উচ্চতর মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়ের নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর
ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পর্ষদের পরিশোধিত
পাঠ্যক্রম অনুসারে লিখিত

বিচিত্রা

উচ্চতর মাধ্যমিক, স্কুল ফাইনাল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ॥

বিভূতি চৌধুরী

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান
সিটি কলেজ, কলিকাতা



বি. সরকার এ্যাণ্ড কোম্পানী
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-১২

প্রকাশক : ভারতচন্দ্র সরকার,
বি. সরকার এ্যাণ্ড কোম্পানী,
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

ষষ্ঠ সংস্করণ
[১৯৫৯]

মুদ্রাকর : [illegible]
মহাবিদ্যা প্রেস
১৫৬, তারক প্রামাণিক
কলিকাতা-৬

ভূমিকাবাক্য

'বিচিত্রা'র ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হল। বর্তমান সংস্করণের 'বিচিত্রা' বিশেষভাবে সংশোধিত এবং পরিবর্তিত। ব্যাকরণ-অংশের আলোচনায় এবার অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন-সাধন করা হয়েছে। কয়েকটি নতুন প্রবন্ধও সংযোজিত করেছি।

ভালো প্রবন্ধ মোটামুটি কী ধরণের হওয়া উচিত, বর্তমান পুস্তকে তার কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছি। মনে রাখতে হবে, উত্তম প্রবন্ধরচনা অনেকখানি নির্ভর করে রচয়িতার জ্ঞানবুদ্ধি, অধ্যয়ন-অভিজ্ঞতা, কল্পনার বিস্তার আর সৌষ্ঠবময় প্রকাশরীতির ওপর। কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মবিধি এক্ষেত্রে নিরর্থক। তবে সতত অনুশীলন এবং উৎকৃষ্ট রচনার সঙ্গে পরিচিতির মূল্য কম নয়, এর ফলে রচনক্ষমতা যে বাড়ে তাতে সন্দেহ নেই।

অনেক পরিশ্রম করে বইখানি লেখা। যাদের জন্যে লিখেছি তারা পড়ে উপকৃত হলে আমার সকল শ্রম সার্থক মনে করব।

এই বই সম্পর্কে পশ্চিম বাঙলায় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মতামত জানতে পারলে খুবই খুশি হব।

সিটি কলেজ,
কলিকাতা

—বিভূতি চৌধুরী

বিষয়সূচী

॥ ১ ॥

< প্রবন্ধমালা >

॥ বি ॥ ॥ পৃষ্ঠা ॥

বিষয় ॥

॥ বিষয় ॥	॥ পৃষ্ঠা ॥

॥ ২ ॥

বাঙ্‌লা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

॥ প্রথম খণ্ড ॥

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

<সেকাল হতে একাল : আধুনিক পর্বের বাঙ্‌লা সাহিত্য>

॥ ৩ ॥

বাংলা ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

[৫]

পাঠসংকলনের অন্তর্ভুক্ত পদ্যাংশ ও গদ্যাংশের ব্যাকরণ ও অলংকার-সম্পর্কিত আলোচনা

[৬]

য়ুনিভার্সিটি বাঙলার অন্তর্ভুক্ত পদ্যাংশ ও গদ্যাংশের ব্যাকরণ ও অলংকার সম্পর্কিত-আলোচনা

বাঙলা অলংকার

ভূমিকাবাক্য—শব্দালংকার : অনুপ্রাস—বক্রোক্তি ও অনুপ্রাস—যমক—শ্লেষ—যমক ও শ্লেষের মধ্যে পার্থক্য—অর্থালংকার : অর্থালংকারগুলির শ্রেণীবিভাগ—উপমা—পূর্ণোপমা—লুপ্তোপমা—মালোপমা—মহোপমা—উৎপ্রেক্ষা—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা—প্রতীয়মানোৎপেক্ষা—রূপক—নানাপ্রকারের রূপক অলংকার : নিরঙ্গ, সাঙ্গ ও পরম্পরিত—রূপক—অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক—ব্যতিরেক—সমাসোক্তি।

[৮]

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন

বাঙলা উপপাঠ্যসমষ্টি

বর্তমান বাঙলার স্বধর্মভ্রষ্ট অশান্ত ছাত্রসমাজ

ঘরে-বাইরে বাঙালি আজ মার খাচ্ছে—অত্যন্ত শোচনীয়, অতীব মর্মান্তিক এক দৃশ্য। বাঙালি-জাতির ওপরে প্রকাণ্ড অভিশাপ নেমে এসেছে। বাঙালির জাতীয় জীবনে এতবড়ো দুর্দিন আর কখনো ঘনায়নি। যেদিকে তাকাই, জাতির বিপন্ন বিপর্যস্ত অবস্থাটি চোখে পড়ে। দেখতে পাই, জাতীয়-অবনতি প্রকট হয়ে উঠেছে, জাতিগত হীনতা ও দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। বাঙালির বিদ্যা বুদ্ধি ও চরিত্র ক্রমেই নিম্নাভিমুখী, তাঁর অপমান-লাঞ্ছনা-দুর্গতির শেষ নেই। জাতিহিসেবে বাঙালি যে নিজের সম্ভ্রম-মর্যাদা সম্পূর্ণ হারিয়েছে, সর্বভারতীয় দীপ্ত গৌরবের সেই সমুচ্চ প্রতিষ্ঠা যে তার খোয়া গেছে, এ সত্যটি অতিশয় লজ্জাজনক হলেও, তর্ক-সংশয়ের অতীত। অকল্পনীয় জাতির এহেন দারুণ দুর্দশা—বেদনাদায়ক, সুদুঃসহ। কতখানি সংকটের সম্মুখীন হয়েছি আমরা!

এই সংকটকে আরো গুরুতর করে তুলেছে বর্তমান বাঙলার ছাত্রসমাজের অশান্ততা, উৎকেন্দ্রিকতা, স্বধর্মভ্রষ্টতা। যে-তরুণ ছাত্রসম্প্রদায় দুর্গত বাঙলার সকল আশা-ভরসার স্থল, যে-ছাত্রদল জাতির প্রকাশোন্মুখ পুঞ্জীকৃত বিপুল শক্তি, অধঃপতিত বাঙলাদেশকে যারা তার পূর্ব-গৌরব ও সম্মানের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে, তারা যদি দিকে দিকে কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর মতো অশুভ অগ্নিচ্ছটা ছড়াতে থাকে, প্রকৃত ছাত্রধর্ম ভুলে গিয়ে আত্মহননের উন্মত্ততা দেখায়, তাহলে সহস্র-অপমান-লাঞ্ছিত মুমূর্ষু বাঙালির নতুন জন্মলাভের উপায় কোথায় থাকে! তারাই তো শোনাবে নীরক্ত বিবর্ণ মৃতপ্রায় জাতিকে পরম আশা-আশ্বাসের বীর্যদীপ্ত বাণী: 'আমরা শক্তি, আমরা বল, আমরা ছাত্রদল।' কিন্তু এরূপ কোনো আশ্বাসবাক্য তাদের মুখে শুনতে পাওয়া যায় না, এই ঘোরতর দুর্দিনে জাতির সম্মান-রক্ষার কঠিন প্রতিশ্রুতি তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় না। দেশ ও জাতি সংগতভাবে আশা করতে পারে, চতুর্ধারের নৈরাশ্যের কুহেলির ঘন আস্তরণ সরিয়ে দিয়ে জ্ঞানশক্তিতে শক্তিমান, চরিত্রবলে বলীয়ান, সাহসে দুর্জয়, আগ্নেয় দুর্দান্ততার আধার, ত্যাগব্রতী তরুণ ছাত্রসমাজ জাতীয় জীবনে নবীন সূর্যোদয়ের পথটি প্রশস্ত করে তুলবে। সাম্প্রতিক কালের বাঙালি ছাত্রগোষ্ঠির দিকে তাকিয়ে কিন্তু এরূপ কোনো আশা অন্তরে পোষণ করতে পারি না। তাই, বাঙালির ভবিষ্যৎ ভেবে কেমন যেন অসহায় বোধ করছি, হতাশার গভীরে ডুবে যাচ্ছি। বাঙলাদেশের কী হতশ্রী অবস্থা হয়েছে আজ!

আমাদের বর্তমান ছাত্রসমাজের অবাঞ্ছনীয় একটি বাস্তব চিত্র উন্মোচন করছি, যেখে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই ব্যথিত হবেন, দুর্ভাবনায় নিজেদের পীড়িত বোধ করবেন। ছাত্রদের চোখে-মুখে সত্যিকার বিদ্যার্থীসুলভ স্নিগ্ধপবিত্রতার ছাপ নেই, তাদের চিত্তে

তারা, আপনাকে সংযমে বাঁধেনি, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার কাছে ধরা দেয়নি; শোভনশীলতার সঙ্গে পরিচয় তাদের নেই বললেই হয়; তারা আচরণে সৌন্দর্যরক্ষা করে চলে না, তাদের কথাবার্তায় মার্জিত রুচি প্রকাশ পায় না; তাদের দেহে-মনে-চরিত্রে রুগ্নতার স্পষ্টরেখ মুদ্রাঙ্কন। উন্মার্গগামিতাকে তারা তারুণ্যের ধর্ম বলে জেনেছে, উচ্ছৃঙ্খলতাকে তরুণের চরিত্রনীতির অঙ্গীভূত বলে বুঝেছে, নম্রমধুর মিতভাষিতাকে বলি দিয়েছে স্পর্ধিত প্রগল্‌ভতার যূপকাষ্ঠে। নিজ নিজ আলয়ে, শিক্ষায়তনে, পরীক্ষাগৃহে, সভাসমিতিতে, উন্মুক্ত সড়কে, খেলার মাঠে—সর্বত্র—ছাত্রদলের কার্যকলাপ তাদের সুস্থ মানসিকতার পরিচয়বাহী একেবারেই নয়, প্রতিনিয়ত ছাত্রধর্মের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে চলেছে তারা। নিজেরা যে আত্মবিনাশের মুখে দ্রুত ধাবমান, এ বোধশক্তি ছাত্ররা বুঝতেই পারছে না। পারলে ছাত্রজীবনের মহতী বিনষ্টির পথে নিশ্চয়ই তারা পা বাড়াতো না, এমন একটি কুশ্রী কলুষিত পরিবেশ সৃষ্টি করতো না।

এখন, জিজ্ঞাসা, এমনটি কেন হলো? এক পুরুষ আগেও তো বাঙালি-ছাত্রসমাজে এতখানি শোচনীয় অবক্ষয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়নি, এমন অধোগতি কারুর চোখে পড়েনি। বিস্তর বিঘ্ন-বাধা সত্ত্বেও তারা মন দিয়ে লেখাপড়া করেছে, একে একে পরীক্ষার ধাপগুলো উত্তীর্ণ হয়েছে, কর্মজীবনে প্রবেশ করে বিদ্যা-বুদ্ধি-কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছে, বাঙলার বাইরেও সম্মানিত আসনে বসেছে। বাঙালি ছাত্রের সুকীর্তি একদা গোটা ভারতবর্ষের ঈর্ষার বস্তু ছিল। সেই গৌরবান্বিত দিনগুলো আজ স্বপ্নের মতোই পলাতক—অতীতের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। আজকের দিনের বাঙালি ছাত্র ক্রমেই অবনতি-প্রাপ্ত হচ্ছে। অশান্ত ছাত্রসমাজ অধুনা জাতির বিরাট এক সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। ফলে বয়স্কব্যক্তিদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। বিভ্রান্ত ছাত্ররা দেশে বিপর্যয় ডেকে আনছে। পুনর্বার প্রশ্ন—এর মূলীভূত কারণ কী? উত্তরে বলতে হয়, কারণ বহুতর—শিক্ষানৈতিক, আর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, এবং আরো অনেককিছু। বড়োই জটিল এই সমস্যা। একারণে এর প্রতিকারের পথ খুঁজে বার করাও কঠিন ব্যাপার, সন্দেহ নেই।

ছাত্রদল স্বভাবতই বিদ্যাবিমুখ, জ্ঞানাহরণে বীতস্পৃহ, নিয়মশৃঙ্খলা-অসহিষ্ণু, দুষ্প্রবৃত্তিপরায়ণ, অবিবেকী, অসুন্দরের ধ্বজাবাহী, এ বিশ্বাস করতে মন চায় না। এরূপ একটি ধারণা চিত্তে যাঁরা পোষণ করেন, বলবো, তাঁরা ভ্রান্ত। নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, সংযম, ত্যাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা জ্ঞানতৃষ্ণা, সৎসাহস এ সমস্তকিছুই তাদের মধ্যে প্রাপ্তব্য। তবে যে তারা আজ আত্মবিস্মৃত হয়ে ছাত্রধর্ম লঙ্ঘন করছে, তারুণ্যের গায়ে কলুষকালিমা মাখাচ্ছে, জ্ঞান-বুদ্ধি ও চরিত্রে দিন দিন পঙ্গু হয়ে পড়ছে, এর জন্যে প্রধানত দায়ী, আমাদের মনে হয়েছে, বাঙলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষাপদ্ধতি।

শিক্ষার প্রথম অবস্থাটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা কি কখনো আমরা নিবিষ্ট মনে ভেবে দেখেছি। শিশু ও বালক-বয়সে দেহের যথোপযুক্ত পুষ্টি যেমন মানবমানবীর

ছাত্রীর পরিণত বয়সের বলিষ্ঠ মানসিকতা ও উন্নত চরিত্রাদর্শের প্রেরণাস্থল। একেবারে কাঁচা বয়সে যে-কতকগুলি নীতি-সংস্কারের ছাপ ছেলেমেয়েদের মনে অঙ্কিত করে দেওয়া হয়, সারাজীবন তার প্রভাব থেকে যায়, ও-ই তাদের অনাগত দিনের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা, কর্মধারা ও আচরণের শক্তিশালী অদৃশ্য নিয়ামক। অতএব শিক্ষার প্রথম অবস্থাটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বর।

অথচ এ-বিষয়ে একেবারেই সচেতন নই আমরা—'আমরা' বলতে শিক্ষা নামীয় বৃহৎ যন্ত্রটির পরিচালকরা। এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ার দিকে একবার তাকান; দেখতে পাবেন, নিদারুণ অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা দিনের পর দিন চলছে সেখানে। ইস্কুলের কর্তৃপক্ষস্থানীয় যাঁরা, অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে বলছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথেষ্ট দায়িত্ববোধসম্পন্ন তারা নন। শিক্ষার আদর্শ ও নীতির দিকে তাঁরা বড়ো-একটা দৃষ্টি দেন না, শিক্ষার্থীর প্রকৃত উন্নতি কোন্ পথে, তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না। কর্তাব্যক্তিদের দলীয় স্বার্থকেন্দ্রিক সর্বক্ষণ ঝগড়া-বিবাদ যে-কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নতির পথে বিঘ্নস্বরূপ। বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের ওপরে নির্ভর করে সমগ্র শিক্ষাকর্মটির সাফল্য। কিন্তু প্রায়শ শুনতে পাই, প্রধানশিক্ষক-মহাশয়কে কর্তৃপক্ষের নানান নির্দেশ সর্বদা মেনে চলতে হয়—স্বাধীনভাবে কোনো কাজ তিনি করতে পারেন না, তার নিজ যোগ্যতার পরিচয় দেওয়ার সুযোগ তেমন মেলে না। ন্যায়নিষ্ঠ, চরিত্রবান, স্বাধীনচেতা, সৎপ্রকৃতিক প্রধানশিক্ষক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে শিক্ষার উচ্চ-আদর্শটিকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে না। আর, নিম্নতন শিক্ষকদের অবস্থাটি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষকতা-বৃত্তি তাঁদের কাছে অভিশাপ ছাড়া আর কী! এই নিদারুণ দুঃসময়েও অত্যন্ত অল্প-বেতনে তাঁরা কাজ করে চলেছেন। সাংসারিক অভাব তাঁদের পূরণ করতেই হবে। কাজেই, ইস্কুলের বাইরেও তাঁরা অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন। এজন্যে শিক্ষাদানকর্মে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পারেন না তাঁরা, উৎসাহও পান না। এরূপ পরিস্থিতিতে শিক্ষার মান নেমে যেতে বাধ্য, ছাত্রদের ক্ষতি অনিবার্য।

আরো একটি গুরুতর ক্ষতি হলো, অভাবক্লিষ্ট শিক্ষকদের দুরবস্থা দেখে, তাঁদের চরিত্রে দুর্বলতার অনুপ্রবেশ ও দৃঢ়তার অভাব লক্ষ্য করে, ছাত্রসম্প্রদায় শিক্ষকসমাজের প্রতি শ্রদ্ধা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে। অথচ ওই শ্রদ্ধা না থাকলে শিক্ষালাভ করা ও মানুষ হওয়া একরূপ অসম্ভব বললেই চলে। শ্রদ্ধা পেতে হলে নিজেকে শ্রদ্ধেয় করে তুলতে হয়, একথা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু অবস্থাচক্রে শিক্ষকগণ নিজেদের সামর্থ ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন না। শিক্ষকের এহেন হীন অবস্থা চাক্ষুষ করে ছাত্রদের—অল্পবয়সের বালকদের—মন কলুষিত হয়ে ওঠে। রুটিনে ক্লাশ রয়েছে, কিন্তু ক্লাশে শিক্ষক অনুপস্থিত, কিংবা ক্লাশে এলেও উৎসাহসহকারে শিক্ষাদানে তেমন তৎপর নন। একনিষ্ঠ শিক্ষাগুরু না থাকলে আদর্শ-ছাত্র গড়ে তুলবেন কে। শিক্ষকসম্প্রদায়ের দুরবস্থাই ছাত্রসমাজকে আদর্শচ্যুতির মুখে ঠেলে দিচ্ছে

নির্ধাণে সতর্কতার অভাব, পাঠ্যতালিকাভুক্ত বইয়ের পর্বতপ্রমাণ বোঝা, ছুটির আধিক্য, পরীক্ষাগ্রহণের ক্রটিযুক্ত নীতি, ইত্যাদি বস্তু ছাত্রদের অধ্যয়নে ব্যাঘাত ঘটায়; এতে তারা বিদ্যাচর্চার বিষয়ে অনুরাগ-উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, তাদের মনের কোণে ক্রমশ বিক্ষোভ জমে ওঠে; এবং এই বিক্ষুব্ধ মানসিক অবস্থার দরুণ পরীক্ষাগৃহে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ বাধে। পরীক্ষাপাশ করতেই হবে, নইলে একদিকে অভিভাবকের রক্তচক্ষুর নির্মম শাসন, অন্যদিকে উচ্চতর শিক্ষালাভের পথটি রুদ্ধ। পরীক্ষায় সাফল্য চাকুরিজীবনে ঢোকার দামি টিকেট, এতো সকলের জানা কথা। ইস্কুলে ছাত্ররা প্রথম থেকে শেষাবধি যে-শিক্ষা পায় তাতে তাদের মন ও চরিত্র কীভাবে গড়ে ওঠে, তা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষার নামে এতখানি অব্যবস্থা যেখানে চলে, সেখানে ছাত্রসমাজ যদি কুৎসিত ঘটনার সঙ্গে নিজেদের জড়িত করে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখায়, তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে!

দেশের শিক্ষাসংকটই ছাত্রসমাজকে দিশেহারা করে তুলেছে, তাদের দুর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য করছে। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও শোচনীয় অব্যবস্থা লক্ষিত হয়। অনেক আশা নিয়ে ছাত্ররা মহাবিদ্যালয়ে—বিশ্ববিদ্যালয়ে—প্রবেশ করে। কিন্তু অচিরে তরুণের সকল স্বপ্ন খান খান হয়ে ভেঙে যায়। নৈরাশ্যপীড়িত হয় তারা, শক্তি-সময় ও অর্থের অপচয় দেখে অল্পকালের মধ্যে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ইস্কুলজীবন থেকে কলেজজীবন—যেন ক্ষুদ্র খাল থেকে একেবারে সমুদ্রে গিয়ে পড়া। একে তো পাঠ্যক্রমের অতিরিক্ত চাপ, তদুপরি শিক্ষাদানের সময় কম, সুযোগ্য অধ্যাপকের নিতান্ত অভাব; লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরির অবস্থাও অতি দীন। অথচ পরীক্ষার উত্তীর্ণ না হলে নয়। ফলে দুর্নীতির পথে পা বাড়ানো, পরীক্ষাগৃহে তুমুল কাণ্ডসৃষ্টি।

ছাত্ররা জানে না, কেন কলেজে-য়ুনিভার্সিটিতে ঢুকছে তারা। না পড়ে কী করবে, উপায়ান্তর না দেখেই তাদের পড়া। উচ্চতর শিক্ষার জগতে অধিকারীভেদ থাকবে না কেন? শিক্ষার প্রতিটি স্তর স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে না কেন? যারা যোগ্য তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে, আর, যোগ্যতা যাদের নেই, কোনো একটি নিম্নমানের বৃত্তির আশ্রয় তারা বেছে নেবে। কিন্তু আমাদের দেশে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা কোথায়! মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ছাড়া অধিকাংশ ছাত্রকে বেকারির দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। বেকারজীবনের গ্লানিবহনের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ছাত্ররা কোনোরকমে পরীক্ষা-পাশের জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। এখানে আবার একই কথার পুনরুক্তি: বি.এ-এম.এ ডিগ্রি চাকরির সংসারে প্রবেশের মহামূল্য টিকেট। যে-কোনো উপায়েই হোক, ওই প্রবেশপত্র লাভ করতে হবে। পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হোক, প্রশ্নপত্র পাঠ্যতালিকার বহির্ভূত বিষয় নিয়ে তৈরি, কিংবা প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে—অতএব পরীক্ষার হল ছেড়ে দল বেঁধে আমরা বেরিয়ে আসবো, পরীক্ষাগৃহের আসবাবপত্র ভেঙেচুরে তছনছ করে দেবো—উত্তেজিত ছাত্ররা এরূপ বাক্য যখন উচ্চারণ করে, আচরণে অশোভন অসংযম দেখায়, তখন বয়স্করা ব্যথিত হন। কিন্তু

অস্বাভাবিকতা কোথায়! শিক্ষার সর্বস্তরে স্তূপীকৃত আবর্জনা জমিয়ে রেখে শিক্ষা-বিষয়ক বড়ো বড়ো প্ল্যান তৈরী করলে, সমাবর্তন-উৎসবে গুরুগম্ভীর ভাষণ দিলে, উৎকৃষ্ট নীতি-পঙ্‌ক্তির আস্তরণ বিছালে, কোনো ফল হবে বলে মনে হয় না। ওই ইস্কুল-গুলিকে জাইয়ে তুলতে হবে, শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কারসাধন করতে হবে, ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে অধীত বিদ্যার যোগসূত্র রচনা করতে হবে, শিক্ষাব্যবস্থার সর্বপ্রকার গলদ সাধ্যমতো দূর করতে হবে। তাহলে ছাত্রসমাজের কোনো ক্ষোভের কারণ থাকবে না, বিক্ষোভ তারা দেখাবে না, ছাত্রধর্মের মর্যাদা অবশ্যই রক্ষা করে চলবে।

ছাত্রসম্প্রদায়ের উন্মার্গগামিতার, নিয়মশৃঙ্খলাদ্রোহিতার অন্যতর একটি কারণ হলো আর্থনীতিক, কথাটিকে ঘুরিয়ে বললে—দারিদ্র্য। দরিদ্র ছাত্ররা অর্থাভাবে বইপত্র কিনতে পারে না, ঠিক সময়ে ইস্কুল-কলেজের বেতন দিতে অসমর্থ। এ তাদের পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটায়। পড়া শিখে না গেলে শিক্ষকের কাছে শাস্তি পেতে হয়, বেতন বাকি পড়লে বিদ্যালয়ে নাম কাটা যায়। এর প্রত্যক্ষ ফল—ইস্কুল-পালানো, শিক্ষায়তনে ছাত্রের অনুপস্থিতি। এসব ছাত্রই আস্তে আস্তে বিপথে পা দেয়, কুসংসর্গ তাদের চরিত্রকে কলুষিত করে। তখন এরা সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হতে কুণ্ঠাবোধ করে না, সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনে।

বাঙ্‌লাদেশের সহস্র সহস্র পরিবার আজ দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর পেষণে ওষ্ঠাগতপ্রাণ। আর্থিক অসচ্ছলতায় ক্লিষ্ট পিতামাতা, ইচ্ছা থাকলেও, তাদের সন্তানের যথোচিত তত্ত্বাবধান করতে পারেন না, পুত্রকন্যার সুষ্ঠু জীবনযাপনের উপযোগী পরিবেশ রচনা করবার মতো মানসিক অবস্থা তাদের নয়। অষ্টপ্রহর যাঁদের অন্নবস্ত্রের চিন্তায় কাটে, ছেলেমেয়েদের দিকে যথোচিত দৃষ্টি দেবার সময় তাদের কোথায়! এ কারণে অসুস্থ আবহাওয়ায় লালিত সন্তানরা যখন লেখাপড়ার পাট গুটিয়ে বদ্ খেয়ালের কবলগ্রস্ত হয়, অবাধ্য হয়ে ওঠে, গুরুজনের শাসনের বাইরে চলে যায়, তখন পরিবারে অভিভাবকের ভূমিকাটি অসহায় নীরব দর্শকের। দারিদ্র্য মানুষের চরিত্রবল ক্ষুণ্ণ করে, মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে দেয়, দুষ্প্রবৃত্তির ইন্ধন জোগায়। বর্তমান ছাত্রসম্প্রদায় বৃহত্তর সমাজের চোখে যে উৎপাত-বিশেষ, তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো সর্বগুণনাশা দারিদ্র্যের প্রচণ্ড আঘাত। মানবিকতা ও নীতিধর্ম বুঝি দরিদ্রের জন্যে নয়, বাস্তুহারাদের আবার ধর্ম কী! আর্থিক সচ্ছলতা এনে দাও, পারিবারিক অশান্তি দূর হবে, সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠবে, পিতামাতা নিজ নিজ সন্তানের দিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ পাবেন, ছেলেমেয়েরাও ঠিকমতো মানুষ হয়ে উঠবে। সুনীতি, সুরুচি, সংস্বভাব, চারিত্রিক শুচিতা, বিদ্যানুরাগ, জ্ঞানানুশীলনের প্রবৃত্তি, জনসেবার কল্যাণী ইচ্ছা, সমস্তকিছু নির্ভর করে দারিদ্র্যমুক্ত সমাজব্যবস্থার ওপরে। দুর্ভিক্ষপীড়িত, নানান অশান্তিতে আকীর্ণ দেশের ছাত্ররা নীতিশৃঙ্খলা পদে পদে মেনে চলবে, এরূপ আশা করা যায় কী করে! দারুণ নৈরাশ্য তাদের নীতিভ্রষ্ট করছে, অভাবে তাদের স্বভাব

সামাজিক কারণটির দূষিত প্রভাব কম ক্ষতিকর নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশ-বিভাগ বাঙালির জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করে দিয়েছে, সমাজজীবনকে কুশ্রীতায় ভরে তুলেছে। সমাজবোধ বলতে এখন কিছুই নেই, শুভচেতনার অপঘাত-মৃত্যু হয়েছে, দেশবাসীর চিত্ত থেকে কল্যাণাত্মিকা বুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে, সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের চিন্তা অধুনা আদর্শবাদীর অবাস্তব স্বপ্নে পর্যবসিত হয়েছে। সামাজিক দায়িত্ববোধ, ভালোমন্দের বিচারবোধ কারুর রয়েছে বলে মনে হয় না। ছলনা, চাতুরি, প্রতারণা, মিথ্যাচার, কালোবাজারি, ক্লেদাক্ত লোভের বশে মানুষের মুণ্ডশিকার, আত্মসুখসর্বস্বতা, নীচতা চতুর্দিকের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলেছে। গোটা জাতি যদি চরিত্রভ্রষ্ট হয়, সেখানে ছাত্রসম্প্রদায় শুভচেতনায় প্রবুদ্ধ হবে, দায়িত্ব-বোধের পরিচয় দেবে, সংপ্রকৃতিক হয়ে উঠবে, এরূপ আশা করা যায় কী! বিধানসভায়, লোকসভায় বুড়োরা লজ্জাকর আচরণ করছে, তরুণদের মনে তা কীরকম ছাপ ফেলছে! বয়স্কব্যক্তিরাই তো তাদের উচ্ছৃঙ্খল হতে শেখাচ্ছে। এই সামাজিক সমস্যাটি গুরুতর।

সর্বশেষে, রাজনৈতিক কারণটির কথা। সক্রিয় রাজনীতিতে ছাত্রসমাজের যোগ দেওয়া উচিত কিনা, এ বহুবিতর্কিত একটি বিষয়। দেশ যখন পরাধীন ছিল, তখন নেতাদের উদাত্ত আহ্বানে, সকল বয়সের মানুষ— বিদ্যায়তনের ছাত্ররাও— রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উপদেশ ও কয়েকটি আদেশ পালন করা, এই ছিল তখনকার ছাত্রসম্প্রদায়ের রাজনীতি। রাজনীতি একটি আপদ্ধর্ম, দেশ ও জাতির গুরুতর সংকটের দিনেই বিদ্যার্থীর রাজনীতিচর্চা বিধেয়। স্বদেশ-উদ্ধার সাময়িক গুরুতর কায, এবং এর প্রয়োজনে লেখাপড়া কিছুকালের জন্যে বন্ধ রাখতেই হয়। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, প্রকাণ্ড একটি আপদ কেটেছে। বিদ্যাভবন ছেড়ে ছাত্ররা দলে দলে রাস্তায় এসে নামুক - দেশনেতারা এরূপ আহ্বান ছাত্রদের নিশ্চয়ই জানাবেন না। দেশগঠনমূলক কাজের জন্যে মাঝে-মধ্যে অবশ্য তাদের ডাক পড়তে পারে।

কিন্তু আজকের দিনে দেখছি, রাজনীতিচর্চা ছাত্রজীবনের একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছে, বলতে গেলে—বর্তমান ছাত্রজীবন রাজনীতিসর্বস্ব। শিক্ষামন্দিরে অধুনা বসেছে রাজনীতির আসর, বিদ্যাপীঠ ছাত্রদলের বক্তৃতামঞ্চে রূপান্তরিত। এরূপ একটি আবহাওয়া মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়—না দেশের পক্ষে, না ছাত্রদের পক্ষে। কোনো একটা বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে কিংবা রাজনীতিক দলকে আশ্রয় করে সম্প্রতি ছাত্রসমাজ নানা আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে, কথায় কথায় বিদ্যালয় ছেড়ে পথে মিছিল বার করছে, বিবিধ বর্ণের ঝাণ্ডা উড়োচ্ছে, বিচিত্র স্লোগান আওড়াচ্ছে। এতে জাতির ক্ষতি, ছাত্রগোষ্ঠির ততোধিক ক্ষতি। বালক-কিশোর যুবকদের শিক্ষা শেষ না হতে অপরিণত বুদ্ধি ও অসম্পূর্ণ বিদ্যা নিয়ে যদি তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে ঢোকে তাতে লাভ কারুরই হয় না, সফলতার পরিবর্তে অনিষ্টের সম্ভাবনাই সমধিক।

বিচারপূর্বক তাকে গ্রহণ করতে হবে, তাকে আত্মগত করা চাই। রাজনীতিক মতবাদ-বিচারণার শক্তি জ্ঞানবিদ্যার দ্বারাই সম্ভব। অশিক্ষিত বুদ্ধি বিচারবোধশূন্য, এ শুধু গড্ডলিকার মতো চালিত হয়, ঠিক পথে কাউকে চালাবার ক্ষমতা তার নেই। একারণে দেখতে পাই, আবেগপ্রবণ ছাত্ররা সুবিধাবাদী, স্বার্থান্বেষী, অদূরদর্শী রাজনীতির পেশাদার ব্যক্তিদের কবলে গিয়ে পড়ছে। এজাতের দেশনেতার উচ্চারিত আদর্শবাদের ফাঁকা বুলি ছাত্রসম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করছে, বিপথে চালাচ্ছে। ছাত্রকল্যাণের জন্যে ভাবনা তাঁদের নেই, দলের পুষ্টিসাধনই তাঁদের অভিলষিত।

শোভাযাত্রায় সমবেত ছাত্রগোষ্ঠির তুমুল কোলাহল, প্রতিবাদমূলক হাঙ্গাম-হুড়াহুড়ি ও অসংযত আচরণের ফল কী হচ্ছে—সমাজে দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি, সামাজিকের শান্তিভঙ্গ। আর, অন্যদিকে, এই উচ্ছৃঙ্খলতা-দমনের জন্যে অসহিষ্ণু শঙ্কাতুর শাসক-সরকারের পুলিশ-পল্টন ছাত্রদের নির্বিচারে নিক্ষেপ করছে বুলেটের মুখে। একদিকে মারমুখী ছাত্র, অন্যদিকে, টিয়ার গ্যাস, বুলেট। রণক্ষেত্র যেন। এরূপ দৃশ্য কি সুস্থ মানসিকতার পরিচয়বাহী! জ্ঞান-বুদ্ধি-বিদ্যার আলোয় রাজনীতিক আন্দোলনের ফলাফল বিচার করতে হবে। অন্ধভাবে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে রাজনীতির অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলে ছাত্রধর্মের অপমৃত্যু, অযথা শক্তিক্ষয়, অনর্থক রক্তক্ষরণ ও মর্মান্তিক জীবনহানিই নিশ্চিত পরিণাম, সুফল কিছুই মিলবে না। ছাত্রদের বুঝে নেবার সময় এসেছে—দলের চেয়ে দেশ বড়ো। আর, শাসকেরাও ইতিহাস কেন ভুলে যান যে, রক্তকলঙ্কিত হাত থেকে শাসনদণ্ড খসে পড়তে বেশি সময় লাগে না!

ছাত্রদলকে আমরা বলি, রাজনীতিকে তারা একটা আপৎকর্ম বলেই জানুক, সাময়িক গুরুতর কর্তব্য বলেই বুঝুক। রাজনীতিচর্চাকে নিত্যনিয়মের মতো আঁকড়ে থাকলে, বিদ্যার আয়ুধে নিজেদের সজ্জিত ও সুরক্ষিত না করলে, ভবিষ্যৎ জীবনে তারা বিমূঢ় হয়ে পড়বে—সম্মুখে দেখতে পাবে আশাহীন, আলোহীন দিগ্‌জোড়া ভয়ংকর শূন্যতা। অতএব, মহাসংকট উদ্ধরণের প্রয়োজন দেখা না দিলে বিদ্যার্থীরা অধ্যয়নকেই ছাত্রজীবনের পরমপবিত্র ব্রত বলে জানবে; অনন্যমনা হয়ে বিদ্যানুশীলনই তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সাধনা। সেই বহুশ্রুত কথা,—'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ'। গভীরভাবে ভেবে দেখলে এর মতো বড়ো সত্য আর নেই। ছাত্ররা বিদ্যামন্দিরের পবিত্রতা যেন ক্ষুণ্ণ না করে।

ওপরে যে-কথাগুলি বলা হলো, তা থেকে বুঝতে পারা যাবে, আজকের দিনের ছাত্রবিক্ষোভের মূলে বিবিধ কারণ নিহিত রয়েছে। এসকল কারণ দূর করতে পারা না গেলে ছাত্রসমাজকে কিছুতেই শান্ত করা যাবে না, তাদের বিক্ষোভ থামবে না, সমাজে শান্তিও ফিরে আসবে না।

শিক্ষিত যুবশক্তির ওপরেই দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধির শাণিত প্রহরণ আহরণ করে তারুণ্য-দীপ্ত বাঙালি ছাত্রদল দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত বঙ্গমাতার উদ্দেশে বলুক: 'মা, আমরা তোমাকে ভারতরাষ্ট্রের গৌরববিভাসিত শীর্ষস্থানে বসাবো, তখন বাঙালিকে হেয় প্রতিপন্ন করার ঔদ্ধত্য কেউ আর

আমার প্রিয় একখানি বাঙ্‌লা গ্রন্থ

॥ বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি'॥

আমার হৃদয়ক্ষেত্রে প্রীতির উচ্চাসনে বসিয়েছি আমি বিভূতিভূষণকে—সেই আশ্চর্য গ্রন্থ 'পথের পাঁচালি'র বহুপ্রশংসিত লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিভূতিভূষণ আমার অন্তরের সর্বাধিক প্রীতি আকর্ষণ করেছেন, একথা বলার অর্থ এই নয় যে, বাঙ্‌লার কীর্তিমান অপর কোনো সাহিত্যনির্মাতাকে আমি নিজ প্রাণের প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করিনি। করেছি। তাঁরা স্মরণীয়, বরণীয় তারা। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্র, শৈলজানন্দ-প্রেমেন্দ্র-প্রবোধকুমার-তারাশঙ্কর, মানিক-বুদ্ধদেব মনোজ-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—এসব নামকরা লেখকের স্মরণযোগ্য কিছু কিছু বই আমার ইস্কুলজীবনের স্বল্পায়ত অবসরের ফাঁকে ফাঁকে আমি পড়েছি। পড়ে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি, খুশিতে মন ভরে উঠেছে। কিন্তু আমার মনে যে-বইখানি সব-চাইতে বেশি দাগ কেটেছে, যে বইখানি অগাধ আনন্দে আমাকে আবিষ্ট করেছে, এক স্বপ্নসুন্দর জগতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আমাকে, এবং আমার চিত্তে বিপুল বিস্ময়ের চমক লাগিয়েছে, তা হলো—'পথের পাঁচালি'। রচনারীতির অভিনবত্ব, পরিবেশিত রসের অপূর্বতা, অতিসাধারণ নিত্যকার অনুভূতির অকপট বর্ণন, গ্রন্থে বর্ণিত শিশু নায়কের রহস্যগম্ভীর জীবনলীলার চিত্রায়ণ, রচয়িতার নিসর্গ-প্রীতিবিহ্বলতা আর অদ্ভুত শিশুপ্রীতি উপন্যাসখানিকে অতিশয় বিশিষ্ট করে তুলেছে।

পথের পাঁচালি পড়ে যেদিন শেষ করলাম, মনে হলো বাঙ্‌লা সাহিত্যে এ বই অনন্যসাধারণ—ঠিক এজাতের জিনিস ইতঃপূর্বে কুত্রাপি চোখে পড়ে নি। কোলাহল-মুখর, সংঘাতসংকুল শহরের রুক্ষ রূঢ় পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে যে পল্লীশৈশবকে হারিয়েছিলাম, নিশ্চিন্দিপুরের গ্রাম্য পরিবেশ থেকে তুলে-আনা পথের পাঁচালি-র স্বপ্নময় সংসারে প্রবেশ করে তাকে যেন ক্ষণকালের জন্যে ফিরে পেলাম। মনের একটি তার সহসা বেজে উঠলো, স্মৃতিলোক আলোড়িত হলো। কে যেন স্মরণ করিয়ে দিল: 'শিশুর অপাপবিদ্ধ জীবনক্ষেত্র থেকে তুমি দূরে সরে এসেছো, সহজ সৌন্দর্য ও আনন্দের স্বপ্নাচ্ছন্ন স্বর্গভূমি থেকে নির্বাসিত হয়েছো, শুভ্রবাস মুক্ত আত্মাকে সহস্র বন্ধনে জড়িয়েছো—জড়াচ্ছো।' অন্তঃকর্ণে আমি অতীতে-অপসৃত শৈশবের ডাক শুনতে পেলাম—পেছনে-ফেলে-আসা দিনগুলোর করুণ কোমল আহ্বান। ভিতরে ভিতরে উন্মনা হয়ে উঠলাম স্মৃতির কান্না পথের পাঁচালি-র পাতা উল্টিয়ে।

এ আখ্যায়িকা 'অপু'-র অভিজ্ঞতার কাব্যস্বরভিত রূপায়ণ, তার জীবনেরই দলিল। তবু অনুভব করলাম, অপুর জীবনের সঙ্গে আমার জীবনও বুঝি একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে, গত জীবনের 'সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি'কে ভুলে গিয়েছিলাম, পথের

পাঁচালি মনে পড়িয়ে দিল তাদের, আর, সঙ্গে নিয়ে এলো অনির্বাচ্য স্বস্তি, শান্তি, তৃপ্তি। মুহূর্তে আনন্দতীর্থযাত্রী শ্রীরবীন্দ্রের কথিত 'সব-পেয়েছির দেশ'টির অধিবাসী হয়ে উঠলাম বুঝি, কিংবা রূপকথার মায়াজড়ানো রূপলোকের বাসিন্দা হলাম।

পথের পাঁচালি-র লেখক আমাদের নতুন এক রূপকথার কাহিনী শুনিয়েছেন। রূপকথা—কিন্তু বাস্তবের মানুষ, বাস্তবের পথঘাট-নদী-প্রান্তর, আকাশ-অরণ্য-মৃত্তিকার উপাদানে গঠিত। নিশ্চিন্দিপুর-গ্রামের চিরশ্যাম বনভূমি বনভূমির ছায়ায় লতাপাতার নিবিড়তা, ভিজেমাটির গন্ধ, শাঁখারিপুকুরে নালদলের বংশ, চক্রবর্তীদের ফাঁকা মাঠ, পল্লীর বাঁশবন, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলা, ধলচিতের খেয়াঘাট, কলমীদামে-ছাওয়া পুরানো দীঘি, আঁশশ্যাওড়া আর কালকাসুন্দির ঝোপ, ঝোপে-ঢাকা সরু গ্রাম্য পথে মেটে খরগোশের আনাগোনা, নীলকণ্ঠ পাখির সন্ধানরত পল্লীবালকের উৎকণ্ঠিত কৌতূহল—বিচিত্র মানব, বিচিত্র জীব, বিচিত্র উদ্ভিদে পরিপূর্ণ আঞ্চলিক এক ভূখণ্ড নিয়ে যে-সাহিত্যজগৎ নির্মাণ করেছেন বিভূতিভূষণ, তা কল্পলোক হলেও, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত; আবার, বাস্তব হয়েও, রূপকথার মতোই, এক মায়াচ্ছন্ন স্বপ্নের ভুবন যেন।

২

পথের পাঁচালি-র ছড়িয়ে-পড়া প্লটের মধ্যে রয়েছে বাঙলার নিস্তরঙ্গ পল্লীর একটি ভদ্র অথচ দুঃস্থ পরিবারের মানুষের কাহিনী। শেষাংশ ছাড়া ঘটনার আবর্ত চোখে পড়ে না, গুরুতর কোনো উত্থানপতনের মধ্যে কেউ নিক্ষিপ্ত হয়নি। উল্লেখযোগ্য দুর্বিপাক হলো দারিদ্র্যের, এ-ই সকরুণ নিয়তির মতো উপন্যাসের চরিত্রগুলোর জীবন আদ্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করেছে। পল্লীর চঞ্চলতাহীন জীবনযাপনের মধ্যেও প্রতিটি চরিত্রের পথেচলার ইতিবৃত্ত আর গতিশীলতাই এই উপন্যাসের মুখ্য বর্ণনীয়।

'পথের পাঁচালি' অর্থে পথের সংগীত—পল্লীজীবনসংগীতই পাঁচালি। যেহেতু 'পথ' সেহেতু এখানে অবারিত দীর্ঘতা; এবং যেহেতু 'পাঁচালি' সেহেতু স্নিগ্ধ মন্থরতা—দুটি বস্তুই উপন্যাসখানিতে গায়ে-গায়ে লাগা। এই পথের সংগীত যেমন অনিবার্যভাবে পরিবর্তনশীলতার দিকে অঙ্গুলিসংকেত করে, তেমনি, জীবনব্যাপী সকরুণতারও সঞ্চার করে। নায়ক অপুর চরিত্রেই এ বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে, যদিও অন্যকোনো চরিত্রই এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। একজন পড়ছে, একজন চলছে; যে পড়ে রইলো তার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করলেও থামবার অবকাশ নেই, তোমার জীবনের যা প্রাপ্য তা কুড়িয়ে নিতেই হবে—এই গতির সূত্রে কয়েকটি জীবনকে কবি-ঔপন্যাসিক আবদ্ধ করেছেন, এবং প্রথমিক পটভূমি হিসেবে নিয়েছেন অচঞ্চল পল্লীজীবন। লেখকের উপকরণ, বলতে গেলে, তুচ্ছ—সামান্য। পল্লীর শাস্ত্র ও প্রথার অনুসরণ এবং গতানুগতিক জীবনযাত্রার মধ্যেও নিজ স্বতন্ত্র পথে প্রত্যেকের যাত্রার দিকটি উপন্যাস-নির্মাতা শুধু অনুমানের বিষয় করেই রাখেননি, স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। হরিহর কেবল পথের সন্ধান করেছে, সবশেষে অনন্তপথের যাত্রী হয়েছে; সর্বজয়া অনির্দেশ্য পথে পা বাড়িয়েছে, পথেই ভেসেছে; বল্লালীপ্রথার মূর্ত অভিশাপ, দুর্ভাগ্য ও বিড়ম্বনার

অশ্রুপরিপ্লুত জরাগ্রস্তমূর্তি ইন্দিরঠাকরুণকে পথই শেষ আশ্রয় দিয়েছে। আর, শ্রীমান্ অপুকে :

'পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে ……। দেশ ছেড়ে দেশান্তরের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডি এগিয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে…দিনরাত্রি পার হয়ে, জন্মমরণ পার হয়ে, মাস-বর্ষ-মন্বন্তর-মহাযুগ পার হয়ে চলে, চলে, চলে—এগিয়ে চলে', ইত্যাদি।

নানান্ ঘটনা ও দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিচালিত-জীবন অপু পথের নিয়মে চলেছে। তার গন্তব্য বিধিনির্দিষ্ট, সুতরাং কোনোকিছুর দিকে স্থায়ীভাবে দৃক্‌পাত করবার অবকাশ তার নেই, উপায় নেই। স্ব স্ব গন্তব্য পথে যেমন সকলেই চলে গেছে, তার নিজ গন্তব্যপথে, তেমনি, তাকেও চলতে হলো। এ-ই পথের পাঁচালি-র পথনির্দেশ।

উপন্যাসে অপুর চরিত্রাঙ্কন লেখকের তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীলতার উজ্জ্বলন্ত নিদর্শন। একটি বিস্তীর্ণ অধ্যায়ে পল্লীর এই বালক ও কিশোরের মনের বিকাশটি সমগ্রভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্মাণ করা হয়েছে। বাঙ্‌লাসাহিত্যে ঠিক এর পূর্বনিদর্শন নেই, পরেও এই সমগ্রতার নিদর্শন লক্ষিত হয় না। অপুর শিশুমানসের স্বপ্নসৃষ্টির, বস্তুকে অবলম্বন মাত্র করে বস্তুর অতীত মায়ালোকে বিহরণের, কী সুন্দর আলেখ্য এঁকেছেন গ্রন্থকার! এ ছাড়া, বালক অপুর নিসর্গপ্রীতি, সরল বিশ্বাস, মায়ের জন্যে মন-কেমন করা, দিদির প্রতি প্রগাঢ় মমত্ববোধ—এসকলের সঙ্গে বয়োবৃদ্ধির সমসূত্রে তার চিত্তে মান-অভিমানের আবির্ভাব, বালিকা-খেলার-সাথীদের প্রতি একপ্রকার আকর্ষণ, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর প্রতি অনুরাগ, অদ্ভুত গল্প ও রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনার আগ্রহ, বীর চরিত্রের সঙ্গে সহানুভূতি, ব্যর্থ জীবনচরিত্রের প্রতি করুণাস্নিগ্ধ মমতা—এ সমুদয় যথাযথভাবে ও নৈপুণ্যসহকারে চিত্রিত হয়েছে। এ চরিত্রের অঙ্কনে লেখকের বাস্তবাশ্রয় তর্কের অতীত। বিভিন্ন ঘটনা ও মানবচরিত্রের সংস্পর্শে আগত শিশু ও কিশোরের অন্তরের ঘাতপ্রতিঘাতগুলি লেখকের কুশলী আলেখ্যনির্মাণের নিশ্চিত স্বাক্ষর বহন করে। পাঠশালায় ও গৃহে শিক্ষার চিত্রটি অপুর জীবনের বিশিষ্ট একটি অধ্যায়। লেখক অপুর সহজ সাহিত্যানুরাগ' ও পাঠে আগ্রহের দিকটি বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছেন। এখানেই অপু সাধারণ কিশোরসম্প্রদায় থেকে বিশিষ্ট, অথচ একান্তভাবে বাস্তব। পিতার মৃত্যুর পর অপুর জীবনের যে অধ্যায়টুকু, তা একদিকে করুণ হলেও, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মতো সুস্থতা ও সরলতার পরিচায়ক। অত্যন্ত নিম্ন ও অবাঞ্ছিত পরিবেশের মধ্যে অপুর চিত্ত স্বাভাবিকভাবেই পরিচিত পল্লীপরিবেশ এবং নিসর্গের অকাতর স্নেহের মধ্যে ছুটে যেতে চেয়েছে। নিশ্চিন্দিপুর সর্বজয়াকে দারিদ্র্যের দ্বারা পীড়িত করেছে, কিন্তু অপুকে সে যা দিয়েছে, তা তো তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল।

'পথের পাঁচালি'র কাব্য-পরিবেশ ও গ্রন্থখানিতে বিভূতিভূষণের কবি-মনের বিস্তৃত

প্রতিফলন লক্ষ্য করবার মতো। কিন্তু বিভূতিভূষণ যদি বাস্তব-জীবনরস-পরিবেশনে কার্পণ্য করে থাকেন তাহলে তার সৃষ্টি ব্যর্থ হয়েছে, বলতে হবে। তাঁর সৃষ্ট সকল চরিত্রই এই বাস্তবতার পথ অনুসরণ করেছে। পরিবেশের মধ্যে শুধু পল্লীর নিসর্গপ্রকৃতিই নয়, পল্লীবাসীর দারিদ্র্য, কুসংস্কার, সংকীর্ণতা, ঈর্ষা, লোভ, নারীনির্যাতন সকলই রয়েছে। ঘটনার বৈচিত্র্য না থাকুক, গুরুতর জীবনসমস্যার মুখে কোনো চরিত্রের আবর্তন-বিবর্তনের চিহ্ন না থাকুক, এতে চিত্র আছে, শান্ত পল্লীর বাস্তব চিত্রই আছে। আর, ভেবে দেখলে, ঘটনাবিরলতার মধ্যেও তাদের জীবনদ্বন্দ্বের যেটুকু পরিচয় মেলে, ও-ই যথেষ্ট। এরই মধ্যে একটি ক্রমবর্ধিষ্ণু শিশুমনের প্রসারণশীলতার চিত্রটি অত্যন্ত নিপুণভাবে সংযোজিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের তথা বাঙ্‌লাসাহিত্যেরই একটি অসাধারণ পল্লীবালিকার চিত্র দুর্গার। গ্রামের ঘরপালানো পাড়াবেড়ানো মেয়ের মতো দুর্গা যদিও, তার বিশেষত্ব এই যে, পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তার সম্পর্ক যতটুকু, তার চেয়ে বেশি বনবাদাড়-গাছপালার সঙ্গে। সে যেন নিসর্গসংসারেরই একজন, কতকটা বন্যবালিকার স্বভাবসম্পন্ন। কোথায় কোন ফুলটি কখন ফোটে; নোনা আতা, শাওড়া ফল, কোথায় কোন্ শাখায় পেকে থাকে; নাটাবীচি, ওড়কলসী, মেটে-আলুর সন্ধান কীভাবে পাওয়া যায়, ত দুর্গার নখদর্পণে। অপুর সঙ্গে নিসর্গের পরিচয় দুর্গার মধ্যস্থতাতেই ঘটেছিল, এবং অপুর মানসগঠনে দুর্গার দানও সামান্য নয়।

তথাপি অপু-দুর্গার মধ্যে একটা বিষয়ে পার্থক্য মৌলিক। দুর্গার সঙ্গে নিসর্গের সম্বন্ধ প্রয়োজনের—বনজাত ফলমূল তার স্বাদ-ক্ষুধা নিবৃত্ত করতো, তার খেলার সহায়ক হতো; অরণ্যচারিণী অরণ্য থেকে তার লোভবৃত্তির যথাকথঞ্চিৎ পরিতৃপ্তি সাধন করতে পারতো। অপুর সঙ্গে নিসর্গের সম্বন্ধ ভিন্ন প্রকৃতির। তার স্বপ্নচারী মন অজানা রহস্যের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্যে উৎসুক ছিল। তাই, কোন মায়ামন্ত্রে লতাশীর্ষে অভিনব ফুল ফুটে থাকে, কী রহস্যবলে মাটি থেকে কন্দ জেগে ওঠে, তা জানবার—বুঝবার—প্রবল আগ্রহই অপুকে বিচিত্র লতাগুল্মসমাচ্ছাদিত অরণ্য, নির্জন পুষ্করিণী, কুঠির মাঠ প্রভৃতির দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে। এই বন-পুকুর, নদী-পথ-ঘাটই অপুর বিশ্ব এবং এই বিশ্বের সঙ্গে নিত্যনবপরিচয়ের কৌতূহলই অপুর সম্বল। দুর্গার ঠিক তা নয়। কৌতূহল অপেক্ষা খেলার প্রয়োজন এবং বিচিত্র বস্তু-স্বাদের আগ্রহ তাকে অরণ্যচারিণী করেছিল। লোভ এবং সঞ্চয়বৃত্তি দুর্গার যেন জন্মসিদ্ধ। বিভূতিভূষণ আশ্চর্য কৌশলে এই বাস্তব মনস্তত্ত্বের বিষয়টি দুর্গার চরিত্রে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। অপুর ন্যায় দুর্গাও একটি স্বভাববিকশিত বালিকার বাস্তবচিত্র। কিশোরী দুর্গার আকস্মিক মৃত্যু আমাদের চিত্তে গভীর রেখাপাত করে, কিন্তু এক্ষেত্রেও যেন লেখকের কিছু করবার ছিল না—স্বভাবে এইরূপই ঘটে থাকে। এর পর থেকে উপন্যাসের নতুন অধ্যায় শুরু হবে। অপুকেও আর অরণ্যে ও ঘটনাহীন পুরাতন পরিবেশে আবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। নীল আকাশের হাতছানি যাকে ডাক দিয়েছে, তাকে আর সংসারের মধ্যে বেঁধে রাখা কেন।

বর্তমান আখ্যায়িকায় অবান্তর চরিত্র ও কাহিনী অনেক আছে এবং সকলে মিলে জীবনরসসমৃদ্ধ, বহুচরিত্রসংবলিত পটখানিকে সম্পূর্ণ ও উজ্জ্বল করে তুলেছে। কোন্দলপ্রিয়া সেজঠাকরুণ, মূর্খ গোকুল ও তার প্রহারসহিষ্ণু বধূ, রাজু রায়, দীনু পালিত, গুরুমহাশয়, সতু, রাণী, দাসীঠাকরুণ, সাতো'র মা যেমন আছে, তেমনি, আছে নবাবগঞ্জের ইচ্ছামতী, নিশ্চিন্দিপুরের প্রতিবেশিনী বালিকা অমলা, এবং সবশেষে জমিদার-গৃহের কন্যা লীলা। পল্লীর বিচিত্র মানুষ ও তাদের কাহিনী গ্রন্থে-বর্ণিত মূল কাহিনীর সঙ্গে অনায়াসে যুক্ত হয়ে পড়েছে।

উপন্যাসে স্মরণীয় দুটি ঘটনা রয়েছে—দুর্গার মৃত্যু ও অপুর গ্রামত্যাগ। প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে ত্বরান্বিত করেছে। দুর্গার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লেখক সংকেতে জানালেন যে, অতঃপর শ্রীমান্ অপুর রায়ের পল্লীজীবনে ছেদ পড়লো, তার মনের নিসর্গাশ্রিত বিকাশ সম্পূর্ণ হয়েছে; এবার ভিন্নতর পরিস্থিতি ও জীবনসংগ্রামের পালা। এরপর সংক্ষিপ্ত অধ্যায়টুকুতে পরিবর্তন দ্রুত। হরিহরের মৃত্যু, সবজয়ার ও অপুর কাশী থেকে অন্যত্র গমন, এবং কল্পনার অতীত নতুন জীবনে প্রবেশ—এ সকল দেখতে দেখতে অল্পকালের মধ্যে ঘটে গেলো। সব মিশিয়ে একটি পরিপূর্ণ জীবনরহস্য আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত করে ধরেছেন উপন্যাসরচয়িতা। নকশাধর্মী পথের পাঁচালি-র আশ্চর্য চিত্রযোজনরীতি আমাকে অতিশয় মুগ্ধ করেছে।

মুগ্ধ করেছে বিভূতিভূষণের বর্ণনশক্তি এবং মনোরম অথচ যথাযথ বাচনভঙ্গি। তিনি অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা যথাসম্ভব বর্জন করে চরিত্রের অভিব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনরীতিই গ্রহণ করেছেন। কোথাও কোনো চরিত্রের মুখে 'দর্শ' উক্তির সন্নিবেশ করেননি অথচ আমাদের পল্লীবাংলার ভাষণরীতিটুকু সম্পূর্ণ বজায় রেখেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্টাইল—সহজ ভাষা এবং শিল্পরীতি—দেখবার মতো একটি জিনিস। এরূপ স্টাইল বাংলাসাহিত্যে অন্যকোনো লেখকের নেই, নির্দ্বিধায় বলতে পারি। সহজ সুরে সহজ ভাষায় গভীর কথা শোনানো কত কঠিন কাজ এ কাউকে বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। পথের পাঁচালি-র রসাস্বাদন করে আমি তৃপ্ত এ হলো আমার শেষ কথা।

লেখক বিভূতিভূষণের উদ্দেশে অন্তরের অশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধানম্র প্রণাম নিবেদন করি।

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র :
সমষ্টির কল্যাণার্থে কোন্‌টি বরণীয়

॥ এক ॥

সাম্প্রতিক দুনিয়ার সর্বস্তরের মানবমানবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে দুটি মতবাদ—ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ। ইতিহাসের ধারায়, মানবসমাজের ক্রমবিকাশে, এদের উদ্ভব। এ দুটি মতবাদ পরস্পর ভিন্নমুখী। উভয়ের মধ্যে প্রকাণ্ড বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। এই বিরোধ ব্যষ্টি আর সমষ্টির, অর্থাৎ, ব্যক্তি আর সমাজের। ধনতন্ত্র ব্যক্তি-অধিকার-নীতিকে কুণ্ঠাহীন স্বীকৃতি জানিয়েছে ; আর, সমাজতন্ত্র ব্যক্তিকে একেবারে মুছে ফেলে—ব্যক্তিমানুষের স্বাধিকারতত্ত্বের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটিয়ে—সমাজের হাতে সর্বস্ব তুলে দিয়েছে। দুটি তত্ত্ববাদই একান্তী [extreme], ব্যক্তির বাসনাকামনা ও সমাজের আশাআকাঙ্ক্ষার মধ্যে নির্দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের সেতু নির্মাণ করতে পারে নি। সে যা হোক, বর্তমান পৃথিবীতে সমাজব্যবস্থায় যে-দারুণ সংকট দেখা দিয়েছে, তা থেকে পরিত্রাণলাভের উপায় হিসেবে অনেকেই সমাজতন্ত্রকে বরণীয় মনে করেছেন। আমরা এখানে এ দুই মতবাদের মর্মকথা বুঝে নিতে চেষ্টা করবো।

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র কথা-দুটি একটা বিশেষ সময়ের বিশেষ সমাজব্যবস্থার পরিচায়ক। একারণে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে নির্ভুলভাবে চিনে নিতে হলে ঐতিহাসিক পটভূমিতে এদের দেখতে হবে। এই উভয় তন্ত্রের বা সমাজনীতির কোনোটিকেই মানুষ জোর করে সমাজের ওপর আরোপ করেনি। সমাজবিবর্তনের এক অবস্থাকে বলা হয় ধনতন্ত্র, এবং সেরূপ অপর একটি অবস্থার নাম সমাজতন্ত্র।

মনুষ্যসমাজে পরিবর্তন আসে সমাজেরই আভ্যন্তরিক শক্তিনিচয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। সমাজ এক অবস্থা থেকে ভিন্নতর অবস্থায় পদক্ষেপ করে আপনারই স্বতঃবিকাশের প্রবর্তনায়। সমাজের এই বিচিত্র অবস্থাগুলিই মানবেতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন নাম পেয়েছে। কাজেই, ধনতন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা-বিচার ও স্বরূপলক্ষণ-নির্ধারণ সম্ভব উক্ত ধনতন্ত্রী সমাজব্যবস্থার উৎপত্তি, গতি ও পরিণতি বিশ্লেষ করে ; সেই রকম, সমাজতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়কথন সম্ভব সমাজতন্ত্রী সমাজের বিবর্তন সযত্নে বিচার করে।

প্রথমে আমরা ধনতন্ত্রী সমাজব্যবস্থার আলোচনা করবো। এই আলোচনায় সমাজের রাষ্ট্রনীতিক ও সাংস্কৃতিক যে-চিত্র প্রতিফলিত হবে তাকেই ধনতন্ত্র নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু সংকীর্ণভাবে বিচার করলে ধনতন্ত্র বলতে শুধু বিশেষ একটি আর্থনীতিক ব্যবস্থাকেই বোঝায়।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা য়ুরোপে গড়ে ওঠে। এর পূর্বে যে-সমাজব্যবস্থা সেখানে প্রচলিত ছিল তা সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্র নামে

পরিচিত। শেষোক্ত ব্যবস্থাটিতে লক্ষ্য করবার মতো বস্তু ছিল—জমির উপর শ্রেণী-বিশেষের একচেটিয়া অধিকার, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় মানুষের একচ্ছত্র আধিপত্য। যে-কৃষিজীবী ও শ্রমজীবিদের নিয়ে আসল সমাজ, সেই বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী সামন্ততন্ত্রের দিনে একরূপ দাস-জীবন যাপন করতো। দেশের উৎপাদন, বণ্টন ও বাণিজ্য সামন্তশক্তির লৌহশাসনের ফলে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের ও যথোচিত বিকাশের পথ খুঁজে পায়নি। সামন্ততন্ত্র ক্ষাত্রশক্তির প্রভুত্বের কথা মনে পড়িয়ে দেয়, যেখানে বৈশ্য ও শূদ্ররা কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীরা—দাসত্বের রজ্জুতে বাঁধা, স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের অধিকার থেকে বঞ্চিত।

এই লৌহপাশের ভিতর থেকেই ধীরে ধীরে একটি নতুন শ্রেণী জন্ম নিলো—ধনিকশ্রেণী। প্রভূত ধনশক্তির অধিকারী এরা। তখন কামানের বারুদ, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে, আবিষ্কৃত হয়েছে বাষ্পশক্তি; বাষ্পশক্তি যন্ত্রচালনার সহায়ক হয়েছে—শ্রমশিল্পে ঘটে গেলো বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই নবজাত ধনিকগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আঘাতে কয়েকটি দেশে সামন্তপ্রথার দুর্ভেদ্য দুর্গ ধূলিসাৎ হলো। ফলে দেশের বাণিজ্য ও উৎপাদনে অবাধ অধিকার দেখা দিল, ভূমির ওপর পূর্বের সেই একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত হলো; রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে দেখা দিল রাজনৈতিক ক্ষমতার গণতান্ত্রিক প্রয়োগ। সামন্ততন্ত্রের আর্থনৈতিক বৃহত্তর বাধা দূর হওয়াতে পুঁজির উদ্বৃত্ত স্ফীতি বেড়ে চললো। পুঁজির মালিক যারা তারা আর্থিক ক্ষেত্রটি দখল করে নেওয়াতে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাদের আয়ত্তে এলো। কালক্রমে এই যে একটা নতুন সমাজব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করলো এরই নাম—ধনতন্ত্র বা পুঁজিতন্ত্র।

ধনতন্ত্রের শুধু আর্থনৈতিক দিকটা বিচার করেও এর একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব। ধনতন্ত্র হলো সেই সমাজব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের বিবিধ উপকরণ বা পুঁজির ওপর রয়েছে ব্যক্তিগত অধিকার; এখানে উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করে মালিকের ব্যক্তিগত লাভের হিসেব। পূর্বেকার সামন্তপ্রথার আর্থিক অনুশাসন দূরীকৃত হওয়ার পর পুঁজির জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, পুঁজির মালিক জমির মালিককে সর্ববিষয়ে পরাস্ত করে এগিয়ে যাচ্ছিল। এতে পুঁজির কলেবর ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলো। দেশে ছোট ছোট গৃহশিল্পের স্থানে বড়ো বড়ো কলকারখানা স্থাপিত হলো, কুটীরশিল্পীরা ধীরে ধীরে পথে এসে দাঁড়ালো, এখন তাদের জীবিকার একটি মাত্র পথ খোলা—কলকারখানায় মজুরবৃত্তি। শ্রমিকদের মনুষ্যত্বচেতনা বলে কিছুই আর রইলো না, তখন তারা নেমে এসেছে পশুর স্তরে। ধনতন্ত্রের শোষণ নিষ্ঠুর এবং প্রাণঘাতী।

ধনতন্ত্রী সমাজব্যবস্থার মূল আর্থনৈতিক সূত্রগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত, পুঁজির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে। এই অধিকারবলে যে-কোনো-ভাবে পুঁজি নিয়োগ করতে পারা যাবে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত মুনাফাই হলো পুঁজি-নিয়োগের নিয়ামক। 'এহেন সমাজে পণ্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয় মুনাফার হিসেবে, চাহিদার হিসেবে নয়। তৃতীয়ত, শ্রমজীবীদেরকে শোষণের ওপরই মুনাফার হার নির্ভর করে।' কাজেই, আর্থিক ক্ষেত্রে সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল, দুটি শ্রেণী দেখা

দিস—মালিক ও শ্রমিক। উৎপাদনের যন্ত্রপাতিতে মালিকের নিরঙ্কুশ অধিকার থাকায় মালিক শ্রমিককে উৎপাদনযন্ত্রের সঙ্গে যোগ করে দেয় তার কারখানায়। তাই, দেখেছি, সংখ্যাতীত মজুর অবিরাম শোষণের নিগ্রহ ভোগ করেছে; পক্ষান্তরে, ধনবানদের লভ্যাংশ দিন দিন স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে। সঙ্ঘবদ্ধ ধনিকশ্রেণী ভয়ানক শক্তির অধিকারী।

সামন্ততন্ত্রের পাশমুক্ত হয়ে ধনতন্ত্রের বিজয়রথ কয়েক দশক পর্যন্ত নির্বাধ গতিতে অগ্রসর হলো। এর সমাজকল্যাণপ্রসূ দান এসময়েই দেখা যায়; বিবিধ শিল্পচর্চায়, বিজ্ঞানে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে—বেশ কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা গেলো। আর্থিক ক্ষেত্রে দেখি, দেশের সম্পদ পুঁজিতন্ত্রের প্রচেষ্টায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কলকারখানা, রেল-স্টীমার, বিদ্যুৎশক্তি, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন, খনিজদ্রব্য-আহরণ, নানা বিস্ময়কর যন্ত্রের উদ্ভাবন ধনতন্ত্রের প্রচেষ্টারই সুফল। পূর্বতন সামন্তপ্রথাশাসিত সমাজের সঙ্গে তুলনা করলে এই বিশেষ সময়কার ধনতন্ত্রশাসিত সমাজকে প্রগতিশীল বলা যেতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেশে একদা ধনতন্ত্রের মঙ্গলবিধায়ক একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল।

কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের আর্থিক ব্যবস্থাটি আস্তে আস্তে বিপদের সম্মুখীন হলো। যে-আর্থিক ব্যবস্থার মূলভিত্তি মুনাফা, সেই ব্যবস্থা মুনাফার হারের হ্রাসবৃদ্ধির জন্যে অকস্মাৎ বানচাল হয়ে যেতে পারে। কার্যত দেখা যায়, ধনতন্ত্রী সমাজব্যবস্থায় পুঁজির হারের ক্রমবর্ধমানতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হলো মুনাফার বিলোপ ও ব্যবসায়-সংকট। একারণে নিশ্চিত বেকারসমস্যা ও লোকসাধারণের দারিদ্র্য-দুর্গতি ধনতন্ত্রের সঙ্গে কোনো-কোনো সময়ে জড়িত হয়ে পড়তে বাধ্য।

ধনতন্ত্রের অত্যন্ত ক্ষতিকর দিকটি আত্মোন্মোচন করলো এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে, যখন ধনতন্ত্রী সমাজের বারম্বার আর্থিক সংকটের ভয়াল আবর্তের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। দারুণ-সংকট-সমস্যা-কণ্টকিত বলে ধনতন্ত্রের মঙ্গলপ্রসূ কোনো দান অধুনা লক্ষিত হয় না। রাষ্ট্রে একনায়কত্ব, শিল্পে একচেটিয়া-অধিকার-বিস্তার, বাণিজ্যিক বিরোধ, বিজ্ঞান-সাধনার বিকৃতি, সংস্কৃতির বর্বর রূপান্তর, দেশ-বিদেশে স্বার্থসংরক্ষণের জন্যে পুনঃপুনঃ সংগ্রাম ইত্যাদি ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার বিশেষ উপায়রূপে দেখা দিয়েছে। এসমস্ত কারণে ধনতন্ত্র এখন মানবসমাজের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইচ্ছা করলে যে-সমাজব্যবস্থা মানবসভ্যতাকে প্রেক্ষণীয় শ্রী ও আভিজাত্য দান করতে পারতো, ধনপতিদের অত্যুগ্র কাঞ্চনপিপাসা আজ তার অশেষ লাঞ্ছনার মূলীভূত কারণরূপে দেখা দিয়েছে। লক্ষ্য করতে হবে, মুষ্টিমেয় ধনাঢ্যের অপরিমেয় সম্পদ সমষ্টি-মানুষের ভোগ্য হয়নি। বৃহত্তর মানবসমাজ যেখানে উপবাসী, সেখানে অগণিত মনুষ্যসন্তান বুভুক্ষার তাড়নায় পশুর ন্যায় দিনাতিপাত করছে, সেখানে স্বল্পসংখ্যক বিত্তবানের ঐশ্বর্যের চোখ-ধাঁধানো জৌলুস প্রাণান্তকর বিদ্রূপের অট্টহাস্য বলে মনে হয় না কী? ধনতন্ত্র লোভী, স্বার্থান্ধ, ক্রূর, অমানবীয়তার স্পর্শে ক্লেদাক্ত।

॥ দুই ॥

অপরদিকে, সমাজতন্ত্রের স্বরূপটি চিনে নিতে হলে অনুরূপভাবে এর উদ্ভব, গতি ও পরিণতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

ধনতন্ত্রকে আমরা সামন্তপ্রথার পটভূমিতে ব্যাখ্যা করেছি; এবার সমাজতন্ত্রকে নিরীক্ষণ করবো ধনতন্ত্রের পটভূমিতে। সামন্ততন্ত্র চালু থাকার কালে যেমন নবোদ্ভূত ধনিকশ্রেণী নতুন-আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক শিল্পযন্ত্রের সহায়ে বাণিজ্যবিস্তারের দ্বারা ধনসঞ্চয় করেছে এবং নিজেদের ধনশক্তির বলে রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করে নিয়ে নতুন একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, তেমনি, ধনতন্ত্রের পরিবেশে উদ্ভূত শ্রমিকশ্রেণী নিজ শ্রেণীস্বার্থের প্রেরণায় নতুন সমাজ, নতুন আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা স্থাপন করলো রক্তক্ষয়ী বৈপ্লবিক পন্থার আশ্রয়ে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কতকগুলি পরিবর্তন লক্ষ্য করবার মতো। এই সমাজে ভূমি, কল-কারখানা, খনিজদ্রব্য, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হয় না। কাজেই, সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রধান কর্তব্য—উৎপাদনের সমস্ত উপকরণকে জাতীয় সম্পদে পরিণত করা। ব্যক্তিগত অধিকারলোপের সঙ্গেই দ্বিতীয় সূত্রটি এসে পড়ে, তা হলো—দেশের সকল সম্পদকে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদনে নিয়োগ। মুনাফার লোভে ব্যক্তি কিংবা সম্প্রদায় যেখানে মূলধন পণ্য-উৎপাদনে নিয়োগ করতে পারে না, সেখানে উৎপাদন-ব্যাপারে দেশের সম্পদ-বিনিয়োগের দায়িত্ব গোটা সমাজকেই গ্রহণ করতে হয়। একারণে কোন্ শিল্পে কী পরিমাণ সম্পদ নিয়োজিত হবে, এবং লোকসাধারণের ব্যবহারের জন্যে, ভবিষ্যৎ ধনোৎপাদন চালু রাখবার ও তার গতি বাড়িয়ে তোলার জন্যে, আর দেশের রক্ষাব্যবস্থার জন্যে, কীভাবে সমস্ত সম্পদকে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বণ্টন করা হবে, তার সুচিন্তিত পরিকল্পনারচনও অত্যাবশ্যক। গোটা সমাজের ব্যবহারের জন্যে সমাজ-পরিকল্পিত ব্যবস্থারই নাম—সমাজতন্ত্র। এখানে শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ অবলুপ্ত, উৎপাদন ও বণ্টননীতি সুনিয়ন্ত্রিত, লোভীর শোষণপ্রবৃত্তি উৎসাদিত।

সমাজের এই অবস্থায় প্রত্যেক মানুষকেই সাধ্যানুযায়ী উৎপাদনকর্মে অংশ গ্রহণ করতে হয়, এবং প্রত্যেকেই নিজেদের শ্রম বা কর্মক্ষমতা অনুযায়ী পুরস্কৃত হয়। সমাজতন্ত্রে শ্রমিকদলই রাষ্ট্রশক্তি স্ববশে এনে জনগণের কল্যাণে তা ব্যবহার করে। ফলে এতে অর্থনীতি ও রাজনীতি উভয়ই ক্রমশ সমাজতন্ত্রী হয়ে ওঠে।

রাশিয়ায় দারুণ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই নতুন সমাজ জন্মলাভ করলো। সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ধনতন্ত্রের অন্তঃপ্রকৃতিতে আত্মহত্যার যে-বীজ সংগুপ্ত রয়েছে তারই ফলে একদিন তার মহানিপাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। দুঃখদারিদ্র্য, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যবসায়-সংকট ইত্যাদিকে ধনতান্ত্রিক সমাজ প্রতিরোধ করতে পারে না। কাজেই, ধনতন্ত্রশাসিত সমাজে জনসাধারণ ও শ্রমিকশ্রেণী ক্রমশ শোষিত হয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

লাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব অবিরত নির্যাতন কখনোই সহ্য করবে না, প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া রয়েছে। ধনতন্ত্রী সমাজব্যবস্থার প্রচণ্ড বিক্ষোভ একদিন দেখা দেবেই। এই বিক্ষোভ শোষণক্লিষ্ট শ্রমিকশ্রেণীর। শ্রমিকরা যখন নিজেদের শক্তিকে সংহত করে ধনতন্ত্রের ওপর আঘাত হানে তখন ধনতন্ত্র আপনাকে আর বাঁচাতে পারে না, ভেঙে পড়ে। এইভাবেই সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়। ধনতন্ত্র নিজ মৃত্যু নিজেই ডেকে আনে।

সমাজতন্ত্রী সমাজে উৎপাদনযন্ত্রের ওপর ব্যক্তিগত অধিকার না থাকায় এবং মুনাফার লোভে পণ্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় সেখানে শ্রমিকের শোষণ নেই, করাল দারিদ্র্য নেই, মারাত্মক বেকারসমস্যা নেই, সর্বনাশা বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা নেই। এই সমাজ মানুষকে মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার দিয়েছে। শ্রেণীসংঘাত এতে বিলুপ্তপ্রায়। একদিকে প্রাচুর্য, অন্যদিকে, লোকসাধারণের দারুণ অভাব পুঁজিতন্ত্রী সমাজেরই চরিত্রলক্ষণ। সমাজতন্ত্রে অভাবনীয় ঐশ্বর্য ও অবিশ্বাস্য অভাব-দারিদ্র্যের সহ-অবস্থান অসম্ভব। ক্ষুধার্তের হাহাকার ঘোচাবার দিকেই সমাজতন্ত্রের দৃষ্টি স্থিরবদ্ধ।

ধনতন্ত্র এখন অবক্ষয়ের মুখে। এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজনীতিকে নির্জিত করে কোনো কোনো দেশে সমাজতন্ত্র বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। মানবকল্যাণের মাপকাঠিতে বিচার করলে দেখা যায়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই মানুষের সম্মুখে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আশ্বাস-ভরা এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এর সর্বাঙ্গীণ-সম্পূর্ণ বিকাশের পথে এখনো রয়েছে বিস্তর বাধাবিঘ্ন। তথাপি মনে হয়, অদূর-ভবিষ্যতে এ সমাজের গণ্ডি প্রসারিত হবে। জীবিকা ও শ্রমের মধ্যে ন্যায়সংগত সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহশীল বলে, মনুষ্যজীবনে সাম্যতত্ত্বকে শ্রদ্ধাসহকারে স্বীকার করে নিয়েছে বলে, সম্পদপ্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের ভেদ দূর করতে চায় বলে, সমাজনীতি-হিসেবে [সমাজ]তন্ত্র অবশ্যই বরণীয়।

সাম্যতন্ত্র ঃ সমাজতন্ত্রবাদীদের মহৎ একটি স্বপ্ন

প্রত্যেক মতবাদই তার পূর্ণসার্থকতালাভের স্বপ্ন দেখে। এই স্বপ্নই একদা বাস্তবে রূপ পায়। সমাজতন্ত্রীরাও স্বপ্ন দেখেছে—সমভোগাধিকারের স্বপ্ন। ইংরেজি 'কম্যুনিজম্' কথাটিরই বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'সাম্যতন্ত্র'। কথাটি একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থারই পরিচয়বাহী।

সাম্যতন্ত্রী সমাজব্যবস্থার কোনো বাস্তব [চিত্র] বর্তমান পৃথিবীতে নেই। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পণ্ডিত মনীষী কার্ল মার্কস্ মানবসমাজের বিবর্তনধারা সযত্নে বিচার

করে সাম্যতন্ত্রী সমাজের অবশ্যম্ভাবিতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সমাজের ক্রমবিকাশের যে গতি তারই অনিবার্য পরিণতি ঘটবে সাম্যতন্ত্রে—বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ভাবুকগোষ্ঠী এই অভিমতই প্রকাশ করেছেন।

সাম্যতন্ত্রী সমাজ সমাজতন্ত্রেরই দ্বিতীয় অধ্যায়। শক্তিশালী সামন্ততন্ত্রকে [Feudalism] পরাভূত করে একদিন ধনতন্ত্রের [Capitalism] প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ধনতন্ত্র আবার কালক্রমে ক্ষয়িষ্ণুতার কবলে পড়লো। এই ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রকে স্থানচ্যুত করে, বিপ্লবী প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে, সাম্প্রতিক দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র [Socialism] মাথা তুললো। সমাজতন্ত্র-গঠনের পথে শ্রমিকরাষ্ট্র প্রধানতম অস্ত্র। পূর্বতন সমাজের শ্রেণীবৈষম্য যখন সম্পূর্ণ মুছে যায়, উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা যথার্থত যখন জনগণের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে, তখন আর রাষ্ট্রশক্তির কোনো প্রয়োজন হয় না—শ্রেণীগত বিরোধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রও নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শ্রমিকরাষ্ট্রের পরিচালনায় সমাজ আপন রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে পরবর্তী সাম্যতন্ত্রী সমাজের উদ্ভবের অনুকূল সর্ববিধ পন্থা অবলম্বন করে। এভাবে বিবর্তনের ধারাপথে শ্রমিকরাষ্ট্র-পরিচালিত সমাজতন্ত্রী সমাজ অতি-উন্নত একটি অবস্থায় এসে পৌঁছায়। এই বিশেষ অবস্থাটিই সমাজতন্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়, অর্থাৎ সাম্যতন্ত্র।

সাম্যতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয়। তবে অনাগত এই সমাজব্যবস্থার উল্লেখনীয় লক্ষণগুলি অনুমান করে নেওয়া যায়—রাষ্ট্রের আর্থিক ও নৈতিক দিক থেকে সমাজতন্ত্রকে কথঞ্চিৎ বিচার করা চলে।

রাষ্ট্রিক দিকটির প্রতি দৃষ্টি রেখে বিচার করলে দেখা যায়, সমগ্র পৃথিবীতে কিংবা পৃথিবীর বড়ো বড়ো দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে সাম্যতন্ত্র বিকাশলাভ করতে পারে না। যতদিন ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন পর্যন্ত সমাজতন্ত্রী সমাজকে আত্মরক্ষার বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে—তার রাষ্ট্রীয় কাঠামোটিকে অক্ষত রাখতেই হবে। পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রী সমাজের গোড়াপত্তন সাম্যতন্ত্রের প্রথম সোপান।

এই সোপানটি অতিক্রান্ত হলে সমাজতন্ত্রশাসিত দেশে রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটবে, পণ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে আশ্চর্য উন্নতি দেখা দেবে,—এককথায়, সাম্যতন্ত্রী সমাজের অভ্যুদয় হবে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্টত বুঝতে পারা যায়, শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণীর অধিকার-রক্ষার জন্যেই রাষ্ট্রের প্রয়োজন। শ্রেণীসংঘাত ও শ্রেণীস্বার্থের বিলুপ্তির পর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিরর্থক হয়ে পড়ে। অবশ্য উৎপাদন, বণ্টন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্যে তখন যে-জিনিসটির প্রয়োজন হবে, তা হলো জনসঙ্ঘ। এই জনসঙ্ঘ ও রাষ্ট্রের মধ্যে মৌল পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটির কাজ সর্বাংশে আর্থনীতিক; দ্বিতীয়টির কাজ প্রধানত রাজনীতিক। রাষ্ট্রকে যদি বলি আইন-তন্ত্র, জনসঙ্ঘকে বলবো নিয়ম-তন্ত্র—উৎপাদন ও বণ্টন-নীতির তত্ত্বাবধায়ক।

আধুনিক রাষ্ট্রগুলির বড় কাজ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শাসিতশ্রেণীকে স্ববশে রাখা ও সর্বপ্রকার বহিরাক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। পক্ষান্তরে, সাম্যতন্ত্রী জনসঙ্ঘ বা

উৎপাদন-সঙ্ঘগুলির কাজ ভিন্নতর। জনসঙ্ঘগুলি শ্রেণীহীন সমাজে কেবল প্রাকৃতিক সম্পদকে জনকল্যাণে নিয়োগের সর্বোত্তম-পন্থানির্দেশক বলিষ্ঠ পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করবে। সাম্যতন্ত্রী দুনিয়ায় যুদ্ধ অনাবশ্যক, যেহেতু সমাজ শ্রেণীহীন—পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সংঘাতমুক্ত। এরূপ সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কী সার্থকতা!

পণ্ডিতেরা সমাজতন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে-পার্থক্য কল্পনা করেছেন তা মূলত বণ্টননীতি-সম্পর্কিত। প্রথমটিতে প্রত্যেকটি মানুষকে নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী উৎপাদন-ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে, এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিশ্রম অনুযায়ী পুরস্কৃত হবে। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে [সাম্যতন্ত্রে] 'ক্ষমতানুযায়ী কাজ' ও 'প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টন'—এই নীতি প্রবর্তিত হবে।

আর্থিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, সাম্যতন্ত্রী সমাজের ভিত্তি দৃঢ় হলে জনগণ সাধ্যমতো সামাজিক উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করবে এবং সকলেই তাদের প্রয়োজন মত ভোগ করবার সামগ্রী পাবে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, সাম্যতন্ত্রী সমাজের অভ্যুদয়ের পূর্বে উৎপাদনশক্তির প্রভূত উন্নতি আবশ্যক। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা ক্রমোন্নতির সোপান বেয়ে এমন এক অবস্থায় এসে পৌছবে, যখন বণ্টনকে ব্যক্তিবিশেষের কার্যক্ষমতার ভিত্তিতে চালিত না করে, তার প্রয়োজনের ভিত্তিতে চালিত করা সম্ভব। এই সম্ভাবনা বাস্তব রূপ নিলেই সমাজতন্ত্র নিজ প্রাথমিক অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ হবে।

ধনতন্ত্রী সমাজে পুঁজিস্বার্থে ও ব্যক্তিগত সম্পদ্স্বার্থের প্রেরণাবশে মানুষের চাহিদা গড়ে ওঠে। সাম্যতন্ত্রী সমাজে মানুষের চাহিদার নিয়ামক হবে ওই সমাজব্যবস্থারই সুচিহ্নিত মহত্তর আদর্শ। আসল কথা এই যে, মানুষের আজিকার দিনের স্বতন্ত্র সুখ-স্পৃহা, স্বতন্ত্র বাসনাকামনা, মানবতার বিরুদ্ধচারী স্বতন্ত্র ভাবচিন্তার অভিমান—সমস্ত-কিছুই শ্রেণীবৈষম্যপ্রভাবিত সমাজব্যবস্থার ফল। সাম্যতন্ত্রবিরোধী এরূপ সমাজ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, সাম্যতন্ত্রমুখী নতুন সমাজ জন্ম নেবে, অথচ মানুষ সেই আদিম মানুষটিই থেকে যাবে, এ হতেই পারে না। সমাজব্যবস্থার রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও বদলায়, তার মনের চেহারার পরিবর্তন ঘটে। অনেক টাকা, অনেক বাড়ী, অনেক গাড়ীর স্বপ্ন দেখে ধনতন্ত্রলালিত মানবমানবী। সাম্যতন্ত্রে মনুষ্যসন্তানের অপরিমিত লোভের স্থান নেই; এখানে সকলেরই সমভোগাধিকার,—সকলের সঙ্গে শ্রমযোগে এক হয়ে, দেহ-মনের যেটুকু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায়, তা ভোগ করতে হবে।

এবার সাম্যতন্ত্রী সমাজব্যবস্থার আওতায় মানুষের নৈতিক উন্নতির কথা। রাষ্ট্রবিহীন এই সমাজটিতে মানুষ কি স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে না? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, সামাজিকের আচরণ সমাজব্যবস্থার ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল; এর আদর্শ যদি উচ্চতর হয় তাহলে সমাজভুক্ত মানুষের কার্যকলাপ কদাপি অপকৃষ্ট জীবের কার্যকলাপের মতো হবে না। মানুষ তখনই সমাজশত্রু হয়ে ওঠে, যখন তার সম্মুখে মনুষ্যত্বের সমুচ্চ কোনো আদর্শ থাকে না। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নততর অবস্থায় ভিত্তিয়

দিয়েই রূপ পরিগ্রহ করবে সাম্যতন্ত্রী সমাজ। এরূপ সুস্থ পরিবেশের শুচিসুন্দর স্পর্শ পেলে মনুষ্যের অপরাধপ্রবণতা স্বাভাবিক কারণেই কমে আসবে। সমাজ নিজের বুকেই লালন করে অপরাধের বীজ; বীজকে উচ্ছিন্ন করা হলে তার অঙ্কুরোদ্গমের সুযোগ কোথায়? কাজেই, রাষ্ট্রশক্তির লোপে সমাজবিরোধী কোনো কাজ মানুষ করবে কিনা, এ প্রশ্ন অবান্তর।

ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বিরোধের অবসান ঘটাবার জন্যেও এখানে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন হবে না। এখনো তো দেখি, কেউ যদি কোনদিন সমাজবিরোধী কাজ করে তাহলে অপর দশজন এসে নিজেদের সম্মিলিত শক্তিতেই ওই ব্যক্তিকে অপরাধের শাস্তি দেয়। সাম্যতন্ত্রী সমাজের এই সামাজিক চেতনা অনেক বেশি প্রখর হবে। তখন সমাজদ্রোহীরা জনমতের দ্বারাই শাসিত হবে।

রাষ্ট্রের বিলুপ্তি, জনসঙ্ঘের উদ্ভব, ক্ষমতানুযায়ী কাজ ও প্রয়োজনমতো বণ্টন এবং সমাজব্যবস্থার উন্নতির সমান্তরাল রেখায় মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ হলো সাম্যতন্ত্রী সমাজের বিশিষ্ট লক্ষণ। কেউ কেউ বলে থাকেন, এই সমাজব্যবস্থা বিশেষ একটি স্তরে পৌঁছে ধীরে ধীরে স্থাণু হয়ে যাবে—শ্রেণীমুক্ত হওয়ার ফলে অন্তর্বিরোধের অবসানহেতু সমাজের অগ্রগতি নিশ্চলতা প্রাপ্ত হবে। সমাজতন্ত্রবাদীরা বলবেন, এরূপ একটি ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, সঙ্ঘবদ্ধ মানবগোষ্ঠী তখন বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে, সকল শক্তিপ্রয়োগে নিসর্গসংসারের রহস্যদ্বার একের পরে এক উন্মোচন করবে। বলতে পারি, মনুষ্যসমাজে শ্রেণীসংঘাতের অবসানের পর মানব আর প্রকৃতির বিরোধমূলক এক নতুন অধ্যায় শুরু হবে।

ধনতন্ত্র তার জন্মলগ্নেই অভিশাপগ্রস্ত। অপরের মুখের অন্ন কেড়ে না নিলে ধনপতি হওয়া যায় না। ধনতন্ত্রে মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত। এখানে সংখ্যাতীত মানবশিশুর অবস্থা অসহায় পশুর মতো। মনুষ্যজাতিকে এহেন শোচনীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণের আশ্বাস দেবে কে? দিতে পারে সমাজতন্ত্র, দিতে পারে সমাজতন্ত্রের উন্নততর রূপ ভাবী কালের সাম্যতন্ত্র। সমাজতন্ত্র উৎপাদন ও বণ্টন-নীতির মধ্যে বৈষম্য ঘুচিয়েছে, মনুষ্যের অন্নবস্ত্র ও দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ক্রমশ দূর করছে, লোভীর শোষণ-প্রবৃত্তির মূলোৎপাটনে এগিয়ে এসেছে।

আধুনিক সাম্যতন্ত্র মানবজীবনের গভীরতর সমস্যার সর্বকালোপযোগী প্রতিকার-পন্থা কিনা, কিংবা 'ব্যক্তি' আর 'সমাজ'-এর মধ্যে নির্বিরোধ সমন্বয়বিধানের সামর্থ্য সাম্যতন্ত্রের আছে কিনা, এ প্রশ্ন এখানে তুলবো না। তবে এটুকু বলা যায়, বর্তমান পৃথিবী অন্নবস্ত্রের যে-দারুণ সমস্যায় সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে, সেই সংকটত্রাণের একমাত্র উপায়রূপে দেখা দিয়েছে সাম্যতন্ত্র। অধুনা সাম্যতন্ত্র ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলছে। কোথায় এর পরিণতি, মানবজাতির ভবিষ্যৎ ইতিহাসই তার সাক্ষী হবে।

ঋতুচক্র ও বাঙ্‌লার পল্লীপ্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য

প্রকৃতি যে কী আশ্চর্য সুন্দরী, কী মনোহর ও নয়নাভিরাম তার রূপশোভা, কী অফুরন্ত তার লীলাবৈচিত্র্য—বাঙ্‌লার পল্লীগ্রামের দিকে না তাকালে বোধ করি তা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা যাবে না। বিভিন্ন ঋতুতে এদেশের পল্লীপ্রকৃতি বিভিন্ন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, অনুপম সৌন্দর্য আর অমেয় সম্পদের পসরা সকলের সম্মুখে উন্মোচিত করে ধরে। প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য-বিলসিত বাঙ্‌লাভূমির এই যে রাজশ্রীমহিমা এর তুলনা হয় না। ঋতুচক্রের সুচিহ্নিত আবর্তন, প্রকৃতির অকৃপণ আশীর্বাদ বাঙ্‌লাকে অশেষ শোভার নিকেতন করে তুলেছে, বিচিত্র ফুল ও ফলের দেশে পরিণত করেছে। বাঙালির মানসপ্রকৃতিতে, বাঙালির অধ্যাত্মজীবনে, বাঙালির সৌন্দর্যসাধনায়, তার কাব্যে-সাহিত্যে, তার উৎসব-পার্বণে চতুষ্পার্শ্বের এই নিসর্গ-প্রকৃতির প্রভাব সামান্য নয়।

বাঙ্‌লার পল্লী অঞ্চলের নিসর্গসংসারকে কবির ভাষায় ঋতুরঙ্গশালা বলা যেতে পারে। এখানে প্রতিনিয়ত চলেছে বিশ্বসৃষ্টির অধিদেবতা নটরাজের ছন্দোময় নৃত্যলীলা। পর্যায়ক্রমে ঋতুচক্রের আবর্তন বুঝি এই নৃত্যচ্ছন্দের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সূর্যকে কেন্দ্র করে একটা নির্দিষ্ট পথে পৃথিবীর যে অবিশ্রান্ত চলার গতি, তারই ফলে ঘটে ঋতুর প্রতিনিয়ত পরিবর্তন; আর, কবিদৃষ্টিসম্পন্ন কল্পনাপ্রবণ ভাবুকের দৃষ্টিতে এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে বিশ্বদেবতা নটরাজের পদক্ষেপের সুমিত ছন্দ। তাই তো প্রকৃতিলোকে একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়, কোনোক্রমেই কদাপি পর্যায়ভঙ্গ হয় না। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, শরতের পর হেমন্ত, হেমন্তের পর শীত, শীতের পর বসন্ত—এর ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। লীলাময়ী প্রকৃতির আশীর্বাদপুষ্ট আমরা—বাঙালিরা—বিজ্ঞানবুদ্ধি আর ভাবুক কবির কল্পনাদৃষ্টিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছি, বৃত্তপথে পৃথিবীর চলার ছন্দের সঙ্গে সৃষ্টির অধিদেবতার ছন্দিত পদচারণাকে যুক্ত করে দিয়ে ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির অশেষ বৈচিত্র্যকে নিবিড় উপভোগের সামগ্রী করে তুলেছি। বাঙ্‌লার প্রকৃতিলোকের উদার প্রাঙ্গণে ছয়ঋতু ফিরে ফিরে এসে নৃত্য করে, নতুন নতুন পাত্র ভরে দিকে দিকে ঢেলে দেয় অফুরন্ত সৌন্দর্যের ধারা। তাতে দুচোখ জুড়িয়ে যায়, অন্তরদেশ তৃপ্তিতে পূর্ণ হয়, সমগ্র প্রাণসত্তা আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। ঋতুচক্রের আবর্তনকে প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের এতখানি বৃহৎ পটভূমিকায় অন্যকোনো দেশের মানুষ দেখেছে কিনা আমাদের জানা নেই।

বছরের বারোটি মাসকে ছয়টি ঋতুতে আমরা ভাগ করে নিয়েছি। এদের প্রত্যেকের আয়ুকাল মোটামুটি দু-মাস। এরা পূর্ণতা আর রিক্ততার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে। তাই দেখি, প্রকৃতিময়ীর ভাণ্ডার কখনো শূন্য,

কখনো ফুলে-ফলে, বর্ণে-গন্ধে, রূপে-রসে হাতের ডালা তার পূর্ণ। এই উভয়কে মিলিয়ে দেখাই ঋতুচক্রকে যথার্থভাবে দেখা, উভয়ের মিলনেই তার সম্পূর্ণ রূপ। বাঙলার ষড়ঋতু পরস্পর গায়ে-গায়ে লাগা। আস্তে আস্তে—অনেকটা লোকচক্ষুর অগোচরে—একের আবির্ভাব ও অপসরণ; আবার, তেমনি অলক্ষ্যে পরবর্তী ঋতুর আগমন। যে যায়, অপরকে নিঃশব্দে ডাক দিয়েই সে বিদায় নেয়। এমনি করেই গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্তের চক্রগতিতে আসাযাওয়া। এদের একের চলার ছন্দ অন্যের চলার ছন্দের সঙ্গে চিরকালের জন্য বাঁধা।

প্রকৃতির রঙ্গশালায় প্রথম আবির্ভাব ঋতুপুরুষ গ্রীষ্মের। গ্রীষ্মঋতুর প্রতিনিধি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ। দুইটি মূর্তিতে গ্রীষ্ম আমাদের কাছে প্রকাশিত—একটি তার বহিরঙ্গ দৃশ্যমূর্তি, অপরটি অন্তরঙ্গ ভাবমূর্তি। গ্রীষ্মের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটি রুক্ষ কঠোর বিশুষ্ক প্রচণ্ড। ঝাঁঝালো রৌদ্রের খরতাপে, প্রতপ্ত সূর্যের বহ্নিজ্বালায় সমস্ত পৃথিবী যেন পুড়ে যায়, চতুর্দিকে বিরাজ করতে থাকে একটা বিবর্ণ পাণ্ডুরতা। নদী-খাল-বিল-জলাশয়গুলি চোখঝলসানো রোদে শুকিয়ে যায়, মাঠ-ঘাট-প্রান্তর তৃষাদীর্ণ হয়ে ওঠে, উত্তপ্ত বাতাস অগ্নিঢালা মরুভূমির ভীষণতার সংকেত বহন করে আনে, সমগ্র প্রাণী-লোকের অস্তিত্ব মুমূর্ষু হয়ে পড়ে, যতদূর দৃষ্টি চলে সবকিছু নিদাঘের রুদ্রদহনে খাঁ-খাঁ করতে থাকে। এ সময়ে কেবল শহরগুলির নয়, পল্লীর অবস্থাও অসহনীয়। মধ্যাহ্নে পথচারীরা গাছের তলায় ছায়া খুঁজে বেড়ায়, পাখীর দল পাতার আড়ালে নীড়ে আশ্রয় লয়, গরুমহিষগুলো পুকুর আর বিলের অবসিতপ্রায় জলে গা ডুবিয়ে থাকে, কীট-পতঙ্গের দল ঝোপে-ঝাড়ে আত্মগোপন করে। বৃষ্টিহারা বৈশাখের দিনে জ্বালাময় দুপুরকে বিরাট একটি অগ্নিকুণ্ড বলে মনে হয়।

এ যেন প্রকৃতিলোকে এক ভয়াল তাপসের রুদ্র-আবির্ভাব। প্রখর রৌদ্র বুঝি তার তপোবহ্নি, চোখে তার ভীষণ দীপ্তি, পিঙ্গল তার জটাজাল। বৎসরের পুরাতন আবর্জনাকে সে বুঝি কিছুতেই সইবে না, চতুষ্পার্শ্বে নিষ্প্রাণ অস্তিত্বের শেষ চিহ্নটুকুও রাখবে না; উষ্ণ নিশ্বাসে আর বহ্নিমান ছটায় পৃথিবীর সঞ্চিত ক্লেদগ্লানিকে মহাশূন্যতার দেশে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, পুড়িয়ে ছাই করে দেবে যা-কিছু জীর্ণ পুরাতনকে। এই রুদ্রসন্ন্যাসীর বাণী, ত্যাগের বাণী সে মানুষকে আহ্বান করে অন্তর্লোকের ধ্যাননির্জনতায়।

বলেছি, গ্রীষ্মের দুপুর দুঃসহ। দ্বিপ্রহর গড়িয়ে যায়, ধীরে ধীরে বেলা পড়ে আসে। পড়ন্ত বেলায় মৃদু বাতাস বইতে থাকে। জীবলোক মুক্তির ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। উদার আকাশের নীচে খোলা মাঠে উন্মুক্ত বাতাসে ক্ষণকাল বেড়ালে শ্রান্তিক্লান্তি আর থাকে না, একটা সুখস্পর্শ অনুভূত হয়। গ্রীষ্মসন্ধ্যা সত্যই স্নিগ্ধতায় শান্তিময়ী। গ্রীষ্মঋতু ফুলের কাল নয়, ফুল ফোটাবার দায়িত্ব তার নয়—ফলের ডালা সাজাতেই তার আনন্দ। এ সময়টিতে আম-জাম-কাঁঠাল-লিচু ইত্যাদি কত সুস্বাদু ও রসাল ফল বাঙালীর রসনা পরিতৃপ্ত করে।

ধীরে ধীরে গ্রীষ্ম অপসৃত হয়, প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্তন ঘটে, সহসা শ্যামলী

বর্ষার আবির্ভাব সকলকে চমকিত করে। 'শ্যাম গম্ভীর সরসা' বর্ষার আগমনে নিদাঘতপ্ত পল্লীর মূর্তিখানি মুহূর্তে এক অপূর্ব রমণীয়তায় ভরে ওঠে। জলভরা পুঞ্জপুঞ্জ কালোমেঘে আকাশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঢেকে যায়, মহাশূন্যের কোন্ গুহা হ'তে বাঁধনছেঁড়া বায়ু দুরন্তবেগে ছুটে আসে, প্রবল ধারায় বর্ষণ শুরু হয়, শুষ্ক বিশীর্ণ মাঠপ্রান্তর, জলাশয়, নদীনালা উচ্ছ্বসিত প্লাবনে থরথর করে কাঁপতে থাকে—মুছে যায় ধূলিপাণ্ডুর ধরণীর রুক্ষতা। মৃতপ্রায় পৃথিবীর বুকে অকস্মাৎ প্রাণচাঞ্চল্যের সাড়া জাগে। মাটির তলদেশ হতে তৃণাঙ্কুর মাথা তোলে, তরুলতার পাতায়-পাতায় সবুজের ঢেউ খেলে যায়, বিচিত্র ফুলের বিকাশে—কদম কেয়া-কামিনী-জুঁইয়ের আত্মপ্রকাশে—দিগ্‌দেশ আমোদিত হয়। নয়নরঞ্জন সজল বর্ষার এই রূপশ্রী।

বর্ষাঋতুতে পল্লীবাঙ্‌লার মূর্তিখানি প্রেক্ষণীয়। দিগন্তহারা জলছলছল মাঠে কচি ধানের গাছগুলি হাওয়ায় দুলছে, পাটের চারা জলের উপরে মাথা তুলে রয়েছে, খালে-নালায় কল্‌কল্ শব্দে স্রোত বয়ে যাচ্ছে, নদীতে পালতোলা নৌকা দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে, গাছে গাছে শ্যামলিমার সমারোহ, মেঘমেদুর আকাশে স্নিগ্ধ কান্তি, পুকুরপাড়ে কদম-কেয়ার চিত্তহরা সুরভির অজস্রতা, অন্ধকারে বাঁশবন আর আমবাগানের ধারে ডোবার মধ্য থেকে অবিশ্রান্ত ব্যাঙের ডাক—সবকিছু মিলে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে যাতে মানুষের অন্তর সাড়া না দিয়ে পারে না। বাঙালিচিত্তে এহেন বর্ষার প্রভাব অসামান্য, তার স্বাক্ষর চিহ্নিত রয়েছে বাঙ্‌লা কাব্যে।

বর্ষার রূপ কিন্তু শুধু কোমলমধুর নয়, তার মধ্যে কঠোরতাও আছে, তার একটি রৌদ্রীমূর্তিও রয়েছে। বিক্ষুব্ধ বর্ষার ভীষণ সৌন্দর্য দেখতেও এদেশের প্রকৃতিপ্রেমিক কবির কত না আনন্দ! কোমলে-কঠোরে, ভৈরবে-মধুরে মিশ্রিত বর্ষার যে রূপ, তার সঙ্গে অপর কোনো ঋতুর তুলনা হয় না। এ হিসাবে বর্ষাঋতু অসাধারণ।

যেমন আমাদের ভাবজীবন, তেমনি ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গেও বর্ষার যোগ অতিশয় নিবিড়। এসময়ে ধান রোপণ করা হয় বলে পরিমিত বর্ষণ অপেক্ষিত। বৃষ্টি না হলে চাষের কাজ চলে না। চাষ না হলে ধানের গুরুতর ক্ষতি হয়, সমগ্র দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়ে, তখন জনসাধারণের দুঃখকষ্টের সীমা থাকে না। কৃষিপ্রধান বাঙ্‌লা বর্ষার প্রসন্নতা ও দাক্ষিণ্যের মুখাপেক্ষী। অনাবৃষ্টি যেমন পল্লীবাসীর নানা দুর্গতির কারণ, তেমনি অতিবৃষ্টি। অতিবর্ষণে প্লাবন ঘটায়, ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে, ধনপ্রাণ নষ্ট হয়—নদীমাতৃক দেশে প্রকৃতির এহেন বিরূপতা সত্যই সাংঘাতিক। বর্ষাকালীন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাঝে মাঝে শহরের মানুষগুলিকেও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। বর্ষাঋতু যেমন প্রাণদ, নয়ন-বিমোহন, আবার, তেমনি মহাঅনর্থপাতের হেতু। রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, ঝুলন প্রভৃতি হিন্দুর কতকগুলি পার্বণ-উৎসব এই ঋতুতে অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ষাসুন্দরী যখন যাই যাই করে, তখন বিশ্বপ্রকৃতির নাটমঞ্চের নেপথ্যে শরৎলক্ষ্মীর

কখনো ফুলে-ফলে, বর্ণে-গন্ধে, রূপে-রসে হাতের ডালা তার পূর্ণ। এই উভয়কে মিলিয়ে দেখাই ঋতুচক্রকে যথার্থভাবে দেখা, উভয়ের মিলনেই তার সম্পূর্ণ রূপ। বাঙলার ষড়ঋতু পরস্পর গায়ে-গায়ে লাগা। আস্তে আস্তে—অনেকটা লোকচক্ষুর অগোচরে—একের আবির্ভাব ও অপসরণ; আবার, তেমনি অলক্ষ্যে পরবর্তী ঋতুর আগমন। যে যায়, অপরকে নিঃশব্দে ডাক দিয়েই সে বিদায় নেয়। এমনি করেই গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্তের চক্রগতিতে আসাযাওয়া। এদের একের চলার ছন্দ অন্যের চলার ছন্দের সঙ্গে চিরকালের জন্য বাঁধা।

প্রকৃতির রঙ্গশালায় প্রথম আবির্ভাব ঋতুপুরুষ গ্রীষ্মের। গ্রীষ্মঋতুর প্রতিনিধি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ। দুইটি মূর্তিতে গ্রীষ্ম আমাদের কাছে প্রকাশিত—একটি তার বহিরঙ্গ দৃশ্যমূর্তি, অপরটি অন্তরঙ্গ ভাবমূর্তি। গ্রীষ্মের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটি রুক্ষ কঠোর বিশুষ্ক প্রচণ্ড। ঝাঁঝালো রৌদ্রের খরতাপে, প্রতপ্ত সূর্যের বহ্নিজ্বালায় সমস্ত পৃথিবী যেন পুড়ে যায়, চতুর্দিকে বিরাজ করতে থাকে একটা বিবর্ণ পাণ্ডুরতা। নদী-খাল-বিল-জলাশয়গুলি চোখঝলসানো রোদে শুকিয়ে যায়, মাঠ-ঘাট-প্রান্তর তৃষাদীর্ণ হয়ে ওঠে, উত্তপ্ত বাতাস অগ্নিঢালা মরুভূমির ভীষণতার সংকেত বহন করে আনে, সমগ্র প্রাণী-লোকের অস্তিত্ব মুমূর্ষু হয়ে পড়ে, যতদূর দৃষ্টি চলে সবকিছু নিদাঘের রুদ্রদহনে খাঁ-খাঁ করতে থাকে। এ সময়ে কেবল শহরগুলির নয়, পল্লীর অবস্থাও অসহনীয়। মধ্যাহ্নে পথচারীরা গাছের তলায় ছায়া খুঁজে বেড়ায়, পাখীর দল পাতার আড়ালে নীড়ে আশ্রয় লয়, গরুমহিষগুলো পুকুর আর বিলের অবসিতপ্রায় জলে গা ডুবিয়ে থাকে, কীট-পতঙ্গের দল ঝোপে-ঝাড়ে আত্মগোপন করে। বৃষ্টিহারা বৈশাখের দিনে জ্বালাময় দুপুরকে বিরাট একটি অগ্নিকুণ্ড বলে মনে হয়।

এ যেন প্রকৃতিলোকে এক ভয়াল তাপসের রুদ্র-আবির্ভাব। প্রখর রৌদ্র বুঝি তার তপোবহ্নি, চোখে তার ভীষণ দীপ্তি, পিঙ্গল তার জটাজাল। বৎসরের পুরাতন আবর্জনাকে সে বুঝি কিছুতেই সইবে না, চতুষ্পার্শ্বে নিষ্প্রাণ অস্তিত্বের শেষ চিহ্নটুকুও রাখবে না; উষ্ণ নিশ্বাসে আর বহ্নিমান ছটায় পৃথিবীর সঞ্চিত ক্লেদগ্লানিকে মহাশূন্যতার দেশে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, পুড়িয়ে ছাই করে দেবে যা-কিছু জীর্ণ পুরাতনকে। এই রুদ্রসন্ন্যাসীর বাণী, ত্যাগের বাণী সে মানুষকে আহ্বান করে অন্তর্লোকের ধ্যাননির্জনতায়।

বলেছি, গ্রীষ্মের দুপুর দুঃসহ। দ্বিপ্রহর গড়িয়ে যায়, ধীরে ধীরে বেলা পড়ে আসে। পড়ন্ত বেলায় মৃদু বাতাস বইতে থাকে। জীবলোক মুক্তির ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। উদার আকাশের নীচে খোলা মাঠে উন্মুক্ত বাতাসে ক্ষণকাল বেড়ালে শ্রান্তিক্লান্তি আর থাকে না, একটা সুখস্পর্শ অনুভূত হয়। গ্রীষ্মসন্ধ্যা সত্যই স্নিগ্ধতায় শান্তিময়ী। গ্রীষ্মঋতু ফুলের কাল নয়, ফুল ফোটাবার দায়িত্ব তার নয়—ফলের ডালা সাজাতেই তার আনন্দ। এ সময়টিতে আম-জাম-কাঁঠাল-লিচু ইত্যাদি কত সুস্বাদু ও রসাল ফল বাঙালীর রসনা পরিতৃপ্ত করে।

ধীরে ধীরে গ্রীষ্ম অপসৃত হয়, প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্তন ঘটে, সহসা শ্যামলী

বর্ষার আবির্ভাব সকলকে চমকিত করে। 'শ্যাম গম্ভীর সরসা' বর্ষার আগমনে নিদাঘতপ্ত পল্লীর মূর্তিখানি মুহূর্তে এক অপূর্ব রমণীয়তায় ভরে ওঠে। জলভরা পুঞ্জপুঞ্জ কালোমেঘে আকাশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঢেকে যায়, মহাশূন্যের কোন্ গুহা হ'তে বাঁধনছেঁড়া বায়ু দুরন্তবেগে ছুটে আসে, প্রবল ধারায় বর্ষণ শুরু হয়, শুষ্ক বিশীর্ণ মাঠপ্রান্তর, জলাশয়, নদীনালা উচ্ছ্বসিত প্লাবনে থরথর করে কাঁপতে থাকে—মুছে যায় ধূলিপাণ্ডুর ধরণীর রুক্ষতা। মৃতপ্রায় পৃথিবীর বুকে অকস্মাৎ প্রাণচাঞ্চল্যের সাড়া জাগে। মাটির তলদেশ হতে তৃণাঙ্কুর মাথা তোলে, তরুলতার পাতায়-পাতায় সবুজের ঢেউ খেলে যায়, বিচিত্র ফুলের বিকাশে—কদম কেয়া-কামিনী-জুঁইয়ের আত্মপ্রকাশে—দিগ্‌দেশ আমোদিত হয়। নয়নরঞ্জন সজল বর্ষার এই রূপশ্রী।

বর্ষাঋতুতে পল্লীবাঙ্‌লার মূর্তিখানি প্রেক্ষণীয়। দিগন্তহারা জলছলছল মাঠে কাঁচা ধানের গাছগুলি হাওয়ায় দুলছে, পাটের চারা জলের উপরে মাথা তুলে রয়েছে, খালে-নালায় কল্‌কল্ শব্দে স্রোত বয়ে যাচ্ছে, নদীতে পালতোলা নৌকা দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে, গাছে গাছে শ্যামলিমার সমারোহ, মেঘমেদুর আকাশে স্নিগ্ধ কান্তি, পুকুরপাড়ে কদম-কেয়ার চিত্তহরা সুরভির অজস্রতা, অন্ধকারে বাঁশবন আর আমবাগানের ধারে ডোবার মধ্য থেকে অবিশ্রান্ত ব্যাঙের ডাক—সবকিছু মিলে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে যাতে মানুষের অন্তর সাড়া না দিয়ে পারে না। বাঙালিচিত্তে এহেন বর্ষার প্রভাব অসামান্য, তার স্বাক্ষর চিহ্নিত রয়েছে বাঙ্‌লা কাব্যে।

বর্ষার রূপ কিন্তু শুধু কোমলমধুর নয়, তার মধ্যে কঠোরতাও আছে, তার একটি রৌদ্রীমূর্তিও রয়েছে। বিক্ষুব্ধ বর্ষার ভীষণ সৌন্দর্য দেখতেও এদেশের প্রকৃতিপ্রেমিক কবির কত না আনন্দ! কোমলে-কঠোরে, ভৈরবে-মধুরে মিশ্রিত বর্ষার যে রূপ, তার সঙ্গে অপর কোনো ঋতুর তুলনা হয় না। এ হিসাবে বর্ষাঋতু অসাধারণ।

যেমন আমাদের ভাবজীবন, তেমনি ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গেও বর্ষার যোগ অতিশয় নিবিড়। এসময়ে ধান রোপণ করা হয় বলে পরিমিত বর্ষণ অপেক্ষিত। বৃষ্টি না হলে চাষের কাজ চলে না। চাষ না হলে ধানের গুরুতর ক্ষতি হয়, সমগ্র দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়ে, তখন জনসাধারণের দুঃখকষ্টের সীমা থাকে না। কৃষিপ্রধান বাঙ্‌লা বর্ষার প্রসন্নতা ও দাক্ষিণ্যের মুখাপেক্ষী। অনাবৃষ্টি যেমন পল্লীবাসীর নানা দুর্গতির কারণ, তেমনি অতিবৃষ্টি। অতিবর্ষণে প্লাবন ঘটায়, ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে ধনপ্রাণ নষ্ট হয়—নদীমাতৃক দেশে প্রকৃতির এহেন বিরূপতা সত্যই সাংঘাতিক বর্ষাকালীন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাঝে মাঝে শহরের মানুষগুলিকেও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। বর্ষাঋতু যেমন প্রাণদ, নয়ন-বিমোহন, আবার, তেমনি মহাঅনর্থপাতের হেতু রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, ঝুলন প্রভৃতি হিন্দুর কতকগুলি পার্বণ-উৎসব এই ঋতুতে অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ষাসুন্দরী যখন যাই যাই করে, তখন বিশ্বপ্রকৃতির নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে শরৎলক্ষ্মীর

আবির্ভাবের অদৃশ্য আয়োজন চলতে থাকে। নিঃশব্দ চরণে সে যে কখন এসে পড়ে, অনেকসময় তা উপলব্ধিই করা যায় না। শরৎ বর্ষারই সহজ স্বাভাবিক পরিণতি। শরতের বিশিষ্ট রূপশ্রী কারো দৃষ্টি এড়াবার নয়। শ্রাবণ শেষ হয়ে গেল, বর্ষণ ক্লান্ত হল। আকাশের আঙিনায় জলভারানত কালো মেঘগুলিকে এখন আর দেখা যাবে না। এবার নীলাম্বরে জলহারা লঘুভার শুভ্র মেঘদলের স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণের শুরু, চারিদিকে মিষ্টি কাঁচা রোদের মধুময় স্পর্শ, মাঠে মাঠে আলোছায়ার লুকোচুরি-খেলা, উঠানের ধারে নতুন-ফোটা শিউলি ফুলের উদাস গন্ধ, নদীতীরের কাশবনে গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুলের আনন্দচঞ্চল দোলা, প্রভাতে শ্যামল তৃণপল্লবে শিশিরের আলিম্পন, তার ওপর সোনালী রোদ্দুরের ঝিলিক, রাতের বেলা ধবধবে জ্যোৎস্নার স্বপ্নভরা স্নিগ্ধ কান্তি—কী অপূর্ব, কী মনোরম এই দৃশ্য!

শরৎকালকে দেখলে মনে হয়, সে যেন উদার আকাশের ঋতু, প্রাণের তারে ছুটির রাগিণী বাজিয়ে তোলাই বুঝি তার প্রধান কাজ। বাঙলার শরৎপ্রকৃতি হাসিতে খুসিতে নিরন্তর উচ্ছল। যেন তার কোনো বন্ধন নেই, কাজের তাড়া নেই, সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি থেকে বুঝি সে সম্পূর্ণ মুক্ত—নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে ঢেলে দেওয়াতেই বুঝি একমাত্র আনন্দ তার। শরৎ অনিরুদ্ধ প্রসন্নতার ঋতু। এতখানি প্রশান্ত সৌন্দর্য প্রকৃতিলোকে অন্যকোনো সময় দেখতে পাওয়া যায় না। এই আনন্দময় মূর্তি, শরৎ-লক্ষ্মীর এই অনুপম রূপশ্রী মনকে একেবারে উদাস করে দেয়, চিত্তকে সাংসারিক লাভ-ক্ষতির হিসাবের ঊর্ধ্বে তুলে ধরে, পরিণাম সম্পর্কে বিস্মৃতি জাগায়, সকল বিষয়বুদ্ধিকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যায়—অনন্ত অবকাশের রাজ্যে। শরতের অন্তর্লোকে একটানা অনাসক্তির সুরটি অহর্নিশ বেজে চলেছে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, শরতের এই হাসিখুশিকে আপাতদৃষ্টিতে লঘু মনে হলেও বস্তুত সে লঘু নয়। সবারই অলক্ষ্যে, অবকাশের ফাঁকে ফাঁকে, শরৎলক্ষ্মী নিজের কর্তব্য করে যাচ্ছে, নিভৃত সাধনায় পৃথিবীকে সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে তুলছে; গোপনে গোপনে ফল ফলাবার আয়োজনেই সে রত—শরতের ইঙ্গিত হেমন্তের সোনার ধানের সঞ্চয়ের দিকে। এ সত্যটি যে বুঝলে না, শরৎপ্রকৃতির স্বরূপটিকেও সে চিনলে না।

একটু আগে বলা হয়েছে, শরৎকাল আনন্দময় অবকাশের ঋতু। তাই বুঝি এই ঋতুটিতেই বাঙালি তার শ্রেষ্ঠ পূজার—দুর্গাপূজার—অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে। একদিকে নিসর্গসংসারে সৌন্দর্যআনন্দের নির্বাধ উৎসার, অন্যদিকে মানবসংসারে আনন্দময়ী জগজ্জননীর পূজাউৎসব, প্রাণচেতনার অভূতপূর্ব সাড়া। আকাশেবাতাসে অফুরন্ত খুশির ঢেউ খেলে যায়, মন প্রজাপতির মতো কেবল চারিদিকে উড়ে বেড়াতে চায়—আত্মানন্দের আবেগে নিজেকে নিঃশেষ করে ঢেলে নিঃসম্বল হয়ে ওঠার সুখও কি কম! শরৎকে নিঃসন্দেহে উৎসবের ঋতু বলা যেতে পারে। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া সবকিছুই শরতের দিনে অনুষ্ঠিত হয়। এই ঋতুটি অন্তর্হিত হলেও দীর্ঘকাল তার স্মৃতি আমরা ভুলতে পারি না, মনের কোণে তার উদাস রাগিণীর রেশটুকু থেকে যায়। ঋতুরাজ বসন্তও যেন শরতের কাছে হার মানে।

শরতের পরিণতি হেমন্তে। হেমন্তের বহিরঙ্গ রূপটি প্রশান্ত পূর্ণতার, অন্তরঙ্গ ভাবমূর্তিটি বিষণ্ণ বৈরাগ্যের। মানবজীবনের প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে প্রকৃতিজগতের হেমন্ত-ঋতুর সাদৃশ্য রয়েছে। রূপসজ্জার দিকে হেমন্তলক্ষ্মীর কোনো দৃষ্টি নেই, নিরাভরণ সে। যে পূর্ণ, আপনাকে রিক্ত করে দিতে এতটুকু ভয় তার নেই। সে ফল চায় না—ফলাতে চায়, ফলতে চায়। পৃথিবীতে হেমন্তের শ্রেষ্ঠ দান সোনার ধান্য। এই ভূষণবিরল হেমন্তের দিকে তাকালে মনে হয়, নিজেকে ব্যক্ত করার কোনো প্রয়াস তার নেই, একটা পাতলা কুয়াশার আঁবরণ টেনে দিয়ে সে যেন আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখতে চায়।

ফুলের বাহার নেই, সৌন্দর্যের উচ্ছলতা নেই, অঙ্গসজ্জার প্রাচুর্য নেই, তথাপি হেমন্তের মহিমা অনস্বীকার্য। সে-মহিমা তার নিঃস্বকরা দানে, আন্তর ঐশ্বর্যে। মমতাময়ী কল্যাণী নারীর সঙ্গেই হেমন্ত তুলনীয়।

হেমন্তের পর শীতের আগমন—শীত হেমন্তঋতুরই পরিণত রূপ। মানুষের বার্ধক্যের যেমন একটা লক্ষণীয় শ্রী রয়েছে, প্রকৃতিলোকে তেমনি শীতেরও। শীতের দিনে নিসর্গ-প্রকৃতির মুখে দেখা যায় একটা শুষ্ক কাঠিন্যের ভাব। যেন সে রিক্ততার প্রতিচ্ছবি। তার তপস্বিনী মূর্তিটিতে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও বৈরাগ্যের অঙ্গীকার সুচিহ্নিত। বৈশাখে প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালায় আমরা দেখি তাপস নটরাজের রুদ্ররূপ, শীতঋতুতে দেখি তার তপস্যানিরত প্রশান্ত মূর্তি—কোথাও চাঞ্চল্য নেই, বিক্ষোভ নেই, প্রগলভতা নেই। শীতকালীন প্রাকৃতিক দৃশ্যে এমন একটা পরিপূর্ণতার বিরলবর্ণ সুষমা চোখে পড়ে, দেখে মনে হয়, প্রকৃতির রহস্যময় গোপন অন্তঃপুরে কিসের একটা প্রস্তুতি চলেছে, এবং এই প্রস্তুতি এক মহতী সিদ্ধির সূচক।

শীতপ্রকৃতি আপনার চতুর্দিকে একটা বৈরাগ্যধূসর পরিবেশ রচনা করে। তার দিকে তাকাও, দেখতে পাবে—ধীরে ধীরে গাছের পাতাগুলি বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, উত্তরে-হাওয়া ওই শুকনো পাতাগুলিকে ঝরিয়ে দিচ্ছে, ডালপালা ক্রমেই রিক্ত হয়ে উঠছে; ধানকাটা মাঠে-মাঠে কী প্রকাণ্ড শূন্যতা, চতুষ্পার্শ্বে অনিঃশেষ জড়তা। ঐশ্বর্যময়ী সুন্দরী প্রকৃতি কতখানি নিরাভরণা, কতখানি কৃপণা হয়ে উঠতে পারে, শীতঋতুর দিকে না তাকালে তা বুঝতে পারা যায় না। বুঝি এও নটরাজের রহস্যাচ্ছন্ন লীলার বিশেষ একটি প্রকাশ।

কিন্তু শীতঋতুর এই নির্মম কৃপণতা, ভিন্ন ভাষায়, শীতপ্রকৃতির উপস্যার এই প্রস্তুতি, নিরর্থক নয়। সে যে তপের শুষ্ক আসন পাতল, উত্তরে-হাওয়ায় ভর করে চারদিকে শাসন জানাল, পাতার রঙ্ ঘুচাল, তরুলতাকে রিক্তপত্র করে তুলল, পৃথিবীর জীর্ণতাকে সরিয়ে দিল—এ-সমস্ত-কিছুই নতুন অতিথি নববসন্তের আগমনের পথটিকে পরিষ্কার বা সুগম করে তুলবার জন্যে। শীত রমণীয় নবযৌবনের দূত। সে বসন্তের আবির্ভাবের বার্তা বহন করে আনে, তার তপশ্চর্যার ফলসিদ্ধির মধ্যেই নিহিত রয়েছে বসন্ত ঋতুর জন্মের সকল সম্ভাবনা। মৃত্যুস্নানে শুচি হয়ে, বসন্তকে জন্ম দিয়ে শীতের অপসরণ।

শীত যায়—বসন্ত এসে তার স্থান পূর্ণ করে। বসন্তের আগমনে সমগ্র প্রকৃতি-লোকে সহসা এক অত্যাশ্চর্য রূপান্তর সাধিত হয়। বসন্ত এক ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারী, দক্ষিণা বাতাস তার সহচর। ওই দখিনহাওয়ার যাদুময় স্পর্শে নির্জীব পৃথিবী নতুন প্রাণচেতনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে, রিক্ত ডালপালায় কচি কিশলয়ের সমারোহ জাগে, কান পাতলে বাতাসে-ভেসে আসা শ্রুতিবিনোদন মর্মরধ্বনি শোনা যায়, বৃক্ষান্তরাল থেকে অবিরল কুহুতান চিত্ত ব্যাকুল করে তোলে, চতুর্দিকে শুরু হয় উদ্দাম ক্ষ্যাপামির পালা। বসন্ত বিচিত্রসুন্দর ফুলের ঋতু। অশোক-পলাশ-শিমুল-দাড়িম্বের বনে যেন রক্তপ্রদীপ জ্বলতে থাকে, মাধবিকা দূরদূরান্তরে সুরভি ছড়ায়, ফাল্গুনের পুষ্পিত প্রলাপে অন্তর্দেশ প্রগল্ভ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—ঘুমভাঙা প্রকৃতি সকলকে ডাকে তার প্রাঙ্গণে, রূপসুন্দরের মহোৎসবে যোগ দিতে। নবীনতায়, প্রাণের উচ্ছলতায়, সৌন্দর্যের প্রাচুর্যে, সৃষ্টির অজস্র সম্ভাবনায় বসন্ত অতুলনীয়। সে মায়াবী, অপরূপ আর যাদু, নতুনের বাসন্তিক ছোঁয়ায় একমুহূর্তে শূন্যকে সে পূর্ণ করে দেয়—মাধুরীর বন্যায় যুগপৎ অন্তর্লোক আর বহির্লোককে পরিপ্লাবিত করে। একালে বসন্তোৎসব—দোলযাত্রা বা হোলিখেলা—অর্থহীন নয়।

একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে, বসন্তের দ্বৈত প্রকাশ। নবফাল্গুনে প্রথমবসন্ত ও চৈত্রাবসানে শেষ বসন্তের রূপ এক নয়। প্রথম বসন্ত অবন্ধন উদ্দাম, ফুলফোটাবার ক্ষ্যাপামি যেন তাকে পেয়ে বসে; উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার মত্ততায় পরিণামের কথা একবারও সে ভাবে না। এহেন বেহিসাবি বসন্ত চৈত্রশেষে নিজের উদ্দামতাকে যেন নিয়ন্ত্রিত করে, প্রৌঢ় পরিণতির শাসনকে স্বীকৃতি জানায়। ফুল-ফোটানোই বসন্তের একমাত্র কাজ নয়, ফুলকে ফলে পরিণতি দান করাতেই তার চরম সার্থকতা। শেষবসন্ত অনেকটা নিরাসক্ত—এখন ফুলের বর্ণবিলাস নয়, ফলনের আনন্দকেই সে পথের সঞ্চয় করে নিতে চায়। এই দুটি রূপ মিলিয়েই বসন্তের সম্পূর্ণতা।

ঋতুচক্রের শেষ ঋতু বসন্ত। প্রকৃতিলোকে নবজীবনের মন্ত্রোচ্চারণ করে ধরিত্রীর জড়ত্বের বন্ধন ঘুচিয়ে সে চলে যায়। তার বিদায়কাল আসন্ন হয়ে উঠতেই বিশ্বপ্রকৃতির রঙ্গশালার নেপথ্যে গ্রীষ্মের আবির্ভাবের প্রস্তুতি চলতে থাকে। রৌদ্রের ক্রমবর্ধমান উত্তাপ ওই প্রস্তুতির প্রতি নিশ্চিত ইঙ্গিত।

বাঙলাদেশে ষড়ঋতুর লীলাবৈচিত্র্য এত সুস্পষ্ট যে তা সকলেরই চোখে পড়ে। প্রকৃতি-উপভোগের সুযোগ আমাদের মতো অপর কারো রয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই বিচিত্ররূপা প্রকৃতির সংসর্গ থেকে আমরা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছি, যান্ত্রিক সভ্যতা আর শহুরে জীবন আমাদের ওপর দুষ্টপ্রভাব বিস্তার করে চলেছে। একদিন আমাদের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কটি ছিল ভাইবোনের মতো, উভয়ে পরস্পরের কত নিকটসান্নিধ্যে ছিলাম। সেই সংস্পর্শের গভীরতা আজ নেই।

প্রকৃতিকে এখন আমরা দূর থেকে দেখি, তার বিষয়ে কদাচিৎ কৌতূহলী হয়ে উঠি, হয়তো ক্ষণকালের জন্যে তার আতিথ্য গ্রহণ করি। কিন্তু প্রকৃতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার চাবিকাঠি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাই, আমাদের জীবনটাও দিন দিন

যান্ত্রিক হয়ে উঠছে, কৃত্রিমতায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে—শান্ত সৌন্দর্য ও অনাবিল আনন্দের নিকেতন হতে আজ আমরা একরূপ নির্বাসিত। এরূপ একটি অবস্থা কিন্তু দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। মানসিক অশান্তি-অস্থৈর্য-বিক্ষোভের হাত থেকে পরিত্রাণলাভ যদি আমাদের সত্যই কাম্য হয়, তাহলে পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে পুনর্বার সহজ যোগসূত্র রচনা করতে হবে, নাগরিক জীবনের মোহ কাটাতে হবে, জীবনকে জটিলতামুক্ত করতে হবে। শান্তিময়ী প্রকৃতিকে উপেক্ষা করলে সেও প্রতিশোধ নেবে—অভিশপ্ত নাগরিক সভ্যতা জাতীয় জীবনে বিষময় দুষ্টক্ষতের সৃষ্টি করবে. সকলকে ঠেলে দেবে শোচনীয় অপমৃত্যুর মুখে।

আমাদের নববর্ষের উৎসব

আনন্দের প্রতি আকর্ষণ প্রত্যেক মানুষের একটা সহজাত ধর্ম। আমরা যাহা কিছু করি, বলি ও ভাবি—সমস্ত কিছুর মূলে অলক্ষ্যভাবে যে প্রেরণাটি কাজ করে, এককথায় তাহা হইল আনন্দানুসন্ধান। এই আনন্দ আবার মানুষ নিজ নিজ প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য অনুসারে একা ভোগ করিতে পারে, পরিবারের পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া উপভোগ করিতে পারে, সমাজে অপর দশজনের সঙ্গেও ভাগ করিয়া লইতে পারে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে ক্ষণে ক্ষণে আমরা যে আনন্দ আহরণ করি তাহা আমাদের ব্যক্তিগত সম্পদ, প্রাত্যহিকতার ডালভাতে পুষ্ট ভরাপেটের আনন্দ-উৎসব তাহা নয়। নিজে বা দুই-একজন নির্দিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে ভালো একটা ছবি দেখিতে যাই, বা বিশেষ কোন খেলা দর্শন করি, বা গঙ্গার চিত্তহারী শোভা দেখিয়া লই—সবই আনন্দের বস্তু সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার একটাকেও উৎসব বলিব না। আনন্দ যখন ব্যক্তিজীবনের বা সংকীর্ণ পারিবারিক জীবনের সীমা অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে, সর্বব্যাপী সাধারণের অন্তরের শুচিস্পর্শে ধন্য হয়, তখনই তাহাকে উৎসব বলি। নিজের আনন্দে যখন বহুর সহিত মিলিত হইয়া একটি সার্বজনীন রূপ গ্রহণ করে, সেই আনন্দেরই নাম উৎসব। এই উৎসবানন্দের স্বরূপ বিশ্লেষ করিতে বসিয়া বাঙালি প্রবন্ধকার বলেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন : 'আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হোক, আমার শুভে সকলের শুভ হোক, আমি যাহা পাই পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি—এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ।' যথার্থ উৎসব মঙ্গল-জ্যোতিতে দীপ্যমান।

উৎসব এইকারণে একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। কতকগুলি বিশেষ উপলক্ষকে আশ্রয় করিয়া মানুষ বিচিত্র উৎসবের আয়োজন করে। পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি যে-কোনো নিমিত্ত বা উপলক্ষকে কেন্দ্র করিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে পারে। আমি আমার একজন অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের জন্মদিন উদ্‌যাপন করিব বা নূতন গৃহ প্রতিষ্ঠা করিব, তাহা লইয়া দশজন বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীকে ডাকিলাম,—একটি পারিবারিক উৎসব সম্পাদিত হইল। দুর্গাপূজা, রথযাত্রা, দোল—এগুলি ধর্মীয় উৎসব। স্বাধীনতাদিবসপালন প্রভৃতিকে রাষ্ট্রীয় উৎসব বলা যাইতে পারে। বর্তমানে রবীন্দ্রজয়ন্তী, বিজয়াসম্মেলন ইত্যাদি আমাদের জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছে। উপলক্ষ ও উদ্যোক্তাদের দিকে তাকাইয়া এইভাবেই আমরা উৎসবের শ্রেণীবিভাগ করি। কিন্তু, একটু লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বোঝা যায়, যে উৎসবের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের সংযোগ বেশী, উহা নিমিত্তের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া জাতীয় উৎসবের মর্যাদা লাভ করে। নববর্ষের উৎসব এরূপ একটি জাতীয় উৎসব।

বৎসর মানুষের নিজের সৃষ্টি। অনাদ্যনন্ত অখণ্ড মহাকালকে আমরা নিজেদের বুদ্ধিমতো খণ্ডিত করিয়া সেকেণ্ড-মিনিট-ঘণ্টা-দিন-মাস-বৎসরে চিহ্নিত করিয়াছি। বছরের ফিতায় আমরা আমাদের আয়ুষ্কালের পরিমাপ করি। এই কারণে নূতন বৎসরের প্রারম্ভে অতীত ও অনাগতের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া আমরা নিজেকে একবার ভালো করিয়া দেখিবার প্রয়াস পাই। চতুষ্পার্শ্বের পরিচিত পৃথিবীই আমাদের জীবন-পরিক্রমার পথে নানা আশাআকাঙ্ক্ষার বার্তাবহ হইয়া যেন নূতন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। পৃথিবীর সকল দেশের মানুষই নববর্ষের উৎসব করিয়া থাকে। তবে মনে রাখিতে হইবে, দেশভেদে ও জাতিভেদে বর্ষ-আরম্ভের বিভিন্নতার মতো, নববর্ষের উৎসব-অনুষ্ঠানের বহিরঙ্গ রূপটিও স্বতন্ত্র।

বছরের প্রথম দিনটি প্রতিদিনের মতোই একটি দিন। কিন্তু, তবু কোথায় যেন ইহার মধ্যে একটা অপূর্বতা রহিয়াছে। এই অপূর্বতার জন্যই ইহার স্বাতন্ত্র্য এবং একারণে ইহা প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ঊর্ধ্বচারী একটি বিশেষ দিন—অপর দশদিন হইতে যেন একেবারে আলাদা। ধাবমান মহাকাল মাত্র এই একটি দিনের জন্য তাহার অশ্রান্ত গতিকে স্তব্ধীভূত করিয়া বুঝি স্থিতিশীল মূর্তিতে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। আমরা সমারোহসহকারে এই নূতনকে অভ্যর্থনা জানাই—আশা ও আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমাদের হৃদয়দেশ পূর্ণ হইয়া উঠে।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে বর্ষ আরম্ভ হইত অগ্রহায়ণ মাস হইতে। অগ্রহায়ণ মাসের নাম ছিল মার্গশীর্ষ মাস। জনসাধারণ কোনো কালেই অধিক শিক্ষিত ছিল না, তাহারা তখনো চন্দ্রসূর্যের গতি দেখিয়া বর্ষ গণনা করিতে শিখে নাই। তাই, প্রাকৃতিক স্বভাবের লক্ষণ দেখিয়া তাহারা বর্ষ গণনা করিত। 'অগ্র' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, 'হায়ণ' অর্থাৎ ব্রীহি বা ধান জন্মায় যে-সময়—সেটা অগ্রহায়ণ। কৃষক ও খাতককে মহাজন কোন্ সময় ঋণ দিবেন, আর, কোন্ সময় তাহারা সেই

ঋণ পরিশোধ করিবে, প্রকৃতিগত একটা স্পষ্ট নির্দেশের দ্বারা তাহা বুঝান হইত। কিন্তু কালের গতি পরিবর্তনশীল। ক্রমে অগ্রহায়ণের পরিবর্তে বৈশাখ হইতে বর্ষগণনা শুরু হইল। হিন্দুদের নিকট বৈশাখমাস সর্বাপেক্ষা পুণ্যমাস। বিশাখানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমার নাম বৈশাখী। যে-মাসে এই বৈশাখী হয় তাহার নাম বৈশাখ।

আমরা—বাঙালিরা—পয়লা বৈশাখেই নববর্ষের উৎসব উদ্‌যাপন করিয়া থাকি। এ দিনটিতে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাই অতীতের ব্যর্থতার গ্লানি, অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করি পুরাতন বৎসরের দুঃখবেদনার যত ক্ষতচিহ্ন। নববর্ষের উজ্জ্বল নূতন প্রভাত আমাদের কাছে বহন করিয়া আনে উদার মুক্তির বাণী—হতাশার হাত হইতে মুক্তি, মানসিক দুর্বলতা-জড়তার হাত হইতে মুক্তি, চিত্তদৈন্যের হাত হইতে মুক্তি। আর মুক্তিতেই তো মানুষের সত্যকার আনন্দ। এই হিসাবে নববর্ষ আনন্দের উৎস, শক্তির উৎস, নবতম প্রাণচেতনা অনুভবের উৎস। এমন দিনটিকে সর্বান্তঃকরণে যে-না বরণ করিয়া লইতে পারে সে বাস্তবিকই দীনাত্মা, জীবন তাহার বিড়ম্বিত। নববর্ষ আমাদের মস্তবড়ো উৎসবের দিন।

পল্লীঅঞ্চলে নববর্ষের শুরুতে মেলা বসে। শিশুরা খেলনা কিনিয়া আনে, নাগর-দোলায় দোলে, বিচিত্র আনন্দানুষ্ঠানে মাতিয়া উঠে। বুড়োরা সংবৎসরের জন্য মাটির বাসন, নানারকমের রবিশস্য, বেতের ও বাঁশের ডালা-কুলা, লোহার ও কাঠের নানা ব্যবহার্য উপকরণ সব কিনিয়া রাখে। চৈত্রমাসের শেষ দিনটিতে গাজন ও শিবের পূজা হয়। চড়কের উপসংহারও নববৎসরের একটি অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। কোনো কোনো অঞ্চলে শিবের গাজন ও গম্ভীরা-গান হইয়া থাকে।

পয়লা বৈশাখে সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে ব্যবসায়ীদের হালখাতা-উৎসব। বিচিত্র-সুন্দর উপকরণে দোকানঘর সাজাইয়া গণেশপূজা ও আনুষঙ্গিক মঙ্গলানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া এই উৎসব সম্পন্ন হয়। নিমন্ত্রিত খরিদ্দারগণ দোকানে আসিয়া বাকি মিটাইয়া দিয়া মিষ্টি খাইয়া ফিরিয়া যায়। ভিখারীভোজনে, নাচেগানে, আনন্দমুখরতায় সমগ্র পরিবেশটি মনোমদ হইয়া উঠে। এই নূতন বৎসরের পুণ্যদিনে গৃহস্থরাও বহুবিধ অনুষ্ঠান পালন করেন। সর্বত্রই সহজ অবারিত আন্তর প্রীতির বন্যা বহিয়া যায়; সকলের মুখেই প্রফুল্লতার উজ্জ্বল দীপ্তি।

অধুনা এই উৎসবের ধারা কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। এই শহরঅঞ্চলে ইহা অনেকটা রাষ্ট্রীয় উৎসবের ভঙ্গিতে সম্পন্ন হয়। ইংরেজী বৎসরের শুরুতে যেমন ফৌজের কুচকাওয়াজ হইয়া থাকে, তেমনি সামরিক কায়দায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ মার্চ করিয়া, রণবাদ্য বাজাইয়া শহর পরিক্রমা করে, এবং ময়দানে বা অন্যকোনো নির্দিষ্ট জায়গায় জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানায়। রাজ্যপাল এই উৎসবে সরকারীভাবে যোগ দেওয়ায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সক্রিয় উৎসাহে ইহা একটি নূতন মর্যাদা লাভ করিয়াছে। বেসরকারী বহু সঙ্ঘ প্রভাতফেরী বাহির করিয়া পথে পথে নূতন আশা-উদ্দীপনার বাণী গাহিয়া বেড়ায়, এবং জাতীয় পতাকা পুরোভাগে রাখিয়া এই নগর-পরিক্রমা চলিতে থাকে।

একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, পল্লী ও শহরঅঞ্চলের অতীত ও বর্তমান কালের—নববর্ষের উৎসবপদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা বেশ চোখে পড়ে। পূর্বে গ্রামাঞ্চলে এই উৎসব ছিল খানিকটা ধর্মীয় পূজা-অর্চনা-জাতীয় আচরণ ও খানিকটা সংবৎসরের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের একটা সুযোগ। গ্রাম্যমেলার আনন্দ অতি সহজভাবে এই দুইটি বস্তুকে আড়াল করিয়া রাখিত। বর্তমানে শহরাঞ্চলে এই উৎসব জাতীয়তার ভাবধারা দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। সৈন্য বা সামরিক শক্তি জাতীয় আশা-উদ্দীপনার প্রতীক বলিয়া, বিদেশী অনুকরণে ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কুচকাওয়াজ ও জাতীয়-পতাকা অভিবাদন ইহার অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিদগ্ধ-গোষ্ঠীর আহ্বানে ও পরিচালনায় সভার অনুষ্ঠান ইত্যাদি সাংস্কৃতিক প্রয়াসও দেখা দিয়াছে। পূজার্চনা ও গৃহগত উৎসব হয়তো একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। কিন্তু ভোজ, প্রমোদভ্রমণ, নির্দিষ্ট বন্ধুদের লইয়া সমারোহ এখন লক্ষণীয় প্রাধান্য পাইতেছে।

কালচক্রের আবর্তনে সবকিছুর পরিবর্তন হইয়া থাকে, পরিবর্তমানতাই জীবনের ধর্ম। কিন্তু তবু মনে হইতেছে, উৎসবের মূলে যে-হৃদয়প্রীতির প্রাধান্য থাকে যে-শুভ্রভাস আন্তরিকতা বিদ্যমান থাকে, বর্তমানে অনেক দিক দিয়া তাহা যেন কমিয়া আসিতেছে। আমাদের নানান্ উৎসবের মতো নববর্ষের উৎসবও যেন ধীরে ধীরে কৃত্রিমতাসর্বস্ব হইয়া উঠিতেছে। 'সমারোহ-সহকারে আমোদপ্রমোদ করায় আমাদের উৎসবকলা কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় না। তাহার মধ্যে সর্বজনের আন্তরিক প্রসন্নতা ও ইচ্ছাটুকু না থাকিলে নয়'—নববর্ষের উৎসবের দিনে রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি যেন বিস্মৃত না হই। অনুষ্ঠানের সঙ্গে আন্তরিকতার সংযোগ ঘটিলেই উৎসব সার্থক হইয়া উঠে।

আমাদের সকলকেই ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উৎসবের দিন সংসারের অন্যান্য দিন হইতে স্বতন্ত্র—প্রতিদিনের জীবন হইতে সরিয়া আসিয়া এই বিশেষ দিনটিকে বরণ করতে হয়। নতুবা ইহার মধ্যে যে নির্মল আনন্দের স্পর্শ রহিয়াছে তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। পয়লা বৈশাখ জীবনের পথে নূতন উদ্যমে যাত্রা শুরু করিবার দিন। ইহাকে সর্বপ্রকার আবিলতা হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে, অন্তত একটি দিনের জন্য সকলের সঙ্গে প্রাণের যোগে নিজেকে ধন্য করিয়া তুলিতে হইবে—তবে মধুস্রাবী হইয়া উঠিবে আমাদের সর্বসাধারণের জীবন।

দেশভ্রমণ ঃ ইহার উপকারিতা

(মানুষের সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া শিক্ষার ধারাটি প্রবাহিত। বয়সের বিশেষ একটা সীমারেখার মধ্যে শিক্ষাকে আবদ্ধ করা যায় না। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, দেশের বিদ্যানিকেতনকে কেন্দ্র করিয়াই সাধারণ মানুষের শিক্ষাজীবন আবর্তিত হয়। আবার বিদ্যার্থীরা সেখানে যে-শিক্ষালাভ করে তাহা প্রধানত পুঁথিগত ও সংকীর্ণ, বাস্তবের সঙ্গে ওই শিক্ষার এবং অর্জিত জ্ঞানের তেমন প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ নাই। এজন্য শিক্ষা ও বিদ্যার মধ্যে সচরাচর দুস্তর একটা ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। বাস্তব-সম্পর্ক-বিরহিত কোনো বিদ্যাই জীবনে যথার্থ ফলপ্রসূ হইয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং ইহাকে অসম্পূর্ণই বলিতে হইবে। পরোক্ষ জ্ঞানকে ফলপ্রদ করিয়া তুলিতে হইলে আমাদের আর-একটি জিনিসের সহায়তা গ্রহণ অবশ্যপ্রয়োজন—এই জিনিসটি হইল দেশভ্রমণ। পাশ্চাত্ত্য দেশে ভ্রমণকে শিক্ষারই একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে ধরিয়া লওয়া হয়। ইংলণ্ডে-আমেরিকায় শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসমাপনের পর দেশভ্রমণে বাহির হইয়া পড়ে। তাহাদের বিশ্বাস দেশভ্রমণ না করিলে শিক্ষার সত্যতাই অনুভূত হয় না।)

বহির্বিশ্বকে নিজের চোখে দেখিয়া যে জ্ঞান আমরা আহরণ করিতে পারি, প্রাচীরবেষ্টিত স্কুলকলেজের মধ্যে তাহা অর্জন করা কখনো সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট একটা বয়স পর্যন্ত মাত্র বিশেষ একরকমের শিক্ষাই সেখানে দান করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বৃহত্তর পৃথিবীকে দেখিবার সুযোগ-সুবিধা লাভ করে না। বিদ্যানিকেতনে আমরা ইতিহাস পড়ি, বিজ্ঞান পড়ি, ভূগোল পাঠ করি, এবং এই রকমের আরো নানা শাস্ত্র আমাদিগকে অধ্যয়ন করিতে হয়। কিন্তু পুঁথির পাতা হইতে যে-জ্ঞান ও ধারণা জন্মায় তাহা অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ। ইহাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক দেশভ্রমণ। ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোলের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়াইয়া আছে। বহির্ভ্রমণের প্রত্যক্ষতা ও দৃশ্যমানতার সাহায্যে উহারা যখন সত্যতর হইয়া উঠে, কেবল তখনই অধীত বিদ্যা চরিতার্থতা লাভ করে। বিচিত্র মানবসমাজ, বিচিত্র প্রাণী, বিচিত্র বস্তুপুঞ্জের কথা বইয়ের পাতায় মুদ্রিত থাকে। এগুলিকে আমরা চিন্তা দিয়া, বুদ্ধি দিয়া জানি মাত্র। কিন্তু বাহিরের জগতে পরিভ্রমণকালে এসব বস্তুকে যখন আবার নানা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করি তখন পূর্বের জানাটি কতখানি বাস্তব হইয়া উঠে। এজন্যই দেশভ্রমণ সর্বথা শিক্ষার বিশেষ একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত।)

(অন্যদিকে, নিজের সীমিত গৃহের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকার ফলে আমাদের মন ও হৃদয় সংকুচিত হইয়া আসে, ইহাতে চিত্তের স্বাভাবিক প্রসারের

গতিটি ব্যাহত হয়। প্রাত্যহিক জীবনের নানা সংকীর্ণতা ও গ্লানি তখন জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ক্ষুদ্র স্বার্থ, গ্লানিময় আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষকে যখন ঘিরিয়া ধরে তখন তাহার অন্তরতর সত্তা মরিতে বসে, তখন মানুষের 'ছোট-আমি' তাহার 'বড়ো-আমি'কে অস্বীকার করে। এই রকমের একটি অবস্থা মানুষের পক্ষে অপমৃত্যুর সমান।) গ্রাম্যজীবনে আমরা যে নিরন্তর হানাহানি ও দলগত বিবাদ-বিসংবাদ দেখিতে পাই, তাহা এই মানসিক সংকীর্ণতার জন্য। পল্লীর মানুষ দীর্ঘকাল ধরিয়া একটি জায়গায় আবদ্ধ হইয়া থাকে, কেবল নিজের গ্রামটিকেই তাহারা সত্য বলিয়া জানে—বহিঃপৃথিবীর বিপুল প্রাণস্পন্দনের ক্ষেত্র হইতে তাহারা একেবারে বিচ্ছিন্ন। তাহাদের মনের এই সংকীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতাকে বিদূরিত করিতে পারে বহির্বিশ্বে ভ্রমণলব্ধ সজীব অভিজ্ঞতা।

পল্লীর মানুষ অন্তত একবারও যদি কিছুকালের জন্য দূরবর্তী দেশ দেখিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে নূতন দেশের নূতন শিক্ষা, নূতন সঙ্গ, নূতন আচার-ব্যবহার-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা তাহার মনগড়া বিচারের ক্ষেত্রটিকে অবশ্যই উদার করিয়া তুলিবে। মানসিক উন্নতি ও জীবনদৃষ্টির প্রসারসাধনের জন্য দেশভ্রমণ সত্যই অপরিহার্য। আমরা যতক্ষণ বদ্ধ ঘরে থাকি ততক্ষণ আমাদের ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র দুঃখ বড়ো হইয়া দেখা দেয়, সামান্য কারণেই আমরা নিজেকে পীড়িত ও ব্যথিত মনে করি। কিন্তু পৃথিবীর দূরবিস্তার প্রাণলোকের প্রেক্ষাপটে নিজেকে যখন আমরা দেখি তখন সেই ক্ষুদ্রতাতুচ্ছতা কোথায় মিলিয়া যায়। জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের বিচিত্রতাকে উপলব্ধি না করার মতো দুর্ভাগ্য মানুষের জীবনে আর-কিছুই নয়। বিস্তীর্ণ মানব-সমাজের পটভূমিকায় আপনাকে উপলব্ধি করিতে না পারিলে মানুষের মাত্রাজ্ঞান জন্মায় না, মানুষে-মানুষে দূরত্বের আড়ালটি মুছিয়া যায় না। ইহার জন্য প্রয়োজন ভ্রমণের—বিদেশ না হোক, অন্তত স্বদেশভূমির নানা জায়গায়।)

দেশবিদেশে ভ্রমণের ফলে শুধু যে আমাদের শিক্ষালাভ হয় তাহা নয়, ইহাতে আমরা বিচিত্র অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করিয়া থাকি। যে-মানুষ জাতির মুক্তিপথের প্রদর্শক হইবেন, যে-মানুষ দেশের জনগণকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিবেন, যিনি হইবেন জাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ, তাঁহার পক্ষে বহির্বিশ্বভ্রমণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির সহিত বিশেষভাবে তাঁহাকে পরিচয়সাধন করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল, রাধাকৃষ্ণন্ প্রমুখ মনীষীদের বিদেশভ্রমণজনিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে দেশের মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে। দেশবিদেশে ভ্রমণের ফলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও আনন্দসঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কবির রচিত 'রাশিয়ার চিঠি', 'জাপানযাত্রীর ডায়েরী', 'পারস্যভ্রমণ', 'পথের সঞ্চয়' প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থ হইতে।

ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিল্প প্রভৃতিকে উন্নত করিতে গেলেও দেশের ব্যবসায়ীকে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিককে বিদেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে। এইসব

ক্ষেত্রে শুধু দেশের চিরাচরিত প্রথাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে চলিবে না। বিভিন্ন দেশের অগ্রগতির সঙ্গে সমান পদক্ষেপে চলিতে না পারিলে দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে পারে না। ইহার ফলে জাতির দারিদ্র্য বাড়িবে, জনগণের জীবনমান নীচু হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে বিদেশভ্রমণের সার্থকতা বর্তমানে আমরা কিছুটা যেন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। আজকাল সরকার, বড়ো বড়ো ব্যবসায় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ধনী মালিকের অর্থসাহায্যে এদেশের অনেক শিক্ষিত যুবক ভারতের বাহিরে যাইবার সুযোগ লাভ করিতেছে।

দেশভ্রমণ হইতে আমরা যে কেবল শিক্ষালাভ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি তাহা নয়, ইহার আরো একটি উপকারিতা আছে। তাহা হইল—আনন্দ। বছরের পর বছর ধরিয়া একই পরিবেষ্টনীর মধ্যে কালাতিপাত করার জন্য আমাদের হৃদয়মন নূতনত্বের অভাবে ক্লান্ত ও নিরানন্দ হইয়া উঠে। তখন ইহা চায় বাহিরের আলোবাতাস, বাহিরের রঙ, বাহিরের সুর। বাহিরকে জানিবার কৌতূহল, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতি সম্পর্কিত সীমাহীন জিজ্ঞাসা মানুষের মনে চিরজাগ্রত। প্রাত্যহিকতার পুনরাবৃত্তির মলিনতা হইতে হৃদয় আর মনকে মুক্তি দিতে হইলে আমাদিগকে বহিঃ-পৃথিবীভ্রমণের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু মানুষই মানুষকে সঙ্গ ও আনন্দ দান করে না, এই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতিও মানুষের চিরকালের সঙ্গী—মানুষকে ঘিরিয়া নিরন্তর চলিয়াছে নিসর্গলোকের আনন্দলীলা।

বিজ্ঞানের আবিষ্কারে দেশভ্রমণ বর্তমানে সহজতর হইয়া উঠিয়াছে, এবং ইহার জন্য অধিক আর্থিক অর্থব্যয়েরও প্রয়োজন হয় না। এই সুযোগ আমাদের প্রত্যেকেরই গ্রহণ করা উচিত। কূপমণ্ডুকতা যেমন অভিপ্রেত নয়, তেমনি কেবল অর্থসঞ্চয়ই মানুষের জীবনের বড়ো কাম্য জিনিস নয়। মানুষ প্রকৃতির অবারিত প্রসন্ন সান্নিধ্য লাভ করুক, দেশে দেশে মানবকীর্তির স্বাক্ষরগুলিকে চিনিয়া লউক, তবেই দেখা দিবে তাহার জীবনের সার্থকতা। মানুষ যে কত বড়ো, তাহার শক্তি যে কী বিপুল, মরণশীল হইয়াও যে মানুষ মৃত্যুঞ্জিৎ, ভ্রমণ ব্যতীত একথার সত্যতা উপলব্ধি করা তাহার পক্ষে কখনো সম্ভব নয়।

সবাক চলচ্চিত্র : সমাজজীবনে ও জাতীয় জীবনে ইহার প্রভাব

আধুনিক বিজ্ঞানের বড়ো একটি দান সবাক চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রের সঙ্গে একালের নাগরিক জীবনের এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ছোট-বড় শহরে যাঁরা বাস করেন তাঁদের সকলেই নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অনুভব করে থাকবেন যে, চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান ক্রমশ সর্বস্তরের জনচিত্তের ওপর কতখানি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এককথায় বলা যায়, এর আকর্ষণ দুর্বার। রঙ্গমঞ্চের আবেদনের জৌলুসও আজ চলচ্চিত্রের কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। বর্তমানে আমাদের বাঙালি-জীবনে দুর্গতিলাঞ্ছনার অন্ত নেই, আমরা দারিদ্র্যক্লিষ্ট। বহুতর অভাব দেশে দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে, জিনিসপত্রের দাম হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনি দুপুরে কিংবা সন্ধ্যায় একটি চলচ্চিত্রগৃহের সম্মুখে দাঁড়ান, দেখতে পাবেন, সেখানে জনারণ্যের সৃষ্টি হয়েছে ; টিকিটঘর থেকে আরম্ভ করে ফুটপাতের বহুদূর পর্যন্ত কত মানুষ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে—বালকের দল, কিশোরের দল, প্রৌঢ়ের দল, শ্রমিক-মজুর—বাদ কেউ নেই। যুদ্ধের দিনে রেশনের দোকানেও এত ভিড় আপনারা কখনো কেউ দেখেননি।

রাস্তায় হাঁটুন, দুপাশের দেয়ালগুলির দিকে তাকান, দেখবেন, কত বিচিত্র রকমের পোস্টার দেওয়ালের গায়ে মারা রয়েছে—জনপ্রিয় চিত্রতারকাদের মুখচ্ছবি সেখানে প্রতিবিম্বিত। আপনার বাড়ীতে পুরানো দৈনিক সংবাদপত্রের ফাইল যদি থাকে তাহলে বিজ্ঞানের পৃষ্ঠাগুলো একনজরে দেখে যান ; নিশ্চয়ই আপনার চোখে পড়বে, চলচ্চিত্রসম্পর্কিত মনোহর বিজ্ঞাপনের আয়তন দিনের পর দিন কীরূপ স্ফীত হয়ে উঠেছে। শুধু সিনেমাজগৎকে নিয়েই আজকাল কতকগুলি চিত্তাকর্ষক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এইসব পত্রিকা দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে ঘুরছে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে কতরকমের তর্কবিতর্ক চলছে—ট্রামে-বাসে-রেস্টুরেন্টে-পার্কে। এতেই সহজে উপলব্ধি করা যায়, ছায়াচিত্রের আকর্ষণ অপ্রতিরোধনীয়। সবাক চলচ্চিত্র নাগরিক সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে বললে মোটেই অত্যুক্তি করা হয় না।

চলচ্চিত্রের এই অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণ নির্দেশ করা মোটেই কঠিন-কিছু নয়। শহরে মানুষের জীবন কীরূপ কর্মব্যস্ত, কতখানি যান্ত্রিক, তা কাকেও বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সবাই রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে জীবিকার সন্ধানে। কাজের ঘূর্ণীপাকে পড়ে এখানে মানুষগুলি প্রতিমুহূর্তে আবর্তিত হচ্ছে, সমস্ত দিনের মধ্যে এতটুকু বিশ্রাম তাদের নেই। নিদারুণ কর্মব্যস্ততার পর তারা

যখন বাড়ী ফেরে তখন তাদের সকল দেহমন শ্রান্ত-ক্লান্ত—অবসাদগ্রস্ত। এরূপ অবস্থায় মন স্বভাবতই কিছুটা আনন্দ পেতে চায়, চিত্তবিনোদনের সামগ্রী খুঁজে ফেরে, আমোদ-প্রমোদের অভিলাষী হয়ে ওঠে। চিত্তের সজীবতা-প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনতে হবে, অথচ অধিক অর্থব্যয় করার মতো সামর্থ্য অনেকেরই নেই। এমন একটি পরিস্থিতিতে অল্পখরচায় দুদণ্ডের আনন্দ-আহরণের বাসনা নিয়ে স্বল্পবিত্ত মানুষ সব ছোটে শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলির অভিমুখে।

অবশ্য শ্রান্তি-অপনোদনের জন্যই যে সকলে সিনেমা দেখতে যায় তা নয়। অভিনয়, নাচ-গান আর বহুবিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যের সহজ একটা আকর্ষণও তো রয়েছে। ছায়াচিত্রে এসমস্তকিছুই মেলে, এবং সামান্য অর্থব্যয়ে। তাছাড়া, বৃষ্টিবাদলার দিনে, কন্‌কনে ঠাণ্ডা ও শীতের সময়ে খেলার মাঠে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে, পার্কে, নদীতীরে আনন্দ-সঞ্চয়ের মানসে আশ্রয় নেওয়াটা তেমন নিরাপদ নয়। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে সকালে-দুপুরে সন্ধ্যায় রাত্রিতে—যে কোন সময়েই দুঘণ্টা-আড়াইঘণ্টা কাল নিশ্চিন্তে নিরাপদে কাটিয়ে দেওয়া যায়, এতটুকু অসুবিধে নেই। এসব কারণে বৈচিত্র্যপিপাসু আনন্দআকাঙ্ক্ষী শহরবাসী মানুষের পক্ষে পর্দার কদর আজ এতখানি বেড়ে গেছে, তাই প্রেক্ষাগৃহগুলিতে প্রতিদিন অজস্র মানুষের মিছিল। সকল বয়সের, সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের, মানুষকে আনন্দ যোগাতে পারে চলচ্চিত্র। সংবাদপত্র, রেডিও এবং ছায়াছবি —এগুলিকে বাদ দিলে নাগরিক জীবন যে অনেকখানি বিস্বাদ হয়ে পড়বে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বস্তুত নারীপুরুষ, বালকবৃদ্ধ, ধনীনির্ধননির্বিশেষে প্রভূত আনন্দপরিবেশনের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের সঙ্গে অপর কোনো শিল্পের তুলনা হয় না। চোখের আর মনের তৃপ্তিসাধনের শক্তি এর অসাধারণ। কিন্তু এ সত্যটি ভুললে চলবে না যে, সিনেমার মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা শুধু চিত্তবিনোদনের জন্যে নয়। শিল্পের সৃষ্টি মুখ্যত আনন্দদান বা মনোরঞ্জনের জন্যে হলেও, গৌণভাবে শিল্প সমাজকল্যাণবিষয়ে একেবারে উদাসীন থাকতে পারে না। আর্টের ওপর কেবল আনন্দাভিলাষী কিংবা রসিকচিত্তের নয়, বৃহত্তর সমাজেরও একটা দাবী রয়েছে। শিল্পের কাছ থেকে মানুষের প্রথম পাওনা হলো আনন্দ, আর, উপরি পাওনা হলো শিক্ষা—বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ। অভিনয়-নৃত্য-সংগীত-চিত্র ইত্যাদি একসময় এদেশে লোকশিক্ষার বাহন ছিল। যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, কবিগান প্রভৃতির সঙ্গে পল্লীর মানুষমাত্রেই পরিচিত। পল্লীজীবন থেকে নানাকারণে আজ আমরা দূরে সরে আসতে বাধ্য হয়েছি, এখন সকলেই ভিড় করছি শহরে; সে-কারণে পূর্বতন লোকশিক্ষামূলক তথা আনন্দপরিবেশনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে এযুগে আমাদের পরিচয় একরূপ নেই বললেই চলে। বর্তমানে ওইসব প্রতিষ্ঠানের স্থান গ্রহণ করেছে রঙ্গমঞ্চ, রেডিও, সংবাদপত্র, ইত্যাদি —বিশেষ করে সবাক চলচ্চিত্র। জনমত গঠনে, শিক্ষাপ্রচারে, জনসাধারণের রুচিনিয়ন্ত্রণে এসকল প্রতিষ্ঠানের অশেষ ক্ষমতা। ব্যাপক প্রচারের জন্যে শিক্ষিত মনের ওপর সংবাদপত্রের প্রভাব অসামান্য। কিন্তু একহিসেবে এই ক্ষেত্রে

ছায়াচিত্রের প্রভাব ব্যাপকতর। তার কারণ হলো, ছায়াচিত্র আনন্দের মাধ্যমে প্রচারণার কাজে অগ্রসর হয়, আমোদপ্রমোদের সহায়তায় মনকে সজোরে নাড়া দিয়ে দর্শকের দৃষ্টিকে বিশেষ কোনো শিক্ষণীয় বিষয়ের দিকে তুলে ধরে। অশিক্ষিতের কাছে সংবাপত্র মূল্যহীন। কিন্তু নিরক্ষর মানুষও ছায়াচিত্র থেকে কিছু-না-কিছু শিক্ষার খোরাক পায়। সুতরাং চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতাবিচারে সমাজসেবার প্রশ্নটি অবান্তর মোটেই নয়।

সিনেমাকে যদি এযুগের নাগরিক সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাহলে বলবো, এর দায়িত্ব কম নয়। সার্থক শিল্পহিসেবে একে সুন্দরের দাবী মানতে হবে—আর্টের মর্যাদা রক্ষা করে চলতে হবে; এবং জনকল্যাণের বাহনরূপে একে লোকশিক্ষার অন্যতম সহায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এদেশের চলচ্চিত্রপ্রতিষ্ঠানের মালিকগণ এই সমস্ত ব্যাপারে একরূপ উদাসীন। সিনেমা তাঁদের কাছে শিল্পরূপে বিবেচিত নয়, সামাজিক দায়িত্বের কথা একবারও তাঁরা ভেবে দেখেন বলে মনে হয় না,—সিনেমার ব্যবসায়িক দিকটিই তাঁদের কাছে একমাত্র বিবেচ্য। উক্ত মালিকগণের এহেন মনোভঙ্গির ফলে শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলি অধুনা সমাজজীবনে ও জাতীয় জীবনে ক্রমাগতই দুষ্টপ্রভাব বিস্তার করে চলেছে। সেখানে যে সকল চিত্র সাধারণত প্রদর্শিত হয় তাতে সুস্থ সবল জীবনাদর্শের কোনো প্রতিবিম্ব নেই, মানুষের মহৎ বৃত্তিগুলির রূপায়ণ নেই, চরিত্রমহিমা নেই, বাস্তবজীবনের বিশ্বস্ত প্রতিফলন নেই, অভিনয়ে-নৃত্যে-সংগীতে নেই কোনো উচ্চতর শিল্পসুষমার প্রকাশ। বেশীর ভাগ চিত্রের অবলম্বন প্রেমকাহিনী, অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর ঘটনা কিংবা সমাজবিরোধী কার্যকলাপ। কিন্তু এসকল ঘটনা মহত্তর জীবনের প্রতি কোনো ইঙ্গিত বহন করে না, নিত্যকালীন মানবসত্যের পরিচয় দেয় না—কেবল অসুস্থ মনোবিকার, মানুষের হীনতম প্রবৃত্তির স্পর্ধিত বিদ্রোহ, ইন্দ্রিয়ের দস্যুতা, অসুন্দরের কদর্য মুখভঙ্গিমার দিকেই দর্শকের সকল মন ও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

মানবচরিত্রের ওপর এর প্রতিক্রিয়া সত্যই বিষময়। সিনেমাতে গিয়ে যে অর্থ আমরা ব্যয় করি তার প্রতিদানে আমরা কী পাই? পাই নিজেদের পশু-প্রকৃতিকে জ্বালিয়ে তোলবার ইন্ধন, পাই বহুকালের কল্যাণপ্রদ সমাজ-বন্ধনকে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাকে ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করার অশুভ প্রেরণা, পাই কুশ্রীতার ক্লেদপঙ্কিল স্পর্শ। ফল কী দাঁড়াচ্ছে—প্রতিনিয়ত নিজেদের আমরা বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী করে ফেলছি, শুভংকর মনুষ্যত্বের উচ্চাদর্শ হতে স্খলিত হয়ে ধীরে ধীরে নৈতিক অধঃপতনের গহ্বরে প্রবেশ করছি। দিন দিন হারিয়ে ফেলছি সৌন্দর্যবোধ, সমাজবোধ, ধর্মবোধ, এতে ক্ষিন্ন হচ্ছে আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মানবধর্ম। আপনারা এরূপ সন্দেহ পোষণ করবেন না, আমরা নীতিবাগীশ। চলচ্চিত্র-রঙ্গমঞ্চকে নিশ্চয়ই আমরা নরক বলে মনে করি না। সত্যকার আর্টকে যে স্বাগত জানাতে পারে না, মানুষ-নামের

অযোগ্য সে। কিন্তু আর্টের গঙ্গাজল ছিটিয়ে অস্বাস্থ্যকর সমাজবিরোধিতা, অশ্লীলতা, নোঙ্‌রামি, ভাঁড়ামি আর বীভৎসতাকে নির্বিচারে গ্রহণ করতে রাজী আমরা নই। সুন্দরের বেদীতে কদর্যতার হুঙ্কারজনক উলঙ্গ-উদ্দাম নৃত্য অসহ্য। কুরুচিপূর্ণ নিকৃষ্টশ্রেণীর চলচ্চিত্র মালিকদের অর্থাগমের পথ সুগম করে তুলেছে, কিন্তু গোটা জাতীয় জীবনকে ঠেলে দিচ্ছে শোচনীয় অপমৃত্যুর দিকে।

সিনেমা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে কতখানি পঙ্গু করে দিচ্ছে তার একটুখানি ইঙ্গিত দিই। আজকালকার তরুণ সম্প্রদায়ের দিকে লক্ষ্য করুণ, অনেকেরই সাজ-পোশাক, চলনবোলন, ভাবভঙ্গি সিনেমাগন্ধী। এদের কাছে এই বিশাল পৃথিবীতে প্রেক্ষাগৃহগুলিই একতম সত্য বস্তু। এতকাল আমরা মহামানবকে, জাতীয় বীরকে, ইতিহাসের মহৎ চরিত্রকে, আদর্শ পুরুষকে, আনন্দলোক-বিচরণকারী শিল্পস্রষ্টাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি-পূজা নিবেদন করে এসেছি। কিন্তু এদের কাছে পূজা পায় একমাত্র চিত্রতারকা-বৃন্দ—ছায়াচিত্রজগতের বাহিরে আর কিছুরই যেন অস্তিত্ব নেই। সিনেমার কাহিনী, সিনেমার গান, সিনেমাবিষয়ক আলাপআলোচনা, তর্কবিতর্ক নিয়েই এরা মেতে রয়েছে। চলচ্চিত্রের নিপুণ অভিনেতা-অভিনেত্রীকে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা অবশ্যই আমরা দেব, যথাস্থানে তাঁদের অভিনন্দন জানাব। এতে আপত্তির কিছুই নেই, বিপদেরও কোনো সংগত কারণ নেই। বিপদ সেখানে, যেখানে চিত্রতারকাবৃন্দের স্বপ্ন দেখা ছাড়া অন্যকিছু আমরা ভাবতে পারি না, চিন্তা করতে পারি না। এরূপ একটি অবস্থা আমাদের মানসিক দৈন্যের সূচক বলেই শোচনীয়। এর আশু প্রতিকারের পথ চিন্তনীয়।

ইচ্ছা থাকলে, স্বার্থবুদ্ধির একটুখানি উর্ধ্বে নিজেদের তুলে ধরতে পারলে, দেশের প্রেক্ষাগৃহগুলিকে আবিলতামুক্ত আনন্দদানের ও নানামুখী-শিক্ষা-প্রচারের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত করা যায়। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে তাই করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এই বিপুল বিশ্বসংসারে মানুষের কতকিছু দেখবার জানবার শিখবার রয়েছে। স্কুলকলেজে বই পড়ে, শিক্ষকদের মুখে শুনে, আমরা কতটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করি? আর, আমাদের দরিদ্র দেশের কয়জনই বা শিক্ষালাভের সুযোগ পায়? বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল ধরে পাঠ নিয়েও যা আমরা শিখতে পারি না, উত্তম চলচ্চিত্র থেকে তা সহজেই শেখা যায়। পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে মানবসংসার ও প্রকৃতিলোকের সর্ববিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করা কোনো মানুষের পক্ষেই একজীবনে সম্ভব নয়। কিন্তু চলচ্চিত্রের সাহায্যে বড় পৃথিবীকে আমরা হাতের মুঠোয় পেতে পারি, রুদ্ধদ্বার প্রেক্ষাগৃহের একটি চেয়ারে বসে দুঘণ্টা-আড়াইঘণ্টা সময়ের মধ্যে গোটা দুনিয়ার নানা বস্তু, নানা দৃশ্যের ওপর আমরা অবলীলায় চোখ বুলিয়ে যেতে পারি। এমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় আর কোন উপায়ে সম্ভব? সার্থক চলচ্চিত্র দূরকে কাছে এনে দেবে, অদেখাকে চাক্ষুষ করাবে, অপরিচিতকে পরিচয়ের আলোকে উজ্জ্বল করে তুলবে, অজানাকে জানাবে। সবকিছুকে নিজের চোখে দেখে, জগতের অশ্রুত বাণীকে নিজের কানে শুনে আমরা কৃতার্থ হব। ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান,

দিকে দিকে বিকীর্ণ অজস্র শিল্পসম্পদ, প্রকৃতির সৃষ্টি আর মানুষের অতন্দ্র সাধনার প্রত্যক্ষ সৃষ্টিকে জীবন্ত করে তুলতে পারে একমাত্র সবাক চলচ্চিত্র। এর সম্ভাবনার সীমা নেই।

শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ পরিবেশনের যোগসূত্র ঘটিয়েছে প্রগতিশীল দেশগুলির চলচ্চিত্র। অথচ আমরা কত পিছনে পড়ে রয়েছি! হাল্কা আমোদপ্রমোদ, ঠুনকো রঙ্গকৌতুক, সস্তা দেশাত্মবোধের পরিচিত বুলি, বাস্তব সম্পর্কবিরহিত ক্লেদে আকীর্ণ প্রেমকাহিনী, অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর ঘটনার চমক—এই তো আমাদের চলচ্চিত্রের পুঁজি। অচিরে এগুলির মোহ আমাদের কাটাতে হবে, রূঢ় বাস্তবের মধ্যে পদক্ষেপ করতে হবে, অবাস্তব স্বপ্নকল্পনার রঙিন ফানুশ না উড়িয়ে বহুসমস্যাকণ্টকিত সমাজজীবন ও জাতীয় জীবনের দিকে সকলেরই দৃষ্টি সংবদ্ধ করতে হবে। চলচ্চিত্রের দায়িত্ব অনেকখানি। ভালো বই পর্দায় দেখানো হলে দর্শকদের অভাব নিশ্চয় হবে না। চিত্র পরিচালকেরা জেনে রাখুন, উৎকৃষ্ট জীবনচিত্র দেখবার সুযোগ পেলে জনসাধারণ কখনো নিকৃষ্ট রসের দিকে ঝুঁকবে না। দেশের মানুষের রুচির জন্যে তাঁরাই যে অনেকখানি দায়ী, এ সত্য উপলব্ধি করবার সময় এসেছে।

মোটকথা, চলচ্চিত্রশিল্পকে সমাজকল্যাণের বাহন করে তুলতে হবে, জনচিত্তবিনোদন ও লোকশিক্ষাকে একসূত্রে গ্রথিত করতে হবে। সোভিয়েট রাশিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে একসঙ্গে এই দুটি কাজ সুচারুরূপে সম্পাদিত হচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শকদের জন্য বিভিন্ন রকমের চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে—স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে যে-ব্যবস্থা, শ্রমিক-মজুরের জন্যে সে ব্যবস্থা নয়। শিক্ষাপ্রচারের ক্ষেত্রে শিল্পকর্ম কতখানি সহায়তা করতে পারে, উক্ত দেশগুলির দিকে তাকালে তা উপলব্ধি করা যায়। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের উদ্যমপ্রচেষ্টা থাকা চাই, রাষ্ট্র উদাসীন হলে জাতীয় জীবনের অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। সিনেমার প্রচারমূল্য সর্বজনস্বীকৃত, উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির লোকশিক্ষার সার্থক বাহন হতে কোনো বাধা নেই। চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি, জনচিত্তের ওপর এর প্রভাব কতখানি তাও খুব ভালোরকমে জানি। আমাদের আন্তরিক কামনা, চলচ্চিত্র সত্যকার জাতীয় শিল্পের গৌরবদীপ্ত মর্যাদা লাভ করুক, শ্রান্তক্লান্ত নরনারীর অন্তরে অনাবিল আনন্দের ধারা প্রবাহিত করে দিক, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের অগণিত মানুষকে পরিচালিত করুক শুভ্রভাস মহত্তর জীবনের পথে।

শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষা

(ইংরেজ-কর্তৃক ভারতবিজয় শুধু যে রাজনীতিক ঘটনাহিসাবেই বিশেষ একটি অর্থপূর্ণ ব্যাপার তাহা নয়, ইহার প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবনে যেমন গভীর তেমনি ব্যাপক। ইংরেজচিত্তের সহিত সংস্পর্শের মধ্য দিয়া আমাদের মনে লাগিয়াছে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার ছোঁয়া—ইহারই ফলে আমাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আসিয়াছে আশ্চর্যরকমের একটা রূপান্তর।) বণিকের মানদণ্ড একদিন এদেশে শাসকের রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল। দেশশাসনের গুরুভারের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব। ব্রিটিশের এই দায়িত্ববোধের মূলে যে প্রেরণা ছিল তা অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক, সুতরাং সেই প্রেরণাকে বলা যায় স্বার্থগন্ধী। অর্থাৎ শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশ্য ছিল বিজিত জাতির মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করা নয়, তাহার লক্ষ্য ছিল আমলাতন্ত্ররূপ সুষ্ঠু পরিচালনা। (আমাদের রাজপুরুষদের ভাষা ছিল ইংরেজি। সুতরাং দেশীয় লোকের মধ্যে ইংরেজিশিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন দেখা দিল।)

(উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকের) দিকে ইংরেজিশিক্ষা ও সভ্যতার ধারা এ দেশে বিশেষভাবে প্রসারলাভ করিতে থাকে। কিন্তু তাহার পূর্ব হইতেই আমরা পাশ্চাত্ত্য মানসিকতার সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। ইহার ফলে দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সভ্যতার পরস্পর পরিচয় ঘটিতে থাকে। য়ুরোপীয় চিত্তের সংঘাতপ্রভাবে ভারতীয় সমাজজীবন ও জাতির চিত্তে একটা নবজাগরণের সাড়া জাগিয়াছিল। নানাকারণে বাঙালির মানসলোকে ইহার প্রভাব গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গেল।)

য়ুরোপীয় (শিক্ষাবিস্তারের) সেই যুগসন্ধিক্ষণে শিক্ষার মাধ্যম লইয়া নানা মতভেদ দেখা দিল। (শিক্ষার বাহনহিসাবে কেহ চাহিল দেশীয় ভাষা, কেহ চাহিল আর্যভাষা সংস্কৃত; আবার, কেহ চাহিল ইংরেজ-রাজপুরুষের ভাষা ইংরেজি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার ব্যাপারে মেকলে সাহেবের প্রচেষ্টাই সার্থক হইল।) ভারতের রাজনীতিক স্বাধীনতা বিধ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও মেকলে সাহেব যেন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, তিনি চাহিলেন সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিজিত জাতিকে পরাভূত করিয়া সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিবর্জিত করিতে। মেকলের এই সর্বনাশা উদ্যমের তাৎপর্য সেদিন দেশবাসী উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

(ইহার পর হইতে শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরেজি ভাষা এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, শিক্ষার ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইল একটি নূতন ধারা। এইভাবে শিক্ষার রূপ বদলাইয়া গেল, ধীরে ধীরে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইল —য়ুরোপীয় ভাবধারার প্রভাবে আমরা আচ্ছন্ন হইয়া গেলাম।

(আমাদের জাতীয় জীবন ও সাহিত্যে একদিন হয়তো পাশ্চাত্ত্য চিত্তসংঘাতের প্রয়োজন ছিল। কারণ, আমরা বাস করিতেছিলাম সংকীর্ণ একটি জগতের মধ্যে।) তাহার বাহিরে যে-বিরাট মানবসভ্যতার ধারা ইতিহাসের বিবর্তনপথে প্রবাহিত হইতেছিল তাহা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার অগোচর ছিল। আমাদের সংস্কারদুষ্ট আচার ও অন্ধবিচারের অচলায়তনকে বিধ্বস্ত করিল য়ুরোপীয় মনের জঙ্গম শক্তি। তাহার ফলে (বাঙ্‌লাদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে আসিয়াছিল 'রেনেসাঁস' বা পুনর্জাগরণ।) কিন্তু তখনো আমাদের সুপ্তির ঘোর সম্পূর্ণ কাটে নাই, উজ্জীবনমন্ত্র তখনো আমরা উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করিতে পারে নাই।

(মনের ও প্রাণের আচ্ছন্ন অবস্থায় লাভক্ষতির হিসাবনিকাশ করা তখন সম্ভব ছিল না) য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোতে তখন (অবাধে আমরা গা ভাসাইয়া দিয়াছিলাম।) কিন্তু আজ আমরা সেই যুগপ্রভাব কাটাইয়া অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছি। (এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি, ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়া যে-শিক্ষা আমরা লাভ করিয়াছি তাহা আমাদিগকে যতটুকু মুগ্ধ করিয়াছে ততটুকু সঞ্জীবিত করে নাই) ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রচারের চেষ্টা যে ফলপ্রসূ হয় নাই, আমাদের জাতীয় জীবনে তাহা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে তাহার প্রমাণ, একটি শতাব্দী চলিয়া গেল তবু এই দুর্ভাগা দেশের শতকরা পনরো জন লোকও নিজেদের শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিতে পারে না। জাতির যে মুষ্টিমেয় ভগ্নাংশ ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহারাও সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে পারে নাই—জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে তাহারা পরগাছাতুল্য। (দেশের জনসাধারণের বৃহত্তম অংশ অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় আমাদের জাতীয় জীবন আজ কলঙ্কিত।)

(এই শিক্ষা ব্যর্থ হইল কেন? ইহার প্রধান কারণ, আমরা অদ্যাবধি মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করিয়া তুলিতে পারি নাই) যথার্থ বাহনের অভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। (পৃথিবীর প্রত্যেকটি সভ্যদেশে জনসাধারণের মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন।) কিন্তু ভারতবর্ষে বিজাতীয় একটি ভাষা দেশবাসীর মাতৃভাষাকে তাহার স্বস্থান ও স্বাধিকার হইতে দূরে ঠেলিয়া দিয়া শিক্ষাকেন্দ্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। (রাজনীতিক কারণে একদিন ইংরেজি ভাষার যে-একটা বিশিষ্ট গৌরব ছিল,) আমরা তথাকথিত শিক্ষিতসম্প্রদায় এখনো উহাকে কাম্য ভাবিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেছি। ইংরেজি ভাষার প্রতি মোহ আজ পর্যন্ত আমরা—ভারতবাসীরা—কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই।

(শিক্ষাসমস্যা এদেশে জটিল রূপ ধারণ করিয়াছে) নানা বাদবিসম্বাদের পর এতদিনে মাত্র মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই আমরা মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিয়া তুলিতে পারিয়াছি। (উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার দ্বার এখনো রুদ্ধ) মাতৃভাষার মাধ্যম ব্যতীত যথাযোগ্য শিক্ষাপ্রচার ও জ্ঞানবিস্তার যে বস্তুত অসম্ভব তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। (শিক্ষার ক্ষেত্রে এতখানি মানসিক

শক্তির অপচয় শুধু আমাদের এই হতভাগ্য দেশেই সম্ভব। এই অপচয় কেবল মানসিক নয়,—আত্মিক, আর্থিক এবং দৈহিক শক্তিরও বটে। এমন একদিন ছিল, যেদিন ইংরেজি শিখিয়া, পরীক্ষায় পাশ করিয়া, আমরা সরকারী দপ্তরখানায় অফিসে চাকরি পাইতাম। আজ সেই সুবিধাও নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে। আমরা এখন পরীক্ষায় পাশ করি, কিন্তু বিদ্যার আলো পাই না, উদরান্নের সংস্থান করিতে পারি না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই যেখানে আমাদের লক্ষ্য সেখানে পাঠ্যবিষয় আমরা গলাধঃকরণ করি মাত্র—তাহা হইতে শক্তি ও রস আহরণ করিতে পারি না। ভোজ্যবস্তুকে দেহের জারকরসের সাহায্যে রক্তে পরিণত করিতে না পারিলে যেমন স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতে হয়, শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের সেই অবস্থা দেখা দিয়াছে।

ভাষা শুধু ভাবের বাহন নয়—মাতৃভাষার ভিতর দিয়া জাতির প্রাণসত্তাটিও প্রকাশ ও বিকাশ লাভ করে। যে-ভাষায় শৈশব হইতে আমরা ভাববিনিময় করি, যে-ভাষার সঙ্গে আমাদের আবাল্য পরিচয় তাহাকে বাদ দিয়া বিজাতীয় ভাষাকে শিক্ষা ও জ্ঞান-প্রচারের বাহন করিলে শক্তির অপচয় সুনিশ্চিত। মাতৃভাষার প্রত্যেকটি শব্দের সঙ্গে আমাদের যেন নাড়ীর সংযোগ রহিয়াছে, সেই যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে আমাদের বুদ্ধি ও বোধশক্তি স্বাভাবিকভাবে পঙ্গু হইতে বাধ্য।

পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতির প্রতি আমরা কটাক্ষপাত করিতেছি না। বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রসারের জন্য ভিন্নজাতির জ্ঞানবিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন আছে কিন্তু বিদেশী ভাবধারাকে গ্রহণ করিতে হইবে নিজ ভাষার ভিতর দিয়া—তখনই আহৃত বস্তু সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠিয়া থাকে।

ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করিতে গেলে স্কুলকলেজ ও বিদ্যালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কিন্তু আধুনিক বিদ্যাশিক্ষা-অর্জন-ব্যাপারে আর্থিক ব্যয়বাহুল্য কাহারও অবিদিত নয়। দরিদ্র দেশের কয়জন শিক্ষার্থী এত অর্থব্যয়ে এই উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ? এমন অনেক ছাত্র দেখা যায়, মাতৃভাষায় যাহাদের রহিয়াছে অদ্ভুত-রকমের দখল অথচ তাহারা ইংরেজি ভাষা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না। ইংরেজিভাষার উপর অধিকারের অভাবজনিত অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশ হইতে কি চিরকালই তাহাদের ফিরিয়া আসিতে হইবে?

তাই আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীবৃন্দ মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে কাতর চিত্তে আবেদন জানাইয়াছিলেন। যে-শিক্ষা দেশের মানুষকে মানুষ করিয়া তুলে না, যে-শিক্ষা আমাদের অন্তর্মুখী মনকে ক্রমশ বহির্মুখী করিয়া তুলিতেছে, যে-শিক্ষার ফলে আমরা 'দেশদেখা চোখ' হারাইতেছি, সেই শিক্ষার আমূল সংস্কারসাধন করিতে না পারিলে আমাদের জাতীয় জীবনে কল্যাণ নাই। আমাদের শিক্ষাজীবনে ও ব্যবহারিক জীবনে, বিদ্যায় ও ব্যবহারে আনিতে হইবে সামঞ্জস্য—এই সামঞ্জস্যবিধান করিতে পারে একমাত্র মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য।

(মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার বিরুদ্ধে অনেকে এইরূপ আপত্তি জানান যে আমাদের ভাষা দুর্বল,) ইহার শব্দসম্ভার পরিমিত, উচ্চচিন্তা ও বিচিত্র ভাবকে ধারণ করিবার সামর্থ্য ইহার নাই। (তা ছাড়া, আমাদের মাতৃভাষার ভাণ্ডারে নাকি জ্ঞানের সাহিত্যের একান্ত অভাব।) এসব যুক্তি যে বালসুলভ তাহা সহজেই বুঝা যায়—'টাকা জমাইবার আগে কোন্ বুদ্ধিমান মানুষ টাকার থলি প্রস্তুত করে?' উপরি-উক্ত যুক্তি-তর্কের প্রত্যুত্তর আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় দিতে পারি: 'আমরা রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখস্বীকার করি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগেনি বললে কম বলা হয়। (শিক্ষা-সরস্বতীকে শাড়ি পড়ালে আজো অনেক বাঙালি বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে।)

(নানা পরাজয়ের গ্লানির হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে) সাতসমুদ্র-তেরোনদীর(ব্যবধান ঘুচাইতে হইলে, মাতৃভাষাকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার বাহন করিয়া তুলিতে হইবে।) তবেই আমাদের চিন্তার দৈন্য, বুদ্ধিবৃত্তির নাবালকত্ব ঘুচিবে। (যেদিন আমরা ইংরেজী ভাষার মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিব সেদিনই ভারতে আসিবে আবার একটি 'রেনেসাঁস'—পুনর্জাগরণ; তাহার মধ্য দিয়াই আজিকার আত্মবিস্মৃত জাতি নিজের লুপ্ত সংবিৎ ও স্বাতন্ত্র্য ফিরিয়া পাইবে।)

আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা

[এক ঝটিকাক্ষুব্ধ রাত্রির ভয়াবহ অভিজ্ঞতা]

মানবজীবন অবিরল ঘটনাপ্রবাহে ভাসমান। বহুবিচিত্র ঘটনার ছোটবড়ো তরঙ্গাভিঘাতে মানুষের চেতনালোক প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে আন্দোলিত-আলোড়িত হচ্ছে। বহির্লোকের ঘটনার আবর্ত যেখানে নেই সেখানে আমাদের প্রাণচেতনাও স্তিমিত। কিন্তু অনন্তমুহূর্তের অন্তহীন ঘটনার সবগুলিকে আমরা স্মরণে রাখি না। অনেকগুলির ওপর বিস্মৃতির যবনিকা পড়ে, কতকগুলি মনের অবচেতন স্তরে আত্মগোপন করে; আর, অতীতের দু-একটি বিশেষ ঘটনা আমাদের স্মৃতিলোকে এমন অক্ষয় চিহ্ন মুদ্রিত করে যায় যে, জীবনে তাদের আমরা ভুলতে পারি না—তারা অবিস্মরণীয়। 'চিত্তের বিচিত্র অনুভূতিকে আশ্রয় করে তারা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে, ক্ষণে ক্ষণে জাগ্রত চেতনাকে ধাক্কা দিয়ে যায়, মুহূর্তে মৃত অতীত যেন প্রত্যক্ষগম্য বর্তমানের মতো একেবারে জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যেক মানুষের চিত্ত-

দেশে এরূপ স্মরণীয় ঘটনার স্বাক্ষর চিহ্নিত রয়েছে। তাদের কোনোটি আনন্দের, কোনোটি বেদনার, কোনোটি-বা আতঙ্কের।

আমার জীবনের যে স্মরণীয় ঘটনাটি এখানে আমি বাণীবদ্ধ করতে যাচ্ছি তা ভয়াবহ। তার শঙ্কামিশ্র স্মৃতি এখনো আমাকে মাঝে মাঝে কেমন যেন বিহ্বল করে তোলে, সমস্ত চিত্তদেশ নিমেষে কম্পমান বিবর্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সেই সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ, সেই ঝঞ্ঝামথিত দুর্যোগময়ী রাত্রি, সেই রুদ্রপ্রকৃতির উন্মাদ নৃত্য, সেই আতঙ্কপাণ্ডুর অভিজ্ঞতা! এসব মিলিয়ে যে অনুভূতি, তা ভুলবার নয়।

কিছুকাল পূর্বের ঘটনা। কলকাতা শহরে এসেছি পড়তে। একবার পূজোর ছুটিতে দেশে—চাটগাঁয়—গেছি। ছুটির অর্ধেকটা নিজগ্রামে নানান্ আমোদপ্রমোদে কাটিয়ে দিলাম। তারপর হঠাৎ একদিন মনে ইচ্ছা জাগলো, ছুটির বাকি-কয়টা দিন গ্রামের বাইরে কাটাবো—বেশ কিছুটা দূরে; সঞ্চয় করবো অদেখা জায়গায় বেড়ানোর নতুন অভিজ্ঞতা। বিচিত্রের স্বাদ কে না পেতে চায়? বৈচিত্র্যজনিত আনন্দের আকর্ষণ, দূরের ডাক, কাকে না চঞ্চল করে তোলে? আমিও চঞ্চল হয়ে উঠলাম। স্থির করলাম, সমুদ্রপথ অতিক্রম করে কয়েক দিনের জন্যে এক বিরল-বসতি দ্বীপের অধিবাসী হব। আপনারা হয়তো জানেন, চাটগাঁ থেকে কিছুটা দূরে কয়েকটি দ্বীপ রয়েছে। তার মধ্যে কুতুবদিয়া একটি। ওখানে পৌঁছতে খুব বেশী সময় লাগে না। চট্টগ্রামশহর থেকে মাত্র ছয়-সাত ঘণ্টার পথ, স্টীমারে ভাড়াও অল্প। ছেলেবেলাকার দুজন প্রাণোচ্ছল বন্ধুকে নিয়ে কুতুবদিয়ায় গিয়ে পৌঁছালাম।

কুতুবদিয়া। অনন্তপ্রসারিত বঙ্গোপসাগরের বিশাল অঙ্কে মসীবিন্দুর মতো ছোট্ট একটি ভূখণ্ড। দ্বীপটি জনমানবশূন্য নয়, তবে দূরে দূরে স্বল্পলোকের বসতি। এখানে শিক্ষিত মানুষের অস্তিত্ব একরূপ নেই বললেই চলে। বাসিন্দাদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর চাষী-মুসলমান আর জেলে এবং তাঁতি। প্রায় সকলেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট। কঠোর কায়িক পরিশ্রমে যে-দুপয়সা রোজগার করে তাতেই কোনো-রকমে তাদের সংসার চলে। পাকাবাড়ি কাকে বলে, তা এরা জানে না। কাঁচামাটির অথবা বেড়ার ঘরই বেশি—খড়ের ছাউনি। কদাচিৎ টিনের ছাউনি চোখে পড়ে। একটি ইস্কুল আছে, আর আছে সরকারের খাসমহল বা কাছারি. এবং একটি পোস্টাপিস ও থানা।

যে বাড়িটিতে আমরা উঠলাম তা কাঁচামাটি দিয়ে তৈরী, ওপরে টিনের আচ্ছাদন। চারদিকে অনেক দূর পর্যন্ত লোকজনের বসতি নেই, সম্মুখে অন্তহীন সমুদ্র দিকচক্রবালে মিশে গেছে, সুনীল জলরাশি দিনরাত তরঙ্গায়িত হচ্ছে। ডাইনে-বাঁয়ে-পিছনে বালুর চর। কেবল আমাদের বাড়িটির পূর্বদিকে খানিকটা জায়গা জুড়ে বিরাজমান রয়েছে কতকগুলি আমগাছ, অনেকগুলি সুপারিগাছ আর একটি মস্তবড়ো বটগাছ। প্রকৃতির সংসার কতখানি নির্জন নিস্তব্ধ ও সুগম্ভীর হতে পারে, এখানে না এলে তা ঠিক উপলব্ধি করা যাবে না। এ স্থানটিতে শিক্ষা ও

সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত মানুষের সঙ্গ সুলভ নয়, আধুনিক জীবনযাত্রার উপযোগী উপকরণও এ জায়গায় মিলবে না। দিগন্তপ্রসারী নীল সমুদ্র, উদার আকাশ ও সাদা ঝক্‌ঝকে বহুবিস্তীর্ণ বালুচরই এখানে মানুষের সবচেয়ে বড়ো সঙ্গী। এখানকার আদিম প্রকৃতির প্রীতিস্নিগ্ধ আতিথ্য শহরবাসীদের কাছে লোভনীয়ই মনে হবে।

প্রকৃতিলালিত এহেন একটি জনবিরল দ্বীপে উপযুক্ত আকাশ-বাতাস-সমুদ্রের সঙ্গে সহজ সখ্য পাতিয়ে আমরা তিন বন্ধুতে সপ্তাহখানেক খুব আনন্দে কাটালাম ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো ভাবনামুক্ত মন নিয়ে সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াতে কী যে ভালো লাগতো তা ভাষায় প্রকাশ করা একরূপ অসম্ভব। সকালে উদয়লগ্নে পূর্বাকাশে সূর্যকে দুচোখ ভরে দেখে নিতাম। পশ্চিম-আকাশটিকে গলিত স্বর্ণে পরিপ্লাবিত করে দিয়ে সন্ধ্যার মুহূর্তে সূর্য দূর দিগন্তে মিলিয়ে যেতো—তাও নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখতাম। সবচেয়ে ভালো লাগতো শুক্লপক্ষের রাত্রিতে জ্যোৎস্নালোকিত জনশূন্য বালুচরটির দৃশ্য। জেলেরা সামুদ্রিক মৎস্য ধরে সেই চরে বিছিয়ে রাখতো। একরকমের মাছ আছে, তাদের গায়ে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস, সেগুলো রাত্রিবেলা এক উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করতো। সমুদ্রবিহঙ্গ পাখার ঝাপটায় দশদিক সচকিত করে দল বেঁধে তীব্র গতিবেগে কোথায় চলে যেতো—দেখে মনটা উদাস হয়ে উঠতো। নৌকা ভাসিয়ে, জেলেদের নিকটতম সান্নিধ্যে এসে, পর্যাপ্ত অবকাশের মধ্যে নির্ভাবনায় ঘুরে বেড়ানোর কাজ নিয়ে সেই অশ্রান্তকলমন্দ্রিত ক্ষুদ্রপরিসর দ্বীপটিতে দিনগুলি বেশ কাটছিল। কিন্তু স্বপ্নালু, মাধুর্যমণ্ডিত, আনন্দচঞ্চল ওই মুহূর্তগুলির স্মৃতিকে শেষ পর্যন্ত মানসপটে অক্ষয় রেখায় মুদ্রিত করে রাখতে পারলাম না। এক ভয়াল প্রাকৃতিক দুর্যোগের শঙ্কাতুর অনুভূতি একদিন অকস্মাৎ তাদের কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল। এখন সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথাই বলি।

কার্তিক মাস। কালিপূজার দু-একদিন পরে। যেদিনকার ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছি সেদিন সকালবেলা থেকেই আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করে কয়েকবার বৃষ্টিও হয়ে গেছে। সমস্ত প্রকৃতির মুখে কেমন একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্য। সূর্য মেঘে ঢাকা পড়েছে, এলোমেলো বাতাস বইছে, নিসর্গলোকের প্রসন্নতা হতে সকলেই বঞ্চিত। ধীরে ধীরে বেলা গড়িয়ে গেল, বিকেল হয়ে এলো। বৃষ্টি ধরে গেছে। বালুচরে সামান্য কয়েকজন মানুষ আনাগোনা করছে। প্রকৃতির বিরূপতাকে উপেক্ষা করে সাহসী জেলের দল সমুদ্রবক্ষে কিন্তু নৌকা ভাসিয়েছে। মাছ তাদের ধরতেই হবে, না হলে পরের দিন তাদের অন্ন জুটবে না। আমরা তিনবন্ধু ঘর ছেড়ে সম্মুখে চরে এসে বসলাম। সমুদ্রে অনেকগুলি নৌকা ভাসমান, অনেক দূরে একখানি ছোট্ট স্টীমারও চোখে পড়লো, চিমনির কালো ধুঁয়ো উড়িয়ে দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছে। সন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসছে। প্রকৃতি প্রসন্ন বটে, কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে তেমন কোন লক্ষণীয় অশান্তভাব দেখা যায়নি।

কিন্তু ক্ষণপরেই সমস্ত প্রকৃতিলোকে সহসা এক অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আকাশের এককোণে বহুদূর পর্যন্ত এক অস্বাভাবিক রক্তাভার বিচ্ছুরণ

দেখা গেল। বাতাসের গতিবেগ তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠল, ঘনকৃষ্ণ পুঞ্জপুঞ্জ মেঘ নভোদেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম ঝড়ো হাওয়ার তীক্ষ্ণ একটানা শোঁশোঁ শব্দ—ক্ষুব্ধ ঝটিকায় উন্মত্ত গর্জন। দেখতে দেখতে বাত্যাতাড়িত মহাসমুদ্র সংক্ষুব্ধ হয়ে এক প্রলয়ংকর মূর্তি ধারণ করল, লক্ষ লক্ষ ফেনিল তরঙ্গের রুদ্রনৃত্য শুরু হল। মনে হচ্ছিল, কে যেন এক সঙ্গে কোটি কোটি শঙ্খের মুখে ফুৎকার হান্‌ছে। প্রমত্ত সমুদ্রের তরঙ্গগুলি যেন এক-একটি চলমান পর্বত, দানবীয় আক্রোশে ছুটে আসছে তটভূমির দিকে, আছ্‌ড়িয়ে পড়ে বুঝি তারা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে মাটির পৃথিবীর সবকিছুকে। এতক্ষণ বর্ষণ ছিল না, তাও আরম্ভ হল। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎবহ্নি ঝলসিত হয়ে গোটা আকাশটাকে যেন বিদীর্ণ করে দিতে চাইল। উর্ধ্বে নিম্নে, ডাইনে-বাঁয়ে, সম্মুখে পশ্চাতে—যতদূর দৃষ্টি চলে দেখা যায় শুধু জমাটবাঁধা নীরন্ধ্র অন্ধকার, শোনা যায় আতঙ্কবিহ্বল দ্বীপটির অশান্ত আর্তনাদ।

ঘরে এসে আমরা দরজার কপাট বন্ধ করে দিলাম। ঝড়ের দুরন্ত ঝাপটায় জানালাদুয়ার কেঁপে কেঁপে উঠছে, দুর্বার শক্তিতে এক বিপুলকায় দুর্ধর্ষ দানব বুঝি বাড়িটার ঝুঁটি ধরে নাড়া দিচ্ছে। বাড়ির পিছনের বটগাছ-আমগাছ-সুপারিগাছগুলি শিকলিবাঁধা আহত অতিকায় পাখীর মতো কেবল ছটফট করছে। ঝটিকা-শিলাবৃষ্টি-বজ্রধ্বনির সমবেত রুদ্রসংগীত—এ কী ভীষণ দুর্যোগময়ী রাত্রি! আকাশ-সমুদ্র-পৃথিবী অন্ধকারে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে প্রচণ্ড মরণের করাল মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। ক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝার তাড়নে আমাদের ঘরের জানালার কপাট খসে পড়ল, তারপর আর-একটি আচমকা ধাক্কায় মাথার ওপরের টিনের ছাউনি হতে কয়েকখানি টিন চক্ষের নিমিষে কোথায় অদৃশ্য হল। সাংঘাতিক বিপদ গণলাম। বাড়িতে আমরা তিনটি প্রাণী ও সেখানকার অধিবাসী একজন আধবয়সী ভৃত্য ছাড়া অন্য কেউ ছিল না; ভৃত্যটি এ পর্যন্ত নানাকথা বলে আমাদের মনে সাহস যোগাচ্ছিল। হঠাৎ বাইরের দিকে তাকিয়ে সে চীৎকার করে বলে উঠল: বেরিয়ে আসুন, বেরিয়ে আসুন, পুলিশথানার দিকে চলুন—একমুহূর্তও দেরি নয়। সীমাহীন শঙ্কায় আমাদের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, কী এক অজ্ঞাত ভয়ে সমস্ত শরীর থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে। যেদিকে সমুদ্রতীর তার বিপরীত দিকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম, ভৃত্যটিকে অনুসরণ করে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। মিনিট দশপনেরো পরে বজ্র-বিদ্যুৎ-বৃষ্টিধারা কোনোকিছুকেই ভ্রূক্ষেপ না করে, সিক্তদেহে থানার সম্মুখে এসে পৌঁছালাম। জায়গাটি অনেক উঁচু। সেখানে আমাদের মতো বিপদ্‌গ্রস্ত আরো অনেকগুলি মানুষ এসে জড়ো হয়েছে। থানার বড়বাবু সকলকে ঘরের প্রশস্ত বারান্দায় শান্তভাবে অবস্থান করতে বললেন। দূরে বাতিঘরে রক্তবর্ণ এক অদ্ভুত আলো জ্বলে উঠেছে—নিদারুণ বিপদের সংকেত। সমুদ্রে জলস্ফীতি, পর্বতাকার দু-তিনটি ঢেউ আসলেই চরটিকে—গোটা দ্বীপটিকে—একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আচম্বিতে পর্বতপ্রমাণ দুটি ঢেউয়ের প্রচণ্ড আবির্ভাব আমরা অনুভব করলাম, বিদ্যুতের শিখায় উন্মাদিনী সমুদ্রপ্রকৃতির

তাণ্ডবনৃত্য পাংশু দৃষ্টিতে দেখে নিলাম। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চোখ বুজলাম। অকম্পিত চিত্তে সমুদ্রের এই প্রলয়ংকর রূপ দেখবে এমন সাহস, মানসিক স্থৈর্য ও শক্তি কারো ছিল না।

অনেকটা মূর্ছাহত অবস্থায় থানার বারান্দায় সমস্ত রাতটি কাটালাম। ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর হিম হয়ে গেছে। কখন সকাল হয়েছে জানতে পারিনি, সেই ভৃত্যের ডাকে চেতনা ফিরে এলো। তার মুখে শুনলাম, মাঝরাত্রেই ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হয়ে এসেছিল, বৃষ্টির প্রচণ্ডতাও কমে গিয়েছিল। কিন্তু ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রের গোঙানি এখনো থামেনি। সূর্যের মুখ দেখা গেল, আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ক্ষণে ক্ষণে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। যা হোক, থানার আশ্রয় ছেড়ে সকালবেলা আমাদের পূর্বতন আশ্রয়ে ফিরে এলাম। ঘরের তিনটি দেয়াল খসে পড়ছে, একটিমাত্র দেয়াল কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে। চরের দৃশ্যটি বীভৎস, অবর্ণনীয়। কত কত গোরু-মোষ-ছাগলের মৃতদেহ সেখানে পড়ে রয়েছে। জলের ধারে অনেকগুলি ভাঙা নৌকা ও জেলেদের শব ভেসে বেড়াচ্ছে। জেলেপাড়ার ছেলে-মেয়ে-পুরুষ-নারী বিপযস্ত চরটিতে উপস্থিত হয়েছে বাড়ি-না-ফেরা নিজেদের স্বামীপুত্রের সন্ধানে। কী অসহায় তাদের দৃষ্টি, কী মর্মচ্ছেদী বুকফাটা ক্রন্দন!

প্রকৃতি কতখানি নিষ্ঠুরা, কতখানি ভয়ংকরী হতে পারে এ ধারণা পূর্বে একেবারেই ছিল না। সেই করাল রাত্রিতে নিসর্গসংসারের অন্তরালস্থিত অন্ধ জড়শক্তির সর্ববিধ্বংসী ভীষণ রূপটি প্রত্যক্ষ করলাম। দুরবগাহ এই প্রকৃতিরহস্য। সে কখনো শান্তিময়ী—স্নেহশীলা জননীর মতো কোমলা, সুখদা, প্রাণদা, আবার, কখনো সে বিভীষিকাময়ী—দয়া নাই, মায়া নাই, নির্মমহৃদয়া। এই সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ—'পাশাপাশি একঠাঁই দয়া আছে দয়া নাই'- এ কি দুই দেবতার লীলাখেলা, না, একই দেবতার বিশ্বলীলার দ্বৈত প্রকাশ, তা মানববুদ্ধির অগম্য।

সে যাক্। ঝড় থামল, সমুদ্র শান্ত হল, সোনালী রোদের ছোঁয়ায় পৃথিবীর মুখে আবার হাসি ফুটল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। সেই দিনটি অপরের আশ্রয়ে কাটিয়ে পরের দিন স্টীমারে চেপে চাটগাঁ-সদরের দিকে রওনা হলাম। বিপদ কাটলেও তার আতঙ্কটা কিন্তু মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি।

তিনচার বছর হল দ্বীপে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখনো মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগমুহূর্তে অতীতের সেই ঝটিকাক্ষুব্ধ রাত্রিটির ভয়াবহ অভিজ্ঞতার স্মৃতি মনে জাগে—তাকে কিছুতেই ভুলতে পারি না।

বাঙলার শ্রেষ্ঠত্ব

বাঙালি জাতি আজ অতীতভ্রষ্ট, আত্মবিস্মৃত। কিন্তু প্রদীপ্ত মনীষা, ভাবসাধনা ও কর্মসাধনার ক্ষেত্রে বাঙালি যে একদিন ভারতবর্ষে একটা গৌরবমণ্ডিত স্থান অধিকার করিয়াছিল, বঙ্গভূমির অতীত ইতিহাস তার সাক্ষ্য প্রদান করে। অতীতে বাঙালি জাতি তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে-কীর্তিস্তম্ভ রচনা করিয়াছিল, নিখিল ভারতবর্ষ আনত মস্তকে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছে। রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক নানা ভাগ্যবিপর্যয়ে বর্তমানে আমরা আমাদের সেই অতীত গৌরব হারাইতে বসিয়াছি বহুতর সংঘাতে বাঙালির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। কিন্তু আমরা যদি বিগত দিনের ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে আমাদের পুনরুজ্জীবনের মন্ত্রটিকে খুঁজিয়া লইতে পারি, তবে আমাদের হৃত গৌরব নিশ্চয়ই আবার ফিরিয়া পাইব—জগৎসভায় পুনর্বার আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিব।

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, ধর্মে-দর্শনে, চারুকলায় ও কারুশিল্পে, শৌর্যে ও বীর্যে একদিন বাঙালির মহিমা ছিল দূরবিস্তার। ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন গ্রন্থেও 'বঙ্গ'-দেশের নাম চিহ্নিত হইয়া আছে। সেই প্রাচীনকালেই বাঙালির বীরত্ব ও জ্ঞানগরিমার কথা দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙলার বীর সন্তান কত দেশ-বিজয়ে বাহির হইয়াছে—ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া দূরবর্তী অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। রাজা ধর্মপাল, রাজা গণেশ, রাজা শশাঙ্ক এবং বিজয় সিংহের কীর্তিকাহিনী বাঙালির বিপুল শৌর্যের পরিচয় বহন করিতেছে। মুসলমান-আমলে বাঙলার বীরসন্তান চাঁদ-প্রতাপ-ঈশা খাঁ প্রভৃতি বারভূঞার দল যে-অমিত পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছে তাহাতে প্রবলপ্রতাপান্বিত দিল্লীশ্বরের সিংহাসন পর্যন্ত বারে বারে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশযুগে বাঙালি জাতি নানা কারণে হীনবীর্য হইয়া পড়িয়াছিল—সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল তাহার সমস্ত শক্তি। তথাপি পরাধীন ভারতকে স্বদেশমন্ত্র ও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছে স্বাধীনতার পূজারী বাঙলার তরুণদল—হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে তাহারা জীবনের জয়গান গাহিয়া গিয়াছে। এই সেইদিন বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীরসন্তান সুভাষচন্দ্র তাঁহার আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়া সামরিক শক্তি ও সাহসিকতার যে-পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা অমর হইয়া থাকিবে।

জ্ঞানের চর্চায় এবং ভাবসাধনায় বাঙালি কোনো জাতি অপেক্ষা পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। প্রোজ্জ্বল মনীষা ও ক্ষুরধার বুদ্ধির জন্য বাঙালি জাতি সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। ভারতের বিশ্রুত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন এই বাঙলা-দেশেরই একজন মানুষ, নাম শীলভদ্র। বাঙালি অতীশ দীপংকরের খ্যাতিও বিদ্বজ্জনসমাজে সুপ্রচারিত ছিল। বাঙলার জ্ঞানসাধনাকে তিনিই বহন করিয়া লইয়া

গিয়াছিলেন সুদূর তিব্বতে। 'দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ, স্মৃতিতে রঘুনন্দন এবং তৎপরগামিগণ' বাঙ্‌লাভূমির গৌরবকে উজ্জ্বল ও মহীয়ান করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীতেও যুগমানব শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্মসাধনা ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের গভীর দর্শন-আলোচনা ভারতবর্ষকে বিস্মিত করিয়াছে।

ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও বাঙালির দান সামান্য নহে। বাঙ্‌লার ধর্মাবতার শ্রীচৈতন্য সর্বভারতীয় বৈষ্ণবধর্মকে বাঙালির হৃদয়রসে নিষিক্ত করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন—বাঙ্‌লায় বহিয়া গেল প্রেমধর্মের দুকূলপ্লাবী বন্যা। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সাধনা য়ুরোপের বহু মনীষীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। আবার, এই রামকৃষ্ণই ছিলেন ভারতের মর্মবাণীর প্রচারক যুগমানব বিবেকানন্দের দীক্ষাগুরু। অধ্যাত্মশক্তিতে দীপ্যমান বিবেকানন্দ শুধু বঙ্গভূমির গৌরব নন, তিনি সনাতন ভারতবর্ষেরই মরণজয়ী সন্তান। রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রমুখ ধর্মবীরের আবির্ভাবে বাঙ্‌লাদেশ ধন্য হইয়াছে।

বাঙালিপ্রতিভার আশ্চর্য প্রকাশ ও বিকাশ দেখা যায় তাহার অত্যুজ্জ্বল সাহিত্য-সাধনায়। আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে গৌরবমণ্ডিত স্থানলাভ করিয়াছে। বাঙালি তাহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে-সুমহান ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সত্যই মহিমাদীপ্ত। একালের বাঙ্‌লা সাহিত্যের পিছনে রহিয়াছে আমাদের সহস্র বৎসরের সাহিত্যসাধনার ইতিহাস। বাঙ্‌লার প্রাচীন কবি জয়দেব, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবি আপন আপন সৃষ্টিসম্ভারে বাঙ্‌লার সাহিত্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল, বিহারীলাল ইত্যাদি কবিদল আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে নববাণীগঙ্গার স্রোতোধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বাঙ্‌লা সাহিত্যকে হাজার বছরের পরমায়ু দান করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রের মতো কথাশিল্পীকে লাভ করিয়া যে-কোনো জাতি আপনাকে ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করিত।

বিজ্ঞানচর্চাতেও বাঙালি কম প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সত্যই বাঙালির শ্লাঘার বস্তু। ডক্টর মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর গবেষণা ও আলোচনায় বিশ্বের বিজ্ঞানভাণ্ডার নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালি সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র যে-রাষ্ট্রনীতিকে জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাঙালি জাতির মর্যাদা অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছে। বাঙালির সমুন্নত চিন্তাধারার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া মহামতি গোখেল বলিয়াছিলেন: 'What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow'। ভাবসাধনা ও উচ্চচিন্তার ক্ষেত্রে বাঙালি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষকে পথ দেখাইয়াছে।

চারুশিল্প এবং কারুকলার জগতেও বাঙালির দান অসামান্য নয়। চিত্রে ও ভাস্কর্যে বাঙালি যে-প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে অত্যুচ্চ। প্রাচীন বাঙ্‌লার শিল্পী ধীমান এবং বীটপালের খ্যাতি একদিন বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাদের প্রবর্তিত শিল্পরীতি ভারতের বাহিরেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ অজন্তার গিরিগুহাগাত্রে বাঙালি শিল্পীর তুলিকার চিহ্ন আজ পর্যন্ত সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। আধুনিকযুগে ভারতীয় চিত্রশিল্পে পুনর্জাগরণ আনিয়াছেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু। শিল্পের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় নৃত্যশিল্পের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়াছেন বাঙালিসন্তান উদয়শংকর। এই সকল প্রতিভাবান বাঙালির অজস্র দানে বাঙ্‌লার সংস্কৃতি মহিমা-মণ্ডিত হইয়াছে। বহু শতাব্দীর সাধনায় বাঙালির যে-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার নিদর্শন ভারতের বাহিরে সিংহল, শ্যাম, কম্বোজ, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও অদ্যাবধি বিদ্যমান।

একদিন বাঙ্‌লাদেশ অমেয় ধনসম্পদে সমৃদ্ধিশালী ছিল—বাঙ্‌লার বহির্বাণিজ্যের পরিধিও ছিল দেশদেশান্তরে বিস্তৃত। বাঙালি বণিকের পণ্যবোঝাই ডিঙা নানাদেশে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। বাঙালির তাঁতশিল্প, শঙ্খ ও হাতীর দাঁতের শিল্প, সূচীশিল্প পৃথিবীর নানাদেশের নরনারীর মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রাচীনকালের বাঙালি বাণিজ্যে অগ্রসর ছিল বলিয়া এদেশে চমৎকার নৌশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল।

জ্ঞানে কর্মে ধর্মে সাহিত্যে—এককথায়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বাঙালির কর্মসাধনা ও ভাবসাধনার যে-পরিচয় মিলে তাহা গৌরবমণ্ডিত। বাঙালি একদিন তাহার যে কীর্তিধ্বজা দিকে দিকে উড্ডীন করিয়াছিল, অতীত ঐতিহ্যের সেই পতাকা আজ অবনমিত। এরূপ একটি অবস্থা বাঙালির দুর্ভাগ্যই সূচিত করে। বিগত দিনের বাঙালিজাতির কীর্তিকলাপ স্মরণ করিয়া দেশপ্রেমিক বঙ্কিম কমলাকান্তের 'একটি গীত' প্রবন্ধে বলিয়াছেন : 'আমাদের এই বঙ্গদেশে সুখের স্মৃতি আছে, নিদর্শন কই? দেবপাল দেব, লক্ষ্মণ সেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ—প্রয়াগ পর্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বরের নাম, গৌড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড় কই? আর্য-রাজধানীর চিহ্ন কই? সুখ গিয়াছে, সুখচিহ্নও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে?

বাঙালি যদি তাহার মানসিক জড়তাকে ভুলিতে পারে, বিলাসশক্তি ও আলস্য পরিত্যাগ করিতে পারে, আত্মকলহ বিস্মৃত হইয়া যদি সে আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পায়, তাহা হইলে নবজাগ্রৎ জাতিহিসাবে আবার সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। আমাদের নূতন করিয়া আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য চাই অতন্দ্র সাধনা, অকুণ্ঠ স্বার্থবিসর্জন আর গভীর দেশপ্রেম— তবেই আমাদের হৃতগরিমা আমরা উদ্ধার করিতে পারিব।

অতীত ও বর্তমান বাঙলাদেশ

অতীতের দিকে যখন দৃষ্টি প্রসারিত করি তখন চোখের উপর ভাসিয়া উঠে বাঙলার একটি প্রশান্ত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল মূর্তি—বাঙলার চতুর্দিকে বহিয়া যাইতেছে সৌন্দর্য, আনন্দ, স্বাস্থ্য, সচ্ছলতা, সম্পদ ও প্রাণের উচ্ছল প্রবাহ। দূরপ্রসারী মাঠে মাঠে সোনালী ধানের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে, কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছ শীতল পুকুরে-দীঘিতে বিস্তৃত আকাশের ঘননীল ছায়া প্রতিবিম্বিত হইতেছে, আম্রবীথিতলে অলস-মধ্যাহ্নে বাঁশীর চিত্তহারী সুর বাজিয়া উঠিতেছে, আর, ঘনায়মান সন্ধ্যায় অগণিত দেবায়তনে বাজিতেছে কত কত কাঁসর-শঙ্খ ঘণ্টা।

অতীত দিনের সেই বাঙলাদেশ ছিল পল্লীবাঙলা—অজস্র পল্লীর মধ্যেই ছিল তাহার প্রাণের উৎস। বর্তমানকালে যে শহরগুলি স্ফীতকায় অজগরের মতো সমস্ত দেশকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেদিন ইহাদের দানবীয় অস্তিত্ব ছিল না। গ্রামগুলির অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে তখনো কৃত্রিমতা প্রবেশ করে নাই, আর্থিক জীবনে ভাঙন ধরে নাই—সেদিন পল্লীতে পল্লীতে স্বদেশীসমাজের রূপটি ছিল অবিকৃত। অতীতের সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীবাঙলার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও সৌন্দর্যের নির্ভুল স্বাক্ষর বহন করিতেছে বাঙালির সামাজিক উৎসবগুলি।

গ্রামের কৃষি, গ্রামের কুটীরশিল্প সেদিন বাঙালিকে আর্থিক ক্ষেত্রে সচ্ছল করিয়া তুলিয়াছিল—ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাঙালি তখনো পিছাইয়া পড়ে নাই। অতীত বাঙলার দিকে তাকাইলে শিল্পসমৃদ্ধ এই দেশের চমৎকার একটি ছবি দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠে: গ্রামের প্রবেশপথের বাহিরে উচ্চভূমিতে বসিয়া কুম্ভকার তাহার চক্রে করসঞ্চালন দ্বারা নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে; গৃহগুলির পশ্চাতে গমনাগমন-পথে কয়খানি তাঁত চলিতেছে, সেগুলির সানা বৃক্ষে ঝুলানো আছে এবং নীল, লোহিত ও স্বর্ণসূত্র, যখন বস্ত্র বয়ন করা হইতেছে তখন সূত্রের উপর বৃক্ষ হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে। পথে পিত্তলের ও তাম্রের পাত্রাদি প্রস্তুতকারীরা সশব্দে কাজ করিতেছে। ধনীর গৃহে অলিন্দে বসিয়া স্বর্ণকার ও মণিকার চারিদিকের ফল ও ফুল এবং বিকশিতশতদল পুষ্করিণীর কূলে আম্রকুঞ্জমধ্যে অবস্থিত দেবায়তনের প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্র হইতে আদর্শ লইয়া নানারূপ অলংকার প্রস্তুত করিতেছে। এই যে ছবি, ইহা আজ আমাদের কাছে স্বপ্নের মতো মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অতীত বাঙলার যথার্থ রূপটি ইহারই মধ্যে ফুটিয়া উঠে। সে-যুগের বাঙলার চাষীর ও বাঙলার শিল্পীর প্রাত্যহিক জীবনে নাগরিকতার মারাত্মক স্পর্শ লাগিতে পারে নাই বলিয়া একদিকে প্রাণময় কর্মচাঞ্চল্য, অন্যদিকে অগাধ শান্তি ও অনাবিল বিরতির মধ্যে তাহাদের দিনগুলি স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইয়াছে।

সেই বিগত দিনের বাঙালিসমাজে লোকশিক্ষা, লোকআনন্দের কোনোরূপ

অভাব ছিল না। প্রত্যেক গ্রামে টোল ছিল, চতুষ্পাঠী ছিল, পাঠশালা ছিল, মক্তব ছিল, মাদ্রাসা ছিল—স্বল্পব্যয়ে সকলেই শিক্ষালাভ করিত। পাঁচালী, কবির গান, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতির মধ্য দিয়াও দেশবাসী শিক্ষা এবং আনন্দ লাভ করিত। সে-যুগের লোকসাহিত্য কম উন্নত ছিল না। বাঙালির ধর্মে, সমাজে, আর্থিক ক্ষেত্রে সর্ব বিষয়ে একটা সহযোগিতার ভাব ছিল, পরস্পরের মধ্যে আন্তর প্রীতির আদান-প্রদান হইত। পল্লীর গানে, পল্লীর নৃত্যে, পল্লীর বিবিধ ক্রীড়াকৌতুকে, পল্লীর মেলাগুলিতে যথার্থ আন্তরিকতা ও স্বাস্থ্যের লক্ষণ সর্বত্রই ফুটিয়া উঠে। বিগত যুগে দেশের মানুষ সমস্ত জীবন ধরিয়া গ্রামের মধ্যেই বসবাস্ করিয়াছে। ধনী নির্ধন সকলেরই একান্ত সত্যবস্তু ছিল তাহাদের আপন আপন পল্লী। বাঙালির যদি কোনো সভ্যতা ও সংস্কৃতি থাকে তবে তাহাকে গ্রামীণ বলিয়াই আখ্যা দিতে হইবে।

বাঙ্‌লাদেশের সেই এক ছবি। তারপর হইল দ্রুত পটপরিবর্তন। পশ্চিমের শিক্ষা, পশ্চিমের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, পশ্চিমের শিল্পবিপ্লব আমাদের জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন আনিয়া দিল। বিদেশী কলকারখানাজাত পণ্যের প্রতিযোগিতার প্রবল বন্যার মুখে পড়িয়া বাঙ্‌লার কুটীরশিল্প ভাসিয়া গেল, এবং তাহারই ফলে দেশের কৃষিজীবনে ভাঙন ধরিল, আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার ভিত্তি আমূল নড়িয়া উঠিল—সমস্ত পল্লীসমাজ কেন্দ্রচ্যুত হইয়া পড়িল। গ্রামের শিল্পবিচ্যুত শ্রমিক নবপ্রতিষ্ঠিত শহর-গুলিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল, চাষীর আর্থিক দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতা বাড়িয়া গেল। বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে দেশের সার্বজনীন শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইতে চলিল, নবপ্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিয়া কতিপয় ভূমিবিত্তহীন বাঙালি শহরাঞ্চলে চাকরির সন্ধানে ফিরিতে লাগিল—ইহারাই জন্ম দিল বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণীর। বাঙ্‌লার শিল্প গেল, কৃষি গেল, ব্যবসায়-বাণিজ্য বিনষ্ট হইল—জাতীয় চরিত্রে দেখা দিল অবিশ্বাস্য দৈন্য ও আত্মনির্ভরশীলতার অভাব।

একদিন পল্লীগুলিই ছিল বাঙ্‌লার প্রাণকেন্দ্র, আজ ইহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে নূতন নূতন কত শহর। একদিকে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ধনিকশ্রেণী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় শহরে বাসা বাঁধিতেছে, অপরদিকে আমাদের পল্লীগুলি ক্রমশই জনবিরল হইয়া পড়িতেছে। বর্তমানে পল্লীতে পল্লীতে যাহারা বাস করে তাহাদের শিক্ষা নাই, আনন্দ নাই, স্বাস্থ্য নাই—তাহাদের সকল আশাভরসা বিনষ্ট হইয়াছে। অশিক্ষা ও কুশিক্ষা, ঘৃণ্য দলাদলি আর কুসংস্কার বাঙালির গ্রাম্যজীবনে ভয়াবহ অভিশাপ ডাকিয়া আনিতেছে। আবার, যাহারা নাগরিক জীবন যাপন করে, তাহাদের মধ্যে দেখা গিয়াছে দারিদ্র্য ও অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার গ্লানি, কৃত্রিমতা, আত্মকেন্দ্রিক অসামাজিকতার ভাব ও মূঢ় উৎকেন্দ্রিকতা।

বাঙালিজাতির অতীতের উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য বর্তমানে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেদিন রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালির প্রভূত খ্যাতি ছিল, কর্মে খ্যাতি ছিল—খ্যাতি ছিল বিশিষ্ট চিন্তা ও ভাবসাধনার ক্ষেত্রে। এযুগে সেই সার্বিক প্রতিষ্ঠা আমাদের

আর নাই। অশেষ দুঃখদৈন্য ও বেকারজীবনের ক্লেদাক্ত গ্লানি আমাদিগকে এখন প্রতিনিয়ত পীড়িত করিতেছে। এই গ্লানিকে আরো মর্মান্তিক করিয়া তুলিয়াছে হিন্দুমুসলমানের লজ্জাজনক আড়াআড়ি এবং উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুর মধ্যে বিচ্ছেদ। সাহিত্য এবং ভাষায় পর্যন্ত আজ সেই সাম্প্রদায়িকতার অসুন্দর ছায়াসম্পাত দেখা যাইতেছে।

উপরে বর্ণিত আর্থিক ও মানসিক দারিদ্র্যকে অবিরত পোষণ করিয়া যখন আমরা রিক্ততার শেষ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তখন সমগ্র বিশ্বে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাহার সর্বনাশা রূপ পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিল দরিদ্র ভারতে। নানাকারণে বাঙ্‌লাদেশেই এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে বেশী। ইহার পর দেশে দেখা দিল ভয়াবহ মন্বন্তর—উনিশ শ' তেতাল্লিশ সালে। বাঙ্‌লার পঁয়ত্রিশ লক্ষ অসহায় নরনারী একমুষ্টি অন্নের অভাবে প্রাণ হারাইল। যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের উপর নামিয়া আসিল আরো ভয়ংকর অভিশাপ—বাঙ্‌লাদেশ তথা বিশাল ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়া গেল। বঙ্গভূমির আর্থিক বনিয়াদ ইহার ফলে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। বর্তমানে আমাদের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে অভাবনীয় সংকট। আজ বাঙালির অন্ন নাই, বস্ত্র নাই—সে উপবাসী, অর্ধ-উলঙ্গ। অতীতের সোনার বাঙ্‌লার সেই সম্পদসৌন্দর্য কে অপহরণ করিল? বাঙ্‌লাজননী আজ হৃতসর্বস্বা, নগ্নিকা হইয়া উঠিয়াছে।

দিনের 'পর দিন বাঙালির বেকারসমস্যা শোচনীয় রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বঙ্গব্যবচ্ছেদের ফলে কাতারে কাতারে মানুষ সমাজজীবনের কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কত কত অসহায় নারী পুরুষরূপী হিংস্র পশুর কবলে পড়িয়া আত্মসম্ভ্রম বিনষ্ট করিয়া বুভুক্ষার তাড়নায় দেহ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। অন্যদিকে, অগণিত দরিদ্র চাষী অনিবার্য কারণে সামান্য জমিজমা বিক্রয় করিয়া দিয়া দিনমজুরে পরিণত হইয়াছে। চাষীর আজ জমি নাই, শ্রমিকের জন্য কোনো শিল্প নাই, মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের জন্য কোনো বৃত্তি নাই—বাঙ্‌লার এ কী সর্বহারা রিক্ত মূর্তি! বাঙ্‌লার সমাজজীবন আজ বিপর্যস্ত, সমগ্র বাঙ্‌লাদেশ আজ বিধ্বস্ত, বাঙালির স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছে, আনন্দ বিদূরিত হইয়াছে—তাহার সম্পদ অপহৃত, তাহার শিক্ষাব্যবস্থা পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙালির ব্যবসায়বিমুখতাও বর্তমানে তাহার সকল উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের শিল্প ও কৃষির অবস্থা শোচনীয়। সুতরাং মানুষের মতো বাঁচিয়া থাকিবার কোনো পথই আমাদের আজ খোলা নাই। এই যে জটিল সংকট-সমস্যার মুখোমুখি আসিয়া আমরা দাঁড়াইয়াছি, আমাদিগকে আজ তাহা হইতে পরিত্রাণের পথনির্দেশ দিবে কে?

এই ভয়াবহ পরিস্থিতি বাঙালির আত্মসম্বিত যদি ফিরাইয়া আনিতে পারে, নাগরিক জীবনের বিলাসমোহ ও স্বার্থান্ধ মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বাঙালি যদি

নূতনভাবে পল্লীবাঙ্লাকে চিনিয়া লইতে পারে, নিদারুণ দুঃখের মূল্যে যদি সে আত্মশক্তি লাভ করিবার প্রেরণা পায়, তবেই তাহার বাঁচিবার আশা আছে। দুঃসহ বেদনার স্পর্শে বাঙালি আবার জাগিয়া উঠুক, পল্লীসম্পদ ও অতীত ঐতিহ্যকে ফিরাইয়া আনুক,—ইহাই হয়তো তাহার ভাগ্যবিধাতার অভিপ্রায়। বাঙ্লার ঐশ্বর্যময়ী মূর্তিখানি বর্তমানের সহস্র আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া আবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, এ প্রত্যয়টুকু যেন আমরা হারাইয়া না ফেলি।

বাঙালির ভবিষ্যৎ

সমস্ত বাঙ্লাদেশ আজ বিধ্বস্ত—সমগ্র বাঙালিজাতি আজ রিক্ততার শেষ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অনশন, অর্ধাশন, ব্যাধি, মৃত্যু এদেশের দুর্গত নরনারীর প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যসহচর। বাঙালির মুখে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, চোখে নাই জীবনের দীপ্তি—তাহার চতুর্দিকে মহামরণের ছায়া ঘনায়মান। গোটা জাতির জীবনে যে একটা অবক্ষয় দেখা দিয়াছে, তাহার চিহ্ন আজ বেশ সুস্পষ্ট। তাই, দেশের কল্যাণশ্রী অবলুপ্ত, প্রাণচাঞ্চল্য স্তিমিত। এমন অসহায়তা ও রিক্ততার ভাব বাঙালির জীবনে কখনো দেখা যায় নাই। এই জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া মনে বার বার প্রশ্ন জাগে—বাঙালি কোন্ পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, বাঙালির ভবিষ্যৎ কী?

অতীতের দিকে তাকাইলে দুই চোখে ফুটিয়া উঠে সোনার পল্লীবাঙ্লার অপরূপ শ্রী। একটা সজীব শ্যামলতা ও প্রাণের অবারিত প্রাচুর্য গ্রামগুলিকে ছোট ছোট শান্তির নীড় করিয়া তুলিয়াছিল। সেইদিন বাঙালির জীবনে ছিল অখণ্ড কর্মপ্রবাহ—চিন্তায়, ভাবসাধনায়, জ্ঞানের সমুন্নতিতে বাঙালি লাভ করিয়াছিল অপূর্ব বিশিষ্টতা। রাজনীতিতে বাঙালি পাইয়াছিল ভারতব্যাপী খ্যাতি, তাহার সমাজনীতিতে ছিল বিস্ময়কর সামঞ্জস্য, আর্থিক জীবনের ছিল একটা সহজ সম্পূর্ণতার ভাব। তাহার ধর্ম, তাহার শিক্ষাব্যবস্থা, তাহার সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান অতীতে সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। শৌর্যে, বীর্যে, কর্মদক্ষতায় কেহ তাহাকে পিছনে ফেলিয়া যাইতে পারে নাই। শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্য তখনো বাঙালির হাতছাড়া হইয়া যায় নাই—কৃষক, শিল্পশ্রমিক, ব্যবসায়ী আপন আপন গ্রামগুলিকে নিজের কর্মসাধনায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। সেইদিন দেশে সম্পদের অপ্রতুলতা ছিল না বলিয়া অভাব, দুঃখদারিদ্র্য, সর্বনাশা পরের দাসত্ব বাঙালির জীবনে বিষক্ষত সৃষ্টি করিতে পারে নাই। আর্থিক ভারসাম্য এবং চরিত্রের দৃঢ়তাই জাতিকে উন্নতির পথে চালিত করে।

অতীতের দিনে গ্রামকেন্দ্রিক বাঙালিজীবনে এই দুইটি জিনিসের অপ্রাচুর্য কখনো দেখা যায় নাই। তাই, সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে জাতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল।

যতদিন পর্যন্ত গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালির জীবন আবর্তিত হইতেছিল ততদিন সুখ-সমৃদ্ধি-সচ্ছলতার অভাব দেশে দেখা যায় নাই। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতা, য়ুরোপের শিল্পবিপ্লবের তরঙ্গ যেদিন বাঙলার বুকে আঘাত হানিল সেইদিন হইতেই এ দেশের গ্রামীণ সভ্যতার মধ্যে ভাঙন ধরিল। বাঙলার কুটীরশিল্পগুলি বিনষ্ট হইল, জমির উপর জনগণের অত্যধিক চাপ পড়িল, নানা কারণে কৃষির অবনতি ঘটিতে লাগিল। কর্মচ্যুত শিল্পশ্রমিক জীবিকার সন্ধানে শহরের অভিমুখে দলে দলে ছুটিয়া গেল। তদুপরি, দেশের উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে যতই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রসারিত হইতে লাগিল ততই তাহারা বিজাতীয় শিক্ষাবৈগুণ্যে গ্রামের প্রতি আকর্ষণ হারাইয়া ফেলিল। গ্রামের জমিদার, ধনিক-শ্রেণী, শহরের ভোগবিলাসের মোহে আপন পল্লীকে বিস্মৃত হইল। শহরে আশ্রয় লইয়া বাঙালি স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিল না—ব্যবসায়-বাণিজ্যকে উপেক্ষা করিয়া চাকরি-জীবনকেই তাহারা একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লইল। ফলে বাঙলার গ্রামগুলি ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইল। বাঙালির সংস্কৃতি গেল, ঐতিহ্য গেল, আর্থিক ভারসাম্য বিনষ্ট হইল। এই বিপর্যয়ের রন্ধ্রপথেই বাঙালির জাতীয় জীবনে সর্বনাশের শনি প্রবেশ করিল। পল্লীকে উপবাসী রাখিয়া নগর-গুলি ফাঁপিয়া উঠিল সত্য, কিন্তু সেই স্ফীতি দেশের মানুষকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিল না। শিক্ষা ও আনন্দের অভাবে, শোচনীয় দারিদ্র্যের তাড়নায় উদার বাঙালি-চিত্তে সংকীর্ণতা ও কুটিলতা আশ্রয় নিল। হীন দলাদলি, ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘাত, সাম্প্রদায়িক জীবনের অনৈক্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। এইভাবে বাঙালির ভাগ্যাকাশে দুর্দিনের মেঘ ঘনাইয়া আসিল, তাহার আর্থিক ও সামাজিক জীবন একরূপ বিধ্বস্ত হইল।

প্রাচীনতন্ত্রকে স্থানচ্যুত করিয়া দেশে নব্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু শিক্ষা-শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে ভাঙন ধরিল, বিদেশী শাসনের নানামুখী বিরোধিতায় তাহার কোনো ক্ষতিপূরণ হইল না, বৃহত্তর সমাজ ক্রমেই অবনতির মুখে ছুটিয়া চলিল। বাঙালির বর্তমানে যে-অবস্থা, তাহার মধ্যে উজ্জ্বল ও উন্নত ভবিষ্যতের কোনো ইঙ্গিত নাই। ভয়াল মৃত্যুর ছায়া জাতির জীবনে প্রতিদিন দীর্ঘতর হইয়া উঠিয়াছে; নানা সমস্যা, নানা দুর্ভাবনা জাতির চিত্তকে আজ পীড়িত করিয়া তুলিতেছে। দেশের অত প্রাচুর্যের মধ্যেও যে আমাদের এত অভাব-দুঃখ-দারিদ্র্য, তাহার একমাত্র কারণ, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক পরাজয়ের দরুন বাঙালি তাহার স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তাটি হারাইয়া ফেলিয়াছে—তাহার দেশদেখা চোখ আর নাই। পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে রাষ্ট্রীয় সাধনার ক্ষেত্রে আমরা স্বদেশপ্রেমের বুলি উচ্চারণ করি, কিন্তু স্বদেশকে উপলব্ধি করিবার শক্তি হইতে আমরা আজ

বঞ্চিত। আমাদের ভাণ্ডার যে একেবারে শূন্য, সে-কথা আমরা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাঙ্‌লা যে নানাদিকে অনেকখানি পশ্চাতে পড়িয়া আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। নিজ দেশেই বাঙালি প্রবাসীর মতোই দিনযাপন করিতেছে। উন্নত কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিল্প জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির প্রধান উপায়—ইহাদের উপরই গড়িয়া উঠে জাতির আর্থিক বনিয়াদ। কিন্তু আমাদের শিল্প নাই, ব্যবসায় নাই, বাণিজ্য নাই, বাঙ্‌লার কৃষিও অবনত। এইগুলিকে বাদ দিয়া একমাত্র চাকরি অবলম্বন করিয়া আমরা কীরূপে ভবিষ্যতে উন্নতি ও কল্যাণ আশা করিতে পারি? সমগ্র জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে হইলে প্রয়োজন বিচিত্র রকমের শিক্ষাব্যবস্থার—এদেশে আজ পর্যন্ত তাহার গোড়া-পত্তন হইল না। পুঁথিগত বিদ্যার চাপে আমাদের বুদ্ধি পীড়িত, তাই, স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে নাবালকত্ব বাঙালির এখনো ঘুচিল না।

শিক্ষা ও প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে যে-বিচ্ছেদ আজ দেখা দিয়াছে তাহা দূর করিতে না পারিলে আমাদের স্বাবলম্বনশক্তি ফিরিয়া আসিবে না, ভবিষ্যৎ আরো তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে। আমাদের প্রয়োজন কৃষিশিক্ষার, প্রয়োজন শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিক্ষার, প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণার—বাঙালি সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছে কী? বৃত্তিশিক্ষা ও সার্বজনীন সাধারণ শিক্ষার পথটিকে যদি উন্মুক্ত ও প্রসারিত না করা যায় তবে বাঙালির আর্থিক পরাধীনতা ঘুচিবে না, মনের আকাশ হইতে ভেদবুদ্ধি, অনৈক্য ও দলাদলির কালোমেঘ কাটিয়া যাইবে না।

আজ শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যে জাতিভেদ, হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে বিরোধিতা হিন্দুর নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অনৈক্য—সকলেরই মূলে রহিয়াছে যথার্থ শিক্ষার অভাব ও আর্থিক দৈন্যের গ্লানি। আমাদের আর্থিক জীবন যদি সচ্ছল হইয়া উঠে, আমরা যদি প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারি তাহা হইলে বাঙালির ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হইবে—দেশে ঐক্য ও সংহতি ফিরিয়া আসিবে, জাতির জীবনে রাজনৈতিক চেতনা বিকশিত হইয়া উঠিবে, জাতীয়তা-উদ্বোধনের পথটি প্রশস্ততর হইবে, এবং এই জাতীয়তাবোধের মধ্যেই রহিয়াছে বাঙালির মুক্তির ইঙ্গিত। জাতীয় মনোভাবের অভাবই আমাদের ভবিষ্যতের সকল উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশকে যদি আমরা যথার্থ ভালোবাসিতে শিক্ষালাভ করি তাহা হইলে আমাদের অবান্তর চিন্তা, কর্মহীনতা ও কর্মবিমুখতার ভাব একমুহূর্তেই কাটিয়া যাইবে। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, সে যে বাঙালি, এই কথাটি প্রত্যেকটি দেশবাসীকে স্মরণ রাখিতে হইবে। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালির যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে ও নিজস্ব একটা দান আছে, সেকথা আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে গভীর আত্মীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া তোলা, জাতীয় স্বার্থ, মঙ্গল ও আদর্শের কথা চিন্তা করা শুধু দেশপ্রেমিক কর্মীরই একমাত্র কর্তব্য নয়—

দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং দেশের সাহিত্যিকবৃন্দকেও এবিষয়ে সক্রিয় হইয়া উঠিতে হইবে। জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় সাহিত্য দেশকে যে-ভাবে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে, অন্য কিছুই তেমনটি পারে না। বিশেষ করিয়া সাহিত্যের মধ্যেই জাতির সকল চিন্তা ও কর্মসাধনার রূপটি প্রতিফলিত হইয়া উঠে—সাহিত্যই জাতিকে চলার পথের নির্দেশ দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রসের দিকটা আজো আমরা অন্ধভাবে অনুকরণ করিয়া চলিয়াছি, কিন্তু তাহার শক্তির দিকটা আমাদের সাহিত্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারি নাই। বাঙ্‌লাদেশের সাহিত্যে বাঙ্‌লার পল্লী, বাঙ্‌লার মানুষ, বাঙ্‌লার দুঃখ-অভাব-দারিদ্র্যের কথা অদ্যাবধি যথার্থ অভিব্যক্তি লাভ করে নাই। অন্যদিকে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান-অনুশীলন প্রভৃতি মানুষের বহুমুখী চিৎপ্রকর্ষের ধারাটি বাঙ্‌লা সাহিত্যে এখনো প্রবাহিত হয় নাই। আমাদের বর্তমান সাহিত্যসাধনা শুধু রসের সাধনা। মনুষ্যত্ব বোধ, দেশপ্রেম, জাতীয় ঋদ্ধি ও সিদ্ধির কথা সাহিত্যে যদি ফুটিয়া না উঠে তবে জাতি সম্মুখে চলিবার শক্তি ও প্রেরণা লাভ করিবে কোথা হইতে?

বাস্তবচেতনা বাঙালিজাতির মধ্যে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। যে-যে গুণে অপরাপর জাতি কর্মশক্তির অধিকারী হইয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, আমাদিগকেও সেইসব গুণের অধিকারী হইতে হইবে। বাঙালি-হিন্দুমুসলমান সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় অখণ্ড জাতীয়তার ভিত্তিতে জীবনকে গড়িয়া তুলিবার আজ সময় আসিয়াছে। শিল্পে, বাণিজ্যে, ব্যবসায়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আমরা যেন কাহারো পিছনে পড়িয়া না থাকি। আজ আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, কিন্তু উন্নত চিন্তা ও কর্মশক্তির অভাব না ঘটিলে আমরা অচিরেই স্বর্ণযুগের তোরণদ্বার উন্মোচিত করিতে সমর্থ হইব। বাঙালির অতীতের দিনগুলি সত্যই ছিল গৌরবোজ্জ্বল—তাহার ভবিষ্যৎও গৌরবমণ্ডিত হইয়া উঠিবে। ইহার জন্য চাই সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি, বাস্তবভিত্তিক আর্থিক পরিকল্পনা এবং দেশাত্মবোধের জাগৃতি।

জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরণের বিরাট সমস্যা আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে। সেই সমস্যার আশু-সমাধান আমাদিগকে করিতেই হইবে। পল্লীকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের বহুমুখী কর্মধারা আবর্তিত হইয়া উঠুক। পল্লীর কৃষি, পল্লীর শ্রমবিভাগ, গ্রামীণ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাদ দিয়া বাঙ্‌লার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কখনো সম্ভব হইবে না। কয়েকটি শহরের মধ্যেই বাঙ্‌লাদেশকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, শহরের বাহিরেই পড়িয়া আছে বৃহত্তর বাঙ্‌লাভূমি—ব্যাধি, মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, বন্যা তাহাকে প্রতিমুহূর্তে বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছে। মোহমুক্ত বাঙালি যদি আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে তবে মৃত্যুমুখী বাঙ্‌লার হাহাকার দিকে দিকে আর [illegible]ধ্বনিত হইয়া উঠিবে না, বাঙ্‌লার যুবশক্তিকে সহ্য করিতে হইবে না [illegible]বাসের দুর্বিষহ গ্লানি। বাঙালি যেদিন তাহার দেশকে চিনিবে,

আত্মশক্তিকে ফিরিয়া পাইবে, সেইদিন বাঙলাজননীর মূর্তি ভিন্নরূপ ধারণ করিবে—আর, বাঙলার প্রাণচঞ্চল নরনারীর মুখে উচ্চারিত হইবে :

'আজ বাঙলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে,
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।'

বাঙালি মধ্যবিত্তের সংকট

বাঙালি-মধ্যবিত্তশ্রেণী আজ শূন্য পরিণামক্ষয়িষ্ণুতার মুখে। ভাগ্যের বিরূপতায় এই সম্প্রদায়ের অগণিত মানুষ বর্তমানে ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন। আমাদের সমাজব্যবস্থায় নিদারুণ ভাঙন ধরেছে, তার সুবিন্যস্ত কাঠামোটি দিনের পর দিন ভেঙে পড়েছে। যেদিকে তাকাই, দেখতে পাই এক অশুভ বিপর্যয়ের সংকেত। এই সর্বনাশা ভাঙনের আঘাত অধুনা সবচেয়ে মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের সংখ্যাতীত মধ্যবিত্তের জীবনে। মুখে তাদের বিবর্ণ অসহায়তার মসীকৃষ্ণ ছায়া, সমগ্র চিত্তদেশ জুড়ে হতাশার ক্রমবর্ধমান অন্ধকার। মন্দভাগ্য মধ্যবিত্ত বাঙালির অবস্থাটি আজ আশ্রয়চ্যুত স্রোতের শেওলার মতো—প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যার মুখে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তৃণপুঞ্জের মতো। দু-তিন দশক পূর্বেও যারা একরূপ সমস্যামুক্ত থেকে নির্ভাবনায় দিনাতিপাত করতো, ভদ্রজীবনযাপনে তখনো যাদের প্রবল কোনো বাধার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়নি, তাদের অবস্থা আজ কী শোচনীয় হয়ে উঠেছে! একদিন যারা ছিল গোটা বাঙালিজাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ, অধুনা তারা সাংঘাতিকরূপে বিপর্যস্ত,—একান্ত বেদনাদায়ক তাদের অসহায় মনোভাব। মধ্যবিত্তের জীবনসংকট আমাদের জাতীয় জীবনে আজ জটিলতম সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এখন দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই একটি প্রশ্ন : মধ্যবিত্তশ্রেণী যদি নিঃশেষ হয়ে গেল তাহলে জাতির আর কী রইল? প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে গুরুতর।

সমাজে কাদের আমরা মধ্যবিত্ত বলি? মধ্যবিত্তের সুস্পষ্ট সংজ্ঞানির্ধারণ করা একটু কঠিন। কারণ, সমাজস্থ মানুষের এই শ্রেণীটির সীমারেখা সুচিহ্নিত নয়। তবে বাঙালির সমাজবিন্যাস তথা সামাজিকের আর্থিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সাধারণ একটা পরিচয় দেওয়া চলে। বর্তমানে ধনতন্ত্রশাসিত মানবসমাজে আমরা দেখতে পাই একদিকে অগাধ ঐশ্বর্য—ভোগবিলাসের প্রাচুর্য, অন্যদিকে অবিশ্রান্ত দারিদ্র্য—প্রাণধারণের দুঃসহ গ্লানি; কেউ প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী, কোনোরকমের পরিশ্রম তাদের করতে হয় না; আবার, কেউ

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিশ্রান্ত খেটেও, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও, উদরান্নের সংস্থান করতে পারে না। প্রথমোক্ত ভাগ্যবান মানুষগুলি ধনিকশ্রেণীর অন্তর্ভূত, আর, শেষোক্ত অদৃষ্টবিড়ম্বিত মানুষগুলি শ্রমিকমজুরের দলভুক্ত—তারা সর্বরিক্ত। এহেন প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের কারণ হল ধনবণ্টনের বৈষম্য, এরূপ অবিশ্বাস্য বৈপরীত্যের পাশাপাশি অবস্থান একমাত্র ধনতান্ত্রিক সমাজেই সম্ভব।* মধ্যবিত্ত নামে যারা পরিচিত, উপরি-কথিত বিত্তশালী ধনিকগোষ্ঠী ও নিঃসম্বল কৃষাণমজুরের মধ্যবর্তী একটি স্থানে তাঁদের অবস্থিতি। প্রচুর ঐশ্বর্য তাঁদের নেই, আবার, কঠিন দারিদ্র্যের পীড়নও পূর্বে কখনো তাঁদের সহ্য করতে হয়নি। তাঁরা পরশ্রমজীবী নন, পরিশ্রম তাঁরা করেন; তবে এই পরিশ্রম ঠিক কায়িক নয়—মস্তিষ্কের, তাঁদের অধিকাংশ লেখনীচালনার কাজে ব্যাপৃত।

মধ্যবিত্তের দুটি শ্রেণীবিভাগ—উচ্চমধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত। শিক্ষা-সংস্কৃতি, পেশা ও আর্থিক সচ্ছলতার তারতম্য মধ্যবিত্তসম্প্রদায়কে উচ্চকোটির ও নিম্নকোটির, এই দু-ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে, মধ্যবিত্তশ্রেণীর পরিধি খুব বিস্তৃত। একদিকে বড়ো বড়ো জমিদার [মনে রাখতে হবে, সম্প্রতি জমিদারীপ্রথা বিলুপ্ত হয়েছে], বড়ো বড়ো শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীবৃন্দ, অন্যদিকে ভূমিহীন চাষী, কলকারখানার দীনদরিদ্র মজদুর। এদের বাদ দিয়ে সমাজের অসংখ্য যে মানুষ মধ্যবিত্ত বলতে তাঁদেরই বুঝায়। আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বহুবিধ শিক্ষায়তনের অধ্যাপক-শিক্ষক, সাধারণ ব্যবসায়ী, দোকানদার, ইত্যাদি, সকলেই মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক পদমর্যাদা, মাথাপিছু আয়, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি বিষয়ে এঁদের মধ্যে যতই পার্থক্য থাক না কেন, মানসিকতার দিক দিয়ে এঁদের সাধর্ম্যটুকু কারো দৃষ্টি এড়াবার নয়। স্বল্প আয়-বিশিষ্ট হলেও এঁদের কাউকেই যেমন শ্রমিকমজুরের পর্যায়ে ফেলা চলবে না, তেমনি, জমিদার ও বড়ো শিল্পপতির পঙ্‌ক্তিভুক্ত করাও চলবে না। কারণ মধ্যবিত্তের জীবিকা-অর্জনের পন্থা, শিক্ষাদীক্ষা, রুচি ও মানসিক গঠন লক্ষণীয়ভাবে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যের পিছনে দীর্ঘকালের একটি ঐতিহ্য রয়েছে। এখানে তার একটুখানি আভাস দেওয়া প্রয়োজন।

আমাদের প্রাচীনকালের সমাজবিন্যাসে—সমাজ-অন্তর্গত মানুষের আর্থনীতিক শ্রেণীবিভাগে—'মধ্যবিত্ত' বলে কেউ ছিল না। তখন একদল মানুষকে আমরা ধনী বলে জানতাম, আর-একদল মানুষকে জানতাম দরিদ্র বলে। বাঙালিসমাজে মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে এদেশে ইংরেজ আগমনের পর। বস্তুত, মধ্যবিত্ত বাঙালি ইংরেজবণিক ও ইংরেজসরকারের সৃষ্টি। স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের আত্মসর্বস্ব শাসননীতি আমাদের কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে, নাগরিক সভ্যতার পত্তন করেছে। লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-প্রথা বাঙলার প্রাচীন ভূমিব্যবস্থাকে ওলটপালট করে দিয়েছে, এবং সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাবাহী লর্ড মেকলের শিক্ষাসংস্কার মানসিক ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক

পরিবর্তন ঘটিয়ে গ্রাম্য-বাঙালি-সমাজের বৃহত্তর অংশকে শহরমুখী করে তুলেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারীতন্ত্রের সৃষ্টি হল, পশ্চিমের শিল্পবিপ্লবের ফলে কৃষি-আশ্রয়ী ও কুটীরশিল্পাশ্রয়ী পুরাতন সমাজ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। আর, তার ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে উঠল বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজ। আমরা যে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতি বিমুখতার ভাব দেখালাম, তার জন্যে দায়ী জমিদারী প্রথা।

বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজের এক অংশকে নানাভাবে জীবিকা জুগিয়েছে জমিদারীতন্ত্র, অপর-একটি বড়ো অংশকে সুলভ সম্মান ও নিরাপদ আশ্রয়ের প্রলোভন দেখিয়ে আকর্ষণ করেছে ইংরেজকোম্পানীর দপ্তরখানায় মাসমাইনের চাকুরি। তারপর, মধ্যবিত্তশ্রেণীর অনেকে ইংরেজিশিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করলেন, তাঁরা ডাক্তারী, ওকালতি, শিক্ষকতা ইত্যাদির দিকে ঝুঁকে পড়লেন। ধীরে ধীরে সমাজে মধ্যবিত্তের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হল। তাঁরা 'ভদ্রলোক'এর সম্মানমর্যাদা পেলেন, আস্তে আস্তে সামাজিক প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে উঠলেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা তাঁদের বুদ্ধিকে শাণিত করে তুলল, বিবিধ জ্ঞানবিদ্যার দ্বার তাদের সম্মুখে উন্মোচিত করে ধরল। কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে তারা বিচিত্র ভাবসাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন. সাহিত্য-শিল্প দর্শন-রাজনীতি অর্থনীতি-ইতিহাস-বিজ্ঞানচর্চায় মন দিলেন। ফলে বাঙালির সমাজজীবনে দেখতে দেখতে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। জন্ম হল নতুন সংস্কৃতির, সৃষ্টি হল নতুন জীবনদর্শনের। শিক্ষার প্রতি মধ্যবিত্ত বাঙালির যেন জন্মগত মানসপ্রবণতা। এই মধ্যবিত্তসমাজ নতুন যুগের—আধুনিক বাঙলার—সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই সত্যটি স্মরণ করেই একটু আগে তাঁদের আমরা সমগ্র জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ বলেছি। মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের মানুষগুলিই যে এতকাল পর্যন্ত দেশের প্রাণশক্তির প্রধান উৎস ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গত দেড়শ বছরের মধ্যে বাঙলাদেশে কর্মসাধনা ও ভাবসাধনার যে-স্মরণীয় ইতিহাস গড়ে উঠেছে, তাকে মধ্যবিত্তের জীবনেতিহাস বললে বোধ করি খুব ভুল করা হয় না। কী ধর্মসংস্কার, কী রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণ, কী দেশাত্মবোধের উদ্বোধন, কী জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ—সবক্ষেত্রেই মধ্যবিত্তের দান অসামান্য। যে সকল শ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের স্মৃতিলোকে নিজ নিজ প্রতিভার প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর মুদ্রিত করে গেছেন তাঁদের অধিকাংশই যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এ কথা কাকেও স্মরণ করিয়ে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। নানাদিকে নানাভাবে জাতকে তাঁরা বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, সর্বভারতের সম্মুখে বাঙালির মর্যাদাকে তুলে ধরেছেন, জাতিহিসেবে বাঙালি যে বিশিষ্ট, তার গৌরবদীপ্ত প্রমাণ রেখে গেছেন। তাঁদের কাছে জাতির ঋণ সামান্য নয়।

কিন্তু ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে এহেন বাঙালি মধ্যবিত্তের অবস্থা আজ কী দাঁড়িয়েছে। নিদারুণ সংকটের আবর্তে পড়ে মধ্যবিত্তসমাজ অধুনা বিপর্যস্ত। এককালে যাঁদের নিরুদ্বেগে দিন কাটতো, অবকাশের মুহূর্তগুলি যাঁদের বিবিধ জ্ঞানবিদ্যার অনুশীলনে অতিবাহিত হতো, তাঁদের চোখের সম্মুখে আজ বিরাজ করছে মহাশূন্যতা। অতীতে

মধ্যবিত্তশ্রেণী এতখানি অসহায় বোধ কখনো করেন নি। পৈতৃক জমিজমা তাঁদের অনেকেরই ছিল, অনেকে সরকারী চাকুরির পক্ষপুটে থেকে নির্ভাবনায় দিন কাটাতেন। আবার অনেকে ডাক্তারী, ওকালতি, শিক্ষকতা ইত্যাদি 'ভদ্রলোক'-এর পেশায় আত্মনিয়োগ করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। কিন্তু নানা প্রতিকূল শক্তির বিরোধিতায় ধীরে ধীরে তাঁরা পূর্বের সেই নিরাপদ আশ্রয় থেকে চ্যুত হতে লাগলেন, দুর্ভাগ্য ক্রমেই বেড়ে চললো। প্রথম-মহাযুদ্ধের পর থেকে তাঁদের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে উঠলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মধ্যবিত্তশ্রেণীকে প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল। তা ছাড়া, মধ্যবিত্তের অনেকেই পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাতে পারেন নি, অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। পশ্চিমী যান্ত্রিকতা ও নাগরিক সভ্যতার দুষ্টপ্রভাবে আমাদের কুটীরশিল্প ও কৃষিবুনিয়াদ আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছিল, একান্নবর্তী পরিবারগুলি টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাচ্ছিল—এ সর্বনাশ আমরা রোধ করতে পারলাম না। ফলে মধ্যবিত্তসম্প্রদায় ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন। ইতোমধ্যে দেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলল, বেকারজীবনের বিড়ম্বনা শুরু হল—শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্যহীন দেশের দিকে দিকে দারিদ্র্যক্লিষ্ট মধ্যবিত্তের হাহাকার উঠল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া একান্ত শোচনীয়। জিনিসপত্রের দাম হুহু করে চারগুণ-পাঁচগুণ বেড়ে যেতে লাগল, ফাঁপানো টাকায় বাজার ছেয়ে গেল, চোরাকারবারীর দল মাথা তুলল—নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর অস্তিত্ব মারাত্মকভাবে বিপন্ন হল।

মধ্যবিত্তজীবনের অসহনীয় দুর্গতিলাঞ্ছনার ইতিকথা কিন্তু এখনো শেষ হয়নি। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে বাঙালি মধ্যবিত্তদের এমন একটি ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হল যার ফলে তাঁরা আজ ধ্বংসের পথে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমরা এখানে ভারতের স্বাধীনতালাভ ও অভিশপ্ত বঙ্গব্যবচ্ছেদ ঘটনার কথা বলছি। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করল, কিন্তু বাঙ্‌লাদেশের, বিশেষ করে পূর্ববাঙ্‌লার, মধ্যবিত্তের সর্বনাশ হল। বাঙালিজাতির ইতিহাসে এতখানি সাংঘাতিক বিপর্যয় আগে কখনো ঘটেনি। মধ্যবিত্তশ্রেণীর নাড়ীর স্পন্দন গেলো দু-তিন দশক থেকে ক্রমেই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল, বঙ্গবিভাগহেতু বর্তমানে তাঁদের নাভিশ্বাস দেখা দিয়েছে। পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্তসমাজ আজ মৃত্যুমুখী। সাতপুরুষের বাস্তুভিটা ছেড়ে, নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করে, সম্পূর্ণভাবে ছিন্নমূল হয়ে তাঁরা প্রতিদিন দলে দলে পশ্চিমবাঙ্‌লায় এসে ভিড় করেছেন। কিন্তু কোথায় তাঁদের মাথা গুঁজবার স্থান, কোথায় ক্ষুধার অন্ন, কোথায়-বা লজ্জানিবারণের পরিচ্ছদ! বাস্তুহারা লক্ষ লক্ষ নরনারীর অবস্থা আজ যাযাবর বেদের মতো, পথের কুকুরের মতো তাঁরা যাপন করছেন গ্লানিপঙ্কিল দুর্বিষহ জীবন। যুদ্ধ মানুষকে আত্মসর্বস্ব ও লোভী করে তুলেছে, মানবতাকে হত্যা করেছে, সমবেদনার কণ্ঠরোধ করেছে, মানুষের ঘুমন্ত পাশবিক বৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তুলেছে। এরূপ পরিস্থিতিতে পড়ে পূর্ববঙ্গের সর্বস্বান্ত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংকট ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। সারাদেশের বেকারসমস্যা, সরকারী-বেসরকারী আপিসে ক্রমাগত ছাঁটাই বাস্তুভিটাত্যাগী শিক্ষিত মধ্যবিত্তগণের সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছে। দেশে শ্রমিক-ধনিকের

বিরোধ লেগেই আছে, তা মিটাতে গিয়ে সরকার হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, অপরাপর সমস্যার দিকে মন দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। এসব কারণে মধ্যবিত্তের দুর্গতির শেষ নেই—আর-কিছুকাল এভাবে কাটালে মধ্যবিত্তসমাজের অস্তিত্ব থাকবে না।

কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণী যদি বিধ্বস্ত হয়ে যায় তাহলে দেশের কী অবস্থা হবে? এতে কি গোটা বাঙালি সমাজের অপমৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠবে না? সমাজের মেরুদণ্ডই যদি ভেঙে গেল তবে সমাজ মাথা তুলে দাঁড়াবে কেমন করে? মধ্যবিত্তেরা মরবে, কিন্তু মরবার আগে সমগ্র দেশটাকে একবার প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যাবে,—হয়তো রাষ্ট্রে জ্বলে উঠবে বিদ্রোহ-বিপ্লবের বহ্নিশিখা। মধ্যবিত্তের বিক্ষোভ কী ভয়াল, পৃথিবীর ইতিহাসের পাঠক-মাত্রেরই তা জানা আছে নিশ্চয়।

বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের কথা ভেবে বলছি, যে-কোনো উপায়েই হোক মধ্যবিত্ত-সমাজের ভাঙন রোধ করতে হবে, অবিলম্বে এইসব কেন্দ্রচ্যুত মানুষের লাঞ্ছনার অবসান ঘটাতে হবে। এর জন্যে দেশের প্রত্যেকটি মানুষের উদ্যমপ্রচেষ্টার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব অনেকখানি। রাজ্যসরকারকে সুচিন্তিত পরিকল্পনা রচনা করতে হবে, সর্বস্তরের মধ্যবিত্তের নিরাপদ আশ্রয় ও জীবিকার উপায় করে দিতে হবে। যারা নিঃসম্বল তাদের জন্যে অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা চাই, স্থায়ীবাসস্থানের ব্যবস্থা চাই, প্রয়োজনমতো আর্থিক সাহায্য চাই। সঙ্গে সঙ্গে মৃতপ্রায় গ্রামগুলির সংস্কারসাধন ও পুনর্বিন্যাস অত্যাবশ্যক। তা ছাড়া, কৃষিপ্রথাকে উন্নত করা প্রয়োজন, কুটীরশিল্পের উজ্জীবন প্রয়োজন, বিবিধ শিল্পের সম্প্রসারণ প্রয়োজন, প্রয়োজন ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রটি প্রশস্ত করা। এতে বহু মধ্যবিত্তের জীবিকা-অর্জনের পথ খুলে যাবে, অবশ্যম্ভাবী বিনাশের হাত থেকে অনেকেই রক্ষা পাবে।

অবশ্য, যতখানি সম্ভব স্বাবলম্বী হয়ে মধ্যবিত্তসম্প্রদায়কেও কঠোর জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। হতাশার কাছে তাঁরা যেন আত্মসমর্পণ না করেন। আমাদের শেষকথা, মধ্যবিত্তের সর্বনাশ সমগ্র জাতির সর্বনাশ—এই নিশ্চিত সত্যটি যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

বৃত্তিশিক্ষা ও বৃত্তিনির্বাচন

সমগ্র পৃথিবীতেই বর্তমানে একটা দ্রুতপরিবর্তনের ধারা লক্ষিত হইতেছে। যান্ত্রিক সভ্যতা ও শিক্ষার বিস্তার এই পরিবর্তনকে আরো গতিশীল করিয়া তুলিয়াছে। সামাজিক, রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক জীবনে আমরা যে আজ একটা বিরাট ওলট-পালটের সম্মুখীন হইয়াছি, চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই এ কথার সত্যতা সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বিগত সার্বিক যুদ্ধ বাঙালি তথা ভারতবাসীর জীবনে আনিয়াছে নানা বিপর্যয়। জাতির এই যে সঙ্কটময় পরিস্থিতি ও জগৎব্যাপী লক্ষণীয় ভাঙাগড়া ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই বর্তমানে আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল-পরিবর্তন-সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি। শিক্ষাই জাতির আশাআকাঙ্ক্ষার নিয়ামক, শিক্ষা জাতিকে দেয় পথচলার নির্দেশ—গোটা জাতির নানামুখী উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভর করে যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার উপর।

আমরা তাহাকেই বলি বৃত্তিশিক্ষা, যাহা শিক্ষার্থীকে বাস্তবজীবনক্ষেত্রে একটি বিশেষ পেশার উপযোগী করিয়া তোলে, জীবিকা-অর্জনের ক্ষেত্রে তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে। এরকম শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার আমাদের দেশে কতখানি ঘটিয়াছে? ইংরেজিশিক্ষাবিধি প্রচলিত হইবার পর হইতে অদ্যাবধি আমরা লাভ করিতেছি কেবল পুঁথিগত শিক্ষা। এই শিক্ষা ও বিদ্যাকে বাস্তবক্ষেত্রে আমরা প্রয়োগ করিতে পারিতেছি না। ফলে আমাদের বেকারসমস্যা দিন দিন উগ্র হইয়া উঠিতেছে, দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে জাতির দুর্দশা আর দারিদ্র্য। অতএব শিক্ষার সামগ্রিক আদর্শই যে ক্ষুণ্ণ হইতেছে তাহা কাহাকেও বোঝানো নিষ্প্রয়োজন। শুধু উচ্চচিন্তা ও ভাবসর্বস্ব জীবন লইয়া কোনো জাতি সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না,—ভাবসাধনার সঙ্গে তাহার কর্মসাধনারও প্রয়োজন আছে।

দেড়শত বছর ধরিয়া বাস্তববিরোধী ইংরেজিশিক্ষালাভ করিয়া আমরা আর্থিক দারিদ্র্যের কবলমুক্ত হইতে পারি নাই। এদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, এবং সেখান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে অন্ধভাবে ছুটিয়া চলে। ইহাদের সকলেরই লক্ষ্য উচ্চতর শিক্ষালাভ। কিন্তু শিক্ষাসমাপ্তির পর দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে তাহারা নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। অজস্র শিক্ষিত যুবকের মধ্যে মাত্র মুষ্টিমেয় ভগ্নাংশ সরকারি এবং সওদাগরি আপিসে অল্প বেতনে ঢুকিয়া পড়ে, আর বৃহত্তর অংশ লক্ষ্যহীনভাবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেতাবী শিক্ষার পাশে দেশের ছাত্রছাত্রীকে যদি বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান করা হইত তাহা হইলে জাতীয় জীবনে আজ এতখানি ব্যর্থতা দেখা দিত না—আমরা দেশের সম্পদ বাড়াইতে পারিতাম, দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতাম।

বৃত্তি শিক্ষার অভাবে এদেশের বিদ্যার্থীরা তাহাদের মানসপ্রবণতা অনুযায়ী বৃত্তিনির্বাচন করিতেও অসমর্থ।

আমাদের দেশে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা যে আদৌ হয় নাই, একথা অবশ্য আমরা বলিতেছি না। ডাক্তারী, ওকালতী, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বৃত্তিশিক্ষা আমরা কিছুটা লাভ করিয়াছি। সাম্প্রতিক কালে কতিপয় কলেজে ব্যবসায় বাণিজ্য ও কারিগরী প্রভৃতি শিক্ষাদানে কিছুটা ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু দরিদ্র দেশের সকলের পক্ষে এই শিক্ষালাভ করা সহজ ও সুসাধ্য নয়। ইহা ছাড়াও বলা যায়, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি পেশার ক্ষেত্রে বর্তমানে বেশ ভিড় জমিয়া গিয়াছে, দেখা দিয়াছে তীব্র প্রতিযোগিতা। এইসব পেশা জাতির সীমাহীন দারিদ্র্য ও জটিল বেকারসমস্যা ঘুচাইতে অক্ষম। সুতরাং দেশের ছেলেমেয়েরা যাহাতে স্বল্পব্যয়ে নানারকমের বৃত্তি শিক্ষা পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতে হইবে।

নিম্নতর বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে নাই বলিলেই চলে। এ দেশের জনসাধারণের বিপুল একটি অংশ কৃষিকে অবলম্বন করিয়া জীবিকা উপার্জন করে। কৃষি শিক্ষার সুবন্দোবস্তও আজ পর্যন্ত আমরা করিতে পারি নাই। যাহারা কৃষিকে অবলম্বন করিয়া আছে, বৎসরের অর্ধেক সময় তাহারা অলস জীবন অতিবাহিত করে। নানারকমের সহজসাধ্য শিল্পশিক্ষা ও কারিগরীশিক্ষার ব্যবস্থা যদি করা যায় তাহা হইলে দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জীবিকাসংগ্রহের পথটি সুগম হইয়া উঠে। বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িবার পথে আমাদের যে বিস্তর বাধা আছে সেকথা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু স্বল্পমূলধনে, সমবেত প্রচেষ্টায়, আমরা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারি। কিন্তু তাহার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে। বহুবিধ কুটীরশিল্প-শিক্ষার প্রচলন হইলে দেশের অধিকাংশ অল্পশিক্ষিত মানুষ তাহা গ্রহণ করিতে পারে।

আর্থনীতিক পরাধীনতা বাঙালির জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে। প্রাকৃতিক সম্পদে, জনশক্তিতে আমরা অন্যান্য দেশ হইতে পিছনে পড়িয়া নাই। কিন্তু এগুলির সুষ্ঠু প্রয়োগে ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিল্প বাড়াইয়া তুলিবার কোনরূপ উদ্যম-উদ্যোগ আমরা প্রকাশ করি নাই। ব্যবসায়ী-শিক্ষা, বাণিজ্য-শিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা লাভ করিলে আমাদের দারিদ্র্য ও পরমুখাপেক্ষিতার ভাব ঘুচিতে পারে। তাই এসব বৃত্তিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি। কয়েক বৎসর পূর্বে সুবিখ্যাত 'এ্যাবট-উড্ রিপোর্ট'-এও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তরে ব্যাপক বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রচলনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ভারতসরকারের শিক্ষাবিষয়ক কেন্দ্রীয়-পরামর্শ-সমিতি এবং ইণ্টার-ইউনিভার্সিটি বোর্ডও এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। গান্ধীজীরচিত ওয়ার্ধা শিক্ষাপরিকল্পনায় হাতেকলমে শিল্পশিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু এইসমস্ত নির্দেশ অনুযায়ী বাস্তবক্ষেত্রে এখনো শিক্ষার সংস্কার সাধিত হয় নাই।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তরে নানাপ্রকার বৃত্তিশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা

যায়। মাধ্যমিক শিক্ষাকে কলেজীশিক্ষার সোপান হিসাবে না দেখিয়া উহাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মস্বতন্ত্র করিয়া তোলা আবশ্যক। প্রতি বৎসর অগণিত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। ইহাদের অনেকে এখানেই শিক্ষাজীবন হইতে বিদায় গ্রহণ করে। তাহারা যদি মাধ্যমিক স্তরে কিছুটা বৃত্তিশিক্ষা পায় তাহা হইলে স্কুল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপন আপন রুচি ও মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী একটি বৃত্তিনির্বাচন করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠ ও স্বাবলম্বী হইতে পারে। উচ্চশিক্ষার উপযোগী মেধাবী ছাত্র সর্বদেশে সর্বকালেই বিরল। প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য উচ্চতর সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি বিদ্যার দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত থাকিবে। কিন্তু আমাদের দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব রহিয়াছে বলিয়াই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তিনির্বাচনের চেষ্টায় সর্বদা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে ব্যক্তিজীবনে এবং সমাজজীবনে বহুবিধ ক্ষয়ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইতেছে, আমাদের জাতীয় চরিত্রে আত্মশক্তির পঙ্গুতা প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

বর্তমানে আমাদের নানাবিধ বৃত্তিশিক্ষার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে এ সত্যটি দেশবাসীর মধ্যে নিশ্চয়ই কেহ অস্বীকার করিবেন না। ইহাতে দেশের ছেলেমেয়ে শিক্ষাঅন্তে সমাজজীবনে স্বাধীন মানুষ হইয়া উঠিবে, এবং অজস্র অর্থ ও শ্রমের পরিবর্তে তাহারা যে-কেতাবী শিক্ষা লাভ করিতেছে তাহার ব্যর্থতা হইতেও মুক্তিলাভ করিবে। অবশ্য একথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ছেলেমেয়েরা কেবলমাত্র বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ পাওয়া-মাত্রই দেশের বেকারসমস্যা ও দারিদ্র্য ঘুচিয়া যাইবে না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প এবং ব্যবসায়বাণিজ্যের ক্ষেত্রটিকেও প্রশস্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ও শিক্ষার সাজাত্যকরণ ব্যতীত জাতির কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি যে সুদূরপরাহত একথাটি এতদিনেও কি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার আজ শিক্ষার এই বৈচিত্র্যহীনতা সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন—ইহা কম আশা ও আনন্দের কথা নয়।

বেতারবার্তা

মানুষের জ্ঞানের পরিধি যতই প্রসারিত হইতেছে, বুদ্ধিশক্তি যতই বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, ততই তাহার চোখে ধরা পড়িতেছে রহস্যময়ী প্রকৃতির নানা গোপন তথ্য। যে-প্রকৃতির ভীষণতার কাছে মানুষ একদিন অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, সেই প্রকৃতিকেই আজ সে নিজের আয়ত্তে আনিয়া নানাকাজে লাগাইতেছে—মানুষের বুদ্ধির কাছে উদ্ধত নিসর্গপ্রকৃতিকে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। কৌতূহলী বিজ্ঞানী যেদিন বিদ্যুৎশক্তি আবিষ্কার করিল, যেদিন তাহার কাছে ধরা পড়িল ইথর আর ইলেকট্রনের গোপন রহস্য, সেদিন মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হইল—টেলিফোন-টেলিগ্রাফের উদ্ভাবন এক আশ্চর্য বস্তুরূপে জগৎকে চমৎকৃত করিল। অতঃপর বিস্ময়কর বেতারবার্তার সৃষ্টি।

টেলিগ্রাফ-টেলিফোনে আমরা দেখি, তারের সহায়তায় কথা ও শব্দ একস্থান হইতে দূরবর্তী অন্যস্থানে সহজেই প্রেরিত হইতেছে। মানুষ ইহাতেও যেন তৃপ্ত থাকিতে পারিল না, সে চাহিল বিনাতারে জগতের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে নিজ বাণীকে প্রেরণ করিতে। দৈনন্দিন জীবনে পরস্পরের সঙ্গে যখন আমরা আলাপ-আলোচনা করি তখন কোনো তারের সাহায্য আমাদিগকে লইতে হয় না। বিজ্ঞানী ভাবিল, অল্পদূরত্বের মধ্যে যদি বিনা তারে পরস্পরের সহিত কথা বলা সম্ভব হয় তবে দূরদূরান্তরে অবস্থিত মানুষের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব হইবে না কেন? বিজ্ঞানীর দূরকে নিকটে করিবার এই যে অশান্ত প্রয়াস, ইহার ফলে একদিন আবিষ্কৃত হইল রেডিওফোন, আবিষ্কৃত হইল বেতারবার্তা। এখন মুহূর্তমধ্যে একদেশের সংবাদ অন্যদেশে প্রচারিত হইতেছে—মানুষের কাছে পৃথিবীর দূরত্ব আজ একেবারে ঘুচিয়া গিয়াছে। ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কনিকে আমরা রেডিও-আবিষ্কারক বলিয়া জানি। কিন্তু এই বিস্ময়াবহ যন্ত্রটি তিনি একক প্রচেষ্টায় উদ্ভাবন করেন নাই, ইহার আবিষ্কারের পিছনে রহিয়াছে বহু বিজ্ঞানীর অনবচ্ছিন্ন গবেষণা।

যাহাকে শব্দ বলা হয় তাহা ইথরের কম্পনসমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। বেতারকেন্দ্রে মাইক্রোফোনের সাহায্যে যে-শব্দতরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহাকে প্রথমে বিদ্যুৎতরঙ্গে এবং বিদ্যুৎতরঙ্গ হইতে পরে ইথরতরঙ্গে পরিণত করা হয়। ইথরতরঙ্গে পরিণত হইয়া ইহা দিগ্‌দিগন্তে বিকীর্ণ হইতে থাকে। বেতারকেন্দ্রে যে-যন্ত্রটি থাকে তাহাকে বলা হয় প্রেরকযন্ত্র; অন্যদিকে, যাহারা বেতারবার্তা শুনিতে চায় তাহাদেরও একটি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, উহার নাম গ্রাহকযন্ত্র। প্রেরকযন্ত্র হইতে উত্থিত ইথরতরঙ্গ গ্রাহকযন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'আকাশতার'-এ আসিয়া প্রতিহত হয়। সেই প্রতিহত তরঙ্গগুলিকে গ্রাহকযন্ত্রটি প্রথমে বিদ্যুৎতরঙ্গে

রূপান্তরিত করিয়া পরে শব্দতরঙ্গে পরিণত করে। তখনই আমরা একস্থান হইতে প্রচারিত কথা, সংগীত, ইত্যাদি অন্যস্থানে বসিয়া স্বাভাবিকভাবে শুনিতে পাই।

বিজ্ঞানীর বিচিত্র আবিষ্কার মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিশ্বমুখী করিয়া তুলিয়াছে—মানবজাতির কল্যাণের পথটি উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছে। রেডিওযন্ত্রের আবিষ্কারের মধ্যেও রহিয়াছে মানবকল্যাণের অজস্র সম্ভাবনা। আনন্দদানে, শিক্ষা-প্রচারে, জ্ঞানবিতরণে রেডিওর উপযোগিতা সহজে উপলব্ধি করা যায়। 'ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন' এবং 'আমেরিকান রেডিও ব্রডকাস্ট' লক্ষ লক্ষ মানুষকে আনন্দ, শিক্ষা ও জ্ঞান বিতরণ করিতেছে। ভারতে কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে বেতার প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের দেশে বর্তমানে বহু ধনীর গৃহে, বড়ো বড়ো দোকানে, রেডিওফোন দৃষ্ট হয়। আশা করা যায়, একদিন এমন একটি সময় আসিবে যখন প্রত্যেক শহরে, গ্রামে গ্রামে, সাধারণ গৃহস্থঘরে পর্যন্ত বেতারযন্ত্রের অসদ্ভাব হইবে না।

বেতারবার্তা সত্যই আধুনিক যুগের একটি আশ্চর্য আবিষ্কার। জগতের কোন্ একপ্রান্তে একজন মনীষী বক্তৃতা করিতেছেন, তাহা আমরা নিজের ঘরে বসিয়াই শুনিতে পাইতেছি। পৃথিবীর কোন্ দূরতম প্রান্তে একটি ঘটনা ঘটিল, পরমুহূর্তে বেতারবার্তার সাহায্যে এই সংবাদ জগতের অন্যপ্রান্তস্থিত মানুষের কাছে গিয়া পৌঁছিল। পৃথিবীর দূরত্ব ও মানুষে-মানুষে ব্যবধানটি যেন আজ একেবারে ঘুচিয়া গিয়াছে, জগদ্বাসীর মানসমিলনক্ষেত্রটি সহজ ও প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষে-মানুষে এই যে ঘনিষ্ঠ মিলনের ভাব, ইহাই তো আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। রেডিওফোন মানুষকে শুধু আনন্দবিতরণের মাধ্যম নয়—কেবলমাত্র সংগীত, অভিনয় ইত্যাদি শুনাইয়াই ইহার প্রয়োজন শেষ হইয়া যাইবে না—ইহা মানুষকে দিবে শিক্ষার আলো, তাহার দ্বারে পৌঁছাইয়া দিবে জ্ঞানের বার্তা। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ-নীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ক নূতন নূতন ভাবধারা ও চিন্তাধারা জগতের মধ্যে নিরন্তর যে-আলোড়ন সৃষ্টি করিতেছে, তাহার সঙ্গেও সহজে প্রত্যেক মানুষের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটাইয়া দিতে পারে এই বিস্ময়াসহ যন্ত্রটি।

বর্তমানে উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষাপ্রচার ও নানাবিধ জনকল্যাণের ক্ষেত্রে খুব দায়িত্বগ্রহণ করিয়াছে সেখানকার বেতার প্রচারকেন্দ্রগুলি। অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে [illegible] ব্যক্তিদের মনের আনন্দ ও জ্ঞানবিতরণের ক্ষেত্রে বেতারকেন্দ্রের প্রচেষ্টা [illegible] প্রশংসার্হ। মানুষকে মানুষ করিয়া তোলা, তাহাকে পরিপূর্ণ জীবনের পথ-[illegible] দেওয়া পাশ্চাত্য দেশগুলির [illegible] নিজেদের প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। ঐ সকল দেশের বেতারবার্তার [illegible] আদর্শ যদি আমাদের দেশেও অনুসৃত হয় তবে অশিক্ষিত মানুষ নিজেদের মনুষ্যত্ববিকাশের ক্ষেত্রে অনেকখানি সুযোগ লাভ করিবে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় শিক্ষাব্যাপারে আমরা অবিশ্বাস্যভাবে পিছনে পড়িয়া আছি। অশিক্ষা ও কুশিক্ষা যাদের মনের চারিদিকে অন্ধকারের প্রাচীর

তুলিয়া দিয়াছে। এদেশের সরকার ইচ্ছা করিলে বেতারবার্তার সাহায্যে অতিসহজে জনশিক্ষা সম্পর্কিত বিরাট দায়িত্ব পালন করিতে পারেন, কুসংস্কারে-আচ্ছন্ন দেশবাসীর চিত্তদৈন্য দূর করিতে পারেন। লঘুপ্রকৃতির গীতবাদ্য, নীচু স্তরের অভিনয়কে প্রাধান্য না দিয়া, বেতারে যদি মনীষীদের নানা বিষয়িনী বক্তৃতাপ্রচারের ব্যবস্থা করা হয়, সর্বস্তরের নরনারীর জন্য যদি প্রচারসূচী প্রস্তুত করা যায় তবে অল্পকালমধ্যেই লোক-সাধারণ অশিক্ষা ও কুশিক্ষার হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারে। রেডিওকে শুধু শহরের সীমায় আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না—গ্রামে গ্রামে যাহাতে সকলেই বেতারবার্তা শুনিবার সুযোগ পায় সরকারকে তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বেতারবার্তা আজ মানুষের কত বিচিত্র প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে। সমুদ্রগামী স্টীমারে, আকাশচারী এরোপ্লেনে, দুর্গম স্থলপথ জলপথের যাত্রীদের সঙ্গে, একটা করিয়া রেডিও-যন্ত্র থাকে। সংবাদপত্রের দৈনন্দিন খবর সরবরাহের জন্য বেতারবার্তা অবশ্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু বর্তমান যুগে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার একদিকে যেমন মানুষের বহুবিধ কল্যাণসাধন করিতেছে, অন্যদিকে, মানুষকে নানাভাবে বিপথগামী করিয়াও তুলিতেছে। যুদ্ধকালীন পৃথিবীতে দেখা গিয়াছে, বেতারবার্তা মিথ্যাপ্রচারের দ্বারা দেশে জনগণকে সর্বনাশের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, তাহাদের বিভ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত করিয়াছে। এজন্য দায়ী হইল হীনস্বার্থপ্রণোদিত মানুষের অশুভ বুদ্ধি। বেতারবার্তা প্রচারের পিছনে যদি শুভবোধের প্রেরণা বর্তমান থাকে তবে ইহা বিশ্বের জনকল্যাণের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিতে পারে। বেতারবার্তার এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎই আমাদের কাম্য।

যুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি

অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটল। বিংশ শতকের ভয়াল শ্মশান-প্রান্তরে বসে আমরা শুনলাম মিত্রশক্তির বিজয়বার্তা। এই যুদ্ধজয়ের মূল্য—অজস্র শোণিতপ্ত অগণিত মানুষের আত্মবলি। এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের হাত থেকে পৃথিবী করিল। উনিশ-শ উনচল্লিশ সালে জার্মানীর পোল্যাণ্ড-অভিযানের য়ুরোপে সর্বাত্মক সংগ্রামবহ্নি জ্বলে ওঠে। উনিশ-শ একচল্লিশ সালে অতর্কিত পার্লহারবার-আক্রমণে সেই অগ্নিশিখা এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এর পরের সুদীর্ঘ ছ'টি বছরের ইতিহাস স্বেদ, অশ্রু ও শোণিতের লেখায় গ্রথিত।

জার্মানী, জাপান ও ইতালী—এই তিনটি অক্ষশক্তি আজ শুধু পরাজিত মিত্রশক্তির পদতলে অবলুণ্ঠিত। 'ইংলণ্ড যুদ্ধে জয়ী হল বটে কিন্তু এর জয়ে

দিতে হয়েছে মহামূল্য। ইংরাজজাতি আজ একরূপ হৃতসর্বস্ব—কেবল আমেরিকাই অধুনা বিজয়উল্লাসে উল্লসিত। আমরা দেখলাম, পশুবল আর মানবসত্যের বিরোধী জিগীষা ও জিঘাংসার ওপর সাম্রাজ্যের যে-ভিত্তি গড়ে ওঠে তা পশুশক্তিরই প্রচণ্ড অভিঘাতে একদিন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে বাধ্য।

কেন এই যুদ্ধ? মানুষের দুর্নিবার লোভ, পৃথিবীর সংখ্যাতীত মানুষকে অবিরত শোষণে সর্বরিক্ত করবার বাসনা, উগ্র জাতীয়তাবশে উপনিবেশ স্থাপনের কুৎসিত ছলনা ও চাতুরী রয়েছে এই সংগ্রামের মূলে। সংগ্রামের আর্থনীতিক কারণের সঙ্গে এর রাষ্ট্রনীতিক কারণগুলিও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দ্বিতীয় মহযুদ্ধ জাতিতে-জাতিতে অমানবীয় সংঘাতের এই মূলীভূত কারণগুলি বিদূরিত করতে পেরেছে কী? যুদ্ধের অবসান ঘটল, কিন্তু পৃথিবীর কোটি কোটি আর্ত মানবের আকাঙ্ক্ষিত শান্তির শুভ্রচ্ছায়া কোথায়?

প্রথমমহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানী সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করবার কালে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন: 'পৃথিবী থেকে ভাবীযুদ্ধের কারণ আজ দূরীভূত হল।' ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর স্বরে স্বর মিলিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট বললেন: 'এই যুদ্ধের সঙ্গেই সাম্রাজ্যিক শোষণ এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সকল বীজ নষ্ট হল।' কিন্তু তাঁদের বিঘোষিত সেই ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়নি। কেন? এর উত্তর হল, যুদ্ধে আর্থনীতিক কারণগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না ঘটলে বিশ্বযুদ্ধের বিলুপ্তি কখনো ঘটতে পারে না। সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার লালসা, উপনিবেশ-স্থাপনের চক্রান্ত, শোষণভিত্তিক পুঁজিবাদ, শিল্পে অনগ্রসর দেশে লাভজনক অর্থ বিনিয়োগ প্রভৃতি যে-সব কারণে যুদ্ধ বাধে, ভার্সাই-সন্ধি সেই কারণগুলির কোনো প্রতিকার করতে পারে নি। ঐ সন্ধির মূলেই ভাবী যুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল।

প্রথমমহাযুদ্ধ অবসানের পর পৃথিবীর মানবসমাজ বিশ্বব্যাপী শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু সেই স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। সামরিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ পঁচিশ বছরের ব্যবধানেই তার দানবীয় হিংস্রতাকে নিয়ে পুনর্বার জগৎসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনেও আমরা শুনেছি সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার কথা। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামও শেষ হল, কিন্তু পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসল না। ফিরে আসবার কোনো লক্ষণ এখন পর্যন্ত লক্ষিত হচ্ছে না। মিত্রশক্তি বারবার ঘোষণা করেছে, এই যুদ্ধ ন্যায় ও সত্যের জন্যে, অত্যাচারীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। শত্রুর আঘাত থেকে মিত্রশক্তি অবশ্য আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে, কিন্তু ন্যায়ধর্মের মর্যাদা তারা রক্ষা করতে পারেনি।

এই যুদ্ধ যদি দুর্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচারের পথ রুদ্ধ করতে পারত তবে মানুষের এত দুঃখলাঞ্ছনাকে আমরা সার্থক মনে করতাম। কিন্তু যুদ্ধাবসানে নির্যাতিত মানবজাতি মুক্তি লাভ করল কোথায়? জাপানের আত্মসমর্পণের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলেছিলেন: 'It is a victory of liberty over tyranny'। কিন্তু পৃথিবীর পরাধীন জাতি তাদের হৃত স্বাধীনতা কি ফিরে পেয়েছে?

অত্যাচারীর উৎপীড়ন, ধনতন্ত্রের চক্রান্ত আর সাম্রাজ্যবাদীর দম্ভ অদ্যাবধি পূর্বের মতোই বর্তমান রয়েছে। ভার্সাইসন্ধিসর্তের অন্তরালে যেমন গুপ্তভাবে অবস্থান করছিল ভাবী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ, তেমনি, পটাস্‌ডাম-ঘোষণা আর অতলান্তিক চুক্তির মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে ভাবী তৃতীয় সার্বিক যুদ্ধের প্রলয়ংকর বিস্ফোরণের স্ফুলিঙ্গ।

আজ হয়তো ফ্যাসীবাদ, নাৎসীবাদ, জাপানের সামরিকবাদ আপাতদৃষ্টিতে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কি অবসান ঘটেছে? জাপান ও জার্মানীকে হীনবল করবার জন্যে মিত্রশক্তি বদ্ধপরিকর। কিন্তু ব্রিটেন, আমেরিকা এবং রাশিয়া নিজ নিজ সামরিক শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি করছে। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে অস্ত্রবলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। কিন্তু এই 'অতি-সাম্রাজ্যবাদ' নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রেখেছে হিংসা ও ধ্বংসের বীজ। যেদিন এই হিংসা ও প্রতিযোগিতার বীজ শাখা-প্রশাখায় আত্মবিস্তার করবে সেদিন কোন্ শক্তি ভয়াবহ সংগ্রামকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবে?

আজকের দিনের গোপন অস্ত্র আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা—যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ইত্যাদি দেশের একচেটিয়া সম্পত্তি বলে ঘোষিত হচ্ছে—কাল তা হয়তো অপরাপর রাষ্ট্রের কাছে গোপন থাকবে না, হয়তো এ অপেক্ষা ভীষণতর কোনো মরণাস্ত্র বৈজ্ঞানিক-গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হবে। আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রের উদ্ভাবিত প্রচণ্ড শক্তিধর বোমাকে 'ইন্দ্রের বজ্র' আখ্যা দিয়ে অনেকে হয়তো নিরাপত্তার হর্ষে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। কিন্তু ইন্দ্রের বজ্রকে প্রতিরোধ করবার শক্তিও আছে—বিষ্ণুর 'সুদর্শনচক্র'। সুতরাং অবিশ্বাস, ঈর্ষা, ঘৃণা, প্রতিশোধ প্রবৃত্তির সাহায্যে যুদ্ধকে কদাপি রোধ করা যাবে না। পরাজিত জাতিকে তার স্বাধিকার ফিরিয়ে না দিলে, মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধনে তাকে বাঁধতে না পারলে, দুর্বলকে শোষণ করার হীন প্রবৃত্তি সমূলে উৎপাটিত না করলে, সাময়িক বিরতির পর আবার যুদ্ধের আত্মপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবী।

বিশ্বশান্তির অভ্যুদয় হবে কোন্ পথে? সর্বজাতির, সর্বমানবের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়ে যদি বিশ্বরাষ্ট্র গঠিত হয়, যদি মানুষ হিসাবে প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা স্বীকৃত হয়, ধনতন্ত্রের চিতাভস্মের ওপর যদি সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় তবে হয়তো পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসবে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুঁজিপতির লাভালাভের প্রশ্নই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। অতিরিক্ত লাভের মোহই উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠার দিকে তাদের ক্রমাগত আকর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু পৃথিবী যতই বিপুলা হোক, এর ব্যাপ্তি অশেষ নয়। সেজন্যে নতুন উপনিবেশ স্থাপন যখন আর সম্ভব হয় না, তখন প্রাচীন উপনিবেশগুলিকে করতলগত করবার জন্যে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেখা দেয় দারুণ সংঘর্ষ—একেই বলি আমরা সংগ্রাম। কিন্তু সমাজতন্ত্রী উৎপাদন-ব্যবস্থায় লাভের কোনো প্রশ্ন থাকে না, সুতরাং সেখানে পররাজ্য-শোষণের স্থানও নেই। ভূমি ও মূলধনকে সমস্ত সমাজের সম্পত্তি করে তুলতে

পারলে আর্থনীতিক ও রাজনীতির বৈষম্য ও অনাচারের হাত থেকে মানুষ রক্ষা পাবে।

সংগ্রামকে সংগ্রাম দ্বারা প্রতিরোধ করা যায় না, যুদ্ধের মূল কারণগুলিকে অপসারিত করতে পারলেই তবে যুদ্ধের সম্ভাবনা বিদূরিত হবে। বর্ণবৈষম্য ও বর্ণবিদ্বেষ, জাতিবৈর, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক আধিপত্য পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে না গেলে যুদ্ধাবসানের কোনো আশা নেই। বৈদেশিক প্রভুত্ব কোনো দেশই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে চাইবে না, এবং কারো স্বাধীনতার দাবিকেও কোনো রাষ্ট্র ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

বাদবিসম্বাদ চাপা দিয়ে কিংবা জোড়াতালি-দ্বারা কিছুকাল থামিয়ে রাখতে পারলেই আসল সমস্যার সমাধান হবে না। ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ বা অশান্তির বারুদ ধূমায়িত হবার সুযোগ পেলে তার ফলে একদিন বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্রসংঘের শান্তিস্থাপনপ্রচেষ্টা অধুনা এই কারণেই ব্যর্থ হচ্ছে। আর্থনীতিক বুনিয়াদেও যে-বৈষম্য আজ বিকট আকার ধারণ করেছে, অবিলম্বে তাও দূর করতে হবে। অবিবেকী রাজনীতিক সাম্রাজ্যবাদ যদি অর্থনীতিক সাম্রাজ্যবাদের আসন অধিকার করে, কিংবা রাজনীতিক প্রভুত্বাবসানের যবনিকাপাতের পরেই যদি আর্থনীতিক প্রভুত্ব-প্রসারের অভিনয় আরম্ভ হয় তাহলে সে-পটপরিবর্তন দ্বারা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার আশা দুরাশা মাত্র।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইগুলিই বর্তমান পৃথিবীর দুরারোগ্য ব্যাধি। যাঁরা ঘোষণা করেন যে, তাঁদের সংগ্রাম নৈতিক সংগ্রাম, তাঁরাও যেমন বিশ্ববাসীকে প্রতারিত করেন,—যাঁরা পুঞ্জীকৃত অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে বলেন, তাঁদের আবেদন শান্তি ও ঐক্যের আবেদন, তাঁরাও ক্ষুধার্তকে দুঃখের পথে প্রলুব্ধ করেন। ধনদান নয়, মানদানও নয়—শক্তিদানই জগতের শ্রেষ্ঠ দান। কে কাকে কতখানি শক্তিশালী করে তুলবার সাহায্য করছে, তার দ্বারাই তাদের আন্তরিকতা ও সততা প্রমাণিত হবে।

যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব মৃত্যুহীন। সেই অপরাজেয় মনুষ্যত্বের উদ্বোধনই মানুষকে যুদ্ধের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে। সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা, ক্ষমা, উচ্চতর জীবনাদর্শ ইত্যাদির মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিশ্বশান্তির সোনার কাঠি। তারই স্পর্শে মানুষের হিংসাপ্রমত্ত চিত্তে আসবে পরিবর্তন। অস্ত্রবলে, পশুবলে পৃথিবীতে কোনো দিনই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না—[illegible] পারে না।

আমার প্রিয় বাঙালি-কবি

আমার প্রিয় বাঙালি-কবি কে এ যদি কেউ প্রশ্ন করেন, নির্দ্বিধায় বলব—কাজি নজরুল ইসলাম। নজরুলসাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক আমি। নজরুলের অগ্নিঝলসিত বাণী, তাঁর অনিরুদ্ধ যৌবনশক্তির গীতিময় প্রকাশ, তাঁর বন্ধনঅসহিষ্ণু চিত্তের আগ্নেয় দুর্দান্ততা আমাকে অভিভূত করে। নজরুল ইসলামের কবিতা আমার সমস্ত প্রাণে আশ্চর্য উন্মাদনা জাগায়, রক্তে তরঙ্গ তোলে। এ পড়তে বসে মুহূর্তে আমি এক নূতন মানুষ হয়ে উঠি যেন। তখন এই মুক্তিপাগল কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে দিগ্‌দেশে ঘোষণা করতে বাসনা হয়:

'আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ,
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার
খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধা।'

নজরুল অমেয় প্রাণময়তার বহ্নিমান প্রতিমূর্তি, তাঁর ললাটে চিরযৌবনের রাজটিকা। কবির কাব্যসংসারে প্রবেশ করলে ঊর্ধ্বকাশে দেখি ঝঞ্ঝার আলোড়ন, নিম্নদেশে মাটির শ্যামল কোমলতা। এখানে ঝড় উঠলেও স্নিগ্ধশীতল বর্ষণে কোনো বাধা নেই। প্রধানত কম্বুনাদ, পুরুষকণ্ঠস্বরের জন্যে নজরুল ইসলাম বাঙ্‌লা কাব্যসাহিত্যে অনন্য ব্যক্তিত্ব। বাঙালির ললিত গীতের রাজ্যে তিনি আমাদের শোনালেন রণক্ষেত্রের তূর্যধ্বনি। নজরুল রক্তটগবগানো গান গেয়ে তরুণ-প্রাণ সবলে কেড়ে নিয়েছেন। তাই, তাঁর প্রতি আমার অনুরাগসিক্ত পক্ষপাত অতিমাত্যন্তিক।

বাঙ্‌লাদেশে কবির সংখ্যা অল্প নয়। এঁদের মধ্যে একজন তো মহা-প্রতিভাধর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ বিশিষ্ট কবিরাও আছেন। তথাপি নজরুল যে আমার এত প্রিয় তার কারণ হল, রবীন্দ্রের দূরচারী কল্পনার সৃষ্টি অত্যুচ্চ ভাবলোক আমার নাগালের বাইরে, নিবিড়হৃদয়ানুভবের স্পর্শশূন্য বলে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা আমাকে তেমন আকৃষ্ট করে না; যতীন্দ্রনাথের কবিতায় কেবল মরুপ্রান্তরের মরুশ্বাস, মরুমায়ার বিভ্রান্তি; মোহিতলালের দার্শনিক-জীবনজিজ্ঞাসার জগতে আমি প্রবেশপথ পাই নে; জীবনানন্দের সূক্ষ্ম-কল্পনায়-গড়া স্বপ্নলোক আমার অনভিজ্ঞ মনের রূঢ় স্পর্শে ছিঁড়েকুঁড়ে যায়। পক্ষান্তরে, নজরুলের কবিতায় সংসারে আমার নির্বাধ আনাগোনা। ভাবের সমুচ্চতা কিংবা চিন্তার জটিলতা, ভাষার কাঠিন্য কিংবা প্রকাশরীতির সূক্ষ্মতা—কিছুই আমাকে এখানে বাধা দেয় না। এ কবির কবিতা বুঝবার জন্যে নয়, হৃদয়টি খুলে ধরে কান পেতে শুনলেই হল। তখন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সহসা চমকে উঠতে হয়। কেবল আমারই প্রিয় কবি

কি নজরুল? আর কোন্ বঙ্গীয় কবি তাঁর মতো এতখানি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন?

বৈশাখীঝটিকা তার সহজ প্রবলতায় প্রকৃতিলোকে যেমন তীব্র আলোড়ন জাগায়, নজরুল ইস্লামের চকিত আবির্ভাব বাঙ্লা সাহিত্যে একদা তেমনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তারুণ্যের পতাকা উড়িয়ে তিনি আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। নতুনের বিজয়কেতন উড়তে দেখে বাঙালিপাঠক সেদিন কী উল্লসিত হল—জয়ধ্বনি করে তারা কবিকে স্বাগত জানাল। 'বিদ্রোহী' কবিতাটির প্রকাশ বাঙ্লা কাব্যের ক্ষেত্রে স্মরণীয় একটি ঘটনা। আবেগের প্রচণ্ডতা এখানে চরমে উঠেছে, কবিপ্রাণের সংগীতবাহিত উদ্দামতা দিশাহারা হয়ে পড়েছে, এ কবিতার বাঁধভাঙা ভাব-বন্যার মুখে পড়ে পাঠকচিত্ত কোথায় ভেসে গেল। এই একটিমাত্র কবিতা নজরুলকে খ্যাতির তুঙ্গশিখরে তুলে ধরল। এরকম চমকপ্রদ ব্যাপার সাহিত্যে বড়ো একটা ঘটে না।

নজরুলের আবির্ভাবকালটির দিকে একবার দৃষ্টি ফেরানো যাক।

বিংশ শতকের প্রথমভাগে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনমোচনের আগ্রহ সমস্ত বাঙালিজাতিকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল, এবং তা উত্তরোত্তর বর্ধিত হচ্ছিল। উনিশ-শ পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী-আন্দোলনের শুরু। বয়কট, রাখীবন্ধন ইত্যাদি নিয়ে সেদিন গোটা বাঙ্লাদেশ কীরূপ উত্তেজনা-উদ্দীপনায় মেতে উঠেছিল আজকের দিনে তা পরিমাপ করা কঠিন। নজরুল তখন ছ-বছরের শিশু। তারপর উনিশ-শ আট সাল। সেই অবিস্মরণীয় বোমার যুগ—ক্ষুদিরাম-কানাইলালের যুগ। আট-নয় বছরের বালক তখন নজরুল ইস্লাম। বাঙ্লার ওই বিপ্লবী ছেলেদুটির ফাঁসির কথা—বারীন ঘোষ প্রভৃতির দ্বীপান্তরের কাহিনী—সে কি কখনো ভুলবার? বিপ্লবপ্রচেষ্টার সেই রক্তরাঙা দিনগুলি ভাবপ্রবণ বালক নজরুলের মনে কী ছাপ এঁকে দিয়েছিল, আমরা জানিনে। 'একবার বিদায় দে, মা, ঘুরে আসি' ধরণের গান এ বালকের কানে নিশ্চয়ই প্রবেশ করেছিল। বিপ্লবীদের মৃত্যুমাতাল জীবনের প্রলয়োল্লাস তাকে প্রাণবলিদানের উৎসাহে কি উদ্দীপিত করে তোলেনি?

উনিশ-শ চৌদ্দ সালে প্রথমবিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে নজরুল সেনাদলে যোগ দিলেন। স্কুলের পড়া ছেড়ে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে করাচীতে চলে এলেন। যুদ্ধ শেষ হলে [১৯১৮], নজরুল হাবিলদার হয়ে ফিরে এলেন। তখন তাঁর বয়স আঠার-উনিশ। এ সময়ে বিপ্লবী-বীর বারীন ঘোষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে তিনি বাঁধা পড়লেন। মেতে গেলেন স্বদেশী হাঙ্গামায়। জেলে গেলেন। বেদুইন নজরুল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। ভাঙার গান লেখার প্রেরণা পেলেন। এভাবে উদ্দাম 'বিদ্রোহী'-কবিজীবনে তাঁর নেমে পড়ার ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হতে লাগল।

তারপর উনিশ-শ কুড়ি সালের দিকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে

আরম্ভ হল অসহযোগ-আন্দোলন। এই বিরাট আন্দোলনের ঢেউ দেশের দিকে দিকে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল। তার সঙ্গে এসে যুক্ত হল মুসলমানসমাজের খিলাফৎ-আন্দোলন। এর পশ্চাৎপটে রয়েছে চতুর ইংরেজের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের এবং পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের বিষাক্ত স্মৃতি। দেশ তখন অহর্নিশ টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে তপ্ত কটাহের মতো—বিশেষ রূপে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী। নজরুল ইস্‌লামের প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' বেরুল এই সময়ে [১৯২২]। সময়টি লক্ষ্য করতে হবে। এখন নজরুলের বয়স তেইশ। মনে রাখা প্রয়োজন, দেশব্যাপী জনজাগরণের যুগে নজরুলের শ্রেষ্ঠ কবিতার অনেকগুলি রচিত হয়েছে।

আরো স্মর্তব্য, সাহিত্যসংসারে তখন চলেছে কবি-রবীন্দ্রের 'বলাকা'র যুগ। রবীন্দ্রনাথ যখন বাঁধনহারা দুরন্ত যৌবনের জয়সংগীত উচ্চারণ করছিলেন, যখন তিনি 'আধমরাদের ঘা দিয়ে' বাঁচাবার জন্যে নিত্যুজ্জ্বল সবুজকে—দুরন্ত কাঁচা অবুঝকে—হাঁক ছেড়ে ডাক দিচ্ছিলেন, তখনই চিরদুরন্ত নজরুলের কবিপ্রতিভার উন্মেষ। রবীন্দ্রকবির 'সবুজের অভিযান'এ নজরুল ইস্‌লাম যোগ না দিয়ে পারেন নি। যৌবনের কবি রবীন্দ্রের ডাকে, আর সেকালে বাংলাদেশে তথা বিশাল ভারতবর্ষে পাগলা হাওয়ার যে মাতামাতি শুরু হয়েছিল তাতে সাড়া দিয়ে, নজরুল অকস্মাৎ একদিন 'ঝড়ের মাতন বিজয়কেতন নেড়ে, অট্টহাস্যে আকাশখানি ফেঁড়ে' 'বিদ্রোহী'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। নজরুল ইস্‌লাম বাঙালির সেই নবজীবনভাবুকতার কবি। এককথায়—যুগের কবি।

যুগপ্রতিনিধি-কবি নিজের চারদিকে তাকালেন। কী দেখলেন তিনি? দেখলেন—দৈন্যে, দারিদ্র্যে, অভাবের পীড়নে, বাংলাদেশ—ভারতবর্ষ—জর্জরিত হয়ে গেছে। তার মুখেচোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি নেই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৈত্য দানব-রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত। এর প্রতিকার চাই-ই। তখন কবিবিদ্রোহী নজরুল তাঁর রুদ্র-'সুন্দর'-এর কাছে এই বলে অস্ত্র দাবি করলেন:

'দাও, বন্ধু, দাও আমায় দুধারী তলোয়ার, দাও আমায় তোমার বিপ্লবের বিষাগ্-শিঙা, দাও আমায় অসুরসংহারী ত্রিশূল-ডমরুধ্বনি; দাও আমায় ঝঞ্ঝাজটিল জটা, দাও আমায় বাংলার সুন্দরবনের বাঘাম্বর; দাও ললাটে প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা, দাও আমার জটাজুটে শিশুশশীর স্নিগ্ধ হাসি; দাও আমায় তৃতীয় নয়ন, সেই তৃতীয় নয়নে অসুর-দানববিধ্বংসী শক্তি......'

কবির 'সুন্দর' কবিকণ্ঠে জোগালেন অগ্নিস্রাবী বাণী। নজরুল একের পর এক লিখে চললেন উদ্দামতাভরা কবিতা আর গান; একটি একটি করে বেরুল অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, প্রলয়শিখা, ভাঙার গান, ফণিমনসা, সর্বহারা, সাম্যবাদ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। সেদিন রাজরোষ কবির উন্নত শিরকে অবনমিত করতে পারেনি, ইংরেজসরকারের রক্তচক্ষুর শাসন তাঁর লেখনীকে স্তব্ধ করে দিতে সমর্থ হয়নি। বজ্রমন্ত্রে তিনি ঘোষণা করলেন: 'আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস, আমি আপনাকে ছাড়া করিনে কাহাকে

কুর্নিশ'। বিদ্রোহী কারো কাছে মস্তক নত করে না। সর্বপ্রকার অন্যায়অবিচারের বিরুদ্ধে তার আপোষহীন সংগ্রাম। আর, শান্তি সম্বন্ধে যার কথা হল :

'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশেবাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ ভীম-রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।'

নজরুল নির্যাতিত মানবতার কবি, সর্বহারা মানুষের ব্যথার কাব্যকার তিনি। প্রতাপের স্পর্ধা, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বর্বরতা, শাসনের নামে বিদেশির নির্লজ্জ শোষণ, মানবসত্যের কণ্ঠরোধ, জাতের বজ্জাতি,—এ সমস্তই যুগসচেতন ও সমাজসচেতন কবি প্রত্যক্ষ করছেন, অত্যাচারিত মানবগোষ্ঠীর আর্তনাদ তিনি শুনেছেন। মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা তাঁর প্রাণপুরুষকে বিদ্রোহী করে তুলেছে, 'উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল'-ই তাঁকে জুগিয়েছে হাতে লেখনীর তলোয়ার তুলে নেবার প্রেরণা। নজরুল ইস্‌লাম সংগ্রামী কবি, শিল্পী-যোদ্ধা—কবিতাকে তিনি যুদ্ধের হাতিয়ারে পরিণত করলেন।

তাঁর বিদ্রোহ সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে, স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, ধর্মীয় ভণ্ডামির বিরুদ্ধে—চতুর্ধারের অনাচার, কুশ্রীতা ও অশুভবুদ্ধির বিরুদ্ধে। অপমানিত, বিক্ষুব্ধ জনগণের ক্ষোভ-রোষ-ঘৃণা, ও জলন্ত আক্রোশকে তিনি সংগীতে বেঁধেছেন। এমন তেজোদৃপ্ত পৌরুষ, সর্বপ্রকার অসত্য-অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে বহ্নিদীপ্ত ভাষায় এমন বিদ্রোহঘোষণা বাংলা কাব্যে, নজরুলের আবির্ভাবের পূর্বে কদাপি শোনা যায় নি। নিঃস্ব রিক্ত লাঞ্ছিতের স্বেদ-রক্ত-অশ্রুই নজরুল ইস্‌লামের কাব্যকবিতার প্রধান উপকরণ। নজরুলের 'আমার কৈফিয়ৎ'-নামীয় কবিতাটি হতে কয়েটি পঙ্‌ক্তি নীচে তুলে ধরছি, এ থেকে তাঁর কবিচরিত্রটি অনায়াসেই বুঝে নিতে পারা যাবে :

'বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড়ো বিষজ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই, যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা, তাই, লিখে যাই এ রক্তলেখা,
বড়ো কথা বড়ো ভাব আসেনাক মাথায়, বন্ধু, বড়ো দুখে ;
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে।
পরোয়া করি না বাঁচি বা না-বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেল,
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটির মুখের গ্রাস—
যেন লেখা হয় আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ।

শ্রেণীবৈষম্য, ধনীদরিদ্রের প্রভেদ, দুর্বলের রক্তমোক্ষণ, মানবপ্রেমিক কবিকে একেবারে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। সমানাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সুস্থ মানবসমাজের প্রতিই তাঁর দৃষ্টি ছিল স্থিরবদ্ধ, সমষ্টিমানুষের কল্যাণই ছিল তাঁর প্রার্থিত।

তিনি বুঝেছিলেন : 'মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, নাই কিছু মহীয়ান্।' অত্যাচারী শাসকের দুঃশাসনের অবসান হোক, গণমুক্তির সংগ্রাম জয়যুক্ত হোক, নিরন্ন জনতার দুঃখের রাত্রি কেটে যাক্, তাদের সম্মুখে 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার' অনর্গলিত হোক— নিজের কবিতা ও গানের মাধ্যমে নজরুল বারংবার এই প্রার্থনাই উচ্চারণ করিয়াছেন। তাঁর শিল্পচর্যা সমাজসেবার নামান্তর মাত্র।

সম্প্রদায়মূলক কিংবা জাতিভেদমূলক কোনো প্রশ্ন কবির চিত্তকে সংকীর্ণতার পথে পরিচালিত করেনি, তাঁর কাছে স্বদেশ ও স্বজাতিই ছিল সবচেয়ে বড়ো সত্য। হিন্দু আর মুসলমানকে তিনি বাঙলামায়ের দুই সন্তানরূপেই দেখেছিলেন। পারস্পরিক হানাহানিতে জাতির বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে তার 'বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান' ফেনিয়ে উঠেছে। তিনি জানতেন, হিন্দুমুসলমান উভয়কেই 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' একসঙ্গে উত্তীর্ণ হতে হবে। তাই, ১৩২৩ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শুরু হলে, কবি 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'-ধ্বনিতে বললেন :

'হিন্দু না ওরা মুস্লিম, ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।'

রাজনৈতিগত কুটিল চিন্তাতর্ক, দলগত অনুদারতা তাঁকে স্পর্শ করেনি, তিনি সব-কিছুর উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন সাজাত্যবোধকে, এবং তার সঙ্গে, শুচিশুভ্র মানবতাকে।

নজরুল ইস্লাম কবিতা লিখেছেন প্রচুর, গান লিখেছেন অজস্র। এসব কবিতা ও গানের সুবৈচিত্র্যও কম নয়। তাঁর কবিতাগুলিকে—স্বদেশী কবিতা, প্রেমের কবিতা, নিসর্গমূলক কবিতা ইত্যাদি—কয়েকটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়। গানগুলিকে— স্বদেশী, প্রেমের, হাসির ও আধ্যাত্মিক—মোটামুটি এই কয়টি ভাগেভাগ করা চলে। তাঁর লেখায় দোষগুণ দুই-ই আছে। কবিতাগুলিতে একদিকে দেখা যায় কবিশক্তির আশ্চর্য অজস্রতা, অন্যদিকে দেখা যায় ওই শক্তির উচ্ছৃঙ্খল অপচয়। এদের মধ্যে আবেগের উদ্বেলতা আছে, প্রাণের উত্তাপ আছে, ধ্বনিকল্লোল আছে। তথাপি প্রায়শ এগুলি উত্তম কারুকর্ম হয়ে ওঠেনি। তার কারণ হল, কবি কখনো সতর্ক হয়ে লেখেন নি, লেখার পরিমার্জনা কাকে বলে তা তিনি জানতেন না, তাই, এদের মধ্যে শিল্পসংগত পারিপাট্যের অভাব। গানগুলি অধিকাংশই ফরমাইশি। কাজেই, কবির বেশির ভাগ গানে নিবিড় রসানুভূতির স্পন্দন নেই। তবে দেশপ্রেমের গানে, ভক্তির গানে, সত্যিই তিনি নিবিষ্টচিত্ত শিল্পীসাধক। কবিতার শিল্পগত অপরিচ্ছন্নতা এজাতের সংগীতে তিনি অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন। এসব দোষগুণ নিয়েই নজরুলের কাব্যকবিতা।

খুব বড় কবি হবার বাসনা নজরুল পোষণ করতেন না। নিজের ক্ষমতার সীমা কোথায় তা তাঁর অজানা ছিল না। যুগের দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে বিদ্রোহের সুরে গান বাঁধতে তিনি এসেছেন, এবং তা-ই তাঁর কাছে যথেষ্ট মনে হয়েছে। তিনি

তো নিজেই আমাদের শুনিয়েছেন—'বর্তমানের কবি আমি ভাই ভবিষ্যতের নই নবি'। এতে সমালোচকের কাজ অনেকখানি সহজ হয়ে গেছে। তাঁকে আমরা মহৎ কবিশিল্পী বলব না, যুগোত্তীর্ণ কবির আসনে বসাব না। কিন্তু এই সত্যটি অবশ্য স্বীকার করে নেব যে, একটি জাতির সাময়িক আশা-উদ্দীপনার এমন বিশ্বস্ত প্রতিনিধিত্ব একালের আর কোনো বাঙালি-কবিই করতে পারেনি। নজরুলের এই উজ্জ্বল অনন্যতা সর্বজনস্বীকৃত।

নজরুল উচ্চভাবনাযুক্ত কবিতা লেখেননি, তাতে কী আসে যায়। যুগের কণ্ঠে তিনি ভাষা দিয়েছেন—এর মূল্যও কি কম? পরাধীনতার জ্বালার অসহনীয়তা, রাজনৈতিক মুক্তির সুতীব্র পিপাসা, হিন্দু-মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ঐক্য, দারিদ্র্যের দুর্বিষহ দুঃখ যে-কবি এমন আবেগময়ী ভাষায় বাণীবদ্ধ করেছেন তাঁকে আমরা অভিনন্দন না জানিয়ে পারিনে

নজরুল ইসলাম আমাকে তাঁর অফুরন্ত প্রাণের শক্তিভরা সান্নিধ্যে নিয়ে আসেন সৈনিকব্রত নিতে উৎসাহিত করেন। সৈনিক হতে চাই আমি। একারণে তিনি আমার অতিশয় প্রিয় কবি। আমার এই মনোভাব যাঁদের রয়েছে তাঁরাও নজরুলকে অতিঅবশ্যই নিজেদের প্রিয় কবি বলে জানবেন।

রবীন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা ও বাঙলা সাহিত্য

বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রের দানের পরিমাপ হয় না। আমাদের সাহিত্যকে রূপে-রসে তিনি অতিশয় সমৃদ্ধ করে তুলেছেন শুধু এটুকু বললে খুব সামান্যই বলা হয়—রবীন্দ্র কবির অসামান্যপ্রতিভার স্পর্শে বাঙলা সাহিত্যে হাজার বছরের পরমায়ু পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। বাঙালির সাম্প্রতিককালের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধানতম পুরুষ তিনি।

রবীন্দ্রপ্রতিভার সবচেয়ে বড়ো প্রকাশক্ষেত্র কাব্যকবিতা—রবীন্দ্রের প্রথম ও শেষ পরিচয় তিনি কবি। এই বাণীসিদ্ধ পুরুষ নিজেই বলেছেন, কবিতা তাঁর জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান। রবীন্দ্রনির্মিত সাহিত্যের যে বিপুল বিস্তার পরিধি তার সবটুকু জুড়ে চিরকালীন এক কবিসত্তার বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, চিত্তহারী অপূর্ব কাব্যব্যঞ্জনার ঝংকার শ্রুতিগোচর হয়।

গীতিকবিতার উন্মুক্ত নভোদেশে এই কবিবিহঙ্গের বাধাহীন পক্ষবিস্তার। জগৎ ও জীবনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে মানবচিত্তে যতপ্রকার ভাবের উদয় হয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যতসব অনুভূতির কম্পন জাগে, রবীন্দ্রনাথের সপ্তস্বরা কাব্যতন্ত্রীতে তা অশ্রুতপূর্ব রাগিণীর সুরমূর্ছনার মাধ্যমে ধ্বনিত হয়েছে। মানুষ ও প্রকৃতি রবীন্দ্র-

কাব্যে একটা নতুন অর্থ পরিগ্রহ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের কবি—প্রকৃতির কবি; 'বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা', 'বহু দিবসের সুখেদুখে আঁকা', 'লক্ষ যুগের সংগীতমাখা' এই যে সুন্দর ধরাতল' তাতে আসন পেতে কবি মর্তভূমির প্রাণের গান গেয়েছেন। প্রগাঢ় প্রকৃতিপ্রেম ও অগাধ মানবপ্রীতি আমাদের মহাকবির নির্মিত স্মরণসুন্দর কাব্যলোকটিকে সুদীপ্ত বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছে। এই মাটির পৃথিবীর দিকে রূপে-রসে-গন্ধে-শব্দে যে-অফুরন্ত প্রাণময়তার সমারোহ চলেছে, রবীন্দ্রনাথ তারই অদ্বিতীয় কাব্যকার। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'—এ দুটি স্মরণীয় পঙ্‌ক্তির মধ্যে রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধান সুর—অনিঃশেষ মর্তমমতা ও মানবমুখিতা—গুঞ্জিত হয়েছে। জগৎকে ভালোবেসেছেন, মানুষকে প্রীতির আলিঙ্গন জানিয়েছেন—নিজের কাব্যকবিতায় এসব কথা কবি কতবার আমাদের শুনিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবি, তাঁর চোখে নিসর্গপ্রকৃতি জীবন্ত একটি সত্তা। এই সজীব সত্তার সঙ্গে তিনি নিবিড় আত্মীয়তা—তারো চেয়ে বেশি, নিজের একাত্মতা, অনুভব করেন। নিগূঢ় প্রকৃতিপ্রেম বা অসাধারণ পৃথিবীপ্রীতিই রবি-কবির সর্বানুভূতি অর্থাৎ বিশ্বৈকানুভূতির মূল উৎস। প্রবল রোমান্টিক কল্পনা কবিকে সুদূরের অভিসারী করেছে, এক মায়াচ্ছন্ন স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে, রহস্যের সন্ধানী করে তুলেছে। সৌন্দর্যবিধুরতা, নিরুদ্দেশ-সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা, অকারণ বিরহবিষাদ—অসংখ্য গীতি-কবিতায় প্রতিফলিত এসকল বস্তুও রবীন্দ্রের রোমান্টিক কবিমনের পরিচয়বাহী। কী ব্যক্তি-জীবনে, কী কাব্যজীবনে, রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্ম-প্রকৃতিক। কবির অরূপচেতনা ও অরূপসাধনার সঙ্গে তাঁর এই আধ্যাত্মিক মানসপ্রবণতার সংযোগ রয়েছে। তা ছাড়া কবির নিসর্গচেতনাও এর সঙ্গে যুক্ত। রবীন্দ্রের অনুভূত অরূপ বা বিশ্বলোকের প্রয়াশ নিসর্গলোকবিহারী, যদিচ মানবসংসারেও অরূপের নিঃশব্দ পদসঞ্চার তিনি শুনতে পেয়েছেন। তবে একথা ভুললে চলবে না যে, অরূপ সাধনা কবিকে জীবনবিমুখ করে তোলেনি, বরংচ তাঁকে জীবনপ্রেমিক করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ঈশ্বর-মুখিতা আছে, অজানার সন্ধান আছে, ভূমাপিপাসা আছে; কিন্তু তাঁর সর্বপ্রকার সন্ধান ও সাধনার পাদপীঠ হল জগৎ ও জীবন। জীবনরসরসিকতাই রবীন্দ্রের সমস্ত কবিতার প্রাণকেন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্যে নির্মাণ করেছেন এক অত্যুচ্চ ভাবলোক—সর্ববিধ সংকীর্ণতার স্পর্শ থেকে যা মুক্ত, জাতি, দেশ ও কালের ঊর্ধ্বে যার স্থিতি, নির্মল আনন্দধারায় যা অভিষিক্ত। কাব্যের ভাবলোকে প্রবেশ করলে পাঠক চিত্তোৎকর্ষের অধিকারী হয়, একরকম মুক্তির স্বাদ পায়—স্থূল জৈবজীবনের—ক্ষুদ্র বৈষয়িকতার—বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি। সুতরাং দর্শনের ভাষায় বলতে পারি, রবীন্দ্রকাব্যপাঠের ফলশ্রুতি হল জীবন্মুক্তি।

গীতিকবি বললে রবীন্দ্রের প্রতিভার স্বরূপটির পূর্ণায়ত পরিচয় দেওয়া হয় না। তাঁর কাব্যের মূল প্রেরণা সংগীতাত্মক—প্রাণের সুরকে তিনি গীতিময় বাণীর মাধ্যমে

ফুটিয়েছেন। কবির রচিত কাব্যজগৎটি অনবচ্ছিন্ন এক গীতধারা যেন, সংগীতরসে তা উচ্ছল। কত শত ভাব ও ভাবনা অহরহ আমাদের মনে জাগে, এদের আমরা প্রকাশ করিতে পারি না; ভাবকে বাণীরূপ দেবার শক্তি অধিকাংশ লোকেরই থাকে না। অথচ আমরা সকলে প্রায়শ প্রকাশব্যাকুল। রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই প্রকাশব্যথা কী পরিমাণে যে দূর করেছেন, ভাষায় তা বুঝিয়ে বলা কঠিন। কবিসার্বভৌম রবীন্দ্র নিজেই তো বলছেন:

না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে,
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে—
মাগিছে তেমনি সুর;
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু-চারিটি কথা
রেখে যাব সুমধুর॥

রবীন্দ্রনাথ আমাদের 'না-বলা বাণী'কে কবিতায় গেঁথেছেন, বাঙালির ভাষাকে আশ্চর্য প্রকাশক্ষমতা দান করেছেন; অনির্বচনীয়কে বচনগ্রাহ্য করে তুলেছেন। কবিহিসেবে এর চেয়ে আর বেশি কী তিনি করতে পারেন? শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা বলতে পারি: কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নাই।

রবীন্দ্রনাথের গীতাত্মক প্রতিভার সর্বোত্তম প্রকাশ দেখতে পাই তাঁর গানগুলিতে। গানের মধ্যে নিজের কবিসত্তাকে তিনি একেবারে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ গানের রাজা, সুরের গুরু। সারাজীবন ধরে কবি এত বিচিত্র গান লিখেছেন, পৃথিবীর কোন সাহিত্যে তার তুলনা মেলে না। তাঁর গানের বিশিষ্টতা—এগুলির মধ্যে কথা ও সুরের নিশ্ছিদ্র সমন্বয় ঘটেছে। ভাবব্যঞ্জনায়, ভাষার যাদুতে, সুরময়তায় রবীন্দ্রসংগীত এক আশ্চর্য সৃষ্টি। অন্যকিছু না লিখে, কবি যদি শুধু এই গীতিসম্পদগুলো রেখে যেতেন, তাতেও তিনি অমর হয়ে থাকতেন। একদা সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন:

যে-ভাবই ওঠে প্রাণের মাঝে
তোমার গানে সকলই আছে—

—রবীন্দ্রের কাব্যকবিতা ও গান সম্পর্কে এর চেয়ে সত্য কথা আর-কিছু হতে পারে না।

রবীন্দ্রপ্রতিভার বহুমুখিতার বিষয়ে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু কবিতা ও গানের ভূমিতে রবীন্দ্রের বিচরণ সীমিত নয়, ছোটগল্পরচনাতেও তিনি অদ্ভুত দক্ষতা

দেখিয়েছেন। বাঙ্‌লা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর গল্পের প্রবর্তক। এদেশে য়ুরোপীয় আদর্শের ছোট গল্প ছিল না, কবির প্রতিভা আমাদের এ অভাবটি পূরণ করল। রবীন্দ্রনাথের লেখনী থেকে অসংখ্য উৎকৃষ্ট ছোটগল্প বেরিয়েছে—গভীর কবিদৃষ্টি ও অনবদ্য বাণীসুষমায় এ দেশীয় সাহিত্যে এগুলির তুলনা নেই। বাঙালি-জীবনের ক্ষুদ্রপরিসর গণ্ডীর মধ্যে ছোট সুখদুঃখ, হাসিকান্নার যে স্রোতোরেখাটি ফল্গুর ন্যায় প্রবহমাণ তার স্পন্দনটি কবি তুলে ধরেছেন স্বরূত গল্পমালায়। লিরিকের স্পর্শ থাকলেও মধ্যবিত্তবাঙালির জীবনের উত্তাপ এদের মধ্যে অনুভব করা যায়। যতখানি সম্ভব, রবীন্দ্রনাথ এখানে বাস্তবের মাটিতে পা ফেলে চলেছেন। মানবরস ও প্রকৃতিরস এসব গল্পে যুক্তবেণী রচনা করেছে। 'গল্পগুচ্ছ' রবীন্দ্র-কবির মৃত্যুঞ্জিৎ কীর্তি।

আমাদের উপন্যাসসাহিত্যকেও রবীন্দ্রনাথ কম সমৃদ্ধ করেননি। বাঙ্‌লা উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের বিরচিত ভূমিতেই যদিও রবীন্দ্রের পদপাত তথাপি নিজের সৃজনীক্ষমতার শক্তিতে কবি একটি নতুন পথ কেটে এগিয়ে গেছেন। বাইরের ঘটনার ওপর জোর না দিয়ে, পাত্রপাত্রীর হৃদয়সংঘাত ও সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসগুলিতে প্রাধান্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রকৃত 'চোখের বালি' বাঙ্‌লা উপন্যাসের দিক্‌পরিবর্তন সূচিত করল। এ বইতে কবির আধুনিক মনের পরিচয় প্রস্ফুট। সমাজের হাওয়া কোন্‌দিকে বইছে তা লেখকের অজানা ছিল না, যুগের সঙ্গে সমান পদক্ষেপে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। কয়েকখানি উপন্যাসে লেখক অভিনব আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছেন, যেমন—'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে'। 'গোরা'র মতো মহৎ উপন্যাস বাঙ্‌লা সাহিত্যে অদ্যাবধি লেখা হয়নি। 'শেষের কবিতা', এককথায়, গদ্যলিরিক। সূক্ষ্ম কাব্যসৌন্দর্য একে উজ্জ্বল বিশিষ্টতা দিয়েছে। রবীন্দ্রের উপন্যাস শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের পথটি প্রশস্ত করে তুলেছে। কবির লিখিত উপন্যাসগুলি অবশ্যই ভাবধর্মী, কিন্তু তাই বলে এদের বাস্তবের সম্পর্কচ্যুত বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে বাস্তবতার কিছুটা তীক্ষ্ণতা হারিয়েছে কবির উচ্চ-আদর্শমুখিতার জন্যে। সে যা হোক, উপন্যাসের রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ যে আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত এতে মতদ্বৈধের স্থান নেই।

নাটকরচনাতেও কবির কৃতিত্ব কম নয়। এক্ষেত্রে অতুল্য গৌরবের অধিকারী অবশ্য তিনি নন, তথাপি তাঁর নাট্যরচনপ্রতিভাকে স্বীকৃতি জানাতে হয়।

প্রথমের দিকের নাট্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত নাট্যরীতি অনুসরণ করেছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি এক স্বতন্ত্র পন্থার আশ্রয় নিয়েছেন। এই পন্থাটি অর্থাৎ নাটকের এই অভিনব রূপরীতিটি তাঁর অপূর্ব লিরিককল্পনার উপযোগী। আমরা রবীন্দ্রনাথের রূপকসাংকেতিক নাট্যগুলির কথাই বলছি। গীতিকবি নাট্যকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ বলে কবির নাট্যকৃতি কাব্যের গা ঘেঁসে চলেছে। এদের গীতিধর্মী নাটক [Lyrical Drama] বা নাটকের আকারে কাব্য বলা যেতে

পারে। প্রচলিত আদর্শের নাটকে আমরা বহির্ঘটনার সংঘাত দেখি, কিন্তু রবীন্দ্রনাট্যের দ্বন্দ্ব অন্তর্জীবনের আদর্শের সঙ্গে আদর্শের, ভাবের সঙ্গে ভাবের, দ্বন্দ্বকেই কবি নাটকে প্রতিফলিত করেন। এখানে পাত্রপাত্রী মানবের হৃদয় ও মন, বাইরের প্রেক্ষাগৃহে এদের অভিনয় হলেও, এর আসল রঙ্গমঞ্চ হল মানুষের মনোলোক। এই অতিমাত্রিক ভাবধর্মিতার জন্যে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি এদেশে যেমন মঞ্চসাফল্য অর্জন করেনি। সাহিত্যরসজ্ঞেরাই কবির লেখা নাটকগুলিকে সমাদর দেখান, সাধারণ স্তরের দর্শক আর পাঠক এজাতীয় নাট্যরচনার রস উপভোগ করতে পারেন না।

নানাধরণের নাটক কবি রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর সর্বাধিক মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিতে। প্রথাগত নাটকের পর্যায়ে পড়ে না বলে স্বতন্ত্রভাবেই এদের আলোচনা বিধেয়।

রবীন্দ্রনাথের মনীষা ও মনস্বিতার অপর এক উজ্জ্বল নিদর্শন তাঁর বিপুলায়তন প্রবন্ধসাহিত্য। কবির গভীর মননশীলতা, নানামুখী ভাব ও ভাবনা, বহুবিচিত্র জিজ্ঞাসা এদের অতিশয় মূল্যবান সামগ্রী করে তুলেছে। রবীন্দ্রপ্রবন্ধমালার বিষয়বৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত করে—সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষাতত্ত্ব—কোনো কিছুই তাঁর ভাবুকতার বিস্তৃত পরিধি থেকে বাদ পড়েনি। এ ছাড়া রয়েছে তাঁর ভ্রমণকথা, ডায়েরি, চিঠিপত্র, আত্মজীবনী, ইত্যাদি গদ্যরচনা—ব্যাপক অর্থে এদেরও প্রবন্ধসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে।

প্রবন্ধ সম্পর্কে সাধারণভাবে আমাদের যে ধারণা, রবীন্দ্রনাথ তা বদলে দিয়েছেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধনিচয় যুক্তিপরম্পরার মাধ্যমে সত্যবিশেষের প্রতিপাদন মাত্র নয়—যুক্তিধর্মী, তথ্যনিষ্ঠ হলেও, এগুলিও সাহিত্যের স্বাদযুক্ত। লেখনভঙ্গির চারুতা কবির প্রবন্ধগুলিকে প্রকৃত সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে। তথ্য যখন রসের স্পর্শ পায়, সত্য যখন মাধুর্যসিক্ত হয়, তখন তা যথার্থ সাহিত্যের মর্যাদা পায়। রবীন্দ্রের প্রবন্ধও একপ্রকারের সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য।

রবীন্দ্রের কতগুলি প্রবন্ধে বিষয়ের প্রাধান্য, এখানে বক্তব্যই বড়ো। আবার, একশ্রেণীর প্রবন্ধ রয়েছে যেগুলিতে কবির অনুভূতিই প্রধান হয়ে উঠেছে। কবিত্বে, কল্পনায়, সূক্ষ্ম হৃদয়ানুভবের সৌকুমার্যে এজাতের রচনা বিশিষ্ট শিল্পমূর্তি পরিগ্রহ করেছে। কোনো সমস্যার অবতারণা নয়, উপদেশনা নয়, তত্ত্বপ্রচারণা নয়—আনন্দসৃষ্টিই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এইশ্রেণীর গদ্যবাহিত রচনা আমাদের সাহিত্যে আগে ছিল না, এ রবীন্দ্রনাথের নতুন সংযোজন।

কবি-নাট্যকার-গল্পলেখক-ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রের সঙ্গে পাঠকসাধারণের মোটামুটি পরিচয় আছে, কিন্তু প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথকে খুব কম লোকেই চেনেন। এখানে বলি, রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না, পৃথিবীর প্রথমশ্রেণীর প্রবন্ধলেখকদের

মধ্যেও তাঁর স্থান অভিউচ্চে। প্রবন্ধকর্মকে উপেক্ষা যেখানে রবীন্দ্ররচনার এক-চতুর্থাংশ বাদ পড়ে যায়।

বাঙলা সমালোচনাসাহিত্যেও রবীন্দ্রের দান সামান্য নয়। একে তিনি সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', ইত্যাদি বিখ্যাত গ্রন্থে তাঁর সমালোচনক্ষমতার অত্যুজ্জ্বল পরিচয় মুদ্রিত রয়েছে। কবি ও সমালোচকের সার্থক দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পৃথিবীর খুব কম লেখককেই দেখা গেছে—রবীন্দ্রের ক্ষেত্রে এ কিন্তু স্মরণীয় এক ব্যতিক্রম।

এককথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা সর্বতোমুখী। রচনার এমন কোনো রূপ নেই, তাঁর লেখনীস্পর্শে যা অপরূপ হয়ে ওঠেনি, যা রীতি বা ভঙ্গির নবত্বে অনন্য রম্যতা লাভ করেনি। পদ্য ও গদ্য—উভয় এলাকায় অতুলনীয় শিল্পী তিনি। তাঁর বাগ্‌বিভূতি আমাদের বিস্মিত করে, তাঁর রূপসৃষ্টির বৈচিত্র্য ও অজস্রতা দেখে আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি। বাণীকে স্ববশে আনার অত্যদ্ভুত ক্ষমতা ছিল রবীন্দ্রনাথের—আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণীশিল্পী তিনি। তাঁর অলোক-সামান্য প্রতিভার অফুরন্ত দানে বাঙলা সাহিত্য ধনী হয়ে উঠেছে, বাঙলা ভাষা রাজকীয় আভিজাত্য লাভ করেছে। বাঙালি জাতি যতকাল বেঁচে থাকবে, বাঙলা ভাষা যতদিন বিদ্যমান থাকবে, রবীন্দ্রনাথ ততদিন স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন। রবীন্দ্রনাথের মতো এতবড়ো বাণীসাধক অদ্যাবধি দুয়েক জনের বেশি জন্মাননি।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—এক বিরাট পুরুষ—পরমাশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর দিব্যজীবনলীলা অনুধাবন করলে একজন অতিসাধারণ মানুষেরও চোখে পড়ে যে, স্বর্গে-মর্তে তিনি এক সোনার সিঁড়ি রচনা করেছিলেন, গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে গড়ে তুলেছিলেন এযুগের নতুন বারাণসী। এই পৃথিবীর মাটিতে ছিল ঠাকুরের অবস্থান, কিন্তু মহাচৈতন্যে লীন তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব ক্ষণে-ক্ষণে দিব্যলোক স্পর্শ করত। সহাস্য প্রশান্ত তাঁর মুখমণ্ডল, তাতে সর্বদা অমর্তলোকের দীপ্তিবিচ্ছুরণ। মুহূর্তে-মুহূর্তে তিনি ভাবাবিষ্ট হতেন, বাহ্যহস্তে দেখা যেত পরমানন্দের মুদ্রা। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। এই আত্মানন্দী পুরুষের পরমহংস-রূপটি প্রত্যক্ষ করে সেইদিনকার অনেক মনীষীব্যক্তি নিজেদের জীবনকে ধন্য মেনেছেন।

বর্তমানকালের বাস্তবপন্থী যুক্তিবাদী মানুষ অবতারে বিশ্বাস করে না, ঊর্ধ্ব হতে পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবতরণ ও মানবকলেবরধারণ তাদের কাছে অসম্ভব একটি ব্যাপার। তথাপি ঋষিশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ ও মহাজ্ঞানী অরবিন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন। ঠাকুরকে আমরা অবতার নাই-বা বললাম, তিনি যে 'ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ' এতে সন্দেহ কী? এহেন একজন মহাপুরুষের লীলা বর্ণনা করতে বসেছি আমরা।

হুগলি জেলার কামারপুকুর বাংলাদেশের এক অখ্যাত পল্লী। ইংরেজি ১৮৩[illegible] সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি এই কামারপুকুর গ্রামের এক দরিদ্র কিন্তু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় আবির্ভাব। তাঁর জন্মকথা সম্পর্কে অনেক অলৌকিক ব্যাপার শোনা যায়। ঠাকুরের সমগ্র জীবনটিই তো লৌকিক-অলৌকিকের সীমারেখা ছুঁয়ে গেছে—মহাপুরুষদের জীবনে অলৌকিকতার স্পর্শ অবিরল। পিতা ক্ষুদিরাম ও মাতা চন্দ্রাবতী তাঁদের এই নবজাতকের নাম রাখলেন—গদাধর। শিশুর মুখে অপূর্ব লাবণ্য আর এক মহা আকর্ষণী শক্তি—দেখে সকলে মুগ্ধ হয়ে যায়।

গদাধর বড়ো হতে লাগলেন। পাঁচবছর বয়সে তাঁকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হল। কিন্তু পড়ায় ঠিকমতো তাঁর মন বসে না, অঙ্ক একেবারেই মাথায় ঢোকে না—যোগবিয়োগ, গুণভাগের হিসেব তাঁর বিশ্রী লাগে। তাঁর মনের গতি [illegible] সংসারী লোকের নয় এতে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল বেশ। রামায়ণ-মহাভারতের [illegible]কথকতা, ভক্তির গান, এসবে গদাধরের ভালো লাগে। যা শোনেন তখুনি মুখস্থ হয়ে যায়। গদাধর শ্রুতিধর। ছেলেবেলা থেকে তাঁর মধ্যে ভাবের ভাব দেখা যেত [illegible] এবং তার সঙ্গে ছিল ভক্তিপ্রবণতা। [illegible] গাঁয়ে, কিশোর [illegible] [illegible] দেখে উঠতেন, অতিথির [illegible] [illegible] হয়। [illegible]

[illegible] বছর বয়সে গদাধরের পৈতে হল। [illegible]
সেবাপূজার ভার তাঁর ওপর পড়ল। এর দুবছর আগে তাঁর বাবা লোকান্তরিত হয়েছেন। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব আপন হাতে তুলে নিয়েছেন তাঁর বড়ো ভাই রামকুমার। আর্থিক অভাবে পড়ে উপার্জনের আশায় রামকুমার কলকাতায় এলেন, ঝামাপুকুরে একটি টোল খুললেন। কিছুটা নিজের সাহায্য হবে বলে, আর কিছুটা গদাধরকে নিজের কাছে রেখে তাকে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে রামকুমার ছোট-ভাইকে একদিন কামারপুকুর থেকে ঝামাপুকুরে নিয়ে আসলেন। এ বুঝি বিধাতারই ইচ্ছা, গদাধরকে দিয়ে ঈশ্বর আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করবেন।

এদিকে রাণী রাসমণি [কলকাতার জানবাজারের বিখ্যাত ধনী রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী] একদা স্বপ্নাদেশ পেয়ে দক্ষিণেশ্বরে ষাট বিঘা জমি কিনে কালীমায়ের এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ শুরু করে দিলেন। কালীভক্ত ছিলেন তিনি। বিধবা হওয়ার পর কঠোর সংযমের মধ্য দিয়ে তাঁর দিনাতিপাত হত। তাঁর অকৃপণ দয়াদাক্ষিণ্যের কথা সকলেরই সুবিদিত। ১৮৫৬ ইংরেজি সালে বিশ্বমাতা শ্রীশ্রীজগদম্বাকে মন্দিরে স্থাপন করা হল। দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁকে খুব বড়ো একটি সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শূদ্রজাতীয়া রাসমণি দেবীকে অন্নভোগ দেবেন এ নাকি হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণেরা বললেন, শূদ্রের প্রদত্ত অন্নভোগ তাঁরা কিছুতেই গ্রহণ করবেন না। এহেন সংকটমুহূর্তে গদাধরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শাস্ত্রজ্ঞ রামকুমার এসে এমন এক বিধান দিলেন যা রাসমণির অন্নভোগ দেওয়ার পথে সকল বাধা দূর করল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সংকীর্ণতায় রাসমণি ব্যথিত হয়েছিলেন, রামকুমারের উদারতা দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। কালীমন্দিরের পূজার জন্যে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ চাই, রাসমণি ব্যবস্থাদাতা রামকুমারকে দেবী ভবতারিণীর পূজকের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে সহৃদয় রামকুমার আপত্তি জানাতে পারলেন না। মন্দিরের পূজারী হয়ে তিনি চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। দাদার সঙ্গে গদাধর ঠাকুরকেও আসতে হল, একা তিনি ঝামাপুকুরে কী করে থাকেন! এসব ব্যাপারকে ভগবানের লীলাই বলতে হবে। কোথায় কামারপুকুর, কোথায় ঝামাপুকুর, আর, কোথায় দক্ষিণেশ্বর। যে-সাধনপীঠে তান্ত্রিকসাধনায় সিদ্ধিলাভ করবেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তা নির্মিত হল এক ভক্তিমতী নারীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলিসংকেতে একদিন সেখানে এসে পৌঁছলেন ভক্তিমান রামকৃষ্ণদেব।

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণকে সকলে বলতেন 'ছোট ভটচায্'। তাঁর ভক্তিপ্রবণতা ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ মনোভাব রাণী রাসমণির জামাতা মথুরমোহনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ইতোমধ্যে ঠাকুর একজন খ্যাতিমান কালীসাধকের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন, কালীপূজার পদ্ধতি তাঁর শেখা হয়ে গেল। মথুরবাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধে রামকুমার ছোটভাইকে নিযুক্ত করলেন শ্রীশ্রীকালীমাতা ভবতারিণীর পূজোয়। এভাবে ঠাকুর পূজকের [illegible] হলেন। [illegible] তিনি [illegible] করে যাচ্ছেন। কী [illegible]

ভক্তি, কী আকুলভাবে জগন্মাতাকে আহ্বান, অসাধারণ নিষ্ঠায় মন্ত্রোচ্চারণ, কী ভক্তি-বিগলিত তাঁর কণ্ঠস্বর। মৃন্ময়ী দেবীকে চিন্ময়ী করে তুলবেন ঠাকুর, পাষাণে-গড়া মায়ের বুকে জাগিয়ে তুলবেন প্রাণের স্পন্দন।

অনুক্ষণ ঠাকুর ভবতারিণীর ধ্যানে মগ্ন থাকেন, সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে মাকে ডাকেন। জননী জগদম্বাই এখন তাঁর কাছে একতম সত্যবস্তু। জগদম্বাকে যদি চাক্ষুষ করতে না পারেন তাহলে জীবন নিরর্থক। জগজ্জননীর পুজো করছেন, আর, সঙ্গে সঙ্গে গভীর রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর নিভৃত জঙ্গলে চলেছে তাঁর কঠিন তান্ত্রিকসাধনা—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

মাকে চোখের সম্মুখে জীবন্ত দেখতে পাওয়ার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগেছে ঠাকুরের অন্তরদেশে, তাঁর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে বেরিয়ে আসে ব্যাকুল প্রার্থনা—মা, দেখা দে। কিন্তু তবু মায়ের দেখা মেলে না। মা কি তবে শুধুই পাষাণপ্রতিমা, ছেলের কান্নাভরা ডাক কি তিনি শুনবেন না? তবে এ প্রাণ রেখে কী লাভ? সহসা ঠাকুরের চোখে পড়ল মন্দিরের একধারে রয়েছে পশুবলির খাঁড়া। উন্মাদের মতো ছুটে ওই খাঁড়া হাতে নিয়ে ঠাকুর নিজের গলায় বসাতে যাচ্ছেন এমন সময় মা ভবতারিণী দিব্যমূর্তি ধারণ করে ভক্তসন্তানের দুচোখের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। নিরাকারা ব্রহ্মময়ী জননীকে সাকার মূর্তিতে প্রত্যক্ষ করে ঠাকুর নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করলেন।

এসময়ে ঠাকুরের অবস্থা প্রায় উন্মাদের মত। তাঁর পুজোর রীতি সব অদ্ভুত ধরণের। মন্ত্রতন্ত্রের বালাই নেই, দেবীকে নিবেদিত অন্ন নিজের মুখেই তুলে দেন। কখনো হাসি, কখনো কান্না, কখনো-বা ভাবাবেশ। অপরের চোখে এ দারুণ অনাচার। মথুরবাবুর কাছে খবর গেল, উন্মাদ ঠাকুরের আচরণের সংবাদ রাসমণির কানে পৌঁছল। তাঁরা এসে ঠাকুরকে দেখে বুঝতে পারলেন, সাধারণ পাগল তিনি নন, তাঁদের ভাষায়—'ছোট ভটচায্ ভাবের পাগল'।

পুত্রের হাবভাব চালচলন অনেকটা পাগলের মতো হয়ে গেছে শুনে মা চন্দ্রামণি পুত্রকে কামারপুকুরে নিয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, বিয়ে দিলে ছেলের এই অদ্ভুত ভাব কেটে যাবে। একদিন শুভলগ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের বিয়ে হল জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখুজ্যের মেয়ে সারদামণির সঙ্গে। বিয়ে তিনি করলেন কিন্তু সংসারে মন দিতে পারলেন না, তাঁর সমস্ত চিত্ত জুড়ে রয়েছেন দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী। বছর দেড়েক কামারপুকুরে কাটিয়ে ঠাকুর আবার মায়ের মন্দিরে ফিরে এলেন। ইতোমধ্যে রাসমণি দেহত্যাগ করেছেন, তাঁর বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারী হলেন জামাতা শ্রীমথুর। ঠাকুরকে তিনি মহাপুরুষ বলে জেনেছিলেন, তাঁর সেবা করবার সুযোগ পেয়ে মথুরবাবু নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করতেন। ঠাকুরের বিষয়ে তাঁর বুদ্ধি শ্রদ্ধাপ্রণত ছিল। এই মহাসাধককে তিনি মাঝে মাঝে জানবাজারের নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতেন, রাজকীয়ভাবে সেখানে তাঁর সংবর্ধনা চলত। ঠাকুর কিন্তু টাকা-পয়সাকে মাটির মূল্যও দিতেন না, ভোগবিলাসের ভূমি থেকে নিজেকে কোটি

যোজন দূরে রাখতেন। টাকা মাটি, মাটি টাকা—এই বলে ঠাকুর দুহাতের টাকা ও মাটি ছুঁড়ে দিতেন গঙ্গার জলে। আত্মিক সম্পদে মহাধনী যিনি, অর্থ-বিত্তে কী তাঁর প্রয়োজন?

সাধনার সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে শ্রীরামকৃষ্ণ এগিয়ে চলেছেন। ভারতীয় সমস্ত সাধন-পন্থার আশ্রয় নিয়ে তিনি অচিরে সিদ্ধিলাভ করলেন। ঠাকুর কেবল ভারতীয় মতের সমস্ত সাধনপথেরই পথিক ছিলেন না, খ্রীস্টীয় আর ইসলামের সুফীমতের সাধনায়ও তিনি সিদ্ধপুরুষ। বিচিত্র সাধনপন্থা অধিগত করে তাঁর এই মহান-সত্যলাভ হয়েছিল যে, নিষ্ঠাসহকারে ধর্মের যে-কোনো একটি পথে অগ্রসর হয়ে ঈশ্বরের সম্মুখীন হওয়া যায়। ঈশ্বরকে পেয়ে তিনি সকলকে জানিয়েছেন—'যত মত তত পথ। সব নদী সাগরে গিয়ে মেশে। আল্লাহ্, জিহোবা, গড, ব্রহ্ম, সেই এক ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নয়।' ঠাকুর সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মন্ত্রগুরু। ধর্মগত বিভেদের মূলে তিনি কুঠারাঘাত হেনেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বোত্তম শিষ্য বিবেকানন্দ গুরুর এই সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণীই একদা জগতে প্রচার করেছিলেন।

এসময়ে দীনদুঃখীর প্রতি ঠাকুরের অপার করুণার উৎসার দেখা যায়। দরিদ্র লোকদের দেখলে ঠাকুর নিরতিশয় কাতর হয়ে পড়তেন, এসব দুঃখীর অভাব বিদূরণ না করে কিছুতেই স্থির থাকতে পারতেন না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তিনি ঈশ্বরকে দেখতেন; তাঁর মনে হত, ঈশ্বর আর্তজনের রূপ ধরে মানুষের সেবা প্রার্থনা করছেন। দীনদরিদ্রকে তিনি কৃপা করতে বলেননি—এদের সেবা করার আদর্শই তিনি প্রচার করে গেছেন। বিবেকানন্দ ঠাকুরের কাছেই নরনারায়ণের সেবার মন্ত্র পেয়েছিলেন।

ঠাকুর এখন আধ্যাত্মিকতার তুঙ্গ শিখরে অবস্থান করেছেন, চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তাঁর দিব্যজীবনের সুরভি। ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে ধর্মপিপাসুদের ভিড় জমতে লাগল। এসময়ে ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের শক্তিমান নেতা কেশবচন্দ্র ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন। একদিন ভাবের ঘোরে ঠাকুর ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে যে-সব কথা বললেন তা শুনে কেশব বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। তিনি বুঝলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এক অসাধারণ পুরুষ—ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি। অচিরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে এলেন কেশবচন্দ্র। তিনিই সর্বপ্রথম ঠাকুরের উচ্চ-আধ্যাত্মিকতার কথা শিক্ষিতসমাজে প্রচার করলেন। বাহিরের বেশবাস দেখে ঠাকুরকে খুবই সাধারণ মানুষ বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে তাকালে, তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলে বুঝতে পারা যায়, দুরারোহী কোন্ তুরীয়লোকে তিনি অবস্থিত রয়েছেন। ঐশীশক্তির বলে শ্রীরামকৃষ্ণ জানতে পেরেছিলেন যে, বহুলোক তাঁর কাছে আসবে, যথার্থ ধর্মজীবনের পথে চলার নির্দেশ চাইবে। ক্রমে ক্রমে সত্যই তারা একে একে হাজির হল। তারা কি এমনিতেই এল, এল ঠাকুরের প্রবল ঈশ্বরানুরাগের টানে, তাঁর অন্তরতম সত্তার আকুল আহ্বান শুনে—'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়।' এমন ডাক কি ব্যর্থ

দক্ষিণেশ্বরে বহু ভক্তের আগমন হল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণ-উদার-করা ওই ডাক শুনতে পেয়ে একদা তাঁর পায়ের তলায় এসে বসলেন যুবক নরেন্দ্রনাথ দত্ত—উত্তরকালের বিখ্যাত বিবেকানন্দ। কার মনে কি ভাব রয়েছে, অন্তর্যামীর মতোই, ঠাকুর তা বুঝতে পারেন, ভক্তির শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে তার মনের গতিকে অবলীলায় ঈশ্বরাভিমুখী করে তোলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখের একটি কথা, তাঁর হাতের পুণ্যস্পর্শ নিমেষমধ্যে মানুষের রূপান্তর ঘটাবার অদ্ভুত ক্ষমতা রাখে। নরেনের অদ্বৈতমন্ত্রে দীক্ষালাভ পরমহংসদেবের কাছেই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্পর্শমণি, তাঁর ছোঁয়া পেয়ে নরেন্দ্রনাথ সোনা হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের জীবনে ঠাকুরের প্রভাব কতখানি গভীরচারী তা বোধকরি অনেকেই জানেন। মনীষী ও মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুরকে দেখতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। স্বনামধন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণকে মহাপুরুষ বলে জেনেছিলেন। সাধকপ্রবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ঠাকুরের মধ্যে বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। ঠাকুর ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করতেন অত্যন্ত সরল ভাষায়। নিতান্ত বুদ্ধিহীন অজ্ঞ ব্যক্তিও তা সহজে বুঝতে পারত। তাঁর কথাগুলি কী সুন্দর উপমায় সমৃদ্ধ ও অনাড়ম্বর কবিত্বে চিত্তহারী! মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি কবি বলি তাহলে কিছুই অত্যুক্তি করা হয় না।

দক্ষিণেশ্বরে পরমানন্দের অফুরন্ত স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরের দিব্যভাব সবলে আকর্ষণ করছে সংখ্যাতীত নরনারীকে। সংসারের তাপে তাপিত মানুষ তাঁর কাছে ছুটে আসে মানসিক-শান্তি-কামনায়। তিনি কল্পতরু, অকৃপণ কৃপা-বিতরণে সকলকে ধন্য করেন। ঠাকুর ব্যথিতের আশ্রয় আরাম, তাদের প্রাণের শান্তি, আধ্যাত্মিক সংকটের ঘনঘোর অন্ধকারে চিরজ্যোতিষ্মান ধ্রুবতারা। মানুষকে সত্যধর্মে দীক্ষা দেবার জন্যেই তো ধরণীতলে তাঁর পুণ্য আবির্ভাব।

তাঁকে অনবরত কথা বলতে হয়। বিশ্রাম তিনি একেবারেই পান না, শ্রান্তি কাকে বলে তা তিনি জানেন না। ফলে ঠাকুরের দারুণ স্বাস্থ্যভঙ্গ হল। হঠাৎ একদিন গলায় তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন। চিকিৎসকরা এলেন, তাঁরা বললেন, ঠাকুর সাংঘাতিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন—ব্যাধিটি ক্যান্সার।

নিজের মহাপ্রয়াণের প্রাক্কালে, পরমহংসদেব আপন শিষ্যদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব সঞ্চারিত করে দেন, সকলে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবতী শক্তির স্পর্শ পেলেন। নরেন তাঁর প্রধান শিষ্য। ঠাকুরের অবস্থা যখন খুব খারাপের দিকে তখন একদিন তিনি নরেনকে কাছে ডেকে, নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সহসা সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। নরেন অনুভব করল, বিদ্যুৎতরঙ্গের মতো কী যেন একটা [illegible] বেগে তার সর্বদেহে প্রবেশ করছে। এই শক্তির প্রচণ্ডতায় সে হতচেতন [illegible]। চেতনা ফিরে পেয়ে ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে তাঁর দু'চোখে [illegible]। সেদিন সেই নিভৃত নিরালায় শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বললেন, 'আজ [illegible]

অনেক উপকার করবি।' ঠাকুরের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে—আধ্যাত্মিক-সংসারে বিবেকানন্দ প্রচণ্ড ঝড় তুলেছিলেন, জাতির জড়ত্ব ও তামসিকতার ওপর তীব্রতম আঘাত হেনেছিলেন, পৃথিবীর মানুষকে দেখিয়েছিলেন চিরন্তন মানবসত্যের জ্যোতির্ময় পথ।

দুরন্ত ব্যাধির হাত থেকে ঠাকুর পরিত্রাণ পেলেন না। তিনি নিজেই বুঝেছিলেন, মর্তধামে তাঁর সঞ্চরণের কাল শেষ হয়ে এসেছে। ১৮৮৬ সালের শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন। ঠাকুরের শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়েছে। ক্ষণে ক্ষণে তিনি সমাধিস্থ হচ্ছিলেন। মধ্যরাত্রিতে একবার তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। শিষ্যেরা তাঁকে কিছু খাইয়ে ঘুম পাড়াবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর আবার তিনি সমাধিস্থ হলেন। তখন রাত্রি ১টা বেজে গেছে। এ-সমাধি—মহাসমাধি—আর ভাঙল না। যে অমর্তলোক থেকে তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন আবার সেই দিব্যলোকে তিনি প্রয়াণ করলেন।

*   *   *

কেউ কেউ এরূপ একটি অভিমত পোষণ করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারত্যাগী উচ্চশ্রেণীর একজন সাধক-মাত্র, তিনি পুরোপুরি সন্ন্যাসী; তাঁর আত্মিক সাধনা সম্পূর্ণভাবে ইহবিমুখ, তাঁর ভগবৎ-চেতনার সঙ্গে লোকশ্রেয়ের কোনোই সম্পর্ক নেই; বাস্তব জীবন ও জগতের সম্পর্কশূন্য এরূপ আধ্যাত্মিকতাকে উচ্চাঙ্গের ভাববিলাসও বলা যেতে পারে।

কিন্তু আমরা বলতে চাই, এরূপ একটি ধারণার মতো ভুল আর-কিছুই নয়। সত্য বটে সাধারণ স্তরের ধর্মপিপাসু নরনারীকে তিনি ঈশ্বর-সম্পর্কিত কথা শোনাতেন। তাদের সত্যের পথে চলবার উপদেশ দিতেন, তাঁর মুখে ত্যাগ, ভক্তি ও আত্মশুদ্ধির উপদেশ প্রায়শই শোনা যেত। যারা পারমার্থিক জ্ঞান লাভ কিংবা আত্মিক উন্নতির জন্যে ঠাকুরের কাছে আসত তারা ঠাকুরের উদাসীন, নির্লিপ্ত, ভাবনিমগ্ন রূপটিই দেখেছে। কিন্তু এ হল শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের বহিরঙ্গ দিকটির পরিচয় মাত্র। তাঁর অন্তরঙ্গ স্বরূপের পরিচয়টি সাধারণের অগোচরেই থেকে গেছে। একজন মাত্র ব্যক্তি ঠাকুরের রহস্যময় সত্তার গভীরে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁর মধ্যে এই মানুষটির অপর একটি মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন—ইনি হলেন শ্রীবিবেকানন্দ।

পরমহংসদেবকে স্বামীজী কেবল ব্রহ্মজ্ঞ, পূর্ণজ্ঞানী হিন্দুমহাযোগী হিসেবে দেখেননি, তাঁর মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন জ্ঞান ও প্রেমের অদ্বৈতসাযুজ্য। তাঁর চোখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যেন প্রেমেরই শরীরী বিগ্রহ—যেন প্রেম-জ্ঞানেরই বিগলিত ধারা। যিনি পূর্ণজ্ঞানী একমাত্র তাঁর পক্ষেই মহাপ্রেমিক হওয়া সম্ভব। এই মহাপ্রেমই যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, চতুষ্পার্শ্বের ঊষরতার মধ্যে করুণার সরস শ্যামলিমার অজস্র ধারা প্রবাহিত করে দেন।

অদ্বৈতবাদী ঠাকুরের দৃষ্টিতে জীবই শিব, মানুষ নিরাকার ব্রহ্মেরই সাকার রূপ। সুতরাং যত্র জীব তত্র শিব। পরমকরুণাময় ঠাকুর ব্রহ্মময় মানুষের দুঃখে কাত[illegible] [illegible] জগতের দুঃখদুর্দশাগ্রস্ত [illegible] শক্তি বিবেকানন্দকে [illegible]

সাধকে রূপান্তরিত করেছিলেন। কিন্তু জীবে দয়া নয়, জীবকে দেখাতে হবে প্রেম—যার অন্য নাম সেবা। যে-মানুষ ঈশ্বরের মূর্ত প্রকাশ তাকে দয়া দেখাবার স্পর্ধা রাখে কে? নরনারায়ণের সেবাধর্মটি স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ মহাপ্রেমিক পরমহংসদেবেরই সৃষ্টি।

আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, জাতির উদ্ধারের জন্যেই ভারতবর্ষে মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মগ্রহণ। পাশ্চাত্যের আক্রমণে হিন্দুস্থান যখন বিপর্যস্ত, ভারতবাসীর ধর্মীয় ও জাতীয় জীবন যখন সংকটের গভীর আবর্তে, সমগ্র দেশ যখন মন্বন্তরের মুখে ছুটে চলেছে, তখন সংকটত্রাতারূপেই দেখা দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। হিন্দু-জাতীয়তায় তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব গূঢ়সঞ্চারী। নিজ দিব্যদৃষ্টি দিয়ে ঠাকুর ভবিষ্যৎ ভারতকে দেখেছিলেন, ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে তিনি আপন হাতেই গড়েছিলেন, তাঁর আপনার শক্তি সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। এই প্রতিনিধিটি—শ্রীবিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ কি ভারতবর্ষের জাতীয়-জীবন-গঠনের প্রধান নেতা নন? বাঙ্‌লাদেশকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রেও কি ঠাকুরের প্রভাব কম সক্রিয় ছিল? অবশ্যই নয়। এ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষ্যই উদ্ধৃত করি: 'He [শ্রীরামকৃষ্ণ] has done the most to regenerate Bengal.'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এযুগের মহাসমন্বয়বাণীর উদ্গাতা। আমাদের তথা সমগ্র পৃথিবীর জাতীয় জীবনের সর্বাধিক গুরুতর সমস্যা হল ধর্মীয় বিরোধ, মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে আত্মঘাতী কলহ। বাঙালিকে তিনি শোনালেন 'যত মত তত পথ'—এই বাণী। তাঁর মতে যে-কোনো ধর্ম মানুষকে ব্রহ্মের সম্মুখে উপস্থিত করে দেয়। সুতরাং ধর্মে-ধর্মে সংঘাত নিরর্থক। বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে ঠাকুর শুধু সহনশীলতা দেখাননি, দেখিয়েছেন আন্তরিক সহানুভূতি। ঠাকুরের এই মনোভাবের আধুনিকতা কি কম মূল্যবান? চিকাগো-ধর্মমহাসভায় দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ পৃথিবীর জাতিসমূহের সমক্ষে বিংশ. শতকের সমন্বয়ের বার্তা উদার কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, এর প্রেরণা স্বামীজী কার নিকটে পেয়েছিলেন? পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকটে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্পূর্ণ বুঝতে হলে তাঁকে বিবেকানন্দের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে হবে। উভয়ে মিলেই এক অখণ্ড ব্যক্তিত্ব—একই শক্তি উভয়ের মধ্য দিয়ে ঈষৎ ভিন্নভাবে প্রকাশিত। স্বামীজীর শক্তির উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুরের আপাতনিষ্ক্রিয় শক্তিই স্বামীজীতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সজল মেঘপুঞ্জ, বিবেকানন্দ ওই মেঘনিঃসৃত বারিধারা; শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিকন্দরে বন্দী প্রকাণ্ডশক্তি স্রোতোবেগ, বিবেকানন্দ এই স্রোতোবেগোচ্ছ্বসিত নির্ঝরধারা—যা দেশের সীমা ছাপিয়ে গোটা পৃথিবীকে প্লাবিত করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিকতাকে ঐহিকের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। এহেন মহাপুরুষকে যাঁরা জগৎবিমুখ মধ্যযুগীয় একজন সন্ন্যাসী মনে করেন তাঁরা অন্ধদৃষ্টি। মানবপ্রেম ও জগৎহিতসাধনের জন্যেই ভারত-ভূমিতে ঠাকুরের মহাআবির্ভাব।

অবিস্মরণীয় বাঙালি বিদ্যাসাগর

ঘর থেকে বেরিয়ে, আনন্দের অতিশয্যে রাস্তায় এসে, পথেই পিতা পুত্রকে বললেন : 'ওরে, একটা সুসংবাদ শোন্, আজ আমাদের এক এঁড়ে বাছুর জন্মাল—এঁড়ে বাছুর'। পিতা—রামজয় তর্কভূষণ ; পুত্র—ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবাদটি শুনে পুত্র অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে অশেষ ঔৎসুক্যসহকারে, তাঁদের গোয়াল ঘরের দিকে দ্রুতপদক্ষেপে এগুতে লাগল। পেছন থেকে পিতার ডাক শোনা গেল : 'ওদিকে নয় রে, এঁড়ে বাছুরটি ঘরের মধ্যেই রয়েছে।' ঘরে ঢুকে ঠাকুরদাস দেখলেন, পিতৃদেবের কথিত এই এঁড়ে বাছুর এক সদ্যজাত সন্তানের মূর্তি পরিগ্রহ করে বসেছে। ঘটনাটি ইংরাজি ১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বরের, ঘটনাস্থল হল মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রাম। এই দিনটিতে অতিদরিদ্র এক ব্রাহ্মণপরিবারে এক অসাধারণ শিশুর জন্ম হল, বীরসিংহের বীরশিশু', নাম—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ক্ষণজন্মা পুরুষ।

এমন কোন্ মন্দভাগ্য বাঙালি রয়েছে, বিদ্যাসাগরের পুণ্যনামটি যার কাছে পরিচিত নয়—যে শোনেনি এই লোকোত্তর চরিত্রের মাহাত্ম্যকথা? কী তাঁর তেজ, কী তাঁর পৌরুষ, কী দুর্জয় তাঁর সংকল্প, কী অগাধ আত্মপ্রত্যয়, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, কী বহ্নিমান তার মনুষ্যত্বের সাধনা। বাঙালি বিদ্যাসাগর কোথায় পেলেন এহেন তেজস্বিতা, অপরাজেয় সংগ্রামশক্তি, প্রদীপ্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অকম্পিত আত্মমর্যাদা? জড়তাগ্রস্ত ঘোর তামসিকতায় সমাচ্ছন্ন, কর্মোদ্যমবিরহিত, বীর্যলেশশূন্য, বাক্‌সর্বস্ব, কুসংস্কারের পঙ্কে নিমজ্জিত বাঙালিজাতির মধ্যে মনুষ্যত্বের অত্যুজ্জ্বল বিগ্রহ বীর্যবন্ত বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলেই মনে হয়। বিকলাঙ্গ বাঙালির কাছে গোটা মানুষ বিদ্যাসাগর চিরবিস্ময় একথা বলতে কোনো বাধা দেখি না।

নিশ্ছিদ্র দারিদ্র্যে কবলিত উচ্চবর্ণের এক ব্রাহ্মণদম্পতির সন্তান বিদ্যাসাগর। কিন্তু দারিদ্র্য সব মানুষকে দরিদ্র করে না, বরংচ কোনো কোনো বিরল ক্ষেত্রে তাঁদের পৌরুষকে উজ্জীবিত করে, তাঁদের মনুষ্যত্বসাধনার শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। এমন একজন মানুষ ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ, এমন একজন মানুষ ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। আগ্রাসী দরিদ্রতা তাঁদের উভয়কে শক্তিমন্ত্রে প্রাণিত করেছে। ঈশ্বরচন্দ্রের জননী ভগবতী দেবীও বহুগুণান্বিতা এক অসামান্যা মহীয়সী রমণী। তাঁর হৃদয়বত্তা ও পরার্থপরতা সর্বজনবিদিত। যে-অভিভাস্বর চরিত্রমহিমা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কৃত অনেক কীর্তিকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে, যার জন্যে এই বিরাট পুরুষের দিকে তাকিয়ে, আমরা আমাদের মহাকবির ভাষায় বলতে পারি—'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'—সেই চরিত্রমাহাত্ম্যের মূলীভূত উপাদানগুলি উত্তরাধিকারসূত্রেই তিনি পেয়েছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই।

[illegible] তর্কভূষণ নিজ পৌত্রকে 'এঁড়ে বাছুর' বলেছিলেন। বলতে হয়, তিনি সত্যিই একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবন ওই কথাটির সত্যতার প্রমাণ বহন করছে। দুরন্ত, একগুঁয়ে, চিরকাল জেদী, নির্ভীক ও শক্তিধর বিদ্যাসাগরের পক্ষে ওই বিশেষণটি কত যে যথার্থ তা সহজে বুঝতে পারা যায়। ছোটবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর স্বজন প্রতিবেশীকে আপন দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন; পরিণত বয়সে কুসংস্কারের [illegible]তনে আবদ্ধ, মনুষ্যত্বভ্রষ্ট, অগণন স্বদেশবাসীকে। দেশবাসীরা একক সংগ্রামে অবতীর্ণ বিপ্লবী বিদ্যাসাগরের সঙ্গ ছেড়েছিল, আর, এদের সকলকে ছাড়িয়ে অনেক—অনেক ঊর্ধ্বে—তিনি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। এই গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখাকে সহ্য করার মত শক্তি সেদিন হীনবীর্য বাঙালিসাধারণের প্রায় কারুরই ছিল না।

এবার বিদ্যাসাগরের জীবনের ঘটনাবলীর কিঞ্চিৎ পরিচয় নেওয়া যাক। বিদ্যাসাগর স্থানীয় গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া শুরু করেন। তখন তাঁর পিতার কর্মস্থল কলকাতায়। ঠাকুরদাসের মাসিক মাইনে যখন দশ টাকা মাত্র তখন তিনি নয় বৎসরের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে এলেন তাকে ভালো করে বিদ্যানুশীলনের সুযোগ দেবার জন্যে। শোনা যায়, মেদনীপুর থেকে আসবার সময় পথে মাইলস্টোন দেখে প্রতিভাবান ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজি-সংখ্যালিখন-পদ্ধতি শিখে নিয়েছিলেন। মহানগরীতে এসে তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন। বড়বাজার থেকে কলেজে প্রত্যহ হেঁটে আসতেন। পিতার আর্থিক অসচ্ছলতাহেতু পাঠ্যাবস্থায় কঠিন দারিদ্র্য তাঁর নিত্যসহচর ছিল। কিন্তু দারুণ অর্থাভাব কখনো তাঁর অধ্যয়ন-অনুরাগকে শিথিল করতে পারেনি। ঈশ্বরচন্দ্র রোজ বাজারে যেতেন, নিজ হাতে বাটনা বাটতেন, দুবেলা রাঁধতেন, এঁটো বাসনপত্র পরিষ্কার করতেন। এতে করে পড়াশুনার সময় খুব অল্পই পেতেন তিনি। একারণে রাত জেগে তাঁকে পড়তে হত। প্রদীপের অভাব হলে রাস্তার গ্যাসের আলোর কাছে গিয়ে পড়তেন। অদ্ভুত তাঁর বিদ্যানুরাগ, অদম্য তাঁর উৎসাহ, অটুট তাঁর অধ্যবসায়। নিষ্করুণ প্রতিকূলতার পাহাড় ঠেলে তাঁকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। কৈশোরকাল থেকেই তিনি সংগ্রামী। দুঃখকষ্ট অভিশাপ নয়, এরা মানুষের আত্মশক্তিকে [illegible] করে।

আশ্চর্য প্রতিভা নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মেছিলেন। ছ'বছরেই তিনি ব্যাকরণ [illegible] পাঠ শেষ করলেন। তারপর সাহিত্য, তারপর অলংকার—একে একে সমস্ত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে সকলের বিস্ময়ের বস্তু হয়ে উঠলেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সে সসম্মানে স্মৃতি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তিনি। [illegible] [illegible] তখনকে ত্রিপুরার জজ-পণ্ডিতের পদগ্রহণের জন্যে আবেদন জানানো হলে [illegible] না হওয়াতে ওই পদ তিনি নিতে পারলেন না। অতঃপর ঈশ্বরচন্দ্র [illegible] ইত্যাদি পাঠ শেষ করলেন। [illegible] [illegible] শেষ [illegible] বিবিধ শাস্ত্রে তাঁর [illegible]

যৌবনেই ঈশ্বরচন্দ্র বহুশ্রুত 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি পেলেন। এ তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সংস্কৃতভাষার অধ্যাপকপদে বৃত হয়েই ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মজীবনের শুরু। এখানে কয়েকজন ইংরেজের সংস্পর্শে এসে তাঁকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে রীতিমতো মনোযোগী হতে হল। ইতঃপূর্বে ইংরেজিশিক্ষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছেড়ে তিনি এলেন সংস্কৃত কলেজে। এখানে প্রথমে সহকারী সম্পাদকের পদে, এবং কিছুকাল পরে অধ্যক্ষপদ লাভ করেছিলেন তিনি। উপরে কথিত দুটি কলেজে সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকায় কালে বহু উচ্চশ্রেণীর ইংরেজ-কর্মচারীকে তিনি বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন। এঁরা সকলেই উন্নত-চরিত্র, আত্মমর্যাদা-বিষয়ে অতিসচেতন বিদ্যাসাগরকে খুবই প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। এঁদের সঙ্গে আচরণে তাঁর চরিত্রস্বরূপ অনেকখানি উন্মোচিত হয়েছে। সে-যুগের পাশ্চাত্যমনোভাবসম্পন্ন বহুসংখ্যক বাঙালি ইংরেজের মনস্তুষ্টিবিধানের জন্যে নিজেকে ও স্বজাতিকে ছোট করতে দ্বিধান্বিত হতেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের মানুষ ছিলেন—তাঁর আত্মসম্মানবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর, স্বাজাত্যাভিমানকে তিনি খুব বড়ো একটি জিনিস বলে মনে করতেন। আত্মাবমাননা তথা জাতির অপমান তাঁর পক্ষে অভাবনীয় ছিল। যখন দেখেছেন সম্ভ্রমহানি হচ্ছে, তখন তিনি উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন; প্রতিবাদেও যখন ফল হয়নি, স্বাধীনচিত্ত, মহামানী এই মানুষটি তৎক্ষাৎ চাকুরি ছেড়ে দিয়ে দারিদ্র্যবরণ করাকে শ্রেয় বলে বুঝেছেন।

বিদ্যাসাগর আটবৎসরকাল সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই কতিপয় বৎসরের মধ্যে অনেক উল্লেখ্য কাজ তিনি করে গেছেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে পূর্বে জাতিভেদের যে বাধা ছিল তাঁর প্রচেষ্টায় তা দূরীকৃত হয়। এই কলেজে বিদ্যার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতিষ্ঠাতা তিনি। শিক্ষাব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র সর্বদা প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে তাঁর জন্ম, তাঁর শিক্ষা আর সংস্কারও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের। তাই, ভেবে অবাক লাগে, দেশবাসীর শিক্ষায় কোনো প্রশ্ন যখন উঠেছে তখন কোথাও তিনি রক্ষণশীল মনোভাব দেখান নি। পশ্চিমী জ্ঞানবিদ্যার প্রতি তাঁর পক্ষপাত সেকালে অনেককেই বিস্মিত করেছে। হিন্দুশাস্ত্রে কতবড়ো পণ্ডিত হিন্দুর সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপদ্ধতি থেকে তিনিই হিন্দুদর্শনকে বহিষ্কৃত করতে চেয়েছিলেন। বলতে পারা যায়, হিন্দুদের মধ্যে প্রগতিশীলসমাজের পুরোধা ছিলেন তিনি।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন বাঙলার বিশেষ একটি অঞ্চলের বিদ্যায়তনগুলির সহকারি পরিদর্শক হলেন তখন শিক্ষাবিস্তারে তাঁর উদ্যমপ্রয়াসের শেষ ছিল না। বিশেষত এদেশে নারীশিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রটি তিনি যথাসাধ্য প্রশস্ত করে তুলেছিলেন। সেদিন তাঁর কণ্ঠে ঘোষিত হল শিক্ষাক্ষেত্রে নারীপুরুষের সমানাধিকারবাদ। ভাবপ্রবণতা ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে দেখা গেলেও তিনি যে যুক্তিবাদী ছিলেন একথা কে অস্বীকার করবে। সে-[illegible] সংস্কারমুক্ত, যুক্তির [illegible] দিতেই হয়। বেশভূষা দেখে [illegible]

হত, বিদ্যাসাগর বুঝি প্রাচীনপন্থী। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপ সর্বদা ও সর্বথা বুঝিয়ে দিত যে, সাজপোষাকে প্রাচীনের অনুবর্তন করলেও, তাঁর চেয়ে আধুনিক মন সেকালে খুব কম লোকেরই ছিল।

কেবল শিক্ষাপ্রসারের জন্যে নয়, আরো একটি কারণে বাঙালিজাতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে চিরকাল স্মরণ করবে। যে-বাঙ্‌লাভাষা আজ আমাদের পরমগৌরবের সামগ্রী তার নির্মাণে বিদ্যাসাগর নিজ প্রতিভা ও সাধনাকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর পূর্বে বাঙ্‌লাগদ্যের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল, কিন্তু কলাসমৃদ্ধ সাহিত্যরচনের উপযোগী মোটেই ছিল না। তখন গ্রাম্যপাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা থেকে তাকে উদ্ধার করবার কথাটি কেউ তেমন ভাবেন নি। তৎকালীন বাঙ্‌লা-গদ্যের কাঠামো মনোহারী রূপেরসে যে সঞ্জীবিত হল তা বিদ্যাসাগরের প্রতিভার স্পর্শে। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাঙ্‌লাগদ্যের প্রথম শিল্পী বলা যেতে পারে। বাঙ্‌লাগদ্যের প্রবহমান স্রোতধারায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা বেতাল-পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, প্রভৃতি গ্রন্থ কয়েকটি প্রেক্ষণীয় তরঙ্গোচ্ছ্বাস—সাহিত্যানুরাগীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ না-করে পারে না। এ ছাড়া, বিদ্যালয়ের, পাঠ্য কতকগুলি বই লিখে তিনি এদেশের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের অভাব অনেকখানি মোচন করে গেছেন। সংস্কৃতভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের রচিত উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণকৌমুদী অপরিহার্য দুখানি পুস্তক। বিদ্যাসাগরপ্রণীত 'বর্ণপরিচয়'এর মাধ্যমে হাতে-খড়ি হয়নি এমন শিশু বাঙ্‌লাদেশে খুব কমই আছে।

শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের সদাজাগ্রত উদ্যম আর তাঁর অক্লান্ত সাহিত্য-সাধনার কথা আমরা জানলাম। উভয় ক্ষেত্রে তিনি উজ্জ্বল কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু এই চিরপূজ্য পুরুষের উজ্জ্বলতম কীর্তি হল বঙ্গদেশে বিধবাবিবাহের প্রবর্তন। এই সৎকর্মটির মধ্য দিয়ে তাঁর প্রকাণ্ড প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক প্রকাশ ঘটেছে। মনীষী ও মনস্বী রামমোহনের প্রচেষ্টায় দেশে সতীদাহ নিবারণ-আইন বলবৎ হল। একদা আমাদের বিধবারা স্বামীর চিতায় পুড়ে মরে সমাজসংসারের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পেত। কিন্তু সতীদাহপ্রথা যখন উঠে গেল তখন হিন্দুসমাজে বিধবাগণের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল। সমাজ তাদের প্রতি নিষ্করুণ, পুরুষজাতি তাদের প্রতি সহানুভূতি কখনো দেখায়নি, শাস্ত্রের নির্দেশে লাঞ্ছিত জীবন কাটাতে তারা বাধ্য; হিন্দুবিধবার এই মর্মান্তিক অসহায়তা মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগরের হৃদয়টিকে ব্যথায় কাতর করে তুলল। তিনি অহোরাত্র চিন্তা করতে লাগলেন, কী উপায়ে এইসব স্বামীহারা রমণীদের অসহনীয় দুঃখকষ্ট ঘুচানো যায়।

উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়ে পণ্ডিতাগ্রগণ্য বিদ্যাসাগর দেখলেন, ক্ষেত্রবিশেষে বিধবাগণের পুনর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। পরাশর-সংহিতার একটি শ্লোক আশ্রয় করে, তাকে প্রভূত যুক্তিযোগে বিস্তৃতি দিয়ে, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা-প্রমাণের দুরূহ কাজে তিনি নেমে পড়লেন। এবিষয়ে গ্রন্থ লিখে তা প্রকাশ করলেন। এতে হিন্দু-সমাজে বিক্ষোভের ঝড় বয়ে গেল; প্রতিকূলশক্তি গড়ে তুলল বাধার বিন্ধ্যাচল। বিদের

পর দিন, মাসের পর মাস, বিদ্যাসাগরের প্রতি বর্ষিত হতে লাগল কুৎসিত গালি। এমন কি প্রতিপক্ষের কেউ কেউ তাঁকে হত্যা করতেও চেষ্টা করেছিল। আত্মীয়-স্বজনেরা, তথাকথিত বন্ধুরা, সকলেই তাঁর বিপক্ষে গেল, তাঁর সপক্ষতা করার একটি লোকও আর রইল না। তথাপি বিপ্লবী সমাজসংস্কারক অণুমাত্র বিচলিত হলেন না, ভীতির রক্তচক্ষুর কাছে হার মানলেন না, মানসিক স্থৈর্য হারালেন না; অবিচল চিত্তে তিনি এগিয়ে গেলেন আপন সংকল্পসাধনের কণ্টকময় পথে, তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তির বেগবান স্রোতে বিরুদ্ধবাদীর সমস্ত প্রতিকূলতা বন্যার মুখে খড়কুটোর মতো কোথায় ভেসে গেল। ১৮৫৬ ইংরেজি সালে বিধবাবিবাহ-আইন প্রচলিত হল। বীরোত্তম বিদ্যাসাগর সংগ্রামবিজয়ীর অক্ষয় গৌরবের অধিকারী হলেন।

শুধু বিধবাবিবাহপ্রবর্তন নয়, বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ-নিবারণকল্পেও তাঁর চেষ্টার শেষ ছিল না। কৌলীন্যপ্রথা আমাদের সমাজের যে কী ক্ষতিসাধন করছিল তা বোঝাবার জন্যে কত প্রবন্ধ তিনি লিখে গেছেন। বিদ্যাসাগরের সংস্কারমুক্তির উদার আহ্বান সেদিন আমাদের কানে এসে পৌঁছেনি। যে-আন্দোলন তিনি শুরু করেছিলেন, আজ একশ বছর পরে তা ফলপ্রসূ হয়েছে—সাম্প্রতিককালে বাল্যবিবাহ আইনের চোখে দণ্ডণীয়। ভাবতে অবাক লাগে, একশ বছর আগেই বিদ্যাসাগর প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের ভিন্নতর একটি পরিচয়—দয়ার সাগর তিনি। বাইরে তিনি ছিলে বজ্রের ন্যায় কঠোর, কিন্তু তাঁর অন্তরতম প্রাণসত্তাটি ছিল কুসুমের মতোই কোমল এ-ই বোধকরি লোকোত্তর পুরুষগণের সত্যকার চরিত্রধর্ম। পরের দুঃখ দেখলে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠতেন, যতক্ষণ তাদের দুঃখ ঘুচাতে পারেননি ততক্ষণ তাঁর স্বস্তি ছিল ন শান্তি ছিল না। দুঃখার্তকে অর্থদান করতে বসে তিনি কখনো ভাবেননি যে, প্রকৃত সে অভাবগ্রস্ত কিনা—এমনই করুণাকাতর ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সর্বশেষে উল্লেখ্য ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃভক্তি। এহেন মাতৃভক্ত সন্তান কদাচিৎ দেখ যায়। মাতার আদেশ তাঁর কাছে অলঙ্ঘনীয় ছিল। একদা মায়ের চিঠি পেয়ে যে যাবার সময়ে, প্রাকৃতিক দুর্যোগহেতু নৌকা না মেলাতে, সাঁতার কেটে তিনি তরঙ্গা দামোদর নদের ওপারে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। জননীর আহ্বান তাঁকে মৃত্যুভয়ের ঊর্ধ্বচা করে তুলেছিল। এইরূপ ঘটনা সহজে বিশ্বাস করবার মতো নয়, তবুও এর সত্যা সন্দেহাতীত।

বাঙলার নবযুগের অবিস্মরণীয় পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। অনিঃশেষ মানবপ্রে তাঁর অতুলনীয় চরিত্রকে অপার মহিমাদান করেছে। চিরাগত হিন্দুসংস্কারের পরিবে মানুষ হয়েও তিনি ঈশ্বরভাবনা কিংবা আত্মিক মুক্তির চিন্তায় দিন কাটাননি। ভগবানে স্থানে তিনি মানুষকে বসিয়ে তার পূজায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ভগবৎ-আরাধন চেয়ে মানবসেবাই তাঁর কাছে অধিক মূল্য পেয়েছে। যে-মানবপ্রীতির প্রবল আকর্ষ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ গোটা সংসারকে নিজ বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন, সেই এ ধ্বজ হিন্দুশাস্ত্রপারংগম বিদ্যাসাগরকে মানুষ-পূজায় প্রবৃত্তি জুগিয়েছে। আপন

পারলৌকিক সদ্‌গতি অপেক্ষা মানুষের ইহজীবনের দুর্গতির কথা তিনি বেশি ভেবেছেন। এই দুর্গতি বিদূরণের প্রয়াসী হওয়াতে কত বিচিত্র কর্মজালে তাঁকে পড়তে হয়েছে। তাঁর জীবন লোকহিতব্রতেই উৎসর্গীকৃত। বিদ্যাসাগরের মানবসেবার সাধনা প্রেমেরই সাধনা—সুমহৎ ত্যাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাসাগর নতুন জীবনবাদের আচার্য, তাঁর অনুসৃত ধর্ম—নবমানবধর্ম।

ঈশ্বরচন্দ্র আমৃত্যু মনুষ্যত্বের সাধক ছিলেন, দেশবাসী এই মনুষ্যত্বে উদ্বোধিত হোক এ ছিল তাঁর অভিলষিত। অজেয় পৌরুষে তিনি চিরদীপ্যমান। বাঙালি আজ তার পৌরুষ হারিয়েছে, মনুষ্যত্বভ্রষ্ট হয়েছে। তাই, তার লাঞ্ছনা-অবমাননার শেষ নেই। এই ঘোর দুর্দিনে আমরা যদি পৌরুষের জলন্ত মূর্তি, কর্মবীর্যতায় বিদ্যাসাগরের সমুচ্চ জীবনাদর্শ কথঞ্চিৎ অনুসরণ করে চলতে পারি তবে জাতিগত অপমানের ক্লেদাক্ত গ্রাস থেকে অবশ্যই পরিত্রাণ পাব।

বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ জগদীশচন্দ্র

যেন ভৌতিক ব্যাপার সব। সহসা এমন এক কাণ্ড ঘটে গেল যা এত এত শ্রোতা বা দর্শকের কল্পনারও অতীত।

প্রকাণ্ড হল, বহু লোকের সমাগম হয়েছে। তারা উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এক তরুণ বক্তার দিকে। মুখে তাঁর দীপ্ত প্রতিভার ছাপ, দুচোখে সত্যসন্ধিৎসার তীব্রতা। বিচিত্র যন্ত্রপাতি সামনে রেখে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন তিনি, প্রত্যেকটি কথার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রত্যয়ের ধ্বনি ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। অকস্মাৎ এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। একটা পিস্তলের আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গে পঁচাত্তর ফিট দূরের রুদ্ধ-কক্ষটিতে-সংরক্ষিত বারুদের স্তূপ উড়ে গেল। উক্ত কক্ষের সামনে আরো দুটি কক্ষ রয়েছে, ওদের দ্বারও রুদ্ধ। কোন্ অদৃশ্য শক্তি এতদূরে অবস্থিত কক্ষগুলির দেয়াল ভেদ করে ওই বিস্ফোরণ ঘটাল? খানিক পরে সকলে বুঝতে পারল, বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান বক্তাটির সামনে যে যন্ত্র রয়েছে তা থেকে বিদ্যুৎতরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে এমন এক বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিয়েছে।

এই যে অদ্ভুত কাণ্ডটি ঘটল তার মধ্যে লুকিয়ে আছে খুব বড়ো একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূলীভূত রহস্য—বিনাতারে বার্তাপ্রেরণের গূঢ় সংকেত। এই [illegible] উদ্ভাবক প্রতিভাধর এক তরুণ বাঙালি বিজ্ঞানী। [illegible]

সংক্ষেপে—জে. সি. বোস্। এ হল ইংরেজি ১৮৯৫ সালের ঘটনা। বেতারবার্তার কথা তখনো পৃথিবীর মানুষ শোনেনি।

জগদীশচন্দ্রের নাম ধীরে ধীরে গোটা পৃথিবীতে ছড়াল, তাঁর প্রতিভা জগতের নামকরা সব বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি পেল। ভারতীয়েরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ায় কৃতিত্ব দেখাতে পারে, পশ্চিম গোলার্ধের আত্মম্ভরী মানুষ কখনো ভাবতে পারেনি। ভারতবাসীকে এতকাল তারা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেছে। তাদের উপেক্ষার মনোভাবের ওপর প্রবল আঘাত হানলেন বাঙালিসন্তান জগদীশচন্দ্র, ভারতবর্ষের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করলেন তিনি। প্রকৃতির রহস্যদ্বার একের পর এক উন্মোচন করে জগদীশচন্দ্র তাঁর অতন্দ্র সাধনার পথে এগিয়ে গেছেন। এবং একদিন য়ুরোপীয় মনীষীদের স্বীকার করতেই হল, জে. সি. বোস্, বিজ্ঞানজগতের সর্ববরেণ্য একজন যাদুকর।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলের একটি গ্রামে ১৮৫৮ ইংরেজি সালে জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম। তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন। সেকালে সরকারী চাকুরেদের পক্ষে দেশের প্রতি প্রীতিনিবেদন করা নানাকারণে সহজ বস্তু ছিল না। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভগবানচন্দ্র এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। স্বদেশকে তিনি সকল প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, দেশের দরিদ্র লোকসাধারণের প্রতি তাঁর অপরিসীম মমত্ববোধ ছিল। তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রেম, তাঁর হৃদয়বত্তা, নৈতিক চরিত্রের বলিষ্ঠতা, অশ্রান্ত কর্মোদ্যম পুত্র জগদীশচন্দ্রের সম্মুখে যে-আদর্শটি তুলে ধরেছে, পুত্রের জীবনে তার প্রভাব সামান্য নয়।

ছেলেবেলায় জগদীশচন্দ্র পিতার সঙ্গে কিছুকাল ফরিদপুরে কাটিয়েছেন। সেখানে গ্রাম্যবিদ্যালয়ে পড়া শেষ হলে কলকাতায় এসে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে তিনি ভর্তি হন। এই শিক্ষায়তন থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে যোলবছর বয়সে তিনি প্রথম বিভাগে পাশ করেন। অতঃপর জগদীশচন্দ্র ঢুকলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। উক্ত কলেজ থেকেই ১৮৭৮ সালে তিনি এফ্-এ ও ১৮৮০ সালে বি-এ [বিজ্ঞানশাখা] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি-এ পাশ ক'রে জগদীশচন্দ্র ভেবেছিলেন, সিভিল্ সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে জজ্-ম্যাজিস্ট্রেট কিছু হবেন। কিন্তু তাঁর পিতার ইচ্ছা বিলেতে গিয়ে তিনি বিজ্ঞান পড়েন। সুতরাং আই. সি. এস.-এর মোহ তাঁকে ছাড়তে হ'ল। অবশেষে ডাক্তারি পড়বার জন্যে জগদীশচন্দ্র বিলেত যাত্রা করলেন। কিন্তু লণ্ডনে পৌঁছে শেষাবধি চিকিৎসা অধ্যয়ন করা তাঁর হল না। ১৮৮১ সালে কেম্ব্রিজে গিয়ে তিনি বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হলেন। এই সময়ে বিশেষভাবে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও উদ্ভিদবিদ্যার দিকে তাঁর সমধিক ঝোঁক দেখা গেল। চার বৎসরকাল অধ্যয়নের পর জগদীশচন্দ্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে ট্রাইপস [Tripos] লাভ করেন। একই সময়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি. এস্-সি. উপাধিও লাভ করেছিলেন। পাঠসমাপনান্তে জগদীশচন্দ্র স্বদেশে ফিরলেন।

এবার জগদীশচন্দ্রের কর্মজীবনের সুরু। ভারতের তদানীন্তন লর্ড রিপনের প্রত্যক্ষ সাহায্যে ১৮৮৪ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হলেন। কিন্তু একজন ইংরেজ এই পদে যে-বেতন পেতেন, কেবল ভারতীয় বলে, তার চেয়ে অনেক কম বেতন দেওয়া হল তাঁকে। সাদায়-কালোয় এরূপ বৈষম্য জগদীশচন্দ্রের আত্মসম্মানকে আহত করল। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। এতেও কোনো ফল হল না। তখন তিনি এক অভিনব সত্যাগ্রহ সুরু করলেন—একাদিক্রমে তিনটি বছর মাইনে নিলেন না, বিনাবেতনে পড়িয়ে-যেতে লাগলেন। অবশেষে তেজস্বী তরুণ অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের কর্তব্য-নিষ্ঠার কাছে ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে হার মানতে হল, বিগত তিন বৎসরের মাইনের সম্পূর্ণ টাকা একসঙ্গে তিনি পেলেন।

কলেজে অধ্যাপনা-কাজ চলছে, সঙ্গে সঙ্গে, একাগ্রচিত্তে জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ যেন কঠোর তপস্যা। বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্যের জন্যে সরকারের কাছ থেকে সে-সময়ে তিনি একটি কপর্দকও সাহায্য পাননি। তা ছাড়া, তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে উন্নত ধরণের কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না। কী অসুবিধায় তাঁকে পড়তে হয়েছিল এ থেকে সহজে তা অনুমেয়। কিন্তু অর্থের অভাব, উপযুক্ত ল্যাবরেটরির অভাব, কিছুই তাঁর উৎসাহ-উদ্যমকে প্রতিহত করতে পারেনি। পুরানো যন্ত্রের সংস্কার সাধন করে তিনি গবেষণায় রত রইলেন। ১৮৯৪-৯৫ সালের দিকে বিদ্যুৎ-বিষয়ক তাঁর মৌলিক গবেষণার বিবরণ বিলাতের রয়্যাল সোসাইটিতে প্রকাশিত হল। এই কৃতিত্বের জন্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. এস্-সি. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলেন।

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনা কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে পদার্থ বিদ্যার বিশেষ একদিক নিয়ে তিনি গবেষণা করতেন। একালেই বিনাতারে টেলিগ্রাফযন্ত্রের উদ্ভাবন করে বিজ্ঞানজগতে তিনি নবযুগ এনেছিলেন। পৃথিবীর মানুষ জেনেছে, ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কনি বেতারযন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এ কথার মধ্যে আংশিক সত্য নিহিত থাকলেও সম্পূর্ণ সত্য এ নয়। জগদীশচন্দ্রই প্রথম বিনাতারে সংকেত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করেন, একমাইল দূরবর্তী স্থানের মধ্যে বেতারবার্তা পাঠাতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। Wire Telegraphy-বিষয়ে, মার্কনির পূর্বে, তাঁর গবেষণাই যে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তার নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু য়ুরোপে গিয়ে নিজের আবিষ্কার সকলকে দেখাবার আগেই মার্কনি দু-মাইল দূরে বিনাতারে সংবাদ পাঠান। ফলে মার্কনিই পেলেন বেতার আবিষ্কর্তার গৌরব। সহানুভূতি ও আর্থিক সাহায্যের অভাবে জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্যদেশে আপনার বিস্ময়কর আবিষ্ক্রিয়া দেখাতে পারলেন না, বাঙ্‌লাদেশের পক্ষে এ কম লজ্জার কথা নয়।

য়ুরোপে জগদীশচন্দ্রের প্রথম অভিযান ১৮৯৬ সালে। অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে তাঁর নতুন আবিষ্ক্রিয়া য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকসমাজের সমক্ষে প্রদর্শন করার জন্যে

ব্রিটিশ এসোসিয়েশন কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি বিলেত যান। সেখানে তাঁর বক্তৃতাসভায় বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা সমবেত হয়েছিলেন। লণ্ডনের প্রসিদ্ধ রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশনে তিনি নিজের আবিষ্কার সম্বন্ধে যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা শুনে বিশ্বখ্যাত লর্ড র‍্যালে বলেছিলেন—এ যেন মায়াজাল, এমন নির্ভুল পরীক্ষা আর কোথাও কখনো হয়নি। অলিভার লজ্ তাঁকে লণ্ডনে অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু স্বদেশবৎসল জগদীশচন্দ্র বললেন, ওই অনুরোধ রক্ষা করতে তিনি অসমর্থ। প্যারিস্ ও বার্লিনের বৈজ্ঞানীকমণ্ডলীও জগদীশচন্দ্রকে তাঁদের দেশে আহ্বান জানান। তাঁরা তাঁর বক্তৃতা শুনে আর পরীক্ষা দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে ১৮৯৭ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।

দেশে ফিরে জগদীশচন্দ্র নতুন উদ্যমে বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধানের কাজ সুরু করে দিলেন। অনবিচ্ছিন্ন তাঁর সাধনা। এবার তিনি গবেষণার ক্ষেত্রে পরিবর্তন করলেন—পদার্থবিদ্যায় কেন্দ্রিত তাঁর মন সহসা একদিন মূক উদ্ভিদ্‌জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হল। এখান থেকে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক-জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সুরু। তাঁর মননক্ষমতা যেমন তীক্ষ্ণ, তাঁর কল্পনাদৃষ্টি তেমনি অন্তর্ভেদী ও দূরধানী। নিশ্চিত বুঝতে পারা গেল, বিজ্ঞানী এখন ঋষির স্তরে উন্নীত হতে যাচ্ছেন। আমরা এতাবৎকাল জানতাম,—কেবল জীবেরই সাড়া দেবার শক্তি রয়েছে, এ শক্তি জড়ের নেই। কিন্তু জগদীশচন্দ্র যে-বিস্ময়াবহ তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন তাতে আমাদের এতকালের ধারণা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হল। তাঁর চোখেই প্রথম ধরা পড়ল, জীবের মতোই তথাকথিত জড়বস্তুও সাড়া দেয়, এবং উদ্ভিদ্‌জীবনে এর ক্রিয়া অধিকতর পরিস্ফুট। বাইরের আঘাতে বা উত্তেজনায় ধাতব পদার্থ—চেতনাবিরহিত—সামান্য একখণ্ড টিনও যে চেতনাবিশিষ্ট মানুষ এবং অপরাপর প্রাণীর ন্যায় ব্যথিত ও স্পন্দিত হয় এ সত্যটি প্রথম ঘোষণা করলেন জগদীশচন্দ্র। নিজের নির্মিত যন্ত্রের সাহায্যে তিনি দেখালেন, আঘাতপ্রাপ্ত কিংবা উত্তেজিত জড়বস্তু, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর স্পন্দনলিপি [গ্রাফ] অবিকল একই রকমের কোথাও কোনো পার্থক্য লক্ষিত হয় না। এ থেকে কী প্রমাণিত হল? প্রমাণিত হল যে, এই বিশ্বসংসারের যাবতীয় মানুষ, প্রাণী, লতাগুল্ম উদ্ভিদ্ আর চেতনাশূন্য পদার্থনিচয় পরস্পর-বিচ্ছিন্ন এবং ভিন্নজাতীয় বলে প্রতিভাত, হলেও এরা সকলে এক অদৃশ্য ঐক্যসূত্রে গ্রথিত, একই নিয়মে পরিচালিত; বিশেষে বৃক্ষজীবন ও মানবীয় জীবনের ওপর শক্তির ক্রিয়ার এতটুকু তারতম্য নেই। প্রকৃতির জগতে এতদিন যে কৃত্রিম ভেদরেখা ছিল, জগদীশচন্দ্র তা মুছে দিলেন, মানুষের চিন্তার রাজ্যে একটা ওলটপালট হয়ে গেল।

বিদেশে জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় অভিযান ১৯০০ সালে, প্যারিস থেকে তাঁর কাছে নিমন্ত্রণপত্র এল আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যাবিষয়ক সম্মেলনে যোগদান করবার জন্যে। এবার বিদেশে গিয়ে সেখানে বক্তৃতা দিলেন জীব ও জড়পদার্থের ওপর বৈদ্যুতিক সাড়ার একতা-বিষয়ে। তাঁর প্রত্যেকটি কথা নতুন, শুনে বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী অবাক হয়ে যান। জড় ও জীবের মধ্যে তিনি এমন এক সেতু রচনা করেছেন যা

মানুষের কল্পনাকেও হার মানায়, যা সত্যই অভাবনীয়। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণিত সত্যকে অবিশ্বাস করবে এমন সাধ্য কার? জগদীশচন্দ্রের তৈরী সূক্ষ্ম যন্ত্র বিরুদ্ধপক্ষের মুখর প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে দিল।

প্যারিস থেকে তিনি লণ্ডনে এলেন। সেখানেও তিনি বক্তৃতা দিলেন। যন্ত্রের সাহায্যে সকলকে দেখালেন—উদ্ভিদ্, জীবী, অজীবী এদের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই—সকলের সাড়ালিপি এক। সেখানকার বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের মনে হল, জগদীশচন্দ্রের 'theory' এককথায়—'magic'। তিনি যে-সূক্ষ্মযন্ত্র নির্মাণ করেছেন তাতে বৃক্ষের বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ হয়, তার বৃদ্ধির পরিমাণও মুহূর্তে মুহূর্তে নির্ণয় করা যায়। উদ্ভিদ্জগতের সম্বন্ধে বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিকের থিয়েরী জগদীশচন্দ্র একেবারে ধূলিসাৎ করে দিলেন। ১৯০২ সালে তিনি ভারতে ফিরে এলেন।

এরপর জগদীশচন্দ্র আরো তিনবার বিদেশে যান—১৯০৭, ১৯১৪ ও ১৯২৮ সালে। উদ্দেশ্য—নিজের নতুন আবিষ্ক্রিয়া ও নিজের উদ্ভাসিত যন্ত্রাদির প্রচার। ১৯০৭ সালের অভিযানে তিনি প্রথমে ইংলণ্ডে, তৎপর আমেরিকায় গিয়েছিলেন। তাঁর মৌলিক গবেষণা সর্বত্র অশেষ সমাদর পেয়েছে, তিনি তখন সম্মানগৌরবের সমুচ্চ শিখরে সমাসীন। ১৯০৯ সালের দিকে জগদীশচন্দ্র কয়েকটি আশ্চর্য যন্ত্র নির্মাণ করেন। এগুলির মধ্যে স্বয়ংলেখ-যন্ত্রটি [Resonant Recorder] সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃক্ষকে উত্তেজিত করলে তার মধ্যে যে-বিচিত্র পরিবর্তন দেখা দেয় এই যন্ত্রে তা সঠিক ধরা পড়ে। উদ্ভিদ্মাত্রেই স-সাড়, তাদের অনুভবক্ষমতা রয়েছে, যদিও এ অনুভবের বহিরঙ্গ প্রকাশ মানুষ কিংবা প্রাণীর ন্যায় সোচ্চার নয়। অতি সহজেই সাড়া দেয় লজ্জাবতী ও বনচাঁড়ালজাতীয় বৃক্ষলতা। একবার এইসব গাছ নিয়ে তিনি য়ুরোপে গিয়েছিলেন। পশ্চিমের দেশগুলির নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে ১৯১৭ সালে তিনি ওইসকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়ে আসেন। য়ুরোপের বিবিধ বিজ্ঞানসভা তাঁকে বক্তৃতার জন্যে আহ্বান জানায়। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে তাঁর নতুন-আবিষ্কৃত ক্রেস্কোগ্রাফ-সাহায্যে তিনি যখন বক্তৃতা করতেন তখন জ্ঞানীগুণী শ্রোতৃবৃন্দ বিস্ময়ে অভিভূত হতেন। এই বিখ্যাত যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয় ১৯০৭ সালে। এতে উদ্ভিদের বৃদ্ধিমাত্রা কোটি গুণ বাড়িয়ে লিপিবদ্ধ হয়। এক সেকেণ্ডে গাছ কতটুকু বাড়ল এর সাহায্যে তাও ধরা পড়ে। ১৯২০ সালে তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলোরূপে [F. R. S.] গৃহীত হন।

জাতিসঙ্ঘের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে ১৯২৮ সালে জগদীশচন্দ্র জেনেভায় যান। এসময়ে তিনি কয়েকটি সূক্ষ্মতম যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। সেইসব যন্ত্রের সূক্ষ্মতা দেখে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা বিস্ময়াভিভূত হলেন। যে সকল যুক্তি দেখিয়ে তিনি উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মধ্যেকার এতকালের ব্যবধান দূর করলেন, সকলপ্রকার প্রাণক্রিয়াকে একই ধরনের বলে বোঝালেন, তার প্রতিবাদে জানাবার সাধ্য কারো রইল না। এলবার্ট আইনস্টাইনের মতো মহামনীষী বললেন, জগদীশচন্দ্রের

প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক-একটি বিজয়স্তম্ভ। মনীষী রোঁলার ভাষায় জগদীশচন্দ্র হলেন—'Revealer of a New World'। যতবার তিনি য়ুরোপে গেছেন প্রত্যেকবারই জয়মাল্য নিয়ে ভারতভূমিতে ফিরেছেন।

জগদীশচন্দ্রের অপর এক স্মরণীয় কীর্তি কলিকাতায় বসু-বিজ্ঞান-মন্দীর। এই জ্ঞানমন্দীরটি স্থাপিত হয় ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর। এর স্থাপনার দুটি উদ্দেশ্য। প্রথমটি হল ভারতীয় বিজ্ঞানসাধক কর্তৃক নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার, দ্বিতীয়টি—সেই নতুন তত্ত্ব জগৎসভায় প্রচার। ভারতবর্ষ জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরের কাছে চিরকাল ঋণী থাকবে না, অপরকেও দেবার শক্তি অর্জন করবে। তবেই তো স্বদেশের গৌরব। 'ভারতের দান ব্যতিরেকে জগতে জ্ঞান অসম্পূর্ণ' একথা বলে গেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র। ভারতবাসী উচ্চতর বিজ্ঞানচর্চায় রত হোক, তার আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্য দূরদূরান্তরে প্রচারিত হোক দেশদেশান্তর থেকে মানুষ এসে আমাদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব আহরণ করুক, আচার্যদেবের এরকম একটি অভিপ্রায় থেকেই উক্ত বিজ্ঞানমন্দিরের স্থাপনা।

জগদীশচন্দ্র শুধু বিজ্ঞানসাধক ছিলেন না, তাঁর মধ্যে আমরা গভীর স্বদেশানুরাগ দেখেছি, দেখেছি প্রগাঢ় জাতিবাৎসল্য। মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করার জন্যে জগৎসভায় স্বজাতির মহিমাবর্ধনের জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। স্বদেশের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল অত্যন্ত প্রবল। একারণে বিলেতে অধ্যাপকপদ গ্রহণ করতে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি বলেছিলেন যে, জন্মভূমির স্নেহবন্ধন ছিন্ন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। নিজের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানমন্দির তিনি 'ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ-কামনায় দেবচরণে নিবেদন' করেছেন; তাঁর স্বরচিত সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'জড় ও প্রাণীজগতে স্পন্দন' দেশবাসীর নামে উৎসর্গীকৃত।

তিনি মাতৃভূমিকে যেমন গভীরভাবে ভালোবেসেছেন, তেমনি মাতৃভাষাকেও। জগদীশচন্দ্র নিজের মৌলিক গবেষণার বিবরণ প্রথমে বাঙ্‌লাভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং আপনার আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলিরও বাঙ্‌লা নাম রেখেছিলেন। বিজ্ঞানী হলেও তাঁর মধ্যে একজন কবি নিভৃতে বিরাজমান ছিল। তাই, তাঁর রচনা কবিত্বের সুরভিমাখা। তিনি একখানা-মাত্র বাঙ্‌লা বই আমাদের উপহার দিয়েছেন, নাম— 'অব্যক্ত', প্রধানত বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। এর মধ্যে কবি ও সাহিত্যকার জগদীশচন্দ্রের নির্ভুল পরিচয় মুদ্রিত। তাঁর লেখা চিঠিপত্রগুলিও সাহিত্যগুণান্বিত।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার গভীরে জগদীশচন্দ্র যতই ডুব দিয়েছেন, বিশ্বসংসারের বিচিত্রতার অন্তরালবর্তী এক এর সত্যটি ততই তাঁর চোখে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষের সত্যদ্রষ্টা ঋষিকুলের মতোই তিনি ঐক্যদর্শী বহুকে একের সূত্রে তিনি গ্রথিত করেছেন। একালের অপর কোন বিজ্ঞানী তাঁর মতো এমন উচ্চকণ্ঠে ঐক্যের বাণী ঘোষণা করেন নি। বিজ্ঞানতাপস জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি',—একথা অতিশয় যথার্থ, এবং 'আর্য আচার্য জগদীশ'-এর সম্পর্কে কবির ওই কথাগুলিই আমাদেরও শেষকথা।

বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ

কোনো নতুন কথা নয়—সবার জানা, সবারই শোনাকথার পুনরুল্লেখ এখানে। যা সকলের পরিজ্ঞাত তার পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্য হল রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার আত্যন্তিক গুরুত্বটিকে সবসাধারণের সমক্ষে তুলে ধরা। সুবিদিত হলেও রবীন্দ্রবিষয়ক কথা বারংবার শোনার প্রয়োজন আছে। এই নিশ্চিত সত্যটি আমরা যেন ভুলে না যাই যে বাঙালির মহিমান্বিত প্রতিষ্ঠাভূমি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রকে বাঙালি নিজেদের মধ্যে পেয়েছে, এ পরম সৌভাগ্যকে সে বিশেষভাবে স্মরণ না করে পারে না।

বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথকে সঠিক বুঝতে ও জানতে হলে সর্বাগ্রে আবশ্যক তাঁর জীবনের বহুবিচিত্র ঘটনাবলীর সঙ্গে কথঞ্চিৎ পরিচয়সাধন। রবীন্দ্রজীবনকথার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপ :

জোড়াসাঁকো কলকাতার উত্তরাংশের সর্বজনবিদিত একটি অঞ্চল। বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ—ইংরেজি ১৮৬১ সালের ৮ই মে—উক্ত জোড়াসাঁকোর প্রখ্যাত ঠাকুরপরিবারে রবীন্দ্রনাথের শুভজন্ম। রবীন্দ্রনাথের পিতামহের নাম দ্বারকানাথ ঠাকুর। তাঁর সম্পদের প্রাচুর্য আর জাঁকজমকের চমকলাগানো আড়ম্বরের জন্যে লোকে তাঁকে 'প্রিন্স' বলত।

দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথের পিতা। মহর্ষি অতিশয় ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্মপ্রাণ, সাত্ত্বিক প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন। ন্যায় ও ধর্মের মর্যাদা কখনো তিনি ক্ষুণ্ণ করেন নি। তরুণ বয়সেই দেবেন্দ্রনাথের চিত্তপ্রবণতা আধ্যাত্মমুখী হয়ে উঠেছিল, ঈশ্বরজিজ্ঞাসা তাঁকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। পরিপূর্ণ যৌবনের দিনেই তিনি ধর্মসাধনায় রত হয়েছিলেন। একদা দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের চিন্তাধারার প্রভাবে আসেন। রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসমাজকে তিনি শক্তিশালী করে তোলেন। আধুনিক ভারতবর্ষে তাঁকে উপনিষদমন্ত্রের উদ্‌গাতা বলা যেতে পারে। তাঁর ভক্তদল শিষ্যবৃন্দের চোখে তিনি একালের মহর্ষি'। মহর্ষির চরিত্র বহুগুণে ভূষিত। এহেন পিতার পুত্র কবি রবীন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও চারিত্রিক গুণাবলীর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে গূঢ়সঞ্চারী।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের ঐতিহ্য মহিমাদীপ্ত। এককালে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ঠাকুরবাড়ীতে একত্র মিলিত হয়ে যুক্তবেণী রচনা করেছিল। ধর্ম দর্শন সাহিত্যে সংগীত নাট্যাভিনয় জাতীয়তা স্বাদেশিকতা ইত্যাদির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এই ঠাকুরবাড়ীর। ঠাকুরবাড়ীর সংস্কৃতিমান মানুষগুলির সুরুচিসম্পন্ন জীবনযাত্রা

একটা প্রেক্ষণীয় বস্তু ছিল। এরূপ একটি পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-বিকাশের কম সহায়তা করে নি।

সেকালকার ধনী পরিবারের রীতি অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছে চাকরদের কাছে। তাঁর নাওয়া খাওয়ার ভার ছিল চাকরদের ওপর। তাদের হাতে তাঁকে কী কষ্টই-না ভোগ করতে হয়েছে। এদিকে অন্তঃপুরেও তিনি ইচ্ছামতো প্রবেশ করতে পেতেন না। শুধু রাত্রিবেলা শোবার জন্যে মার কাছে যেতেন। বর্ষীয়সী মহিলাদের মুখে—কখনো ঝি-দের মুখে—রূপকথা জানতেন তিনি। চাকরদের জিম্মায় থাকাকালে বদ্ধ ঘরের জানলা দিয়ে, বাইরে পুকুরটার দিকে তাকিয়ে, তাঁর নিঃসঙ্গ দুপুরটা কেটে যেত। তখন তাঁকে সঙ্গ দিত দূরের রহস্যময় নিসর্গপ্রকৃতি, বালকের মন কল্পনার পাখায় ভর করে কোথায় উড়ে যেত।

রবীন্দ্রনাথের লেখাপড়া শুরু হয় চার-পাঁচ বছর বয়সে। তাঁর বয়স যখন ছ-বছর তখন তিনি স্কুলে ভর্তি হন—বলা যেতে পারে কান্নার জোরে। কিন্তু ইস্কুল প্রাচীরের মধ্যে রবীন্দ্রের মন বসত না। স্নেহসম্পর্কহীন বিদ্যালয়ের চিরায়ত—পঠনপাঠন রীতি তাঁর ভালো লাগত না। গোটা তিন ইস্কুলে কিছুকাল পড়াশোনা করে, শেষে বিদ্যালয়ে যাওয়া ছেড়েই দিলেন। দাদাদিদিরা রবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হলেন। ইস্কুল তিনি ছাড়লেন, কিন্তু তাই বলে লেখাপড়া যে তিনি ভালোবাসতেন না তা নয়। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত গৃহশিক্ষকের কাছে তাঁর পড়াশোনা চলত। বাঙলা, সংস্কৃত, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অস্থিবিদ্যা কিছুই তাঁর শিক্ষার তালিকা থেকে বাদ পড়েনি। প্রতিদিন ভোরবেলা একজন পালোয়ান এসে তাঁকে কুস্তি শিখিয়ে যেত। বাড়ীর একজন গায়কের কাছে তাঁর গান শেখাও চলতে লাগল।

বারো বছর বয়সে রবীন্দ্রের পৈতে হয়। এসময় মহর্ষি রবিকে সঙ্গে নিয়ে ডালহৌসি পাহাড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পাহাড়ে একা একা ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা পেয়ে রবীন্দ্র যেন মুক্তির আস্বাদ পেলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই হিমালয় ভ্রমণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিমালয় থেকে ফিরে এলে পর রবীন্দ্রনাথকে আবার ইস্কুলে ভর্তি হতে হল—সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল। বছর দুই এখানে তিনি পড়েছিলেন। এরপর আর কখনো বিদ্যাশিক্ষার জন্যে ইস্কুলে যাননি।

রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখায় হাত দেন সাত-আট বছর বয়সে। বড়োরা কাব্য-সাধনায় সর্বদা তাঁকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর প্রথম-প্রকাশিত কবিতাটির নাম 'অভিলাষ'—কবির বারো বছর বয়সে লেখা। ছোটবেলায় বিস্তর বই তিনি পড়েছেন। বিহারীলালের ছন্দিত রচনা আর বঙ্কিমের উপন্যাস তাঁর খুব ভালো লাগত। কবিকে সাহিত্যচর্চায় অনুপ্রাণিত করতেন তাঁর বৌদি—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী—কবির সাহিত্য পাঠের নিত্যসঙ্গী ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রের কাব্যরচনায় ঝোঁক দিনদিন বেড়ে চলল, ফুলের মতো তাঁর সৃজনীপ্রতিভা ধীরে ধীরে উন্মীলিত হতে লাগল। হিন্দুমেলায় পনেরো বছর বয়সে নিজের লেখা স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা শুনিয়ে সকলকে তিনি অবাক করে

ভগবদ্‌মুখিতার পরিচয় বহন করেছে। পরবর্তী 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' একই সুরে বাঁধা। আরো কতকগুলি বিখ্যাত গ্রন্থ কবি এসময়ে প্রকাশিত করেন—'শারদোৎসব', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'অচলায়তন', 'রাজ', 'ডাকঘর', 'গোরা', 'জীবনস্মৃতি' ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রের কিছু কিছু রচনা ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে, বিলাতে সাহিত্যিক সমাজে সেগুলি সমাদর পেতে আরম্ভ করেছে। ১৯১০ সালে কবি পঞ্চাশ বছরে পদক্ষেপ করলেন। এই বছর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক তিনি বিপুলভাবে অভিনন্দিত হলেন। দেশবাসী কবিকে প্রীতি জানাল, শ্রদ্ধা জানাল। এরূপ সার্বজনীন কবিসম্মাননা এদেশে এই প্রথম।

১৯১২ সালে কবি আর-একবার বিলেতে যান। ওখানে যাওয়ার সময় তিনি ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র হাতে লেখা কপি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। সেখানকার শিল্পী ও কবিদল এই কবিতাগুলি শুনে চমৎকৃত হলেন। এর মধ্যে যে অধ্যাত্মভাবুকতার রস রয়েছে তা তাঁদের কাছে অনাস্বাদিতপূর্ব। কবিতাগুলি ইংলণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। ১৯১৩ সালে এদেশে সংবাদ এল, 'গীতাঞ্জলি'-র জন্যে রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েছেন। এই দুর্লভ সম্মানে কেবল কবিই গৌরবান্বিত হলেন না, এ গৌরব সমগ্র ভারতবর্ষের—বিশেষে বাঙালিজাতির।

রবীন্দ্রকাব্যধারায় কতবার আমরা বাঁকফেরা দেখেছি। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত 'বলাকা' কাব্যে সম্পূর্ণ নতুন একটি সুর শোনা গেল। কবি যৌবনের জয়গানে মুখর হলেন, দুঃখ-বিপদ-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নির্ভাবনায় এগিয়ে চলার উদার বাণী শোনালেন দুঃসাহসী যৌবনপূজারীকে, তামসিকতা ও জড়ত্বের অচলায়তন ভাঙবার মন্ত্র দিলেন দেশের মানুষের কানে। তখন প্রথমবিশ্বযুদ্ধ চলছে—অসত্য ও মিথ্যার বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করলেন—কবির হাতের লেখনী যেন হাতিয়ারে পরিণত হল। পৃথিবী তখন রণোন্মত্ত। পশ্চিমের জঙ্গিবাদী জাতীয়তাকে তিনি ধিক্কার জানালেন, সামরিকবাদী জাপান ও সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকায় গিয়ে ভারতবর্ষের মৈত্রীর কথা শোনাতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর শান্তির বাণীর প্রতি কেউ কান দিল না। রবীন্দ্রের এসব বক্তৃতামালা তাঁর ইংরেজিতে-লেখা ''ন্যাশনালিজম্' বইটিতে স্থান পেয়েছে।

১৯১৫ সালে বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্র ইংরেজের প্রদত্ত 'স্যর' উপাধিতে ভূষিত হলেন—রাজকীয়-সম্মান পেলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র ভারতবাসীর ওপর নির্দয়ভাবে মেসিনগানের গুলি চালিয়ে ইংরেজ যে-উলঙ্গ বর্বরতা দেখালে তার প্রতিবাদে কবি ব্রিটিশশাসকের প্রতি চরম ঘৃণায় ওই 'স্যার' উপাধি বর্জন করলেন। পাঞ্জাবের এই শোচনীয় ঘটনা সম্পর্কে, তৎকালীন বড়লাটের কাছে, অগ্নিময়ী ভাষায় যে-পত্রখানি তিনি লিখেছিলেন তা কখনো ভুলবার নয়। শক্তিস্পর্ধিত শাসকের রক্তচক্ষুকে সেদিন কবি এতটুকু ভয় করেন নি।

'লীগ্ অব্ নেশনস্' পৃথিবীতে শান্তিস্থাপন করতে পারেনি সাম্প্রতিক কালের রাষ্ট্রসঙ্ঘও কি পেরেছে? রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান-ভাবের বিনিময়, না হলে বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তাই পূর্বপশ্চিমের মিলনের জন্যে নূতন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন—বিশ্বভারতী। এ প্রতিষ্ঠানটিকে বলা যেতে পারে—'লীগ অব্ কালচারস্'। বিশ্বভারতী গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনস্থল হয়ে উঠবে, কবি এই আশা করতেন।

অবিশ্রান্ত লেখনী চালিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, সর্বদা তিনি সৃষ্টিসুখের আনন্দে মগ্ন থাকতেন। পরিপূর্ণ বার্ধক্যের দিনেও তাঁর সৃজনীপ্রতিভার দীপ্তি ম্লান হয়নি। কবির নির্মিত সাহিত্যের বিচিত্রতাও প্রেক্ষণীয়। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে অনেকগুলি বই তিনি লিখেছেন, যেমন,—ঋণশোধ', 'মুক্তধারা', 'লিপিকা', 'পূরবী', 'মহুয়া', 'রক্তকরবী', 'শেষরক্ষা', 'যোগাযোগ' 'শেষের কবিতা', 'তপতী'—ইত্যাদি। ছবি আঁকার প্রতি কবির বরাবরই ঝোঁক ছিল। সত্তর বছরে পৌঁছে তিনি চিত্রাঙ্কনে মেতে উঠলেন, অজস্র অদ্ভুত ছবি অবলীলায় এঁকে ফেললেন।

কবির সত্তর বছরের জন্মদিনে জয়ন্তীউৎসব অনুষ্ঠিত হল মহাসমারোহ সহকারে। দেশবাসী কবিকে কত যে ভালবাসে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। দেশবিদেশের অসংখ্য মনীষী তাকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জানালেন। ১৯৩০ সাল এবং তারপরেও তিনি ভারতের বাইরে গিয়াছেন, বিশ্ববাসীকে মানবমহামিলন ও শান্তির পথনির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের 'প্রফেট'—শান্তিদূত—একথা তখন সকলের মুখে শোনা গেছে।

বার্ধক্য তাঁর দেহকে জীর্ণ করেছে কিন্তু প্রতিভাকে নির্বাপিত করতে পারে নি। এখনো সাহিত্যের নতুন নতুন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা চলছে, একের পর এক বই লেখা হচ্ছে। অপরবিধ কাজও তাঁর কম নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলাবিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে তিনি বৃত হলেন, গান্ধীজীর আমৃত্যু-অনশনব্রত ভাঙবার জন্যে-পুণ্য-অভিমুখে ছুটে গেলেন। ১৯৪০-এর আগষ্ট মাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে 'ডক্টর' উপাধি দেন। এই উপাধিদান উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে যে-সমারোহ হল তা স্মরণীয়। ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে রবীন্দ্রের লিখিত বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এই সৃষ্টিপ্রাচুর্য বিস্ময়কর। একালে লেখা কয়েকটি বইয়ের নাম হল—'রাশিয়ার চিঠি', 'পরিশেষ', 'কালের যাত্রা', 'দুইবোন', 'মানুষের ধর্ম', তাশের দেশ', 'পুনশ্চ', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী', 'কালান্তর', 'বিশ্বপরিচয়' 'বাঙলাভাষা-পরিচয়', 'ছেলেবেলা', তিনসঙ্গী', 'গল্পসল্প', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', সভ্যতার সঙ্কট' —ইত্যাদি।

১৩৪৮ এর ২৫-শে বৈশাখ—ইংরেজি ১৯৪১ সালের ৮ই মে—কবির মর্তজীবনের শেষ বৈশাখ। এখন তিনি খুবই অসুস্থ। চিকিৎসা চলেছে কিন্তু রোগের উপশম হয় না। ডাক্তারের পরামর্শে জুলাই মাসে তাঁকে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আনা হল। জোড়াসাঁকোর যে-বাড়িতে আশিবছর পূর্বে প্রথম চোখ মেলে তিনি পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন, জীবনের ধূসর গোধূলিলগ্নে রবীন্দ্র সে-বাড়ীতে ফিরে এলেন

অপারেশন হল। কিন্তু সব চিকিৎসাই ব্যর্থ। ১৯৪১-এর ৭ই আগস্ট—বাঙলা সাল ১৩৪৮-এর ২২শে শ্রাবণ—কবি চোখ বুজলেন। রবীন্দ্রকে হারিয়ে আমরা যেন সর্বস্বান্ত হলাম।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শেষ হল। কিন্তু কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রের বিশাল ব্যক্তিত্বের কথা শেষ হয়নি। তা বলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মানুষের দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে উজ্জ্বলতম একটি নাম। কী তাঁর সামগ্রিক পরিচয়? এ পরিচয়ের ঐতিহাসিক তাৎপর্যই-বা' কী? রবীন্দ্রনাথ শুধু কি একজন স্মরণীয় কাব্যকার—একজন ব্যক্তিকবি-মাত্র? অবশ্যই নয়। তবে কী? তিনি দূরবিস্তার পরিপূর্ণ একটি যুগ। তারো চেয়ে অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথ গোটা একটা শতাব্দীর চলমান সংস্কৃতির 'প্রদীপ্ত ভাববিগ্রহ। শতাব্দীর কণ্ঠে তিনি ভাষা দিয়েছেন। রবীন্দ্রের বিচিত্রকর্মান্বিত স্মরণসুন্দর জীবন মানবেতিহাসের এক আশ্চর্য সৃষ্টি। তাঁর নির্মিত সাহিত্যাকৃতি স্বদেশের জীবনকে আলিঙ্গন করেছে, তাঁর অসামান্য সৃষ্টিপ্রতিভার রাজোচিত দাক্ষিণ্য বিশ্বের অভিমুখে প্রসারিত হয়েছে। তাঁর কাব্যে মানুষের মহৎ আত্মপ্রকাশের স্বাক্ষর মুদ্রিত। রবীন্দ্রের মতো এমন উচ্চকণ্ঠে আর কে ঘোষণা করছেন বলিষ্ঠ মানবতার বাণী? সাহিত্যে রবীন্দ্রের অধ্যাত্মদান প্রোজ্জ্বল মানবিকতা। তাঁর ঘোষিত এই মানবিকতার বাণীই পৃথিবীর দূরদূরান্তরের মানুষকে প্রাণিত করেছে। মানব-মূল্যকে আকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েছেন বলেই বিশ্ববাসীর তিনি অন্তরঙ্গ আত্মীয়। এই মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিকে তাকিয়েই প্রতীচীর মনীষীবৃন্দ বললেন—'ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সার্থকতম দেশ।'

কী পরাক্রান্ত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন মহামানব রবীন্দ্রনাথ! এই প্রতিভার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো। পৃথিবীর কোন্ কবিশিল্পীর সঙ্গে রবীন্দ্রের তুলনা করবো? হোমার, শেক্সপিয়র, গ্যেটে, দান্তে, টলস্টয়, কালিদাসের সঙ্গে? এঁদের সকলেই নিঃসংশয়িতভাবে মহৎ স্রষ্টা। তথাপি বলবো, একদিক থেকে বিচার করলে এসকল লোকখ্যাত সাহিত্যকার কারো সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না। রবীন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্যের আশ্চর্যসুন্দর রূপলোক নির্মাণ করেন নি, সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে গোটা একটা দেশকে তিনি গড়ে তুলছেন, বৃহৎ একটি জাতিকে সৃষ্টি করেছেন জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নতুন রূপ দিয়েছেন। আধুনিক বাঙলা ভাষা রবীন্দ্রের সৃষ্টি, একালে বাঙালি লেখকদল তাঁর মানসসন্ততি। বাঙালির মননে, ভাবনায়, ধ্যান-ধারণায় রবীন্দ্রনাথ অচ্ছেদ্যভাবে মিশে গিয়েছেন। অবারিত আলোবাতাসের মতোই কবিরবীন্দ্র সর্বদিকে আমাদের আচ্ছন্ন করে বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বর্তমান বাঙালির প্রায়-সর্বস্ব একথা বললে কি কিছু অত্যুক্তি হয়? কেবল সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে একটা দেশকে সৃষ্টি করা যায় এমন পরমাশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীর কোথায় ঘটেছে?

বাঙালির অন্তরতর সত্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রবীন্দ্রের ভাবসত্তা অনুপ্রবিষ্ট। আমাদের

হাসি-অশ্রু-আনন্দ বেদনার প্রকাশ তাঁর ভাষায়; আমাদের বিচিত্র উৎসব-অনুষ্ঠান বাণী খোঁজে তাঁর অজস্র গানে; বাঙ্‌লাভূমির ষড়ঋতুর লীলারঙ্গ আমরা উপভোগ করি তাঁর দৃষ্টি ও কল্পনা দিয়ে; আমাদের চলনে বোলনে, আচারে-শীলে, তাঁর অনুশীলিত রুচির শুচিশুভ্র মুদ্রাঙ্কন স্পষ্টরেখ। কী ব্যক্তিগত জীবনে, কী জাতিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে এক মুহূর্ত আমরা চলতে পারি না—এতখানি অপরিহার্য তিনি।

কেবল বিশুদ্ধ কাব্যের নন্দনলোকে রবীন্দ্রের রসমুগ্ধ বিহরণ নয়, গদ্যময় জীবনের কঠিন ভূমিতেও অবলীলায় তাঁর সঞ্চরণ। কখনো তিনি আমাদের শুনিয়েছেন বাঁশির ললিত রাগিণী, কখনো তাঁর কণ্ঠে আমরা শুনেছি সুগম্ভীর তূর্যধ্বনি—মাধুর্য আর বীর্যের অদ্ভুত সমন্বয় তাঁর কবিব্যক্তিত্বে। কখনো তিনি বাউল, কখনো বা কবি-বিদ্রোহী। অনুরাগে তিনি সুকোমল, প্রতিবাদে রুদ্রকণ্ঠ। জাতির সংগঠনমূলক কর্মে, জাতির সংকটমুহূর্তে, জাতীয় আন্দোলনে বার বার তিনি সকলের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নিদারুণ দুর্যোগের দিনে অবিস্মরণীয় রাখীবন্ধন-উৎসব, জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে, হিজলীর গুলিবর্ষণে, গান্ধীজীর অনশনে, বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার রাথবোনের উদ্ধত অশিষ্ট উক্তির বজ্রকণ্ঠ প্রতিবাদে কবির মহিমান্বিত ভূমিকা কার-না বিদিত? শুধু বাঙ্‌লার নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের আত্ম-মর্যাদাবোধের অত্যুজ্জ্বল প্রতীক এই রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ শুধু শিল্পলোক রচনা করেননি, তাঁর নিজের জীবনটাও যেন সর্বাঙ্গসুন্দর এক শিল্পকর্ম। জীবনকে যে আর্টের মতোই গড়ে তোলা যায় তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন রবি-কবি আমাদের সমক্ষে তুলে ধরেছেন। তাঁর সাহিত্যসাধনা ও জীবনসাধনাকে কেন্দ্র করে বাঙ্‌লাদেশে একটা অভিনব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে—রবীন্দ্রসংস্কৃতি। এই পরিমণ্ডলে বাস করে বাঙালির রুচি মার্জিত হয়েছে, অনুভূতি সূক্ষ্মতা ও গভীরতা লাভ করেছে এতে সন্দেহ কী? সবচেয়ে বড়ো কথা, কেমন করে বাঁচবো—সম্প্রতিকালের মানুষের মুখে এই যে একটি প্রকাণ্ড প্রশ্ন—তার উত্তর মিলবে রবীন্দ্ররচনাবলীতে।

মহাপ্রেমিক-সন্ন্যাসী শ্রীবিবেকানন্দ

একালের বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দ এক অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, তাঁর কণ্ঠোদ্গীর্ণ বেদান্তের বাণী, তাঁর প্রচারিত বিদ্যুৎগর্ভ শক্তিমন্ত্র উনবিংশ শতকের ভারতভূমিতে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। একদা য়ুরোপ-আমেরিকার সংখ্যাতীত মানুষ বীর্যদীপ্ত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামীজীর দিকে তাকিয়েছে বিস্ময়চকিত দৃষ্টিতে। ভূখণ্ডের যেখানেই তিনি গেছেন ঝড় তুলেছেন, স্বামীজীকে লক্ষ্য করে ওদেশের সকলে বলত—'Cyclonic-monk'। কী তাঁর তেজ, কী তাঁর মহিমা! বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা বাঙালিপ্রতিভার অত্যাশ্চর্য বিকাশ দেখেছি। তাঁকে আশ্রয় করে একটা যুগ কথা কয়ে উঠেছিল। আমাদের সমাজে, ধর্মে, সাহিত্যে, রাজনৈতিক চিন্তাধারায়, স্বাদেশিকতায়, জাতীয়তার মনোভাবে বিবেকানন্দের জীবন-সাধনার প্রভাব যেমন ব্যাপক তেমনি গভীরচারী।

পরবর্তীকালে যিনি বিবেকানন্দ-নামে পৃথিবীখ্যাত হয়েছিলেন সেই নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় উত্তরকলকাতার শিমলাপল্লীর প্রসিদ্ধ দত্তবংশে—১৮৬৩ ইংরেজি সালের ১২ই জানুয়ারী

ছেলেবেলায় নরেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত দুরন্তপ্রকৃতির, যেমন অবাধ্য তেমনি অস্থির। ছেলেকে শাসনে আনতে না পেরে নরেন্দ্রের মা মাঝে মাঝে বলতেন—'শিবের কাছে ছেলে চেয়েছিলাম, ভূতনাথ আমার কাছে পাঠিয়েছেন আস্ত একটি ভূত'।

বিদ্যাশিক্ষার জন্যে ছ-বছর বয়সে তাঁকে প্রাইমারি স্কুলে পাঠানো হল। শৈশব থেকেই তাঁর অসামান্য মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেতে লাগল। প্রাইমারি স্কুলের পড়া শেষ হলে তিনি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হলেন। তাঁর চমকপ্রদ ধীশক্তি শিক্ষক আর সহপাঠীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নরেন্দ্র শুধু পড়াশুনা নিয়েই থাকতেন না—খেলাধূলা, গানবাজনা, কুস্তি—সমস্তকিছুর দিকেই নরেন্দ্রের ঝোঁক ছিল। তাঁর অবারিত প্রাণপ্রাচুর্য সকলেরই চোখে পড়ত। চঞ্চলতা-অস্থিরতা তাঁর মধ্যে দেখা যেত, বহু সঙ্গীর সঙ্গে অবাধে তিনি মিশতেন। এদের মধ্যে খারাপ ছেলেও যে কেউ কেউ ছিল না এমন নয়। কিন্তু কুপথে নরেন্দ্রনাথ কখনো পা বাড়াননি। পাপের প্রলোভন এড়াবার সহজাত একটা শক্তি তাঁকে বারবার সাবধান করে দিয়ে যেন বলতো, ওপথ তাঁর জন্যে নয়। তা ছাড়া, সুমাতা ও সুপিতার শিক্ষার প্রভাবে পবিত্রতা ও সরলতা তাঁর অন্তরতম বস্তুতে দাঁড়িয়েছিল। খেলাধূলা তিনি করতেন, আমোদপ্রমোদে মেতে উঠতেন অথচ পাঠাভ্যাসে কদাপি

শিথিলতা দেখান নি। আর একটি উল্লেখ্য বিষয় হল, দিনের বেলায় নানা কিছুতে জড়িত থাকলেও রাত্রির নৈঃশব্দের মধ্যে ধ্যানজপে রত হওয়া কিশোর বয়সেই নরেন্দ্রের শুরু হয়ে গিয়েছিল।

নরেন্দ্রনাথ যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এবার উচ্চতর শিক্ষা আরম্ভ হল। প্রথমে ঢুকলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে, তৎপর জেনারেল এসেমব্লি মহাবিদ্যালয়ে। এই দুই শিক্ষায়তনে অধ্যয়নকালে সহপাঠী আর অধ্যাপক-অধ্যক্ষের চোখে ছাত্র হিসাবে তাঁর অসামান্যতা এবং তাঁর সুদীপ্ত ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ল। ছাত্রাবস্থায় কলেজপাঠ্য বই ছাড়া আরো কত যে গ্রন্থ তিনি পড়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদর্শন আর ন্যায়শাস্ত্রের বইগুলি তাঁর কাছে করতলে আমলকবৎ ছিল, একাল ও সেকালের সর্বদেশীয় ইতিহাসে ছিল তাঁর অসামান্য আয়ত্তি।

ঈশ্বরে আশক্তি, ধর্মে বিশ্বাস নরেন্দ্রের জন্মগত। কিন্তু পাশ্চাত্যদর্শন পড়ে ধীরে ধীরে তিনি সংশয়বাদী হয়ে উঠতে লাগলেন। পশ্চিমী যুক্তিবাদ তাঁর ভক্তি-বিশ্বাসের ভূমিটিকে ক্রমে আঘাত করতে লাগল। নরেন্দ্র নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকলেন, অথচ বিশ্বচরাচরের পরমতম সত্যকে জানবার জন্যে তাঁর ব্যাকুলতার শেষ নেই। অজ্ঞেয়ের তত্ত্ব জানা যাবে কী করে, একালে এই ছিল তাঁর সর্বপ্রধান জিজ্ঞাসা।

বাঙলাদেশে তখন বিখ্যাত কেশব সেনের যুগ চলছে, বাঙালিযুবকচিত্তকে তিনি নিজ বাগ্মিতাশক্তিতে দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করেছেন। নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-আন্দোলনে যোগ দিলেন, এই সমাজের সদস্য হলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের নির্দেশাবলী অনুসরণ করেও নরেন্দ্রের আত্মিকপিপাসা পরিতৃপ্ত হল না। এ ধর্ম তো তাঁকে ঈশ্বরসান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দিল না, আজো তো তিনি ঈশ্বরকে কোথাও প্রত্যক্ষ করলেন না! সত্যসন্ধী নরেন্দ্র ঈশ্বর দর্শনের জন্যে সুতীব্র আকুলতা প্রকাশ করতে লাগলেন। হিন্দুধর্মে যখন তাঁর বিশ্বাস একরূপ টলেছে, হৃদয়ের কোণে উঁকি দিচ্ছে অবিশ্বাস, বয়ে চলেছে সংশয়ের ঝড়, তখন কোন্ এক দৈবী নির্দেশে বিধাতার অদৃশ্য অঙ্গুলি সংকেতে, একদিন তিনি হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন কলকাতার চার মাইল উত্তরে অবস্থিত দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে সেই পাগলা ঠাকুরের কাছে—যাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ।

পরমহংসদেব কলকাতার ছেলে নরেন্দ্রকে দেখলেন, দেখে অবাক হয়ে গেলেন। মহানগরীর চতুষ্পার্শ্বের মালিন্যের মধ্য থেকে আধ্যাত্ম-আলোয়-উদ্ভাসিত-মূর্তি এ ছেলেটি কোথা হতে উঠে এল! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপুরুষ, অন্তর্ভেদী তাঁর ভাবাবিষ্ট চোখের দৃষ্টি—দেখামাত্রই তিনি বুঝে নিলেন, নরেন্দ্রনাথ অসাধারণ শক্তির অধিকারী। ঠাকুরের অনুরোধে নরেন্দ্র একটি গান গাইলেন, শুনে মুহূর্তে পরমহংসদেব সমাধিস্থ হলেন। ভাবাবেশ কেটে গেলে ঈশ্বরজিজ্ঞাসু নরেন্দ্র সোজা ঠাকুরকে প্রশ্ন করে বসলেন—'আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' শান্তমুখে স্নিগ্ধ হাসির রেখা টেনে ঠাকুর

নরেন্দ্রনাথকে বললেন—'হ্যা, দেখেছি। তাঁকে সত্যই পাওয়া যায়, তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়—যেমন অমি তোমাদের দেখছি, কথা কইছি। কিন্তু কে তা চায়? কে তার সাধনা করে?' প্রশ্নের জবাব শুনে নরেন্দ্রের বিস্ময়ের অবধি রইল না। শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্র প্রথমে উন্মাদ বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু ক্ষণপরে তাঁর সেই ধারণা ভেঙে গেল।

মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নরেন্দ্র একদিন দীক্ষা নিলেন। ঠাকুর তাঁর এই প্রিয় শিষ্যের মধ্যে ভাগবতী শক্তিসঞ্চার করলেন। ঠাকুরের নিত্য-উপদেশ নিয়ে নরেন আধ্যাত্মিকতার পথে অতিক্রুত অগ্রসর হতে থাকলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের পূত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে নরেন্দ্রনাথ দিব্য আনন্দের স্বাদ পেলেন, তাঁর আধ্যাত্মিক পিপাসা চরিতার্থ হতে চলেছে। মানসিক অস্থৈর্য তিনি কাটিয়ে উঠেছেন, চিত্তে শান্তি ফিরে পেয়েছেন। এমন সময় তাঁর পারিবারিক জীবনে এক সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটে গেল। একদিন অকস্মাৎ তাঁর পিতা লোকান্তরিত হলেন। সংসারে দারুণ আর্থিক অভাব দেখা দিল। ইতঃপূর্বে নরেন্দ্রনাথ বি. এ. পাশ করে আইনক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। এখন তো নিরুদ্বেগে আইন পড়া আর চলবে না। বিত্তবানের পুত্র নরেন্দ্র ভাগ্যের পরিহাসে চরম দারিদ্র্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়লেন।

ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দিকে নরেনের চিত্তপ্রবণতা। সংসারের বন্ধন তাঁর যেন ভালো লাগে না, সকল পার্থিবতা থেকে তিনি চান আত্মার মুক্তি। অশান্ত মন নিয়ে তিনি ছুটে আসেন দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরকে সাংসারিক দারিদ্র্যের কথা খুলে বলেন। ঠাকুর তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে, মোটা ভাতকাপড়ের অভাব তার ভাই-বোনেদের হবে না।

একদা নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে নির্বিকল্প সমাধি চাইলেন, মহাচৈতন্যে নিজ চৈতন্যকে লীন করে দেবার অভিলাষী হলেন—নিজের মুক্তিই তাঁর একান্ত কাম্য। একথা শুনে ঠাকুর ভর্ৎসনার স্বরে বললেন—তার আকাঙ্ক্ষা যে এত ক্ষুদ্র হতে পারে তা তাঁর ধারণায়ও অতীত ছিল। সংসারপলাতক স্বার্থপরেরাই তো আপনার মুক্তি কামনা করে, নরেনের চাওয়া কেন এত ছোট হবে। ঈশ্বর কোথায়? মানবসংসারকে অতিক্রম করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? চারিদিকে এই যে দীন দুর্গত মানব-মানবী, তাদের মধ্যেই তো ঈশ্বর মূর্ত হয়ে উঠেছেন—'যত্র জীব তত্র শিব'—মানুষের সেবা করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে—মানবসেবাই মানুষের মুক্তির একমত পথ। ঠাকুরের বাক্য শুনে নরেন্দ্রনাথ এক নতুন অধ্যাত্মদৃষ্টি লাভ করলেন, মানব-প্রেমকে ধর্মসাধনার শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে জানলেন। পরমহংসদেবের অবিস্মরণীয় উপদেশে সন্ন্যাসী নরেন্দ্র মহাপ্রেমিকে রূপান্তরিত হলেন। এ যেন জন্মান্তর—জীবনের কূলে জেগে ওঠা।

১৮৮৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করলেন। নরেন গুরুভাইদের নিয়ে বরাহনগরে একটি সন্ন্যাসীসঙ্ঘ গড়ে তুলবার প্রয়াসী হলেন। তরুণ সন্ন্যাসীরা

তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিল। এই সময়ে তাঁরা দারুণ অভাবদারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন, তথাপি ঠাকুরের বাণীপ্রচারের মহৎ ব্রত থেকে বিচ্যুত হন নি। জনসেবা তাঁদের জীবনের আদর্শ হল।

নরেন্দ্রনাথ অন্তরে অন্তরে নির্লিপ্ত পুরুষ ছিলেন। কোনোপ্রকারের বন্ধন তিনি দীর্ঘকাল সহ্য করতে পারতেন না। এই বন্ধন অসহিষ্ণুতার জন্যে হঠাৎ একদিন দণ্ডকমণ্ডলুহাতে বরাহনগরের মঠ থেকে তিনি ভ্রমণে বের হলেন। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষ তিনি ঘুরে বেড়ালেন পায়ে হেঁটে। এই ভারত-পরিক্রমা তাঁর জীবনের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। সনাতন ভারতবর্ষকে তিনি চাক্ষুষ করলেন, যুগযুগান্তের ভারতভূমির অন্তঃপ্রকৃতি ও বাইরের রূপটির সর্বাঙ্গীণ-সম্পূর্ণ পরিচয় পেলেন—নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে ভারতজননীকে যেন তিনি স্পর্শ করলেন। নিজ মাতৃভূমির সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা তাঁর আহৃত হল।

ভারতপরিক্রমায় বেরিয়ে কী দেখলেন নরেন্দ্রনাথ? দেখলেন, ভাষায়-আচারে ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিভিন্ন হলেও ভারতবাসী মূলত এক, ভারতীয় সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য বন্ধনসূত্রে সকলে বাঁধা, সুতরাং অবিভাজ্য। যে-অভিজ্ঞতা তাঁর মর্মদেশে সবচেয়ে আঘাত হানল তা হল দেশের সংখ্যাতীত মানুষের বর্ণনাতীত অসহনীয় দারিদ্র্য। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে ধর্মবোধের অভাব নেই, কিন্তু তারা তথাকথিত শিক্ষিতসম্প্রদায়ের কাছ থেকে এতটুকু সহানুভূতি পায় না, মানবিক অধিকারে বঞ্চিত, শিক্ষার আলোকের অভাবে অজ্ঞতা ও মূঢ়তার মধ্যে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত! সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলির ভীষণ দারিদ্র্যের ছবি তাঁর হৃদশের গভীরে রক্তের অক্ষরে যেন লেখা হয়ে গেল। তখন নরেন্দ্রনাথের মনে পড়ল মহামানব পরমহংসদেবের সেই স্মরণীয় উক্তি—'খালি পেটে ধর্ম হয় না'। মানবপ্রেমিক নরেন্দ্রনাথ সংকল্প করলেন, ভারতের অগণন দুর্গত মানবমানবীর দুঃখ-মোচনের উপায় খুঁজে বার করবেন, জনসেবা হবে তাঁর প্রচারিত নতুন ধর্মের প্রধানতম অঙ্গ।

নরেন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, দেশের ধনীসমাজ কোটি কোটি মানুষের দারিদ্র্য-বিদূরণের জন্য অর্থসাহায্য করবেন না, দীন-দুঃখীর সঙ্গে তাঁহাদের সহমর্মিতার কোনো যোগ নেই। তাহলে উপায় কী? এসম্পর্কে তিনি মহীশূরের রাজারকাছে বললেন, 'আমি আমেরিকা যেতে চাই, আমেরিকাবাসীদের সাহায্যে ভারতের দারিদ্র্যমোচনের জন্যে।' ক্ষেত্রীর রাজা আমেরিকাযাত্রায় নরেন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করলেন, ক্ষেত্রীর রাজদরবারে তিনি বহুশ্রুত 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ করে সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

প্রধানত তাঁর মাদ্রাজের ভক্তশিষ্যদের সাহায্যে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গেলেন ১৮৯৩ ইংরেজি সালে। উদ্দেশ্য—আমেরিকার চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্ম-মহাসম্মেলনে [Parliament of Religions] যোগদান করে হিন্দুধর্ম ও বেদান্তকথিত অদ্বৈতবাদ প্রচার করা। পৃথিবীর মানুষের প্রতি অপার করুণায় বিগলিত

হয়ে মহামানব বুদ্ধ একদিন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পথে নেমেছিলেন ; বিবেকানন্দ ভারবর্ষের দুর্গত জনগণের দুঃখদূরীকরণমানসে বিত্তবান পশ্চিম মহাদেশে পা বাড়ালেন। আমেরিকার মাটিতে পা দিয়ে কী প্রকাণ্ড প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে ! কিন্তু সমস্ত বিরুদ্ধশক্তিকে তিনি পরাভূত করেছেন নিজের দুর্জয় সাহস ও সংকল্পের সহায়তায়, আর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বীর্যবন্ত চরিত্রধর্মগুণে। ভারতের প্রতিনিধি হয়ে, সমগ্র হিন্দুজাতির বক্তব্য তরুণ-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসীকে শোনালেন। তাঁর প্রথম সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার সার্বজনীনতা, উদারতা ও ঐকান্তিকতা সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে অভিভূত করল তাঁদের অন্তরলোকে বিবেকানন্দ অক্ষয় স্থান পেলেন।

চিকাগো-ধর্মসভার অধিবেশন যতদিন চলল বিবেকানন্দ বক্তৃতা করবার সুযোগ পেলেন। বারংবার সকলের সমক্ষে তিনি বেদান্তের মূল সত্যগুলি তুলে ধরলেন হিন্দু-ধর্মকে সর্বধর্মের জননী বলে ঘোষণা করলেন; সকলকে বোঝালেন, বেদান্তকথিত অদ্বৈততত্ত্বের ওপরই বিশ্বের সকল মানুষের গ্রহণীয় মহামানবধর্ম গড়ে তোলা কঠিন কিছু নয়। আমেরিকার ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজীর অসামান্য সাফল্য তাঁকে পৃথিবীজয়ী বীরের সম্মান এনেদিল—সহায়সম্বলহীন অজানা সন্ন্যাসী সেদিন সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

তারপর য়ুরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ডাক পড়ল স্বামীজির। আমেরিকা থেকে তিনি ইংলণ্ডে গেলেন; আরো নানা জায়গা থেকে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ এল। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁকে বহু বক্তৃতা দিতে হল, তখন তাঁর হাতে প্রচুর অর্থ আসতে লাগল। এভাবে আহৃত অর্থ দিয়ে স্বামীজী সেখানে রামকৃষ্ণ-মঠ গঠন করলেন। বেদান্তপ্রচার ও বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা অবিশ্রান্ত চলছে, তার সঙ্গে চলছে পুস্তকরচনা আর পুস্তক-প্রকাশন—রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি। পাশ্চাত্ত্যের দার্শনিকমণ্ডলী বিবেকানন্দের মনীষা ও বিদ্যাবত্তায় চমৎকৃত হলেন।

ইংলণ্ডে-আমেরিকায় অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিকে বিবেকানন্দ তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ-হিসেবে পেলেন। সেখানে অল্পকালের মধ্যেই বহু ভক্তশিষ্য জুটে গেল তাঁর। যে-সকল য়ুরোপীয় পুরুষ ও মহিলা বিবেকানন্দের বিরাট প্রতিভা ও তাঁর প্রচারিত ধর্মমতের ঔদার্য ও অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মিস্ মার্গারেট নোবেলের [ইনি জাতিতে আইরিশ] নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মহাবিদুষী নারীই পরবর্তীকালে স্বামীজীর কাছে দীক্ষা নিয়ে নিবেদিতা-নামে জগতে পরিচিতা হন।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল। ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে বিশ্রামের নিতান্ত প্রয়োজন। বিশ্রামকামনায় কিছুদিনের জন্যে তিনি য়ুরোপভ্রমণে বেরুলেন—সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশ দেখার সুযোগ মিলে গেল। কয়েকটি অঞ্চল ঘুরে স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করতে প্রস্তুত হলেন। এখন ভারতের চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসেছে, ভারতবর্ষে পৌঁছবার জন্যে তাঁর অধীরতা প্রবল আকার ধারণ করেছে।

১৮৯৭ সালে স্বামীজী কলম্বোয় পৌঁছলেন। সিংহলবাসীগণ য়ুরোপবিজয়ী বিবেকানন্দকে যে-অভ্যর্থনা জানাল তা প্রতাপান্বিত সম্রাটেরই যোগ্য। কলম্বো থেকে

এলেন মাদ্রাজে, এখানেও রাজকীয় সমারোহে অভ্যর্থিত হলেন তিনি—স্বামী বিবেকানন্দ যে ভারতের হৃদয়রাজ্যের সম্রাট। দেশবাসীর সম্মুখে উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি বাঙলাদেশের দিকে এগুলেন। ওই বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর জলন্ত দেশপ্রেম, জাতিবাৎসল্য, ভারতের দীনদুঃখীজনের প্রতি অগাধ মমতা।

বিবেকানন্দ যথাসময়ে কলকাতা এসে পৌঁছলেন [২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭], সমগ্র নগরীর নাগরিকবৃন্দ তাঁকে মানপত্র প্রদান করলেন—সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতা বলে তিনি অভিনন্দিত হলেন। সকলের কাছে তিনি উদাত্ত আহ্বানবাণী পাঠালেন জনসেবায় আত্মনিয়োগ করবার জন্যে। তাঁর গুরুভাইদের তিনি ব্যক্তিগত মুক্তির সাধনা ছেড়ে জনকল্যাণে আত্মোৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করলেন, বললেন—'ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, নগ্নকে বস্ত্র দাও, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও, দুর্বলকে দাও শক্তি। তোমরা সংসার ছেড়ে এসেছ জগৎসংসারের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে ব্যাপ্ত করে দিতে।' শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদলকে তিনি একত্র করে প্রতিষ্ঠা করলেন 'রামকৃষ্ণ মিশন'—মানবমানবীর কল্যাণবিধানই যার প্রধানতম লক্ষ্য। স্বামীজী দেশের বহুমুখী উন্নতিপ্রচেষ্টায় মন দিলেন। এইসময়ে বেলুড়গ্রামে মঠপ্রতিষ্ঠা বিবেকানন্দের বিরাট এক কীর্তি। বেলুড়মঠকে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের প্রাণকেন্দ্র বলা যেতে পারে।

বিবেকানন্দ স্বাস্থ্য হারিয়েছেন। চিকিৎসা চলছে। বিশ্রাম চাই অথচ সন্ন্যাসী-ভাইদের অনুরোধ না মেনে তিনি অজস্র দর্শনার্থীর সঙ্গে আলাপে মেতে থাকতেন। তাঁর শ্রীমুখের কথা শুনবার জন্যে কত লোক প্রতিদিন দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসছে। তাঁর দর্শন না পেয়ে তারা ফিরে যাবে এ হতেই পারে না। ফলে স্বামীজীর ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সকল পথ রুদ্ধ হল।

১৯১২ সালের ৪ঠা জুলাই। এই সেই দিন, যেদিন মহাপ্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ মর্তলোক ছেড়ে অমর্তলোকে মহাপ্রয়াণ করলেন। সেদিন প্রভাতে তিনি অনেকক্ষণ ধ্যানে কাটালেন। মায়ের স্তব করলেন। মধ্যাহ্নে শিষ্যদের নিয়ে অধ্যাপনায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত করলেন। সন্ধ্যায় একঘণ্টা ধ্যানে কাটল। ঘণ্টা দুই পর শয্যাগ্রহণ, হাতে জপমালাধারণ। তারপর গভীরভাবে একবার নিশ্বাস টানলেন। তারপর—সব শেষ—ধ্যানযোগে দেহরক্ষা। দেহাবসানকালে বিবেকানন্দ উনচল্লিশ বৎসর অতিক্রম করেন নি।

*

বিবেকানন্দকে পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র বলা যায়। ঠাকুরকে বাদ দিয়ে স্বামীজীর কথা ভাবাই যায় না। মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সর্বাধিক প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দকে নিজ অভিপ্রায়-মতো গড়েছিলেন। শিষ্যের মধ্যে তিনি আধুনিক ভারতবর্ষের প্রতিনিধিকে—জগতে মহামানবধর্মের উদ্গাতাকে—চাক্ষুস করেছিলেন। কে না জানে যে ঠাকুর দিব্যদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন? ঠাকুরের শক্তিতেই স্বামীজী

শক্তিমান। নিজ মহাগুরুর উপলব্ধ সত্যকেই স্বামীজী ভারতে ও বহির্বিশ্বে প্রচার করেছেন। বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীই ধ্বনিত হয়েছে।

বিবেকানন্দ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তের প্রবক্তা হলেও জ্ঞানকৈবল্য তাঁর অভিলষিত ছিল না। সমাজসংসারকে কদাপি তিনি মায়াপ্রপঞ্চ বলে ভাবেননি, জগৎ ও জীবন তাঁর চোখে কখনো মরীচিকাবৎ প্রতিভাত হয়নি। স্বামীজী যে-ধর্মটি প্রচার করেন তাকে মানবধর্ম বলা যেতে পারে। এর মূলকথা—জনসেবাই ব্রহ্মোপলব্ধির সর্বোত্তম পন্থা। বিবেকানন্দের মতে আর্ত মানবের, দীন-পতিতের সেবা দয়া নয়, এ ঈশ্বরের পূজার—ব্রহ্মস্পর্শের—নামান্তর মাত্র। মানবের মধ্যেই ব্রহ্মোপলব্ধি ছিল তাঁর আধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য। তাঁর ধর্মমতের মূলসূত্র এ কথাগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে—'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' এযুগের ধর্ম যে মানবমুখী তা প্রথম আমরা শুনলাম বিবেকানন্দের শ্রীমুখে।

বিবেকানন্দ মানবপ্রেমিক, বিবেকানন্দ স্বদেশপ্রেমিক—মানুষের প্রতি অনিঃশেষ ভালোবাসাই বিবেকানন্দকে স্বদেশসেবায় প্রাণিত করেছে—'Charity begins at home'; দেশপ্রীতি তাঁর কাছে ছিল রক্তের সংস্কার, প্রাণের অতৃপ্যক্ষুধা। এই দেশপ্রেমের বহ্নিশিখাকে আমৃত্যু তিনি নিজ হৃদয়দেশে অনির্বাণ রেখেছিলেন। স্বামীজীর দেশপ্রীতি বাঙলাদেশের চতুঃসীমায় আবদ্ধ ছিল না—সমগ্র ভারতবর্ষকে আলিঙ্গন জানিয়েছিল। দেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা কী নিবিড় ছিল তার পরিচয় প্রদীপ্ত অক্ষরে মুদ্রিত আছে 'স্বদেশমন্ত্র' রচনাটিতে।

বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী, কিন্তু সংসারপলাতক নন। পরমার্থিকতার সঙ্গে ঐহিকতার কোনো বিরোধ তিনি দেখতে পাননি, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে লোকশ্রেয়কে তিনি যুক্ত করে দিয়েছিলেন, মানুষকে ভালোবেসে ঈশ্বরের পূজা করেছিলেন। তিনি শুধু ভারতের জাতীয়তা গঠন করেন নি, বিশ্বের জাতীয়তাগঠনের দিকে তাঁর অতন্দ্র লক্ষ্য ছিল।

মহাসমন্বয়তত্ত্বের উদ্গাতা মানবমিত্র বিবেকানন্দ গোটা পৃথিবীর মানুষের নমস্য। আর, ভারতের বিশাল জনসঙ্ঘের উদ্বোধনের জন্যে যে অক্লান্ত প্রয়াস তিনি করেছেন, আর্ত মানুষের প্রতি যে-অনুকম্পা দেখিয়েছেন, তার একমাত্র উপমাস্থল প্রাচীন ভারতবর্ষের মহামানব বুদ্ধ—বিবেকানন্দের অপরিমেয় মানবপ্রেম তাঁকে গৌতমবুদ্ধের অতিভাস্বর মহিমার সমুচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে।

জীবনচরিতপাঠ

'জীবন লইয়া কী করিব? কী করিতে হয়?'

'ধর্মতত্ত্ব'-এর বঙ্কিম একদা এই জিজ্ঞাসা মনে তুলিয়াছিলেন। এ-প্রশ্ন তো আমাদের সকলেরই: কী করিব, কী করিতে হয়! আমরা দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি, সে কি এমনি? তার জন্য কি মূল্য দিতে হইবে না? রামপ্রসাদ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—'এমন মানবজমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা।' আমরাও কি জীবনকে সেই পতিত করিয়াই রাখিব? অথবা পরমপ্রযত্নে তাহাকে সার্থকতার শস্যে ভরিয়া তুলিবার সাধনা করিব?

প্রাণিজগতে মানুষের এই-তো গৌরব যে, সাধনা করিয়া নিজেকে সে গড়িয়া তোলে। বিধাতা তো জীবলোকের সর্বত্রই প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মনুষ্যেতর জীব কেবল বিধাতার সেই ঝরিয়াপড়া দানটুকুর উপর একান্ত নির্ভর করিয়া থাকে, মানুষ তাহাকে আত্মবলে প্রসারিত করিয়া লয়। 'বিধাতা আমাকে দুর্বল করিয়া সৃজন করিয়াছেন, আমি কী করিব' এই কথা যে বলে সে তো কাপুরুষ, অপমানব। এই দুর্ভাগ্যকে কি মানুষ স্ববলে অতিক্রম করিয়া যাইবে না? মানুষের কণ্ঠে তো আমরা এই প্রশ্নই নিরন্তর ধ্বনিতে শুনিতে চাই: 'জীবন লইয়া কী করিব, কী করিতে হয়!

তখনই আমরা উত্তরের একটা আদর্শ খুঁজি। কী করিব, কোন্ পথে যাইব, কে তাহা বলিয়া দিবে? নিজেদের যখন বড়ো দুর্বল আত্মহারা মনে হয়, কাহার মর্মস্পর্শী সাহায্য তখন প্রত্যাশা করিব?

বকের ছদ্মরূপে ধর্মও আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কঃ পন্থা? উত্তরে যুধিষ্ঠিরের মুখে জানিয়াছি, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।

বাঙালি-কবির এই অনুবাদছত্রগুলিতেও যেন ঐ উত্তরেরই প্রতিধ্বনি জাগিয়া আসে:

মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে ক'রে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্তিধ্বজা ধ'রে
আমরাও হব বরণীয়!

জীবনচরিতপাঠের প্রথম উপযোগিতা এইখানে। দেশে দেশে যুগে যুগে কত মহামানবের জন্ম হইয়াছে; গূঢ়তর ধ্যান, ব্যাপকতর কর্মোদ্দীপনা লইয়া কত-না ব্যক্তি মানবসভ্যতাকে স্তরে স্তরে শিখরশীর্ষে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের সেই ধ্যানের পরিমাণ, আদর্শের পরিমাণ আমরা কেমন করিয়া জানিব, যদি-না জীবনীগ্রন্থ

করি? যিশুখ্রীস্ট ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন, জোয়ান অব আর্ক জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছিলেন অবিশ্বাসীর আগুনে, গৃহ ছাড়িয়া অনিশ্চিতের অন্ধকারে সরিয়া গিয়াছিলেন সুভাষচন্দ্র —এইসব ছিন্ন টুকরা কাহিনী জানবার জন্যই যে জীবনী পড়ি, এমন নয়। এসব কথা তো লোকপুরাণে পর্যবসিত হইয়া যায়, আকাশবাতাস হইতে এসব কথা কখন যে আমরা অন্তঃস্থ করিয়া লই তা মনেও করিতে পারি না। কিন্তু এসব তো তাঁদের জীবনের একটা পরিণাম বা স্বর্ণসূত্র, এটুকু জানিয়া লইলেই কি যথেষ্ট হইল? কঃ পন্থা? কোন্ পথ দিয়া চলিয়া অবশেষে তাঁহারা পরিণামের ঐ মহিমায় পৌঁছিয়াছেন? বস্তুত, ঐ পথটিকেই আমাদের প্রয়োজন, পরিণামে নহে।

পরিণামে নহে কেন? কেননা, একথা সত্য যে, সকলেই আমরা কিছু জোয়ান অব আর্ক বা সুভাষচন্দ্র, রুশো বা রামমোহন হইব না। কে কতদূর পর্যন্ত কী হইতে পারিবে তাহার তো কোনো স্থিরতা নাই, তা ভাবিয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকাও কোনো কাজের কথা নয়। আমরা কেবল জীবনের সত্য চলার-পথটি চিনিয়া লইতে চাই। কোন্‌টা মনুষ্যত্ব আর কোন্‌টা তা নয়, কোন্‌টা গ্রহণ করিব আর কোন্‌টাকে-বা ছাড়িয়া দিতে হইবে এইটুকু স্থির করিয়া লওয়াই প্রয়োজন। তারপরে সকল শক্তি একাগ্র করিয়া সেই পথে চলিতে হইবে, মহাজীবন আমাদের সেই পথটুকুর ইঙ্গিত দিয়া দেয় মাত্র।

জীবনের এই দীর্ঘ চলার পথ যেন গান্ধীজির একটি মূর্তির মধ্যে প্রতীক-প্রতিভাত হইয়া আছে। করধৃত দীর্ঘদণ্ড লইয়া দৃঢ়প্রত্যয়ে চলিয়াছেন শীর্ণ বৃদ্ধ, মর্মন্তু অবয়বে অমোঘ সাহসিকতার মুদ্রা, আর, চতুর্ধারে সমস্তই শূন্য! কবির সংগীত যেন জীবন্ত হইয়া উঠে ঐ মূর্তির মধ্যে, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।'—

চলার পথের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এই একাকিত্বের কথাও ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া আছে। এই এক আশ্চর্য সংযোগ দেখিতে পাই সকল মহাপুরুষের জীবনবেদনায়, তাঁহারা বড়ো একাকী। বৃহৎ আদর্শ তো বৃহৎ শক্তির অপেক্ষা করে, বিধাতার পতাকা বহন করিবার ভার যাঁহার তাঁহার তো শক্তিও হওয়া চাই অপার,—সকলের মধ্যে তাহা প্রত্যাশা করিব কেমন করিয়া? তাই, সকলের নিকট হইতে তাঁহারা যেন অনেক দূরবর্তী, আমরা তাঁহাদের বুঝিতে পারি না, সন্দেহ করি।

কেবল কি বুঝিতে পারি না? কেবল কি সন্দেহ করি? তাঁহাকে আমরা ক্রুশে বিদ্ধ করি, জীবন্তদগ্ধ করি, পাথর ছুঁড়িয়া, নিন্দা ছুঁড়িয়া, অপমান করিবার জন্য খেপিয়া উঠি। যাঁহাকে আমি আমার সমান করিয়া পাই না তাঁহাকে আমি আমারই মতো করিয়া ছাঁটিয়া লইতে চাই—মানবচরিত্রের এ এক আশ্চর্য দুর্বলতা।

কিন্তু কী আশ্চর্য, যাঁহাদের জীবনী এই আমি পাঠ করিতেছি, ওই নিন্দা বা নির্যাতনে তাঁহারা তো কই বিচলিত হন না। বিদ্যাসাগরের সেই গল্পটি কি আমাদের মনে পড়ে না? একজন তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছেন শুনিয়া বিদ্যাসাগর সকৌতুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কেন, আমি তো তাহার কোনো উপকার

করি নাই? হয়তো কেবলই কৌতুক নয়, একটু অভিমানও হয়তো এই উক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু আমরা বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করি যে, এইসব নিন্দার প্রতিঘাতের পরেও তাঁহার উপচিকীর্ষা মুহূর্তের জন্য সরিয়া যায় না। কেমন গভীর বিনতিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ঈশ্বরকে জানাইতে পারেন :

নিন্দা পরব ভূষণ ক'রে কাঁটার কণ্ঠহার,
মাথায় ক'রে তুলে লব আপমানের ভার।

ইহার কি কোন শিক্ষা নাই? জীবনের ছোটোবড়ো সকল পথে চলিতে চলিতে কত সময়ে আমরা আশাহীন নিরানন্দের মধ্যে ডুবিয়া যাই। ছলনা, বঞ্চনা, অকৃতজ্ঞতার কাঁটা চলার পথে পায়ে পায়ে বিঁধিতে থাকে। ও-লোকটা হাতে-হাতে ফল পাইল, আমি কেন পাইলাম না—এই বিষে আমার মন জ্বলিতে থাকে।

কিন্তু তখন কি আমি ভাবিতে পারিব না যে, আমার প্রত্যাশা বড়ো বলিয়াই আমার সফলতা বিলম্বিত? আমি মনে করিব না যে, যা দিয়া ও' অমাকে বঞ্চনা করিল ভাবিতেছে তা আমার বিষয়ই নয়? এই প্রত্যয় কি আমাকে দৃঢ় করিয়া রাখিতে হইবে না যে, কিছু নয়, কিছু নয়, সকল সাময়িক মোহতাপকে দূরে সরাইয়া রাখিতে আমি একাগ্রচিত্তে কাজ করিয়া যাইতে পারিব?

মনের এই অমিত শক্তি সংগ্রহ করিব কোথা হইতে? মহাপুরুষের জীবনচরিতপাঠ অহরহ আমাদের এই শক্তি উপহার আনিয়া দেয়।

তাই বলিয়া আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত হইবে না যে, জীবনীগ্রন্থের চেয়ে জীবনগ্রন্থ মহত্তর। তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ—এই প্রত্যয় যেন জীবনী-পাঠকালে শিথিল না হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে বলিয়াছিলেন, 'মহাপুরুষের জীবনী বড়ো জিনিসকে ছোট করিয়া দেখাইবার একটা উপায় মাত্র', সে-কথা যথার্থ। একটা অভিপ্রায় লইয়া, উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহাদের জীবনের চতুর্দিকে আমরা একটা গণ্ডি টানিয়া লই, সেই গণ্ডিরমধ্যে জীবন হইতে নির্বাচিত খানিকটা ছিন্ন অংশ পূর্ণ করিয়া দেই। ইহাতে লেখকের বা পাঠকের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু জীবনের সমগ্রতাকে পাইলাম কি? রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' গল্পের সেই আপশোস মনে পড়িয়া যায়। সৌন্দর্যে-লালিত্যে পরিপূর্ণ একটি মানবদেহ দূরে সরিয়া গেছে, এখন তার কঙ্কালটিকে লইয়া শরীরবিজ্ঞানী তত্ত্ব শিক্ষা করে। মহাপুরুষের জীবনও কি কেবলই তত্ত্বশিক্ষা করিবার? সে তো কেবল তাঁহার 'জীবনী' নহে, হাসিকান্না-আনন্দবেদনায় পরিপূর্ণ সে এক মহাজীবন—তাহাকে এক নিমেষে বুঝিয়া ফেলিবার স্পর্ধা যেন প্রকাশ না করি।

আধুনিক জীবনীকারেরা এই সমস্যা হয়তো বুঝিতে পারেন। কবিতাগল্পের তুলনায় জীবনীসাহিত্য অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা, কিন্তু সেই ইতিহাসেও কত বিবর্তন হইয়া গেল। জীবনের কয়েকটা কীর্তির তালিকা, মহিমার গুণগান, আদর্শের উচ্ছ্বাস—জীবনীসাহিত্যের এই ছিল প্রাথমিক চরিত্র। তাহাতে উপকার ছিল; কিন্তু

এ-কথা মানিতে হইবে যে, তাহাতে মানবচরিত্রের পূর্ণাঙ্গতা ছিল না। ক্রমে এই দৃষ্টির পরিবর্তন হইল, বস্‌ওয়েলকে সরাইয়া দিয়া আসিল লিটন স্ট্রেচির যুগ। মহিমা-প্রচারের জন্য নয়, 'এমিনেণ্ট ভিক্টোরিয়ান্‌স্' বা 'কুইন্ ভিক্টোরিয়া' রচিত হইল কেবল মানবিক সমগ্রতা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে।

এই সামগ্রিক চিত্র কি আমাদের আহত করিবে? যে-মহিমার অনুসরণ জীবনী-পাঠের অন্যতম ফলশ্রুতি, আধুনিক জীবনী কি তাহাকে ব্যাহত করে? আমাদের তো তা মনে হয় না। বরং আমাদের বিশ্বাস আরো বাড়িয়া যায়। যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনীগ্রন্থ পাঠ করি, যখন গান্ধীজির জীবনচরিত জানি, তখন আমরা দেখি যে তাঁহাদের জীবন তো প্রথম মুহূর্ত হইতেই মহর্ষি বা মহাত্মা পদবী লাভ করে নাই। আমরা তখন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, তাহাদের জীবনও তো পতনবন্ধুরতাময়। তবে আত্মধিক্কারে আমরাই-বা বসিয়া থাকিব কেন? আমাদের এই দোষত্রুটি-দুর্বলতাগুলি এমনই কী অনপনেয়! মহর্ষি বা মহাত্মা হই বা না-হই, আমাদের অভ্যাসের জড়তাগুলিকে জীবনসফলতার পথে অলঙ্ঘ্য বাধা মনে করিয়া বসিয়া থাকিব কেন?

আত্মগঠন করিবার, মানুষকে তাহার পরিবেশের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবার, মানবজীবনের মহিমা সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিবার কোনো আকাঙ্ক্ষা যদি মনে জাগে, জীবনচরিতপাঠই তবে তাহার সর্বোত্তম উপায়। জীবনচরিত পাঠে আমরা যেন নূতন করিয়া জাগিয়া উঠি। 'জাগিয়া উঠিয়া আমরা কী দেখি? আমরা মানুষকে দেখিতে পাই। আমরা নিজের সত্যমূর্তি সম্মুখে দেখি।'

আমার শখ

'আর সবচেয়ে মুশকিল কি জানো, ছেলেটার কোনো শখ পর্যন্ত নাই'—মা তাঁহার সখীর কাছে বসিয়া দুঃখ করিতেছিলেন; কথা হইতেছিল আমারই সম্পর্কে।

আমার বিষয়ে মা-র ভারি দুর্ভাবনা। আমি কেন অন্য কাহারো মতো নই, আমি কেন ঘরকুনো, আমার নাকি আমোদপ্রমোদ, হাসিআহ্লাদ কিছুই নাই, এইসব তাঁহার দুশ্চিন্তা। আমার যে বিশেষ বন্ধু নাই সে-কথা সত্য। কিন্তু মা যে কেন বোঝেন না, বন্ধু করিবার মতো ছেলে যে বড় অল্পই আছে।

কাহার সঙ্গে বন্ধুতা করিব? ক্লাশের ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে? উহাদের রুচির সঙ্গে যে কিছুই আমার মিল নাই, কেমন করিয়া বন্ধুতা হইবে? ঘরে যেমন মা আমাকে বলেন সৃষ্টিছাড়া, বাহিরেও তেমনি বন্ধুরা আমার দিকে কেবল ঠাট্টা ছুঁড়িয়া মারে, বলে, 'রামগড়ুরের ছানা—হাসতে তাদের মানা'—শুনিয়া আমার রাগও হয়, হাসিও পায়, কিন্তু রাগিতে বা হাসিতে তখন আমার লজ্জাবোধ হয়।

তা সত্যি কথা, আমি ওদের সকলের মতো নই। কিন্তু তাই বলিয়া আমার শখ বলিয়াও কিছু নাই? মা, এ-কথা কেমন করিয়া বলিলেন? অবশ্য আমি কোনোদিন তাঁহাকে সে-কথা তো বলি নাই, কেমন করিয়া-বা জানিবেন তিনি! বলিব কেন? বলিলে কি লোকে বুঝবে? আমার তো ভারি লজ্জার সঙ্গে ক্লাসের সেদিনের কথা মনে পড়ে। মাস্টারমশাই ক্লাসে সেদিন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, বল্ দেখি, তোদের কার কী শখ—ইংরেজিতে যাকে বলে 'হবি'?

ছেলেরা এক-এক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। শখ জানাইবার সে এক ভারি ধুম পড়ে গেল। কেহ বলিল, ছুটির দিনে আমি মাছ ধরি, স্যার—বলিয়া মাছেদের রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত শুনাইবার উপক্রম করিতেই মাস্টারমশাই তাকে থামাইয়া দিলেন। কেহ বলিল, ঘুড়ি ওড়ানোর শখ; কেহ বলিল, ডিটেকটিভ গল্পের বই পড়ার চেয়ে তৃপ্তি কিছুতে নাই। কেহ খুব গম্ভীর মুখ করিয়া জানাইল, আমি দেশ-বিদেশের টিকিট জমাই।

এমনি করিয়া ছবি আঁকা হইতে শুরু করিয়া বাবা-মা'র সঙ্গে দেশ দেখিয়া ঘুরিয়া-বেড়ানো পর্যন্ত অনেক শখের গল্প যখন শেষ হইল, মাস্টারমশাই আমার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন, বজ্রনিনাদে হাঁকিলেন—অমিত, তুই?

আমি নিম্নকণ্ঠে বলিলাম, আমি গাছ দেখি।

'গাছ দেখিস্?' কেবল মাস্টারমশাই কেন, ক্লাস-সুদ্ধ ছেলে ক্ষণেকের জন্য থমকাইয়া গেল। যেন হঠাৎ এমন একটা কথা শোনা গেল যাহার বিন্দুবিসর্গ পর্যন্ত কাহারো জানা নাই। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। তারপরই সামলাইয়া লইয়া যখন মাস্টারমশাই বলিলেন, 'গাছ তো সকলেই দেখে, চোখ কি তোর একার আছে?' তখন ক্লাসময় একটি হাসির হট্টগোল পড়িয়া গেল।

চোখ কি সবারই আছে? তবে কেন মেজকাকা সেদিন আমার পিঠে চাপড়াইয়া বলিলেন, তোর চোখ আছে অমি, তুই দেখতে শিখবি। অবন ঠাকুরের নাম শুনেছিস? অবন ঠাকুর ছবি লেখেন, সেই অবন ঠাকুরের? তিনি বলেন যে, বেশির ভাগ লোকেরই তো চোখ নেই, তারা কি দেখতে পায় কিছু? তুই দেখতে পাবি?

তাই, আমি আর কাহাকেও কিছু বলি না। আমি বেশ বুঝিয়াছি, টিকিট জমানো 'হবি', মাছ ধরাও হবি'; আরো এইরকম অনেক-কিছু 'হবি' আছে ভু ভারতে— কিন্তু গাছ দেখা কখনো সভ্যসমাজের 'হবি' হইতে পারে না। মাস্টারমশাইকেও আমি বুঝাইতে পারি নাই, মাকেই যে পারিব এমনই-বা ভরসা কী!

তোমরা কি ভাবিতেছ আমি উদ্ভিদতত্ত্ব বিশারদ হইয়াছি? তা কিন্তু মোটেই নয়। চোখে অণুবীক্ষণ-যন্ত্র লাগাইয়া শিকড়ের বা পাতার জীবনেতিহাস আমি খুঁজিয়া বেড়াই না। ওটা আমার পছন্দ হয় না, এ যেন সাজঘরের ভিতরে গিয়া অভিনেতাদের তদন্ত করা। অভিনয়ের কথাটা বলিয়া ভালোই করিলাম। আসলে গাছের দিকে তাকাইয়া আমি তো গাছকেই ঠিক দেখি না; মস্ত এক রঙ্গমঞ্চে বৃক্ষ-সমাজের যে অ

এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন। ইংরেজির মাস্টারমশাই সেই যে সেক্সপীয়রের কথা বলিয়াছেন, বিশ্বরঙ্গমঞ্চে মানুষ কেবল অভিনেতার মতো আসে যায়,—গাছের দিকে তাকাইয়াও সেই মঞ্চটি যেন আমি পরিষ্কার দেখিতে পাই।

সেইজন্য, অনেক সময়েই আমার দেখিতে ভালো লাগে নিষ্পত্র বৃক্ষমালা। কেন জানো? তাহাদের ভারি একটা চরিত্র আছে। পাতা নাই, শুধু শক্ত সমর্থ শুষ্ক শাখাগুলি যেন শূন্যের মধ্যে এধারে-ওধারে ছুটিয়া যাইতেছে; কোনোটা-বা হাতের মতো, কোথাও-বা পাঁচ আঙুলের ছড়া, কোথাও সমস্ত দেহটাই মস্ত একটা ঢেউ তুলিয়া উঠিয়া গেছে, কোথায় যেন মনে হয় নৃত্যের ভঙ্গিতে সে যেন নত হইয়া আছে। মাত্র দু'এক সময়ে সেই ধারালো শুষ্কতার আকৃতি দেখিয়া রাগী ত্রিশূলের কথা মনে পড়ে, নয়তো অন্তত একটা এলোমেলো জটার মতন মনে হয়। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ে গাছগুলি যেন নরনারীর মূর্তি ধরিয়া ভাস্কর্যশিল্পের মতো দাঁড়াইয়া থাকে। এইসব দেখি, তাহাদের সহিত মনে মনে কথা বলি, এই তো আমার সবচেয়ে বড়ো শখ।

কখনো কখনো একই ছবির আবার রঙ্ বদলাইয়া যায়। অনেকদিন ধরিয়া একটা শুকনো গাছ আমাদের স্কুলবাড়ীর দেওয়ালের পাশে দাঁড়াইয়া আছে, দেখিয়াছ? সেদিন স্কুলে যাইবার সময়ে দেখি, দেওয়ালে তাহার দীর্ঘ শীর্ণ ডালের একটা অদ্ভুত ছায়া পড়িয়াছে। ছায়াটা জোরালো নয়, কিন্তু দেখিয়া মনে হইল কোনো ক্লান্ত দীর্ঘ বাহু মিনতি করিয়া কিছু চাহিতেছে। দুদিন পরে এক পূর্ণিমা রাতে ঐ পথে যখন ঘুরিতেছিলাম, সেই ছায়াটা দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। এ তো সেই হাতটা! এখনো তো সে চাহিতেছে বটে, কিন্তু চারিদিকের আবছায়ার মধ্যে ঐ নির্জন হাতটা দেখিয়া মনে হইল সেই মিনতির ভাবটা আর তাহার মধ্যে নাই। এখন যেন ভীষণ-বলে ছুটিয়া আসিয়া সে দাও-দাও বলিয়া শেষ আর্তনাদ করিয়া লইতেছে। গাছের ডালটা দীর্ঘ বাহুর আকৃতি পাইয়াছে তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই, কিন্তু তাহার প্রান্তদেশ এমন করতলের মতো অঙ্গুলিময় হইয়া উঠিল কেমন করিয়া! সে ভারি বিস্ময়!

গাড়ীতে চড়িয়া যখন দেশে যাই, কাছের গাছগুলি 'আয় আয় হায় হায়' করিতে করিতে নিমেষে পিছাইয়া পড়ে, স্বজনকে ধরিয়া রাখিবার জন্য তাহাদের শেষ আকুলি-বিকুলি ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু তখন কি তুমি অনেক দূরের প্রান্তর-মধ্যে উদাসীন ভঙ্গিতে বসিয়া-থাকা কয়েকজন বৃক্ষমাতাকে দেখিয়াছ? তাঁহাদের অনেকে বয়স হইয়াছে, তাঁহারা অনেক বুঝিতে পারেন, কিছুতে তাঁহাদের তাড়া নাই, তাঁহারা জানেন যে আমি আবার ফিরিয়া আসিব।

শীত পড়ি-পড়ি করিতে থাকে, গাছগুলি তাহাদের পুরানো পাতাগুলি সব ঝরাইয়া দেয়। হী হী বাতাস যেন সব জায়গায় খবরদারি করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সব ফেলিয়া দিয়াছ তো, পুরানো সঞ্চয়-সব বাহির করিয়া দিয়াছ তো? নতুন-সব সাজপোশাক পরিতে হইবে, কিন্তু তার আগে কিছুদিন যেন উহারা প্রাণ ভরিয়া

নিশ্বাস টানিয়া লইতেছে। তারপর একটু একটু করিয়া টলমলে সবুজ অল্প অল্প উঁকি দিতে থাকে চতুর্দিকে। তোমরা শুনিলে হাসিবে, আমার তখন সর্পিনীর কথা মনে পড়িয়া যায়। পুরোনো খোলস ছাড়িয়া রাখিয়া তার লাবণ্যময় ঝিলমিলে দেহখানি লইয়া সর্পিনী যেমন সগৌরবে বাহির হইয়া আসে, বসন্তদিনে ডালগুলির শিরায় শিরায় তেমনি লাবণ্য যেন সঞ্চারিত হইয়া যায়। এইসব দেখি, আর, তাহাদের সহিত মনে মনে কথা বলি, এই তো আমার সবচেয়ে বড়ো শখ।

বাঙলার মাস্টারমশাই সেদিন ক্লাসে একটি আধুনিক কবিতা পড়িয়াছিলেন, সেটি তো সেইজন্যই আমার মনে গাঁথা হইয়া আছে। তবে তো আমি একাই নই, এমন করিয়া গাছকে তো আরো কেহ কেহ দেখেন। অন্তত এই কবি যদি না দেখিতেন তবে তিনি কেমন করিয়া বলিতেন :

এক যে ছিল গাছ
সন্ধে হলেই দুহাত তুলে জুড়ত ভূতের নাচ।
আবার হঠাৎ কখন
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে মেঘ উঠত যখন
ভালুক হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে করত সে গরগর,
বৃষ্টি হলেই আসত আবার কম্প দিয়ে জ্বর।
আবার যখন চাঁদ উঠত হেসে
কোথায়-বা সে ভালুক গেল, কোথায়-বা সেই গাছ,
মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ।
ভোরবেলাকার আবছায়াতে কাণ্ড হতো কী যে
ভেবে পাইনে নিজে
সকাল হোল যেই
একটিও মাছ নেই,
কেবল দেখি পড়ে আছে ঝিকিরমিকির আলোর
রূপালি এক ঝালর।

ইস্কুল থেকে একদিন সেইরকম ঝিকিরমিকির আলোয় বাড়ী ফিরিয়াছি, আজ ভাবিয়াছি মাকে বলিবই, 'জানো, গাছেদের কত কাণ্ড।' কিন্তু ফিরিয়া দেখি মা বারান্দায় বসিয়া আছেন, খুব সুন্দর অপরাহ্ণবেলায় তাহাকে দেখাইতেছে অনেকটা অস্তআলোর ডালিম-গাছের মতো ; আর তাহার সইকে তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেছেন : 'সবচেয়ে মুশকিল কী জানো, ছেলেটার কোন শখ পর্যন্ত নাই'।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ও বিজ্ঞান

প্রকৃতির-দেওয়া এই যে অবারিত আলোবাতাস চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে রয়েছে তার প্রাণদ স্পর্শ সম্পর্কে আমরা যেমন কদাপি তেমন সচেতন নই, তেমনি, একালের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা বিজ্ঞানের সংখ্যাতীত আবিষ্ক্রিয়ার ওপর কতখানি নির্ভরশীলতার বিষয়েও এতটুকু সচেতন আমরা নাই। কিন্তু দুমুহূর্ত বসে ভাবলেই বুঝতে পারি, বিজ্ঞানকে বাদ দিলে আধুনিক সভ্যতা বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে, নিমেষে স্তব্ধীভূত হয়ে যায় কোটি কোটি মানবসন্তানের সচল পদক্ষেপ। বিজ্ঞানের বিচিত্র দানের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞান সাম্প্রতিককালের মানুষের জীবনকে গতিশীল করেছে, মানবমানবীর কর্মক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়েছে, কায়িক শ্রম কমিয়ে অবকাশের পরিধি বিস্তৃত করে দিয়েছে। আমাদের অতীত দিনের পূর্বপুরুষেরা কত-না বিরোধী-শক্তির কাছে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। ওইসব প্রতিকূল শক্তিকে আজকের দিনে অমরা পরাভূত করেছি। অধুনা আমাদের জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, আজ আমরা অনেকটা শঙ্কামুক্ত। একালে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যেমন অভাবনীয় তেমনি বিস্ময়কর। বর্তমান পৃথিবীতে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ হল অশেষ উদ্ভাবনীশক্তির আধার বিজ্ঞান।

এই সৃষ্টিক্রিয়াশীল বিজ্ঞানের দানের পরিমাপ হয় না। যে প্রভূত সুখ-সুবিধা বিজ্ঞান আজ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে, দু-তিনশ বছর আগেকার দিনের মানুষের তা কল্পনারও অতীত। দেশদেশান্তরে—দূরদূরান্তরে—যাওয়া-আসার পথে কী প্রকাণ্ড বাধারই-না সম্মুখীন হতে হয়েছে তাদের। তখন পথঘাট ছিল দুর্গম আর বিপদসংকুল, কোনো পরিবহণব্যবস্থা একরূপ ছিল না বললেই হয়। যে পথ অতিক্রম করতে তাদের লেগেছে চার-ছ মাস, সেই দূরত্ব আজ আমরা অতিক্রম করছি দু-চার দিনে, এমন কি, তিন-চার ঘণ্টায়—রেল-স্টীমারে-ব্যোমযানে। দূরের পৃথিবী এখন কত কাছে এসেছে আমাদের, শুধু ঘরের বাইরে পা বাড়ালেই হল। যাদের মোটর গাড়ী রয়েছে তারা অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে যাচ্ছে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে। তা ছাড়া, অবিরত বাস চলছে, ট্রাম চলছে—ফলে স্বল্পবিত্তের মানুষ খুব অল্পভাড়ায় স্থান থেকে স্থানান্তরে যাতায়াত করছে, কারুরই কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। কেবল পায়ের ওপর নির্ভর করে থাকার দিন এখন চলে গেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। বলা যেতে পারে, বিজ্ঞান পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘনের শক্তি জুগিয়েছে।

বিজ্ঞানের অসংখ্য আবিষ্ক্রিয়াকে আজ আমরা কত বিচিত্র কাজে লাগিয়েছি। রাতের বেলা ঘরের অন্ধকার দূর করবার জন্যে আগে আমরা জ্বালতাম কেরো-

দিনের বাতি। কত অসুবিধেই-না তখন ভোগ করতে হয়েছে। এখন তার স্থান অধিকার করেছে বৈদ্যুতিক আলো। (সুইচ্ টিপে দিলেই ঘর প্রখর রশ্মিমালায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।) রান্না করবার জন্যে বর্তমানে কয়লার উনোন না-জ্বালালে চলে, এবং এতে ধোঁয়ার বিরক্তিকর আক্রমণ থেকেও বাঁচা গেছে। গ্যাস-স্টোভ, ইলেট্রিক হীটার, নানারকমের কুকার, ইত্যাদি আবিষ্কৃত হওয়াতে ঘরের মেয়েদের রান্নাবান্নার কাজটি যেমন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে তেমনি সময়ও বেশ কিছুটা বেঁচে যাচ্ছে। (যান্ত্রিকপদ্ধতিতে প্রত্যহ আরো কত কাজ আমরা সমাধা করছি। যন্ত্রে কাপড় কাচার কাজ চলে, ভ্যাকুয়াম পাম্পের সাহায্যে ঘর ঝাঁট দেওয়া হয়।) মাছ, মাংস, বিবিধ ফল ইত্যাদি সামগ্রীকে পচনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে রেফ্রিজারেটরের সৃষ্টি।

(বাইরে বাতাস বয় না, ঘরে গ্রীষ্মের দিনে অসহ্য গরম। তাই বলে ভাবনা কী? ইলেট্রিক পাখা চালিয়ে দিলাম, পাখার ব্লেডগুলি বন্‌বন্ করে ঘুরতে লাগল, গুমোট্ কেটে গেল, শরীর ঠাণ্ডা হল।) প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের ওপর কে এখন তেমন নির্ভর করে? বর্তমানে ঠাণ্ডা ঘরকে গরম রাখতে আর গরম ঘরকে ঠাণ্ডা রাখতে বিশেষ কোনো অসুবিধে নেই। কিছু পয়সা খরচ করে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ব্যবস্থা করলেই হল। (পাঁচ-সাততলা দালানে তুমি উঠতে চাও, সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভাঙবার তোমার প্রয়োজনই হবে না, লিফ্‌টখানিতে উঠে দাঁড়ালেই মুহূর্তে গিয়ে পৌঁছবে যথাস্থানে। চাই কি,(ঘরে বসেই তুমি দূরের বন্ধুর সঙ্গে আলাপ জমাতে পার যদি হাতের কাছে থাকে টেলিফোন-যন্ত্র। পরিশ্রান্ত হয়েছ কিংবা মেজাজ ভালো নেই, কিছুক্ষণ তোমার আমোদের প্রয়োজন। খুলে দাও রেডিওর চাবি, চালাও গ্রামোফোন—সংগীতের ঝংকারে সকল শ্রান্তিক্লান্তি কেটে যাবে, মন খুশিতে ভরে উঠবে।) (পথ চলতে চলতে, হঠাৎ ইচ্ছে হলে,\ট্রাম-বাস থেকে নেমে পড়ে, সিনেমাহলেও ঢুকে পড়তে পার তুমি, দুঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা সময় কোন্ দিকে যে কেটে যাবে তা বোঝাই যাবে না। বিজ্ঞান শুধু আমাদের প্রয়োজনসাধন করে না, এর আনন্দবিধানের ক্ষমতাটিও অবশ্যস্বীকার্য।)

(বিবিধ রকমের এত যে সামগ্রী প্রতিদিন আমরা ব্যবহার করছি তার বেশির ভাগই তৈরী হচ্ছে কলে।) এসকল বস্তুর নামোল্লেখ করতে গেলে নামের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতম হয়ে পড়বে। (আমাদের জামাকাপড়, নানান্ আহার্য-পানীয় নিত্যপ্রয়োজনী আরো বিস্তর সামগ্রী যন্ত্রেই উৎপাদিত।) আপিসে কত দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে হয়। এই দ্রুততার প্রয়োজনেই টাইপরাইটারের সৃষ্টি, খুব অল্পসময়ে বড়ো বড়ো অঙ্ক কষার জন্যে নানান্ যন্ত্র উদ্ভাবিত। বিজ্ঞান এখন কী না করছে! (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এখন আমরা কৃষির হরেক রকম কাজ চালাচ্ছি, পশুপ্রজননেও নিচ্ছি বিজ্ঞানের সাহায্য।)

(দুরন্ত ব্যাধির আক্রমণে আমাদের জীবনে যখন সংকটাপন্ন হয় তখন ডাক্তারখানায় না-গিয়ে, ডাক্তারকে না-ডেকে, পারি না।) রসায়নবিজ্ঞান, জীবাণুবিজ্ঞান

অস্ত্রচিকিৎসা আজ এতখানি উন্নত হয়েছে যে, এরা মারাত্মক-সব রোগের কবল থেকে বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করতে আজ সমর্থ। যক্ষা, টাইফয়েডের মতো সাংঘাতিক ব্যাধিকে এখন আমরা প্রতিহত করেছি। অল্পকতিপয় বৎসরের মধ্যে কয়েকটি আশ্চর্য ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে যেমন—স্ট্রেপ্টোমাইসিন, পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসেটিন ইত্যাদি। মানুষকে রোগমুক্ত করবার বিস্ময়কর ক্ষমতা রয়েছে এগুলির। আমাদের দেহাভ্যন্তরে কত মারাত্মক অদৃশ্য শত্রু রয়েছে, অণুবীক্ষণযন্ত্রে এদের গোপন অবস্থিতি সহজেই ধরা পড়েছে। এক্স-রে যন্ত্রের সাহায্যে কত ব্যাধি নির্ণীত হচ্ছে; রেডিয়াম-রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি, কতরকমের জীবাণুকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। পূর্বের চেয়ে আজ আমরা অনেক বেশী নিরাপদ বিজ্ঞানবলে আমাদের আয়ুর পরিধি নিশ্চিত বেড়ে গেছে।

কিছুদিন আগে খবরের কাগজে একটি সংবাদ বেরিয়েছিল। নোবেল-পুরস্কার-বিজয়ী এক রুশবিজ্ঞানী ভয়াবহ বিমানদুর্ঘটনায় পড়েছিলেন। এতে তাঁর বুকের অধিকাংশ পাঁজর একেবারে গুঁড়িয়ে যায়, তাঁর মাথার একটি অংশ দারুণভাবে জখম হয়। এতখানি আহত হয়ে কোন মানুষ যে বাঁচতে পারে তা ধারণা করা যায় না। কিন্তু রাশিয়ার চিকিৎসকবৃন্দ অক্লান্ত চেষ্টায় তাঁর পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন। এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। আর-একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা। বছর দুই পূর্বে কলকাতার বিজ্ঞান-কলেজে এক বিশিষ্ট অধ্যাপক লেবরেটরিতে কাজ করতে করতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান। দেখতে দেখতে তাঁর হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া লোপ পায়। তিনি মৃত্যুর দেশে পদক্ষেপ করলেন। কিন্তু আশ্চর্য! কিছুক্ষণ পরে একটি যন্ত্রের সাহায্যে তাঁর স্তব্ধীভূত হৃৎযন্ত্রকে আবার সক্রিয় করে তোলা হল, তিনি প্রাণ ফিরে পেলেন! এই অত্যদ্ভুত ঘটনাটি সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞান-শক্তির বলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান মরামানুষকেও বাঁচাতে পারে। এই অপারশক্তিধর বিজ্ঞান দৃষ্টিহারাকে দৃষ্টিদান করছে, বধিরের মধ্যে সঞ্চারিত করছে শ্রবণশক্তি, অপসারিত করছে মানবদেহের কোনো কোনো অংশের বিকৃতি। আগে এসব ব্যপার আমাদের ধারণারও বাইরে ছিল।

অধুনা পুষ্টিবিজ্ঞান নামে একটি জিনিস আমরা পেয়েছি। এ নিরূপণ করে খাদ্যের গুণাগুণ। খাদ্যে 'কেলরি'র পরিমাণ, কোন্ কোন্ খাদ্যে কতখানি কী জাতের ভিটামিন রয়েছে, এর সাহায্যে তা সঠিক জানা যায়। পুষ্টিকর খাদ্য স্বল্প-পরিমাণে গ্রহণ করলেও স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এ আমরা জেনেছি অধিককাল নয়। বিজ্ঞান অপরিচিত জগতের সংবাদ নিত্যই আমাদের কাছে বহন করে আনছে। প্রকৃতির রহস্যলোকের সবগুলি চাবিকাঠি এখনো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেনি। তবে এও নিশ্চিত সত্য যে, বিশ্বের বিজ্ঞানীদলের অতন্দ্র সাধনা ওই রহস্যলোকের দুয়ারগুলি একদিন উন্মোচন করবেই।

তবে একটি কথা। আমাদের সমাজব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ বলে, বিজ্ঞানের দান এখনো সমাজের অল্পসংখ্যক মানুষের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের সামগ্রী হয়ে

রয়েছে। এ দান যেদিন সর্বস্তরে মানবমানবীর হাতে গিয়ে পৌঁছাবে সে দিন বিজ্ঞানীর সাধনালব্ধ সম্পদ যথার্থ সার্থক হয়ে উঠবে।) সর্বস্থানিক ও সর্বকালিক মানুষের সেই আর্থনীতিক মুক্তির দিনটির অপেক্ষায় আমরা রয়েছি। (সাম্যতন্ত্রী সমাজে বিজ্ঞান সর্বমানবের সেবায় নিযুক্ত।)

(সর্বশেষে বলতে চাই, বিজ্ঞানের কাছ থেকে আমরা বহুতর সুখসুবিধা পেয়েছি একথা যেমন সত্য, এও তেমনি সত্য যে, বিজ্ঞান আমাদের জীবনকে ক্রমশ জটিল করে তুলছে।) আজ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে সুখী কিনা, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন, সন্দেহ নেই। তবে (একালের যান্ত্রিক সভ্যতার পরিবেশে লালিত মানুষ যে দিন দিন মনের শান্তি হারিয়ে ফেলছে এ স্বীকার করতেই হবে।) এহেন অবাঞ্ছিত অবস্থার হাত থেকে পরিত্রাণলাভের উপায় কী? উপায় হল বিজ্ঞান-অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে মানববিদ্যা [Humanities] বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হওয়া। (উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপন করতে পারলে আমাদের মনের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকবে,) যন্ত্রের দাসত্ব আমরা কখনো করব না। (বিজ্ঞানবুদ্ধি যদি মানবসত্যবিরোধী হয়ে ওঠে তাহলে আত্মিকমৃত্যু অনিবার্য।)

বাঙালির বিজ্ঞানসাধনা

ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার শুরু উনিশের শতকের নবজাগরণের যুগে। এই উনবিংশ শতকে, যেমন সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে, তেমনি, বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও বাঙালি গোটা ভারতবর্ষে পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উনিশের শতকে বাঙ্‌লাদেশ পশ্চিমী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিল। এর ফলে বাঙালিজাতির মনোজগতে এক প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা গেল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হল, তার ভাবসাধনা ও কর্মসাধনা নতুন নতুন খাতে প্রবাহিত হতে লাগল। সে দিন বাঙালি যথার্থ উপলব্ধি করেছিল কেবল ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যকে আঁকড়ে ধরে কোন জাতি সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না—ব্যবহারিক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজন সর্বাধিক।

বিজ্ঞানশিক্ষাদানের কোনো প্রতিষ্ঠান দেশে তখন ছিল না বললেই হয়। উনবিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে বাঙ্‌লাদেশে ধীরে ধীরে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল, এবং এখানে বিজ্ঞানের পঠনপাঠন শুরু হল। এইসব প্রতিষ্ঠানের নাম—শ্রীরামপুর কলেজ, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজ। দেখতে পাই, ১৮২১ ইংরেজি সালের দিকে, শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্ররা রসায়নশাস্ত্রে কিছু কিছু পাঠ নিচ্ছে। ১৮৩৫ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা। অমোদের

বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এই কলেজটির স্থাপনা নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য একটি ঘটনা। বহু বছর ধরে মেডিকেল কলেজই একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল যেখানে এদেশীয় শিক্ষার্থীরা রসায়ন বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে অল্পবিস্তর জ্ঞান আহরণ করতে পেত। এখানে রসায়নশাস্ত্র যত্নসহকারে পড়ানো হত। স্বনামখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এই মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। এখানে অধ্যায়নকালেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ জন্মে। উনিশের শতকের শেষ পাদে বাঙ্‌লাদেশে বিজ্ঞান অনুশীলনের কেন্দ্রস্থাপনের যে বৃহৎ উদ্যমপ্রচেষ্টা দেখা যায় তার সর্বাধিক প্রেরণা জুগিয়েছিলেন ডাক্তার সরকার। এদেশে বিজ্ঞানশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতিষ্ঠান-হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রসায়নশাস্ত্রে প্রখ্যাত অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার ১৮৭৪ সালে এই কলেজে যোগদান করেন। তাঁর অধ্যাপনার আশ্চর্য আকর্ষণীশক্তি ছিল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি তিনি খুব কৃতিত্বের সঙ্গে প্রদর্শন করতেন। একারণে রশায়নশাস্ত্র উক্ত কলেজে ছাত্রদের খুব প্রিয় একটি বিষয় ছিল। বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আলেকজাণ্ডার পেডলারেরই একজন কীর্তিমান ছাত্র।

মেডিকেল কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন হত, কিন্তু উচ্চতর বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার তেমন কোন সুযোগ এখানে মিলত না। সেকালের কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তি এ অভাবটি লক্ষ্য করলেন। মৌলিক গবেষণা চালিয়ে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করতে না পারলে বিজ্ঞানশিক্ষার মূল্য কী? দেশের এই অভাব দূর করবার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি বাঙ্‌লাদেশে এমন একটি প্রতিষ্ঠান-স্থাপনে প্রয়াসী হলেন যেখানে উৎসাহী তরুণেরা গবেষণাকার্য চালাবার প্রশস্ত সুযোগ পাবে আর যেখানে সংগৃহীত থাকবে বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের লেখা উত্তম উত্তম বিস্তর গ্রন্থ। সহজ কথায়, তিনি স্থাপন করতে চাইলেন বিজ্ঞানের বড়ো একটি গবেষণাকেন্দ্র। মহেন্দ্রলালের সঞ্চিত অর্থে এবং দুয়েকজন সদাশয় ব্যক্তির কয়েক হাজার টাকা দানে ১৮৭৬ ইংরেজি সালে কলিকাতায় স্থাপিত হল একটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, নাম—'Indian Association for the Cultivation of Science'—সংক্ষেপে, সায়েন্স এসোসিয়েশন'। এই সায়েন্স এসোসিয়েশন স্থাপনার ইতিহাস বাঙলাদেশে তথা গোটা ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চার উজ্জ্বল-সম্ভবনাপূর্ণ আন্দোলন-শুরুরই ইতিহাস।

লণ্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের আদর্শটি মহেন্দ্রলালের দৃষ্টির সম্মুখে ছিল। ওই প্রতিষ্ঠানটির আদর্শেই সায়েন্স এসোসিয়েশন স্থাপিত। আমাদের দেশের তরুণদের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা ছিল। উপযুক্ত সুযোগ পেলে ভারতীয়দের মধ্যে যে ডেভি, ফ্যারাডের মতো বিজ্ঞানীর আবির্ভাব একদিন হবেই হবে এরকম একটি নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়েই মহেন্দ্রলাল অক্লান্ত প্রচেষ্টায় উক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। নিজের জীবৎকালে তাঁর এই স্বপ্ন অবশ্য বাস্তবে রূপ পায়নি, কিন্তু

বিংশ শতকের প্রথম পাদে বহুসংখ্যক বাঙালি ও ভারতসন্তান বিজ্ঞানচর্চায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছেন। নোবেল-পুরস্কার-বিজয়ী বিজ্ঞানী শ্রীচন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন উক্ত সায়েন্স এসোসিয়েশনের লেবরেটরিতে গবেষণাকার্য চালাবার সুযোগ যদি না পেতেন তাহলে হয়তো আজিকার এই জগৎজোড়া খ্যাতির অধিকারী তিনি হতেন না। বর্তমানে সায়েন্স এসোসিয়েশন কেন্দ্রী সরকারের তত্ত্বাবধানে এক প্রকাণ্ড বিজ্ঞানগবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি এখন যাদবপুরে অবস্থিত।

বাঙালি বিজ্ঞানসাধকদের মধ্যে প্রতিভাধর জগদীশচন্দ্র বসুর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখনীয়। পদার্থবিদ্যায় ও উদ্ভিদবিজ্ঞানে তাঁর বিস্ময়কর মৌলিক আবিষ্কার বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পেয়েছে। জগদীশচন্দ্র লণ্ডন ও কেম্ব্রিজ য়ুনিভার্সিটির বিজ্ঞানের ছাত্র। বিলেতে অধ্যয়নকালে তিনি লর্ড র‍্যালে, ফ্রান্সিস ডারউইন প্রমুখ মনীষীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৮৪ সালে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। একদিকে সপ্তাহে বহুঘণ্টার অধ্যাপনা, অন্যদিকে, উক্ত কলেজের অনুন্নত পরীক্ষাগারে অনবচ্ছিন্ন গবেষণা, উভয় কার্যই একসঙ্গে জগদীশচন্দ্র অশেষ উৎসাহে চলিয়ে যান। বিদ্যুৎ-বিষয়ে গবেষণা করে অল্পবয়সেই তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্‌সি উপাধি পান। বেতারবার্তা-প্রেরণের সম্ভাবনার কথা তাঁর মনেই প্রথম উদিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত তত্ত্বের সুযোগ নিয়ে বেতারযন্ত্রের উদ্ভাবকের নামযশ পেলে য়ুরোপের একজন বিজ্ঞানী। এতে অবশ্য এতটুকু হতোদ্যম হলেন না তিনি। একের পর এক নতুন নতুন জ্ঞানের দুয়ার উন্মোচনে রত রইলেন। অদৃশ্য আলোক সম্পর্কে তাঁর আবিষ্ক্রিয়া পাশ্চাত্ত্যদেশের বৈজ্ঞানিক-সমাজকে বিস্মিত করল। লণ্ডনের প্রসিদ্ধ রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে তাঁর বক্তৃতা শুনে তাঁরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

জড়জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটন্ করতে বসে একদা জগদীশচন্দ্র মূক উদ্ভিদজীবনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। জীব ও জড়পদার্থের মধ্যে তিনি বৈদ্যুতিক সাড়ার একতা লক্ষ্য করলেন, বৃক্ষরাজিও যে অনুভূতিশীল তা যন্ত্রের সাহায্যে সকলকে দেখালেন। নির্বাক উদ্ভিদকে দিয়ে তিনি কথা বলালেন, তাদের সংকেতভাষণ তাঁর চোখে সুস্পষ্ট ধরা পড়ল। জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত ক্রেস্কোগ্রাফ সত্যই একটি আশ্চর্য যন্ত্র। গাছ প্রতি সেকেণ্ডে কতটুকু বাড়ল তা এই যন্ত্র পরিষ্কার লিখে দেয়। ক্রেস্কো-গ্রাফের শক্তি অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের চেয়ে লক্ষগুণ বেশি। কত সূক্ষ্ম যন্ত্র যে তিনি নির্মাণ করেছেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এরূপ আর একটি যন্ত্র হল Resonant Recorder—এর সাহায্যে বৃক্ষের সাড়া লিপিবদ্ধ করা হয়। উত্তেজিত হলে গাছের মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা দেয় এই স্বয়ংলেখ-যন্ত্র তা record করে। বৃক্ষজীবনের

গূঢ় কাহিনী ব্যক্ত করে জগদীশচন্দ্র প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর কাছে 'প্রাচ্যের যাদুকর' হয়ে উঠলেন। তাঁর গবেষণার শেষকথা হল—জড়পদার্থ, উদ্ভিদ ও জীব সকলেই এক অচিন্তনীয় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে তাঁর প্রতিভার দান সামান্য নয়। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনা জগদীশচন্দ্রের আর-এক স্মরণীয় কীর্তি।

আধুনিক ভারতবর্ষে আর-একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আমাদের বাঙলাদেশেরই সন্তান তিনি। তাঁর মৌলিক আবিষ্ক্রিয়া জগতে প্রচারিত হওয়ায় মাতৃভূমির মর্যাদা ও গৌরব বেড়েছে। একসময় ভারতীয়দের এই অখ্যাতি ছিল যে, বিজ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী তারা নয়। কিন্তু জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ বাঙালির চিন্তাশীলতার প্রখরতা, তাঁদের অভিনব বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব-উদ্ভাবন ওই অখ্যাতির বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রতিবাদ। প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণায় বিজ্ঞানের রসায়নশাখা সমৃদ্ধ হয়েছে।

বি. এ. ক্লাশে পড়বার সময় প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি-কলেজে অধ্যাপক স্যর আলেকজাণ্ডার পেড্‌লারের কাছে রসায়নশাস্ত্র অধ্যায়ন করেন। ১৮৮২ সালে যখন তিনি বি. এ. ক্লাসের ছাত্র তখন 'গিলক্রাইস্ট বৃত্তি' লাভ করে তিনি বিলেতে পড়তে যান। সেখানে গিয়ে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এস্‌সি. ক্লাসে তিনি ভর্তি হলেন। এসময়ে রসায়নশাস্ত্রের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। ১৮৮৫ সালে প্রফুল্লচন্দ্র বি. এস্‌সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং পরপর দুবছর গবেষণাকার্য চালিয়ে ডি. এস্‌সি. উপাধি পান। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, তাঁর এই গবেষণা খুব উচ্চশ্রেণীর বিবেচিত হওয়ায় তিনি বিশেষ একটি পুরস্কার পেয়েছিলেন।

স্বদেশে ফিরে ১৮৮৯ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রফুল্লচন্দ্র অধ্যাপক নিযুক্ত হন। নিজ ছাত্রদের মধ্যে যাতে মৌলিক গবেষণার স্পৃহা জাগে সেদিকে তিনি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন এবং নিজেও কলেজের লেবরেটারিতে সতত গবেষণাকর্মে রত থাকতেন। জগদীশচন্দ্রের মতোই, প্রফুল্লচন্দ্রকেও পরীক্ষাগারে নানা অসুবিধের মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু কঠিন সাধনার শক্তি দিয়ে সকল অসুবিধাকেই তিনি অতিক্রম করেছেন। প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণার পরিধি বিস্তৃত। দীর্ঘকাল ধরে পারদবিষয়ে গবেষণায় ফলস্বরূপ ১৮৯৬ সালে আবিষ্কৃত হল মারকুরাস নাইট্রাইট [Mercurous Nitrite]। এ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। মারক্যুরাস নাইট্রাইট পারদজাত একটি যৌগিক পদার্থ। এই পদার্থটি আবিষ্কার করে খ্যাতনামা রসায়নবিজ্ঞানীদের কাছে তিনি প্রভূত প্রশংসা পেলেন।

স্যর তারকনাথ পালিত, স্যর রাসবিহারী ঘোষ, রাণী বাগেশ্বরী, খয়রার রাজা গুরুপ্রসাদ সিংহ প্রভৃতি মহদাশয় ব্যক্তির বিপুল আর্থিক আনুকূল্যে এবং স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টায় ১৯১৬ সালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানকলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাসে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানিন্তন উপাচার্য আশুতোষের অনুরোধে প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানকলেজে রসায়নবিদ্যার পালিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তারপর, জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত উক্ত কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেছেন ও গবেষণাকার্য চালিয়ে গেছেন। শুধু নিজের মৌলিক আবিষ্কারের জন্যই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র চিরস্মরণীয় নন, তাঁর আরো বড়ো কৃতিত্ব হল তিনি আধুনিক বাঙলার একদল রসায়ন-বিজ্ঞানীর স্রষ্টা। বলতে গেলে, নব্যভারতে তিনিই প্রথম রাসায়নিক গবেষণার পথ উন্মুক্ত করেন। বহু প্রতিভাবান ছাত্রের উজ্জ্বল কৃতিত্ব দেশবিদেশে আচার্য দেবের গৌরব বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্রের লিখিত দুই খণ্ডে সমাপ্ত, বৃহদায়তন গ্রন্থ 'হিন্দুরসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস' তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও অশেষ পরিশ্রমের স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর অপর এক প্রকাণ্ড কীর্তি বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস-স্থাপনা। বাঙলাদেশে এতবড়ো রসায়নশিল্পের প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয়টি নেই।

এবার নব্যবাঙলার আন্তর্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন কয়েকজন বিজ্ঞানীর কথা বলি। বিজ্ঞানসাধনায় যে-সকল বাঙালি পৃথিবীজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন, মনীষী সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁদের অন্যতম। তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর বুদ্ধি, অসামান্য প্রতিভা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। সত্যেন্দ্রনাথ যে সময়ে এম-এস্‌সি পরীক্ষা পাশ করেন সেই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হয়। স্যার আশুতোষ প্রতিভাবান তরুণ সত্যেন্দ্রনাথকে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে অধ্যাপক বসু ঢাকায় চলে আসেন, এবং দীর্ঘকাল সেখানে উচ্চতর বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন।

বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আইন-স্টাইনের 'সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ' প্রচারিত হয়। সেকালে তাঁর এই অভিনব তত্ত্ব পৃথিবীর মাত্র দুয়েকজন বিজ্ঞানীর বোধগম্য হয়েছিল। আমাদের অত্যন্ত গৌরবের বিষয়, অল্পবয়স্ক সত্যেন্দ্রনাথ [এবং মেঘনাদ সাহা] আইনস্টাইনের মতবাদ সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। শুধু তা নয়, ওই বিষয়ে তিনি গবেষণাও শুরু করে দিলেন। পরমাণু ও ইলেকট্রনের বিষয়ে অধ্যাপক বসু অতি উচ্চাঙ্গের গবেষণা করেন। আলোককণিকা সম্বন্ধে তাঁর উদ্ভাবিত নতুন পরিসংখ্যান প্রণালীকে বিশ্বের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী বিনাদ্বিধায় স্বীকার করে নিলেন। অধুনা উক্ত পরিসংখ্যান প্রণালী 'বসু-পরিসংখ্যান' নামে খ্যাত। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সৌধনির্মাণে সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণা কম সহায়তা করেনি। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কীভাবে বিজ্ঞানচর্চা হয় তার পরিচয়লাভের জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ একবার য়ুরোপে গিয়েছিলেন। সেখানকার নামকরা বিজ্ঞানীরা উচ্চতর গণিতে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখে চমৎকৃত হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পুনর্বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-

কলেজে এসে যোগ দেন। সম্প্রতি ভারতসরকার তাঁকে 'ন্যাশন্যাল প্রফেসর' মনোনীত করেছেন। এ তাঁর অসামান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বীকৃতি। পৃথিবীবরেণ্য বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

বাঙ্‌লাদেশের আর-একজন প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক—ডক্টর মেঘনাদ সাহা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিশয় মেধাবী একজন ছাত্র তিনি। ১৯১৫ সালে ফলিত-গণিতশাস্ত্রে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মেঘনাদ এম্‌-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা পাশ করার পর তিনি কলিকাতা বিজ্ঞান-কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গবেষণাকার্যও চলিতে থাকে। গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে অধ্যাপক সাহা এখানকার ডি-এস্‌সি উপাধি পেলেন। ইংলণ্ড ও জর্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছে। উভয় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর সঙ্গে একত্রে তিনি গবেষণা করেছেন, এবং সেখানেও প্রচুর খ্যাতি পেয়েছেন। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে কয়েক বৎসর পদার্থবিজ্ঞানের খয়রা-অধ্যাপকের পদে কাজ করার পর ডক্টর সাহা পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। এখানে এসেও তিনি নিয়মিতভাবে গবেষণার কাজে নিযুক্ত থেকেছেন। পরামাণু সম্পর্কিত তাঁর মতবাদ পৃথিবীর সেরা পদার্থবিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯২৫ সালে অধ্যাপক সাহা ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটি সদস্য [F. R. S.] হন। এফ. আর এস্‌. হতে পারা এদেশের বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে মস্তবড়ো একটি সম্মান। য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক-সম্মেলনে কয়েকবার তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে গেছেন। ভারতের বহু বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অধ্যাপক সাহা জড়িত ছিলেন। এদেশে বিজ্ঞানপ্রচারে তাঁর উৎসাহ-উদ্যমের শেষ ছিল না। কিছুকাল পূর্বে তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন।

পদার্থবিজ্ঞানের তথ্যপূর্ণ গবেষণায় অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু [ডি, এম. বোস] যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা উল্লেখ করবার মতো। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র তিনি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি নেওয়ার পর অধ্যাপক বসু য়ুরোপে যান। সেখানে কেমব্রিজ, লণ্ডন, বার্লিন প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেন। রেডিও এ্যাকটিভিটি সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার জন্যে তিনি ডক্টরেট উপাধি পান। চুম্বকতত্ত্ববিষয়ে গবেষণা করে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচুর খ্যাতি পেয়েছেন। উক্তবিষয়ক তাঁর মতবাদ 'বোস স্টোনার থিওরি' নামে পরিচিত। পদার্থবিজ্ঞানীদের সম্মেলনে যোগদান করবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি ইংলণ্ডে গেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার 'পালিত অধ্যাপক'-রূপে কতিপয় বৎসর তিনি কাজ করেছেন। অধ্যাপক বসু বর্তমানে আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

রসায়নবিদ্যার গবেষণার ক্ষেত্রেও বাঙালি প্রতিভার উজ্জ্বল বিকাশ দেখা গেছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এমন একদল ছাত্র তৈরি করে গেছেন যাঁরা নিজ নিজ প্রতিভাবলে তাঁদের মহান গুরুর সাধনার ক্ষেত্রটিকে উত্তরোত্তর প্রশস্ত করে তুলেছেন। এঁদের খ্যাতি আজ দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। আজকের খ্যাতিমান বাঙালি রাসায়নিক-গোষ্ঠীর মধ্যে অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক নীলরতন ধর, অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী, অধ্যাপক পুলিনবিহারী সরকার, অধ্যাপক হেমেন্দ্রকুমার সেন, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় প্রমুখ রসায়ন-বিদ্যাবিদের নাম উল্লেখনীয়। রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনা ও গবেষণা এদের সকলেরই জীবনের ব্রত। বলা-বাহুল্য, এঁরা প্রত্যেকেই কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র।

ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ অল্প কয়েক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তৎপর দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। লবণাক্ত জলের গুণাবলী সম্বন্ধে তিনি বিস্তর গবেষণা করেন, জড়পদার্থের ওপর আলোকরশ্মির প্রভাব সম্পর্কিত তাঁর গবেষণা অতিশয় মূল্যবান। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানকলেজেও তিনি কিছুকাল গবেষণা করেছেন। ডক্টর ঘোষ বার্লিনেও গিয়েছিলেন। বার্লিনের দুজন বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক তাঁর গবেষণার বিষয়গুলি জার্মান ভাষায় ছাপিয়ে জার্মান-দেশে প্রচার করেন। বহির্ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিদেশে এভাবে তিনি সম্মানিত হয়েছেন। এতে আমরা বাঙালিরা নিজেদের অত্যন্ত গৌরবান্বিত বোধ করি। সরকারি ও বেসরকারি বহু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাসায়নিকদের অন্যতম। ১৯৫৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাঙলার আর-একজন বিশিষ্ট রসায়নবিদ্—অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বিজ্ঞানসাধনার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। ডক্টর মুখোপাধ্যায় রসায়নবিজ্ঞানের একটি নতুন দিকে নিজ গবেষণা পরিচালিত করেন। এই বিষয়টির নাম—কোলয়ড্ [colloid]-রসায়ন। পদার্থতত্ত্বমূলক [physical] রসায়নশাস্ত্রের এই শাখাটির সাহায্য ব্যতিরেকে কৃত্রিম রেশম, রবার, সাবান, বিবিধপ্রকার রঞ্জনদ্রব্য প্রস্তুত করা যায় না। কোলয়ডের প্রকৃতি বা স্বভাবধর্ম সম্বন্ধে ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা কোলয়ড-রসায়ন-বিশেষজ্ঞ য়ুরোপীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর উচ্চ প্রশংসা পেয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর মতবাদ সর্বজনস্বীকৃত। ভারতবর্ষে কোলয়ড-রসায়ন চর্চায় তিনি অগ্রণী। এদেশে তিনি রসায়নসভার প্রতিষ্ঠাতা। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে ডক্টর মুখোপাধ্যায় নিজে যেমন অশেষ যশখ্যাতি পেয়েছেন, তেমনি, তাঁর বহু ছাত্র দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট সুনামের অধিকারী হয়েছেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অপর একজন যশস্বী ছাত্র—ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী। দীর্ঘ-কাল তিনি রাজসাহী কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেছেন। সুদূর মফঃস্বলে থেকেই তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে গেছেন, এ তাঁর অশেষ কৃতিত্বের

পরিচায়ক। এখানে অবস্থানকালে তিনি গবেষণামূলক যে-সব প্রবন্ধ লেখেন তার জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ডক্টর নিয়োগী রাজসাহী কলেজ থেকে বদলি হয়ে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে চলে আসেন। রসায়নবিদ্যার কয়েকটি শাখায় তিনি পারদর্শী। তবে তিনি সবচেয়ে বেশি গবেষণা করেছেন অজৈব [Inorganic] রসায়নে। তাঁর লিখিত বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিলাতের নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গেলিয়াম যৌগিকসমূহের [New Compounds of Gallium] আবিষ্কার ডক্টর নিয়োগীর সবচেয়ে বড়ো কীর্তি।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে যশস্বী হয়েছেন ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সমস্ত পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্ব দেখিয়ে উত্তীর্ণ হন এবং বহু পুরস্কার ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। ডক্টর ব্রহ্মচারী এম.-ডি. এবং পি. এইচ. ডি উপাধিতেও ভূষিত। প্রথমে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ও পরে কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে তিনি অধ্যাপনা করেন। এই দ্বিতীয়োক্ত প্রতিষ্ঠানে কালা-আজর সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা সুরু হয়। এর ফলেই ডক্টর ব্রহ্মচারীর বহুখ্যাত 'ইউরিয়া স্টিবামিন'-এর আবিষ্কার। এই অমোঘ ইনজেকশন আবিষ্কৃত হওয়ায় কালা-আজরে আক্রান্ত লক্ষ লক্ষ রোগী মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর এই দান চিরস্মরণীয়।

আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ। তাঁদের প্রজ্বলিত বিজ্ঞানের দীপবর্তিকা হাতে তুলে নিয়ে একালেও বহু তরুণ বিজ্ঞানী প্রকৃতির সংসারে অপরিচিত, অপরীক্ষিত, অন্ধকার পথে নিত্য এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞানসাধনায় বাঙালি যে পৃথিবীতে কোনো জাতিরই পশ্চাতে পড়ে থাকবে না, বাঙালি সন্তান নিজ নিজ প্রতিভার দানে যে বিশ্বের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধতর করে তুলবে এ সত্যটি ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

সার্বজনীন পূজা

॥ ১ ॥

সেইসব স্মৃতি কি ভুলিবার? মাঘের শীত ঘনাইয়া আসিয়াছে, কুয়াশামাখা উষা অল্প অল্প আদর করিয়া যায়, আমরা নবম শ্রেণীর বন্ধুরা সারারাত্রি জাগরণের পর গোপনে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ফুলের সন্ধানে চলিয়াছি। অন্ধকার ভালো করিয়া কাটে নাই, শীতে আমাদের জমাট হইয়া যাইবার কথা। কিন্তু বুকের ভিতর পর্যন্ত তো শীত পৌঁছায় না, সেখানে এখন তপ্ত উৎসাহ অবিরাম জাগিয়ে আছে। আমাদের মতো কি আর-কাহারো পূজা! দেবদারুর আস্ত আস্ত ডাল ভাঙিয়া আনিয়া

দেবদেউল রচনা করিয়াছি, মণ্ডপেরই মধ্যে সাজসজ্জারই-বা কতো বাহার! সমস্ত রাত ভরিয়া এই আয়োজনে আমাদের পূজা সকলের সেরা হইয়া উঠিবে!

দুপুরে বিকেলেই এ সমস্ত হয়তো করিয়া ফেলা যাইত। কিন্তু তা কি হয়? আমরা তবে আমাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিব কেমন করিয়া? যদি নিশীথ অন্ধকারের মধ্যে একদিনের স্বাধীনতা অর্জন না করিলাম তবে সে-কেমন বাণীবন্দনা! না, তা হইবে না। আজ সব বন্ধুকে আসিয়া মিলিত হইবে স্কুলপ্রাঙ্গণে। যে-কাজ হয়তো একাই পারিতাম, আজ তা সবাইকে ভাগ করিয়া লইতে হইবে। ওখানে বসিয়া কে নিদ্রার আয়োজন করিতেছে? উহাকে তুলিয়া দাও, আলপনার ব্যবস্থা করিয়া দিক। তোমার মনে আছে তো, মালা গাঁথিতে হইবে? ঐ বুঝি ধুপদানিটাকে বাজারেই ফেলিয়া আসিল সমর। দৌড়াও দৌড়াও। এত রাত্রে? হ্যাঁ, সেই তো মজা। এ তো অন্যরকম। এ তো প্রত্যেক দিনের মতো নয়। আজ সকলের পূজায় সকলে আমরা স্বাধীন হইয়া মিলিত হইয়াছি। রাত্রি কেমন করিয়া আস্তে আস্তে ভোর হইয়া উঠে, আজ আমরা সকলে মিলিয়া তা দেখিতে পাইব। প্রথম সূর্যকিরণ আসিয়া যখন আমাদের মাতার শুভ্র ললাট স্পর্শ করিয়া যাইবে, সেই মুহূর্তেই আজ আমাদের সর্বপ্রথম পবিত্র পূজা।

সে-সব দিন ভুলিবার নয়। সেই প্রথম আমরা নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা বহন করিতে শিখিয়াছি। আর, এ দায়িত্ব কি যেমন-তেমন! মাতৃপূজার দায়িত্ব! যখন দূর হইতে মাত্র অঞ্জলি দিয়া গিয়াছি অথবা প্রসাদভিক্ষু হাতখানি প্রসারিত করিয়া দিয়াছি, তখনকার সঙ্গে এ যে অনেক প্রভেদ। তখন পূজা ছিল যেন বাহিরের বস্তু তখন অন্তরের মধ্যে তাহার সহিত নিবিড় যোগ এমন করিয়া অনুভব করি নাই, মাতার দুয়ারে আসিয়াছি যেন অতিথির মতো। কিন্তু আজ এ যে আমাদেরই পূজা, আমরাই সহস্র অতিথিকে বরণ করিয়া ডাকিয়া লইব, মাতৃমন্দির উন্মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আমরা অনেক দ্বারী, এই অনুভবে অকস্মাৎ আজ আমরা বড়ো হইয়া উঠিয়াছি।

এই দায়িত্বের অনুভব, অন্তরের সংযোগ এবং পারস্পরিক মিলনসান্নিধ্য ইহাই তো প্রকৃত পূজার তাৎপর্য। নতুবা আমরা কি কেবল মাটির মূর্তিকেই পুষ্প নিবেদন করি? মাটি মাটিই থাকিয়া যায় যদি আমরা আমাদের জাগরণের মন্ত্র সেই মূর্তিমায়া হইতে আহরণ না করিয়া লই।

॥ ২ ॥

তাই মনে হয়, পূজার প্রসঙ্গে 'সার্বজনীন' কথাটা একটা বাহুল্য মাত্র। এক হিসাবে দেখিতে গেলে পূজার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যই তো তাহার সার্বজনীনতায়। সর্বজনের মঙ্গলের জন্য, সর্বজনের মিলনের জন্য, সর্বজনের আনন্দের জন্য যদি সৃষ্ট না হয় তবে মাতৃমন্দিরের পুণ্য অঙ্গন কখনো কি মহোজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে?

যেন না-ভাবি যে এই মিলনমন্ত্র কেবল হিন্দুরই মন্দিরের কথা। হিন্দু বা

বৌদ্ধ, মুসলমান বা খ্রীষ্টান—যাহারই ধর্মের কথা বলি না কেন, সমস্ত উপাসনাতেই দেখা যাইবে এই বিচিত্রকে বহুকে একের মধ্যে বাঁধিবার চেষ্টা। তা যদি না হইত তবে মসজিদ-বিহার মন্দির-গির্জার কী প্রয়োজন থাকিত? একাকীর প্রার্থনা তো একাকী রুদ্ধগৃহেও সম্ভব, গৃহের সেই রুদ্ধতা ভাঙিয়া দিয়া পূজা সকলকে আনিয়া দেবতার অঙ্গনে মিলিত করিয়া দেয়।

পূজার এই সার্বজনীন মন্ত্রটা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি বলিয়াই কি 'সার্বজনীন পূজা' কথাটার উপর আজ এত চাপ পড়িয়াছে? তা হইতে পারে? বিভেদের যুগ যতই আমাদের পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেছে, ততই আমরা কয়েকটি বিশেষ মিলনমুহূর্তের জন্য প্রতিক্ষাকাতর হইয়া উঠিতেছি। তাই সত্যের দিক হইতে 'সার্বজনীন' শব্দটা পূজার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও আজ স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহিতেছি 'সার্বজনীন পূজা'। বিশেষত বাঙ্‌লাদেশের নগরাঞ্চলে ঐ কথাটা এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

অবশ্য নাগরিক এই সার্বজনীনতা কল্পিত হইয়াছে পরিমাণগত বিচারে। গ্রামের স্মৃতি যদি মনে পড়ে তো দেখিতে পাই, একবাড়িতে পূজার আয়োজন হইলে দশ বাড়ি তাহাতে অংশ লইতে ছুটিয়া আসে। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহাকে বলিয়াছেন সেকালের উৎসব, তাহা একালেও যে একেবারে তিরোহিত তা তো বলিতে পারি না। কিন্তু নাগরিক সভ্যতার গ্রাসে সেই দশের মিলন আর স্বতঃস্ফূর্ত নাই, সেকথা মানিতে হয়। তাই নাগরিক পূজা একের বাড়িতে দশের আগমন নয়, দশের আয়োজনে ঐক্যের প্রয়াস।

ইহার যে কোনো কারণ নাই, তাহা নয়। কালের পরিবর্তন হইয়াছে। মানুষের জীবনযাত্রাও কত বক্রকুটিল রূপ লইয়াছে। ইহার মধ্যে কি আর পূর্বজীবনের শ্রী আশা করা যায়? তথাপি ইহাও সত্য, মানুষ তো কেবলই তার অন্যময়তা লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, জীবনের সঙ্গে কোনক্রমে আপোশ করিয়া তাহাকে আনন্দের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িতে হয়। তখনই আমরা চাঁদার খাতা লইয়া অগ্রসর হই।

ইহাতে দোষ কী? প্রত্যহ আমরা যে অন্নগ্রহণ না-করি এমন নয়, তবু কেন কোনো কোনো দিন বনভোজনের আকাঙ্ক্ষা লইয়া জনে জনে চাঁদা তুলিয়া আনি? প্রত্যহের একাকিত্ব একদিন সকলে মিলিয়া মুছিয়া দিব, এই তো আমাদের ইচ্ছা। পূজাও যদি সেই ইচ্ছা হইতে জাগ্রত হয় তবে তাহাতে দোষের কিছু নাই। তাই, চাঁদা তুলিয়া পরস্পরের অংশভাগ হইয়া সার্বজনীন এই পূজার আয়োজন নিতান্ত তুচ্ছ অবজ্ঞেয় বিষয় নয়, একথা স্বীকার করা যাইতে পারে।

॥ ৩ ॥

পূজার মধ্যেই সার্বজনীনতার মন্ত্র নিহিত, একথা বলিয়াছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিলাম যে আজ যখন মাঝেমাঝেই মানুষ সে-মন্ত্র ভুলিয়া যায় তখন

'সার্বজনীন পূজা' কথাটা প্রবলভাবে প্রচারিত হইয়াছে। সত্যকে যখন স্বভাব হইতে হারাইয়া ফেলি, তখন তাহাকে এমন করিয়া মনে করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

সার্বজনীন পূজা বলিতে অবশ্য প্রথমেই আজ আমাদের শারদীয় দুর্গাপূজার কথা মনে পড়ে। তাই তো স্বাভাবিক। বাঙ্‌লাদেশে ইহাই সবচেয়ে বড়ো পূজা, সে তো বটেই, তদুপরি ইহার মধ্যে একটা পরিপূর্ণতার শ্রী আছে। শ্যামাপূজা বলো, জগদ্ধাত্রী পূজা বলো, দুর্গাপূজার মতো এমন আর কী হইতে পারে। দশপ্রহরণধারিণী অসুরনাশিনী দেবীমূর্তির সমস্ত অবয়বে শক্তিনিপাতের দৃঢ়তা, কিন্তু ঐ তাঁহার উজ্জ্বল প্রসন্ন চক্ষুতারকার দিকে তাকাইয়া দেখো। মধুর বৎসল আভায় কে তাঁহার মুখমণ্ডল এমন গভীর প্রসাদে ভরিয়া দিল! সিংহবাহিনী গতিময়ী দেবীর পদযুগল দেখিলাম, কিন্তু ঐ তাঁহার বামে দক্ষিণে তাকাইয়া দেখো। স্থিতি-সৌন্দর্যের এমন পরিপূর্ণ মহিমা আর কোথায় তুমি দেখিবে? যেন তাঁহার সমস্ত নিটোল ঘরখানি লইয়া তিনি পথে বাহির হইয়া আসিয়াছেন, পুত্রকন্যাপরিবৃত সমস্ত দেশের সুস্থ পরিবারজীবনের প্রতীক হইয়া যেন তিনি দাড়াইয়া আছেন।

দৃঢ়তা এবং মধুরতায়, গতিতে এবং স্থিতিতে, ঘরে আর পথে এমন করিয়া মিলিয়া গেছে বলিয়াই তো দুর্গাপূজা আমাদের সার্থকতম সার্বজনীন পূজা। সার্বজনীনতার সমস্ত কল্পনা যেন ঐ মূর্তিরচনার মধ্যে বাহিত হইয়া আসিতেছে। এখান হইতে কাহাকে তুমি বর্জন করিবে? এখানে যে সকলেরই স্থান। একমাত্র অমঙ্গলকে অসুন্দরকে অসত্যকে ভিন্ন আর কাহাকেও তো এ মন্দির হইতে তুমি বর্জন করিতে পারো না। শারদাদেবীর দশহস্তের আহ্বানে তাই আপনা হইতেই সার্বজনীনতার মন্ত্র জাগিয়া ওঠে, স্বতন্ত্র করিয়া যেন কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় না।

কিন্তু হায়, তবু আমরা ভুলিয়া যাই। স্বতঃ-উদ্ভাসিত এই সত্যেরও মুখে বারে বারে আবরণ পড়িয়া যায়, এতই আমাদের দুর্ভাগ্য। চাঁদা তুলতে তুলতে আমরা কতদূর সরিয়া যাই। কেহ কি লক্ষ্য করি যে লক্ষ্মীকে ভুলিয়া আমরা কুবেরের স্বর্ণসম্পদে লুব্ধ হাত বাড়াইয়াছি? আজ আমাদের সেই মহাপতনের হতভাগ্য দিন।

অজস্র অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, মস্ত মস্ত ম্যারাপ বাঁধা সম্পন্ন হইয়াছে, বিচিত্র আধুনিকতার সাজে দেবীকে শ্রী হইতে সরাইয়া আনিয়া চোখধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে বসাইয়া দিয়াছি। এ পাড়া ও-পাড়ার প্রতিযোগিতা বাড়িয়া বাড়িয়া দেবীপ্রতিমার উচ্চতাকে অনেক অতিক্রম করিয়া গিয়াছে আত্মদম্ভ। মিলনমন্ত্র আজ পরিণত হইয়াছে কলহবীজে। জোরালো লাউডস্পীকার চতুর্দিকে তাহার গর্জন মেলিয়া ধরিয়াছে, তাহার কণ্ঠ হইতে নির্গত উৎকট ধ্বনিপুঞ্জের সহিত সংগীত অথবা দেবী কাহারো কোনো সম্পর্ক নাই। দেবী আবাহনের দিন হইতে যেন আমাদের রুচি-বিসর্জনের সূত্রপাত।

কখনো কখনো গৃহে গৃহে প্রসাদ বিতরণ করিয়া আসি বটে, কিন্তু তাহার সহিত এককণাও কি হৃদয় মিশাইয়া দিই? যাঁহার বাড়ি বহিয়া চাঁদা চাহিয়া আনিয়াছি

পূজাপ্রাঙ্গণে আসিলে তাঁহাকে কি ভুল করিয়াও চিনতে পারি? নিষ্প্রাণ শুষ্ক প্রমোদ-রীতির পথ বাহিয়া বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, মাতৃমন্দিরের পুণ্যঅঙ্গন আর তো আজ মহোজ্জ্বল হইয়া ওঠে না। কেবল তো কাঙালিনী মেয়েটি নহে, আমার প্রতিবেশীও আসিয়া যখন দূরাগত অতিথির মতো মাতার দুয়ারে আসে যায় কিংবা ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া থাকে, তখন সহসা বুঝিতে পারি যে সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে—'তবে মিছে সহকারশাখা, তবে মিছে মঙ্গলকলস'। মস্ত মস্ত অক্ষরে লাল শালুর উপরে শাদা হরফ দিয়া লিখিয়াছি 'সার্বজনীন পূজা', বিরাট পথে শূন্য বুক জুড়িয়া টাঙাইয়া দিয়াছি এই উচ্চরব ঘোষণা। কিন্তু হায়, মন্দিরের নিভৃত কোণের মধ্যে ছোট একটু আসন বানাইয়া রাখি নাই ঐ শব্দটির জন্য। 'দেবী প্রসীদ' বলিয়া আজ যখন মন্ত্র উচ্চারণ করিব, তখন কি দেবী আজ তবে সত্যই প্রসন্ন হইবেন? 'সার্বজনীন' কথাটাকে পূজা'র একটা বিশেষণমাত্রে পরিণত না করিয়া উহাকে কবে আবার পূজার চরিত্র করিয়া তুলিতে পারিব? হয়তো সেদিন বিলম্বিত, কি সেইদিনেরই জন্য আমাদের সমগ্র সাধনা উন্মুখ হইয়া থাকুক।

ছাত্রজীবন

খুব ব্যাপক অর্থে দেখলে মানুষের গোটা জীবনটাই ছাত্রজীবন। আমরা প্রায়ই বলে থাকি—'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি'। প্রতিনিয়ত নতুনকিছু শিখতে যে অসমর্থ তার বাঁচা শুধুই প্রাত্যহিকতার আবর্তন-মাত্র। বাহিরকে অনুক্ষণ অন্তরের সম্পদে পরিণত করতে হবে, দৃষ্টিকে চতুর্দিকে প্রসারিত করে না ধরতে পারলে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে দৈন্য দেখা দিতে বাধ্য। তা ছাড়া, মানবের জ্ঞানের রাজ্যটি প্রত্যহ বিস্তৃততর হয়ে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে তা বিচিত্রমুখী হয়ে উঠেছে, তার জটিলতা ক্রমশ বাড়ছে। স্কুলকলেজের শিক্ষার্থীর মতো সারা জীবনটা ধরে অধ্যয়ন করেও বিচিত্র জ্ঞানবিদ্যার কিনারা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব বললেই চলে: উচ্চস্তরের পণ্ডিত আর জ্ঞানসাধকদেরও তাই একালে এই বহুমুখী বিদ্যার কোনো-না-কোনো শাখা বেছে নিতে হচ্ছে। বর্তমানে অতিবড়ো পণ্ডিতেরাও বলে থাকেন, জ্ঞান-সমুদ্রের কূলে তাঁরা উপল সংগ্রহে নিরত রয়েছেন। একথা তাঁদের বিনয়-মাত্র নয়—জ্ঞানের অসীমতারই দ্যোতক। এরূপ পরিস্থিতিতে কে বলতে পারে যে, আমার ছাত্রজীবন শেষ হয়েছে, অধিক কিছু শিখবার আবশ্যকতা আর নাই? এর ওপর রয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে [গ্রন্থাদির মাধ্যমে নয়] শিক্ষালাভের প্রশ্ন।

কাজেই, একমাত্র জড়চিত্ত ব্যক্তিই এই বলে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করিতে পারেন যে, শিক্ষাজীবন তিনি অতিক্রম করে এসেছেন। এ কারণে বলতে হয়, ব্যাপক অর্থে সকলেই আমরা ছাত্র—সমস্ত জীবন ধরেই ছাত্র।

কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন, ছাত্র কথাটিকে এতখানি বিস্তৃত অর্থে সচরাচর আমরা প্রয়োগ করি না—ছাত্রজীবন বললে জীবনের একটি নির্দিষ্ট কালখণ্ডকেই বুঝি। জীবনের প্রারম্ভমুখের কতিপয় বছর সর্বদেশে সর্বকালে শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত সময় বলে বিবেচিত হয়েছে। শৈশবে-কৈশোরে-প্রথমযৌবনে মানব-সন্তানের মন কাঁচা থাকে, সতেজ থাকে, আর থাকে তার গ্রহণক্ষমতার প্রাচুর্য। সাংসারিকতার জটিল আবর্ত হতে এখনো দূরে তার অবস্থান, কর্মজীবনের দায় ও দায়িত্ব এখনো তাকে স্পর্শ করেনি। তাই, অপেক্ষাকৃত ভারমুক্ত সে। এরূপ ভারমুক্ত অবস্থায় একাগ্র চিত্তে অধ্যয়ন বা বিদ্যানুশীলনই ছাত্রজীবনের প্রধান কর্তব্য। পূর্ণাঙ্গ মানুষ জীবন-ব্যাপী বিদ্যাচর্চা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে-শিক্ষা গ্রহণ করে তার সঙ্গে এই সুচিহ্নিত ছাত্রজীবনে শিক্ষার্জনের ভাবগত ও পদ্ধতিগত বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। বয়স্ক মানুষের ছাত্রত্ব তার ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতার ওপর নির্ভরশীল, তাকে আবশ্যিক বলা চলে না। কিন্তু জীবনের প্রথমাংশে শিক্ষাগ্রহণকে আবশ্যিক বলে মনে করা হয়, ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি-হিসেবেই একে দেখা হয়ে থাকে। ছাত্র-জীবন অপরিণত মানুষের জীবন, শিক্ষকবর্গের পরিচালনায় এ নিয়ন্ত্রিত; এর কেন্দ্রীয় লক্ষ্য জ্ঞানবিদ্যা আহরণ—লেখাপড়ার দ্বারা আত্মগঠন। একে ভাবী কর্মজীবনের উদ্যোগপর্ব বলা যেতে পারে। বিদ্যায়তনের শিক্ষারম্ভ হতে শিক্ষাসমাপ্তি পর্যন্ত নির্দিষ্ট একটি কালই ছাত্রজীবন।

ছাত্রজীবনের আত্যন্তিক গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। এর ওপরেই তো প্রতিটি মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। জীবনটাকে বিশাল একটা সংগ্রামক্ষেত্র বলা হয়ে থাকে। এই জীবনসংগ্রামে জয়ী হতে গেলে যে-সমস্ত আয়ুধসংগ্রহের প্রয়োজন, প্রত্যেককে নিজ নিজ ছাত্রাবস্থায়ই তা আহরণ করতে হবে। যথোপযুক্ত অস্ত্রে সজ্জিত না হয়ে এহেন রণস্থলে প্রবেশ করা মূঢ়তারই পরিচায়ক। জীবনযুদ্ধক্ষেত্রে এ আয়ুধ বা অস্ত্র কল সমাহৃত বিদ্যা, অনুশীলিত বুদ্ধি, উদ্ভিন্নমান মানসিক শক্তি, সংযম-শাসিত চরিত্রবল, প্রদীপ্ত আদর্শ, সদাজাগ্রৎ মনুষ্যচেতনা ইত্যাদি বস্তু? ছাত্রজীবন বস্তুত কঠিন নিয়মশৃঙ্খলা ও সাধনার জীবন। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে বিদ্যার্থীরা অধ্যয়নকে তপস্যা বলেই জানত, শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা ও একাগ্রতাসহকারে শিক্ষার পথে তারা এগিয়ে যেত। সেকালে ছাত্রজীবন ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত। তখন শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত গুরু খুঁজে নিয়ে, গুরুগৃহে বাস করে, দীর্ঘকাল ধরে গুরুর কাছে পাঠ নিত। তাদের কাছে অধ্যয়ন ছিল দুশ্চর একটি সাধনা। গুরুকুলে অবস্থান করে তারা একদিকে যেমন শাস্ত্রে পারংগম হয়ে উঠত, অন্যদিকে শ্রমকঠোর সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনহেতু তাদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তির সামঞ্জস্য সুন্দর বিকাশ ঘটত। সদ্গুরুর অনির্বাণ প্রেরণা একটি পবিত্র ভাবাদর্শের অভিমুখে অনুক্ষণ তাদের চালিত

করত। গুরুকুলে অবস্থানকালে তারা শুধু বিদ্যা অর্জন করত না, কেমন করে গোটা মানুষ হয়ে উঠতে হয় তারো যথোচিত শিক্ষা পেত। এইভাবে কঠোর-সাধনালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে যথাকালে তারা সংসারী হত, তাদের সেবাধর্মী জীবনচর্যা সমাজকে কল্যাণশ্রীমণ্ডিত করে তুলত।

কিন্তু সেকাল আজ বহুদূরে অপসৃত। যুগের পরিবর্তন হয়েছে, সমাজব্যবস্থা বদলে গেছে। অধুনা নতুন কালের মানুষ নতুন শিক্ষাধারাকে—প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যাকে—গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন এসেছে বটে কিন্তু তাই বলে ছাত্রজীবনের আদর্শটি সম্পূর্ণ পাল্টে যায় নি। অধ্যয়নই ছাত্রদলের তপস্যা—একথা পুরানো হয়ে গিয়েছে বলে উপেক্ষণীয় মোটেই নয়। নিয়মিত বিদ্যাভ্যাস করবে, নানামুখী অনুশীলনের দ্বারা নিজের সুপ্ত মনুষ্যত্ব-শক্তিকে উদ্বোধিত করে তুলবে, বিবিধ চারিত্রিক গুণের অধিকারী হয়ে উঠবে—এই হল ছাত্রসমাজের কাছে সকল দেশের মানুষের প্রত্যাশিত। ভুললে চলবে না, আজকের দিনের ছাত্র আগামী দিনের দায়িত্বশীল নাগরিক, তার ভাবীজীবন বিচিত্র সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে সত্য করে তোলবার জন্যে পূর্বপ্রস্তুতি চাই। তার উপযুক্ত সময় ছাত্রজীবন। একে ভবিষ্যৎ'-এর শীর্ষদেশে আরোহণের সোপানশ্রেণী বলা যায়। মূলধন ছাড়া ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হওয়া যেমন একরূপ অসম্ভব তেমনি ছাত্রাবস্থায় যথার্থ শিক্ষা ও বিদ্যার্জন ব্যতীত কর্মজীবনে সাফল্যলাভ কিছুতেই সম্ভব নয়।

কোনো বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ প্রতিটি ছাত্রের মানসপ্রবণতা অনুযায়ী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। চিত্তপ্রবণতার সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর অনুরাগের প্রশ্নটি জড়িত। আমার ঝোঁক বিজ্ঞানের দিকে, এরূপ অবস্থায় আমাকে যদি সাহিত্যের পাঠ নিতে বাধ্য করা হয় তাহলে অনুরাগের অভাবে আমার সাহিত্যচর্চা অবশ্যই বিঘ্নিত হবে। এতে প্রত্যক্ষত আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি, পরোক্ষভাবে সমাজের ক্ষতি। বিদ্যার পরিসর অতিশয় বিস্তীর্ণ. এই বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিষয়-নির্বাচনে শিক্ষার্থীর সতর্কতা অবলম্বনই বিধেয়।

তারপর শিক্ষার্থীকে মনে রাখতে হবে, ছাত্রজীবনে অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা ভোগবিলাসিতা ইত্যাদির স্থান একেবারেই নেই। আত্মগঠন ও আত্মোন্নতি যার লক্ষ্য, অসংযত আচরণ তার অভীষ্টলাভের একান্ত প্রতিকূল। ছাত্রের থাকবে উচ্চাদর্শ ও উচ্চ-অভিলাষ, এক্ষেত্রে ফলসিদ্ধির জন্যে তন্ময়তা ও একনিষ্ঠ সাধনা অত্যন্ত প্রয়োজন। চিত্তবিক্ষেপ মানসিক অধৈর্য বিদ্যার্থীকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। ছাত্র-জীবনে আদর্শচ্যুতির মতো মারাত্মক আর-কিছু নয়। একাগ্র বিদ্যানুশীলনের জন্তে চাই প্রশান্ত পরিবেশ, সুস্থ মন, সুস্থ দেহ। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে আমাদের সমাজ-জীবনে পরিবেশগত প্রশান্তি অতিশয় দুর্লভ সামগ্রী হয়ে উঠেছে। অধুনা এদেশের ছাত্রসম্প্রদায় অধ্যয়নমুখী হতে পারছে কই? বাঙলার বিপর্যস্ত অর্থনীতি গোটা সমাজকে প্রতিনিয়ত সর্বনাশা নীতিহীনতার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কোথাও

শৃঙ্খলা নেই, নিয়মানুবর্তিতা নেই, আদর্শগত শুচিতা নেই, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নেই—সমগ্র সমাজজীবন দ্রুতবেগে ভাঙনের মুখে ধাবিত। এহেন অস্বাভাবিক একটি পরিবেশে ছাত্রদল লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে এতে বিস্মিত হবার কী আছে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও ছাত্রদের মনের ওপর নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে আজ অসমর্থ। আর, শিক্ষাগোষ্ঠীও কি তাঁদের আদর্শনিষ্ঠাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছেন? এই ব্যাধিক্লিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা কি তাঁদের কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষাবিদ্ হবার পথে প্রকাণ্ড বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়নি? অবক্ষয় যেখানে সর্বব্যাপ্ত, ছাত্রসমাজ সেখানে নিজেদের উচ্চাদর্শকে আঁকড়ে থাকবে কি করে?

তা ছাড়া আমাদের রাষ্ট্রিক জীবনে ঘুণ ধরেছে। এদেশের আর্থনীতিক ব্যবস্থা যেমন বিপর্যস্ত তেমনি রাজনীতিক জীবন আবিলতায় অত্যন্ত দূষিত হয়ে উঠেছে। আমাদের ছাত্রসম্প্রদায়ও আজ ঘুরপাক খাচ্ছে এই পঙ্কিল রাজনীতির দুষ্টবৃত্তে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে রাষ্ট্রনেতারা ছাত্রদের দলে টানেন, সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিতে তাদের আহ্বান জানান। একদিকে রাষ্ট্রব্যবস্থা শিক্ষার অনুকূল মোটেই নয়, অন্যদিকে দেশের কর্ণধারগণের কার্যকলাপ ছাত্রসমাজের পক্ষে অতীব বিভ্রান্তিকর। চতুষ্পার্শ্বের এই অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ছাত্রসম্প্রদায়কে পাঠে অমনোযোগী করে তুলছে, তাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় উস্কানি দিচ্ছে, বিদ্যায়তনগুলিকে নোঙ্‌রা পলিটিক্সের ডিপো করে তুলতে সাহায্য করছে। বিদ্যানিকেতন প্রত্যহ যদি পলিটিকাল শ্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে তবে বেচারি সরস্বতী দেবীর ঠাঁই হবে কোথায়? সরস্বতীপূজা আর রাজনীতিচর্চা কি একসঙ্গে হতে পারে?

ছাত্রসম্প্রদায়কে আজ উপলব্ধি করতে হবে সক্রিয় রাজনীতি বয়স্ক মানুষেরই চর্চার একটি বিষয়, এই জটিল ও কুটিল পথে তারা যেন পদক্ষেপ না করে। সুবিধে হলে, সময় থাকলে, রাজনীতি বিষয়ে জ্ঞান তারা অবশ্যই আহরণ করবে; কিন্তু জাতীয় জীবনের দারুণ সংকটকাল ব্যতীত অন্যকোনো সময়ে রাজনীতি নিয়ে তারা যেন মেতে না ওঠে। অপটু হাতে রাজনীতির নৌকা চালাতে গেলে ভরাডুবিরই সমূহ সম্ভাবনা। ফাঁকে ফাঁকে ছাত্রদল সমাজের বিবিধ সেবাকর্মে এগিয়ে আসতে পারে, সামাজিক দুর্নীতির সোচ্চার প্রতিবাদ তারা জানাতে পারে, অহিংস উপায়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে পারে। এ ছাড়া, নিজেদের সীমায়িত গণ্ডী যেন তারা লঙ্ঘন না করে। প্রধানত গঠন, আহরণ, সঞ্চয়ের দিকেই ছাত্রদলের দৃষ্টি থাকবে স্থিরবদ্ধ। অন্যথায় তাদের ভিৎ কাঁচা থেকে যাবে, ফলে ভবিষ্যতে আমরা পাব অদূরদর্শী দেশনেতা, স্বল্পবিদ্যাসম্বল শিক্ষাবিদ্, জ্ঞানবুদ্ধিহীন রাষ্ট্রপরিচালক, অকুশলী কর্মী। তরুণ ছাত্রসম্প্রদায় দেশে ও জাতির ভবিষ্যতের আশাভরসার স্থল, তারা যথার্থ মানুষ হয়ে না উঠলে ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার। দেশের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা যদি থাকে তবে ছাত্রদল নিজেদের দায়িত্ববিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে বাধ্য।

ছাত্ররা হবে শ্রদ্ধাবান, তাদের থাকবে অধ্যবসায়, আত্মপ্রত্যয়, অদম্য জ্ঞান-

পিপাসা, তারা করবে মনুষ্যত্ব অর্জনের সাধনা। সাধনার অভাবে সাধ্যবস্তু তাদের নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে, কেবল অপচয় শক্তির, সময়ের, অর্থের। এতরকমের অপচয় যেখানে সেখানে প্রতিভার সম্যক বিকাশ অসম্ভব, বলতে হবে। বাঙালি ছাত্রের কথাই বলি। আজ তাদের যে এতখানি অবনতি তার কারণ প্রতিভার অভাব নয়; বাঙালির আর্থিক অসচ্ছলতা কিংবা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিও তার প্রধান হেতু নয়; আসল কথা হল, ছাত্রসমাজ নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে ফেলেছে, সাধনার সামগ্রীকে সহজলভ্য বস্তু বলে জেনেছে। তাদের অধিকাংশের মধ্যে বিদ্যার্থীর মনোভাব নেই বললেই চলে। এদেশের বর্তমান ছাত্রসমাজের অধোগামিতার জন্যে চারদিককার পরিবেশই দায়ী একথা অনেকে বলে থাকেন। আমরা কিন্তু বলতে চাই, এই অবনতির জন্যে ছাত্রসম্প্রদায় নিজেরাও কম দায়ী নয়। শ্রমকাতরতা, আরামপ্রিয়তা, চিত্তের বিলাসপ্রবণতা কাটিয়ে উঠে কঠোর সংকল্পের বর্মে নিজেকে আবৃত করতে পারলে প্রতিকূল পরিবেশকেও অনেকটা অনুকূল করে তোলা যায়। সেই অনমনীয় সংকল্প, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, জ্ঞানস্পৃহা আমাদের ছাত্রদের কোথায়?

সুস্থ মন না হলে জ্ঞানের সাধনা চলতে পারে না। আবার, সুস্থ মনের জন্যে চাই সুস্থ দেহ। সুতরাং ছাত্রসমাজকে স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে, বিদ্যা চর্চার সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চাও অত্যাবশ্যক। নিয়মিত ব্যায়াম, খেলাধুলা দেহকে নিরোগ রাখে, অনাবিল আমোদপ্রমোদ মনের প্রফুল্লতা বাড়ায়। শরীররক্ষার নিয়মগুলি ছাত্রদের যথাসাধ্য পালন করতে হবে, এবং কু-অভ্যাস ও কুচিন্তা তাদের সর্বৈব বর্জনীয়।

কেবল চিৎশক্তির স্ফুরণ নয়, হৃৎবৃত্তির জাগরণও ছাত্রদের কাছে প্রত্যাশিত। বুদ্ধি ও হৃদয় উভয়ের যুগপৎ উন্মীলনেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতর বিকাশ। প্রীতি, স্নেহ, সহমর্মিতা, দয়া, সেবা, ত্যাগ, পরোপকার প্রভৃতি মানবীয় গুণের বিকাশসাধনের দিকে লক্ষ্য রাখা ছাত্রজীবনের অবশ্যকর্তব্য। জ্ঞানবিদ্যা আহরণের সঙ্গে সঙ্গে মানবিকতার উদ্বোধন চাই। বিদ্যানুশীলনের নামে মানুষ যদি শুধু গ্রন্থকীট হয়ে ওঠে, যদি তার প্রতিবেশীর দিকে—বৃহত্তর সমাজের দিকে—না তাকিয়ে আত্মকেন্দ্রিকতারই আশ্রয় লয় তাহলে তাতে দেশের বা জাতির কী লাভ? তাই, ছাত্রজীবনে কেবল জ্ঞানের সাধনা নয়, মনুষ্যত্বের সাধনাও করতে হয়।

সংসারের গুরুদায়িত্বভার, বাস্তবের ঘাতপ্রতিঘাত, তেমন স্পর্শ করে না বলে ছাত্রজীবন নির্দ্বন্দ্ব আনন্দের কালই বটে। ছাত্ররা এসময়ে জগৎকে সুন্দর দেখে, জীবনকে মধুময় অনুভব করে, মহৎ আদর্শকে উদার আলিঙ্গন জানাতে চায়। সুচারুরূপে কর্তব্য সম্পাদনের মধ্য দিয়ে এই কালখণ্ডের প্রতিটি মুহূর্তকে সার্থক ও আনন্দময় করে তুলতে হয়। এহেন ছাত্রজীবনকে হেলায় যারা অপচিত হতে দেয় সত্যই তারা মন্দভাগ্য। ব্যক্তির ভবিষ্যতের গৌরবদীপ্ত আত্মপ্রতিষ্ঠা তার ছাত্রজীবনের ওপরেই একান্তভাবে নির্ভরশীল। এই অমূল্য সময়টির প্রতি যে উপেক্ষাপরায়ণ, অশেষ বিড়ম্বনাই সে-মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের একমাত্র সম্বল।

শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা

শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতাকে মনের একরূপ শিক্ষা বলা যেতে পারে। এরূপ শিক্ষিত মন---ব্যক্তিগত জীবনে হোক, পরিবারে হোক, সমাজে হোক কিংবা রাষ্ট্রে হোক—সুনির্দিষ্ট যে-কোনো আচরণবিধি মেনে চলতে এতটুকু দ্বিধান্বিত হয় না। শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার মর্মকথা হল আনুগত্য ; আর, এর প্রেরণামূলে সক্রিয় রয়েছে মঙ্গলবোধ। শৃঙ্খলাকে যে শৃঙ্খল বলে মনে করে, বেরোয়া মনোভাবের বশবর্তী হয়ে সর্বজনস্বীকৃত নিয়মবিধিকে যে সর্বদা ও সর্বথা অমান্য করে চলে, জীবনের কোনো ক্ষেত্রে কৃতকার্য হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। মানব-সমাজের উন্নতি বল, অগ্রগতি বল, সভ্যতার বিকাশ বল, সবকিছুর মূলে রয়েছে ব্যষ্টিমানুষ আর সমষ্টিমানুষের সুশৃঙ্খল কর্মোদ্যম। যেখানে শৃঙ্খলা নেই, নিয়মানুবর্তিতার অভাব যেখানে, সেখানে শ্রী নেই কল্যাণ নেই, আনন্দ নেই, শান্তি নেই—উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যক্তি-সমাজকে অরাজকতার ঘূর্ণাবর্তের দিকে সবলে আকর্ষণ করে।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে, পৃথিবীতে যে সকল জাতি উন্নতির সমুচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে তাদের জীবনধারা কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা বা বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রাচীন ভারতীয় আর্যসমাজের শৃঙ্খলাবোধের কথা কার না বিদিত? অতীতকালের স্পার্টাদেশবাসীর শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মনিষ্ঠার কাহিনী প্রবাদে দাঁড়িয়ে গেছে। উন্নত জাতি হিসেবে স্পার্টানদের গৌরবমহিমা একদা বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা জানত, নিয়মশৃঙ্খলার শাসন মানুষের শক্তিতে অপচিত হতে দেয়না, নির্ধারিত নিয়ম মেনে কাজ করলে তার ফলসিদ্ধি নিঃসংশয়িত। পাশ্চাত্যদেশের জাতিগুলির জনবল যে খুব বেশি এমন নয়, অথচ পৃথিবীর ওপর তারা আজ কতখানি আধিপত্য বিস্তার করেছে। ব্রিটেনের ভৌগোলিক আয়তন কতটুকু? কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার, বিশাল ভারতবর্ষ প্রায় দু'শ বছর কাল ব্রিটিশজাতির পদানত ছিল। এরূপ একটি আশ্চর্য ঘটনা কী করে ঘটল? এর একমাত্র উত্তর—ব্রিটিশের Organisation of man-power। সুসমঞ্জস শৃঙ্খলা গোটা ব্রিটিশজাতিকে প্রচণ্ড শক্তিমান একটি যন্ত্ররূপে গড়ে তুলেছে—প্রণালীবদ্ধ কার্যধারা তার সকল শক্তির উৎস।

নিখিল বিশ্বসৃষ্টি নিয়মের রাজত্ব বলেই তার অস্তিত্ব অদ্যাপি অক্ষত রয়েছে। নিসর্গসংসারে 'উঠিলেও নিয়ম, মানিলেও নিয়ম, স্থির থাকিলেও নিয়ম'। প্রাকৃত জগতে কোনক্রমেই নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম হতে পারে না। সভ্যতার পথে ক্রমঅগ্রসরমান মানুষও তার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করছে, কঠিন নিয়মের বাঁধনে বাঁধতে না পারলে পরিবারে ভাঙন ধরে, সমাজ টেঁকে না, রাষ্ট্র বিপর্যস্ত হয়,

প্রতিষ্ঠান কিংবা যৌথজীবন অচল হয়ে পড়ে। নিয়মশৃঙ্খলা যে কার্যসাধিকা এ সত্যটি মানুষকে তার বাস্তব অভিজ্ঞতারই দান। সভ্যতা যতই প্রসার লাভ করেছে মানুষের সামাজিক আচরণবিধি ততই বিশিষ্টরূপ পেয়েছে। অসভ্য, অর্ধসভ্য এবং সুসভ্য সমাজের চেহারাটি সঠিক চিনে নিতে পারা যায় সেই-সেই সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা লক্ষ্য করে। জনগোষ্ঠীর সুশৃঙ্খল কার্যক্রম তার উন্নত সভ্যতার পরিচয়বাহী।

নিয়মানুগত্যের অভাব ঘটলে—শৃঙ্খলারক্ষা করে না চললে—সমস্ত কাজ যে কী রকম পণ্ড হয়ে যায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিচ্ছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রছোট বহুতর ঘটনা। রেলে-স্টীমারে, ট্রাম-বাসে, খেলার মাঠে, সিনেমা-ঘরের সম্মুখে একসঙ্গে অসংখ্য লোক ভীড় জমায়, তখন অবস্থাটা কীরূপ দাঁড়ায়? তখন টিকেট কিনতে গিয়ে জামা ছেঁড়ে, জুতো হারায়, মনিব্যাগ কোথায় উধাও হয়ে যায়; যাত্রীবাহী যানগুলিতে ওঠা-নামার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলতার জন্যে মানুষকে কী হয়রানিই-না সহ্য করতে হয়। এসব জায়গায় আত্যন্তিক স্বার্থপরতা না-দেখিয়ে, একটুখানি ধৈর্য ধরে, নিয়মরক্ষা করে যদি চলি তাহলে নানান ক্ষয়ক্ষতি হতে সকলেই বাঁচতে পারে। শিক্ষার অভাবে অর্থাৎ অনভ্যস্ততার জন্যে শৃঙ্খলাবোধ আমাদের নেই বললেই চলে। শৃঙ্খলারক্ষা করতে গেলে নিয়মের শাসন মানতে হয়, কিছুটা আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন হয়। অহংমুখী জীবনদৃষ্টি, সমাজবোধের অভাব শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অত্যন্ত বিরোধী। অপরের সুখসুবিধার দিকে এতটুকু দৃকপাত না করে প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠে তাহলে বৃহত্তর সমাজজীবনে বিপর্যয় দেখা না-দিয়ে পারে না।

আরো দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তি এক-একজন কর্তা সেজে বসলে, নিজ নিজ রুচিপ্রকৃতিকে প্রাধান্য দিলে, সংহতি হারিয়ে পরিবারটি কি অল্পকালের মধ্যে ভেঙে পড়বে না? দল বেঁধে খেলতে নেমে খেলোয়াড়েরা ব্যক্তিগত কেরামতি দেখাতে গেলে সেই দলের পরাজয়বরণ কী অনিবার্য নয়? রণক্ষেত্রে সৈন্যদল সেনাধ্যক্ষের আদেশ-নির্দেশের প্রতি উপেক্ষা দেখালে যুদ্ধ জয় কি কখনো সম্ভব হতে পারে? কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায় সেনাবাহিনীর মধ্যে। এখানে আনুগত্যস্বীকার যে করবে না তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদল অদ্ভুত শৃঙ্খলা মেনে চলে। সেনাপতির আদেশ তাদের কাছে অলঙ্ঘ্য। শৃঙ্খলাবিরহিত সেনাদল উদ্‌ভ্রান্ত জনতা ছাড়া আর কী?

কোনো প্রতিষ্ঠান গড়তে গেলে কয়েকটি বিধিনিয়ম চাই এইসব বিধিবিধান উপেক্ষিত হলে ওই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। বিদ্যায়তনে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের আদেশ মান্য করে চলবে, নিজেদের আচরণকে শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত করবে কোনোরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখাবে না এই প্রত্যাশা করা যায়। এর অন্যথাচরণ করলে শিক্ষানিকেতনে জ্ঞানবিদ্যার অনুশীলন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ব্যক্তিগত জীবনেও শৃঙ্খলার সমান গুরুত্ব। ব্যক্তির দৈহিক, নৈতিক আধিমানবিক, আধ্যাত্মিক—সর্বক্ষেত্রে উন্নতির জন্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন অত্যাবশ্যক।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মভঙ্গ করলে দেহ রোগাক্রান্ত হবেই, আত্মসংযমে অসমর্থ হলে মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়বেই, এর ফলে নৈতিক চরিত্রের অবনতি অনিবার্য। বিক্ষিপ্ত মনকে যদি শাসনে বাঁধতে না শিখি তাহলে বিদ্যাচর্চা কী করে সম্ভব হতে পারে? মনের শান্তিস্বস্তিই বা থাকে কোথায়? যে-মানুষ অধ্যাত্মমার্গে পদক্ষেপ করবার অভিলাষী, কঠোর আত্মশাসনের মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হবে। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্যে প্রথমে চাই দেহ, পবিত্র মন, অসংযত জীবনচর্যায় পবিত্রতার স্থান হতে পারে কি? সামাজিকের আচরণবিধিকে তার স্বভাবের অঙ্গীভূত করা ছাড়া মঙ্গলধন্য জীবনের ভিত্তিরচন কদাপি সম্ভব নয়।

অনেককে বলতে শুনি, নিয়মশৃঙ্খলার কাছে আত্মসমর্পণ সাধারণ স্তরের মানুষের জন্যে; যাঁরা প্রতিভাধর, বিধিবিধানের আনুগত্য স্বীকারের আবশ্যকতা তাঁদের নেই। এরূপ ধারণা কিন্তু ভ্রান্তিমূলক। কয়েকজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি নিজেদের জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে বন্ধন-অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন একথা সত্য। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে এঁদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, যে-যে বিশেষ ক্ষেত্রে এঁরা স্মরণীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন সেইসব ক্ষেত্রে প্রত্যেকে শৃঙ্খলারক্ষা করেই চলেছেন। কবি মধুসূদন দত্তের উদ্দামতা ও অমিতাচারের কথা সকলেই বিদিত। কিন্তু যখনই তিনি নিজেকে স্রষ্টার আসনে বসিয়েছেন তখন তাঁর অন্তরতর কবি-পুরুষটিকে ধ্যানতন্ময় রেখেছেন। শ্রীমধুসূদনের সারস্বত সাধনা সত্যই বিস্ময়কর। মাইকেলের কবিজীবনকে তাঁর ব্যক্তিজীবন হয়ে অনায়াসে আলাদা করে নেওয়া যায়। সুতরাং কোনো-না কোন প্রকারের নিয়মের বাঁধন সকলের জন্যেই, কারণ, স্বেচ্ছাচার সৃষ্টির নিয়মবহির্ভূত।

সমাজ ও রাষ্ট্রের নির্ধারিত বিধিনিয়ম অনুযায়ী নিজের আচরণাদির নিয়ন্ত্রণকে দাসত্ব মনে করার সংগত কোনো হেতু নেই। যেখানে নিছক একের কিংবা মুষ্টিমেয় কতিপয় মানুষের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে—নিশ্চিত শাসনপীড়নের ভয়ে—বাধ্য হয়ে কোনো বিধিনিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় সেইখানেই দাসত্বের প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু যেখানে সমষ্টির কল্যাণে শৃঙ্খলা মেনে চলি, নিয়মের অনুগত হই, সেখানে ওই প্রশ্ন উঠতেই পারে না। সমাজের বিধিনিষেধ তো আমাদের নিজেদেরই গড়া। নিয়মবন্ধন এখানে শক্তির উৎস, শান্তির উৎস, বহুমুখী কল্যাণের উৎস। শৃঙ্খলার পরেই তো আমাদের ভিতরকার নিত্যকারের পশুটাকে সংযত রাখতে হয়, না হলে আমরা যে নিজেদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারি না। আত্মসংযম শিক্ষা করেই মানুষ সত্যকার মানুষ হয়েছে।

শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা দীর্ঘকালের শিক্ষাসাপেক্ষ। অভ্যাস ব্যতিরেকে কেউ নিয়মশৃঙ্খলানিষ্ঠ হতে পারে না। অভ্যাসকে মানুষের দ্বিতীয় স্বভাব বলা হয়। অভ্যাসের ফলে বিধিবিধানের প্রতি সহজ আনুগত্য মানুষের স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়, পরে এর জন্যে আর স্বতন্ত্র প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। কোনোকালেই যে মানুষ নিয়মের শাসন মানেনি, অকস্মাৎ একদিন সে শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়ে উঠবে

এ অবিশ্বাস্য। নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে যাদের শৈশব-কৈশোর গড়ে ওঠে তারাই ভবিষ্যতে একদিন সুনাগরিক হয়, তারাই সমাজের কাজে লাগে। ব্যক্তিস্বার্থরক্ষার জন্যেও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে তাকাতে হয়। প্রত্যেকটি ব্যক্তি সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করলে সমষ্টির এই বড়ো স্বার্থ বিঘ্নিত হয় না, ফলে সমাজের উন্নতি অব্যাহত থাকে।

শৃঙ্খলাশিক্ষার প্রশস্ত সময় ছাত্রাবস্থা। এই সময়েই সকলে নিজেকে শাসন করতে শিখবে, সংযমী হবে, প্রয়োজন হলে অকুণ্ঠ চিত্তে ত্যাগ স্বীকার করবে। পরিবারে গুরুজনের, বিদ্যালয়ে শিক্ষকের, খেলার মাঠে দলপতির আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার অভ্যাস করলে নিয়ম ভাঙার প্রবৃত্তি অবশ্যই দমিত হবে। জীবনের সফলতা অর্জনের বড়ো একটি উপায় নিজের আচরণকে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার বশে রাখা। আপাত-দৃষ্টিতে যে-কোনো বন্ধন বিরক্তিকর, কিন্তু পরিণাম লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায়, তা কল্যাণপ্রসূই হয়েছে। বন্যার জল চতুষ্পার্শ্বের জনপদের নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর; কিন্তু ওই জলপ্রবাহকে বাঁধের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করে যখন ফসল ফলানোর কাজে লাগানো হয় তখন দেশ শস্যশ্যামল হয়ে ওঠে। তেমনি, সমাজের সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধির জন্যে চাই জনগোষ্ঠির শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যধারা। প্রাজ্ঞজনের এই উক্তিটি আমরা সকলে যেন মনে রাখি—'Discipline means success, anarchy means ruin'। আর প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্মর্তব্য—He that ruleth his spirit is greater than he that taketh a city'।

উপন্যাসপাঠ কি সময়ের অপচয়-মাত্র

উপন্যাসপাঠ সময়ের অপব্যয় ছাড়া আর-কিছু নয় এ অভিমত আমার মনে প্রতিবাদস্পৃহা জাগায়, একে আমি সত্য বলে মেনে নিতে পারি না। নিজ অভিজ্ঞতার কথাই বলছি। এযাবৎ আমি অনেকগুলি উপন্যাস পড়েছি, অন্তত তিরিশ-চল্লিশের কম নয়—বাঙ্‌লা এবং ইংরেজি। প্রখ্যাত ও স্বল্পখ্যাত লেখকের লেখা এসব বই আমার মনোলোকে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছে এরূপ আমি অদ্যাপি অনুভব করিনি। বরং বলতে হয় এতে আমি উপকৃতই হয়েছি। এখানে কেউ কেউ বলতে পারেন, উপন্যাসপাঠজনিত এই উপকার একান্ত ব্যক্তিগত, আর-দশটি ক্ষেত্রে এ সত্য নাও হতে পারে। উত্তরে আমি বলব সামাজিকের মনে সাহিত্যের প্রতিক্রিয়া ও আবেদন অনেকটা সার্বজনীন। সাহিত্যাদি শিল্পের একটি বড়ো গুণ যে সার্বজনীনতা এ তো একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। তাই যদি হয় তাহলে আমার উপলব্ধি ও ধারণাকে একেবারে ব্যক্তিক বলে অবশ্যই উড়িয়ে দেওয়া চলবে

না। উপন্যাসপাঠের যে যথেষ্ট সার্থকতা রয়েছে তা আমি এখানে বোঝাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

কিছুকাল পূর্বেও প্রাচীনপন্থীদের কাছে উপন্যাসপাঠ নিন্দিত হয়েছে। গুরুজনদের সামনে উপন্যাস পড়াটা এখনো কোথাও কোথাও অপরাধ বলে গণ্য হয়। একে গোঁড়ামি বা দৃষ্টির সংকীর্ণতা ছাড়া কী বলা যায়? উপন্যাসজাতীয় সাহিত্যকর্মের প্রতি এঁদের এহেন বিরূপ মনোভাবের একটা সম্ভাব্য হেতু অবশ্য নির্দেশ করা চলে। বেশিরভাগ পাঠকের রুচি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুশীলিত নয়। জীবনজিজ্ঞাসা বলে কোনো বস্তু তাদের নেই, তেমন রসবোধের পরিচয়ও তাদের মধ্যে মেলে না। যে-কোন আখ্যান-উপাখ্যান-কাহিনী হলেই তাদের চলে, সাধারণ স্তরের মানুষের গল্পপাঠের তৃষ্ণা এতেই মেটে। সাহিত্যের ভালোমন্দ বিচারের সামর্থ্য এদের নেই। তাই, প্রায়শ দেখতে পাওয়া যায়, রোমাঞ্চকর আখ্যায়িকা, খেলো রোম্যান্স, সস্তা গোয়েন্দা কাহিনী যা-কিছু হাতের কাছে পায় এরা গোগ্রাসে গেলে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এজাতের বইয়ের সঙ্গে উচ্চতর সাহিত্যশিল্পের এতটুকু সামিপ্য নেই, এগুলি দায়িত্বহীন লেখকের অতিশয় নিকৃষ্টশ্রেণীর রচনা—বাস্তবতা-বিরহিত, সৌন্দর্যলেশশূন্য, রুচিবোধহীন প্রগলভতায় পূর্ণ। উত্তম সাহিত্যকৃতির সঙ্গে যারা অপরিচিত, সময় যাদের কাটে না, উৎকৃষ্ট রসের সন্ধান যারা কখনো পায়নি, উপরে-কথিত গল্পকল্প কথা তাদেরই অভিলষিত বস্তু। বোধ করি, রক্ষণশীল প্রবীণেরা এই জাতের রচনাকেই উপন্যাস বলে মনে করে থাকেন। এসব বইয়ের পাঠক অবশ্যই তিরস্কারযোগ্য। কারণ, এতে সময়ের অপচয় হয় মাত্র, এর বিন্দুমাত্র ইষ্টকারিতা নেই। উৎকৃষ্ট উপন্যাসসাহিত্য কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। পরিণত বয়সের মানুষ যে-কোনো ভালো উপন্যাস পড়ে উপকৃত হবেন একথা জোর করে বলা যায়।

ভালো উপন্যাস কাকে বলি? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আগে আমাদের জানতে হবে উপন্যাস-নামীয় সামগ্রীটা কী। এর যথার্থ সংজ্ঞানির্ধারণ করা একটু কঠিন—মোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়া যায় মাত্র। উপন্যাসে বিচিত্র-ঘটনা-সংবলিত দীর্ঘায়ত একটি কাহিনী থাকে। এই ঘটনাপরম্পরায় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কয়েকটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়। প্রত্যেকটি চরিত্র নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে প্রেক্ষণীয়। মানবজীবনের রহস্যউন্মোচন, মানবভাগ্যের রূপায়ণ, দুর্জ্ঞেয় নিয়তিলীলার চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি বস্তু উপন্যাসে প্রাধান্য পায়। উপন্যাস আমাদের সকলেরই পরিচিত চতুষ্পার্শ্বের চলমান সংসার-সমাজকেই নিজের কায়ায় প্রতিফলিত করে। সমাজের বাস্তব মানবমানবীর কামনাবাসনা, আশানৈরাশ্য, হাসিঅশ্রু, মিলনবিরহ, নানান্ প্রবৃত্তির ঋজু-তির্যক প্রকাশ নিয়েই উপন্যাসের কারবার। উপন্যাসে যে-কাহিনী বিবৃত হয় তা বাস্তবে ঠিক না ঘটলেও তা আমাদের প্রতীতিকে লঙ্ঘন করে না। কারণ, উপন্যাসকারের লিপিচাতুর্য পাঠকের মনে এমন একটা বিশ্বাস উৎপাদন করে যে, প্রাত্যহিক সংসারে এ ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে। চরিত্রগুলি কাল্পনিক হলেও লেখকের বাস্তবচিত্রণের গুণে এদের আমরা প্রত্যক্ষ, জীবন্ত, একান্ত চেনা

বলেই মনে করে থাকি। একেই বলে আর্টের যাদু, যার ফলে ক্ষণকালের জন্যে 'the willing suspension of disbelief' সম্ভব হয়। উপন্যাসের মধ্যে কল্পনার স্থান থাকলেও কাল্পনিকতা এখানে প্রশ্রয় পায় না, রূপকথার অসম্ভবের রাজ্যে পাঠককে নিয়ে যাওয়া ঔপন্যাসিকের কাজ নয়। মানুষের জীবনবৃক্ষের উচ্চশাখার ফুল থেকে আরম্ভ করে এর ডাল-পাতা-কাঁটা পর্যন্ত খাঁটি উপন্যাসের পাতায় প্রতিবিম্বিত। এতে সমাজের বহুমুখী সমস্যা আলোচিত হয়, নীতি-ধর্ম প্রভৃতি বস্তু এসে ভিড জমায়, এখানে নরনারীর জীবনবৃত্তের পূর্ণাঙ্গ বা খণ্ডিত রূপ সকলেই চাক্ষুষ করতে পারে। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে উপন্যাসের নির্বাধ সঞ্চরণ। মানুষের কথা শুনতে মানুষমাত্রেই কৌতূহলী। উপন্যাস আমাদের চিত্তের সদাজাগ্রত এই কৌতূহল নিবৃত্ত করে।

এখন, কোন্ উপন্যাস সুলিখিত, কোন্ উপন্যাস শিল্পসৃষ্টিহিসেবে নিকৃষ্ট তা আমরা সহজে বুঝে নিতে পারব। উত্তম উপন্যাসে বিশ্বস্ত জীবনচিত্র থাকবে, এতে বর্ণিত প্রত্যেকটি ঘটনা পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত হবে, এবং এদের সাহায্যে চরিত্রগুলি বিকাশমান হয়ে উঠবে। ভাবগত আভ্যন্তর ঐক্য এবং বাইরের আঙ্গিকগত ঐক্য উপন্যাসের শিল্পসিদ্ধির জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এখানে কাহিনীর পরিণামকে অনিবার্য হতে হবে। উপন্যাস কেবল বিশুদ্ধ আর্টের বস্তুরূপেই বিচার্য নয় মানব-জীবনের মূল্যবান ভাষ্যরূপেও গল্প আখ্যায়িকাগুলি পঠিতব্য। 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্' নীতি অনুসরণ করে হয়তো 'good novel' রচনা করা যায় ; কিন্তু সমুচ্চ ভাব ও ভাবনাকে বাদ দিয়ে, 'কেবল সৌন্দর্যসৃষ্টির অভিপ্রায় নিয়ে 'great novel' রচিত হতে পারে না বলেই আমাদের ধারণা। মহৎ উপন্যাস পাঠককে জীবনরহস্যের গভীরে আকর্ষণ করে, মনের রুদ্ধ দুয়ারগুলি খুলে দেয়। যে-আখ্যায়িকায় মানব-মানবীর অন্তরের বিচিত্র ভাবের সংঘাত নেই, চরিত্রগুলি অপরিস্ফুট, লেখনভঙ্গি দুর্বল, মানুষের শাশ্বত সমস্যার মূলে অবগাহনের কোনো প্রয়াস নেই, তাকে উত্তম সাহিত্যকর্মের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে না। কেবল অবসরযাপনের জন্যে উপন্যাসের সৃষ্টি নয়। তার মহত্তর উদ্দেশ্য রয়েছে। উৎকৃষ্ট উপন্যাস যেমন চিত্তবিনোদন করে তেমনি চিত্তবৃত্তির স্ফুরণ ঘটায়, মানবমনকে এক উচ্চতর ভূমিতে উত্তীর্ণ করে দেয়।

ভালো উপন্যাসপাঠের উপকারিতা অবশ্যস্বীকার্য। বাস্তব সংসারে আমরা সকলে সাধারণত একটা সীমিত গণ্ডির মধ্যেই বিচরণ করি। এখানে যে-সব মানুষের সঙ্গে প্রতিদিন আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয় তাদের মধ্যে অনন্যসাধারণতা তেমন চোখে পড়ে না, প্রাত্যহিকতার গণ্ডিতে বহুবিচিত্রের সন্ধান মেলে না। কিন্তু ঔপন্যাসিকের কল্পিত সংসারে আমরা কত বিচিত্র চরিত্রের সংস্পর্শে আসি, ভালোমন্দ অসংখ্য নরনারীর সঙ্গে পরিচিত হই। এদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অতিশয় প্রেক্ষণীয়। এতসব মানুষের আচার-আচরণ, রীতিনীতি দেখে আমাদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়ে। লোকচরিত্রবিষয়ে এই অভিজ্ঞতা-অর্জন কম লাভের বস্তু নয়। উপন্যাসে আমরা বাস্তবজীবনের সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াই এবং এসব সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিতও এখানে

মেলে। এই ইঙ্গিত আমাদের চিন্তাধারাকে নতুন পথে পরিচালিত করে। উপন্যাসের মাধ্যমে দ্বন্দ্বজটিল মানবসংসারের সঙ্গে ব্যাপক পরিচয় সমাজে আমাদের সচেতন পদক্ষেপের ক্ষেত্রে অবশ্যই সহায়ক। পৃথিবীর কঠিন বাস্তবকে সমক্যরূপে চিনতে হলে উপন্যাসের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমাদের দৈনন্দিন জগৎটি তেমন প্রশস্ত নয়। একে ছাড়িয়ে জনাকীর্ণ, বহুসমস্যাকণ্টকিত যে একটা বিশাল পৃথিবী রয়েছে তা আমরা যথার্থ উপলব্ধি করি উপন্যাস পড়ে। সুতরাং বলতে হয়, উপন্যাস আমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা ঘুচায়, এর সম্মুখে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে ধরে।

রহস্যময় মানুষের মন, বঙ্কিম তার গতি। মানবমনের এই মহা সমুদ্রে অনুক্ষণ কত ভাবের উদয়বিলয় ঘটছে, প্রতিনিয়ত কত প্রবৃত্তির খেলা চলছে। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি-প্রদীপের আলোকরেখা অনুসরণ করে মানুষের মনের জটিল রাজ্যে অবলীলায় ঘুরে বেড়াতে আমরা সমর্থ হই। এর জন্যে মনস্তত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না। উপন্যাসকে অনেকেই লঘুকল্পনাবিলাস বলে জানেন। এরূপ একটি ধারণা কিন্তু ভ্রান্তিমূলক। উপন্যাস বাস্তব জীবনেরই বিন্যস্ত আলেখ্য। শক্তিমান লেখকের হাতে মানবজীবনকেন্দ্রিত নিয়তিলীলা, অমোঘ নীতিবিধান, বিচিত্র প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বসংঘাত যে-কারামূর্তি পরিগ্রহ করে তা চাক্ষুষ করে আমরা কখনো বিস্মিত হই, কখনো বিমূঢ় হই, কখনো স্তম্ভিত হই। উপন্যাসপাঠ ব্যতীত জীবনের অতলস্পর্শ গভীরতায় আত্মনিমজ্জন একরূপ অসম্ভব; আবার, উপন্যাসপাঠ একহিসেবে আত্মসাক্ষাৎকারও বটে—পরের মধ্য দিয়ে নিজেকে চিনে লওয়া।

ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করে সর্বদেশে উপন্যাস রচনার প্রথা আছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস দূরযানী কল্পনার সহযোগে সন-তারিখ আর শুষ্ক ঘটনাপঞ্জীতে প্রাণসঞ্চার করে। ইতিহাস পাঠ করে অনেক সময় আমরা যুগবৈশিষ্ট্যকে সঠিক চিনে নিতে পারি না, তৎকালীন লোকসাধারণের জীবনযাত্রার চেহারাটি ঠিক ঠিক ধরতে পারি না—অতীতের সবকিছু কেমন যেন কুহেলিকা-আচ্ছন্ন মনে হয়। কিন্তু উপন্যাসের পৃষ্ঠায় যখন এই অতীতকে প্রতিবিম্বিত দেখি তখন কোনো একটি পর্বের জীবনযাত্রা-প্রণালী তার রক্তরঞ্জিত প্রত্যক্ষতা নিয়ে আমাদের সম্মুখে যেন একেবারে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠ করে যে-কোনো কেউ উপকৃত হবেন একথা নিশ্চিত সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, স্কট, ডুমা প্রমুখ ঔপন্যাসিকের নাম এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু অতীতের নয়, ভাবী মানবসমাজের মনোজ্ঞ কাল্পনিক চিত্রও উপন্যাসকার আমাদের হাতে তুলে ধরেন। প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক এইচ. জি. ওয়েলস্ আর আল্ডুস হাক্সলির নাম এস্থলে বিশেষভাবে স্মর্তব্য। হাক্সলি তাঁর 'Brave New World' গ্রন্থে ভবিষ্যতের আবরণ কেমন সুন্দর উন্মোচন করেছেন।

উপন্যাসের মনোরঞ্জনক্ষমতা অসামান্য তো বটেই; আরো বড়ো কথা হল লোকশিক্ষণ ও প্রচারকর্মের অতিশয় উল্লেখ্য একটি মাধ্যম এই উপন্যাস। অবশ্য মনে

রাখতে হবে, উপন্যাসে যে-প্রচারধর্মিতা থাকে তা গোপনচারী, কিন্তু তার ক্রিয়াশীলতা গূঢ়সঞ্চারী ও দূরপ্রসারী। মানুষের সামাজিক ইতিহাসে সাহিত্যের প্রভাব যেমন গভীর তেমনি ব্যাপক। দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নাটক 'নীলদর্পণ' একদা আমাদের সমাজে কী প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা অনেকেরই জানা আছে। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' বইখানি থেকে আমরা পেয়েছি জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের দীক্ষা। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' গ্রন্থটিকে ইংরেজ-সরকার দীর্ঘকালের জন্যে কেন বাজেয়াপ্ত করেছিল তা কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না। ইংরেজ-ঔপন্যাসিক চার্লস্ ডিকেন্সের কয়েকটি আখ্যায়িকা সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে খুব বড়ো একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাঁর লিখিত 'Oliver Twist', 'Little Dorrit', 'Nicholas Nickleby' প্রভৃতি গ্রন্থ ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বহুতর দোষত্রুটি উদ্‌ঘাটিত করে দেখবার ফলে ওদেশের লোক এসব ক্ষেত্রে সংস্কারসাধনে ব্রতী হয়েছিল। শ্রীমতী Stowe-এর বহুখ্যাত 'Uncle Tom's Cabin' প্রকাশিত না হলে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথার উচ্ছেদ হত কিনা, সন্দেহ। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার কারাব্যবস্থার কুশ্রীতা ও কদর্যতার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল চার্লস রীডের লেখা 'Never Too Late to Mend' উপন্যাসটি। আরো অনেক বইয়ের নামোল্লেখ করা যায়, কিন্তু তার প্রয়োজন দেখি না।

উপরে যা বলা হল তার থেকে সহজে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, মানুষের জীবনে ও সমাজে উপন্যাসের প্রভাব সামান্য নয়। আমাদের বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ে আমরা কেবল আনন্দ পাই না, এঁদের উপন্যাসাবলীতে শিক্ষারও প্রভূত খোরাক রয়েছে। উপন্যাসে শিক্ষা ও আনন্দ উভয়েই একাধারে লভ্য।

উত্তম উপন্যাসপাঠের ভালো দিকটিতে স্বীকৃতি জানাতেই হয়। এতে যেটুকু সময় ব্যয়িত হয় তাকে অপচয় কিছুতেই বলা চলে না। তবে নিকৃষ্টশ্রেণীর উপন্যাস-পাঠের অনিষ্টকারিতা রয়েছে একথাও স্বীকার্য। এসব বই পাঠকের রুচির বিকৃতি ঘটায়, তার চিত্তকে রুগ্ন করে তোলে। এমন অনেক উপন্যাস রয়েছে যেগুলি উদ্দেশ্যহীন, যার মধ্যে উচ্চতর কোনো রসের আবেদন নেই। বাস্তববাদ [Realism] ও প্রকৃতিবাদের [Naturalism] নামে এসব বই নরনারীর স্থূল লালসার চিত্রই কেবল উন্মোচন করে—এখানে ইন্দ্রিয়জ বাসনার বহ্ন্যুৎসব সৃষ্টি করাতেই লেখকের অশেষ উৎসাহ। এজাতের আখ্যায়িকা সাহিত্য-নামের অযোগ্য, এবং একারণে সকলের পরিত্যাজ্য। যে-উপন্যাসে জীবনজিজ্ঞাসা নেই, সামাজিক সমস্যার আলোচনা নেই, মানবের মনোলোকের রহস্য সন্ধানের প্রয়াস নেই, যা মানুষের নীচ প্রবৃত্তিকেই কেবল জাগরিত করে সেই উপন্যাসপাঠ সময়েরই শুধু অপচয় নয়, মানসিক অসুস্থতারও নিদান বলে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এসকল নিকৃষ্ট রচনাকে সর্বতোভাবে বর্জন করাই বিধেয়।

উপন্যাস যতই উৎকৃষ্ট হোক একে সর্বক্ষণের সঙ্গী করা অকর্তব্য। সদাসর্বদা

উপন্যাসপাঠের একটি অপকারিতা এই যে, এতে গভীর-মননশীলতাপূর্ণ গ্রন্থঅধ্যয়নের ক্ষমতা নষ্ট হয়, কর্মোদ্যমে শিথিলতা আসে; ঔপন্যাসিকের কল্পজগতে সতত বিহরণ মানুষকে বাস্তব জগৎ হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসে। রোম্যান্টিক নভেল পড়ে পড়ে তার যাদুময় প্রভাবে আমরা সকলে যদি নভেলে-বর্ণিত নায়কনায়িকা সেজে বসি তাহলে বাস্তব সংসারের অবস্থাটি কী হবে? উপন্যাস অবশ্যই পড়ব কিন্তু অবসর মুহূর্তে। দেখতে হবে, উপন্যাসপাঠ নেশায় যেন পরিণত না হয়। নেশার বস্তু নেশাই শুধু বাড়ায়, পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের প্রবৃত্তি কমিয়ে দেয়। এও মনে রাখতে হবে যে, সকল বয়সের জন্যে সকল রচনা উপযোগী নয়। অপরিণত মনের পাঠক আর পরিণত বয়স্ক পাঠকের ভিন্ন জাতীয় উপন্যাসপাঠের ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয়। বয়স-অনুযায়ী সত্যকার ভালো উপন্যাস নির্বাচন করে পাঠ করলে তার সুফল হতে কেউ বঞ্চিত হবে না এই আমাদের সর্বশেষ বক্তব্য।

একটি কথা বলা হয়নি। বাঙ্‌লা ভাষার ওপর যে-টুকু অধিকার আমার জন্মেছে তা আমাদের খ্যাতনামা উপন্যাসকারগণের লিখিত আখ্যায়িকা অধ্যয়নেরই ফল। একে আমি মস্তবড়ো একটি লাভ বলে মনে করি।* প্রথমশ্রেণীর উপন্যাস পাঠ করলে কারো কোনোরূপ ক্ষতি হতে পারে একথা আমি ভাবতেই পারি না।

আমাদের জাতীয় পতাকা

যে-কোনো দেশে জাতীয় পতাকা তার অখণ্ড স্বাধীনতার প্রতীক। এই পতাকাকে সমগ্র দেশের ও গোটা জাতির অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের প্রতিভূ বলা যেতে পারে। জাতীয় পতাকা পবিত্র একটি বস্তু—দেশমাতৃকার মতোই পূজনীয় এবং নমস্য। এর অসম্মান সমগ্র জাতিরই নিদারুণ অবমাননা। কত কত পরাধীন জাতি প্রাণের মূল্যে—বুকের রক্ত দিয়ে—নিজেদের জাতীয় পতাকা অর্জন করেছে; আর, কত কত স্বাধীন জাতি বিপর্যয়ের মুহূর্তে তাদের জাতীয় পতাকার সম্মানরক্ষার জন্যে অশেষ নির্যাতন সহ্য করেছে, বর্ণনানীত দুঃখ বরণ করেছে, অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছে, যে-কোনো ত্যাগস্বীকারে বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত হয়নি। স্বাধীনতা-অপহারকের সহস্র অত্যাচারে তারা মনোবল হারায়নি, করাল মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছে, নিজেদের জাতীয় পতাকাখানিকে উড্ডীন রেখেছে। বস্তুগত মূল্যবিচারে অতিশয় সাধারণ একটি সামগ্রী এই জাতীয় পতাকা, কিন্তু ভাবদৃষ্টিতে দেখলে এর মূল্য অপরিসীম; কারণ, জাতির স্বাধীন সত্তার মর্যাদাটি এর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

আমাদের—আমরা ভারতবাসীর—যে জাতীয় পতাকা তার পবিত্র অস্তিত্ব

ঘোষণা করতে গিয়ে মহা মূল্য দিতে হয়েছে দেশের মানুষকে। সুদীর্ঘকালের সংগ্রাম, আত্মবলি, কঠিন দুঃখচর্যা, বুকের রক্তদান ও অনেক ত্যাগের সঙ্গে ভারতের জাতীয়-পতাকা-অর্জনের গৌরবদীপ্ত স্মৃতি বিজড়িত। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে আমাদের জাতীয় পতাকার উল্লেখ্য একটি স্থান রয়েছে। সেদিন এই পতাকা জাতির প্রাণে জুগিয়েছে উন্মাদনা, নিরাশায় মধ্যে দেখিয়েছে আশার আলোকশিখা, সংকটকালে হয়েছে পরম সহায়, বিপর্যয়ের মুহূর্তে হয়েছে অনিঃশেষ উৎসাহের উৎস। উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সালের সেই রক্তরাঙা দিনগুলির স্মৃতি এখনো অনেকের মনের পটে উজ্জ্বল রয়েছে। গান্ধীজি 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করলেন, ভারতবর্ষের দিকে দিকে বিপ্লবের বহ্নি জ্বলে উঠল। দেশের যুবশক্তি 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ব্রত গ্রহণ করে, ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে, এগিয়ে গেল সরকারি ভবনের দিকে, উদ্দেশ্য—এইসব ভবনচূড়ায় উত্তোলন করবে ওই পতাকা। একদিকে স্বাধীনতাকামী তরুণসম্প্রদায়ের কঠিন অঙ্গীকার, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের রক্তমুখী হিংস্রতা—পুলিশের গুলিতে দেশের অসংখ্য বীরসন্তান ধুলায় লুটিয়ে পড়ল। এসব মৃত্যুঞ্জিৎ শহীদের কথা আমরা কেউ ভুলিনি। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে প্রাণ দিয়েছে কিশোরকিশোরী, প্রাণ দিয়েছে তরুণ-তরুণী, প্রাণ দিয়েছে বৃদ্ধবৃদ্ধা। এদের সংখ্যা গণনার অতীত। বিগত দিনের অন্ধকার অমারাত্রিতে জাতীয় পতাকা আমাদের কাছে ছিল যেন প্রদীপ্ত মশাল। সমগ্র দেশ ও জাতির ঐক্য আর সংহতি-শক্তির প্রাণকেন্দ্রে বিরাজমান রয়েছে আমাদের তিনরঙা পতাকা। এহেন পবিত্র পতাকার জন্ম ও বিবর্তনের ইতিহাস স্মর্তব্য।

কার্জনী আমলে—১৯০৫-৬ সালে—বঙ্গভঙ্গের প্রচণ্ড প্রতিবাদে বাঙলাদেশ যখন প্রকাণ্ড শক্তি নিয়ে জেগে ওঠে, সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে আমাদের জাতীয় পতাকার প্রথম সূচনা। শোনা যায়, ১৯০৬ সালে আগস্ট মাসে উত্তর-কলিকাতায় ক্ষুদ্রায়তন একটি ময়দানে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয়। সমান্তরাল-ভাবে তিনটি রঙে এই পতাকা রঞ্জিত—লাল, হলদে, সবুজ। এতে অঙ্কিত ছিল আটটি সাদা প্রতীকী পদ্মফুল, মুদ্রিত ছিল সর্বজনপরিচিত 'বন্দেমাতরম্' শব্দটি, আর ছিল একটি সূর্য ও একটি অর্ধচন্দ্রের ছাপ। এ পতাকা আমরা কেউ দেখিনি।

তারপর, শুনতে পাই, ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় ভারতভূমির বাইরে য়ুরোপের প্যারিসে—১৯০৫ থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যেকার কোনো একটি সময়ে। তখন ভারতবাসীর চিত্তে স্বাধীনতা অর্জনের অদম্য স্পৃহা জেগেছে, দেশের স্বাধীনতাকামী ভারতীয় বিপ্লবীরা য়ুরোপে দল গঠন করেছে। এই বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা ও পার্শি মহিলা মাদাম কামা। ভারতের কোনো জাতীয় পতাকা নেই দেখে এঁরা একটি নতুন পরিকল্পনা রচনা করেন। এ পতাকা তিন-রঙা। উপরে জাফরাণী রঙ্, তাতে সপ্তর্ষি [সাতটি তারা] চিহ্নিত। মাঝখানে সাদা রঙ্, তাতে দেবনাগরী অক্ষরে 'বন্দেমাতরম্' লেখা। সবার নীচে সবুজ রঙ্। এর প্রচলন ভারতে দেখা যায় নি।

এরপর কয়েকটি বছর অতিক্রান্ত হল। ১৯১৬ সালের দিকে আমরা এগিয়ে গেলাম। এ সময়ে দেশে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ও আনি বেশান্ত 'হোমরুল' আন্দোলন শুরু করেছেন। তখন আর-একপ্রকার জাতীয় পতাকা পরিকল্পিত হল। এ পতাকা দ্বিবর্ণরঞ্জিত—সবুজ ও লাল। উপরে লাল, তলায় সবুজ, আবার লাল ও তলায় সবুজ—পাঁচটি লাল ও চারটি সবুজ পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থিত। লক্ষণীয়, পতাকার বাঁ-দিকের মাথায় আঁকা ছিল ব্রিটিশ 'ইউনিয়ন জ্যাক'। এ ছাড়া, এই পতাকায় সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারা মুদ্রিত ছিল। ব্রিটিশের অধীনে স্বায়ত্তশাসন লাভ করাই ছিল উক্ত হোমরুল-আন্দোলনের উদ্দেশ্য। একারণে ভারতের জাতীয় পতাকায় সেদিন 'ইউনিয়ন জ্যাক' স্থান পেয়েছিল। উপরে-কথিত আন্দোলন শেষ হলে এই পতাকা অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। 'ইউনিয়ন জ্যাক'-এর ছাপ-দেওয়া পতাকাকে জাতীয় পতাকা বলে গ্রহণ করা দেশবাসীর পক্ষে অসম্ভব।

দেখতে দেখতে ভারতবর্ষে ভীষণ এক দুর্যোগের দিন ঘনিয়ে এল। ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবপ্রদেশের জালিয়ানওয়ালাবাগে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল—শক্তিস্পর্ধিত ইংরেজজাতি চূড়ান্ত মূঢ়তার পরিচয় দিলে। ১৯২০ সালে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করার প্রস্তাবটি গৃহীত হল। এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক আন্দোলন শুরু করার মুহূর্তে গান্ধীজি জাতীয় পতাকার প্রয়োজন অনুভব করলেন এবং এবিষয়ে ইয়ং 'ইণ্ডিয়া'-য় একটি প্রবন্ধ লিখলেন। এসময়ে পাঞ্জাবের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মহাত্মাকে বললেন যে, আমাদের জাতীয় পতাকা চরকাচিহ্নিত হওয়া উচিত। কথাটি মহাত্মাজীর মনে গভীর রেখাপাত করল। ১৯২১ সালে এক অন্ধ্রযুবক তার নিজের কল্পিত একটি জাতীয় পতাকা মহাত্মা গান্ধীর হাতে দেয়। এ পতাকার দুটি রঙ্—লাল ও সবুজ। এই দুই রঙ্ হিন্দু ও মুসলমান-সম্প্রদায়ের প্রতীক। গান্ধীজির উপদেশে এর সঙ্গে সাদা রঙ্ যোগ করে দেওয়া হল। সাদা রঙ্টি ভারতের অপরাপর সংখ্যালঘুসম্প্রদায় বা জাতির প্রতীক। এই পতাকাকে চরকাচিহ্নেও চিহ্নিত করা হল। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এ পতাকা প্রচলিত ছিল। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে যখন 'পূর্ণ-স্বরাজ-প্রস্তাব' গৃহীত হয় তখন এই পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল।

এরপর আমাদের জাতীয় পতাকার রূপটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হল ১৯৩১ সালে। এই বছর কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে শিখরা নিজেদের কালো রঙ্ ভারতের জাতীয় পতাকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তোলেন। এতে পতাকার নতুন একটি পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুভূত হল। উক্ত অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নানা জল্পনাকল্পনার পর পতাকার যে-রূপটিকে স্বীকৃতি জানালেন তাতে আগের মতো তিনটি রঙ্ই রইল, তবে উপর থেকে নীচে তা হল যথাক্রমে গেরুয়া, সাদা ও সবুজ। এর সঙ্গে একথাটিও বিজ্ঞাপিত হল যে, পতাকাটির রঙ্-তিনটি কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতীক নয়; এগুলি কয়েকটি বিশেষ গুণেরই প্রতীক। গেরুয়া রঙ্ সাহস ও ত্যাগের প্রতীক; সাদা রঙ্ সততা ও শান্তির প্রতীক; আর সবুজ—বিশ্বাস ও বীরত্বের। পতাকার সাদা অংশের

ওপর অঙ্কিত হল নীল রঙের চরকা। এই চরকাচিহ্ন দেশের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রতীক। স্থির হল, পতাকার দৈর্ঘ প্রস্থের দেড়গুণ হবে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত জাতীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে এ পতাকা ভারতের সবত্র উত্তোলন করা হয়েছে।

আমাদের পতাকার সর্বশেষ পরিবর্তন সাধিত হল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের কিছু আগে—দেশ স্বাধীন হবার প্রাক্‌কালে। ওই বছরের ২২শে জুলাই শ্রীনেহেরু কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেমব্লিতে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে এক প্রস্তাব পেশ করলেন এবং তাঁর প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। নবপরিকল্পিত পতাকা সভায় সকল সভ্যকে দেখানো হল। জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বকল্পিত পতাকার সঙ্গে এর বর্ণ বা মর্মার্থের কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য দেখা দিল পতাকায় চরকার পরিবর্তে 'অশোকচক্র' গ্রহণের ক্ষেত্রে। সারনাথের অশোকস্তম্ভের ওপর যে-ধর্মচক্র খোদিত রয়েছে, আমাদের জাতীয় পতাকার ক্ষেত্রে চিহ্নিত চক্রটি তারই প্রতিরূপ। তবে বলা যেতে পারে, অশোকচক্র-চিহ্নটির সঙ্গে চরকার ভাবাত্মক একটি যোগ যেন রয়েছে।

অশোকচক্র ভারতের জাতীয় পতাকার মহিমা বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন ভগবান বুদ্ধ তেমনি তাঁর শিষ্য ধর্মাশোক প্রেম, মৈত্রী, অহিংসা ও সাম্যের বাণী প্রচার করেছিলেন—আমাদের পতাকা তারই প্রতীক। ভারতবর্ষের শাশ্বতকালের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও বিশ্বমৈত্রীর বার্তা বহন করে এসেছে। অশোকের ধর্মচক্র আমাদের নির্দেশ দেবে অসাম্য-হিংসা-বিদ্বেষ অধর্ম ও অসত্য ; সাম্য-প্রেম-করুণা-মিলনই ধর্ম ও সত্য—শাশ্বত বস্তু। নিজেদের আমরা সর্বপ্রকার সংকীর্ণ মনোভাবের উর্ধ্বে তুলে ধরবো, পররাজ্যগ্রাসের লিপ্সা থেকে মুক্ত থাকবো ; অশোকচক্রচিহ্নিত আমাদের জাতীয় পতাকা যেখানেই নিয়ে যাব ঘোষণা করবো মুক্তির বাণী। আর, উচ্চকণ্ঠে বলব, স্বাধীন ভারতবর্ষ প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা কামনা করে, প্রত্যেক দেশের মৈত্রী তার অভিলষিত, স্বাধীনতার পথে অগ্রসরমান জাতিকে সাহায্য করতে সে সতত উৎসুক। *জয় হিন্দ*।

ইতিহাস-অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা

ইতিহাস অতীতের কাহিনী বলে। যুগযুগান্তের অগণন ঘটনাপুঞ্জের নির্বাক সাক্ষী এই ইতিহাস। সুদূরের সেই কোন্ বিস্মৃত কাল হতে পৃথিবীর মানবযাত্রী অভ্যুদয়-পতনের বন্ধুর পথে এগিয়ে চলেছে—তাদের অশ্রান্ত পদধ্বনি স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। যে-কথা আর-সকলে ভুলে গেছে, ইতিহাস তাকে ভোলেনি; কালের প্রান্তরে যা হারিয়ে গেল মনে হয়, ইতিহাস তাকে সযত্নে কুড়িয়ে নিয়েছে। বিস্মরণের গোধূলির বুকে জ্বালিয়ে রেখেছে অক্ষয় স্মৃতির অনির্বাণ দীপশিখা—শত শত শতাব্দী তার আলোয় উদ্ভাসিত। দূরবিস্তার অতীতের অন্ধকারে ইতিহাস মানুষকে নির্ভুল পথ দেখায়—'বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী' নিঃশব্দ ভাষায় অনুক্ষণ সে আবৃত্তি করে চলেছে। 'যুগে যুগে ধাবিত' মানবযাত্রীর বিপুল কর্মকাণ্ডের মরণজয়ী স্মৃতিসৌধ বিশ্বমানবের ইতিহাস।

এহেন ইতিহাসের যথার্থ তাৎপর্য বস্তুবাদী সাধারণ মানুষ কিন্তু সঠিক উপলব্ধি করতে পারে না। সাধারণের কাছে অতীত মৃত, আর ইতিহাস তো এই মৃতেরই জীর্ণ কঙ্কালে পরিকীর্ণ। যারা সবচেয়ে বেশি মূল্য দেয় বর্তমানকে তারা অতীতের দিকে ফিরে তাকাবার সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। কী হবে অতীত কাহিনী জেনে? ইতিহাস পড়ে কী লাভ? বরং ভবিষ্যৎকে জানতে পারলে কিছুটা আশ্বস্ত হওয়া যেত। আরো লাভ যদি বর্তমানকে সম্পূর্ণভাবে হাতের মুঠোয় আনা যায়—বর্তমানের বুকে স্বর্ণচূড় জয়স্তম্ভ নির্মাণ করতে পারাতেই মানবজীবনের সর্বাধিক সার্থকতা। নির্বস্তুক দার্শনিক তত্ত্বালোচনা তোমার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করবে? যে ইতিহাসের পাতায় মরা ঘটনা প্রেতায়িত হয়ে রয়েছে তার নাড়াচাড়া করে কিছু তো লাভ দেখি না। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসনপ্রণালীর কথা না জানলে কি কিছু ক্ষতি আছে? রোম-সাম্রাজ্যের উত্থানপতন, আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের কথা, মিশর বেবিলনের পুরাকীর্তির পরিচিতি একালের মানুষের কী কাজে লাগবে? হরপ্পার মানুষ কোন্ কোন্ দেবদেবীর পূজা করতো, মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতা কতকালের প্রাচীন, গান্ধারশিল্পের জন্ম হল কী করে, স্থাপত্যকলায় দক্ষিণভারতের এতখানি উৎকর্ষলাভের হেতু কী, বাঙ্লার সংস্কৃতিতে আর্যপ্রবণতা কতখানি এসব জেনে আমাদের লাভের অঙ্ক কতটুকু বাড়বে? কী লাভ গ্রীক ও মিশরীয় সভ্যতার মৃত বিবরণ পড়ে? স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে, সাধারণ হিসেবি মানুষ ইতিহাসপাঠের কোন মূল্যই দেখতে পায় না। স্থূল বর্তমানের ওপরই তাদের সকল দৃষ্টি নিবদ্ধ, অতীত তাদের কাছে বিরাট একটি শূন্যতা-মাত্র। এ কারণে ইতিহাসসহ সর্ববিধ মানববিদ্যা [Humanities] আজ প্রায় সর্বত্রই অবহেলিত হচ্ছে। অধুনা বিবিধ বিজ্ঞানের একমুখী চর্চা ইতিহাসাদির অনুশীলনকে নিঃসন্দেহে বিঘ্নিত করছে।

অবশ্য স্বীকার করতেই হবে বিজ্ঞানাদি বিদ্যার চর্চাজনিত লাভের দিকটা

অতিশয় প্রত্যক্ষ। কিন্তু সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাসাদি বিদ্যার অনুশীলন কি একেবারে নিরর্থক? এসব বিদ্যাচর্চার সামাজিক প্রয়োজন সর্বদা এবং সর্বথা প্রত্যক্ষভাবে নিরূপণ করতে পারা যায় না বলে এদের কি মূল্যহীন বলব? মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে এমন সব বস্তু রয়েছে যাদের মূল্যায়ন অত সহজ নয়, প্রত্যক্ষ-ফলপ্রসূতার মানদণ্ডে এগুলির মূল্যবিচার চলে না। মানবজীবনে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এরা কাজ করে, মানুষের অদৃশ্য মনোলোকে—ভাবনার জগতে—এদের প্রভাব গোপনসঞ্চারী। ইতিহাসকে নিঃসংশয়ে মানববিদ্যার প্রথম সারিতে দাঁড় করানো যায়। এর চর্চাকে যথাযোগ্য মূল্য দিতেই হবে। বিজ্ঞজন ইতিহাসকে কদাপি অবহেলা করে না। যে-অতীতকে নিয়ে ইতিহাসের কারবার, সেই অতীত কি সত্যই মৃত? অতীত মরে না, বর্তমান তার প্রভাবচিহ্ন নিত্যই বহন করে চলেছে, কবির ভাষায়—'হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে কাজ করে যাও গোপনে গোপনে'। অতীতের অভিজ্ঞতা অতীতের ভাবনাকল্পনা সমাজে-সংসারে সভ্য মানুষের খুব বড়ো একটি উত্তরাধিকার। মনস্বী মানুষ উচ্চকণ্ঠে আমাদের কি শোনাননি যে, 'Histories make men wise'—'History is a storehouse of wisdom.' এই 'wisdom' যদি আমাদের অভিলষিত হয়, 'wise' হওয়ার কামনাটা চিত্তে যদি আমরা পোষণ করি তাহলে ইতিহাসচর্চায় আমাদের আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন।

জাতির জীবনে ইতিহাসপাঠের সার্থকতা অবশ্যস্বীকার্য। সার্থকতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করে নিতে হবে। আমরা সাধারণত মনে করি, রাজারাজড়াদের কাহিনী আর তাঁদের বংশলতার পরিচয়, যুদ্ধাদির বিবরণ, সাম্রাজ্যবিস্তারের কথা, রাষ্ট্রশাসনবিষয়ে কিছু বর্ণনাই বুঝি ইতিবৃত্তের আলোচ্য বস্তু। এরূপ একটা ধারণা কিন্তু ভ্রমাত্মক, এই ভুল ধারণা দূর না-করলে নয়। কোনো জাতির ইতিহাস সেই জাতির সামগ্রিক জীবনচর্যা ও সর্ববিধ কর্মপ্রচেষ্টার কালানুক্রমিক অর্থাৎ ধারাবাহিক বিবরণ এবং বিশ্লেষণ। এ যাবৎ অধিকাংশ ইতিহাসই কেবল রাষ্ট্রনীতির দিকেই জোর দিয়ে আসছে। এ কারণে আমাদের মনে ধারণা জন্মেছে 'হিস্ট্রি' মাত্রেই 'পলিটিকাল'। কিন্তু আদর্শ ইতিহাস অনেক ব্যাপক একটি জিনিস। শুধু রাজনীতি নয়—অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি—মানুষের বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণায়ত আলেখ্য—এর পাতায় মুদ্রিত হয়। এইদিক থেকে দেখলে আদর্শ-ইতিহাসকে জাতির জীবনের স্বচ্ছ দর্পণ বলা যেতে পারে। এ ধারণ করবে বিশেষ বিশেষ জাতির নৃতাত্ত্বিক পূর্বপরিচয়, তার আর্থনীতিক জীবনের ক্রমবিকাশকাহিনী, তার সামাজিক জীবন-যাত্রাপ্রণালীর বিবর্তনের কথা, তার রাষ্ট্রপরিচালননীতির ক্রমিক বিবরণ, এবং তার সাহিত্য, শিল্প ও অন্যান্য সৃষ্টিমূলক কর্মপ্রচেষ্টার নানামুখী পরিচিতি। অন্য জাতির সংস্পর্শে এসে কোনো বিশেষ জাতির জীবনে কীরূপ প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে তাও সযত্নে লক্ষ্য করার বিষয়। এরূপ ইতিহাসগ্রন্থই জাতিকে সমগ্রভাবে জানবার এবং বুঝবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

সত্যকার ইতিহাসপাঠের সার্থকতা অনেক। হোক-না ইতিহাস অতীতকথা। বর্তমান তো অতীতের ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর কীভাবে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে তার নির্ভুল নির্দেশ কি অতীত জোগাচ্ছে না? অতীতকে জানার অর্থ ই তো হল বিগত বহুযুগের সংখ্যাতীত মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। অতীতের অভিজ্ঞতা বর্তমানকালের মনুষ্যসন্তানের কাছে আলোকবর্তিকার মতো—অগ্রগতি ও উন্নতির যথার্থ পথটি দেখায়। ইতিহাস চর্চা করলে সঠিক বুঝতে পারা যায়, কোন্ পথ ধরে চললে জাতি জীবনের বহুবিচিত্র ক্ষেত্রে উন্নত হয়ে উঠবে। যে-পথে এগিয়ে গিয়ে অপর জাতি উন্নতির শীর্ষদেশে পৌঁছেছে সেই পথ অনুসরণীয়; আর, যে-পথের অনুসৃতি অপর জাতিকে অধঃপতনের নিতল গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে সে পথ সর্বৈব বর্জনীয়। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, ইতিহাস-অনুশীলন আমাদের বিচারশক্তির সহায়ক। ইতিহাসের বিপুল বিস্তার-ধারার মধ্যে জাতির অভ্যুদয়-বিলয়ের মূলীভূত কারণগুলি সংগুপ্ত রয়েছে। মানবজীবনের উন্নতি-অবনতির এই সার্বভৌমিক নীতিগুলি আমাদের অগ্রসরণের পথে অত্যাবশ্যক পাথেয়স্বরূপ। আমরা নতুন পথ ধরে চলব, না, পুরাতন পথ আশ্রয় করব তারো নির্দেশ খুঁজতে হবে ইতিহাসের সমর্থন অথবা প্রতিবাদের মধ্যে। জাতিগঠনে ইতিহাসচর্চার ভূমিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শ-সমাজ, আদর্শ-রাষ্ট্র গড়তে গেলে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাসপর্যালোচনা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে এক জাতির ইতিহাস অপর এক জাতির ইতিহাসের পরিপূরক। বিশেষ কোনো জাতি উন্নতির সমুচ্চ শিখর হতে কেন পতিত হল তা জেনে আমরা যেমন সাবধানতা অবলম্বন করতে পারি, আবার তেমনি অবনতির নিম্নস্তর হতে কোনো বিশেষ জাতি কোন্ শক্তির বিকাশে আশ্চর্য উন্নতি লাভ করল তা জেনে আমরা অনুপ্রাণিত হতে পারি। একের কীর্তিস্থাপন এবং অপরের শ্মশানশয্যারচন ইতিহাসেই আমরা প্রত্যক্ষ করি।

অবিকৃত ইতিহাস যেমন সংশয়াতীত সত্য তেমনি এর শিক্ষা বহুমূল্য। বলা হয়, ইতিহাসের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় না। কথাটির অর্থ যদি এই হয় যে, দূরকালের ব্যবধানে সংঘটিত কোন দুটি ঘটনা কখনো ঠিক একই রূপ হতে পারে না, তাহলে বলতে হবে—'History does not repeat itself'। কিন্তু এও কি সত্য নয় যে, অনুরূপ কারণেই যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে, পৃথিবীতে অশান্তিসংঘর্ষের মূলীভূত হেতুগুলি সর্বদেশে সর্বকালেই প্রায় একই রকমের? ইতিবৃত্ত আমাদের কী শিক্ষা দেয়? সে কি এই সত্যটির প্রতি অঙ্গুলিসংকেত করে না যে, জাতি কিংবা জাতির ভাগ্য-রচয়িতা যদি স্বৈরাচারী হয়, পররাজ্যগ্রাসের দুরন্ত কামনা যদি তাঁকে উন্মত্ত করে তোলে, নিজের হীনস্বার্থবুদ্ধি ছাড়া অন্যকিছু যদি সে না জানে, পশুশক্তির বলে সে যদি অপরকে পদদলিত করতে চায়, সমস্ত ন্যায়বোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে শক্তিমত্ততাবশে হিংস্রতার নখদন্ত বিস্তার করতে থাকে, তাহলে তার পতন অবশ্যম্ভাবী? রোম-সাম্রাজ্যের সর্বগ্রাসী প্রতাপ কোথায় গেল? দুর্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের ভাগ্যের পরিণাম কী? যে-সাম্রাজ্যে সূর্য অস্তমিত হয় না এরূপ জনশ্রুতি ছিল

ব্রিটিশের সেই বিস্তৃত সাম্রাজ্য সংকুচিত হতে হতে আজ কোথায় এসে ঠেকেছে? উপনিবেশস্থাপনের অশুভ অভিলাষ, সাম্রাজ্যবাদ আর উগ্র জাতীয়তাবাদ আমাদের জন্যে কোন্ শিক্ষা বহন করে চলেছে? বর্ণবৈষম্য, জাতিবৈর, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, সর্বনাশা আত্মকলহ জাতির অপঘাত-মৃত্যুর পথটিই কি প্রশস্ত করে তোলে না? জাতিগত কুসংস্কার, আলস্য-আরাম-বিলাসপ্রিয়তা মানবগোষ্ঠীকে কি সর্বনাশের পথে সবলে আকর্ষণ করে না? সভ্যতার উদয়-বিলয়, জাতির অভ্যুদয়-পতন মানবের কতকগুলি চিরন্তন নীতির ওপর নির্ভরশীল।. ইতিহাসের শিক্ষা হল, এই নীতি লঙ্ঘন যে করবে তার বিনাশ অপ্রতিরোধ্য। সুতরাং কে অস্বীকার করবে ইতিহাস-পাঠের উপকারিতা? ইতিহাস উপেক্ষার বস্তু মোটেই নয়।

ইতিহাসচর্চার আরো সার্থকতা রয়েছে। অন্যজাতির ইতিহাস পাঠ করলে ঠিক পথে চলার যেমন নির্দেশ পাই, তেমনি, আপন জাতির অতীত কর্মকীর্তির কথা জেনে স্বদেশকে ভালোবাসতে শিখি, চিত্তে জাতিবৎসলতার উদ্গম হয়। অতীতভ্রষ্ট জাতির ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। বিগত দিনের গৌরবকাহিনী জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা জোগায়। বিনষ্ট মহিমার পুনরুদ্ধারসাধনকল্পে স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেমিক বঙ্কিম বাঙালিকে তার জাতীয় জীবনের সত্যকার ইতিহাস রচনার জন্যে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। বাঙালীর পক্ষে যে-কথা সত্য তা সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষেও সত্য।

আত্মবিস্মৃতি আমাদের জাতিগত শোচনীয় অধঃপতনের বড় একটি কারণ নয় কী? বিদেশিরচিত মিথ্যায় আকীর্ণ ইতিহাস পড়ে নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা কি আমরা হারিয়ে ফেলিনি? ভুললে চলবে না, প্রত্যেক জাতির ইতিহাসই তার মহত্তর জীবনের নৈতিক ভিত্তি। এই ভিত্তিমূলের ওপরই নতুন জীবনের সৌধ গড়ে তুলতে হবে। নিজ ইতিহাসকে বিস্মৃত হলে আত্মশক্তি-উজ্জীবনের চিরন্তন উৎস শুকিয়ে যেতে বাধ্য।

মানুষের মর্মমূলে তার অতীত ইতিহাস বাসা বেঁধে থাকে। তার গর্ববোধ শুধু বর্তমানের কৃতিত্ব নিয়ে নয়, অতীতের কীর্তিকলাপের বর্ণাঢ্য কেতন উড়িয়ে সে বর্তমান জীবনের পথে চলতে চায়। আমাদের জাতি পুরানো দিনে যেসব বিপুল কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেছে, আমরা তাদের বংশধর হিসেবে তার গৌরবের অধিকারী। বস্তুজ্ঞানী একে মিথ্যা গৌরব বলে ভাবতে পারে। কিন্তু মানুষের মন সর্বদা বস্তুজ্ঞানীর নির্দেশ মেনে চলে না। বহুসময়ে দেখা গিয়েছে, পরাধীন প্রাণচাঞ্চল্যবিরহিত জাতি অতীতের গৌরবকথা শুনে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে।

আমাদের বিচারবুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে কত অমূলক সংস্কার, কত অশুভ প্রথা আত্মবিস্তার করেছে। এগুলি এত দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছে যে, এদের উৎপাটিত করা অতিশয় কঠিন একটি কাজ। অনেকসময় বিনাবিচারে আমরা ভিত্তিহীন কাহিনীকে সত্যের মর্যাদা দিই, অভিসন্ধিমূলক বানানো ঘটনাকে ইতিহাসগত তথ্য বলে মেনে নিই। এসব ক্ষেত্রে অতীত মিথ্যার আবরণে আচ্ছাদিত, এর অপসারণ অবশ্যকর্তব্য।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এসকল ভ্রান্ত সংস্কার দূরীভূত হতে বাধ্য। এমন কতকগুলি সংস্কারকর্ম রয়েছে, ইতিহাসের অনুশীলন ব্যতীত যার সম্পাদন একরূপ অসম্ভব। বিবিধ অকল্যাণকর নীতি-সংস্কারে সমাজ যখন একটি অচলায়তনের রূপ পরিগ্রহ করে তখন ওকে ভাঙতে হলে ইতিহাসলব্ধ জ্ঞানের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। একদিন যার কোন অস্তিত্ব ছিল না, সুতরাং অমঙ্গলজনক বলেই তা আজ বর্জনীয়, এই শুভবোধ মানুষের অন্তরে জাগাতে পারে ইতিহাসবুদ্ধি। সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা হতে জাতির চিত্তকে মুক্ত করতে চাইলে ইতিহাসচর্চা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা অপরাপর বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানসম্পদকে নিষ্ফল করে দেয়।

ইতিহাস ছাড়া আর কোন্ বস্তু আছে যার সাহায্যে আমরা দূর দেশ ও দূর কালে মানসভ্রমণ করতে পারি? ইতিহাসের পৃষ্ঠা যতই উল্টাই, বিস্মৃত অতীত ততই আমাদের কাছে প্রত্যক্ষবৎ হয়ে ওঠে, দূর নিকটে আসে, বড়ো পৃথিবী আমাদের হাতের মুঠোয় ধরা দেয়। ইতিহাসের সঙ্গে অপরিচিত এমন মানুষকে—সে যতই শিক্ষিত হোক—সংস্কৃতিমান বলতে আমরা কুণ্ঠিত।

ইতিহাসপাঠের আরো বড়ো উপকার আছে। পৃথিবীতে কত সভ্যতার উদয় হল, কত সাম্রাজ্য উচ্চকণ্ঠে নিজের প্রতাপ ঘোষণা করল; কত দুর্ধর্ষ বীরের স্পর্ধিত শক্তি পৃথিবীকে শঙ্কাতুর করে তুলল, কত বিজয়ীর কীর্তিধ্বজা দেশে দেশে দিকে দিকে উড়ল। কিন্তু, এসব বস্তু আজ কোথায়? বুদ্বুদের মতো কোন্ শূন্যতায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তারা, এতটুকু চিহ্ন না রেখে মহাকালের স্রোতে তারা ভেসে গেছে। ইতিহাস পার্থিব বস্তুর নশ্বরতার দিকে অভ্রান্ত অঙ্গুলি-সংকেত করে। ফলে ইতিহাসপাঠে মানুষের স্থূলবস্তুতৃষ্ণা হ্রাস পায়, শক্তিমদমত্ততা কমে আসে, নভোস্পর্শী অহংকার নিজের ক্ষণিকতা উপলব্ধি করে কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। ইতিহাসের শিক্ষা পেয়ে মানুষ উপকৃত না হয়ে পারে না।

অতএব ইতিহাস-অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি জানাতেই হয়।

জনসেবা

মানবেতর প্রাণীও দল বাঁধে—যূথবদ্ধ হয়ে চলে। শোনা যায়, ডাইনোসেরাসের মতো আদিম অতিকায় প্রাণী দল বাঁধতে জানতো না। পৃথিবীর বুকে তাদের কোনো চিহ্নই আজ নেই, তাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, অতি ক্ষুদ্রকায় প্রাণী পিপীলিকা ধরাপৃষ্ঠে অদ্যাপি স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রাকৃতিক নির্বাচনে তারা জয়লাভ করেছে। এখানে মনে রাখতে হবে, পিপীলিকারা দল বাঁধতে জানে

পারস্পরিক সহযোগিতা তাদের মস্তবড়ো একটি শক্তি। মানুষও যে দলবদ্ধ হতে শিখল তা বেঁচে থাকবার তাগিদে—আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। একক মানুষের শক্তি কতটুকুই-বা। দূর অতীতে, সেই বিপদসংকুল পরিবেশে, মানুষ যে কতখানি দুর্বল ছিল তা আজ ধারণারও অতীত। কিন্তু তার সমাজবদ্ধ অবস্থান, তার যৌথজীবন, তাকে সমস্ত আপদবিপদ থেকে রক্ষা করেছে। ধীরে ধীরে সে প্রকাণ্ড শক্তির অধিকারী হয়েছে, ক্রমে দৃঢ়ভিত্তি সমাজ গড়েছে, সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে। নিজ অস্তিত্বকে অক্ষত রাক্ষার জন্যে, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষ পরস্পরকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেছে, পরকে রক্ষা না করলে তার নিজের অস্তিত্বও যে বিপন্ন হয়ে পড়ে। সমাজবদ্ধ জীবনযাত্রাপ্রণালী মানুষকে নিরাপত্তায় অশ্বস্ত করেছে, তার বস্তুগত অভাব বহুলাংশে মিটিয়েছে, তাকে নিরুদ্বেগে দিনযাপনের সুযোগ করে দিয়েছে।

সমাজবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃৎবৃত্তিরও ক্রমোন্মেষ ঘটল। তখন সে নিজেকে আর স্থূল-প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ রাখল না, প্রাত্যহিকতার ধূলিমালিন্যের ওপর আপন হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিনিচয়ের মনোরম একটি আবরণ বিছিয়ে দিল। এখানে শুরু হল নিজ ব্যক্তিসীমা অতিক্রম করে অপরের মধ্যে মানুষের আত্মব্যাপ্তি-সাধনের পালা। সে শুধু আপন পরিবারকেই চিনতে শিখল তা নয়, প্রীতি নিবেদন করল বৃহত্তর সমাজকে। অনাত্মীয়কে আত্মীয় জেনে তাকে সাহায্য করতে মানুষ এগিয়ে এল। পারিবারিক বন্ধনের সীমা ছাড়িয়ে সহমর্মিতার প্রেরণায় নিঃসম্পর্কিত মানুষকে প্রীতির আলিঙ্গনে জড়ানোর মনোভাবটিই জনসেবার মূলভিত্তি। এই মনোভাব ব্যক্তিকে পরের স্বার্থে নিজস্বার্থ পরিহার করতে বলে, ব্যক্তির দৃষ্টিকে আত্মসর্বস্বতার উর্ধ্বে তুলে ধরে, ব্যষ্টিজীবনের সঙ্গে সমষ্টিজীবনের সংযোগসূত্র রচনা করে। মানুষের অন্তর্নিহিত উচ্চতর বৃত্তিই—প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা, দয়া-দাক্ষিণ্য-করুণা-সেবা—মানুষকে পরহিতব্রতে দীক্ষা দেয়, তাকে তার 'ছোট-আমি'র জগৎ হতে 'বড়ো-আমি'র জগতে টেনে আনে; আত্মকেন্দ্রিকতার দুর্গপ্রাকার ভেঙে দিয়ে তার অন্তঃকর্ণে এই অনুধাবনীয় বাক্যটি উচ্চারণ করে: 'স্বার্থমগ্ন যে-জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে'। আত্মতৃপ্তির মধ্যে মনুষ্যমহিমা নেই, নিজ আত্মাকে বিশ্বমুখী করে তোলার মধ্যেই ঈশ্বরের সর্বোত্তম সৃষ্টি মানবের সমুজ্জ্বল গৌরব।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব—সমাজসেবায় সে আত্মনিয়োগ করবে এই তো প্রত্যাশিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আত্মপ্রীতির পারবশ্য সহজে সে কাটিয়ে উঠতে পারে না; তাই বিশ্বের মধ্যে নিজেকে মেলে ধরা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। মনুষ্যলোকে আমাদের জন্ম বটে, কিন্তু মানুষের ধর্মে সকলে দীক্ষা নিতে সমর্থ হইনি। উচ্চতর মানবধর্মের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। একটু ভাবলেই তো আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, স্বার্থত্যাগ ব্যতীত স্বার্থরক্ষা কদাপি সম্ভব নয়। যে-সমাজের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ তার সামগ্রিক কল্যাণেই তো আমার কল্যাণ। সমাজ যদি অবনতির মুখে ছুটে চলে তবে আত্মোন্নতির পথও কি রুদ্ধ হয়ে যায় না? অনুন্নত সমাজে আত্মবিকাশের সুযোগ কোথায়? সমাজস্থ মানুষের কত আধি-

ব্যাধি রয়েছে, অভাব-দৈন্য-দুর্গতি রয়েছে, সমাজকে কত সময়ে আকস্মিকভাবে কত রকমের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। একের দুঃখদুর্গতিমোচনের জন্যে অন্যে যদি এগিয়ে না যায়, দুঃস্থ, রোগাতুর, জরাগ্রস্ত অপরের প্রতি মানুষ তার সেবার হস্ত প্রসারিত করে না ধরে তবে সমাজে বেঁচে থাকার উপায় কী? মনুষ্যজাতির ভরসাই-বা কোথায়? আমাদের একের স্বার্থ অন্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, অপরের স্বার্থবিষয়ে উপেক্ষাপরায়ণ হয়ে সমাজে বসবাস্ করার কল্পনাও করতে পারা যায় না। সুতরাং স্বীকার করতেই হয় অহংকেন্দ্রিক জীবন আত্মঘাতী, সমাজ-বিমুখ মনোভাব একরূপ আত্মদ্রোহিতাই বটে। বৃহত্তর সমাজের কাছে আমাদের ঋণের পরিমাণও কি সামান্য! হঠাৎ কোনো কারণে সমাজজীবন যখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তখন বুঝতে পারি আমরা একে অন্যের ওপর কতখানি নির্ভরশীল। জনকল্যাণে ব্রতী হয়ে মানুষকে এই সামাজিক ঋণ শোধ করতে হয়। জনসেবা বা সমাজসেবা প্রত্যেকটি মানুষের বড়ো একটি কর্তব্য।

তা ছাড়া, সেবাব্রত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। বৈষয়িক কোনো লাভের জন্যে সেবাধর্মের অনুষ্ঠান নয়, এর মাধ্যমে 'হওয়া'টাই আমাদের অভিলষিত—মানুষ হওয়া। এই মানুষ হতে পারার আনন্দ মানবসন্তানের কাছে সবচেয়ে বড়ো আনন্দ। কোনো ব্যক্তি মানুষ হতে চায় না এ ভাবলেও কষ্ট হয়। রাস্তায় একজন অনাত্মীয় পথচারীকে বিপন্ন দেখলে অপর মানুষ কেন তার দিকে ছুটে যায়, কেন তাকে বিপন্মুক্ত করতে ব্যকুল হয়ে ওঠে? উত্তর—মনুষ্যত্ববোধের প্রেরণায়। রাজকুমার সিদ্ধার্থ কেন যৌবনে রাজ্যসুখভোগ জলাঞ্জলি দিয়ে রিক্তহস্তে পথে এসে দাঁড়িয়েছিলেন? ব্যাধি-জরা-মৃত্যুর আবর্ত হতে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে। বিশ্বমানবের দুঃখমোচনকল্পে বুদ্ধদেব নিজে কঠিন দুঃখচর্যার জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন। এমন করুণাঘন মনুষ্যমূর্তি জগতে আমরা আর কোথায় দেখেছি? করুণার অবতার যীশুর আত্মবলিদানও কি পৃথিবীর আর্তজনের জন্যে নয়? সংসারের যেখানে যত মহাত্মা আবির্ভূত হয়েছেন, জনসেবাকেই তাঁরা নিজেদের সর্বোচ্চ ধর্ম বলে জেনেছিলেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মপ্রাণতা মানুষের জীবনপ্রত্যয়ের কেন্দ্রগত সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধর্মসাধনা মানুষকে যাতে সেবাব্রত হতে বিচ্যুত না করে, এবং সেবাব্রতকে যাতে মানুষ আপনার ধর্মসাধনার অঙ্গীভূত করতে পারে, জগতে সমস্ত ধর্মগুরু ও ধর্ম-প্রবক্তা বারংবার তার উপদেশ দিয়ে গেছেন। এমন কি, যারা নাস্তিক—ঈশ্বর মানে না, কোনো ধর্মশাস্ত্রে আস্থা রাখে না—তারাও উচ্চকণ্ঠে সেবাব্রতের মহিমা ঘোষণা করে। নানান্ ধর্মের মধ্যে অনুষ্ঠানগত পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু দয়া-দাক্ষিণ্য-পরোপকার—মানবকল্যাণসাধন—অর্থাৎ সেবাব্রতের ক্ষেত্রে ধর্মে ধর্মে এতটুকু বিরোধ নেই। মানবসেবায় যারা পরাঙ্মুখ তাদের সত্যকার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বলি কী করে? বিশ্বের সকল ধর্মই তো স্বীকার করে গেছে: 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'।

নানাজন নানাভাব নিয়ে সেবাধর্মে এগিয়ে যায়। কেউ পুণ্যলোভে, কেউ-বা যশোলিপ্সায় সেবাধর্ম আচরণ করে। এতে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়, সমাজ উপকৃত

হয়, সন্দেহ নেই। তবে যে-সেবাকর্ম সর্বপ্রকার স্বার্থবিরহিত, যা মানবের প্রতি উদার প্রেমবশেই অনুষ্ঠিত তার মহিমা অবশ্যস্বীকার্য। প্রাচীন ভারতবর্ষ এই মহিমান্বিত সেবাধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল। তার প্রেমানুভব মানুষকে ছাপিয়ে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গকেও স্পর্শ করেছিল। তার মানবপ্রীতিও বিশেষ জাতিধর্মের মধ্যে সীমিত ছিল না। আপামর সাধারণকে সে কল্যাণস্নিগ্ধ আলিঙ্গনে বেঁধেছে। সর্বভূতে প্রীতিনিবেদন একমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভব হয়েছে। বৌদ্ধ-জৈনের অহিংসা ও জীবে দয়ার উচ্চাদর্শ বাস্তবে সত্য হয়ে উঠেছে। হিন্দুর পঞ্চযজ্ঞের ভূতযজ্ঞ মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রচনা করেছে। তাই, ভারতবর্ষের যত্রতত্র আরোগ্যনিকেতন, অতিথিশালা, অন্নসত্র, পিঁজরাপোল, ইত্যাদি চোখে পড়ে। ভারতবর্ষ শুষ্ক কর্তব্যবোধে সেবাধর্মকে ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করে নি, করেছে তার সর্বত্রচারী প্রেম আর শ্রেয়বোধের প্রেরণায়।

প্রাচীন সমাজ ধর্মপ্রভাবিত ছিল। একালের সমাজে আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রভাব ধীরে ধীরে যেন কমে আসছে। একদা ভগবৎসত্তার উদ্দেশে পূজা নিবেদিত হত, বর্তমান যুগের পূজা স্পষ্টত মানবকেন্দ্রিক। এস্থলে প্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মহাবাক্য স্মর্তব্য—'জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'। এর তাৎপর্য হল ভগবৎসত্তার সঙ্গে মানবসত্তার কোনো পার্থক্য নেই, সুতরাং 'যারে বলে প্রেম তারে বলে পূজা'। প্রেমে প্রাণিত সেবার নামই তো পূজা। মানুষকে নারায়ণরূপে দেখেছিলেন বলে বিবেকানন্দ 'জীবে দয়া'-র কথা বলেননি, 'সেবা'র কথাই বলেছেন। নবরূপী নারায়ণকে আমরা সেবা করতে পারি; কোন্ অধিকারে তাকে আমরা দয়া দেখাব! স্বামীজির কাছে মানবপ্রেম ছিল ব্রহ্মোপলব্ধির শ্রেষ্ঠ পন্থা, মানুষের স্পর্শকে তিনি ব্রহ্মস্পর্শ বলে জেনেছিলেন। আমাদের কবি-রবীন্দ্রও মানবপ্রেমিক—তাঁর পূজা মানুষের পূজা। সংসারবিমুখ হয়ে বৈরাগ্যের পথে ভগবৎসাধনা তাঁর কাছে নিন্দিত। রবীন্দ্রের ধর্ম মানবধর্ম, তার ব্রহ্ম মানবব্রহ্ম। মানবতার সাধক রবীন্দ্রনাথের দেবতার অবস্থান মঠে-মন্দিরে-গির্জায়-মসজিদে নয়; ধর্মতন্ত্রের বিধিনিষেধে কিংবা নির্জন গিরিগুহায় তাঁর সন্ধান মিলবে না—এই ধূলিমাটির সংসারেই তিনি নিত্যবিরাজমান, দীন-দুর্গত-ব্যাধিক্লিষ্ট অনাথজনের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে কবির দেবতা মানুষের সেবা মাগছেন। রবীন্দ্রের মতে দরিদ্রনারায়ণের সেবাই ঈশ্বরের পূজা।

সহজে বুঝতে পারি, এযুগের আধ্যাত্মিকতা জীবনমুখী, বর্তমানে জগৎবিমুখ অধ্যাত্মসাধনার দিন গেছে। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনধারার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। বৈদান্তিক বিবেকানন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছেই সেবাধর্মের দীক্ষা নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের ভাবধারাকেই তাঁর কাব্যে রূপায়িত করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর মতো এতবড়ো জনসেবক আধুনিক পৃথিবীতে আমরা কোথায় দেখেছি? ভারতে প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সেবা-ধর্মের মহিমাদীপ্ত ঐতিহ্য অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবহমাণ।

জনসেবায় সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারে। যাঁরা বিত্তবান তাঁদের পক্ষে

জনকল্যাণকর্মে অর্থদান কঠিন কিছু নয়। অর্থব্যয়ের সামর্থ্য যাঁদের নেই তাঁদের পক্ষে সহজ শ্রমদান করা। সেবার কাজে কায়িক শ্রমের মূল্যও কম নয়। তবে এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার চেয়ে সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যমের গুরুত্ব যে অনেক বেশি তা কাকেও বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন হয় না। সুখের বিষয়, অধুনা দেশের নানাস্থানে জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এগুলির লক্ষ্য হল দুঃস্থ মানুষের বহুমুখী হিতসাধন। তা ছাড়া, দেশের মধ্যে যখন কোনরূপ আকস্মিক বিপদপাত ঘটে তখন সাময়িকভাবে নানা সংস্থা গঠিত হয় আর্তত্রাণের উদ্দেশ্যে। বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। একালের রাষ্ট্রপরিচালকগণ নিজেদের কল্যাণব্রতী বলে পরিচয় দেন। সুতরাং তাঁরা জনসেবা হতে দূরে থাকতে পারেন না। এখন রাষ্ট্রনেতা এবং বিভিন্ন রাজনীতিক দল জনসেবামূলক কর্মতৎপরতাকে তাঁদের প্রধান কর্তব্যরূপে গণ্য করে থাকেন। অবশ্য সকলের জনসেবার আদর্শ ও কার্যকরী পন্থা এক নয়। প্রত্যেক সমাজেই এমন কতিপয় ব্যক্তি থাকেন যাঁরা স্বার্থবুদ্ধিকে চিত্তে এতটুকু স্থান দেন না, নিজেদের সামর্থ্যের কথা ভাবেন না, বিপন্নের জাতিধর্মের বিচার করতে বসেন না—দুর্গতের আহ্বান শুনলেই নির্বিচারে সেবার জন্য এগিয়ে যান। এঁরা সমাজের চেহারা বদলিয়ে দিতে পারে না ঠিকই, কিন্তু বলতে হয় এঁরাই প্রকৃত জনসেবক। জনসেবা এঁদের একটি মৌল বৃত্তিতে [basic instinct] পরিণত হয়েছে।

একথা ভুললে চলবে না, মানুষের অভাবদৈন্য দূর করতে হলে, মানুষকে সহস্রবিধ দুর্গতিলাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি দিতে চাইলে, বর্তমান সমাজব্যবস্থার রূপান্তরসাধন অত্যাবশ্যক। একমাত্র রাষ্ট্রনীতিক আর আর্থনীতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের মাধ্যমেই এ দুরূহ কাজটি সম্পাদিত হতে পারে। এ পথে অগ্রসর হতে পারলে জনসেবার আদর্শটি পূর্ণতর সাফল্যমণ্ডিত হবে। সমাজকল্যাণব্যাপারে ব্যক্তিগত বা সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগ-উদ্যমের আন্তরিকতা যতই থাক, বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর দুঃখদারিদ্র্য-বিদূরণের লক্ষ্যে পৌঁছান তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই গণতান্ত্রিক যুগে জনসেবার সর্বাধিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের; এর সঙ্গে জনসেবক ব্যক্তি ও সংস্থাগুলির সহযোগিতা যুক্ত হলেই সেবাকর্ম প্রকৃত ফল দর্শাতে পারবে।

আমাদের সর্বশেষ কথা, সেবার চেয়ে বড়ো ধর্ম আর নেই। যথার্থ সেবক অহংকৃত মনোভাব থেকে সর্বদা মুক্ত থাকবেন, নিজেকে তিনি দাতার উচ্চাসনে যেন কখনো না বসান; আর, সেবা যিনি গ্রহণ করছেন, নিজেকে তাঁর ভিক্ষুক মনে করার সংগত কোনো কারণ নেই। কারণ, এক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা পরস্পর প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ —সেবককে তিনি দান করবেন আপনার হৃদয়। সেবাব্রত এভাবেই মঙ্গলসুন্দর হয়ে ওঠে।

যুদ্ধপ্রস্তুতি কি শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উপায় ?

যুদ্ধের ভীষণতা মানবভাষায় বর্ণনার অতীত। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভয়াল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে গোটা পৃথিবীতে যে প্রলয়ংকর কাণ্ড ঘটিয়েছে তা সহজে ভুলবার নয়। একালের যুদ্ধ সর্বাত্মক, দাবানলের মতো সর্বত্রচারী। এখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে দেশের সেনাবাহিনীই যে কেবল কাতারে কাতারে মরে তা নয়, এর করাল গ্রাস থেকে বেসামরিক অধিবাসীরাও রক্ষা পায় না—সমগ্র দেশ বিরাট একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত ভীষণ মারণাস্ত্রগুলি যুদ্ধের নাশকতাশক্তিকে একরূপ অপ্রতিরোধনীয় করে তুলেছে। আমেরিকার নিক্ষিপ্ত দুটিমাত্র আণবিক বোমা জাপানের হিরোসিমা আর নাগাসাকি-অঞ্চলকে ধূলিমুষ্টিতে পরিণত করেছিল, দুটি বোমার আঘাতে লক্ষাধিক মানুষের জীবনান্ত হয়েছিল। মানুষের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে এতবড়ো শোকাবহ ঘটনা কদাপি ঘটেনি। ইতোমধ্যে আণবিক বোমার চেয়ে আরো সাংঘাতিক মারণাস্ত্র বিজ্ঞানীরা নির্মাণ করেছেন। এরূপ অবস্থায় এখন আর একটি যুদ্ধ যদি বাধে তাহলে ধরাপৃষ্ঠ হতে মানবজাতি ও মানবসভ্যতা যে নিশ্চিহ্ন মুছে যাবে এবিষয়ে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ নেই। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের নামে পৃথিবীর মানুষ আতঙ্কপাণ্ডুর হয়ে উঠবে এতে বিস্মিত হবার কী আছে? শুভবোধে-প্রতিষ্ঠিত মানুষ এই একটা প্রশ্নেরই উত্তর চায় আজ—পৃথিবী হতে বীভৎস নরমেধযজ্ঞের অবসান ঘটবে কবে?

শান্তি জগতের সাধারণ মানুষ সকলেরই প্রার্থিত। কিন্তু যুদ্ধের আতঙ্ক যে প্রত্যেকটি জাতির চিত্তে স্থায়ী নীড় বেঁধেছে। তাই, একান্ত কাম্য হলেও শান্তিবস্তুটি মরুপ্রান্তরে মরীচিকার মতো কেবলই দূরে সরে যাচ্ছে। সমগ্র পৃথিবী কাজ বিক্ষুব্ধ, এখানে শান্তিপ্রতিষ্ঠার পরিবেশ কোথায়? একারণে শক্তিমান রাষ্ট্রই হোক, আর দুর্বল রাষ্ট্রই হোক, মুখে শান্তির বাণী উচ্চারণ করলেও প্রত্যেকে গোপনে গোপনে সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, সকলে রণসম্ভার কেবল বাড়িয়েই চলেছে। ভূতের ভয়ে দ্রুতবেগে আমরা ছুটে পলাই কিন্তু পেছন দিকে যেমন ফিরে না তাকিয়ে পারি না, ঠিক তেমনি, শান্তিকামী হয়েও যুদ্ধভীতি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি না আমরা। পারস্পরিক সন্দেহ, বিদ্বেষ, প্রতিযোগিতাস্পৃহা, শক্তিমদমত্ততা, দুর্বলকে কুক্ষিগত করার অশুভ বুদ্ধি, রাজ্যবিস্তারের ঘৃণ্য বাসনা—এ সমস্ত-কিছু মিলে আজিকার পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতিকে দুর্লভ সামগ্রী করে তুলেছে।

পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে দুটি মহাযুদ্ধ ঘটে গেল, রক্তস্রোতে ধরিত্রী প্লাবিত হল। কিন্তু ভাবী তৃতীয় যুদ্ধের সম্ভাবনা উৎপাটিত হল কৈ? লীগ অব্ নেশনস্

হেগের আন্তর্জাতিক আদালত, নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক, অনাক্রমণচুক্তি, নিরপেক্ষ থাকবার অঙ্গীকার, ইউ. এন. ও.-র সিকিউরিটি কাউন্সিল বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে এযাবৎ সমর্থ হয়েছে কী? প্রতাপের মোহ শক্তিমান রাষ্ট্রগুলি কি অদ্যাবধি বর্জন করতে পেরেছে? তারা কি এখনো দুর্বল রাষ্ট্রের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি হানছে না? এহেন পরিস্থিতিতে দুর্বলেরা সবলের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকবে এ তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই প্রস্তুতির অর্থ নিজেকে যতদূর-সম্ভব অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করা— পূর্ণোদ্যমে সমরোপকরণ বাড়িয়ে তোলা। অন্যদিকে, প্রতাপান্বিত রাষ্ট্রগুলির কথা ধরা যাক্। এদের একে অন্যকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না, প্রত্যেকেই ভাবছে, যে-কোনো মুহূর্তে তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, চতুর্দিকে কেবল দেখছে এরা প্রবল শত্রুর সম্ভাব্য হানা। তাই, নিরুদ্বেগ স্বস্তিতে দিনাতিপাত করা এদের পক্ষে অসম্ভব। মনের গভীরে এই দারুণ সন্দেহ আর অবিশ্বাস প্রতিক্ষণ পোষণ করে চলেছে বলে এরা সম্ভাব্য আক্রমণের প্রতিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে সমরায়োজনের মধ্যে। অস্ত্রনির্মাণের প্রতিযোগিতা এদের প্রায় উন্মাদ করে তুলেছে। রকেট, দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, মেগাটন বোমা, বিচিত্র ধরণের তীব্রগতিসম্পন্ন বিমান আজ যেন পৃথিবীকে গ্রাস করতে উদ্যত। 'দিকে দিকে নাগিনীরা' যেখানে 'বিষাক্ত নিশ্বাস' ফেলছে সেখানে 'শান্তির ললিত বাণী' কি 'ব্যর্থ পরিহাস'-এর মতো শোনাবে না?

যদি শান্তিময় উপায়ে আন্তর্জাতিক সমস্যাসমাধানের কোন উপায় থাকত তবে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে দারুণ সংঘাত অবশ্যই এড়ানো যেত। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে এরূপ পন্থার একান্ত অসদ্ভাব। আরো একটা উপায়ে আমরা যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে পারতাম। যদি আন্তর্জাতিক-সেনাবাহিনীর-শক্তিযুক্ত বলিষ্ঠ বিশ্বরাষ্ট্র বিদ্যমান থেকে নেশন-রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপ তদারক করবার দায়িত্ব নিত তাহলে মনে হয় যখন-তখন বিশ্বের শান্তিভঙ্গ হত না। কঠোর শাস্তির ভয়ে কোনো রাষ্ট্র, সে যতই শক্তিমান হোক, আন্তর্জাতিক বিধিনেষেধ লঙ্ঘনের সাহস পেত না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় লীগ অব্ নেশন্‌স্ কিংবা ইউ. এন. ও. এরূপ বিশ্বরাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেনি। যে সব জাতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য তারা নিজ নিজ স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে সমর্থ হয়নি— শক্তির দ্বন্দ্বে মেতে উঠে উচ্চতর মানবনীতির মর্যাদা তারা প্রায়শই ক্ষুণ্ণ করছে। ফলে শান্তিপ্রতিষ্ঠার পথ অনুক্ষণ কণ্টকাকীর্ণ হয়ে উঠছে। আধুনিক অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে ওঠাকেই প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্র আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় বলে জানছে। আসল কথা হল, আমরা এখন একটা দুষ্টবৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে মরছি—যে-শান্তি আমাদের প্রার্থিত তা অস্ত্রসুরক্ষিত; যতই রণহুংকার শোনা যাচ্ছে, শান্তি ততই সভয়ে আত্মগোপন করছে। অস্ত্রে শান দিয়ে শান্তি খুঁজতে যাওয়া অরণ্যে রোদন মাত্র।

এখন প্রশ্ন, যুদ্ধপ্রস্তুতি কি শান্তিপ্রতিষ্ঠার যথার্থ সহায়ক? এ প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক হতে বাধ্য। একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে, অস্ত্রঝনৎকার কিছুকালের

বিজ্ঞানপ্রভাবিত এই যান্ত্রিক যুগে সাহিত্য ও বিবিধ শিল্পচর্চা কোন্ মূল্য বহন করে

পরিবর্তমানতা বিশ্বসংসারের ধর্ম। বহির্জগৎ আর মানুষের অন্তর্জগৎ প্রতিনিয়ত এই পরিবর্তমানতার স্রোতে ভেসে চলেছে। তাই, যুগ বদলায়, সমাজ পালটায়, মানবের চিন্তাধারা বিবর্তিত হয়। যুগ ও জাগতিক পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার মূল্যবোধেও লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। এক-এক যুগ এক-একটি বস্তুকে বিশেষ মূল্যবান বলে মনে করে। মধ্যযুগে ধর্মকে মানুষ খুব বড়ো একটি বস্তু বলে জেনেছে, য়ুরোপে রেনেসাঁসের কালে বহুবিচিত্র কলাবিদ্যার মূল্য অপর-সব বস্তুর মূল্যকে অনেকদূর ছাপিয়ে উঠেছে। আর, আধুনিক যুগ মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তার মুক্তির যুগ; অধুনা বিজ্ঞানভাবনার সার্বভৌম আধিপত্য, রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের জয়যাত্রা।

আজ বিজ্ঞানের সাফল্য অভূতপূর্ব, একের পর এক এর আবিষ্কারগুলি সত্যই বিস্ময়াবহ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান এমন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে যার জন্যে আমাদের মূল্যবোধ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। আজ আমরা সকলে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছি বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্যের দিকে। বিজ্ঞানের অভাবনীয় অভিনব নিত্যনতুন দান বিশ্বের মানুষকে প্রলুব্ধ করেছে, এ প্রলোভনের সীমাপরিসীমা নেই। বিজ্ঞানী একদিকে প্রকৃতির রহস্যলোকের দ্বার একে একে উন্মোচন করে চলেছে, অন্যদিকে মানুষের হাতে তুলে ধরেছে কত কত ভোগের সামগ্রী, সুখবিধায়ক বিবিধ উপকরণ। এ কারণে বর্তমানে বিজ্ঞানের মর্যাদা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে, সকলের ঝোঁক পড়েছে বিজ্ঞানশিক্ষার দিকে, ফলে অপর-সব জ্ঞানবিদ্যার মূল্য দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। একালের মানুষের বিজ্ঞানপ্রীতি অস্বাভাবিক কিছুই নয়। বিজ্ঞান যে আমাদের পার্থিব জীবনটাকে নানান্ সুখ-সুবিধায় ভরে তুলেছে একথা কে অস্বীকার করবে? বিজ্ঞানের দানগুলিকে বাদ দিলে একালের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাই যে অচল হয়ে পড়ে। শহরের বিদ্যুৎসরবরাহকেন্দ্রগুলি যদি বন্ধ হয়ে যায়, বড়ো বড়ো ফ্যাক্টরীগুলি যদি কাজ বন্ধ করে, যানবাহনের চলার গতি যদি স্তব্ধীভূত হয়, ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্রশিল্পী, ইলেকট্রিশিয়ানের দল যদি তাদের কাজে ইস্তফা দেয় তাহলে দেশের অবস্থাটি একমুহূর্তে কীরূপ দাঁড়াবে, ভাবা যায় না। অতন্দ্র গবেষণায় প্রকৃতিজগতের যে-জ্ঞান বিজ্ঞানী আহরণ করে, প্রাত্যহিক জীবনে আমরা দেখতে পাই তার প্রতিফলন। বিজ্ঞান মানুষের বাস্তব অবস্থার অশেষ উন্নতিসাধন করেছে, মানবসংসার অভাব-দারিদ্র্য-ব্যাধির কবলমুক্ত হবে এ-ই বিজ্ঞানসাধকের অভিলষিত।

উপরে-বর্ণিত পরিপ্রেক্ষায় বিজ্ঞানকে দেখলে, অধুনা বিজ্ঞানশিক্ষার কেন এত কদর তা সহজেই বুঝতে পারা যাবে। এরূপ অবস্থায় অন্যসকল বিদ্যার প্রভাব কমে আসতে বাধ্য।

সাধারণভাবে বিদ্যাকে দুটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়—কলা ও বিজ্ঞান। ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিবিধ চারুশিল্প—যেমন, কাব্য, চিত্র, সংগীত, ভাস্কর্য, ইত্যাদি—কলাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। আর, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইত্যাদি বিদ্যা বিজ্ঞান শাখার অন্তর্ভুক্ত। ফলিত বিজ্ঞানেরও বহুবিচিত্র রূপ। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে এমন একটা যুগ ছিল যখন বিজ্ঞান তার শৈশব অতিক্রম করেনি, প্রকৃতিসংসারের অনেক রহস্য মানবের অগোচরেই ছিল। তখন মানুষের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল বিবিধ কলা, সে-যুগে পাণ্ডিত্য বলতে বোঝাত ভাষা-সাহিত্য দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ অধিকার, নানাবিধ কলাশাস্ত্রের ওপর প্রভূত আয়ত্তি। কিন্তু বিজ্ঞান অতিক্রুত জয়যাত্রার পথে এগিয়ে গিয়েছে। তার বিস্ময়কর অগ্রগতি মানুষকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছে। তার চোখঝলসানো দীপ্তির জন্যেই সাম্প্রতিককালে কলাবিদ্যাগুলি যেন ছায়ায় পড়ে গিয়েছে।

বিজ্ঞান-অনুশীলনের আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার্য। এর বাস্তব উপযোগিতা অস্বীকার করা একরূপ অসম্ভব। আধুনিক সভ্যতা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানভিত্তিক। বিজ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত একালের কৃষি, শিল্প, পরিবহণ-ব্যবস্থা ইত্যাদি এতখানি উন্নত হয়ে উঠতে পারত না। বিজ্ঞানবিদ্যার প্রসার ও সুষ্ঠু প্রয়োগের ওপর অনুন্নত দেশগুলির উন্নতি বা অগ্রগতি অনেকখানি নির্ভরশীল। কৃষিসম্পদ ও শিল্পোৎপাদন-বৃদ্ধি, আর্থনীতিক সচ্ছলতাসম্পাদন, জীবনের মান-উন্নয়ন প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দ্বারস্থ না হলে চলে না। সুতরাং বিজ্ঞানশিক্ষার বিষয়ে একালের মানুষকে উৎসাহী হতেই হবে। বিজ্ঞানের গতিরোধের অর্থ হল প্রগতির পক্ষচ্ছেদন। বিজ্ঞান প্রতিদিন মানুষের আত্মব্যাপ্তির নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে, প্রকৃতির শক্তি ও সম্পদকে কতভাবে সে কাজে লাগাচ্ছে।

বুঝা গেল, বিজ্ঞানচর্চা এ যুগে অপরিহার্য। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কলাচর্চার প্রয়োজনীয়তা একেবারে নেই। কলাবিদ্যার মূল্য বিজ্ঞানবিদ্যার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বিজ্ঞানশাস্ত্রের আত্যন্তিক আবশ্যকতা স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয়, কলাশাস্ত্রকে সম্পূর্ণ পরিহার করে বিজ্ঞানের পরিচর্যা কেবল অকল্যাণকর নয়, একরূপ আত্মঘাতী। আত্মাকে বাদ দিয়ে দেহের পুষ্টিবিধানের প্রয়াস যেমন মূঢ়তার পরিচায়ক, কলাবিদ্যাকে বর্জন করে বিজ্ঞানানুশীলনও তেমনি মূঢ়তাব্যঞ্জক। জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অনেকেই অধুনা বিজ্ঞানের সর্বগ্রাসী আধিপত্যবিস্তার দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন, কলাশাস্ত্রের প্রতি জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান বিরূপ মনোভাব তাঁদের ভাবিয়ে তুলেছে। আধুনিক সভ্যতার বিজ্ঞানমুখিতা সত্যই একটি দুশ্চিন্তার কারণ বটে। বিজ্ঞান স্ফীতকায় হয়ে উঠে কলাকে যদি গ্রাস করে বসে তবে মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ কি? মানুষের জীবনের মহনীয় তাৎপর্যই-বা থাকে কোথায়?

কলাচর্চাবিরহিত জীবন শুষ্কতা ও যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। মানব-জীবনে কলাবিদ্যার খুব বড়ো একটি স্থান রয়েছে, সেই স্থানটিতে তাকে পূর্ণ-অধিষ্ঠিত করতে হবে। বস্তুত, যে-কোনো জাতির উচ্চতর সভ্যতার পরিমাপ হয় তার বিচিত্র কলাসম্পদে। যে-জাতি কাব্যে-চিত্রে-সংগীতে-ভাস্কর্যে ধর্মে-দর্শনে যত বেশি উন্নত তার সভ্যতাও তত উন্নতস্তরের। শিল্পসুন্দর জীবনযাত্রারীতিটিই সুসভ্য মানুষকে প্রদীপ্ত মহিমায় মণ্ডিত করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের বহুকাল পূর্বে প্রাচীন গ্রীস, রোম, অ্যাসিরিয়া, ব্যাবিলন, ইজিপ্ট, চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির অত্যুন্নতি ঘটেছে। এসব দেশের সমুচ্চ গৌরব তাদের কলাশিল্প, ধর্ম ও দর্শনের জন্যে। সেই সুদূর অতীতে বিজ্ঞানবুদ্ধির তেমন বিকাশ ঘটেনি, বিজ্ঞানের আশ্চর্য অভিযানের কথা তখন কেউ শোনেনি। ভারতের বেদ-উপনিষদ-গীতা-রামায়ণ-মহাভারত, কালিদাস-ভবভূতির কাব্য ও নাটক, য়ুরোপীয় কবি হোমার-ভার্জিল-দান্তে-ট্যাসোর মহাকাব্য, গ্রীসীয় ট্রাজেডি, প্লেটো-এরিস্টটলের দার্শনিক গ্রন্থরাজির মূল্য কতখানি তা কোনো সংস্কৃতিমান মানুষকে বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। গ্রীক ও রোমীয় শিল্প-সাহিত্য অদ্যাপি য়ুরোপকে প্রাণিত করেছে, উপনিষদীয় চিন্তাধারার প্রভাব ভারতবাসীর ভাবজীবনে গভীরচারী। অতীতের এই শিল্প-সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন চিরকালের মানুষের আনন্দ-শান্তি-সান্ত্বনার অক্ষয় উৎস।

শুধু সেকালের নয়, একালেও বিবিধ কলাবিদ্যার একনিষ্ঠ অনুশীলন য়ুরোপকে উজ্জ্বল গৌরবের অধিকারী করেছে। ইংলণ্ডের এলিজাবেথ-যুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয় কিসের জন্যে? এই যুগটিতে ড্রেক, ফিসার আদি মানুষ সমুদ্রবক্ষে দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছে, অসংখ্য বীরসন্তান বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করেছে, দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এদের সাহসিকতা ও বীর্যবত্তায় ইংলণ্ড অবশ্যই গৌরবান্বিত। কিন্তু এলিজাবেথ-যুগের সত্যকার মহিমা প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন প্রতিভাধর সাহিত্যকারের নির্মিত শিল্পকর্মের ওপর। এঁরা হলেন স্পেন্সার, শেক্সপীয়র, বেকন প্রভৃতি মৃত্যুঞ্জিৎ সাহিত্যশিল্পীগোষ্ঠী। য়ুরোপের প্রখ্যাত রেনেসাঁসের কালটির প্রাণকেন্দ্র হল প্রাচীন গ্রীসীয়-রোমীয় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুশীলন ও নূতন মূল্যায়ণের প্রয়াস। ভিক্টোরিয়া-যুগের ইংলণ্ড কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্যে নিশ্চয়ই গৌরব বোধ করতে পারে। কিন্তু তার ততোধিক গৌরবজনক সম্পদ নিহিত রয়েছে ডিকেন্স, টেনিসন, কারলাইল, ম্যাথু আর্নল্ড, টমাস হার্ডি, ওয়াল্টার পেটার প্রমুখ স্বনামধন্য সাহিত্যনির্মাতার বহুশ্রুত সাহিত্যিক রচনার মধ্যে। এঁদের শিল্পকৃতির মূল্য কোন্ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চেয়ে কম? শিল্প ও সাহিত্যের মহিমাকথন বাহুল্য মাত্র।

বিজ্ঞান মানুষের বহিরঙ্গ জীবনকে প্রভাবিত করে; মানবের অন্তরঙ্গ জীবনে কলারই সার্বভৌম প্রভাব। মানুষের বস্তুগত-সুখসুবিধার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দান নিঃসন্দেহে অপরিসীম। কিন্তু কেবল স্থূল ভোগস্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই কি মানবাত্মা পরিতৃপ্ত থাকতে পারে? জীবসীমা পেরিয়ে তার যে আত্মিক সত্তা রয়েছে সেখানে বিজ্ঞানের

মূল্য কতখানি? বলতে হয়—খুবই সামান্য। রুটি না হলে মানুষের অবশ্যই চলে না; কিন্তু বাইবেলের সেই অমর বাণীটি 'Man does not live by bread alone' —মানুষ কি কখনো ভুলেছে, না ভুলতে পারে? কলাবিদ্যাবর্জিত মানবজাতির অবস্থাটি কীরূপ দাঁড়াবে তা কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি? সেখানে সৌন্দর্য নেই, সুষমা নেই, প্রাণের সুখদ স্পর্শ নেই, আত্মার বিনির্মল আনন্দ ও শান্তি নেই, আছে শুধু নিষ্প্রাণ যন্ত্রের উন্মাদ ঘূর্ণীনৃত্য, ঐরকম একটি পরিবেশ সত্যই কি পৃথিবীর মানবমানবীর কাম্য? এ প্রশ্নের উত্তর বড়ো একটি 'না'। অবশ্য বিকৃতমস্তিষ্ক মানুষের কথা আলাদা।

দেহের সুখবিধানের দিকেই বিজ্ঞানের সকল দৃষ্টি নিবদ্ধ; যাবতীয় কলাবিদ্যার অভিলষিত প্রাণের আরাম। কলা মানুষকে সৌন্দর্যলোকে, উচ্চতর ভাবভূমিতে উত্তীর্ণ করে দেয়। মানুষের রয়েছে সূক্ষ্ম সুকুমার হৃদয়বৃত্তি, সৌন্দর্যচেতনা, আদর্শের স্বপ্ন, আত্মপ্রকাশের প্রবল বাসনা—চিত্র-সংগীত নৃত্য-কাব্য, ইত্যাদি শিল্পসৃষ্টি উক্ত সব বস্তুরই বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কী? বিজ্ঞানে পাই নিরেট বস্তুকে; শিল্প-সাহিত্য-ধর্ম আদি সামগ্রীর মধ্যে আমরা পাই আমাদের নিজেকে—এদের আনন্দ আত্মসাক্ষাৎকারেরই আনন্দ। উচ্চতর সাহিত্যে-দর্শনে মানুষের মহতী প্রজ্ঞার স্বাক্ষর চিরন্তন কালের জন্যে মুদ্রিত। সত্য শিব ও সুন্দরের স্বপ্ন দেখে যে মানুষ, নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞানচর্চা কখনো তাকে স্থায়ী আনন্দ দিতে পারে না। কলাবিদ্যার অনুশীলন ব্যতিরেকে মানুষের ব্যক্তিপুরুষের সর্বাঙ্গীণ-সম্পূর্ণ বিকাশসাধন কখনো সম্ভব হতে পারে না।

সভ্য ও সংস্কৃতিমান, আর, সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকবর্জিত মানুষের মধ্যে আমরা যখন সুস্পষ্ট পার্থক্যের একটি সীমারেখা টানি সেখানে এরূপ পৃথকীকরণের মূলে রয়েছে কলাবোধ ও বহুরূপী কলার অনুশীলনের সদ্ভাব এবং অসদ্ভাব। বল।সম্পদের ক্ষেত্রে দরিদ্র মানবগোষ্ঠীকে সুসভ্য বলতে আমরা যেন কুণ্ঠিত। জৈব-অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কলার প্রয়োজন নেই বটে, কিন্তু মানবিক অধিকারে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে কলাচর্চা অপরিহার্য। কলানুশীলনের মূল্য কী? মূল্য হল—বিবিধ কলাবিদ্যা আমাদের হৃদয়বৃত্তি, চিত্তবৃত্তিকে উজ্জীবিত ও সঞ্জীবিত করে, মহত্তর ভাব ও ভাবনার জগতে আমাদের উত্তরণ ঘটায়, অসংযত প্রবৃত্তিকে সংযমে বাঁধে, সুন্দরবোধ ও মঙ্গলবোধের ধ্রুবজ্যোতির মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়। সাহিত্য-শিল্প-ধর্ম-দর্শন মানুষের মহামূল্য উত্তরাধিকার। একারণে কলাবিদ্যার অপর এক নাম মানববিদ্যা, সে বহন করে যুগযুগান্তরের মানবসত্যের অন্তরঙ্গ পরিচয়। কলাবিদ্যার অনুশীলনে যে মানবগোষ্ঠী বিমুখ তাকে কিছুতেই সংস্কৃতিমান বলা চলবে না।

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বস্তুতালিকা হতে, কিছুটা অসুবিধে হলেও, বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কারকে যে বাদ দেওয়া চলে এ বিষয়ে বোধ করি মতদ্বৈধ হবে না। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম তো খুব বেশি দিনের কথা নয়—দু'শ তিনশ' বছর মাত্র বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বহু শতাব্দী পূর্বে মানবজাতি তার জীবনযাত্রার মানটিকে উচ্চস্তরে উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছে। প্রাচীন কালে পৃথিবীর সভ্য দেশগুলি বিজ্ঞানসম্পদে

ধনী হতে না পারলেও কলা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার সৃষ্টি বিস্ময়কর, ধর্ম ও দর্শনের উত্তুঙ্গ শিখরে তখন তার অবস্থান। সুদূর অতীতে গ্রীসে, রোমে, বৈদিক ভারতে একালের বিজ্ঞান অবশ্যই ছিল না। তথাপি সমুন্নত সভ্যতার আলোকে এসব দেশ ছিল দীপ্যমান। এতে স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায় যে, বিজ্ঞানের বহুতর দান ছাড়াও মনুষ্যজীবন সুন্দরভাবে অতিবাহিত হতে পারে। পার্থিব সুখ-ভোগের উপকরণে প্রাচুর্য না থাকলে মানুষের জীবন অচল হয়ে পড়বে এরূপ ধারণা করবার সংগত কোনো কারণ নেই। বিজ্ঞান যেমন মানুষের অনেক বস্তুগত অভাব পূরণ করেছে তেমনি প্রতিদিন নতুন অভাব সৃষ্টি করে চলেছে। এরূপ অবস্থায় বিজ্ঞানবলে-সমাহৃত বস্তুর সঞ্চয়তৃষ্ণাকে অধিক না বাড়ানোটাই বিজ্ঞজনোচিত বলে মনে হয়।

বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত নানাবিধ বস্তুকে আমরা ইচ্ছা করলে বর্জন করিতে পারি, কিন্তু উপনিষদ, বাইবেল, কোরাণ, গীতা, কালিদাস, শেক্সপীয়র, বিটোভেন, মোজার্ট, দা-ভিঞ্চি, রাফেলকে পরিহার করবার মতো মূঢ়তা কে প্রকাশ করবে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুঞ্জিৎ রচনাবলীর চেয়ে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, এ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, ইত্যাদির মূল্য কি বেশি? ইংরেজজাতি শেক্সপীয়রকে বাদ দিয়ে নিউটনকে, জার্মান জাতি গ্যেটেকে বাদ দিয়ে আইনস্টাইনকে যদি রাখতে চায় তাহলে সভ্যতা কি পক্ষপাতগ্রস্ত হবে না? বড়ো বিজ্ঞানসাধকের চেয়ে মহৎ কলাসাধক, ধর্মগুরু আর প্রজ্ঞাবান দার্শনিকের প্রভাব জাতির মানসলোকে কি অনেক বেশি গূঢ়সঞ্চারী নয়? অবশ্য একখানা মোটরগাড়ী যে-অর্থে প্রয়োজনীয়, কোনো শিল্পকর্ম কিংবা ধর্মশাস্ত্র কিংবা দর্শনবিদ্যা সে-অর্থে অত্যাবশ্যক নয়। তবু বলব, রবীন্দ্রনাথের গীতিগুচ্ছ থেকে যে মানুষ একজোড়া জুতোর দিকে ধাবিত হয় সে নিতান্তই মূঢ়।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য, বিজ্ঞানের সঙ্গে কলা প্রভৃতি বিদ্যার বিরোধ-কল্পনাটা আসলে ভুল, মনুষ্যজীবনে উভয়েরই যথাযোগ্য স্থান রয়েছে; মানব-সভ্যতাকে সম্পূর্ণতাদানের ক্ষেত্রে এসব বিদ্যার প্রত্যেকেরই দান স্বীকৃত। বহিরঙ্গ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে বিজ্ঞানকে চাই, আর, অন্তরঙ্গ ভাবজীবনে শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি বস্তু না হলে চলে না। এদের একটাকে বাদ দিয়ে অপরকে চাওয়ার অর্থ জীবনকে খণ্ডিত করা। সুতরাং কলা ও বিজ্ঞান উভয়েরই চর্চা ও সমৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়।

মহাশূন্যে পাড়ি

'খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা'—মহাকাশের রহস্য-যবনিকা উন্মোচনের এ আকৃতি কেবল স্বপ্নাতুর কবিরই নয়, অজানাকে জানার প্রবল বাসনা বিজ্ঞানীর চিত্তেও নিত্য জাগরূক। শুধু কবি বা বিজ্ঞানীর কথাই বা বলি কেন, কোন্ আদিকাল থেকে দূরের আকাশ ও আকাশলোকবিহারী কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্র আর সূর্য-চন্দ্র-নীহারিকা এই পৃথিবীর মানুষের মনে অগাধ বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। যদি সে আকাশের দিকে ডানা বিস্তার করে দিতে পারত! কিন্তু হায়, মানুষের যে ডানা নেই, পাখীর মতো শূন্যে ধাবিত হবে কী করে?

নাই-বা রইল ডানা, মানুষের তো রয়েছে আশ্চর্য সৃজনপ্রতিভা—বিপুল উদ্ভাবনী-শক্তি। তার অটল অঙ্গীকার এই উদ্ভাবনী-ক্ষমতাকে সে কাজে লাগাবে, পাখিকে হার মানিয়ে আকাশ থেকে মহাকাশের দিকে উধাও হয়ে যাবে—অনন্ত শূন্যের কিনারা তাকে খুঁজে পেতেই হবে। এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই, অবারণ চলা তো মানুষেরই ধর্ম, বসুন্ধরার জীবকুলের মধ্যে কেবলই মনুষ্যকণ্ঠে উদ্গীত হয়েছে—'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে'—এই আকুল বাণী। কোনোকিছুকেই মানুষ অসাধ্য অসম্ভব বলে স্বীকার করবে না, তার কাছে দুরধিগম্য বলে কিছু নেই। সুদূরের আহ্বান তাকে উন্মনা করে তুলেছে।

প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তিকে প্রতিহত করে একদিন তার যাত্রা শুরু হল, শূন্যে সে ডানা মেলে দিলে—যন্ত্রের অদ্ভুত ডানা। এ ডানার নাম বিমান, নাম—হেলিকোপ্টার। কিন্তু এ তো মানুষকে ঊর্ধ্ব-আকাশে বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে গেল না, আট-দশ-বারো মাইল ওপর উঠে তার বাসনা তো চরিতার্থ হবার নয়। আরো অনেক—অনেক ঊর্ধ্বে তাকে পৌছুতে হবে, একেবারে গ্রহউপগ্রহের দেশে; এমন কি, তাকে পেরিয়ে যেতে হবে সৌরলোক—অপরিমাণ মহাব্যোমকে মদিরার মতো সে পান করবে। বিজ্ঞানীর দল নতুন গবেষণায় রত হল, নিজের দুরন্ত বাসনার ফলসিদ্ধি তার চাই। এবার এক অদ্ভুত জিনিস নির্মাণ করল বিজ্ঞানীরা—রকেট। আতসবাজির কার্যক্রম ও গতিধারার সঙ্গে রকেটের কার্যক্রম ও গতিধারার লক্ষণীয় মিল রয়েছে। প্রায় হাজার বছর আগেও রকেটের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ছিল, চীনদেশে খেলার জন্যে রকেট ব্যবহৃত হত। তবে রকেট সম্বন্ধে নতুন করে গবেষণা শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে—জার্মানীতে। সাম্প্রতিককালে রকেট-বিজ্ঞানের আরো অনেক উন্নতি হয়েছে, এর শক্তির ক্রিয়া মানুষকে বিস্ময়-বিমূঢ় করেছে।

রকেটের মধ্যে জ্বালানীকে অতিদ্রুত পুড়িয়ে প্রচণ্ড চাপে বায়বীয় পদার্থ তৈরী করা হয়। সরু নলের মধ্য দিয়ে তীব্র গতিতে তা যখন বেরিয়ে আসতে থাকে তখন এই নিষ্ক্রমণের বিপরীত দিকে প্রবল ধাক্কার সৃষ্টি হয়। রকেট এই ধাক্কায় অভাবনীয় গতিতে ছুটে চলে। একটা পর্যায়ে একে অনেকদূর ওপরে তোলার মধ্যে ব্যবহারিক অসুবিধে রয়েছে বলে একালের বিজ্ঞানী বহুপর্যায় বা বহুপাল্লার রকেট নির্মাণ করেছেন। এঁরা রকেটের গতিপথকে নির্ভুলভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

রকেটনির্মাণকৌশলটি সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনে বিজ্ঞানসাধকেরা চাইলেন শূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপ করতে। ইংরেজি ১৯৫৭ সালে আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান-বর্ষ [International Geo-physical year] উদ্‌যাপিত হয়েছে। আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্র থেকে ঘোষণা করা হয় উক্ত বিজ্ঞানবর্ষ-উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁরা মহাকাশে বহু রকেট ও কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করবেন। এদের সাহায্যে অসীম শূন্যদেশের ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর স্তরের বিচিত্র খবরাখবর পাওয়া যাবে। এ ছাড়া রকেটাদির সাহায্যে আরো বহুতর বিষয়ে গবেষণা চালাবার সুবিধে হবে,— যেমন, সৌরতৎপরতা, মেরুজ্যোতি, নভোরশ্মি; পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি, চৌম্বকশক্তি, মহাজাগতিক রশ্মি, হিমবিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান, মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে পরিমাপ, ভূমিকম্পবিজ্ঞান ইত্যাদি।

আমেরিকা যখন প্রকাশ্যভাবে এইরূপে দূরের আকাশে নকল উপগ্রহ উৎক্ষেপণের ব্যবস্থা করছিল তখন সোভিয়েট রাশিয়া হঠাৎ একদিন মহাশূন্যে কৃত্রিম উপপগ্রহ পাঠিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিল। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর মানবেতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। ওইদিন রাশিয়ার তৈরি প্রথম উপগ্রহটি যাত্রা করল মহাশূন্যের দিকে। এই স্পুৎনিক-এর কথা মানুষ কোনোদিন ভুলবে না ['স্পুৎনিক' মানে উপগ্রহ]। একটি বহুপর্যায় [multi-stage] রকেটের মাথায় উপগ্রহটিকে বসানো হয়েছিল। নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছানোর পর উপগ্রহটি রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে আপন কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে শুরু করল। প্রায় ১৪০০ বার পৃথিবীকে পাক খাওয়ার পর তিন মাস অতিক্রান্ত হলে এই প্রথম স্পুৎনিক বায়ুর ঘন স্তরে নেমে আসে এবং পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

সৌরলোকের দিকে একবার যখন মানুষের মন ছুটেছে সে কি থামতে চায়! বিপুল-সুদূরের যাত্রী মানুষের অভিযান থামল না। রাশিয়া তার দ্বিতীয় 'স্পুৎনিক' আকাশে পাঠাল ১৯৫৭ সালের ৩রা নভেম্বর ; ২৩৭০ বার পাক খেয়ে প্রায় চার মাস পরে এই নকল উপগ্রহটি প্রথম স্পুৎনিকের মতো একইভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে।

এরপর মার্কিন আমেরিকা ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের কৃত্রিম একটি উপগ্রহ—'আলফা': ১৯৫৮—আকাশে প্রেরণ করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শূন্যে পাড়ি জমানোর ক্ষেত্রে আমেরিকার তুলনায় রাশিয়ার কৃতিত্ব ঢের বেশি। বিজ্ঞানকুশলী রাশিয়া ১৯৫৮ সালের মে মাসে তাদের তৃতীয় স্পুৎনিক কক্ষস্থ করল। ২৯২৫ পাউণ্ড ওজনের এতবড়ো একটি জিনিস অবলীলায়

মহাকাশে পাক খেল ১০০৩৭ বার—১১৭৫ মাইল উর্ধ্বে থেকে—ভাবতেও অবাক লাগে। একবছর এগার মাস ধরে পৃথিবী পরিক্রমা করে রাশিয়ার উৎক্ষিপ্ত উপগ্রহটি আগের দুটির মতোই ভস্মসাৎ হয়।

রাশিয়ার 'স্পুৎনিক' ও আমেরিকার 'আল্‌ফা'কে সাময়িক সাহিত্যে বলা হয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহ বা শিশুচাঁদ। পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ যেমন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে স্পুৎনিকগুলোও তেমনি পৃথিবীকে বেষ্টন করে আবর্তিত হয়েছে। তবে একটু পার্থক্য আছে। এসব স্পুৎনিক কেবল সাময়িকভাবে উপগ্রহ। কেননা, কিছুকাল পাক খাওয়ার পর এরা উল্কার মতো মর্তমৃত্তিকায় ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টায় পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু পৃথিবীর অকৃত্রিম উপগ্রহ চাঁদ অনন্তকাল ধরে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলেছে। মহাশূন্যে তার নিত্যকালের আবর্তন।

অতিদূর নভোলোকের যাত্রী রকেটগুলির সম্বন্ধে সবচেয়ে বড কথা হল, এর ফলে বিজ্ঞানের বিচিত্র গবেষণা সম্ভব হবে। বায়ুমণ্ডলের সর্বাপেক্ষা উর্ধ্বের যে স্তর [Exosphere] সেই স্তর সম্পর্কে কোনো পরীক্ষানিরীক্ষা অদ্যাবধি সম্ভবপর হয়নি। এখন সেই উপরকার স্তরের বায়ুর ঘনত্ব, উষ্ণতা, আর্দ্রতা ইত্যাদি বিষয়ে নানান তথ্য জানা যাবে। আমরা আরো জানতে পারবো, সেই শত শত মাইল ওপরে মহাজাগতিক রশ্মির প্রখরতা কতখানি। নকল উপগ্রহগুলো নিরক্ষবৃত্তের একটা বিশেষ কোণ ধরে ঘুরছে বলে ওদের মধ্যে রক্ষিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে অক্ষাংশের ওপর মহাজাগতিক রশ্মির প্রখরতার ফলাফল বিষয়ে [Latitude effect] অনেক সংবাদ আহৃত হবে। এই রশ্মির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঠিক সংবাদ চয়নের ওপর শূন্যে-পাড়ি-দেওয়ার অভিলাষী মানুষের গ্রহান্তরযাত্রার সফলতা-বিফলতা অনেকখানি নির্ভর করে। কারণ, উক্ত রশ্মিমালা জীবকোষগুলো নষ্ট করে ফেলে।

রাশিয়ার প্রেরিত কৃত্রিম উপগ্রহের সহায়তায় আমরা জানতে পারব সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি এবং এক্সরশ্মি সম্বন্ধে খবরাখবর। সদ্যোক্ত অতিবেগুনি আর এক্স-রশ্মিই আমাদের বায়ুমণ্ডলের আয়নিক স্তরের জন্মদাতা। আবার, এই আয়নিক বায়ুস্তর পৃথিবীর আবহাওয়াকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে। আমাদের দূরপাল্লার বেতারবার্তা প্রেরণের সফলতা-বিফলতার ক্ষেত্রে অনেকটা দায়ী বায়ুমণ্ডলের উক্ত আয়নিক স্তর। ভূপৃষ্ঠে বসে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ও এক্সরশ্মি সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়। কেননা, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এই রশ্মিগুলোকে একেবারে শোষণ করে নেয়; এদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য আহরণ করা হচ্ছে 'স্পুৎনিক'-এ সংস্থাপিত Photo Electronic Multiplier-নামক একপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে। আবার, কৃত্রিম উপগ্রহে রক্ষিত বর্ণালী-বিশ্লেষণ-যন্ত্রদ্বারা জানা যাবে বহুতর জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর দেহের উপাদান। তা ছাড়া, গোটা পৃথিবীর একটা নিখুঁত আলোকচিত্র স্পুৎনিক-এ সংযোজিত টেলিভিশনযন্ত্র মারফত আমাদের হাতে আসবে। এর ফলে ভূপৃষ্ঠের গঠন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেক বাড়বে।

মহাশূন্য পরিক্রমা-সম্পর্কিত আরো অনেকগুলো বাস্তব-সমস্যার সমাধান হবে এই সকল উপগ্রহের সাহায্যে। আমাদের শরীরের যন্ত্রপাতি বায়ুমণ্ডল আর মাধ্যাকর্ষণের শক্তির মধ্যেই কাজ করতে অভ্যস্ত। কিন্তু মহাকাশে যাত্রার পথে ভূপৃষ্ঠের দুশ-তিনশ মাইল ওপরে বায়ুর চাপ অকিঞ্চিৎকর এবং মাধ্যাকর্ষণের শক্তিও সেখানে অপেক্ষাকৃত কম। এরূপ অবস্থায় মানুষের দেহযন্ত্র কী রকম কাজ করবে তা জানা অত্যন্ত দরকার।

আকাশের ঊর্ধ্বস্তরে বাতাসের কোনো স্রোত নেই বলে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া সেখানে বিঘ্নিত হতে বাধ্য। কারণ, প্রশ্বাসের সঙ্গে যে অঙ্গারবাষ্প সে ত্যাগ করবে তা বাতাসের স্রোতের অভাবে একজায়গাতেই জমাট হয়ে থাকবে। শূন্যে বিচরণের ক্ষেত্রে সকল অসুবিধাবিদূরণের জন্যে বিজ্ঞানীরা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় আছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা দ্বিতীয় 'স্পুৎনিক'-এ জীবন্ত একটি কুকুরকে [নাম— লাইকা] সহযাত্রী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। আকাশপরিক্রমাকালে কুকুরটির নাড়ীর স্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তের চাপ এবং হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক ছবি [Electro-Cardiograms] রুশবিজ্ঞানীদের হাতে এসেছে। বহুঊর্ধ্বের সেই বায়ুস্তরের নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং জীবদেহের ওপর সেই রহস্যময় জগতের প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তর খবর আমরা পেয়েছি নকল উপগ্রহের ভিতরকার স্বয়ংক্রিয় বেতারযন্ত্র মারফত [Radio telemetering]।

সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা মহাকাশজয়ের পথে কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলেন, গ্রহান্তরে পাড়ি দেওয়ার পথ নিঃসন্দেহে উন্মুক্ত করে দিলেন। রাশিয়ার বিজ্ঞানবুদ্ধি অসাধ্যসাধন করে চলেছে। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে রুশবিজ্ঞানীরা চাঁদের দিকে লক্ষ্য করে ছাড়লেন ১ম লুনিক। এটি চাঁদের দেশ ছাড়িয়ে গিয়ে চারিদিকে ঘুরতে লাগল—যেন একটি নতুন গ্রহ। তারপর রাশিয়ার উৎক্ষিপ্ত ২য় লুনিক ওই বৎসরেরই সেপ্টেম্বর মাসের ভোর রাতে চাঁদের পিঠে আঘাত হেনে ধূলির ঝড় উঠাল। আমরা আগে জেনেছিলাম যে চাঁদের পিঠ ধুলোয় আচ্ছন্ন। লুনিকের আঘাতে ধূলিঝড়ের সৃষ্টি হওয়াতে আমাদের পূর্বেকার জানা কথার সত্যতা প্রমাণিত হল। আমরা সবসময় চাঁদের একটামাত্র পিঠ দেখতে পাই, কোনো মানুষ কোনোদিন চাঁদের অপর পিঠ দেখেনি—ওপিঠ আঁধারে ঢাকা। কিন্তু রুশ-রকেট ৩য় লুনিক চন্দ্রলোকে অভিযান করে এই অদেখা পিঠের ফটো তুলে নিয়েছে। বর্তমানে সকলেই এরূপ আশা পোষণ করছেন যে অল্পকালের মধ্যেই মানুষ চাঁদের দেশে গিয়ে পৌঁছবে।

লুনিকের সাফল্যে বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত উৎসাহিত হলেন, পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগলো মহাকাশে মানুষ পাঠাবার বহুবিধ পরীক্ষা। তাঁদের এই পরীক্ষাও সফল হল, মর্তমানবের, সুচিকালের স্বপ্ন—মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়ার অতি-আত্যন্তিক বাসনা—বাস্তবে সত্য হয়ে উঠল। ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল দিনটি পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় চিরকাল অক্ষয় অক্ষরে মুদ্রিত থাকবে। এই স্মরণীয় দিনটিতে

মানুষের প্রথম পদক্ষেপ ঘটল মহাকাশে। সেইদিন সকালবেলায় 'ভস্তক' [প্রতীচী]-নামধেয় মহাকাশযানসহ ১২½ মণ ওজনের একটি রুশ রকেট আকাশে উৎক্ষিপ্ত হল। পৃথিবীকে এক পাকের কিছু বেশি ঘুরে ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট পরে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে 'ভস্তক' অবতরণ করল। পৃথিবীর প্রথম আকাশচারী মানুষ সাতাশ বৎসর বয়স্ক মেজর য়ুরি আলেক্সেয়েভিচ গাগারিন উক্ত উপগ্রহ-মহাকাশযান থেকে নিরাপদে নেমে আসলেন। আকাশের নীল রহস্যের যবনিকা প্রথম উন্মোচিত করলেন য়ুরি গাগারিন।

মহাকাশের গোপন-রহস্য-উদ্‌ঘাটনের জন্যে শুধু সোভিয়েট বিজ্ঞানীরাই নন, মার্কিণ বিজ্ঞানীরাও বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছেন। ১৯৬১ সালের মে ও জুলাই মাসে দুজন মার্কিণ বৈজ্ঞানিকও মহাশূন্যে যাত্রা করে ফিরে এসেছেন। তবে তাঁদের সাফল্য তেমন চমকপ্রদ নয়। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক কম্যাণ্ডার এলান শেফার্ড ঘণ্টায় পাঁচ হাজার মাইল বেগে মহাশূন্যে পৌঁছেই পৃথিবীবক্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ষোল মিনিট মহাকাশে ছিলেন। জুলাই মাসে পরবর্তী মার্কিণ বৈজ্ঞানিক ক্যাপ্টেন ভার্জিল গ্রীসম্ এইভাবে পনর মিনিটকাল মহাকাশে থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানীদল বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁদের সংকল্প, আকাশ থেকে মহাকাশে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, তাঁরা ধাবিত হবেন। ১৯৬১ সালের আগস্ট মাসে জগদ্বাসী সংবাদপত্রে এক অত্যাশ্চর্য খবর শুনতে পেল—রাশিয়া তার দ্বিতীয় মহাকাশচারী মানুষ মেজর স্টেপানোভিচ টিটভকে পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ কক্ষপথে স্থাপন করেছে। তারপর জানা গেল, টিটভ পঁচিশ ঘণ্টা আঠারো মিনিট মহাশূন্যে বিচরণ করে সুস্থ দেহে ও সুস্থ মনে মাটির বুকে ফিরে এসেছেন। শূন্যপরিক্রমা-কালে মাটির মানুষের সঙ্গে তাঁর বেতারযোগাযোগ ছিল। মহাকাশে তাঁর প্রতিটি কাজ রুটিনমাফিক চলেছে—আহার করছেন, মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিচ্ছেন, ব্যায়ামও করছেন; আবার, বেতারযন্ত্রটি হাতে তুলে নিয়ে পৃথিবীতে বার্তা পাঠাচ্ছেন নিজহাতে মহাকাশযানটিকে চালাচ্ছেনও তিনি। আরো আশ্চর্যজনক ব্যাপার রাত ৯টার সময় তিনি ঘুমোতে যান, এবং ভোর ৪টা পর্যন্ত এই অভিনব পরিবেশে স্বাচ্ছন্দ্যে নিদ্রিত থাকেন। মহাকাশে মানুষের নিদ্রার আয়োজন এই প্রথম—মহাকাশযানেও।

সেই কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ মহাকাশে বিচরণের স্বপ্ন দেখে আসছে প্রায় একশ বছর আগে বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাসের জনক ফরাসী লেখক জুল ভে মানুষের শূন্যে পাড়ি দেওয়ার কাহিনী রচনা করেন। বৈজ্ঞানিক তথ্য ও কল্পনাশক্তি অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় ভের্ণ-এর লেখায়। শতবর্ষ পূর্বেকার এই প্রখ্যাত কাহিনী রচয়িতার কিছু কিছু কল্পনা আজ বাস্তবে সত্য হয়ে উঠেছে। নভোলোকে বিহরণে যে কলাকৌশল সোভিয়েট রাশিয়া আয়ত্ত করেছে তার তুলনা নেই বললে অত্যুক্তি হ না। ১৯৬৩ সালে রুশদেশীয় এক সাহসিকা নারী—ভেলেন্টিনা তেরেস্‌কোভা—মহাশূ পাড়ি দিয়েছেন। এও এক স্মরণীয় ঘটনা।

মর্তসীমা ছাড়িয়ে মানুষ আজ অনন্ত মহাব্যোমে উধাও হয়ে যেতে চাইছে। এ পথ কিন্তু বিস্তর বিঘ্নে আকীর্ণ। মহাকাশপরিক্রমার সমস্যা অনেক। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য হল—অত্যধিক চাপ, অত্যধিক ওজন, অভিকর্ষশূন্যতা, অত্যধিক উত্তাপ, খাদ্য-পানীয় ও অক্সিজেন-সরবরাহ, এবং অঙ্গারকবাষ্পশোষণ। বিজ্ঞানীরা যে এসকল সমস্যার সমাধান বিষয়ে সচেতন নন এমন নয়। সর্বপ্রকার বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা অনবরতই চলছে।

মোটকথা, ঊর্ধ্বের মহাজগতের অন্য গ্রহে যেতে গেলে মহাকাশযানের কেবিনের মধ্যে আমাদের পৃথিবীর একটি অতিক্ষুদ্র সংস্করণ সৃষ্টি করতে হবে। গ্রহান্তরে অভিযান বেশ কয়েক মাসের ব্যাপার। মানুষকে নিথর নিস্তব্ধ কেবিনে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকতে হবে—অদ্ভুত একটি পরিবেশ। এতদ্ব্যতীত, মহাকাশে উল্কাপিণ্ড ইত্যাদির ভীষণতার সম্মুখীন হওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। মহাজাগতিক রশ্মি, প্রচণ্ড সৌররশ্মি প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়াটিও সহজ কথা নয়। এতসব বাধা উত্তীর্ণ হয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে হবে।

বুঝতে কষ্ট হয় না মহাশূন্যে বিচরণের বাধাবিঘ্ন অসংখ্য। কিন্তু কোন্ বাধার কাছে দুর্গম পথের অভিযাত্রী মানুষ নতি স্বীকার করেছে? মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস তো সংখ্যাতীত বিঘ্ন অতিক্রমণেরই কাহিনী। সব তুচ্ছ করেই তো মানবযাত্রী যুগের পর যুগ এগিয়ে চলেছে। দুর্জয় তার সাহস, অকম্পিত তার মনোবল, ক্ষুরধার তার বুদ্ধি। একথা নিশ্চিত, মহাকাশের প্রতিকূলতাকেও মানুষ একদিন কাটিয়ে উঠবে। গাগারিন-টিটভের মতো অসমসাহসিক মানবসন্তান প্রথমে পাড়ি দেবে চাঁদের দেশে; তারপর এগিয়ে যাবে কাছের গ্রহের দিকে, তারপর দূরের গ্রহ হবে তার অভিযানের লক্ষ্যস্থল। মহাজগতে মানুষের এই যে পদক্ষেপ ঘটল তা খুলে দিল অনন্ত সম্ভাবনার সিংহদ্বার। অতঃপর যন্ত্রকৌশলে মানুষ কী করবে তা ধারণারও অতীত।

স্বাধীন ভারতে নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

নাগরিক কথাটির সাধারণ অর্থ হইতেছে নগর-বাসী। কিন্তু এই শব্দটির পারিভাষিক বিশেষ একটি অর্থ আছে। রাষ্ট্রের নানা ব্যবস্থায় যাহার অংশ গ্রহণের অধিকার আছে, পৌরবিজ্ঞানে একমাত্র তাহাকেই নাগরিক বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই পৌর অধিকার বা নাগরিক অধিকার প্রত্যেক সভ্যদেশের সামাজিক মানুষের একটি বড়ো সম্পদ। পৌর অধিকার হইতে বঞ্চিত মানুষের জীবন নানাভাবে বিড়ম্বিত। আমরা সভ্য মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া রাষ্ট্রপ্রদত্ত কতকগুলি সুযোগসুবিধা ও অধিকার ভোগ করিয়া থাকি। এই সুযোগ-

সুবিধাগুলি দেওয়া হয় নিরুদ্বেগ জীবনযাপনের জন্য, আমাদের আত্মবিকাশসাধনের জন্য। উক্ত অধিকারই পৌরঅধিকার—রাজনৈতিক অধিকার। রাষ্ট্র আমাদিগকে জীবনরক্ষণের অধিকার দিয়াছে, সম্পত্তিভোগ, সংস্কৃতি ও ভাষা সংরক্ষণের অধিকার দিয়াছে, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, আপন আপন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিয়াছে, স্বাধীনভাবে কর্মসম্পাদন ও শিক্ষালাভের অধিকার দান করিয়াছে। এইসকল পৌর-অধিকার ছাড়া রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যেক নাগরিকের কতগুলি রাজনৈতিক অধিকারও স্বীকৃত হইয়াছে। এইগুলি হইতেছে—ভোটাধিকার, সরকারি চাকুরি পাইবার অধিকার, সরকার কিংবা আইনসভার নিকট আবেদন বা আর্জি পেশ করিবার অধিকার। যে রাষ্ট্র নাগরিকদের যত বেশি অধিকার স্বীকার করে, সেই রাষ্ট্রকেই আমরা তত প্রগতিশীল বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকি।

এইবার আমাদের বুঝিতে হইবে, অধিকারসম্ভোগ, এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যেখানে অধিকার সেখানেই দায়িত্ব ও কর্তব্য, ইহাদের কোনো-একটিকে অন্যটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলে না। রাষ্ট্র আমাকে অধিকার দিয়াছে ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করার, অপর-সব নাগরিকের কর্তব্য হইতেছে আমার সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ না-করা। আবার, আমাকেও দেখিতে হইবে, আমার কোনো কার্যকলাপে অন্যের ন্যায্য অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হইতেছে কিনা। এ গেল নাগরিকের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য। অন্যদিকে, রাষ্ট্রের প্রতিও প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য রহিয়াছে। রাষ্ট্র নাগরিকগণকে যে-সব অধিকার দিয়াছে তাহার জন্য রাষ্ট্রকে নাগরিকদের কিছুটা মূল্য অবশ্যই দিতে হইবে। বিনামূল্যে, বিনাকর্তব্যসম্পাদনে ও বিনাদায়িত্ব পালনে কোনো অধিকার ভোগ করা যায় না।

প্রথমে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা যাক্। যে-রাষ্ট্র কর্তৃক আমাদের মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকৃত হইয়াছে, উহার প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য স্বীকার করা আমাদের সকলের প্রথম কর্তব্য। যে-রাষ্ট্রকে আমরা স্ব-ইচ্ছায় গড়িয়া তুলিয়াছি, সে-রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার কর্তব্য ও দায়িত্ব আমাদেরই। বিদেশীর আক্রমণ হইতে আপন রাষ্ট্রকে প্রাণের বিনিময়ে হইলেও রক্ষা করিতে হইবে নাগরিককে। দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার জন্যই রাষ্ট্র আইন রচনা করে। সরকারপ্রণীত যে-আইন জনকল্যাণের বিরোধী নয়, নির্দ্বিধায় সে-আইন প্রত্যেক নাগরিকের মানিয়া চলা উচিত। অবশ্য যে-আইন জনস্বার্থের বিরোধী তাহাকে বিধিসম্মতভাবে সর্বপ্রকারে বাধা দিয়া সংশোধিত করিবার প্রচেষ্টা করিতে হইবে। শাসনযন্ত্রপরিচালনার জন্য সরকারকর্তৃক যে-কর ধার্য হয় সকল নাগরিকের কর্তব্য হইতেছে সেই কর যথাসময়ে প্রদান করা। নতুবা রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো শাসনকার্যই সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না।

ভোটদানের অধিকার সুসভ্য আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের খুব বড়ো একটি অধিকার। বিচারযুক্তিসহ সকলের এই বাঞ্ছিত অধিকারটিকে নির্বাচনকালে ব্যবহার করার দায়িত্ব সত্যই গুরুতর। ভোটদানের অধিকারী নাগরিকের কর্তব্য হইতেছে

যথার্থ গুণী ও উপযুক্ত নির্বাচনপ্রার্থীকে ভোট দেওয়া। ভোটাধিকার-ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। কেননা, নাগরিকের ভোটের সহায়তায় যদি অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের সরকার গঠিত হয় তাহা হইলে শাসনকার্য ভালরূপে চলিতে পারে না—ইহাতে জনস্বার্থ পদে পদে ক্ষুণ্ণ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কেন্দ্রস্থলে থাকিবে জনসেবা, দেশসেবা ও রাষ্ট্রের সেবা। ভারতবর্ষ আজ বিদেশীর শাসনশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া তাহার চিরঅভীপ্সিত স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রকে সর্বপ্রকারে উন্নত করিয়া তুলিয়া দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের দায়িত্বভার বর্তমানে আমাদের উপরই বর্তাইয়াছে। ব্রিটিশ-আমলে ভারতবাসী তাহার ন্যায্য পৌরঅধিকার ভোগ করিতে পারে নাই—বিদেশি শাসকের হাতে তাহার ব্যক্তিস্বাধীনতা পদে পদে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বহুবিধ নাগরিক-অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল বলিয়া ভারতের মানুষ এতকাল অশেষ গ্লানির মধ্য দিয়া দিন অতিপাত করিয়াছে। এখন রাষ্ট্রপরিচালনার সকল ভার পড়িয়াছে ভারতবাসীর উপর। সুতরাং বলিতে হইবে, রাষ্ট্রকে সুপরিচালিত করিবার দায়িত্ব আমরাই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছি। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র মানুষের গণতন্ত্রসম্মত সকল মৌলিক অধিকারকে আনন্দে স্বীকৃতি জানাইয়াছে। এই অধিকারগুলি যাহাতে রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে পারে, ইহাদের সহায়তায় যাহাতে প্রত্যেক নাগরিক আত্মবিকাশসাধন করিতে পারে, সেদিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা কর্তব্য। নিজেদের অধিকার ও স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিব, পরের অধিকার ও স্বাধীনতাকে কখনো ক্ষুণ্ণ করিব না, ক্ষুদ্রস্বার্থ বিসর্জন দিয়া রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করিব—এই প্রতিজ্ঞাই প্রতিটি ভারতবাসী যেন অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করে।

প্রত্যেক ভারতবাসীকে সুনাগরিকের মহান আদর্শের পথে চলিতে হইবে। ইহার জন্য চাই বিচারবুদ্ধির স্ফুরণ, আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তির দমন, অজ্ঞতা, উদ্যমহীনতা ও সংকীর্ণ দলাদলি বর্জন এবং আত্মবিকাশের সহায়ক শিক্ষার্জন। নাগরিকদের শিক্ষা ও বিচারবুদ্ধি যদি সদাজাগ্রৎ থাকে তাহা হইলে সুনিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সহজ হইয়া পড়ে—শাসনতন্ত্রের পরিচালনায় অযোগ্য ব্যক্তির স্থান হয় না। আত্মদমন করিতে না পারিলে, স্বার্থপরায়ণতা বিসর্জন দিতে শিক্ষা না করিলে, রাষ্ট্রে সর্বসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণ কখনো আসিতে পারে না। সুনাগরিককে সর্বথা সর্বপ্রকার মানসিক জড়তা ও উদ্যমহীনতা পরিহার করিতে হইবে, নিজের স্বাধীনতা সম্পর্কে সতত সতর্ক থাকিতে হইবে, রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। অপরে করিবে, এই কাজটি আমার না করিলেও চলে, এইরূপ মনোবৃত্তি নিজের তথা সমগ্র দেশের অকল্যাণ ডাকিয়া আনে। 'স্বাধীনতাস্পৃহার অভাব ঘটিলেই শাসনতন্ত্র-পরিচালকগণ নাগরিকের

অধিকারের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়েন, ফলে কখনো কখনো সরকার স্বৈরাচারী পর্যন্ত হইয়া উঠেন। আপনার কর্তব্যকর্মে নাগরিকের উদাসীনতাই ব্যক্তিস্বাধীনতার অপমৃত্যুর কারণ।

রাজনৈতিক দল না থাকিলে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না সত্য, কিন্তু দলীয় আদর্শের নামে সংকীর্ণ দলাদলি নাগরিকরা অবশ্যই বর্জন করিবে। আত্মকলহ জাতির অপঘাত-মৃত্যুর হেতু হইয়া দাঁড়ায়। স্বার্থপরতা ও দলগত সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া চলা আমাদের প্রধান কর্তব্য। আমরা সর্বশক্তি লইয়া সমাজসেবা করিব, দেশসেবা করিব। তবে মনে রাখিতে হইবে, আমাদের দেশপ্রেম যেন উগ্ররূপ ধারণ করিয়া অপর দেশের স্বাধীনতাহরণে মাতিয়া না উঠে। প্রতিমুহূর্তে আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আমরা শুধু ভারতের অধিবাসী নই, আমরা বিশ্বসমাজেরও অধিবাসী। তাই, জাতীয়তাকে ক্রমশ আন্তর্জাতিকতার দিকে পরিচালিত করাই নাগরিকের একটি মহৎ আদর্শ হওয়া উচিত।

ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিকদের সম্মুখে আজ বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য রহিয়াছে। প্রায় দুইশত বৎসর ভারতবর্ষ শাসনের পর সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজজাতি বাধ্য হইয়া এদেশ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা পিছনে রাখিয়া গিয়াছে মহাশ্মশানের ভগ্নস্তূপ : অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অবিশ্বাস্য দুঃখদারিদ্র্যের গভীরে ভারতবাসী আজ নিমজ্জমান। হিন্দুমুসলমানের আত্মঘাতী কলহ দেশের সংহতিশক্তিকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে আমাদের দুর্ভাগ্যবশত অখণ্ড ভারতবর্ষ আজ দ্বিধাবিভক্ত। মানুষের অপরিমিত লোভ আর স্বার্থান্ধতা কোটি কোটি মানুষকে আজ মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। এই যে ভয়াবহ প্রতিকূল পরিস্থিতি, ইহার বিরুদ্ধে ভারতের সকল নাগরিককে সংগ্রাম করিতে হইবে। নিরক্ষরতা, কুশিক্ষা, দুঃখদারিদ্র্য ইত্যাদি বিদূরিত করিয়া ভারতকে জগতের শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে। সেজন্য আমাদের প্রত্যেকের সুনাগরিকের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলা একান্ত কর্তব্য। এতদিনের সংগ্রামের পর যে-স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি আমাদের অশুভ বুদ্ধি যেন তাহার শত্রু হইয়া না দাঁড়ায়। নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ পালন করিতে পারিলে, আমরা স্বাধীন জাতির গৌরব কখনো হারাইব না।

সক্রিয় রাজনীতিতে ছাত্রসমাজের যোগদান কি সমর্থনযোগ্য ?

রাজনীতিচর্চা ও রাজনীতিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের ঔচিত্য-অনৌচিত্য-বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন মত পোষণ করেন। সত্যই বিষয়টির সপক্ষে ও বিপক্ষে নানাবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা করা চলে। একশ্রেণীর ব্যক্তি অভিমত প্রকাশ করেন, ছাত্রজীবন অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনেরই প্রশস্ত ক্ষেত্র, রাজনীতির ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া ছাত্রদলের বিভ্রান্ত হওয়া সমর্থনযোগ্য নয়। আবার, আর-একদল ব্যক্তি বলেন, রাজনীতিক চেতনা আজ রাষ্ট্রের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আর্থনীতিক প্রতিক্রিয়া সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সকল মানুষকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। বর্তমানের ছাত্রসম্প্রদায়ও সামাজিক মানুষ, সুতরাং রাজনীতিচর্চা হইতে তাহারা দূরে সরিয়া থাকিতে পারে না— আধুনিক জগতে কেবল গ্রন্থকীট হইয়া পড়িয়া থাকা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

অতীত দিনের ভারতবর্ষে ছাত্রদল অধ্যয়নকে কঠোর তপস্যারূপেই গ্রহণ করিয়াছিল। তখন সমাজে বিরাজ করিত নিরুপদ্রব শান্তি—সর্বগ্রাসী আর্থিক চিন্তা মানুষের জীবনকে বিব্রত করিয়া তুলিত না, দুষ্ট রাজনীতির আবর্তসংকুল প্রবাহ সমাজের স্তরে স্তরে মারাত্মক চোরাবালি সৃষ্টি করিত না। তাই, সে যুগে ছাত্রদের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জন বাধাগ্রস্ত ছিল না। গুরুগৃহে, বিদ্যানিকেতনে যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করার পর সেকালের ছাত্রদল অতি সহজভাবেই সংসারজীবনে প্রবেশ করিয়া আপন কর্তব্য নিশ্চিন্ত মনে পালন করিত। কিন্তু সেকাল আর একালের মধ্যে অনেক পার্থক্য। বর্তমানে সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে দ্রুত রূপান্তর সামাজিক মানুষকে সজোরে নাড়া দিতেছে—শ্রেণীসংগ্রামের ঝড়োহাওয়ায় অধুনা দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিতেছে। সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়নের জন্য উৎসর্গীকৃত ছাত্রসমাজের মানসলোকেও তাই আজ এক নবতন প্রাণ-চেতনা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। সেজন্য বর্তমানের ছাত্রদল গ্রন্থের জগৎ হইতে ক্ষণে ক্ষণে বহির্জগতে তাহাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া ধরিতেছে। জীবনচেতনা যাহার আছে, যুগধর্মকে সে অস্বীকার করিতে পারে না।

একথা স্বীকার্য যে, ছাত্রসম্প্রদায় আজ দেশের বিভিন্ন রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হইয়া পড়িতেছে। বর্তমানের ছাত্র-আন্দোলনকে বৃহত্তর রাজনীতিক ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলে না। যেখানে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারীর স্পর্ধা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় সেখানেই দেশের যুবসমাজ তাহার সকল

শক্তিসামর্থ্য লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে জনসমাজের প্রতি কর্তব্যবোধহেতু—তাহারা নীরবে অনাচার-অত্যাচার বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না। রাষ্ট্রের আর্থনীতিক আবহাওয়া এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনীতিক প্রতিক্রিয়াশীলতা এরূপ পরিস্থিতির জন্য যে কিছুটা দায়ী, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ'-মন্ত্রটিকে এ যুগের ছাত্রদল অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে অসমর্থ বলিয়া তাহাদের অভিভাবক, বহু শিক্ষাবিদ্ এবং দেশনেতা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন সত্য, কিন্তু এই অপরাধের জন্য ছাত্রসম্প্রদায়ের উপর সকল দোষ চাপাইয়া দেওয়া কতখানি সমীচীন তাহা অবশ্যই চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই দ্রুত পটপরিবর্তনের যুগে ছাত্রদল যে রাজনীতির সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না একথা স্বীকার করিয়া লইয়াই ছাত্রসমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে আমাদের অভিমত এখানে ব্যক্ত করিতেছি। শুধু গ্রন্থের জগতে নিবদ্ধ থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানার্জনই ছাত্রসম্প্রদায়ের একতম আদর্শ ও কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি না। ছাত্রদলকে সমাজের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে জীবন ও জগৎকে নূতন করিয়া যাচাই করিয়া লইবার সামর্থ্য অর্জন করিতে হইবে, সমাজসেবা, জনসেবা, দেশসেবায় তাহাদিগকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এইসকল সেবাকার্যের সঙ্গে যে জটিল রাজনীতির একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে তাহার সীমারেখাটি ছাত্রদিগকে চিনিয়া লইতে হইবে। রাজনীতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেই দেশের প্রতি সকল কর্তব্য শেষ হইয়া যায় না। রাষ্ট্রকে, দেশকে, সমাজ-ব্যবস্থাকে উন্নত ও সর্বপ্রকার কলঙ্কমুক্ত করিয়া তুলিতে হইলে এমন সহস্র সহস্র মানুষের প্রয়োজন—যাহারা জ্ঞানে, চিন্তায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রবলে যথার্থই শক্তিমান।

ভবিষ্যতের এই শক্তিমান মানুষ আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে বর্তমানের অগণিত শিক্ষার্থীর মধ্যেই। যে-দেশে রহিয়াছে বহুসংখ্যক জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, চিন্তানায়ক, শিল্পী, সাহিত্যিক, কর্মী, সে-দেশকেই আমরা বলি উন্নত—অগ্রসর। আমাদের দৃষ্টিকেও সেদিকে প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে। জ্ঞান অর্জন, চরিত্রগঠন, মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন এবং দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিতির প্রশস্ত ক্ষেত্র হইল ছাত্রজীবন। এই অমূল্য ছাত্রজীবনকে উপেক্ষা করিয়া, ছাত্রধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া রাজনীতির ঘূর্ণীপাকে প্রতিদিন আত্মনিমজ্জন করা যে বাঞ্ছনীয় নয়, নিবিষ্ট মনে একটু চিন্তা করিলেই ইহার সত্যতা ছাত্রসমাজ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবে। ছাত্রদের জীবনে রাজনীতিচর্চার স্থান আছে, কিন্তু রাজনীতিচর্চাকেই তাহারা যেন তাহাদের প্রধান কর্মকৃত্য বলিয়া মনে না করে। তাহারা আগে ছাত্র, পরে দেশসেবক—এই সত্যটি মনে রাখিলে, নানা বিশৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খলতার হাত হইতে ছাত্রদল সহজেই মুক্ত হইতে পারিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

রাজনীতির ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করিতে হইলে দেশের আভ্যন্তরীণ গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে। লোকচরিত্র ও রাজনীতির অ-আ-শিক্ষাও

লাভ করে নাই, এইরূপ ছাত্র যদি রাজনীতিক আন্দোলনে নির্বিচারে ঝাঁপাইয়া পড়ে তাহা হইলে নিজের এবং দেশের কাহারো কল্যাণ সাধিত হয় না। সে-ক্ষেত্রে অমূল্য ছাত্রজীবনের অপচয়টাই শুধু বড় হইয়া উঠে; আর, এই অপচয় জাতীয় জীবনে শোচনীয় ব্যর্থতাকেই ডাকিয়া আনে। শিক্ষা, সমাজ, বাস্তব জীবন ও রাষ্ট্রের সম্পর্কে বহুদর্শিতা লাভ না করিয়া রাজনীতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা আত্মহত্যারই সামিল।

ছাত্রদের চিত্ত সাধারণত ভাবাবেগপ্রবণ। অনেক স্বার্থান্বেষী দেশনেতা ছাত্রদলের এই ভাবপ্রবণতার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে আপন আপন দলগত স্বার্থসিদ্ধির কাজে নিযুক্ত করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। ইহাতে দেশের রাজনীতি যেমন কলুষিত হইয়া উঠে, তেমনি ছাত্রেরাও উত্তেজনার মুহূর্তে তাহাদের উচ্চাদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হয়। বর্তমান কালের বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়গুলির দিকে তাকাইলে স্পষ্টত বুঝা যায়, শিক্ষানিকেতন-সমূহ আজ ধীরে ধীরে রাজনীতিক আন্দোলন ও সংকীর্ণ দলাদলির কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে। তুচ্ছ বিষয় লইয়া কথায় কথায় ধর্মঘটের আশ্রয় লওয়া ছাত্রদের যেন স্বভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, বিদ্যানুরাগ, শিক্ষাজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রসম্প্রদায় যে এখন নিতান্ত উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। দেশের এরূপ একটি অবস্থা কখনো বাঞ্ছনীয় নয়।

বিদ্যানিকেতনে ছাত্রদের বিতর্কসভায় স্বদেশের ও বিদেশের রাজনীতিক অবস্থা-বিষয়ে, জাতির বিবিধ সমস্যা-সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা চলিতে পারে—সময়ে সময়ে শ্রদ্ধেয় ও খ্যাতিমান রাজনীতিবিদকে শিক্ষালয়ে আমন্ত্রণ জানাইয়া সারগর্ভ বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। ইহাতে ছাত্রদের রাজনীতিক জ্ঞান বর্ধিত হয়, চিন্তার নানামুখী প্রসার সাধিত হয়, বক্তৃতা করিবার শক্তিসামর্থ্যও বাড়ে। জাতীয় জীবনে কোনো চরম মুহূর্ত না আসিলে, আমাদের মতে ছাত্রদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করাই ভালো। ছাত্রশক্তি—যুবশক্তি—দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ। তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ উদ্বোধন ঘটিলে জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। বড়ো কাজ করিতে গেলে আগে তাহার অনুরূপ শক্তি অর্জন করা প্রয়োজন, সেইজন্যই তো কবিগুরু বলিয়াছেন: 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি'। পাঠ্যজীবনে ছাত্রসম্প্রদায়কে এই শক্তি—চরিত্রশক্তি, আত্মপ্রত্যয়শক্তি, জ্ঞানশক্তি, বিচারবুদ্ধির শক্তি—যথাসাধ্য অর্জন করিতে হইবে।

দেশ আজ স্বাধীন হইয়াছে, স্বাধীন ভারতে ছাত্রদলের দায়িত্ব ও কর্তব্য পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। সর্ববিধ শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তাহারা মাতৃভূমির গৌরব বর্ধিত করিয়া তুলুক, ইহাই আমাদের প্রার্থিত।

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা

(আধুনিক সমাজজীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব ও প্রচলন যে কতখানি ব্যাপক তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। রেল-স্টীমার-বিমানপোত যেমন এযুগের মানুষের কাছে পৃথিবীর দূরত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছে, সংবাদপত্রও তেমনি জগতের দূরদূরান্তের মানুষকে একান্ত কাছের করিয়া তুলিয়াছে, অচেনা-অজানার সঙ্গে আমাদের নিকটতর পরিচয়ের যোগসূত্র রচনা করিয়াছে। পৃথিবীর একপ্রান্তে এই মুহূর্তে একটি ঘটনা ঘটিল, আর, সংবাদপত্রের মাধ্যমে পরমুহূর্তেই ঘরে বসিয়া আমরা তাহার খবর পাইতেছি।) বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে, মানুষের বিচিত্র কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়ণকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া লইবার সুযোগ-সুবিধা কাহারো ঘটে না। কিন্তু প্রতিদিনকার সংবাদপত্রের উপর চোখ বুলাইলেই এসব অদেখা মানুষকে আমরা দেখিতে পাই, তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনের কর্মধারার সহিত আমরা পরিচিত হই, বিশাল পৃথিবীর রূপটির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটে। সংবাদপত্র আজ বড়ো পৃথিবীর প্রতিবিম্ব নিজের বুকে চিহ্নিত করিয়া আমাদের ছোট ঘরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। (নিখিল জগতের সহিত পরিচয়সাধনের আকাঙ্ক্ষা যাহার মধ্যে প্রবল তাহার পক্ষে সংবাদপত্র অপরিহার্য।)

(বর্তমান যুগের সভ্য মানুষ সংবাদপত্রের অস্তিত্বহীনতার কথা কল্পনাও করিতে পারে না। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন পৃথিবীর কোনো দেশেই সংবাদপত্র বলিয়া কোনো বস্তু ছিল না। তখন কাছের মানুষ ছিল অনেক দূরে,) পৃথিবীর পরস্পর-সংলগ্ন দেশগুলি ছিল পরস্পর হইতে একরূপ বিচ্ছিন্ন। সেই অতীত দিনে যখন দুয়েকজন মানুষ দূরদেশে ভ্রমণ করিয়া আসিত, দেশের লোক তাহাদের নিকট অদেখা অপরিজ্ঞাত দেশের ঘটনা উৎকর্ণ হইয়া শুনিত—তখন এইভাবেই নিবৃত্ত হইত মানুষের অজানাকে জানিবার দুর্বার কৌতূহল। (সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে) দেশবিদেশের সংবাদ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাও মানুষ উপলব্ধি করিল, এবং এই প্রয়োজনের তাগিদেই (একদিন আবির্ভাব হইল সংবাদপত্রের।)

(বহুশত বৎসর পূর্বে চীনদেশেই প্রথম সংবাদপত্রের প্রচলন হয়। মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভবও এই চীনদেশে। মানবসভ্যতার দ্রুত বিস্তারের ক্ষেত্রে চীনদেশের এই দুইটি দান স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।) ভারতবর্ষে মোগল আমলে হস্তলিখিত সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল এবং তখন পর্যন্ত ইহার অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ ছিল রাজ্যশাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে—গণজীবনের সঙ্গে সংবাদপত্রের যোগ তখনো স্থাপিত হয় নাই। য়ুরোপে সংবাদপত্রের প্রথম প্রচলন হয় ইতালীতে, তারপর জার্মানীতে এবং পরে ইংলণ্ডে। (বাঙলাদেশে সংবাদপত্রের প্রথম প্রচলন হয় ইংরেজ আমলে) এজন্য বাঙলাদেশ ইংরেজ মিশনারীদের নিকট ঋণী।)

(সংবাদপত্র আজ সমাজমানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য বস্তু বলিয়া স্বীকৃত।) মুদ্রাযন্ত্রের বিস্ময়কর উন্নতি, সাংবাদিকতার প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনুরাগ, গণতন্ত্রের ক্রমপ্রতিষ্ঠা সংবাদপত্রের ব্যাপক প্রচারকে ত্বরান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। (বর্তমানে লোকশিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হইল সংবাদপত্র,) এবং জনমত গঠনে ইহার প্রভাব অপরিসীম। আধুনিক যান্ত্রিক যুগে মানুষের জীবনযাত্রা যতই জটিল হইয়া উঠিতেছে, সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা ততই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এতদ্ব্যতীত জনগণের মধ্যে রাজনীতিক ও সমাজমুখী চেতনার উদ্বোধন সংবাদপত্রের প্রচারকে আশ্চর্য গতিদান করিয়াছে।

(আজিকার দিনে প্রভাতে ঘুম ভাঙিতে-না-ভাঙিতেই আমাদের হাতের কাছে চাই একখানি সংবাদপত্র। ইহার এতখানি জনপ্রিয়তার কারণ কি? সংবাদপত্রে কেবল চলতি দুনিয়ার কয়েকটি নির্দিষ্ট খবরই যে মুদ্রিত থাকে তাহাই নয়— রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, খেলাধুলা, বিচিত্র আমোদ-প্রমোদ, জীবিকা উপার্জনের সন্ধান ইত্যাদি নানাকিছুই সংবাদপত্রে স্থানলাভ করিতেছে।) সুতরাং সকল শ্রেণীর, সকল রুচির মানুষই সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বাহিরের বড়ো পৃথিবীকে আমাদের হাতের মুঠোয় তুলিয়া ধরিবার ভার লইয়াছে এই সংবাদপত্র, ইহার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত অক্ষরগুলি যেন সমগ্র বিশ্বের হৃৎস্পন্দনেরই প্রতীক।

(জাতীয় জীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব অনেকখানি।) ইহা একদিকে গোটা পৃথিবীর বহুতর সংবাদ পরিবেশন করে, অন্যদিকে প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করে, ভাষ্য রচনা করে। ফলে (ইহার মাধ্যমে পাঠক-পাঠিকা জাগতিক পরিবেশ ও অজস্র তথ্যের সঙ্গে যেমন পরিচিত হয়,) তেমনি ইহার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত প্রতিদিনকার সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি জনসাধারণের চিত্তে রাজনীতিক ও সমাজনীতিক চেতনার উদ্বোধন ঘটায়। এইভাবে জনমত গঠিত হয়, মানুষ বহির্বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠে, ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে রাষ্ট্রিক জীবন ও সমাজজীবনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। (সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া আমরা রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতি ও বহুবিধ কর্মপন্থার পরিচয় লাভ করি, আবার, সরকারের জনকল্যাণবিরোধী নীতির সমালোচনা করিবার সুযোগও পাই। সমাজের ও রাষ্ট্রের অন্যায়-অবিচারের যথার্থ প্রতিকার করিতে হইলে সংবাদপত্রের আশ্রয় গ্রহণ অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে।)

গণতন্ত্রের সার্থক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীন অস্তিত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। (বর্তমানে পৃথিবীতে রাজনীতির চর্চাই মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে,) আবার, ইহার সঙ্গে সম্পৃক্ত রহিয়াছে অর্থনীতি। তাই, (আধুনিক যুগে অধিকাংশ সংবাদপত্রেরই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল রাজনীতি ও অর্থনীতি।) (সেজন্য রাজনীতিবিদ্, সরকার ও জনসাধারণ নিজ নিজ মতবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সংবাদপত্রের উপর নির্ভরশীল।) সংবাদপত্র জনসাধারণকে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ক শিক্ষাদান করে) এবং সমাজের নানা দুর্নীতি ও কুসংস্কার বিদূরিত করিয়া মানুষের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উন্নত করিয়া তুলিবার যথেষ্ট

সহায়তা করে। (জাতীয় জীবনগঠনে, জনসেবায়, লোকশিক্ষাপ্রচারে উন্নতশ্রেণীর সংবাদপত্রের দান অসামান্য। সংবাদপত্র আধুনিক সভ্যতার একটি বড়ো অঙ্গ।)

(দেখা যায়, পৃথিবীতে খুব কম বস্তুই মানুষের পক্ষে অবিমিশ্র কল্যাণকর। সংবাদপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যাইবে, ইহা জনগণের যেমন কল্যাণ-বিধান করিয়াছে তেমনি ইহা দ্বারা সময় সময় মানুষের বহু অকল্যাণও সাধিত হইয়াছে।) সংবাদপত্রের পরিচালকবর্গ জনসেবার মহৎ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া দলগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থসিদ্ধির মানসে যখন ইহাকে অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করে, তখন সমাজ-জীবনে ইহার প্রভাব মারাত্মক হইয়া উঠে। (দেশে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা, রাজনীতিক দলাদলি ও বিদ্বেষদুষ্ট মনোভাব, নানারকম কুৎসা ও মিথ্যা প্রচারের জন্য অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বহীন সংবাদপত্রই দায়ী।) হীন স্বার্থসাধনের বশবর্তী হইয়া সাংবাদিক যখন ন্যায়ধর্ম, বিবেকবুদ্ধি ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া যায় তখনই সংবাদপত্র জন-সাধারণের অকল্যাণের আকর হইয়া উঠে।)

সাংবাদিকের কর্তব্য হইল জনসাধারণকে সত্য ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করা। ইহার পরিবর্তে ক্ষুদ্রস্বার্থের প্রভাবে পড়িয়া যাঁহারা অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষকে মিথ্যাপ্রচারণায় বিভ্রান্ত করিয়া তোলেন তাঁহারা সমাজের শত্রু—সংবাদপত্রসেবার যোগ্য তাঁহারা নন। সাংবাদিকের দায়িত্ব গুরুতর, তাঁহার কর্তব্য সত্যই কঠিন। তাঁহাকে হইতে হইবে যথার্থ জনসেবক, সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক, নিরপেক্ষ—দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিতে না পারিলে সংবাদপত্র কখনো জনকল্যাণ-সাধন করিতে পারে না। পক্ষপাতহীন সংবাদপত্র দেশে আজো বিরলদৃষ্ট।

বৃত্তিহিসাবে সাংবাদিকতা আমাদের দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের দৃষ্টি এখন পর্যন্ত তেমন আকৃষ্ট করে নাই। উন্নত ধরণের সাংবাদিকতার জন্য যে বিশেষ ধরণের শিক্ষার প্রয়োজন, সে-ধারণা আমাদের অনেকেরই নাই। কোন একটা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চডিগ্রীধারী হইলেই যথার্থ সাংবাদিক হওয়া যায় না। ইহার জন্য চাই পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান, সংবাদসরবরাহ ও পরিবেশন-বিষয়ে বিচক্ষণতা, ঘটনার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান ব্যাপারে নিপুণতা; চাই সত্যনিষ্ঠা, চিত্তস্থৈর্য, নির্ভীকতা এবং আরো নানাকিছু। সার্থক সাংবাদিকতা যে একটি উচ্চশ্রেণীর আর্ট এ কথাটি বিস্মৃত হইলে চলিবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাংবাদিকতা শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এই অত্যাবশ্যক শিক্ষণীয় বিষয়টি কিন্তু আমাদের দেশে এখনো উপেক্ষিতই রহিয়া গিয়াছে। জাগতিক পরিবেশের পটভূমিকায় প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলিকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিতে গেলে যে কতখানি বিদ্যাবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। সংবাদসরবরাহ ও প্রকাশনার দায়িত্ব সত্যই গুরুতর।

আদর্শ-সাংবাদিককে যথার্থ জনসেবক হইতে হইবে, বৃহত্তর সমাজকল্যাণকে তুলিয়া ধরিতে হইবে দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে। দেশের জনগণকে রাজনৈতিক ও সমাজনী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা, জাতিকে ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালনা

জনসাধারণের মধ্যে নানাবিষয়িনী শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ করার মহৎ দায়িত্ব তাঁহাকে প্রসন্ন চিত্তে বহন করিতে হইবে। সংবাদপত্রসেবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা সকলে যদি সচেতন হইয়া উঠি, তাহা হইলে সংবাদপত্রের স্বাস্থ্যকর প্রভাবে জনগণ যে অচিরেই আদর্শ-নাগরিকের স্তরে উন্নীত হইবে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

স্বাধীন ভারতে ইংরেজি ভাষার স্থান

ব্রিটিশের প্রায় দুইশত বৎসরের শাসনশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষ বর্তমানে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ইংরেজ কর্তৃক ভারতবিজয় ভারতবাসীর পক্ষে একটি কলিতার্থময় ঘটনা। রাজনীতিক পরাধীনতা জাতির জীবনে কত বড়ো অভিশাপ ডাকিয়া আনে, ব্রিটিশশাসিত ভারতের দিকে তাকাইলে তাহা যথার্থ উপলব্ধি করা যাইবে। ভারতবর্ষের সত্যকার পরাজয় সেইদিন সূচিত হইল যেদিন হইতে ইংরেজি ভাষা দেশের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করিল—যেদিন হইতে ইংরেজি ভাষা গৃহীত হইল ভারতের কোটি কোটি মানুষের শিক্ষার মাধ্যমরূপে। রাজনীতিক পরাধীনতা মারাত্মক, সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক সাংস্কৃতিক পরাধীনতা।

স্বেচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক, ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার বাহনহিসাবে গ্রহণ করিয়া জাতীয় জীবনে সাংস্কৃতিক পরাভবকেই আমরা স্বাগত জানাইলাম। বিজয়ী জাতির ভাষা বিজিত জাতির জীবনকে কতখানি প্রভাবিত করে ও গ্লানিময় করিয়া তুলিতে পারে, তাহার নির্ভুল পরিচয় রহিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী মেকলে সাহেবের এই উক্তির মধ্যে: 'We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern —a class of persons, Indian in blood and colour but English in taste, in opinions, in morals and in intellect'—ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার প্রচেষ্টা সার্থক হইলে পর মেকলে জয়গর্বে উল্লসিত হইয়া এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সে যাহা হোক, ইংরেজি ভাষা যথাসময়ে রাষ্ট্রভাষার গৌরব অর্জন করিল, শিক্ষার মাধ্যমহিসাবে স্বীকৃত হইল, এবং ইহারই ফলে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যপরিচালনা অনেকখানি বাধামুক্ত হইয়া উঠিল। ভারতবাসী বর্তমানে তাহার মাতৃভাষাকে যতখানি চিনে না, তাহার চেয়ে অনেক বেশী চিনে ও জানে ইংরেজি ভাষাটিকে। এরূপ একটি অবস্থা জাতীয় জীবনে কতখানি গ্লানিজনক,

ভারতবর্ষে একদিন বিজাতীয় ইংরেজি ভাষার প্রভূত আভিজাত্য ছিল, সুপ্রচুর সম্ভ্রমমর্যাদা ছিল। ইংরেজি না শিখিলে সে-সময় কেহ চাকুরি পাইত না, ইহাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে কোনো মানুষ দেশের লোকের কাছে সম্মানলাভ করিত না। সেদিন আমাদের কাছে ইংরেজিশিক্ষা ছিল যেন কল্পতরু—দেশবাসীর উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তব জীবনে ফলসিদ্ধির নিয়ামক। আজ কিন্তু ইংরেজজাতি ভারত ত্যাগ করিয়াছে, আমরা স্বাধীন মানুষের স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছি। এখন আমাদের প্রশ্ন হইতেছে, স্বাধীন ভারতে ইংরেজি ভাষার স্থান কতখানি?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরেজিশিক্ষার সুফল ও কুফল—এই দুইটি দিকেরই যথার্থ বিচার করিতে হইবে। প্রথমে বলা যাইতে পারে, এই ভাষাটির একাধিপত্য ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনের উপর যে অনেকখানি ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সে-সম্বন্ধে মতদ্বৈধের অবকাশ নাই। ইহা আমাদের জন্য বহন করিয়া আনিয়াছে নিদারুণ ব্যর্থতা। মানুষের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করিয়া তোলা, মানুষকে জাগতিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত করিয়া তাহাকে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার শক্তিসামর্থ্য দান করা, জনগণের চিত্তে জ্ঞানের আলোক বিকিরণ করিয়া জাতির জীবনকে সার্বিক কল্যাণের পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়াই হইল যথার্থ শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

(কিন্তু সুদীর্ঘ কালের ইংরেজিশিক্ষা আমাদের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটায় নাই, মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করে নাই, জাতির চিৎপ্রকর্ষসাধন করে নাই, দেশবাসীর মানসিক শক্তিকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে নাই, জনগণকে ব্যবহারিক জীবনে আত্মনির্ভরশীল হইবার মতো ক্ষমতা দান করে নাই। ইহা দেশের সার্বজনীন শিক্ষার প্রবাহকে রুদ্ধগতি করিয়াছে, আমাদের মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে—সর্বোপরি দেশের মানুষে-মানুষে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া জাতির সংহতিশক্তিকে একরূপ বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। ইংরেজিশিক্ষিত ও ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ, দেশে এই যে দুটি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা সাংঘাতিক রকমের জাতিভেদ। ইহারই রন্ধ্রপথে বহু অকল্যাণ, বহুবিধ গ্লানি প্রবেশ করিয়া জাতিকে সর্বনাশের পথে টানিয়া আনিয়াছে।) ইংরেজিশিক্ষার এই কুফলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন: 'Among the many evils of foreign rule, blighting imposition of a foreign language upon the youth of the country will be counted by history as one of the greatest. It has estranged them from the masses'। (ইংরেজিশিক্ষা আমাদিগকে যতখানি মুগ্ধ করিয়াছে ততখানি সঞ্জীবিত করে নাই—এই অভ্রান্ত সত্যটি কে অস্বীকার করিবে?)

তবে ইংরেজিশিক্ষা-দ্বারা আমরা যে উপকৃতও হইয়াছি, সে-কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই আমরা য়ুরোপীয় চিত্তের, পাশ্চাত্ত্য মানসিকতার নিকটসংস্পর্শে আসিয়াছি। য়ুরোপের সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-রাজনীতি-সমাজনীতির সহিত পরিচিত হওয়ার ফলে আমাদের মানসলোকে নবচেতনার উদ্বোধন ঘটিয়াছে

আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে, জগৎ ও জীবন-সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে অভিনবত্ব দেখা দিয়াছে—এককথায়, আমাদের কিয়ৎপরিমাণ চিৎপ্রকর্ষসাধিত হইয়াছে। দেশবাসীর সংকীর্ণ আচার-বিচার-সংস্কারের অচলায়তনকে বিধ্বস্ত করিল য়ুরোপীয় মনের প্রবল জঙ্গমশক্তি, ইহারই ফলে একদিন ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছিল রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণ। য়ুরোপীয় চিত্তের সংঘাতপ্রভাবে ভারতবাসীর সমাজজীবনে ও রাজনীতিক জীবনে একটা নূতন প্রাণের সাড়া জাগিয়াছিল, য়ুরোপের নিকট হইতে আমরা পাইয়াছিলাম দেশাত্মবোধের দীক্ষা। এই সব দিক হইতে বিচার করিলে ইংরেজিশিক্ষার দান অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

দেড়শত বছরের অধিক কাল ধরিয়া যে-ভাষার অনুশীলন আমরা করিতেছি, আমাদের জাতীয় জীবনে তাহার প্রভাব যে গভীর ও দূরপ্রসারী হইবে তাহাতে বিস্মিত বোধ করিবার কিছুই নাই। স্বাধীনতালাভের পর হইতে ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগিয়াছে। এই ভাষাটির বিষয়ে অনেকেরই মনে বিরূপ মনোভাব দেখা যাইতেছে। যেহেতু দেশে আজ ইংরেজশাসনের অবসান ঘটিয়াছে সেহেতু এখন বাহির হইতে অন্য কেহ আমাদের উপর ইংরেজি ভাষাকে জোর করিয়া চাপাইয়া দিতে পারে না। বর্তমানে আমাদিগকেই সুচিন্তিত-ভাবে স্থির করিতে হইবে—ইহা গ্রহণীয়, না বর্জনীয়।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী পরলোকগত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন, 'ইংরেজি ভাষা এতকাল ধরিয়া আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ও সরকারি কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে যে-বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে উহা আর সেই স্থানটি দখল করিতে পারে না। ভারতীয় কোনো একটি ভাষাকেই ধীরে ধীরে তাহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কিন্তু সর্বক্ষেত্র হইতেই রাতারাতি যদি ইংরেজিকে নির্বাসিত করা হয় তাহা হইলে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অবশ্যই একটা বিপর্যয় দেখা দিবে।' শিক্ষামন্ত্রীর এই উক্তির যাথার্থ্য অনস্বীকার্য।

কালক্রমে হিন্দীভাষা যে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইবে, সে-বিষয়ে বোধ করি সন্দেহ নাই। তবে আন্তঃপ্রাদেশিক ক্ষেত্রে ভাবের সহজ আদান-প্রদান ও সরকারি কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য হিন্দীভাষাকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে আমাদিগকে আরো কিছুকাল ইংরেজি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার স্থানে অধিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। এই কতিপয় বৎসরের মধ্যে হিন্দী যদি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিভাষাসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে তাহা হইলে ইংরেজিকে বর্জন করিলে তেমন কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা হয়তো থাকিবে না। এ গেল রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে ইংরেজির প্রয়োজনীয়তার দিক।

এখন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজির কথাটি বিবেচ্য। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভারতের আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ভাষাগুলিকেই মাধ্যমরূপে গ্রহণ

করিতে হইবে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে না পারিলে শিক্ষা কখনই যথার্থ ফলপ্রসূ হইয়া উঠিতে পারে না। মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজিকে একটি সহায়ক ভাষারূপে [subsidiary language] গ্রহণ করা যাইতে পারে। উচ্চশিক্ষার ব্যাপারেও দেশীয় ভাষাকে উপযুক্ত পরিভাষার সাহায্যে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়া যাহাতে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করা যায়, আমাদিগকে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা যতদিন সম্ভবপর না হয় ততদিন ইংরেজিই উচ্চ-শিক্ষার বাহন থাকিবে। মৌলানা আজাদ বলিয়াছেন, 'প্রচেষ্টার ত্রুটি না ঘটিলে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় একটি ভাষাকে [হিন্দীকে] আমরা এমন সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিব, যাহা আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইংরেজির স্থানটি দখল করিতে সমর্থ হইবে।' বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজিকে আবশ্যিক শিক্ষণীয় ভাষারূপে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিবার প্রয়োজন আছে। তবে বর্তমানে পরীক্ষাপাসের ব্যাপারে ইহার উপর যতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়, ভবিষ্যতে ততখানি না করিলে ক্ষতি নাই। ইংরেজি ভাষার প্রতি মোহান্ধতার ভাবটি আমাদিগকে কাটাইয়া উঠিতে হইবে, অন্যদিকে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনের দিকে সকলকে মনোযোগী হইতে হইবে।

ভাষার সমস্যাটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি জটিল। ইহার সমাধানে খুবই সতর্কতার প্রয়োজন—অন্ধ স্বাদেশিকতা আমাদের যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে যেন আচ্ছন্ন না করে। ইংরেজি ভাষাকে একেবারে বর্জন করিলে বিশ্ববিদ্যার দ্বার আমাদের নিকট রুদ্ধ হইয়া যাইবে। সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞানসাধনার ফলসিদ্ধি এই ভাষাটিতেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে বৃহত্তর জগতের চিন্তা ও ভাবসাধনার সঙ্গে আমাদের চিত্তের যোগসূত্রটি ছিন্ন হইয়া যাইবে। এরূপ একটি অবস্থা জাতীয় জীবনে অগ্রগতির পক্ষে সত্যিই ক্ষতিকর। একদিকে ইংরেজির প্রতি অন্ধমোহ, অন্যদিকে ইহার বিরুদ্ধে অন্ধ স্বাদেশিকতার মনোভাব—এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলে ইংরেজি ভাষার অনুশীলনে আমরা যে যথার্থই উপকৃত হইতে পারিব তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

স্বাধীন ভারতে সামরিক শিক্ষা

পৃথিবীর প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রেই জনগণকে সামরিক শিক্ষা দান করা জাতীয় শিক্ষারই একটা অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনরূপ বিরুদ্ধ-প্রশ্ন স্বাধীন দেশের জনসাধারণের মনে কখনো জাগিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। কিন্তু ভারতবাসীর ক্ষেত্রে সামরিক শিক্ষা এতকাল একটি প্রধান সমস্যার বিষয় ছিল। এরূপ অবস্থার জন্য দায়ী ভারতের সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক পরাধীনতা। বিগত দেড়শত বৎসর পর্যন্ত ভারতের ভাগ্যবিধাতা ইংরেজজাতি ভারতবাসীকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তাহাদের প্রতিনিয়তই একটা ভয় ছিল, যদি পরাধীন ভারতবাসী সামরিক শিক্ষায় পারদর্শী হইয়া উঠে তবে সুযোগ পাইলেই তাহারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালাইবে। এইরকমের ভয় ও অবিশ্বাস আমাদের সামরিক শিক্ষালাভের অধিকারের বিপক্ষে বার বার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অন্যদিকে, বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে অহিংসানীতি—যে নীতি সংগ্রামকে প্রশ্রয় দিতে চায় না, হিংসাকে হিংসার বিরুদ্ধে চায় না মাথা তুলিতে দিতে। অহিংসানীতির যাঁহারা প্রচারক তাঁহারা বলেন, যুদ্ধ পশুশক্তিরই একটা অভিব্যক্তি, পশুবলকে পশুবল দিয়া জয় করা যায় না—ইহাকে জয় করিতে হইলে চাই প্রেম, প্রীতি ও আত্মিকসাধনালব্ধ শক্তি। নীতিহিসাবে অহিংসাকে অগ্রাহ্য করা যায় না—কয়েকজন বিশিষ্ট মানবের পক্ষে এই আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠাও অসম্ভব নয়। কিন্তু সমগ্র জাতিকে অধ্যাত্মসাধনমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা সম্ভব কিনা, একথাটি বিশেষভাবে বিবেচ্য। মানুষের সীমাহীন লোভ, প্রবল জিগীষা ও জিঘাংসার যতদিন পর্যন্ত না বিনাশ ঘটিবে ততদিন মানুষ সহিংস সংগ্রাম হইতে বিরত থাকিবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

অন্ততপক্ষে আত্মরক্ষা করিবার জন্য হইলেও সংগ্রামপ্রস্তুতির প্রয়োজন রহিয়াছে। অহিংসানীতি যেখানে প্রবলের অত্যাচার-উৎপীড়ন রোধ করিতে পারে না সেখানে হিংসানীতি বা যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। বর্তমানে পৃথিবীতে নানাকারণে সংগ্রাম যখন অনিবার্য এবং অহিংসানীতিও যখন সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তখন মানুষকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আধুনিকতম সংগ্রামকৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে। স্বাধীন জাতিহিসাবে যদি বাঁচিবার অধিকার আমাদের থাকে তবে ভারতবাসীর সামরিক শক্তিলাভের দাবী কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। স্বাধীন ভারতের আত্মরক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্র নির্মাণ করিতে হইলে আমাদের সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বীকার্য। ব্রিটিশজাতি আজ এদেশ ছাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই অপর কোনো শক্তিমান জাতি ভারতকে আক্রমণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না।

সামরিক শিক্ষা ভারতবাসীর পক্ষে নূতন-কিছু নয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের আমলেই ভারতের জনগণ যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্রব্যবহার ভুলিয়া গিয়াছে নানা বিধিনিষেধের ঘূর্ণাচক্রে পড়িয়া। ভারতবর্ষ নানা বৈদেশিক জাতির আক্রমণ বহুবার সহ্য করিয়াছে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য তখন আমাদিগকে ব্রিটিশের সাহায্য লইতে হয় নাই। অতীত ভারতের রাজপুত, শিখ ও মারাঠা জাতির শৌর্যবীর্য ও রণকুশলতার কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এখনো মুদ্রিত রহিয়াছে। বিগত দুইটি বিশ্বযুদ্ধে ভারতের অসংখ্য সেনা বিভিন্ন রণাঙ্গনে তাহাদের প্রশংসনীয় শক্তিসাহস ও কুশলতার পরিচয় দিয়াছে।

ভারতে সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা যে একেবারেই হয় নাই, আমরা সে কথা বলিব না। কিন্তু যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দেরাদুন সমরবিদ্যালয়ে ভারতবাসীকে কিছুটা সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু সেখানে মাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় সেনাদলে সকল প্রদেশের তরুণদের প্রবেশাধিকারও সমান নয়। ভারতবাসীদের মধ্যে সমরে পটু [Martial] ও সমরে অপটু [Non-martial] এই রকমের জাতিবিভাগ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। সাম্প্রতিক যুদ্ধে পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের সমরপটু সেনার পাশে তথাকথিত সমরে অপটু বাঙালি কিংবা মাদ্রাজী সেনা সমান কৃতিত্বই প্রদর্শন করিয়াছে। সুবিধা ও সুযোগ লাভ করিলে বাঙলা, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যের যুবকও যে যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে পারে, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারে না।

বিজ্ঞানের ক্রম-উন্নতি এবং প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের প্রকৃতিও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। এ যুগের যুদ্ধ জলে-স্থলে-আকাশে পরিব্যপ্ত হইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের ভীষণতা ও মারণশক্তি বিশ্ববাসীকে ভয়ার্ত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতে যে-সামরিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহা আধুনিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী যাহাতে অধুনা-আবিষ্কৃত অস্ত্রচালনায় নিপুণতা লাভ করিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। পরিখাযুদ্ধের দিন অতিবাহিত হইয়াছে, বর্তমানে যুদ্ধ অতিমাত্রায় যান্ত্রিক যুদ্ধে রূপান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং এদেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যান্ত্রিক-যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষার প্রণালী প্রবর্তন করিতে হইবে। সংগ্রামের আকৃতি ও প্রকৃতির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যদি সমান পদক্ষেপে চলিতে না পারি তবে অত্যাবশ্যক সামরিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

আয়তনে ভারত একটি বিশাল দেশ—হাজার হাজার মাইলব্যাপী ইহার সীমান্তভাগ বিস্তৃত। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ভারতের সীমান্ত-ভাগের স্থানগুলি বিশেষভাবে সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন। ভারতের সমুদ্রতীর অনেক হাজার মাইল ব্যাপিয়া প্রসারিত। এদেশের কয়েকটি সীমান্ত হইতে যে-কোনো মুহূর্তে বহিঃশত্রুর উপদ্রব আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই যে এতবড়ো

একটি দেশ, ইহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব ভারতবাসীর। সুতরাং ইহার জন্য চাই সুশিক্ষিত নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং স্থলবাহিনী। ভারত রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও দেশরক্ষাবিষয়ক ব্যাপারে আজ যে-স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, সেই স্বাধীনতাকে সর্বপ্রকার বিপদমুক্ত করিবার জন্যই চাই সামরিক বিদ্যায় নিপুণ অজস্র ভারতীয় সেনা। ভারতবিভাগ সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে বহুগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আমাদের দূরবিস্তার একটি সীমান্ত রহিয়াছে, সেখানে কোনো প্রাকৃতিক বাধা নাই। দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সেখানে বিশাল সৈন্যবাহিনী রাখিতে হইবে। এ সত্যটি ভুলিলে চলিবে না যে, বর্তমান পৃথিবী রণোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

জিগীষা ও জিঘাংসাবৃত্তি মানুষের রক্তের সংস্কার। এইসব বৃত্তি সমূলে উৎপাটিত না হইলে পৃথিবী হইতে কখনো সংগ্রামের বিরতি ঘটিবে না। ভারতবাসীকেও সতত সেই সংগ্রামের ও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। শুধু সংগ্রামের জন্য নয়, শান্তির সময়েও সেনাদলের প্রয়োজন আছে। এদেশে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর প্রাদুর্ভাব প্রায়শ ঘটিয়া থাকে। এরূপ দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের মুহূর্তে দেশে শান্তি, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর সাহায্যের প্রয়োজন আছে। সুগঠিত জাতীয় সেনাবাহিনীর মূল্য শান্তির সময়েও উপেক্ষণীয় নয়।

স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতবাসীর দেশরক্ষার দায়িত্ব শতগুণ বাড়িয়া গেল। ইংরেজজাতি এদেশ পরিত্যাগ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতি সমগ্র দেশকে দুর্বল, পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। আমাদের চতুর্দিকে বিপদের কালো মেঘ আজ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। তা ছাড়া, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধও অসম্ভব কিছু নয়। এরূপ অবস্থায় স্বাধীন ভারত যদি সামরিক শক্তিতে শক্তিমান হইয়া না উঠে তাহা হইলে তাহার অস্তিত্বরক্ষা কঠিন হইয়া পড়িবে। প্রেম, মৈত্রী ও প্রীতির সদিচ্ছাপূর্ণ বাণী পররাজ্যলোভী মানুষের অশুভ পশুমনোভাব বিদূরিত করিতে পারিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। তাই, অস্ত্রকে অস্ত্রের দ্বারা, রক্তমুখী পশুবলকে ভীষণ মারণ-শক্তির দ্বারা, প্রতিহত করিতে হইবে।

ভারতবাসীকে ব্যাপকভাবে সামরিক শিক্ষায় পারদর্শী করিয়া তুলিতে হইলে সামরিক বিদ্যালয়ের প্রভূত প্রসার আবশ্যক। তা ছাড়া, সমরে পটু এবং সমরে অপটু, এরকম শ্রেণীবিভাগ অচিরেই তুলিয়া দিতে হইবে। প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ মনোভাব এখনো যদি আমরা বর্জন করিতে না পারি তাহা হইলে দেশরক্ষা-ব্যাপারে ভারত বিপন্ন হইয়া পড়িবে। ভারতের নানা অঞ্চলে সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক প্রদেশের স্বাস্থ্যবান তরুণ যুবক এইসব বিদ্যালয়ে যাহাতে সহজে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি বটে কিন্তু স্বাধীন মানুষের মনোভঙ্গি এখনো অর্জন করিতে পারি নাই। সেজন্য ভারতবাসীর চরিত্রে অদ্যাপি নানারকমের দুর্বলতা বিদ্যমান। দেশকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য আমাদিগকে সকলরকমের চারিত্রিক

দুর্বলতার উর্ধ্বে উঠিতে হইবে। দেশপ্রীতি, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণের অভাব না ঘটিলে ভারতবাসী অদূর ভবিষ্যতে সামরিক শক্তিতে নিশ্চয়ই দুর্জয় হইয়া উঠিতে পারিবে।

আমার প্রিয় বাঙালি গ্রন্থকার ঃ বঙ্কিমচন্দ্র

বাঙ্‌লাকথাসাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্যে বিশিষ্ট একটি মর্যাদার আসন লাভ করিয়াছে। বঙ্গভারতীর বরপুত্রগণ তাঁহাদের অপূর্বসুন্দর রচনাসম্ভারে এই সাহিত্যকে প্রতিদিন সমৃদ্ধ করিতেছেন। বাঙালি বলিয়া, এবং বাঙ্‌লাসাহিত্যের পাঠক হিসাবে পরিচয় দিতে, আমরা আজকাল বিশেষ একটা গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থকার কে, তাহা হইলে এককথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। নানাবিষয়িনী রচনায় নানা লেখক আমার অন্তরে তাঁহাদের চিরন্তন আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথাপি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকেই আমার প্রিয় গ্রন্থকার বলিয়া বিবেচনা করি। কেন করি, তাহার আলোচনা সহজ নয়। কেন-না, রুচি ও সহানুভূতি কার্যকারণ বিশ্লেষ করিয়া চলে না—তাহা একান্ত হৃদয়গত ও মানসপ্রবণতাগত এক ব্যাপার। অতএব যুক্তি বা বিশ্লেষণের অপেক্ষা না রাখিয়া আমার অন্তরের উপলব্ধির সাহায্যেই আমি বঙ্কিমকে বুঝাইবার প্রয়াস করিব।

বাঙ্‌লাসাহিত্যের অতীতের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখন দেখিতে পাই গদ্যসাহিত্য বলিতে আমাদের বিশেষ কিছু ছিল না—উপন্যাস তো দূরের কথা। ইংরেজ মিশনারীরাই প্রকৃতপক্ষে দেশে গদ্যসাহিত্যের পত্তন করিলেন। নানা লেখকের প্রচেষ্টায় নিবন্ধসাহিত্য কিছু কিছু রচিত হইল। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি লেখকেরা উপন্যাসরচনায় ব্রতী হইলেন, কিন্তু সে-প্রচেষ্টা তেমন সার্থকতা অর্জন করিল না। এসময় বঙ্গসাহিত্যের দিক্‌চক্রবালে নবোদিত সূর্যের কিরণপ্রভা বিকীর্ণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় ঘটিল। বঙ্কিমের আবির্ভাব বাঙ্‌লা সাহিত্যে যুগান্তরের সূচনা করিল। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন : 'বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।'

প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যরূপে বঙ্কিম প্রথম সাহিত্যসংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন—কবি হইবার বাসনায়। কিন্তু কবিতা যে বঙ্কিমের মানব-ধর্মের অনুকূল ছিল না তাহা তিনি অচিরাৎ উপলব্ধি করিলেন এবং পরবর্তী সময়ে আপন প্রতিভার বাহন উপন্যাস-রচনায় হস্তক্ষেপ করিলেন। মধুসূদনেরই মতো প্রথম-বয়সে বঙ্কিমও ইংরেজির

মোহে বিভ্রান্ত হইয়া তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'Rajmohan's Wife' ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের মতোই তিনিও বুঝিলেন : 'কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমলকানন'—এবং মোহভঙ্গের পর সেইযুগে অনাদৃতা অবমানিতা বাঙ্‌লাভাষাকেই নিজের সার্থক লেখনীর বাহন করিয়া লইলেন। বঙ্কিমের সম্পাদিত মাসিকপত্র 'বঙ্গদর্শন' বাঙালি-পাঠকসমাজকে চমকিত করিল। একটি বলিষ্ঠ লেখকগোষ্ঠীসহযোগে যূথপতি বঙ্কিম এই পত্রে সাংবাদিকতার যে-ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন, আজো তাহা অননুকরণীয় হইয়া আছে। কিন্তু একমাত্র সাংবাদিকতারই নয়, জাতীয়তার তথা জাতীয় সাহিত্যের প্রথম অঙ্কুরও 'বঙ্গদর্শন'-এ আত্মপ্রকাশ করিল ; আর, এই জাতীয় সাহিত্যের কর্ণধার হইলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র।

'বঙ্গদর্শন'-এর পাতায় তাঁহার উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' যে নবীন ধারার সূচনা করিল তাহা দেশবাসীকে বিস্ময়চকিত করিয়া তুলিল। কবিত্বমণ্ডিত ভাষার গম্ভীর ছন্দোভঙ্গিমায়, বর্ণনার নিপুণ চাতুর্যে, ঐতিহাসিক ঘটনা ও রোম্যান্সের আশ্চর্য বিন্যাসে 'দুর্গেশনন্দিনী' সেদিন এক অপূর্ব সৃষ্টি বলিয়া অভিনন্দিত হইল। ইহার পরে আসিল 'কপালকুণ্ডলা'। তরঙ্গমুখর নির্জন সমুদ্রতীরে আসন্ন সন্ধ্যার পটভূমিতে বনদুহিতা 'কপালকুণ্ডলা'র যে-বাণীবিগ্রহ তিনি রচনা করিলেন রোম্যান্সহিসাবে বিশ্বসাহিত্যেও তাহা অতুলনীয় বলিতে হইবে।

এই দুইটি উপন্যাসে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব কিছু কিছু থাকিলেও বঙ্কিম ক্রমেই এই প্রভাব কাটাইয়া উঠিলেন—অসাধারণ প্রতিভাবলে সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি মৌলিক পথ তিনি আবিষ্কার করিয়া লইলেন। বঙ্কিমের স্মরণসুন্দর 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'মৃণালিনী', 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী', 'রজনী', 'ইন্দিরা' ও 'সীতারাম' প্রভৃতি উপন্যাসাবলী বাঙ্‌লা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদরূপে পরিগণিত হইল। আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে সম্রাটের যে-মর্যাদা বঙ্কিম লাভ করিলেন, সেই ক্ষেত্রে অদ্যাবধি তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আছেন। তাঁহার পরে বহু সাহিত্যরথী আসিয়াছেন, তাঁহারা বহু মনোরম ও মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমের ন্যায় কল্পনার বিশালতা ও রচনার শক্তিমত্তা যে তাঁহাদের অনেকেরই নাই, একথা বলিলে বোধকরি সত্যের অপলাপ ঘটিবে না।

শুধু ঔপন্যাসিক হিসাবে নয়, সমালোচক হিসাবেও বঙ্কিম অদ্বিতীয়। তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্র', 'গীতা'-সম্পর্কিত মননসমৃদ্ধ আলোচনা এবং শ্লেষগর্ভ 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাঙ্‌লা সাহিত্যের এক-একটি স্বর্ণপীঠিকা। উপন্যাসের রূপকলা ও রসসৃষ্টির মধ্যে বঙ্কিমের যে-লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয় মিলে, সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সেই প্রতিভারই পূর্ণ পরিচিতি বহন করিতেছে। তাই, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সাহিত্যের 'সব্যসাচী' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

বঙ্কিমপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিতে গেলে আমাদিগকে কয়েকটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। তিনি বাঙ্‌লা গদ্যকে পূর্ণতা দিয়া ইহাতে সরসতা ও গতিশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন ; গদ্যের একটি নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন

বিদ্যাসাগর ও প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনারীতির সমন্বয়বিধান করিয়া আদর্শ বাঙ্‌লা-গদ্যভঙ্গি নিরূপিত করিয়াছেন; ঐতিহাসিক ও পারিবারিক উপন্যাস রচনা করিয়া বঙ্কিম কথাসাহিত্যের পরিধি বহুদূর প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। বস্তুত, প্রথম মৌলিক তথা সার্থক উপন্যাস রচনা করিয়া বঙ্কিম শুধু বাঙ্‌লার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ঔপন্যাসিকদের পথিকৃৎ হইলেন।

বাঙ্‌লাসাহিত্যে রুচি ও শুচিতা প্রথম প্রবর্তন করিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাচীন কথাসাহিত্যে 'কামিনীকুমার' বা 'নয়নতারা'-জাতীয় গ্রন্থে যে স্থূলভ ও বিকৃত আদিরসের প্রাবল্য ছিল, এবং টপ্পা ও খেউড়-গানের মধ্যে আমাদের যে চারিত্রিক অবনতি প্রকটিত হইয়াছিল, মনীষী বঙ্কিম তাহাকে মার্জিত ও পরিশোধিত করিলেন। তাঁহার পূর্বে এদেশের অধিকাংশ ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তি বাঙ্‌লাসাহিত্য পড়িতে ঘৃণা বোধ করিতেন। এইরূপ মনোবৃত্তি যে নিতান্ত অহৈতুক কিংবা অযৌক্তিক ছিল একথাও অবশ্য বলা চলে না। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রুচিকলুষিত দেশে তিনি সাহিত্যিক 'সুন্দর'-এর বেদী রচনা করিলেন। কৌতুক বা হাস্যরস বলিতে যে গোপালভাঁড়জাতীয় ইতরতাই আমরা বুঝিতাম, তাহাকে তিনি অনাবিল ও রসমধুর করিয়া তুলিলেন।

নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বলিষ্ঠ স্বাধীন বুদ্ধির সহায়তায় যথার্থ সমালোচনাসাহিত্যের সূত্রপাতও করিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। শুধু তাহাই নয়, বৈদেশিক শিক্ষার আলোকে তিনিই প্রথম হিন্দুধর্মের মর্মার্থ উদ্‌ঘাটিত করিবার প্রয়াস পাইলেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা আমাদের ধর্ম ও শাস্ত্রের তাৎপর্য না বুঝিয়া উহাদের যে অপব্যাখ্যা করিতেছিলেন, বিদ্যাভূয়িষ্ঠ বঙ্কিম উচ্চকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ ঘোষণা করিলেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্রের গূঢ়ার্থ, হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দেবতা শ্রীকৃষ্ণের তাৎপর্য প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন—আমাদের ইতিবৃত্ত ও ঐতিহ্য নূতনভাবে ব্যাখ্যাত হইল। সর্বশেষে জাতীয়তার মন্ত্রে বাঙালিকে বঙ্কিমই প্রথম প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। তাঁহার রচনারাজির মধ্য দিয়া আমরা জানিলাম, আমাদের একটি গৌরবমণ্ডিত অতীত রহিয়াছে—বিগত দিনের বাঙালির জাতীয় ইতিহাসটি উপেক্ষণীয় নয়। দেশাত্মবোধের উজ্জ্বল শিক্ষা তিনিই আমাদের সকলের চিত্তে জ্বালাইয়া তুলিলেন।

এই সব দিক হইতে বিচার করিলে বঙ্কিম অতুলনীয়। বস্তুত, বাঙ্‌লাগদ্যসাহিত্যে বঙ্কিম তুষারমৌলি উত্তুঙ্গ হিমাদ্রিশৃঙ্গের ন্যায় প্রদীপ্ত মহিমায় শুদ্ধগম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হিমালয়নিঃসৃত সহস্র নির্ঝরিণীধারার মতোই তাঁহার শতমুখিনী সাহিত্য-স্রোতস্বিনী বাঙালির হৃদয় পরিপ্লাবিত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের যে-বিভিন্ন দিকের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি তাহাই তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিচার। কিন্তু এই সর্বাঙ্গীণতার কথা বাদ দিয়াও বলা যায়, শুধু উপন্যাসসাহিত্যেই তিনি যে সৃজনীক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাই তাঁহাকে বাঙ্‌লাসাহিত্যে অমর প্রতিষ্ঠা দান করিবে। ইতিহাসের বিস্মৃতিময় তামসলোকে কবিকল্পনার যে-বর্ণাঢ্য আলোকসম্পাত তিনি

করিয়াছেন, নরনারীর হৃদয়রহস্য-উন্মোচনে যে-অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, চরিত্র সৃষ্টিতে যে-বহুমুখিতা দেখাইয়াছেন, এবং মানবজীবনে সত্য-শিব-সুন্দরের যে-সমুচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মতো লোকোত্তর প্রতিভাবানের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাঁহার রচনা সর্বাংশে ত্রুটিমুক্ত নয়—আধুনিক যুগের পাঠকের কাছে তাঁহার আদর্শবাদ সর্বতোভাবে যে গৃহীত হইবে, ইহাও আমি মনে করি না। তথাপি বলিব, বঙ্কিমের সমুদ্রতুল্য প্রতিভার বিপুলতার কাছে এই ত্রুটিবিচ্যুতি ও রুচি-বিভিন্নতা একান্ত তুচ্ছ বলিয়াই প্রতিভাত হইবে।

বাঙালির হৃদয়রাজ্যের সম্রাট ও 'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্রের উদ্গাতা, শিল্পী ও ঋষি বঙ্কিমকে এইসব কারণেই আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। আশাকরি, আমার রুচির এই পক্ষপাতিত্ব এবং আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত একেবারে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইবে না।

বাঙালি-সংস্কৃতির পরিচয়

প্রত্যেক ভাষায় এমন কয়েকটি বহুগুণব্যঞ্জক শব্দ আছে, এককথায় যাহাদের সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করা বস্তুত কঠিন। 'সংস্কৃতি' কথাটি এই জাতেরই একটি শব্দ। ইহার ব্যাপক অর্থ হইল জাতির প্রতিভা ও চিৎপ্রকর্ষের বহিঃপ্রকাশ—মানসচর্চা, ভাবসাধনা ও কর্মসাধনার বাস্তব রূপ। সুতরাং 'সংস্কৃতি' বলিতে বুঝিতে হইবে কোনো বিশেষ জাতির মানসপ্রকৃতি, তাহার ঐতিহ্য, সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম-কর্ম এবং আরো নানাকিছু। জাতির সমগ্র সত্তার প্রতিবিম্বটি ধরা পড়ে তাহার সংস্কৃতিতে। বাঙালির অন্তরতর জীবনের সামগ্রিক পরিচয় মিলিবে তাহার সংস্কৃতির মধ্যে। 'বাঙ্‌লাদেশে বাঙ্‌লাভাষী জনসমষ্টির মধ্যে, দেশের জলবায়ু ও তাহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ এই দেশের উপযোগী জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া, এবং মুখ্যত প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাবধারায় পুষ্ট হইয়া, বিগত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহাই বাঙালি-সংস্কৃতি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের সাংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়াই বাঙ্‌লার সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে—বাঙালি-সংস্কৃতি বৃহত্তর ভারতীয় কৃষ্টির বিরোধী নয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিভিন্ন জাতি হইতে বাঙালিকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। বাঙ্‌লাদেশ উত্তরভারতের ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা, ধর্ম ও ঐতিহ্যকে সহজেই গ্রহণ করিয়াছে। বাঙালির সহজাত অনার্যমনের উপর আর্যজাতির মানসপ্রকৃতির প্রভাবচিহ্ন যখন মুদ্রিত হইল তখনই বাঙালিচরিত্রে

লক্ষণীয় বিশিষ্টতা আত্মপ্রকাশ করিল। বাঙালি-সংস্কৃতির মূলে রহিয়াছে সর্বভারতীয় হিন্দুর চিৎপ্রকর্ষের প্রভাব। তারপর, ক্রমবিকাশের ধারাপথে অগ্রসরকালেও দেশের সংস্কৃতি ঐতিহাসিক কারণেই মুসলমান-সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছে। সুতরাং বাঙালি-সংস্কৃতির ইতিহাস হিন্দু, মুসলমান ও য়ুরোপীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ, সংঘাত এবং সমন্বয়েরই ইতিকথা।

বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে মোটামুটি তিনটি যুগে বিভক্ত করা চলে : প্রাচীন যুগ—খৃস্টিয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ; মধ্যযুগ—দ্বাদশ হইতে আঠারোর শতক পর্যন্ত, আধুনিক যুগ—আঠারোর শতক হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত। প্রথম-যুগের বাঙালি-সংস্কৃতির চেহারাটা পূর্বোক্ত বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ অভিব্যক্তি। মধ্যযুগে পাঠানমোগলের আমলে হিন্দু ও মুসলমান-সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়াছে এবং বাঙালি-সংস্কৃতির সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে বস্তুত মধ্যযুগেই। ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈনধর্মের সম্মিলিত প্রভাবে যে-সংস্কৃতি এ দেশের মাটিতে জন্মলাভ করিয়াছে, তুর্কীবিজয়ের পর রাজশক্তিপুষ্ট ইসলাম তাহাকে তেমন বিপর্যস্ত কিংবা পরিবর্তিত করিতে পারে নাই। মধ্যযুগে বাঙ্‌লাদেশে শাসকজাতি ছিল মুসলমান। কিন্তু সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙ্‌লাভূমিতে বাস করার ফলে তাহারা বাঙালিত্ব অর্জন করিয়াছিল, এবং সহজেই স্থানীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। তা ছাড়া, বাঙালি-মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুরক্তের প্রাধান্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং ইসলামধর্মী হইয়াও এই দেশের মুসলমানেরা হিন্দুসংস্কৃতিকে আপনা হইতেই স্বীকৃতি জানাইয়াছে।

এস্থলে আরো একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। যে-ইসলামধর্ম বাঙ্‌লায় প্রচারিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে কোরাণ-অনুযায়ী ইসলাম নয়। ইসলামের সুফীমতই বাঙ্‌লাদেশে প্রাধান্য লাভকরাহেতু হিন্দুসংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমান-সংস্কৃতির সহযোগিতা সম্ভব হইয়াছিল। সুফীসাধনা ও বাঙালির আধ্যাত্মিক সাধনার অন্তঃ-প্রকৃতির মধ্যে বেশ লক্ষণীয় একটা মিল রহিয়াছে। মধ্যযুগের আমলে মোল্লা-মৌলবী প্রভৃতি বিশিষ্ট মুসলমানেরা আরবী-ফার্সী চর্চা করিতেন বটে, কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতিকে এদেশে প্রচারিত করিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ কোন আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। মুসলমানবিজেতারা কিছু-কিছু নূতন ভাবধারা বাঙ্‌লাদেশে আনিলেও কোনো উচ্চতর কৃষ্টি তাঁহারা সঙ্গে লইয়া আসেন নাই। সেজন্য মুসলমানসংস্কৃতি হিন্দুসংস্কৃতিকে আপন প্রভাবে আচ্ছন্ন করে নাই। বাঙালির উচ্চতর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানী প্রভাব খুব বেশি দৃষ্ট হইবে না। তবে বাঙ্‌লার লোকসংস্কৃতি হিন্দু ও মুসলমানের যৌথসম্পত্তি।

ইংরেজিশিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আঠারোর শতক হইতে বাঙালি-সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটিতে থাকে। বাঙ্‌লার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংস্কৃতি ছিল দেশজ, আধুনিক যুগের সংস্কৃতি কিন্তু পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে দেশের মূলধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল গ্রাম্যজীবনকে কেন্দ্র করিয়া

—একালের সংস্কৃতি ক্রমেই নগরকেন্দ্রিক হইয়া উঠিতেছে। বিজাতীয় শিক্ষা, বর্তমান রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং এ-যুগের নানামুখী চিন্তাধারা বাঙালির ভাবজীবনে ও কর্ম-সাধনায় বড়ো রকমের পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে। আধুনিক বাঙালি-সংস্কৃতির একটা ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার দুর্বলতাও কম নয়। তা ছাড়া, অধুনা দেশে ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার ও হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থবিরোধ বাঙালি-সংস্কৃতিকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। যে-মধ্যবিত্তসম্প্রদায় দেশের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তাহারাও ভাগ্যবিপর্যয়ে এখন ধ্বংসের মুখে ধাবমান। আমাদের জাতীয় জীবনে এতখানি সর্বনাশা সংকট ইহার পূর্বে কখনো দেখা যায় নাই।

বাঙালি-সংস্কৃতির আধুনিক যুগটিকে চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহার প্রথম পর্যায়ে বাঙালি চিন্তানায়কেরা সর্বপ্রথম য়ুরোপীয় চিত্তের সংস্পর্শে আসে। পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারায় প্রাচ্য জীবনকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলাই ছিল তাঁদের সাধনা। য়ুরোপের ভাবচিন্তা প্রথমযুগের ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালিকে প্রভাবিত করিলেও তাঁহারা নির্বিচারে পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা ও সভ্যতার সবকিছুকে গ্রহণ করেন নাই। ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি ব্যাপারে চিন্তার সুস্থতা ও চিত্তের সজীবতা ঐ যুগের রামমোহন প্রভৃতি-সংস্কৃতি-আন্দোলনকে একটি লক্ষণীয় বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল। রামমোহনের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সর্বজনস্বীকৃত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সমন্বয়বিষয়ে রামমোহন বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। তাঁহাকে আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়ের প্রতিভূ-হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করিল সর্বজনপরিচিত 'ইয়ং বেঙ্গল দল'। হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে দেশে এমন একদল ইংরেজি শিক্ষাভিমানী তরুণের আবির্ভাব ঘটিল, যাঁহাদের নিকট সুপ্রাচীন হিন্দুসংস্কৃতি ছিল সর্বৈব বর্জনীয়। স্বাধীন চিন্তার নামে তাঁহারা দেশজ সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা-উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তাঁহারা অন্ধভাবে অনুকরণ করিয়া চলিলেন। সেকালের পাশ্চাত্ত্যপন্থী তরুণচিত্তের উপর তাঁহারা কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

তৃতীয় পর্যায়ে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় কৃষ্টির মধ্যে একটা সমন্বয়সাধনের প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এই সময়ের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বঙ্কিম-ভূদেব-বিবেকানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রতীচীর সভ্যতা সংস্কৃতির যে-উপাদান বাঙালির জাতীয় জীবনের পক্ষে কল্যাণপ্রদ, ওইগুলিকে আত্মসাৎ করিবার প্রচেষ্টায় এইসকল মনীষী ব্যাপৃত ছিলেন। বঙ্কিমপ্রমুখ শ্রেষ্ঠ বাঙালির জীবনদৃষ্টি ছিল উদার, দূরদর্শিতা ছিল ব্যাপক। তাই, এই পর্বের ভাবসাধনা ও কর্মসাধনা বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে কম ফলপ্রসূ হয় নাই। জাতীয়তাবাদ এবং রাজনীতিক আন্দোলনও এসময়ে আত্মপ্রকাশ করে। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে বাঙ্‌লাদেশে ধর্মান্দোলনের পুনরাবির্ভাবও লক্ষ্য করিবার মতো।

চতুর্থ পর্যায়ে অর্থাৎ সাম্প্রতিক কালে বাঙালি-সংস্কৃতির সংকট স্পষ্ট ও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাত বাঙালির জাতীয় জীবনকে নানাদিকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে। আজ হিন্দুমুসলমানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে আত্মঘাতী বিরোধ—১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে বঙ্গবিভাগ তাহারই চূড়ান্ত পরিণতি। রাজনীতিক ও আর্থনীতিক বিপর্যয় বর্তমানে আমাদের মানসিক ও নৈতিক শক্তিকে দুর্বল করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রবল ভাঙনের অবসানে বাঙালিসংস্কৃতি কোন্ রূপ পরিগ্রহ করিবে, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব নয়।

এইবার বাঙালি-সংস্কৃতির বাস্তব রূপটির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের সংস্কৃতির বৈচিত্র্য নিশ্চয়ই কাহারো দৃষ্টি এড়াইবে না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাঙালি-সংস্কৃতি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এই ক্ষেত্রে বাঙ্লার সহিত অন্যকোনো রাজ্যের তুলনাই হয় না।

প্রত্যেক জাতির লোকসংস্কৃতি ও উচ্চতর সংস্কৃতি কতকগুলি বস্তু, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও বিত্তভাবকে আশ্রয় করিয়াই বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। বাঙালি-সংস্কৃতিও ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রথমেই ধরা যাক বাঙ্লার বাস্তবসভ্যতামূলক সংস্কৃতির কথা—যেমন, পল্লীবাঙ্লার খড়ের চালের কুটীর, বেত ও বাঁশের কাজ, নানাবিধ মৃৎশিল্প, বিচিত্র বস্ত্রশিল্প, নানারকমের ধাতব শিল্প, শাঁখের কাজ, হাতীর দাঁতের কাজ, বিচিত্র রকমের পট, দেয়াল-মৃৎপাত্র ইত্যাদিতে মনোরম চিত্র-অঙ্কন, আলপনা, কাঁথাসেলাই, নৌশিল্প ইত্যাদি। তারপর, আমরা দেশের অনুষ্ঠান-মূলক সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করিতে পারি, যেমন—নানাবিধ ব্রতপার্বণ ও উৎসব—পৌষপার্বণ, নবান্ন, অন্নপ্রাশন, ভাইফোঁটা, জামাইষষ্ঠী, বিবাহের স্ত্রীআচার, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা, দোল ও রাস-উৎসব ইত্যাদি; ব্রত-নৃত্য আরতিনৃত্য প্রভৃতিকেও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

মানসিক, আধ্যাত্মিক ও কলাগত সংস্কৃতির পর্যায়ে পড়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগত অভিব্যক্তি, যেমন—বৈষ্ণব, শাক্ত, সহজিয়া ও বাউলের ধর্মীয় ভজন-পূজন-আরাধনা। নানা জাতের কাহিনী ও উপাখ্যান—ব্রতকথা, পুরাণবিষয়ক কথকথা, কালকেতু-ফুল্লরা, বেহুলা-লখীন্দর, রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কথা ইত্যাদি। বিবিধ ধর্মকাব্য, ছড়া, বচন, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদ, পল্লীগীতিকা; বিচিত্র রকমের আমোদ-প্রমোদ—তর্জা-পাঁচালি-যাত্রা ইত্যাদি; লোকসংগীতের মধ্যে কীর্তন; বাউল, রামপ্রসাদী, জারি, সারি, ঝুমুর, টপ্পা, ঢপ্, খেমটা, খেউড়, হাফ্-আখড়াই ইত্যাদি।

উচ্চসংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেশের বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠান, ধর্মনীতিক, সামাজিক ও রাজনীতিক আন্দোলন প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নেতৃত্বে বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানসাধনা, গবেষণা ও আবিষ্কার, রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে বিশ্ববিদ্যার অনুশীলন বাঙালির সংস্কৃতিচর্চাকে মর্যাদা দান করিয়াছে। মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ-বিংশ শতকে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত বহু মনীষীর অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার মূল্য সামান্য নয়। ভারতবর্ষের

রাজনীতিক চেতনার উদ্বোধনে বাঙালির সাধনার দান অনেকখানি—সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, বিপিনচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি নেতার আবির্ভাবে ভারতের রাজনীতিক আন্দোলন ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করিয়াছে। বাঙালি-সংস্কৃতির সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটিয়াছে বাঙ্‌লার গৌরবদীপ্ত সাহিত্যে। শ্রীচৈতন্যের ধর্মান্দোলন, মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল-শরৎচন্দ্র-প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টার বাণীচর্যা বাঙ্‌লা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। চিত্রাঙ্কনশিল্পে মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল-যামিনী রায় প্রভৃতি স্বনামধন্য বাঙালি শিল্পী। রবীন্দ্রনাথ আর উদয়শংকর সংগীত ও নৃত্যশিল্পের ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের প্রবর্তন করিয়াছেন। অভিনয়পদ্ধতিতে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত।

বাঙালি-সংস্কৃতির এই যে পরিচয়, ইহা অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এই পরিচিতি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাঙালির প্রতিভা ভারতীয় সভ্যতার ভাণ্ডারটিকে কম সমৃদ্ধ করে নাই। বাঙ্‌লার উচ্চতর সংস্কৃতি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করিয়াছে এমন কথা অবশ্য আমরা বলিব না। বাঙালির মধ্যে ভাবসাধনা, কর্মসাধনা ও জ্ঞান-সাধনার ত্রুটি যদি দেখা না দেয়, এবং বাঙালিজাতি যদি নিজের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বলে বর্তমান সংকটমুহূর্ত উত্তীর্ণ হইতে পারে, তবে বাঙালি-সংস্কৃতি অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই প্রবর্ধমান হইয়া উঠিবে।

বাঙ্‌লার সামাজিক উৎসব

বাঙালির সমাজজীবনে যে একদিন অফুরন্ত প্রাণধারা প্রবাহিত হইত, তাহার নির্ভুল প্রমাণ বাঙ্‌লার উৎসবগুলি। ইহাদের মূলে রহিয়াছে সামাজিক মানুষের গভীর একত্ববোধ ও পরস্পরের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ। মানবতা, সহানুভূতি ও একপ্রাণতার স্নিগ্ধমধুর দীপ্তিতে এগুলি সমুজ্জ্বল। একদিন বাঙালির বিত্ত ছিল, অর্থ ছিল, প্রাণশক্তি ছিল। সেই বিগত যুগের বাঙালি নিজের সম্পদপ্রাচুর্যকে শুধু আপন ভোগসুখ ও অহংসর্বস্বতার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে নাই, তাহারা সমাজের সর্বস্তরে অর্থ, বিত্ত ও প্রাণপ্রবাহকে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে। বহুবিধ সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়া, তথা অর্থ ও বিত্তের মধ্য দিয়া বাঙালি তাহার অন্তরেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। উৎসবগুলির মধ্যেই বাঙালির জাতীয় জীবনের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য নানাভাবে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখ, গ্লানি ও বেদনাকে মুছিয়া দিয়াছে—অন্তরে

উদ্বোধিত করিয়াছে মঙ্গলদীপ্ত সমাজচেতনা। আমাদের উৎসব শুভ-কল্যাণ-শ্রীমণ্ডিত।

বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব হইতেছে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা। প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে তাহেরপুরের হিন্দুরাজা কংসনারায়ণ এই বাঙলাদেশে যে-মহাপূজার প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রাণোন্মাদকারী আকর্ষণ আমাদের হৃদয় হইতে আজ পর্যন্ত এতটুকু মুছিয়া যায় নাই। জগৎমাতার এই পূজা হিন্দুবাঙালিসমাজের সকল স্তরের সকল মানুষের—ইহার ব্যাপকতা ও মর্মস্পর্শিতা সার্বজনীন। দুর্গা-পূজার নামে বাঙালি আত্মহারা হইয়া উঠে, ইহা তাহার জীবনে আনে বিপুল প্রাণচাঞ্চল্য ও সজীবতার সাড়া—দেশের দিকে দিকে প্রবাহিত করিয়া দেয় নির্বাধ আনন্দস্রোত। এই মহাপূজার প্রাক্কালে শুধু বাঙালির প্রাণজগতে নয়, প্রকৃতি-জগতেও অমেয় আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যায়। শরতের সোনালী আকাশে, শিউলিঝরা আঙিনায়, শস্যশ্যামল মাঠে, জলেস্থলে সর্বত্র প্রাণের প্রাচুর্য ও সম্পদের মহিমা হিল্লোলিত হইতে থাকে। প্রকৃতির বিনির্মল প্রসন্নতার পটভূমিকায় জগন্মাতার পূজা-আরাধনা কেমন যে প্রাণময় হইয়া ওঠে, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব।

বাঙালির আরাধ্যা দুর্গা হইলেন পুরাণের রক্তবীজবিনাশিনী মহামায়া—বিদ্যা, বিত্ত ও শক্তির মূর্ত প্রতীক। অন্যদিকে, ইনি বাঙালির মাতা, বাঙালির কন্যা। পুরাণকারের কাব্যসুরভিত কল্পনার সঙ্গে বাঙালি মিশাইয়া দিয়াছে তাহার অপূর্ব ভাবকল্পনা। দুর্গা তাই হিমালয়ের কন্যা, শিবের গৃহিণী। বৎসরে মাত্র তিনটি দিনের জন্য তিনি পিতৃগৃহে আসেন, তাহার পর আবার চলিয়া যান স্বামীর আলয়ে। এক মূর্তিতে তিনি জগৎমাতা, মহাশক্তির আধার—আবার, অন্য মূর্তিতে তিনি দেশমাতৃকা। আজ মন্দিরে মন্দিরে তাঁহারই প্রতিমা আমরা গড়িতেছি। অধ্যাত্মজীবন ও ভাবজীবনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে শ্রীশ্রীদুর্গার মূর্তিপরিকল্পনায়। দুর্গাপূজা বাঙালির জাতীয় উৎসব।

দুর্গাপূজা শেষ হইতে-না-হইতেই হিন্দুবাঙালি আবার মাতিয়া উঠে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজার আনন্দোৎসবে। মহালক্ষ্মী সম্পদবিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তাঁহার মূর্তিখানি ঘটেপটে বাঙালি অঙ্কিত করে। জ্যোৎস্নাস্নাত পূর্ণমাসী রাত্রিতে ধনীদরিদ্র সকলেই লক্ষ্মীদেবীকে নিজেদের আন্তরিক আহ্বান জানায়। লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা শুভ্র শুচিতার ভাব আছে, ইহার পূজারিণী হইতেছেন বাঙলার পুরনারী। তাঁহাদের অন্তরতম কামনা আত্মীয়স্বজনের কল্যাণ, সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও স্বাচ্ছন্দ্য। বাঙলার ঘরে ঘরে মহালক্ষ্মীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়—ইহাও সার্বজনীন।

লক্ষ্মীপূজার পর আসে শ্রীশ্রীকালীপূজা। ইহা বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব, বিচিত্রসুন্দর ইহার অনুষ্ঠান। এই জড়বিশ্বের মর্মকেন্দ্রে যে-বিরাট শক্তি অদৃশ্যভাবে বিরাজমান, মহাকালী তাহারই আধ্যাত্মিক প্রতীক। মানুষের একদিকে জীবন,

অন্যদিকে মৃত্যু—একদিকে সৃষ্টি, অন্যদিকে সংহারলীলা নিত্য প্রকটিত হইতেছে। সর্বভূতে যে-চেতনা শক্তিরূপে সংস্থিত, তাহার উপলব্ধির সাধনাই মহাকালীর পূজা। অমাবস্যার ঘনান্ধকার নিশীথিনীতে শক্তিরূপিণী এই কালীমাতার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নিসর্গলোকের গহন অন্ধকারকে আমরা অপসারিত করি সহস্র দীপাবলীর আলোকে। ঘরে ঘরে বালকবালিকার বাজিপোড়ানোর ধুম উৎসবটিকে সুন্দর করিয়া তোলে, দীপান্বিতার প্রজ্জ্বোল দীপ্তি অন্তরের সমস্ত কালিমা নিঃশেষে মুছিয়া দেয়। মহাকালীর পূজা কেবল যে মহানন্দের উৎস তাহা নয়, ইহা আমাদের অধ্যাত্মপিপাসাকেও নিবৃত্ত করে।

বাঙালির আর একটি স্মরণীয় উৎসব শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা। সরস্বতী জ্ঞান-দায়িনী, বিদ্যার প্রতীক। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বাঙলার বিদ্যার্থী তরুণ-তরুণী, বালকবালিকা মহাসমারোহে সরস্বতীকে বন্দনা করে। সকলের চিত্তে জাগ্রত হয় একটা শুচিশুভ্র ভাব। যে চৈতন্যময়ী শক্তিকে আমরা কালীর রূপমূর্তিতে আরাধনা করি, যে অমূর্ত শক্তিকে আমরা মহালক্ষ্মীর প্রতিমার মধ্যে অনুভব করি, সেই আদ্যাশক্তিরই আর-একটি প্রকাশ দেখি বাগ্‌দেবীর অপূর্বসুন্দর বিগ্রহের মধ্যে। মাতৃ-পূজার মধ্যেই বাঙালীর ভাবজীবনের বিশিষ্টতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

ফাল্গুনের দোলযাত্রার উৎসবও কত সুন্দর, কতখানি মনোমদ। এই দোললীলা বসন্তঋতুরই উৎসব। বসন্তের সমাগমে প্রকৃতির বুকে একটা নূতন প্রাণের সাড়া জাগে, তরুলতায়, পাতায়, পুষ্পে নবজীবনের বিপুল বন্যা বহিয়া যায়। বিচিত্র রঙের খেলার মধ্য দিয়া মানুষ প্রকৃতিকে জানায় সাদর সম্ভাষণ, অন্তরের গভীরে উৎসারিত হয় আনন্দের নির্ঝর। এই ঋতু-উৎসবটির সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে বৈষ্ণবের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বসন্ত-উৎসবের সহিত শ্রীকৃষ্ণলীলার যখন সংমিশ্রণ ঘটিল তখন বসন্তলীলা দোললীলায় পরিণত হইল। দোল-উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য রঙের খেলা। রক্তিম আবিরে-কুমকুমে মানুষের প্রাণসত্তাকে রঞ্জিত করিবার আনন্দই রহিয়াছে ইহার মূলে।

বাঙালীর উৎসবের যেন অন্ত নাই। রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, নবান্ন-উৎসব আমাদের হৃদয়-লোকে বিচিত্র অনুভূতি জাগাইয়া তোলে। শ্রাবণ মাসে পূর্ববঙ্গের ঘরে ঘরে মনসাপূজার অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। পশ্চিম বঙ্গে চৈত্র মাসের চড়কপূজা ও গাজন-উৎসব সকলেরই পরিচিত। মুসলমানসমাজে মহরম, ঈদ প্রভৃতি পর্বদিনে বিপুল প্রাণচাঞ্চল্য জাগে। বৎসরের প্রায় প্রতি মাসেই বাঙলাদেশে একটা-না-একটা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালির এই উৎসবগুলি বর্তমানে যেন স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। গোটা সমাজের আনন্দেই আমার আনন্দ, সমাজের কল্যাণেই আমার কল্যাণ—উৎসবগুলির অন্তর্নিহিত এই ভাবসত্যটি আজ আমরা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। এইরূপ একটি অবস্থা অধুনা আমাদের জাতীয় জীবনে মঙ্গলাদর্শের অভাবই সূচিত করে। সমাজচেতনা বাঙালির হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে

মুছিয়া যাইতেছে, সে যেন ক্রমেই স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িতেছে। বাঙলার উৎসবগুলি দেশবাসীকে শুধু আনন্দই দেয় না, ইহার মধ্যে লোকশিক্ষার আয়োজনও রহিয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় একালের উৎসব অনুষ্ঠানে হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা বিত্ত ও সম্পদের গরিমা তথা মানুষের অহমিকাই যেন আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আমরা আজ সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চাহিতেছি, কিন্তু সমাজজীবনে যদি মানুষের সমষ্টিগত কল্যাণ ও আনন্দের কথা বিস্মৃত হই তবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিব কীরূপে? বাঙালির উৎসব-গুলির মধ্যেই রহিয়াছে সমাজতন্ত্রের বীজ, তাহাকে অঙ্কুরিত করিয়া তোলাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

বাঙলার লোকসাহিত্য

গ্রামবাঙলার নিরক্ষর জনসাধারণের অনাড়ম্বর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা যে-সাহিত্যের মধ্যে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই আমরা বলিয়া থাকি লোকসাহিত্য। প্রত্যেক জাতির সাহিত্যেই লোকসাহিত্য বা গ্রাম্য-সাহিত্যের বিশেষ একটি স্থান আছে। অধুনা পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা ও সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভিন্নতর রুচির ও সার্বজনীন সাহিত্য রচনা করিতেছি সত্য, কিন্তু নিত্যকালের ওই গ্রামসাহিত্যকে আমরা কোনোমতেই অস্বীকার করিতে পারি না। আমাদের এই লোকসাহিত্যের মধ্যেই বাঙলা জনপদের শতশত সুখ-দুঃখের রাগিণী নিঃশব্দ সুরে ধ্বনিত হইতেছে।

একালের নাগরিক সভ্যতা আমাদিগকে পল্লীজীবনের কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত করিয়া একটা কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে—গ্রামের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগটি অধুনা ছিন্নপ্রায়। তাই, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে বঙ্গপল্লীর নিবিড় পরিচয়টি সর্বাঙ্গীণ সমগ্রতায় তেমন আর রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে না। বাঙলার লোকসাহিত্য কিন্তু একেবারে পল্লীর মৃত্তিকা হইতে উদ্ভূত—ইহার গায়ে এদেশের শ্যামল মাটির গন্ধটুকু ছড়ানো-জড়ানো রহিয়াছে। বাঙলাপ্রকৃতির ফুল-ফল-লতা-পাতার মতোই আমাদের গ্রামসাহিত্যও যেন স্বাভাবিকভাবেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। বাঙলার গ্রামীণ সংস্কৃতি আজও বাঁচিয়া আছে অজ্ঞ অশিক্ষিত জনপদবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে, তাদের ভাব ও ভাবনায়, কল্পনা ও চিন্তায়। পল্লীর নিরক্ষর মানুষের হৃদয়ভূমিতেই জন্মলাভ করিয়াছে অজস্র ছেলে-ভুলানো ছড়া, যাত্রা, পাঁচালি, ব্রতকথা, রূপকথা, গীতিকথা, কবিসংগীত ভাটিয়ালী-জারি-মুর্শিদা ও বাউল গান, মাণিক পীরের গান, গোপীচন্দ্রের গান, ময়নামতীর গান, অপূর্বসুন্দর পল্লীগীতিকাগুলি এবং আরো কত কী। এই বিশাল সাহিত্য কে কখন রচনা করিয়াছে তাহার ইতিহাস আমাদের জানা নাই। কিন্তু ইহা বাঙালির

অন্তর হইতে উৎসারিত হইয়া পুরুষানুক্রমে বাঙালির স্মৃতিপথ বাহিয়া, কাল হইতে কালান্তরে প্রসারিত হইয়াছে এবং বাঙালির সার্বজনীন সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে।

লোকসাহিত্যের আছে দুইটি দিক—একটি আনন্দের, আর-একটি শিক্ষার। আনন্দের সঙ্গে লোকশিক্ষার এমন মনোজ্ঞ সমন্বয় অন্যত্র দুর্লভ। অগণিত পল্লীবাসীর সুচিরকালের জীবনদর্শনের অভিজ্ঞতার প্রাচুর্যে, সুকোমল অনুভূতির প্রকাশে, সহজ উপলব্ধির বিচিত্রতায় আমাদের লোকসাহিত্য অতিশয় সমৃদ্ধ। তাই, আনন্দ-বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে এই সাহিত্য জনপদবাসীকে শিক্ষা ও জ্ঞানদানেও প্রভূত সহায়তা করিয়াছে। একদিন আমাদের লোকশিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছিল লোকসাহিত্য। সহজ ভাষায় রচিত বলিয়া জনচিত্তের উপর ইহার প্রভাব অসামান্য।

অতীত দিনে দেশের জনসাধারণকে ব্যাপক আনন্দ দেওয়ার আয়োজন আমাদের সমাজ করিয়াছিল। যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, কবিগান প্রভৃতির মধ্য দিয়া পল্লীর মানুষ শিক্ষা ও আনন্দ উভয়ই লাভ করিত। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে লোকশিক্ষা ও জনগণের চিত্তবিনোদনের সকল সামগ্রী দেশ হইতে ধীরে ধীরে মুছিয়া যাইতেছে। লোকসাহিত্যের মাধ্যমে লোকশিক্ষার আলোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি প্রবন্ধে লিখিতেছেন : 'এমনি কতকাল চলেছে দেশে, বরাবর রসের যোগে লোক শুনেছে ধ্রুব প্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বত্যাগ। দেশে তখন দুঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে। কিন্তু সেই সঙ্গে এমন একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল যাতে করে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যেও মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েছে,—মানুষের যে-শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতা হেয় করতে পারে না, তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করেছে। সেদিন দেশে এমন অনাদৃত অংশ ছিল না যেখানে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত। এমন কি, যে-সকল তত্ত্বজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রে কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত, তারো সেচন চলেছিল সর্বক্ষণ এদেশের জনসাধারণের চিত্তভূমিতে।'

লোকসাহিত্যের প্রকাশ বহুমুখী। যুগযুগান্তর ধরিয়া পল্লীবাসীর মনে এই সাহিত্যের গঠনকার্য চলিয়াছে। ইহাতে দূরপ্রসারী কবিকল্পনা নাই, বিচিত্র ছন্দের কারুকলা নাই। কিন্তু আছে প্রকাশরীতির সরলতা, আর, পল্লীর মানুষের অনাবিল হৃদয়ানন্দের সুরঝংকার। 'গ্রামবাসীরা যে-জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, যে-কবি সেই জীবনকে ছন্দে-তালে বাজাইয়া তোলে সে-কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে। পদ্মাচরের চক্রবাকসংগীতের মতো তাহা নিখুঁত সুরতালের অপেক্ষা রাখে না।'

বাঙলা লোকসাহিত্যের বাণীরূপ বিচিত্র। ছেলেভুলানো মনোজ্ঞ ছড়াগুলি কোন্ সুদূর অতীতে কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছে তাহার কোনো স্থিরতা নাই।

যে-সকল কবি এইসব ছড়া গাঁথিয়াছেন তাঁহারা কাব্যশাস্ত্রের ধরাবাঁধা পথে পদচারণ করেন নাই। কেবলমাত্র শিশুমনের নিরঙ্কুশ কল্পনার আলোছায়ার খেলাকেই এই কবিদল গ্রাম্যভাষায়, ভাঙাচোরা ছন্দে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এগুলিতে কোথাও রহিয়াছে ছবি, কোথাও কলভাষী সংগীত। শিশুদের মনে ভাবপারম্পর্যের ততটা প্রয়োজন নাই, যতটা প্রয়োজন আছে প্রত্যক্ষ চিত্রসম্পদ ও সংগীতঝংকারের। সেজন্য ছেলেভুলানো ছড়াগুলির মধ্যে 'অসংসগ্ন ছবি যেন পাখীর ঝাঁকের মতো উড়িয়া চলিয়াছে'। এই সমস্ত ছড়া শিশুদের জন্য যেন সরলপ্রাণ শিশুকবিরই সৃষ্টি।

রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-ভাগবতের বিচিত্র কাহিনী ছিল আমাদের প্রাচীন যাত্রাগুলির উপজীব্য। ইহাদের ভিতর দিয়া পল্লীর মানুষ অফুরন্ত আনন্দলাভ করিত, চিরন্তন মানবধর্ম ও মানবসত্যের সহিত পরিচিত হইত। গ্রামের উদার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ছোটবড়, ধনীনির্ধন সকলেই পাশাপাশি একসঙ্গে বসিয়া যাত্রাভিনয় দেখিত। রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সীতার সতীধর্ম, হরিশ্চন্দ্রের সত্যধর্ম, কর্ণের বীরধর্ম, ধ্রুবপ্রহ্লাদের ভক্তিব্যাকুলতা, ভীষ্মদধীচির আত্মদান প্রভৃতি কাহিনী যখন অভিনীত হইত তখন নিরক্ষর গ্রাম্যনরনারীর বিশ্বাসপ্রবণ হৃদয় নিবিড় আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিত।

জনপদবাসীর সরল জীবনযাত্রার ছবি আমরা দেখিতে পাই বিভিন্ন ব্রতকথার মধ্যে। ভাদুব্রত, মাঘমণ্ডল, তুষতুষলি, কুলকুলতী, থুয়া, লাউল, সেঁজুতি প্রভৃতি ব্রতগুলির ভিতর দিয়া বাঙলার পুরনারীর মর্তমমতার বিশ্বস্ত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্রতকথাগুলি মেয়েদের মধ্যেই প্রচলিত। মেয়েরা তাহাদের অনাগত জীবনের সুখ-দুঃখের ভার গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্রতগুলি পালন করে। তাহাদের বিচিত্র আশাআকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের কর্মপন্থা প্রভৃতিই এই ব্রতগুলির প্রার্থনায় চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ব্রতকথাজাতীয় কত বিচিত্রসুন্দর ছড়া বাঙলা লোকসাহিত্যের অঙ্গনে ঘাসের ফুলের মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

আর-এক জাতের ছড়া আছে, উহাদের 'বিষয়কে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—হরগৌরীবিষয়ক এবং কৃষ্ণরাধাবিষয়ক। হরগৌরীবিষয়ে বাঙালির ঘরের কথা এবং কৃষ্ণরাধাবিষয়ে বাঙালির ভাবের কথা ব্যক্ত করিতেছে। একদিকে সামাজিক দাম্পত্যবন্ধন, আর-একদিকে সমাজবন্ধনের অতীত প্রেম।' হরগৌরীর বাস্তব কাহিনীর পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে আনন্দ ও কারুণ্যমধুর আগমনী গান ও বিজয়াসংগীত।

প্রাচীন ও আধুনিক বাঙলা কাব্যের সংযোগস্থলে দাঁড়াইয়া আছে কবিসংগীত। সখীসংবাদ, বিরহ, গোষ্ঠ, আগমনী প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া কবিওয়ালারা তাঁহাদের গান বাঁধিয়াছেন। ইহাদের আগমনী ও বিরহ-গানের তুলনা নাই। বাঙালির অন্তরের বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হইয়া এই গানগুলি অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। বৎসরান্তে মাতা কন্যাকে দেখিতে চাহেন। তিনি স্বামীকে মিনতি করিয়া বলিতেছেন

কন্যাকে শ্বশুরালয় হইতে আনিতে, এই কথাই কত-না করুণতায় উক্ত গানগুলির মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে। 'উপস্থিতমতো সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার ভার লইয়া, কবিদলের গান—ছন্দ এবং ভাষার বিশুদ্ধি ও নৈপুণ্য বিসর্জন দিয়া, কেবল সুলভ অনুপ্রাস ও ঝুটা অলংকার লইয়া কাজ সারিয়া দিয়াছে—ভাবের কবিত্ব সম্বন্ধেও তাহার মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায় না। পূর্ববর্তী শক্তি এবং বৈষ্ণবমহাজনদিগের ভাবগুলিকে অত্যন্ত তরল ও ফিকা করিয়া কবিগণ শহরের শ্রোতাদিগকে সুলভ মূল্যে যোগাইয়াছেন। তাঁহাদের রচনায় যাহা সংযত ছিল, এখানে তাহা শিথিল এবং বিকীর্ণ; তাঁহাদের কুঞ্জবনে যাহা পুষ্প-আকারে প্রফুল্ল, এখানে তাহা বাসি ব্যঞ্জন-আকারে সংমিশ্রিত।' কবিওয়ালাদের আগমনী ও বিজয়াসংগীতের পর সখীসংবাদের সূত্র অনুসরণ করিলে খেউড়, তর্জা, হাফআখড়াই প্রভৃতি গানের আবির্ভাব কিছুই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ববঙ্গগীতিকাগুলি বাঙ্‌লা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রত্যেকটি শাখা লৌকিক ধর্ম ও উপধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু এই গীতিকাগুলি ধর্মের প্রভাব হইতে অনেকখানি মুক্ত। গীতিসাহিত্যকে আমরা নিঃসংশয়ে বাঙালির ধর্মবন্ধনমুক্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার বাণীবিগ্রহ বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারি। ইহার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই বাঙ্‌লাদেশের নরনারীর বিচিত্র বাস্তব আলেখ্য—ইহাতে সমাজের মানুষের হাসিকান্না, আনন্দবেদনা সহজ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। মানবীয় ভাবের আবেদন, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, নিপুণ শব্দযোজনা অতি-সরস প্রকাশভঙ্গি এবং সর্বোপরি স্বাভাবিকতার গুণে গীতিসাহিত্য বাঙালি পল্লীকবির অনবদ্য সৃষ্টি। সেকালের কাব্যরচনায় সমস্ত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করিয়া গ্রাম্যকবিরা এই সাহিত্যের মধ্যে একটা নূতন কাব্যরীতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সে যুগের সাহিত্যে জগৎ ও জীবনকে এমন সহজভাবে আর কোথাও স্বীকৃতি জানানো হয় নাই।

লোকসাহিত্যের অন্তর্গত বাউলসংগীতগুলি সহজ অনুভূতির সাবলীল প্রকাশে সত্যই সুন্দর। মধ্যযুগীয় মিষ্টিক সাধক এবং সুফীসম্প্রদায়ভুক্ত কবিদের রচনার সঙ্গে ইহাদের তুলনা করা চলে। বাউলসংগীত বাঙলার হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সাধারণ সম্পত্তি।

ভাটিয়ালী, মুর্শিদা, জারী প্রভৃতি গানও পল্লীবাঙ্‌লার নিজস্ব সম্পদ। ইহাদের আশেপাশে জন্মলাভ করিয়াছে ডাক ও খনার বচন এবং প্রবাদ ও প্রবচনগুলি। সমাজ-জীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তির সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা মানবচরিত্রের বিচিত্রতা, ধর্মতত্ত্ব-কৃষিতত্ত্ব-খাদ্যতত্ত্ব প্রভৃতি নানান বিষয় ও ভাবের প্রাচুর্যহেতু এইগুলি আমাদের পরম আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্‌লা লোকসাহিত্যে বাঙালির অন্তরতর প্রাণের সামগ্রী। খাঁটি বাঙ্‌লার রূপ ও রস এই সাহিত্যের কথায় সুরে-ছন্দে বাঁধা পড়িয়াছে। বাঙালির ভাবানুভূতির সঙ্গে ইহার সংযোগ অতিশয় নিবিড়: উচ্চস্তরের ভাবনা ও কবি-

কল্পনা অবশ্য ইহার মধ্যে নাই। না-থাকাতে একরকম ভালোই হইয়াছে, যদি থাকিত তবে নিরক্ষর পল্লীর মানুষ ইহার রস উপভোগ হইতে বঞ্চিত হইত। পল্লীকবি 'কল্পনার সংকীর্ণতা দ্বারা আপন প্রতিবেশীবর্গকে ঘনিষ্ঠ সূত্রে বাঁধিতে পারিয়াছে, এবং সেই কারণেই তাহার গানের মধ্যে কল্পনাপ্রিয় একক কবির নহে, পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।'

ধর্মঘট

সাম্প্রতিক পৃথিবীতে পরস্পরবিরোধী দুইটি শ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—পুঁজিপতি ধনিকশ্রেণী ও সর্বহারা শ্রমিকগোষ্ঠী। এই শ্রেণীবিরোধ যতই জটিল রূপ ধারণ করিতেছে, সমাজে ততই একদিকে দেখা দিতেছে নির্বিচার শোষণপ্রবৃত্তি, অন্যদিকে উগ্র হইয়া উঠিতেছে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও বিদ্রোহাত্মক মনোভাব। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তির পরিধি দিন দিন প্রসারিত হইতেছে, প্রতিনিয়ত কত বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কার-উদ্ভাবন হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেই অনুপাতে মানুষ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হইতেছে না। তাই, মনে হয়, বর্তমানের এই যান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে কোথায় যেন একটা অভিশাপ লুকাইয়া আছে।

আধুনিক যুগটিকে যন্ত্রযুগ-নামে চিহ্নিত করিতে পারি। এই যন্ত্রযুগে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই শ্রমিক ও কলকারখানার মালিকদের মধ্যে একটা অনভিপ্রেত সংঘর্ষ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়াই বর্তমানে আর্থিক জগতের চাকা ঘুরিতেছে। মালিকগণ নিজেদের মূলধনে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেখানে শ্রমিকদের নিযুক্ত করে এবং শ্রমিকের কঠোর শ্রমের সহায়তায় উৎপাদিত পণ্যাদি বিক্রয় করিয়া মোট লাভের অংশ নিজেরাই ভোগ করিয়া থাকে। ফলে দেখা যায়, একদিকে মালিকসম্প্রদায়ের বিত্তৈশ্বর্য দিন দিন স্ফীতকায় হইয়া উঠিতেছে, অন্যদিকে অগণিত শ্রমিকদের আর্থিক অসচ্ছলতা ও দুঃখদারিদ্র্য ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। শ্রমিকসম্প্রদায় ধনী মালিকদের কাছে নিজেদের অভাবঅভিযোগের কথা জানায়, কিন্তু তাহারা সেদিকে সহজে কর্ণপাত করে না। ধনিকশ্রেণীর এই অবহেলাই শোষিত শ্রমিকগোষ্ঠীর মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়াছে সংঘশক্তিচেতনা। এই নবপ্রবুদ্ধ সংঘশক্তিকে তাহারা আজ ধনিকের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। শ্রমিকের ন্যায্য দাবী যখন অবিরত উপেক্ষিত হইতে থাকে তখন তাহারা সমবেত-ভাবে কলকারখানার মালিকের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং পুঁজিতন্ত্রের অন্যায় প্রতিরোধের শেষ

অনুস্বরূপ কারখানায় নিজেদের কর্ম হইতে বিরত হয়। শ্রমিকদলের এই যে একযোগে কর্মবিরতি ইহাকেই আমরা বলি ধর্মঘট।

ধর্মঘটের জন্মইতিহাস কিন্তু খুব বেশিদিনের নয়। সমাজের সহজ সরল আর্থিক ব্যবস্থায় পুঁজিতন্ত্র প্রবেশ করিবার পর হইতেই শ্রমিকধর্মঘটের শুরু। য়ুরোপে শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হইবার পর দেখা গেল, একদল মানুষ নিজেদের পুঁজি খাটাইয়া দরিদ্রসাধারণের উপর প্রভুত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এইসব পুঁজিপতি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যন্ত্রের সাহায্যগ্রহণ করাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরশিল্প বিনষ্ট হইল, বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইল এবং তাহাতে বহুলোৎপাদন শুরু হইল। ইহাতে শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা দেখা দিল। যে সকল মালিকের পুঁজি অল্প, বাধ্য হইয়াই নিজেদের পরিচালিত কুটীর শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প তুলিয়া দিয়া তাহারা বৃহৎ কারখানায় আশ্রয় লইল জীবিকার্জনের জন্য। এভাবে সমাজে ধীরে ধীরে পরস্পরবিরোধী দুইটি স্বার্থ দেখা দিল—শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীসংঘর্ষ আত্মপ্রকাশ করিল। পশ্চিমের শিল্পবিপ্লব এদেশের শিল্পের উপর যে-প্রভাব বিস্তার করিল তাহা সামান্য নয়।

বড়ো বড়ো কলকারখানার ধনী মালিকগণ নিঃস্ব শ্রমিকের অসহায়তার সুযোগ লইয়া নানা অপকৌশলে তাহাদিগকে শোষণের জন্য জাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়া দিল—শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি ধনিকরা বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য বলিয়া মনে করিল না। শ্রমিকগণকে অল্পবেতনে বেশি খাটাইয়া লইয়া নিজেদের পুঁজি বাড়াইয়া তোলাই হইল ধনিকশ্রেণীর প্রধান লক্ষ্য। এককভাবে শ্রমিকরা শক্তিহীন। কিন্তু যে-দিন তাহাদের মধ্যে জাগিল সংঘচেতনা সেদিন তাহারা নিজেদের আর অসহায় বলিয়া মনে করিল না। তাহাদের ন্যায্য দাবী অস্বীকৃত হইলে শ্রমিকরা সমবেতকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাইতে আরম্ভ করিল। এই প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল ধর্মঘটের মধ্য দিয়া। ধর্মঘট সর্বরিক্ত শ্রমিকের নিরস্ত্র সংগ্রাম। কিন্তু ইহার বিপুল শক্তি সশস্ত্র অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। ভারতবর্ষে শ্রমিক-ধর্মঘটের ইতিহাসটিও পাশ্চাত্ত্যের কলকারখানায় শ্রমিকধর্মঘটের অনুরূপ।

ধর্মঘটের সাফল্য নির্ভর করে, শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতা ও ঐক্যচেতনার উপর। সংঘশক্তি ব্যতীত শক্তিশালী ধনিকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া শ্রমিকেদের পক্ষে সম্ভব নয়। ধনী মালিকসম্প্রদায় অর্থবলে বলীয়ান—ধনতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রশক্তিও তাহাদের স্বার্থের অনুকূলে। এক-একটি কারখানায় বহু শ্রমিক কাজ করে। অন্যায়ের প্রতিবাদকল্পে যদি সংঘবদ্ধভাবে তাহারা ধর্মঘট না করে তবে ওই ধর্মঘট ব্যর্থ হইতে বাধ্য। তাই, শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য এবং কারখানার বিত্তশালী মালিকদের অসাধুতার কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বর্তমানে শ্রমিকসংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে ধর্মঘট প্রায়শ সাফল্য অর্জন করিতেছে, এবং কলকারখানার মালিকগণ শ্রমিকের দাবী পূর্বের মতো তেমন আর উপেক্ষা করিতে পারিতেছে না।

ধর্মঘট যে শ্রমিকসম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কলকারখানার মালিকদের উদ্ধত অবিচার, সামান্য বেতনের

পরিবর্তে শ্রমিককে দিয়া প্রভূত কাজ আদায় করিয়া লইবার কুশ্রী মনোবৃত্তি শ্রমিক-দলের জীবনযাত্রা সত্যই দুর্বহ করিয়া তুলিয়াছে। মালিকগণ যখন নিজেদের শোষণনীতি বজায় রাখিবার চেষ্টা করে ও শ্রমিকসম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিতে অনিচ্ছা জানায়, তখন নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ধর্মঘটের আশ্রয় লওয়া ছাড়া শ্রমিকদের অন্য কোনো উপায় থাকে না। ধর্মঘট অধুনা শুধু কল-কারখানার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়, ইহা সমাজের নানা স্তরে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

অল্পসময়ের ব্যবধানে ধর্মঘটের অবাঞ্ছিত পুনরাবৃত্তি বর্তমান কালের যান্ত্রিক-সভ্যতাকণ্টকিত সমাজের অসুস্থতারই পরিচয়বাহী। ধর্মঘটের প্রয়োজন যে আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সামান্য কারণে ধর্মঘট করা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, ইহার ফলে সামাজজীবনে নানারকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। বিশেষত জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মঘট দেখা দিলে সমাজের সকল ক্ষেত্রেই ইহার বিষময় ফল অনুভূত হয়। ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত না হইলে তাহাতে শ্রমিকরাই যে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা নয়, ব্যবসায়বাণিজ্য বন্ধ থাকায় জন্য জনসাধারণের ক্ষতিরও অন্ত থাকে না। অবিচারঅন্যায় প্রতিরোধের কোনো পথই যখন খোলা থাকিবে না, একমাত্র তখনই ধর্মঘটের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। ধর্মঘট যদি শৃঙ্খলাসহকারে ও শান্তভাবে পালন করা না হয় তবে অনেক ক্ষেত্রে ইহা হিংস্র সংঘাতের আকার ধারণ করে। তখন শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার জন্য সরকার ধর্মঘটীদের উপর অস্ত্রবল প্রয়োগ করিতে বাধ্য হন। ফলে ধর্মঘটের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় এবং শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

ধর্মঘট যত অল্প হয় ততই সমাজের মঙ্গল। তবে একথাও সত্য যে, সরকার কিংবা ধনী মালিক বলপ্রয়োগ করিয়া কদাপি ধর্মঘট বন্ধ করিতে পারিবে না। মূল কারণগুলি বিদূরিত না হইলে ইহার পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। কলকারখানার পুঁজিপতি যদি তাহাদের মোট লাভের কিছুটা অংশ দরিদ্র শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়, তাহারা যদি শ্রমিকদের স্বার্থ, স্বাস্থ্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিষয়ে কিছুটা সচেতন হয় তবে দুর্গত শ্রমিকদের বিক্ষোভ আর ধূমায়িত হইয়া উঠিবে না। শ্রমিকদের কাজের সময় কমাইতে হইতে হইবে, জীবনধারণের উপযোগী বেতন তাহাদিগকে দিতে হইবে, তাহাদের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ এবং এবং শিক্ষা ও আনন্দের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিকদের স্বার্থের সঙ্গে ধনীর স্বার্থও যে অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত, এ সত্যটি বিস্মৃত হইলে চলিবে না। শ্রমিকগণ যদি অর্ধভুক্ত এবং অর্ধনগ্ন না থাকে তবে তাহাদের অভিযোগ ও অসন্তোষ বিদূরিত হইবে, তখন তাহারা আর প্রতিবাদমূলক কোনো আন্দোলনের আশ্রয় লইবে না। একমাত্র শিল্পমালিকদের সহৃদয় মনোভাব এবং সরকারের গণতান্ত্রিক মনোভঙ্গিই ধর্মঘটের অবসান ঘটাইতে পারে।

বর্ষার দিনে কলকাতা

বর্ষার যে একটি বিশেষ রূপসৌন্দর্য রয়েছে তা পল্লীগ্রামে যতখানি উপলব্ধি ও উপভোগ করা যায় ততখানি শহরে--বিশেষত কলকাতার মতো বড়ো শহরে নয়। কলকাতায় দিগ্বলয় পর্যন্ত বিস্তৃত মাঠ কোথায়, আমবাগান বাঁশবাগান কোথায়, কোথায় প্রকাণ্ড নদী, আর, খাল-বিল-হাওর? অনন্তপ্রসারিত আকাশই-বা এখানে কোথায়? সমারোহসহকারে বর্ষার আবির্ভাবের এইগুলিই তো উপযুক্ত পটভূমি। কলকাতা-সহরের একফালী আকাশে পুঞ্জপুঞ্জ মেঘের সমারোহ ও বিদ্যুৎবহ্নির দূরব্যাপ্ত ঝলসন চোখে পড়ে না, মেঘডমরুর গম্ভীর ধ্বনি তেমন কানে প্রবেশ করে না; এখানে ঝড়োবাতাসের নিঃশ্বসন, অশ্রান্ত ধারাপতন আর তার সঙ্গে ডাহুক-ডাহুকা ব্যাঙের ডাকের মোহময় ঐকতান শুনতে পাওয়ার সুযোগ তেমন ঘটে না। বর্ষাপ্রকৃতি তার দৃশ্যরূপ, ভাবরূপ, সংগীতরূপ নিয়ে সম্পূর্ণ ধরা দেয় পল্লীর মানুষের কাছে, মহানগরীর কর্মব্যস্ত অধিবাসীদের কাছে নয়। গ্রামদেশের বর্ষার সঙ্গে কলকাতার বর্ষার পার্থক্য অনেকখানি।

তথাপি বলব, এ মহানগরীতে বর্ষার আবির্ভাব একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। এখানে ঋতুবৈচিত্র্যের কিছুটা সংবাদ নিয়ে আসে বর্ষা আর গ্রীষ্ম। অপরাপর ঋতুর—শরৎ-হেম-শীত-বসন্তের—সত্যকার রূপটি পাষাণকায়া কলকাতার বুকে তেমন ফোটে না। শরতের সোনামাখা মিষ্টি রোদ, শিউলির সুরভি, হেমন্তের ধানকাটা মাঠে সন্ধ্যার বিষণ্ণতা; শীতের নিরাভরণ তপস্বিনীমূর্তি; মায়াবী বসন্তের উদ্দাম ক্ষ্যাপামি, তরুলতার পুষ্পিত প্রলাপ, প্রকৃতিলোকে নির্বোধ জীবনচাঞ্চল্য— মহানগরী কলকাতায় এসমস্তকিছুর তো প্রবেশ নিষেধ। এখানে সহজ প্রবেশের পথ পায় শুধু বর্ষা ও গ্রীষ্ম। গ্রীষ্ম তার খর দহনে, বর্ষা তার মেঘান্ধকার ও প্রবল বর্ষণে নিজ নিজ অস্তিত্ব ঘোষণা করে। তাই, বলছিলাম, নিসর্গসংসারের রূপবৈচিত্র্যের স্বাদ কলকাতা শহরে না মিললেও বর্ষাঋতুকে উপেক্ষা করা চলে না।

° • • •

বর্ষার কলকাতা—কখনো উপভোগ্য, কখনো বিরক্তিকর। এই কর্মমুখর বিশাল শহরটিতে বর্ষাদিনের একটি দৃশ্য কল্পনা করুন:

আকাশে মেঘ করেছে, নভোদেশে বেশ একটা থমথমে ভাব দেখা যাচ্ছে। খানিক পরে একটু বাতাস বইতে আরম্ভ করল, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল। এবার পথচারীর কথা ভাবুন। দেখতে পাবেন, সকলে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, প্রকৃতির বিরূপতাসম্পর্কে এতক্ষণ যারা অসতর্ক ছিল, এখন তাদের সতর্ক না হয়ে উপায় নেই। সকলের চলার বেগ দ্রুততর হল। কেউ রাস্তার গাড়ীবারান্দায় আশ্রয়

নিচ্ছে, যাদের ছাতা রয়েছে তারা ওটা খুলে জোরে জোরে পা ফেলছে, কেউ ট্রামে-বাসে চাপবার জন্যে ব্যস্ত। কেউ 'রিক্সা—রিক্সা' বলে চীৎকার করছে, আর, যাদের পকেট ভারি তারা চট্ করে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ছে। মুহূর্তমধ্যে সারা কলকাতার চেহারাটি যেন একেবারে বদলে গেল।

বৃষ্টি ধরে না, বর্ষণ প্রবলতর হয়ে আসে। দেখতে দেখতে কতকগুলি বিশেষ রাস্তায় জল জমে উঠে। এরূপ অবস্থায় ছাতা, বর্ষাতি, 'ক্যাপ' সবকিছুই নিরর্থক। জল বেড়েই চলে, ফুটপাত ডুবে যায়। কোথাও হাঁটু পর্যন্ত, কোথাও কোমর পর্যন্ত জল। বড়ো চওড়া রাস্তাগুলি তখন খরস্রোতা খালের রূপ ধারণ করে। অল্পক্ষণ পরে ট্রামের গতি স্তব্ধ হয়ে আসে, তারা এগুতে আর পারে না, একটার পর একটা সারিসারি দাঁড়িয়ে যায়। যাত্রীবোঝাই বাসগুলি প্রবল বর্ষণ আর জলস্রোতকে উপেক্ষা করে কিছুক্ষণ চলতে থাকে, চলবার বেগে জলের বুকে বড়ো বড়ো ঢেউ জাগে। ওই ঢেউয়ের আঘাত গিয়ে লাগে দুইপাশের দোকানগুলির দরজায়; কোনো কোনো পথচারী ঢেউয়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে কাৎ হয়ে পড়ে জলের মধ্যে, জামাকাপড়ের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে—দেখলে মায়া হয়। অশান্ত বেবিট্যাক্সি-গুলি শান্তভাবে যখন জলের মধ্যে প্রায়-অর্ধেক ডুবে থাকে তখন তাদের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, দুষ্টু ছেলেকে কেউ অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার শাস্তি দিয়েছে বুঝি। কিন্তু কোমরজল ভেঙে রিক্সাওয়ালা টুং টুং শব্দ করে এগিয়ে চলে—ডবল ভাড়ার লোভ সে সামলাতে পারে না।

চারদিকে জল থৈ থৈ করছে। এ যেন শহুরে মানুষগুলোকে নিয়ে পিতামহী প্রকৃতির নিষ্ঠুর কৌতুক। পায়ের জুতো তখন হাতে ওঠে, কাপড় গুটোতে গুটোতে কখন যে হাঁটুর ওপরে চলে আসে তা বোঝাই যায় না, পাৎলুন গুটিয়ে হাঁটবার অদ্ভুত ভঙ্গিটি দেখলে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। (মেয়েদের অবস্থা আরো করুণ। দামী শাড়ীতে কাদামাখা জল, শালীনতাবোধে শাড়ী গুটিয়ে নেবার অসুবিধে, দুপায়ের সুন্দর স্যাণ্ডেল জলের তলায় নিমজ্জিত, কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগটি সম্পূর্ণ সিক্ত, ভেজা রুমাল দিয়ে ঘনঘন মাথার চুল-মোছা—সে এক কারুণ্যমিশ্রিত কৌতুকজনক দৃশ্য।)

দুরন্ত ছেলেরা ভারি মজা পায়। খালি পায়ে তারা রাস্তায় নেমে এসে কোমরজলে সাঁতার কাটবার চেষ্টা করে। কেউ ভাঙা তক্তপোষ অথবা খালি পিপে ভাসিয়ে দিয়ে তার ওপর চেপে বসে ভারি আমোদ পায়। ছোট শিশুরা দরজা-জানালার ধারে স্রোতহীন বদ্ধজলে নৌকা ভাসাতে ভালোবাসে। ইস্কুলে 'রেনি-ডে' হলে ছেলেরা দল বেঁধে ভিজতে ভিজতে বাড়ী ফেরে। (কেউ-বা চলচ্চিত্রগৃহাভিমুখে অভিযান করে, টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে সিনেমা দেখে।) বড়বাবুর বড়ো কথার ভয়ে কেরাণীকুলের অনেকেই জলকাদা ভেঙে ঝড়ের কাকের মতো সিক্তদেহে আপিসের দিকে চলতে থাকে। তাদের মধ্যে যারা একটু বেপরোয়া তারা বাড়ীতে দিবানিদ্রা উপভোগ করে। বাইরে না গেলে

যাদের চলে তারা গল্পগুজবে, অথবা আধখোলা জানালার কাছে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে, সময় কাটিয়ে দেয়। যাদের কবিমন তারা বৃষ্টির সুরে নিজেদের প্রাণের সুর মেলায়, বাদলা দিনের বাতাস তাদের হৃদয়ের উত্তাপকে স্তিমিত করতে পারে না। তবে একথাও সত্য যে, পাষাণপুরী কলকাতা 'অলকাস্বপ্ন' দেখার উপযুক্ত স্থান মোটেই নয়।

কলকাতা শহরে যেমন পাকাবাড়ির প্রাচুর্য, তেমনি পুরানো জীর্ণ বস্তিবাড়িরও অভাব নেই। এসব ঘরে অসংখ্য দরিদ্র মানুষ বাস করে। ঘনবর্ষার দিনে এরাই সবচেয়ে বেশী কষ্ট পায়, এদের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি হলে ছাদের ফুটো দিয়ে অবিরল জল পড়তে থাকে, জামাকাপড়-বিছানাপত্র সব ভিজে যায়। বাইরে প্রবল জলস্রোত' বহুবিধ আবর্জনা নিয়ে নীচু জায়গার ঘরগুলিতে ঢুকে পড়ে—তখন এক দুঃসহ বদর্য অবস্থার সৃষ্টি হয়। এরূপ অবস্থায় অন্যকোনো বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়া কিংবা রাস্তায় এসে দাঁড়ানো ছাড়া বস্তিবাসীদের গত্যন্তর থাকে না। শহরের বস্তিগুলি ধনতান্ত্রিক সমাজের কলঙ্কের পরিচয় বহন করে।

তবে কলকাতায় স্বল্পবৃষ্টি তেমন খারাপ লাগে না, বিশেষত রাতের বেলা। প্রচণ্ড উত্তাপে এখানকার মানুষগুলোর কী যে কষ্ট হয় তা বর্ণনাতীত। বেশীর ভাগ মানুষই তো গরীব, কয়জনের বাড়িতেই-বা ইলেকট্রিক পাখা রয়েছে। আর, সূর্যের খরতাপে চারদিকের বাতাস যখন আগুনের মতো হয়ে ওঠে তখন ফ্যানের হাওয়া তো গায়েই লাগে না। দিনের বেলাটি কাজকর্মে কোনোরকমে কেটে যায়। কিন্তু দীর্ঘ রাতটি—কিছুতেই কাটতে যায় না। অসহ্য গরমে বিছানায় ছটফট করতে হয়, চোখে ঘুম আসে না, বদ্ধ ঘরে গুমোট হাওয়ার প্রকোপ দুর্বিষহ। গ্রীষ্মের দিনে এরূপ অবস্থায় মানুষ আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, মেঘের আনাগোনা দেখলে তারা খুশিই হয়, ঠাণ্ডা বাতাসে ভর করে বৃষ্টি নামলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। রাতে একটুখানি ঘুমোতেও যদি না পারল তাহলে শহরের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত মানুষগুলি বাঁচে কী করে? তাই, কলকাতাবাসীর জীবনে অল্পবৃষ্টি—ভিজে বাতাসের কিছুটা স্পর্শ—সুখেরই বলতে হবে। কদমকেয়ার গন্ধ হাওয়ায় ভেসে না-ই বা এলো, মন্দাক্রান্তা ছন্দে 'মেঘদূত'-আবৃত্তি সম্ভবপর না-ই বা হলো, তরুলতার শ্যামল সৌন্দর্যের সমারোহ চোখে না-ই বা পড়লো, সাতরঙা রামধনুর বিচিত্র বর্ণবিলাস না-ই বা দেখা গেল—গ্রীষ্মতপ্ত মহানগরীতে হালকা বর্ষণ যে সুখদায়ক, এ বিষয়ে মতবিরোধের অবকাশই নেই।

আমাদের শিক্ষাসংস্কার

ইংরেজ-জাতীর শাসনাধীনে থাকিয়া বিগত দেড়শত বছরের মধ্যে আমরা য শিক্ষা অর্জন করিয়াছি তাহার লাভক্ষতির হিসাবনিকাশের একটা উদ্যম আজ মামাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে। জাতীয় জীবনের জাগরণের ক্ষেত্রে ইহাকে নিশ্চয়ই আমরা শুভবুদ্ধির পরিচয়ক বলিয়া মনে করিতে পারি। সুদীর্ঘকালের মপ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টিকে অপসারিত করিয়া আজ আমরা প্রকৃতই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি য, ইংরেজিশিক্ষা আমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছে, উজ্জীবিত করে নাই। করে তাই বলিয়াই এই শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের পক্ষে একটা বোঝার মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং বর্তমানে ইহা জাতির অগ্রগতিকে প্রতিপদে ব্যাহত করিতেছে। শিক্ষার নামে এতবড় বঞ্চনা ও নির্মম পরিহাস জগতের কোনো সভ্যদেশে দেখা যাইবে বলিয়া আমাদের ধারণা নাই।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইল মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করা, মানুষের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা, জাগতিক পরিবেশর সঙ্গে মানুষের পরিচয়সাধন করিয়া দেওয়া, ব্যষ্টিজীবন ও সমষ্টিজীবনের মধ্যে ঐক্যের সেতু গড়িয়া তুলিয়া সুশৃঙ্খল সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করা। কিন্তু ইংরেজের প্রদত্ত শিক্ষা আমাদিগকে মানুষ করিয়া তোলে নাই, আমাদের আত্মশক্তির বিকাশসাধন করে নাই, ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের মধ্যে কোনো যোগসূত্র রচনা করিতে পারে নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া তথাকথিত শিক্ষালাভের পরও আমাদের শিক্ষায়তন ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে বিচ্ছেদ দূর হইল না। এই শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের মনুষ্যত্ব, আমাদের মর্যাদাবোধ ও শুভবুদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে হত্যা করিয়াছে—স্বাধীনমানুষ, বলিষ্ঠ সমাজ, স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িবার সকল শক্তি পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। সুতরাং আমাদিগকে জাতীয়-শিক্ষা প্রবর্তনের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে। শোচনীয় আর্থনৈতিক পরাধীনতার হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে আমাদের শিক্ষাধারার মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনিতে হইবে। স্বাধীন মানুষ, স্বাধীন রাষ্ট্র যদি গড়িতে হয় তবে গণতান্ত্রিক শিক্ষার বুনিয়াদ রচনা করা ছাড়া কোনো উপায় নাই।

আমাদের শিক্ষাসংস্কারের গোড়ার কথা হইবে সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারসাধন। দেশের প্রত্যেকটি মানুষ যাহাতে শিক্ষার আলোক পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা এখনো আমাদের দেশে হয় নাই। আমরা আজ গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখিতেছি, সেজন্য সর্বাগ্রে চাই গণশিক্ষার বিস্তার। তাহাকেই গণশিক্ষা বলিব, যেখানে সমাজের সর্বস্তরের, সকল বয়সের, নরনারী ও শিশুর রহিয়াছে শিক্ষালাভের অধিকার। প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্কদের শিক্ষার কোন উচ্চআদর্শ আমাদের নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আবশ্যিক অবৈতনিক প্রাথমিক-শিক্ষা-

সম্পর্কিত যে-আইন বাঙ্‌লাদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা দেশের সর্বত্র অদ্যাবধি কার্যকর হইয়া উঠে নাই। অধুনা আবশ্যিক শিক্ষার নানা পরিকল্পনার কথা আমরা শুনিতেছি।

গান্ধীজী সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালকবালিকাদের জন্য সাত বৎসর পরিসরের আবশ্যিক বুনিয়াদী শিক্ষার কথা বলিয়াছিলেন। সার্জেন্ট-পরিকল্পনায় আবশ্যিক শিক্ষার পরিসর আট বৎসর—ছয় হইতে চৌদ্দ বছরের বালকবালিকারা এই শিক্ষাব্যবস্থায় সুযোগ লাভ করিবে। বহুকাল পূর্বের এসব পরিকল্পনা অদ্যাপি বাস্তব রূপ লাভ করে নাই. করিলে আমাদের শিক্ষার অনশন কিছুটা দূর হইত। যে-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা এখন দেশে প্রচলিত আছে, উহা দ্বারা বালকবালিকারা যথার্থ শিক্ষালাভ করিতেছে না। বহুদিনের পুরাতন পরিত্যক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীগণের আজো বিদ্যাচর্চা করিতে হইতেছে। ইহাতে আনন্দ নাই, শিশুমনস্তত্ত্বের স্থান নাই, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নাই—আছে শুধু পুঁথির বোঝা ও শাসনদণ্ড। অল্পবয়সে পুঁথিতে মনঃসংযোগ করা অপেক্ষা হাতেকলমে কাজ করার মধ্য দিয়াই ছেলেমেয়েরা ফলপ্রসূ শিক্ষালাভ করে। অগ্রসর দেশগুলিতে সেজন্য ইন্দ্রিয়মূলক শিক্ষা ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে ছোট ছোট বালকবালিকাদের জন্য। ফ্রোয়েবেল ও মন্টেসারি পদ্ধতিতে এরকম শিক্ষাধারার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে মোটেই উন্নত নয়, এবং এরকমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে নিতান্ত স্বল্প। এতদ্ব্যতীত এইসব প্রতিষ্ঠানে যে-শিক্ষায় ধারা প্রবাহিত তাহা আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। একটিমাত্র আদর্শে আমরা প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছি। পুঁথিগত মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য কলেজের অভিমুখে ধাবিত হওয়াই দেশের প্রত্যেক তরুণতরুণীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞান, সূক্ষ্ম-ভাবভিত্তিক সাহিত্য যে সকলের জন্য নয়, এ সত্যটি এখনো আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। সেহেতু মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বৈচিত্র্যের এমন অভাব লক্ষিত হয়।

বৃত্তিশিক্ষাদানে তেমন কোনো ব্যাপক উদ্যোগ আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে পরিদৃষ্ট হয় না। কৃষি, কারিগরি ও ব্যবসায়ী শিক্ষার সুব্যবস্থা যদি না থাকে তাহা হইলে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ জীবনে কোনাদিনই আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিতে পারিবে না, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রতিপদে তাহাদের আসিবে ব্যর্থতা এবং পরাজয়। জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করিবার শক্তিসামর্থ যাহাতে শিক্ষার্থীরা অর্জন করিতে পারে তাহার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। বিদ্যালয় ত্যাগ করার পর তাহারা যাহাতে সমাজে প্রবেশ করিয়া স্বাধীন মানুষ বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে পারে, আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যায়তনে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষাকে অর্থকরী ও স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার জন্য গান্ধীজী তাঁহার ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। কর্মপ্রবাহের ভিতর দিয়াই মানুষের জীবনের অগ্রসরণ। শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মের একটা বিশেষ স্থান আছে। অথচ শিক্ষাকে আমরা কর্মকেন্দ্রিক ও শিল্পমুখী না করিয়া পুস্তককেন্দ্রিক করিয়া তুলিয়াছি। ফলে আধুনিক শিক্ষা তাহাদের কাছে একটা বোঝার মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যতদিন না হয় ততদিন নানা দুর্ভোগ আমাদিগকে সহ্য করিতে হইবে, কেরানীজীবনের দাসত্ব হইতে আমরা কিছুতেই মুক্তিলাভ করিতে পারিব না।

নারীশিক্ষার ব্যবস্থাও এদেশে নিতান্ত অসম্পূর্ণতার স্তরে রহিয়া গিয়াছে। সমাজে নারীর স্থাননির্দেশপূর্বক বিশেষ রকমের শিক্ষাপদ্ধতির গোড়াপত্তন এখনো আমরা করিতে পারি নাই। অসংখ্য ত্রুটিতে-ভরা পুরুষের শিক্ষার আদর্শই আমরা মেয়েদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছি। ইহাতে আমাদের সমাজ ও পারিবারিক জীবন কেন্দ্রচ্যুত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া প'ড়তেছে। বাহিরের জগতে পুরুষের সহিত আর্থিক প্রতিযোগিতা করিবার প্রবৃত্তি নারীসমাজে আজ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতে নারী এবং পুরুষ কাহারো কল্যাণ দেখা দিবে না। পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া নারীশিক্ষার আদর্শ গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিবিধ বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কুটীরশিল্পবিষয়ক শিক্ষালাভ করিলে মধ্যবিত্তসমাজের কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতা আসিতে পারে। বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে এবং বহুতর কারণে আমাদের সমাজে নারীর মন বহির্মুখী হইয়া পড়িয়াছে, উহাকে যথাসম্ভব গৃহাভিমুখী করিয়া তুলিবার প্রেরণা সৃষ্টি করিতে হইবে। বহিঃক্ষেত্রে মেয়েদের কর্মজীবন নিতান্ত সীমাবদ্ধ। সেইজন্যই নারীশিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনিবার প্রয়োজন আমরা অনুভব করিতেছি।

পাঁচবৎসরবয়স্ক ও তৎনিম্ন শিশুদের নার্সারী স্কুলে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এদেশে নাই বলিলেও চলে। পাশ্চাত্ত্যদেশে নার্সারী স্কুলের ব্যাপক প্রসার হইয়াছে বলিয়া সেখানে অল্পবয়সের ছেলেমেয়েরা শিক্ষানিকেতনে স্বাস্থ্য ও আনন্দের ঝর্ণাধারা ছুটাইয়া চলিয়াছে। আনতশিরে ম্লানমুখে ছয়সাত ঘণ্টা ধরিয়া পুঁথির মধ্যে মনোনিবেশ করিতে হয় আমাদের দেশের ছেলেমেয়েকে। ইহা নির্মমতার নামান্তর মাত্র, এবং এরূপ নির্মমতা তাহাদের পক্ষে দুর্বিষহ।

এতদিন ইংরেজি ভাষাই ছিল আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার বাহন। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বর্তমানে মাতৃভাষাকে আমরা শিক্ষার বাহনরূপে পাইয়াছি। মাতৃভাষার সাহায্য ভিন্ন কোনো শিক্ষাই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না—এতকাল পরে এই সত্যটি আমরা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়াছি। কিন্তু কেবল মাধ্যমিক স্তরেই নয়, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করিয়া তুলিতে হইবে, তবেই আমাদের শিক্ষা যথার্থ ফলপ্রদ হইয়া উঠিবে।

এদেশের উচ্চতর শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যেও নানা ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ সংস্কৃতি আদানপ্রদানের ক্ষেত্রটিকে প্রশস্ত করিয়া তোলা। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বিদেশের জ্ঞানবিদ্যাই গ্রহণ করিতেছে, আপন দেশের জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার বিশ্ববাসীর কাছে উন্মুক্ত করিয়া ধরিবার তেমন কোনো চেষ্টা করিতেছে না। দেশীয় সংস্কৃতি, স্বদেশের ঐতিহ্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। আমরা শুধু গ্রহণ করিতেই শিক্ষালাভ করিতেছি, অন্য দেশকে নিজের জিনিস দিবার উদ্যম ও প্রেরণা আমাদের মধ্য হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জাতীয় ভাবধারায় যাহাতে আমাদের জীবন পরিপুষ্ট হইয়া উঠে এবং অন্যদিকে বৈদেশিক উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া যাহাতে আমরা আহৃত বিদ্যার পরিচয় দিতে পারি, বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

শিক্ষাসংস্কারের কথা বলিতে বসিয়া শিক্ষককে বাদ দিলে বর্তমান আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এবং মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে যে-বেতন আমরা দিয়া থাকি, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এজন্যই বিদ্যালয়ে বর্তমানে উপযুক্ত শিক্ষকের এমন অভাব দেখা যাইতেছে। শিক্ষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না ঘটিলে শিক্ষাব্যবস্থাও উন্নত হইবে না। জীবিকা-অর্জনের দুশ্চিন্তা হইতে শিক্ষককে মুক্তি দিবার উপায় আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। শিক্ষককে বাদ দিয়া শিক্ষাসংস্কারের কোনো প্রস্তাবই উত্থাপিত হইতে পারে না।

শিক্ষকের বেতনবৃদ্ধি করিতে হইলে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান বাড়াইতে হইলে, শিক্ষা বাবদ আরো অধিক পরিমাণ অর্থ আমাদিগকে ব্যয় করিতে হইবে। সরকার যদি আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অকৃপণ হস্তে সাহায্য করেন, এবং আমরাও যদি আমাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে শিখি, তবে অর্থের অভাব অবশ্যই বিদূরিত হইবে। আমরা এখনো শিক্ষার জন্য আবদার করিতেছি মাত্র—যেদিন প্রকৃত গরজ অনুভব করিব সেদিন নিশ্চয়ই শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থের অসচ্ছলতা দেখা যাইবে না। আমাদের মনোবৃত্তির পরিবর্তনের উপরই শিক্ষাসংস্কারের আকৃতিপ্রকৃতি এবং সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

বিজ্ঞান ও মানবসভ্যতা

(সৃষ্টির আদিম যুগে এ পৃথিবীতে সবচেয়ে অসহায় ছিল মানুষ। যেদিন সে প্রথমে চোখ মেলিয়া চাহিল, নিজের চতুর্ধারে দেখিতে পাইল প্রকৃতির ভয়াল কুটিল রূপ—ভয়ংকরী প্রকৃতি বুঝি করাল মুখব্যাদান করিয়া সেদিন শঙ্কিত মানব-শিশুকে গ্রাস করিতে উদ্যত। সেদিন মানুষের দেহে ছিল না কোনো আচ্ছাদান, ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য তাহার হাতের কাছে ছিল না এককণা আহার্য, হিংস্র শ্বাপদের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য ছিল না কোনোরূপ অস্ত্র, আত্মরক্ষা করিবার জন্য ছিল না এতটুকু নিরাপদ আশ্রয়। সে তখন সম্পূর্ণ নিঃসম্বল, একেবারে অসহায়।) প্রতিকূলা নিসর্গপ্রকৃতির ভীষণ ভ্রূকুটি সেই আদিম যুগে মানুষকে নিশ্চয়ই শঙ্কাবিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, নিদারুণ প্রতিকূল প্রতিবেশের মধ্যে অবস্থান করিয়াও এই মর্তভূমির মানবশিশু আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, চারিদিকের ভয়ালতার কাছে আত্মসমর্পণ সে করে নাই। এই অভাবনীয় ঘটনা কেমন করিয়া সম্ভব হইল? ইহার একটিমাত্র উত্তর—মানুষের শাণিত বুদ্ধি আর বিপুল সৃজনীপ্রতিভার বলে।

(মানুষের যাত্রা শুরু হইয়াছে সেই কোন্ স্মরণাতীত কালে। ইহা অনবচ্ছিন্ন, অপ্রতিহত। মানবের এই সুদীর্ঘকালের যাত্রার ইতিহাস, ইহা উদ্ধত প্রকৃতির সহিত অবিরাম সংগ্রামেরই কাহিনী। প্রকৃতি মানুষকে কত ভয় দেখাইয়াছে, তাহার প্রতিপদক্ষেপে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। তথাপি পথচলায় সে বিরত হয় নাই, নিজে চলতাধর্মকে ক্ষণকালের জন্যও পরিহার করে নাই।) প্রকৃতি-মানবের এই সংগ্রামে অবশেষে মানবসন্তানেরই জয়বার্তা ঘোষিত হইয়াছে। মানুষ ধীরে ধীরে প্রকৃতির হাত হইতে কাড়িয়া লইল তাহার রহস্যভাণ্ডারের চাবি, জানিয়া লইতে লাগিল বিপুলব্যাপ্ত জড়বিশ্বের বিচিত্র তথ্য, সেগুলিকে গ্রথিত করিল কার্যকারণসূত্রে—নবজন্ম সূচিত হইল বিজ্ঞানের।

(বিজ্ঞানের জন্মলগ্নে রহিয়াছে মানুষের প্রয়োজনসাধনের তাগিদ। কিন্তু মানুষ শুধু প্রয়োজনের দাস নয়। প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্রমশ সে পা বাড়াইয়াছে অপ্রয়োজনের উদার ক্ষেত্রে, অনিঃশেষ কৌতূহলের জগতে। জানার আনন্দ, প্রকৃতির রহস্যআবরণ উন্মোচনের অনির্বাণ প্রেরণা মানুষকে আকর্ষণ করিয়াছে দুরধিগম্য অজানিতের দিকে।) তাই, বিজ্ঞানের অভিযান অশ্রান্ত, বিজ্ঞানীর সাধনা অতন্দ্র—বিজ্ঞানসাধকের দল মাতিয়া রহিয়াছে নিত্যনূতন উদ্ভাবনে। বিজ্ঞান আজ তাহার পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে স্থলে-জলে-নভোদেশে—পরিদৃশ্যমান এই বিরাট বিশ্বসংসারের সর্বত্র। দূরকে সে নিকট

করিয়াছে, অদৃশ্যকে দৃশ্য করিয়া তুলিয়াছে। অজানাকে সম্পূর্ণ জানিয়া লইবে, ইহাই তাহার কঠিন পণ। আজ মানবসভ্যতার সে-অভ্রংলিহ সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার পিছনে বিজ্ঞানের দান অপরিসীম। আধুনিক সভ্যতা ও বিজ্ঞান অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত।

(সভ্যতার বিবর্তনপথে অগ্রসর হইয়া বর্তমানে আমরা বিজ্ঞানসমৃদ্ধ যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমরা আজ আর সেই অনেক-শতাব্দী-পূর্বেকার আরণ্যচারী ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করি না। মানুষের মনে আজ আদিম যুগের সেই অসহায়তার ভাব নাই।) বিজ্ঞান আমাদের অস্বাচ্ছন্দ্য, আমাদের দুর্বলতা অনেকখানি বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। (সন্ধানী মানুষের চোখে আলোকশিখা জ্বালিবার কৌশলটি যেদিন ধরা পড়িল, যেদিন মানুষ আবিষ্কার করিল বাষ্পশক্তি, সেদিন সূচিত হইল বিজ্ঞানের জয়যাত্রার প্রথম অধ্যায়।) বিশ্বচারী তমসার ঘন আস্তরণকে মানুষ কৌশলে অপসারিত করিল, বাষ্পীয় শক্তিকে কাজে লাগাইয়া পৃথিবীর দূরত্ব সে ঘুচাইয়া দিল। জেম্‌স্‌ ওয়াট কর্তৃক স্টীমইঞ্জিনের উদ্ভাবন মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় দান। (রেলস্টীমার উদ্ভাবিত হওয়ায় জলপথে-স্থলপথে মানুষের গতিবিধি নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিল, পৃথিবীর সর্বমানবের মিলনের ক্ষেত্রটি বাধামুক্ত হইল।) বিজ্ঞানের অভিযান শুরু হইয়াছে কোন্‌ সুদূর অতীতে, কিন্তু উনবিংশ-বিংশশতাব্দীতে ইহার অগ্রগতি বিস্ময়াবহ।

(বিদ্যুৎশক্তির আবিষ্কার মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও দূরদূরান্তে গতিবিধির ক্ষেত্রটি সহস্রগুণ প্রশস্ত করিয়া তুলিল। বৈদ্যুতিক বাতি, বৈদ্যুতিক পাখা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও টেলিভিশনযন্ত্র প্রভৃতি বস্তু বিদ্যুৎতরঙ্গের রহস্যময় শক্তির খেলাকে আশ্রয় করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তড়িৎতরঙ্গের মাধ্যমে পৃথিবীর একপ্রান্তের সংবাদ মুহূর্তমধ্যে অপর প্রান্তে গিয়া পৌঁছাইতেছে। গৃহাভ্যন্তরে বসিয়াই বর্তমানে আমরা কেমন অবলীলায় বহির্বিশ্বকে দেখিয়া লইতেছি।) বড়ো পৃথিবী আমাদের কাছে আজ করতলে আমলকবৎ একটি বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। অধুনা মানুষের বহুবিধ দুরারোগ্য ব্যাধিকে দমন করিবার উদ্দেশ্যেও চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিদ্যুৎশক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতেছে। শুধু তাহা নয়, বিজ্ঞানী তাহার বুদ্ধি খাটাইয়া মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো একান্ত সহজে আজ আকাশদেশে উড়িয়া বেড়াইতেছে ব্যোমযানের সাহায্যে। (এরোপ্লেনে উড়িয়া শূন্যপথে আমরা এখন ঘণ্টায় তিনশত মাইল পথ উত্তীর্ণ হইতেছি।)

(পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কার আশ্চর্যজনক। অধ্যাপক রন্টজেনের আবিষ্কৃত 'রঞ্জনরশ্মি' ও অধ্যাপককুরী ও মাদামকুরীর আবিষ্কৃত 'রেডিয়াম' বিজ্ঞানজগতে যুগান্তর আনিয়াছে। (রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে শরীরের অদৃশ্য বস্তু দৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে,—রেডিয়াম ক্যানসারের মতো ভয়ংকর ক্ষতের মারাত্মক বিষক্রিয়াকে অনেকটা প্রতিহত করিয়াছে।) একালের আর একটি যুগান্তকারী ঘটনা আণবিক শক্তির আবিষ্কার—একটি আণবিক বোমার ধ্বংসকারী শক্তি লক্ষ

লক্ষ ডিনামাইটের শক্তির চেয়েও বেশী। ইহার ভীষণতাদর্শনে মানুষ আজ ভীতস্তম্ভিত—বিমূঢ়। কেবলধ্বংসসাধনের কাজে প্রয়োগ না করিয়া, এই আণবিক শক্তিকে বিজ্ঞান যেদিন মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবে, সেদিন মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে অত্যুজ্জ্বল এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইবে।) 'র‍্যাডার বিম'-এর উদ্ভাবন এ যুগের বিশেষ একটি উল্লেখনীয় ঘটনা। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইহার সাহায্যে ইংলণ্ড জার্মানীর প্রচণ্ড বিমানহানার হাত হইতে কিছুটা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

(রসায়নবিজ্ঞান চিকিৎসাবিজ্ঞানের সহায়ক। চিকিৎসাবিজ্ঞানকে নানাভাবে সহায়তা করিয়া রসায়নবিজ্ঞান ব্যধিগ্রস্ত মানুষকে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর কবল হইতে ফিরাইয়া আনিতেছে। পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, ক্লোরোমাইসিটিন প্রভৃতি ঔষধ আবিষ্কৃত হওয়ায় এখন লক্ষ লক্ষ মানুষ বহুবিধ ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতেছে। পূর্বে ক্ষিপ্ত কুকুর, শৃগাল প্রভৃতির দংশনে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া কত মানুষ মারা যাইত, পাস্তুরের ইনজেকসন আবিষ্কৃত হওয়ায় সেই ভয়ের হাত হইতে মানুষ আজ মুক্ত। একদিন বসন্তরোগ লোকালয়, গ্রামের পর গ্রাম উৎসন্ন করিয়া দিয়াছে, জেনর-এর আবিষ্কৃত 'ভ্যাক্সিন' এই দুরন্ত রোগের প্রতিষেধক।) অধুনা সর্পবিষকে বিজ্ঞানীরা ক্যানসাররোগে প্রয়োগ করিতেছেন। অণুবীক্ষণযন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে আমরা নানারকমের সাংঘাতিক জীবাণুর সন্ধান পাইয়াছি।) এসব অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণের কাছে এখন মানুষ অসহায়ভাবে আর আত্মসমর্পণ করিবে না।

(মানবসভ্যতার বিকাশের গতি দ্রুততর করিয়াছে মুদ্রাযন্ত্র। এই যন্ত্রটি নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের একটি বড়ো দান। ইহা মানুষের জ্ঞানসাধনাকে কতখানি যে বিশ্বমুখী করিয়াছে তাহা ভাষায় বলিয়া শেষ করা যায় না।) সবাক চলচ্চিত্র, রেডিওফোন ইত্যাদির উদ্ভাবন মানুষকে আনন্দদান ও শিক্ষাপ্রচারের ক্ষেত্রে বিপ্লবসাধন করিয়াছে। দূরবীক্ষণযন্ত্রের দূরযানী দৃষ্টি আকাশলোকের গোপন রহস্যের আচ্ছাদন অপসৃত করিয়াছে।

বিজ্ঞান মানুষের নানা অভাব ঘুচাইয়াছে, মানুষকে আনন্দ দিয়াছে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য দান করিয়াছে, শক্তিমান করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের দান অমেয়। আধুনিক যুগটিকে বিজ্ঞানপ্রভাবিত যান্ত্রিক যুগ বলিলে কিছুই ভুল বলা হয় না। বিজ্ঞানের শক্তিবলে একালের মানুষ সত্যই বিশ্বজয়ী হইয়া উঠিয়াছে।

(কিন্তু ইহাও সত্য যে, বিজ্ঞানের যুগান্তকারী সকল আবিষ্কার মানবজাতির কল্যাণসাধনে প্রযুক্ত হয় নাই। বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কার একদিকে যেমন সভ্যতাবিকাশে সহায়তা করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি সভ্য মানুষের বহু শতাব্দীর কীর্তিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার উন্মত্ত প্রয়াসেরও সহায়ক হইয়াছে। পর-পর দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা আমাদের একথার সত্যতার প্রমাণপরিচয় বহন করিতেছে। অবশ্য ইহা বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীর দোষ নয়—দোষ হইতেছে লোভী মানুষের সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির, বৌদ্ধিক-দুষ্ট ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার। আত্মঘাতী

জিগীষাকে, দানবীয় প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারকে মানুষ যেদিন দমন করিতে শিখিবে, যেদিন মানুষের চিত্তে জাগ্রত হইবে মানবতাবোধ, সেদিন সভ্যতার সংকট আর দেখা দিবে না। মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বধর্মের উপর আস্থা আমরা কখনো হারাইব না। তাহার চিত্তে আবশ্যই একদিন শুভবোধের উদ্বোধন হইবে, এবং এই শুভবোধই তাহাকে পরিচালিত করিবে মহত্তর সমাজকল্যাণের অভিমুখে। বিজ্ঞানসাধনাকে ধর্মসাধনার সহিত যুক্ত করিতে পারিলে বিজ্ঞানের অভিযান শুভংকার হইয়া উঠিবে। পৃথিবীর অগণিত মানুষ আজ সেই মঙ্গলপ্রভাতের প্রতীক্ষায় দিন কাটাইতেছে।

বিজ্ঞান কী চায়ঃ জীবন, না, মৃত্যু

মানবসভ্যতার ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহের রক্তলেখা কতবার চিহ্নিত হইল। আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জৈব প্রেরণা মানুষকে বারংবার ঠেলিয়া দিয়াছে ভীষণ সংগ্রামের মুখে। প্রাগৈতিকহাসিক যুগ হইতে আজিকার বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষে-মানুষে কত পাশবিক হানাহানি আমরা দেখিলাম, দেখিলাম অমানবীয় জিঘাংসার ছিন্নমস্তারূপ। কুরুক্ষেত্র, লঙ্কা ও ট্রয়ের সংগ্রামকাহিনী কত কবির লেখায় অবিস্মরণীয় হইয়া আছে; থার্মপলি, হলদিঘাটের যুদ্ধ মানুষকে ভয়চকিত করিয়াছে। সেকালের মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচয় দিয়াছে নিজের বাহুবলের—বীরত্বের। রণনীতি তখনো মানবতা ও ধর্মবোধকে নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘন করে নাই। সেদিন ছিল বিজ্ঞানের শৈশব।

কিন্তু আজিকার দিনের যুদ্ধবিগ্রহের এ কী ভয়ংকর রূপ। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রণনীতি ও সমরকৌশল অভাবনীয়রূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক যুগে ধর্মবোধ ও ন্যায়নিষ্ঠার স্থান নাই, বাহুবলের প্রয়োজন নাই, যুদ্ধক্ষেত্রের পরিধিও এখনও সর্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রতিক কালের যুদ্ধ বাহুবলের নয়—অস্ত্রবলের। মানুষের বুদ্ধির সূক্ষ্মতা তাহার দৈহিক শক্তিকে আজ বহুদূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আধুনিক-সংগ্রাম যে এতখানি সর্বনাশা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে বিজ্ঞানের নিত্যনূতন মারণ-অস্ত্রের আবিষ্কার। তাই, সমগ্র বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। মানুষের মনে আজ অনুক্ষণ জাগিতেছে একটি মাত্র প্রশ্নঃ বিজ্ঞান কী চায়—সভ্যতার অগ্রগতি, না, বিনাশ? জীবন না, মৃত্যু?

প্রথমমহাযুদ্ধেও মারণ-অস্ত্রের এমন ভয়াবহ আত্মপ্রকাশ দেখা যায় নাই। পরিখার অন্তরালে থাকিয়া সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং দূরপাল্লার কামানে শত্রুকে

বিপর্যস্ত করিয়া তোলাই ছিল সেই যুদ্ধের বিশিষ্ট রূপ। কিন্তু প্রথমবিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে আবিষ্কৃত হইল বৃটিশ-ট্যাঙ্ক। ইহাতে যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইল, সূচিত হইল জার্মানীর পরাজয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ অস্ত্র আরো ভয়ংকর, তাহার দানবীয় শক্তি শতসহস্রগুণ বেশি ভয়াবহ ও মারাত্মক। মাত্র দুইটি আণবিক বোমার প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে অগণিত অধিবাসীসহ জাপানের দুইটি শিল্পসমৃদ্ধ নগরী মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

একদিকে আক্রমণ, অন্যদিকে আত্মরক্ষা—ফলে প্রতিদিন আরো উগ্র হইয়া উঠিতেছে বিজ্ঞানীর সন্ধানতৎপরতা। একটি মারাত্মক অস্ত্রকে প্রতিহত করিবার জন্য উদ্ভাবিত হইতেছে অন্য একটি ততোধিক মারাত্মক অস্ত্র। বোমারু বিমানের জন্য সৃষ্টি হইল বিমানধ্বংসী কামান, বিষবাষ্পকে প্রতিরোধ করিতে আসিল গ্যাসমুখোস, মাইনের পরিবর্তে আসিল মাইনঝাঁটানো অস্ত্র, গোলাবারুদের পরিবর্তে আসিল ফেরোকংক্রিটের পাষাণগাঁথুনী, ট্যাঙ্কের পরিবর্তে আসিল ট্যাঙ্কধ্বংসী অস্ত্র, সাবমেরিণের টরপেডো-আক্রমণকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সৃষ্টি হইল 'ডেপ্‌থ চার্জ', শত্রুবিমানের অবস্থিতি জানিবার জন্য আবিষ্কৃত হইল 'র‍্যাডার-বীম'। আবার, এ্যাটম বোমাকে প্রতিহত করিবার জন্য বিজ্ঞানীর লেবরেটরিতে গবেষণা চলিতেছে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের। এখানেই শেষ নয়। সম্প্রতি য়ুরোপীয় জাতিগুলি হাইড্রোজেন বোমার যে-ভয়াল পরীক্ষাকার্য চালাইতেছে তাহার সংবাদ পৃথিবীর মানুষকে ভীতিবিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। হিংসা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে হিংসাকে। ইহার সম্মুখে বিশ্বের নরনারী আজ যূপকাষ্ঠবদ্ধ মৃত্যুমুখী বলিয়া পশুর মতো শঙ্কাতুর, অসহায় মানুষের দুই চোখে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। বিজ্ঞান মানবসভ্যতাকে কোথায় টানিয়া নিতেছে?

সভ্যতা ও সাংস্কৃতিকে ধ্বংস করিবার জন্যই কি বিজ্ঞানীর গবেষণা? কেবল যুদ্ধকে ভয়াবহ করিয়া তোলার জন্যই কি বিজ্ঞানের অভিযান? যে-প্রকৃতির হাতে মানুষ ছিল ক্রীড়নক মাত্র, যে-প্রকৃতির বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে মানুষকে নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইয়াছে, সেই প্রকৃতির দুর্জয় ক্ষমতার উপর জয়ী হইবার প্রয়োজনে একদিন আরম্ভ হইয়াছিল বিজ্ঞানের সাধনা। পৃথিবীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষ মানবকল্যাণের জন্য ডুব দিয়াছিলেন রহস্যসমুদ্রে। সেই রহস্যের আবরণ অপসারিত করিয়া মানুষের আশ্চর্য প্রতিভা আবিষ্কার করিয়াছে কত গোপন সম্পদ ও শক্তি। জলে, স্থলে, নভোদেশে—সর্বত্রই মানুষের আজ অপ্রতিহত অভিযান। বিজ্ঞান একদিন ভয়ংকরকে শুভংকর করিয়া তুলিয়াছিল—সার্বিক সত্য ও মঙ্গল ছিল বিজ্ঞানীর সাধনার মূলমন্ত্র। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামশীল মানুষের জীবনে যে-বিজ্ঞান শক্তি ও শান্তির বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিল, সে বিজ্ঞানই আজ নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতেছে মানুষের ধ্বংসের পথ। তবে কি বিশ্বশান্তি ও কল্যাণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দান ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে?

বিজ্ঞানীর কাছে মানুষের ঋণ অপরিমেয়, বিজ্ঞানের কল্যাণপ্রসূ দান অবশ্য-

স্বীকার্য। এখন প্রশ্ন, এযুগের বিজ্ঞানীদল সর্বাত্মক ধ্বংসের কাজে আপনার শক্তি ও মনীষা নিয়োজিত করিল কেন? জীবন সাধনের পরিবর্তে কেন তাহাদের এই মৃত্যু-মুখী সাধনা। কোন্ শক্তির কাছে বিজ্ঞানী তাহার মহান আদর্শ, সমস্ত বিবেকবুদ্ধি বিক্রয় করিয়া দিয়া জনকল্যাণের ক্ষেত্রে দেউলিয়া সাজিয়া বসিল? মানবসভ্যতা যে আজ ধ্বংসোন্মুখ। ইহার জন্য কি বিজ্ঞানীরাই দায়ী, না, অপর কোনো দানবীয় শক্তি? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইবে।

আধুনিক রাষ্ট্রধর্ম ও সমাজব্যবস্থাকে বিশ্লেষ করিলে দেখা যায়, ইহার পিছনে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে মুষ্টিমেয় মানুষের সীমাহীন লোভ, পরাজিতকে শাসন ও শোষণের ঘৃণ্য প্রবৃত্তি। এই পুঁজিবাদী মানবগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুরা স্বার্থের কবলে পড়িয়া গোটা পৃথিবী আজ আর্ত ও পীড়িত। সেই স্বার্থান্ধ ধনিকশ্রেণীর কাছে জগতের বিজ্ঞানীরাও নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি-প্রতিভা বিকাইয়া দিয়াছে। রাষ্ট্রের স্বার্থই বর্তমানে মানবতার উর্ধ্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই, আজ তথাকথিত সভ্যদেশগুলিতে দেখিতেছি, রাষ্ট্রের জন্যই মানুষের মূল্য, রাষ্ট্রনিরপেক্ষ কোনো মূল্যই তার নাই। জীবনাদর্শেই এই যে বিপর্যয়, আজ ইহারই জন্য সাম্রাজ্যবাদ ক্ষুধার্ত গরুড়ের মতো সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে, আর, মানুষ দিন দিন নামিয়া আসিতেছে পশুত্বের স্তরে। আধুনিক রাষ্ট্রের এই অশুভ বুদ্ধির প্রভাবে আদর্শভ্রষ্ট হইয়া আজিকার বিজ্ঞানী বিশ্বে নরমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ইন্ধন যোগাইতে আগাইয়া আসিয়াছে।

নাজী-জার্মানী ও সামরিকবাদী জাপানের দিকে একবার দৃষ্টি ফিরাইলে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। উগ্র জাতীয়তাবাদ এই দুইটি রাষ্ট্রের জনগণের দৃষ্টিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। যুদ্ধকালীন জার্মানীর একজন নাৎসীনেতার মুখে আমরা শুনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আদর্শ হইবে: 'not to teach objective science, but the militant, the warlike, the heroic'। সুতরাং হিটলারের তাঁবেদার বিজ্ঞানীদলের নিকট হইতে বিশ্বধ্বংসের ভায়াল অস্ত্র ব্যতীত মানবকল্যাণ-প্রসূ কোনো আবিষ্কার কেমন করিয়া আমরা আশা করিতে পারি? অথচ এই জার্মানীই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একদিন পৃথিবীতে বড়ো একটি স্থান অধিকার করিয়াছিল। মানুষের জীবনাদর্শে যখন বিকৃতি ঘটে তখন ওই বিকৃতি সমগ্র জাতিকে মহানিপাতের অভিমুখে টানিয়া লইয়া যায়।

জঙ্গিবাদী জাপানও য়ুরোপের দুষ্টপ্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। জাপানের রাষ্ট্র-নায়কগণ তাই বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করিয়াছে মারাত্মক সমরঅস্ত্রের উৎপাদনে। জাপানের বিজ্ঞানীদল ওই মূঢ় যুদ্ধোন্মাদনার কবল হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারে নাই। আধুনিক জার্মানী ও জাপান বর্তমান পৃথিবীর মানুষকে দেখাইল সভ্যতা ও বিজ্ঞানের ভয়াবহ কুশ্রী মূর্তি। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিও কিছুটা অনুরূপ।

কিন্তু লোভীর বিকৃত ক্ষুধা ও উদ্ধত পশুশক্তি মানুষের আত্মিক শক্তিকে,

মানবসত্যকে, ন্যায়ধর্মকে চিরকাল পঙ্গু করিয়া রাখিতে পারিবে না। সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসীবাদ, নাজিবাদ এবং সামরিকবাদ একদিন-না-একদিন পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে; মানুষের শ্রেয়োবুদ্ধি ও মানবতাবোধের অমোঘ প্রভাবে একদিন সমাজতন্ত্র, সাম্য ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। সেইদিন রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাধীন চিন্তা ও শুভবোধের উদ্বোধন হইবে, এবং নূতন-আদর্শে প্রবুদ্ধ বিজ্ঞানীদের চিত্তে জাগিবে মানবকল্যাণসাধনের প্রেরণা।

বিজ্ঞানীর সত্যতপস্যার উপর বিশ্বাস কখনো হারাইব না। লোকশ্রুত ব্রিটিশ বিজ্ঞানবিদ্ হলডেনের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা বলিব: 'We need science more than ever before, and we must think scientifically not only about weapons and health, but about politics and philosophy'. বর্তমানের অস্বাস্থ্যকর সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটুক, মানবকল্যাণকে কেন্দ্র করিয়া বিবর্তিত হোক বিজ্ঞানসাধনা—ইহাই আমাদের কামনা।

বাঙালির আর্থিক উন্নতির অন্তরায়

বাঙালীর আর্থনীতিক জীবনে আজ সর্বনাশা ভাঙন ধরিয়াছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বর্তমান শতাব্দী শুরু হইবার অব্যবহিত-পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্‌লার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঙালির উপরই ছিল; এবং বাঙ্‌লাদেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী সারা বিশ্বে যে কেবল বাঙালির বিশিষ্টতার পরিচয় দিত তাহা নয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের মোটা লাভের অংশও ভোগ করিত বাঙালি ব্যবসায়িগণ। বর্তমানে সেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আজ বাঙালির স্থান অধিকার করিয়াছে বিদেশি শিল্পপতিগণ, মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া বণিকগণ। বাঙ্‌লার একচেটিয়া কারবারের অধিকারী হইয়া যাহারা বৎসরের পর বৎসর বাঙ্‌লার বাহিরে কোটি কোটি টাকা আয় করিয়া স্ফীত হইতেছে তাহাদের প্রদত্ত চাকুরিই আজ আমাদের একমাত্র সম্বল। অতীতের অবস্থার সহিত বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা করিলে আমাদের অবনতি কী ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব। বাঙ্‌লার আর্থিক অবস্থা একটু তলাইয়া দেখিলে বাঙালির উন্নতির অন্তরায়ের কারণগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

যে-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এককালে বাঙালির উন্নতির প্রধান কারণ ছিল, উহাই আজ অবনতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কুটিরশিল্পে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি, যখন দেখি যে একজন শিল্পী কত সুন্দর পণ্য নিখুঁতভাবে নিজেই প্রস্তুত করিতেছে। ইহার জন্য অপরের সাহায্যের প্রয়োজন

তো ছিলই না, বরং একক প্রচেষ্টাই এই কুটীরশিল্পজাত সামগ্রীর উৎকর্ষের বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু বর্তমান জগৎ যখন বহুলোৎপাদনের দিকে জোর দিল তখন বাঙালির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-গুণটি অর্থনীতিক অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইল। বর্তমানে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে পারিতেছে না। বিশ্বের প্রত্যেকটি জাতির আর্থনীতিক বুনিয়াদের দিকে তাকাইলে লক্ষ্য করা যায় যে, তাহার আর্থিক চক্র ঘুরিতেছে বহু ব্যক্তির মিলিত প্রচেষ্টায়। বর্তমানকালে যখন রাজনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া অর্থনীতি পর্যন্ত সমস্ত কিছুরই উন্নতি নির্ভর করিতেছে জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার উপর তখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধকে আঁকড়াইয়া থাকিলে আমাদের আর্থিক কাঠামো যে শীঘ্রই ভাঙিয়া পড়িবে, ইহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

আর্থনীতিক মতবাদের দ্রুত তথা বিপ্লবমূলক পরিবর্তনের চাপে পড়িয়া দিনের পর দিন নূতনভাবে বিশ্বের আর্থিক কাঠামোর সংস্কার সাধিত হইতেছে। পুরাতনকে সরাইয়া দিয়া নূতন উন্নততর প্রণালীকে কাজে লাগাইবার দিকে একটি প্রচেষ্টা বর্তমানে সকল ক্ষেত্রেই চোখে পড়িতেছে। বাঙালি কিন্তু যুগের এই অগ্রগতির সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না। সেইজন্য দেখা যায়, একই প্রাচীন পদ্ধতিতে অদ্যাবধি তাহার কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় পরিচালিত হইতেছে। ইহার হেতু কী? আমরা বলিব, ইহার জন্য অনেকটা দায়ী আমাদের আর্থিক দুরবস্থা এবং শিল্প-শিক্ষা ও বৈষয়িক শিক্ষার অভাব।

আমাদের আর্থনীতিক পরিস্থিতির সম্পর্কে আসিয়া দেশের শিক্ষাপ্রণালীর স্বরূপ বিশ্লেষ করিলে আমরা দেখি যে, বাঙলার স্বার্থের সহিত বাঙালির শিক্ষা-ব্যবস্থার কোনো সামঞ্জস্য নাই। বাস্তববিরোধী এই শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত থাকায় দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি শুধু কেরাণীর উৎপাদনের কারখানায় পরিণত হইয়াছে। বাঙলার শিক্ষাধারা বাঙালি শিক্ষার্থীকে কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে না, তাহাদের মনে কেবল শিক্ষার অভিমানের বিষ ছাড়াইয়া দেশে বেকারসমস্যার জাল বুনিতেছে। বাঙলার শিক্ষাব্যবস্থায় যে ফাটল ধরিয়াছে, এই সত্যটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া ইহার পরিবর্তনবিষয়ে অনেকেই সতর্ক হইয়া উঠিয়াছেন।

আয়ের স্বল্পতার জন্য, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে, স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতি একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের দুর্গত জনসাধারণ ও কৃষকের স্বাস্থ্যের অবস্থা এইরূপ হইয়াছে যে, তাহারা বৎসরের মধ্যে প্রায় সাত মাস রোগ ভোগ করে। একজন খ্যাতনামা চিকিৎসাবিজ্ঞানী ভারতবাসীর স্বাস্থ্যসম্বন্ধে হতাশ হইয়া বলিয়াছেন, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবই আমাদের স্বাস্থ্যসম্পর্কিত অবনতির প্রধান কারণ। তিনি আরো বলিয়াছেন, যে, ভারতের প্রদেশগুলির অধিবাসীদের মধ্যে পাঞ্জাবের খাদ্যই উৎকৃষ্ট। পাঞ্জাবদের প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকার সহিত তুলনা করিলে বাঙালীর দৈনিক খাদ্যের পরিমাণস্বল্পতা সুস্পষ্টরূপে চোখে পড়ে।

স্বাস্থ্যহীনতা আমাদের আর্থিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় এবং আর্থিক দুর্গতির অন্যতম প্রধান কারণ।

গতানুগতিকতা বাঙালির স্বভাবগত দোষ। কোন একটি বিশেষ ব্যবসায়ে যদি কেহ প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে, উক্ত ব্যবসায় লাভজনক মনে করিয়া আরো অনেকে অনুরূপ ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এরূপ অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া বাঙালি নিজের বিপর্যয় নিজেই ডাকিয়া আনিতেছে।

শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে বাঙ্‌লার যে বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে উহার দিকে মনোযোগী হইবার চেষ্টা বাঙালি কোনদিন করে নাই। নির্দিষ্ট আয়ের একটি সুবিধা থাকায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাঙালিবাবুদের বেশ ভিড় জমিল, সমাজ ইহাদের দেখিল অতিশয় সম্ভ্রমের চোখে। আপিসে কাজ করিয়া সমাজে যথেষ্ট সম্ভ্রমের অধিকারী হওয়া যায় দেখিয়া লোকে আর শিল্পবাণিজ্যের ঝুঁকি বহন করিবার প্রয়াস করিল না। ইহাতেই দেখা দিল বাঙালির আর্থিক বিপর্যয়ের সূত্রপাত। এই সুযোগে বাঙ্‌লার চা-পাট-কয়লা প্রভৃতি অত্যন্ত লাভজনক শিল্পগুলির একচেটিয়া অধিকারী হইয়া বসিল অবাঙালি ব্যবসায়ীগণ। ফলে আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে-সকল শিল্প বাঙালির জাতীয় আয়বৃদ্ধি করিতে পারিত, সেই শিল্পগুলির প্রায় সমস্তই ইংরেজ ও মাড়োয়ারীদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। যে-কয়টি বাঙালির হাতে আছে তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

শিল্পক্ষেত্রে বাঙালির অসাফল্যের আর-একটা প্রধান কারণ মূলধনের অভাব। যাহাদের মূলধন আছে, ঝুঁকি থাকায়, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অর্থবিনিয়োগ করার চেয়ে তেজারতিতে টাকা খাটানোকেই তাহারা লাভজনক বলিয়া মনে করে। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে এই, ব্যবসায়-বাণিজ্যে যাহারা উৎসাহী, মূলধনের অভাবে তাহারা হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। উপযুক্ত মূলধনের যোগানোর অভাবেই বাঙালি যে নিজের শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারে নাই একথা অবশ্যস্বীকার্য। জমিদারি-প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় ইহা আশা করা যায় যে, জমিদারগণ তাঁহাদের অর্থ ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যকোনো ক্ষেত্রে লাভজনক উপায়ে নিয়োগ করিতে পারিবে না বলিয়া বর্তমানে শিল্পে মূলধনের অভাব কিছুটা দূর হইবে।

পাশ্চাত্ত্যের শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চোখে পড়ে ওইসব দেশে শিল্পসংক্রান্ত অর্থের যোগান দেয় ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের প্রসার মোটেই আশানুরূপ হয় নাই বলিয়া বাঙ্‌লাদেশে বরাবরই মূলধনের অপ্রতুলতা রহিয়া গিয়াছে। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে এদেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মতো আমরা যদি প্রয়োজনমতো শিল্পব্যাঙ্ক গড়িয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে শিল্পে মূলধন-বিনিয়োগ-সমস্যার তীব্রতা অনেকখানি কমিয়া আসিবে।

বাঙ্‌লার কৃষি একেবারেই অনুন্নত। এদেশের কৃষকরা এখনো মান্ধাতা-

আমলের যন্ত্রপাতি লইয়া কৃষিকার্য চালাইতেছে। ফলে ফসলউৎপাদনের পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। কৃষকের শিক্ষার দৈন্য, মূলধনের অপ্রাচুর্য, কৃষিসমবায়সমিতির অভাব, উৎপন্ন ফসল বাজারজাত করিবার অসুবিধা, ইত্যাদি নানাকিছু এদেশের কৃষকের উন্নতির অন্তরায়। তা ছাড়া, ইহাও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, যে-সকল চাষী আদিম যুগের কৃষিপ্রণালী অনুসরণে কাজ করিয়া আসিতেছে, কৃষির ক্ষেত্রে তাহারা উন্নত-প্রণালী-প্রবর্তনের বিরোধী; এই অবাঞ্ছিত অবস্থার জন্য শুধু বাঙলার কৃষকসম্প্রদায়কেই দায়ী করিলে চলিবে না, পল্লীঅঞ্চলে যথোচিত শিক্ষাবিস্তারবিষয়ে সরকারের উদাসীন মনোভাব এবং চাষীদের অবিশ্বাস্য দারিদ্র্যও ইহার জন্য অনেকটা দায়ী।

বাঙলার বৈদেশিক বাণিজ্য আজ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে য়ুরোপীয় বণিকগণ। কলিকাতার বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা পনেরো ভাগ মাত্র ভারতবাসীর হাতে। সুতরাং বাঙালির হাতে যে কতটুকু ইহা সুস্পষ্ট অনুমান করা যায়। বৈদেশিক বাণিজ্যে যে-পরিমাণ মূলধন আবশ্যক তাহার অধিকাংশেই যোগান দিয়া থাকে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক। বাঙলায় ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত কোনো এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক না থাকায় য়ুরোপীয় এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি কেবল ইংরেজ ব্যবসায়ীগণকেই তাহাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে সাহায্য করিয়া থাকে। ইহার ফলে কেবল গ্রেটব্রিটেনের সহিতই আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর অপরাপর দেশে বাণিজ্যবিস্তারের বহু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গ্রেটব্রিটেনের বাণিজ্যের সহিত এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের উন্নতি নির্ভর করার দরুণ, অন্যান্য দেশগুলিতে বাঙলার বৈদেশিক বাণিজ্য ভালভাবে শিকড় গাড়িতে পারে নাই।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজে বুঝিতে পারা যাইবে, যে, বাঙালির স্বভাবগত দোষই কেবল বাঙালির অন্তরায় নয়, বহুবিধ সমস্যার বাঙালি জাতীয় জীবনকে প্রতিনিয়ত বিব্রত করিতেছে। ওইগুলির সুষ্ঠ সমাধান না হইলে এদেশের আর্থিক উন্নতি সুদূরপরাহত। বর্তমানে বাংলার আর্থিক-কাঠামো-পুনর্বিন্যাসের সময় আসিয়াছে। কী করিয়া, কোন্ পথে, এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে এ সম্বন্ধে একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, গ্রামে কৃষকদের সংঘবদ্ধতা, মূলধনের যোগান, কৃষিশিক্ষাপ্রবর্তন, বাঙালির চরিত্রগত দোষগুলির দূরীকরণ প্রভৃতির উপর বাঙালির দারিদ্র্যমুক্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

গ্রন্থও মানুষের একটি বড়ো সঙ্গী

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই মানুষকে আমরা দেখিতেছি যৌথজীবনের পটভূমিকায়। যখন সভ্যতার আলো মানবসংসারে বিকীর্ণ হয় নাই মানুষ যাপন করিয়াছে অরণ্যচারী ভ্রাম্যমাণ জীবন, তখনো সে চাহিয়াছে তাহারই মতো অপর একটি মানুষের সঙ্গ। মানুষের গড়া এই যে সমাজ, তাহার মূলেও রহিয়াছে উক্ত সহজাত যৌথবৃত্তির প্রেরণা। তাই, দেখি, মানবসমাজের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস মানুষে-মানুষে মিলনেরই ইতিহাস—পারস্পরিক সাহচর্য ও উদার একটি ক্ষেত্রে মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার সভ্যতাকে দিয়াছে বিশিষ্ট একটি রূপ।

সমাজজীবনের মধ্যেই বিকাশলাভ করে মানুষের দেহের ধর্ম ও মনের ধর্ম ও হৃদয়ধর্ম। তাহার যতই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব থাকুক না কেন, সমষ্টিজীবনকে বাদ দিয়া তাহার ব্যক্তিজীবনের সামগ্রিক স্ফুরণ কখনো সম্ভব নয়। তাই, একটি প্রাণ চায় আর-একটি প্রাণের সাড়া, একটি ভাব চায় আর-একটি ভাবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিধৃত হইয়া থাকিতে। সভ্য মানুষ সমাজহীন নিঃসঙ্গজীবনযাপন করিতে পারে না, যৌথবৃত্তির কেন্দ্রাভিসারী শক্তি তাহাকে অপর মানুষের দিকে আকর্ষণ করে।

আবার, শুধু মানুষই মানুষকে দান করে না। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতিকেও মানুষ লাভ করিয়াছে তাহার জীবনবিকাশের সাথীরূপে। প্রকৃতির বিচিত্র রূপসৌন্দর্যের অভিব্যক্তিকে পঞ্চইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া আমরা প্রতিনিয়ত বরণ করিয়া লইতেছি নিজেদের হৃদয়মন্দিরে—অন্তরের অন্তস্থলে।

তারপর মানুষের আর-একটি নবতন সঙ্গীর আবির্ভাব হইল গ্রন্থরচনার সেই স্মরণীয় শুভলগ্নে। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার গ্রন্থপ্রচারের সম্ভাবনাকে দান করিল অজস্রতা মুদ্রাযন্ত্র মানুষের এক আশ্চর্য কীর্তি। ইহার সহায়তায় দূরদূরান্ত, অতীতবর্তমান, পূর্বপশ্চিম একই সূত্রে গ্রথিত হইল—ঘুচিয়া-মুছিয়া গেল দেশ আর কালের গণ্ডীর দুস্তর ব্যবধান। নিজের ঘরের মধ্যেই মানুষ পাইল তাহার আত্মার আত্মীয়কে, বিশ্বমানবের সঙ্গলাভ করিল সে গ্রন্থের মাধ্যমে।

মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প ও সাহিত্যসাধনার নির্বাক সাক্ষীরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে জগতের মহামূল্য গ্রন্থরাজি। এগুলির ভিতর দিয়া মানুষ লাভ করিতেছে আপন অন্তরতম সত্তার পরিচয়। নির্জন অরণ্যে তুমি যাও—কোনো মানব তোমার সাথী হইবে না সেই অরণ্যপ্রদেশে। কিন্তু তোমার দুঃসহ নিসঙ্গতা মুছিয়া দিবে, একটি বই। অকূল সমুদ্রের জনশূন্য একটি দ্বীপে হইল তোমার দ্বাদশ বৎসরের জন্য নির্বাসন, সেখানেও মানুষের মুখ দেখিতে পাইবে না তুমি সুদীর্ঘ একটি যুগ ধরিয়া। কিন্তু তাহাতেও তোমার চিত্তের কোনো গ্লানি কিংবা দুঃখ নাই যদি সঙ্গে থাকে বই-এর একটি সেল্‌ফ। যদি হৃদয়ের গভীরে বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ চাও তবে তোমার চাই বিশিষ্ট মানুষের লেখা বিশিষ্ট কয়েকখানা বই—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শেক্সপীয়র,

গ্যেটে কিংবা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কিংবা শেলীর লেখা গ্রন্থকে সঙ্গী করিতে পারিলে মানুষের হৃদয়মনের বহুতর অভাব ঘুচিয়া যায়। বিশ্বকে উপলব্ধি করিতে হইলে বইয়ের নিবিড় সঙ্গ না হইলে মানুষের চলে না।

মানুষের নিরন্তর সঙ্গ আমরা কামনা করি এইজন্য যে, মানুষ মানুষের প্রয়োজন মিটায়, পরস্পরকে আনন্দ দেয়। একই কারণে গ্রন্থের সঙ্গও আমাদের কাম্য—সেও দেয় আনন্দ, আর, সাধন করে নানা প্রয়োজন। আমাদের হৃদয়ানন্দে সৃষ্টি হইয়াছে শিল্পকলা ও সাহিত্য, প্রয়োজনবোধে সৃষ্টি হইয়াছে বিজ্ঞান। আর, পরাজ্ঞান ও জগৎরহস্যের উৎসসন্ধানের ফলে পাইয়াছি আমরা প্রাচী ও প্রতীচীর দর্শনকে। কিন্তু আজিকার দিনে কোথায় আমরা পাইব হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো, গ্যেটে, শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ? কোথায় পাইব মাদাম কুরী, ফ্যারাডে, মার্কনি, এডিসন, জগদীশচন্দ্রকে? এই বিংশ শতাব্দীতে কোথায় পাইব শংকর, প্ল্যাটো, এ্যারিস্টটলকে? যদি তোমার গৃহে থাকে একটি গ্রন্থাগার তবে ইহাদের সকলেরই নিকটসান্নিধ্য মিলিবে, সেখানে উপলব্ধি করিবে তুমি তাঁহাদের নিঃশব্দ উপস্থিতি। দেখিবে, প্রাচীন গ্রীস, মিশর, রোম, ভারতবর্ষ, পরস্পরের দিকে তাকাইয়া আছে উৎসুক দৃষ্টিতে। যদি তোমার অন্তরে থাকে সঙ্গপ্রিয়তার প্রেরণা, আর, যদি থাকে তোমার অধ্যবসায় তবে বইয়ের পাতা তোমার চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিবে রহস্যময় এবং বিশাল জগৎ।

সুতরাং সভ্য মানুষের চাই গ্রন্থরাজির সঙ্গ। ইতিহাস, পুরাণ, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের বই মানুষকে দান করে কত আনন্দ, শিক্ষা ও জ্ঞান। অতীতের ঐতিহ্য, নানামুখী চিন্তার অনুশীলন ও বিচিত্র ভাবধারা গুহায়িত রহিয়াছে গ্রন্থরাজির মধ্যে। সেখানে আসিয়া মিশিয়াছে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্যের স্রোতোধারা, সেই ধারায় অবগাহন করিয়াই ঘটে মানুষের চিৎপ্রকর্ষ। বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ের ক্ষেত্রে গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা আন্তরিকভাবে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই মনীষী কারলাইল্‌ তাঁহার 'On the Choice of Book' প্রবন্ধের একজায়গায় বলিয়াছেন: 'The true university of our days is a collection of books'।

বাস্তব জীবনে আমরা দেখি, মানুষের সঙ্গ মানুষকে নানাভাবে প্রভাবিত করে—বইয়ের সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা যায়। ভালো আর খারাপ সঙ্গীর মতো, ভালো বই এবং খারাপ বইয়ের প্রভাব অনস্বীকার্য। ভালো বই গ্রহণ করিতে হইবে চিনিয়া লইয়া, যাচাই করিয়া, বাছাই করিয়া। ভালো গ্রন্থের রচয়িতা, অতীতের ও দূরের সেই মনীষীরা—'Noble deads'—সহজে কিন্তু কথা বলে না। তাঁহাদের মুখে ভাষা ফুটাইয়া তুলিতে হইলে চাই ধৈর্য, অধ্যবসায় ও বিচক্ষণতা। ইহার জন্য মননশক্তি ও হৃদয়বৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে জাগ্রৎ রাখিতে হইবে নতুবা বইয়ের জগতের গভীরতম প্রদেশ হইতে জ্ঞান ও আনন্দের সম্পদ আহরণ করা যাইবে না। ভূগর্ভের অভ্যন্তরে গুপ্ত রহিয়াছে কত সোনা, প্রকৃতি সহজে

মানুষকে তাহা দান করে না; তাহার জন্য চাই শ্রম, উৎসাহ, মনের একাগ্রতা। তেমনি বইয়ের পৃথিবী হইতে আনন্দ আর জ্ঞানবিজ্ঞানের স্বর্ণসম্পদ সংগ্রহ করিতে হইলে আমাদের অধ্যবসায়ী হইতে হইবে।

সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের উপাসক যে-সব কবি, জ্ঞানী, দার্শনিক, বিজ্ঞানীর দল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা লইয়া, হৃদয়ের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়া, গ্রন্থের রাজ্যে মানুষকে প্রবেশ করিতে হইবে। তবে তাঁহারা আমাদিগকে সঙ্গদান করিবেন, তবে আমাদের সঙ্গে ওইসব বিশ্ববন্দিত মনীষীরা কথা বলিবেন। একনিষ্ঠচিত্তে অতীতের মহামনীষীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়সাধন করিতে হইবে।

উৎকৃষ্ট বই মানুষকে দেয় অনাবিল আনন্দ। মানুষের উচ্চতর বৃত্তিগুলি চায় সত্য, জ্ঞান, ও আনন্দের আলো। জ্ঞানসাধনা ও শিল্পসাধনা মানুষকে প্রতিদিনের তুচ্ছতার সংসার হইতে তুলিয়া ধরিয়াছে এক উচ্চতর ভাবলোকে। আবার, মানুষের সভ্যতার কোনো একটি-মাত্র বিশিষ্ট যুগ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই অতীতের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করিতে হয় বর্তমানকে এবং বর্তমানের পটভূমিতেই গড়িয়া উঠে অনাগত ভবিষ্যৎ। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের মধ্যে সেতু রচনা করে যুগোত্তীর্ণ গ্রন্থরাজি। গ্রন্থের সাহচর্যের সূত্র ধরিয়া মানুষ অগ্রসর হইয়া চলে সভ্যতাসংস্কৃতির বিবর্তনপথে।

বইয়ের সঙ্গ তাই মানুষের এত কাম্য। কত মানুষের চলার পদচিহ্ন পড়িয়াছে পৃথিবীর বুকে—তাহার ছন্দকে ধরিয়া রাখিয়াছে বই। কত ভাষায় মানুষ কথা বলিয়াছে, সেই কথার সংগীতধ্বনি গুম্ভিত হইয়া আছে বইয়ের পৃষ্ঠায়। বিচিত্র মানুষের হৃৎকম্পন অনুরণিত হইতেছে গ্রন্থরাজির পাতায় পাতায়। মানুষ যখন একান্ত নিঃসঙ্গ তখন তাহার সেই নিঃসঙ্গ একাকীত্বকে মুছিয়া দেয় গ্রন্থের সাহচর্য। মানুষ মানুষের সঙ্গী, প্রকৃতিও মানুষের সঙ্গী—কিন্তু মানুষের আরো একটি সঙ্গী উৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজি। কে না ভালবাসে এই গ্রন্থরাজি। যে বলে, গ্রন্থ ভালো লাগে না মানুষ নামের অযোগ্য সে —জীবন তাহার বিড়ম্বিত।

বিশ্বশান্তিপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা

ভারতবর্ষের চিন্তাধারা ও জীবনচর্যার বিশিষ্টতা তাকে এমন একটি উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য দান করেছে যা কারো দৃষ্টি এড়াবার নয়। তার এই বিলক্ষণ স্বাতন্ত্র্যতার মূলে রয়েছে তার যুগপ্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অনবচ্ছিন্ন ধারা। কথাটিকে একটু ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায়, ভারতের সুদীর্ঘকালের ইতিহাস তার বিশিষ্ট মানসপ্রকৃতিরই বহিরঙ্গ অভিব্যক্তি।

ভাবজীবনের দিক থেকে দেখলে পৃথিবীর অপরাপর দেশগুলির তুলনায়

ভারতবর্ষকে কিছুটা আধ্যাত্মপ্রবণ বলা যাইতে পারে। এই মানবপ্রবণতার স্বাতন্ত্র্য তাকে অন্তর্মুখী করে তুলেছে, ভোগসর্বস্ব জৈব জীবনের ঊর্ধ্বচারী করেছে, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় দীক্ষা দিয়েছে। যে জাতির ধ্যানধারণায় সবচেয়ে বড়ো কথা হল চিরন্তন 'মানবসত্য', দস্যুতা লুণ্ঠনবৃত্তির প্রতি তার অভিরুচি থাকবার কথা নয়। তাই, দেখি, পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতি যখন অতিশয় স্থূল সুখস্বাচ্ছন্দ্যের তাড়নায় বাইরে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারে ছুটেছে, পররাজ্য আক্রমণ ও হিংস্র লুণ্ঠনকার্যে ব্যাপৃত রয়েছে, জাতিবৈষম্য-বর্ণবৈষম্য-ঘৃণা-বিদ্বেষের বিষবাষ্প ছড়িয়েছে দিকে দিকে, তখন ভারতের মনীষা আত্মপ্রকাশ করেছে সাহিত্যে-দর্শনে, আধ্যাত্মিক অনুশীলনে, সাম্য-মৈত্রী ও শান্তির বাণীতে। মহামানব বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সকল লোকগুরু, সকল লোকনেতাই প্রচার করে গেছেন অহিংসা, তিতিক্ষা, ত্যাগধর্ম, শান্তি ও মৈত্রীর বাণী; এ শিক্ষা বংশানুক্রমিকভাবে আমাদের রক্তের সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে।

বর্তমান ভারত অতীতের এই মহান ঐতিহ্যেরই ধারক ও বাহক। স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতেও এর প্রভাব অতিশয় স্পষ্ট। শান্তিকামী প্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষ আধুনিক বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করতে চলেছে। সারা পৃথিবী আজ ভারতবর্ষকে দেখছে শান্তির সৈনিকমূর্তিরূপে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ অল্প কয়েক বৎসরের ঘটনামাত্র। কিন্তু এরই মধ্যে তার বিঘোষিত মানবতাদীপ্তবাণী পৃথিবীর দূরদূরান্তরে পৌঁছে গেছে, তার অতুলন মর্যাদা অতিশয় প্রেক্ষণীয় বস্তু হয়ে উঠেছে। স্বাধীন হয়ে উঠিবার পর থেকে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ভারত স্বাতন্ত্র্যোজ্জ্বল অভিনব এক নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

উনিশ-শ সাতচল্লিশের পরবর্তী সময়ের দিকে একবার দৃষ্টি ফেরানো যাক্। ভারত যখন বৃটিশের কবলমুক্ত হল তখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে জটিল হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে-আমেরিকা ও রাশিয়া পরস্পর হাত মিলিয়ে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, যুদ্ধাবসানে সেই আমেরিকা-রাশিয়া দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল। উভয়ের রাজনৈতিক আদর্শ ও বিশ্বাসে কোনো মিল নেই। কাজেই পরস্পর পরস্পরকে দেখতে আরম্ভ করল অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে। কথা ছিল, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে তারা নিজেদের সেনাবাহিনী ভেঙে দেবে, অস্ত্রসম্ভার কমিয়ে ফেলবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, তারা চলেছে এর বিপরীত দিকে। এ দুটি দেশ সাংঘাতিক যুদ্ধাস্ত্রনির্মাণে মেতে উঠল, রণোন্মত্ততা তাদের পেয়ে বসল—শুরু হল ঠাণ্ডা লড়াই। এই স্নায়ুযুদ্ধের [cold war] প্রতিক্রিয়া কিন্তু দূরপ্রসারী, পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের কাছে এ যেন এক দুঃস্বপ্ন। এহেন প্রতপ্ত রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে অহিংসামন্ত্রেদীক্ষিত, সাম্য ও মৈত্রীর সাধক ভারতবর্ষ অবিচলিত রইল। সে ঘোষণা করল নিজের নিরপেক্ষ নীতি। পৃথিবীর উক্ত বৃহৎ দুটি শক্তিকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল—কোনো শিবিরে সে যোগদান করবে না। সংগ্রামের পথে পদক্ষেপ করে আত্মভ্রষ্ট হতে চায় না সে।

ভারতের এই নিরপেক্ষ-নীতি [neutrality] পশ্চিমের রাজনীতিবিশারদদের ভালো লাগল না। পৃথিবীর শক্তিস্পর্ধিত কয়েকটি জাতি ভারতবর্ষের মনোভঙ্গিকে সম্যক্‌রূপে বুঝতে পারল না কিংবা বুঝতে চাইল না। তারা বলল, রাজনীতির ঘূর্ণীচক্রে আলোড়িত বর্তমান দুনিয়ার নিঃসঙ্গতার পথ বেছে নিয়ে ভারতবর্ষ আত্মহত্যার পথটিই প্রশস্ত করে তুলেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ উপলব্ধি করছে, যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে নিরুদ্বেগ শান্তিই আজ সবচেয়ে কাম্য বস্তু। বিশেষ করে, যে সব জাতি এই সবেমাত্র স্বাধীনতা অর্জন করেছে, অধুনা শান্তিপ্রতিষ্ঠার চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তাই তাদের মনে জাগতে পারে না জাগাটা স্বাভাবিকও নয়। ভারত দরিদ্র দেশ, আর্থনীতিক ক্ষেত্রে সে দুর্বল, শিল্পের দিকে অনগ্রসর, বহুতর সমস্যা চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে রয়েছে। এরূপ অবস্থায়, শান্তি বিঘ্নিত হলে, যুদ্ধের উন্মাদনাগ্রস্থ হলে, কোনো সমস্যারই সমাধান সে করতে পারবে না। তা ছাড়া, তার সামরিক শক্তি প্রভূত নয়, এবং মরণাস্ত্রনির্মাণের প্রতিযোগিতায় নামবার ইচ্ছাও তার নেই, উপকরণেরও কিছুটা অভাব। সুতরাং, কী নীতির দিক দিয়ে, কী বাস্তব প্রবিপ্রেক্ষিতে বিচার করে, সর্বৈব যুদ্ধবর্জনই তার পক্ষে শ্রেয়। নিজের বলিষ্ঠ আদর্শবাদের প্রেরণাবশে এবং জাগতিক পরিবেশের দিকে তাকিয়ে ভারত শান্তি, অহিংসা আর অরাপর জাতির বন্ধুত্বের পথ বেছে নিয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কীয় নির্দেশক সূচনায় বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরপত্তা রক্ষা করতে চেষ্টা করবে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্মানজনক, ন্যায়ানুমোদিত সম্বন্ধ রক্ষা করে চলবে, আন্তর্জাতিক বিবাদ সালিশীর মাধ্যমে মীমাংসা করবার প্রয়াসী হবে। সংবিধানের এই সূচনায় ভারতের অনুসরণীয় পররাষ্ট্রনীতির সুস্পষ্ট ছায়াপাত হয়েছে। এই কারণে সামরিক জোটে সে যোগ দিতে পারে না, সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়ে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হওয়া তার আদর্শ ও নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। রণোন্মাদ পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠাকল্পে ভারত 'পঞ্চশীল' নামে গঠনমূলক একটি কার্যসূচী বড়োছোট রাষ্ট্রগুলির সমক্ষে তুলে ধরেছে।

যুদ্ধের প্রধান প্রধান কারণগুলো ভারত অভিনিবেশসহকারে বিশ্লেষ করে দেখেছে। আর্থনীতিক সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণ, উপনিবেশ স্থাপন করে অনগ্রসর জাতি সমূহের ওপর আধিপত্যবিস্তার এবং সাম্রাজ্যবাদীপন্থায় তাদের শাসন, অপরের রাজনীতিক আদর্শ ও বিশ্বাস সম্পর্কে সহনশীলতার অভাব, জাতিবিদ্বেষ ও বর্ণবৈষম্য—যুদ্ধের মূলে এইগুলিই তো সক্রিয় রয়েছে। স্বাধীনতালাভের পর ভারতবর্ষ যখন নিজের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করল তখন সে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, কী রাজনীতিক, কী আর্থনীতিক—কোনপ্রকার শোষণই তার সমর্থনীয় নয়। ঔপনিবেশিক শাসন ও সাম্রাজ্যবাদকে কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না—এশিয়া ও আফ্রিকার এরূপ শাসনের দিন শেষ হয়ে এসেছে—এ সত্যটি পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী যথাসত্বর যেন বুঝে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ এও বলেছে, সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রীয়

জীবনে বিভিন্ন মতবাদের অস্তিত্ব মারাত্মক কিছুই নয়। মস্তবড়ো এই পৃথিবী, এখানে গণতন্ত্র [Democracy] ও সাম্যতন্ত্রের [Communism] পাশাপাশি স্থান হতে পারে। এদের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থিতিকে সম্ভব করে তোলার বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য। আর, এই শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থিতি ভারতের প্রচারিত 'পঞ্চশীল'-এর অন্তর্ভুক্ত একটি নীতি।

এই 'পঞ্চশীল'কে অনেকে নিষ্ক্রিয়তার পথ বলে ভুল করেছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ মনে করেছে। সকলের জেনে রাখা উচিত, নৈষ্কর্ম্য বা কূর্মবৃত্তি ভারতের ঐতিহ্যবিরোধী। এখন বুঝবার সময় এসেছে, ভারতবর্ষ কেবল শান্তির দূতমাত্র নয়, শান্তির শক্তিমান সৈনিকও সে। এখীয় মানবতার আদর্শ যাকে প্রাণিত করেছে, দ্বন্দ্বকুটিল জগতের রণাঙ্গন থেকে তার অপসরণ কখনো সম্ভব হতে পারে না—বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর অনির্বাণ সেবার দিকেই তার সজাগ লক্ষ্য সন্নিবদ্ধ। ভারতের কর্মপন্থার মধ্যে যুদ্ধের ডঙ্কানিনাদ নেই, এবং বোধ করি এ কারণেই তার নিঃশব্দ অগ্রসরণ কারো-কারো-বা চোখে পড়ছে না। এসব দৃষ্টিহারা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় : 'Peace hath her glories no less then war'।

উচ্চতর আদর্শের ফাঁকা বুলি আওড়িয়ে ভারতবর্ষ বিশ্বের সম্ভ্রম আকর্ষণ করতে চায়নি, তার কথায় ও কাজে এতটুকু ব্যবধান নেই। এর প্রমাণ—শান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, স্বতন্ত্রতায় সমুজ্জ্বল, তার পররাষ্ট্রনীতি। কোরিয়া, ইন্দোচীন, সুয়েজ-এলাকা—শান্তিপ্রতিষ্ঠার গুরু দায়িত্ব যেখানে ভারতের ওপর ন্যস্ত হয়েছে সেইখানেই ভারত নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করেছে; এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভারতবর্ষ নীরব থাকতে পারেনি। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে ভারতের নীতির দান সামান্য নয়; অক্লান্ত চেষ্টায় ভারত ইন্দোচীন ও কোরিয়ার রক্তক্ষরা যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছে। প্রজাতন্ত্রী সাম্যবাদী চীনসরকারকে স্বীকার করে নিতে ভারতবর্ষ একটুকু দ্বিধান্বিত হয়নি। সম্মিলিত জাতিসংঘে চীনকে গ্রহণ করার জন্যে ভারত তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে। পৃথিবীর চারটি শক্তিমান রাষ্ট্রের অগ্রনায়কদের নিয়ে ১৯৫৫ সালে জেনেভায়-যে আলাপআলোচনা হল তাও ভারতের উদ্যমপ্রয়াসের ফল। ভারতবর্ষে ফরাসী উপনিবেশ কিছু কিছু ছিল। এসব উপনিবেশ ছাড়তে ভারত ফরাসীদের বাধ্য করেছে, কিন্তু এর জন্য তাকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়নি। ভারতের বিশ্বশান্তিরক্ষার অগ্নিপরীক্ষার স্থল হল কাশ্মীর ভূখণ্ড। সামরিক অভিযান চালিয়ে এই স্থানটিকে নিজের অঙ্গভূত করে নেওয়ার অভিলাষ ভারতবর্ষের নেই। অজস্র প্ররোচনা সত্ত্বেও, নিজের আদর্শের দিকে তাকিয়ে, ভারতবর্ষ যুদ্ধের পথ বেছে নেয়নি। যুদ্ধের মাধ্যমে যে-জয় আসে তা বৃহত্তর যুদ্ধের বীজ বপন করে এ সত্যটি ভারতের অজানা নয়। বর্তমান যুগে যে-কোন খণ্ডসংগ্রামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিশ্বসংগ্রামের ভয়ংকর দাবদাহে পরিণত হতে পারে, একথা কাকেও বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না। ভারতীয় সামরিকবাহিনীকেও মূলত দেশরক্ষাবাহিনী বলা যেতে

পারে। আক্রান্ত না হলে ভারত কদাচ পররাজ্য আক্রমণ করবে না, এ ঘোষণা তার কণ্ঠে বারংবার শোনা গেছে।

বিশ্বশান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসে ভারত শ্রান্তিহীন। এখানে উল্লেখনীয়, ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কগণের বিভিন্ন রাষ্ট্রে শুভেচ্ছামূলক ভ্রমণ এবং বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের ভারতে সাদর আমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক আলাপআলোচনায় বহু ভীতি, শঙ্কা ও সন্দেহের নিরসন হয়েছে। পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও বোঝাপড়ার ব্যাপারে এই ভ্রমণ, শুভেচ্ছামিলন, সাংস্কৃতিক দলপ্রেরণ, ইত্যাদির উপযোগিতা যে কত, বিগত কয়েক বছরে তা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেছে। আরো স্মরণ করা যেতে পারে, সম্মিলিত জাতিসংঘে ভারতের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতকে বাদ দিয়ে অধুনা বিশেষ কোনো বড়ো সমস্যারই সমাধান যে সম্ভব নয় তার আর-একটি নিশ্চিত প্রমাণ, মধ্যপ্রাচ্যের এই সেদিনকার সংকট, এবং প্রস্তাবিত শীর্ষসম্মেলনে ভারতকে গ্রহণ করার জন্যে আমেরিকা ও বৃটেনকে রাশিয়ার অনুরোধজ্ঞাপন। অল্পকালের মধ্যে ভারতবর্ষের সম্ভ্রমমর্যাদা কতখানি বেড়ে গিয়েছে এসব ঘটনা তার নির্ভুল পরিচায়ক।

ভারতের প্রচারিত 'পঞ্চশীল'-এর মৌলিক ঘোষণা বান্দুং হতে আরম্ভ করে গোটা পৃথিবীতে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে, বহু রাষ্ট্র এই নীতিকে অকুণ্ঠ সমর্থনও জানিয়েছে। ইতোমধ্যে কত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক শান্তিবাদী ভারতে পদার্পণ করেছেন, ভবিষ্যতে ভারতভূমিতে আরো কত রাষ্ট্রপ্রধানের শুভ আগমন ঘটবে। নয়াদিল্লীকে বর্তমান পৃথিবীর সুরক্ষিত শান্তিদুর্গ বলা যেতে পারে। ইন্দোনেশিয়ার সোয়েকার্ণো, আলী সাস্ত্রাওমিদ্‌জোজো, মুহম্মদ হাত্তা- ব্রহ্মদেশের থাকিন নু, ইজিপ্টের কর্নেল নাসের, চীনের চৌ-এন-লাই এবং শ্রীযুক্তা সান ইয়াৎসেন, যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটো, নেপাল ও আরবের রাজা, রাশিয়ার নিকোলাই বুলগানিন আর নিকিতা ক্রুশ্চেভ, জার্মানীর ডিমোক্র্যাটিক রিপাব্লিকের ডক্টর ফ্রাঞ্জ ব্লুশার, ইরাণের রাজা ও রাণী এবং আরো অনেকে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে নয়াদিল্লীতে এসেছেন, ভারতের সৌহার্দে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁরা ভারতের অনুসৃত নীতির উচ্চপ্রশংসা করেছেন, এবং অধুনা সারা বিশ্বে যে-সামরিক উত্তেজনা চলেছে তার প্রশমনে ভারতবর্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখে তাঁরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারেন নি।

কী আভ্যন্তরীণ সৈন্যসজ্জায়, কী পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগে, কী বিভিন্ন দেশে শুভেচ্ছা-প্রণোদিত ভ্রমণে কী সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘে—সর্বত্র বিশ্বশান্তিরক্ষার জন্যে ভারত অতন্দ্রভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নিজের সুবিধে-অসুবিধের দিকে না তাকিয়ে ভারত বিবদমান আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যবর্তী হয়ে উভয়কে একটি শান্তিপূর্ণ সৌহার্দস্নিগ্ধ পরিমণ্ডলের মধ্যে আনবার চেষ্টা করেছে। এ যে কত বড়ো কঠিন কাজ তা সকলেরই বিদিত। তবু ভারত এই কঠিন দায়িত্ব এড়িয়ে যায় নি। ভারতবর্ষের এই শান্তি-কামনা, তার এই শুভবোধ, ভারতীয় ঐতিহ্যেরই আধুনিক অভিব্যক্তি। যেহেতু ভারতের আদর্শসমুচ্চ সেহেতু তার বিশ্বনেতৃত্ব সুনিশ্চিত।

পঞ্চশীল ঃ শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থিতি

পঁচিশ বছরের ব্যবধানে সর্বনাশা দুটি বিশ্বযুদ্ধ—পৃথিবীর সভ্য মানুষের ইতিহাসে এ এক অভাবনীয় ঘটনা। দু-দুবার ধরণী রক্তস্নাত হল। যুদ্ধের অবসানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সকলে, ভাবল—দুর্যোগের কালো মেঘ কেটে গেল বুঝি, এবার নিশ্চয়ই শান্তির উদার অভ্যুদয় হবে, স্বেদ ও শোণিত পৃথিবীকে আর প্লাবিত করবে না। কিন্তু বহুআকাঙ্ক্ষিত শান্তি ফিরে এল কৈ, নিরুপদ্রবে ও নিরুদ্বেগে জীবনযাপন করবার উপযুক্ত পরিবেশ রচিত হল কৈ? প্রথম মহাযুদ্ধ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিল, তা হল না। একনায়কতন্ত্রের সমাধি রচিত হল। হিটলার-মুসোলিনী জগৎসমক্ষে দুঃস্বপ্নের মতো বিরাজমান ছিলেন, তাঁদের অস্তিত্বও আজ বিলুপ্ত।

মিত্রশক্তির সাফল্যে সমস্ত পৃথিবী উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে-উল্লাস বিদ্যুৎবিলসনের মতো ক্ষণকালের, তাকে অচিরে গ্রাস করে নিল ভাবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল আশঙ্কার ঘনান্ধকার। যুদ্ধসমাপ্তির কিছুকাল পর থেকেই পুনর্বার যুদ্ধাতঙ্ক দেখা দিয়েছে, শান্তিঅভিলাষি মানবগোষ্ঠী একান্ত শঙ্কাবিহ্বল হয়ে উঠেছে। অসহায় অবস্থায় পড়ে তারা ভাবছে, দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মানুষের কি মুক্তি নেই? দেখতে দেখতে সারা বিশ্ব যেন ভয়াবহ প্রকাণ্ড এক বারুদখানায় পরিণত হতে চলেছে। যদি কখনও বিস্ফোরণ ঘটে তাহলে কী প্রলয়ংকর রূপ ধারণ করবে এর বহ্নিমান প্রকাশ! বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মানবসভ্যতা যে-নিদারুণ সংকটের সম্মুখীন হয়েছে, মানুষের সুদীর্ঘকালের ইতিবৃত্তে তার তুলনা কেহই খুঁজে পাবে না।

পৃথিবী যুদ্ধক্লান্ত। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি শক্তির দ্বন্দ্বে উন্মত্ত। বর্তমান বিশ্বের কয়েকটি দেশ দ্বিধাবিভক্তি হয়ে গিয়ে দুটি সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হয়েছে। রণক্ষেত্রে এখন কোথাও তেমন বড়ো কোনো যুদ্ধ হচ্ছে না বটে, কিন্তু বিপজ্জনক স্নায়ুযুদ্ধ বা 'ঠাণ্ডা লড়াই' লেগেই রয়েছে। এর মূলগত কারণ হল ক্ষমতাবিস্তারের প্রচেষ্টা, জাতিতে-জাতিতে অবিশ্বাস-সন্দেহ-বিদ্বেষ, রাষ্ট্রের কাঠামো সম্পর্কিত মতবাদের সংঘাতিক বিরোধ, সহনশীলতার অভাব। ফলে পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে, দিকে দিকে পূর্ণোদ্যমে সমরপ্রস্তুতি চলেছে, একের পর এক ভয়ংকর মারণাস্ত্র-তৈরীর উন্মত্ত প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছে। আজকার দ্বন্দ্ব গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের দ্বন্দ্ব নয়—ধনতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্রের।

এই ভাবী যুদ্ধের ভয়াবহতা সাধারণ মানুষের কল্পনারও অতীত। পাঁচসাতটি হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটলে যুধ্যমান দেশে মনুষ্যজাতির চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট

থাকবে না। এহেন পরমাণুযুদ্ধের ভীষণতার কথা ভেবে বার্ট্রাণ্ড রাসেল, আইনস্টাইন প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত মনীষী সমুচ্চ কণ্ঠে যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন তা প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই স্মর্তব্য। কিন্তু পৃথিবীর প্রধান প্রধান শক্তিগুলি এ বিষয়ে এখনো সচেতন হয়ে উঠেছে বলে মনে হয় না। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিটি একনজরে দেখে নিলেই বুঝতে পারা যাবে, যে দূষিত রাজনীতির আবর্তে পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যুদ্ধোত্তর বর্তমান পৃথিবীতে সেই একইরূপ কুটিল রাজনীতিক চক্রান্ত চলেছে—যে কোন মুহূর্তে সাংঘাতিক লড়াই বেধে যেতে পারে।

য়ুরোপে পরাজিত জার্মানী দ্বিধাবিভক্ত, বিচ্ছিন্ন জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার বিষয়ে রাশিয়া ও আমেরিকা অদ্যাবধি একমত হতে পারেনি। সেখানে উভয় শক্তিই নিজ নিজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে দৃঢ়সংকল্প। শোষিত নির্যাতিত আফ্রিকা দাসত্বের শৃঙ্খলমোচন করবার জন্যে যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। সেখানকার কেনিয়া, মরক্কো, আলজেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে রক্তাক্ত বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতালুব্ধ য়ুরোপের শোষণবর্বরতাও চরমে পৌঁছেছিল। শ্বেতশোষণের বিরুদ্ধে আফ্রিকার দুর্মর বিক্ষোভ ও তাহার বিপুল গণচেতনা উপনিবেশ-নির্মাতাদের রীতিমতো দুর্ভাবনাগ্রস্ত করে তুলেছে।

তারপর, এশিয়ার নবজাগরণের কথা। ভারত, ব্রহ্ম, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা পেয়েছে। তারা য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলির কূটনীতি ও অভিসন্ধিকে ছিন্নভিন্ন করতে বদ্ধপরিকর। মাও-সে-তুং চিয়াং কাইসেককে তাড়িয়ে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগঠন করেছেন। ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি ঘটলেও সেখানে সাম্রাজ্যবাদের জুয়াখেলা শেষ হয়েছে এমন কথা বলা চলে না। জাপান আবার মাথা তুলেছে। ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। গোয়ার মাটিতে পর্তুগীজশাসকেরা আগুন নিয়ে খেলা করছিল, উপনিবেশের মোহান্ধতাবশে পর্তুগাল ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে পদদলিত করতে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। কিন্তু গোয়া অধুনা ভারতরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়েছে।

বিশ্বরাষ্ট্রসংস্থা যদিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সদস্যরাষ্ট্রগুলির মতবিরোধের জন্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর তা সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। এখানেও আমেরিকার সোভিয়েট-আতঙ্কের শেষ নাই। বোধকরি, এজন্যেই বিশ্বরাষ্ট্রসংস্থার পাশ কাটিয়ে আমেরিকা যৌথ নিরাপত্তার [collective security] অজুহাতে বহুবিধ যুদ্ধজোট গঠন করে চলেছে। রাশিয়াকে চতুষ্পার্শ্ব থেকে ঘেরাও করবার জন্যে, সোভিয়েটের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির ক্রমবিস্তারকে প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করেছে। তা ছাড়া, আর্থনীতিক সাহায্যদানের নাম করে আমেরিকা কতকগুলি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। আমেরিকার এই সামরিক চক্রান্ত রাশিয়ার কাছে দিনালোকের মতো সুস্পষ্ট। তাই, রাশিয়াও চুপ করে বসে নেই, সেও য়ুরোপের কয়েকটি দেশের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়েছে।

উপরে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যে-সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল তা থেকে বোঝা যায়, পৃথিবীর রাজনীতিক পরিবেশ শান্তির অনুকূল নয়, শক্তির প্রমত্ততা বড়ো বড়ো রাষ্ট্রগুলিকে যেন যুদ্ধোন্মাদ করে তুলেছে। আমেরিকা ও রাশিয়ার পরস্পরবিরোধী নেতৃত্বের প্রভাবে প্রায় গোটা দুনিয়া দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, দিকে দিকে অস্ত্রসম্ভারবৃদ্ধির প্রতিযোগিতা চলেছে। এও বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, যে-সব সদ্যস্বাধীন জাতি মুক্তির স্বাদ পেয়েছে তারা সাম্রাজ্যবাদীর শোষণ ও উৎপীড়ন আর বরদাস্ত করবে না—এশিয়া ও আফ্রিকার অভ্যুত্থান এই সত্যটির প্রতি অঙ্গুলিসংকেত করছে। সবনাশা সামরিক চুক্তির, নতুন নতুন মারণাস্ত্রনির্মাণের মূঢ় প্রতিযোগিতা কেবল সন্দেহ-অবিশ্বাস-হিংসাকেই পরিপুষ্ট করে তুলেছে, বিশ্বের শান্তিকে ব্যাহত করছে। বর্তমানের হিংসাউন্মত্ত পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার সমস্যাটি যে কী গুরুতর এবং কতখানি জটিল তা সহজেই অনুমেয়। এই আণবিক যুগে জগতের সমস্ত চিন্তাশীল মানুষকে যে-প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে তা হল—আমরা একসঙ্গে মরতে চাই না, একসঙ্গে বাঁচতে চাই? যুদ্ধের পথে পা বাড়ালে সকলের মৃত্যু অবধারিত সত্য, সর্ববিধ্বংসি আণবিক অস্ত্রের হাত থেকে রক্ষা কেউ পাবে না। সকলের এই শোচনীয় সামগ্রিক বিনাশ যদি আমাদের অভিপ্রেত না হয়, আমরা বাঁচাতেই যদি চাই, তাহলে কোন পথে আমরা পদক্ষেপ করব?

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু এই পথের সন্ধান বিশ্ববাসীকে দিয়েছেন, মৃত্যুর উল্টোপথটি তিনি সকলকে চিনিয়েছেন। সহজ কথায় বিশ্বশান্তি কী ভাবে রক্ষা করা যেতে পারে, নেহেরুজী তার উপায় নির্দেশ করেছেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'পঞ্চশীল'-এর প্রশস্ত পক্ষপুটে আশ্রয় নিলে বিশ্ববাসীর শোচনীয় বিনাশের আশঙ্কা দূর হয়ে যাবে, সকলে সুখে-শান্তিতে একসঙ্গে বেঁচে থাকতে পারবে। 'যৌথ নিরাপত্তা'র দিকে তাকিয়ে 'যৌথ শান্তি'র দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে, কূটচক্রান্তের নীতি বর্জন করতে হবে, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার ওপর দাঁড়াতে হবে। 'পঞ্চশীল'-এর প্রবক্তা শ্রীনেহেরু মানুষের সম্পর্ক ও আচরণের কয়েকটি নতুন নীতি নির্ধারণ করেছেন, একে আন্তর্জাতিক আচরণনীতি বলা যেতে পারে। 'পঞ্চশীল'-এর পাঁচটি নীতি এই :

[১] পরস্পরের রাষ্ট্রিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌম অধিকারের প্রতি মর্যাদা-প্রদর্শন ;

[২] পরস্পরের আক্রমণ থেকে বিরত থাকা ;

[৩] আর্থনীতিক, রাজনীতিক বা আদর্শগত কোনো কারণে অপরের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না-করা ;

[৪] সমানাধিকার ও পারস্পরিক কল্যাণসাধন ; এবং

[৫] শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থিতি।

এই নীতিপঞ্চকের মর্মকথা—লোভকে আমরা ঘৃণা করিব, হিংসাকে আমরা বর্জন করে চলব, পরমতবিষয়ে সকলে সহিষ্ণু হব, মানবতার অপমান কখনো করব

না। বর্তমান বিশ্বের এ্যাটম্ ও হাইড্রোজেন বোমার একমাত্র উত্তর নেহেরুজীর নির্দেশিত পঞ্চশীল। দুই-শিবিরে-বিভক্ত সাম্প্রতিক পৃথিবীতে ভারতরাষ্ট্রের প্রধান-মন্ত্রী শান্তিবাদী শ্রীনেহেরু একটি 'তৃতীয় এলাকা'র ['third area']—তৃতীয় শিবিরে'র ['third block'] নয়—কল্পনা করেছিলেন, এবং তিনি এর নাম রেখেছিলেন—'শান্তি-এলাকা'। এই শান্তি-এলাকার পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত করে তোলাই তাঁর মহৎ সংকল্প ছিল। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির আদর্শের সঙ্গে পঞ্চশীলের নিগূঢ় সম্পর্কটি কারো দৃষ্টি এড়াবার নয়। এই নীতি বিশ্লেষ করতে গিয়ে শ্রীনেহেরু বলেছেন : 'আমরা সকলরাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। বিশ্বে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য শান্তি প্রতিষ্ঠা। আমরা চাই—জাতিগত বৈষম্যের লোপ হোক, পরাধীন মানুষেরা স্বাধীনতা অর্জন করুক।...এশিয়ার বিশেষ কোনো স্থান অধিকারের অভিসন্ধি আমরা রাখি না, এশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অঞ্চলরূপে রাখারও পক্ষপাতী আমরা নই। আমরা শুধু চাই যে, আমরা এবং অপরের, বিশেষভাবে আমাদের প্রতিবেশীরা, একটা শান্তি-এলাকার সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং বিশ্বে উত্তেজনা ও যুদ্ধের সঙ্গে সংস্রব এড়িয়ে চলে ও পক্ষাবলম্বনবর্জনের নীতি অনুসরণ করে। এতে আমাদের কল্যাণ হবে এবং এর ফলে বিশ্বে সমরোত্তেজনা ও অস্ত্রশস্ত্রনির্মাণের মত্ততা হ্রাস পাবে এবং পরিণামে বিশ্বশান্তির পথ সুগম হয়ে উঠবে।' এই উক্তির মধ্যে এতটুকু অস্পষ্টতা কোথাও নেই।

ইতোমধ্যেই পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র পঞ্চশীলকে সমর্থন জানিয়েছে। এশিয়াভূমিতে চীন, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, লাওস ; মধ্যপ্রাচ্যে মিশর, সৌদি আরব ; য়ুরোপে যুগোশ্লাভিয়া, সোভিয়েট রাশিয়া, পোলাণ্ড প্রভৃতি এই নীতির সমর্থক। উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালে বিশ্রুত বান্দুং সম্মেলনে 'পঞ্চশীল' এশিয়া ও আফ্রিকার উনত্রিশটি জাতির অকুণ্ঠ অনুমোদন লাভ করেছে।

পঞ্চশীল-এর শেষকথা শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থিতি। এই নীতি বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে স্বীকার করে নিয়েছে, বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিকে নিজে বাঁচার এবং অপরকে বাঁচতে দেওয়ার পথ দেখিয়েছে। প্রকৃতির সংসারে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে যদি আমরা মেনে নিতে পারি তাহলে মানবসংসারেও কেন তা পারব না? মানুষের রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্মে, আর্থনীতিক ব্যবস্থায়, রাজনৈতিক মতবাদে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকাটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। তা সত্ত্বেও, যদি কোনো দুরভিসন্ধি না থাকে, তাহলে রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে, সুখে-শান্তিতে অবশ্যই পরস্পর পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে, আমরা যদি পরমসহিষ্ণু হয়ে উঠি তা হলে দেখতে পাবো ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সহঅবস্থিতির পথে সকল বাধা অপসারিত হয়ে গেছে। নিজেদের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে উভয়ে যদি আপন আপন কর্মকলাপ সীমাবদ্ধ রাখতে পারে তবে সন্দেহ-অবিশ্বাস-ভয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, পৃথিবীর শান্তিও আর বিঘ্নিত হয় না। কিছুকাল পূর্বে সোভিয়েট রাশিয়া স্বীকার করেছে, সাম্যতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের সহঅবস্থিতি অবশ্যই সম্ভব। এ সম্পর্কে

আমেরিকার কণ্ঠ হতে কোনো স্পষ্ট ঘোষণা অদ্যাবধি শুনতে পাওয়া যায়নি। মার্কিণযুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ সহঅবস্থিতির নীতিকে যদি স্বীকৃতি জানায়, তবে আমরা জোর গলায় বলতে পারি, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বে যুদ্ধের সম্ভাবনা আর দেখা দেবে না।

পৃথিবীর রাজনীতির আকাশ আজ দুর্যোগের কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। যুদ্ধের আতঙ্ক শান্তিকামী মানুষের চিত্তদেশকে নিরন্তর পীড়িত করছে, চারদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ভয়-সন্দেহ-অবিশ্বাস-বিদ্বেষ-হিংসা—কুটিল কুশ্রীতা। এতে মানুষ দিশাহারা হয়ে পড়েছে, শান্তির পথ তাঁরা খুঁজে পাচ্ছে না। চতুর্ধারের এই ঘনান্ধকারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু বিভ্রান্ত মানুষের হাতে তুলে ধরেছেন পঞ্চশীল-এর উজ্জ্বল দীপ-শিখা। ক্ষমতালোলুপ রাষ্ট্রগুলি তাকে যদি স্পর্ধিত শক্তির প্রমত্ত ফুৎকারে নিবিয়ে না দেয় তাহলে পঞ্চশীলের শুভ্রাভাস আলো রণশ্রান্ত পৃথিবীকে শান্তির রাজ্যে পৌঁছিয়ে দেবে।

সর্বশেষে শ্রীনেহেরুর সাবধানবাণী সকলকে এখানে স্মরণ করিয়ে দিই: তরবারির সাহায্যে যারা বাঁচতে চাইবে, ওই তরবারিই তাদের মহানিপাতের অতল শূন্যতায় নিক্ষেপ করবে।

যুগে যুগে আমাদের মধ্যে এমন দুই-একজন মহামানব আবির্ভূত হন যাঁহাদের কর্ম-সাধনা অথবা ভাবসাধনার মধ্য দিয়া জাতির আশাআকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নকামনা সার্থকতায় ভরিয়া উঠে। তাঁহাদের মহৎ জীবনের দীপবর্তিকা সকল মানুষের ঋদ্ধি ও সিদ্ধির পথটি আলোকিত করিয়া তুলে। এইসকল ক্ষণজন্মা পুরুষ বিরাট বনস্পতির মতো—ইঁহারা জাতিকে নির্ভয় আশ্রয়দান করেন, স্নিগ্ধ ছায়া দান করেন, জাতীয় জীবনে সঞ্চারিত করিয়া দেন মহত্তর জীবনের প্রাণনা। মহামানব গান্ধী এইরকম একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাঁহার শুভ-আবির্ভাবে পরাধীন ভারতের জন্মান্তর—রূপান্তর—ঘটিয়াছে? ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক সাধনাকে মহাত্মাজী সফল করিয়া তুলিয়াছেন, সমগ্র দেশের প্রাণসত্তাকে তিনি উজ্জীবিত করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রমহিমা, দেশপ্রেম ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রেরণাবলে ভারতবাসী রাজভয়, মৃত্যুভয়—সকল কিছুরই ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য অর্জন করিয়াছে। আত্মপ্রকাশের শঙ্কাহীন অভিমানে তিনি জাতিকে যোগাইয়াছেন অশেষ উদ্দীপনা।

ইংরেজী ১৮৬৯ সালে গুজরাটের অন্তর্গত পোরবন্দর-নামক স্থানে এক বণিকবংশে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম। গান্ধীজীর পিতা করমচাঁদ গান্ধী কাঁথিয়াবাড় রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। পোরবন্দরে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া গান্ধীজী রাজ-

কোট বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। স্কুলজীবনে তিনি তেমন কোনো লক্ষণীয় শক্তির পরিচয় দেন নাই। শৈশবে-কৈশোরে তিনি ছিলেন ভীরু এবং লাজুকপ্রকৃতির বালক। রাজকোটে অধ্যয়নকালে গান্ধীজী কয়েকজন অসৎপ্রকৃতি শিক্ষার্থীর সংস্পর্শে আসিয়া ধূমপান করিতে শিখেন ও চুরিবিদ্যায় উৎসাহী হন। জৈনপরিবারে তাঁহার জন্ম বলিয়া মৎস্যমাংস ইত্যাদি আহার্যগ্রহণ ঐ পরিবারে নিষিদ্ধ ছিল। গান্ধীজী সঙ্গদোষে এই নিষিদ্ধ বস্তু আহারে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সহজাত আন্তর শক্তির প্রেরণায় সেইসব কদভ্যাসের প্রভাব তিনি ধীরে ধীরে কাটাইয়া উঠেন। কিশোরবয়সেই সত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ দেখা যায়। মাত্র তের বছর যখন বয়স তখন কস্তুরী-বাঈয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া ব্যারিস্টারী-শিক্ষালাভের জন্য গান্ধীজী বিলাতযাত্রা করেন, এবং ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯১ সালে ভারতে ফিরিয়া আসেন। যথাসময়ে বোম্বাই হাইকোর্টে তিনি ব্যারিস্টারী-ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হইলেন। এই সময় গান্ধীজী স্বনামধন্য দাদাভাই নৌরজী এবং গোপালকৃষ্ণ গোখেলের সংস্পর্শে আসেন। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে এই দুইজন খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রভাব সামান্য নহে। ইহাদের নিকটেই তিনি জাতীয়তামন্ত্রে প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ সালে ব্যারিস্টার গান্ধীজী একটি মোকদ্দমা পরিচালনার দায়িত্ব লইয়া দক্ষিণআফ্রিকায় গমন করেন। যে সত্য ও অহিংসাকে মহাত্মাজী তাঁহার জীবনদর্শনের মূলমন্ত্র করিয়াছিলেন, দক্ষিণআফ্রিকায় অবস্থানকালেই তিনি সেই সত্যধর্ম ও অহিংসাধর্মে ব্রতী হন।

আফ্রিকার নাটালপ্রদেশে বহুসংখ্যক ভারতীয়ের বসবাস। সেই সময়ে নাটালের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা কৃষ্ণাঙ্গ ভারতবাসীর উপর অসহনীয় অত্যাচার উৎপীড়ন চালাইয়া যাইত। ফলে সে-দেশের প্রবাসী ভারতীয়ের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতবিরোধী নাটালসরকার আইনসভায় তখন এমন একটি বিল আনয়ন করিয়াছিল যাহা ভারতীয়দের স্বার্থের অত্যন্ত বিরোধী। নাটালপ্রবাসী ভারতবাসীরা গান্ধীজীর শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে এই কুখ্যাত বিলের প্রতিরোধ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। প্রবাসী ভারতবাসীর আত্মমর্যাদা ও রাজনৈতিক অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। নাটালসরকারের বিরুদ্ধে এইবার স্বদেশ-প্রেমিক ও মানবতার সাধক মহাত্মাজীর সংগ্রাম শুরু হইল। এই সংগ্রাম কিন্তু হিংসাত্মক নয়, অহিংস। ইহাকে বলা যায় অহিংস প্রতিরোধ অর্থাৎ 'Passive Resistance'। সত্যকে জয় করিবার জন্য আত্মিক শক্তির বলে অত্যাচারীর সকল উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিব, কিন্তু শত্রুকে কদাপি আঘাত করিব না—ইহারই নাম সত্যাগ্রহ। এই সত্যাগ্রহরূপী অভিনব অস্ত্রের দ্বারাই তিনি দক্ষিণআফ্রিকার কঠিন সংগ্রামে জয়লাভ করিলেন।

তারপর গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবন পথপরিবর্তন হইল। সুদীর্ঘ একুশ বৎসর দক্ষিণআফ্রিকায় অবস্থানের পর ১৯১৪ সালে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

তখনো মহাত্মা ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে পদক্ষেপ করেন নাই। দক্ষিণআফ্রিকার সংগ্রামবিজয়ী সত্যাগ্রহী বীর বলিয়া তাঁহার অসামান্য খ্যাতি সে-সময় কিন্তু দেশের চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সময় মহাত্মাজী আমেদাবাদের সবরমতা-নদীতীরে সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপিত করিয়া জনসেবা ও গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করেন। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে প্রথমবিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হয়। তখন পর্যন্তগান্ধীজী সম্পূর্ণ ব্রিটিশবিরোধী হইয়া উঠেন নাই। এই যুদ্ধে তিনি ভারত-বাসীকে লইয়া ব্রিটেনকে যুদ্ধের বিপত্তিকালে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইলেন। ব্রিটিশসরকার তাঁহাকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন যে, যুদ্ধের অবসান ঘটিলে তাঁহারা ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিবেন। ১৯১৯ সালে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিল। কিন্তু ইংরেজসরকার পূর্বপ্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন না, উপরন্তু দুরভিসন্ধিপূর্ণ রাউলাট আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। ইহাতে সমগ্র ভারত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

১৯২০ সালে কলিকাতার কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয় সেই অধিবেশনে মহাত্মাজী ব্রিটিশের পশুশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিবার মানসে নিরস্ত্র ভারতবাসীর তরফ হইতে অসহযোগ আন্দোলন প্রচার করিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার নেতৃত্ব নতমস্তকে স্বীকার করিল। সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অভিনব একটি দান। তিনি দুর্বল ভারতবাসীর মানসিক জড়ত্ব দূরীভূত করিলেন, আত্মসম্মান ও আত্মপ্রত্যয়কে জাগাইয়া তুলিলেন—আত্মপ্রকাশকে বাধাহীন পথে পরিচালিত করিলেন। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে মহাত্মাজী অনশনব্রত আরম্ভ করেন। যেখানে এবং যখনই জাতি তাহার সংকীর্ণ স্বার্থ ও দুর্নীতির দ্বারা দেশে দুর্বলতার বিষ ছড়াইয়াছে তখনই এই বীরপুরুষ নীলকণ্ঠের মতো সেই বিষ নিজে গ্রহণ করিয়া জাতিকে অপমৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়াছেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার অকল্যাণকে প্রতিরোধ করিবার জন্য মহাত্মাজী ১৯৩২ সালে যারবেদা জেলে অনশনে মৃত্যুবরণ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহার ফলেই বিখ্যাত 'পুণাচুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে রাজনীতিক ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায়। এই সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 'পূর্ণ স্বরাজ' ঘোষণা করিয়া ইংরেজের রচিত আইন অমান্য করার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই অবিস্মরণীয় আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন গান্ধীজী। লবণ-আইন অমান্যের অবিচল সংকল্প লইয়া মহাত্মার ঐতিহাসিক 'ডাণ্ডি'-অভিযান শুরু হইল। ব্রিটিশের কঠোর দমননীতি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ জাতির অন্তরতর সত্তাকে দ্বিগুণ উদ্দীপিত করিয়া তুলিল। গান্ধীজীর অহিংসা সংগ্রাম জগৎকে বিস্মিত করিল—পশুশক্তি আধ্যাত্মশক্তির কাছে পরাজয় মানিল। ইহারই ফলে 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়।

ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনকে ত্বরান্বিত করিয়া তুলিবার জন্য গান্ধীজী তিনটি দুরূহ কার্যে ব্রতী হইলেন—অস্পৃশ্যতাবর্জন, হিন্দুমুসলমানের মিলনসাধন ও কুটীর-শিল্পস্থাপনের আদর্শকে তিনি সমস্তকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিলেন। অস্পৃশ্যতা যে হিন্দুর সমাজদেহকে পঙ্গু করিতেছে তাহা তিনি যথার্থ উপলব্ধি করিলেন—ভেদবুদ্ধির অভিশাপে ভারতের রাষ্ট্রিক-মুক্তিসাধনা বিঘ্নিত হইয়াছে। অস্পৃশ্য অনুন্নতশ্রেণীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি যে-আন্দোলন শুরু করেন উহা 'হরিজন-আন্দোলন' নামে খ্যাত। হিন্দুমুসলমানকে আর হিন্দুসমাজকে দ্বিধাবিভক্ত দেখার চেয়ে মৃত্যুকে তিনি বরণীয় মনে করিয়াছিলেন।

মহাত্মাজীর নেতৃত্বে ও প্রেরণায় ভারতবর্ষের রাজনীতিমঞ্চে দ্রুত পটপরিবর্তন হইতে থাকে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও ক্রমশ জটিল হইয়া উঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাবানল ভারতের রাজনীতিক আকাশকে প্রলয়ংকর বহ্নিরাগে রক্তবর্ণ করিয়া তুলিল। ব্রিটিশরাজশক্তি জোর করিয়া ভারতকে যুদ্ধে অবতীর্ণ করাইল, কিন্তু এদেশের স্বাধীনতার দাবিটিকে স্বীকৃত জানাইল না। ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট মহাত্মাজী ব্রিটিশকে ভারত ছাড়িতে বলিলেন। ঐদিন কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে ভারতের পূর্ণস্বাধীনতা ও এদেশ হইতে ব্রিটিশের অপসারণ দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। ফলে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন—ভারতবর্ষের দিকে দিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মহাত্মাজী কারাবরণের প্রাক্কালে জাতিকে তাঁহার চরম বাণী ও অভয়মন্ত্র শুনাইয়া গিয়াছেন—'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। একরূপ বাধ্য হইয়াই ব্রিটিশরাজশক্তি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু ব্রিটিশরাজনীতির কূটকৌশলে অখণ্ড ভারত দ্বিধাবিভক্ত হইল।

ইহার পর ভারতে ঘনাইয়া আসিল ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দুর্যোগ। স্বাধীনতা-লাভের পরও নবজাত দুইটি রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মিলন সম্ভব হইয়া উঠিল না। ১৯৪৬ সালে তিনি ছুটিয়া গিয়াছিলেন নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার মহাশ্মশানে। তারপর তিনি আসিলেন মহানগরী কলিতায়। ইহার পর আবার ছুটিয়া গেলেন দিল্লীতে। হিন্দুমুসলমানকে আত্মকলহে লিপ্ত থাকিতে দেখিয়া তিনি ব্যথিত চিত্তে বলিয়াছিলেন : 'আমি যে-স্বাধীন ভারতে বাস করি তাহাতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সকল ভারতবাসী প্রকৃত বন্ধুর মতো বাস করিবে। এই স্বপ্ন সফল করবার কাজে আমি মৃত্যুবরণ করাও শ্রেয় মনে করি। গৃহযুদ্ধে ছিন্নভিন্ন ভারতবর্ষ দেখিবার জন্য আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই না, তার আগে ভগবান যেন আমাকে মৃত্যু দেন।'

ইহার পর ভারতবর্ষের রাজনীতি ইতিহাসে যাহা ঘটিল তাহা জাতির পক্ষে অতিশয় কলঙ্কজনক তথা পরম বেদনাদায়ক। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরাইয়া আনিবার জন্য যে-প্রাণান্ত প্রয়াস মহাত্মাজী করিতেছিলেন, অনেকে তাহা বরদাস্ত করিতে পারিল না,—গান্ধীজীর এই প্রচেষ্টায় তাহারা যেন ক্ষিপ্ত হইয়া

উঠিল। অবশেষে ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী দিল্লীতে তিনি যখন প্রার্থনাসভায় প্রবেশ করিতেছিলেন তখন এক যুবক তাঁহার প্রতি রিভলভারের গুলি নিক্ষেপ করে, এবং সেই আঘাতে মহাপ্রাণ 'বাপুজী'র জীবনাবসান ঘটে।

মহাত্মার নরদেহের বিনাশ ঘটিয়াছে কিন্তু তাঁহার জীবনবাণী মরণবিজয়ী। সত্য ও অহিংসার মৃত্যু নাই। ধর্ম অবিনশ্বর। গান্ধীজী মানবসত্যকে—মানব-ধর্মকে—রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর সাধনা সত্য, প্রেম ও শুচিসুন্দর মৈত্রীর সাধনা। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া তিনি শাশ্বত সত্যধর্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই—এমন কি রাজনীতিক স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রেও নয়। স্বাধীনতালাভের জন্য পৃথিবীর বহু জাতি রক্তপঙ্কিল পথে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা ও জাতির আত্মস্বাতন্ত্র্যকে গান্ধীজী অপহরণ এবং দস্যুবৃত্তি-দ্বারা সহজলভ্য করিয়া তুলিতে চাহেন নাই। অহিংসার আশ্রয় লইয়াও যে স্বাধীনতা অর্জন করা যাইতে পারে, সমগ্র বিশ্বকে তিনি তাহারই ইঙ্গিত দিয়া গেলেন। তাঁহার অহিংস সংগ্রাম ধর্মযুদ্ধ। 'ধর্মযুদ্ধ বাইরে জেতবার জন্যে নয়, হেরে গিয়েও জয় করবার জন্যে। অধর্মযুদ্ধে সবটা মরা, ধর্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে—হার পেরিয়ে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত। যিনি এই কথাটা নিজের জীবনে উপলব্ধি করে স্বীকার করেছেন তাঁর কথা শুনতে আমরা বাধ্য।'

মুসলমানসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ পর্ব

[মহর্‌রম ও ঈদ্‌]

মুসলমানসম্প্রদায় যে-সকল পর্বের অনুষ্ঠান করেন, মহর্‌রম তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যুগে যুগে মানুষ তাহার স্বার্থবিসর্জন ও আত্মদানের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছে চারিত্রিক মহত্ত্ব, শৌর্যবীর্য আর জীবনচর্যার পবিত্র সুন্দর আদর্শ। মানুষের এই মহিমাদীপ্ত শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি মানুষ চিরকাল নিবেদন করিয়াছে তাহার অন্তরতম হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি। মনুষ্যত্বের পূজারী মানবের এই আন্তর-শ্রদ্ধা ও ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মুসলমানগণের শ্রেষ্ঠ দুইটি পর্ব—মহর্‌রম ও ঈদ্‌।

মহর্‌রমপর্বের পিছনে রহিয়াছে অতীব করুণ, মর্মান্তিক একটি ঘটনা—কারবালাপ্রান্তরে ধর্মপ্রাণ পুণ্যব্রত এমাম হোসেনের আত্মবলিদানের কাহিনী। পবিত্র ইসলামধর্মের জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া মহান বীরের মতো তিনি অকাতরে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই শোককরুণ ঘটনাকে স্মরণ করিয়া প্রতিবছর মহর্‌রম মাসে [আরবীয় বৎসরের প্রথম মাস] মুসলমানধর্মবিশ্বাসীগণ যে-অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন তাহাই 'মহর্‌রম'-পর্ব নামে পরিচিত।

ইসলামধর্মের প্রবর্তক মহাপুরুষ হজরত মুহম্মদের তিরোধানের পর যথাসময়ে খলিফা [ধর্মনেতা]-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন তাঁহার জামাতা হজরত আলী। তিনি ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ কঠোর শাসক। তাঁহার সুকঠোর শাসনব্যবস্থায় সিরিয়ার প্রদেশপাল মুয়াবিয়া অতীব রুষ্ট হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমে তিনি [মুয়াবিয়া] হজরত আলীর একজন প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। অবশেষে হজরত আলী এই মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন, কিন্তু কুফার মসজিদে এক গুপ্ত ঘাতকের হাতে তাঁহাকে [হজরত আলীকে] প্রাণ হারাইতে হইল।

হজরত আলীর দুই পুত্র—এমাম হাসান ও এমাম হোসেন। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান পিতৃশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে আর লিপ্ত হইলেন না মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অবাঞ্ছিত বিরোধের অবসানকল্পে তিনি মুয়াবিয়ার সহিত সন্ধি করিলেন এবং খলিফাপদ ত্যাগ করিলেন। তবে সন্ধির এক সর্ত, মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তিনি খলিপার পদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

মুয়াবিয়ার পুত্র এজিদ ছিলেন অতিশয় রাজ্যলোলুপ মানুষ। সহজবুদ্ধিতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার পিতার দেহাবসানের পর যথাক্রমে হাসান এবং হোসেনই মুসলিমজগতের অধিপতি হইবে। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি তাঁহাকে হীন চক্রান্তজাল প্রসারণ ও পাশবিকতার পথে প্ররোচিত করিল। এক ভীষণ ষড়যন্ত্র-জাল রচনা করিয়া বিষপ্রয়োগে এমাম হাসানকে তিনি হত্যা করিলেন। তারপর পিতা মুয়াবিয়ার মৃত্যু ঘটিলে এই এজিদই খলিফার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া হজরত আলীর কনিষ্ঠ পুত্র এমাম হোসেনের সঙ্গে এজিদের সংঘাতের সূত্রপাত হইল। হোসেন এজিদকে কিছুতেই খলিফা বলিয়া স্বীকার করিবেন না, এজিদের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। কুফার অধিবাসীবৃন্দ দুষ্টবুদ্ধি এজিদের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করিত। তাহারা এজিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে হোসেনকে যথাসাধ্য সহায়তা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলে হোসেন কুফানগরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এজিদের সৈন্যদল পথিমধ্যে কারবালা নামক প্রান্তরে হোসেন ও তাঁহার সেনাধ্যক্ষের অগ্রগতি রোধ করিল। হোসেনের সৈন্যসংখ্যা ছিল নিতান্ত অল্প; তা ছাড়া, এই ভয়ংকর বিপদমুহূর্তে কুফার অধিবাসীরাও এজিদের সেনাপতির আক্রোশভয়ে হোসেনকে পূর্বেকার প্রতিশ্রুত সাহায্যদানে অস্বীকৃত হইল। ফলে মন্দভাগ্য হোসেনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল।

শত্রুসেনাপতি প্রস্তাব পাঠাইল, হোসেন যেন এজিদের কাছে বশ্যতাস্বীকার করেন। কিন্তু ধর্মবীর হোসেন সেই প্রস্তাব অত্যন্ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কারাবালাপ্রান্তরের মধ্য দিয়া ইউফ্রেতিস [ফোরাত] নদী প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এজিদের সেনাপতি এই নদীতীরে সৈন্যসমাবেশ করিয়া নদী হইতে হোসেনের জলসংগ্রহের সকল পথ রুদ্ধ করিয়া দিল।

ইহার পরবর্তী দৃশ্য ভীষণ, খুবই শোককরুণ। অল্পকালমধ্যেই হোসেনের

শিবিরে জলকষ্ট দেখা দিল—তাঁহার বাহাত্তর জন অনুচর, বালকবালিকা ও রমণী, নিদারুণ পিপাসায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল। কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণের জন্ত একবিন্দু জলও তাহারা পাইল না, পিপাসার যন্ত্রণায় ইহাদের কেহ কেহ প্রাণত্যাগ করিল। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখী দাঁড়াইয়া ধর্মপ্রাণ হোসেন এতটুকু বিচলিত হইলেন না—এজিদের নিকট আত্মসমর্পণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। অধর্মচারীর কাছে পরাভবস্বীকার করা অপেক্ষা ধর্মযুদ্ধে আত্মদান করাকেই তিনি শ্রেয় মনে করিলেন। একমাত্র ধর্মবলকে পাথেয় করিয়াই হোসেন শত্রুর দিকে ধাবিত হইলেন। অতঃপর নির্মম শত্রুর প্রবল আঘাতে তাঁহার অনুচরবর্গ, আত্মীয়স্বজন একে একে প্রাণ হারাইল, এবং সর্বশেষে সেই সম্মুখযুদ্ধে তিনি নিজেও বীরের ন্যায় জীবন উৎসর্গ করিলেন।

কারবালা মহাপ্রান্তরে ধর্মবীর এমাম হোসেনের আত্মবলিদানের ঘটনাটি শোকাবহ। এই ঘটনা স্মৃতিপথে উদিত হইলে কোনো হৃদয়বান মানুষ অশ্রুসংবরণ করিতে পারে না। মহর্‌রম-মাসের দশম দিবসে ধর্মযুদ্ধে এমাম হোসেনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তাই প্রতিবৎসর যখন মহর্‌রম-মাস আসে তখন এই বেদনাময় ঘটনাটিকে স্মরণ করিয়া মুসলমানসম্প্রদায় পুণ্যাত্মা হোসেনের জন্য শোকপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

মহর্‌রম-পর্বটি সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। কারবালায় এমাম হোসেনের কবরের উপর যে স্মৃতিমন্দির নির্মিত হইয়াছিল তাহারই অনুকরণে তাজিয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহার পশ্চাদ্‌ভাগে রক্ষিত থাকে তরবারি, ঢাল, তীর, ধনুক, প্রভৃতি অস্ত্র। দশদিন ধরিয়া মুসলমানগণ হোসেনের পবিত্র আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন-মানসে রোজা বা উপবাস করিয়া থাকেন, এবং রাত্রিবেলা তরবারি, লাঠি, প্রভৃতি লইয়া কারবালাপ্রান্তরে সেই ভীষণ যুদ্ধের পুনরভিনয় করেন। নবম দিনে তাজিয়া ও দণ্ড লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করা হয়, এবং দশম দিনে শোভাযাত্রীরা এই তাজিয়া ও দণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত করেন কিংবা জলে নিমজ্জিত করিয়া থাকেন। শোভাযাত্রীদের 'হা হোসেন' করুণ ধ্বনি চিত্তস্পর্শী।

মহর্‌রমপর্বের সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন মুসলমানের শিয়াসম্প্রদায়। যাঁহারা স্থন্নিসম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহারা বাহ্যসমারোহ ও আড়ম্বরের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের মতে এই করুণ ঘটনাকে স্মরণ করিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিলেই ধর্মবীর হোসেনের প্রতি যথার্থ সম্মান দেখানো হয়। মহর্‌রমপর্বটি চিরন্তন মানবসত্য ও উজ্জ্বল ধর্মাদর্শে প্রাণিত। ধর্মবোধের মহতী প্রেরণায় মানুষ কেমন সহজে সকল মৃত্যুভয়ের উর্ধ্বে নিজেকে তুলিয়া ধরিতে পারে, হোসেনের জীবনউৎসর্জন তাহার স্মরণসুন্দর দৃষ্টান্ত।

*

ঈদ্ মুসলমানজাতির আর-একটি পবিত্র উৎসব। ঈদ্‌পর্ব দুইটি—ঈদল্-ফিৎর্ ও ঈদ্-জ্-জোহা বা বকর্ ঈদ্। শুচিতায় ও কল্যাণদীপ্তিতে এই দুইটি

পর্বানুষ্ঠানই সমুদ্ভাসিত। রমজান মাসের অবসানে রমজানের রোজা বা প্রাত্যহিক উপবাস শেষ হইলে শওয়াল মাসের প্রথম দিনে ঈদ্-ল্-ফিৎর্ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চিত্তের সংযম ও শুচিতার জন্য মুসলমানগণ সমস্ত রমজান মাস ধরিয়া একবিন্দু জল স্পর্শ না করিয়া উপবাসে দিবাভাগ কাটাইয়া দেয় এবং রাত্রিবেলা আহার্য গ্রহণ করেন। এসময় সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানই কোরানপাঠ, কোরানশ্রবণ এবং নামাজাদি কর্মক্রিয়ার মধ্যে আপনাকে ব্যাপৃত রাখেন। তারপর আসে শওয়াল মাসের সেই বহুপ্রত্যাশিত শুভ দিনটি। এইদিন মুসলমান নরনারী সানন্দে চন্দ্রদর্শন করেন, মস্জিদে সমবেত হইয়া নামাজক্রিয়া সম্পন্ন করেন—খোদাতালার উদ্দেশে নিবেদিত হয় অগণিত মানবচিত্তের পরম ভক্তি। ঈদ্-ল্ ফিৎর্ মুসলমানদের মিলন ও ভ্রাতৃত্বের মহোৎসব। এইদিন ধনীদরিদ্র, উচ্চনীচ সকলেই সামাজিক ভেদাভেদ বিস্মৃত হইয়া পরস্পর আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হন। অন্তরের প্রীতিরসের এমন উচ্ছলতা, সাম্যবোধের এমন নির্বাধ উৎসার অন্যত্র বিরলদৃষ্ট।

আধ্যাত্মিক সত্যের সুমহমান উপলব্ধিতে ঈদ্-জ্-জোহা পর্বটি মহিমান্বিত। খোদাতালা যে পৃথিবীতে মানুষের সকল কিছু হইতে প্রিয়, এই পরম সত্যটিই ঈদ্-জ্ জোহা পর্বের মর্মকেন্দ্র বিরাজ করিতেছে—করুণানিধান খোদাতালার কাছে মানুষের অদেয় কিছুই নাই।

এই পর্বটির পিছনে মানবহৃদয়ের ভক্তিরস ও পবিত্রতাস্নিগ্ধ একটি ইতিহাস রহিয়াছে। হজরত ইব্রাহিম একজন শ্রেষ্ঠ নবী। তাঁহার দুই পুত্র—ইস্হাক্ ও ইস্মাইল। নবীশ্রেষ্ঠ ইব্রাহিমের অন্তরের ভক্তিপরীক্ষার জন্য খোদাতালা তাঁহাকে আদেশ জানাইলেন তাঁহার প্রিয়পুত্র ইস্মাইলকে কোর্বানি করিতে। ভক্তপ্রবর ইব্রাহিম যখন আল্লাহ্র সন্তোষবিধানার্থ স্বীয় পুত্রের গলদেশে ছুরিকা বসাইয়া তাহাকে বলি দিতে উদ্যত হইলেন তখন দৈববাণী হইল, ইস্মাইলকে কোর্বানি করিতে হইবে না—তাহার পরিবর্তে ইব্রাহিম যেন একটি দুম্বা বা মেষ কোরবানি করেন। এইভাবে আদিষ্ট হইয়া ইব্রাহিম আপনার সম্মুখে ঈশ্বরের রক্ষিত দুম্বাটি কোরবানি করিলেন। সেই হইতে গো, মেষ, ছাগ প্রভৃতি পশুর কোরবানি-অনুষ্ঠান দ্বারা মুসলমানগণ ঈদ্ জ্-জোহা উৎসব সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন।

ঈদ্ জ্-জোহা মুসলমানের অতিশয় পবিত্র পর্ব। এইদিন সকলে মসজিদে সমবেত হইয়া ভক্তিপ্রণত চিত্তে নামাজ পড়িয়া আল্লাহ্র করুণা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করে—পরস্পরের সহিত প্রীতিবিনিময়, দান, সেবা ও আধ্যাত্মিকতার পূত স্পর্শে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি প্রাণোদ্বেল হইয়া উঠে। মুসলিমজগতে ঈদ্ পর্বের অনুষ্ঠান সার্বজনীন—ইহাকে মুসলমাসম্প্রদায়ের শুভমিলনমহোথৎসব বলা যাইতে পারে।

বাঙ্‌লার কুটীরশিল্প

বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ পাশ্চাত্যদেশগুলির মতো ততখানি সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই। কিন্তু বাঙ্‌লা তথা ভারতের কুটীরশিল্প একদিন জগতে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। কিছু অর্ধশতাব্দী পূর্বেও আমাদের গ্রামগুলি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিল, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ছিল যথোচিত সামঞ্জস্য ও সহযোগিতা। বাঙ্‌লার চাষী উৎপাদন করিত খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল, আর, বিভিন্ন শ্রেণীর কারুশিল্পীরা তৈরী করিত বিচিত্র রকমের শিল্পপণ্য। তখন একের চাহিদা অপরে পূরণ করিত। সেদিন প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য আমাদিগকে বাহিরের দিকে উন্মুখ হইয়া তাকাইয়া থাকিতে হয় নাই। তখন পল্লীর স্বয়ংসম্পূর্ণতা, পল্লীবাসীর আত্মনির্ভরশীলতা ও তাহাদের সহযোগিতামূলক শ্রমবিভাগ দেশের ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে। তন্তুবায়, সূত্রধর, কর্মকার, চর্মকার, শাঁখারী, কাঁসারী প্রভৃতি শ্রমশিল্পীরা প্রত্যেকেই জন্মগত ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিত, এবং বহুকালের অভ্যাসের ফলে আপন আপন শিল্পকর্মে তাহারা অদ্ভুত নৈপুণ্য অর্জন করিত।

কিন্তু বাঙ্‌লা ও ভারতের কুটীরশিল্পের সেই গৌরবজ্জ্বল দিনগুলি অতীতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমাদের কুটীরশিল্প আজ মৃতপ্রায়। এগুলির বিলুপ্তির পিছনে বহুবিধ কারণ রহিয়াছে। অষ্টাদশ শতক হইতে পশ্চিমে শিল্পবিপ্লবের শুরু—উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এদেশে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিদেশ হইতে শিল্পজাত পণ্যের অবাধ আমদানী, ভারতে যন্ত্রদানবের আবির্ভাব এদেশের কুটীরশিল্পগুলিকে মারাত্মকভাবে আঘাত করে। বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে দেশীয় শিল্পগুলি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিল না, পল্লীর শিল্পীরা নিরুপায় হইয়া তাহাদের জন্মগত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল—তাহাদের জীবিকা অর্জনের পথ ধীরে ধীরে রুদ্ধ হইয়া আসিল। অভাবের তাড়নায় ক্রমশ তাহারা শহরে ভিড় জমাইতে লাগিল, গ্রামের অর্থসমতা নষ্ট হইয়া গেল। জনগণ পল্লীর কেন্দ্রচ্যুত হওয়ায় প্রকট হইয়া উঠিল অভাব, দারিদ্র্য আর বেকারসমস্যা। তাঁতি, জোলা, ছুতোর, কুমোর, শাঁখারী, কাঁসারী, ধ্বংসের মুখে আগাইয়া চলিল—বাঙ্‌লার কুটীরশিল্প মরিতে বসিল।

এতদিন পর্যন্ত কুটীরশিল্পগুলির পুনরুদ্ধার ও উন্নতিবিধানের কোনোরূপ উদ্যম প্রয়াস আমাদের মধ্যে দেখা যায় নাই। ব্যবসায়বাণিজ্যের অভাবে, শিল্পের অভাবে বাঙালির অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দেশীয় শিল্পগুলির উদ্ধারসাধনের ব্যগ্রতা আমাদের নাই বলিলেও চলে। একদিন বাঙ্‌লার কুটীরশিল্প জনসাধারণের অন্নসমস্যা মিটাইতে পারিত। কিন্তু দেশের শিল্পগুলি লোপ এবং লোক সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির জন্য জমির উপর বর্তমানে অত্যধিক চাপ

পড়িয়াছে। তাই, কৃষি এখন আমাদের জীবিকাসমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছে না। বৃহৎযন্ত্রশিল্পের পাশে কুটীরশিল্পেরও যে স্থান হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত আধুনিক জাপান-জার্মানী প্রভৃতি দেশের ক্ষুদ্রাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি। বিগত যুদ্ধের সময় এদেশের কুটীরশিল্পগুলি আপন অস্তিত্বের সার্থকতা বিশেষভাবে সপ্রমাণ করিয়াছে।

দেশের আর্থিক অভাব ঘুচাইতে হইলে আমাদিগকে কৃষির উন্নতি ও কুটীরশিল্পের উদ্ধারসাধন ও উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। কৃষি ও শিল্পের যদি উন্নতিসাধন করা যায় তাহা হইলে পল্লীপ্রাণ বাঙলার বুকে আবার জীবন-চাঞ্চল্য দেখা দিবে, জাতির মুমূর্ষু অবস্থা কাটিয়া যাইবে। একালের 'গ্রামে ফিরিয়া যাও' আন্দোলনকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে মৃতপ্রায় কুটীরশিল্পগুলির প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে কলকারখানাকে আমরা অস্বীকার করিতে পারিব না কিছুতেই, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইলে বৃহৎযন্ত্রশিল্পের সাহায্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। কিন্তু শুধুমাত্র কলকারখানার সৃষ্টি, যান্ত্রিক উৎপাদন দেশের তীব্র বেকারসমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। বৃহৎশিল্পপ্রতিষ্ঠান শহরের মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের কিছুটা অভাব ঘুচাইতে পারিবে বটে, কিন্তু বৃহত্তর দরিদ্র জনসাধারণের জীবিকাঅর্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিবার সামর্থ্য ইহাদের নাই। কেন-না, যন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শ্রমের প্রয়োজন কমিয়া আসে, ফলে শ্রমিকদল বৃত্তিহীন হইয়া পড়িতে বাধ্য। আমাদের দেশে বৃহৎশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটীরশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা অপেক্ষা কম। সুতরাং ক্ষুদ্রাকার শিল্প ও কুটীরশিল্পকে যদি উন্নত করিয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে আর্থিক দুর্দশার হাত হইতে আমরা কথঞ্চিৎ মুক্তি পাইব।

বাঙলার অনেকগুলি কুটীরশিল্প লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্তমান হস্তচালিত তাঁত-শিল্প, রেশমী বস্ত্রশিল্প, হস্তনির্মিতকাগজশিল্প, ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, শাঁখাশিল্প, বোতাম ও চিরুণীশিল্প, ছুরি-কাঁচি-তালা-চাবি ইত্যাদি শিল্প কোনোরকমে তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে। পুরাতন শিল্পগুলির উন্নতিবিধান এবং নূতন কুটীরশিল্প-প্রতিষ্ঠার সুযোগসুবিধা যথেষ্ট পরিমাণে এখনো বিদ্যমান। সুতা, কাপড় ও চামড়া, ধাতু, কাষ্ঠ, কাগজ, মাটি, কাচ প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী বা পণ্য সহজেই উৎপাদন করা যায়। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে এদেশে যে বিচিত্র রকমের শিল্প তৈরি হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীনিকেতন ও খাদিপ্রতিষ্ঠান।

কুটীরশিল্পের উজ্জীবন ও উন্নয়নসাধন করিতে হইলে প্রথমে এ পথের বাধাগুলিকে অপসারিত করা প্রয়োজন। এসব প্রতিবন্ধকের জন্য আমাদের দেশীয় শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। অশেষ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া বাঙলার কুটীরশিল্পীরা দিন অতিপাত করে। আর্থিক অসচ্ছলতা ও উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাহাদের সকল উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। কুটীরশিল্প ক্ষুদ্রায়তন, ইহার জন্য অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় না। স্বগৃহে অবস্থান করিয়াই শিল্পীরা বহুবিধ পণ্য সহজে প্রস্তুত করিতে

কিন্তু সামান্য পুঁজিসংগ্রহের সামর্থ্যও তাহাদের নাই। সেজন্ত ইহাদিগকে সর্বদাই মহাজন ও ধূর্ত মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর শরণাপন্ন হইতে হয়। ইহার ফলে তাহাদের দারিদ্র্য বাড়িয়াই চলে। এইসব লোভী মানুষের অর্থসাহায্য ও দাদন ভিন্ন তাহারা কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে পারে না, উৎপাদিত দ্রব্য ন্যায্যমূল্যে বাজারে বিক্রয় করিতে পারে না। মহাজন ও মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর চক্রান্তে পড়িয়া শিল্পীরা তাহাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ হইতে নিয়ত বঞ্চিত হইতেছে। শিল্পদ্রব্যবিষয়ে ক্রেতার রুচি নিত্যপরিবর্তন ঘটিতেছে, কিন্তু কুটীরশিল্পের ক্ষেত্রে গবেষণা ও উপযুক্ত শিক্ষার অভাবহেতু গ্রাম্যশিল্পীরা শিক্ষিত ও আধুনিক রুচিসম্পন্ন মানুষের চাহিদা মিটাইতে সমর্থ হইতেছে না। এসব কারণে কুটীরশিল্পের প্রসার বিঘ্নিত হইতেছে।

অথচ এই বাধাগুলি দুর্লঙ্ঘ্য নয়। শ্রমিকের অভাব এদেশে নাই, এক্ষেত্রে বেশি মূলধনেরও প্রয়োজন নাই। অভাব সংগঠনশক্তির, ব্যবসায়িক বুদ্ধির, আত্মপ্রত্যয়ের, এবং সর্বোপরি অর্থসাহায্যের। সরকার যদি কুটীরশিল্পগুলির উজ্জীবনের প্রতি মনোযোগী হন এবং জনসাধারণ যদি এ বিষয়ে উৎসাহী ও উদ্যমশীল হয় তবে বাঙলার লুপ্ত কুটীরশিল্পের উদ্ধারসাধন সম্ভব হইয়া উঠিবে। সমবায়সমিতি, কুটীরশিল্পব্যাঙ্ক, কুটীরশিল্পবোর্ড ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশীয় শিল্পগুলি অবশ্যই উন্নতিলাভ করিতে পারিবে।

আমাদের দেশে যন্ত্রশিল্পের যতই উন্নতি বা প্রসার হোক-না কেন—যেমন বর্তমানে তেমনি ভবিষ্যতেও, কৃষিই দেশবাসীর জীবিকাঅর্জনের প্রধান সহায়রূপে বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু এদেশের কৃষক সমস্ত বছর ধরিয়া কৃষিকর্মে ব্যাপৃত থাকে না, সেই অবসর সময়ে তাহারা যদি কুটীরশিল্পে আত্মনিয়োগ করে তবে তাহাদের একটি সহকারী আয়ের নূতন পথ খুলিয়া যায়। ইহাতে তাহাদের দারিদ্র্যও অনেকটা ঘুচিবে। বৈচিত্র্যাভিলাসী ও রুচিসম্পন্ন মানুষের কাছে কুটীরশিল্পজাত সামগ্রীর চাহিদা সর্বদাই থাকিবে। কলকারখানায় অধিক পরিমাণে জিনিস উৎপাদিত হয় সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব রহিয়াছে—যন্ত্রনির্মিত দ্রব্য মানুষের রুচি ও সৌন্দর্যপিপাসা মিটাইতে পারে না।

শিল্প, কৃষি ও ব্যবসায়বাণিজ্যই জাতীয় সম্পদ বাড়াইবার প্রধান উপায়। সুতরাং শিল্পের ক্ষেত্রে কুটীরশিল্পের স্থান কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়। দেশে এখন বেকারসমস্যা উগ্ররূপে দেখা দিয়াছে। মধ্যবিত্তসম্প্রদায়, কৃষক ও কর্মচ্যুত শ্রমিককে আর্থিক দুর্গতির হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে শুধু বৃহৎযন্ত্রশিল্পস্থাপনের দিকে দৃষ্টি দিলে চলিবে না। পূর্বে আমরা দেখাইয়াছি, যন্ত্রশিল্প অধিক সংখ্যক মানুষের কর্মস্থান করিতে পারে না—যন্ত্রশিল্পের ব্যাপক প্রসারে বেকারসমস্যার তীব্রতা বাড়িয়া যায়। যন্ত্রশিল্পস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কুটীরশিল্পগুলিকে উন্নত করিয়া তুলিবার সময় আসিয়াছে। এগুলির যথোচিত প্রতিষ্ঠা হইলে আমাদের জাতীয় জীবনে অর্থসমতা ফিরিয়া আসিবে, আমাদের দারিদ্র্য ও অন্নসমস্যার অন্তত কিছুটা সমাধান হইবে। যান্ত্রিক সভ্যতা ও নাগরিক জীবনের মোহ আমাদের দুঃখকষ্ট বহুল পরিমাণে

বাড়াইয়া তুলিয়াছে। এইবার বাঙালিকে পল্লীসংস্কৃতি ও গ্রামীণ অর্থনীতির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। বাঙ্‌লাদেশ গ্রামে গাঁথা। গ্রামগুলি বাঁচিলেই বাঙালি বাঁচিবে। গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের যে-নূতন আর্থিক জীবন গড়িয়া উঠিবে তাহার প্রধান সহায় হইবে কৃষি ও কুটীরশিল্প। গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে কুটীরশিল্পের যে একটি বড়ো স্থান রহিয়াছে এই সত্যটি যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

বাঙ্‌লার কৃষি ও কৃষক

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো বাঙ্‌লাও একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল। বাঙ্‌লাদেশের শতকরা প্রায় তিনচতুর্থাংশ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। আমাদের আর্থিক জীবনের প্রধান ভিত্তি যে কৃষি একথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। কৃষিব্যবস্থার উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে বাঙালির আর্থনীতিক সচ্ছলতা ও দারিদ্র্য ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমাদের জাতীয় জীবনে একদিন আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। গ্রামের অধিকাংশ লোক কৃষিকর্মে ব্যাপৃত থাকিলেও জীবনযাত্রানির্বাহসমস্যা দেশবাসীকে তখন খুব পীড়িত করে নাই। পূর্বে বাঙ্‌লার শিল্পগুলি ছিল উন্নত। কৃষিকার্যে ও শিল্পকর্মে গ্রামবাসী নিযুক্ত থাকিত, একের চাহিদা অন্যে পূরণ করিত। সেদিনকার অর্থসমতার মূলে ছিল সুন্দর একটি শ্রমবিভাগ। কিন্তু দেশের জনসংখ্যা যখন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং বিদেশি যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পগুলি ধীরে ধীরে লোপ পাইতে বসিল, তখন লোকসাধারণ অনন্যোপায় হইয়া জমিকেই একমাত্র আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিল। ইহার ফলে বাঙ্‌লায় আর্থিক বনিয়াদ ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল, চাষীসম্প্রদায় দারুণ আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হইল।

বাঙ্‌লার লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু দেশে জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে সেই অনুপাতে চাষের জমির পরিমাণ বাড়ে নাই। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে যদি শিল্পপ্রসার ঘটিত তবে কৃষির উপর এতখানি চাপ পড়িত না। কিন্তু অপরাপর দেশের তুলনায় শিল্পক্ষেত্রে এখনো আমরা নিতান্ত অনগ্রসর। সেজন্য কৃষিকেই আমরা জীবিকার্জনের একতম উপায় বলিয়া জানিয়াছি। আধুনিক যন্ত্রশিল্পের যুগে ভারতের মতো কৃষিকেন্দ্রিক দেশ পৃথিবীতে বিরলদৃষ্ট।

শুধু কৃষির উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়াই এদেশের কৃষকের দারিদ্র্য এত বেশি, তাহার জীবনযাত্রার মান অবিশ্বাস্যরকমে নীচু। দারিদ্র্যের জন্য দুইবেলা তাহার অন্ন জুটে না, রোগে ঔষধের ব্যবস্থা নাই, পথ্য নাই—ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করিয়া ধীরে ধীরে সে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়। অতিবৃষ্টি কিংবা

কৃষি ও শিল্প পরস্পরের অনুপূরক। দেশে যদি আমরা যথোপযুক্ত শিল্পপ্রসারণ ঘটাইতে পারি তাহা হইলে জমির উপর অত্যধিক চাপ স্বাভাবিক ভাবেই কমিয়া আসিবে, অন্তদিকে, জনসাধারণের আয়ের পথও প্রশস্ত হইবে। আয়ের নূতন পথ খুলিয়া গেলে আমাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইতে বাধ্য। পৃথিবীর বহুদেশ বিজ্ঞান-সম্মত কৃষিপ্রণালী অনুসরণ করিয়া শস্যের ফলন বহুগুণ বাড়াইয়াছে। সেদিকে আমাদের কাহারো দৃষ্টি নাই বলিলেই চলে। কৃষিব্যাপারে এখনো আমরা মধ্যযুগে বাস করিতেছি। বাঙ্‌লাদেশে কৃষিসংক্রান্ত পরীক্ষাগার, পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকেন্দ্র ও কৃষিশিক্ষাবিদ্যালয়ের একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। উপযুক্ত সার, ভালো বীজ এবং জলসেচনের সুব্যবস্থার অভাবে আমরা কৃষির উন্নতিসাধন করিতে পারিতেছি না। এইসব দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

কৃষি ও কৃষকের উন্নতির পথে বহুতর প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। কিন্তু সমস্ত বাধা আমাদের প্রতিহত করিতেই হইবে। চাষীসম্প্রদায়ের উন্নতিবিধানের ইচ্ছা সত্যই যদি আন্তরিক হয় তবে সমস্ত প্রতিকূলতাকে অবশ্যই আমরা পরাভূত করিতে পারিব। ইচ্ছা থাকিলে উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। সমগ্র দেশের ভাগ্য যে চাষীর ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত একথা আমরা এখনো উপলব্ধি করিতে পারি নাই। বাঙ্‌লাদেশ তথা ভারত কৃষিপ্রধান অঞ্চল। সুতরাং কৃষিব্যবস্থার অবনতি আমাদের পক্ষে মারাত্মক। বছরের পর বছর আমরা খাদ্যাভাবের মধ্যে দিনাতিপাত করিতেছি। এই খাদ্যসংকট উত্তীর্ণ হইবার জন্য, শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল জোগাইবার জন্য, আর্থিক দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাদের সকলকে কৃষির প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে। দেশবাসী সকলকেই বুঝিয়া লইতে হইবে যে কৃষি ও কৃষককে বাদ দিয়া জাতীয় জীবনে কোনো উন্নতিরই সম্ভাবনা নাই।

একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি : নেতাজী সুভাষচন্দ্র

পরাধীন ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে বাঙ্‌লার বিপ্লবী বীর সুভাষচন্দ্র গৌরবদীপ্ত এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিলেন। অগ্নিঅক্ষরে তিনি যে আত্মজীবন-কাহিনী রচনা করিয়া গিয়াছেন, শৌর্যে ও বীর্যের মহিমায় তাহা উজ্জ্বল, আত্মত্যাগ ও কর্মসাধনার দীপ্তিতে বিভাসিত, অতুলনীয় দেশপ্রেমের বিচ্ছুরণে দীপ্যমান। স্বাধীনতাকামী বিক্ষুব্ধ ভারতের প্রাণসত্তা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক শক্তির অজস্র মিথ্যা-প্রচারণা তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাকে মসীলিপ্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু দেশপ্রাণ সুভাষ

সে-প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি আজ ভারতের দিকে দিকে কীর্তিত হইতেছে—সেই খ্যাতি ভারতভূমির সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র এশিয়াখণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সুভাষের মৃত্যুজিৎ গৌরবে আমরাও গৌরবান্বিত।

ইংরেজি ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে উড়িষ্যার কটক জেলায় সুভাষচন্দ্রের জন্ম। চব্বিশপরগণার অন্তর্ভুক্ত কোদালিয়া গ্রামে সুভাষের পৈতৃক বাসভূমি। কটকের রেভন্‌শ কলেজিয়েট স্কুল হইতে তিনি ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইহার পর তরুণ সুভাষ কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইলেন। এইসময় তাঁহার অন্তরে সন্ন্যাসজীবনবরণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। একদা সকলের অগোচরে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি ভারতের নানাতীর্থে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে ফিরিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার বাসনা চরিতার্থ হইল না, তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালেই তাঁহার চিত্তে স্বাদেশিকতার অঙ্কুরোদ্‌গম হয়। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইংরেজঅধ্যাপক ওটেন বাঙালিছাত্রদের প্রতি অপমানসূচক আচরণ করিলে সুভাষচন্দ্র সেই অপমানের প্রতিশোধগ্রহণমানসে ওটেনকে প্রহার করেন। ইহার ফলে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়িতে হয়। ১৯১৭ সালে তিনি মহাপ্রাণ আশুতোষের আনুকূল্যে স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হইলেন। ১৯১৯ সালে সুভাষচন্দ্র দর্শনশাস্ত্রে অনার্সসহ বি. এ পাশ করেন।

এম. এ. অধ্যয়নকালেই ১৯১৯ সালে তিনি বিলাত যাত্রা করেন এবং ১৯২০ সালে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া আই-সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র কেম্ব্রিজ হইতে দর্শনে 'ট্রাইপস্' ডিগ্রী লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে যখন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সে সময় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষে অসহযোগআন্দোলনের প্রবল বিক্ষোভ ছড়াইয়া পড়ে। দেশমাতৃকার বাণী সুভাষচন্দ্রের হৃদয়কে আলোড়িত করিল, তাঁহার অন্তরে দেশপ্রেমের বহ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। এই দেশাত্মবোধের প্রেরণায় তিনি সিভিল সার্ভিসের মোহত্যাগ করিলেন—ঘৃণাভরে আই-সি-এস পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। এসময় হইতেই তাঁহার সংগ্রামী রাজনীতিক জীবনের শুরু।

১৯২১ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসে যোগদান করিলেন। বাঙ্‌লাদেশে তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রবাহ বিকীর্ণ হইয়াছে, তাঁহার প্রাণবান স্বাদেশিকতার আহ্বান যুবচিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। সুভাষ দেশবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, এবং চিত্তরঞ্জনের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কলেজে অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইলেন। ১৯২১ সালেই শেষভাগে দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র কারাবরণ করেন।

১৯২৩ সালে সুভাষচন্দ্র বিখ্যাত 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক

পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯২৪ সালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তার পদলাভ করেন। ওই বৎসরই তাঁহাকে অন্তরীণ করা হইল। তিনটি বৎসর কারাপ্রাচীরের অন্তরালে থাকার পর দেশবাসীর আন্দোলনে সরকার তাঁহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ১৯৩০ সালে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া যখন কারাবাস করিতেছিলেন সেই সময়েই তিনি কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত হন। কিন্তু অল্পদিন পরে সুভাষ আবার কারারুদ্ধ হইলেন। উপর্যুপরি কারাবাসের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে। ভগ্নস্বাস্থ্যউদ্ধারের জন্য ইংরেজসরকার তাঁহাকে য়ুরোপে যাইবার অনুমতি দিলে ১৯৩৩ সালে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটিল ১৯৩৪ সালে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর সুভাষ আবার য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া ১৯৩৬ সালে ভারতভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে অন্তরীণ করা হইল।

সুভাষচন্দ্রের জীবনকথা অনবচ্ছিন্ন সংগ্রামেরই ইতিহাস—তাঁহার জীবন বৃটিশসাম্রাজ্যবাদীদের কূটচক্রান্তের বিরুদ্ধে আপোষহীন যুদ্ধেরই রক্তরাঙা ইতিকথা। সেদিনের পরাধীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতাপূজারী সুভাষচন্দ্র ১৯৩৭ সালে মুক্তিলাভ করিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি হরিপুরাকংগ্রেসের সভাপতির সম্মানিত পদ অলংকৃত করেন। ১৯৩৯ সালে সুভাষ ত্রিপুরীকংগ্রেসের সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

নিজের স্বাধীন মতবাদের জন্য সুভাষ কংগ্রেসের আনুগত্য স্বীকার করিতে পারিলেন না। ফলে তিনি কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইলেন, এবং অল্পকালমধ্যেই 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করিলেন। কংগ্রেসের আপোশমূলক মনোভাবকে বিদ্রোহী সুভাষ মানিয়া লইতে পারেন নাই। ১৯৪০ সালে রামগড়ে তিনি এক আপোষ-বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেন। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের বরাবরই একটা স্বকীয় স্বাধীন মতবাদ ছিল, এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল বলিষ্ঠ—অনমনীয়। ইহার জন্য সুভাষকে বরদাস্ত করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হইল না।

১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে অকস্মাৎ সুভাষচন্দ্র তাঁহার কলিকাতার বাসভবন হইতে অন্তর্ধান করিলেন। বহুদিন দেশবাসী তাঁহার সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারিল না। পরে শোনা গেল, ছদ্মবেশে তিনি জাপানে গিয়া পৌঁছিয়াছেন, এবং সেখান হইতে সিঙ্গাপুরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া মুক্তিসংগ্রামের সেনাদল গঠন করিতে। সুভাষের জীবনে ১৯৪১ সালের পরবর্তী ঘটনাবলী যেমন দুঃসাহসিক, তেমনি রোমাঞ্চকর। কী ভাবে তিনি ভারত ত্যাগ করিয়া কাবুলে পৌঁছিলেন, কী ভাবে সেখানে হইতে চক্রশক্তির দেশে পদার্পণ করিলেন, সেইসব কাহিনী রহস্যে আচ্ছন্ন ও আশ্চর্যজনক। বিদেশে অবস্থান করিয়া ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের যে-গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস তিনি রচনা করিলেন তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে চিরকাল প্রেরণাসঞ্চার করিবে।

মালয়ে, ব্রহ্মদেশে, সিঙ্গাপুরে ইংরেজরাজত্বের উচ্ছেদ ঘটিয়াছে—এইসব দেশ তখন জাপানের করতলগত। সুভাষ বুঝিলেন, বৃটিশরাজশক্তির নাগপাশ হইতে ভারতকে মুক্ত করিবার সুবর্ণসুযোগ আসিয়াছে। তখন এই বিপ্লবী বীর 'আজাদহিন্দ্-ফৌজ'-গঠনে মাতিয়া উঠিলেন। সহস্র সহস্র ভারতীয় সেনা এই বাহিনীতে স্বেচ্ছায় যোগদান করিল—সুভাষচন্দ্র হইলেন সেই সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। দেশের অগণিত মুক্তিযোদ্ধা তাঁহাকে 'নেতাজী'রূপে বরণ করিয়া লইল। ইহার পর শুরু হইল ভারতের মুক্তিসংগ্রামের বীর্যদীপ্ত অভিযান। ভারতব্রহ্মসীমান্তে, আরাকানে, টিড্ডিমে, কোহিমায়, ইম্ফলে আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের বীরপদধ্বনিমন্দ্রিত হইল, দুর্গম অরণ্যপ্রান্তর অসংখ্য বীরসন্তানের বক্ষশোণিতে রক্তিম হইয়া উঠিল। মণিপুরে আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের সেনাদল প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিল।

ব্রিটিশসাম্রাজ্যলিপ্সাকে বিধ্বস্ত করিবার সে কী এক অপূর্ব উন্মাদনা! সেই ধ্বংসযজ্ঞের ঋত্বিক ছিলেন এই বাঙলাভূমিরই বীরসন্তান নেতাজী সুভাষচন্দ্র। সুভাষের কার্যকলাপকে কলঙ্কিত করিতে ব্রিটিশশক্তি যথাসাধ্য প্রয়াস করিল, সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁহাকে চিহ্নিত করিতে চাহিলে স্বদেশদ্রোহী 'কুইস্লিং' নামে। কিন্তু তাহাদের সমস্ত অপপ্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল, সমগ্র ভারত সুভাষচন্দ্রকে তাহার শ্রেষ্ঠসন্তান বলিয়া অভিনন্দন জানাইল। তাঁহার প্রচারিত 'জয়-হিন্দ্'-ধ্বনি ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধ-বনিতার বুকে জাগাইয়া তুলিল স্বাধীনতার দুর্বার স্পৃহা। সুভাষচন্দ্র আজাদ-হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিলেন, নয়টি স্বাধীন রাষ্ট্র উহাকে স্বীকৃতি জানাইল। বাঙলার সন্তান স্বতন্ত্র গভর্ণমেণ্টের ভিত্তি রচনা করিয়া বাঙালির সংগ্রামবিমুখতার অপবাদ ও গ্লানি মুছিয়া দিল।

নেতাজীর আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মুহূর্তে হিন্দুমুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট মনোভাব বিদূরিত হইল, তিনি বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের জন্মদান করিলেন। আজাদ-হিন্দ্-ফৌজে এতটুকু সাম্প্রদায়িকতা ছিল না—হিন্দু ও মুসলমান তাহাদের সমবেত শক্তিপ্রয়োগে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছে। সুভাষের নেতৃত্বেই ভারতের হিন্দুমুসলমানদল দিল্লীর লালকেল্লায় বিজয়নিশান উড়াইতে—জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে—সেদিন যেন উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল।

সুমহান ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় অভূতপূর্ব সাফল্য, অতুলন দেশপ্রেম, মহিমময় ত্যাগের আদর্শ, অকম্পিত আত্মশক্তি ও দুর্জয় সাহস নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনকে মহিমায় ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। স্বাধীন-ভারত-ঘোষণা, ভারতের বাহিরে স্বাধীন ভারত-প্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয় জাতীয়বাহিনীসংগঠন জগতের ইতিহাসে কয়েকটি বিশেষ অধ্যায়। এই অধ্যায় যিনি রচনা করিয়াছেন, সেই নেতাজীর অসামান্য চিন্তাশীলতা ছিল, দূরদৃষ্টি এবং সাহস ছিল।

উনিশ-শ পঁয়তাল্লিশ সালে অকস্মাৎ জাপানী সংবাদে প্রচারিত হয়, বিমান আহত হইয়া নেতাজী দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদ কিন্তু অনেকে

করে না—আমাদের প্রাণের সুভাষচন্দ্র, আজাদ-হিন্দ-ফৌজের 'নেতাজী' সুভাষচন্দ্র কখনো মরিতে পারেন না।

মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্

ভারতের রাজনীতিক ও গঠনতান্ত্রিক ইতিহাসে কায়েদ আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ একটা উল্লেখনীয় স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিই ভারতে মুসলিমজাতিকে এত সত্বর স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। ভারতীয় মুসলিমানসম্প্রদায়ের মধ্যে যে কয়জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। জিন্নাজীবনের স্মরণীয় কীর্তি হইতেছে তিনি মুসলিমজাতির বহুঈপ্সিত পাকিস্তানরাষ্ট্রের স্রষ্টা। ভারতীয় মুসলমানকে তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ইংরেজি ১৮৭৬ সালে করাচী শহরে এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর ঘরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। করাচীর একটি মাদ্রাসায় প্রথম তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয়। ১৮৯১ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করেন। ব্যবসায়ীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও, শৈশব হইতেই লেখাপড়া ও জ্ঞানার্জনের প্রতি তাঁহার অনুরাগ দেখা যায়। ১৮৯২ সালে ব্যারিস্টারী পড়িবার মানসে তিনি বিলাত গমন করেন এবং লণ্ডনের 'লিঙ্কনস্ ইন্'-এ ভর্তি হন। আইনশাস্ত্রে জিন্নাহ্ সবিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিলেন। ১৮৯৬ সালে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

রাজনীতিক জীবনের প্রারম্ভে জনাব জিন্নাহ্ ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর সান্নিধ্যে আসেন। তিনি যখন ইংলণ্ডে ছিলেন তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দাদাভাই নৌরজীর সঙ্গে পরিচিত হন। ইহার নিকটই জিন্নাহ্ লাভ করেন রাজনীতির প্রথম শিক্ষা। দেশপ্রেমিক গোপালকৃষ্ণ গোখেলের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। জিন্নাহ্ জীবনে আরো একজন ভারতসন্তানের প্রভাব গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল, তিনি হইতেছেন বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এসকল মনীষীর সংস্পর্শে আসিয়া কায়েদ আজম জিন্নাহ্র মধ্যে দেশপ্রেম, কর্মনিষ্ঠা, সাহসিকতা ও রাজনীতিজ্ঞানের স্ফুরণ হয়।

আইনব্যবসায়কেই জিন্নাহ্ আপনার কর্মজীবনের বৃত্তিরূপে বাছিয়া লইলেন। এক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য প্রথমে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অসাধারণ আইনজ্ঞান ও বাগ্মিতার পরিচয় দিলেন,

চতুর্দিকে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। আইনব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তিনি পদক্ষেপ করলেন। শৈশবকাল হইতেই জিন্নাহ্জী প্রগতিপন্থী। সুতরাং একসময় নিজেকে জাতীয়তাবাদী বলিয়া অভিহিত করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন। সে সময় তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, হিন্দুমুসলমানের মিলনের পথেই ঘটিবে পরাধীন ভারতের মুক্তি। তাঁহার অন্তরে স্বাধীনতাস্পৃহা সতত জাগ্রত ছিল। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ-অধিকারকে তিনি সর্বাপেক্ষা বড়ো অধিকার বলিয়া মনে করিতেন।

জিন্নাহ্জী যখন রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন ভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। ইংরেজিশিক্ষা গ্রহণ করিয়া হিন্দুরা দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু মুসলমানসম্প্রদায় নানা কারণে ইংরেজিশিক্ষা মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে পারিল না। ফলে তাহাদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছিল। ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যুদয় ঘটে। কয়েকটি কারণবশত মুসলমানসম্প্রদায় কংগ্রেসের জাতীয়তার আহ্বানে আন্তরিকতার সহিত সাড়া দিতে পারিল না। এ সময় মুসলমানদের অধিকার ও মুসলিমস্বার্থ কী ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় এই বিষয়ে কয়েকজন মুসলমান অতিশয় চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন। তখন কতিপয় মুসলিমনেতার প্রচেষ্টায় মুসলমানদের একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। এই প্রতিষ্ঠানকে 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ' নামে অভিহিত করা হয়। মুসলমানের সামাজিক-অধিকারসংরক্ষণ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনই ইহার আদর্শরূপে প্রচারিত হইল।

জাতীয়তাবাদী জিন্নাহ্ কিন্তু প্রথমে মুসলিম লীগকে সাগ্রহ অভিনন্দন জানাইতে পারিলেন না। ১৯০৬ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করিলেন। অবশ্য মুসলিম লীগকে প্রগতির পথে পরিচালিত করিতে এবং প্রতিষ্ঠানটিকে পুনর্গঠিত করিতে তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। লীগের সদস্য না হইয়াও এ বিষয়ে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ইহার অল্পদিন পরে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করিলেন। এই প্রতিষ্ঠানে যোগদানকালে জিন্নাহ্ বলিয়াছেন, জাতীয় স্বার্থের কোনো বিরুদ্ধাচরণ তিনি করিবেন না।

হিন্দুমুসলমানসমস্যার সন্তোষজনক সমাধানই তখন তাঁহার কাম্য ছিল। তাঁহারই চেষ্টার ফলে ১৯১৫ সালে বোম্বাই শহরে একই সঙ্গে কংগ্রেস ও লীগের অধিবেশন হয়। সেদিনকার হিন্দুমুসলমানের নির্বিরোধ মিলনের আকুলতা সত্যই বিস্ময়কর! মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্ই সে-সময় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতিবন্ধনের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। ১৯১৬ সালে সুপ্রসিদ্ধ 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' হয়—কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সম্মিলিতভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবি পেশ করে। লীগের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্। 'হোমরুল-আন্দোলনে' অংশগ্রহণ করিয়া জিন্নাহ্ ভারতীয় রাজনীতির পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গান্ধীজী যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন তখন জিন্না [illegible]

আন্দোলনকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাইতে পারেন নাই। মুসলিম লীগকে অনেকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলিয়া অভিযোগ করিলে ইহার প্রত্যুত্তরে জিন্নাহ্ বলেন, 'মাইনরিটির মনে সত্যকার রাজনীতিবোধ জাগাইতে হইলে তার নিজের অস্তিত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে তার মনে নিশ্চিন্ততা সৃষ্টি করিতে হইবে। উপযুক্ত এবং কার্যকর রক্ষাকবচের দ্বারাই এই নিশ্চিন্ত ভাব সৃষ্টি করা যাইতে পারে।' এজন্য তিনি কংগ্রেসের নিকট স্বতন্ত্র নির্বাচন এবং মুসলমানদের জন্য সংখ্যাতিরিক্ত আসনের দাবি পেশ করিলেন। ইহার পর কংগ্রেসের সম্মুখে তিনি 'চৌদ্দ দফা দাবী' [Fourteen Points] উপস্থাপিত করিলেন। কিন্তু তখনকার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই দাবী স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না। ফলে হিন্দুমুসলমানের মতবিরোধে দেশের রাজনীতিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিরাশাব্যঞ্জক হইয়া উঠিল।

জনাব জিন্নাহ্ ভারতে মুসলিম সমাজকে সংঘবদ্ধ করিবার দিকে আপনার সকল মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি বোম্বাই শহরে লীগের বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করিলেন। এই অধিবেশনের সভাপতি স্যর ওজির হাসান ঘোষণা করেন: 'একথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ। হিন্দুমুসলমান দুইটি সমাজমাত্র নয়, নানাদিক হইতে দুইটি স্বতন্ত্র জাতি।' ১৯৩৭ সালে লীগ পূর্ণস্বাধীনতার দাবি জানায়। উক্ত অধিবেশনে জিন্নাহ্‌র প্রথম দাবি ছিল যে, মুসলিম লীগকে ভারতের মুসলমানদের একমাত্র রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু কংগ্রেস এই প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য মনে করিল না। ১৯৪০ সালে লাহোরে লীগের যে অধিবেশন হয় তাহা নানাদিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহাতে সভাপতি জিন্নাহ্ প্রকাশ্যে 'পাকিস্তান'-প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন।• তিনি বলিলেন, মুসলমানরা শুধু মাইনরিটির অধিকারসংরক্ষণ লইয়া আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না—তাহাদের জন্য চাই নিজেদের স্বতন্ত্র বাসভূমি। এহেন সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে কয়েকজন হিন্দুরাষ্ট্রনেতা এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহার পাকিস্তানপ্রস্তাবকে একপ্রকার মানিয়া লইলেন।

১৯৪২ সালে স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ভারতে আসিয়া পাকিস্তানের মূলনীতিকে স্বীকৃতি জানাইলেন। ইহার পর ভারতের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে অতিদ্রুত পট-পরিবর্তন ঘটিল। ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধী বিখ্যাত 'ভারত ছাড়' [Quit India] আন্দোলন সুরু করিলেন—স্মরণীয় আগস্টবিপ্লব আরম্ভ হইল। ব্রিটিশসরকার বুঝিলেন, বিদ্রোহী ভারতকে পরাধীনতার নাগপাশে বাঁধিয়া রাখা আর সম্ভব নয়। এই সময়ে ভারতবর্ষের নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হয়। কংগ্রেস-লীগ-বিরোধের ইহাই চূড়ান্ত পর্যায়।

১৯৪৬ সালের ৩রা জুন, ভারতবাসীর হাতে এদেশে শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করার বিষয়ে ব্রিটিশের নবরচিত পরিকল্পনা ঘোষিত হইল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট রাজপ্রতিনিধি লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এদেশবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিলেন ... এবং ভারতের অঙ্গচ্ছেদ হইল। ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র

ও পাকিস্তান—এই দুই ডোমিনিয়নের সৃষ্টি হইল। কায়েদে আজম জিন্নাহ্ সাম্প্রদায়িক-সমস্যা-সমাধানের একমাত্র উপায়হিসাবে মুসলমানদের জন্য পৃথক যে বাসভূমি দাবি করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিল।

পাকিস্তানরাষ্ট্রের স্রষ্টা, মুসলিমভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ কায়েদে-আজম জিন্নাহ বর্তমানে ইহজগতে নাই। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার জন্মস্থান করাচীতে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। জিন্নাহ্‌র মতো একজন নেতার আবির্ভাবে মুসলমানজাতি সত্যই গৌরবান্বিত। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল অনমনীয় এবং জনপ্রিয়তাও ছিল ব্যাপক। তাঁহারই দাবিতে ভারত বিচ্ছেদ হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি যে স্বাধীনতার অভিলাষী ছিলেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। দ্বিধাবিভক্ত ভারত এখনো সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। যেদিন হিন্দুমুসলমানদের সাম্প্রদায়িক কলহের অবসান ঘটিবে, যেদিন দেশে পূর্ণশান্তি ফিরিয়া আসিবে, সেইদিনই এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে জিন্নাহ্‌র স্থান নির্ধারিত হইবে।

বাঙলাপল্লীর উন্নয়নসমস্যা

বাঙালী তথা সমগ্র ভারতবাসীর জীবন পল্লীকেন্দ্রিক। আমাদের দেশ পল্লী-প্রাণ। এই পল্লীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। পশ্চিমী বস্তুতান্ত্রিকতার প্রভাবে আজ আমাদের দেশের স্থানে স্থানে বিভিন্ন শহর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে সত্য, কিন্তু অদ্যাবধি দেশের শতকরা নব্বই জন লোক বাস করে দূরদূরান্তের পল্লীঅঞ্চলে। পঞ্চাশ বছর পূর্বেও গ্রামের সঙ্গে আমাদের সংযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল, পল্লীর বুকে কান পাতিলে সমগ্র বাঙালিজাতির হৃৎস্পন্দন শোনা যাইত। এহেন গ্রামদেশের আজ কী অবস্থা হইয়াছে!

একদিন যে-গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালির জীবন-প্রবাহ আবর্তিত হইয়াছে, বাঙালি আজ তাহাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে বসিয়াছে। বাঙলাপল্লীর সৌম্য শান্তশ্রী আজ আর নাই। গ্রামের দেবায়তন, শিক্ষানিকেতন ভাঙিয়া পড়িয়াছে, উৎসব-আনন্দমুখর লোকালয়গুলি ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে, পথঘাট জঙ্গলে আকীর্ণ হইয়া উঠিতেছে। বর্তমানে বাঙলার পল্লী প্রায় জনশূন্য ও শ্রীহীন। সে-যুগের সম্পদপ্রাচুর্য আজিকার দিনে আর চোখে পড়ে না। বাঙালির কৃষি গিয়াছে, কুটীরশিল্প গিয়াছে, আর্থিক সচ্ছলতা গিয়াছে। বাঙলার জনগণের মুখে আজ অভাব, দুঃখদৈন্য ও নিরানন্দের ছায়া গভীর রেখাপাত করিয়াছে।

দেশের শতকরা নব্বই জন লোক এখনো বাস করে গ্রামে। সুতরাং গ্রামের

দীঘি সব মজিয়া ভরাট হইয়া গিয়াছে, বিশুদ্ধ জলের অভাবে নানা রোগ সহজেই বিস্তারলাভ করিতেছে। সমস্ত গ্রামবাসীর সমবেত প্রচেষ্টায় যদি নলকূপ বসাইবার ব্যবস্থা করা যায়, পুষ্করিণী-দীঘিগুলির যদি সংস্কার সাধিত হয় তবে ব্যাধির প্রকোপ অনেকটা কমিয়া আসিবে। গ্রামবাসীর উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য সরকারি সহায়তার বিশেষ আবশ্যক আছে।

এসেম্বলি-হলে, শহরের ময়দানে ময়দানে, বক্তৃতা করিয়া আমরা প্রতিনিয়ত অযথা শক্তিক্ষয় করিতেছি; ইহাতে দারিদ্র পল্লীবাসীর বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হইবে না। দেশের অসংখ্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইলে পল্লীমেলার পুনঃপ্রবর্তনই উত্তম পন্থা। গ্রাম্যমেলার বহুবিধ উপকারিতা আছে। ইহার মাধ্যমে একদিকে মানুষে-মানুষে মিলনের পথটি সহজ হইয়া উঠিবে, আবার, অন্যদিকে ইহার একটা অর্থকরী সুবিধাও আছে। স্বদেশীশিল্পের প্রদর্শনী খুলিয়া আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া, ইহা হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহাতে কয়েকটি গ্রামের সংস্কার-কার্য অন্তত কিছুটা অগ্রসর হইতে পারে। মেলার সুযোগে পল্লীবাসিগণ পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানও করিতে পারিবে, শিক্ষার আলোক পাইবে, তদুপরি লাভ করিবে কিছুটা আনন্দ।

পল্লীসংস্কার ও পল্লী পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সরকারি অর্থসাহায্যের প্রয়োজন যে অত্যধিক একথা বুঝাইয়া বলিতে হয় না। কিন্তু সরকারের নিকট প্রতিমুহূর্তে সাহায্য পাওয়ার আশা আমরা করিতে পারি না। সুতরাং পল্লীসংগঠনের জন্য আমাদের প্রয়োজন বলিষ্ঠ স্বদেশীসমাজ গড়িয়া তোলা। আত্মনির্ভরশীলতা ও সংঘশক্তির সহায়তায় জাতীয় জীবনের উন্নতিকে আমরা অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিতে সমর্থ হইব। এক্ষেত্রে শিক্ষিতসম্প্রদায়কেই পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে, তাহারাই হইবে জাতির সকল উন্নতির পথপ্রদর্শক। তাহাদের অক্লান্ত সাধনাই সৃষ্টি করিবে পল্লীবাসীর মধ্যে বলিষ্ঠ সমাজচেতনা। সমাজবোধ জাগ্রত করিতে পারিলেই আমাদের হীন দলাদলি ও মানসিক সংকীর্ণতা মুছিয়া যাইবে, ঐক্যের ভিত্তিতে কাজ করা সহজ হইবে। পল্লীর উন্নতি ব্যতীত বাঙালির কোনো উন্নতিই যে সম্ভব নয় একথা আমাদিগকে যথার্থ ই উপলব্ধি করিতে হইবে।

বাঙালির বেকারসমস্যা

বেকারসমস্যা এ যুগের বাঙালির কাছে নূতন-কিছুই নয়। যতই দিন যাইতেছে, তাহার আর্থিক সংকট প্রবলতর হইয়া দেখা দিয়েছে। বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস বিশ্লেষ করিলে দেখা যাইবে, বাঙালি ক্রমশই আর্থনীতিক অবনতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার শিল্প নাই, ব্যবসায় নাই; এদেশে কৃষিও অত্যন্ত

অনগ্রসর। যে-কুটীরশিল্প ও কৃষিকে অবলম্বন করিয়া বাঙালি তাহার আর্থিক জীবন অতিবাহিত করিত, নানাকারণে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইংরেজশাসন আমাদের কুটীরশিল্প ধ্বংস করিয়াছে। বিদেশের যন্ত্রোৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগিতার মুখে পড়িয়া এদেশের শিল্প দাঁড়াইতে পারে নাই। অন্যদিকে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইত্যাদি ভূমিপ্রথার প্রবর্তনহেতু বাঙলার কৃষকসম্প্রদায়ের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইতোমধ্যে আমাদের দেশে যদি নানারকমের শিল্প গড়িয়া উঠিত, আমরা যদি ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্থান করিয়া লইতে পারিতাম তবে কৃষির উপর একান্ত নির্ভরশীলতা অনেকটা কমিয়া যাইত। কিন্তু বাঙালির ব্যবসায় বিমুখতা ইহার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই, কৃষক-বাঙালি শ্রমিক-বাঙালিতে পরিণত হইয়াছে, শ্রমিক-বাঙালি আজ বাধ্য হইয়াই নিঃস্ব বেকার শ্রমিকের জীবনযাপন করিতেছে।

বাঙলাদেশে আরো এক শ্রেণীর মানুষ আছে, ইহারা হইতেছে মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়। ইহাদের তেমন কোন ভূসম্পত্তি নাই, স্থায়ী আয়ের কোনো ব্যবস্থা নাই—সরকারী দপ্তরে, সওদাগরী আপিসে চাকরিকেই একমাত্র পেশা করিয়া ইহারা জীবন অতিবাহিত করে। ইংরেজরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। কিছুটা ইংরেজিশিক্ষা পাইয়া মাসান্তে নির্দিষ্ট বেতনের চাকরিতে ঢুকিয়া পড়াই বাঙলার মধ্যবিত্তশ্রেণী নিজেদের আত্যন্তিক আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলিয়া জানে। আবার, ইহাদের মধ্যে অনেকে ডাক্তারী, ওকালতি প্রভৃতি উচ্চশিক্ষামূলক বৃত্তির ক্ষেত্রেও নামিয়া পড়িয়াছে।

আপিসের চাকরি একদিন সুলভ ছিল, উচ্চতর পেশায় একসময় বর্তমানের মতো এতখানি মারাত্মক প্রতিযোগিতা ছিল না। তাই, বাঙলার মধ্যবিত্তসম্প্রদায় অতীত দিনে বেশ সহজ-স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করিয়াছে। কিন্তু আজ যুগের পরিবর্তন হইয়াছে—সরকারি দপ্তরে, অবাঙালি আপিসে, বিবিধ পেশার ক্ষেত্রে, অভাবনীয় প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় যে মর্মান্তিক পরাজয় উহার হাত হইতে আত্মরক্ষার কোনো পথ আজ তাহারা খুঁজিয়া পাইতেছে না। সাম্প্রতিককালে বাঙালিজাতির মুখে একটা করুণ অসহায়তার ভাব ক্রমশ ফুটিয়া উঠিতেছে। তা ছাড়া, বঙ্গবিভাগের ভয়াবহ পরিণামহেতু আমাদের বেকারসমস্যার জটিলতা প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে—বহুতর-অভাব কবলিত বাঙালির সম্মুখে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া আজ সুস্পষ্ট।

বাঙালিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই বিরাট সমস্যার আশুসমাধান করিতেই হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকার আমাদিগকে অবিরত নানা পরিকল্পনার কথা শুনাইতেছেন, কিন্তু তাহার কোনোটাই অদ্যাবধি বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। সুতরাং বর্তমানে সরকারের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না। আজ আমাদিকে পরমুখাপেক্ষিতার মনোভাব বর্জন করিতে হইবে—আশ্রয় লইতে হইবে আত্মশক্তির, নিজেদের সংগঠনশক্তির। ইংরেজিশিক্ষালাভ

করিয়া চাকরিজীবন অবলম্বনের সর্বনাশা মোহ বাঙালিকে কাটাইয়া উঠিতে হইবে, শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি তাহাকে দৃষ্টি দিতে হইবে। এই পথ ছাড়া বেকার-সমস্যার ভীষণতা হইতে পরিত্রাণলাভের অন্যকোনো উপায় নাই।

কর্মহীন শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিতসম্প্রদায় আমাদের বেকারসমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রহিয়াছে বাঙলার অগণিত কৃষকদল, যাহারা বছরের সামান্য কয়েকটি মাস মাত্র কৃষিকার্যে রত থাকে, বাকি কয়টি মাস অলস বেকারজীবন যাপন করে। অবশ্য এইসব কৃষকদের সমস্যা সাময়িক। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির প্রশ্নই সবচেয়ে গুরুতর। তাহারা শ্রমশিল্পে ও কৃষিকার্যে অনভ্যস্ত, চাকরিকেই একমাত্র সম্বল বলিয়া জানে, অথচ কোথাও তাহাদের চাকরি আজ মিলিতেছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এদেশে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, এতখানি উচ্চশিক্ষা পাইয়াও শিক্ষিতসম্প্রদায় নিজেদের জীবিকার্জন করিতে পারিতেছে না। চাকরির দ্বারা বেকারসমস্যা সমাধানের সুযোগ যে খুব কম তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। অগণিত দেশবাসীর মধ্যে যদি মাত্র কয়েক সহস্র বাঙালি সরকারি আপিসে কিংবা অবাঙালির ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানে চাকরি পায় তাহাতে এতবড় সমস্যার সমাধান হইতে পারে কীরূপে? সেজন্য চাকরির নিঝঞ্ঝাট স্বর্ণদ্বারের দিকে না তাকাইয়া আমাদিগকে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে।

কৃষি ও শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যকে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যেকটি সমৃদ্ধ জাতির আর্থিক জীবন আবর্তিত হইতেছে। কিন্তু কৃষির প্রতি আমাদের দৃষ্টি নাই বলিলেও চলে, যদিও প্রাচীনকাল হইতে কৃষির জন্য বাঙলাদেশ তথা ভারতবর্ষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। বিজাতীয় শিক্ষাবৈগুণ্যে কেবল চাকরিকেই আমরা কল্পতরু ভাবিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু বিগত পঞ্চাশের ভয়াবহ মন্বন্তর আমাদের সকল মোহ ভাঙিয়া দিয়াছে। দেশের সোনার ধানের মূল্য চাকরিজীবিরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছে। কৃষির পুনর্গঠনের কথাটি তাই আজ নানামহলে আমরা শুনিতে পাইতেছি। আমাদের কর্তব্য হইল বর্তমানে শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে কৃষির প্রতি মনোযোগী করিয়া তোলা, তাহাদের মধ্যে কিছু জমিবণ্টন করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা। উপযুক্ত শিক্ষা ও উদ্যম থাকিলে তাহারা সহজেই উন্নত ধরণের কৃষিকার্য চালাইতে পারিবে। আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, এদেশের শতকরা পঁচাত্তর জন লোকের জীবিকার প্রধান উপায় হইল কৃষি। কৃষিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য ও গুটিপোকার চাষ, হাঁস-মুরগী-পালন এবং দুগ্ধজাত বিবিধ দ্রব্য উৎপাদনের শিক্ষা প্রবর্তন করা কর্তব্য। ইহার দ্বারা দেশের বহু বেকার লোকের কর্মহীনতা দূর হইতে পারে।

দেশে বিবিধ শিল্পপ্রসারের প্রতিও আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রথমেই আমরা বলিতে পারি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও কুটীরশিল্পের পুনরুদ্ধার-সাধন করিতে পারিলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং সাময়িকভাবে বেকার কৃষকদের অর্থ

উপার্জনের পথটি কিছুটা প্রশস্ত হইয়া উঠিবে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটি শিল্পকমিটি মন্তব্য করিয়াছিলেন: 'Small scale industries should be encouraged so that it might absorb young men'। আমাদের শিক্ষায়তনে এইসব ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটীরশিল্প সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষার দুয়ারটি খুলিয়া দিতে হইবে।

য়ুরোপের প্রত্যেকটি শিল্পোন্নত দেশে বৃত্তিশিক্ষা বিশেষ করিয়া কারিগরী শিক্ষার জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখা যায়। আমাদের দেশেও শিল্পজাগরণ আনিতে হইলে সুনিপুণ কারিগর, তীক্ষ্ণধী পরিচালকবর্গ এবং শিল্পগবেষণাকারীর প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইতে হইলে পুঁথিগত শিক্ষার পাশে ছাত্রদিগকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন্ ছাত্র কোন্ বিষয়ে শিক্ষা পাইলে বাস্তবজীবনে সফলতা অর্জনে সমর্থ হইবে তাহার নির্দেশদানের প্রধান দায়িত্ব আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির। যাঁহারা শিল্পে লোক নিযুক্ত করেন, বর্তমানে একটি নিয়োগকর্মটি স্থাপন করিয়া তাঁহাদের সঙ্গেও যোগাযোগরক্ষা করা যাইতে পারে। দেশকে শিল্পের ক্ষেত্রে, ব্যবসায়বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নত করিতে হইলে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির আদর্শে শিক্ষাব্যবস্থার মোড়টিও বর্তমানে আমাদিগকে ঘুরাইয়া দিতে হইবে।

অবশ্য ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শুধু বৃত্তিশিক্ষালাভ করিলেই বেকারসমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হইবে না। দেশে শিল্পের ক্ষেত্রটিকেও সঙ্গে সঙ্গে প্রশস্ততর করিয়া তুলিতে হইবে; সরকারকে এবং দেশীয় শিল্পপতিগণকে শিল্পপ্রসারের দিকে মনোযোগী হইতে হইবে। রাজ্যসরকার আর্থিক সহায়তার দ্বারা দেশীয় শিল্পের উন্নয়নে সাহায্য করিতে পারেন। ক্রমবর্ধমান বেকারসমস্যার ভয়াবহতাবিষয়ে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছুটা সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতের পরিকল্পনাকমিশনের সুপারিশ অনুসারে এই সমস্যাটির সমাধানকল্পে পশ্চিমবঙ্গসরকার একটি পরিকল্পনা কার্যকরী করার কথা বিবেচনা করিতেছেন।

আমরা যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তন আনিতে পারি, সংঘশক্তিকে যদি জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারি, দেশবাসী যদি সরকারের সক্রিয় সহায়তা পায় তবে এই জটিল বেকারসমস্যার অনেকখানি সমাধান হইতে পারে। কর্মহীনতার জন্যই প্রতিদিন জনশক্তির অপচয় ঘটিতেছে। এই অপচয় এবং তজ্জনিত বহু দুর্গতি হইতে জাতিকে বাঁচাইবার একটি পথ আমাদিগকে যে-কোনপ্রকারেই হোক আবিষ্কার করিতে হইবে। তবেই বাঙালি বাঁচিবে, নতুবা জীবনসংগ্রামে তাহার ধ্বংস অনিবার্য।

ব্যবসায়-বাণিজ্যিক শিক্ষার মূল্য

আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় ভারতবর্ষকে যখন দেখি তখন চোখে পড়ে এদেশের শোচনীয় আর্থনীতিক অসচ্ছলতা, দেশবাসীর অভাবনীয় দারিদ্র্য। বিপুল জনশক্তি ও অমেয় প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হয়েও ভারত আজ পৃথিবীর শিল্পবাণিজ্যসমৃদ্ধ অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমতারক্ষা করে চলতে একরূপ অসমর্থ। ফলে ভারতবাসীর আর্থিক জীবনে নিদারুণ বিপর্যয় ঘটছে, বাস্তব ক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব আজ বিপন্ন হয়ে উঠেছে! কী শোচনীয় একটি অবস্থা।

এ সত্যটি কারো অজানা নয় যে, যুগোপযোগী শিক্ষাই জাতির সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার নিয়ামক। এ জাতিকে দেয় পথচলার নির্দেশ। সমগ্র দেশের বহুমুখী উন্নতি ও সার্বিক কল্যাণ নির্ভর করে সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। শিক্ষার উপযোগিতা বিবিধ। এ একদিকে যেমন মানুষের অজ্ঞানতা ঘুচায়, তার সুপ্ত মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করে, অন্যদিকে তেমনি, মানুষকে জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার উপযোগী করে তুলে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভে সহায়তা করে।

কিন্তু এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এই লক্ষ্যমুখে আমাদের কতখানি পরিচালিত করেছে? আমরা শিক্ষাজীবনের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের কতখানি সমন্বয় ঘটাতে সমর্থ হয়েছি? বিচারবিশ্লেষণ করিলে দেখা যাবে, এ প্রশ্নের উত্তর একেবারেই নিরাশাব্যঞ্জক। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি পুঁথিঘেঁষা বিদ্যার প্রতি সন্নিবদ্ধ, এর সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোনো সংযোগ নেই। ফলে বর্তমানে আমরা আর্থিক জগতের ক্ষেত্র হতে দূরে সরে এসে ভাবজগতের অধিবাসী হয়ে উঠেছি। চলতি দুনিয়ার কেনাবেচার হাটের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে না পারলে বর্তমান পৃথিবীতে কারো টিকে থাকবার উপায় নেই। এ সত্যটি সম্যক্ উপলব্ধি করতে না পারার জন্যেই বাঙালির আর্থিক দুর্গতি আজ চরমে পৌঁছেছে। ব্যবসায়বাণিজ্যে বাঙালি সকলেরই পিছনে পড়ে রয়েছে, দেশে দিন দিন বেড়ে চলেছে উৎকট বেকারসমস্যা, চতুর্দিকে প্রকট হয়ে উঠেছে নিদারুণ অন্নাভাব—বস্ত্রাভাব। বেঁচে থাকবার কৌশলই যদি না শিখলাম তবে আমাদের এ শিক্ষার মূল্য কী?

সুদীর্ঘকালের রাজনীতিক পরাধীনতা আমাদের আর্থনীতিক পরাধীনতাকে ডেকে এনেছে, এ যেমন সত্য, তেমনি, ভাবসর্বস্ব বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বাঙালিকে মসিজীবী দাসজাতিতে পরিণত করেছে, এও ততোধিক সত্য। জাতির অবমাননাসূচক ও বেদনাদায়ক এই পরিস্থিতি হতে পরিত্রাণলাভের পথ আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে দৈন্য গোটা জাতির মৃত্যুর পথই উন্মুক্ত করে মাত্র। আমাদের জনবলের অভাব নেই, শ্রমশক্তির অভাব নেই, কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের অপ্রাচুর্য নেই। তথাপি দেশবাসীর দারিদ্র্য ঘুচছে না।

এই অবাঞ্ছিত পরিবেশ হতে মুক্তি পাবার উপায় দেশে ব্যবসাবাণিজ্যমূলক শিক্ষার প্রবর্তন। শিক্ষাজীবনের সঙ্গে ব্যবসায়িক জীবনের, উচ্চতর জ্ঞানসাধনার সঙ্গে কর্মসাধনার যে-সামঞ্জস্য পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে দেখতে পাই, আমরাও যদি তা করতে পারি তবে আমাদের আর্থিক দুর্গতি ঘুচতে বাধ্য। দেশের দারিদ্র্য-মোচন করতে হলে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়ে বাঙালিকে বাণিজ্যজগতে প্রবেশ করতে হবে। এত দুঃখলাঞ্ছনার মধ্যে থেকে যদি আমরা বুঝতে না শিখি যে, বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান, তাহলে লক্ষ্মীছাড়ার পুঞ্জীভূত গ্লানি নিয়েই আমাদের সকলকে দিনাতিপাত করতে হবে।

জীবনে যে-কোন ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সাফল্যলাভের জন্যে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। বণিকবৃত্তি যে অবলম্বন করবে তার জন্যে চাই উপযুক্ত বাণিজ্যিক শিক্ষা—ব্যবসায়-বাণিজ্য-সংস্কারের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা। সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী কারো কাছে সেধে ধরা দেন না, শিক্ষা ও সাধনার মূল্যেই তিনি লভ্য।

এমন একদিন ছিল যখন আমরা পণ্যের বিনিময়ে পণ্য পেতাম, এক সামগ্রীর বদলে আর-একটি সামগ্রী সংগ্রহ করতাম। এ হল বাণিজ্যের শৈশবযুগের কথা। কিন্তু সেই যুগটি এখন আমাদের কাছ থেকে বহুদূরে সরে গেছে—সে-যুগ আর এ-যুগের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। কেনাবেচার ক্ষেত্রটি এখন দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত, আজকের বাণিজ্য জগৎজোড়া। এইজন্যেই ব্যবসায়বাণিজ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি বর্তমানে দিন দিন জটিল রূপ ধারণ করেছে। এর প্রকৃতির সম্যক্ ধারণা ব্যতীত কেহই এ ক্ষেত্রে যথার্থ সফলতা অর্জনের আশা-করতে পারে না। সুতরাং ব্যবসায়বাণিজ্যে সত্যিই যারা সফলতাকামী তাদের জন্যে বাণিজ্যিকশিক্ষা অত্যাবশ্যক।

পণ্যউৎপাদন, পণ্যের কেনাবেচা নিয়েই ব্যবসায়বাণিজ্যের কারবার। সুতরাং এক্ষেত্রে যারা পদক্ষেপ করবে তাদের দেশবিদেশের বাজার, মুদ্রানীতি, অর্থনীতি ইত্যাদির সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হতে হবে; জেনে নিতে হবে ব্যবসায়িক আইনকানুন, কোম্পানীর সংগঠন-পরিচালন-পদ্ধতি, ব্যাঙ্কের লেনদেনবিষয়ক কার্যকলাপ এবং আরো নানাকিছু। দেশে কতরকমের আর্থিক সমস্যা প্রতিনিয়ত আত্মপ্রকাশ করছে। কখনো পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়ছে, কখনো কমছে; কখনো দেখা দিচ্ছে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে অসামঞ্জস্য; কখনো দেখছি ঘাটতি-বাড়তির মধ্যে সমতা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না; কোনো দেশে কাঁচামালের প্রাচুর্য, কিন্তু তার শিল্পসম্পদের অভাব; আবার, কোনো দেশ শিল্পোন্নত অথচ তাকে কাঁচামাল আমদানী করতে হয় বার থেকে; পণ্যের আমদানী-রপ্তানীর মধ্যেও কতরকমের জটিলতা। বুঝা যাচ্ছে—ব্যবসায়ে নামব, বাণিজ্য করব—শুধু এই সাধু সংকল্পটিই যথেষ্ট নয়, বাণিজ্যিক সফলতা বিশেষরকমের জ্ঞানবুদ্ধির ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। কেবল মূলধন থাকলেও সাফল্য মেলে না, এর জন্যে শিক্ষার প্রয়োজন, অভিজ্ঞতার প্রয়োজন—বাণিজ্যের ব্যবহারিক ও তত্ত্বগত দিক,

উভয়ের সঙ্গে পরিচয় থাকা প্রয়োজন। এদের বাদ দিয়ে ব্যবসায়বাণিজ্যে নামতে যাওয়া মূঢ়তামাত্র।

এই বাণিজ্যশিক্ষা আমাদের নেই বললেই চলে। এর উপযোগিতা-বিষয়ে আমরা এতকাল অন্ধ ছিলাম বলেই দেশে আজ বাণিজ্যিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমন অভাব। শ্রমের মর্যাদা আমরা বুঝি না, সেজন্যে সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমাদের প্রতি আজ এতখানি বিরূপ। নির্দিষ্ট আয়ের চাকরির মোহ, ভাবসর্বস্ব কেতাবী বিদ্যা আমাদের শ্রমবিমুখ করে তুলেছে। স্বাধীন ব্যবসায়ে নেমে জীবিকা অর্জন করার চেয়ে কেরাণীগিরির দাসত্বকে আমরা বরণীয় বলে মনে করি। দাসমনোভাব আমাদের একেবারে মজ্জাগত হয়ে গেছে, তাই, বাঙালির আজ এহেন জাতিগত অধঃপতন।

সমাজজীবনে সর্বতোভাবে স্বাধীন মানুষ হয়ে উঠতে হলে আমাদের মসিজীবীর নিশ্চিন্ত জীবনের মোহ কাটাতে হবে, আরামপ্রিয়তা বর্জন করতে হবে, জগৎজোড়া বাণিজ্যের হাটে নিজের অধিকার স্থাপন করতে হবে। হাতের কাছে রত্নের খনি থাকা সত্ত্বেও বাঙালির আজ হতশ্রী ভিখারীর অবস্থা, কাচের মূল্যে কাঞ্চন বিকিয়ে দিতে আমরা এতটুকু দ্বিধাবোধ করি না।

জাতীয় জীবনের এই অসহনীয় দুর্গতি হতে আমাদের মুক্তি দিতে পারে বাণিজ্যশিক্ষা। দেশে এজাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রসার ঘটলে তরুণসম্প্রদায়ের দৃষ্টির অস্বচ্ছতা দূর হবে, তারা নিজের দেশকে চিনবে, আত্মসংবিৎ ফিরে পাবে। বুঝবে, দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলবার উপকরণের অভাব আমাদের নেই—অভাব শুধু বাণিজ্যমুখী মনোবৃত্তির, শ্রমের মর্যাদাবোধের, সাধু সংকল্পের, সর্বোপরি—আধুনিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থার।

এতকাল ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল বলে পরজাতির শোষণবৃত্তি প্রতিরোধ করে দেশের দারিদ্র্য আমরা ঘুচাতে পারি নি। কিন্তু দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে, সুতরাং বহিঃশক্তির প্রতিকূল প্রভাব হতে আমরা অনেকটা মুক্ত। দীর্ঘকালের মানসিক জড়তা কাটিয়ে উঠে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমানে সকলকে দেশের আর্থনীতিক প্রগতির প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করতে হবে। আর্থনীতিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে রাজনীতিক স্বাধীনতা নিরর্থক।

শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি আমরা যুগোপযোগী করে তুলতে পারি, ব্যবসায় ও বাণিজ্যমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি দেশের সর্বত্র গড়ে ওঠে তাহলে আমাদের আর্থিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

নারীশিক্ষা

নারীশিক্ষা এদেশের প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত। বৈদিক যুগ থেকে আজকের বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নারীশিক্ষার ধারাটি প্রবহমাণ। প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। শিক্ষালাভের পথে তার বিশেষ কোনো বাধা ছিল না। পুরুষ তাকে সম্মান দিয়েছে, জ্ঞানচর্চার সুযোগ দিয়েছে, তার আত্মবিকাশের পথে তেমন বাধাসৃষ্টি হয় নি। মনুর যুগে কিন্তু আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটে। তাঁর রচিত নতুন বিধি প্রচারিত হওয়ার পর সমাজে নারীর স্থান অনেকখানি সংকীর্ণ হয়ে আসে, ফলে তার বিদ্যাচর্চার সুযোগ কমে যায়। বৌদ্ধযুগে নারীশিক্ষার ধারাটি সংকীর্ণ হলেও নানা মঠে শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুর পাশে বিদুষী ভিক্ষুণী বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করেছে। মুসলমানযুগে পর্দাপ্রথার জন্যে বয়স্কা নারীরা গৃহের বাইরে এসে বিদ্যার্জনের সুযোগ পায়নি।

এদেশে য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা প্রচারিত হবার পর আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় ও জীবনাদর্শে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। নারীর জীবনধারাও এতে প্রভাবিত হয়েছে। আমাদের সমাজে নারীর গতিবিধির গণ্ডী এখন পূর্বাপেক্ষা প্রশস্ততর—যুগপ্রভাবকে সমাজপতিরা অস্বীকার করতে পারেন নি। অবশ্য নারীশিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা আজ দেশে দেখা যাচ্ছে একথা বললে ভুল হবে। তবে তাদের শিক্ষালাভের বাধা যে অনেকখানি বিদূরিত হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হতে এদেশে নারীশিক্ষা-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এর ফলে আধুনিক নারীশিক্ষার যে বীজ অঙ্কুরিত হল, অধুনা তা পরিপুষ্ট বৃক্ষের আকারে শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হয়ে উঠছে।

পুরুষের মতো নারীরও যে শিক্ষালাভের অধিকার আছে, এ অস্বীকার করবার উপায় নেই। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে নারীপুরুষ উভয়েরই শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এই সহজ সত্যটির বিষয়ে আমরা তেমন সচেতন ছিলাম না বলে এদেশের নারীজাতি বহুকাল ধরে উপযুক্ত শিক্ষার আলোক হতে বঞ্চিত ছিল। তারা পাঠশালায় প্রাথমিক স্তরের সামান্য শিক্ষালাভ করবার যে সুযোগ কোনো কোনো স্থলে পেয়েছে তা চিত্তবৃত্তির পূর্ণায়ত বিকাশের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। সেজন্যে দেশের অধিকাংশ নারীই কুসংস্কার ও অজ্ঞানতাকে পাথেয় করে জীবনের পথে যাত্রা সুরু করতে বাধ্য হয়েছে। তাতে সমাজের কল্যাণসাধিত হয় নি, নারীর অজ্ঞানতা আমাদের পারিবারিক জীবনে অনেক দুষ্টক্ষতের সৃষ্টি করেছে।

নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে আছে সে-কথা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু বর্তমানে সমস্যা দাঁড়িয়েছে মেয়েদের শিক্ষার বিস্তারসাধন ও প্রকৃতি নিয়ে। প্রথমে

দেশের নারীশিক্ষানিকেতনের কথাই ধরা যাক। গ্রামের পাঠশালায় এদেশের মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষার কিছুটা সুযোগ পেয়ে থাকে। কিন্তু সম্যকরূপে চিত্তোন্মেষের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা মোটেই যথেষ্ট নয়। প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথে যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন, অন্তত মাধ্যমিক স্তরাবধি শিক্ষা না পেলে, বালকবালিকারা তা অর্জন করতে পারে না। অথচ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা এখনো বাঙলাদেশে তেমন প্রসারলাভ করে নি। ছেলেদের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা ঘটেছে বটে, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর।

আমাদের শহরগুলিতে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলের চেয়ে কিছুটা ভালো। কিন্তু দরিদ্র দেশের কয়জন লোক ছেলেমেয়েকে শহরে পাঠিয়ে তাদের শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যয়ভার বহন করতে সমর্থ? একারণে কত কত মেয়ে শিক্ষার আলোক হতে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ নির্মমতা শুধু পরাধীন দেশেই সম্ভব। পল্লীগ্রামে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হলে সরকারি অর্থ সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। শহরাঞ্চলেও অধিকতর নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে।

আমাদের বড়ো সমস্যা নারীশিক্ষার প্রকৃতি নিয়ে। এদেশে দীর্ঘকাল ধরে নারী ও পুরুষের শিক্ষাপদ্ধতি একই পুরাতন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। প্রত্যেক দেশেই নারীর জীবনাদর্শের লক্ষণীয় বিশিষ্টতা রয়েছে। এই বিশিষ্টতাকে কেন্দ্র করে তাদের কর্মধারা আবর্তিত হয়ে থাকে। বাঙলাদেশে তথা ভারতবর্ষে নারীর বিশিষ্ট স্থান পরিবারের কেন্দ্রস্থলে। সন্তানসন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ, গৃহের শৃঙ্খলা ইত্যাদি সবকিছুই নারীর ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। নারীই এদেশে গৃহের কর্ত্রী, পরিবারে তার বিপুলা শক্তি অলক্ষ্যভাবে বিরাজ করে। পুরুষের কর্মজীবন বাইরে প্রসারিত। এই ঘর এবং বাহিরকে নিয়েই আমাদের সামাজিক সুখশান্তির প্রাত্যহিক আবর্তনের ধারাটি ক্রিয়াশীল। নারী ও পুরুষের জীবনবিকাশের ক্ষেত্র বিভিন্ন বলে উভয়ের শিক্ষাপদ্ধতির পার্থক্যের কথাটি আপনা থেকেই এসে পড়ে। অথচ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নারীপুরুষের শিক্ষাদর্শের মধ্যে কোনো পার্থক্য লক্ষিত হয় না। একই আদর্শে উভয়ের শিক্ষাপদ্ধতি বিবর্তিত হচ্ছে বলে বর্তমানে আমাদের সমাজে নানা অকল্যাণ প্রকট হয়ে উঠেছে।

দেড়শত বছরের বিজাতীয় ইংরেজিশিক্ষার হিসাব-নিকাশ করে আজ আমরা দেখছি এ শিক্ষা এদেশের পুরুষের জীবনেও তেমন ফলপ্রসূ হয়নি—আমাদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলেনি, জাতির জীবনে এ দুরারোগ্য পক্ষাঘাত সৃষ্টি করেছে। নারীদের সম্মুখেও যদি আমরা এই নিরর্থক শিক্ষার আদর্শ তুলে ধরি তাহলে পুরুষের মতো নারীর জীবনও বিড়ম্বনায় ভরে উঠবে। সুতরাং এ সমস্যাটি সত্যই জটিল।

যে-শিক্ষাব্যবস্থা অধুনা দেশে প্রচলিত হয়েছে, ওতে শিক্ষিত হয়ে

স্বাধীনভাবে জীবিকার সংস্থান করা বর্তমানে নারীর পক্ষে নানা কারণে দুঃসাধ্য বলেই মনে হয়। পুরুষের বেকারসমস্যা যেখানে এত ব্যাপক সেখানে নারীসম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতির পথটি খুঁজে বার করা যে কঠিন তা হয়তো অনেকে ভেবে দেখেন না। বাইরে নারীর কর্মস্থলটি কত সংকীর্ণ! শহরের কয়েকটি আপিসে ও মুষ্টিমেয় বিদ্যালয়ে অর্থোপার্জন-বিষয়ক ভাগবাঁটোয়ারা করে. সমাজে নারী আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারবে কিনা সে কথাটি আমাদের বিচার্য। যে-শিক্ষা আমাদের চরিত্র সুন্দর করে গড়ে তুলবে, যা আমাদের আর্থিক সচ্ছলতা এনে দেবে, চিত্তের কুসংস্কার দূর করবে, এবং সর্বোপরি মনুষ্যত্বের সন্ধান দেবে, সেরূপ শিক্ষাবিধি প্রবর্তনের পথটি যাতে প্রশস্ত হয় তার আশুব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় শিক্ষাপ্রবর্তনের ফলে পুরুষের আর্থিক অবস্থা উন্নততর হলে আমাদের নারীসম্প্রদায় বাইরের জগতে জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। আর্থিক অসচ্ছলতাই আমাদের সকল দুর্গতির মূলীভূত কারণ।

সমাজে নারীপুরুষ উভয়েরই স্থানটি নির্দেশ করে নিতে হবে দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারাটি অনুসরণ করে। বাইরের কর্মজগতে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা না করে বাঙ্‌লার পারিবারিক স্বাস্থ্য ও বাঙালির জাতীয় আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখবার শিক্ষাটি নারীকে লাভ করতে হবে। সেজন্যে আবশ্যক এদেশের নারীশিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপক সংস্কারসাধন। আমাদের নতুন করে পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করতে হবে, পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষাপদ্ধতির রূপান্তরসাধন করতে হবে, বিবিধ গৃহকেন্দ্রিক বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সূচীশিল্প, রন্ধনশিল্প, গার্হস্থ্য-স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, শিশুমনস্তত্ত্ব, সাধারণ গণিত, ইংরেজি ভাষা, বাঙলা সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস এবং এর সঙ্গে কিছুটা সংগীত নারীদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সকল শিক্ষাবিদ্‌ই আজ চিন্তা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ও এবিষয়ে কিছুটা সচেতন হয়ে উঠেছে। বিশেষপ্রতিভাসম্পন্ন নারী ও পুরুষ সর্বদেশেই বিরল—উচ্চশিক্ষার পথটি তাদের জন্যে অবশ্যই খোলা রাখতে হবে।

উপযুক্ত কন্যা, উপযুক্ত পত্নী, উপযুক্ত মাতার সৃষ্টি করাই বর্তমানে প্রত্যেক অগ্রসর রাষ্ট্রে শিক্ষার প্রধান লক্ষণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এদেশের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি নারীজাতির আত্মবিকাশের পরিপন্থী। এতে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আদর্শহীন, লক্ষ্যহীন পথে চলে জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করবার সময় আজ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। শিক্ষার বিলাস আমাদের বর্জন করতে হবে। বাঙালিকে যদি পরিপূর্ণরূপে বাঁচতে শিখতে হয় তবে নারী ও পুরুষের উপযোগী শিক্ষার পথটি বিস্তীর্ণ করে তুলবার পন্থা খুঁজে নিতে হবে। তা যদি না হয় তবে আলেয়াকেই আমরা আলো বলে ভুল করব, এবং এতেই ঘটবে বাঙালির অপমৃত্যু।

যারা সাতপুরুষের ভিটেমাটি হারালো

বহুকালের মুক্তিসংগ্রাম আর বহু বৈঠকী রাজনীতিক আলাপ-অলোচনার পর ভারতবাসীর তার সুচিরবাঞ্ছিত স্বাধীনতা পেল বটে, কিন্তু সেই নবলব্ধ স্বাধীনতাকে কলঙ্কিত করল হিন্দুমুসলমানের আত্মঘাতী অমানবীয় সাম্প্রদায়িকতার তিক্ততা। ফলে এতকালের অখণ্ড ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল—সৃষ্টি হল পাকিস্তান ডোমিনিয়ন ও ভারতযুক্তরাষ্ট্রের। সাম্প্রদায়িকতা যে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার শত্রু এ সত্যটি অনেকে উপলব্ধি করলেও, কল্পিত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগের সর্বনাশা প্রচেষ্টাকে তখন অবস্থাগতিকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। ভারতের স্বাধীনতাকামী নেতারা প্রভুত্বস্পৃহার মূঢ় উন্মাদনায় সেদিন বুঝতে চাননি কিংবা বুঝতে পারেননি এই ভারতবিভাগের পরিণাম কতখানি শোচনীয় হবে, কী অবর্ণনীয় দুর্দশালাঞ্ছনার অতলগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুরা এবং অপরাপর অমুসলমানসম্প্রদায়ের নিঃসহায় লক্ষ লক্ষ মানুষ।

ভারতের অঙ্গচ্ছেদের মতো এমন অকল্যাণকর ব্যাপার আর কী হতে পারে। আমাদের নেতৃবর্গ সেদিন যে ধর্মবুদ্ধি ও বাস্তববুদ্ধির ক্ষেত্রে একরূপ দেউলিয়া সেজে বসেছিলেন এতে কি এতটুকু সন্দেহ আছে? ইংরেজের ন্যায় রাজাগিরি তাঁরা চেয়েছিলেন, এবং তা পেয়েছেনও বটে। কিন্তু তার জন্যে পাকিস্তানবাসী হিন্দুদের দিতে হচ্ছে মহামূল্য। ওই রাষ্ট্রে অনবরতই নরমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, তার আহুতি হল তথাকার অগণন হিন্দু নারীর প্রাণবলি। হিন্দুর জীবননাশ, ইজ্জতনাশ, সম্পত্তিনাশ, বাস্তুনাশ প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনার রূপ নিয়েছে। দেশবিভাগ আমাদের রাষ্ট্রিক সর্বনাশ ডেকে এনেছে। অত্যন্ত পরিতাপের কথা হল, নিজেদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় আমরা নিজেরাই স্বাক্ষর দিয়েছি। ব্রিটিশের কূটনীতিকে জয়যুক্ত করেছেন ভারতবর্ষের দেশনেতাগণ। পাঞ্জাব ও বঙ্গব্যবচ্ছেদ ভারতবিভাগেরই স্বাভাবিক পরিণতি। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির ফলে দেশে আজ দেখা দিয়েছে জটিল আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা বা বাস্তুহারা সমস্যা।

ইংরেজশাসকবর্গ ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার প্রাক্কালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভয়াবহ দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়। তারপর প্রবল উত্তেজনার মধ্যে ভারতভূমি বিভক্ত হয়ে গেল। সেদিন অনেকে হয়তো ভেবেছিলেন, হিন্দুমুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলে সাম্প্রদায়িক কলহের অবসান ঘটবে। কিন্তু সে-ধারণা যে কতখানি ভুল তা উপলব্ধি করতে দেরী হল না।

পাঞ্জাব বিভক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওই প্রদেশের পশ্চিমঅঞ্চলে শুরু হল সাম্প্রদায়িক হানাহানির তাণ্ডব লীলা। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও দেখতে দেখতে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। এই উন্মত্ত জিঘাংসার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল পূর্বপাঞ্জাবে ও দিল্লীতে। সেখানকার মুসলমানদের বিপর্যস্ত

করে হিন্দুরা প্রতিশোধ নিল। এহেন ভয়ংকর দুর্যোগমুহূর্তে কোনোপ্রকার আত্মরক্ষার জন্যে পশ্চিমপাঞ্জাবের হিন্দুশিখরা পূর্বপাঞ্জাবে এবং পূর্বপাঞ্জাবের মুসলমানরা পশ্চিমপাঞ্জাবে চলে আসতে ব্যাকুল হয়ে উঠল। পাকিস্তান ও ভারত সরকার নিরুপায় হয়ে বাসিন্দাবিনিময়ের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলেন। লক্ষ লক্ষ শিখ ও হিন্দু পশ্চিমপাঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছেড়ে এল; অন্যদিকে, কয়েক লক্ষ মুসলমান দিল্লী ও পূর্বপাঞ্জাব ছেড়ে আসতে বাধ্য হল। অশেষ দুর্ভাবনায় পড়ে সিন্ধুপ্রদেশের হিন্দুগণও দলে দলে ভারতভূমিতে এসে আশ্রয় নিতে লাগল।

সাম্প্রদায়িক বিপর্যয়হেতু বাস্তত্যাগের যে-সূচনা দেখা দিল পশ্চিমভারতে, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল পূর্বভারতে। পাকিস্তানসৃষ্টির পর থেকেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুজাতি নিজেদের বহুকালের বাস্তভিটা ছেড়ে কাতারে কাতারে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয়ভিক্ষা করছে। অনুমান করা যায়, এ পর্যন্ত এক কোটির মতো হিন্দু পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। ভারত ছেড়ে যে-সব মুসলমান পাকিস্তানে চলে গেছে তাদের সংখ্যা তিরিশ-পঁয়ত্রিশ লক্ষের বেশি হবে না। এখনো এক কোটির কাছাকাছি হিন্দু পূর্ববঙ্গে রয়েছে।

বাস্তহারাসমস্যা যে ভারতভাগের ফলেই উদ্ভূত হয়েছে তা কাকেও বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন হয় না। সমস্যাটি মুখ্যত রাজনীতিক। ধর্মভিত্তিক দেশবিভাগের ফলেই পশ্চিমবঙ্গসরকার তথা ভারতসরকারকে শরণার্থীদের সমস্যা নিয়ে আজ এতখানি বিব্রত হতে হচ্ছে। নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ না করলে মানুষ কখনো তার পিতৃপিতামহের বাস্তভিটা ফেলে অনিশ্চিতের পথে পদক্ষেপ করে না। ইংরেজের কূটনীতির কাছে আমরা অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করলাম, ব্যক্তিজীবনে আচরণীয় বস্তু ধর্মকে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার উপরে স্থান দিলাম, সংখ্যাতীত মানুষের অবশ্যম্ভাবী দুর্গতির চিন্তা করলাম না—এত মূল্য দিয়ে কিনলাম দুর্গতিক্লিষ্ট পঙ্গু স্বাধীনতা। তিন হাজার বছরের ভারত-ইতিহাস বলে দিচ্ছে ভারতকে ভাগ করা যায় না। সেই ভাগ করার ফলে কোটি কোটি হিন্দু সম্প্রতি সর্বরিক্ত, তারা হিংস্রব্যাধতাড়িত বনের পশুর ন্যায় আশ্রয়বঞ্চিত হয়ে এখান থেকে ওখানে প্রাণভয়ে ঘুরছে। ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান তাদের কাছে মৃত্যুপুরীতুল্য, সেখানে প্রতিনিয়ত হিন্দুর শ্মশানশয্যা রচিত হচ্ছে। পরিকল্পিত হিন্দুনিধন ও হিন্দুনির্যাতন পাকিস্তানী রাজ্যশাসনের প্রধান একটি কৃত্য হয়ে উঠেছে। তাই, পূর্ববাংলার হিন্দুরা ভারতসীমান্তের এপারে এসে আর্তনাদ করে বলছে: 'দ্বার খোলো, দ্বার খোলো, দ্বার খোলো'। আমরা—ভারতবর্ষের জনগণ—এই ডাকে কতখানি সাড়া দিয়েছি?

ভারতযুক্তরাষ্ট্রের আশ্রয়প্রার্থীসমস্যা বর্তমানে গুরুতর একটি রূপ ধারণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্যাসমাধানের কিছুটা চেষ্টা যে না করেছেন তা নয়। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয় সরকারি তৎপরতায় বা-কিছু

সদ্‌গতি হয়েছে তা পশ্চিমপাঞ্জাবের বাস্তুহারাদের। সেখানে লোকবিনিময়ের ফলে আগন্তুক হিন্দুরা মুসলমানের পরিত্যক্ত বাসস্থানে অনায়াসে আশ্রয় পেয়েছে। তা ছাড়া, তাদের পুনর্বাসনের জন্যে ভারতসরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। কিন্তু পূর্ববাঙলার হতভাগ্য বাস্তুহারাদের জন্যে এরূপ কিছুই করা হয়নি। বাসিন্দাবিনিময়ের কোনো সম্ভাবনাই এখানে নেই। আন্দামান, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি আশ্রয়শিবির নির্মিত হয়েছে। এগুলি কুঁড়েঘর ছাড়া অন্যকিছু নয়। যে সামান্য কয়েক লক্ষ মানুষ এসব শিবিরে স্থান পেয়েছে তাদের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য নেই, রোগের ঔষধপত্র নেই, চাষের যথোপযুক্ত জমি নেই—মৃত্যু ও ব্যাধির সঙ্গে অবিরত তারা সংগ্রাম করে চলেছে। আশ্রয়শিবিরগুলি, এককথায়, মানুষের বাসের অযোগ্য। এ কি বাস্তুহারার পুনর্বাসন, না, দুর্গতের নির্বাসন? বাস্তুহারাসমস্যার সমাধানের এ পন্থা বাস্তব একেবারেই নয়। তাদের পুনর্বসতিস্থাপন বর্তমানে একরূপ প্রহসনে পরিণত হতে চলেছে। এরূপ একটা জটিল পরিস্থিতি সত্যই উদ্বেগজনক।

মৃত্যু ও বিনাশের নরকাগ্নিতে পরিবেষ্টিত হয়েই পূর্ববাঙলার দুরদৃষ্ট হিন্দুরা ভারতে এসে ভিড় করছে, বহুবিধ বাধানিষেধের পাহাড় ঠেলে তারা স্বজাতির কাছে আশ্রয় চাচ্ছে। তাদিগকে নিজের পরিত্যক্ত বাস্তুভিটায় ফিরে যাবার উপদেশ দেওয়া নিরর্থক। পূর্বপাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থী সম্পর্কে বলা যায়, রাজ্যসরকার এবং ভারত-সরকার এসব অসহায় নরনারীর জীবনমরণসমস্যার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি, কিংবা পারলেও, রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হবার কোনো সক্রিয় উদ্যমউদ্যোগ দেখাননি। বাস্তুহারাকে বাস্তু ও বৃত্তিদানের মুখ্য দায়িত্ব যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের, তথাপি ভারতসরকারকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত করবার দায়িত্ব যে পশ্চিমবাঙলা-সরকারের, এ সত্যটি বিস্মৃত হলে চলবে না।

আজ একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সংখ্যালঘু হিন্দুদের পক্ষে মানসম্ভ্রম ও নাগরিকের পূর্ণ মর্যাদা তো দূরের কথা—এমন কি, নিতান্ত প্রাণ বাঁচিয়ে কোনো-রকমে পাকিস্তানে টিকে থাকাও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। দেশভাগকালীন সংখ্যালঘুরক্ষার শর্ত অথবা নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি—সবকিছুই আজ অর্থহীন হয়ে গেছে। বিগত জানুয়ারী মাসে [উনিশ-শ চৌষট্টি সাল] পূর্বপাকিস্তানে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল তাতে পনেরো থেকে কুড়ি হাজার হিন্দুনরনারী প্রাণ হারিয়েছে। এ ছাড়া, হিন্দুর কত যে ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে, কত কত হিন্দুনারী যে ধর্ষিতা ও অপহৃতা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। উনিশ-শ পঞ্চাশ সালে পূর্ব-বাঙলার হিন্দুনিধনের সময় ভারতসরকার 'অন্যপন্থা' গ্রহণের কথা উচ্চারণ করেছিলেন। এবারের হত্যাকাণ্ড পূর্বেকার সকল বীভৎসতাকে অতিক্রম করে গেছে। তথাপি ভারতসরকার একরূপ নিষ্ক্রিয় দর্শকের অভাবনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। দেশভাগের সময়ের পবিত্র প্রতিশ্রুতি তাঁরা সম্পূর্ণ ভুলে বসেছেন। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা ভারতে এলে পশ্চিমবঙ্গরাজ্যসরকার ও ভারতসরকারের

পক্ষে যে প্রকাণ্ড সমস্যার সৃষ্টি হবে তার দিকে তাকিয়েই তাঁরা পূর্ববাঙ্লার সংখ্যালঘু-সমস্যাকে নানা কৌশলে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। এহেন হৃদয়হীনতা, কর্তব্যের গুরুতর অবহেলা, জাতীয় অপরাধ বলেই আমরা মনে করি। লাঞ্ছিত মানবতার প্রতি যারা অন্ধদৃষ্টি, ইতিহাস কি কখনো তাদের ক্ষমা করবে?

বাস্তুহারাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখালো ভারতে আগত এই বিপুল বিপন্ন জনতা একটা ভয়াবহ কাণ্ড বাধিয়ে রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে পর্যন্ত সংকটাপন্ন করে তুলতে পারে। এসকল ছিন্নমূল মানুষগুলো চায় স্থায়ী আশ্রয়, চায় বৃত্তি আর নাগরিক অধিকার, চায় নিরাপদ সমাজজীবন। এতদুদ্দেশ্যে কালবিলম্ব না করে নতুন পরিকল্পনা রচনা করা অতীব প্রয়োজন।

বাঙ্লাদেশে এবং ভারতের অপরাপর রাজ্যে অকর্ষিত জমির অভাব নেই। সেগুলিকে চাষআবাদের ব্যবস্থা করা হলে, বিবিধ শিল্পের সম্প্রসারণ সাধিত হলে বহুসংখ্যক লোকের জীবিকার্জনের পথ প্রশস্ত হয়ে উঠবে। কৃষিঋণ, শিল্পঋণ, কৃষি ও শিল্পের উপকরণ-সরবরাহ ইত্যাদির মাধ্যমে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্বাসন-প্রচেষ্টাকে নিশ্চয়ই কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারেন। নানা জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করেও সরকার উদ্বাস্তুদের নতুন জীবিকার পথ খুলে দিতে পারেন।

বাস্তুহারার দল যদি পুনর্বসতি ও জীবিকাসংগ্রহের সুযোগ পায় তাহলে গলগ্রহ হওয়ার পরিবর্তে অল্পকয়েক বৎসরের মধ্যে তারা ভারতরাষ্ট্রের মস্তবড়ো শক্তির উৎস হয়ে উঠবে। যারা সাতপুরুষের ভিটেমাটি হারালো তাদের ভারতবর্ষের যত্রতত্র অবাঞ্ছিত জঞ্জালের মতো ছড়িয়ে দিলে কিঞ্চিৎ মুস্কিলআসান হয় বটে, কিন্তু এতে বাঙালির জাতীয় জীবন ও বাঙালিসংস্কৃতি ভীষণরকমে বিপর্যস্ত হবে। এই বাঙ্লাদেশে, বাঙালি-জনসমাজের সন্নিকটেই, পূর্ববাঙ্লার বাস্তুহারাদের স্থায়ী বাসস্থান নির্দেশ করা বিধেয়। এদের পেলে বাঙালিজাতির শক্তি বাড়বে বৈ কমবে না। স্বজাতি-স্বজনকে যারা আপদ মনে করে, জাতিহিসাবে তাদের শোচনীয় বিনষ্টি অবশ্যম্ভাবী। শরণার্থীদের এতবড়ো জটিল সমস্যার আশুসমাধান সহজসাধ্য ব্যাপার মোটেই নয়। কিন্তু সুরচিত পরিকল্পনা, সহানুভূতি ও দূরদৃষ্টির অভাব না ঘটলে ধীরে ধীরে এই সমস্যা সহজ হয়ে আসতে বাধ্য। ভারত বিশাল একটি দেশ। এদেশে পূর্ববঙ্গের কোটি-দুই হিন্দুর স্থান হবে না, হতে পারে না, একথা যারা বলে তারা মনুষ্যত্বভ্রষ্ট—চূড়ান্ত স্বার্থসর্বস্ব।

এতক্ষণ আমরা সেইসব হতভাগ্যদের কথা বলেছি, নীতিবোধবিরহিত পাক্‌জনতার শত্রুতায় যারা নিজেদের বাস্তুভিটা থেকে উৎপাটিত ও উৎসাদিত হয়েছে। এরা সর্বস্বান্ত, প্রায় পথের ভিখারী। এবার তাদের সম্পর্কে দুয়েকটি কথা বলব যারা পূর্বপাকিস্তানে পৈতৃক ভিটেমাটি হারাতে বসেছে।

পূর্ববঙ্গে হিন্দুনির্যাতন লেগেই আছে। এখনো সেখানে বসবাসকারী হিন্দুরা

সংখ্যা এক কোটির কাছাকাছি। যূপকাষ্ঠে বদ্ধ বলির পশুর মতোই প্রতিমুহূর্তে তার প্রাণনাশের আশঙ্কায় ত্রস্ত বিহ্বল। তাদের যেন পাকিস্তানে জামিন করে রাখা হয়েছে রাজনীতিক কারণে যে-মুহূর্তে 'ভারতকে শিক্ষা' দেওয়া দরকার মনে হলে পাক্‌সরকারের অনুগত হিন্দুবিদ্বেষী জনগণ এইসব অসহায় মানুষগুলোকে নির্বিচারে হত্যা করছে। পাকিস্তানে ইস্‌লাম ছাড়া অন্যকোনো ধর্মের স্থান যে নেই গত জানুয়ারি মাসের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড তার নিশ্চিত প্রমাণ।

এরূপ অবস্থায় এদের রক্ষা করার দায়িত্ব ভারতরাষ্ট্রের। কারণ, দেশ-বিভাগ আমাদের স্বাধীনতালাভের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাঙ্‌লাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার সময় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সর্বশক্তিপ্রয়োগে ভারতসরকার পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু উক্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি। পাক্‌সরকারের কাছে বিনীত আবেদন ও মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের কড়াকড়ি কিঞ্চিৎ শিথিল করার নীতি অনুসরণ ছাড়া ভারতের রাষ্ট্রনেতারা পূর্ব-বাঙ্‌লার সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি। তাদের প্রতি মাত্র মৌখিক-সহানুভূতি-প্রদর্শন নিদারুণ হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। ভারতের দ্বার সম্পূর্ণ-না-খোলার নীতি বর্তমান পরিস্থিতিতে মানবতাবিরোধী—ন্যায়ধর্মের পরিপন্থী।

পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুদের চরম দুর্দশালাঞ্ছনার মর্মবিদারক দৃশ্য দেখে আমরা যদি তাদের উদ্ধারকল্পে সক্রিয় হয়ে না উঠি তাহলে এ অপরাধের কি ক্ষমা আছে? তাই, গণসংগ্রামের জন্যে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে—পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লীর কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করুন, পূর্ববাঙ্‌লায় হিন্দুর উৎসাদন অব্যাহত থাকলে তার সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া ভারতরাষ্ট্রে দেখা দেবেই। এতে ভারতবাসীর সুখশান্তি বিঘ্নিত হবে। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু-সমস্যা-সমাধানের কার্যকরী পন্থাগ্রহণের জন্যে এই উভয় সরকারের কাছে ভারতীয় জনতার দাবি:

যারা পূর্বপাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসতে চায়, মাইগ্রেশনের বাধানিষেধ তুলে দিয়ে এদেশে আগমনের পূর্ণসুযোগ তাদের দেওয়া হোক। ভারতবর্ষে আগমনেচ্ছু হিন্দুর সমস্ত ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করুন। এসকল বাস্তুহারার পূর্ণায়ত পুনর্বসতির দায়িত্ব ভারত-সরকারের। যতদূর সম্ভব, পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের আশেপাশের এলাকায় তাদের বসতিস্থাপনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। যে-সম্পত্তি পূর্ববঙ্গে ফেলে আসতে তারা বাধ্য হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণের জন্যে পাক্‌সরকারের নিকট দাবি জানাতে হবে। পূর্বপাকিস্তানে সুপরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুনিধনের ঘটনা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে পৃথিবীময় প্রচারের ব্যবস্থা করা হোক। সম্প্রতি সংখ্যালঘু-উৎসাদনের সময়ে যেসকল হিন্দুনারী অপহৃতা হয়েছে, সর্বপ্রযত্নে তাদের উদ্ধার-সাধনের চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

পদ্মা-মেঘনা-বুড়ীগঙ্গার তীরে তীরে মৃত্যুমুখী হিন্দুনরনারীর যে আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে এখনো তা আমাদের কানে ভেসে আসছে। স্বজনকে যদি আমরা রক্ষা না করি তবে কে করবে? হাজারে হাজারে হিন্দু পাকিস্তানে রাজনীতিক চক্রান্তের বলি হল—এই পৈশাচিক ক্রুরতার নিঃশব্দ দর্শকমাত্র হয়ে থাকব আমরা—ভারতরাষ্ট্রের কোটি কোটি মানুষ? ভারতবাসীরা কি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেল, ক্লীব সেজে বসল! আর, কেন আজ ভারতসরকার জড়ত্বে কবলিত? দেশনায়কেরা তাঁদের পূর্বকৃত অঙ্গীকার বিস্মৃত হলেন একথা ভাবলে আমাদের সকল অন্তরদেশ অসহনীয় যন্ত্রণায় কাতরিয়ে ওঠে। অধর্মের সঙ্গে আপোস যে করে, ধর্মের কাছে একদিন-না-একদিন তাকে জবাবদিহি করতেই হবে।

সর্বশেষে একটি কথা। পশ্চিমবঙ্গে পূর্ণশান্তি রক্ষা করা চাই। এখানে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা দেখা দিলে পূর্ববাঙলার সংখ্যালঘুসমস্যা জটিলতর হয়ে উঠবে—রাজনীতিক সমস্যার সমাধান রাজনীতিক স্তরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতের জনতার কণ্ঠে বজ্রমন্ত্রে উদ্‌ঘোষিত হোক্: 'পূর্ববঙ্গের নিঃসহায় হিন্দুদের বাঁচাও'। এই বজ্রধ্বনি পশ্চিমবঙ্গসরকারের ঔদাসীন্যের ওপর আঘাত হানুক, অনেক দূরের দিল্লীর প্রাসাদের নিদ্রা ভেঙে দিক।



একালের পৃথিবীর রাজনীতিক ইতিহাসে জওহরলাল নেতৃত্বের নতুন দিগন্ত—এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। জওহরলালের মতো রাষ্ট্রাধিনায়ক এই বিংশ শতকে দুর্লভ একথা বললে কারো মনে প্রতিবাদ স্পৃহা জাগবে এ অবিশ্বাস্য। বিদেশিরা বলেছেন, জওহরলাল নেহরু স্বাধীন ভারতের মুকুটহীন রাজা। কেউ বলেন, এশিয়ার লেনিন তিনি, আবার কেউ কেউ বলেন, নেহরুজী উইলকি, উইলসন, রাসেল, আইনস্টাইন প্রমুখ বর্তমান দুনিয়ার আন্তর্জাতিকতাবাদীদের একমাত্র সমন্বয়। আমরা বলি এসকল জগদ্বরেণ্য মনীষীদের সঙ্গে তাঁর প্রেক্ষণীয় মিল থাকা সত্ত্বেও তিনি নেহরু-ই—তিনি অদ্বিতীয়, একক, অনন্য।

বর্তমান প্রসঙ্গে একটি উপমা মনে জাগছে—অসামান্য প্রতিভাধর চিত্রীর আঁকা নিরুপম চিত্রের। চিত্রী তাঁর একনিষ্ঠ সাধনায় চিত্রটি আঁকলেন। এই সেরা চিত্রটি সকলে দেখলে। দেখে বললেন, এ এক অদ্ভুত শিল্পকর্ম; এমনটি কেউ কখনো দেখেনি, ঠিক এরকম শিল্পকৃতি ভাবীকালেও কেউ দেখবে না—দেশকালের সীমা ছাড়িয়ে এ-চিত্র সর্বদেশের সর্বকালের অতি গৌরবের একটি বস্তু। আমাদের এই আলোচনার ক্ষেত্রে উপমাটিতে-কথিত শিল্পী হল অধ্যাত্মব্রত কর্মযোগী যুগপ্রাচীন ভারতবর্ষ, আর চিত্রটি হল বর্তমান ভারতরাষ্ট্রের সত্য-লোকান্তরিত

অধিনায়ক জওহরলাল নেহরু। ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম অক্ষয় অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে গেছে।

এই অ-সাধারণ সাধারণ মানুষটির কথাই আজ আমরা বলতে বসেছি। কী দুরূহ একটি কাজ। ভারতবর্ষের অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস ও জওহরলালের বিচিত্রকর্মান্বিত সংগ্রামী জীবন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত-মিশ্রিত, এদুটিকে আলাদা আলাদা করে দেখা একরূপ অসম্ভব। তাই, নেহরুজীর জীবনকাহিনী ও তাঁর অনুসৃত জীবনাদর্শের কথা স্বল্পপরিসরের মধ্যে বিবৃত করা খুবই কঠিন। তবু চেষ্টা করতে হবে।

এলাহাবাদ শহরের নেহরুপরিবার। এদের অগাধ বিত্তৈশ্বর্য, আভিজাত্যে এঁরা অতিশয় স্বতন্ত্র। মতিলাল নেহরু এলাহাবাদ হাইকোর্টে আইনব্যবসায়ে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। ঐশ্বর্যের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। ব্যবসায়ে বিস্ময়কর সাফল্য তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করল। প্রভূত সম্পদের অধিকারী হলেন তিনি. রাজগৃহতুল্য সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করলেন, নাম রাখলেন—'আনন্দভবন'। বিত্তপ্রাচুর্যের কিছুটা দম্ভও মতিলালের ছিল। দেশীয় চালচলন পরিহার করে ক্রমশ তিনি ঝুঁকলেন সাহেবীধরণের আচার-আচরণের দিকে। এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। সেকালে য়ুরোপীয় জীবনচর্যা প্রায় সকল ধনীব্যক্তিরই সদয় স্বীকৃতি পেত। এর ব্যতিক্রম যে ছিল না এমন নয়, কিন্তু তা অত্যন্ত বিরল। এহেন নেহরুপরিবারে ১৮৮৯ ইংরেজি সালের ১৪ই নভেম্বর জওহরলাল নেহরুর জন্ম। পিতা—পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, মাতা—স্বরূপরাণী।

শৈশবে নেহরু একপ্রকার নিঃসঙ্গ ছিলেন। তাঁর বোনেরা বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক ছোট। আর দশটি পরিবারে ছেলেরা যেভাবে স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করে, নেহরুর তেমনটি হয়নি। তাঁর লেখাপড়া শুরু হয় গৃহশিক্ষক ও গৃহশিক্ষিকার কাছে। নেহরুর বয়স যখন এগারো তখন একজন য়ুরোপীয় শিক্ষক, নাম—ফার্দিনান্দ ব্রুক্‌স্—তাঁকে পড়বার ভার নেন। এই শিক্ষকটির কাছে অধ্যয়নকালে ইংরেজি-গ্রন্থপাঠে তাঁর অনুরাগ জন্মে। ফার্দিনান্দ ব্রুক্‌স্ তাঁকে বিজ্ঞান শাস্ত্রেও দীক্ষা দেন। এসময় থেকে তিনি কাব্যকবিতার অনুরাগী পাঠক হয়ে ওঠেন। নেহরুর জীবনে কত পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু তাঁর চিত্তদেশ থেকে কাব্যপ্রীতি কদাপি হারিয়ে যায়নি। তাঁর লেখার কাব্যসুরভি সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন।

পূর্বে বলেছি, মতিলাল নেহেরু ছিলেন পাশ্চাত্ত্যমনোভাবসম্পন্ন মানুষ। তাই পুত্রকে তিনি বিদেশি শিক্ষায় দীক্ষিত করতে অভিলাষী হলেন। পনেরো বছর বয়সে [১৯০৫ সালে] জওহরলাল ইংল্যাণ্ডে গেলেন, গিয়ে হ্যারোতে ভর্তি হলেন। হ্যারোর স্কুলজীবন শেষ করে দুবছর পরে যোগদান করলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে পড়া আরম্ভ করলেন। ১৯১০ সালে এখানকার ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কেম্ব্রিজে পড়াশুনোর সময় 'মজলিশ' নামীয় ভারতীয় ছাত্রদের সভায় জওহরলাল রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন। দেশে

তখন জাতীয় আন্দোলন চলছে, বিক্ষোভ ও অশান্তি দেখা দিয়েছে। তিলকের কারাবরণের সংবাদ, অরবিন্দ ঘোষের গ্রেপ্তারের খবর তাঁরা পাচ্ছেন। বিদেশি-পণ্য-বর্জনের উন্মাদনার ঢেউ দূর সাগরপারে গিয়ে পৌঁছাত। সেখানে কয়েকজন ভারতীয় রাজনীতিক নেতার সঙ্গেও তাঁদের দেখাশুনা হতো—যেমন, বিপিনচন্দ্র পাল লাজপৎ রায়, গোখেল।

কেম্ব্রিজের পাঠ সমাপ্ত হলে বছর দুই পর জওহরলাল ইনার টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করলেন। এখানে বিলেতে অধ্যয়নের পালা শেষ। সুদীর্ঘ সাতটি বছর বিলেতে কাটিয়ে ১৯১২ সালে পুরোপুরি সাহেব হয়ে তিনি দেশে ফিরলেন। তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-পর্বের উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে, লোকমান্য তিলক কারাগারে বন্দী, ভারতের রাজনীতি, বলতে গেলে, একরূপ নিস্পন্দ। ভারতীয় কংগ্রেসে কোনো উত্তাপ নেই, কর্মোদ্যোগের চিহ্ন কোথাও চোখে পড়ে না। সেদিন জাতির জীবনের মর্মদেশে কংগ্রেস শিকড় গাড়তে পারেনি।

১৯১৬ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। এসময় লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে জওহরলাল যোগদান করলেন। এখানেই গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। এবছরেই কমলা কাউলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল। মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসে ধীরে ধীরে প্রাণ সঞ্চারিত হচ্ছে। ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে শক্তিস্পর্ধিত ইংরেজ-কর্তৃক বীভৎস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনিঃশেষ রোষে ও ক্ষোভে দেশবাসী প্রকাণ্ড-রকমে বিক্ষুব্ধ, জনগণ দেশাত্মবোধে জেগে উঠেছে, হৃদয়লোকে অনুভব করছে বিদেশিশাসনের দুর্বিষহ যন্ত্রণা—পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে সকলে উন্মাদ হয়ে উঠল যেন।

এর কিছুদিন পরে জওহরলাল সিমলা থেকে অকারণে বহিষ্কৃত হয়ে চলে এলেন এলাহাবাদে। এসময় প্রতাপগড় থেকে একদল কিষাণ এসেছে দেশনায়কদের কাছে তাদের দুঃখদুর্দশা জানাতে—তারা নিজেদের সহস্রবিধ দুর্গতিলাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়। মানবদরদী তরুণ জওহরলাল এইসব কিষাণদের সঙ্গে মিশলেন। সেদিন প্রথম তিনি ভারতবর্ষের প্রকৃত চেহারাটির পরিচয় পেলেন, চাক্ষুষ করলেন দেশের সংখ্যাতীত মানুষের অবিশ্বাস্য দারিদ্র্যের গ্লানিপঙ্কিল রূপটি। এতে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেল। ভারতের গ্রামে গ্রামে তিনি ঘুরে বেড়ালেন, অভিজাত বংশের এই সন্তানটি মাটির কাছাকাছি এলেন। গ্রাম-ভারতকে চিনে নেওয়ার পর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল। সেই থেকে তাঁর কঠিন সংকল্প, যে-কোনো উপায়েই হোক, দেশকে ইংরেজশাসনপাশমুক্ত করতে হবে, দূর করতে হবে শোষণজর্জর কোটি কোটি ভারতবাসীর অবর্ণনীয় দারিদ্র্য। কিষাণদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন জওহরলাল। গান্ধীজীর চম্পারণ-সত্যাগ্রহের পর ভারতীয় কিষাণদের সমস্যা নিয়ে কত চিন্তা তিনি করেছেন। অ-সাধারণ জওহরলাল সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সেইদিন থেকে অভিজাতবংশের এই

সন্তানটি হল কৃষাণমজদুরের আত্মার অন্তরঙ্গ আত্মীয়। মানবতাবোধের নিবিড় আকর্ষণে, দেশের প্রতি অকৃত্রিম মমত্বের টানে, জওহরলাল নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। জনতার ডাকে পরাধীন ভারতে এক প্রাণচঞ্চল নির্ভীক নেতার অভ্যুদয় ঘটতে চলল। মহাত্মার ছায়াতলে বাড়তে লাগলেন স্বাধীনতার দুর্গম পথের নিঃশঙ্ক সৈনিক নেহরু।

১৯২১ সালে দেশে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। সে আন্দোলন দমন করা ব্রিটিশশাসকের পক্ষে সম্ভব হলো না। নিজেদের মর্যাদা অতিমাত্রায় ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ছে দেখে তাঁরা প্রিন্স অব্ ওয়েলস্‌কে সঙ্গে আনলেন, উদ্দেশ্য—সাম্রাজ্যের জাঁকজমক দেখিয়ে ভারতবাসীকে অভিভূত করে ফেলা। কিন্তু এর ফল হল বিপরীত, জনগণের বিক্ষোভ প্রবলতররূপে দেখা দিল। নেতৃবৃন্দের ধরপাকড় আরম্ভ হল, নেহরুও কারারুদ্ধ হলেন। এই তাঁর প্রথম কারাবরণ। ১৯২২ সালে বিদেশি বস্ত্র বয়কট উপলক্ষে এবং ১৯২৩ সালে আইন-অমান্য-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্যে তাঁকে আবার কারাগৃহে নিক্ষেপ করা হল। শাসনের রক্তচক্ষু যতই ভ্রূকুটি হেনেছে নেহরুর সংগ্রামী চিত্ত ততই মুক্তিপাগল হয়ে উঠেছে। ১৯২৩-এ জওহরলাল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। ১৯২৬ সালে ব্রাসেলস্‌-এ নিপীড়িত জাতিবৃন্দের এক সম্মেলন হয়। নেহরু ওই সম্মেলনে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। এবারে য়ুরোপে অবস্থানকালে জওহরলাল পৃথিবীর যাবতীয় দেশের রাজনীতিক জীবনের সংবাদাদি আহরণ করে নিজেকে নিজেই যেন নির্মাণে ব্যাপৃত থাকলেন। বিশ্বরাজনীতির হাওয়া কোনদিকে বইছে, ভারতবর্ষের ভাবী অধিনায়ক অনুক্ষণ সাগ্রহে তা পর্যবেক্ষণ করে গেছেন।

হ্যারো আর কেম্‌ব্রিজের সেই ছাত্রটির চেহারা ক্রমেই পাল্টাতে লাগল, ভারতের রাজনীতিতে তাঁর পুরোপুরি নামবার পালা যে আসন্ন। ১৯২৯ সালে লাহোরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে সভাপতির আসন অলংকৃত করলেন জওহরলাল। তাঁর জীবনে এ একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই অধিবেশনেই পূর্ণস্বাধীনতার সংকল্প গৃহীত হল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯২৯ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে জওহরলাল ছয় বার কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। এতবার আর-কেউ প্রেসিডেন্ট হননি। এতে সহজে বুঝতে পারা যায়, 'জনগণমনঅধিনায়ক' হবার কী অসাধারণ ক্ষমতা ছিল জওহরলালের।

১৯৩০-৩৫ সালে কংগ্রেসের লবণসত্যাগ্রহ, উত্তরপ্রদেশের ভূমিআন্দোলন, কলিকাতায় 'আপত্তিকর বক্তৃতা'-দান ইত্যাদির জন্য নেহরুকে কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময়ে [বিখ্যাত আগস্ট বিপ্লবের প্রাক্‌কালে] তিনি আবার কারারুদ্ধ হলেন। মুক্তি পেলেন তিন বছর কারাবাসের পর—১৯৪৫-এর জুন মাসে। এই সময় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীর সেনানীদের বিচারকালে আইনজীবী-হিসেবে নেহরু তাঁদের পক্ষসমর্থন করেন।

তারপর ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন জওহরলাল। ব্রিটিশসরকার বুঝতে পারলেন ভারতবর্ষকে আর পদানত করে রাখা চলবে না। সুতরাং কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হয়ে ভারতবাসীর হাতে শাসনক্ষমতা অর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ১৯৪৬ সালে এই ক্ষমতা-হস্তান্তরকরণ সম্পর্কে যে সব আলোচনা হয় তাতে নেহেরু যে অংশগ্রহণ করেন তা সবিশেষ উল্লেখ্য। ওই বছরই অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলো। নেহরু ভাইস্‌রয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে ভাইস-প্রেসিডেন্টরূপে যোগ দিলেন। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীও হলেন তিনি। গুরুভার এ দায়িত্ব। এখন থেকে জাতির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করতে হবে তাঁকে। বলা নিষ্প্রয়োজন, জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত এ দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করে গেছেন।

এবার জওহরলালের ভূমিকা বদল হলো। একদিন তিনি ছিলেন সংগ্রামী, এখন থেকে হয়ে উঠলেন বিশাল একটা জাতির সংগঠক। বিরাট কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করলেন জওহরলাল। যৌবনের দিনে দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতবর্ষ তাঁর চিত্তকে পীড়িত করেছে। তখনই তিনি ভেবেছিলেন, ভারত স্বাধীন হলে তাঁর কাজ হবে দারিদ্র্যদূরীকরণ, জাতিকে আর্থনীতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেওয়া। এরই জন্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ভারতের নদীপরিকল্পনা, এবং আরো বহুমুখী কর্মসূচী। এক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনার শেষ ছিল না। অপরকে তিনি অনবচ্ছিন্ন প্রেরণায় প্রাণিত করেছেন, নিজের দূরপ্রসারী চিন্তার আলোকে অন্ধকার পথকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। প্রথমে তিনিই দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের ভাবনা ভাবেন। এছাড়া আধুনিক প্রগতিশীল জীবনযাত্রা যে সম্ভব নয় তা তিনি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আজ যে ভারতবর্ষের দিকে দিকে প্রকাণ্ড কর্মের সহস্র চাকা ঘুরছে তার পেছনে জওহরলালের অতন্দ্র উদ্যম-উদ্‌যোগ সংগুপ্ত ও সক্রিয় রয়েছে। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব ব্যতিরেকে এই বিরাট কর্মব্রত কদাপি উদ্‌যাপিত হতে পারত না।

কী কণ্টকাকীর্ণ গহন-অন্ধকারসমাচ্ছন্ন পথে জওহরলালকে অগ্রসর হতে হয়েছে! বাপুজীর শোচনীয় মৃত্যু, দেশজোড়া দাঙ্গাহাঙ্গামা, লুঠতরাজ ও অগ্নিকাণ্ড, পাকিস্তানের কাশ্মীরআক্রমণ, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক বহুবিধ গুরুতর সমস্যা, চীনের বিশ্বাসঘাতকতা, পাকিস্থানরাষ্ট্রের অমানবীয় শত্রুতা—কত বাধা, কত বিঘ্ন তাঁর চলার পথটিকে দুর্গম করে তুলেছে। কিন্তু সর্বক্ষণ সুনিপুণ কর্ণধারের মতো তিনি জাতীয় তরণীর হাল ধরে ছিলেন, তাকে ভরাডুবি থেকে রক্ষা করেছেন। সাম্প্রদায়িকতা স্বাধীনতাকে পঙ্গু বিকল করে দেয়। নেহরু অসাম্প্রদায়িক ভিত্তির ওপর মাতৃভূমিকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের বিনষ্টি তাঁর কাছে অভাবনীয় ছিল। একারণে ভারতরাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ। নিজ দেশের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা আর বৈদেশিক ক্ষেত্রে

জোটনিরপেক্ষতা নেহেরুনীতিকে উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এ নীতি কারো কারো ভালো লাগেনি, বিশেষ, তাঁর জোটনিরপেক্ষতানীতির বহু বিরুদ্ধসমালোচনাও হয়েছে। কিন্তু সকল বিরোধিতা সত্ত্বেও নেহরু আপন স্বাধীন স্বতন্ত্র নীতিকে কখনো পরিহার করেননি। এই নীতিই তাঁর 'পঞ্চশীল'-আদর্শের জন্ম দিয়েছে। ১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলনে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলি 'পঞ্চশীল'কে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষা করার জন্যে তাঁর প্রয়াসের তুলনা হয় না। এক দেশের মত ও পথ অপর দেশের মত ও পথ থেকে ভিন্ন হতে পারে। তাই বলে সংঘর্ষ কেন হবে? উদারতা ও সহনশীলতার অভাব না ঘটলে সকল রাষ্ট্রের সহ-অবস্থানে বাধা কোথায়?

জওহরলাল নেহেরু স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে অপরাপর দেশের মুক্তিসংগ্রাম থেকে কদাপি তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। রাজনীতিক পরাধীনতা আর আর্থনীতিক দাসত্বকে তিনি ঘৃণ্য বস্তু বলে মনে করতেন। সকল দেশই স্বাধীন হোক এ ছিল তাঁর অন্তরতর কামনা। তাই, তিনি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বারংবার উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন; পৃথিবীর বুক থেকে জাতিবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ নিঃশেষে মুছে যাক, একথা কতবার শুনিয়েছেন।

'বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তিনি মৈত্রী ও শান্তির বাণী প্রচার করেছেন। বিশ্বশান্তিস্থাপনে যে ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছেন তা অতিশয় বিশিষ্ট। এই পারমাণবিক যুগে যুদ্ধপ্রচেষ্টা কতখানি যে আত্মঘাতী, নেহরুর ন্যায় আর কোন্ রাষ্ট্রনায়ক এমন করে গোটা পৃথিবীকে বুঝিয়েছেন? আন্তর্জাতিক উত্তেজনা ও বিরোধ যুদ্ধ ছাড়াই মেটানো যায়, সুস্থ মানসিকতার পরিবেশে পারস্পরিক আলোচনা যে এক্ষেত্রে কম ফলপ্রসূ নয়, এ বিশ্বাস নেহরুর রক্তের সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। আধুনিক যুগের মানুষকে গান্ধীশিষ্য জওহরলাল শান্তি ও সৌহার্দের পথ দেখিয়েছেন। তাঁর কণ্ঠোদ্গীর্ণ বাণী বর্তমান জগতের সর্বত্রই শ্রদ্ধা পেয়েছে। কোরিয়া, লাওস, কঙ্গো, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি স্থানে সাংঘাতিক সংঘর্ষের দিনে নেহরুর রাজনীতিক মনোভাব নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কয়েকটি দেশের কোনো কোনো রাষ্ট্রনেতা নেহরুকে ঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। কিন্তু তিনি যে শান্তির মানুষ, মানবমৈত্রীর খুব বড়ো একজন প্রবক্তা, কালক্রমে তা বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল অবিচল, তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, জাতিতে-জাতিতে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ কিংবা ঠাণ্ডা লড়াই এড়াতে হলে অধুনা ওই সনদের প্রতি আনুগত্য দেখানো ছাড়া উপায় নেই। অস্ত্রশক্তির মূঢ় দম্ভে একে লঙ্ঘন করতে চাইলে মানবজাতির এতকালের সভ্যতা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে এ তাঁর অতিস্বচ্ছদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে, বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসম্মেলনে, জেনেভার বৈঠকে, হোয়াইট হাউসে, ক্রেমলিনে নেহরু আকুল কণ্ঠে যা প্রচার

করেছিলেন তার নাম শান্তিবাদ। হিংসা-উন্মত্ত সাম্প্রতিক পৃথিবীতে ভারতপথিক জওহরলাল শুভ্রভাস শান্তির পথের দিশারী। তাঁর শান্তিবাদী ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অত্যুজ্জ্বল বিভায় বহু বহু বৎসর ধরে দীপ্তি পেতে থাকবে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল বিরোধ-মীমাংসাকল্পে, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের নায়কদের সঙ্গে আবেদনপত্রে তাঁর স্বাক্ষরদানের কথা কে না জানেন? মানবকল্যাণের সাধনায় জওহরলাল উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। ভারতপুত্র জওহরলাল বিশ্বনাগরিক, জগতের সেরা ডেমক্র্যাট তিনি।

নেহরুর অসাধারণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বিশ্বরাষ্ট্রসভায় ভারতকে সমুচ্চ মর্যাদার আসনে তুলে ধরেছে। বস্তুত, এই বিশাল ভারতবর্ষে জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর পর এতবড়ো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ আর দ্বিতীয়টি নেই। তাঁর সঙ্গে তুলনা করতে পারি এমন কল্যাণকর্মা মহিমান্বিত কৃতী পুরুষ একালের দুনিয়ার কোনো রাষ্ট্রে চোখে পড়ে না। বিদেশিরা যথার্থত উপলব্ধি করেছে— নেহরুই ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষই নেহরু। নব্যভারতের মহাপ্রতিভাধর স্থপতি তিনি, তিনি আমাদের গণতান্ত্রিক প্রগতির অবিস্মরণীয় রূপকার। জওহরলাল পঁয়তাল্লিশ কোটি ভারতবাসীকে গড়ে পিটে নিজের মনের মতো মানুষ করে তুলতে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষের রাজনীতিক চিন্তাচেতনা-ধ্যানধারণাকে তিনি যেভাবে আলোড়িত ও প্রভাবিত করেছেন তেমন আর কেউ নন। তিনি পরাধীন ভারতের অতন্দ্র অক্লান্ত সেনানায়ক, স্বাধীন ভারতের সতেরো বৎসরের প্রাণদীপ্ত অভ্যুদয়ের সর্বপ্রচেষ্টা ও কর্মব্রতের পুরোধা। তাঁর সত্তার মধ্য দিয়ে কখনো আত্মপ্রকাশ করেছেন লেনিন, কখনো রুজভেল্ট, কখনো চার্চিল—কখনো তার চেয়ে বেশী কিছু। জওহরলালহীন ভারতবর্ষ কল্পনা করাও যেন যায় না, আমাদের কাছে এতখানি অপরিহার্য ছিলেন তিনি। নেহরুকে শুধু মাত্র একজন ব্যক্তিমানুষ বলে মনে হয় না, তিনি যেন পরিপূর্ণ একটি যুগ—গেল চল্লিশ বছরের ভারত-ইতিহাসের শুভ্র-সমুজ্জ্বল বিরাট একটি অধ্যায়।

মাতৃভূমির মাটিকে, ভারতের অগণিত মানুষকে, জওহরলাল অপরিসীম মমতায় জড়িয়েছিলেন। প্রতিদানে গোটা ভারতবর্ষ তাঁকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহস্র-ধারায় অভিষিক্ত করেছে। জাতির অটুট ভালোবাসার সিংহাসনেই মহানায়ক জওহরলালের সুমহান নেতৃত্বের অকম্পিত অধিষ্ঠান। কী প্রকাণ্ড ক্ষমতার অধিকার তাঁর ছিল, ইচ্ছা করলে ডিক্‌টেটরের ভূমিকা তিনি গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু এহেন ক্ষমতা তাঁকে কখনো প্রমত্ত করে তোলেনি। গণতন্ত্রী সমাজবাদী জওহরলাল সেবা দিয়ে সমগ্র জাতির আনুগত্য আকর্ষণ করেছেন। ক্ষমতা নয়, মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসাই ছিল তাঁর কাম্য। ভারতীয় জনগণের কাছে তাঁর দাবির শেষ ছিল না—ভালোবাসার দাবি। এই প্রীতির শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তিনি দেশ শাসন করেছেন; অনুরাগে হয়েছেন কোমল, বেদনায় মুহূর্তে অতিশয় কঠিন। জনতাকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেও জনসমুদ্রে নিঃশঙ্ক চিত্তে ঝাঁপ দিয়ে তারাকে

পারেন একমাত্র জওহরলালজী। সাধারণের হৃদয়লোকই জওহরলালের আসল রাজ্যপাট।

ব্যক্তিমানুষহিসেবে জওহরলাল ছিলেন দরদী, সূক্ষ্মঅনুভূতিশীল। দরিদ্র মেহনতী মানুষের দুঃখ দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়তেন। তিনি কৃষাণমজদুরের জীবনের শরিক, কথায় ও কর্মে তাদের আত্মীয়তা অর্জন করেছিলেন। নেহরুজী যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন—'আমার চিতাভস্মের বেশির ভাগ ভারতের মাঠে মিশিয়ে দিও যেখানে কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে'—এ শুধু একজন স্বপ্নলোকবিহারীর অবাস্তব কাব্যকথা নয়, এর মধ্য দিয়ে আমরা শুনতে পাই অনুরাগবিজড়িত তাঁর কণ্ঠস্বরটি। কথাগুলির সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করুন নেহরু কর্তৃক প্রস্তাবিত নিজের সমাধিলিপি: 'সমস্ত হৃদয়মন দিয়ে এই ব্যক্তি ভালোবেসেছিল ভারত ও ভারতীয় জনগণকে। আর, বিনিময়ে তারা সেই মানুষকে দিয়েছিল তাদের অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্য, দিয়েছিল তাদের অশেষ ও অপরিমিত ভালোবাসা।' এ বিশ্বাসের মূল কত গভীরে তা সহজে বুঝে নিতে পারা যায়।

উনিশ-শ চৌষট্টি সালের মে মাসের সাতাশ তারিখ ভারতীয় জীবনে অত্যন্ত বিষাদক্লিষ্ট একটি দিন। এই দিনটির দ্বিপ্রহরে আমাদের প্রিয় জওহর লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর লোকান্তরগমন যেন ইন্দ্রপতন। ভারতবাসীর মাথার ওপর থেকে বিশাল প্রাচীন বটবৃক্ষ সরে গেল। এ মহাশূন্যতার পরিমাপ হয় না। মহীরুহের পতন ঘটলে নীড়হারা অসহায় পাখীরা পাখা ঝাপটায় আর অশ্রান্ত আর্তনাদে দিগ্‌দেশ ধ্বনিত করে তোলে; মুহূর্তে তাদের চোখের সুমুখ থেকে সকল আলো নিভে যায়, বিষণ্ণ অন্ধকারে তারা কাতরিয়ে ওঠে। জওহরকে হারিয়ে আমরাও শূন্যে ডানা ঝাপটাচ্ছি, আর বলছি—'দীপ নিভে গেল'।

দীপ নিভল। কিন্তু তাকে আমরাই জ্বালিয়ে তুলব, আমরা—যারা জওহরলালের উত্তরাধিকার পেয়েছি। নেহরুর তিরোধান ঘটেছে কিন্তু তাঁর নেতৃত্বের প্রেরণা শূন্যতায় পর্যবসিত হয়নি—হবে না। মরেও নেহরু মৃত্যুঞ্জিৎ। তাই তাঁর মহাযাত্রার সঙ্গে ভারতের কোটি কোটি মানবমানবীর কণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত হয়েছে:

'নেহরু অমর রহে'।

নিজের চেতনা যখন অন্তিম বিলুপ্তির পথে তখন জওহরলালজীও কী এ কথাগুলি নিঃশব্দ সুরে উচ্চারণ করেন নি:

'গৌরবে মোরে লয়ে যাও
ওগো মরণ',
'হে মোর মরণ।'

আমার রাজগিরভ্রমণ-কথা

আমি রাজগির দেখে এসেছি। রাজগির—ভারতের পূর্বাঞ্চলের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একটি স্থান। মনোরম, স্মৃতিকে আলোড়িত করে, মনকে সেই দূর অতীতের দিকে টানে। প্রাচীন রাজগৃহের [রাজগির] বৃত্তান্ত আমাদের পুরাণে মেলে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মেলে। বহুস্মৃতিবিজড়িত, নিসর্গসৌন্দর্যের লীলানিকেতন, বিচিত্র দর্শনীয় বস্তুর প্রখ্যাত ভূমি রাজগির আমি চাক্ষুষ করেছি। নিচে আমার ভ্রমণকথা লিখছি—খুব সংক্ষেপে।

ঘর ও বাহির। আমার চিত্তে ঘরের আকর্ষণ যে কম এমন নয়। কিন্তু বাইরের বড়ো পৃথিবীর নিঃশব্দ আহ্বানও নিজ অন্তঃকর্ণে মাঝে-মধ্যে শুনতে পাই। শুনে, কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠি। কলকাতার ছেলে আমি। মহানগরী কলকাতার মায়াজড়ানো বন্ধনপাশ কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। তবু, এর উন্মদ কোলাহল, রক্তশোষী কর্মব্যস্ততা, প্রতিদিনের বিবর্ণ রুটিনের রক্তচক্ষুর শাসন, একঘেঁয়ে জীবনযাত্রা কখনো কখনো নিরতিশয় পীড়িত করে। তখন, কোথাও ছুটে পালাতে ইচ্ছে যায়—এমন কোথাও, যেখানে প্রাত্যহিকতার মলিন স্পর্শ নেই, অবশ্যকরণীয় কাজের ভারি বোঝা নেই; আছে নির্বন্ধ অবকাশের পরমাশান্তি, ব্যস্ততাবিহীন ছুটির মধুময় স্বস্তি, প্রাণ খুলে উদ্দেশ্যমুক্ত পদচারণার নিবিড় আনন্দ।

সেই 'কোথাও' ছুটে পালাবার সুযোগ বড়ো একটা পাওয়া যায় না। নানান্ বিঘ্নবাধা পথ রোধ করে দাঁড়ায়। মনের বাসনা তৃপ্ত হয় না। কিন্তু সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, গেলো পুজোর ছুটিতে। পিসেমশায় একদিন এসে বললেন : 'যাবি বেড়াতে ?' আমার প্রশ্ন : 'কোথায় বলুন না ?' উত্তর : 'বাঙলাদেশের বাইরে—রাজগিরে।' এমন আশ্চর্য প্রস্তাব কানে আসতেই খুশিতে প্রায় লাফাতে যাচ্ছিলাম।

এখন, বাবার মতামত জানা দরকার এ বিষয়ে। মা'র কাছে ধর্না দিলাম, প্রার্থনা মঞ্জুর করাতে হবে। বাবার সম্মতিই প্রার্থিত। বাবা বড়োই ব্যস্ত মানুষ। লেখা আর পড়া নিয়ে থাকেন। তাই, আমাদের নিয়ে কলকাতার বাইরে ঘুরে আসবার মতো অবসর তাঁর একরূপ নেই। মায়ের মুখে তিনি শুনলেন আমার ব্যাকুলতার কথা। বাধা দিলেন না। সহজে তাঁর অনুমতি পাওয়া গেলো। তখন আমার প্রাণের উল্লাস অবন্ধন হয়ে উঠেছে।

কোজাগরী পূর্ণিমার দিনে বেরিয়ে পড়লাম পিসেমশায়ের সঙ্গে। আমার এই পিসেমশায় ব্যক্তিটি বড়োই প্রাণবন্ত মানুষ। অবকাশ পেলেই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন—কাছে, দূরে। এমন মানুষের সঙ্গ সত্যই লোভনীয়

শহরের জনাকীর্ণ পথ বেয়ে ট্যাক্সি ছুটে চলেছে। রাস্তায় কত লোক [illegible]

কাজের তাড়া। গোটা শহরটিই কর্মচঞ্চল—নিজের ছুটি বুঝি নেই, কারুরকে ছুটি দিতেও যেন নারাজ। আমাদের কিন্তু ছুটি। কী মজা।

রাত নেমেছে অনেকক্ষণ। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলাম। কুলিরা আমাদের ওপর ছোঁ মেরে এসে পড়ে, দুজনকে ছিনিয়ে নিয়ে, কোথাও বুঝি উধাও হয়ে যেতে চায়। কোন্ গাড়ীতে উঠবো, বলে দিলাম। যাত্রীর ভিড়ের চাপে চ্যাপ্টা যে হয়ে যাইনি, সে-ই ভাগ্যের কথা। ভেবেছিলাম, সেকেণ্ড ক্লাশের কামরায় ভিড় কিছুটা কম হবে। উঠে দেখি, ঠিক উল্টো। বিছানাপত্তর, ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস, ইত্যাদিতে চারদিক একেবারে ঠাসা। এতসব বস্তুর পাহাড়ের কিনারে কিনারে যাত্রীরা কেউ বসে, কেউ-বা দাঁড়িয়ে। আবালবৃদ্ধবনিতার বিচিত্র মেলা বসেছে। কী ভিড়, কী ভিড়। তা বলে পরিবেশটি বিশ্রী লাগছিল না। লোকের বর্ণাঢ্য মিছিল দেখছিলাম কৌতুক ও কৌতূহল সহকারে।

হুইসল্ বাজলো। রেড্ লাইট সহসা গ্রীন্ হলো। সিগ্ন্যাল ঘাড় নিচু করে কী একটা সংকেত জানালো। এবার ঝিক ঝিক্, ঝিক্ ঝিক শব্দ। ট্রেনের গতি ক্রমেই দ্রুততর হয়ে চলেছে। গতির নেশায় পেয়েছে বুঝি তাকে, স্টেশনের পর স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছে। আমি বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে ধরেছি। রাতের পৃথিবী। পূর্ণিমার রাত। চতুর্ধারে জ্যোৎস্না বিকীর্ণ হয়েছে, শাদা ধব্‌ধবে জ্যোৎস্না। ঘুমন্ত চরাচরের ওপরে কে যেন রূপোলি স্বপ্নের মায়া মাখিয়ে দিয়েছে। নিঃশব্দ নিশুতি রাতকে আমি কখনো এমন করে চোখ মেলে দেখিনি। কী সুন্দর মধ্যরাত্রির মায়ামূর্তি। পিসেমশায় পাশে ঘুমিয়েছেন, আমি জেগে আছি। দেখছি আলো আঁধারে-জড়ানো নিসর্গসম্ভারকে, পাহাড় আর ক্ষেত মাঠ, দূরবিসারী দিগন্ত। ঊর্ধ্বে আকাশ—চিগ জোড়া নীলাকাশ যেন চাঁদের আলোয় স্নান করে। মনকে উদাস করে দেয়। কত রাত পর্যন্ত জেগে ছিলাম বলি না। জানি না, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙ্‌লো পিসেমশায়ের হাতের স্পর্শে। তখন ভোর হয়েছে। বক্তিয়ারপুর স্টেশনে এসে গাড়ী থেমেছে। এবার গাড়ী বদল করতে হবে।

নেমে পড়লাম আমরা।

বক্তিয়ারপুর থেকে রাজগির পর্যন্ত ব্রডগেজ লাইন চালু। ইস্টার্ণ রেলওয়ের মেইন লাইনে বক্তিয়ারপুর। আবার গাড়ীতে উঠলাম। বিহার অঞ্চলের রাজগিরে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগলো না। নতুন দেশ দেখবার উত্তেজনা আমাকে অভিভূত করেছে।

পৌঁছে গেলাম। আগের থেকে চিঠি দিয়ে 'রেস্ট হাউস'-এ থাকবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। নতুন স্থান, নতুন দৃশ্য, নতুন অভিজ্ঞতা। সে যে কী অনুভূতি, ভাষায় ঠিক প্রকাশ করা যায় না।

রাজগির। প্রাকৃতিক শোভা নয়নাভিরাম। অপূর্ব একটি স্থান। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈনের তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ। প্রাচীনকালের কত নিদর্শন এখানে ছড়িয়ে আছে—মূক অতীতের নির্বাক সাক্ষী। রাজগিরকে কবিরা দেখেছে, ধ্যানরসিকেরা দেখেছে, দেখেছে ঐতিহাসিকেরা—কেউ মানসদৃষ্টিতে কেউ ধ্যাননেত্রে কেউ প্রত্নজিজ্ঞাসুর

চোখ দিয়ে। আমিও রাজগির প্রত্যক্ষ করলাম। আমার চোখে কৌতূহল ছাড়া অন্যকিছু ছিল কিনা, বলতে পারি না।

কিছু সময় বিশ্রাম। দুপুর কখন অতিক্রান্ত। বিকেল। বেরিয়ে পড়লাম গিরিব্রজের [রাজগিরের প্রাচীন একটি নাম] পথে। বলতে গেলে পাহাড়ি জায়গা। পথ সর্বত্র সমতল নয়। আমার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা প্রাচীন রাজগৃহ [রাজগির]-সন্দর্শনের। স্থানটি পাঁচটি পাহাড় দিয়ে ঘেরা। প্রকৃতি নিজের হাতেই যেন একটি দুর্গ তৈরি করে রেখেছে। পাহাড়গুলার নাম—বিপুল, রত্নগিরি, উদয়গিরি, শোনগিরি, এবং বৈভার। বৈভার-পাহাড়ের পাদদেশে কয়েকটি কুণ্ড আছে। এদের মধ্যে নামকরা কুণ্ড হলো—সপ্তধারাকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড। শেষোক্ত কুণ্ডে সর্বদাই ভূগর্ভ থেকে জল উঠছে। রাজগিরের পাহাড় দেখলাম। বেশ উঁচু। বৈভারের কিছুদূরে রাজা জরাসন্ধের বৈঠক দেখতে পাওয়া যায়। এ বৈঠক পাথর দিয়ে তৈরি। কেউ কেউ বলেন, রাজগিরের বৈঠক প্রাগৈতিহাসিক যুগের রক্ষীভবন। রক্ষীরা এখান থেকে পাহারা দিত। বৈভার-পাহাড়েরর জৈনমন্দির দেখলাম, আর দেখলাম প্রাচীন শিব-মন্দিরটি। বলা হয়, রাজা জরাসন্ধ এই শিবমন্দিরে পূজো করতেন। চারধারে দেখবার মতো কত বিচিত্র বস্তু! কিন্তু একবেলায় কত জিনিস আর দেখা যায়। সন্ধ্যার পর আবাসস্থলে ফিরে এলাম।

দ্বিতীয় দিনে আমাদের দর্শনীয়—নতুন রাজগির—'নবরাজগৃহ'। প্রাচীন 'রাজগৃহ' মহারাজ বিম্বিসারের রাজধানী। তাঁর রাজত্বকালে গৌতম সিদ্ধার্থ এখানে এসেছিলেন। এখান থেকে গয়া চলে যান সিদ্ধার্থ। গয়ায় সিদ্ধিলাভ করেন। অজাতশত্রু রাজা হয়ে পুরানো রাজগৃহের উত্তরে নিজের নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন। এই নতুন রাজধানী সতেরো-আঠারো ফুট উঁচু দেয়ালে ঘেরা ছিল। অজাতশত্রুগড, অজাতশত্রু-স্তূপ পুরানো যুগেরে ইতিহাসখ্যাত নিদর্শন। দেখে মন অতীতচারী হয়ে উঠলো। মৌনী অতীত যেন কথা বলছে। তারপর চলে এলাম নতুন রাজধানীর দক্ষিণদিকের বেণুবনে। স্থানটি বাঁশবনে একদা ঘেরা ছিল, তাই, বেণুবন। রাজা বিম্বিসার এইটি উপহার দিয়েছিলেন বুদ্ধদেবকে। বেণুবন থেকে আরো দক্ষিণদিকে এগিয়ে গেলে দেখা যায়, বাঁ-দিকে একটি রাস্তা চলে গেছে। রাস্তাটি গিয়ে মিশেছে পূর্বোক্ত 'বিপুল' নামে পাহাড়টির পাদদেশে। এখানে একটি গুহা রয়েছে—দেবদত্ত-গুহা। গুহার একটুখানি নীচে মখ্‌দুমকুণ্ড। আরো একটি গুহা দেখেছি—সপ্তপর্ণী, বৈভারের আদিনাথের মন্দিরের উত্তরদিকের পাহাড়ে। এই সপ্তপর্ণী গুহার সম্মুখভাগে প্রথম-বৌদ্ধসভা হয়েছিল বুদ্ধের নির্বাণলাভের পর। শোনা যায়, 'ত্রিপিটক' এখানেই রচিত হয়েছিল।

তৃতীয় দিন ঘুরে বেড়িয়েছি 'বিপুল' পাহাড়ে, রত্নগিরি পাহাড়ে। দেখে নিয়েছি গৃধ্রকূট, মনিয়ার মঠ, শোণভাণ্ডার, জরাসন্ধের আখড়া। কতকগুলি বিখ্যাত স্তূপ বিপুল-পাহাড়ের গোড়ায় অবস্থিত। রত্নগিরিতে দর্শনীয়—দুটো জৈনমন্দির। রত্নগিরির দক্ষিণ-অংশের নাম গৃধ্রকূটচূড়া। এস্থানে এক [illegible] দেব ও [illegible]

করতেন। আরো কিছু ওপরে উঠলে চত্বরের মতো একটি জায়গা চোখে পড়ে। ওইখানে বসে বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিতেন। কত মহাসত্ত্ব পুরুষের পায়ের ধুলো পড়েছে, রাজগিরে, স্থানটি পবিত্রতায় ভরে উঠেছে। রাজগির ঐতিহ্যসমৃদ্ধ শহর। মনিয়ার মঠ বৌদ্ধযুগের স্থাপত্যের স্মারক।

রাজগিরের উষ্ণপ্রস্রবণগুলো সর্বকালের বিশেষ আকর্ষণ। এর জলে নানা রোগ সারাতে সাহায্য করে। যে-কয়দিন ছিলাম প্রতিদিন প্রস্রবণের জলে স্নান করেছি, কতবার পেট পুরে জল খেয়েছি। পাহাড়ে কয়েকবার ওঠা-নামা করলে আর প্রস্রবণের জল খেলে তীব্র ক্ষুধার উদ্রেক হবেই হবে। কাজেই, স্বাস্থ্যও ভালো হতে বাধ্য। তাই তো, লোকে এখানে আসে। এখানকার জলহাওয়ার আশ্চর্য গুণ।

চতুর্থ দিনে আমরা গেছি রাজগিরের অদূরবর্তী দুটি ঐতিহাসিক স্থান দেখতে—নালন্দা ও পাওয়াপুরী। 'নালন্দা' বহুশ্রুত একটি নাম। অধুনা এই স্থানের নাম বড়গাঁও। রাজগির থেকে দূরত্ব প্রায় আট মাইল। রাজগিরের দু-স্টেশন আগে নালন্দা। আমরা গিয়েছিলাম নালন্দায়, দুধারে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ পেরিয়ে। পথে দু'এক জায়গায় টাঙা থামিয়ে চা ও খাবার খেয়েছি। ইতিহাসে নালন্দার বৃত্তান্ত পড়েছি। এখন, সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নালন্দার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। নালন্দা প্রাচীন-কালের বৌদ্ধবিহার ও বিদ্যাকেন্দ্র। একদিন এই বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। বহুদূর থেকে ছাত্ররা এখানে পড়তে আসতো। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্‌সাঙ্‌ নালন্দায় এসে অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কাছে বৌদ্ধশাস্ত্র পড়েন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা তাঁদের প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য এখান থেকে আবিষ্কার করেছেন। এখানকার মিউজিয়ামে প্রাচীন যুগের বিচিত্র নিদর্শন সকলেই দেখতে পাবেন। নালন্দা বৌদ্ধতীর্থরূপে গণ্য ছিল। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ভারতবর্ষ একসময়ে কতখানি সমৃদ্ধ ছিল, নালন্দায় এলে বুঝতে পারা যায়। পৃথিবীর সংস্কৃতির ভাণ্ডারে ভারতের দান সামান্য নয়।

পাওয়াপুরী জৈনদের তীর্থস্থান। শেষ-তীর্থংকর মহাবীর এখানে দেহত্যাগ করেছিলেন। পাওয়াপুরী রোড স্টেশন থেকে এস্থানের দূরত্ব প্রায় সাত মাইল। পাওয়াপুরীর মন্দির কত সুন্দর, চোখে না দেখলে ঠিক বুঝা যায় না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিসর্গের রম্যতা। অপূর্ব দৃশ্য।

পঞ্চম দিনে বাকি কয়েকটি জায়গায় ঘুরেছি। বর্ণনা দিতে গেল সময় লাগবে। ততখানি অবকাশ আমাদের হাতে নেই। রাজগিরে প্রকৃতির সংসার ও মানব-সংসারের যে-মহিমান্বিত ঐশ্বর্য দেখেছি, স্মৃতির পটে চিরদিন তার ছাপ অঙ্কিত থাকবে।

ষষ্ঠ দিনে কলকাতায় ফেরার পালা। স্থানটি ছেড়ে আসতে মন চাইছিল না। তবু আসতে হবে। কলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়ে অদ্ভুত একটা আনন্দশিহরণ চিত্তে অনুভব করেছিলাম। রাজগিরকে পেছনে ফেলে আসতে মনে বেদনা জাগলো। কিন্তু নিরুপায়। কলকাতামুখী ট্রেন ছাড়লো। ভাবছিলাম, রাজগির দেখার সুযোগ কখন আবার মিলবে।

বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যের উদ্ভব ঃ

বাঙালি জনসমাজ যে-বিশেষ ধ্বনিসমষ্টির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে তা-ই বাঙলা ভাষা।

বাঙলা ভাষার মূল উৎস হল বৈদিক সংস্কৃত, যার প্রাচীনতম সাহিত্যিক রূপটি মুদ্রিত হয়েছে ঋগ্বেদ-সংহিতায়। এই ঋগ্বেদের ভাষাই বর্তমান ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক আর্যগোষ্ঠীসম্ভূত ভাষাগুলির আদিজননী। বৈদিক সংস্কৃত ভারতভূখণ্ডের আর্যজাতির ভাষা। আর্যদের অনুপ্রবেশ ও বসতিস্থাপনের পূর্বে ভারতবর্ষে দুটি অনার্যজাতির ভাষা প্রচলিত ছিল—দ্রাবিড় আর কোল।

খ্রীস্টপূর্ব পনেরো শতকের পূর্বেই কোনো সময়ে আর্যজাতি ভারতের ভূমিভাগে প্রবেশ করে। ভারতীয় আর্যগণের প্রাচীনতম সাহিত্যের নাম বৈদিক সাহিত্য, ও যে-ভাষায় ওই সাহিত্য নির্মিত হয়েছিল তার নাম বৈদিক সংস্কৃত। বৈদিক সংস্কৃতই বহুশত বৎসরের বিবর্তনের পথে বাঙলা ভাষায় বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে।

ঋগ্বেদ দেবতার আরাধনাবিষয়ক স্তোত্রের একটি সংকলনগ্রন্থ—বিভিন্ন ঋষির দ্বারা বিভিন্ন সময়ে এই স্তোত্র বা সূক্তগুলি রচিত হয়েছিল। এসব স্তোত্র একসময়ে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। পরে আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব দশম শতকে এগুলি একখানি গ্রন্থে সংকলিত হয়। এই গ্রন্থেরই নাম ঋগ্বেদ। পূর্বে বলা হয়েছে, ঋগ্বেদ-সংহিতার ভাষা ভারতের আর্যভাষার সবচেয়ে পুরানো নিদর্শন। এই প্রাথমিক যুগের ভারতীয় আর্যভাষা প্রাচীন বা আদি-ভারতীয় আর্যভাষা নামে পরিচিত, ইংরেজিতে—Old Indo-Arvan। উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থরাজিও এই ভাষাতেই রচিত।

ভারতবর্ষে এসে আর্যরা উত্তর-পাঞ্জাবে প্রথমে বসতি স্থাপন করে। তারপর ভারতের নানাদিকে আর্যজাতি ও তার ভাষার প্রসার ঘটতে থাকে। ভারতবর্ষের সুবিস্তৃত একটা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার ফলে, আর, দেশের তৎকালপ্রচলিত অনার্যভাষাগুলির প্রভাবাধীনে এসে, ভাষার পরিবর্তনধর্মের নিয়মানুসারে, আর্যভাষা নিজের বিশুদ্ধি রক্ষা করতে পারল না—ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল। এরূপ অবস্থায় আদি-ভারতীয় আর্যভাষা অর্থাৎ বৈদিক ভাষা কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে নতুন একটি রূপ গ্রহণ করল। তখন এর নাম হল মধ্যভারতীয় আর্য বা প্রাকৃত, ইংরেজীতে—Middle Indo-Aryan। খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম হতে ষষ্ঠ শতকের দিকে—বুদ্ধদেবের সময়ের পূর্বে—প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হয়। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক হতে দশম শতক পর্যন্ত কালটি মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগ।

প্রদেশভেদে প্রাকৃত ভাষার মধ্যে নানারকম রূপভেদ লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ অব্দের দিকে ভারতবর্ষে মুখ্যত তিন প্রকারের প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হয়েছিল: [১] উদীচ্য প্রাকৃত [২] মধ্যদেশীয় প্রাকৃত [৩] প্রাচ্য প্রাকৃত। প্রাচ্য অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষার দুটি বিভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায়—একটির নাম পশ্চিমী প্রাচ্য, অপরটির নাম পূর্বী প্রাচ্য। মগধ অঞ্চলে পূর্বী প্রাচ্য ভাষা বলা হত বলে এ মাগধী প্রাকৃত নামে পরিচিত। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকে, মৌর্যদের সময়ে এই পূর্বী প্রাচ্য বাঙ্‌লাদেশে প্রবেশ করতে থাকে; আর, খ্রীস্টোত্তর চতুর্থ শতকের মধ্যেই বাঙ্‌লাদেশে এর ব্যাপক প্রসার ঘটে। সংস্কৃত-নাটকে বররুচির প্রাকৃত ব্যাকরণে মাগধী প্রাকৃতের নিদর্শন মেলে। তারপর প্রায় ছয়-সাতশ বছর ধরে একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়ে, অপভ্রংশের স্তর পেরিয়ে, পরিশেষে মাগধী প্রাকৃত বাঙ্‌লার রূপ নিলে। মাগধী অপভ্রংশ বাঙ্‌লা ভাষা আর মাগধী প্রাকৃতের মধ্যবর্তী একটি স্তর। বাঙ্‌লা ভাষার উদ্ভবকাল মোটামুটি খ্রীস্টোত্তর দশম শতক। ভারতীয় আর্যভাষার এই আধুনিক যুগটিকে বলা হয় নব্যভারতীয় আর্যযুগ, ইংরেজিতে—New Indo-Aryan।

বাঙ্‌লা ভাষার আবার তিনটি যুগবিভাগ: [১] আদি বা প্রাচীন যুগ; [২] মধ্যযুগ; এবং [৩] নবীন বা আধুনিক যুগ। আদি যুগের বাঙ্‌লা ভাষার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন মেলে পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত 'বৌদ্ধগান ও দোহা-নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত **চর্যাপদ**গুলিতে। এই যুগের অন্যকোনো সাহিত্যিক-নিদর্শন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। বাঙ্‌লা সাহিত্যের আদিগ্রন্থ বলতে এখন আমরা এই '**চর্যাপদ**'কেই বুঝি। 'চর্যা'-নামীয় পদগুলি ছোট ছোট গীতিকবিতারই সমষ্টি, এদের বয়স প্রায় হাজার বছরের কাছাকাছি। বৌদ্ধতান্ত্রিক সহজিয়া সাধকেরাই এসব পদ রচনা করেছিলেন। ঠিক সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা থেকে চর্যাগীতিগুলি রচিত হয়নি, এদের রচনামূলে সক্রিয় রয়েছে বিশেষ একটি উদ্দেশ্য—সহজিয়া-মতবাদ-প্রচারণা। চর্যাপদ আসলে বৌদ্ধ-সহজিয়াদের ভাবধারা ও যোগসাধনার কথা। চর্যার সংখ্যা ৪৬।৪৭টি, চব্বিশ জন পদকর্তার অর্থাৎ চর্যার কবির নাম পাওয়া যাচ্ছে।

যে-ভাষায় চর্যা লেখা হয়েছে, দেখলে, প্রথমে তাকে বাঙ্‌লা বলেই মনে হয় না, এ ভাষা আমাদের অনেকেরই পরিচিত নয়। এর অবশ্য কারণও রয়েছে। বাঙ্‌লা ভাষা তখনো সৃজ্যমান, সবেমাত্র অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে স্বতন্ত্র একটি রূপ নিতে সুরু করেছে। তাই, এর বিশিষ্ট চেহারাটি সঠিক চিনে নেওয়ার জন্যে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। চর্যার আরো একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করবার মতো। এদের বাইরের অর্থ একরূপ, ভিতরের অর্থ অন্যরূপ। চর্যাগীতির আসল বক্তব্য কেবল তাঁরাই বুঝতে পারবেন যাঁরা বৌদ্ধ-সহজপন্থার মর্মকথাটি যথার্থ জানেন। অপরের কাছে পদগুলি একরূপ দুর্বোধ্য। সহজসাধনার কথা গুরুর মুখেই শুনতে হয়, না হলে এর রহস্য কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না।

একটি পদ উদ্ধৃত করি, এর থেকে চর্যার ভাষারীতি ও ভাবজগতের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাবে :

চিঅ সহজে শূন্য সংপুন্ন।
কান্ধবিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না॥
ভন কইসে কাহ্ন নাহি।
ফরই অনুদিন তৈলোএ পমাই॥
মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাব-তরঙ্গ কি সোষই সাঅর॥
মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই।
দুধ-মাঝে লড় অচ্ছন্তে ন দেখই॥
ভব জাই, ণ আবই এথু কোই।
অইস ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই॥ [চর্যা : ৪২]

পদটিতে ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে একালের বাঙ্‌লা ভাষার বিস্তর প্রভেদ। এর আদল অনেকটা ভারতীয় মধ্যযুগের আর্যভাষা প্রাকৃতের শেষ স্তর অপভ্রংশেরই মতো। আর, রূপক-উপমাদির প্রয়োগের মাধ্যমে এই পদে যা প্রচারিত হয়েছে তা সহজসিদ্ধাদের তত্ত্বকথা। এতে সহজসাধক কৃষ্ণাচার্য সিদ্ধাবস্থায় তাঁর অনুভবের কথা বলেছেন। জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে তিনি জ্ঞানলাভ করেছেন। জাগতিক সর্বপ্রকার মোহের ঊর্ধ্বে এখন তাঁর অবস্থিতি। এখন নির্বাণে সর্বশূন্যতায় তাঁর চিত্ত পূর্ণ রয়েছে। সাধনার উচ্চস্তরে পৌঁছে কৃষ্ণাচার্য জানাচ্ছেন, জন্মমৃত্যুর অতীত অবস্থায় তিনি উপনীত হয়েছেন, এখন মৃত্যুতে তাঁর ভয়ের কারণ নেই। মূঢ়জনেরাই মৃত্যুকে ভয় পায়; কিন্তু সিদ্ধসাধক কৃষ্ণাচার্য বুঝেছেন, দেহাবসান ঘটলে তাঁর অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাবে না, ত্রৈলোক্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে সর্বদা তিনি বিরাজ করবেন। একবিন্দু জল মহাসমুদ্রে মিশে গেলে তার অস্তিত্ব কি মুছে যায়? যায় না, সাগরের সর্বত্র তা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। পরম-কারণ থেকে দেহীরূপে কৃষ্ণাচার্যের উদ্ভব, মৃত্যুতে কায়ারূপটি বিনষ্ট হলে পুনর্বার সেই কারণসমুদ্রেই বিলীন হয়ে যাবেন তিনি। দৃষ্ট বস্তুকে নষ্ট হতে দেখলে মূর্খেরা কাতর হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এভাবে বিষণ্ণ হওয়ার কোনো কারণ নেই। সাগরবক্ষে তরঙ্গের দোলা জাগে আবার, ওই তরঙ্গ সাগরে লয় পায়। এতে যদি তরঙ্গের বিনষ্টি সূচিত হত তাহলে সমুদ্রই যে শুকিয়ে যেত। আসলে তা তো নয়। পার্থিব বস্তুনিচয়ের ভাবাভাবও ঠিক এইরূপ। রূপের অপচয়ে বিলোপের কল্পনা মানুষের মূঢ়তারই পরিচায়ক। দুধের মধ্যে স্নেহ-পদার্থ অদৃশ্যভাবে অবস্থান করে বলে তাকে কেউ দেখতে পায় না; ঠিক তেমনি, দেহান্তেও লোক বর্তমান থাকে—মূর্খতাবশে মানুষ তা বুঝতে পারে না। বস্তুত, পৃথিবীতে নতুন-কিছু আসে না, এখান থেকে কিছু চলেও যায় না; আসা-যাওয়ার লৌকিক ধারণাটি ভ্রান্তিপ্রসূত। সংসারের প্রকৃত স্বরূপটি বুঝে নিয়ে কৃষ্ণাচার্য পরমাশান্তিতে বিহার করছেন।

স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে, এ তত্ত্বকথা। একথা সবগুলি চর্যা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তথাপি চর্যাগুলিতে মাঝে-মধ্যে সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া যায়। সাধকগণের অনুভূতি যখন আন্তরিকতার স্পর্শ পেয়েছে এবং এই আন্তরিক অনুভূতি যেখানে অলংকৃত ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে সেখানে চর্যাগীতির কাব্যোৎকর্ষ স্বীকার করতেই হয়। তা ছাড়া, চর্যাপদের অন্যবিধ মূল্যও রয়েছে। এগুলিতে তাৎকালিক সামাজিক রীতিনীতি, বৃত্তিব্যবসায়, নিম্নশ্রেণীর লোকসাধারণের জীবনযাত্রা, ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। সে যা হোক, পুরানো বাঙ্‌লা ভাষার নিদর্শন হিসেবে চর্যাগীতির মূল্য অসামান্য।

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থটিতে খ্রীস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকের বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের বেশ কিছুটা নমুনা পাওয়া গেল। কিন্তু এর পরবর্তী দুশ-তিনশ বছরের কোনো সাহিত্যিক নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় না। একারণে সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ এই সময়টিকে বাঙ্‌লা সাহিত্যের 'অন্ধকার-যুগ' বলে আখ্যাত করেছেন। এটি যে একটি সকংটকাল বা যুগসন্ধিক্ষণ এবিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। তুর্কি অক্রমণে [ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে] দেশ বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, এই বিপন্ন অবস্থা কাটিয়ে উঠতে দেশবাসীর সময় লেগেছিল দুশ-আড়াইশ বছর।

ধীরে ধীরে 'অন্ধকার-যুগ' অবসিত হল, নতুন উদ্যমে সাহিত্য রচিত হতে লাগল। আমরা তাই এখন চর্যার কাল থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি, বাঙ্‌লা সাহিত্য' আদিযুগ পেরিয়ে যেন মধ্যযুগে উপনীত হয়েছে [গোটা মুসলমানরাজত্বের কালটি—ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক—বাঙ্‌লা সাহিত্যের মধ্যযুগ বলে পরিচিত]। এই মধ্যযুগের প্রথম স্মরণীয় গ্রন্থ বড়ু চণ্ডীদাসের কৃত '**শ্রীকৃষ্ণকীর্তন**'। চর্যাগীতির পর এটাই উল্লেখ্য মৌলিক রচনা। চর্যার ভাষা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে কী রূপ পেয়েছে, বইখানিতে তার বিশ্বস্ত নমুনা মেলে। ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতে এ বই রচিত হয়েছে ১৪৫০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে, তখনো শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হননি। 'শ্রীকৃষ্ণকার্তন' অসাধারণ একখানি কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার করেন স্বর্গত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়। এ পুঁথি ছাপা হয়ে ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার পূর্ণাঙ্গ একটি কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে। বৈষ্ণবপদাবলীর অধ্যাত্মভাবুকতা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মিলবে না; কৃষ্ণ ও রাধার প্রেমকথা এ বইয়ের উপজীব্য হলেও এতে অনুরণিত প্রেমের সুরটি একেবারে লৌকিক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার আংশিক-পরিচয়-জ্ঞাপক দু'একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হল।

প্রণয়াতুরা রাধাকে ফেলে কৃষ্ণ দূরে চলে গেছেন, অসহনীয় বিচ্ছেদবেদনায় কাতর হয়ে রাধা বলছেন :

মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিঁদুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচূর॥
কাহ্ন-বিনা সবখন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী॥

পুনমতী সব গোআলিনী আছে সুখে।
কোন্ দোষে বিধি মোক দিল এত দুখে॥
অহোনিশি কাহ্নাঞিঁর গুণ সোঁঅরিআঁ।
বজরে গঢ়িল বুক না জাএ ফুটিআঁ॥

অংশটির মর্মার্থ: প্রাণপ্রিয়তম কৃষ্ণবিহনে সিঁথির সিঁদুর রাধা মুছে ফেলবেন। এখন হাতের বলয়ে কী তাঁর প্রয়োজন? আজ কৃষ্ণবিরহিতা রাধার অবস্থাটি আহতা হরিণীর মতো, হৃদয়যন্ত্রণা তাঁর দুঃসহ হয়ে উঠেছে। বিরহতাপে তিনি জ্বলেপুড়ে মরছেন। বৃন্দাবনে তো আরো কত কত গোপনারী রয়েছে, কোনো দুঃখ তাদের নেই, পুণ্যবতী তারা। গোপনারী রাধাই কেবল অনন্ত-দুঃখের রাত্রি যাপন করছেন। বিধাতা তাঁর প্রতি অত্যন্ত বিরূপ। যে-কৃষ্ণ দূরে অপসরণ করলেন, রাধা আজ গৃহকোণে বসে বসে তাঁর গুণ স্মরণ করছেন, সমস্ত অন্তর বেদনায় হাহাকার করে মরছে। রাধার বুক যেন বজ্র দিয়ে গড়া, না হলে ফেটে চৌচির হয়ে যেতো।

কিছুটা স্থূলতা ও গ্রাম্যতার স্পর্শ থাকলেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থের কাব্যত্ব স্বীকার করতেই হয়। বৈষ্ণবপদাবলীর সূক্ষ্ম মণ্ডনকলার সৌন্দর্য এতে অবশ্যই নেই, কিন্তু চরিত্রচিত্রণে ও কাহিনীবিন্যাসে কবি প্রশংসনায় কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। এও লক্ষ্য করতে হবে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রাধাকৃষ্ণ অধ্যাত্মভাবনার বিগ্রহ নয়, তারা রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে। এতে একটি আখ্যান বর্ণিত হলেও, নাটকীয়তা প্রচুর থাকলেও, কাব্যখানি আসলে গীতিপ্রাণ। বাঙালির কবিপ্রতিভা গীতিকাব্যেই সমধিক স্ফুরিত হয়েছে। চর্যার মতো, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পুঁথির আবিষ্কারও বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। ভাষার দিক থেকে বিচার করলে 'চর্যাপদ'-এর পরেই এ বইয়ের স্থান।

বাঙ্‌লা সাহিত্যের মধ্যযুগকে একহিসেবে সমৃদ্ধির যুগই বলব আমরা। এই সময়ে সমস্ত মঙ্গলকাব্য, গোপীচাঁদের গীতিকা, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ, বৈষ্ণবপদাবলী, শাক্তপদাবলী, জীবনীসাহিত্য প্রভৃতি লেখা হয়েছে; একালেই কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবির আবির্ভাব; এই মধ্যযুগেই কারুশিল্প আর ভাস্কর্যে বাঙালি তার উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে চৈতন্যদেবের শুভ-আবির্ভাব-ঘটনাটি সর্বাধিক উল্লেখ্য। শ্রীচৈতন্যের ধর্মভাবুকতার প্রভাবে এদেশে একটা বিপুল সাহিত্য গড়ে ওঠে—বৈষ্ণবসাহিত্য।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান-রাজত্বের অবসান হল, ইংরেজজাতি এদেশে তাদের একাধিপত্য বিস্তার করল। পাশ্চাত্যপ্রভাবের ফলে আমাদের সাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতি বদলে গেল—শুরু হল বাঙ্‌লা সাহিত্যের আধুনিক যুগ। এ যুগের ভাষা ও সাহিত্য মোটামুটিভাবে আমাদের সকলেরই পরিচিত। বাঙলাগদ্যের উদ্ভব ঘটে এই কালটিতে। মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আধুনিক যুগের

ধারাপথটি অনুসরণ করা সহজ হয়ে উঠেছে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রমুখ শক্তিধর লেখকের শিল্পরচনপ্রতিভা আধুনিককালের বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যকে উজ্জ্বল গৌরবমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমাদের সাহিত্য এখন বিচিত্রমুখী বিকাশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে বাঙ্‌লা ভাষার একটি বংশপীঠিকা তৈরি করা যায়, তা হল : বৈদিক কথিত ভাষার বিভিন্ন রূপভেদ>প্রাচ্য অঞ্চলের কথিত ভাষা> কথিত মাগধী প্রাকৃত>মাগধী অপভ্রংশ [মাগধী অপভ্রংশের কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি, এর একটি সম্ভাব্য রূপ কল্পনা করা হয়েছে]>প্রাচীন বাঙ্‌লা>মধ্যযুগের বাঙ্‌লা>আধুনিক বাঙ্‌লা। বৈদিকশব্দগুলি কীভাবে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের কালে এসে পৌঁছেছে তার দু'একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

বৈদিক সংস্কৃত	প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাঙ্‌লা	আধুনিক বাঙ্‌লা
দুহিতা	ধীতা, ধীদা, ধীআ	ধীঅ	ঝিঅ	ঝী, ঝি
কৃষ্ণ	কণ্‌হ	কণ্‌হ	কাণ্‌হ, কাহ্ন	কানু, কানাই
কর্কট	কক্কট, কক্কড়, কংকড	কংকড	কংকড়া	কাঁকড়া
অষ্টাদশ	অট্‌ঠারহ	অট্‌ঠারহ	আঠারহ	আঠার
কথয়তি	কথেতি	কহেদি, কহেই	কহই	কহে, কয়
ভবতি	হোতি, হোদি	হোই	হোই	হয়
গৃহ+ধি	ঘরধি, ঘরহি	ঘরহি	ঘরই	ঘরে
গ্রাম	গাম	গাঁব	গাঁও	গাঁ

বৈদিক কথিত ভাষা যুগে যুগে সরল হতে হতে—প্রাকৃত ও অপভ্রংশের স্তর পেরিয়ে—বাঙ্‌লার বিশিষ্ট রূপ নিলে। শব্দে, বাক্যের গঠনরীতি ও উচ্চারণ-রীতিতে বৈদিক সংস্কৃতের সঙ্গে এর বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ভারতীয় আর্যভাষা একদা অনার্যভাষার সংস্পর্শে এসেছিল। একারণে বহু অনার্য শব্দ আর্যগোষ্ঠীসম্ভূত বাঙ্‌লা ভাষায় প্রবেশ করেছে। তা ছাড়া, বাঙ্‌লা তার শব্দসম্ভারের ক্ষেত্রে কয়েকটি বহির্ভারতীয় ভাষার কাছেও ঋণী। বাঙ্‌লা ভাষার উপাদান বিশ্লেষ করলে তাতে কতকগুলি বিদেশী শব্দ চোখে পড়ে; যেমন—ফারসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজি প্রভৃতি শব্দ।

আধুনিক যুগে বাঙ্‌লা ভাষার দুটি রূপ দাঁড়িয়ে গেছে—লেখ্য ও কথ্য বা সাধু ও চলিত। আগে আমাদের সাহিত্য রচিত হত সাধুভাষায়, চলিত ভাষা তখন সাহিত্যের বাহন ছিল না। সাম্প্রতিক কালে চলিত ভাষাও সাহিত্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। এখানে চলিত ভাষা বলতে ভাগীরথীতীরবর্তী অঞ্চলের শিষ্ট জনের কথ্য ভাষাই বুঝতে হবে। ভাষা গতিশীল সজীব একটি বস্তু। জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কালে কালে ভাষাও বিবর্তিত হয়। আজ আমরা যে-ভাষায় কথা বলছি, সাহিত্য লিখছি, কালক্রমে তাও হয়তো বদলে গিয়ে নতুনতর একটি রূপ গ্রহণ করবে। তার ইতিহাস লিখবে আগামী দিনের বাঙালি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মঙ্গলকাব্য : মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল

মঙ্গলকাব্যপাঠের ভূমিকা :

মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্য প্রধানত তিনটি ধারায় প্রবাহিত—আখ্যানকাব্য, গীতিকবিতা ও অনুবাদকাব্যের ধারা। আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলি প্রথম ধারার, বৈষ্ণবপদাবলী দ্বিতীয় ধারার, এবং রামায়ণ-মহাভারত আদির অনুবাদ তৃতীয় ধারার অন্তর্ভূত। মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবকবিতা বাঙালির কবিপ্রতিভার মৌলিক দান। অনুবাদসাহিত্য তার পৌরাণিক সংস্কৃতিচর্চার পরিচয়বাহী।

বাঙ্‌লা সাহিত্যের মধ্যযুগের বৃহত্তম শাখা হল মঙ্গলকাব্য। খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এর ব্যাপ্তিকাল। বাঙ্‌লার বিভিন্ন অঞ্চলের বহুসংখ্যক খ্যাত, স্বল্পখ্যাত ও অখ্যাত কবি এজাতের কাব্যরচনে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। যখন বৈষ্ণবগীতিকাব্য রচিত হয়নি, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদকর্ম সবে মাত্র সুরু হয়েছে, তখন মঙ্গলকাব্যই ছিল এদেশের প্রধান সাহিত্য। এশ্রেণীর সাহিত্যকর্মের উদ্দেশ্যমূলকতা অতিশয় স্পষ্ট—সাম্প্রদায়িক ধর্মপ্রচার—নানান্ দেবদেবীর মাহাত্ম্যখ্যাপন। মঙ্গলকাব্য নিঃসন্দেহে ধর্মকেন্দ্রিক।

মঙ্গলকাব্যের দেবতারা যেন আমাদের চারদিকের এই পরিচিত সংসারেরই মানবমানবী। অলৌকিক শক্তির অধিকারী হলেও মানুষের মতোই এঁদের আচরণ। এঁরা উপাসকের কল্যাণবিধান করেন, বিপদকালে তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন, তার রোগ-তাপ-দুর্গতিমোচনে এঁদের উদ্যম প্রয়াসের অন্ত নেই। ভক্তজনের ওপর এইসব দেবতার কৃপা অকৃপণভাবে বর্ষিত হয়, আর, মর্ত্যালোকে এঁদের পূজাপ্রচারে যারা বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় তাদের সম্পর্কে এঁরা অত্যন্ত প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেন। তাই, মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখি, যে-মানুষ দেবতার কাছে আত্মসমর্পন করেছে, অনেক ধনদৌলতের অধিকারী হয়েছে তারা, কেউ-বা রাজসিংহাসনেও বসেছে। পক্ষান্তরে, দেবদ্রোহিতা যে করেছে তার সর্বনাশ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সহজে বুঝতে পারা যায়, দেবতার বরে অভীষ্ট হাতের মুঠোয় আসে, আর, দেবতার বিমুখতায় সর্বহারা হতে হয়। দেবতার নির্ভয় বক্ষোদেশে আশ্রয় নিলে কোনোরূপ অকল্যাণের সম্ভাবনা থাকে না, কারণ, ভক্তকে মঙ্গলদানের জন্যই মর্ত্যভূমিতে এঁদের আবির্ভাব। উপাসকের সভক্তি পূজা পেলে এঁরা নিরতিশয় সন্তুষ্ট থাকেন।

যেসব দেবদেবী ইহলোকে নরনারীকে সর্বপ্রকার বিপদের উর্ধ্বে তুলে ধরেন,

যাঁদের পূজা করলে ভক্তের সকল বিপদ নিঃশেষে কেটে যায়, তাঁদেরই বলা হয়েছে 'মঙ্গলদেবতা'। মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর এবং পরপর্তীকালে দক্ষিণ রায়, কালু রায়, ষষ্ঠী, শীতলা প্রত্যেকেই এরূপ এক-একজন দেবদেবী। এসব দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনী যে-কাব্যে গ্রথিত হয়েছে তার নাম 'মঙ্গলকাব্য'। এককালে বিশেষ বিশেষ মঙ্গল-দেবতার পূজা-অনুষ্ঠানে এসব কাব্য গান করা হত, এবং এ ছিল পূজারই একটি অঙ্গ।

এবার মঙ্গলকাব্যের মোটামুটি একটা সংজ্ঞা নিরূপণ করা যেতে পারে: অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন, মঙ্গলবিধায়ক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে-কাব্য বা গান রচিত, যার গীতিঝংকৃত আবৃত্তি শুনলে রচয়িতার, গায়কের ও শ্রোতার মঙ্গল হয়, এক মঙ্গলবারে শুরু হয়ে পরের মঙ্গলবার পর্যন্ত যে-কাব্য গীত হয়, তাকেই বলে মঙ্গল-কাব্য বা মঙ্গলগান। দেবতার মহিমাকথন ও পূজাপ্রচারই এসব কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। আট দিন ধরে দুবেলা গান করা হত বলে এসব কাব্য বা গানকে 'অষ্টমঙ্গলা'ও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ধর্মমঙ্গল-গান বারোদিন ধরে চলে ও মনসামঙ্গল বা মনসার ভাসান গোটা শ্রাবণ মাস ধরে গীত হয়।

মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত দেবদেবীর জাতকুল সম্পর্কে এস্থলে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। এঁরা সকলেই গ্রাম্যদেবতা বা লৌকিক দেবতা—অনার্যকল্পনাসম্ভূত। আদিতে সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যেই এঁদের পূজার প্রচলন ছিল। সুপ্রাচীনকালে বাঙ্‌লাদেশে অনার্য জাতি বাস করত। বাঙ্‌লাদেশ নদীতে-অরণ্যে-জলাভূমিতে আকীর্ণ, বাঘ-কুমীর-সাপ, ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর নিত্য-আনাগোনা এখানে। এদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বাঙ্‌লার আদিম অধিবাসীরা [দ্রাবিড়, কোলগোষ্ঠীর মানুষ এরা] নানান্ দেবতার কল্পনা করেছিল —সাপের দেবতা, বাঘের দেবতা, কুমীরের দেবতা—যেমন, মনসা, দক্ষিণ রায়, কালুরায়, ইত্যাদি। আর্যরা অনার্যদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলেও উক্ত সব অনার্যদেবতা দীর্ঘকাল আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠা পায়নি। কিন্তু একদা রাষ্ট্রবিপ্লবে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের সন্ধিক্ষণে বাঙ্‌লাদেশ তুর্কিদের দ্বারা বিজিত হল, দেশশাসনের অধিকার চলে গেল মুসলমানের হাতে। এহেন জাতীয় সংকটের দিনে সামাজিক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ল। বিপর্যস্ত হিন্দুসমাজ মুসলমান-শাসকজাতির ধর্মীয় প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনার প্রয়োজন অনুভব করল। এর ফলে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দীর্ঘকালের ব্যবধান ঘুচে গেল, উভয়ের সংস্কৃতির মধ্যে আদানপ্রদান চলতে লাগল। তখন উপরতলার হিন্দুরা নীচের তলার হিন্দুজনসাধারণের পূজিত লৌকিক ধর্ম ও লৌকিক দেবদেবীকে স্বীকৃতি জানাল, অন্যদিকে, সমাজস্থ নিম্নবর্ণের মানুষ ব্রাহ্মণ্য ও পৌরাণিক সংস্কৃতিকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করার সুযোগ পেল। এইভাবে বহুতর অনার্যদেবতা আর্যদেবদেবীর পাশে আপনাদের স্থান করে নিল এবং কালক্রমে এরা পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল। এখন সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ এঁদের পূজা-অর্চনার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন না।

সকল 'মঙ্গল'-এরই রূপাবয়ব প্রায় এক ধরণের, এদের ছাঁচের মধ্যে লক্ষ্যণীয় স্বাতন্ত্র্য তেমন চোখে পড়ে না। কবিরা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দেবতার মাহাত্ম্যবর্ণনে হাত দেন, কাব্যের নায়কনায়িকারা শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যধামে আসেন। তাঁরা পৃথিবীতে এসে অনেক দুঃখকষ্ট পান, অবশেষে দেবতাদের অনুগ্রহে তাঁদের দুর্গতিমোচন হয়, মর্ত্যে উদ্দিষ্ট দেবদেবীর প্রচারকর্ম শেষ হলে তাঁরা স্বর্গলোকে ফিরে যান। ভক্তের প্রতি দেবতার অশেষ কৃপা—অবিশ্বাসীকে পূজাপ্রত্যাশী দেবতা ছলে-বলে-কৌশলে সর্বনাশের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত হন না। এজাতীয় কাব্যে নানা পৌরাণিক দেবদেবীর বন্দনা, সৃষ্টিতত্ত্ববর্ণন, ইত্যাদি সর্বত্র মেলে। তার সঙ্গে রয়েছে নায়কনায়িকার প্রথাগত রূপবর্ণনা, কুলকামিনীর পতিনিন্দা, রন্ধনবিবরণ, 'বারমাস্যা' বা নায়কনায়িকার বারোমাসের সুখদুঃখের কথা, বিপন্ন নায়কের বর্ণানুক্রমে চৌত্রিশ অক্ষরে দেবমহিমাসূচক স্তব-উচ্চারণ, এবং আরো নানাকিছু। দুয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া চরিত্রচিত্রণেও তেমন বৈচিত্র্য দেখা যায় না। এরূপ হওয়ার প্রধান একটি কারণ কবির মৌলিক সৃষ্টিপ্রতিভার অভাব।

মঙ্গলকাব্যগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষ যেমনই হোক, মধ্যযুগের বাঙালির রাজনীতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের বিশ্বস্ত আলেখ্য এদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে বলে এজাতীয় রচনার একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। বাঙালিজাতির ইতিহাস লিখতে যাঁরা ইচ্ছুক, মঙ্গলকাব্যের পাতায় তার প্রভূত উপকরণ তাঁরা পাবেন। সে কালের মানুষেরা জীবনযাত্রার এমন নিখুঁত ছবি অন্যত্র দুর্লভ।

সেকালে কবিপ্রতিভাবিকাশের একটি বড়ো ক্ষেত্র ছিল 'মঙ্গল'-শ্রেণীর কাব্য। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে পুরাণ রচনার আদর্শে এজাতের কাব্য অতিশয় বিশিষ্ট একটি রূপ পরিগ্রহ করে। অষ্টাদশ শতকের দিকে এই আদর্শের কাব্যানুশীলন ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে। ভারতচন্দ্রের পর আর-কোনো বাঙালি কবি মঙ্গলকাব্য লেখেননি। এসময়ে মুসলমানরাজত্বের শেষ হয়ে এলে, দেশে ইংরেজের আগমন ঘটল। ফলে বাঙলাভূমিতে যে পাশ্চাত্য হাওয়া বইল তা আমাদের সাহিত্যের রূপ ও ভাবাদর্শ বদলে দিল। নতুন যুগে নতুন সাহিত্য জন্ম নিল।

॥ মনসামঙ্গল-কাব্য ॥

[পদ্মাপুরাণ বা মনসার ভাসান]

ভূমিকাবাক্য :

রচনারীতি ও বিষয়বস্তু দেখে, মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গলই প্রাচীনতম সৃষ্টি বলে মনে হয়। অবশ্য এ বিষয়ে সকলে একমত নন। মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ বা মনসার ভাসান-এ সাপের দেবতা মনসার মাহাত্ম্যকথা বর্ণিত হয়েছে।

মনসার পূজার সঙ্গে সর্পপূজার ইতিহাসটি জড়িত। ভারতের অনার্য অধিবাসীরা অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে সাপের পূজা করত, স্ত্রীদেবতার পূজাও এদের

আর-একটি উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য। এই আর্যেতর আদিম অধিবাসিগণ দ্রাবিড়গোষ্ঠীরই মানুষ। দ্রাবিড়-ভাষাভাষীরা আর্যদের বহু পূর্বে ভারতে আসে এবং তাদের দ্বারাই এদেশে সর্পপূজা প্রচলিত হয়। বোধ করি একারণেই অনার্য [দ্রাবিড়]-প্রধান দাক্ষিণাত্যে ও বাঙলাদেশে সর্পপূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। কেউ কেউ অনুমান করেছেন, দাক্ষিণাত্যের লোকদের পূজিত সর্পদেবী 'মঞ্চী' বা 'মঞ্চামা' নামটি লোকমুখে বিকৃত হয়ে 'মনসা'-য় পরিণত হয়েছে। একথা সত্য হলে, বলতে হবে, মনসার পূজা-অনুষ্ঠানের সঙ্গে দ্রাবিড়জাতির ধর্মবিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। অবশ্য 'মনসামঙ্গল'-এ বলা হয়েছে, শিবের মানসকন্যা বলে এই সর্পদেবতার নাম মনসা, পদ্মবনে তাঁর জন্ম বলে তিনি পদ্মাবতী-নামেও পরিচিত। যাই হোক, মনসা যে লৌকিক দেবতা—পৌরাণিক দেবতা নন—এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নেই।

মনসামঙ্গল-এর মূলকাহিনী পুরাণাশ্রয়ী নয়, লোকমুখে এ কাহিনীর উদ্ভব। এর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে বলেও মনে হয় না। আরো একটি কথা। পূর্ববঙ্গে, উত্তরবঙ্গে মনসামঙ্গল যতখানি জনপ্রিয়, পশ্চিমবঙ্গে ততখানি নয়। শেষোক্ত অঞ্চলে চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলই সমাদর পেয়েছে বেশি। মনসামঙ্গল-এর অধিকাংশ খ্যাতিমান কবি পূর্ববঙ্গেরই লোক।

মানবীয় আবেদন, করুণ-রসের নির্বাধ উৎসার, পৌরুষদীপ্ত দেবদ্রোহী চন্দ্রধরের উদাত্ত চরিত্রমহিমা, সনকার মমতাময়ী মাতৃমূর্তি, বেহুলার সতীত্বের তেজ 'মনসামঙ্গল'-কে অতিশয় চিত্তস্পর্শী কাব্য করে তুলেছে। একারণে মঙ্গলসাহিত্যের মধ্যে মনসামঙ্গল কাব্যের প্রতিই আমাদের পক্ষপাত কিছুটা বেশি।

মনসামঙ্গল-কাব্যের মূলকথাবস্তু বা কাহিনীসংক্ষেপ :

শিবের মনে একটা সৃষ্টিবাসনা জাগল। তার ফলে কালিদহের পুষ্পবনে এক সুন্দরী কন্যার জন্ম হল। মানসকন্যা বলে শিব তার নাম রাখলেন—মনসা। পদ্মপাতার উপর জন্মেছিলেন বলে আর-একটি নাম হল—পদ্মা।

শিব নবজাত কন্যাকে নিজগৃহে নিয়ে গেলেন না পত্নী চণ্ডীর কলহের ভয়ে। মেয়েটি পাতালে আশ্রয় পেলেন। সেখানে নাগকুলের দেবতা হলেন তিনি।

একদিন পিতা মহাদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে পিতাকে মনসা বললেন, কৈলাসে গিয়ে মা চণ্ডীকে তিনি দেখবেন। ইচ্ছা না থাকলেও অনন্যোপায় হয়ে মনসাকে শিব কৈলাসে নিয়ে এলেন। চণ্ডীর কাছে মনসা নিজের পরিচয় দিলেন, চণ্ডী তাঁর মা, শিব—বাবা। চণ্ডী মনসার কথা একেবারেই বিশ্বাস করলেন না, অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হয়ে মেয়ের চুলের মুঠি ধরে টেনে তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। ফলে মনসার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেল।

মায়েতে-মেয়েতে বিরোধ। নিরুপায় শিব কন্যাকে সিজুয়া পর্বতের একটি স্থানে রেখে এলেন। বেদনাতুর শিবের চোখ থেকে একফোঁটা জল মাটিতে পড়ল।

মুহূর্তে ওই অশ্রু রূপ গ্রহণ করল আর-একটি মেয়ের। নেত্রজলে জন্ম বলে এই মেয়ের নাম হল নেত্রবতী বা নেতা।

দেবতার কন্যা অথচ দেবসমাজে মনসার প্রতিষ্ঠা নেই। একদিন কিন্তু এর সুযোগ এসে গেল। দ্বিতীয়বার সমুদ্রমন্থনে ভয়ংকর বিষ উঠে এলে বিশ্বসংসারকে রক্ষা করবার জন্যে মহাদেব ওই হলাহল পান করলেন, বিষক্রিয়ায় তিনি ঢলে পড়লেন। কী করে এই মহাসংকট উত্তীর্ণ হওয়া যায়? তখন ডাক পড়ল 'বিষহরি' মনসার। তিনি এসে মন্ত্রশক্তিতে পিতা শিবের দেহকে বিষমুক্ত করলেন। স্বর্গে মনসা দেবতার সম্মান পেলেন। কৈলাসে তাঁর স্থান হল। তারপর যথাসময়ে জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিয়ে হয়ে গেল। কিছুকাল পরে জরৎকারু কিন্তু মনসাকে ছেড়ে চলে গেলেন। স্বামীপরিত্যক্তা মনসা পিতৃগৃহে আর রইলেন না, অজানা পথে বেরিয়ে পড়লেন। নেতা তাঁকে উপদেশ দিলেন, মর্ত্যে পূজা প্রচারিত হলে তাঁর সকল দুঃখ ঘুচবে। মর্ত্যলোকে শিবভক্ত চন্দ্রধর বা চাঁদ সদাগরের অশেষ প্রতিপত্তি। চম্পকনগরের এই চাঁদবেনের নিকট হতে পূজা আদায় করতে পারলে মনসার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হবে।

চন্দ্রধর মস্তবড়ো ধনী। জমজমাট তাঁর সংসার। স্ত্রী সনকা গুণবতী নারী। চাঁদের ছয় ছেলে, ছয় পুত্রবধূ। সপ্তডিঙা সমুদ্রে ভাসিয়ে চাঁদসদাগর বাণিজ্য করেন। প্রাসাদোপম তাঁর বাড়ী। এই চাঁদ কিন্তু শিবের পরম ভক্ত। আরাধনায় তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে 'মহাজ্ঞান' দান করেছেন। শিবদত্ত মহাজ্ঞানপ্রভাবে মৃতকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন তিনি। জন্ম থেকেই চন্দ্রধর সাপের শত্রু, সাপ দেখলে হাতে হেঁতালের লাঠি [হেমতাল-যষ্টি] নিয়ে মারতে যান। চম্পকনগরে ধন্বন্তরি, শঙ্খ প্রমুখ বিখ্যাত সাপের ওঝারা রয়েছেন। এহেন শৈব চন্দ্রধরের কাছ থেকে সর্পদেবী মনসা পূজা আদায় করবেন—অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ।

তথাপি মনসার প্রয়াসের অন্ত নেই। প্রথমে তিনি সমাজের নিম্নশ্রেণীর জেলেদের মধ্যে নিজের পূজা প্রচার করলেন কৌশলে। দেবীর ঘটা পূজা করে তাদের অবস্থা ফিরে গেল। চাঁদের স্ত্রী যখন জানলেন যে, ওইভাবে পূজা নিবেদন করলে দেবী তুষ্ট হন তখন তিনি জেলেদের নিকট হতে মনসার ঘট নিজ গৃহে নিয়ে এলেন। চাঁদের গৃহে গোপনে মনসার পূজা চলতে লাগল।

এ সংবাদ কিন্তু চন্দ্রধরের অবিদিত রইল না। তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করে হেঁতালের লাঠি দিয়ে মনসার ঘট ভেঙে দিলেন, স্ত্রীকে সাবধান করে দিলেন তাঁর ঘরে আর কোনোদিন যেন মনসার পূজা না হয়। এতে মনসা অত্যন্ত কুপিত হলেন। এবার সুরু হল তাঁর প্রতিশোধগ্রহণের পালা, বিদ্রোহী চাঁদকে নাকাল না করে তিনি ছাড়বেন না। তাঁর নির্দেশে নাগদল এসে চন্দ্রধরের প্রাসাদসংলগ্ন বাগানটিকে নষ্ট করে দিল। কিন্তু 'মহাজ্ঞান' চাঁদের আয়ত্তে, এর শক্তিতে বিনষ্ট বাগানটিকে তিনি জীইয়ে তুললেন। মনসা তখন আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। মায়াজাল বিস্তার করে তিনি প্রথমে চাঁদবেনের মহাজ্ঞান হরণ করলেন; তারপর

সাপ পাঠিয়ে, আর বিষপ্রয়োগ করে, একে একে নগরের ওঝাদের প্রাণে মারলেন, এবং সর্বশেষে অনন্ত ও বাসুকি নাগের সহায়তায় চন্দ্রধরের ছয়-ছয় পুত্রের মৃত্যু ঘটালেন। পুত্রহারা চন্দ্রধর আর সনকার অন্তর শোকযন্ত্রণায় দীর্ণবিদীর্ণ হল।

কিন্তু চন্দ্রধরের পৌরুষ অনমনীয়। দৈবের কাছে দয়া ভিক্ষা কদাপি তিনি করবেন না। মনসার প্রতি তাঁর ঘৃণা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। শৈব চাঁদসদাগর সাপে-কাটা মরা ছয় ছেলেকে ভেলায় চাপিয়ে জলে ভাসিয়ে দিলেন—হিংস্রস্বভাবা মনসার মনস্কামনা সিদ্ধ হোক। একদিকে চন্দ্রধর দেবদ্রোহী, অন্যদিকে মনসা নিজের পূজাপ্রচারে কৃতসংকল্পা। উভয়ের সংঘর্ষ উত্তরোত্তর তীব্র হয়ে উঠল।

চাঁদ আবার বাণিজ্যযাত্রা করলেন। মনসাও তাঁর পিছু নিলেন। সমুদ্রপথে নানা জায়গায় সওদা চলল। সিংহলে ব্যাণিজ্যপণ্যে তাঁর সবগুলি ডিঙা বোঝাই হয়ে উঠল। এবার মহামূল্য সম্পদ নিয়ে চন্দ্রধরের ফিরবার পালা। ফেরাব মুখে তরণী এসে পড়ল কালিদহে। এই দুস্তর সমুদ্রে চাঁদের সর্বনাশ করতে উদ্যত হলেন মনসা। সহসা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হল, চারিদিক গহন আঁধারে ঢেকে গেল, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় সাগরের বক্ষোদেশ তরঙ্গসংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। চন্দ্রধর বুঝতে পারলেন, ভয়াল প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে ডিঙাগুলিকে রক্ষা করা যাবে না। নৌকাডুবি হলে প্রাণেও তিনি মরবেন। এইরূপ একটি সংকটাপন্ন অবস্থায় মেঘের আড়াল হতে মনসা চাঁদসদাগরকে জানালেন যে, একমুঠো ফুল তাঁর [মনসাদেবীর] চরণে অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদন করলে ধনেজনে তিনি রক্ষা পাবেন, তাঁর মৃত পুত্রেরা পুনর্জীবিত হবে, সমস্ত বিপদ কেটে যাবে। কিন্তু পদ্মার প্রলোভনে চাঁদ ভুলবেন এমন দুর্বলচিত্ত মানুষ তিনি নন। পদ্মাদেবীর কথা শুনে ক্রোধে তিনি ফেটে পড়লেন।

চন্দ্রধরের কটুবাক্য মনসার অসহ্য। ক্ষিপ্তা হয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর ভয়ংকর রোষে একে একে চাঁদের সবগুলো ডিঙা ডুবল, অর্ধ-অচৈতন্য চাঁদ সমুদ্র-তরঙ্গের ওপর ভাসতে লাগলেন। চন্দ্রধর মরলে পূজা প্রচারিত হয় না, তাই চাঁদকে বাঁচাবার জন্যে মনসা একগুচ্ছ পদ্মফুল জলে নিক্ষেপ করলেন। আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো, তার আলোয় ওই ফুল দেখে আশ্রয়লাভের আশায় চাঁদ ভাসমান ফুলের দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু যেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, ফুলগুলি পদ্ম—তার সঙ্গে পদ্মাবতী [মনসার এক নাম] নামের সংস্পর্শহেতু—অমনি দারুণ ঘৃণায় নিজের হাত সরিয়ে নিলেন। তারপর তরঙ্গান্বিত সমুদ্রের সঙ্গে বহুক্ষণ সংগ্রাম করে কোনোরকমে তিনি তীরে এসে পৌঁছলেন। বহু দুর্দশা ভোগ করে দীর্ঘকালের ব্যবধানে চাঁদ যখন নিজ বাড়ীতে ফিরলেন তখন উন্মাদের মতো তাঁর অবস্থা। সনকা হৃতসর্বস্ব স্বামীকে চিনতে পেরে কাঁদতে লাগলেন।

চন্দ্রধর যখন বাণিজ্য করতে যান তখন সনকা গর্ভবতী ছিলেন। যথাকালে একটি পুত্রসন্তান লাভ করলেন তিনি। এই ছেলের নাম রাখা হল লখিন্দর। লখিন্দরের জন্মের পিছনে মনসাদেবীর বিশেষ একটি ইচ্ছা সক্রিয় রয়েছে। ইচ্ছাটি হল চাঁদবেনের পুত্র আর পুত্রবধূকে দিয়ে নিজের পূজা প্রচার করা। মনসার চক্রান্তে

পড়ে স্বর্গলোকের অনিরুদ্ধ ও ঊষা দেবসভায় নৃত্যকালে তালভঙ্গ করল। ফলে তাদের ওপর ইন্দ্রের অভিশাপ বর্ষিত হল—মর্ত্যলোকে মানবগৃহে তাদের জন্ম নিতে হবে। অনিরুদ্ধ জন্ম নিল চম্পকনগরের চাঁদসদাগরের গৃহে—নাম হল লখিন্দর; ঊষা জন্ম নিল উজানী নগরের সায়বেনের ঘরে—নাম হল বেহুলা। ইতোমধ্যে উভয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে।

ছয়টি পুত্র হারাবার পর সপ্তম পুত্র লখিন্দরকে পেয়ে চন্দ্রধর সমস্ত দুঃখকষ্ট, ক্ষয়ক্ষতির কথা ভুলে গেছেন। বড়ো আদুরের ছেলে। তিনি স্থির করলেন, পুত্রের বিয়ে দিতে হবে। আনেক পাত্রী খোঁজার পর সায়বেনের কন্যা রূপে-গুণে অতুলনীয়া বেহুলাকে তাঁর পছন্দ হল। ঘটা করে একদিন এই মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেন চন্দ্রধর। বউ ঘরে এল।

উপেক্ষিতা মনসা হতে পুত্র ও পুত্রবধূর অনিষ্ট আশঙ্কা করে চাঁদ সুদক্ষ কারিগরদের দিয়ে লোহার বাসর তৈরি করিয়েছিলেন চম্পকনগরের অদূরবর্তী সাঁতালি পর্বতের ওপর। একটি ছিদ্রও এতে থাকবার কথা নয়, এরূপ ঘরে সাপ কিছুতেই প্রবেশপথ পাবে না। কিন্তু মনসাদেবীর নির্দেশে কারিগর ওতে একটি গোপন ছিদ্র কেটে রেখেছিল। চন্দ্রধর তা জানতেন না। তিনি বেহুলা-লখিন্দরকে ওই লোহার বাসরে পাঠালেন, আর নিজে হেঁতালের লাঠি হাতে নিয়ে উক্ত গৃহের চতুঃপার্শ্বে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। মশালের আলোয় রাত দিনের মতো হয়ে উঠেছে।

হায়, দৈবশক্তির কাছে মানুষের শক্তি কত তুচ্ছ। দেবীর মায়াপ্রভাবে গোটা চম্পকনগর সহসা ঘুমে আচ্ছন্ন হল। সকলে যখন নিদ্রায় অভিভূত তখন মনসার প্ররোচনায় কালীয় নাগ সেই গোপন রন্ধ্র দিয়ে বাসরে ঢুকে লখিন্দরকে দংশন করল, বিষের জ্বালায় লখিন্দর চিৎকার করে উঠল। চিৎকার শুনে বেহুলা চমকে জেগে উঠল। তখন সর্বনাশ হয়ে গেছে, লখিন্দরের দেহে প্রাণ নেই। বেহুলার বুকফাটা আর্তনাদে রাতের আকাশ ভরে উঠল। অল্পক্ষণের মধ্যে এ দুঃসংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সনকা পাগলিনীর মতো ছুটে এসে মৃত পুত্রকে বুকে জড়ালেন। চন্দ্রধরের চোখে কিন্তু এক ফোঁটা অশ্রু নেই। পুঞ্জীভূত ক্রোধ তাঁকে উন্মাদ করে তুলেছে। হেঁতালের লাঠিটি তুলে মনসাকে বধ করতে প্রস্তুত হলেন তিনি।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হল। বেহুলার অঙ্গীকার, স্বামীকে নিয়ে সে সাগরে ভাসবে, যেমন করেই হোক দেবপুরে গিয়ে মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলবে। আত্মীয়-স্বজনেরা সকলে অকূলে না ভাসতে বেহুলাকে অনুরোধ করল, কিন্তু কারো আপত্তি সে শুনল না। কলার মান্দাস প্রস্তুত হলে তার ওপর স্বামীর শব তুলে নিয়ে বেহুলা অনির্দেশের পথে পা বাড়াল।

নদীপথে বেহুলা এগিয়ে চলেছে। বাঁকে বাঁকে নতুন নতুন বিপদ তাকে গ্রাস করতে উদ্যত। কিন্তু সতীত্বের তেজে সব বিপদ কেটে যায়। দিন যায়,

রাত আসে, বেহুলা ভেসেই চলে। লখিন্দরের শব একেবারে পচে গেছে, দেহের মাংস খসে পড়েছে, কেবল অস্থিগুলি রয়েছে। জলে ধুয়ে সে-সব অস্থি কাপড়ে বাঁধল বেহুলা। দেবপুরে তাকে পৌঁছাতে হবে।

কয়েক মাস অতিক্রান্ত হলে পর বেহুলার ভেলা এসে উপস্থিত হল নেতা ধোবানীর ঘাটে। নেতা স্বর্গের দেবতাদের কাপড় কাচেন। এই নেতা বা নেত্রবতী আর কেউ নন—পদ্মা বা মনসার সহচরী। অদ্ভুত ক্ষমতা নেতার। একদিন বেহুলা লক্ষ্য করল, কাপড় কাচার সময় নিজের ছোট ছেলেটিকে আছড়িয়ে মেরে ফেলে, কাপড় কাচা, কাপড় শুকানো শেষ হলে, সেই মরা ছেলেকে তিনি বাঁচিয়ে তুললেন। এ এক অলৌকিক ব্যাপার। বেহুলা এসে নেতার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বেহুলার অশ্রুসিক্ত অনুনয়ে নেত্রবতীর মন গলে গেল। তিনি কথা দিলেন, তাকে সর্গপুরীতে নিয়ে যাবেন।

নেতার সঙ্গে বেহুলা দেবধামে উপস্থিত হল। দেবাদিদেব শিবশংকর বেহুলার দুঃখের কাহিনী শুনলেন। শিব বেহুলাকে বললেন, নাচ দেখিয়ে দেবতাদের যদি সে তুষ্ট করতে পারে তাহলে তার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। বেহুলার অপরূপ নৃত্যে খুশি হয়ে দেবতারা তাকে বর দিতে চাইলে সে বললে, স্বামীর পুনর্জীবনই তার প্রার্থিত। শিবের আদেশে কন্যা মনসা মৃত লখিন্দরকে বাঁচিয়ে তুলতে স্বীকৃত হলেন। তবে একটি শর্তে। শর্তটি হল, মর্ত্যে ফিরে গিয়ে শ্বশুর চন্দ্রধরকে দিয়ে বেহুলা মনসার পূজা করাবে। বেহুলা জানাল, এই শর্ত অবশ্যই সে পালন করবে। বেহুলার প্রতিশ্রুতিতে মনসাদেবী খুশি হলেন। তাঁর মন্ত্রপ্রভাবে লখিন্দর প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠল। শুধু তা নয়, মনসা চাঁদের আর ছয়পুত্র ও অপরাপর মৃত লোকদের জীবন দান করলেন। চন্দ্রধরের নিমজ্জিত ডিঙাগুলিকেও তিনি ফিরিয়ে দিলেন।

তারপর সতী নারী বেহুলা সকলকে নিয়ে দেশে ফিরলেন। স্বজন সম্পদ পুনরুদ্ধারের সমস্ত কাহিনী শুনিয়ে শেষে সনকাকে সে বলল, শ্বশুর যদি পদ্মাদেবীর পূজা করেন তবে তার গৃহে থাকা সম্ভব, নচেৎ স্বামী-ভাসুরাদি সকলকে নিয়ে তাকে দেবপুরে ফিরে যেতে হবে। সনকা তৎক্ষণাৎ চন্দ্রধরের কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে কাতর মিনতি জানালেন তিনি যেন পদ্মার পূজা করেন। চাঁদ কিন্তু পুরুষকারের জীবন্ত প্রতিমূর্তি, পদ্মার চরণে ফুল দিতে তিনি নারাজ। সর্বস্ব গেলেও কাণী দেবতা পদ্মার পূজা করা শৈব চন্দ্রধরের পক্ষে সম্ভব নয়। পর্বতের মত অটল তাঁর চিত্তদেশ।

কিন্তু শেষপর্যন্ত এহেন দৃঢ়চেতা মানুষটিকেও পরাজয় স্বীকার করতে হল। অবশ্য এ পরাজয় দেবতার কাছে নয়, স্নেহের কাছে। বেহুলার জীবনপণ সাধনাকে তিনি অগ্রাহ্য করেন কেমন করে? পুত্রবধূর পাতিব্রত্যকে স্বীকৃতি না জানালে তো মনুষ্যত্ববিরোধি কাজ করা হত। বেহুলার অনুরোধে চাঁদ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বাঁ-হাতে বিষহরির পায়ে একমুঠো ফুল ফেলে দিলেন। মনসা সানন্দে ওই নিবেদিত ফুল গ্রহণ করলেন।

সেদিন হতে মর্ত্যে ব্যাপকভাবে মনসার পূজা প্রচলিত হল। এর কিছুকাল পরে শাপভ্রষ্ট অনিরুদ্ধ আর উষা দেবরথে চড়ে স্বর্গপুরে ফিরে গেল।

মনসামঙ্গল-এর কবিগণের পরিচয় :

মনসা যেমন পুরানো দেবী তেমনি মনসার গীত—বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী—এদেশে বহুকালাবধি প্রচলিত। বাঙ্‌লাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শতাধিক কবির লেখা মনসামঙ্গল-কাব্যের পুঁথি পাওয়া গেছে। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত এই কাব্যের ধারা এগিয়ে এসেছে।

কানা হরিদত্ত নামে এক ব্যক্তি মনসার ভাসান-গীতের সর্বপ্রাচীন কবি বলে খ্যাত। তিনি পূর্ববঙ্গের লোক। তাঁর লেখা পুঁথির খণ্ডিত অংশ পাওয়া গেছে। হরিদত্তের কাব্য কখন রচিত হয়েছিল সে-বিষয়ে সঠিক কিছুই বলা যায় না। পঞ্চদশ শতকের প্রখ্যাত কবি বিজয়গুপ্ত তাঁর পদ্মাপুরাণে হরিদত্তকে মনসামঙ্গল কাব্যের আদিকবি বলে উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা চলে, খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধেই তাঁর কাব্য লেখা হয়েছিল। হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত যে-খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে 'পদ্মার সর্পসজ্জা'র সুন্দর একটি বর্ণনা পাওয়া যায় :

দুই হাতে শঙ্খ হৈল গরল শঙ্খিনী।
কেশের গাত কৈল এ কালনাগিনী॥
সুতলিয়া নাগে কৈল গলার সুতলি।
দেবী বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলি॥
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিতের সিন্দুর।
কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর॥…
অমৃত নয়ান এড়ি বিষ-নয়ানে চায়।
চন্দ্রসূর্য দুই তারা আড়ে লুকায়॥

এতে রচয়িতার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের পরিচয় আছে।

মনসামঙ্গল-এর খুব নামকরা একজন কবি হলেন **বিজয়গুপ্ত**। তিনি ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দে 'পদ্মাপুরাণ' রচনা করেছিলেন, কাব্যমধ্যে তার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামের অধিবাসী তিনি। বাঙ্‌লার পূর্বাঞ্চলে তাঁর কাব্যের বহুল প্রচার হয়েছিল। বিজয়গুপ্তের উজ্জ্বল কবিখ্যাতি দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাঁর প্রতিভা অনেক কবির কীর্তিকে ম্লান করে দিয়েছে। তাঁর গ্রন্থে সেকালের কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য মেলে, দেশের তৎকালীন সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। দেবতার বেনামীতে মানুষের চরিত্র এঁকে গেছেন তিনি। বাস্তবচিত্রণের ক্ষেত্রে আর ব্যঙ্গ ও হাস্যরসসৃষ্টিতে বিজয়গুপ্ত প্রশংসনীয় কুশলতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। ছন্দের ওপর বিজয়গুপ্তের বেশ দখল ছিল. ছন্দনির্মাণে বৈচিত্র্য দেখিয়ে গেছেন তিনি। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, শিব সম্পর্কে ক্রোধাবিষ্টা চণ্ডীর উক্তি :

প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সৈতে পারি॥
নিজে ভাবিতে প্রাণে বড় লাজ লাগে।
চড়ে বেড়ায় দুষ্ট বলদে তারে খাউক বাঘে॥

পয়ার-ত্রিপদী প্লাবিত সে-যুগের বাঙলা কাব্যে এজাতীয় স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দের প্রয়োগ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর নির্মিত সনকা-চরিত্র সত্যই হৃদয়গ্রাহী। বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' বহুশ্রুত বহুজনস্বীকৃত একখানি গ্রন্থ।

বিজয়গুপ্তের সমকালীন আর-একজন মনসামঙ্গল-এর কবি **বিপ্রদাস পিপিলাই**। চব্বিশপরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার বাদুড্যা-বটগ্রামে তাঁর জন্ম। জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিপ্রদাস স্বকৃত কাব্যের [নাম 'মনসাবিজয়'] আত্মপরিচয়-অংশে আমাদের জানিয়েছেন, তাঁর কাব্যখানির রচনাকাল ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দ, তখন—'নৃপতি হোসেন সাহা গৌড়ের প্রধান।' উচ্চতর কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন না তিনি, তবে সেকালের সামাজিক তথ্যের বিবরণ গ্রথিত হয়েছে বলে তাঁর 'মনসাবিজয়' ইতিহাসরচয়িতাগণের নিকট মূল্যবান। বিপ্রদাসের কাব্য থেকে জানতে পারি, এদেশীয় সমাজে তখন ধর্মঠাকুরের বেশ প্রতিপত্তি ছিল; শিবের মতো উচ্চশ্রেণীর দেবতাও ধর্মরাজের তপস্যায় রত রয়েছেন, দেখা যায়।

'পদ্মাপুরাণ'-এর কবি **নারায়ণ দেব** অশেষ খ্যাতির অধিকারী। ইনি পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার লোক—বোর গ্রামের অধিবাসী। তার জীবৎকাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে তিনি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন; আবার, কেউ কেউ বলেছেন, বিজয়গুপ্তের কিছু অগ্রবর্তী তিনি, অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে তাঁর আবির্ভাব। নারায়ণ দেব উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন, তাঁর খ্যাতি পশ্চিমবঙ্গে এবং আসামে পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। মনসামঙ্গল-এ করুণরসের প্রাধান্য, নারায়ণদেবের কাব্যে এই কারুণ্য শতমুখে উৎসারিত। তিনি পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন। তাঁর হৃদয় ছিল স্পর্শকাতর। 'সুকবি' নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় মেলে। প্রাচীন বাঙলার পল্লীজীবনের বহুবিচিত্র দিকের আলেখ্য তাঁর কাব্যে অতিশয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নারায়ণ দেবের রচনার সামান্য একটু নমুনা উদ্ধার করি, এ উক্তি সর্পদংশনের জ্বালায় যন্ত্রণাকাতর লখিন্দরের:

ওঠ ওঠ প্রাণপ্রিয়া কত নিদ্রা যাও।
কালনাগ খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও॥
তুমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতিতলে।
অকারণে রাঁড়ি হৈলা খণ্ডব্রত ফলে॥
কত খণ্ড তপ তুমি কৈলা গুরুতর।
সে কারণে তোমা ছাড়ি যায় লখিন্দর॥

এর মধ্যে লখিন্দরের মৃত্যুযন্ত্রণা এবং বেহুলার আসন্ন বিপদের দুঃখ সমভাবে মর্মস্পর্শী বাণীরূপ লাভ করেছে।

মনসামঙ্গল-এর কবিদলের মধ্যে দ্বিজ বংশীদাস সমুচ্চ একটি স্থান অধিকার করে আছেন। খুবই জনপ্রিয় কবি ছিলেন তিনি। কবির জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাটওয়ারী গ্রাম। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বংশীদাস বাঙলা রামায়ণের খ্যাতনাম্নী মহিলাকবি চন্দ্রাবতীর পিতা। বংশীদাস নিজ কাব্যখানি কখন লেখেন তা সঠিক জানা যায় না। কারো মতে ষোড়শ শতকে, কারো মতে সপ্তদশ শতকে তাঁর মনসামঙ্গল রচিত হয়েছে। বংশীদাসের কবিত্বশক্তি তো ছিলই, তা ছাড়া, তিনি ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক। নিজের লেখা মনসার ভাসান তিনি গ্রামে গ্রামে গান করে বেড়াতেন। এতে তাঁর জীবিকাসংস্থান হত। গান গেয়ে তিনি পাষাণ হৃদয়কেও গলাতে পারতেন। কথিত আছে, একদা গানের দল নিয়ে বংশীদাস নলখাগড়ার বনের মধ্য দিয়ে অন্য একটি গ্রামে যাচ্ছিলেন। 'জালিয়া হাওর'-এর বনে সেকালের স্থানীয় দস্যু নরঘাতী কেনারামের দ্বারা তিনি আক্রান্ত হন। কেনারাম ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁকে হত্যা করতে এগিয়ে এলে তিনি মৃত্যুর পূর্বে শেষবারের মতো দেবী মনসার নামগান করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন এই দস্যুর কাছে। কী ভেবে কেনারাম বংশীদাসের প্রার্থনা মঞ্জুর করল। ভক্তকবি তাঁর মধুময় কণ্ঠে শুরু করলেন মনসার ভাসান-গান। ডাকাতের দল রাতের অন্ধকারে মশাল জ্বালিয়ে গীত শুনতে বসেছে। বংশীদাসের গানের যাদু তাদের অভিভূত করে ফেলল। গান যখন সমাপ্তির মুখে তখন দেখা গেল, সহসা—'ফেলাইয়া হাতের খাণ্ডা [খড়্গ] কান্দে কেনারাম।' দুই চোখ তার অশ্রুসিক্ত। সে এসে লুটিয়ে পড়ল ভক্তকবির পায়ে। আজ এই খুনী মানুষটির অন্তরে অনুতাপ জেগেছে, পাপবোধের সুতীব্র যন্ত্রণায় কেনারাম আত্মহত্যা করতে উদ্যত হল। তখন বংশীদাস তাকে বুকে টেনে দিয়ে শিষ্যত্বে বরণ করলেন। দস্যু কেনারাম অল্পকালের মধ্যে একজন বিখ্যাত গায়ক হয়ে উঠল। মনসার ভাসান পালার কারুণ্যমণ্ডিত মানবিক আবেদন নরহন্তাকেও মনুষ্যত্বে উদ্বোধিত করতে পারে।

দ্বিজ বংশী অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে, প্রাঞ্জল ভাষায় কাব্য লিখে গেছেন। সংস্কৃতে পারদর্শী হয়েও কোথাও তিনি পাণ্ডিত্য দেখাতে সচেষ্ট হননি। তাঁর অনুভূতি যেমন আন্তরিক তেমনি তীব্র, তাঁর রচনা আবেগে স্পন্দমান। চাঁদসদাগরের পৌরুষ বংশীদাসের লেখনীতে যতটা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে তেমনটি অন্য কারো লেখনীতে নয়। তাঁর কল্পিত পুরুষকারে বিশ্বাসী, নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয়ে অকম্পিত চন্দ্রধরের একটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হল:

যে-কাঁদে আমার হেথা মুড়াইব তার মাথা
দেশেতে রাখিয়া নাহি কাজ।
কাতর করুণাধ্বনি শুনিয়া হাসিবে কাণী,
তাহাতে হইবে মোর লাজ॥

দ্বিজবংশীকে ময়মনসিংহের প্রাণের কবি বলা হয়। মনসার পাঁচালি তাঁকে অমর করে রেখেছে।

মনসামঙ্গল-এর অধিকাংশ কবি পূর্ববঙ্গের লোক। মনসার ভাসান বেশি সমাদর পেয়েছে পূর্ববঙ্গে—এও লক্ষ্য করার মতো। পশ্চিমবঙ্গের মনসার পাঁচালি-রচয়িতাদের মধ্যে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের নাম উল্লেখ্য। এই **ক্ষেমানন্দ** বর্ধমানের অধিবাসী ছিলেন, কায়স্থকুলে তাঁর জন্ম। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি কোনো একসময়ে তিনি মনসামঙ্গল লেখেন এরূপ অনুমান করা যায়। মনসার এক নাম 'কেতকা'। মনসাদেবীর পরমভক্ত বলে কবি কোথাও কোথাও নিজেকে **কেতকাদাস** বলে পরিচিত করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, কেতকাদাস আর ক্ষেমানন্দ অভিন্ন ব্যক্তি।

ক্ষেমানন্দ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁর কাব্যে পাণ্ডিত্য প্রকাশের কিছুটা ব্যগ্রতা লক্ষ্য করা যায়। বেহুলার চরিত্রাঙ্কনে তিনি বেশ দক্ষতা দেখিয়েছেন; কিন্তু মনে হয় চাঁদের চরিত্রমহিমা তাঁর হাতে কিঞ্চিৎ যেন খর্ব হয়েছে। করুণ ও হাস্য উভয় রসসৃষ্টিতে কবি সমান পটু ছিলেন। ক্ষেমানন্দের রচনার নিদর্শন লক্ষ্য করলেই তাঁর কাব্যরচনাশক্তির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে। লখিন্দর সর্পদংশনে প্রাণ হারালে :

প্রাণনাথ-কোলে কান্দে বেহুলা নাচনী।
ঘরে হৈতে শোনে তাহা সোনকা বাণ্যানী॥
ক্রন্দন শুনিয়া তার শুকাইল হিয়া।
পুত্রবধূ দেখিবারে চলিল ধাইয়া॥

জগজ্জীবন ঘোষাল উত্তরবঙ্গের কবি। দিনাজপুর জেলার কোচ-আমোরা গ্রামে তাঁর জন্ম। সপ্তদশ শতকের একেবারে শেষের দিকে তাঁর মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হয়। এ ছাড়া বগুড়া জেলার কবি **জীবন মৈত্র**, বীরভূম জেলার কবি **বিষ্ণু পাল** মনসার পাঁচালি লিখে খ্যাতি পেয়েছেন। মনসামঙ্গল-এর আরো বহু কবি রয়েছেন। একই কাহিনী অবলম্বনে অসংখ্য কবি কাব্য রচনা করে গেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই মন্দকবিযশঃপ্রার্থী। নিজেদের লেখায় তেমন উল্লেখ্য কোনো বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারেননি বলে ইতিহাস এঁদের মনে রাখেনি।

চণ্ডীমঙ্গল্-কাব্য

ভূমিকাবাক্য :

মনসামঙ্গল-এর অধিক প্রচলন হয়েছিল পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গে বেশি সমাদৃত হয়েছে চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য।

আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যে মনসা ও চণ্ডী খুব বড়ো একটি স্থান জুড়ে রয়েছেন। এ দুজন দেবীর মাহাত্ম্যকথা যে কত কবির দ্বারা কীর্তিত হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। এঁদের পূজা বাঙালি-হিন্দুসমাজে পঞ্চদশ শতকে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই।

চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজাপ্রচারের কাহিনী নিয়েই চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য রচিত। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে চণ্ডীর আখ্যায়িকা বড়ো আকারের কাব্যকথার রূপ লাভ করেনি। তবে পঞ্চদশ শতকেরও অনেককাল আগে এ আখ্যায়িকা যে ব্রতকথারূপে চলত তা সহজেই অনুমান করা যায়। এখনো পল্লীগ্রামে গৃহস্থের মঙ্গলকামনায় মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করা হয়, এবং এরূপ পূজার সময়ে ঘরের মেয়েরা ক্ষুদ্র ব্রতকথা ভক্তিভরে পাঠ করে থাকেন।

এখানে চণ্ডীমঙ্গল-এ বন্দিতা দেবী চণ্ডীর গল্প-ইতিহাস সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। অবশ্য এ আলোচনা সাহিত্যিক নয়—আমাদের ধর্মীয় সংস্কৃতির। কিন্তু এও মনে রাখতে হবে, জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে তার সাহিত্যকর্মের যোগ ঘনিষ্ঠ। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে দুটি উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে—কালকেতু ব্যাধ আর ধনপতি সদাগরের। এ দুটি উপাখ্যানের কোনটিরই বিবৃতি আমাদের প্রাচীন পুরাণগুলিতে দেখতে পাওয়া যায় না। এ কাহিনী স্পষ্টত যেমন লৌকিক তেমনি এতে কীর্তিতা চণ্ডীদেবীঠাকুরাণীও। কালকেতু-ব্যাধের গল্পটি অনুধাবন করলে বুঝতে পারা যায়, আদিতে অরণ্যচারী ব্যাধজাতীয় মানুষরাই চণ্ডীর পূজা করত, এবং এ চণ্ডী নিঃসন্দেহে বন্যপশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সুতরাং বলতে হয় অনার্যসমাজে এঁর জন্ম। অনার্যরা আর্যসমাজে যখন মিশে গেল তখনই তাদের এই দেবতাটি উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেন।

ধনপতি সদাগরের গল্পের চণ্ডী আর পূর্বোক্ত দেবী স্বরূপত এক নন, একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে উভয়ের স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়। ব্যাধ কিংবা আরণ্য পশুদের সম্পর্কবিবর্জিতা ইনি। এঁর আসল নাম 'মঙ্গলচণ্ডী'। অবশ্য ইনিও লৌকিক দেবতা যেহেতু পুরাণসম্ভূতা নন। অনেকের মতে বৌদ্ধধর্মের 'আদ্যাদেবী'ই কালক্রমে 'মঙ্গলচণ্ডী'তে রূপান্তরিত হয়েছেন।

জন্মসূত্রে স্বতন্ত্র হলেও, পরবর্তীকালে মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রভাবে হিন্দুর শক্তিদেবতা মহিষমর্দিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে এই 'চণ্ডী' ও 'মঙ্গলচণ্ডী' নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছেন—তৃতীয় একটি দেবতার সঙ্গে মিশে দুই দেবতা যে এক হয়ে গেছেন তা সহজে বুঝতে পারা যায় না। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে চণ্ডীর যে-মূর্তি আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে আর্য-অনার্য কল্পনার মিশ্রণ স্পষ্টরেখ। আরো একটি কথা, মনসামঙ্গল-এ বর্ণিত নায়কনায়িকাদের যেমন কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, তেমনি, চণ্ডীমঙ্গল-এর নায়কনায়িকারাও কেউ ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন। এ দুই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যদি কিছু বাস্তবের স্পর্শ থাকে তা সামাজিক ও রাজনীতিক পটভূমিকায়। এখানে অপরবিধ কোনো বাস্তবতা খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক।

চণ্ডীমঙ্গল-এর কবির সংখ্যাও কম নয়। এঁদের মধ্যে সর্বোত্তম কবি হলেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের মূলকাহিনী বা সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু:

চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে দুটি কাহিনী গ্রথিত হয়েছে, একটির নাম—'আখেটিক খণ্ড', এ গল্প কালকেতু ব্যাধকে নিয়ে—দেবীর কৃপায় দরিদ্র কালকেতু রাজ্যেশ্বর হল। অপরটির নাম 'বণিক খণ্ড', এ গল্প ধনপতি সদাগর ও তাঁর পুত্র শ্রীমন্তকে নিয়ে, দেবীর করুণায় উভয়ে দারুণ বিপদ থেকে মুক্ত হল। দেবী চণ্ডী মনসাদেবীর মতো ক্রূরস্বভাবা আর প্রতিহিংসাপরায়ণা নন, ভয়ংকরতা এঁর মধ্যে নেই; এঁকে বরাভয়দাত্রী, সংকটবারিণী বলা যেতে পারে।

প্রথমে ব্যাধসন্তান কালকেতুর গল্পটি সংক্ষেপে বলি:

চণ্ডীদেবীর মনে সুখ নেই। তাঁর স্বামী শিব শ্মশানবাসী, আত্মভোলা, সংসারের প্রতি তাঁর দৃষ্টি একেবারেই নেই। এ কারণে শিবপার্বতীর সংসারে অভাব লেগেই রয়েছে। স্বামীস্ত্রীতে নিত্য ঝগড়া হয়। পার্বতীর দুঃখ দেখে সহচরী পদ্মা তাঁকে বলেন, মর্তে ভক্তের পূজা গ্রহণ করলে তাঁর দুঃখ অচিরেই ঘুচবে। চণ্ডী দেখলেন পদ্মার উপদেশ মন্দ নয়।

এবার স্বর্গের দেবতা মর্তলোকে নিজের পূজা প্রচার করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চণ্ডীঠাকুরাণী মনে মনে স্থির করলেন, ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বরকে পৃথিবীতে নিয়ে এসে ব্যাপকভাবে এই পূজা প্রচলন করতে হবে। এখন কী করে দেবপুরবাসী ইন্দ্রপুত্রকে মর্তে পাঠান যায়? দেবী শিবকে অনুরোধ জানালেন অভিশাপ দিয়ে নীলাম্বরকে পৃথিবীতে পাঠাতে। কিন্তু নিরপরাধের প্রতি শাপবর্ষণ করা শিবের পক্ষে সম্ভব নয়, স্ত্রীর প্রস্তাবে তিনি সম্মত হলেন না। তখন দেবী চণ্ডী ছলনার আশ্রয় নিলেন। ইন্দ্র প্রত্যহ শিবপূজা করতেন। পূজার ফুল চয়ন করত নীলাম্বর। একদিন নীলাম্বর পূজার জন্যে যে-ফুল তুলে আনল তার একটিতে দেবী অতিক্ষুদ্র কীটরূপে সংগুপ্ত রইলেন। সেই ফুলে ইন্দ্র শিবের পূজা করলেন। ওই কীট শিবকে দংশন করল; শিব যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে নীলাম্বরকে শাপ দিলেন—

মর্তভূমিতে ব্যাধের ঘরে তাকে জন্ম নিতে হবে। নীলাম্বরের মাথায় বজ্র ভেঙে পড়ল যেন। শিবকে সে কাতর মিনতি জানিয়ে বলল, না-জেনে অপরাধ করে ফেলেছে, শিব যেন তাকে ক্ষমা করেন। তার এই কাতর প্রার্থনায় মহাদেবের মন কিছুটা নরম হল। কিন্তু অভিশাপ যে ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই—পৃথিবীতে যেতেই হবে। তবে চণ্ডীর সেবা করলে অল্পকালের মধ্যে নীলাম্বরের শাপমুক্তি ঘটবে।

শাপভ্রষ্ট হয়ে নীলাম্বর পৃথিবীতে ধর্মকেতু ব্যাধের পুত্ররূপে জন্মাল; তার স্ত্রী ছায়াও স্বামীর অনুগামিনী হয়ে সঞ্জয়কেতু নামে আর-এক ব্যাধের কন্যারূপে জন্ম নিল। মর্তলোকে এদের নাম হল যথাক্রমে কালকেতু ও ফুল্লরা। ব্যাধপুত্র হলেও কালকেতুর রূপ নয়নাভিরাম, দেখলে চোখ জুড়ায়। এই ব্যাধসন্তান দিন দিন বাড়তে থাকে।

রূপবান শুধু নয়, কালকেতুর পরাক্রমেরও সীমা নেই—যেমন তেজ তেমনি সাহস। ওদিকে ফুল্লরারও অপরূপ দেহশ্রী। তার গুণের কথাও বলে শেষ করা যায় না। এহেন ব্যাধকন্যার সঙ্গে এগার বছর বয়সে কালকেতুর বিয়ে হল।

পিতামাতার বার্ধক্যে সংসারের ভার পড়ল কালকেতু ও ফুল্লরার ওপর। অবস্থা খুব সচ্ছল না হলেও মনের আনন্দে তাদের দিন কাটে। কালকেতু বনে বনে শিকার করে ফেরে, পশু মেরে ঘরে নিয়ে আসে; ফুল্লরা ঘরে ঘরে আর হাটে-বাজারে পশুর মাংস বেচতে যায়। স্বামীর ভালবাসা পেয়ে দৈহিক কষ্টকে কষ্ট বলেই মনে করে না সে। বলতে হবে ফুল্লরার সুখী জীবন।

পরাক্রান্ত কালকেতুর শিকারদক্ষতায় কলিঙ্গদেশের বনচারী পশুদল ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। যত শক্তিমানই হোক কোনো পশুর নিস্তার নেই, বনের পশুসমাজ নির্বংশ হতে চলল। এই সমস্ত পশু দেবীর আশ্রিত। অনন্যোপায় হয়ে তারা দেবীর শরণাপন্ন হল। অসহায় পশুদের কান্না দেখে দেবী তাদের আশ্বাস দিলেন যে, ভয় নেই পশুদের কারো, এর প্রতিকার তিনি করবেন। চণ্ডী স্থির করলেন, কালকেতুকে পশুহনন থেকে নিবৃত্ত করতে হবে; তাকে তিনি রাজা বানাবেন, এতে পশুরা নিষ্কৃতি পাবে, এবং সেই সঙ্গে তার দ্বারা নিজের পূজা-প্রচার কর্মটিও সম্পাদন করাবেন।

এই ভেবে মহামায়া কালকেতুকে ছলনা করবার জন্যে একদিন মায়াজাল পাতলেন—তিনি এক সোনালি গোসাপের রূপ ধরে পথের ধারে পড়ে রইলেন এবং বনভূমিতে ঘন কুয়াসা ছড়িয়ে পশুপক্ষীকে লুকিয়ে রাখলেন। সেদিন কালকেতু বনে শিকার করতে এসে কোনো শিকারই পেল না। তার মন আজ অত্যন্ত বিষণ্ণ, একটি পশুও নিয়ে যেতে না পারলে ফুল্লরাই-বা কী বলবে। এসব কথা যখন ভাবছে, অকস্মাৎ পথে সে দেখতে পেল সেই স্বর্ণবর্ণ গোধিকা। কোনো পশু যখন মিলল না তখন এই গোধিকাকে ধনুকের ছিলায় বেঁধে কালকেতু ঘরে ফিরল। উদ্দেশ্য, শিকপোড়া করে তার মাংস খাবে।

কালকেতুকে শূন্যহাতে ফিরতে দেখে ফুল্লরার মুখ শুকিয়ে গেল। দিনের শিকারে তাদের দিন চলে। এখন উপায় কী। কালকেতু ফুল্লরাকে বলল, সে যেন তার সইয়ের বাড়ী থেকে কিছু খুদ ধার করে নিয়ে আসে। স্ত্রী বেরিয়ে গেলে গোসাপটাকে চালার খুঁটিতে বেঁধে রেখে, বাসি মাংসের পসরা নিয়ে, কালকেতু চলল বাজারের দিকে। উভয়ে যখন গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত সেই অবসরে সোনালি গোসাপরূপিণী চণ্ডী এক অপূর্বসুন্দরী যুবতীনারীর রূপ ধরে বসে রইলেন। ফুল্লরা ঘরে পা দিয়ে এই অপরিচিতা তরুণী রূপসীকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হল। বিস্ময় দমন করে ফুল্লরা তার পরিচয় জানতে চাইলে ওই রমণী বলল, এক বামুনের ঘরের বউ সে, সতীনের সঙ্গে কলহ করে ঘর ছেড়ে বনে বনে যখন ফিরছিল এমন সময়ে ব্যাধ কালকেতু তাকে দেখতে পেয়ে কুটীরে নিয়ে এসেছে। তার কথা শুনে ফুল্লরার মুখ শুকিয়ে গেল। যা হোক, মনের আশঙ্কা গোপন রেখে সে ছলনাময়ী চণ্ডীকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে, স্বামীর ঘরে যতই ঝগড়াঝাটি লেগে থাক, স্বামীকে ছেড়ে স্ত্রীলোকের এক মুহূর্তের জন্যেও পরগৃহে থাকতে নেই—স্বামীই যে নারীর একমাত্র গতি।

ফুল্লরার উপদেশ গৃহাগতা রূপসীর কানেই গেল না। সমস্ত নীতিকথা ব্যর্থ হল দেখে ফুল্লরা নিজ সংসারের বারোমাসের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করে যাতে সত্বর আপদ বিদায় হয় তার চেষ্টা করল। বৈশাখ থেকে চৈত্রমাস পর্যন্ত কত দুঃখদুর্গতি ফুল্লরাকে সহ্য করতে হয়, এমন কি, অভাবের তাড়নায় মাটিয়া পাথরের বাসনটি পর্যন্ত বাঁধা দিয়ে তারা দুমুঠো অন্নের সংস্থান করে। এই তো ফুল্লরার জীবন। এতসব শুনেও ছদ্মরূপধারিণী মহামায়ার নড়বার চড়বার নাম নেই। তখন স্বামীর ওপর ফুল্লরার নিদারুণ অভিমান হল, চোখের জল ফেলতে ফেলতে ছুটে গেল বাজারের দিকে—স্বামীকে খুঁজতে। পথে স্বামীর দেখা পেয়ে তাকে সব কথা খুলে বলল। শুনে কালকেতু তো অবাক, সে আবার কোন্ সুন্দরী নারীকে ঘরে নিয়ে এল! কুটীরে এসে দেখে ফুল্লরার কথা সত্য, বর্ণনাতীত ওই নারীর রূপশোভা।

প্রথমে কালকেতু মহামায়ার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল, অনুনয়সহকারে তাকে স্বগৃহে ফিরে যেতে বলল। সমস্ত অনুনয়-উপদেশ যখন নিষ্ফল হল তখন—'ভানু সাক্ষী করি বীর জুড়িলেক তীর', কিন্তু ক্রোধাবিষ্ট কালকেতুর হাতের শর হাতেই রইল, দেবীর দৃষ্টিপাতে তীর নিক্ষেপ করার শক্তি সম্পূর্ণ সে হারিয়ে ফেলেছে। শেষে চণ্ডী আত্মপ্রকাশ করলেন এবং স্বামীপ্রাণা ফুল্লরা আর নির্মলচরিত্র কালকেতুকে বললেন যে, তাদের বর দিতে এসেছেন তিনি। কিন্তু এককথায় কালকেতুর বিশ্বাস হয় না। চণ্ডীঠাকুরাণী ব্যাধদম্পতীকে তখন নিজের স্বরূপ দেখালেন—মহিষমর্দিনীর রূপ ধারণ করলেন। কালকেতু ও ফুল্লরা উভয়ে আভূমি নত হয়ে দেবীকে প্রণাম জানাল। দেবী তাদের বর দিলেন, এবং একটি মূল্যবান অঙ্গুরী ও সাত ঘড়া ধন দিয়ে কালকেতুকে বললেন, নগরের মধ্যে তাঁর মন্দির নির্মাণ করে :

'পূজিবে মঙ্গলবারে পাতাইবে জাত।
গুজরাট নগরের তুমি হবে নাথ॥'

চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন চণ্ডিকা।

অতঃপর কালকেতু দেবীর প্রদত্ত অঙ্গুরী ভাঙাতে গেল মুরারি শীল নামে এক বেণের কাছে। অতিশয় ধূর্ত আর দুঃশীল এই মুরারি, লোককে ঠকিয়ে সে খায়। কালকেতুকেও সে ঠকাতে চেষ্টা করল, অঙ্গুরীটি হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক উল্টিয়ে বলল: 'সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল। ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল॥'

উচিত মূল্য পাওয়া যাবে না বুঝে কালকেতু ওই আঙটি ফেরত চাইল। তখন মুরারি শীল আঙটির দাম আর-একটু বাড়াল। এমন সময় দৈববাণী হল, মুরারি শীল দরিদ্র ব্যাধকে যেন প্রবঞ্চনা না করে—ওই অঙ্গুরী কালকেতুকে দেবীর দেওয়া। তখন ধূর্ত মুরারি আঙটির উচিত মূল্য দিল।

কালকেতু এখন প্রভূত অর্থের মালিক। চণ্ডিকার আদেশমতো বনজঙ্গল কাটিয়ে গুজরাটে সে নতুন নগর ও রাজধানী স্থাপন করল। নানা রাজ্যের লোক বসবাসের উদ্দেশ্যে তার রাজ্যে এসে ভীড় জমাল। সেই সঙ্গে এল শঠচূড়ামণি ভাঁড়ু দত্ত। প্রবঞ্চক ভাঁড়ু অচিরে একজন মাতব্বর লোক হয়ে উঠল। কালকেতু রাজা। অনেক প্রজা তার। রাজ্যে কোনো অশান্তি নেই। কিন্তু অশান্তি সৃষ্টি করল খল-প্রকৃতির এই ভাঁড়ু দত্ত। হাটুরিয়ার দোকানে গিয়ে কড়ি না দিয়ে সকল দ্রব্য সে আত্মসাৎ করে। দোকানীরা অত্যন্ত বিব্রত হয়ে কালকেতুকে সমস্ত ঘটনা জানাল। কালকেতু ভাঁড়ুকে ডাকিয়ে এনে সর্বজনসমক্ষে অনেক শক্ত কথা শুনিয়ে দিল এবং আরো বলল, এ রাজ্যে তার স্থান হবে না। অপমানিত ভাঁড়ু রাজ্য ছেড়ে গেল।

কালকেতুকৃত অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। ভাঁড়ু কলিঙ্গরাজের কাছে গিয়ে কালকেতুর বিরুদ্ধে তাঁকে উত্তেজিত করল। এভাবে প্ররোচিত হয়ে কলিঙ্গাধিপতি কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করলেন। বীরের মত যুদ্ধ করেও কালকেতু পরাজিত হল এবং ভাঁড়ুদত্তের শঠতায় বন্দী হল। কলিঙ্গরাজ তাকে কারাগারে পুরলেন। শৃঙ্খলিত ও নির্যাতিত অবস্থায় কালকেতু তার আরাধ্যা দেবী চণ্ডীকে স্মরণ করল। নিজের সেবককে বিপন্ন দেখে চণ্ডিকা কলিঙ্গের রাজাকে স্বপ্নাদেশ দিলেন, তিনি যেন কালকেতুকে তাঁর বন্দীশালা থেকে মুক্ত করে দেন। শঙ্কিত হয়ে কলিঙ্গাধিপতি অবিলম্বে বন্দী বীরকে কারামুক্ত করলেন।

কালকেতু নিজরাজ্যে ফিরে এল। যুদ্ধে যে-সকল সৈন্য মারা গিয়েছিল, চণ্ডীর বরে তারা বেঁচে উঠল। ধূর্ত ভাঁড়ুদত্ত পুনর্বার কপটবাক্যে কালকেতুর মন ভুলাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার কপালে জুটল চূড়ান্ত অপমান ও লাঞ্ছনা।

কালকেতু গুজরাটে বেশ কিছুকাল রাজত্ব করল। ততদিনে মর্তে চণ্ডীদেবীর পূজা প্রচলিত হয়েছে। কালকেতু-ফুল্লরার কাজ শেষ হল। তাদের ওপর

অভিশাপের অন্ত হলে একদিন তারা দেবভূমি স্বর্গে চলে গেল। এখানে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম উপাখ্যানের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় উপাখ্যানের নাম 'বণিক-খণ্ড'— ধনপতি-খুল্লনা-শ্রীমন্তকে কেন্দ্র করে এ কাহিনী গড়ে উঠেছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ : .

মর্তে পূজা আদায় করতে হবে, একদা স্থির করলেন দেবী চণ্ডিকা। স্বর্গের অপ্সরী রত্নমালাকে পৃথিবীতে পাঠাতে পারলে দেবী চণ্ডীর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

নিজ পরিকল্পনা অনুসারে চণ্ডী কাজে অগ্রসর হলেন। সুরসভায় নর্তকী রত্নমালার নাচ শুরু হয়েছে। বীণা বেজে চলেছে, মৃদঙ্গ ধ্বনিতে হচ্ছে। সহসা রত্নমালার তালভঙ্গ হল। এতে রুষ্ট হয়ে চণ্ডিকা শাপ দিলেন—মর্তলোকে মানব-গৃহে তাকে জন্ম নিতে হবে। শাপ ব্যর্থ হওয়ার নয়। রত্নমালা জন্ম নিল লক্ষপতি বণিকের ঘরে। পিতা লক্ষপতি কন্যার নাম রাখলেন খুল্লনা। অতুলনীয় রূপ মেয়েটির।

উজানী নগরের বিত্তশালী এক বণিক, নাম—ধনপতি। শিবের ভক্ত ছিলেন তিনি। ধনপতি বিবাহিত। পত্নীর নাম হল লহনা। এই ধনপতি একদিন পায়রা উড়াতে গিয়ে রূপসী খুল্লনাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। খুল্লনা জ্ঞাতি সম্পর্কে পূর্বোক্ত লহনারই বোন। লহনা নিঃসন্তানা। খুল্লনার সঙ্গে ধনপতির বিয়ের প্রস্তাব উঠল। বিয়ের কথা শুনে লহনা কিন্তু খুবই বিমর্ষ হল, স্বামীর ওপর সে অভিমান করে বসল। ধনপতি সদাগর তাকে বোঝালেন যে, খুল্লনাকে তিনি তার [লহনার] রন্ধনের কাজে নিযুক্ত করবেন। অনেক মিষ্টি কথা শুনিয়ে এবং একখানি পাটশাড়ী ও অলংকার গড়াবার জন্যে পাঁচ তোলা সোনা দিয়ে সদাগর স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করলেন। লহনা আপত্তি তুলে নিলে জাঁকজমকে বিয়ে হয়ে গেল।

একদিন রাজসভায় ধনপতির ডাক পড়ল। রাজসমীপে উপস্থিত হলে রাজা ধনপতিকে বললেন—পিঞ্জর চাই, সোনার পিঞ্জর, ভালো পিঞ্জর পাওয়া যায় গৌড় নগরে ; শুকসারিকে যত্নে পুষতে হবে, সোনার পিঞ্জর না হলে চলে না। অতএব রাজার নির্দেশ : 'ধনপতি যাও ত্বরা গৌড় নগরে'। ইচ্ছা না থাকলেও ধনপতিকে গৌড়ে যেতে হল। খুল্লনাকে সদাগর লহনার হাতে সমর্পণ করলেন, আর, বলে গেলেন, খুল্লনার যত্নের কোনোরূপ ত্রুটি যেন না হয়।

লহনা স্বামীর বাক্য মেনে চলে, খুল্লনাকে অত্যন্ত প্রীতির দৃষ্টিতে দেখে সে। দুই সতীন প্রগাঢ় প্রীতিবন্ধনে বাঁধা পড়েছে। কিন্তু দুজনের এহেন সম্প্রীতি বাড়ীর দুর্বলা দাসীর সহ্য হল না। মনে মনে সে জ্বলতে থাকে। স্বার্থপরায়ণা দুর্বলা উভয়ের মন ভাঙাবার কাজে লেগে গেল, খুল্লনার বিরুদ্ধে লহনার চিত্তদেশটিকে সে বিষিয়ে তুলল ; তাকে বোঝাল, অত্যধিক আদরযত্নে খুল্লনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেলে স্বামী তাকেই বেশি ভালোবাসবে, লহনার পক্ষে তা সর্বনাশেরই কথা। লহনা সরলা বটে কিন্তু সে বড়ো নির্বোধ। দাসীর কুপরামর্শে সতীনের প্রতি সে বিরূপ হয়ে উঠল। এখন থেকে তার সংকল্প হল সপত্নীকে সে স্বামীর চক্ষে বিষ করে

তুলবে। দুর্বলার সঙ্গে যুক্তি করে স্বামীর জাল চিঠি খুল্লনার হাতে সে দিল। তাতে নির্দেশ ছিল, খুল্লনা ছাগল চরাবে, ঢেঁকিশালে বাস করবে, দিনে একবেলা আধপেটা খেতে পাবে ও 'খুঞা কাপড়' পরবে। খুল্লনা বুঝতে পারল যে, ওই চিঠি জাল। কিন্তু লহনার নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে চিঠিতে-লেখা নির্দেশমতো চলতে বাধ্য হল।

খুল্লনা এখন ছাগলচরাণী দাসী। দুঃখে তার দিন কাটে। একদিন ছাগল চরাতে গিয়ে অতিশয় শ্রান্ত বোধ করে এক বনের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল। চণ্ডিকা-দেবী অসহায় খুল্লনাকে স্বপ্নে মাতৃমূর্তিতে দেখা দিয়ে বললেন: 'কত দুঃখ আছে ঝি তোর কপালে। সর্বশী ছাগল তোর খাইল শৃগালে॥'

সহসা খুল্লনার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে দেখে, 'সর্বশী' ছাগলটি নেই। ভয়ে ব্যাকুল হয়ে ছাগলের খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরছে এমন সময় সে দেখতে পেল, বনমধ্যে একস্থানে কতকগুলি মেয়ে মিলে চণ্ডীদেবীর পূজা করছে। এসব মেয়ে আর কেউ নয়—চণ্ডীরই অনুচর বিদ্যাধরীর দল তারা। চণ্ডিকা তাদের পাঠিয়েছেন খুল্লনাকে তাঁর পূজা শিখিয়ে দিতে। পঞ্চবিদ্যাধরী তাকে চণ্ডীপূজা শিখিয়ে দিল। ভক্তিভরে চণ্ডীর ব্রত গ্রহণ করলে তার হারিয়ে-যাওয়া ছাগলটি খুল্লনা ফিরে পেল। চণ্ডী লহনাকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন, সে যেন খুল্লনাকে আগের মতো আদর করে। লহনা দেবীর আদেশ শিরোধার্য করে নিল। এদিকে ধনপতি সদাগরও দেশে ফিরলেন। রাজা পিঞ্জর পেয়ে ভারি খুশি হলেন।

দেশে এসে ধনপতি বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করেছেন। নিমন্ত্রিত কুটুম্বরা সকলে এলো। কোনো একটি ব্যাপারে জ্ঞাতিগণের সঙ্গে সদাগরের বিবাদ বাধলে জ্ঞাতিজনেরা ক্রুদ্ধ হয়ে খুল্লনার সতীত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলল। এতদিন যে-নারী বনে ছাগল চরিয়েছে তার চারিত্রিক-শুচিতা-বিষয়ে তারা সন্দিহান। হয় খুল্লনা সতীত্বের পরীক্ষা দিক, নয়, ধনপতি সমাজের কাছে এক লক্ষ টাকা জরিমানা দিক। ধনপতি সদাগর এক লক্ষ টাকা দিয়ে সমাজপতিদের শান্ত করতে চাইলেন, কিন্তু খুল্লনা তাঁকে বাধা দিল—সতীত্বে পরীক্ষা দেবে সে।

কঠিন পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। খুল্লনাকে জলে ডুবিয়ে মারবার চেষ্টা করা হল, জ্বলন্ত লৌহদণ্ডে তার সর্বাঙ্গ দগ্ধ করা হল এবং সর্বশেষে জতুগৃহে তাকে বন্ধ করে রেখে তাতে অগ্নিসংযোগ করা হল। কিন্তু চণ্ডীদেবীর আশীর্বাদে সতী খুল্লনা অক্ষত রইল। সকলে খুল্লনাকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। বিবাদ মিটল।

খুল্লনা সুখেই দিনাতিপাত করছিল। কিন্তু দেখা যায়, মানুষের সুখের দিন সচরাচর দীর্ঘস্থায়ী হয় না। রাজভাণ্ডারে চন্দন, লবঙ্গ, নীলা, পলা, চামরাদির অভাব হওয়ায় রাজা ধনপতিকে সিংহলে যেতে আদেশ দিলেন। খুল্লনার মন বিষাদে আচ্ছন্ন হল, সতীনের ঘরে আবার যদি কোনো বিপদ উপস্থিত হয়। ধনপতি তাকে আশ্বাস দিয়ে বাণিজ্যযাত্রার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। সমুদ্রে সদাগরের তরণী ভাসাবার শুভলগ্ন সমুপস্থিত। স্বামীর মঙ্গলকামনায় ঘট পেতে চণ্ডীপূজা করতে

বসেছিল খুল্লনা। লহনা এসে ধনপতিকে জানাল যে, খুল্লনা ডাকিনী-দেবতার পূজায় বসেছে। সংবাদটি শুনে শৈব ধনপতি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তিনি খুল্লনার ঘরে এসে দেখলেন লহনার কথা সত্য। তখন শিবভক্ত সদাগর ক্রোধ সংবরণ করতে না পেরে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট পায়ে ঠেললেন। সামান্য মানুষের এতখানি দর্প দেখে চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হলেন।

ধনপতি বাণিজ্যযাত্রা করেছেন। সাধুর ডিঙাগুলি সমুদ্রপথে যখন মগরায় এসে পৌঁছল তখন সহসা প্রচণ্ড ঝড় উঠল। মাঝিমাল্লারা প্রমাদ গণল। চণ্ডীদেবী অপমানের কথা ভোলেননি, এবার তার শোধ নেওয়ার পালা। তুফানের মুখে পড়ে সদাগরের ছয়টি নৌকা ডুবল। অবশিষ্ট রয়েছে একটিমাত্র ডিঙা—মধুকর; তাকে আশ্রয় করে কোনোরকমে তিনি প্রাণে বাঁচলেন। সেই ডিঙা নিয়ে ধনপতি সিংহলের দিকে চললেন। পথে পড়ল কালীদহ।

নৌকা কালীদহে এসে পড়লে শিবের ভক্ত ধনপতিকে বিপন্ন করবার অভিপ্রায়ে দেবী অদ্ভুত এক মায়া পাতলেন। সমুদ্রবক্ষে শতদল একটি পদ্ম ফুটে রয়েছে; তার ওপরে বসে এক সুন্দরী নারী একটি হস্তীকে ধরে একবার গিলছে, পরক্ষণে উগরিয়ে ফেলছে। পরমাশ্চর্য এই দৃশ্যটি দেখলেন শুধু ধনপতি, মাঝিরা কিছুই দেখতে পেল না।

ধনপতি যথাকালে সিংহলে পৌঁছলেন, পৌঁছে রাজাকে খুশি করলেন যথারীতি উপঢৌকন দিয়ে। তারপর দ্রব্যের বদলে দ্রব্য বিনিময় হল। রাজার সঙ্গে সদাগরের কথোপকথন চলছে, কথাপ্রসঙ্গে সদাগর কালীদহের সেই 'কমলে-কামিনী' মূর্তির কথা রাজাকে বললেন। এই অসম্ভাব্য ব্যাপার বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে রাজা সদাগরের কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন। পাত্রমিত্রেরা সাধুকে মিথ্যাবাদী বলাতে সাধুর রোখ চেপে গেল। তখন সাধু প্রতিজ্ঞা করলেন, 'কমলে-কামিনী-দৃশ্য রাজাকে দেখাতে না পারলে রাজা তাঁর ডিঙার সমস্ত দ্রব্যসম্ভার লুটে নেবেন এবং সাধু রাজার কারাগারে বারোবছর বন্দীজীবন যাপন করবেন। এতে সিংহলরাজের প্রত্যুত্তর: ধনপতির কথা যদি সত্য হয় তাহলে—'অর্ধ রাজ্য দিব আর অর্ধ সিংহাসন॥'

অতঃপর রাজাকে নিয়ে ধনপতি কালিদহে গেলেন কিন্তু সে-দৃশ্য দেখাতে পারলেন না। রাজা সদাগরকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। শুধু তা নয়, সদাগরের ডিঙাও লুঠ করা হল। ছলনাময়ী চণ্ডী ধনপতিকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন যে, তাঁর পূজা করলে সাধুর সমস্ত বিপদ কেটে যাবে। কিন্তু শিবোপাসক ধনপতির পক্ষে চণ্ডিকাকে পূজানিবেদন অসম্ভব, প্রাণ থাকতে নয়।

এদিকে চণ্ডীর চক্রান্তে মালাধর স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে খুল্লনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছে। এই সুন্দর শিশুর—চণ্ডিকার বরপুত্রের—নাম রাখা হল শ্রীমন্ত। মায়ের অশেষ যত্নে বেড়ে উঠে শ্রীমন্ত যথাকালে শিক্ষায় মনোনিবেশ করল। দনাই ওঝা তার শিক্ষক। একদিন গুরুশিষ্যে তর্ক শুরু হল। সেই তর্কে হেরে গিয়ে গুরু দনাই

কুপিত হয়ে শিক্ষক শ্রীমন্তকে তার জন্ম সম্পর্কে একটি কুশ্রী ইঙ্গিত করে বসলেন। তরুণ শ্রীমন্ত নিজেকে এতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করল। তার কঠোর সংকল্প, নিরুদ্দিষ্ট পিতাকে খুঁজে বের করবে। পুত্রের ব্যগ্রতা দেখে মাতা শ্রীমন্তের সমুদ্র-যাত্রায় সম্মতি না দিয়ে পারলেন না। দেশের রাজাও আপত্তি জানালেন না। সাত ডিঙা সাজিয়ে শ্রীমন্ত একদিন সিংহল অভিমুখে যাত্রা করল।

পথে সেই কালীদহ, দেবী চণ্ডিকা আবার মায়া পাতলেন। কালীদহ-জলে শ্রীমন্ত চাক্ষুষ করল সেই অপূর্ব 'কমলেকামিনী' দৃশ্য। ডিঙা অগ্রসর হল, এসে পৌঁছল সিংহলের ঘাটে। রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে রাজাকে সে নিজ পরিচয় দিল। রাজা তাকে বাণিজ্য করতে সম্মতি দিলেন। যথারীতি দ্রব্যের বদলে দ্রব্য বিনিময় হল। একদিন অবসর সময়ে শ্রীমন্ত সিংহলরাজকে কালীদহের সেই অদ্ভুত ঘটনার কথা বলল। রাজা আর তাঁর পাত্রমিত্রেরা কেউ শ্রীমন্তের কথা বিশ্বাস করলেন না। সকলে তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করতে চাইলে শ্রীমন্ত বলল, রাজাকে ওই মূর্তি যদি সে দেখাতে না পারে তাহলে : 'দক্ষিণ মশানে মোর বধিহ জীবন'। রাজাও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, 'কমলেকামিনী' মূর্তি দেখাতে পারলে শ্রীমন্তের হাতে তিনি নিজ কন্যাকে সমর্পণ করলেন এবং তাঁর অর্ধেক রাজত্ব শ্রীমন্ত পাবে।

রাজাকে নিয়ে শ্রীমন্ত কালীদহে এল কিন্তু দেবীর ছলনায় সিংহলরাজকে ওই দৃশ্য দেখাতে পারল না। তখন শর্ত অনুযায়ী তাকে মশানে নিয়ে যাওয়া হল—রাজার আদেশে তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। ওদিকে পুত্রের অমঙ্গলভয়ে শঙ্কিতা খুল্লনা বাড়ীতে পূজার ঘরে বসে চণ্ডীঠাকুরাণীকে একমনে স্মরণ করছিল। দেবী প্রসন্না হলেন। মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে শ্রীমন্ত একাগ্র চিত্তে চণ্ডীর স্তব করল। নিজের ভক্ত-উপাসককে সংকট থেকে উদ্ধার করতেই হবে। কোটালের খড়্গ শ্রীমন্তের মাথার ওপর পড়ে পড়ে এমন সময়ে দেবী এক অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে মশানে গিয়ে শ্রীমন্তকে কোলে নিয়ে বসলেন। চণ্ডিকার ভূতপ্রেতাদির সঙ্গে যুদ্ধে রাজার বহু সৈন্য পরাজিত হল, অগণিত সেনা প্রাণ হারাল, বাকি সৈন্যেরা পলায়ন করল। রাজা বুঝতে পারলেন, দৈবীশক্তি শ্রীমন্তের সহায়। তখন তিনি নিজে গিয়ে চণ্ডীর পায়ে পড়লেন। দেবী শ্রীমন্তকে কন্যাদান করতে রাজাকে আদেশ দিলেন। দেবীর বরে মৃত সৈন্যগণ পুনরায় জীবনলাভ করল। শ্রীমন্তের বন্দীদশা ঘুচল। কারাগারে বন্দী ধনপতিও চণ্ডিকার আজ্ঞায় মুক্তি পেলেন। পিতাপুত্রের মিলন হল। সিংহল-রাজ নিজ কন্যা সুশীলাকে শ্রীমন্তের হাতে তুলে দিলেন।

এবার ধনপতি পুত্র, পুত্রবধূ আর প্রচুর পণ্যদ্রব্য নিয়ে স্বদেশ যাত্রা করলেন। ফিরবার পথে সদাগরের ডিঙা মগরা নদীতে এলে চণ্ডী দেবী কৃপা করে ধনপতির জলে-ডোবা ছয়টি নৌকা ফিরিয়ে দিলেন। দেশে ফিরে শ্রীমন্ত রাজা বিক্রম-কেশরীকেও 'কমলেকামিনী'-দৃশ্য দেখাল। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে কন্যা রূপবতীর সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে দিলেন।

ইতোমধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। দারুণ বিপদের মুখেও ধনপতি

এতদিন চণ্ডিকার কাছে নতি স্বীকার করেননি। একদিন আশ্চর্য এক দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল—শিবপূজা করতে বসে তিনি দেখলেন, তাঁর আরাধ্য দেবতা শিবের আর্ধাঙ্গ জুড়ে অধিষ্ঠান করছেন দুর্গা। তখন ধনপতি বুঝলেন, 'দুইজনে একতনু মহেশপার্বতী'। শিব ও পার্বতী অভিন্ন জেনে তিনি দেবীর পূজা করলেন। এইরূপে চণ্ডিকার পূজা সর্বত্র প্রচারিত হল।

যথা সময়ে শাপভ্রষ্ট দেবদেবীরা [খুল্লনা ও শ্রীমন্ত] স্বর্গে ফিরে গেলেন।

চণ্ডীমঙ্গল-এর কবিপরিচয় :

চণ্ডীঠাকুরাণীর মাহাত্ম্যকথাকে কাব্যাকারে প্রথম গ্রথিত করেন সম্ভবত **মাণিক দত্ত**। তাঁর লেখা চণ্ডীমঙ্গল-এর রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। অনেকে মনে করেন, কবি প্রাক্‌চৈতন্যযুগের লোক, মলদহ অঞ্চলের অধিবাসী। তাঁর কাব্যখানি যে প্রাচীন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের মধ্যেই এ কাব্য রচিত হয়েছে বলে মনে হয়। মাণিক দত্তের রচনা অত্যন্ত সরল, গানের উপযোগী। এ কাব্যে ব্রতকথার ছাপই বেশি, ছন্দে ছড়ার ধরণ লক্ষ্য করবার মতো। ষোড়শ শতকের প্রখ্যাত কবি মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শ্রুতকীর্তি বহু প্রাচীন কবির বন্দনার সঙ্গে মাণিক দত্তকেও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, মণিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল-এর গীতপথ-পরিচায়ক কবি। সুতরাং চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের আদিরচয়িতার গৌরব তাঁর প্রাপ্য।

(**দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য** চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের একজন খ্যাতিমান কবি। মাধবাচার্যের লিখিত কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল' বা 'সারদাচরিত'। মাধবাচার্যকে চট্টগ্রামের লোক বলে অনুমান করা হয়। ষোড়শ শতকের শেষদিকে তাঁর কাব্যখানি রচিত। মাধবাচার্যের রচনা কাব্যাংশে মুকুন্দরামের রচনার ন্যায় উৎকৃষ্ট না হলেও তাঁর কবিপ্রতিভা নিঃসন্দেহে সকলেরই স্বীকৃতি পাবে। পাণ্ডিত্যও তাঁর কম ছিল না। দ্বিজ মাধবের 'সারদামঙ্গল' আকারে সংক্ষিপ্ত। যে সব চরিত্র তিনি নির্মাণ করেছেন তাতে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় আছে। বাস্তব-বর্ণনায় তিনি প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখিয়েছেন। কালকেতুর ভাঙা কুটীর, এই ভাঙা কুটীরের ভেরেণ্ডার থাম, ব্যাধদম্পতীর ছেঁড়া কাঁথা, তাদের বাসি মাংসের পসরা, ইত্যাদি সবকিছুর আলেখ্য অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। ধনপতির কাহিনীও বাস্তবানুসারী। খুল্লনা, ফুল্লরা আর কালকেতুর চরিত্রচিত্র তাঁর হাতে সুন্দর ফুটেছে। মুকুন্দরাম তাঁর কল্পিত কালকেতুর আলেখ্যটি নিপুণতাসহকারে অঙ্কিত করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু মুকুন্দরামের হাতে কালকেতুর চরিত্রমহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে এই কালকেতু কাপুরুষের মতো 'লুকাইল বার ধন্য ঘরে'। দ্বিজ মাধবের

কালকেতু যথার্থ বীর, ভীরুতা কাকে বলে সে জানে না। ফুল্লরা স্বামীকে যুদ্ধ থেকে বিরত হতে অনুনয় করছে, তখন :

শুনিয়া যে বীরবর কোপে কাঁপে থরথর,
শুন রমা আমার উত্তর।
করে লৈয়া শর গাণ্ডী পূজিব মঙ্গলচণ্ডী,
বলি দিব কলিঙ্গ-ঈশ্বর॥
যতেক দেখহ অশ্ব সকলি করিব ভস্ম,
কুঞ্জর করিব লণ্ডভণ্ড।
বলি দিব কলিঙ্গরায় তুষিব চণ্ডিকা মায়,
আপনি ধরিব ছত্রদণ্ড॥

বন্দী কালকেতুকে সভাসীন রাজার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছে, কিন্তু 'রাজসভা দেখি বীর প্রণাম না করে'। এ চরিত্র সত্যকার একজন বীরের। আচার্য দীনেশচন্দ্র দ্বিজ মাধবের বর্ণিত ভাঁড়ু দত্তের প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'মাধুব ভাঁড়ু দত্ত কবিকঙ্কণের ভাঁড়ু দত্ত হইতে শঠতায় প্রবীণ'। এও লক্ষ্যণীয় যে, দুয়েকটি ক্ষেত্রে মুকুন্দরাম মাধবাচার্যের কবিকল্পনার কাছে ঋণী।

দ্বিজ মাধবের কবিকর্ম সাবলীল এবং অনাড়ম্বর। এই সহজ সাবলীলতা সেকালের কবিদের রচনায় তেমন সুলভ মোটেই নয়। দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম সমকালীন কবি, মুকুন্দরামের আবির্ভাবে দ্বিজমাধবের কবিত্বের খ্যাতি অনেকখানি ম্লান হয়ে গেছে।)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য লিখে যে-ব্যক্তিটি সর্বাধিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তিনি **মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ**। মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্যে তাঁর মতো শক্তিমান কবি আর একজনও আবির্ভূত হননি একথা বললে কিছুই অত্যুক্তি করা হয় না। (দেবতার মাহাত্ম্যের কথা লিখতে বসেও মুকুন্দরাম তাঁর দৃষ্টিকে এই পরিচিত লৌকিক সংসারের চতুঃসীমায় স্থিরবদ্ধ রেখেছেন। সত্যকার মানুষের কবি তিনি, তাঁর কাব্যে যে-রস স্ফুরিত হয়েছে তাকে বলা যেতে পারে মানবরস।)

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতকের শেষদিককার লোক। স্বকৃত গ্রন্থে আত্মপরিচয় বাণীবদ্ধ করে গেছেন তিনি। তা থেকে আমরা জানতে পারি, বর্ধমান জেলার দামিন্যা গ্রামে তাঁর জন্ম। এই গ্রামে ছিল কবির চ-সাতপুরুষের বাস; বেশ সুখেশান্তিতে তাঁদের দিন কাটছিল। কিন্তু একদা দেশে দেখা দিল সাংঘাতিক অরাজকতা। মানসিংহের সুবাদারীর [খ্রীস্টাব্দ ১৫৯৪] কালে মামুদ শরিফ্ নামে এক ডিহিদারের [পরগনার ক্ষুদ্রতর একটি বিভাগের নাম 'ডিহি', ডিহির শাসনকর্তাকে বলা হয় 'ডিহিদার'] অত্যাচারে দেশবাসী উত্ত্যক্ত হয়ে উঠল, সাতপুরুষের ভিটা ফেলে দেশের উৎপীড়িত লোকসাধারণ অন্যত্র পালিয়ে যেতে লাগল। এহেন সমাজবিপর্যয়ের দিনে মুকুন্দরামকেও স্ত্রীপুত্র নিয়ে দেশত্যাগ করতে হল। বহুতর বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে কবি এসে পৌছলেন মেদিনীপুর

জেলার আড়রা গ্রামে। স্থানীয় জমিদার বাঁকুড়া রায় সহৃদয়তাবশে কবিকে আশ্রয় দিলেন। উক্ত ভূম্যধিকারী মুকুন্দরামকে নিজ পুত্র রঘুনাথের শিক্ষাগুরুরূপে নিযুক্ত করলেন। অনেককাল পরে এই রঘুনাথের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল রচনায় ব্রতী হন। রঘুনাথই তাঁকে উপাধি দেন 'কবিকঙ্কণ'।

মুকুন্দরামের কাব্যের প্রকৃত নাম 'অভয়ামঙ্গল'। (মুকুন্দরাম পল্লীসভ্যতার কবি। মানুষকে যথোচিত মর্যাদা দিয়েছেন বলে, মানবমুখী দৃষ্টিভঙ্গির জন্যেই, আধুনিক কালের মানুষ না হলেও, মুকুন্দরামকে আমরা বাঙ্‌লা সাহিত্যে আধুনিকতার পথিকৃৎরূপেই দেখেছি। গ্রামবাঙ্‌লার তদানীন্তন সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষ তাঁর কাব্যে এসে ভিড় করেছে।)মানবজীবনচরিত তিনি অভিনিবেশসহকারে অধ্যয়ন করেছেন। একারণে তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলি একেবারে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠেছে। মুকুন্দরামের আঁকা ধূর্ত বেণে মুরারি শীল, প্রবঞ্চক ভাঁড়ু দত্ত, স্বার্থপরায়ণা দুর্বলা দাসী, প্রভৃতি চরিত্র তো আমাদের সকলেরই পরিচিত। নিপুণ ভাস্করের মতো তিনি নির্মাণ করেছেন কালকেতু-চরিত্রটিকে। স্বামীপ্রাণা ফুল্লরা এবং ভাগ্যবিড়ম্বিতা খুল্লনার চরিত্র মুকুন্দরামের উদার সহানুভূতির স্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে। পল্লীসমাজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার এমন সুস্পষ্ট ছবি তাঁর মতো সেকালের আর কোন্ কবি আঁকতে পেরেছেন?

বলেছি, কবিকঙ্কণের আসল বৈশিষ্ট্য চরিত্রাঙ্কনে। কবির চরিত্রনির্মাণ-কুশলতার দুয়েকটা দৃষ্টান্ত দিই। মুরারী শীল পোদ্দার। তার কাছে কালকেতু গিয়েছে দেবীদত্ত বহুমূল্য আঙ্‌টিটি বিক্রয় করতে। পরীক্ষা করে মুরারি শীল বুঝতে পেরেছে ভারি দামে বিকোবে ওই আঙ্‌টি। কিন্তু সরলমনা কালকেতুকে সে ঠকাতে চায়।' তাই, মুখে গাম্ভীর্যের ভাব এনে দরিদ্র ব্যাধসন্তানকে মুরারি বলল

সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করাছ উজ্জ্বল॥
রতি প্রতি হৈল বীর দশ গণ্ডা দর।
দুধানের কড়ি আর পাঁচগণ্ডা ধর॥
অষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
একুনে হৈল অষ্ট পণ আড়াই বুড়ি॥
মাংসের নেছিলা বাকি ধারি দেড় বুড়ি।
কিছু লহ চালু ক্ষুদ কিছু লহ কড়ি॥

মুরারি শীলের নিকটে মাংসবিক্রী বাবদ কালকেতুর পাওনা ছিল দেড় বুড়ি। এই অতিমূল্যবান আঙ্‌টির দামের সঙ্গে ওই দেড় বুড়ি যোগ করে কালকেতুকে মুরারি একুনে দিতে চাইল অষ্ট-পণ আড়াই বুড়ি মাত্র। বেণেটি যে কতখানি ধূর্ত, উপরের

কথাগুলির মধ্যে তার পরিচয় মিলবে। নীচের বর্ণনাটিতে জুয়াচোর ভাঁড়ুদত্তের বেশভূষা ও বাক্‌চাতুর্য চমৎকার ফুটেছে :

ভেট লয়্যা কাঁচকলা পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগে ভাঁড়ু দত্তের পয়ান।
ছিটাফোটা মহাদম্ভ ছেঁড়া ধুতি কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরশান।...
আমি বড় প্রতি-আশে আইলাঙ তোমা দেশে
আগেত ডাকিবে ভাঁড়ুদত্তে,
যতেক কায়স্থ দেখ্য ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ্য
কুলশীল বিচার মহত্ত্বে।

দুর্বলা দাসীর খলস্বভাবের পরিচায়ক একটি বর্ণনা নিম্নরূপ : দুঃসতীনের প্রতি অবঞ্চন দুর্বলার সহ্য হল না, সে চিন্তা করল :

যেই ঘরে দুসতানে না হয় কোন্দল।
সেই ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল ॥
একের করিয়া নিন্দা যায় অন্যস্থান।
সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান ॥

নামে 'দুর্বলা' হলে কী হবে, কূটবুদ্ধির শক্তিতে এই নারী অত্যন্ত সবলা—বেণেবউ দুজনকে অনায়াসে সাত ঘাটে জল খাইয়ে আনতে পারে সে।

মুকুন্দরাম নিজে অশেষ দুর্গতিলাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন, সমাজের সাধারণ মানুষকে নানাভাবে নির্যাতিত হতে দেখেছিলেন; এ সমস্তেরই প্রত্যক্ষ বেদনা কবির আন্তরিকতার সঙ্গে কবি বাণীবদ্ধ করে গেছেন। নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার উৎসমূল থেকে সমাহৃত হয়েছে বলে মুকুন্দরামের আঁকা দুঃখের আলেখ্য আমাদের মর্মস্পর্শ করে বেশি।

মঙ্গলকাব্যের আবেষ্টনী অনেকটা বৈচিত্র্যহীন, এখানে অলৌকিকের নিবাধ সঞ্চার, বিষয়বস্তুও তেমন অসাধারণ কিছু নয়। এই সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়ে নিজ প্রতিভাবলে মুকুন্দরাম যে-মনোজ্ঞ কাব্য নির্মাণ করেছেন মধ্যযুগে তার তুলনা কোথায়?)

চণ্ডীমঙ্গল-এর অপর একজন উল্লেখযোগ্য কবি দ্বিজ রামদেব। তাঁর 'অভয়ামঙ্গল' বা 'সারদাচরিত'-এর রচনাকাল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ। ভাষার ওপর রামদেবের যথেষ্ট দখল ছিল, চরিত্রাঙ্কনেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে মুকুন্দরামের মতো বাস্তবদৃষ্টি ও সমাজচেতনতা তাঁর কাব্যে লক্ষিত হয় না।

সপ্তদশ দশকে মুক্তারাম সেন, জয়নারায়ণ সেন, ভবানীশংকর প্রমুখ কয়েকজন কবি চণ্ডীমঙ্গল লিখেছেন। কিন্তু এঁরা কেউ উচ্চতর কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। তা ছাড়া মুকুন্দরামের প্রভাব অতিক্রম করা এঁদের সাধ্যাতীত ছিল। কবিকঙ্কণকে যদি বনস্পতি বলি তবে এঁরা গুল্মলতা।

ধর্মমঙ্গল-কাব্য

ভূমিকাবাক্য :

ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যকথা ও মর্তে তাঁর পূজাপ্রচারের কাহিনী অবলম্বনে যে-মঙ্গল' রচিত তা-ই ধর্মমঙ্গল। ধর্মঠাকুর মনসা আর চণ্ডীর মতোই প্রাচীন এক দেবতা। তবে লক্ষ্য করতে হবে, ইনি স্ত্রী দেবতা নন, পুরুষদেবতা। জাতকুলের দিক থেকে দেখলে এ তিন দেবতাই সমপর্যায়ের—এঁরা সকলেই অনার্যকল্পনা-সম্ভূত। অবশ্য কালক্রমে এঁদের ওপর আর্যদের ধর্মীয় ভাবনার প্রভাব পড়েছে, সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের রূপান্তর সাধিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ধর্মঠাকুরের পূজা রাঢ় অঞ্চলে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ, বাঙলাদেশের অন্য-কোথাও ইনি প্রতিষ্ঠা পাননি। ধর্মমঙ্গলের কবিসম্প্রদায়ও রাঢ়ের অধিবাসী। ধর্মমঙ্গলকে আঞ্চলিক সাহিত্য বলা যায়।

রাঢ়দেশের নানাস্থানে দেখা যায়, নিম্নবর্ণের হিন্দুরা গাছের তলায়, পুকুর-পাড়ে, নদীতীরে, মাঠের মধ্যে, মন্দিরে একটি প্রস্তরখণ্ডকে পূজা করছে। এই প্রস্তরখণ্ডরূপী দেবতাই ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজ। ধর্মঠাকুরের পূজারীরা সাধারণতঃ ডোমজাতির লোক, ব্রাহ্মণপূজারী কদাচিৎ চোখে পড়ে। এইসব পূজারী 'পণ্ডিত' উপাধি ব্যবহার করেন। তাম্র-উপবীত ধারণ করা এঁদের একটা রীতি। যে-শিলাখণ্ড ধর্মরাজের বিগ্রহরূপে পূজিত হয় সাধারণতঃ তা পাদুকাচিহ্নিত কূর্মাকৃতি, কোথাও ডিম্বাকৃতি। এ ঠাকুরের কাছে শূকর, ছাগ, হাঁস, মুরগী, পায়রা প্রভৃতি পশুপক্ষী বলি দেওয়া হয়। সমাজের নানান্ জাতির নরনারী নিজেদের অভীষ্টসিদ্ধির জন্যে ধর্মঠাকুরের কাছে মানসিক করে। গ্রামবাসীর গভীর বিশ্বাস, ধর্মঠাকুর জাগ্রত দেবতা, মঙ্গলবিধায়ক ; এঁকে পূজা নিবেদন করলে রোগশোক, আধিব্যাধি, দুঃখদুর্দশা দূর হয়, এঁর কৃপায় কোনো অকল্যাণ সেবককে স্পর্শ করে না। আরো একটি বহুপ্রচলিত লৌকিক সংস্কার হল, ধর্মরাজের পূজায় কুষ্ঠরোগমুক্তি ঘটে, আর বন্ধ্যানারী পুত্রের মুখ দেখে।

ধর্মরাজের উদ্ভব হয়েছিল দূর অতীত দিনে—আর্যেতর সমাজে। নিশ্চিত-ভাবে বলা যায়, ইনি অনার্য আদিবাসীদের গ্রামদেবতা। ধর্মরাজ বহুরূপী। কালের অগ্রগতির মুখে নানাধর্মকে আশ্রয় করে ইনি আত্মরক্ষা করে এসেছেন। প্রয়োজনবোধে ইনি বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। বর্তমানে ইনি হিন্দুধর্মের আশ্রিত, পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলটি এঁর পূজার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। অধুনা ধর্মঠাকুর কোথাও শিব, কোথাও বিষ্ণু, কোথাও সূর্যদেবতারূপে পূজা পাচ্ছেন। মনসা চণ্ডী প্রভৃতি লৌকিক দেবতা হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণের মানুষের

কাছে যতখানি মর্যাদা পেয়েছেন, ধর্মঠাকুর ততখানি নয়। একদা এ ঠাকুর ছিলেন ডোমজাতির, ব্রাহ্মণেরা সহজে তাঁর পূজা করতে এগিয়ে আসতেন না, তাঁর মাহাত্ম্যখ্যাপক গান লিখতে ভয় পেতেন—জাত খোয়াবার ভয়।

ধর্মমঙ্গল-কাব্যের পটভূমিতে রাঢ়দেশের প্রাচীন ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে, রাঢ়ের অতীত দিনের সমাজচিত্র এ কাব্যে প্রতিবিম্বিত। এককালে রাঢ়ভূমি বাঙলাদেশের প্রবেশদ্বার ছিল। এই ভূমিভাগের মানুষকে পাঠান, মোগল, বর্গীর দারুণ উৎপাত প্রতিহত করতে হয়েছে, তারা বীরত্ব ও সাহসের সুদীপ্ত পরিচয় রেখে গিয়েছে। এই শৌর্যবীর্যের ছাপ পড়েছে ধর্মমঙ্গলের পাতায়। এসব কারণে ধর্মমঙ্গল-কাব্যকে রাঢ়ের বীরগাথা বলা হয়। মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে যেটুকু পুরুষবীর্য চোখে পড়ে তা ধর্মমঙ্গলে। যুদ্ধবিগ্রহ-কূটচক্রান্তের কিছু কিছু চিত্রও এতে মেলে।

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল যেমন গাওয়া হত তেমনি ধর্মমঙ্গলও। প্রধান গায়ক দেবতার ঘট সম্মুখে রেখে গান করতেন। তাঁর হাতে চামর, পায়ে নূপুর। গানের সঙ্গে বাজত মৃদঙ্গ ও মন্দিরা। এ গান চলতো বারোদিন ধরে।

ধর্মমঙ্গলের প্রধান বর্ণনীয় ধর্মের বরপুত্র নায়ক লাউসেনের আখ্যান। লাউসেনের কাহিনী ঠিক ঐতিহাসিক না হলেও এর মধ্যে কিছু ইতিহাসের সত্য নিহিত রয়েছে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। এই সত্যটি হল, বাঙলায় পাল-বংশের রাজত্বকালে সামন্ত রাজাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ। কর্ণসেন ও তাঁর পুত্র লাউসেনের সঙ্গে সোমঘোষ ও তাঁর পুত্র ইছাই ঘোষের যুদ্ধ উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ়ের দুই সামন্ত রাজার মধ্যে ঘোরতর বিবাদ ছাড়া আর কী?

ধর্মমঙ্গলের মূলকাহিনী বা কথাবস্তু-সংক্ষেপ:

এই কাব্যের প্রথমের দিকে দেখি, ধর্মঠাকুর মর্তে নিজ পূজা-প্রচারের জন্যে ব্যগ্রতা অনুভব করছেন। স্বর্গে দেবতার সভা বসেছে। এ সভায় নৃত্যকালে ইন্দ্রের নর্তকী জাম্ববতীর তাল কেটে গেল! শাপ দেওয়া হল তাকে মর্তে মানুষের ঘরে জন্ম নিতে হবে।

রমাতি নগরে বেণু রায়ের কন্যা হয়ে জন্মাল জাম্ববতী। নাম হল রঞ্জাবতী। রঞ্জাবতীর এক বোন—গৌড়ের রাজার পাটরাণী তিনি; আর. বড় ভাই মহামদ গৌড়েশ্বরের মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত।

রাজা ধর্মপালের পুত্র তখন গৌড়াধিপতি। তাঁর অশেষ প্রতাপ, রয়েছে 'নব লক্ষ সেনা'। রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে। কিন্তু এই শান্তি মাঝে মাঝে বিঘ্নিত হত রাজশ্যালক অত্যাচারী মহামদের হঠকারিতায়। একবার রাজার কানে সংবাদ পৌঁছল, এই মহামদের চক্রান্তে সোমঘোষ নামে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি খাজনার দায়ে বন্দী হয়েছে। ব্যাপারটা কী, গৌড়েশ্বর বুঝে নিলেন। তিনি হুকুম দিয়ে সোমঘোষকে কারাগার থেকে মুক্তি দিলেন এবং তাকে পাঠিয়ে দিলেন ত্রিষষ্ঠী

গড় বা ঢেকুর গাড়ে। রাজার দূরসম্পর্কের একজন ভাই কর্ণসেন তখন ঢেকুরের সামন্তরাজা। কর্ণসেনের রাজত্বে এসে সোমঘোষ বসবাস করতে লাগল।

সোমঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ। চণ্ডীদেবীর অনুগৃহীত সে। তার অসীম শক্তি, প্রকৃতি দুর্দান্ত। ইছাই বিদ্রোহী হয়ে উঠে এমন উৎপাত শুরু করল যে, কর্ণসেনের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে দাঁড়াল। গৌড়েশ্বরের আদেশে ইছাইকে দমন করতে গিয়ে সামন্ত কর্ণসেন সর্বস্বান্ত হলেন। তাঁর ছয় পুত্র মারা গেল, পুত্রদের শোকে তাঁর পত্নী প্রাণত্যাগ করলেন। পুত্রবধূরা সহমৃতা হল। ইছাইয়ের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেন না কর্ণসেন, পরাজিত হলেন তিনি। অপমানে ও মর্মবেদনায় কর্ণসেন যখন একেবারে ভেঙে পড়েছেন, সংসারবিষয়ে তাঁর মনে যখন পরমবিতৃষ্ণা জেগেছে তখন গৌড়াধিপ তাঁকে আশ্রয় দিলেন। শুধু আশ্রয় দিলেন না, এই বৃদ্ধ সামন্তকে আবার সংসারী করার উদ্দেশ্যে নিজের তরুণী শ্যালিকা রঞ্জাবতীকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। রঞ্জাবতী তখন গৌড়েই ছিল। একজন বৃদ্ধের সঙ্গে অল্পবয়স্কা বোনের বিয়ে হোক, রাজশ্যালক মহামদের এ অভিপ্রেত ছিল না। তার বিনা-অনুমতিতে এবং তার অনুপস্থিতিতে এই বিবাহকার্য সম্পাদিত হল। মহারাজ কর্ণসেন-রঞ্জাবতীকে জমিদারী দিয়ে দক্ষিণের ময়নাগড়ে পাঠিয়ে দিলেন। বৃদ্ধবয়সে কর্ণসেন ময়নার সামন্তরাজ পদে অধিষ্ঠিত হলেন।

ইছাই ঘোষের সঙ্গে লড়তে গিয়েছিল মহামদ। যুদ্ধ হতে ফিরে এসে এই বিয়ের সংবাদ পেয়ে সে ক্রোধে জ্বলে উঠল। গৌড়েশ্বরকে কিছু বলবার সাহস তার হল না, শত্রুতা আরম্ভ করল কর্ণসেনের সঙ্গে। কিছুকাল অতিক্রান্ত হল। অপুত্রক কর্ণসেন পুত্রের মুখ দেখবার অভিলাষী। কিন্তু রঞ্জাবতীর কোনো সন্তান হয়নি। একারণে উভয়ের মনে বড়ো দুঃখ। পুত্রলাভের আশায় কত দেবতার পায়ে রঞ্জা মাথা খোঁড়ে। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

একদিন ধর্মঠাকুরের গাজন-উৎসবের মিছিল যাচ্ছে রাজপথ দিয়ে। রঞ্জা কৌতূহলী হয়ে পুরোহিতকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, ধর্মঠাকুরের পূজার ফল কী। পুরোহিত বলল, এই ঠাকুর বড়ো জাগ্রত দেবতা, এঁকে পূজা করলে ধনহীন ধন পায়, পুত্রহীনের হয় পুত্রলাভ। পুরোহিতের মুখে ধর্মরাজের মাহাত্ম্য শুনে রঞ্জাবতীর চিত্তে ঠাকুরের প্রতি ভক্তির উদয় হল। রঞ্জা স্থির করল, কঠোর তপস্যায় ঠাকুরকে সে তুষ্ট করবে। শুরু হল কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনা। উপবাসে তার দেহ শীর্ণ হয়ে এসেছে, উঠে দাঁড়াবার পর্যন্ত শক্তি নেই। কিন্তু ঠাকুর কোনো প্রত্যাদেশ দিলেন না। এবার তার সংকল্প 'শালে ভর' দেবে, অর্থাৎ কণ্টকশয্যা গ্রহণ করবে। সকলে বাধা দিল কিন্তু কারো বাধার দিকে দৃক্‌পাত না করে সে 'শালে ভর' দিল।

রঞ্জাবতীর সর্বশরীর ছিন্নভিন্ন, রক্তাপ্লুত। ধর্মঠাকুর আর স্থির থাকতে পারলেন না, নিজের উপাসিকাকে পুত্রবর দান করলেন। ঠাকুরের বরে যথাসময়ে এক শাপভ্রষ্ট দেবতা রঞ্জার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করল। এই পুত্রের নাম লাউসেন। তার জন্মসংবাদ গৌড়ে পৌঁছলে গৌড়েশ্বর খুশি হলেন, কিন্তু মাতুল মহামদ

ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠল। সে স্থির করল, রঞ্জাবতীর পুত্রকে—নিজ ভাগ্নেকে—চুরি করে নিয়ে এসে হত্যা করবে। মহামদের আদেশে ইন্দামেটে নামে তার এক অনুচর শিশু লাউসেনকে অপহরণ করল। পুত্রকে হারিয়ে রঞ্জাবতী উন্মাদিনী প্রায় হয়ে উঠল। রঞ্জাবতীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে ধর্মরাজ কর্পূরবিন্দু থেকে এক শিশু সৃষ্টি করে তার কোলে পাঠিয়ে দিলেন। এই দ্বিতীয় পুত্রের নাম কর্পূরধবল। মহামদের ষড়যন্ত্র কিন্তু সফল হল না। ধর্মঠাকুরের চেলা হনুমান অপহৃত শিশুকে উদ্ধার করে মায়ের কাছে দিয়ে এল। এখন রঞ্জাবতীর দুই পুত্র—লাউসেন আর কর্পূরধবল সেন।

বড়ো হয়ে লাউসেন খুব ভালো করে মল্লবিদ্যা শিখল। তার বীর্যবত্তার খ্যাতি দেখতে দেখতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। লাউসেনের যেমন বীরপনা তেমনি চরিত্রবল। মোহিনীমূর্তি ধরে পার্বতী তার চারিত্রিক সংযম পরীক্ষা করলেন এবং খুশি হয়ে এই বীরের হাতে তুলে দিলেন স্বহস্তের অজেয় খড়্গ।

গৌড়াধিপতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে, মাতার অনুমতি নিয়ে, কর্পূরধবলসহ লাউসেন গৌড় শহরের দিকে যাত্রা করল। গৌড়ের পথে চলতে চলতে লাউসেন নিজ বীরত্বের কত পরিচয় দিল, চরিত্রসংযমের বলে অসতী নারীর লালসাক্লিন্ন প্রলোভনের ওপর জয়ী হল। তারপর এসে পৌঁছল গৌড় রাজ্যের উপান্তে। এখানে এসে মাতুল মহামদের চক্রান্তে লাউসেন কারারুদ্ধ হল। কিন্তু তার অদ্ভুত মল্লবিদ্যার পরিচয় পেয়ে রাজা সন্তুষ্ট হলেন, এবং পরিচয় নিয়ে তিনি জানলেন যে, লাউসেন তাঁর শ্যালিকা রঞ্জাবতীর পুত্র। তখন রাজার কাছে লাউসেনের সমাদর বেড়ে গেল, গৌড়েশ্বরের নিকট হতে সে ময়নাগড়ের তালুক ইজারা পেল। এবার ময়নাগড়ে ফিরবার পালা। পথে পরিচয় হল মল্লবীর কালুডোম ও তার স্ত্রী লখ্যার সঙ্গে। লখ্যাও শক্তিমতী বীরনারী। এদের পুত্র আর অনুচরাদি তেরজন ডোমকে সঙ্গে নিয়ে লাউসেন ময়নাগড়ে ফিরল। কালুডোম হল তার প্রধান সেনাপতি।

এদিকে মহামদ হিংসায় জ্বলতে লাগল। তার একটি মাত্র চিন্তা কী করে ভাগ্নেকে মেরে ফেলা যায়। গৌড়াধিপকে সে পরামর্শ দিল, লাউসেনকে কামরূপ-বিজয়ে পাঠানো হোক, কামরূপের রাজাকে দমন করে সে রাজস্ব আদায় করে আনুক। মহারাজের আদেশ পেয়ে লাউসেন কালুডোমকে সঙ্গে নিয়ে কামরূপে গিয়ে উপস্থিত হল। কামরূপের রাজা পরাজিত হয়ে লাউসেনের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। বিজয়ী বীর রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিয়ে করল। অতঃপর সিদ্ধকাম লাউসেন স্বদেশে ফিরে এল।

একটি চক্রান্ত ব্যর্থ হলে নতুন একটি চক্রান্ত ফেঁদে বসে মহামদ। ভাগ্নের অচিরে মৃত্যুই তার অভিলষিত।

সিমুলের রাজা হরিপালের কন্যা যেমন রূপসী তরুণী তেমনী বীর্যবতী। সে আবার দেবী চণ্ডীকার সেবিকা। মন্ত্রী মহামদের প্রস্তাবে ভুলে গৌড়াধিপতি সুন্দরী

কানাড়াকে বিয়ে করার অভিপ্রায় জানিয়ে ভাট পাঠালেন। কিন্তু ভাট অপমানিত হয়ে ফিরে এল। তখন ক্রুদ্ধ গৌড়েশ্বর বহু সৈন্য নিয়ে সিমুলরাজ্যে অভিযান করলেন। কানাড়া চণ্ডীদেবীর নিকট হতে একটি লোহার তৈরি গণ্ডার পেয়েছিল। সে স্বয়ংবরা হয়ে ঘোষণা করল, যে-বীর এক আঘাতে এই গণ্ডারের মাথা কাটতে পারবে তাকেই সে স্বামীত্বে বরণ করবে। গৌড়েশ্বর ও মহামদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। এরূপ একটি অবস্থায় মহামদের যুক্তিতে গৌড়াধিপ লাউসেনকে ডেকে পাঠালেন। বীর লাউসেন এককোপে গণ্ডারের মাথা কেটে ফেলল। কানাড়া লাউসেনকেই বিয়ে করল। মহারাজ এজন্যে লাউসেনের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। সে যা হোক, কানাড়া ও তার সাহসিকা দাসী ধুমসীকে নিয়ে লাউসেন ময়নাগড়ে প্রত্যাবর্তন করল।

যে-কোন উপায়েই হোক লাউসেনকে নিহত করতে হবে—মহামদের এই সংকল্প। মহারাজকে সে বলল, ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী, ঢেকুর হতে কর আদায় বন্ধ হয়েছে। লাউসেনকে পাঠান হোক এই বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করতে। রাজার আদেশে ইছাইকে দমন করতে চলল লাউসেন। সঙ্গে কালুডোম আর অসংখ্য সেনা। দুপক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধল। লাউসেন প্রথমে হত্যা করল ইছাইয়ের দুর্ধর্ষ সেনাপতি লোহাটা বর্জরকে। দেবীর অনুগৃহীত ইচ্ছাই অমিত শক্তিধর। যুদ্ধে সে অদ্ভুত বিক্রম দেখাল। কিন্তু অবশেষে ধর্মঠাকুরের বরপুত্র লাউসেনরই জয় হল, তার হাতে ইছাই প্রাণ দিল। বিজয়গৌরবে লাউসেন ফিরে এল ময়নাগড়ে।

ধর্মরাজের অলৌকিক শক্তির বিচিত্র লীলা দেখে মহামদ বিস্ময় মানল। গৌড়েশ্বরকে সে পরামর্শ দিল, ঠাকুরের পূজার আয়োজন করা হোক। মহারাজ পূজানুষ্ঠানের বিরাট আয়োজন করলেন। এই ভক্তিবিরহিত পূজায় অসন্তুষ্ট হয়ে ধর্মঠাকুর প্রবল বৃষ্টির জলে গৌড়রাজ্য ডুবিয়ে দিলেন, দারুণ বিপত্তি দেখে শঙ্কিত রাজা লাউসেনকে ডাকলেন। লাউসেন এসে বাত্যা ও প্লাবন থামিয়ে দিল।

মহারাজকে মহামদ বুঝাল, রাজ্যকে পাপ স্পর্শ করেছে; লাউসেন প্রকৃতই যদি ধর্মের সেবক হয় তবে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখিয়ে পাপ দূর করুক। তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় রাজা লাউসেনকে বললেন, সে যেন পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখায়।

রাজাজ্ঞা অলঙ্ঘ্য। ধর্মরাজের সেবক লাউসেন এই অসাধ্য সাধন করতে চলল হাকন্দ নামে স্থানটিতে। সঙ্গে গেল হরিহর বাইতি। ময়নার ভার অর্পিত হল কালুডোমেরই ওপর। এই সুযোগে দুষ্টবুদ্ধি মহামদ ময়না আক্রমণ করে বসল। কালুর স্ত্রী লখ্যা ডোমনী অসমসাহসে মহামদের সৈন্যের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। কালুডোম যুদ্ধ করে প্রাণ দিল। যুদ্ধস্থলে কলিঙ্গাও নিহত হল। কিন্তু কানাড়া ও দাসী ধুমসীর বীরপনার কাছে মহামদকে পরাজয় মানতে হল। বন্দী হল সে।

ওদিকে লাউসেন হাকন্দে দুশ্চর তপস্যায় বসেছে। নিজের দেহের মাংস হোমাগ্নিতে আহুতি দিল সে। তবু ধর্মঠাকুরের প্রসন্নতা বর্ষিত হয় না তার ওপর। পরিশেষে লাউসেন আপন মস্তক কেটে যজ্ঞানলে নিক্ষেপ করল। এবার ঠাকুর

আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর আদেশে ঘোর অমাবস্যার রাত্রিতে পশ্চিমে সূর্য উদিত হয়। সূর্যদেবের পশ্চিমোদয়ের সাক্ষী রইল হরিহর বাইতি। সাধনায় এভাবে সিদ্ধিলাভ করে গৌড়ে ফিরে এল লাউসেন।

শঠ মহামদ ঘুষ দিয়ে হরিহরকে মিথ্যা বলাতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই সে মিথ্যা বলল না। প্রমাণিত হল, লাউসেন পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখেছে। এই সত্যকথনের জন্যে মহামদের ষড়যন্ত্রে হরিহরকে শূলে প্রাণ দিতে হল।

ময়নায় এসে লাউসেন দেখে তার রাজ্য বিধ্বস্ত হয়েছে। তখন সে ঠাকুরের স্তব করতে লাগল। মহামদের সর্বদেহে কুষ্ঠরোগের সঞ্চার করে ধর্মঠাকুর তাকে তার শঠতার শাস্তি দিলেন। ধর্মের কৃপায় সকলে আবার বেঁচে উঠল। মহামদ কূটচক্রী হলেও লাউসেন দয়াপরবশ হয়ে তার কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করে দিল। তবু তার দুষ্কর্মের চিহ্ন শ্বেতকুষ্ঠের দাগ দেহ হতে সম্পূর্ণ মুছে গেল না, মুখে রয়ে গেল।

ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য পৃথিবীতে প্রচারিত হলে রঞ্জাবতী-লাউসেনের কাজও ফুরাল। পুত্র চিত্রসেনকে ময়নার সিংহাসনে বসিয়ে লাউসেন মাতার সঙ্গে স্বর্গলোকে চলে গেল।

ধর্মমঙ্গল-এর কবিসম্প্রদায় :

যেমন মনসামঙ্গলের, যেমন চণ্ডীমঙ্গলের, তেমনি ধর্মমঙ্গলের কবিও সংখ্যায় কম নন। এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছেন সমাজের নানা স্তরের মানুষ—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত এবং শুঁড়ি। অবশ্য ধর্মমঙ্গল-কাব্যের রচয়িতাগণের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ।

ধর্মমঙ্গল-এর আদিকবি ময়ূরভট্ট এরূপ প্রসিদ্ধি রয়েছে। এই 'মঙ্গল'-এর প্রায় সকল কবিই এঁকে লাউসেন-রঞ্জাবতী কাহিনীর প্রথম রচয়িতা বলে উল্লেখ করে গেছেন, তাঁরা এঁর বন্দনাও করেছেন। কিন্তু ময়ূরভট্টের লেখা ধর্মমঙ্গলের কোনো পুঁথি পাওয়া যায় নি। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলার উপায় নেই। সম্ভবত ময়ূরভট্ট চতুর্দশ শতকের লোক এবং জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। শোনা যায়, তাঁর লেখা কাব্যের নাম 'হাকন্দপুরাণ'।

খেলারাম নামে এক ব্যক্তির লেখা ধর্মমঙ্গলের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার খণ্ডিত পুঁথিও নাকি কেউ কেউ দেখেছেন, এবং তাঁরা বলেছেন, খেলারাম কাব্য লিখতে আরম্ভ করেন ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশকে। কিন্তু খেলারামের আবির্ভাবকাল ও তাঁর গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা কঠিন।

মাণিকরাম গাঙ্গুলির কাব্যে ময়ূরভট্টের সঙ্গে রূপরাম নামে আর-একজন কবির উদ্দেশ্যে বন্দনা-কাব্য রয়েছে। রূপরাম ধর্মমঙ্গল কাব্যের একজন খ্যাতিসম্পন্ন কবি। আজ পর্যন্ত ধর্মমঙ্গলের যে-সব পুঁথি পাওয়া গেছে তার মধ্যে রূপরামের পুঁথিই সবচেয়ে প্রাচীন এবং সম্পূর্ণাঙ্গ। রূপরাম বর্ধমান জেলার কাইতি-

শ্রীরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পুত্র তিনি। তাঁর গ্রন্থের রচনাকাল-বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে রূপরামের গ্রন্থ রচিত হয় ষোড়শ শতকে, কারো মতে সপ্তদশ শতকে।

রূপরাম সংস্কৃতে কিছু পাঠ নিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরূপতায় নিজগৃহে তাঁর স্থান হল না। পথে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। পথিমধ্যে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুর তাঁকে ধর্মের গীত বারমতি গাইতে আদেশ দিলেন। স্বগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে, অনেক ঘুরে, উপবাসী অবস্থায় বিস্তর শারীরিক ক্লেশ ভোগ করে, অবশেষে এড়াইল গ্রামের গণেশ নামে এক ভূম্যধিকারীর আশ্রয় পেলেন রূপরাম। গণেশ রূপরামকে সংবর্ধনা জানালেন ও তাঁকে ধর্মের গীত রচনায় অবকাশ করে দিলেন। কোনো একটি কারণে কবি জাতিচ্যুত হয়েছিলেন বলে মনে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বহুস্থানে রূপরামের কাব্যের পুঁথি পাওয়া গেছে। তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের পরিচয় মেলে। সহজ ভঙ্গিতে, প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি কাব্য লিখে গেছেন। মঙ্গলসাহিত্যে অলৌকিকের সমাবেশ খুব বেশি। দৈবলীলা মানুষের কাহিনীকে এখানে একরূপ আচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু রূপরামের সম্পর্কে প্রশংসার কথা এই যে, দেবতার দিকে তাকিয়েও তিনি বাস্তব দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেননি, মানবীয় আশাআকাঙ্ক্ষাকেও যথোচিত বাণীবদ্ধ করেছেন। বাস্তবতা ও কাহিনীবর্ণনের সাবলীলতা রূপরামের কাব্যকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। এই কবির রচনার একটুখানি নমুনা দিই। লাউসেন গৌড়যাত্রা করলে পথে নয়ানী নামে এক নারী তার মন ভুলিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করতে চাইছে। নয়ানী লাউসেনকে অনেকে কপট-মধুবচন শুনালে:

ইহা শুনি লাউসেন কর্ণে দিল হাত।
রাম রাম স্মরণ করে জগন্নাথ॥
কি করিব পান গুয়া শীতল চন্দন।
গৃহস্থের বাড়ী আমি যাই না কখন॥
শিশুকাল হইতে আমি ধর্মের তপস্বী।
শুক্রবার দিনে মোর ধর্ম-একাদশী॥…ইত্যাদি

এই অনাড়ম্বর বর্ণনাটির মধ্যে ধর্মের বরপুত্র লাউসেনের চরিত্রসংযম কেমন সুন্দর ফুটেছে।)

সপ্তদশ শতকে আরো দুজন কবি ধর্মমঙ্গল লিখে খ্যাতি পেয়েছেন—**রামদাস আদক** ও **সীতারাম দাস**। রামদাস কৈবর্তের ছেলে। হুগলী জেলার ভুরশুট পরগণার হায়াৎপুর গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল। তিনিও কাব্য লেখেন ধর্মঠাকুরের দ্বারা স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে। আত্মপরিচয়ও রেখে গেছেন কবি। লেখাপড়া শিখবার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। ঠাকুরের আশীর্বাদেই রামদাস কবিত্বশক্তির অধিকারী হন, একথা তিনি আমাদের জানিয়েছেন।

সীতারাম দাস জাতিতে কায়স্থ, বর্ধমানের সুখসাগর গ্রামে ছিল তাঁর বাড়ী। কবি তাঁর কাব্যের আত্মপরিচয়-অংশে নিজের জীবনে বহুবিধ দুঃখদুর্গতির কথা লিখেছেন। তিনিও কাব্যরচনায় ব্রতী হন ধর্মের আদেশে। সেকালে ধর্মপূজা করলে কিংবা ধর্মঠাকুরের গীত লিখলে জাত যেত। তাই ঠাকুরের দ্বারা আদিষ্ট হলেও সীতারাম কাব্যরচনে-স্বীকৃত হলেন না। তখন ধর্মরাজ তাঁকে ভরসা দিলেন : 'পরিণামে মোর পদ পাবে অনায়াসে।' এরপর কবির দ্বিধা কেটে গেল, গীত রচনায় হাত দিলেন তিনি,—'বারমতি করিলাম সাঙ্গ চল্লিশ দিনে।' সীতারামের সহজ কবিত্বের আবেদনকে স্বীকৃতি জানাতেই হয়।

ধর্মমঙ্গল-এর সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি **ঘনরাম চক্রবর্তী**। তাঁর বাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে। কবি ব্রাহ্মণকুলের মানুষ। টোলে বিদ্যাভ্যাস হয়। অল্পবয়সে ঘনরাম কবিত্বশক্তির পরিচয় দেন। তাঁর শিক্ষাগুরুই তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর কাব্যের নানা ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায়, অষ্টাদশ শতকের প্রথমের দিকেই এ কাব্য রচিত হয়েছে। সম্ভবত বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

ঘনরামের লিখিত ধর্মমঙ্গল বৃহদায়তন একখানি গ্রন্থ, চব্বিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। কবি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁর কবিত্বশক্তি সর্বজনস্বীকৃত। কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য উভয়ের সমাবেশ ঘটেছে তাঁর কাব্যে। পদ্যের ক্ষেত্রে তিনি স্বচ্ছন্দচারী, কিছুটা বাহুল্য দেখা গেলেও, অনুপ্রাসাদি অলংকার-প্রয়োগে তিনি নিপুণ। যেমন :

বিপক্ষ দেখিয়া বড় নদে বাড়ে বান।
কুলকুল কুরব কমল কানে কান॥

কবির পর্যবেক্ষণশক্তি তীক্ষ্ণ, রুচি মার্জিত, গ্রাম্য স্থূলতা হতে একরূপ মুক্ত। গ্রাম্যতাহীনতা আর সাবলীলতা সেকালের মঙ্গলকাব্যের কবিদের রচনায় সচরাচর লক্ষিত হয় না। কিন্তু এই গুণ ঘনরামের কাব্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই কবির কাব্যরীতি পরবর্তীকালের ভারতচন্দ্রের লেখনভঙ্গির কথা মনে করিয়ে দেয়। আর, ঘনরামের কাছে ভারতচন্দ্র যে কিছুটা ঋণী এ সত্যটিও অস্বীকার করা যায় না। লাউসেন-রঞ্জাবতী ইত্যাদি প্রধান চরিত্রগুলিকে খুব সজীব ও ব্যক্তিত্বে বলিষ্ঠ করে তুলতে না পারলেও ছোট ছোট চরিত্রঅঙ্কনে কবি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। সেকালের বাঙালী নারীপুরুষের বীরত্ব-সাহসিকতার ওপর ঘনরাম উজ্জ্বল আলোকপাত করেছেন। এইসব আলেখ্যের দিকে তাকালে এটুকু গর্ববোধ হয় যে, এককালে বাঙালি ভীরু ছিল না, তখনো তার কাপুরুষতার অপবাদ রটেনি। লাউসেনের পত্নী কলিঙ্গা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে, তার শব কোলে তুলে নিয়ে অশ্রুপাত করছে লাউসেনের যোদ্ধবেশে-সজ্জিতা অপর এক স্ত্রী কানাড়া। সে-সময় দাসী দুর্মুখা উপস্থিত হয়ে বলছে :

কেঁদ না সুন্দরী শুন উঠ বুক বেঁধে।
মরিলে কে কোথা কারে প্রাণ দিল কেঁদে॥
শোকের সময় নয় শত্রু আসে পুরে।
সংহার সংগ্রামে সাজি শোক ত্যজ দূরে॥

মুকুন্দরামের মতো শক্তিমান না হলেও ঘনরাম প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি একথা বলতে কোনো বাধা নেই।

ধর্মমঙ্গল লিখে মাণিকরাম গাঙ্গুলি খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। মাণিকরামের জন্মস্থান হুগলী জেলার বেলডিহা গ্রাম। কবির গ্রন্থসমাপ্তির কাল সম্পর্কে সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ একমত হতে পারেন নি। তবে বর্তমানে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে কবি তাঁর কাব্যরচনা শেষ করেন। বলরাম ও রূপরামের কাব্যের সঙ্গে মাণিকরাম যে পরিচিত ছিলেন এর প্রমাণ আছে। স্বপ্নে দেবতার আদেশ পেয়ে কাব্যলেখায় প্রবৃত্ত হওয়া সেযুগে একটা প্রথা [মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে] দাঁড়িয়ে গিয়াছিল। এরূপ প্রত্যাদেশ পান মাণিকরামও। কিন্তু ধর্মঠাকুর যে সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের পূজিত দেবতা, ব্রাহ্মণসন্তান হয়ে মাণিকরাম ধর্মের গান লেখেন কী করে? তাঁর আশঙ্কা, এতে যদি জাত যায়? তাই, দেবতার উদ্দেশে কবির উক্তি: 'জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান'। কিন্তু ঠাকুর এই বলে কবিকে আশ্বস্ত করলেন: 'আমি তোর জাতি, তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি'। আশঙ্কা কেটে গেল, মাণিকরাম গীত-রচনায় হাত দিলেন।

মাণিকরামের রচনা প্রশংসার যোগ্য। তিনি পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন, তাঁর কবিত্বশক্তি অবশ্যস্বীকার্য। কবির দক্ষতা সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে বীররসসৃষ্টিতে। কালুডোমের স্ত্রী লখার চরিত্রটি খুব নৈপুণ্যসহকারে তিনি নির্মাণ করেছেন। তাঁর লেখায় অনুপ্রাসবহুলতা চোখে পড়ে, কিন্তু এতে কাব্যের সরলতা তেমন ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না।

আলোচিত কবিগণ ছাড়াও ধর্মমঙ্গলের আরো কয়েকজন রচয়িতা রয়েছেন। এঁদের মধ্যে নরসিংহ বসু, রামকান্ত রায়, দ্বিজ রামচন্দ্র, সহদেব চক্রবর্তী-র নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। নরসিংহের বাস ছিল বর্ধমানের শাঁখারী গ্রামে। অষ্টাদশ শতকের প্রথমের দিকে তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল। রামকান্ত রায় দামোদর অঞ্চলের লোক ছিলেন। ধর্মরাজের এক নাম বুড়া ঠাকুর। এই ঠাকুরের আদেশেই তিনি নিজ কাব্য লেখেন। রচনাকাল অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে। দ্বিজ রামচন্দ্রের বাসস্থান ছিল বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের চামোট গ্রামে। সহদেব চক্রবর্তীর লেখা ধর্মমঙ্গল 'অনিলপুরাণ' নামে পরিচিত। হুগলী জেলার বালিগড় পরগণার রাধানগর গ্রামে কবির জন্ম। প্রথাগত রীতিতেই তিনি কাব্য রচনা করেন। লক্ষ্য করার মতো তেমন কোনো বিশেষত্ব তাঁর রচনায় নেই। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সহদেবের কাব্য রচিত হয়।

পঞ্চদশ শতকে মঙ্গলকাব্যধারার শুরু, অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্রে পৌঁছে সেই ধারা নিঃশেষিত হয়ে যায়। 'অন্নদামঙ্গল' স্বরূপত 'মঙ্গল'-পর্যায়ের কাব্য না হলেও এই কাব্যের রচয়িতা ভারতচন্দ্রকে মঙ্গলাখ্য রচনার শেষ কবি বলা যেতে পারে। ভারতচন্দ্রের কালেই নবাবী আমল শেষ হল। দেশের শাসনকার্যের ভার চলে গেল নবাগত ইংরেজের হাতে। এ এক যুগান্তকারী ঘটনা। দেশে পশ্চিমী হাওয়া বইতে শুরু হল। যুগধর্মের প্রভাবে এসে দেশবাসীর জীবনবোধ ও মনোভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল, তাদের মধ্যে নতুন সমাজচেতনার উদ্বোধন ঘটল। দেবমাহাত্ম্য, ভক্তিবাদ ও অলৌকিক জীবনে বিশ্বাস স্থান ছেড়ে দিল মানুষের মহিমা আর বাস্তব-সচেতনতাকে। মধ্যযুগের অবসানে আধুনিক যুগের ভূমিকা রচিত হল। একটু পরেই আমরা এ পর্বের আলোচনা করব। কিন্তু তার পূর্বে মধ্যযুগীয় বাঙ্‌লা সাহিত্যের অপর দুটি প্রধান ধারার—অনুবাদসাহিত্য ও গীতিকবিতার—মোটামুটি একটা পরিচয় জেনে নেব।

তৃতীয় অধ্যায়

অনুবাদ-সাহিত্য ঃ প্রাচীন মহাকাব্য *

॥ রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ ॥

ভূমিকাবাক্য ঃ

মঙ্গলকাব্যের বিবর্তনধারা অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে পৌঁছেছিলাম। আবার পিছন ফিরে পঞ্চদশ শতকে আসতে হল—মধ্যযুগের অনুবাদসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনে। আমাদের মধ্যযুগীয় বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রধান একটি ধারা বিবর্তিত হয়েছে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতাদির অনুবাদকর্মের মধ্য দিয়ে। সংস্কৃত-কাব্যপুরাণের অনুবাদ-বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিবিধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

মনে প্রশ্ন জাগে, সে-যুগের বাঙালি সাহিত্যনির্মাতারা সংস্কৃত-লিখিত প্রাচীন কাব্যপুরাণ ইত্যাদির অনুবাদকর্মে হাত দিলেন কেন? এর দুটি কারণ দর্শানো যায়। মুখ্য কারণ হল, এদেশের শাসক বিধর্মী পাঠান-সুলতানগণের কৌতূহল-নিবারণ তথা তাঁদের চিত্তপ্রসাদন। মুসলমানশাসন যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হল তখন বহিরাগত বিজয়ী শাসকগোষ্ঠী বাঙ্‌লাভূমিকে আর বিদেশ ভাবতে পারলেন না, স্বদেশ বলেই মনে করলেন, ধীরে ধীরে এখানকার অধিবাসী হয়ে পড়তে থাকলেন। এর ফলে তাঁদের মধ্যে বাঙালিভাব এসে গেল। দরবারে ফারসির চর্চা চলতে

থাকলেও এদেশীয় মানুষের সঙ্গে তাঁরা কথাবার্তা চালাতে লাগলেন বাঙ্‌লাতে, বাঙ্‌লাভাষাকে যথাযোগ্য সমাদর জানালেন। এরপর রাজদরবারে বাঙালি জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হতে লাগল। মুসলমানবিজেতারা আমাদের লৌকিক গল্পকাহিনীগুলি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। কিন্তু তাঁদের কৌতূহল শুধু এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না, ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনী শুনবারও অভিলাষী হলেন তাঁরা। এই অভিলাষ চরিতার্থ করবার মানসে তাঁরা সংস্কৃতে অভিজ্ঞ এবং দেশীয় ভাষায় সংস্কৃত কাব্যাদি রূপান্তরীকরণে পারদর্শী ব্যক্তিগণকে নানাভাবে পরিতুষ্ট করতে লাগলেন—এঁদের কেউ দানস্বরূপ ভূমি পেলেন, কেউ রাজকীয় উপাধিতে ভূষিত হলেন। এইভাবে উৎসাহিত হয়ে এঁরা ভাগবত-রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদে হস্তক্ষেপ করলেন। বাঙ্‌লা ভাষার মর্যাদা বেড়ে গেল। কয়েকজন সুলতান ও তাঁদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্‌লা সাহিত্য সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে গেল।

বাঙ্‌লা অনুবাদরীতি প্রচলিত হওয়ার গৌণ একটি কারণ রয়েছে। এই দ্বিতীয় কারণটি সাংস্কৃতিক—সমাজরক্ষণগত। হিন্দুরা রাজত্ব হারাল, দেশের শাসন-অধিকার মুসলমানের করায়ত্ত হল। বিধর্মী মুসলমান রাজশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গেই গোটা দেশে ইসলামধর্ম আত্মবিস্তার করতে শুরু করল। এই ধর্মীয় প্লাবনকে হিন্দুরা ঠেকাতে চাইল সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সাহায্যে। উচ্চবর্ণের হিন্দুসম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করবার প্রয়োজন অনুভব করলেন, সমাজে শাস্ত্রের শিক্ষাদীক্ষা পরিব্যাপ্ত করে দিতে বদ্ধপরিকর হলেন। এ করতে না পারা গেলে হিন্দুর সামাজিক সত্তার অপমৃত্যু অনিবার্য, এ কথা ভাবলেন হিন্দুসমাজপতিরা। শুরু হল প্রাচীন শাস্ত্র-দর্শনাদির অনুশীলন। হিন্দুসংস্কৃতির বড়ো একটি আশ্রয় রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ। এগুলিকে বাঙ্‌লায় অনুবাদ করে লোক-সাধারণের হাতে তুলে দিতে পারলে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাদের অনুরাগ বাড়বে, উচ্চাদর্শে তারা অনুপ্রাণিত হবে; এতে সমাজের ভিত্তিটিও দৃঢ়তা লাভ করবে। সেকালে পুরাণ-প্রচার-প্রয়াসের মূলে এরূপ একটি কারণ যে নিহিত রয়েছে তা অনেকেরই চোখে পড়ে না। একদিকে বিজাতীয় ধর্মের তীব্র আক্রমণ, অন্যদিকে হেয় আচারের পঙ্কে দেশের মানুষের বৃহৎ একটি অংশের নিমজ্জমানতা, তৎকালিক সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন এই উভয়কে প্রতিরোধ করতে অনেকটা যে সাহায্য করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর সঙ্গে যুক্ত হল বাঙালির ভক্তি-ভাবুকতা। ভক্তিধর্মের প্রসার বাঙ্‌লাসাহিত্যের অনুবাদ-শাখাটিকে কম পুষ্ট করেনি।

বাঙ্‌লা রামায়ণের রচয়িতাগণ :

বাঙ্‌লার সবচেয়ে লোককান্ত কবি কৃত্তিবাস ওঝা [উপাধ্যায়]। বাঙ্‌লা ভাষায় প্রথম রামায়ণ লিখে কৃত্তিবাস মৃত্যুঞ্জিৎ খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন।

কৃত্তিবাসের কৃত রামায়ণ বাঙালি-সর্বসাধারণের অত্যন্ত আদরের একটি বস্তু। বিগত পাঁচশ বছর ধরে এই মহাগ্রন্থ বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে পঠিত হয়ে আসছে। শ্রীরামচরিত-কাব্য একদিকে অফুরন্ত আনন্দের উৎস, অন্যদিকে লোকশিক্ষার প্রাণবন্ত একটি আধার। কৃত্তিবাস এবং মহাভারতের কবি কাশীদাসের সম্পর্কে মাইকেলমধুসূদন দত্ত বলছেন, এঁদের দুখানি গ্রন্থ তেতালায়ও পড়ে, বটতলায়ও পড়ে। বাঙ্‌লার সত্যকার জাতীয় কবি যদি কেউ থাকেন ওঁরা হলেন প্রথমে কৃত্তিবাস ওঝা, তারপর কাশীরাম দাস।

এবার কৃত্তিবাসের ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনের কথা। কৃত্তিবাস তাঁর আত্মপরিচয় রেখে গেছেন। আত্মবিবরণ থেকে জানা যায়, তাঁর পিতার নাম বনমালী, মাতার নাম মেনকা। কৃত্তিবাসের এক পূর্বপুরুষ কোনো বিশেষ একটি কারণে পূর্ববঙ্গের আদিবাসস্থান ছেড়ে এসে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া-শান্তিপুরের নিকটবর্তী ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কবির বংশ মুখটি বংশ নামে খ্যাত। নিজের জন্মের তারিখও উল্লেখ করেছেন কবি। এর থেকে জ্যোতিষিক গণনায় পণ্ডিতেরা মোটামুটি স্থির করেছেন, ১৩৯৮ ইংরেজি সালে কিংবা ১৪১৫-১৬ ইংরেজি সালে কবি জন্মগ্রহণ করেন। আবার, কেউ কেউ বলেছেন, পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই কবির আবির্ভাব। সে যা হোক, বার বছর বয়সে কবি বরেন্দ্রভূমিতে [উত্তর-বঙ্গে] যান বিদ্যালাভের জন্যে। পড়াশুনা শেষ করে কবি এলেন গৌড়ের রাজদরবারে, উদ্দেশ্য—দেশের রাজার কাছে নিজের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দেওয়া। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ-পাঠে অনুমান হয়, যে গৌড়েশ্বরের কথা কবি উল্লেখ করেছেন, তিনি প্রতাপশালী কোনো হিন্দুরাজা। কৃত্তিবাস যখন দর্শনপ্রার্থী হলেন, রাজা তখন দরবারে বসে। দরবার ভাঙলে রাজসকাশে ফুলিয়ার এই নতুন পণ্ডিতের ডাক পড়ল। কবি দ্বারীর অনুসরণ করলেন।

পাত্রমিত্রপরিবেষ্টিত হয়ে গৌড়েশ্বর মাঘমাসের রোদ পোহাচ্ছেন। একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে পণ্ডিত-কবি সাতশ্লোকে রাজসম্ভাষণ করলেন। কবির কণ্ঠোচ্চারিত শ্লোক শুনে রাজা অত্যন্ত খুশি হলেন, খুশি হয়ে কবিকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করলেন, তাঁকে 'পাটের পাছড়া' উপহার দিলেন। প্রাণদীপ্ত এই কবিসংবর্ধনা। রাজসংবর্ধনা পেয়ে কৃত্তিবাস নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন।

গৌড়েশ্বরের অনুরোধে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনায় ব্রতী হলেন।

এখন প্রশ্ন, কে এই গৌড়েশ্বর? এ প্রশ্নের উত্তর পেলে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব-কালটি জানতে পারা যায়। পঞ্চদশ শতকে—পাঠানআমলে—গৌড়ের সিংহাসনে বসেছিলেন হিন্দুরাজা গণেশ [১৪১৫-১৪১৮]। গণেশের পুত্র যদুও কিছুকালের জন্যে সিংহাসনের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করেন, এবং তখন তাঁর নাম হয়—জলালু-দ্‌-দীন মহম্মদ শাহ। হিন্দুর সন্তান বলে তাঁর দরবারে হিন্দুরীতি চলত। এদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাস উৎসাহিত হয়ে থাকলে, ধরে নিতে হবে, পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে তিনি রামায়ণ রচনা শেষ করেছিলেন।

কিন্তু কারো কারো মতে কৃত্তিবাস শ্রীচৈতন্তের সময়েরই লোক, ষোড়শ শতকের আগে তাঁর গ্রন্থ রচিত হয়নি। দেখা যাচ্ছে, কৃত্তিবাসের কাল স্থির করা জটিল একটি সমস্যা। তবে অধিকাংশ গবেষক কৃত্তিবাসকে পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে টেনে নিয়ে যাবার পক্ষপাতী নন।

কৃত্তিবাস যে 'শ্রীরামপাঁচালির' প্রথম কবি ও সত্যটি সকল তর্কের অতীত। তবে মনে রাখতে হবে, কবি বাল্মীকি-রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করেননি, করেছেন ভাবানুবাদ। মূলানুসারী হলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণকে বাঙালির রুচি ও সংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বাধীন রচনা বলা যেতে পারে। মূলের কোনো কোনো আখ্যান এতে বর্জিত হয়েছে, অনেক ঘটনা ও কাহিনী নতুন সংযোজিত হয়েছে।

জনপ্রিয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ গান করা হত। বহু লিপিকার গায়কের পুঁথি নকল করেছে। লিখবার সময় পরবর্তীকালের অনেক রামায়ণকারের লেখা এই রামায়ণে ঢুকে গেছে। এতে নানা হস্তের ছাপ, নানা যুগের ও নানা ধর্মের প্রভাব এবং যুগোপযোগী সংস্কারসাধন সহজেই চোখে পড়ে। নানা কবির রচনাংশে কৃত্তিবাসের গ্রন্থে স্থান পেলেও সেগুলি মিলে মিশে এমনভাবে একাকার হয়ে গেছে যে, কোন্ অংশ কৃত্তিবাস লিখেছেন, আর কোন্ অংশ অপর কবির লেখা তা বুঝে ওঠা অসম্ভব একটি ব্যাপার।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূল ভাষাও অনেকখানি বদলে গেছে। ফলে পুরাতন ভাষা নবীনের রূপ গ্রহণ করেছে। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা এই বইটি ছেপে যখন প্রকাশ করেন তখন বইটিকে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য করবার জন্যে এর ভাষাটিকে মেজেঘষে একেবারে আধুনিক করে তোলেন। এ বইয়ের মূল ভাষার রূপটি কীরূপ ছিল, জানবার উপায় নেই।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এর অন্তঃপ্রবাহী বাঙালি-মনোভাব এবং বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাবুকতা। কবির কল্পিত রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, দশরথ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, এমন কি, বিভীষণ, মন্দোদরী, শূর্পণখা-আদি মানবমানবী চিন্তায় ও চরিত্রে অংকিত বাঙালিঘরের মানুষ হয়ে উঠেছে। বীরপুরুষ হয়েও শ্রীরাম সীতাহরণে অত্যন্ত অধীরতা প্রকাশ করেন, শক্তিশেলবিদ্ধ লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে বালকের মতো কাঁদতে থাকেন, হৃদয়াবেগের সামান্য আলোড়নে তাঁর চোখ-দুটি সজল হয়ে ওঠে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রাচীন সংস্কৃত-আদর্শের মহাকাব্য না হয়ে ভক্তিরসের কাব্য হয়ে উঠেছে। এখানে রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলে মনে হয়, ভক্তি-আরাধনার যেন বিগ্রহ তিনি। রামচরিত্র বৈষ্ণবী কোমলতায় মেদুর, ভক্তের জন্যে তাঁর করুণা শতধারে উৎসারিত। এখানে বীরবাহু, তরণীসেন, রাবণ প্রমুখ চরিত্র ভক্তবৈষ্ণবের সাজে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছেন।

সে যা হোক, কবিহিসেবে কৃত্তিবাসের শক্তি অস্বীকার করবে কে? কত বিচিত্র রকমের অনুভূতিকে বাঙ্‌লা ভাষায়, পয়ার ছন্দে, তিনি গ্রথিত করেছেন।

এর পরিচ্ছন্ন প্রাঞ্জল বাণীরূপ সকলেরই চিত্তহরণ করে। বাঙলার লোকজীবনের সঙ্গে এর যোগটি অন্তরঙ্গ। বাঙালির নিজস্ব ভাবের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে বলে এ বইখানি আমাদের এতখানি আদরের সামগ্রী হতে পেরেছে। খাঁটি বাঙালির কাব্য লিখে কৃত্তিবাস অমরতা পেয়েছেন। কবির রচনার দুটি মাত্র নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করা হল :

হাতে ধনুক বাণ রাম ধাইয়া আসে ঘরে।
পথে অমঙ্গল রাম দেখিল গোচরে॥
বামে সর্প দেখিল রাম দক্ষিণে শৃগালী।
মনে তোলাপাড়া করে হইয়া উতরোলী॥
বিপরীত রা কাড়িলেক নিশাচর॥
মোর উদ্দেশে আসিবে ভাই সীতা থুইয়া ঘর॥

শ্রীরামপুরে মুদ্রিত রামায়ণের এই ভাষা অত্যন্ত সহজ বলে কারো বুঝতে কষ্ট হয় না। নীচের উদ্ধৃতিটি রামায়ণের কোনো হস্তলিখিত পুঁথিতে নেই, এটি নিশ্চয়ই পরবর্তী কালের যোজনা :

গোদাবরী-নীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিলা কি গ্রাস॥
রাজ্যচ্যুত যদ্যপি হয়েছি আমি বটে।
রাজলক্ষ্মী আমার ছিলেন সন্নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারালাম বনে।
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এতদিনে॥

সীতাকে হারিয়ে শ্রীরাম বিলাপ করছেন, এ ভাষা প্রাঞ্জলতাগুণে অতিশয় সমৃদ্ধ। এমন প্রসাদগুণসম্পন্ন না হলে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আমাদের ঘরে ঘরে পঠিত হত না।

কৃত্তিবাস মাতৃভাষায় রামায়ণকাহিনী রচনার পথ খুলে দিলেন, তাঁর প্রদর্শিত পথে বহু কবিযাত্রীর পদসঞ্চার শোনা গেল। কৃত্তিবাসের অনুসরণে অনেকেই যে রামায়ণ রচনায় হাত দিয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এঁদের তেমন বিস্তৃত কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না, এঁদের লেখা সম্পূর্ণ কোনো পুঁথিও মেলে না। এসব কবির রচনা, মনে হয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজ স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছে। অবশ্য কয়েকজন কবির লিখিত রামায়ণকথা আমাদের হাতে এসেছে—কোথাও সম্পূর্ণ, কোথাও খণ্ডিতভাবে। এঁদের মধ্যে যাঁরা কিছুটা স্বকীয়তা দেখিয়েছেন, খুব সংক্ষেপে তাঁদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হল।

কৃত্তিবাসের পর একজন নারী-কবি রামায়ণগীতি লিখেছিলেন। তাঁর নাম চন্দ্রাবতী। ময়মনসিং জেলার প্রখ্যাত মনসামঙ্গল-রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা তিনি। এই প্রতিভাময়ী নারীকবির জীবৎকাল আনুমানিক ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। চন্দ্রাবতীর রচনার মৌলিকত্ব ও কবিত্বকে আমাদের সাহিত্য-সমালোচকেরা অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েছেন। এই রামায়ণগীতি পূর্ব-ময়মনসিং অঞ্চলে মহিলাসমাজে খুবই প্রচলিত। এই রামায়ণকথা কিন্তু অসম্পূর্ণ, এতে সীতার বনবাস পর্যন্ত বর্ণিত আছে। চন্দ্রাবতীর ব্যক্তিগত জীবন সুখের ছিল না, দারুণ হতাশা ও ব্যর্থতার দুঃসহ বেদনা নিয়ে অকালে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাই, নিজের পুস্তকখানি শেষ করতে পারেননি। চন্দ্রাবতীর ভাষা সহজ সরল। রচনা কারুণ্য ও ভক্তিরসে আর্দ্র। কবির রচনার একটি নমুনা দিই। রাবণের ছলনায় ভুলে সীতা তাকে একটি বনের ফল ভিক্ষা দিতে এলেন। এই সুযোগে রাক্ষসরাজ সীতাকে হরণ করে রথে তুলে নিলেন। এখানে তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে :

একটি বনের ফল গো অঞ্চলে বাঁধিয়া।
কুটিরের বাহির হইলাম গো ভাবিয়া চিন্তিয়া॥
আমি কিগো জানি সখি কালসর্প বেশে।
অমনি করিয়া সীতায় ছলিবে রাক্ষসে॥
প্রণাম করিনু আমি গো পড়িয়া ভূতলে।
উড়িয়া গরুড় পক্ষী সর্প যেমন গিলে॥
রথেতে তুলিল মোরে দুষ্ট লঙ্কাপতি।
দেবগণে ডাকি কহি গো দুঃখের ভারতী॥
অঙ্গের আভরণ খুলি গো মারিনু রাক্ষসে।
পর্বতে মারিলে ঢিল কিবা যায় আসে॥

রামায়ণগীতি ছাড়াও চন্দ্রাবতী 'মলুয়া' ও 'কেনারাম' দস্যুর কাহিনী আশ্রয়ে দুখানা ক্ষুদ্র কথাকাব্য লিখে গেছেন।

এর পর রামায়ণ পাঁচালির উল্লেখযোগ্য কবি হলেন নিত্যানন্দ আচার্য বা অদ্ভুত আচার্য। ইনি সপ্তদশ শতকের কবি। পাবনা জেলায় অমৃতকুণ্ডা গ্রামে এঁর জন্ম। নিত্যানন্দ-বিরচিত রামায়ণ উত্তরবঙ্গে একদা বিশেষরূপে আদৃত হয়েছিল। অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বন করে ইনি রামায়ণ পাঁচালি লিখেছিলেন বলে এবং কিছু কিছু আশ্চর্য অদ্ভুত কথা আমাদের শুনিয়েছেন বলে অদ্ভুতাচার্য নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। অদ্ভুতাচার্যের অদ্ভুত কল্পনায় সীতা কালীর অবতার; বাল্মীকির সীতার ওপর আর-এক নতুন সীতা তিনি দাঁড় করিয়েছেন। এ কবির রচনার কোনো কোনো অংশ কৃত্তিবাসী রামায়ণে ঢুকে গেছে।

অষ্টাদশ শতকে যে কয়েকজন কবি রামচরিত-কাব্য লিখেছেন তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় রামানন্দ ঘোষএবং জগৎরাম রায়। রামানন্দ যৌবনে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন।

বোধ করি এ কারণেই নিজেকে তিনি 'যতী' বলেছেন। কবি সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর রামলীলার রচনা সরস, মনোজ্ঞ এবং কবিত্বমণ্ডিত।

বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জগৎরামের জন্ম। তেমন প্রাঞ্জল না হলেও জগৎরামকৃত রামায়ণে সুন্দর বর্ণনা গ্রথিত হয়েছে। জগৎরাম যে-রামায়ণ কাব্য লেখেন তাতে লঙ্কাকাণ্ড নেই, তাঁর পুত্র রামপ্রসাদ লঙ্কাকাণ্ডটি লিখে পিতার কাব্যে সংযোজিত করেন। পিতাপুত্রের লেখা এই রামায়ণগ্রন্থখানি আকারে বেশ বড়ো।

উনবিংশ শতকের রামায়ণকারগণের মধ্যে রঘুনন্দন গোস্বামী-র নাম উল্লেখ্য। কবির নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার নাড় গ্রামে। রঘুনন্দনের লিখিত কাব্যের নাম 'রামরসায়ন'। বাল্মীকির অনুসরণে এ কাব্য রচিত হলেও, তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ থেকে আহৃত কিছুকিছু উপাদানও এতে স্থান পেয়েছে। পরবর্তী রামায়ণগুলির তুলনায় এ বইতে বৈষ্ণবপ্রভাবও কিছুটা বেশি। কবি কারুণ্যসৃষ্টিতে যেন অনিচ্ছুক ছিলেন, তাই, উত্তরকাণ্ডে করুণ অংশগুলি তিনি বর্জন করেছেন।

কবিচন্দ্র-উপাধি-ভূষিত শংকর চক্রবর্তী নামক কবি রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন। এটি বিষ্ণুপুরী রামায়ণ নামে খ্যাত। কবিচন্দ্রকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমের দিকের কবি বলে ধরা হয়। ইনি বাঁকুড়া জেলার লোক ছিলেন এবং মল্লরাজদের আশ্রিত। কবিচন্দ্রের লেখা রামায়ণের অনেক অংশ কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণে মিশে গেছে। কেউ কেউ মনে করেন, অঙ্গদরায়বার, তরণীসেন-বধের পালা, ইত্যাদি অংশের রচয়িতা কবিচন্দ্র।

॥ মহাভারত ॥

বাঙ্‌লায় প্রথম অনূদিত হয় রামায়ণ, তারপর মহাভারত। ষোড়শ শতকের একেবারে প্রথমের দিকে মহাভারতের অনুবাদকর্ম শুরু হয়েছিল এরূপ অনুমান করা যায়। 'ভারত পাঁচালি'র আদিকবি কে, এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আচার্য দীনেশচন্দ্রের মতে বাঙ্‌লা মহাভারত-কাব্যের প্রথম কবি সঞ্জয় নামে এক ব্যক্তি। কিন্তু এই সঞ্জয়-কবির বিশেষ কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ বলেছেন, শ্রীহট্টদেশের ব্রাহ্মণবংশে সঞ্জয়ের জন্ম। সংস্কৃত মহাভারত দেশীয় ভাষায় কেন অনুবাদ করতে গেলেন তার বিষয়ে কবি নিজে বলেছেন : 'অতি অন্ধকার যে ভারতসাগর। পাঞ্চালী সঞ্জয় তাক করিল উজ্জ্বল॥' বৃহদায়তন ভারত-মহাকাব্য সংস্কৃতানভিজ্ঞের কাছে অনধিগম্য ছিল, অনুবাদ দ্বারা কবি প্রথম তাকে সাধারণ্যে প্রচার করেন। ডক্টর সুকুমার সেন কিন্তু মহাভারতের অনুবাদক উক্ত সঞ্জয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তিনি বলেন, সঞ্জয় কোনো অনুবাদকের নাম নয়। তাঁর মতে 'সঞ্জয়-ভারত' অর্থে সংস্কৃত 'বৈশম্পায়ন ভারত'।

আচার্য দীনেশচন্দ্র-কথিত সঞ্জয়ের বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না বলে, এখন মেনে নেওয়া হয়েছে 'কবিন্দ্র পরমেশ্বরই' বাঙলা মহাভারতের আদি-রচয়িতা। এ বই যখন র'চত হয় স্বনামখ্যাত হোসেন শাহ্ [১৪৯৩-১৫১৯] তখন গৌড়ের রাজা। এই মুসলমানসম্রাট বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। সেকালের মুসলমানশাসকবর্গ ধীরে ধীরে হিন্দুমনোভাবসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন, হিন্দুর পুরাণকথা ও কাব্যাদি তাঁরা আগ্রহসহকারে শুনতেন, দেশীয় গুণীজ্ঞানীরা তাঁদের রাজসভায় সমাদৃত হতেন। সুলতান হোসেন শাহ্‌র প্রধান সেনাপতি [লস্কর] পরাগল খাঁ [চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন ইনি] ভারতকথা ধারাবাহিকভাবে শুনবার অভিলাষী হয়ে তাঁর সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসকে মহাভারতের কাহিনী বাঙলায় অনুবাদ করতে আদেশ দেন। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'ভারত পাঁচালি' লিখলেন।

পরাগলের উৎসাহ ও আদেশে রচিত হয়েছে বলে পরমেশ্বরকৃত মহাভারতের সাধারণ পরিচয় 'পরাগলী মহাভারত'। গ্রন্থখানির নাম 'পাণ্ডববিজয়'। সংক্ষেপে তিনি প্রায় সমগ্র মহাভারতই অনুবাদ করেন। সংস্কৃতভাষার ওপর কবির খুব দখল ছিল বলে মনে হয়। তাঁর রচনার একটি নমুনা দিই। উদ্ধৃত অংশটিতে শ্রীহরির রূপ বর্ণিত হয়েছে :

পরিধান পীতবাস কুসুম বসন।
নবমেঘ-শ্যাম অঙ্গ কমললোচন॥
মেঘের বিদ্যুৎতুল্য হসিত মুখেত।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম এ চারি করেত॥
শিরেতে বান্ধিছে চূড়া মালতী-মালাএ।
দেখিয়া মোহন বেশ পাপ দূরে যাএ॥

তৎসম শব্দের প্রাধান্য থাকলেও এ ভাষার প্রাঞ্জলতাগুণ অবশ্যস্বীকার্য। সম্রাট হোসেন শাহ্‌র রাজত্বের শেষদিকে পরাগলী মহাভারতের অনুবাদকার্য আরম্ভ হয়। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে এর রচনা সমাপ্ত হয়েছিল। কবীন্দ্রের বিশেষ কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

পরাগল খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ সুলতান হোসেন শাহ্ কর্তৃক সেনাপতির পদে বৃত হন। পিতার মতোই ছুটি খাঁ-ও মহাভারতের অনুরাগী শ্রোতা ছিলেন। শ্রীকর নন্দী নামে নিজের এক সভাসদ্‌কে ছুটি খাঁ মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বকথা বাঙলায় লিখতে বলেন। জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধপর্ব অবলম্বনে শ্রীকর নন্দী বাঙলা ভাষায় নতুন অশ্বমেধপর্ব লিখলেন।

শ্রীকর নন্দী ভারতকাহিনী যখন অনুবাদ করেন তখন গৌড়ের রাজা ছিলেন হোসেন শাহ্-এর পুত্র নুসরৎ শাহ্ [১৫১৯—১৫৩২]। সুতরাং বলা যেতে পারে, ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদে কবি তাঁর অশ্বমেধপর্বকথা রচনা শেষ করেছিলেন। শ্রীকর নন্দীর রচনার একটি নিদর্শন উদ্ধৃত করা হল :

কৃষ্ণের বচনে ভীম রুষিয়া বলিল।
মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল॥
তোম্মার উদরে যত বসে ত্রিভুবন।
আম্মার উদরে কত অন্ন ব্যঞ্জন॥
সংসার উপালম্ভ সব খাইলা তুম্মি।
তাহা হৈতে বহু ভয়ঙ্কর বোলে আম্মি॥

মহাভারতকার ব্যাসের সঙ্গে শ্রীকর নন্দীর অনুবাদের কোনো সম্পর্ক নেই, এর মূল উৎস জৈমিনি-সংহিতা।

ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে **রামচন্দ্র খান**-এর অশ্বমেধপর্ব এবং এই শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে **দ্বিজ রঘুরাম**-এর 'অশ্বমেধ-পাঞ্চালী' রচিত হয়।

সপ্তদশ শতকের প্রখ্যাত মহাভারত-রচয়িতা হলেন **কাশীরাম দাস**। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতোই, কাশীদাসী মহাভারতের জনপ্রিয়তা বহুব্যাপ্ত। কৃত্তিবাসের নামের সঙ্গে কাশীদাসের নামটি চিরকালের জন্য একত্র হয়ে গেছে। উভয়ে বাঙলা কাব্যের অঙ্গনে দুই বিশাল বনস্পতির ন্যায় ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। এঁদের কাব্য যথার্থ লোককাব্য বলে বাঙালির কাছে এঁরা যুগাতীর্ণ সর্বকালের কবি—সকলেরই সমাদৃত।

বর্ধমানের ইন্দ্রাণী পরগণার সিঙ্গি গ্রাম কাশীরামের জন্মস্থান। তাঁর পিতার নাম কমলাকান্ত। জাতিতে তাঁরা কায়স্থ। কবির পূর্বপুরুষ দেশ ছেড়ে ধলভূম-ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে চলে যান। কথিত আছে, কাশীরাম মেদিনীপুরের জমিদারের আশ্রিত। জমিদারবাড়ীতে অনেক কথক ও পণ্ডিতের সমাগত হত, পুরাণকথা শোনাবার জন্যেই তাঁরা আসতেন। তাঁদের কাছে মহাভারতের গল্প শুনে কাশীরাম ভারতকাহিনীর অনুরাগী হয়ে ওঠেন। এই অনুরাগই তাঁকে মহাভারতের অনুবাদকর্মে প্রাণিত করে—কবি ধারাবাহিকভাবে সহজ ভাষায় লোকসাধারণের জন্যে লিখলেন মহাভারত। অনুমান করা যায়, সপ্তদশ শতাব্দের একেবারে প্রথম দিকে কাশীদাসের মহাভারত লেখা হয়।

জনশ্রুতি রয়েছে, গোটা মহাভারত কাশীরাম লিখে যেতে পারেন নি, মাত্র তিনটি পর্ব রচনা শেষ করে তিনি মারা যান। অষ্টাদশ পর্বের এই কাব্যখানির অবশিষ্টাংশ সমাপ্ত করেন কবিরই জ্ঞাতিসম্পর্কিত এক ভ্রাতুষ্পুত্র নাম—নন্দরাম দাস। পণ্ডিতেরা বলেন, কাশীদাসী মহাভারতে কৃষ্ণানন্দ বসু নামে এক ব্যক্তিরও হাত আছে।

কাশীদাসী মহাভারত বেদব্যাস-বিরচিত মূল সংস্কৃত মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, একে ছায়ানুসারী ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে। তা ছাড়া, নানা পুরাণ উপপুরাণের আখ্যান এতে স্থান পেয়েছে। আরো বলা যায়, কবির নিজ কল্পনার সৃষ্টিও এই গ্রন্থে লক্ষিত হয়।

কাশীদাস দেশের মানুষকে শুধু গল্পরস পরিবেশন করেন নি, ধর্মবোধের

প্রেরণায় নৈতিক শিক্ষাদানের বিষয়েও সচেষ্ট হয়েছেন। কবির ভক্তিভাবুকতাও লক্ষ্য না করে পারা যায় না। কাশীরামের ভাষা পরিচ্ছন্ন ও প্রাঞ্জল, এতে স্নিগ্ধ একটা সৌকুমার্য আছে। কবি কাশীরাম দাসের ভাষার বিচ্ছিন্ন একটি নমুনা :

অষ্টক বলিল তুমি কোন্ মহাজন।
কোন্ নাম ধর তুমি কাহার নন্দন॥
সূর্য অগ্নি প্রায় তেজ দেখি যে তোমার।
স্বর্গ হৈতে পড় কেন না বুঝি বিচার॥
রাজা বলে নাম আমি ধরি যে যযাতি।
পুরুর জনক আমি নহুষে উৎপত্তি॥
পুণ্যবান জনের করিলাম অপমান।
সেই হেতু আমার হৈল ক্ষীণ পুণ্য॥

তিনশ বছরেরও আগে কাশীদাস জন্মেছিলেন। বাঙালি মানুষ দীর্ঘকাল ধরে কাশীদাসী মহাভারতের সঙ্গে পরিচিত। কাশীরাম আমাদের মানসপ্রকৃতিকে গঠন করেছেন, আবার, আমাদের ভাবনাকল্পনা, ধ্যানধারণা যুক্ত হয়ে তাঁর কাব্যকে বাঙালিজীবনের মহাকাব্য করে তুলেছে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে আরো বহুজন কবি মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন. তবে অনেকাংশে ক্ষেত্রেই এই অনুবাদ আংশিক অর্থাৎ দুচারটি পর্বের। সম্পূর্ণ মহাভারত-কাহিনী লিখেছিলেন কবিচন্দ্র চক্রবর্তী, ষষ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস। নিত্যানন্দ ঘোষ, রাজেন্দ্র দাস, উড়িষ্যার কবি সারল প্রমুখ কবির লেখা ভারতকাব্যের বিভিন্ন পর্বের পুঁথি পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে নিত্যানন্দ ঘোষের নাম উল্লেখ্য। তাঁর মহাভারত একসময়ে পশ্চিমবঙ্গে খুবই প্রচলিত ছিল।

রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদের ধারা বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে এসেছে। মৌলিক রচনা সাহিত্যের পুষ্টিবিধান করে, এ সম্পর্কে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সাহিত্যের সম্পদ বাড়াতে হলে সার্থক অনুবাদকার্যেরও আবশ্যকতা রয়েছে। এতে ভাষার শব্দসম্পদ বৃদ্ধি পায়, ভাব ও বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য আসে। রামায়ণ-মহাভারত, আমাদের আকর-গ্রন্থ। কত কত সাহিত্যকার যে এ দুটি বই থেকে উপাদান আহরণ করে কাব্য-নাটকাদি লিখেছেন তা বলে শেষ করা যায় না।

চতুর্থ অধ্যায়

• শ্রীচৈতন্যের জীবন ও চৈতন্যজীবনী-কাব্য •

১

শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা :

এক অলৌকিক মানুষের মর্তজীবনলীলার কথা লিখতে বসেছি আমরা। এই মহামানবের পুণ্য নামটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত—শ্রীচৈতন্য। যুগাবতার শ্রীচৈতন্য যে জীবন যাপন করে গেছেন তা মোটেই ঘটনাবহুল নয়, এহেন দিব্যজীবনে বিচিত্রতাপূর্ণ বহির্ঘটনার শোভাযাত্রার সুযোগ কোথায়? তাঁর জীবন বলতে অন্তরঙ্গ ভাবজীবন—ঈশ্বরীয় প্রেমানুভব ও লীলারসে অতিশয় সমৃদ্ধ।

ইংরেজি ১৪৮৬ সালের ফাল্গুন মাস। এই ফাল্গুনের দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে নবদ্বীপধামে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। এক সাধারণ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে জন্ম নিলেন এক অসাধারণ মানব। পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। নবজাত শিশুটির নামকরণ হল বিশ্বম্ভর, ডাকনাম নিমাই। শ্রীচৈতন্যের অপূর্বসুন্দর দেহকান্তি, গায়ের রঙ্ কাঁচা সোনার মতো। উজ্জ্বল-গৌরবর্ণ-দেহবিশিষ্ট নিমাইকে পাড়া-প্রতিবেশীরা আদর করে ডাকত গোরা—গৌরাঙ্গ—বলে।

গোরা ধীরে ধীরে বড় হয়, আর, সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলে তার চপলতা, দুরন্তপনা। নিমাইয়ের অত্যাচারে নবদ্বীপবাসিগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, সকলে বলে, 'জগন্নাথের কুপুত্র' নিমাই। জগন্নাথ মিশ্র নানাজনের নিত্য অভিযোগ শুনে চিন্তিত হয়ে উঠলেন, অশান্ত পুত্রকে টোলে পাঠাতে বাধ্য হলেন।

নিমাই তীক্ষ্ণধী বালক। অল্পকালের মধ্যেই ব্যাকরণ, ন্যায়, কাব্য, ইত্যাদি শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। নিমাইয়ের বিদ্যাবত্তার খ্যাতি অচিরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কেশব-কাশ্মীরী নামে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তর্কে হারিয়ে তাঁর বিদ্যাভিমান তিনি চূর্ণ করলেন। শাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তি অর্জন করলে কী হবে, তাঁর শৈশবের চাপল্য, দুষ্টবুদ্ধি আর রহস্যপ্রিয়তা হ্রাস পেল না। স্থানীয় নামকরা প্রবীণ পণ্ডিতদের পথে পেলে তাঁদের তিনি জটিল প্রশ্নে বিমূঢ়, ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন।

শিক্ষা সমাপ্ত হলে নিমাই টোল খুলে অধ্যাপনায় ব্রতী হলেন। তখন তাঁর বয়স কুড়ির মতো হবে। সেকালে নবদ্বীপ ভারতের পূর্বাঞ্চলে সংস্কৃতশাস্ত্রচর্চার অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি কেন্দ্র ছিল। বহু পড়ুয়া এসে তাঁর টোলে ভর্তি হল। নিমাইয়ের অদ্ভুতসুন্দর মূর্তি, অসামান্য পাণ্ডিত্য, শাণিত বুদ্ধি, প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্ব। এমন একজন আশ্চর্য প্রতিভাধর মানুষের নিকটসান্নিধ্যে এসে ছাত্রদল একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। কত কত পণ্ডিত তো রয়েছেন কিন্তু নিমাইয়ের তুলনা কোথায়। কুড়ি বছর না পেরুতেই নিমাই পণ্ডিতাগ্রগণ্য বলে স্বীকৃতি পেলেন।

নিমাই অল্পবয়সেই সংসারী হয়েছিলেন। নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন লক্ষ্মীদেবীকে। পিতা জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্বভার তাঁর ওপরই পড়ল। জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্টের লোক। পড়াশুনা করতে এসে নবদ্বীপেই স্থায়ীভাবে বাস করছিলেন। শ্রীহট্টে তাঁর কিছু সম্পত্তি ছিল। নিমাই একবার পূর্ববঙ্গে গেলেন, পিতৃভূমিতে গিয়ে বেশ কিছু টাকাপয়সাও পেলেন, আর সেখানে পেলেন পাণ্ডিত্যের প্রচুর খ্যাতি। কিন্তু গৃহে ফিরে এসে শুনলেন মর্মান্তিক এক দুঃসংবাদ—তাঁর প্রিয়তমা পত্নী লক্ষ্মীদেবী সর্পাঘাতে প্রাণ হারিয়েছে। মাতার ইচ্ছা, পুত্র আবার সংসারী হোক। মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে দ্বিতীয়বার তিনি বিয়ে করলেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে। এঁকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পেয়েও নিমাইয়ের অন্তরের শূন্যতা ঘুচল না—প্রথমা স্ত্রীর অকালমৃত্যু তাঁর চিত্তে সৃষ্টি করেছে সংসারনিস্পৃহতা—যৌবনের দিনেই তিনি বৈরাগীমনোভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন।

অল্পকাল পরে এমন একটি ঘটনা ঘটল যার ফলে নিমাই সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জীবনে পদক্ষেপ করলেন। নিমাই গিয়েছিলেন গয়াধামে, পিতৃকৃত্য সম্পাদন করতে। সেখানে বিষ্ণুপাদপদ্মদর্শনে তাঁর মনে সহসা কী এক অদ্ভুত ভাবোদয় হল, দিব্যভাবের আবেশে বাহ্যজ্ঞান হারালেন তিনি। যখন চেতনা ফিরে পেলেন তখন নিমাই আর পূর্বের সেই মানুষটি নেই। অন্তরাত্মা তাঁর জেগে উঠেছে, কোন্ মধুনিস্যন্দী রহস্যময় জীবন যেন তাঁকে সবলে আকর্ষণ করছে—লৌকিক সংসার তাঁর কাছে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মতো একেবারে মিথ্যা হয়ে গেল। সঙ্গীরা অতিকষ্টে তাঁকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে এল। এখানে উল্লেখ্য, ভক্ত ও সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরী গয়ায় নিমাইকে গোপালমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করলেন এক নতুন নিমাই। এখন তাঁর সেই শিক্ষাভিমান চলে গেছে, মুখে কৌতুকহাসির চিহ্নমাত্র নেই। দিবারাত্র এখন 'কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ' বলে তিনি কাঁদেন আর কেবলই অশ্রুমোচন করেন। প্রলাপে-বিলাপে-মূর্ছায় তাঁর দিনগুলি কাটে, মাটির ধুলায় পড়ে তাঁর সোনার অঙ্গ ক্রমশ মলিন হয়ে আসে।

এ কী হল নিমাইয়ের! ঈশ্বরপ্রেমের আবেশে কোনো মানুষের এরূপ বিকার নবদ্বীপবাসী আর কখনো চাক্ষুষ করেনি। এ এক আশ্চর্য দৃশ্য, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। তারা অবাক মানল, বুঝল, কলিযুগে নবদ্বীপে নররূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভূত হয়েছেন। সেখানকার এবং আশেপাশের অনেক হরিভক্ত, যেমন—অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীবাস, গদাধর—একে একে এসে নিমাইয়ের সঙ্গে মিলিত হলেন। শ্রীবাসের অঙ্গন হরিনামে মুখর হয়ে উঠল, কীর্তনের মধুময় ধ্বনিতে নবদ্বীপের আকাশবাতাস প্রতিধ্বনিত হল। হরিভক্তির বন্যা বয়ে গেল দিকে দিকে।

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ হয়ে উঠেছে যে-মানুষ, পঠনপাঠনে মন দেওয়া তাঁর পক্ষে কী করে সম্ভব হতে পারে। নিমাইয়ের টোল উঠে গেল, পড়ুয়ারা পড়া বন্ধ করে

ভক্তির স্রোতে গা ভাসাল। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সংস্পর্শে যারা আসে তাদের চিত্ত বিকল হল তারা বৈষয়িকতা ভুলে যায়, ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষা লয়। এরা সকলে ভাবে, মহাপ্রভু মানুষ, না, ঈশ্বরের অবতার!

সংসারের বন্ধন নিমাইয়ের কবে শিথিল হয়ে গেছে। তবু তিনি এতদিন সংসার ছেড়ে যাননি। কিন্তু আর নয়, এবার সমস্ত বন্ধন কাটাতে হবে। কৃষ্ণধাম দূরের বৃন্দাবন তাঁকে ডাকছে। চব্বিশ বছর অতিক্রান্ত হলে নিমাই একদিন গৃহত্যাগ করলেন, কাটোয়ায় গিয়ে বিখ্যাত মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য বৈষ্ণবসাধক কেশবভারতীর নিকটে সন্ন্যাসে দীক্ষা নিলেন। এখন নিমাইয়ের নতুন নাম হল—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—সংক্ষেপে, শ্রীচৈতন্য। সন্ন্যাসগ্রহণের পর চৈতন্যদেব নবদ্বীপে আর আসেননি। অবশেষে মায়ের অনুমতি নিয়ে মহাপ্রভু চলে গেলেন পুরীতে। শ্রীক্ষেত্র নীলাচল আর শ্রীচৈতন্য—দুটি নাম অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে গেছে।

পুরীতে আসার পর শ্রীচৈতন্য কিছুকাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। তীর্থস্থান পরিদর্শন আর প্রেমভক্তি-প্রচারই হল তাঁর ভারতপরিক্রমার মুখ্য উদ্দেশ্য। দাক্ষিণাত্য, প্রয়াগ, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, প্রভৃতি অঞ্চল তিনি ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। এর ফলে তাঁর ভক্তিধর্ম নানা দেশের মানুষের মধ্যে বিস্তারলাভ করেছে। প্রখ্যাত রামানন্দ রায়, গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ্‌র দুজন মন্ত্রী দবীর খাস ও সাকর মল্লিক [রূপ ও সনাতন] এই সময়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে রাজকার্য ছেড়ে দিয়ে, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইভাবে ভারতভ্রমণে শ্রীচৈতন্যের ছয় বৎসর লেগেছিল।

চৈতন্যদেবের শেষজীবন নীলাচলেই অতিবাহিত হয়। এ স্থান ছেড়ে আর কোথাও তিনি যাননি। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর মহাপ্রভুর দিন কেটেছে দিব্যোন্মাদ-অবস্থায়। প্রায়শ তিনি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন, নিজেকে কৃষ্ণবিরহিত মনে করে আকুলভাবে কাঁদতেন, কাতর প্রলাপোক্তি করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়তেন, হরিনাম শুনে তাঁর জ্ঞানসঞ্চার হত। শ্রীচৈতন্যের ভাগবত জীবন সুললিত একখানি গীতিকাব্য যেন—দিব্য অনুভবের বিচিত্র প্রকাশে আশ্চর্যরকমে সুন্দর, ঈশ্বরবিরহের কারুণ্যে সিক্ত।

অন্ত্যলীলায় প্রেমভক্তিতে মহাপ্রভুর চিত্তবিগলনের দৃশ্যটি প্রেক্ষণীয়। হরিই তাঁর একমাত্র অভিলষিত, সুধাস্রাবী হরিনামই তাঁর একমাত্র শ্রবণীয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাধক অদ্বৈতবাদীকে তিনি ভক্তিবাদী প্রেমিকে রূপান্তরিত করেছেন, নির্বিচারে সর্বমানবকে বিলিয়েছেন হরিপ্রেমামৃত। তাঁর নীলাচলবাসকালে এই কৃষ্ণপ্রেমসুধা পান করবার জন্যে বঙ্গদেশ হতে প্রতি বৎসর কত ভক্ত নীলাচল এসে সমবেত হতেন। ধর্মতত্ত্বের শুষ্ক উপদেশ কাকেও তিনি শোনান নি, নিজে ধর্ম আচরণ করে জগৎকে রাগময়ী ভক্তির শিক্ষা দিয়েছেন।

মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মর্তলীলাবসান হয় খ্রীস্টীয় ১৫৩৩ সালে। তখন তাঁর বয়স আটচল্লিশ বছর। কীভাবে তিনি অপ্রকট হন তা রহস্যসমাবৃত।

তাঁর তিরোভাব সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত বৈষ্ণবচরিতকারই নীরব থেকে গেছেন। কেউ কেউ বলেন, পুরীর মন্দিরে জগন্নাথদেবের বিগ্রহের মধ্যেই তিনি লীন হন, আবার, কারো মতে, দিব্যোন্মাদ-অবস্থায় নীলাচলের সমুদ্রের নীল জলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন—মরদেহে তাঁকে আর দেখা যায়নি। একমাত্র 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর লেখক জয়ানন্দ বলেছেন, পুরীধামে আষাঢ় মাসে জগন্নাথের রথযাত্রার সময়, রথাগ্রে ভাবাবিষ্ট হয়ে নৃত্য করার কালে, মহাপ্রভুর পায়ে ইষ্টক বিঁধে যায়। ফলে তিনি জরাক্রান্ত হলেন, আর তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। বলা বাহুল্য, বৈষ্ণবভক্তেরা একথা বিশ্বাস করেন না—তাঁদের কাছে কৃষ্ণাবতারের মৃত্যু অভাবনীয়।

বাঙালি সমাজজীবনে ও বাঙলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব বা দান ঃ

শ্রীচৈতন্যের শুভ-আবির্ভাব বাঙালির জীবনের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় একটি ঘটনা। এই মহাপুরুষ যে-প্রেমধর্ম প্রচার করলেন, বাঙালিজাতির প্রাণসত্তার গভীরে নিজ দিব্যজীবনের যে-অমর্ত্যজ্যোতি বিকীর্ণ করলেন তাতে তার সুপ্তপ্রায় আত্মার জাগরণ ঘটল। গোটা একটা জাতির মর্মদেশকে এতখানি আলোড়িত করেছেন আর কে? চৈতন্যপ্রবর্তিত ধর্মকে বাঙালি আপনার যথার্থ ধর্ম বলে জানল, তাঁর ভাবাদর্শের প্রেরণায় আপনার সমাজসংগঠনে সচেষ্ট হল। বাঙালির চিন্তায়-মননে-কল্পনায়, তার বহুবিচিত্র কর্মসাধনার ক্ষেত্রে, শ্রীচৈতন্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এলেন।

জাতির সমাজজীবনে এই মহাপুরুষের প্রভাব সামান্য নয়। বর্ণভেদ, নানা-রকমের অধিকারভেদ আমাদের সমাজকে পঙ্গু করে রেখেছিল, মানুষে মানুষে ছিল দুস্তর ব্যবধান। এরূপ অবস্থায় সমাজবন্ধন শিথিল হতে বাধ্য। প্রেমিকসন্ন্যাসী চৈতন্য কৃষ্ণনামে সকল মানুষকে একত্র মিলিত করলেন, জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেক নারীপুরুষকে নামসংকীর্তনের অধিকার দিয়ে, কৃষ্ণভজনকে সার্বজনীন করে তুলে, একটি মহান ভাবের মধ্যে ব্রাহ্মণ-শূদ্রকে এক করে দিলেন। এই প্রেমধর্মের আদর্শ সমাজে সাম্যবিধায়ক, অনুদার বিভেদের মধ্যে উদার ঐক্যস্থাপক।

শ্রীচৈতন্যদেবের এই সংস্কারকের ভূমিকাটি লক্ষ্য করতেই হয়। প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক হলেও তাঁর উচ্চারিত সাম্যসাম অর্থাৎ একত্বের মন্ত্র অনেকখানি মূল্য বহন করে। বিজয়ী মুসলমানশাসকের সংস্পর্শে এসে হিন্দুসমাজের অভিজাতবর্গ ধীরে ধীরে ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল, মহাপ্রভুর ভক্তিধর্ম এই ম্লেচ্ছাচাররোধের সহায়ক হয়েছিল। হিন্দুর সংস্কৃতিচেতনাকে তিনি প্রবুদ্ধ করলেন, উচ্চনীচকে আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধলেন, ফলে নতুন একটি হিন্দুসমাজ গড়ে উঠতে থাকল। শ্রীচৈতন্য আমাদের সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রধান পুরুষ বলা যেতে পারে। সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা না করলেও তাঁকে আমরা বিদ্রোহী বলতে পারি। অবশ্য ভাববাদী বিদ্রোহী তিনি। মানুষহিসেবে মানুষের যে

একটা মর্যাদা আছে এই মানবিক মূল্যবোধ তিনি আমাদের চিত্তে জাগিয়ে তুলেছেন।

তারপর, বাঙ্‌লাসাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের দান। এককথায় একে বলব অসামান্য; এই অলৌকিক মানুষটিকে মর্মকেন্দ্রে স্থাপন করে গোটা জাতি যেন আত্মার মহোৎসবে মেতে উঠল। দু'শ বছর ধরে বাঙালির অন্তরের সে কী আলোড়ন! প্রেমাবতার মহাপ্রভু তাঁর ঐশী অনুভূতির স্পর্শে বাঙালির আত্ম-প্রকাশের রুদ্ধ দ্বারগুলি একে একে সব খুলে দিলেন। বাঙ্‌লাসাহিত্যের অঙ্গন গানে গানে মুখর হল, কত কত বৈষ্ণবকবি দেখা দিলেন, কত ভক্তিপ্রাণ মনীষী ব্যক্তি অলংকার-দর্শনাদির গ্রন্থরচনে ব্রতী হলেন। বৈষ্ণবকবির অনুরাগময় আকুতি যে-পদাবলীসাহিত্যে নির্মাণ করল তার তুলনা খুঁজে বার করা সত্যিই কঠিন।

ভক্তকবিরা শুধু কৃষ্ণলীলার পদ লিখলেন না, গৌরাঙ্গলীলাকেও বাণীবদ্ধ করলেন। আগে আমাদের কবিরা 'মঙ্গল'-ধারার কাব্য লিখেছেন, লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর মহিমাখ্যাপন করেছেন, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদে হাত দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু দেশে যখন প্রেমভক্তির প্লাবন বইয়ে দিলেন তখন বাঙ্‌লা কাব্যের আকৃতি-প্রকৃতি বদলে গেল, বাঙ্‌লা সাহিত্যের নতুন একটি দিগন্ত উন্মোচিত হল। মহাপ্রভুর জীবনীকাব্য একালের বিশিষ্ট একটি সৃষ্টি। পদাবলীরচনের জন্যে বৈষ্ণবকবিরা একটি নতুন ভাষা নির্মাণ করলেন—'ব্রজবুলি'। এ ছাড়া বৈষ্ণবকবিদল বাঙ্‌লা ভাষাকে কত সূক্ষ্ম অনুভূতি, কত বিচিত্র মনোভাব প্রকাশের উপযোগী করে তুলেছেন তা সাহিত্যবেত্তাদের বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্যের ধর্মভাবনায় প্রাণিত না হলে বিপুল বৈষ্ণবসাহিত্য যে গড়ে উঠত না এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশমাত্র নেই। চৈতন্যপরবর্তী বাঙ্‌লা সাহিত্য আমাদের অক্ষয় গৌরবের বস্তু। নিজে সাহিত্যনির্মাতা না হয়েও শ্রীচৈতন্যদেব বাঙ্‌লা সাহিত্যকে অপরূপ সৃষ্টির প্রাচুর্যে ভরে তুলেছেন এ এক আশ্চর্য ঘটনা।

শ্রীচৈতন্যের জীবনীকাব্য :

ভূমিকাবাক্যস্বরূপ দুয়েকটিকথা বলে মূলপ্রসঙ্গে আসছি। শ্রীচৈতন্যের দিব্যভাবসমৃদ্ধ অলৌকিক জীবন আমাদের নতুন ধরণের সাহিত্যনির্মাণের প্রেরণা জোগায়। রক্তমাংসের মানুষ হয়েও তিনি দেবকল্প ব্যক্তি, তাঁর জীবৎকালেই শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে তিনি বহু ভক্তের পূজা পেয়েছেন। মানবচরিত্রের মধ্যেই আমরা দেবচরিত্রের জ্যোতিষ্মানতা চাক্ষুষ করলাম, মর্তমানব শ্রীচৈতন্যদেবের অমর্তলীলামাধুরী আমাদের অভিভূত করে ফেলল। তখন আমরা কল্পনার দেবতাকে দূরে সরিয়ে রেখে মানুষরূপী দেবতার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতালাম। এখন হতে বৈষ্ণবভাবের ভাবুক ভক্তেরা শ্রীমহাপ্রভুর অলৌকিক অনুভূতি ও তাঁর

প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বিবরণ ভাষায় গ্রথিত করতে শুরু করলেন। এভাবে চৈতন্যজীবনীকাব্য লেখার সূত্রপাত হল।

বাঙলা ভাষায় ইতঃপূর্বে লৌকিক সংসারের মানুষকে নিয়ে কাব্য রচিত হয়নি। তখন আমাদের আখ্যানমূলক কাব্যগুলি ছিল দেবতাকেন্দ্রিক। দেবলীলা ছাড়া কোনো মানবের চরিত্রমহিমা কাব্যে কীর্তিত হতে পারে তা ছিল কল্পনারও অতীত। যা অচিন্তনীয়, শ্রীচৈতন্যের অধ্যাত্মমধুর ভিমাখ্য চরিত্রমাধুর্যের প্রভাবে তাও বাস্তবে সত্য হয়ে উঠল। সেকালে বাঙালির তথা ভারতবর্ষের মন তেমন তথ্যসন্ধী ছিল না, তার মধ্যে ইতিহাসচেতনারও একান্ত অভাব। শ্রীচৈতন্য আমাদের জীবনদৃষ্টিকে বাস্তবমুখী করে তুললেন, আমাদের চিত্তে তথ্যের প্রতি কৌতূহল জাগালেন, কিছুটা উদ্বোধিত করলেন আমাদের ইতিহাসবোধ।

অবশ্য মনে রাখতে হবে, বৈষ্ণবচরিতকাব্য সর্বাংশে আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত জীবনীসাহিত্য নয়। এতে বাস্তব-বর্ণনের ফাঁকে ফাঁকে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে, অলৌকিকতার স্পর্শ রয়েছে, ভক্তির আতিশয্যে মানবজীবনের চিত্র মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ে গেছে। এরূপ হওয়ার কারণ, চরিতকাব্যের লেখকগণ ধর্মের প্রভাব এড়াতে পারেন নি—লোকসাধারণের পাঠ্য সাহিত্য রচনা করছেন এরূপ একটি ধারণা তাঁদের মধ্যে ছিল না। তা ছাড়া, প্রধানত ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই তাঁরা নিজেদের কাব্যগুলি লিখেছেন। আরো একটি কথা। এইসব লেখকদের ভাবদৃষ্টিতে মহাপ্রভু সামান্য মানব নন, পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার তিনি। এ কারণে চৈতন্যদেবের ক্রিয়াকলাপ তাঁদের চোখে দেবলীলা রূপেই প্রতিভাত হয়েছে। ভক্তিমাহাত্ম্যে মানুষ চৈতন্য অমর্তলোকের দেবতায় পরিণত হয়েছেন। তাই, চৈতন্যজীবন স্বরূপত ভক্তিকাব্য। তথাপি বলব, এতে মানবচিত্রই স্থান পেয়েছে। চৈতন্যচরিতকাব্যের লেখকসম্প্রদায় আমাদের সাহিত্যকে আধুনিকতার পথে কিছুটা অগ্রসর করে দিয়েছেন তা অনস্বীকার্য।

● শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালেই তাঁর অন্তরঙ্গ সহচর মুরারি গুপ্ত ও তাঁর পার্ষদ স্বরূপ-দামোদর সংক্ষিপ্ত কড়চা-আকারে চৈতন্যজীবনকথা-বর্ণনে হস্তক্ষেপ করেন। এই মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ-দামোদরের কড়চা কিন্তু সংস্কৃতে লিখিত। চৈতন্যদেবের তিরোধানের অল্পকাল পরে তাঁর অধ্যাত্মজীবনলীলাকে উপজীব্য করে কবি কর্ণপুর [পরমানন্দ সেন] দুয়েকখানি গ্রন্থ লেখেন—তা-ও সংস্কৃতে। এ ছাড়া, বাকি চৈতন্যজীবনীগুলি বাঙলা ভাষায় রচিত—কাব্যাকারে; যেমন, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত. লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত এবং গোবিন্দদাসের কড়চা।

বাঙলায় চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী লেখেন **বৃন্দাবনদাস**। ইনি বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধ নিত্যানন্দ প্রভুর উৎসাহেই বহুখ্যাত চরিতকাব্য **'চৈতন্যভাগবত'**

প্রণয়ন করেন। এ বই যখন রচিত হয় তখন মহাপ্রভুর পারিষদগণের মধ্যে অনেকে বেঁচে ছিলেন। চৈতন্যজীবনের বিস্তর উপাদান বৃন্দাবনদাস এঁদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছেন। 'চৈতন্যভাগবত'-এর রচনাকাল সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলতে না পারা গেলেও এ কথা ঠিক যে, গ্রন্থটি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগেই লেখা হয়েছিল।

'চৈতন্যভাগবত' বৃহদায়তন একটি গ্রন্থ—আদি, মধ্য ও অন্ত—তিনখণ্ডে বিভক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণলীলা যে-ভাবে বর্ণিত হয়েছে, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যলীলা অনেকটা তার অনুরূপ। কবি মহাপ্রভুকে কৃষ্ণের অবতাররূপেই দেখেছেন, তাই, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অভিন্ন হয়ে পড়েছেন। মহাপ্রভুর লীলাপ্রচার উদ্দেশ্যেই বইটি লিখেছিলেন বলে তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত বহু অলৌকিক কাহিনী লেখক এতে বিন্যস্ত করেছেন।

সহজ ভাষায়, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের সঙ্গে, ভক্তিবিগলিত চিত্তে, কবি তাঁর কাব্যটি লিখেছেন। কাব্যখানি সুপাঠ্য, কবিত্বের স্পর্শে মনোজ্ঞ। অলৌকিকতামুক্ত না হলেও এতে প্রচুর মানবীয় আবেদন আছে। (বাস্তববর্ণনে কবির নিপুণতা প্রশংসনীয়। মহাপ্রভুর বাল্যলীলার টুকরো টুকরো চিত্র চমৎকারভাবে কবি আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। বৃন্দাবনদাসের কবিত্বের নিদর্শনরূপে এসব মনোজ্ঞ বর্ণনা-অংশ কিছু কিছু উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

রন্ধন করিয়া শচী বোলে বিশ্বম্ভরে।
তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে॥
মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈতসভায়।
আইলেন অগ্রজেরে নিবার ছলায়॥
আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যোন্যে কহে কৃষ্ণকথন-মঙ্গল॥)

বৈষ্ণবভক্তবৃন্দ এ গ্রন্থকে অশেষ সমাদর জানিয়েছেন। ঐতিহাসিকের কাছেও 'চৈতন্যভাগবত'-এর মূল্য কম নয়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দের বাঙলাদেশের রাজনীতিক ও সামাজিক ইতিহাসের অনেক তথ্য এতে গ্রথিত হয়েছে।

বইখানি ত্রুটিমুক্ত এমন কথা বলা চলে না। চৈতন্যজীবনী হিসেবে এই গ্রন্থ অবশ্যই অসম্পূর্ণ, এখানে-ওখানে কবি বৈষ্ণববিদ্বেষিদের প্রতি অসহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন, মহাপ্রভুকে অতিপ্রাকৃতের আবরণে আচ্ছাদিত করেছেন। তবু বলতে হয়, মানুষের কথা বর্ণিত হয়েছে বলে 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থ মূল্যবান। শ্রীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ জীবনীলেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্তমান গ্রন্থের লেখককে অকুণ্ঠ প্রশংসা জানিয়েছেন। চৈতন্যজীবনীকাব্যের আদিরচয়িতার গৌরব বৃন্দাবনদাসেরই প্রাপ্য।

(বোধ করি, নবদ্বীপে বৃন্দাবনদাসের জন্ম। তাঁর মাতার নাম নারায়ণী। নারায়ণী ছিলেন শ্রীবাসের [এই শ্রীবাসের অঙ্গনে মহাপ্রভু অপরাপর বৈষ্ণবভক্তদের নিয়ে কীর্তনে মেতে উঠতেন] ভ্রাতুষ্পুত্রী।) পরবর্তীকালে বৃন্দাবনদাস বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে বসবাস করেন।

শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে দ্বিতীয় জীবনীগ্রন্থ হল **'চৈতন্যমঙ্গল'**—লিখেছেন **লোচনদাস**। চৈতন্যজীবনী-হিসেবে বইখানির তেমন প্রশংসা করা যায় না। এতে চৈতন্যদেবের বিশ্বস্ত জীবনচিত্র নেই, মানুষ এখানে দেবতায় রূপান্তরিত, একে চরিতকাব্য বলতে মনে দ্বিধা জাগে। তবু যে এ বই বৈষ্ণবসমাজে খুবই সমাদর পেয়েছে তার কারণ এর মনোরম ভাষা, কবিত্বের সুষমা। এ কাব্যে মহাপ্রভুর শেষজীবনের কোনো বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়নি। রাগরাগিণীর উল্লেখ দেখে বোঝা যায়, কাব্যটি গান করার উদ্দেশ্যেই রচিত।

বর্ধমান জেলার কোগ্রামে কবির জন্ম। পিতা—কমলাকর, মাতা—সদানন্দী। ষোড়শ শতকের শেষ পাদে লোচনদাস দেহত্যাগ করেন।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' সুপরিচিত একটি গ্রন্থ। বইখানি কিন্তু বৈষ্ণবসমাজে সমাদৃত হয়নি। এতে কবিত্বগুণের অভাব, লেখক রচনানৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি। জয়ানন্দকৃত এ কাব্যটিও রাগরাগিণীযুক্ত। এ থেকে লেখকের উদ্দেশ্য বোঝা যায়, প্রধানত গানকরার জন্যেই কাব্যটি লেখা। সমালোচ্য 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ শ্রীচৈতন্যের তিরোধানে সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত করা হয়েছে—পুরীতে রথযাত্রার সময় রথের সম্মুখভাগে আনন্দে নৃত্য করার কালে মহাপ্রভু ইষ্টকবিদ্ধ হন। এতে তৃতীয় দিবসে তাঁর জ্বর হয় ষষ্ঠ দিবসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। এ ঘটনাটিকে বৈষ্ণবেরা প্রামাণিক বলে স্বীকার করে নেননি। মহাপ্রভুর তিরোধান সম্পর্কে এই বিবরণ গ্রন্থভুক্ত করার জন্যে জয়ানন্দ গোঁড়া বৈষ্ণবভক্তের বিরাগভাজন হয়েছেন। আর-একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল-কাব্যে কৃত্তিবাসবন্দনা রয়েছে। বৈষ্ণবসাহিত্যে আর কোথাও কৃত্তিবাসের উল্লেখ দেখা যায় না।

* * *

জয়ানন্দের পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র, মাতার নাম রোদনী। জয়ানন্দ বর্ধমান জেলার অধিবাসী ছিলেন।

উনবিংশ শতকের শেষ পাদে **'গোবিন্দদাসের কড়চা'** নামে একখানি বই প্রকাশিত হয়। এতে মহাপ্রভুর জীবনের মাত্র দু-তিন বছরের ঘটনার বিবরণ রয়েছে। বৈষ্ণবমণ্ডলী এ বইয়ের প্রামাণিকতাবিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন, তাঁদের মতে গোবিন্দের কড়চা একটি জাল রচনা। আবার, কোনো কোনো খ্যাতনামা পণ্ডিত দিনলিপির আকারে লেখা বর্তমান গ্রন্থখানিকে চৈতন্যজীবনের ক্ষুদ্রকায় খাঁটি একটি দলিল বলেই গ্রহণ করেছেন।

গোবিন্দদাস কর্মকার চৈতন্যদেবের ভৃত্য ও তাঁর দাক্ষিণাত্যভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন। একান্ত কাছের মানুষ মহাপ্রভুকে তিনি যেভাবে দেখেছেন তা-ই রোজনামাচার মতো করে লিখে রেখে গেছেন। এতে চৈতন্যের জীবন সম্বন্ধে এমন কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে যা অন্যকোনো পুস্তকে পাওয়া যায় না। এসব ঘটনা বৈষ্ণবেরা স্বীকার না করলেও সাধারণ পাঠক এগুলিকে বিশ্বাস্য বলে মনে

করবে। তবে গোবিন্দ কর্মকারের লেখা কড়চার মধ্যে আধুনিকতার ছাপ চোখে পড়ে। বইখানির সম্পাদক মূল রচনার ওপর যে কলম চালিয়েছেন তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। সে যা হোক, মূল রচনা পরিবর্তিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হলেও চৈতন্যদেবের এই সেনকটি যে প্রভুর জীবনের ঘটনার সংক্ষিপ্ত নোট রেখে গেছেন এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। গোবিন্দদাসের কড়চায় প্রচারধর্মিতা নেই, এতে মহাপ্রভু ঈশ্বরের অবতার বলে কল্পিত হননি। এর ভাষা সরল, অবশ্য রূপে আধুনিক।

চৈতন্যজীবনীকাব্যের মধ্যমণি হল 'চৈতন্যচরিতামৃত,' রচয়িতা—'কৃষ্ণদাস কবিরাজ। এতটুকু দ্বিধা না রেখে বলা যায়, এ একখানি মহৎ গ্রন্থ। এর তুলনা হয় না। গ্রন্থখানি কৃষ্ণদাস কবিরাজকে বাঙলা সাহিত্যে অমরতা দিয়েছে। একে শুধু মহাপ্রভুর চরিতকথা মনে করলে ভুল করা হবে—এতে ইতিহাস, দর্শন, ভক্তিতত্ত্ব ও কাব্যের অপূর্ব সমাবেশ হয়েছে। তা ছাড়া, এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা সর্ব সংশয়ের বহু উর্ধ্বে। কী অদ্ভুত নিষ্ঠা, অধ্যবসায় আর পরিশ্রমসহকারে মহাপুরুষ চৈতন্যদেবের লোকোত্তর জীবনের কাহিনী লিখে গেছেন কৃষ্ণদাস! সুদীর্ঘ নয়টি বৎসরের অক্লান্ত সাধনায় 'চৈতন্যচরিতামৃত' নামে বিরাট গ্রন্থরচন তিনি শেষ করেন। গ্রন্থটির রচনাকাল ষোড়শ শতকের শেষপাদ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তখন বার্ধক্যের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বৃন্দাবনদাসের লেখা 'চৈতন্যভাগবত'-এ মহাপ্রভুর শেষজীবন সবিস্তারে বর্ণিত হয়নি। বৃন্দাবনধামের নেতৃস্থানীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী এই অভাব পূরণ করতে অনুরোধ জানালেন মহাপণ্ডিত চৈতন্যপ্রাণ কৃষ্ণদাসকে। প্রখ্যাত গোস্বামীগণের অনুরোধ কৃষ্ণদাস এড়াতে পারেন নি। তিনি গুরুতর একটি কার্যভার গ্রহণ করলেন এবং এই দুরূহ কার্য সমাধা করে দেশজোড়া খ্যাতির অধিকারী হলেন।

শ্রীচৈতন্যের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন লেখক নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তিধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যানে তিনি যে পাণ্ডিত্য ও মনীষার পরিচয় দিয়েছেন, এক কথায় তা বিস্ময়কর। বৈষ্ণবদর্শন যাঁরা জানতে চান, কৃষ্ণদাসের এই আশ্চর্য গ্রন্থের সাহায্য তাঁদের নিতেই হবে। বিষয় কঠিন বটে কিন্তু সুস্পষ্ট ভাষায় তা ব্যাখ্যাত। কৃষ্ণদাস ভক্ত ছিলেন, সুরসিক ব্যক্তি ছিলেন। তা ছাড়া, তাঁর ছিল কবিত্বশক্তি—এ সমস্ত কিছুর নিশ্চিত প্রমাণ পাঠকেরা বর্তমান পুস্তকটির মধ্যেই পাবেন। লেখকের তথ্যনিষ্ঠা, তত্ত্ববিশ্লেষণ, দেবোপম মানব চৈতন্যের চরিতকথারূপ অমৃতের নিপুণ পরিবেশন আমাদের বিস্ময়মিশ্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

কৃষ্ণদাসের প্রকাশরীতি কী সুন্দর, উপমাশ্রিত ভাষার মধ্যে যে কঠিন তত্ত্বও তাঁর হাতে কতখানি সহজবোধ্য হয়ে ওঠে! কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে কৃষ্ণদাস বলছেন:

কৃষ্ণপ্রেম সুখসিন্ধু পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয় তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়॥…
এই প্রেম আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
জিভ জলে না যায় ত্যজন।
সেন প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥

রাধাকৃষ্ণ অবিচ্ছেদ্য, এই যুগলতত্ত্বের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন:

মৃগমদ তার গন্ধে যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ॥

প্রেমধর্ম ও চৈতন্যাবতারের নতুন ব্যাখ্যা তাঁর লেখনীতে অতীব সুন্দর হয়েছে।

আদিলীলা, মধ্যলীলা, অন্ত্যলীলা—এই তিন খণ্ডে 'চৈতন্যচরিতামৃত' বিভক্ত। মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থখানির ভাষা সর্বত্র খাঁটি বাঙলা নয়। কৃষ্ণদাস দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে বাস করেছিলেন, একারণে উক্ত অঞ্চলের কিছু কিছু শব্দ বাঙলার সঙ্গে মিশে গেছে।

ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে বর্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম। কৃষ্ণদাস শৈশবকালে পিতৃমাতৃহীন হন। দুঃখকষ্টের মধ্যে তিনি লালিত। বিবাহিত জীবনে তিনি প্রবেশ করেননি। একদা সংসার ত্যাগ করে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে চলে যান। সেখানে খ্যাতনামা বৈষ্ণবাচার্যগণের কাছে তিনি নানান্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং অল্পসময়ের মধ্যে পাণ্ডিত্যে খুব খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণদাসের বিদ্যাবত্তা ও মনীষা সত্যই বিস্ময়ের বস্তু।

গীতিসাহিত্য

বৈষ্ণবপদাবলী ও শাক্তপদাবলী

ভূমিকাবাক্য:

'গীতিসাহিত্য' বলতে এখানে 'গীতিকবিতা'-ই বুঝতে হবে। এই গীতিকবিতার অন্তঃপ্রকৃতি কী কোন্ জাতের কবিতাকে গীতিকবিতা বলা হয় তা প্রথমে বুঝে নেওয়া দরকার।

আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের যা-কিছু সাহিত্য সমস্তই পদ্যে রচিত, এবং এদের আমরা কাব্য বা কবিতা নামেই চিহ্নিত করেছি। চর্যাপদ কবিতা, মঙ্গল-

সাহিত্য কবিতা, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদ কবিতা, চরিত্রসাহিত্যও কবিতা, অথচ বিষয়বস্তু আর আকারে এদের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য রয়েছে। আরো লক্ষ্য করতে হবে, প্রাচীন বাঙ্‌লা কাব্য-কবিতার অধিকাংশই আসরে সুরসহযোগে গীত হত, কাব্যের পাঠকের চেয়ে শ্রোতার সংখ্যাই তখন ছিল বেশি। কিন্তু গীত হলেও এগুলিকে গীতিসাহিত্য, গীতিকাব্য কিংবা গীতিকবিতা কখনো আমরা বলিনি। অর্থাৎ যে বিশেষ একটি অর্থে বৈষ্ণবপদাবলী ও শাক্তপদাবলী 'গীতি-কবিতা' সেই অর্থে মঙ্গলকাব্য অথবা রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি ছন্দে-লেখা রচনা গীতিকবিতা কেন নয়, বলছি।

কবিতায় সুর যোজনা করে গান করলেই তা সত্যকার 'গীতিকবিতা' হয়ে ওঠে না। গানের আকারে বা গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত না হলেও, একজাতের ছন্দিত রচনা রয়েছে যার নাম দেওয়া হয়েছে গীতিকাব্য বা গীতিকবিতা; ইংরেজিতে এদের জাতপরিচয়—'lyric poetry'। বিশেষ একটি মূলগত ধর্ম বা সাধারণ গুণ বা লক্ষণ এই শ্রেণীর রচনাকে সাহিত্যের অপরবিধ রচনা থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে।

এ ধর্মটি হল রচয়িতার নিজ প্রাণের কোনো এক ভাবানুভূতির উৎসার—গীতিকবিতায় কবির স্বকীয় মর্মের কথাই প্রধান হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে বাস্তব-সংসারের অধিবাসী হলেও, কাব্যরচনাকালে গীতিকার নিজ প্রাণগত উৎকণ্ঠার দিকে দৃষ্টি স্থির রাখেন। ফলে, কোনো বিশেষ বস্তুর আশ্রয়ে কবিতা নির্মিত হয়ে থাকলেও তাতে কবির প্রাণের রঙ্‌ লাগে, তা কাব্যনির্মাতার ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দবেদনা, ভালোলাগা-মন্দলাগার বাণীরূপ হয়ে ওঠে। এ কারণে গীতিকবিতামাত্রেই আত্মভাবমূলক, গান বা গীতের মতোই তা ভাবময়। এর মধ্যে যে তীব্র ভাবাবেগ থাকে তা প্রকাশ লাভ করে ধ্বনিঝংকৃত ছন্দের দোলার মধ্য দিয়ে। কবির অনুভূতির গভীরতা ও আন্তরিকতা গীতময় ভাষার মাধ্যমে সহজে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। খাঁটি 'লিরিক' গানের মতোই কবির নিজ ভাবকল্পনার সৃষ্টি বলে আমরা তার নাম রেখেছি 'গীতিকবিতা'। অনুভূতির প্রকাশেই গীতিকবিতা আত্যন্ত বিশিষ্ট। বিশুদ্ধ গানের সঙ্গে এজাতীয় রচনার পার্থক্য হল, গানে অভিব্যক্ত ভাবে কথার চেয়ে সুরেরই প্রাধান্য; আর, গীতিকবিতার কথা উপেক্ষণীয় মোটেই নয়, তার নিজস্ব একটি মূল্য আছে।

বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রথম যথার্থ গীতিকাব্য হল বৈষ্ণবপদাবলী, এর পর নাম করতে হয় শাক্তপদাবলীর। এই দু-রকমের পদাবলীতে কবির নিভৃত অন্তরের কত বিচিত্র সূক্ষ্ম ভাবের লীলা চিত্তচমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করেছে। বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলীর মধ্য দিয়ে বাঙালি তার হৃদয়ের গোপন কক্ষগুলি একে একে খুলে ধরেছে। বৈষ্ণবকবিতা ও শাক্তসাধকের গানগুলি বাঙলা সাহিত্যের মস্তবড়ো সম্পদ।

বৈষ্ণবকবিতা :

রাধাকৃষ্ণলীলাকে উপজীব্য করেই বৈষ্ণবের গান। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেও রাধাকৃষ্ণলীলাকথা-আশ্রয়ে কবিতা রচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের নাম সকলেরই পরিচিত। জয়দেব তাঁর 'কোমলকান্ত পদাবলী' লিখেছেন সংস্কৃতে। তথাপি তিনিই বাঙলার প্রথম গীতিকবি। বিদ্যাপতির পদাবলী মৈথিল ভাষায় রচিত। কিন্তু মিথিলার কবি হলেও পরবর্তী বৈষ্ণবকবিরা তাঁকে বাঙালি করে নিয়েছেন, এবং একালে আমরাও তাঁকে বাঙলার বৈষ্ণবকবিদের অন্তর্ভুক্ত বলেই জানি। বড়ু চণ্ডীদাস ঠিক বৈষ্ণবগান রচনা করেননি, ধারাবাহিক একটি আখ্যান অবলম্বনে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে বাণীরূপ দিয়েছেন। তাহলেও তাঁর "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ গীতিভাবুকতার নির্বাধ উৎসার সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন। এদিক হতে দেখলে বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রন্থখানি গীতিকাব্যের এলাকায় পড়ে, এবং নিঃসংশয়িতভাবে বলতে পারা যায়, বাঙলা ভাষার প্রথম খাঁটি গীতিকাব্যকার তিনি।

দেখা যাচ্ছে, রাধাকৃষ্ণলীলাকথন শুরু হয়েছে প্রাক্‌চৈতন্য পর্বে। কিন্তু বৈষ্ণবের গানে গানে বাঙলার অঙ্গন মুখর হয়ে উঠল চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর। তিনি প্রেমধর্ম প্রচার করলেন, অনুরাগময় ভক্তির দীপশিখা জেলে দিলেন অগণন ভক্তের অন্তঃদেশে। এই মহাপ্রেমিকের আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণায় প্রাণিত হয়ে অসংখ্য বৈষ্ণবসাধককবি শ্রীরাধামাধবের লীলাসংগীত আমাদের শোনালেন—দেশময় কীর্তনগানের প্লাবন বয়ে গেল।

বৈষ্ণবকবিতা সম্পর্কে দুয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। বৈষ্ণবেরা পদাবলীকে সাধারণ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করতে অস্বীকৃত। এগুলিকে তাঁরা পৃথক একটি মর্যাদা দিয়েছেন। লৌকিক কাব্যরসসৃষ্টির উদ্দেশ্যে এসব পদ রচিত নয়, এদের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। এগুলি আসলে বৈষ্ণবের সাধন-সংগীত। পদাবলী সুরসংযোগে গীত হয়ে ঈশ্বর-অনুরক্ত মানবমানবীর ভক্তিপিপাসা উদ্রিক্ত করে। বৈষ্ণবসাধনতত্ত্বের মর্ম যারা বোঝে না, বৈষ্ণবকবিতার রস সম্পূর্ণ তারা আস্বাদন করতে পারবে না। বৈষ্ণবকবিরা ভক্তিধর্মের সাধক, তাঁদের সংগীত অধ্যাত্ম-উৎস থেকে প্রবাহিত। বৈষ্ণবকবিসম্প্রদায় 'মহাজন' নামে অভিহিত, আর, যে পদ তাঁরা লিখেছেন তার নাম 'মহাজনপদাবলী'।

বৈষ্ণবসাধককবিরা মানুষের প্রাণকে যে দিব্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন একটি কথা আমরা মেনে নিতে পারি না যে, বৈষ্ণবের সাধনতত্ত্বের সঙ্গে প্রাণগত পরিচয় না থাকলে মহাজনপদাবলীর রসোপভোগ অসম্ভব। রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রণয়লীলা মানবীয় প্রণয়রীতির মাধ্যমে বর্ণিত হওয়ায়, বৈষ্ণবতন্ত্রে দীক্ষিত না হয়েও, পদাবলীর সাধারণ পাঠক নায়কনায়িকার বিরহমিলনের আর্তি ও আনন্দ সহজে উপলব্ধি করতে পারে। কৃষ্ণের জন্যে রাধার যে ব্যাকুলতা, শিশুগোপালের প্রতি জননী যশোদার যে বাৎসল্য,

আমাদের সংসার-অঙ্গনেও কি তার নিত্য-অভিনয় চলেছে না? বৈষ্ণবের গান ভক্তের ভক্তিপিপাসিত অন্তরকে পরিতৃপ্ত করে, আর, সাধারণ নরনারীর প্রেম-পিপাসিত হৃদয়কে আনন্দসুধা পান করায়। আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা থাকলেও বৈষ্ণব কবির গান রোমান্টিক কাব্যের পর্যায়ভুক্ত।

পদাবলীসাহিত্যের পূর্ণবিকাশ হয়েছিল চৈতন্যোত্তর কালে। এই কালের পদাবলীকে মোটামুটি দুই ভাগে বিন্যস্ত করা যায়—রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক এবং গৌরাঙ্গবিষয়ক। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বৈষ্ণবকাব্যের মূল বিষয়বস্তু। এখানে কিশোর কৃষ্ণ নায়ক, কিশোরী শ্রীরাধা নায়িকা। লীলাস্থান দ্বাপরের বৃন্দাবন। পূর্বরাগে এ প্রণয়লীলার শুরু, তারপর অভিসার, মিলন, মান, আক্ষেপানুরাগ, বিরহ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভাবসম্মিলনে এর সমাপ্তি। গৌরাঙ্গের রহস্যময় মর্তলীলা নিয়ে বহু কবি পদরচনা করেছেন। এর কারণ হল শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবের জীবন্ত মূর্তি। রাধিকার মতোই তিনিও কৃষ্ণের জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন। রাধা-প্রেম কী বস্তু তিনিই আমাদের বোঝালেন, তবে সকলে রাধাকৃষ্ণলীলার নিগূঢ় তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করল। কৃষ্ণসমর্পিতপ্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবজীবনকে উপজীব্য করে যে পদ রচিত হয়েছে তার নাম 'গৌরচন্দ্রিকা'। পালাকীর্তনের পূর্বে এই গৌর-চন্দ্রিকার পদ গীত হয়ে থাকে।

পদাবলী গীতিকবিতার সমষ্টি। এর ভাষাটি লক্ষ্য করবার মতো। কত সূক্ষ্ম ও গূঢ় ভাবের বাহন হয়েছে এই ভাষা। বহুসংখ্যক প্রথমশ্রেণীর পদ 'ব্রজবুলি'তে রচিত। [যে বিশিষ্ট একটি ভাষায় রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা বা বৃন্দাবনলীলা বর্ণিত হয়েছে তা-ই 'ব্রজবুলি'। এ কৃত্রিম একটি ভাষা—মৈথিলী এবং বাঙ্‌লা আর কিছু কিছু হিন্দীর সংমিশ্রণে গঠিত। এই ভাষাটির নির্মাণে প্রেরণা জুগিয়েছেন প্রসিদ্ধ মৈথিল-কবি বিদ্যাপতি।] ব্রজবুলি গীতিকাব্যের উপযুক্ত ভাষাই বটে। অত্যন্ত শ্রুতিসুখকর এর ঝংকার, সৌন্দর্যসুরভিত প্রাণময়তাময়। বৈষ্ণবপদকর্তাদের মধ্যে কেউ কেউ খাঁটি বাঙ্‌লায় কেউ কেউ শুধু ব্রজবুলিতে, আবার কেউ কেউ উভয় রীতিতে কাব্য লিখে গেছেন। পদকর্তাগণ সংখ্যায় বহু। আমরা এখানে মাত্র পাঁচজন বিখ্যাত পদরচয়িতার কথা বলব। এঁরা হলেন—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস এবং বলরামদাস।

কয়েকজন বৈষ্ণবকবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

॥**বিদ্যাপতি**॥ পূর্বভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি—'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থের রচয়িতা—বাঙালী জয়দেব আবির্ভূত হন দ্বাদশ শতকে। জয়দেবের দু'শ বছর পরে এই পূর্বভারতে আর-একজন খুব বড়ো কবি জন্মান, নাম—বিদ্যাপতি ঠাকুর। পিতা—গণপতি ঠাকুর। বিদ্যাপতি মিথিলা অঞ্চলের লোক। পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর শিব সিং তাঁকে নিজ সভাসদ্ কবিরূপে বরণ করেন। বিদ্যাপতির সময়ে শ্রীচৈতন্যের

জন্ম হয়নি। মিথিলা নগরের রাজসভার এই কবি সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদগুলি মৈথিল ভাষায় লেখা।

বিদ্যাপতি বাঙ্‌লাদেশের মানুষ নন, বাঙলায় কবিতা লেখেননি তিনি। কিন্তু একটি আশ্চর্য ঘটনা এই যে, মিথিলার কবি হয়েও বাঙ্‌লা কাব্যসাহিত্যকে তিনি নানাভাবে প্রভাবিত করেছেন। একারণে বাঙ্‌লা সাহিত্যের আলোচনা থেকে তাঁকে আমরা কিছুতেই বাদ দিতে পারি না। দেখা যায়, চৈতন্যদেবের সময়ে বৈষ্ণবকাব্যকারহিসেবে তাঁর খ্যাতি বাঙ্‌লাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য তাঁর লেখা পদগুলি পড়ে এবং শুনে আনন্দধারায় স্নাত হচ্ছেন—এই কারণেই লোকে তাঁকে একজন বাঙালী কবি বলে জেনেছে। তা ছাড়া চৈতন্যদেবের কয়েকজন অতিশয় বিশিষ্ট বাঙালি-বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতির রচনামাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর ভাষার অনুকরণে অভিনব একটি কাব্যভাষা নির্মাণ করলেন। এই অনুকৃত ভাষাটির নাম 'ব্রজবুলি'।

রাধাকৃষ্ণলীলার বহুশ্রুত একজন কবি বিদ্যাপতি। ভাষার চাতুর্য, ছন্দোবিন্যাস ও অলংকারপ্রয়োগের দক্ষতা, শব্দচিত্রময় আলেখ্য-নির্মাণের কুশলতা ইত্যাদি গুণে বিদ্যাপতি প্রথমশ্রেণীভুক্ত কবিশিল্পীর দুর্লভ মর্যাদা পেয়েছেন। কাব্যের সপ্তস্বরা বীণা বাজিয়েছেন তিনি, তার বহুবিচিত্র সুরতরঙ্গের ঝংকার আমাদের মুগ্ধ করে। এ কবির কাব্য উপমাসমৃদ্ধ বাক্যের তাজমহল যেন :

নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দুরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজপাতা॥…
লোচন জনু থির ভৃঙ্গ-আকার।
মধু মাতাল কিয়ে উড়ই না পার॥

তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ বৈষ্ণব পদকর্তা যতখানি ভক্ত ও সাধক, বিদ্যাপতি ততখানি নন। তাঁর লেখা পদগুলিতে ভাবের গভীরতা সর্বত্র চোখে পড়ে না, ভক্তিবিহ্বল তন্ময়তাও এখানে কদাচিৎ লক্ষিত হয়। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণলীলাসংগীত অধিকাংশ ক্ষেত্রে লৌকিক সংস্কারের প্রণয়াসক্ত নরনারীর মিলনবিরহের গান ছাড়া অন্য কিছু নয়। বিদ্যাপতি প্রেমের দেহ-সম্পর্ক, প্রেমের বিলাসের দিকেই ঝুঁকেছেন সমধিক। তাঁর রাধাকে বৃন্দাবনের রাধা বলে মনে হয় না; মনে হয়, এ যেন আমাদের এই ধূলির পৃথিবীরই ছলাকলাপূর্ণ একটি নায়িকা নারী। দেহাতীত ভগবৎপ্রেমের গান বেশি লেখেননি বিদ্যাপতি, তাই, আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা এতে খুব কম। তবে বিরহ ও ভাবসম্মিলন-পর্যায়ের পদগুলিতে বিদ্যাপতি রাধাপ্রেমের গভীরতা ও ব্যাকুলতার হৃদয়গ্রাহী চিত্র অঙ্কন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মাথুরায় চলে গেলে বিরহাতুরা শ্রীরাধার :

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী॥

প্রিয়তমকে হারিয়ে এই প্রেমসাধিকার :

নয়ানক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ মঝু পাশ॥

অহর্নিশ প্রিয়তমের ধ্যানে তন্ময় থেকে রাধিকা নিজে কৃষ্ণময়ী হয়ে উঠেছেন : 'অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই'। বিদ্যাপতির ভাবসম্মিলন-এর পদগুলি প্রেমানুভবের নিবিড়তায় সত্যিই চিত্তচমৎকার। প্রার্থনা-র পদেও বিদ্যাপতির স্বকীয় কাব্যরীতির বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে :

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণ লেশ না পায়বি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ-বাহির নহ মুঞি ছাড়॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

পদাবলীর কাব্যলোকে ছন্দ-সংগীতে তাঁর সমকক্ষ কবি খুব কমই আছেন। চণ্ডীদাসের নামের সঙ্গে বিদ্যাপতির নাম চিরকালের জন্যে যুক্ত হয়ে গেছে।

॥ চণ্ডীদাস ॥ চৈতন্যোত্তর কালের পদাবলীরচয়িতা চণ্ডীদাসের নাম বহুখ্যাত। বৈষ্ণবকাব্যসাহিত্যে চণ্ডীদাসের স্থান অতি উচ্চে। তাঁর গানের মর্মস্পর্শী সুর আমাদের হৃদয়কে উদাস করে তোলে। অল্পকথায়, সহজ ভাষায়, বৈষ্ণবীয় প্রেমের নিগূঢ় ভাবকে সংগীতে ফুটিয়েছেন তিনি। প্রাণের গভীর কথাকে কী সুন্দর বাণীরূপ দিয়েছেন চণ্ডীদাস। এ জন্যে তাঁর বাক্‌চাতুর্যের প্রয়োজন হয়নি, ভাষার অলংকরণসজ্জাকে তিনি দূরে সরিয়ে রেখেছেন, শব্দালংকার ও অর্থালংকারের কোনো আবশ্যকতাই তাঁর নেই। তাই, বলতে পারি, চণ্ডীদাস সহজ ভাবের সহজ সুরের সহজ কবি। বিদ্যাপতির তুলনায় তাঁর কাব্যরচনরীতি বিলক্ষণ স্বতন্ত্র। গান লিখতে বসে বিদ্যাপতি মিথিলার রাজসভার নাগরিক প্রভাব অতিক্রম করতে পারেননি, তাঁর হাতে রয়েছে সপ্ততন্ত্রী বীণা; পল্লীবাঙলার নিভৃত নিরালায় বসে কাব্যের একতারা বাজিয়েছেন চণ্ডীদাস। তাঁর চিত্রিত রাধা একটি সূক্ষ্ম ভাবের জ্যোতির্ময়ী বিগ্রহ বলেই মনে হয়। আজন্ম তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী-প্রায়।

প্রিয়তম কৃষ্ণের চিত্র দেখলে তিনি ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানরহিতা হন, কৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শুনে তিনি বলেন :

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥

রাধাচিত্তের এই আর্তি পাঠকের মর্মলোকে প্রবেশ করে তাকে ব্যাকুল করে তোলে।

কৃষ্ণসমর্পিতপ্রাণা রাধিকার অন্তরবেদনার মুখে চণ্ডীদাস এইভাবে ভাষা দিয়েছেন :

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমন যোগিনী-পারা ॥

যে-রাধিকার আলেখ্য প্রেমসাধক চণ্ডীদাসের কবিকল্পনাকে আচ্ছন্ন করেছিল তার রূপচ্ছবি আত্মবিস্মৃতা ধ্যানতন্ময়া যোগিনীর, প্রেমসাধনার নামে শ্রীরাধিকা দুঃখের তপস্যাই করেছেন। চণ্ডীদাসের লেখা আত্মনিবেদন-পর্যায়ের পদগুলি পড়তে পড়তে পাঠকের মন সংসারসীমা ছাড়িয়ে স্থূল কামনাবাসনাবিরহিত অধ্যাত্মভাবের ঊর্ধ্বলোকে সঞ্চরণ করতে থাকে। যে-চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলে জেনেছেন তাঁর কল্পিতা কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী রাধারাণীর বহু উক্তি নিখিল প্রেমিকপ্রেমিকার নিভৃত প্রণয়লীলার সংগীতে পরিণত হয়েছে। যেমন :

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হৈলাম দাসী ॥

প্রেম সম্পর্কে চণ্ডীদাস আমাদের এইভাবে শেষ কথা শুনিয়েছেন :

চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনী,
পীরিতি না কহে কথা।
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পীরিতি মিলয়ে তথা ॥

সরলতা, আন্তরিকতা ও ভাবগভীরতায় চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ এবং ভাবসম্মিলনের পদগুলির তুলনা হয় না। বৈষ্ণবকবিকুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তিনি।১

॥ জ্ঞানদাস ॥ বৈষ্ণবপদসাহিত্যে খুব বড়ো একজন কবি জ্ঞানদাস। চণ্ডীদাসের প্রবর্তিত কাব্যরীতির পথে অগ্রসর হয়ে উঁচু সুরে তিনি বৈষ্ণবগান বেঁধেছেন। জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের মতোই গভীরতম অনুভূতি বা মর্মকথাকে অত্যন্ত সহজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। পদরচনায় জ্ঞানদাসকে প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা যেতে পারে। বৈষ্ণবের ভাবসাধনার ঊর্ধ্বতম স্তরে তাঁর সতত বিহরণ : প্রেমের দুরবগাহ রহস্য, প্রণয়ের চিরন্তন অতৃপ্তি, মিলন-আকাঙ্ক্ষার আর্তি, বিরহের মর্মান্তিক দাহ, পুনর্মিলনের আনন্দনিবিড় প্রশান্তি, ইত্যাদি কত বিচিত্র ভাব জ্ঞানদাসের পদগুলিতে আবেগস্পন্দিত বাণীরূপ পরিগ্রহ করেছে। জ্ঞানদাস স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ, মান, নিবেদন ও মুরালী-শিক্ষা-বিষয়ক প্রভৃতি পদ-রচনায়। রাধাচিত্তের ব্যাকুলতাকে কী সুন্দর ফুটিয়েছেন জ্ঞানদাস। রূপানুরাগে বিদ্ধ হয়ে শ্রীমতী রাধা বলছেন :

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

অথবা :

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া ফুকরে পরাণ॥

প্রেমবেদনার মধুময় ও সরল প্রকাশে এসমস্ত পদের তুলনা কোথায়? প্রাণোচ্ছলতার লিরিকমূর্ছনা এদের চিরযুগজীবী কবিতার পর্যায়ে উন্নীত করেছে। নিম্নোদ্ধৃত আক্ষেপানুরাগের পদটি জ্ঞানদাসের বহুশ্রুত একটি রচনা :

সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥......ইত্যাদি

জ্ঞানদাস সহজ কথায় সর্বত্যাগী প্রেমের বাণী উচ্চারণ করেছেন :

বঁধু হে, আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ সেখানে রাখিয়া দিব॥

জ্ঞানদাসের পদ রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। নীচের বর্ষাবর্ণনার পদটি রবীন্দ্রনাথ ভুলতে পারেননি :

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমঝিম শবদে বরিষে :
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড-রোল মত্ত দাদুরী-বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেনকালে॥

জ্ঞানদাসের বহু পদে ঐশী-ব্যঞ্জনা-সুরভিত কাব্যগুণের চমৎকারিত্ব চোখে পড়ে। জ্ঞানদাস নিঃসন্দেহে অতিশয় শক্তিমান একজন পদকর্তা।

॥ **গোবিন্দদাস** ॥ পদাবলীসাহিত্যের আর একজন উত্তম কবি গোবিন্দ-দাস। পদরচনার রীতিতে বিদ্যাপতির অনুগামী তিনি। একারণে গোবিন্দদাসকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' বলা হয়েছে। তাঁর কবিতা সালংকারা, তাঁর ভাষাভঙ্গির রমণীয়তা মনোমদ, ছন্দ-সংগীতে তিনি সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন, আর, ভাবের গাঢ়তার জন্যে তাঁর কাব্য রসিক জনের আদরের সামগ্রী। গোবিন্দদাস সত্যই উঁচুদরের কাবশিল্পী। তিনি পদ লিখেছেন ব্রজবুলিতে, বাঙ্‌লা ভাষায় নয়। তাঁকে ব্রজবুলির সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকার বলতে কোনো বাধা নেই। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, বৈষ্ণবরসশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল। নিজ কাব্যনির্মাণকালে এই উভয় ক্ষেত্র থেকে তিনি বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। স্বাভাবিক কবিশক্তির সঙ্গে পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার সমাবেশ হওয়ায় গোবিন্দদাসের কাব্য চমৎকার শিল্পকৃতির নিদর্শন হয়ে রয়েছে। প্রথমে কবির শ্রুতিসুখকর বাঙ্‌নির্মিতি ও ছন্দকুশলতার একটি নমুনা উদ্ধার করি :

শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ
ফুল্ল মল্লী মালতী যূথী
মত্ত মধুপ ভোরণি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলি-গান পঞ্চম তান
কুলবতী-চিত-চোরণি ॥...ইত্যাদি

গীতঝংকৃত ছন্দের এই চারুত্ব কার না মনোহরণ করে?

গোবিন্দদাস বহুবিচিত্র ভাবের পদ লিখেছেন। কিন্তু তিনি সমধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন গৌরচন্দ্রিকা, রূপানুরাগ আর অভিসারের পদে। নিম্নলিখিত

পদটিতে কবি ভাবাবেশে-বিহ্বল শ্রীগৌরাঙ্গের অতিশয় মনোজ্ঞ একটি চিত্র এঁকেছেন :

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাবকদম্ব
কি পেখলু নটবর গৌর-কিশোর।
অভিনব হেম- কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর॥...ইত্যাদি

এতটুকু দ্বিধা না রেখে বলা যায়, অভিসারের পদ-রচনায় গোবিন্দদাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর লেখা এই পর্যায়ের পদগুলির বৈচিত্র্য কারো দৃষ্টি এড়াবার নয়। দিবাভিসার, তিমিরাভিসার, বর্ষাভিসার—বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে অভিসারিকা নায়িকা শ্রীরাধার কত বিচিত্র ছবি এঁকেছেন তিনি। কৃষ্ণপ্রেম রাধার হৃদয়টিকে পর্যাকুল করে তুলেছে, প্রিয়তমের সঙ্গে তাঁকে মিলিত হতেই হবে। বর্ষার আঁধার রাতে পিছল পথে রাধা অভিসারে যাত্রা করেছেন। আকাশ কালো মেঘে সমাচ্ছন্ন, বিদ্যুৎ-ঝলসন মুহুর্মুহু আকাশকে বিদীর্ণ করছে, ঘন ঘন বজ্রপাত হচ্ছে, বারিবর্ষণে বিরাম নেই, এই দুর্যোগের রাত্রিতে বিশ্বচরাচর শঙ্কিত—কোনো কিছুই ভ্রূক্ষেপ না করে প্রেমসাধিকা রাধা পথে পা বাড়িয়েছেন :

মন্দির-বাহিরে কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি দূরতর বাদর-দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥

প্রেমের জন্যে এই দুঃশ্চর্যা গোবিন্দদাসের অঙ্কিত রাধার আলেখ্যটিকে অতিশয় মনোজ্ঞ ও মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। অলংকারসজ্জায়, শব্দচিত্রে, ধ্বনিগুণে ও অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় এইসব পদ উচ্চশ্রেণীর গীতিকবিতার উৎকর্ষ পেয়েছে। স্বরচিত পদ সম্পর্কে গোবিন্দদাস নিজে বলেছেন :

রসনারোচন শ্রবণবিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥

গোবিন্দদাস ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের পদকর্তাদের অন্যতম। তার পিতা চিরঞ্জীব সেন চৈতন্যদেবের সহচর ছিলেন। কবির পৈতৃক বাসস্থান কুমারনগর। বৈষ্ণববিদ্বেষী রক্ষণশীল সমাজের পীড়াদায়ক সংস্পর্শ এড়াবার জন্যে শেষজীবনে তিনি খেতুরীর নিকটবর্তী তেলিয়াবুধরি গ্রামে এসে বসবাস করেন। বৃন্দাবনের বিখ্যাত বৈষ্ণবগোস্বামী শ্রীজীব গোবিন্দদাসের পদাবলী পড়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ‘কবিরাজ’ উপাধি দিয়েছিলেন।

॥ বলরামদাস ॥ বলরামদাস নামে একাধিক পদকর্তাদের মধ্যে নিত্যানন্দ-শিষ্য বলরামদাসই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের সমকালে ইনি আবির্ভূত হন। জ্ঞানদাসের মতোই বলরামদাস সরল রীতির কবি। কত গভীর ভাবকে সহজ ভাষায় ইনি রূপায়িত করেছেন। বাৎসল্যরসের পদরচনায় এঁর অদ্ভুত দক্ষতা ছিল। নীচে বলরামদাসের লিখিত একটি পদ উদ্ধৃত হল, এতে কৃষ্ণজননী যশোদার স্নেহব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে। বালক-কৃষ্ণ গোষ্ঠে যাবেন, যশোদা পুত্রের জন্যে ভেবে ব্যাকুল, কৃষ্ণসখাদের তিনি অনুরোধ জানান :

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে সভারে।
বন কত অতিদূরে নবতৃণ-কুশাঙ্কুর
গোপাল লইয়া না যাইহ দূরে ॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায়ে জনি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন ॥
বলরামদাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লইয়া দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয় ॥

রবীন্দ্রনাথ বলরামদাসের পদাবলীর অনুরাগী পাঠক ছিলেন। রবীন্দ্রের কয়েকটি প্রবন্ধে এই পদকর্তার লেখা পদের বহু পঙক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, দেখা যায়, যেমন—'আমার হিয়ার ভিতর হইতে তোমা কে কৈল বাহির', 'দেখিবারে আঁখি-পাখি ধায়' ইত্যাদি।

বলরামদাস বর্ধমান জেলার লোক ছিলেন। ইনি জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের সমকালীন কবি।

বৈষ্ণবকবিতার লক্ষ্যণীয় বিশিষ্টতা :

আলোচ্যমান 'গীতিসাহিত্য'-অধ্যায়ের ভূমিকা-অংশে বৈষ্ণব কবিতার মোটামুটি একটি পরিচয় আমরা গ্রথিত করেছি। সেখানে পদাবলীসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে সেই কথাগুলিই সংক্ষেপে গুছিয়ে বলছি।

বৈষ্ণবকবিতার মূলবিষয়বস্তু হল বৃন্দাবনের কিশোরকিশোরী রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা। ব্রজধামের গোপবালক ও গোপবালিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী আমাদের পুরাণে বর্ণিত আছে। ওই কাহিনী-আশ্রয়ে লোকে বহুদিন ধরে

গান বেঁধে আসছে। এই কৃষ্ণলীলাই বাঙালি বৈষ্ণবকবিদের হাতে বিশিষ্ট একটি কাব্যরূপ লাভ করেছে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে রাধামাধবের প্রণয়মূলক যে-সব কাব্যকবিতা রচিত হয়েছে তাতে প্রেমের যে-আদর্শটি ফুটেছে তা প্রাকৃত অর্থাৎ লৌকিক; কবিরা সেখানে কৃষ্ণরাধার জবানীতে আমাদের পরিচিত সংসারের রক্তমাংসে-গড়া মানবমানবীর বাস্তব প্রেমপিপাসার কথাই বাণীবদ্ধ করেছেন—তার মধ্যে তেমন কোনো আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা ছিল না। কিন্তু মহাপ্রভুর ভক্তিধর্ম প্রচারিত হওয়ার পর ওই আদিরসাত্মক কাহিনী অধ্যাত্মরাগরঞ্জিত হয়ে প্রেমভক্তিরসের আধার হয়ে উঠল। ফলে, শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীরাধিকা সাধারণ প্রণয়ীপ্রণয়িনী রইলেন না, পরমাত্মা ও জীবাত্মা বা ভগবান ও ভক্তের প্রতীকে পরিণত হলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের চোখে শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ ভগবান এবং শ্রীরাধা সেই ভগবানেরই আনন্দময় শক্তির প্রকাশ বা পরমাপ্রকৃতি—জীবাত্মার প্রতীক তিনি। শ্রীকৃষ্ণের জন্যে শ্রীরাধার অভিসার পরমাত্মার উদ্দেশ্যে জীবাত্মার অভিসারের রূপক মাত্র। রাধাকৃষ্ণলীলা অধ্যাত্মসাধনার ভাবময় রূপক হয়ে ওঠার জন্যে বৈষ্ণবপদাবলী সাধারণ প্রেমকাব্য থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে—একে ভক্তিকাব্য বলাই সমীচীন।

কবিখ্যাতি অর্জনের অভিলাষে বৈষ্ণব পদকর্তারা তাঁদের পদ রচনা করেননি। বৈষ্ণবগান আরাধ্য দেবতার [রাধামাধবের] শ্রীচরণে ভক্তিব্যাকুল সাধকের গীতেরই অঞ্জলি। মনে রাখতে হবে, পদাবলীগান ভক্তবৈষ্ণবের কাছে নিজের ধর্মসাধনের অঙ্গ। বৈষ্ণবপদকার সামান্য 'কবি' বলে বিবেচিত হন না, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রণয়লীলার দ্রষ্টা তাঁরা। এই অধ্যাত্মদৃষ্টির অধিকারী বলে তাঁরা 'মহাজন'-রূপেই গণ্য, আর, তাঁদের লেখা গানগুলি 'মহাজনপদাবলী'-নামেই চিহ্নিত।

ভক্তিরস সাধক ও ভক্তের চিত্তকে পরমাশান্তির রাজ্যে উত্তীর্ণ করে দেয়, অন্তরকে বৈরাগ্যমুখী করে তোলে। বৈষ্ণবকবিতার আদ্যন্ত প্রাণের একটা আকুলতার সুর বেজেছে—প্রেমোন্মাদিনী রাধিকার তীব্র আর্তির সুর। এই আর্তির গীতময় প্রকাশ হল বৈষ্ণবকবিতা। একারণে পদাবলী স্বরূপত কবিতা নয়, গীতিকবিতাও নয়—সংগীত—এতে সুরেরই প্রাধান্য। কীর্তনের সুরে বৈষ্ণবপদগুলি গেয়। শুধু কবিতাহিসেবে পাঠ করলে বৈষ্ণবকাব্যের রস সম্পূর্ণ উপভোগ করা যায় না, সুর-সহযোগে গীত হলেই এর যথার্থ রসটি ধরা পড়ে।

বৈষ্ণবধর্ম প্রেমের ধর্ম। বৈষ্ণবের এই প্রেমসাধনা দূরের দেবতাকে একান্ত কাছে টেনে এনেছে, রসস্বরূপ ঈশ্বরকে আত্মার আত্মীয় করে তুলেছে। বৈষ্ণবেরা শ্রীমাধবকে স্বয়ং ভগবান বলেই জানেন। কৃষ্ণরূপী-পূর্ণ-ভগবান বৃন্দাবনে মানুষী লীলায় মেতেছেন। তিনি যশোদার আদরের দুলাল, শ্রীদাম-সুদাম-বলরামের প্রাণপ্রিয় সখা, গোপনারী রাধিকার প্রণয়াস্পদ। ভগবান মানুষের কাছে ধরা দিয়েছেন পুত্ররূপে, সখারূপে, প্রণয়ীরূপে।

পদাবলী বৈষ্ণবের সাধনসংগীত হলেও আমাদের কাছে এর যতকিছু আদর গীতিকাব্য বলেই। পদকর্তারা মানুষী প্রেমের জবানীতে ভগবৎপ্রেমের কবিতা লিখেছেন বলে বৈষ্ণবের গান সকল মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে, সাধারণ কাব্যরসিকেরা রাধাকৃষ্ণলীলার মধ্যে চিরন্তন মানবলীলার সাক্ষর দেখতে পান। কৃষ্ণের জন্যে রাধার আর্তি-ব্যাকুলতা আমাদের চিত্তকে অধ্যাত্মমুখী করে না তুললেও, আমাদের অন্তরদেশটিকে ভক্তিতে বিগলিত না করলেও, নায়িকা-নারী শ্রীরাধার প্রেমবেদনার কাব্যসুরভিত মানবীয় প্রকাশ আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে এক মোহময় ঝংকার সৃষ্টি করে। তখন পদাবলী আর ভক্তসাধকের গান থাকে না, বাস্তবসংসারের প্রণয়ীপ্রণয়িনীজনের নিভৃত মর্মের সংগীত হয়ে ওঠে। তাই, বৈষ্ণবপদাবলীর কাব্যরস সর্বজনীন।

ব্রজবুলি-নামে বৈষ্ণবকবিদের নির্মিত স্বতন্ত্র ভাষাটি পদাবলীসাহিত্যের আর-একটি লক্ষণীয় বস্তু। সত্যকার গীতিকবিতার জন্যে এরূপ একটি ধ্বনিময় অর্থাৎ সংগীতধর্মী ভাষার প্রয়োজন ছিল। এর নিজস্ব একটি মন্ত্রশক্তি রয়েছে যেন, এর মধুর গুঞ্জরণ প্রাণকে মুহূর্তে ভাবময় সুরের দেশে উত্তীর্ণ করে দেয়। একটি দৃষ্টান্ত দিই:

এ সখি হমরি দুখক নাহিক ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরখন্তিয়া॥
কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘন খরশর হন্তিয়া।
কুলিশ শত শত পাত মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া॥
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া।
তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরিক পাঁতিয়া॥
বিদ্যাপতি কহে কৈছে গোঁয়ায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া।

এ ভাষার সৌরভের তুলনা কোথায়? আর, বাঙ্‌লাবুলিতে কবিরা যখন পদ লিখেছেন সেখানেও প্রাণের কত গভীর কথা কত সহজ, কী আশ্চর্য সরল ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে:

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলা বাটে।
আঙিনার মাঝে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।

অথবা:

সই, কেমনে ধরিবে হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া॥

অনুভূতির আন্তরিকতা, প্রকাশের সরল রীতি, ব্রজবুলির অপূর্ব ধ্বনিতরঙ্গ, প্রণয়-বাসনার বহুবর্ণরঞ্জিত সংরাগ বৈষ্ণবপদাবলীকে প্রথমশ্রেণীর কাব্যোৎকর্ষ দান করেছে। বাঙালি তার হৃদয়মাধুর্য, তার ভালোবাসার আবেগে, তার প্রেমভক্তির ব্যাকুলতা বৈষ্ণবগানে নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে। পদাবলীসাহিত্য তাই বাঙালির সবচেয়ে আদরের সামগ্রী।

শ্যামাসংগীত

ভূমিকাবাক্য :

বাঙ্‌লা মধ্যযুগের গীতিসাহিত্যের বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে খুব বড়ো একটি স্থান অধিকার করে আছে বৈষ্ণবকবিতা ; তারপর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য শাক্ত-পদাবলী বা শ্যামাসংগীত। বৈষ্ণবের গানে প্রণয়-অনুরাগের প্রাধান্য, শাক্তের গানে —মাতৃঅনুরাগের। প্রথমটিতে প্রেমণীয় নারীর [শ্রীরাধার] প্রেয়সীমূর্তি, দ্বিতীয়টিতে নারীর [কালী বা শ্যামার] জননীমূর্তি। রাধিকার অভিসার লোকালয়ের বাইরে, শ্যামার অধিষ্ঠান আমাদের গৃহের অঙ্গনে। প্রেমচেতনা ও মাতৃচেতনা—এই দুই ভিন্নপ্রকৃতিক চেতনাকে আশ্রয় করে বৈষ্ণবগীতি আর শাক্তগীতি গড়ে উঠলেও উভয়ের মধ্যে ভক্তিরসের ধারাই প্রবাহিত হয়েছে।

প্রায় দু'শ আড়াইশ বছর ধরে ভক্তিরসাশ্রিত বৈষ্ণবপ্রেমসংগীতের শতমুখী উৎসারের পর অষ্টাদশ শতকে বাঙ্‌লা সাহিত্যে শাক্তের শ্যামাসংগীত আত্মপ্রকাশ করল। ষোড়শ শতক থেকে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বৈষ্ণবপদাবলীর স্বর্ণযুগ, তারপর সামাজিক ও জীবনাদর্শগত কয়েকটি কারণে বৈষ্ণবভাবধারা স্তিমিত হয়ে আসে। ফলে, ভক্তির স্রোত ভিন্নমুখী হল, প্রেমসাধনার পরিবর্তে শক্তিসাধনার দিকেই লোকের প্রবণতা দেখা দিল—সমাজে শক্তিপূজা ও মাতৃশক্তি-উপাসনা প্রতিষ্ঠা পেল। বৈষ্ণবসাধকের দৃষ্টি সৌন্দর্যলোকের দিকে, তাঁদের অধ্যাত্মচেতনা অনেকটা সংসারবিমুখ। শাক্তসাধকগোষ্ঠী বাস্তব জীবনকে কিন্তু উপেক্ষা দেখাননি, চতুষ্পার্শ্বের চলমান সংসারের সংগে তাঁদের যোগ ঘনিষ্ঠ বলেই, অধ্যাত্মভাবুক হলেও, প্রাত্যহিক জীবনের কেন্দ্রস্থলেই তাঁরা নিজের উপাস্য দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সমাজচেতনা ও জীবনদৃষ্টিগত এই বৈষম্যের জন্যেই বৈষ্ণবগীতির ও শাক্তগীতির সুরের মধ্যে বিলক্ষণ স্বাতন্ত্র্য দেখা দিয়েছে।

শাক্তসাধকেরা মাতৃদেবতার উপাসক, তাঁদের পূজার নাম শক্তিপূজা। 'শক্তি' বলতে শিবের শক্তিই বুঝতে হবে। 'শক্তি' অর্থাৎ শিবগৃহিণী—কখনো চণ্ডী, কখনো

দুর্গা বা গৌরী বা উমা, কখনো কালী। সুপ্রাচীন কাল থেকে এদেশে তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি প্রচলিত। শক্তিদেবতা কালীর সঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তাই, কালী বা শ্যামা আমাদের পূজিতা প্রাচীন দেবতা। তন্ত্রে শক্তিস্বরূপা মহাকালী একাধারে সৃষ্টি ও সংহারের দেবতা, ভীষণা তিনি, তাঁর মূর্তি ভয়ংকরা। কিন্তু ভয়ংকরা তিনিই আবার কল্যাণদাত্রী, মমতাময়ী, বিশ্বজননী—বর ও অভয় দিচ্ছেন তাঁর সন্তানকে। ভীষণসুন্দর শ্যামার অদ্ভুত রূপ শাক্তকবিরা মুগ্ধদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছেন, তাঁরা বলেছেন : 'মা কি আমার কালো রে। কালরূপা দিগম্বরী হৃদিপদ্ম করে আলো রে।' মহামায়া শ্যামার রহস্য দুরবগাহ।

তন্ত্রের সাধনশক্তি ভীষণা কালীকে বাঙালি শক্তিসাধক ও ভক্তিমান শাক্তকবিরা কোমলতায় মণ্ডিত করেছেন, তাঁর সঙ্গে একটা আত্মীয়সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। এর ফলে এই ভয়ালসুন্দর দেবী মাতা ও কন্যায় রূপান্তরিত হলেন। শ্যামা ও উমা শক্তিদেবতা কালিকার রূপভেদ ছাড়া আর কী? এই রূপান্তরীকরণ অনেকখানি সম্ভব হয়েছে বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাবুকতার আশ্চর্য প্রভাবে। উপাস্যা শ্যামাকে 'মা' বলে ডেকে কবি ও সাধকেরা তাঁর চরণে যে হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ ঢেলে দিলেন, উমাকে যে তাঁরা কন্যারূপে নিজ ঘরের আঙিনায় পেলেন এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে মাধুর্যভাবাশ্রিত বাঙালির ভক্তিভাবের যাদুশক্তি।

কালীমূর্তিকে বাঙালি মানুষ আপনার মনের মতো করেই গড়েছে। সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিণী দেবতার মাতৃমূর্তিটিকে সম্মুখে রেখে নানাভাবে নিজ হৃদয়ের আবেগ ও বিশ্বাসকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। তাই, আমাদের ভক্তকবির কণ্ঠে আমরা শুনতে পেলাম 'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,' অথবা—'কেমন মা কে জানে। মা বলে ডাক ছকত বাজে না মা তোর প্রাণে', ইত্যাদি। শ্যামাসংগীতে মানুষী ভাবের উজ্জ্বল প্রকাশ দেখতে পাই আমরা। তা ছাড়া, উপাস্য-উপাসকের এমন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বৈষ্ণবের গানেও চোখে পড়ে না।

প্রকৃত শাক্তসাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে অষ্টাদশ শতকে। অবশ্য স্ত্রীদেবতা বা মাতৃদেবতা বা শক্তিদেবতার, যেমন—চণ্ডী, মনসা, দুর্গা, কালিকা [প্রভৃতি দেবতার—মাহাত্ম্যজ্ঞাপক আখ্যানকাব্যগুলিকে [মঙ্গলকাব্যকে] সাধারণভাবে শাক্তসাহিত্য বলা হয়ে থাকে। কিন্তু শাক্তসাহিত্যের মূলভিত্তি যে তান্ত্রিক সাধনা তার কোনো প্রেরণা ওই আখ্যানকাব্যগুলির মধ্যে রয়েছে বলে মনে হয় না। তন্ত্রোক্ত সাধনপদ্ধতির নিগূঢ় ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হয়েছে পরবর্তীকালের রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত প্রমুখ সাধককবিদের শ্যামাসংগীতে। সুতরাং বলা যায়, আত্মমুখী এই সংগীতগুলিই যথার্থ শাক্তসাহিত্য নামে আখ্যাত হবার যোগ্য। শাক্তপদাবলী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতের আকারে রচিত, ঠিক যেমন বৈষ্ণবপদাবলী। ক্ষুদ্রাকার গীতিকবিতার মাধ্যমে শাক্তকবিরা যে নিজেদের সাধকজীবনের নিগূঢ় অনুভূতিকে প্রকাশিত করলেন তার মধ্যে বৈষ্ণবকাব্যের নিশ্চিত প্রভাব রয়েছে। আরো লক্ষ্য করতে হবে, শাক্তকবির গান 'বৈষ্ণবপদাবলী' কথারই অনুকরণে

'শাক্তপদাবলী' আখ্যা পেয়েছে। আকৃতি ও প্রকৃতিতে বৈষ্ণবপদাবলী যেমন গান তেমনি শাক্তপদাবলীও। উভয়ে ধর্মসংগীত।

শাক্তসংগীত দুটি ধারায় প্রবাহিত। একটি ধারা মাতৃরূপিণী শ্যামাকে নিয়ে, অপর ধারাটি কন্যারূপিণী উমাকে নিয়ে। প্রথম ধারাটি উমাসংগীত বলে পরিচিত, দ্বিতীয়টির নাম শ্যামাসংগীত। উমাসংগীতের কেন্দ্রগত রস বাৎসল্য, এতে গার্হস্থ্য-জীবনকথার প্রাধান্য; শ্যামাসংগীত ভক্তিরসে সিঞ্চিত, এদের মর্মকেন্দ্রে বিরাজ করছে ভক্তকবির অধ্যাত্মভাবুকতা। শ্যামাসংগীত মুখ্যত তত্ত্বমুখী, এর অবলম্বন শক্তিতত্ত্ব ও শক্তিসাধনতত্ত্ব। তত্ত্বের উৎসমুখ থেকে গীতিধারা আকর্ষণ করেছেন আমাদের শাক্তকবিরা। এ গান বাঙালির সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পদ্। গিরিরাজ ও গিরিরাজপত্নী মেনকার কন্যা উমাকে কেন্দ্র করে যে-গান লেখা হয়েছে সাধারণ্যে তার পরিচয় আগমনী ও বিজয়া-গান। এই উমাসংগীত সকলেই শুনে থাকবেন। বাৎসল্যভাবাশ্রয়ী এমন মানবীয় মধুর রসে সমৃদ্ধ ও কারুণ্যে সিক্ত গান খুব কমই আছে।

শাক্তসংগীতের কবিসম্প্রদায়ঃ

দিব্যমাতৃভাবযুক্ত শ্যামাবিষয়ক গানের আদি কবি এবং সর্বোত্তম কবি হলেন বহুখ্যাত রামপ্রসাদ সেন। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 'অন্নদামঙ্গল'-এর প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আনুকূল্যে নাগরিক পরিবেশে ভোগচঞ্চল জীবনের কাব্য লিখছেন, সেইসময় শহর থেকে দূর পল্লীর নিভৃতনিরালায় বসে [চব্বিশপরগণার কুমারহট্ট গ্রামে রামপ্রসাদের জন্ম] সাধক কবি রামপ্রসাদ লিখলেন ভক্তিরসোদ্বেল শ্যামাসংগীত। রামপ্রসাদ অধ্যাত্মপ্রকৃতিক—খাঁটি মাতৃঅনুরাগেরই কবি তিনি। এই সাধক-মানুষটির কবিসত্তার সার্থকতম প্রকাশ ঘটেছে শাক্তপদাবলীতে। মাতৃভাবের ভক্তির গান লিখে অষ্টাদশ শতকের সেই গতানুগতিকতা ও কৃত্রিমতার যুগে রামপ্রসাদ অনাস্বাদিতপূর্ব রসের নতুন-একটি উৎস খুলে দিলেন। এই সাহিত্যকীর্তি তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে।

স্থূল ভোগসুখের আসক্তি রামপ্রসাদকে বৈষয়িক জীবনের গণ্ডীতে বাঁধতে পারেনি। ধনী জমিদারের সেরেস্তায় মুহুরির কাজ করতে বসে হিসাবের খাতার পাতায় রামপ্রসাদ লিখলেন ভক্তিরসের সংগীত—'আমায় দে মা তবিলদারী, আমি নিমকহারাম নই, মা শংকরী'। বিত্তবান প্রভু তাঁর নিবিড় মাতৃঅনুরাগ ও কবিত্বের পরিচয় পেয়ে তাঁকে ভক্তিভাবের সাধনপথে এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দিলেন—কর্মস্থল কলকাতা ত্যাগ করে হালিশহরের কুমারহট্টে চলে এলেন রামপ্রসাদ। ইষ্টদেবতাকে তিনি কালীনামেইডাকতেন, নিজের যতকিছু ভাবনাচিন্তা, আনন্দবেদনা কালীমায়ের চরণেই নিবেদন করতেন গানের মাধ্যমে। ভক্তিই ছিল তাঁর জীবনের সম্বল, মাতৃমহাভাবে তাঁর হৃদয়দেশ পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর জীবনটি গড়ে উঠেছিল সাধকত্ব ও কবিত্বের অপূর্ব সমন্বয়ে। এহেন সাধককবিকে আপনার একজন সভাসদরূপে পেতে চাইলেন বিদ্যোৎসাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। অধ্যাত্মপথের পথিক

রামপ্রসাদ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তথাপি কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে তাঁর কবিত্বের সম্মান দেখাতে পরাঙ্‌মুখ হলেন না, তাঁকে তিনি 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত করলেন, আর দান করলেন একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি।

রামপ্রসাদ গান লিখে'ছলেন—ভক্তির গান—কবিতা লেখেন নি। তাঁর ভক্তি কী আন্তরিক, ভাবানুভূতি কী গভীর, কী তন্ময় তাঁর মাতৃসাধনা! আশ্চর্যরকমে সরল তাঁর সংগীতের প্রকাশভঙ্গি, তাঁর, এই গীতের সুর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে স্বতঃউৎসারিত। দিব্যমাতৃভাবের উচ্চতম সোপানে ছিল কালীসাধক রামপ্রসাদের অধিষ্ঠান। তাঁর সংগীতের ভাবে এবং ভাষায় শিশুসুলভ সারল্য ও তন্ময়চিত্ততার গীতময় প্রকাশ ঘটেছে। কবি আরাধ্যা দেবীকে মহাশক্তিরূপা জেনেও কেবল অকৃত্রিম ভক্তি ও অকপট ভালোবাসার টানে, একান্ত আপনার করে নিয়েছিলেন—ঐশ্বর্যময়ী মহামায়াকে 'মা' বলে ডেকেছিলেন। ইষ্টদেবতার সঙ্গে এই উপাসকের সম্পর্কটি মাতা ও অবোধ শিশুর। সংসারজীবনে মাকে ছাড়া অসহায় ছেলের একমুহূর্ত চলে না; আধ্যাত্মিক জীবনে মাতৃঅনুরাগী রামপ্রসাদেরও শ্যামাজননীকে ঠিক তেমনি প্রয়োজন। সর্বেশ্বরী মহামায়ার প্রতি তাঁর ভক্তি ও বিশ্বাস এতই প্রবল যে আবদার-অনুরাগ, অভিমান-তিরস্কার, ইত্যাদি কত বিচিত্র ভাবের দোলায় তাঁর কাব্য তরঙ্গমুখর হয়ে উঠেছে। সাধক বলে মায়ের যথার্থ স্বরূপটি তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং কবি বলে নিজ প্রাণের ভক্তি এমন সহজ সরল রীতিতে প্রকাশিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

যেমন সুখের দিনে তেমনি দুঃখের মুহূর্তে মমতাময়ী মাতার শ্রীচরণ ছিল রামপ্রসাদের পরমনির্ভয় আশ্রয়: 'সংসারবিষে জ্বলি যত দুর্গা দুর্গা বলি তত'—বলেছেন শ্যামামায়ের ভক্তছেলে। দুঃখবেদনায় যতই তিনি জর্জরিত হন ততই তাঁর কণ্ঠে আমরা শুনি আকুতিভরা 'মা' 'মা' ডাক:

ভূতলে থাকিয়া মা গো
করলে আমায় লোহাপেটা;
তবু আমি কালী বলে ডাকি
সাবাস আমার বুকের পাটা।

বিশ্বসংসারে মা-ই যাঁর যথাসর্বস্ব, মাকে ছাড়া নিজ দুঃখের কথা আর কাকেই-বা তিনি জানাবেন? ছেলের আকুল ডাকে মা কিন্তু সাড়া দেন না, নীরব থাকেন। এতে সন্তানের চিত্ত অভিমানক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে:

মা মা বলে আর ডাকব না।
ও মা, দিয়াছ দিতেছ কত যন্ত্রণা॥
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী?
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না॥

অভিমানে আহত হয়ে রামপ্রসাদ মাকে গালিগালাজ করতেও ছাড়েননি :

জন্মজন্মান্তরেতে মা, কত দুঃখ আমায় দিলে।
প্রসাদ বলে, এবার ম'লে ডাকব সর্বনাশী বলে॥

একদিকে এই হতাশামিশ্র অভিমানের সুর, অন্যদিকে, ভক্তি ও বিশ্বাসসঞ্জাত আত্মনির্ভরতা :

আমি কি দুঃখেরে ডরাই ?
তবে দাও দুঃখ, মা, আর কত চাই।
দেখো সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে,
আমি করি দুঃখের বড়াই।

রামপ্রসাদের সংগীতে এই বিশ্বাসের জোর কী উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে :

আমি কি আটাশে ছেলে ?
ভয়ে ভুলব না গো চোখ রাঙালে।

ভক্তকবি রামপ্রসাদের কবিতায় আধ্যাত্মিকতা আছে, দার্শনিকতা আছে, কত গূঢ় তত্ত্বকথাকে তিনি গানে বেঁধেছেন সর্বজনবোধ্য ভাষায়। তাঁর প্রযুক্ত উপমাগুলি আমাদের চতুষ্পার্শ্বের পরিচিত সংসার থেকে সমাহৃত। লৌকিক বাংলা বুলিকে রামপ্রসাদ স্মরণীয় কবিভাষার মর্যাদা দিয়েছেন। অত্যন্ত সহজ রীতিতে লিখিত তাঁর গানের এইসব পঙ্‌ক্তির সঙ্গে কার না পরিচয় নেই :

মন রে, কৃষিকাজ জান না।
এমন মানবজমিন রইল পতিত আবাদ করলে
ফলত সোনা॥

* *

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥

* *

নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, মন, চিনি খেতে ভালবাসি॥

—ইত্যাদি

মাঝে মাঝে কবির ভাষাভঙ্গি অদ্ভুতসুন্দর, যেমন—'প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু তরণ। আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন', 'আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি' ইত্যাদি।

যেমন প্রসাদী সংগীত, তেমনি, প্রসাদী সুর হৃদয়গলানো—শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক, বাঙালি জনসাধারণের চিত্তে এর প্রভাব ব্যাপক। রামপ্রসাদী গান ভক্তিসরোবরের শুভ্র শতদল।

উমাসংগীত অর্থাৎ আগমনী ও বিজয়া-গানেরও প্রবর্তয়িতা রামপ্রসাদ।

রামপ্রসাদের প্রবর্তিত শাক্তগীতের ধারাটি অনুসরণ করেছেন **সাধক কমলাকান্ত**, এবং আরো অনেক কবি। রামপ্রসাদের পর শাক্তকবিদের মধ্যে কমলাকান্তই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।

কমলাকান্ত বীরাচারী তান্ত্রিক ছিলেন, তাঁর পাণ্ডিত্যও সর্বজনবিদিত। পঞ্চমুণ্ডির আসন করে কালীসাধনা করতেন তিনি। বর্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্র তাঁকে নিজ গুরুরূপে বরণ করেন। পরবর্তীকালে বর্ধমানরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত হয়েছিলেন এই ভক্তসাধক কমলাকান্ত। রাজাকে যিনি শিষ্যরূপে পেয়েছিলেন তাঁর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোনো অভাব থাকার কথা নয়। কিন্তু কমলাকান্ত বিষয়নিস্পৃহ ছিলেন, আরাধ্য দেবতার চরণে আত্মসমর্পণ করে পার্থিব সমস্ত ভোগচাঞ্চল্যের ঊর্ধ্বে এক পরাশান্তির জগতে প্রায়শ বিরাজ করতেন তিনি।

কমলাকান্ত শুধু গীতিকার ছিলেন না, তাঁর রচনার মধ্যে একজন শিল্পী-মানুষেরও সন্ধান পাওয়া যায়। গীতে অলংকরণসজ্জার প্রতি তাঁর ঝোঁক লক্ষ্য করবার মতো। কমলাকান্তের গানগুলিতে রামপ্রসাদের মতো ভাবের বৈচিত্র্য দেখা না গেলেও ভক্তির আন্তরিকতার অভাব নেই। নীচের সাধনরসের গানটি কবিত্বময় এবং এর চমৎকারিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য :

মজিল মনভ্রমরা কালীপদ-নীলকমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালো মিশে গেল।
দেখ, সুখদুঃখ সমান হল আনন্দসাগরে উথলে॥
কমলাকান্তের মনে আশা পূর্ণ এত দিনে।
পঞ্চতত্ত্ব, প্রধান, সত্ত্ব, রজ দেখে ভঙ্গ দিল॥

কবির সংগীতে নিগূঢ় অধ্যাত্মসাধনার পরিচয় আছে। তাঁর 'আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন কারো ঘরে। যা চাবে এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে', 'শুকনা তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে ভাঙে পাছে', 'জানি জানি গো জননি, কেমন পাষাণের মেয়ে', 'সদানন্দময়ী কালী' প্রভৃতি পদ সকলেরই পরিচিত এবং প্রিয়। ভক্তমনের অকপট প্রকাশ হিসাবে তাঁর গীতিগুচ্ছ আমাদের আদরের বস্তু।

উনিশের শতকের প্রথমার্ধের খুব একজন জনপ্রিয় কবি ছিলেন **দাশরথি রায়**। মুখ্যত পাঁচালি গানের রচয়িতা হলেও শাক্তসংগীতেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় ফুটেছে। বিশেষ করে, আগমনী ও বিজয়া-সংগীতে দাশুরায়ের তুলনা হয় না। পাঁচালি লিখতে বসে দাশরথি লোকসাধারণের মুখের দিকে তাকিয়েছেন। কিন্তু শাক্তসংগীতরচনে প্রবৃত্ত হয়ে, বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে, তিনি নিজ ভক্তিপ্লুত হৃদয়ের গভীরে ডুব দিয়েছেন। দাশু রায়ের ভক্তিভাবুকতার মধ্যে কৃত্রিমতার স্পর্শ নেই। তাঁর কণ্ঠে যখন শুনি :

দোষ কারো নয় গো, মা,
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।

অথবা—

মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন্ মা বলি—

তখন মনে হয় আমরা রামপ্রসাদের অধ্যাত্মব্যাকুলতার জগতে প্রবেশ করেছি যেন। এসকল গানে দাশরথি সমস্ত চপলতা পরিহার করে ভাবগম্ভীর হয়ে উঠেছেন। তাঁর এই সব রচনা ধর্মসংগীতের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

*

শাক্তসংগীতের একটি বড়ো অধ্যায় জুড়ে রয়েছে উমাসংগীত—আগমনী ও বিজয়ার গান। এগুলিতে ভগবতীর বাৎসল্যরসসিক্ত কন্যামূর্তিটিই লক্ষ্যণীয়। মঙ্গলকাব্যে শিবদুর্গার যে-রূপ আমরা দেখেছি এখানে তা ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে নবকলেবর ধারণ করেছে। উমাবিষয়ক গানে উমা বা দুর্গার বাল্যজীবন ও বিবাহিত জীবনের কথা।

ভক্তের চোখে দুর্গা বা কালী অভিন্ন বলে উমাসংগীতকে ব্যাপকভাবে শাক্তসংগীতের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। এসমস্ত গানে শক্তিতত্ত্ব কিংবা শক্তিসাধনতত্ত্বের কোন ব্যঞ্জনা নেই, এগুলির মধ্যে বাঙালিঘরের আনন্দবেদনা-মিশ্রিত কলধ্বনিই শুনতে পাওয়া যায়। বাঙ্লার সমাজের সঙ্গে উমাসংগীতের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। শ্যামাসংগীতে আধ্যাত্মিক ভাবেরই রূপায়ণ, আগমনী-বিজয়ার গানে মানবীয় ভাবের। বাঙালি কবির নিজস্ব পরিকল্পনায় পুরাণকথিত গিরিরাজ মেনকার কন্যা উমা এখানে আমাদের একান্ত আপন জন হয়ে উঠেছেন—তিনদিনব্যাপী দুর্গোৎসবের তত্ত্ব বাঙালি-বিবাহিত-কন্যার তিনদিনের জন্যে পিতৃগৃহে আগমন ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িত মিশ্রিত হয়ে গেছে। আমাদের গৃহধর্মের অতিপরিচিত করুণমধুর একটি চিত্র ফুটেছে বলে বাঙালিচিত্তে আগমনী ও বিজয়া সংগীতের আবেদন গভীর।

বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার প্রচলন একদা বাঙ্লার সমাজে কত মনোবেদনার সৃষ্টি করেছে। আট বৎসরের শিশুকে বিবাহ দিয়ে বাঙালি-পিতামাতা যে কী উৎকণ্ঠায় দিন কাটাতেন তা সহজে অনুমেয়। মা বাপ যে কেবল কন্যার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় কাতর হতেন তা নয়। মেয়ের জন্যে কুলীন পাত্র চাই, কিন্তু সর্বদা মনোনীত পাত্র মিলে কৈ? তাই কুল রক্ষা করতে গিয়ে মেয়ে প্রায়শ অপাত্রের হাতে পড়ত। প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ কিংবা দারিদ্র্যগ্রস্ত স্বামীর হাতে পড়ে তার দুঃখকষ্টের সীমা থাকত না। আর, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সতীনের সঙ্গে তার ঘর করতে হত। এরূপ অবস্থায় মেয়েকে জামাতার ঘরে পাঠিয়ে কোন্ স্নেহময়ী মা মনের শান্তি ও স্বস্তিতে দিনাতিপাত করতে পারেন? সেকালের কত কত মা মন্দভাগ্য মেয়ের জন্যে নীরবে অশ্রুপাত করতেন। কন্যাকে কাছে পাবার অশান্ত আগ্রহ তাঁদের হৃদয়টিকে ব্যাকুল

করে তুলত। তাঁরা অধীর প্রতীক্ষায় থাকতেন বৎসরান্তে মেয়েকে কবে বুকের মধ্যে ফিরে পাবেন। 'আগমনী'-গানে কন্যার জন্যে সাধারণ জননীর এই ব্যাকুল প্রতীক্ষা ও ব্যথাকাতরতার মনোভাবটি মর্মস্পর্শী বাণীরূপ লাভ করেছে—এখানে মেনকা ও উমা বাঙালিঘরের মা ও মেয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

কন্যা পিতৃগৃহে আসে, কিন্তু তিনদিন পরে তাকে জামাতাগৃহে পাঠাতে হয়। ক্ষণমিলনের পর আবার নিদারুণ বিচ্ছেদমুহূর্ত দেখা দেয় মায়ের প্রাণ অসহ্য বেদনায় কাতর হয়ে ওঠে। মা কাঁদেন, বাপের দুচোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, মেয়ের আহার-নিদ্রা ঘুচে যায়—তৃতীয় দিবসের রাত্রিটি কী বিষাদম্লান! এই দুঃখ-বেদনা-কান্নার সুর বেজেছে 'বিজয়া'র গানে, এ সংগীত ব্যথাদীর্ণ হৃদয়ের হাহাধ্বনি।

আগমনী ও বিজয়া, এই অংশকে নিয়ে উমাসংগীতের সম্পূর্ণতা। বাঙালি ছাড়া এজাতীয় গানের রস অপরে ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না।

গিরিরাণী মেনকার একমাত্র শিশুকন্যা উমা—সযত্নে লালিতা, আদরের দুলালী। এহেন উমার বিবাহ হয়েছে বৃদ্ধ কুলীন পাত্র শিবের সঙ্গে—সতীনের ঘরে। শিব দরিদ্র, অভাবের সংসারে অনেকগুলি সন্তান। তাই গৌরীর অশেষ দুঃখ। গিরিরাণী মেয়ের দুর্দশার কথা ভাবেন। তাঁর দুর্ভাবনার অন্ত নেই। কন্যার চিন্তায় মেনকা রাত্রিতে ঘুমোতে পারেন না—কাঁদেন। আর মাঝে মাঝে দোষারোপ করেন পাষাণ স্বামী গিরিরাজাকে, তিনিই তো দারিদ্র্যযুক্ত শিবের হাতে কন্যাকে তুলে দিয়েছেন। মেয়ের ওপরও কখনো কখনো তাঁর অভিমান হয়। শরৎকালের নিশিশেষে গিরিরাজপত্নী নিজ তনয়াকে স্বপ্নে দেখে উৎকণ্ঠাতুরা হয়ে ওঠেন। স্বামীকে ডেকে বলেন :

আমি কী হেরিলাম নিশি-স্বপনে।
গিরিরাজ, অচেতনে কত-না ঘুমাও হে ॥
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথায় গেল হে ॥

কন্যা স্বপ্নে দেখা দিয়ে চকিতে কোথায় মিলিয়ে গেল, এতে মায়ের চিত্তব্যাকুলতা শতগুণিত হয় :

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল!

স্বামীর প্রতি মেনকার অনুযোগ তিনি যেন কন্যার বিষয়ে কতকটা উদাসীন। ইচ্ছা করলে গিরিরাজ কি মেয়েকে কয়েক দিনের জন্যে মায়ের কাছে এনে দিতে পারেন না :

আমি দেখেছি স্বপন, যেন উমাধন
আশাপথ রয়েছে চেয়ে ॥
আছে কন্যাসন্তান যার, দেখতে হয়, আনতে হয়,
সদাই দয়ামায়া ভাবতে হয় হে অন্তরে ॥

পত্নীর অনুরোধ গিরিরাজ উপেক্ষা করতে পারেন না, মেয়েকে তিনি আনতে যান। কন্যার সঙ্গে আসন্ন মিলনের মুহূর্তে মেনকার স্নেহাতুর মাতৃহৃদয়ের দাবি সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে:

গিরি, এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়ে-ঝিয়ে করব ঝগড়া,
জামাই বলে মানব না॥

বাৎসল্য অর্থাৎ অপত্যস্নেহের এই কাব্যরূপ সত্যই হৃদয়গ্রাহী। ভক্তকবিরা বাঙালির পিতামাতার নিভৃত প্রাণলোকের এই বিশিষ্ট অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলেই মায়ের স্নেহার্তি তাঁদের হাতে এমন মধুসিক্ত হয়ে উঠেছে।

শারদীয়া সপ্তমী। সুনীল আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে দিকে সোনালী রোদ ঝরে পড়ছে। শিউলি ফুলের রঙে মেনকা কন্যার গায়ের বর্ণ দেখতে পান যেন, শরতের বাতাস উমার গায়ের স্পর্শ এনে দেয়। এতে মায়ের প্রাণ কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। এমন একটি সময়ে গিরিরাণী পুরবাসীর মুখে কন্যার আগমন-বার্তা শুনতে পান, তাঁর দুইচোখে আনন্দাশ্রুর বান ডাকে।

আদরের মেয়ে ঘরে ফিরছে, জননীর কত আনন্দ, কত উৎসাহ। আনন্দকম্পিত কণ্ঠে মেনকা গিরিরাজকে ডাকেন, প্রতিবেশিদের ডাকেন। কন্যাকে প্রশ্নের 'পর প্রশ্ন করে তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার বিচিত্র সংবাদ জানতে চান, তাকে সস্নেহে বলেন—'এসেছিস মা, থাক না উমা দিন কত'। মেয়ে বাপের বাড়ীতে বেশিদিন থাকবে না জেনে জননীর অন্তর অভিমানে কাতর হয়। সন্তানের বিচ্ছেদবেদনা যে কী যন্ত্রণাদায়ক তা বোঝাবার জন্যে মেনকা উমাকে বলেন:

বুঝাব মায়ের ব্যথা গণেশকে তোর আটকে রেখে।
মায়ের প্রাণে বাজে কেমন, বুঝবি তখন আপনি ঠেকে॥

উমাসংগীতের কবিরা মায়ের প্রাণের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন, সেখান থেকে আহরণ করেছেন বাৎসল্যের সুধা এবং তা ঢেলে দিয়েছেন তাঁদের গানগুলিতে। এই মানবিক রসে নিষিক্ত হয়ে আগমনীপর্যায়ের সংগীত অপূর্ব আস্বাদনীয় বস্তুর রূপ পরিগ্রহ করেছে।

সপ্তমীর প্রভাতে মিলনোৎসবের রাগিণী বেজে ওঠে, তিনটি দিন আনন্দকলরবে কেটে যায়। নবমীর রাত্রে জননীর অন্তরে আসন্ন বিচ্ছেদের মসীকৃষ্ণ ছায়া নেমে আসে। নিশি পোহালে কন্যাকে বিদায় দিতে হবে একথা ভেবে মায়ের প্রাণ এক দুঃসহ ব্যথায় ক্রন্দন করে ওঠে। অল্প কয়েক দিনের জন্যে কন্যাকে নিকটে পাওয়া যায়, তাকে দীর্ঘকালের জন্যে ধরে রাখা যায় না অথচ মাতৃহৃদয়ের স্নেহবুভুক্ষা যে কিছুতেই মেটে না। একদিকে হৃদয়সত্য, অন্যদিকে, বাস্তবসংসারের নির্মম দাবি, এই

দুইয়ের টানাপোড়েনে বিজয়ার গানগুলি গড়ে উঠেছে। এ গান বিষাদাচ্ছন্ন কারুণ্যে আর্দ্র। নবমীর রাত্রি গত হলেই তো মিলনমহোৎসব শেষ হয়ে যাবে, তাই, প্রবোধ-না-মানা জননীর প্রাণ অসম্ভব একটি প্রার্থনা জানায়: 'ওরে নবমী নিশি, না হইও রে অবসান'! কিন্তু নিসর্গপ্রকৃতি বধিরা, নিষ্ঠুরা, মায়ের কাতর মিনতির দিকে তার লেশমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। নবমীর রাত্রি কেটে যায়, 'বজয়ার দিন উপস্থিত হয়। তবু জননীর অবুঝ মন বলে 'যেতে নাহি দিব', সন্তানের ওপর নিজ দাবি কিছুতেই ছাড়বে না। গৌরীকে নিতে এসেছেন শিব, এই আসন্ন বিদায়লগ্নে জয়াকে ডেকে মেনকা বলছেন:

জয়া, বল গো পাঠানো হবে না।
হর—মায়ের বেদন কেমন জানে না॥

বাঙালির সংসারধর্মের এই আলেখ্যটি করুণ। জননীর ব্যথাদীর্ণ হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে রামপ্রসাদ আমাদের শুনিয়েছেন:

তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায়, এ কী বিড়ম্বনা বিধাতার।

অবশেষে 'পরের ধন তনয়া'কে বিদায় দিতে হয়, কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে অশ্রুছলছল চোখে জননী বলেন।

ফিরে চাও গো উমা, তোমার বিধুমুখ হেরি;
অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে কোথা যাও গো।
এখানে দাঁড়াও উমা, বারেক দাঁড়াও, মা,
দুটি নয়ন মোর রইল চেয়ে পথপানে—
বলে যাও আসিবে আবার কতদিনে এ ভবনে॥

তার পর কন্যা পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যায়, কারুণ্যমাখা বিয়োগান্ত নাটকের অবসান ঘটে। তিনদিন মিলন-উৎসব-সমারোহের পর বিজয়াদশমী গৃহের ভিতর-বাইরে মহাশূন্যতার ম্লান ছায়া বিস্তার করে। বিজয়া-গান যেন বৈষ্ণবকবির মাথুর-সংগীত, শুনলে সকল প্রাণ বেদনায় টনটন্ করে ওঠে।

আগমনী ও বিজয়ার গান সর্বত্র প্রচলিত, দুর্গোৎসবের আগে ও পরে এই সংগীত এখনো ভিখারীর কণ্ঠে শুনতে পাওয়া যায়। মেনকা বাঙালি-মায়ের জীবন্ত ছবি। সামাজিক প্রথার নির্দেশে যে-দেশের শিশুকন্যাকে অপাত্রের হাতে সমর্পণ করে অপরের ঘরে পাঠাতে হয় এ গান সে-দেশের গৃহধর্মের বাস্তব চিত্র। কত 'পার্বতী'র দুঃখকষ্টের কথা স্মরণ করে আমাদের কত 'মেনকা'-মাতা সমস্ত জীবন ধরে কেঁদেছেন। এঁদের কান্না উমাসংগীতে গুঞ্জিত হয়ে রয়েছে।

আগমনী ও বিজয়ার গানকে বাৎসল্যরসের অলকানন্দা বলা যেতে পারে।

শাক্তসংগীত ও বৈষ্ণবগানের তুলনা :

শাক্তগীত স্বাভাবিক-ভাবেই বৈষ্ণবগানের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই দুইশ্রেণীর রচনাই স্বরূপত সংগীত—লিখে গেছেন ভক্তকবিদল। মূলত ভক্তিকে আশ্রয় করে শাক্ত ও বৈষ্ণবের কাব্য গড়ে উঠেছে।

বৈষ্ণবপদাবলীর উদ্ভব শাক্তপদাবলীর বহু আগে। শাক্তপদে বৈষ্ণবকবিতার কিছু কিছু প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণবসাধক দেবতার কোমলকান্ত রূপমূর্তির ধ্যান করেছেন, দেবতাকে অন্তরঙ্গ আত্মীয় বলে জেনেছেন। শাক্তদেবতা ভীষণা কালীও ভক্তিভাবযুক্ত হয়ে অনেকখানি কোমলতায় মণ্ডিত হয়েছেন—শাক্তসাধক কালিকার মাধুর্যস্বরূপটিও চাক্ষুষ করেছেন। শাক্তগীতের কায়ানির্মাণে শাক্তকবিরা বৈষ্ণবকবির অনুসৃত কাব্যরীতির দিকে স্বেচ্ছায় ঝুঁকেছেন বলে মনে হয়। বৈষ্ণব-সংগীতকে 'পদাবলী' বলা হয়—শাক্তসংগীতকেও 'পদাবলী' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে বৈষ্ণবপদাবলীর ভাববৈচিত্র্য ও কল্পনার অবাধ বিস্তার শাক্তের পদগুলিতে নেই, শাক্তকবিদল বহুবিচিত্র ভাবের রাজ্যে সঞ্চরণ করেন নি।

পূর্বে বলেছি, শাক্ত ও বৈষ্ণবের গান ভক্তিরসাশ্রিত। কিন্তু মনে রাখতে হবে, শাক্তভক্তির ও বৈষ্ণবভক্তির মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য রয়েছে। শাক্তের সাধনা মাতৃভাবের, বৈষ্ণবের সাধনা কান্তাভাবের। শ্যামাসংগীতের কবিরা উপাস্য দেবতাকে 'মা' বলে ডেকেছেন। বৈষ্ণবের 'মধুর'রসের সাধনায় ঈশ্বর পরম-প্রণয়াস্পদ [কান্ত বা প্রিয়তম], রাধা এই পরমদয়িতের প্রণয়াস্পদা [কান্তা]—বৈষ্ণবসাধক প্রেমের পথেই ঈশ্বরকে সন্ধান করেছেন। শাক্তকাব্যের প্রাণকেন্দ্রে জননী, আর, বৈষ্ণবকাব্যের মর্মকেন্দ্রে প্রেয়সী বিরাজমানা।

উভয় শ্রেণীর পদাবলীর মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য হল, বৈষ্ণবকবির মধ্যে ঐশ্বর্যবুদ্ধির স্পর্শ নেই, তাঁরা ভগবানের ঐশ্বর্যভাব পরিহার করে মাধুর্যভাবের পথেই এগিয়ে গেছেন। কিন্তু শাক্তকবির ভক্তি ঐশ্বর্যমিশ্র, শাক্তসাধকেরা আরাধ্য দেবতার কোমলমধুর মূর্তির দিকেও যখন তাকিয়েছেন তখনো তাঁর ঐশ্বর্য ও বিভূতির কথা ভুলতে পারেন নি—'গিরিবালা' যে শক্তিশ্বরী কালিকারই একটি রূপভেদমাত্র একথাটি তাঁরা সর্বদা স্মরণে রেখেছেন।

অতঃপর তৃতীয় পার্থক্য। বৈষ্ণবকাব্যে পাঁচটি রসের স্ফুরণ দেখতে পাই, এদের নাম—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শাক্তের ভক্তিধারা থেকে যে-পাঁচটি রস নিঃসৃত হয়েছে তা একটু স্বতন্ত্র ধরণের—বাৎসল্য, বীর, অদ্ভুত, দিব্য ও শান্ত। বৈষ্ণবসাধকের কাছে পরমারাধ্য কোথাও বিভু, কোথাও প্রভু, কোথাও সখা, কোথাও পুত্র এবং কোথাও প্রিয়তম। শাক্তসাধকের কাছে পরমারাধ্য কোথাও মাতা, কোথাও-বা কন্যা। উভয়ের সাধনরীতি কয়েকটি কারণে পৃথক হয়ে পড়েছে। শান্তরস বৈষ্ণবসাধনার প্রাথমিক অবস্থা। শাক্তসাধনায় এই রসটি কিন্তু সবশেষের পরিণত অবস্থা। সাধকচিত্ত মাতৃমহাভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে যে-অবিক্ষুব্ধ শান্তির অধিকারী হয়, শান্তরস তারই ফলশ্রুতি।

অদীক্ষিতের জন্যে বৈষ্ণবকাব্য নয়, এই কাব্যের রস যথার্থ উপলব্ধি করতে হলে বৈষ্ণবসাধনতন্ত্রের সঙ্গে কিছুটা পরিচয়ের প্রয়োজন আছে; কিন্তু শাক্তের রচিত মাতৃভাবের কবিতা সকলশ্রেণীর মানুষই অনায়াসে উপভোগ করতে পারে। তবে বৈষ্ণবকাব্যের রসের আবেদন যে-অর্থে যতখানি সর্বজনীন, শাক্তকাব্যের তা নয়। শাক্তগীতে বাংলার পরিবেশপ্রভাব রয়েছে বলে এই শ্রেণীর গান বাঙালিরই সর্বাধিক উপভোগের সামগ্রী।

সর্বশেষে কাব্যকলার কথা। শাক্তপদাবলীর মধ্যে সেই কলাসৌন্দর্য তেমন চোখে পড়ে না যা লক্ষণীয়ভাবে বৈষ্ণবপদের কাব্যমূল্য বর্ধন করেছে। বৈষ্ণব-কবিদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতিমান পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন, সংস্কৃত সাহিত্য ও অলংকারশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁদের ব্যাপক পরিচয় ছিল। কাব্য লিখতে বসে এসব বৈষ্ণবকবি এই পরিচিতির সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন। শাক্তপদরচয়িতাদের সম্পর্কে কিন্তু একথা বলা যায় না। তাঁদের কবিকৃতিতে সূক্ষ্মশিল্পকার্যের রম্যতার অভাব সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন। ছন্দ, অলংকার ও বাণীবিন্যাসের পরিপাট্যে বৈষ্ণবকবিতা যে-আভিজাত্য লাভ করেছে, শাক্তসংগীত তা থেকে বঞ্চিত। তার ছন্দোবৈচিত্র্য নেই, অলংকরণসমৃদ্ধি নেই, শব্দগ্রন্থনের চমকপ্রদ নিপুণতা নেই। কিছুটা এই কারণে শাক্তপদ উপভোগ করার জন্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির তেমন প্রয়োজন হয় না, পাঠকচিত্ত ভক্তিযুক্ত হলেই সহজে এর রসাস্বাদন করা যায়। সূক্ষ্মভাবুকতাপূর্ণ, কলাসমৃদ্ধ ও গূঢ়তত্ত্ববাহী বৈষ্ণবসংগীত আমাদের মনকে এক অবাস্তবমনোহর সৌন্দর্যলোকে উত্তীর্ণ করে দেয় আর, বাঙালির বৈষয়িক জীবনের পরিবেশ ও অনুষঙ্গের মধ্যে সঞ্চরণশীল, প্রাত্যহিক সংসারের ক্রূরতা-কুশ্রীতা, দারিদ্র্য-রিক্ততা ইত্যাদির পরিচয়বাহী, কল্পনার অতিরেকবর্জিত, শাক্তগীতি আমাদের মনকে এই বাস্তবপৃথিবীর চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে।

কালান্তর

সেকাল হতে একালে

আধুনিক পর্বের বাঙলা সাহিত্য

॥ ১৮০০ থেকে পরবর্তী কাল ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ বাঙলা গদ্যের অনুশীলন ॥

আধুনিক কাল : একালের সমাজ ও সাহিত্যে রূপান্তর :

আমরা রামপ্রসাদের কাল পেরিয়ে এলাম। প্রসিদ্ধ ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের সমকালীন কবি। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতচন্দ্র লোকান্তরিত হন। এই সময়ে পলাশীর যুদ্ধে [১৭৫৭ সাল] সিরাজউদ্দৌলার পতন হল। এখান থেকে ভারতে ইংরেজরাজত্বের শুরু—দেশে নতুনের আগামনী সোনা গেল। তাহলে, বলতে পারা যায়, রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাঙলায় ইংরেজগণের প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠায় মধ্যযুগের অবসান ঘটল. আমরা আধুনিক কালে উত্তীর্ণ হলাম। জাতীয় জীবনে রাজনীতিক বিপর্যয়ের ফলে সেকাল থেকে একালে এই যে উত্তরণ. একেই আমরা বলছি কালান্তর। ইংরেজসংস্পর্শে দেশে যে-পরিবর্তনধারা বইয়ে দিল তা যেমন দ্রুত, প্রকৃতিতে তেমনি বৈপ্লবিক।

বহুকাল ধরে আমাদের অভিলষিত ছিল প্রগতি। কিন্তু মুসলমানআমলে নানাকারণে এই পথ রুদ্ধ ছিল। ইংরেজশাসন-শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিয়ে এই প্রগতির পথ উন্মুক্ত করে দিল। ১৮০০ সালে কোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হল। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে খুব বড়ো একটি ঘটনা। দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার নতুন হাওয়া বইল। পুরানো আমলের শিক্ষাধারার ওপর ছেদ পড়ল। প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সংঘর্ষে প্রাচীন ঐতিহ্যের অনেক কিছু গেল, নবসংস্কৃতি জয়যুক্ত হল। আধুনিকী শিক্ষা ও সভ্যতায় দীক্ষিত হওয়ার ফলে বাঙালির সমাজ-জীবনও দ্রুত রূপান্তরিত হতে লাগল—গোটা দেশ বিবিধ আন্দোলনে আলোড়িত হল। ব্যক্তির চিন্তায়, সামাজিক রীতিনীতিতে, শিক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদিতে যে-পরিবর্তন এল তা আমাদের সমাজের কাঠামোটিকে অনেকখানি বদলে দিল। ব্যক্তির সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, সাহিত্যের সম্পর্কটি ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তির মনের ও সমাজমনের নতুন ভাবনা বাঙলা সাহিত্যকেও অনেকাংশে নতুন করে তুলল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে আমাদের মন ছিল সংস্কারসম্বল, বিচারবিমুখ। পুরাতন প্রথা ও শাস্ত্রের বিধিবিধানকে আমরা অপরিবর্তনীয় বলেই জেনেছিলাম, জীবনে ও সাহিত্যে দেবতার আধিপত্যকে নির্বিচারে মেনে নিয়েছিলাম। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা আমাদের এই সংস্কারাচ্ছন্ন. দৈবনির্ভরশীল, প্রথাশাসিত মনের ওপর আঘাত হানল, জাগ্রত করল সুপ্ত বিবেকবুদ্ধি। এদেশের ইংরেজিশিক্ষিত বহু ব্যক্তি সামাজিক

কুসংস্কার ও নৈতিক কদাচার দূর করতে বদ্ধপরিকর হলেন, স্বাধীন চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধিকে ভিত্তি করে সমাজে নবযুগপ্রবর্তনের প্রাণপণ প্রয়াস করলেন।

পুরাতন কুসংস্কারকে উড়িয়ে দিতে গিয়ে কিছু কিছু নতুন কুসংস্কারেরও বশীভূত হলাম আমরা। বেশভূষা, আচারঅনুষ্ঠান ও আহারবিহারে ইংরেজের অন্ধঅনুকরণ, তারা যা করে তা সর্বাংশে উত্তম, আমাদের সবকিছু খারাপ সুতরাং বর্জনীয়—আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত বাঙালির এরূপ মনোভাবও একপ্রকার কুসংস্কার ছাড়া আর কি? এতদ্ব্যতীত, ইংরেজবণিকের সংস্পর্শে এসে বাঙলাদেশের একশ্রেণীর মানুষের রুচিবিকৃতি ঘটল। তারা নীতিভ্রষ্ট হল। এরকম একটি অবস্থায় সমাজে পুনরায় সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিল। বিদেশীর নির্বিচার অনুকরণে জাতির সত্তার স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হয়, সে আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে যায়। জাতিকে এই আধ্যাত্মিক সংকট থেকে উদ্ধার করবার কাজে ব্রতী হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙালি মনীষীবৃন্দ।

জাতির এই পরিবর্তিত মানসিকতা আধুনিক পর্বের সাহিত্যে নবীনতার সঞ্চার করল। বহিরঙ্গ রূপ এবং অন্তরঙ্গ ভাব—উভয় দিক দিয়ে একালের সাহিত্য সেকালের সাহিত্য থেকে বিভিন্ন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে মানবিকতার মহিমা স্বীকৃতি পায়নি, স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তার প্রতিফলন ঘটেনি, ঐহিকতা ও ইতিহাসচেতনার কোনো স্পন্দন তার মধ্যে নেই। লৌকিক ধর্মের অনুসৃতি, দেবকর্তৃত্ব, অলৌকিকতা, পল্লবগ্রাহিতা, বাস্তবের প্রতি ঔদাসীন্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ য়ুরোপীয় ভাবচিন্তার সংস্পর্শে এসে নবজাগ্রত জীবনবোধের ফলে আধুনিক সাহিত্য আকৃতি ও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ বদলে গেল। এতে মানুষ প্রতিষ্ঠা লাভ করল, ধর্মীয় প্রভাব ধীরে ধীরে মুছে গেল, মানবীয় সুখদুঃখ, আনন্দবেদনার কথা উচ্চারিত হল—জাতির বহুবিচিত্র কামনাবাসনা বাণীরূপ পেল।

তা ছাড়া, পূর্বে বাঙলা সাহিত্য ছিল পদ্যবাহিত। উনিশের শতকের প্রথম দিকে গদ্যরীতি এসে পদ্যরীতির পাশে নিজের স্থান করে নিল। রচিত হল প্রবন্ধ-উপন্যাস-গল্প-নাটক, লেখা হল পাশ্চাত্য ধরণের মহাকাব্য আর গীতিকবিতা, ছন্দ ও ভাষাভঙ্গি নতুনতর ভাবের প্রকাশক্ষমতা লাভ করল। কাব্যসাহিত্যে প্রধানত মধুসূদনের, এবং গদ্যসাহিত্যে বঙ্কিমের. সারস্বত প্রতিভাকে আশ্রয় করেই আমাদের সাহিত্যে আধুনিকতার নিশ্চিত পদক্ষেপ। সাহিত্য নির্মাণ করতে বসে মধুসূদন সাহসসহকারে পুরাতন পথ বর্জন করলেন—কাব্যে, নাটকে. গীতিকবিতায়, ছন্দে ও ভাষায়, তিনি যা দিলেন তা নবীনতায় সমুজ্জ্বল। বঙ্কিমপ্রতিভা ব্যতিরেকে প্রাণবন্ত গদ্যের গঠন কদাপি সম্ভব হত না—উপন্যাস সমালোচনা, প্রবন্ধরচনা তাঁর অদ্ভুত সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয় বহন করে। হৃদয়লোকের গোপন গভীরে প্রবেশের চাবিকাঠি আমাদের হাতে তুলে দিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথ সেই নিভৃত অন্তঃপুরে

বিদ্যাসাগর এহেন গদ্যের অঙ্গে শোভনতার সঞ্চার করলেন। শেষজীবনে চলতি ঢঙের গদ্য লিখে তিনি আমাদের বিস্মিত করেছেন। এ তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের নিশ্চিত পরিচয় বহন করে।

বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনারীতির নমুনা :

॥ ১ ॥ 'একদিবস রাজকুমার নানা বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে কোন নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশপূর্বক তন্মধ্যবর্তী পরমরমণীয় এক সরোবর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। এবং দেখিলেন ঐ সরসীর তীরে হংস বক চক্রবাক সারস প্রভৃতি নানাবিধ জলীয় পক্ষিগণ কলরব করিতেছে।' —বেতালপঞ্চবিংশতি

॥ ২ ॥ 'লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যা, এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ-গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত-সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।'
—সীতার বনবাস

॥ ৩ ॥ 'শকুন্তলা কহিলেন, না পিসি! আমি একা ছিলাম না, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা বরাবর আমার নিকট ছিল, এইমাত্র মালিনীতে জল আনিতে গেল। তখন গৌতমী কহিলেন, বাছা! আর রোদ নাই, অপরাহ্ণ হইয়াছে, এস কুটীরে যাই। শকুন্তলা অগত্যা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।' —শকুন্তলা

॥ ৪ ॥ 'এ যাত্রায় খুড়র কাছে দুই-চারিটি প্রশ্ন করিব।...যদি উপেক্ষা করিয়া অথবা ভয় পাইয়া অথবা আর কোন নিগূঢ় কারণের বশবর্তী হইয়া খুড় মহাশয় উত্তরদানে বিমুখ হন, 'দুও' 'দুও' বলিয়া হাততালি দিয়া ইয়ারবর্গ লইয়া কিয়ৎক্ষণ আনন্দে নৃত্য করিব, পরে রীতিমত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া মড় মড় করিয়া খুড়র ঘাড় ভাঙিয়া ফেলিব।' —ব্রজবিলাস

সমকালীন ও পরবর্তীকালের কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রবর্তিত সাধুগদ্যরীতি অনুসরণ করেছিলেন।

॥ অক্ষয়কুমার দত্ত ॥ বাঙলা গদ্যের আর-একজন উল্লেখযোগ্য ভালো লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত [১৮২০-১৮৮৬]। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের [১৮২০-১৮৯১] সমকালেই তাঁর আবির্ভাব। এঁদের 'তত্ত্ববোধিনী'-পর্বের দুজন মহারথী বলা হয়।

অক্ষয়কুমার দত্তের রচনারীতি ছিল সাধুগদ্যভঙ্গি অথচ তা প্রাঞ্জল ও যথাযথ

ছিল। বাঙলা গদ্যে বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনার তিনি পথপ্রদর্শক বললে অত্যুক্তি হয় না। অক্ষয়কুমার দীর্ঘকাল 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদক ছিলেন। তাঁর গদ্যরচনা-রীতি বিদ্যাসাগরের সমসূত্রে উল্লিখিত হয়। অক্ষয়কুমারের প্রধান বইগুলি হচ্ছে: 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার', 'চারুপাঠ' [তিন ভাগ], 'ধর্মনীতি' ও 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়'। এ ছাড়া, কয়েকটি পুস্তিকাও তিনি লিখেছেন।

প্রবন্ধ ব্যতীত অন্যকোনো শ্রেণীর রচনায় অক্ষয়কুমার হস্তক্ষেপ করেননি। তিনি ছিলেন জ্ঞানতপস্বী। তাঁর পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা সংশয়াতীত। এর নিশ্চিত মুদ্রাঙ্কন আমরা দেখতে পাই তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার', 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়', 'চারুপাঠ' প্রভৃতি গ্রন্থে। জ্ঞানগর্ভ রচনায় তিনি প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন; চিন্তার স্বচ্ছতা, যুক্তির বলিষ্ঠতা, মননের ঋজুতা, তথ্যবিন্যাসের কুশলতা ইত্যাদির জন্যে অক্ষয়কুমারের রচনা অভিনন্দনযোগ্য।

বিদ্যাসাগরের গদ্য প্রধানত ভাবধর্মী, এতে হৃদয়াবেগের প্রচুর স্পর্শ লেগেছে। অক্ষয়কুমারের গদ্যরীতির চেহারা কিন্তু স্বতন্ত্র, রামমোহনের পথে এগিয়ে গিয়ে তিনি যুক্তিনিষ্ঠ গদ্যেরই অনুশীলন করেছেন। এ জাতের গদ্য ছাড়া দর্শনবিজ্ঞানাদির আলোচনা সম্ভব হতে পারে না। রামমোহনের গদ্য যুক্তিপন্থী হলেও তাতে অনায়াসগতি ছিল না। অক্ষয়কুমারের হাতে বাঙলা গদ্য সাবলীল হয়ে উঠেছে, প্রাঞ্জলতা পেয়েছে অথচ তথ্যভারবহনের দৃঢ়তাটি হারায়নি। অবশ্য স্বীকার করতে হবে, সৃষ্টিমূলক সাহিত্যনির্মাণের মতো কল্পনা তাঁর ছিল না—যাকে বলে জ্ঞানের সাহিত্য, তারই নির্মাতা তিনি।

অক্ষয়কুমারের গদ্যের কিছু নমুনা:

॥ ১ ॥ 'ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিজনিত বিহিত সুখেও আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। জগদীশ্বর জগতের কোনো পদার্থ নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। আমরা ঐ সমস্ত বৃত্তিকে পরিচালিত ও চরিতার্থ করিয়া সুখসৌভাগ্য লাভ করিব এই অভিপ্রায়েই তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।' —ধর্মনীতি

॥ ২ ॥ 'যদি জগতে কেবল কতকগুলি পরমাণু ও তাহার আকর্ষণ-গুণ থাকিত, আর তাহার প্রতিবিধানার্থে কোন শক্তি না থাকিত তবে সমুদায় জড়পদার্থ পরস্পর দৃঢ়তর আকৃষ্ট হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড কেবল একটি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড হইত। কিন্তু তেজ নামে এক পদার্থ থাকাতে, ঐ প্রকার বিপত্তি ঘটনার নিবারণ হইয়াছে।'

—পদার্থবিদ্যা

॥ ৩ ॥ 'আহা, কি দেখিলাম! এমন অদ্ভুত স্বপ্ন কখনও দেখি নাই। এমন কলরবপরিপূর্ণ লোকাকীর্ণ স্থানও কোথাও দৃষ্টি করি নাই। এই অসীম ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে এক পরম শোভাকর অপূর্ব পর্বত

দর্শন করিলাম। সে পর্বত এত উচ্চ যে তাহার শিখর নভোমণ্ডলস্থ মেঘসমুদায় ভেদ করিয়া উঠিয়াছে।' —চারুপাঠ

॥ প্যারীচাঁদ মিত্র ॥ বাঙলা গদ্য ও বাঙলা গদ্যসাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের [১৮১৪-১৮৮৩] লেখনভঙ্গির প্রভাবের স্বাক্ষর মুদ্রিত রয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি খ্যাতিমান লেখক আড়ম্বরমুক্ত সাধুগদ্যরীতির প্রবর্তন করলেও তাতে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য ছিল। প্রাকৃতমূলক, দেশজ কিংবা বিদেশি শব্দ তাঁরা কদাচিৎ ব্যবহার করতেন। এর ফলে সাহিত্যের ভাষা ক্রমেই মুখের ভাষা বা দৈনন্দিন কথাবার্তার ভাষা থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়তে লাগল। অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষের পক্ষে বিদ্যাসাগরাদির ব্যবহৃত সাধুভাষা সুবোধ্য ছিল না।

তৎকালীন সাহিত্যের এই সীমাবদ্ধতা দেখে দেশের ইংরেজিশিক্ষিত কয়েকজন ব্যক্তি বাঙলা গদ্যকে ভিন্ন খাতে—একটি নতুন পথে—চালাতে যত্নবান হলেন। এঁদের মধ্যে সেকালের Public Library-র [পরে Imperial ও National Library] গ্রন্থাগারিক ও সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তিনি তাঁর বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় 'মাসিক পত্রিকা' নামে এক কাগজ বার করলেন [১৮৫৪]। কাগজটির গোড়ায় প্রতি সংখ্যায় লেখা থাকত: 'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে; যে-ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।' কথাগুলি আমাদের গদ্যরচনায় অভিনবত্বের প্রতি ইঙ্গিত করছে। ক্রিয়াপদে মোটামুটি সাধুরূপ রেখেও প্রচুর ঘরোয়া কথাবার্তার ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহারে 'মাসিক পত্রিকা'-র ভাষা নতুন পথ দেখাল। এই ভাষাতেই প্যারীচাঁদ মিত্র—টেকচাঁদ ঠাকুর এই ছদ্মনামে—লিখলেন 'আলালের ঘরের দুলাল'। বইটি ঠিক উপন্যাস নয়, কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত নক্শাজাতীয় রচনা। প্যারীচাঁদের ব্যবহৃত ভাষা ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তির ও স্ত্রীলোকদের কাছে খুব সমাদর পেল।

'আলালের ঘরের দুলাল' পুস্তকাকারে আত্মপ্রকাশ করলে সর্বত্র একটা আলোড়নের সৃষ্টি হল, এবং এর অব্যবহিত পরবর্তীকালে বাঙলা লেখ্য গদ্য অতিক্রত রূপান্তরিত হতে লাগল। সাধুভাষার শ্লথগতির মধ্যে বেগের সৃষ্টি হল, পূর্বে যে-ভাষা ছিল অংশত কৃত্রিম তা অচিরে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। মৌখিক ভাষার মাধ্যমেও যে সাহিত্য নির্মিত হতে পারে এবং সাহিত্যিক রস পরিবেশন করা যায় তা প্রথম প্রমাণ করলেন প্যারীচাঁদ মিত্র।

ইতঃপূর্বে উইলিয়ম কেরি ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার তাঁদের বইতে চলিত ভাষা ব্যবহার করলেও কতকগুলি কারণে তাতে এই ভাষার সহজ সৌন্দর্য ফোটেনি, সেখানে সাহিত্যরসের স্ফুরণ ঘটেনি—এতে সাফল্য অর্জন করলেন

প্যারীচাঁদ। স্বীকার করতেই হবে, এটি তাঁর খুব বড়ো একটি কীর্তি। চলিত ভাষাকে রসসৃষ্টির কাজে লাগিয়ে তিনি বাঙলা সাহিত্যকে উন্নতির পথে এগিয়ে দিলেন। ১৮৫৮ সালে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর প্রকাশকে উল্লেখ্য একটি ঘটনা বলা যেতে পারে।

পরবর্তী কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক তাঁদের সাহিত্যকর্মে যে-ভাষা ব্যবহার করেছেন তার মূলে প্যারীচাঁদের প্রবর্তিত গদ্যরীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব সক্রিয় রয়েছে। নিঃসংশয়ে বলা যায়, এই কীর্তিমান ব্যক্তিটির কাছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ নিশ্চিতভাবে ঋণী, প্রমাণ—মধুসূদন-দীনবন্ধুর হাস্যরসাত্মক নাটকগুলি, কালীপ্রসন্নের নক্শাজাতীয় রচনা। প্যারীচাঁদ অবশ্য আদর্শগদ্যের স্রষ্টা নন, শিষ্ট কথ্য ভাষার রীতি তিনি আবিষ্কার করেন নি। কিন্তু দ্রুতগতি, হাল্কা, সর্বজনবোধ্য, স্বচ্ছন্দ গদ্য লিখে তিনি আমাদের একটি নতুন সাহিত্যরীতির সন্ধান দিলেন। পরোক্ষভাবে বঙ্কিম নিজেও এই স্টাইলের প্রভাবে এসেছেন।

•

প্যারীচাঁদ চলিত ভাষাকেই যে শুধু কাজে লাগিয়েছেন তা নয়, সাধু গদ্যরীতিও তাঁর হাতে নতুন রূপ পেয়েছে। তৎকালপ্রচলিত সাধুভাষার সংস্কারসাধনেও তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। 'আলাল'-এর পর প্যারীচাঁদ যে-বইগুলি লিখেছেন, যেমন—'যৎকিঞ্চিৎ', 'অভেদী', ইত্যাদি—তাতে তিনি ক্রমশ সাধুভাষার দিকে ঝুঁকেছেন। বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমারের ব্যবহৃত সাধুভাষার সঙ্গে এর পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে চলিত শব্দ ও প্রাকৃতমূলক শব্দের অকুণ্ঠ প্রয়োগ তাঁর সাধুগদ্যরীতির লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। এতে সংস্কৃতসাহিত্যের অলংকার ও জটিল বাক্য যথাসম্ভব বর্জিত হয়েছে, ফলে প্যারীচাঁদের ভাষা এক নতুন শক্তি লাভ করছে। তবে তাঁর ভাষার একটি ত্রুটি হল ক্রিয়াপদে সাধু ও কথ্যভাষার মিশ্রণ। একে 'গুরুচণ্ডালি'-দোষ বলা যেতে পারে। দোষযুক্ত হলেও এতে সাহিত্যসৃষ্টির তেমন কোনো বাধা হয়নি। প্যারীচাঁদ যে বাঙলা গদ্যের বড়ো একজন সংস্কারক এতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্যারীচাঁদের ভাষার নিদর্শন :

॥ ১ ॥ 'ঠকচাচা চৌকির উপর থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়িয়া বলিলেন—মোর উপর এতনা টিটকারী দিয়া বাত হচ্ছে কেন? মুই তো এ সাদি করতে বলি—একটা নামজাদা লোকের বেটি না আনলে আদমির কাছে বহুত সরমের বাত, মুই রাতদিন ঠেওরে ঠেওরে দেখেছি যে, মণিরামপুরের মাধববাবু আচ্ছা আদমি—তেনার নামে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়…'

—'আলালের ঘরের দুলাল'

॥২॥ মধ্যাহ্ন উপস্থিত। রবির প্রখর উত্তাপ। মাঠে গোপালেরা গরু চরাইতেছে। হলের বেগে মৃত্তিকা ভেদ হইতেছে। গো-সকল তৃষ্ণাতে আতুর। গোপাল লাঙ্গুল মুচড়াইয়া লাঙ্গল চালাইতেছে। আপন লাভ জন্য পশুদিগের প্রতি মনুষ্য সর্বদা দয়াহীন হইয়া থাকে।

॥৩॥ 'ভবশঙ্কর। আরে বলা—বলা—বলা।
বলারাম চাকর। আজ্ঞে, আজ্ঞে।
ভবশঙ্কর। আরে বেটা! পাঁচ ডাকের পর আজ্ঞে। নীচে গিয়া দেখ দেখি হানুপ আসিয়াছে কিনা। আর, চারপাঁচ বোতল ব্রাণ্ডি ও বরফ শীঘ্র আন।
বলরাম। হানিপ ঝুড়ি ঢাকা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে; আর মোশাই কাল বলেছিলি যে হানিপ দাড়ি কামায়ে মালা পরে এস্‌বে—সে সব করেছে—এক্ষ তাকে গোঁসাই গোবিন্দের মত দেখাচ্ছে।' —'মদ খাওয়া বড় দায়'

॥ ভূদেব মুখোপাধ্যায়॥ বাঙ্‌লা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারের অন্যতম হলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় [১৮২৫-১৮৯৪]। আমাদের প্রবন্ধসাহিত্যকে উন্নতির পথে তিনি অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছেন। যে-সময়ে পাশ্চাত্যশিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য ধ্যানধারণার প্রভাব বাঙ্‌লাদেশে ব্যাপক বিস্তারলাভ করছিল সেই সময়ে ভূদেবের আবির্ভাব। তদানীন্তন বিখ্যাত হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন তিনি। য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এলেও বাঙালির সমাজজীবনে তার নির্বিচার অনুকরণকে ভূদেব সমর্থন জানাতে পারেন নি। হিন্দুর সামাজিক আচারপ্রথা, হিন্দুর জীবনাদর্শ ও ধর্মাদর্শের বিষয়ে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাই বলে তাঁকে অতীতাশ্রয়ী সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীনপন্থীর পর্যায়ে ফেলা যায় না। কারণ, ইংরেজিশিক্ষা তাঁকে যুক্তিবাদী, সংস্কারমুক্ত করে তুলেছিল। তাঁর জীবনের মহৎ লক্ষ্য ছিল যুক্তির কঠিন ভিত্তির ওপর হিন্দুর জাতীয় ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রাচীনের প্রতি অন্ধ-আনুগত্য ভূদেবের ছিল না, আবার, উদ্দাম নবীনত্বপ্রয়াসকেও তিনি জাতীয় জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করতেন। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানেরই প্রয়াসী ছিলেন তিনি। বলিষ্ঠ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন ভূদেব।

সৃষ্টিমূলক সাহিত্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেও ভূদেব নিজের লেখনীকে ভিন্নমুখে পরিচালিত করলেন। অনেকে তাঁকে বাঙ্‌লা ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্রষ্টা বলে অভিহিত করেছেন। একথার মধ্যে সত্য থাকলেও আমরা সকলে প্রবন্ধকার ভূদেবকেই চিনি। অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন, তাঁর অনেকগুলি বই 'প্রবন্ধ'

নামে চিহ্নিত—'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', 'বিবিধ প্রবন্ধ'। এই প্রাবন্ধিক ভূদেব বাঙলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দাবি করতে পারেন। এখানে ভূদেবের লেখা প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ঠিক আমাদের আলোচ্য নয়, আলোচ্য হল প্রবন্ধগুলির গদ্যরীতি। অক্ষয়কুমারের প্রবর্তিত প্রবন্ধরীতির ধারা ভূদেবের হাতে লক্ষণীয় পূর্ণতা পেয়েছে। যে-ভাষা জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনের সত্যকার বাহন, যে-ভাষা বিবিধ চিন্তাভারবহনে সক্ষম, ভূদেব সেই ভাষার চর্চা করেছিলেন। স্বচ্ছতা ও প্রাঞ্জলতা তাঁর রচনার সবচেয়ে বড়ো গুণ। গদ্য লিখতে বসে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি, ভাবাবেগে উচ্ছল হয়ে ওঠেননি, কোথাও শব্দাড়ম্বর দেখাননি। প্রয়োজনবোধে তাঁর ভাষা কখনো সংস্কৃতানুগ, কখনো তদ্ভবশব্দবহুল। কিন্তু সর্বত্র তা ক্ষিপ্রচারী, সাবলীল, প্রসাদগুণবিশিষ্ট। ভূদেবের চিন্তাক্রম অতিশয় স্পষ্ট, বক্তব্য যুক্তিনিষ্ঠ, প্রকাশভঙ্গি ঋজু। এক কথায়, তিনি আদর্শ গদ্য লিখে গেছেন, কাব্যিকতার দিকে ঝুঁকে নিজের গদ্যরচনাকে স্বধর্মচ্যুত কখনো করেননি।

প্রধানত লোকশিক্ষামূলক বলে সাহিত্যিক সৌরভ ভূদেবের প্রবন্ধনিচয়ে তেমন চোখে পড়ে না। বক্তব্যকে সরস করে তোলার জন্যে যেসব কলাকৌশলের প্রয়োজন তার বিষয়ে তিনি খুব মনোযোগী হননি। তবু স্বীকার করতে হয়, সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষমতা তাঁর ছিল। এর নিশ্চিত প্রমাণ মেলে ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামে গ্রন্থটির ভাষায়। বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' আখ্যায়িকায় ভূদেবের ব্যবহৃত ওই ভাষার যে প্রভাব পড়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। মনে রাখতে হবে, ভূদেব বঙ্কিমের পূর্ববর্তী গদ্যলেখক। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নয়, সেকালের আরও অনেক লেখকের ওপর তিনি প্রভাব বিস্তার করেছেন—জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গদ্যরীতি তাঁদের কাছে অপরিহার্য বলে মনে হয়েছে। ভূদেবের এই কৃতিত্ব অবশ্যই স্মর্তব্য।

ভূদেবের গদ্যরীতির কিঞ্চিৎ নমুনা :

॥ ১ ॥ "ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ" অর্থাৎ বিদ্যাভ্যাসই বিদ্যার্থীদিগের প্রধান তপস্যা। যিনি এই কথার তাৎপর্য্য অবগত হইয়াছেন, তিনি কাহারো পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা অপ্রয়োজনীয়বোধ করেন না। তিনি জানেন, বিদ্যাভ্যাসের অন্য ফল আর যত হউক বা না হউক, তদ্দারা মানসিক বৃত্তিসকলের অনেক সদ্‌গুণ জন্মে—তিনি জানেন যে, অধ্যয়নরূপ তপস্যা দ্বারা মনের চাঞ্চল্যদমন, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, পরোক্ষজ্ঞান, এবং পরিণাম-দর্শন প্রভৃতি গুণসকল অবশ্য কিঞ্চিন্মাত্রও বর্দ্ধিত হয়।" —'শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব'

॥ ২ ॥ বস্তুতঃ, পরমাণুর উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই। যে-দ্রব্য মাটিতে পড়িয়া পচিতেছে তাহার পরমাণু-সমস্ত কতক বায়ুতে আর কতক পৃথিবীতে থাকে। আবার, সেই সকল পরমাণুই সংযুক্ত হইয়া অন্য দ্রব্যে মিশ্রিত হয়। যে-স্থলে শবদাহ হয় সেই স্থানের

মৃত্তিকাতে ঐ শব-শরীরের কতক পরমাণু থাকে—ঐ স্থানে যে-উদ্ভিজ্জ জন্মে তাহার মূলদ্বারা ঐ সকল পরমাণু কতক উঠিয়া আইসে, এবং তদ্দ্বারা উদ্ভিজ্জশরীর সৃষ্ট হয়।'

—'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান'

॥ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ মনীষী বঙ্কিমের বিপুল সাহিত্যকীর্তির পরিচয় গ্রহণের স্থান এ নয়। এখানে আমরা বাঙ্‌লা গদ্যের নির্মাতা, ভাষাশিল্পী বঙ্কিমের দিকেই তাকাব।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-গোষ্ঠীর লেখকের হাত দিয়ে যে-বাঙ্‌লা গদ্য প্রথম বেরুল তা বিবর্তনের ধারাপথ বেয়ে—রামমোহন-বিদ্যাসাগর-প্যারীচাঁদ-অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথ-ভূদেবের দ্বারা সযত্নে লালিত ও পুষ্ট হয়ে—বঙ্কিমের হাতে বিশিষ্ট এক শিল্পমূর্তি পরিগ্রহ করল। বঙ্কিম আমাদের ভাষার বন্ধনমোচন করলেন, তার দেহপ্রাণের অসাড়তা ঘুচালেন, তার স্পর্শবোধশক্তি বাড়িয়ে দিলেন। ফলে সে ভাবজগৎ ও চিন্তার জগতের বহুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে অবাধ সঞ্চরণের ক্ষমতা পেল। মোটামুটি বলা যায়, ইতঃপূর্বে বাঙ্‌লা গদ্য তথ্যপ্রকাশের বাহন ছিল, এখন তা উত্তম সাহিত্যনির্মাণেরও উপযোগী হয়ে উঠল। বাঙলা গদ্যের এই রূপান্তর-সাধনে মহৎ শিল্পী বঙ্কিমের কৃতিত্ব অসামান্য।

বঙ্কিমপ্রবর্তিত গদ্যরীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কী তা আমাদের বুঝে নিতে হবে। প্রাক্-বঙ্কিমযুগে গদ্যরচনার দুটি রীতি বা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল—পণ্ডিতী রীতি ও আলালী রীতি। একদিকে বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা', তারাশংকরের 'কাদম্বরী' ইত্যাদি; অন্যদিকে, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'। বিদ্যাসাগর ও তারাশংকরের প্রযুক্ত ভাষার সঙ্গে প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের প্রযুক্ত ভাষার পার্থক্য দুস্তর, এঁদের অবলম্বিত রীতি পরস্পর ভিন্নমুখী।

বঙ্কিম এই রীতির কোনোটিকেই আদর্শগদ্যরীতি বলে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। পণ্ডিতী রীতির ত্রুটি এর সংস্কৃতানুকারিতা, এ ভাষা সর্বজনের বোধ্য নয়; আলালী রীতি বঙ্কিমের প্রশংসা পেলেও, তাঁর, মতে, এ ভাষা অপরিমার্জিত, নিস্তেজ, দুর্বল—নিছক কথ্যভাষা সাহিত্যের ভাষা হতে পারে না, উভয়ে স্বতন্ত্র থাকবেই। তাহলে প্রশ্ন, কাকে আমরা আদর্শ-ভাষা বলে স্বীকৃতি জানাব? এ প্রশ্নের উত্তর বঙ্কিম নিজেই দিয়েছেন: 'এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ-বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।' কাজটি শুনতে সহজ কিন্তু বস্তুত অতিশয় দুরূহ। এই দুরূহ কাজ যিনি সম্পাদন করবেন তাঁর উন্নত শিল্পবোধ থাকা চাই, তাঁকে হতে হবে উচ্চতর সৃজনীপ্রতিভার অধিকারী। খুব উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন বঙ্কিম, তাঁর সাহিত্যনির্মাণক্ষমতা ছিল প্রশ্নাতীত—অশেষ প্রযত্নে বাঙ্‌লা ভাষার এক অভিনব

মূর্তিগঠন করলেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বপ্রচলিত কোনো পথ ধরে চললেন না, নিজস্ব পথ কেটে এগিয়ে গেলেন। এতকাল পরে আদর্শ-ভাষার সৃষ্টি হল। বাঙ্‌লা গদ্যরচনায় সংস্কৃতজ ও খাঁটি বাঙ্‌লা শব্দ কী পরিমাণে গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় বঙ্কিম তার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন।

এই নির্দেশ বা আদর্শের অনুসৃতি আমরা দেখলাম তাঁর নিজের রচনায়। বাঙ্‌লা গদ্য সম্বন্ধে আপন ধারণাটি বঙ্কিম আমাদের জানিয়েছেন। তা হল, ভাষা সহজবোধ্য হবে, বিষয়ানুগ হবে, এতে সরলতা ও স্পষ্টতা থাকবে, থাকবে সৌন্দর্যের স্পর্শ। এর জন্যে, প্রয়োজনমতো, গুরু হোক লঘু হোক, যে-কোনো বাগ্‌ভঙ্গির আশ্রয় নিতে হবে, নিঃসংকোচে যে-কোনো ভাষার শব্দ গ্রহণ করতে হবে. কেবল অশ্লীল শব্দই পরিহার্য। এই হল বাঙ্‌লা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। বঙ্কিমের মন ছিল সংস্কারমুক্ত, নতুনকে স্বাগত জানাতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। তাই, অল্পকালমধ্যেই ভাষার একটি নতুন রীতি প্রতিষ্ঠা করতে তিনি সমর্থ হলেন। এই রীতিটিই 'বঙ্কিমী রীতি' নামে পরিচিত।

আদর্শ-গদ্যের রূপটি চিনে নিতে বঙ্কিমের কিছুটা সময় লেগেছিল। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার [১৮৭২] পূর্ব পর্যন্ত তাঁর রচনা অনেকটা সংস্কৃতানুসারীই ছিল। 'বঙ্গদর্শন'-পর্ব শুরু হলে বঙ্কিমচন্দ্র ভাষার ক্ষেত্রে নিজস্বতার পরিচয় দিলেন। 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদনার পূর্বে আর পরে বঙ্কিম যে-গদ্য লেখেন তার মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর বঙ্কিম সংস্কৃতের মোহ কাটিয়ে উঠেছেন, আবশ্যকবোধে বাঙ্‌লা তদ্ভব শব্দের দ্বারস্থ হয়েছেন, কখনো অলংকারসমৃদ্ধ, কখনো অলংকারবর্জিত, বৈচিত্র্যময় হ্রস্ব ও দীর্ঘবাক্য প্রয়োগ করেছেন। তিনি সর্বদা ও সর্বথা লক্ষ্য রেখেছেন বক্তব্যের সুস্পষ্টতা, সুবোধ্যতা আর বাচনভঙ্গির রম্যতার দিকে। এতসব বস্তু মিলে তাঁর গদ্যে শোভা ও প্রাণশক্তির সঞ্চার করেছে।

বঙ্কিমরচনাবলীকে দুভাগে ভাগ করা যায়—[১] উপন্যাসসাহিত্য, [২] প্রবন্ধ-সাহিত্য। এই দুই শ্রেণীর রচনাবলীর মধ্যে মানবজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রায় সর্বপ্রকার বিষয়বস্তুই বিধৃত হয়েছে। ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্যসমালোচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি যেমন অবলীলায় সঞ্চরণ করেছেন, তেমনি আবার মানবমনের সূক্ষ্মজটিল ক্রিয়াকলাপ ও গতিবিধি তাঁর উপন্যাস-সাহিত্যে সহজ স্থান পেয়েছে। ফলে বঙ্কিমের রচনায় বাঙ্‌লা গদ্য সর্বত্র বিচরণ করবার এক অবাধ অধিকার পেল। কাব্যধর্মী এবং যুক্তিবাহী ও মননপ্রধান, উভয় প্রকার গদ্যে তিনি লেখনী চালিয়েছেন। উপন্যাসে যে-রীতির গদ্য তিনি লিখেছেন তাঁর প্রবন্ধনিবন্ধে ব্যবহৃত গদ্যের প্রকৃতি তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'কমলাকান্তের দপ্তর' আর উপন্যাসাবলীতে বঙ্কিমের গদ্যরীতি কাব্যধর্মিতার দিকে ঝুঁকেছে ; 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব', 'সাম্য', 'বিজ্ঞানরহস্য' ইত্যাদিতে যুক্তিধর্মিতার দিকে। তথ্য-তত্ত্ব-তর্ক-যুক্তির ভাষা আর সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি প্রকাশের ভাষা যে এক নয় তা বঙ্কিম ভালোরকমই জানতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকীর্তি সকলের সুবিদিত। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রবন্ধসাহিত্যেও তাঁর প্রতিভার দান অল্প নয়। বঙ্কিমের লিপিচাতুর্যেই বাংলা প্রবন্ধরচনা খাঁটি সাহিত্যকর্ম হয়ে উঠল। যথার্থ সাহিত্যরসবাহী প্রবন্ধ তাঁর পূর্বে কদাচিৎ রচিত হয়েছে। কেবল জ্ঞানবিতরণ নয়, উপদেশদান নয়, বঙ্কিম স্বকৃত প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে আমাদের রসপিপাসাও নিবৃত্ত করেছেন। যে-সব প্রবন্ধে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা মুখ্য সেখানে বঙ্কিম এক মনোরম শিল্পলোকের নির্মাতা। এ জাতীয় লেখায় তাঁর বাক্যে কোথাও বুদ্ধির চমক, কোথাও হৃদয়াবেগের স্নিগ্ধ লাবণ্য; কোথাও তিনি ভাবুক, কোথাও নিপুণ পরিহাসরসিক। কেবল উপন্যাসে নয়, বঙ্কিমের প্রবন্ধ নিচয়েও তাঁর ব্যক্তিমানস ও শিল্পীমানস দুয়েরই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসকার বঙ্কিম যেমন অবিস্মরণীয়, তেমনি, প্রবন্ধকার বঙ্কিম। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যকর্ম ও গদ্যরীতির প্রভাব অসামান্য।

বঙ্কিমের রচনার কিছু নমুনা:

॥ ১ ॥ '৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমাণ অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।...প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্যাস্ত হইল। ক্রমে নৈশগগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে অশ্বচালনা অতি কঠিন হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোনমতে চলিতে লাগিলেন।'

—'দুর্গেশনন্দিনী'

॥ ২ ॥ 'জল অশ্রান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ-বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ-বা তামাক খাইতেছে, কেহ-বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষকে লাঙল চষিতেছে, গোরু ঠেঙাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকে কিছু কিছু ভাগ দিতেছে।'

—'বিষবৃক্ষ'

॥ ৩ ॥ 'শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। সর্বসুখী, সর্বগুণযুক্ত কি সকল মনুষ্য হইতে পারে?

গুরু। কখনো হইতে পারিবে কিনা সেকথা এখন তুলিয়া কাজ নাই। সে অনেক বিচার তবে ইহা স্বীকার করিব যে, এ পর্যন্ত কেহ কখনো হয় নাই। আর, সহসা কেহ হইবার সম্ভাবনাও নাই।'

—মনুষ্যত্ব কি: 'ধর্মতত্ত্ব'

॥ ৪ ॥ 'মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ—সকলেরই এক-একটি বহ্নি আছে। সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে। কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। আবার, সংসার কাচময়—কাচ না থাকিলে সংসার এতদিনে পুড়িয়া যাইত।···বহ্নি কি, আমরা জানি না। তবু সেই অলৌকিক অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না তো কি?
—'কমলাকান্তের দপ্তর'

॥ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ বঙ্কিম-রবীন্দ্রের পর বাঙ্‌লাসাহিত্যে আর একজন প্রথমশ্রেণীর উজ্জ্বলখ্যাতিসম্পন্ন লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী [১৮৬৪-১৯১৯]। প্রবন্ধরচনায় তিনি অদ্ভুত লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র এবং বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। সুতরাং এই শাস্ত্রটির প্রতি তাঁর অতিমাত্রিক অনুরাগ থাকবে এ-ই স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের ভূমিতে রামেন্দ্রসুন্দরের সঞ্চরণ নির্বাধ হলেও, আরো বহুবিধ বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসা সদাজাগ্রৎ ছিল। এককথায় বলা যায়—তিনি সর্বত্রচারী ছিলেন। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, ইত্যাদি বিষয়ের অনুরাগী ছিলেন তিনি, এবং তাঁর অধ্যয়নের পরিধি ছিল বিস্তৃত। মনস্বী রামেন্দ্রসুন্দর দুরূহ বিষয়কে প্রাঞ্জল ভাষায় সরস করে বাণীবদ্ধ করতে পারতেন।

রামেন্দ্রসুন্দর শুধু বিজ্ঞান-আলোচনায় কৃতিত্ব দেখাননি, দর্শন এবং সাহিত্যালোচনাতেও সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। তাঁর রচনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তৎকালীন খ্যাতিমান সমালোচক সুরেশ সমাজপতি বলেছেন: 'দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা—মানবচিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্রসঙ্গমে যুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছিল।' কথাগুলিতে অতিশয়োক্তি নেই। সত্যিই, রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের প্রবন্ধসাহিত্যের একজন দিক্‌পাল। তাঁর প্রবন্ধের বাহন মুখ্যত সাধুভাষা অথচ তা সারল্য-সুষমায় মণ্ডিত, প্রসাদগুণে উপাদেয়—স্বচ্ছন্দ, নমনীয়, পরিচ্ছন্ন, বাণীবিন্যাসে সংহত। কোনো গম্ভীর বিষয়ে আলোচনার মধ্যেও [কী দর্শন, কী বিজ্ঞান, কী সৌন্দর্যতত্ত্ব, কী সাহিত্যের আলোচনাকালে] কোথাও কৌতুক, কোথাও পরিহাসরসিকতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রচনাকে তিনি সরস করে তুলেছেন। পাণ্ডিত্য ও প্রকাশসৌষ্ঠবের এমন সুন্দর একত্রসমাবেশ খুব কম প্রবন্ধকারের লেখায় দেখা যায়।

রামেন্দ্রসুন্দরের আলোচ্য বিষয়বস্তু বহুবিচিত্র। তাঁর গ্রন্থগুলির নাম এই বিচিত্রতার দিকে ইঙ্গিত করে; যেমন—'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা', 'চরিতকথা,' 'শব্দকথা', 'যজ্ঞকথা', 'জগৎকথা', 'বিচিত্র প্রসঙ্গ', 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' ইত্যাদি। বিষয়গুলি দুরূহ, সন্দেহ নেই। কিন্তু রচনারীতির গুণে এগুলি উজ্জ্বল স্পষ্টতা পেয়েছে, সর্বত্র অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য দেখা গেছে। আরো বড়ো কথা, তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধকর্ম সাহিত্যগুণোন্নত।

রামেন্দ্রসুন্দর সাধুগদ্যের চর্চাই করেছিলেন বেশি। কিন্তু তাঁর চলতি গদ্যে লেখা রচনাও কী সুন্দর! এর গতি সাবলীল অথচ এতে কেমন একটা গাম্ভীর্য রয়েছে। চলতি ভাষা-আশ্রয়ী 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রামেন্দ্রসুন্দরের উল্লেখযোগ্য একটি রচনা। দেশানুরাগী বাঙালিসাধারণ অবশ্যই এর সঙ্গে পরিচিত।

এই লেখকের রচনার কিঞ্চিৎ নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

॥ ১ ॥ 'জননী বসুন্ধরার বয়স নিরূপণ করিতে গিয়া মোটের উপর আন্দাজে নির্ভর করিতে হয়। কেননা, জননী ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাঁহার পুত্রকন্যার মধ্যে কাহারও উপস্থিতির সম্ভাবনা ছিল না, সেইজন্য জন্মকালনির্ণয়োপযোগী কোষ্ঠীর একান্ত অভাব। তথাপি যে জন্মকালনির্ধারণ একেবারে অসম্ভব, তাহা স্বীকার করিয়া আপন অক্ষমতা প্রদর্শনে বড়ই লজ্জা বোধ হয়।'—'প্রকৃতি'

॥ ২ ॥ 'প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না। কাজেই যদি কেহ আসিয়া বলে, অমুকের গাছের নারিকেল বৃন্তচ্যুত হইবামাত্র ক্রমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে, লোকটা মিথ্যাবাদী; কেহ বলিবে পাগল। কেহ বলিবে, লোকটা গাঁজা খায়; এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ন নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি বলিবেন, হইতেও পারে; তবে ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল।' —'প্রকৃতি'

॥ ৩ ॥ 'বন্দেমাতরম্। বাঙলা নামে দেশ। তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে এই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ-কাশী পার হয়ে মা পূর্ববাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলাদেশ জুড়ে বসলেন।' —'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'

সপ্তম অধ্যায়

কবি, পাঁচালি ও যাত্রা

॥ কবিগান ॥ বাঙ্‌লা গানের দেশ। কত বিচিত্র রীতির গান এদেশে উদ্ভূত হয়েছে, যেমন—কীর্তন, বাউল, শ্যামাসংগীত, ভাটিয়ালি, সারি গান, গাজির গান, জারি গান, টপ্পা প্রভৃতি। এসকল সংগীত ছাড়া আর-এক ধরণের গান আঠারোর শতকে সারা বাঙ্‌লা জুড়ে নিজ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং একশতাব্দী ধরে আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল—এর নাম কবিগান। যাঁরা কবিগান গাইতেন তাঁদের 'কবিওয়ালা' বলা হত। ভাব এই যে, এঁরা যথার্থ মৌলিক কবি নন, কবি-ব্যবসায়ী। প্রথমত, এঁরা পূর্ব পূর্ব পদাবলী বা আগমনীর কবিদের রচনার অনুসরণ বা অনুকরণ করে কবিতা লিখতেন। দ্বিতীয়ত, এঁরা 'কবি' গেয়ে দুপয়সা উপার্জন করতেন। তবে এদের একটা শক্তির দিক এই ছিল যে, সভাস্থলে এঁরা মুখেমুখেই কবিতা রচনা করতে বা গান বাঁধতে পারতেন। আর, এঁদের সম্বল ছিল শব্দচাতুর্য, যার দ্বারা অনায়াসেই তৎকালীন শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে পারতেন।

'কবিগান' তখনকার সমাজের একটি বিশেষ সৃষ্টি। তখন উত্তম কবির আবির্ভাবের যুগ কেটে গেছে। ভারতচন্দ্র অস্তমিত হয়েছেন। রাষ্ট্রে এবং সমাজেও একটা অনিশ্চয়তা ও শৃঙ্খলাহীনতা ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোম্পানির প্রসাদপুষ্ট শহরঅঞ্চলের কতিপয় ব্যক্তি অথবা পল্লীঅঞ্চলের ভূম্যধিকারিগণ সমাজের নেতা হয়েছেন। উচ্চতর সাহিত্যের আদর্শ এদের চিত্তে ছিল না। এঁরাই কবিওয়ালাদের উৎসাহদাতা হয়েছিলেন।

কবিওয়ালাদের কেউ কেউ স্বাভাবিক কবিত্বশক্তিসম্পন্ন হলেও তাঁদের কবিত্ব-প্রকাশের অনুকূল অবস্থা তখন ছিল না। বিশেষত, 'কবির লড়াই' বা দুইদল কবির মধ্যে জয়পরাজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তখন এরূপ ব্যাপক হয়ে পড়েছিল যে, ভালো কিছু রচনা করার প্রবৃত্তিও দূরীভূত হয়েছিল। দুই দলে লড়াই করতে গিয়ে শ্রোতৃবৃন্দের নিকট হতে বাহবা এবং পুরস্কার এবং পুনরাগমনের বায়না লওয়ার দিকেই এঁদের ঝোঁক থাকত বেশি। আর, সেইরূপ শ্রোতাদেরই মনোরঞ্জন এঁদের করতে হত যাঁরা সাহিত্য অপেক্ষা শব্দচাতুর্য, রসরুচি অপেক্ষা কুরুচি ও আদিরসকেই মর্যাদা দিতেন বেশি। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির হাওয়া বইলে এবং ইংরেজিশিক্ষার বিস্তার হলে এবং বিশেষত কবি শ্রীমধুসূদন অভিনব কাব্যের পত্তন করলে ক্রমশ কবিওয়ালাদের সমাদর কমে যায়। কবির দল প্রায়লুপ্ত, কেবল পল্লীঅঞ্চলে কেউ কেউ আজো এঁদের ধারা রক্ষা করে আমাদের সেই অতীত সাহিত্যিক অধ্যায়টির যৎসামান্য প্রত্যক্ষ পরিচয় বহন করছেন।

কবিওয়ালাদের মধ্যে কবিত্বে সর্বাপেক্ষা প্রশংসা অর্জন করেছিলেন রাম বসু। তাঁর 'সখীসংবাদ' ও 'আগমনী গান' প্রসিদ্ধ। কবিওয়ালা রাম বসু অনুপ্রাসের ভক্ত ছিলেন, তবু তাঁর কাব্যে সহজ অনুরাগের স্পর্শ দুর্লভ নয়। এঁর বাস ছিল কলিকাতার নিকটবর্তী সালকিয়া অঞ্চলে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই এর সঙ্গীত-প্রতিভার স্ফূর্তি হয়। রাম বসু ছাড়া হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, আণ্টুনি ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা প্রভৃতি তখনকার বিখ্যাত কবিওয়ালা ছিলেন।

এঁদের মধ্যে আণ্টুনি ফিরিঙ্গির খুব নাম। আণ্টুনি জাতিতে পর্তুগীজ ছিলেন। কিন্তু হিন্দুর সঙ্গে মিশে তিনি হিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন। বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব করতেন। এই আণ্টুনি সাহেবের সঙ্গে বিপক্ষ-দলের লড়াই সম্পর্কে অনেক মজার কথা আছে। সাহেব হয়ে তিনি বাঙালি সাজলেন কেন, খ্রীস্টান হয়ে দুর্গার আরাধনা করেন কেন—এ হল বিপক্ষদলের প্রধান আক্রমণের বিষয়। প্রতিপক্ষদলের নেতা ঠাকুরদাস সিংহ আণ্টুনিকে প্রশ্ন করলেন :

> বলহে আণ্টুনি, আমি একটা কথা জানতে চাই—
> এসে এদেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই।

তিনি এই আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিলেন ঠাকুর সিংহকে নিম্নলিখিতভাবে শ্যালক প্রতিপন্ন করে :

> এই বাঙলায় বাঙালির বেশে আনন্দে আছি।
> হয়ে ঠাকুরে সিংহের বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি॥

রাম বসু প্রতিপক্ষ হয়ে আণ্টুনিকে কটাক্ষ করলেন :

> সাহেব, মিথ্যা তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি
> ও তোর পাদ্রি-সাহেব শুনতে পেলে গালে দেবে চুণকালি

আণ্টুনি উত্তর দিলেন :

> কৃষ্ণে আর খ্রীস্টে কিছু প্রভেদ নাইরে ভাই।
> শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এমন কোথাও শুনি নাই॥

দুর্গাভক্ত আণ্টুনি দুর্গার স্তব গাইলেন :

> যদি দয়া করে তার মোরে এ ভবে, মাতঙ্গি !
> ভজনসাধন জানি না, মা, জেতেতে ফিরিঙ্গি ···
> আণ্টুনি-ফিরিঙ্গি বলে, নিদানকালে, মা,
> দিও চরণ দুখানি, দিও চরণ দুখানি॥

বিপক্ষ কবিওয়ালা গালাগালি করে বললেন :

> যিশুখ্রীস্ট ভজ্‌গে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জেতে।
> তুই জাতফিরিঙ্গি জবড়জঙ্গি পারবি নাক তরিতে॥

কবিগান সম্পর্কে তেমন প্রশংসার কিছু না থাকলেও বলা চলে, এগুলি জনসাধারণের গান বা লোকসাহিত্য, 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতির ন্যায় রাজসভায় শ্রোতব্য

সঙ্গীত নয়। ক্রমে 'তরজা' বলে এক নতুন রীতির সংগীত কবিগানের সঙ্গে মিশে যায়। আর, আখড়াই, হাফ্‌-আখড়াই, খেউড [অশ্লীলতাপূর্ণ সংগীত] প্রভৃতির কিছু কিছু প্রসার হয়।

॥ **পাঁচালি** ॥ অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে বাঙ্‌লাদেশে কবি, টপ্পা, আখড়াই, হাফ্‌-আখড়াই ইত্যাদির মতো আর-এক জাতের সংগীত প্রচলিত ছিল, নাম—'পাঁচালি'। পাঁচালির উদ্ভব কী করে হল, তা সঠিক বলা কঠিন। ডক্টর সুশীলকুমার দে বলেছেন, 'পদচালন' কথা থেকে 'পা-চালি, এবং এই 'পা-চালি' শব্দের রূপপরিবর্তনে 'পাঁচালি' কথার উদ্ভব হয়েছে। তিনি আরও অনুমান করেছেন, 'নাচাড়ী' থেকেই হয়তো "পাঁচালি' কথাটি এসেছে। এও অনুমান, স্থির সিদ্ধান্ত কিছু নয়। নৃত্যগীত এবং আবৃত্তি—এ নিয়েই পাঁচালি। যে সময়কার পাঁচালির কথা আমরা বলছি তখন একজন মূল গায়ক পায়ে নূপুর পরে, হাতে চামর নিয়ে ছড়া কাটতেন এবং গান করতেন। তাঁর পদ্য-আবৃত্তির মধ্যে কিছুটা অভিনয়ের ঢঙ এসে যেত। আদিতে 'পাঁচালির প্রিয়বস্তু ছিল পৌরাণিক কাহিনী, এতে ভক্তিরসের প্রাধান্য। আঠারোর শতকের শেষের দিকে পুরানো 'পাঁচালি' যখন রূপান্তরিত হতে থাকে তখন আধুনিক কাহিনী অবলম্বনে পালা রচিত হতে লাগল।

মনে রাখতে হবে, আগে রামায়ণ-মহাভারত, বিবিধ মঙ্গলকাব্য, সমস্তই পাঁচালির ঢঙে আসরে গান করতে হত এবং এসমস্ত পদ্যরচনার নাম ছিল 'পাঁচালি' যেমন—'ভারত-পাঁচালি, 'রামায়ণ-পাঁচালি'। এ ছাড়া, 'শনির পাঁচালি' 'মনসার পাঁচালি' 'ষষ্ঠীর পাঁচালি' কথার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিশেষ শ্রেণীর 'পাঁচালি' এগুলি নয়। পূর্বেই বলেছি অষ্টাদশ উনবিংশ শতকেই বাঙলা কাব্যে এই শ্রেণীর পাঁচালির আত্মপ্রকাশ।

'পাঁচালি'-রচয়িতাহিসেবে সর্বাধিক খ্যাতি পেয়েছেন দাশরথি রায়। ইনি বর্ধমান জেলার লোক। উনবিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে এর জন্ম। দাশু রায় প্রথমে কবির দলে যোগ দিয়েছিলেন। পরে পাঁচালি লেখায় হাত দেন। গানের অপূর্ব অনুপ্রাসঝংকারে ও সুরমাধুর্যে দাশরথি একদা পশ্চিম বাঙ্‌লাকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। পল্লীঅঞ্চলে এখনো বহুকণ্ঠে দাশুরায়ের গান শুনতে পাওয়া যায়। দাশরথির পরবর্তীকালে যাঁরা পাঁচালি লিখেছেন তাঁদের মধ্যে রসিক রায়, নবীন চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কবিগানের জনপ্রিয়তা কিছুটা কমে এলে পাঁচালি সর্বসাধারণের আকর্ষণের বস্তু হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, বাল্যকালে দাশরথির গান শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন। 'রামায়ণ আবৃত্তি করা হচ্ছে, এমন সময়—আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুয্যে আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালি গাহিয়া বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল,—কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল—অনুপ্রাসের ঝকমকি ও ঝংকারে আমরা 'একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।' ১৮২৫ থেকে ১৮৬০ ইংরেজি সালের মধ্যে 'পাঁচালি' ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল।

॥ যাত্রাগান ॥ 'যাত্রা' শব্দের মূল অর্থ দেবতার উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রকারের জনসম্মেলন। এ থেকে ক্রমশ 'নাটগীত'। সেকালকার যাত্রা এখন আর নেই বললেই চলে। উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় থিয়েটার 'যাত্রা'কে পরাস্ত করে তার স্থান দখল করেছে। প্রাচীন 'যাত্রা' বলতে গানের সমাহারই বুঝাত। কৃষ্ণলীলাই ছিল যাত্রার প্রধান বিষয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ রাধা-কৃষ্ণ-বড়াই, নারদ প্রভৃতি নিয়ে সেকালের যাত্রা বা নাটগীতের আদিরূপটি ফুটে উঠেছে। যাত্রায় উক্তি-প্রত্যুক্তি গানে, ঘটনার ক্রমবর্ণনও গানে, মনের ভাববিশেষ তো গানে বটেই। ক্রমশ স্থানে স্থানে গদ্যে উক্তিপ্রত্যুক্তির সন্নিবেশ হতে থাকে।

প্রাচীন যাত্রা-রচয়িতাদের মধ্যে বিখ্যাত কৃষ্ণকমল গোস্বামী 'স্বপ্নবিলাস', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'রাই উন্মাদিনী' প্রভৃতি পালা রচনা করেন। সেকালে এগুলি—বিশেষত 'রাই উন্মাদিনী'—খুব প্রশংসা পেয়েছিল। কৃষ্ণকমল চৈতন্যপ্রদর্শিত ভক্তিধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বগুলির সঙ্গে অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন। সেকালের যাত্রা-গায়কদিগের মধ্যে গোবিন্দ অধিকারী, বদন অধিকারী, পরমানন্দ অধিকারী, লোচন অধিকারী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাগান সর্বাধিক প্রশংসিত হত। কিছুকাল পূর্বে মতিলাল রায় নামে এক ব্যক্তি প্রাচীন যাত্রাকে থিয়েটারের সঙ্গে মিশিয়ে একপ্রকার আধুনিক যাত্রার সূত্রপাত করেন।

আমাদের একালের নাট্যে প্রাচীন যাত্রাগানের রীতি কিছুপরিমাণে প্রবেশ করেছে। বিশেষত পৌরাণিক নাট্যে যাত্রাগানের প্রভাব প্রবল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবধর্মী সংকেতপ্রধান নাটকগুলির রচনায় প্রাচীন যাত্রারীতি স্থানে স্থানে গ্রহণ করেছেন।

নাট্য ও নাট্যশালা ঃ নাটক রচনার সূত্রপাত

নাটক ও নাট্য শব্দ দুইটির অর্থের পার্থক্য আছে। নৃত্যগীতাদির দ্বারা অভিনীত বস্তুই 'নাট্য'। আর, সংলাপের দ্বারা গ্রথিত, অঙ্কাদির দ্বারা বিভক্ত অভিনেয় বস্তুই 'নাটক'। সংস্কৃত নাটক দৃশ্যকাব্যের দশটি বিভাগের মধ্যে একটি অভিনয়যোগ্য বস্তুর সাধারণ নাম—'রূপক'।

আমরা একটু আগে যাত্রাগানের কথা উল্লেখ করেছি। ওতে কুশীলবগণ কৃষ্ণ, রাধিকা, দূতী, নারদ প্রভৃতির সাজে আসরে অভিনয় করলেও ওই অভিনয় প্রধানভাবে সংগীতেই হত। যাত্রাগানে হৃদয়ভাবেরই খেলা, 'action' বা বাস্তবসংঘাত নেই বললেই চলে। কৃষ্ণ আধখানি বাক্য বলে দীর্ঘ সংগীত ধরলেন—'আজ কেন অঙ্গ গৌর হল রে, ভাবি তাই'। রাধিকার সখী প্রশ্ন করলেন—'এ হাটে কি সুতো পাওয়া যায়'? কৃষ্ণের দূতী সংগীতে উত্তর দিলেন—'এ হাটে বিকায় না অন্য সূত, বিকায় নন্দরাণীর সুত। দর না জেনে, নামটি শুনে, ভয়ে

পালায় রবি-সুত'। এখানে সংঘাত হৃদয়ে-হৃদয়ে অত্যন্ত ধীরগতিতে, বক্তব্য যাহাকিছু তাহা গানে। এ ছাড়া, সঙ্ সেজে সস্তা ধরণের কৌতুকরস [কখনো কখনো কুরুচিপূর্ণ] পরিবেশনও যাত্রার অঙ্গ ছিল।

এই যাত্রাপদ্ধতি থেকে আমাদের আধুনিক নাট্য ও নাটক আসেনি। এসেছে য়ুরোপীয় থিয়েটার থেকে, প্রভাবিত হয়েছে য়ুরোপীয় নাটকের দ্বারা। অবশ্য যাত্রাগানের প্রভাব আমাদের নাটকে ও নাট্যে প্রচুর, কিন্তু তা আমাদের নাটকের মূল নয়। য়ুরোপীয় রীতির রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় দেখে কলিকাতা-অঞ্চলের দর্শকেরা আর পুরানো যাত্রাগান পছন্দ করল না। মধুসূদন তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের ভূমিকায় শিক্ষিতসাধারণের এই মনোভাব জ্ঞাপন করেছেন :

অলীক কুনাট্য-রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

এদেশে প্রথম য়ুরোপীয় নাট্যরীতির প্রচলনে রুশশিল্পী হেরাসিম লেবেডেফের নাম খুব শোনা যায়। তিনিই প্রথম [১৭৯৫-৯৬] দুখানি ইংরেজি প্রহসনের বাঙলা অনুবাদ করিয়ে বাঙালি নটনটীর দ্বারা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়েছিলেন। এদেশের লোকের মনস্তুষ্টির জন্যে অবশ্য তিনি কিছু কৌতুকরস ও গান যোজনা করেছিলেন।

এর অনেকদিন পরে আবার নতুন রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়—১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে নবীনচন্দ্র বসুর গৃহে, 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রাকেই অভিনয়োপযোগী রূপ দেওয়া হয়। তারপর আশুতোষ দেব বা ছাতুবাবুর বাড়ীতে, কালীপ্রসন্ন সিংহের স্বগৃহে, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনীত হয়েছে। এগুলি ১৮৫৩-৫৮ সালের ঘটনা। তখনো বাঙলায় অভিনয়োপযোগী নাটক রচিত হয়নি। কাজ চালানো হত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ দ্বারা। পরে শেক্‌সপীয়রের নাটকের অনুবাদও আরম্ভ হয়।

বাঙলায় সত্যকার নাটক লেখা না হওয়াতে রঙ্গমঞ্চেরও বিস্তৃতি হয়নি। নাট্যশালা ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগে ব্যক্তিবিশেষের গৃহেই নির্মিত হত। অবশ্য কলিকাতায় ইংরেজদের একটি রঙ্গালয় ছিল, কেউ কেউ সেখানে গিয়ে ইংরেজি নাটকের অভিনয় দেখে আসতেন। তার অনুকরণে 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার' নামে আর-একটি ইংরেজি নাট্যশালা দেশীয়দের জন্যে স্থাপিত হয়। এইভাবে অভিনয়ে সাড়া পড়ে গেলে পাইকপাড়া রাজপরিবারের প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিলে পরামর্শ করে বেলগাছিয়ার উদ্যানবাটীতে একটি নাট্যালয় স্থাপন করলেন [১৮৫৮]।

যতদূর মনে হয়, ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে ও জয়রাম বসাকের গৃহে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-এর অভিনয়ই [১৮৫৭] প্রথম মৌলিক বাঙলা নাটকের অভিনয়। কিন্তু বেলগাছিয়া নাট্যশালাই প্রকৃতপক্ষে বাঙলায় নাট্যাভিনয়ের ও নাটক রচনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। ইতিমধ্যে মধুসূদন মাদ্রাজ হতে ফিরে এলে

যেমন—'কল্কি অবতার', 'ব্রাহস্পর্শ', 'পুনর্জন্ম'। কিন্তু লঘু রচনায় সন্তুষ্ট না-হতে পেরে তিনি পৌরাণিক ও ক্রমে ঐতিহাসিক, রোম্যান্টিক ও সামাজিক নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজি নাট্যাদর্শের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, আর, তাঁর চিত্তে ছিল স্বাদেশিকতার প্রেরণা। একারণে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এবং আজো সেগুলির অভিনয় লুপ্ত হয়ে পড়েনি। এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'চন্দ্রগুপ্ত', 'প্রতাপসিংহ', 'নূরজাহান', 'মেবারপতন' ও 'শাহজাহান'। এগুলি ১৯০৪-১০-এর মধ্যে লিখিত হয়। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে অনেকে ঠিক ঐতিহাসিক বলতে সঙ্কুচিত হবেন, আর, অতিনাটকীয়তার ভাগ বেশি আছে বলে দোষদর্শী সমালোচক এগুলিকে নাটক বলতেও দ্বিধা করতে পারেন। তবু একথা বলা যায় যে, দ্বিজেন্দ্রলাল এদের আধুনিক মনের উপযোগী করে, বাঙালিসুলভ ভাবপ্রবণতা মিশিয়ে, যথাসাধ্য সাহিত্যিক ও শিক্ষিতজনপ্রিয় নাটকরূপে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই শ্রেণীর নাট্যে প্লটনির্মাণ, চরিত্র-সংঘাত-বর্ণন এবং স্বগতোক্তি প্রভৃতির দিক থেকে শেক্স্পীয়রের অনুসরণ দেখা যায়। সংলাপগুলি কোনো কোনো স্থলে ভাবময় ও অলংকারবহুল ভাষায় নিবদ্ধ হয়েছে, এবং অনর্থক দীর্ঘ হয়ে নাটকীয় সংঘাতের ব্যাঘাত জন্মিয়েছে একথা স্বীকার করতে হবে।

তাঁর পৌরাণিক নাটক 'পাষাণী' ও 'সীতা'। এদুটিতে প্রাচীন পুরাণের কাহিনী ও চরিত্রকে সম্পূর্ণ নতুন আকার দেওয়া হয়েছে। আধুনিক ভাবে এমন পরিবর্তিত করা হয়েছে যে এদের পৌরাণিক আখ্যা দেওয়া যায় না। বিশেষত 'সীতা' নাটকে তিনি রামায়ণের চরিত্রগত আদর্শকে বিপর্যস্ত করে ছেড়েছেন। এটি আগাগোড়া পদ্যছন্দে লেখা। 'সীতা' ও 'পাষাণী' ব্যতীত অন্য সব নাটকেই দ্বিজেন্দ্রলাল গদ্যভাষা ব্যবহার করেছেন।

সামাজিক নাটক 'পরপারে' বইখানিতে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীত তাঁর নাটকগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে এবং জনপ্রিয় করতে বিশেষভাবে সাহায্য করছে।

অষ্টম অধ্যায়

॥ উপন্যাস ও ছোটগল্প ॥

ভূমিকাবাক্য : কাহিনী বা গল্প শুনতে কে না ভালবাসে? সে কোন্ আদিম যুগ থেকে মনের জাগ্রত কৌতূহল নিয়ে সর্বদেশের সর্বকালের মানুষ বিচিত্র আখ্যান-উপাখ্যান, রূপকথা, উপকথা শুনে আসছে। মানুষের জীবন নানান ঘটনার আন্দোলনে নিত্য-আন্দোলিত, এদের মধ্যে তার সুখদুঃখ আনন্দবেদনা, আশা-নৈরাশ্য প্রতিফলিত। বাস্তবে যা ঘটেছে তার ওপর মানুষ কিছুটা নিজের কল্পনা যোগ করে দিচ্ছে—উভয়ের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হচ্ছে মনোজ্ঞ কাহিনীর। এসব কাহিনী দীর্ঘকাল ধরে মুখে মুখে চলে এসেছে, আবার, এর কিছু কিছু ছাপার অক্ষরে গ্রথিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানবমানবীর মধ্যে কাহিনী শোনার বাসনাটি অত্যন্ত প্রবল।

কিন্তু আধুনিককালে যাকে আমরা 'উপন্যাস' আর 'ছোটগল্প' [ইংরেজিতে Novel ও Short Story] বলি, আড়াইশ তিনশ বছর আগে তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না, বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাস ও ছোটগল্পের উদ্ভব হয়েছে সকলের পরে। সাহিত্যের এলাকায় ছোটগল্প সর্বকনিষ্ঠ আগন্তুক। বিজ্ঞানবুদ্ধি, বাস্তব মনোভঙ্গি তীক্ষ্ণ সমাজচেতনা, মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা, একালের যুগসমস্যা আর যন্ত্রপ্রভাবিত জটিল জীবনধারা, শক্তিশালী গদ্যের প্রসার, ইত্যাদির সঙ্গে খাঁটি উপন্যাস ও ছোটগল্পের সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। এসমস্ত বস্তুর সমবায়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র যখন প্রস্তুত হল তখনই জন্ম হল উপন্যাসের, আবির্ভাব হল ছোটগল্পের।

গল্প-উপন্যাসকে আমরা বলে থাকি কথাসাহিত্য। কাহিনীবর্ণন উভয়ের লক্ষ্য বলে সাহিত্যকর্ম-হিসেবে এদের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু পার্থক্যও কম নয়। এ পার্থক্য আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত। উপন্যাসের কাহিনী দীর্ঘায়ত, তাতে ঘটনার ঘনঘটা, বহুসংখ্যক পাত্রপাত্রীর সমাবেশ। ছোটগল্পে কাহিনীর পরিধি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ, পাত্রপাত্রী সংখ্যায় কম। উপন্যাসে কাহিনী প্রায়শ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে শ্লথগতিতে পরিণামের দিকে এগোয়। আখ্যানের এই ব্যাপ্তি ছোটগল্পের নেই, কাহিনী এখানে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। উপন্যাস জীবনবৃত্তের ওপর নানাদিক থেকে আলোকপাত করে, বিস্তৃত পরিসরে সূক্ষ্ম জটিল মনোবিশ্লেষণ এখানে সম্ভব। কিন্তু ছোটগল্পে মানবজীবনের একটি খণ্ডাংশকে রূপায়িত করা হয়। তাই, অনাবশ্যক ঘটনা ও চরিত্র, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এখানে যথাসম্ভব পরিহার্য। এজাতের সাহিত্যকর্মের কলাকৌশল অতিশয় সূক্ষ্ম।

ছোটগল্পকে আয়তনে বাড়ালে উপন্যাসের রূপ পাবে না, উপন্যাসকে সংক্ষিপ্ত করলে ছোটগল্পে পর্যবসিত হবে না—আকৃতি ও প্রকৃতিতে উভয়ে এতখানি পৃথক।

বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাস ও ছোটগল্পের জন্ম হয়েছে উনিশের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা ভাষার সত্যিকার প্রথম ঔপন্যাসিক, আর রবীন্দ্রনাথ প্রথম ছোটগল্প-রচয়িতা। বঙ্কিমের আগে আমাদের কোনো লেখক খাঁটি উপন্যাস রচনা করেন নি, তাঁদের হাত দিয়ে বেরিয়েছে সামাজিক নক্‌শা। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে প্রকৃত ছোটগল্প লেখার দিকে কেউ দৃষ্টি দেননি। বঙ্কিম-রবীন্দ্রের এই কীর্তি স্মরণীয়।

কয়েকজন প্রধান ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক ঃ

॥ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ বাঙলা উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিম [১৮৩৮-১৮৯৪] তাঁর কৈশোরে সাহিত্যক্ষেত্রে যখন প্রথম অবতীর্ণ হলেন তখন কবি ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন নবীন লেখকসম্প্রদায়ের খুব বড়ো একজন উৎসাহদাতা। এই ঈশ্বর গুপ্ত এবং তাঁর পূর্ববর্তী প্রখ্যাত কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যকবিতা বঙ্কিমকে মুগ্ধ করেছিল। কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে গ্রহণ করেছিলেন কবির ভূমিকা, তাঁর প্রথম গ্রন্থের নাম 'ললিতা ও মানস'—একটি কবিতাপুস্তক। গ্রন্থখানিতে ভারতচন্দ্র ও গুপ্তকবির প্রভাব সুপ্রকট।

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই প্রতিভাধর ইংরেজিশিক্ষিত বঙ্কিম পূর্ববর্তী সাহিত্যনায়কদের প্রভাব কাটিয়ে উঠলেন। তিনি যেন আপনা থেকেই বুঝতে পারলেন, কাব্যের এলাকাটি তাঁর মানসধর্মের অনুকূল নয়; তাই, তাঁকে সাহিত্যে গদ্যপন্থাকেই আশ্রয় কর'তে হল। গদ্যে নিজস্ব একটি স্টাইলও দাঁড় করালেন তিনি। এই গদ্যভঙ্গি বঙ্কিমী-রীতি নামে পরিচিত।

তখন দেশেই ইংরেজিশিক্ষার প্রসার ঘটেছে, হিন্দুকলেজে যাঁরা পাঠ নিয়েছেন তাঁরা ইংরেজি উপন্যাসাদির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু বিদেশি সাহিত্য পড়ে কি রসপিপাসা সম্পূর্ণ চরিতার্থ হয়? তাঁদের চিত্তে পিপাসার উদ্রেক হয়েছে অথচ য়ুরোপীয় আদর্শের উপন্যাসে—বাঙালিজীবনভিত্তিক কোনো আখ্যায়িকা হাতের কাছে নেই বলে—ওই পিপাসা তাঁরা নিবৃত্ত করতে পারছিলেন না। সাহিত্যের এহেন দৈন্য সত্যই বেদনাদায়ক।

মাতৃভাষার এই অভাব দূর করতে এগিয়ে এলেন সাহিত্যসাধক বঙ্কিমচন্দ্র। ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হল তাঁর বহুশ্রুত 'দুর্গেশনন্দিনী'। এটিই প্রকৃতপক্ষে প্রথম সার্থক বাঙলা উপন্যাস। এই আখ্যায়িকাখানির রচনামূলে সক্রিয় ছিল ইংরেজি ঐতিহাসিক রোমান্সের আদর্শ। এতে যে-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা মোগল-পাঠানের সংঘর্ষের পটভূমির ওপর স্থাপিত। এখানে তিলোত্তমা-জগৎসিংহ-আয়েষা-ওসমান প্রণয়ের আবর্ত রচনা করেছে। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহকে ভালোবেসেছে দুটি নারী—তিলোত্তমা ও আয়েষা। পাঠানসেনাপতি

ওসমান আবার আয়েষার প্রণয়প্রার্থী। এতে ঘটনা আঁকাবাঁকা পথে অগ্রসর হয়েছে। শেষে অভিরামস্বামীর মধ্যস্থতায় জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার বিবাহ হল, ভগ্নমনোরথ আয়েষা নিজেকে নিঃশব্দে দূরে সরিয়ে নিল। বর্তমান আখ্যায়িকায় ঐতিহাসিক ঘটনার পরিবেশমাত্র রয়েছে, কোনো বিখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্রের বিস্তৃত রূপায়ণ নেই। ইতিহাস এখানে ব ক্কমের কল্পনায় রঞ্জিত এবং রূপান্তরিত।

(বঙ্কিমের প্রথম রচনা বলে আখ্যায়িকাখানিতে অল্পবিস্তর শিল্পগত ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়; তবু 'দুর্গেশনন্দিনী'কে অভিনন্দন জানাতে হয়, এর মধ্যেই প্রথম আমরা ইতিহাস আশ্রয়ী রোম্যান্সের স্বাদ পেলাম—'নববাবুবিলাস' আর 'আলালের ঘরের দুলাল' থেকে এর অবস্থান অনেক দূরে। বঙ্কিমের হাতে রোম্যান্সের নবজন্ম হল, বাঙ্‌লা সাহিত্যে বঙ্কিম ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূত্রপাত করলেন—নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে গেল।)

প্রথম উপন্যাসে বঙ্কিমপ্রতিভার জাগরণ, দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'য় এই প্রতিভার বিকাশদীপ্তি। সূক্ষ্মবিচারে 'কপালকুণ্ডলা' ঠিক উপন্যাসজাতীয় রচনা নয়, একে বলা যায় কবি-বঙ্কিমের গদ্যে-লেখা অনুপম একটি কাব্য। বিশেষ একটি ভাবকল্পনাকে কেন্দ্র করে এই আখ্যায়িকার ঘটনাগতি আবর্তিত হয়েছে—মানবসমাজ থেকে আবাল্য বিচ্ছিন্ন একটি নারীকে লোকালয়ে এনে স্থাপন করলে তার চরিত্রে কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটবে কিনা? সমস্যাটি মনস্তাত্ত্বিক, একেই বর্তমান আখ্যায়িকায় রূপায়িত করেছেন বঙ্কিম। এখানে একদিকে, প্রকৃতি—সমুদ্রতীরবর্তী বনভূমি, অন্যদিকে, মানবসংসার—বনজঙ্গলসমাকীর্ণ সপ্তগ্রাম; একদিকে, আগ্রার বিলাসচঞ্চল রাজপ্রাসাদ, অন্যদিকে, নিভৃত পল্লীবাঙ্‌লার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা—চমৎকার বৈপরীত্যের সমাবেশ। কাপালিক-প্রতিপালিতা বনবিহঙ্গী সমাজপিঞ্জরে আবদ্ধ হল। কিন্তু আমরা দেখলাম, এই উদাসিনী বনবিহঙ্গী সংসারের সোনার পিঞ্জরে বাঁধা পড়তে চায় না, বনে বনে বিচরণ করে বেড়াতেই যেন তার অধিক সুখ। প্রকৃতিদুহিতা নায়িকা-নারী কপালকুণ্ডলার যে-আলেখ্য কবি-বঙ্কিম আমাদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরলেন তার সৌন্দর্যের তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন। রোম্যান্সহিসেবে 'কপালকুণ্ডলা' অদ্বিতীয়।

এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সৃজনীক্ষমতাবিষয়ে নিঃসংশয় হলেন। আখ্যায়িকাখানিতে লেখকের কল্পনা দূরাভিসারী, আগ্রা থেকে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত তা স্বচ্ছন্দগামী। আশ্চর্য কৌশলে বঙ্কিম মোগলরাজঅন্তঃপুরের সঙ্গে বাঙ্‌লার ক্ষুদ্র একটি পরিবারের ভাগ্যকে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। মানবজীবনে নিষ্ঠুর নিয়তিলীলার প্রভাব কতখানি গূঢ়সঞ্চারী তা-ও এ বইতে বঙ্কিম আমাদের দেখিয়েছেন। 'কপালকুণ্ডলা' আখ্যায়িকায় বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক কবিকল্পনা অবাধ পক্ষবিস্তার করেছে।

পরবর্তী উপন্যাস 'মৃণালিনী'। ইতিহাসের পটভূমিতে হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রণয়কাহিনীকে বিধৃত করে বঙ্কিম বিদেশির লিখিত বাঙ্‌লার গ্লানিময় ইতিকথার

ওপর নতুন আলোকপাত করবার প্রয়াসী এখানে। সপ্তদশ অশ্বারোহীর দ্বারা বিশাল গৌড়দেশ অধিকৃত হল, এই কলঙ্কযুক্ত ঘটনা দেশবৎসল বঙ্কিম বিশ্বাস করতে পারেন নি। এ ঘটনার পেছনে নিশ্চয়ই যে কোনো এক হীন ষড়যন্ত্র ছিল—বিশ্বাসঘাতকতার আত্মদ্রোহী গোপন অস্ত্রপাতন ছিল—দুষ্টমতি পশুপতির চরিত্রটি এঁকে বঙ্কিমচন্দ্র তার আভাস দিয়েছেন। এই উপন্যাসে ইতিহাসের স্বল্পতাকে লেখক কল্পনার দ্বারা পূরণ করে নিয়েছেন। বইটির মূল সুর স্বদেশপ্রীতি। এতে স্থান পেয়েছে লক্ষণসেনের রাজত্বকালে মুসলমানশক্তির বাঙ্‌লাদেশ অধিকারের কাহিনী।

এরপর বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'চন্দ্রশেখর', 'রাধারাণী', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—এ কয়টি আখ্যায়িকা রচিত হয়।

'চন্দ্রশেখর'-এ ঐতিহাসিকতা আছে—ব্রিটিশরাজত্বের গোড়াপত্তনের সময়ে মীরকাসিমের সঙ্গে ইংরেজবণিকের সংঘর্ষ ইতিহাসের কাহিনী, সন্দেহ নেই। এতে বর্ণিত কয়েকটি চরিত্রও ঐতিহাসিক এবং এই উপন্যাসে বঙ্কিম ইতিহাসের চমৎকার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ইতিহাসরসের স্ফুরণ ঘটলেও 'চন্দ্রশেখর'-কে আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলব না। কারণ, বাঙালির পারিবারিক জীবন ও বাঙ্‌লার সমাজের কথাই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্র এ বইতে ভারতীয় দাম্পত্যআদর্শটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। চন্দ্রশেখর অপাপবিদ্ধ ব্যক্তি, নিষ্কলুষ তাঁর চরিত্র, শাস্ত্রে তাঁর অগাধ ব্যুৎপত্তি। শৈবলিনী এহেন চন্দ্রশেখরের স্ত্রী। বিবাহের পূর্বে শৈবলিনী প্রতাপকে ভালোবেসেছিল, বিবাহের পরও এই প্রেমানুভব অনির্বাণ রইল। সংযতচিত্ত প্রতাপ চন্দ্রশেখরের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মবলিদান করলেন। শৈবলিনীর প্রেমজীবন একরূপ ব্যর্থ হল।

দলনীবেগমের ভাগ্যবিপর্যয় এবং চন্দ্রশেখর-চরিত্রের রূপায়ণে বঙ্কিম প্রথমশ্রেণীর উপন্যাসশিল্পীর দক্ষতা দেখিয়েছেন। প্রতাপের বীরত্ব ও মহত্ত্ব সকল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গ্রন্থে কেবল রোম্যান্সরস-পরিবেশনই বঙ্কিমের উদ্দেশ্য নয়, সমাজে উচ্চতর মঙ্গলাদর্শের প্রতিষ্ঠাও তাঁর অভিপ্রেত।

'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমের প্রথম পারিবারিক উপন্যাস। রূপজ মোহের বশে যেদিন নগেন্দ্রনাথ বিধবা কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্ত হলেন, সেদিন থেকে দাম্পত্যপ্রেমে ব্যভিচার প্রবেশ করল—সংসারভূমিতে বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হল। পতিব্রতা সূর্যমুখীর দীর্ঘনিশ্বাস নগেন্দ্র-কুন্দের প্রণয়জীবনের ওপর অভিশাপের অগ্নিবর্ষণ করল। এতে কুন্দনন্দিনীর জীবন পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বিষবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেই কুন্দনন্দিনী মরেছে, নগেন্দ্রনাথ মরতে মরতে কোনোরকমে বেঁচে গেছে। 'চন্দ্রশেখর'-এ প্রেমপিপাসিতা শৈবলিনী বাল্যপ্রণয়ী প্রতাপের প্রতি অনুরাগবশত স্বামী চন্দ্রশেখরকে নিজ হৃদয়টি অর্পণ করতে পারেনি। দাম্পত্যজীবনে এই মানসিক ব্যভিচারের জন্য শৈবলিনীকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে, প্রতাপকে

শাসনের ভিত্তি তখনো দৃঢ় হয়নি। চতুর্দিকে অরাজকতা চলেছে। শাসনবিশৃঙ্খলায় দেশবাসীর জীবন বিপর্যস্ত—বিপন্ন। এরূপ অবস্থায় দেশের পরাধীনতা ও অরাজকতা দূর করতে সচেষ্ট হলেন ত্যাগধর্মে দীক্ষিত এক ব্যক্তি, নাম ভবানী পাঠক। এক অপহৃতা বঙ্গবধূ—প্রফুল্ল—ভবানী পাঠকের গঠিত তথাকথিত দস্যু-দলের নেত্রীপদে অধিষ্ঠিতা হলেন। সকলে তাঁকে জননী বা দেবীর আসনে বসালেন। তাই, তাঁর নাম—দেবীচৌধুরানী। 'দেবী' যুদ্ধ করলেন, প্রভূত ঐশ্বর্য আর অশেষ কর্তৃত্বের অধিকারিণী হলেন। কিন্তু সর্বফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করলেন তিনি—তাঁর আহৃত সকল ধন ব্যয়িত হল লোককল্যাণকর্মে। উপন্যাসটির উদ্দেশ্য-মূলকতা গোপন নেই। বঙ্কিম এখানে নিষ্কামধর্ম ও দেশপ্রীতির দিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন।

এই উপন্যাসে বঙ্কিম, নারীজীবনের সার্থকতা কোথায়, তার সম্পর্কেও একটা নির্দেশ দিতে চেয়েছেন যেন। নারীর জন্যে সন্ন্যাসআদর্শ নয়—নারীর সুখশান্তি, নারীজীবনের সর্বাঙ্গীণ চরিতার্থতা হল স্বামী-পুত্র-সংসার ও পরিবারের মধ্যে। তাই, দস্যুদলের নেত্রী দেবীচৌধুরাণীকে সর্বশেষে আমরা দেখলাম বধূবেশে, পত্নীরূপে, প্রফুল্লের মধ্যে—স্বামী ব্রজেশ্বরের খিড়কিপুকুরে বাসন মাজতে তাঁর এতটুকু দ্বিধা-সংকোচ নেই। লেখকের উদ্দেশ্যমূলকতা 'দেবীচৌধুরাণী'র শিল্পোৎকর্ষের হানি ঘটিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা শেষ উপন্যাস 'সীতারাম'। আখ্যায়িকাখানির নায়ক সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্তু এ আখ্যায়িকা ঐতিহাসিক নয়।' উপন্যাসটিতে লেখক নিষ্কাম হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন, গীতার একটি ব্যবহারিক ভাষ্য দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। আবার, এখানে আমরা দেখি হিন্দু-বঙ্কিমকে—'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?' এতে মিলবে সংসার ও সন্ন্যাসের সংঘাত, সীতারাম ও শ্রীর পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র দ্বন্দ্বের মনোরম আলেখ্য। এই দ্বন্দ্বের ইতিহাসই 'সীতারাম' উপন্যাস।

মুসলমানরাজত্বকালে যশোরের প্রতাপান্বিত জমিদার সীতারাম স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই মনোগত বাসনা সফল হয়নি। যেন নিয়তিতাড়িত হয়ে, রূপতৃষ্ণার প্রণোদনায়, একটি নারীর দিকে তিনি ছুটে গেলেন। কিন্তু ওই নারী তাঁর বাহুপাশে ধরা দিলেন না। এর পর সীতারাম মনুষ্যত্বভ্রষ্ট হলেন, চারিত্রিক অধঃপতনের শেষ ধাপে নেমে গেলেন তিনি। ফলে যে-প্রতিষ্ঠান সীতারাম গড়ে তুলেছিলেন তা ভেঙে পড়ল, তার স্বাধীনতার স্বপ্ন অন্তর্হিত হল।

বর্তমান উপন্যাসে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি হল- যে নারী তাঁর জীবনের এতবড়ো বিপর্যয় ডেকে আনল, তিনি তাঁরই বিবাহিতা প্রথমা স্ত্রী—শ্রী। এখানেবঙ্কিম অদৃষ্টের অখণ্ডনীয়তা দেখিয়েছেন। নারীর রূপমোহ কা করে পুরুষের ভাগ্যসূত্র ছিন্ন করে দেয় তার প্রতি অঙ্গুলিসংকেত করেছেন। যে-স্ত্রী ছিলেন সীতারামের কাছে

সহজপ্রাপ্য, ভাগ্যের অমোঘ বিধানে তিনি হলেন অপ্রাপণীয়া। শক্তিমান পুরুষ সীতারামের আত্মবিস্মরণ ঘটল, ফলে সর্বনাশের অতলে ডুবে গেলেন তিনি। 'সীতারাম'-এ বঙ্কিমের শিল্পসিদ্ধিবিষয়ে আমরা নিঃসংশয়, গ্রন্থটি লেখকের উত্তম একটি সাহিত্যকর্ম।

বঙ্কিম অনেকগুলি উপন্যাস লিখে গেছেন। সেগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়, যেমন—ঐতিহাসিক, সামাজিক বা পারিবারিক, স্বদেশপ্রেমমূলক, ধর্মতত্ত্বব্যাখ্যানমূলক ইত্যাদি। লক্ষ্য করতে হবে, তাঁর প্রায় সকল উপন্যাসের মধ্যেই একটি সাধারণ ধর্ম প্রকাশ পেয়েছে, তা হল রোম্যান্সপ্রবণতা। এই 'রোম্যান্স' কথাটির অর্থ বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

রোম্যান্সমূলক সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রকৃতি হল—এতে রয়েছে কল্পনার অতিসমৃদ্ধি—বিস্ময়কর ঘটনার সমাবেশ, অসাধারণ, অতিলৌকিক বস্তুর অবতারণা, অতীত ও সুদূরের প্রতি স্বপ্নমধুর আকর্ষণ, মানবজীবনের উচ্ছ্বাসময় বর্ণবৈচিত্র্যের ঐশ্বর্য, বাস্তবকে উল্লঙ্ঘন করে অবন্ধন কল্পনার অমরাবতীতে প্রবেশের বাসনা একজাতীয় সাহিত্যে খুব বড়ো হয়ে দেখা দেয়। বাস্তবজীবনের তুচ্ছতাক্ষুদ্রতা রোম্যান্সের যাদুস্পর্শে এক অপরূপ সৌন্দর্য ও গৌরবে মণ্ডিত হয়। ইতিহাসকে বঙ্কিম কল্পনার রঙে রঞ্জিত করেন, জীবনচিত্রের ওপর স্বপ্নকল্পনার আবিরকুমকুম ছড়িয়ে দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত কাহিনী, চরিত্রসৃষ্টি, বর্ণনভঙ্গি সবকিছু অসাধারণ। কিন্তু একথাটিও আমাদের ভুললে চলবে না, কল্পনার ঐশ্বর্যে তাঁর রচিত আখ্যায়িকা-গুলি সমৃদ্ধ হলেও বাস্তবের সঙ্গে তাদের নিগূঢ় সংযোগ রয়েছে—সম্ভব ও অসম্ভব তাঁর রচনায় একাকার হয়ে যায়নি।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিম যে-শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তাকে অসামান্যই বলতে হবে। আখ্যায়িকার কায়াগঠনে, ঘটনাবিন্যাসের নৈপুণ্যে, চরিত্রনির্মাণের কৌশলে, জীবনবোধের গভীরতায়, রূপ ও রসের বৈচিত্র্যে ও ঘনতায় বঙ্কিমরচিত উপন্যাসাবলী অদ্যাবধি সমালোচকের অশেষ প্রশংসার বস্তু হয়ে রয়েছে। উপন্যাসের সার্বিক বিচারে বঙ্কিমকে একালেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

॥ রমেশচন্দ্র দত্ত ॥ প্রতিভাধর বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের রাজপথ খুলে দিলেন বঙ্কিমের এই সাহিত্যচর্চা সেকালের বহু লেখককে উপন্যাস-রচনায় অনুপ্রাণিত করল; আবার, অনেক অযোগ্য লেখক যশোলাভের প্রলোভন এড়াতে না পেরে হাতে কলম তুলে নিলেন। বঙ্কিমের সময়ে এইভাবে কিছুসংখ্যক ইতিহাসভিত্তিক আখ্যায়িকা একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকল। বঙ্কিম-অনুসারী লেখকদের মধ্যে যাঁরা কিছুটা শক্তিমান ছিলেন, বঙ্কিমের ন্যায় উচ্চতর কবিকল্পনার অধিকারী কেউ তাঁরা নন, বাঙলা উপন্যাসের ধারাটিকে তাঁরা পুষ্ট করতে পারেননি। এই সময়কারই একজন লেখক উল্লেখযোগ্য শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, তিনি হলেন —রমেশচন্দ্র দত্ত [১৮৪৮-১৯০৯]।

সেদিন 'বঙ্গদর্শন'-কে ঘিরে যে-বঙ্কিমগোষ্ঠীর লেখকচক্র গড়ে উঠেছিল, রমেশচন্দ্র তাঁর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না বটে, কিন্তু সাহিত্যনায়ক বঙ্কিমের দ্বারা প্রাণিত হয়েই তিনি আখ্যায়িকা-রচনায় মনোযোগী হন। বঙ্কিমের কাছে রমেশচন্দ্রের ঋণ সামান্য নয়। এই ঋণের কথা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন।

এখানে বিশেষভাবে স্মর্তব্য, রমেশচন্দ্র ইতিহাসে অশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, তাকে একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিকও বলা যেতে পারে। ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর প্রবল দেশানুরাগ। উভয় প্রকার অনুরাগের প্রতিফলন তাঁর উপন্যাসাবলীতে সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন।

রমেশচন্দ্রের লিখিত উপন্যাস সংখ্যায় বেশী নয়—মাত্র ছয়খানি। সংখ্যায় অল্প হলেও এদের মধ্যে তাঁর প্রতিভার মুদ্রাঙ্কন সুস্পষ্ট। রমেশচন্দ্র যে-ছয়খানি উপন্যাস লিখেছেন তাঁর মধ্যে চারখানি কমবেশি ইতিহাসের ঘটনাকে পটভূমিরূপে গ্রহণ করেছে, বাকি দুখানিতে বাঙ্‌লা সামাজিক সমস্যা আলোচিত হয়েছে। ইতিহাসের বিশাল ক্ষেত্র আর সমাজের স্বল্পপরিসর ভূমি উভয়ত্র রমেশচন্দ্রের স্বচ্ছন্দ বিহরণ। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনাতেই তাঁর অধিক কৃতিত্ব।

বাঙ্‌লা সাহিত্যে রমেশচন্দ্রের প্রথম দান 'বঙ্গবিজেতা'—প্রকাশকাল ইংরেজি ১৮৭৪ সাল। আখ্যায়িকাখানি ইতিহাসের ক্ষীণ একটি সূত্রকে আশ্রয় করে রচিত। এখানে ঐতিহাসিক ঘটনার চেয়ে লেখকের কল্পনারই আধিক্য। এতে যে-ঘটনা রূপায়িত তা সংঘটিত হয়েছে মোগলসম্রাট আকবরের সময়ে। রাজা টোডরমলের শাসনকালে বাঙ্‌লাদেশে এক বিদ্রোহ দেখা দেয়, কিন্তু অচিরে টোডরমল এ বিদ্রোহ দমন করেন। সেইসময় ইন্দ্রনাথ নামে এক বাঙালিযুবক রাজার সপক্ষে থেকে অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দেয়। 'বঙ্গবিজেতা'র নায়ক এই ইন্দ্রনাথ। নায়িকা সরলা—ইন্দ্রনাথের প্রণয়িনী। শকুনি-নামে এক খলস্বভাব ব্যক্তির প্ররোচনায় বিশ্বাসঘাতক সতীশচন্দ্র কৌশলে সরলার পিতাকে হত্যা করে। এতে সরলার মাতা মহাশ্বেতা অত্যন্ত জিঘাংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন, এবং ইন্দ্রনাথ উক্ত সতীশচন্দ্রকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্যে এগিয়ে যায়। শয়তান শকুনির চক্রের হাতে সতীশচন্দ্র প্রাণ হারায়, শকুনি আত্মহত্যা করে মরে। অবশেষে সরলার সঙ্গে ইন্দ্রনাথের পরিণয় সম্পন্ন হয়।

শিল্পকর্ম হিসেবে 'বঙ্গবিজেতা' সার্থক হয়ে ওঠেনি, ঔপন্যাসিকের কলাকৌশল এখনো রমেশচন্দ্রের অনায়ত্ত। ইতিহাস এখানে নিরুত্তাপ। আখ্যায়িকায় বর্ণিত চরিত্রগুলিকেও লেখক সজীব করে তুলতে পারেননি। এখানে প্রণয়কাহিনীবর্ণন গতানুগতিক, চরিত্রচিত্রণ বৈশিষ্ট্যবর্জিত, যুগের আলেখ্য অস্পষ্ট। তবে যুদ্ধাদির বর্ণনায় উপন্যাসকার কথঞ্চিৎ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবীকঙ্কণ', ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত। মোগল-আমলে ভারত ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ এই আখ্যায়িকার পটভূমি, তখন শাহজাহান ভারতবর্ষের সম্রাট। 'মাধবীকঙ্কণ' মূলত প্রেমকাহিনী, মুখ্য চরিত্রগুলি কাল্পনিক—

এদের ঐতিহাসিক আবেষ্টনের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এর নায়ক নরেন্দ্রনাথ, নায়িকা হেমলতা। জমিদারপুত্র নরেন্দ্র তাদের নায়েবের হাতে সর্বস্বান্ত হয়েছে; আবার, এই নায়েবেরই কন্যা হেমলতাকে সে ভালোবেসেছে। কিন্তু বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন নায়েব নরেন্দ্র-হেমলতার প্রণয়মিলনের বিরোধিতা করলেন। ভাগের প্রতিকূলতায় নরেন্দ্রনাথ গৃহত্যাগী হল, সুদূর রাজমহলে গিয়ে শুজার সৈন্যদলে নাম লেখাল। গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার আগে তার প্রেমের চিহ্নস্বরূপ মাধবীলতার কঙ্কণ প্রণয়াস্পদা হেমলতার হাতে সে পরিয়ে দেয়। পরে শ্রীশের সঙ্গে হেমলতার বিবাহ হয়। এর মধ্যে বহু ঘটনা ঘটে গেছে। কাহিনীর শেষাংশে দেখি, মথুরার এক মন্দিরে নরেন্দ্রের সঙ্গে হেমলতার সাক্ষাৎ হয়েছে। তখন হেমলতা পূর্বপ্রণয়ী নরেন্দ্রকে উপদেশ দিল অতীতের প্রণয়ানুরাগের কথা সে যেন ভুলে যায়, আর, নরেন্দ্রের দেওয়া মাধবীর কঙ্কণ তাকে প্রত্যর্পণ করল। বেদনাবিদ্ধ নরেন্দ্রাথ সেই কঙ্কণ নিক্ষেপ করল যমুনার জলে। তারপর থেকে সে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী—গৃহজীবনের মায়ামুক্ত।

পূর্ববর্তী উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা'-র তুলনায় 'মাধবীকঙ্কণ' অনেক বেশি পরিণত রচনা। এখানে রমেশচন্দ্রের শিল্পবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান আখ্যায়িকায় নরেন্দ্র-হেমের প্রণয়চিত্রটি খুব চমৎকার ফুটেছে। উভয়ের বাল্যপ্রীতি কি করে ধীরে ধীরে গভীর প্রেমে পরিণত হল, নরেন্দ্রের উগ্র চঞ্চল ও তেজস্বী স্বভাব এবং হেমলতার শান্ত চাপা প্রকৃতি কীভাবে আখ্যায়িকাখানিকে ট্র্যাজিক পরিণামের দিকে এগিয়ে নিল, কর্মচারার চক্রান্তে কারূপে নাবালক উত্তরাধিকারী সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত হল এসব বিষয়ের বর্ণনে উপন্যাসকার প্রশংসনীয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

ইতিহাসের ঘটনা বিবৃত হলেও 'মাধবীকঙ্কণ'কে আমরা যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলব না। একে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স বলাই সংগত। ঐতিহাসিক কাহিনী নরেন্দ্র-হেমের প্রণয়কথার নিবিড় গ্রন্থন এ আখ্যায়িকায় চোখে পড়ে না, ইতিহাসের ঘটনাস্রোত উক্ত প্রণয়াযুগলের প্রেমের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে না। যা হোক, একটি বিষাদকরুণ প্রণয়কাহিনীহিসেবে 'মাধবীকঙ্কণ' অবশ্যই উপভোগ্য। 'মাধবীকঙ্কণ' এই সত্যটির প্রতিই ইঙ্গিত করছে যে, ঐতিহাসিক ও পারিবারিক উভয় শ্রেণীর আখ্যায়িকা রচনার ক্ষমতা রমেশচন্দ্র দত্তের ছিল।

অতঃপর রমেশচন্দ্র থাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস আমাদের উপহার দিলেন। তাঁর 'মহারাষ্ট্রজীবনপ্রভাত' প্রকাশিত হল ১৮৭৮ সালে। এই আখ্যায়িকাখানিকে রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনার মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির যে-স্বাধীনতাকামনা বিগত দিনের ইতিহাসে হিন্দুর লুপ্ত গৌরবের সন্ধান করেছিল, 'মহারাষ্ট্রজীবনপ্রভাত' তারই প্রেরণায় রচিত বলে মনে হয়। ভারতেতিহাসের এক গৌরবদীপ্ত অধ্যায় ঔপন্যাসিক তাঁর গ্রন্থে পাঠকের সম্মুখে খুলে ধরেছেন। এখানে নায়ক মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী, প্রতিনায়ক অমিতপ্রতাপ

আওরঙ্‌জেব। মারাঠাশক্তির উত্থান ও মোগলমারাঠার প্রচণ্ড সংঘর্ষের কাহিনীই সমালোচ্য উপন্যাসটিতে বর্ণিত হয়েছে।

রমেশচন্দ্র কী উজ্জ্বল বর্ণে এঁকেছেন মারাঠাদের জলন্ত দেশপ্রেম ও অমেয় শৌর্যের রক্তরাঙা কাহিনী। শিবাজী আর আওরঙ্‌জেবের চরিত্রচিত্রণে লেখক অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শিবাজীর দেশপ্রাণতা, রণচাতুর্য, দুঃসাহসিক অভিযান, লোকচরিত্রবিষয়ে অভিজ্ঞতা, তাঁর 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'-নীতি ও মারাঠাজাতির বিজয়কেতন ঊর্ধ্বে ওড়াবার অটল প্রতিজ্ঞা লেখক যেমন সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন, তেমনি, শক্তিস্পর্ধিত মোগলসম্রাট আওরঙ্‌জেবের প্রতিকৃতিকেও জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর অন্তরে কুটিলতা, বাইরে বৈরাগ্য ও ধার্মিকতার মনোভাব, তাঁর শাঠ্য ও সন্দেহপরায়ণ আচরণ ইত্যাদির ওপর উপন্যাসকার প্রচুর আলোকপাত করেছেন। শিবাজী দোষেগুণে রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে, আওরঙ্‌জেবকে চিনে নিতে কেউ ভুল করবে না। এ দুই ঐতিহাসিক চরিত্রনির্মাণ রমেশচন্দ্রের অক্ষয় শিল্পকীর্তি। উপন্যাসখানিতে রমেশচন্দ্রের ইতিহাসনিষ্ঠা ও বর্ণনকুশলতার যোগে জাতীয় ইতিবৃত্তের একটি বিশেষ পর্বের এক সামগ্রিক রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

রমেশচন্দ্রের চতুর্থ ও আর-একটি যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা'—প্রকাশকাল ইংরেজি ১৮৭৯ সন। এই আখ্যায়িকা অস্তমিতগৌরব রাজপুতশৌর্য ও বীরত্বের প্রাণোন্মাদকর কাহিনী। রাণা প্রতাপসিংহকে উপন্যাসের নায়ক বলা চলে। আকবরের রাজত্বকালে মোগলশক্তির সঙ্গে প্রতাপের অনবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এ উপন্যাসটিতে বাণীরূপ পেয়েছে। স্বাধীনতারক্ষার জন্য স্বদেশপ্রেমিক রাজপুতজাতি আত্মাহুতি দিয়ে যেভাবে যুদ্ধ করেছে, ইতিহাসে তার তুলনা অতি বিরল। সমগ্র একটি যুগের বিশ্বস্ত পরিচয় 'জীবনসন্ধ্যা'র পাতায় পাতায় প্রতিফলিত হয়েছে। ইতিহাসের গৌরবময় ঘটনার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার দিকে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি নিবদ্ধ বলে হৃদয়বিশ্লেষণের চিত্র এখানে সামান্যই, চরিত্রগুলির ব্যক্তিপরিচয় কোথাও তেমন মেলে না। কিছু কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও, স্বীকার করতে হবে, এখানে ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শটি মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

এবার রমেশচন্দ্রের লেখা সামাজিক উপন্যাসের কথা। এ জাতের দুখানি উপন্যাস তিনি লিখেছেন—'সংসার' ও 'সমাজ'—প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ১৮৮৬ ও ১৮৯৪ সালে। এ দুটি আখ্যায়িকার উপাদান সমাহৃত হয়েছে ঊনবিংশ শতকের উত্তরার্ধের বাঙ্‌লায় সমাজজীবন ও পারিবারিক জীবনের জটিলতামুক্ত ছোট সুখ ছোট দুঃখের চিত্রশালা থেকে। ইতিহাসের উত্তেজনা-উন্মাদনা-পূর্ণ কলরব-মুখরিত বিশাল ক্ষেত্র থেকে লেখকের কল্পনাদৃষ্টি দূরে সরে গেছে, এখন ছায়াবৃত বাঙ্‌লাপল্লীর গৃহাঙ্গনের দিকে তাঁর মমতাজড়িত দৃষ্টি প্রসারিত।

'সংসার' ও 'সমাজ'-এ কথাশিল্পী রমেশচন্দ্রের শিল্পরচনশক্তির নতুন একটি পরিচয় পেলাম আমরা। এখানে প্রকাণ্ড ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের তীব্র আন্দোলন

নেই, উদ্দাম আবেগউচ্ছ্বাসের ফেনিল আবর্ত নেই, ইতিহাসের রথচক্রের গম্ভীর নির্ঘোষ নেই, আছে সরল গ্রাম্যনরনারীর আশাভিলাষের মৃদু কম্পন, তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাত্যহিক ঘটনার ক্ষীণ স্রোত, পল্লীবাসী বাঙালিমানুষের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্রণ। কোনো গুরুতর সমস্যার জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করে, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের গভীরতায় ডুব না দিয়ে, অল্পসংখ্যক পাত্রপাত্রী নিয়ে, সুন্দর পরিবেশে আমাদের সাংসারিক জীবনকে রমেশচন্দ্র নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন। সামাজিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিত্তশালী অভিজাত পরিবারের ছবি এঁকেছেন, রমেশচন্দ্র আরো একধাপ নীচে নেমে এসে সাধারণ জীবনের আলেখ্য আমাদের দৃষ্টির সমক্ষে তুলে ধরেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণক্ষমতা সূক্ষ্ম, পল্লীর মানুষগুলির প্রতি সহানুভূতি গভীর, তাঁর আঁকা ছবিগুলি আন্তরিকতার স্পর্শে হৃদয়গ্রাহী। বাঙলার পল্লীগ্রামের পথঘাট, পুকুরবাগান, জোতজমা, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার, গোয়ালা-কৈবর্ত, সাধারণ চাষাভুষাশ্রেণীর মানুষ সমস্তই রমেশচন্দ্রের বর্ণনকৌশলে প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠেছে। সেকালের উপন্যাসসাহিত্যে এসব কিছুর লিপিচিত্র তেমন সুলভ ছিল না। এক্ষেত্রে বর্তমান উপন্যাসকারের কৃতিত্ব অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য।

কিন্তু এও স্বীকার্য যে, রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসে প্রথমশ্রেণীর শিল্প-কুশলতার তেমন কোনো পরিচয় ফোটেনি। যথার্থ ঔপন্যাসিকের পক্ষে কেবল চিত্রাঙ্কনক্ষমতা ও পর্যবেক্ষণই যথেষ্ট নয়। তাঁর কাছে পাঠক আরো বেশিকিছু দাবি করে—তিনি হবেন জীবনরহস্যের ভাষ্যকার, মানবহৃদয়ের অন্তরালের সংবাদ তিনি পাঠককে নিবেদন করবেন, বিরুদ্ধশক্তির সংঘাতকে আখ্যায়িকায় রূপ দেবেন; আখ্যায়িকায় বর্ণিত চরিত্রগুলির ক্রমবিকাশ দেখাবেন, তাদের কার্যাবলীর মনস্তাত্ত্বিক কারণ দর্শাবেন, ঘটনাধারার বিবর্তনকে কার্য কারণের সম্পর্কসূত্রে গাঁথবেন। পাঠক-সমাজের এসব দাবি রমেশচন্দ্র প্রায়শ পূরণ করেন না—ঔপন্যাসিকের দায়িত্ববিষয়ে তাঁকে খুব সচেতন বলে মনে হয় না। 'সমাজ'-'সংসার'-এ বর্ণনা আছে প্রচুর, এর তুলনায় ঘটনার সংঘাতসংক্ষোভ খুবই কম বলতে হবে।

'সংসার'-এ রমেশচন্দ্র অতিসহজেই বিধবাবিবাহকার্যটি সম্পন্ন করেছেন, 'সমাজ'-এ প্রতিষ্ঠিত করেছেন অসবর্ণবিবাহ। এতে ঔপন্যাসিকের সমাজ-সংস্কারের উৎসাহ যতখানি প্রকাশ পেয়েছে, উপন্যাসশিল্পে প্রত্যাশিত কলা-কৌশলের পরিচয় ততখানি নেই। বলতে হবে, শিল্পের মর্যাদাহানি ঘটিয়েই তিনি আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দিলেন। 'সংসার'-এ শরৎ ও সুধা পাঠকের প্রীতি আকর্ষণ করে বলে সেখানে তাদের বিবাহমিলনকে ততখানি শিল্পবিরোধী বলে মনে হয় না; কিন্তু 'সমাজ'-এ দেবীপ্রসাদ ও সুশীলার অসবর্ণবিবাহ অবশ্যই শিল্পসম্মত নয়। দ্বিতীয়োক্ত উপন্যাস শিল্পকর্ম হয়নি, নিছক প্রচারে পর্যবসিত হয়েছে।

স্বীকার করতে বাধা নেই, বঙ্কিম-শরৎচন্দ্রের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর কলাবিদ্ রমেশচন্দ্র

নন। তবু ঐতিহাসিক উপন্যাসে ভালো লাগে তাঁর সত্যনিষ্ঠা, স্বদেশের পূর্বগৌরব পুনরুদ্ধারের অভিলাষ; সামাজিক উপন্যাসে ভালো লাগে তাঁর সরল আন্তরিকতা, সমাজের তৎকালীন দুর্বলতাবিদূরণের মহৎ সংকল্প ও অদম্য উৎসাহ।

॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ বাঙলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের [১৮৭৩-১৯৩২] উল্লেখযোগ্য একটি ভূমিকা আছে। একদিকে রবীন্দ্রপ্রতিভার পূর্ণবিকাশ, অন্যদিকে, শক্তিমান শরৎচন্দ্রের উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ, এই অন্তর্বর্তী কালখণ্ডের মধ্যে যে কয়জন জনপ্রিয় সাহিত্যনির্মাতার অভ্যুদয় হয়েছে প্রভাতকুমার তাঁদের অন্যতম। তাঁকে স্বকীয়তায় দীপ্যমান বিশিষ্ট একজন লেখকরূপে চিহ্নিত করা যায়। ' প্রভাতকুমারের সৃষ্টির প্রাচুর্য লক্ষ্য করবার মতো। তিনি একজন প্রথমশ্রেণীর ছোটগল্পকার। ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার বাঙালির মনোলোকে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি, এর অধিকারী শরৎচন্দ্র।

প্রথমে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস-রচনাবলীসম্পর্কে দুয়েকটি কথা বলি। প্রভাতকুমারের উপন্যাস সংখ্যায় বহু। এজাতীয় রচনার কতকগুলি নাম —রমাসুন্দরী, নবীন সন্ন্যাসী, জীবনের মূল্য, রত্নদ্বীপ, সিন্দুরকৌটা, মনের মানুষ, সত্যবালা, ইত্যাদি। তাঁর লেখা যে-সব উপন্যাস সমধিক খ্যাতি পেয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রত্নদ্বীপ ও সিন্দুরকৌটা। এদের রচনাকাল ১৯১৭-১৯১৯ —তখনো শরৎচন্দ্রের বিরাট প্রতিভার পূর্ণপরিচয় এদেশের পাঠকসমাজ পায়নি।

• স্বীকার করে নেওয়াই ভালো প্রথমশ্রেণীর উপন্যাসকার প্রভাতকুমার নন। শিল্পকর্মহিসেবে উপন্যাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে— সুবিস্তৃত একটি কাহিনী, বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ, ঘটনাগুলির ঐক্যে-ধৃত গ্রন্থন, পাত্রপাত্রীর হৃদয়বিশ্লেষণ, জীবনরহস্যে অবগাহন, বাস্তবসমস্যার ওপর প্রচুর আলোকপাতন, পূর্ণায়ত চরিত্রনির্মাণ ইত্যাদি বস্তু সত্যকার উপন্যাসে প্রত্যাশিত। উপন্যাস লিখতে বসে প্রভাতকুমার এদের প্রতি যথোচিত লক্ষ্য রাখেন না। তাঁর কাহিনীগ্রন্থনে শৈথিল্য প্রকাশ পায়, ঘটনাগুলি ঐক্যসূত্রে বাঁধা পড়েনা বলে তাতে সংহতির অভাব ঘটে; জীবনের উপরিভাগের উর্মিলীলার চিত্র আঁকেন তিনি, গভীরতায় ডুবে যেতে পারেন না, তাঁর আঁকা চরিত্র-সব পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে না। অন্তর্দ্বন্দ্বের সংঘাত তাঁর উপন্যাস সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট, চমকপ্রদ ঘটনাবর্ণনের দিকেই তাঁর ঝোঁক সমধিক। লঘু কল্পনা ও কৌতুকপ্রবণতার জন্যে মানবজীবনের ট্র্যাজেডির চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি ব্যর্থকাম হয়েছেন।

অবশ্য দুয়েকটি উপন্যাসে প্রভাতকুমার কিছুটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'রত্নদ্বীপ'-এ ঘটনার চমকপ্রদ অভিনবত্ব, কাহিনীর ট্র্যাজিক পরিণতি, রাখালের চরিত্রগৌরব, বৌরাণীর কারুণ্যসিক্ত হৃদয়াকুতি ও তাঁর গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব লেখকের উচ্চতম শিল্পদৃষ্টির পরিচয়বাহী। 'সিন্দুরকৌটা'তে বিজয় ও সুশীর প্রণয়োন্মেষের আলেখ্য, মাদ্রাজী খ্রীস্টান পল সাহেবের ইতরতা ও আত্মসম্মানহীনতা, স্বামীর ইচ্ছার

কাছে বকুরাণীর নিরভিমান আত্মসমর্পণ, কাহিনীর সুখময় পরিণতি—সমস্তকিছুই সুচিত্রিত।

প্রভাতকুমার পাকা গল্পবলিয়ে, ছোটগল্পরচনায় তিনি অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর গল্পসংকলন-গ্রন্থগুলির মধ্যে নবকথা, ষোড়শী, দেশি ও বিলাতী, গল্পাঞ্জলি, গল্পবীথি, গহনার বাক্স, হতাশপ্রেমিক, জামাতা বাবাজী ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রচুর গল্প লিখে তিনি বাঙালির মনোহরণ করেছেন। এককালে জনপ্রিয়তায় প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। খুব কম গল্পকারই তাঁর মতো এতখানি লোককান্ত হতে পেরেছেন।

গল্পরচনায় প্রভাতকুমারকে উৎসাহিত করেন রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রের সস্নেহ সাহচর্য তিনি পেয়েছেন। তাঁর প্রথমের দিকের কয়েকটি গল্পে রবীন্দ্রানুসারিতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অল্পকালমধ্যেই দৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে তিনি উজ্জ্বল নিজস্বতার পরিচয় দিলেন, ছোটগল্পের মনোরম এক রূপলোক নির্মাণ করলেন।

গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ও গল্পকার প্রভাতকুমার দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের অধিবাসী। রবীন্দ্রের-ছোটগল্প কবিকল্পনায় সমৃদ্ধ; প্রভাতকুমারের ছোটগল্প বাস্তবের স্পর্শে সঞ্জীবিত। রবীন্দ্রনাথ দূরযানী ও গভীরচারী কল্পনার পাখায় ভর করে প্রায়শ ভাবজগতে বিহার করেন, প্রভাতকুমার তাঁর বাস্তবসত্যনিষ্ঠা নিয়ে আমাদের অতিপরিচিত সংসারেই ঘুরে বেড়ান। গল্প বলতে বসেও রবীন্দ্রনাথ মানুষের অতিসূক্ষ্ম ভাবানুভূতির কাব্যকার, প্রভাতকুমার বাঙলাদেশের মানবমানবীর দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো হাসিকান্নাগুলির সুদক্ষ রূপকার। এই দুজন কথাশিল্পীর লেখা গল্পের স্বাদের মধ্যে পার্থক্য সামান্য নয়।

ছোটগল্পের খুব বড়ো একজন শিল্পী প্রভাতকুমার। গল্পের আঙ্গিকনির্মাণে তিনি যে-কলাকুশলতা দেখিয়েছেন তা পৃথিবীখ্যাত ফরাসি গল্পলেখক গীদ্য মোপাসাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্ষুদ্রতর আয়োজন ও স্বল্পতম উপাদানে প্রভূত গল্পরস পরিবেশন করতে পারেন প্রভাতকুমার। গল্পবানানোর অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে তাঁর। তিনি যে-কাহিনীটি বলতে শুরু করেন তার বিষয়ে পাঠকচিত্তের কৌতূহল উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে এবং কাহিনীর সমাপ্তিতে পৌঁছে সেই কৌতূহল নিবৃত্ত হয়। গল্পের উপসংহার অপ্রত্যাশিত কিন্তু অনিবার্য এবং স্বাভাবিক। কাহিনীর অন্তঃপ্রবাহী নির্মল কৌতুকরসধারা প্রভাতকুমারের অধিকাংশ গল্পকে স্নিগ্ধ সরসতা দান করেছে। এই কৌতুকসঞ্জাত হাসি বিনির্মল।

উনবিংশ শতকের শেষ পাদের ও বিংশ শতকের প্রথম তিনটি দশকের মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালিজীবনকে প্রভাতকুমার তাঁর গল্পে রূপায়িত করেছেন। বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যেও তিনি রোম্যান্সের সন্ধানী। প্রধানত জীবনের লঘু অংশের দিকেই তিনি আপন দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করেছেন, সহজ সুরে সহজ কথাই বলেছেন—গভীরতায় তলিয়ে যাওয়া, দার্শনিকতায় আত্মনিমজ্জন, তাঁর প্রকৃতিবিরোধী। তাঁর গল্পের কোথাও কোথাও শ্লেষ আছে, ঈষৎ ব্যঙ্গও রয়েছে, কিন্তু তীব্র নয় বলে

তাতে জ্বালা নেই। আবার, প্রভাতকুমারের কৌতুকের হাসি কোথাও কোথাও কারুণ্যের অশ্রুতে সজল—যেন রৌদ্রঝলমল্ সবুজ তৃণদলের ওপর ভোরবেলাকার শিশিরবিন্দু। একটা শান্তি, একটা তৃপ্তি তাঁর চিত্তকে প্রসন্নতায় ভরে তুলেছে এবং এই প্রসন্নতা তাঁর গল্পগুলির সর্বদেহে বিকীর্ণ।

এবার প্রভাতকুমারের দুয়েকটি নামকরা গল্পের সামান্য পরিচয় দিই। পূর্বে বলেছি, কৌতুক ও রঙ্গরসাশ্রয়ী রচনায় তিনি সিদ্ধ শিল্পী। ঘটনাসংস্থানকৌশলে কীরূপ হাস্যমধুর গল্পের সৃষ্টি হতে পারে তার স্মরণীয় একটি নিদর্শন 'বলবান জামাতা'। রমণীসুলভ কোমল দেহের জন্যে নলিনীকান্তকে তার শ্যালিকা বাসরঘরে বিদ্রূপবাক্য শোনালে নিজের চেহারাটিকে পুরুষালি করে তুলতে নলিনী নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা শুরু করে দিল। দুবছরের প্রাণপণ চেষ্টায় সে রীতিমত একজন পালোয়ান হয়ে উঠল। তারপর একদিন এলাহাবাদে শ্বশুরগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করল সে। সঙ্গে রয়েছে একটি মোটা লাঠি ও একটি বন্দুক। এলাহাবাদে পৌঁছে শ্বশুরের নামগত বিভ্রান্তির ফলে নলিনী অন্যের বাড়ীতে গিয়ে উঠল। লাঠিবন্দুক আর তার গুণ্ডামার্কা চেহারা দেখে বাড়ীর লোকেরা ভাবল, বুঝি ডাকাত পড়েছে। তাড়া খেয়ে এবার নলিনী আপন শ্বশুরবাড়ীতে এসে হাজির হল। এখানেও বিড়ম্বনার শেষ নেই। শ্বশুরমশাই 'বলবান জামাতা' অর্থাৎ পালোয়ান-নলিনীকে দেখে চিনতেই পারলেন না, দিলেন তাড়িয়ে। পরিশেষে অট্টহাসিতে গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। একই নামের দুজন ব্যক্তি থাকায় নলিনীকান্তের এহেন দুর্গতি ভোগ করতে হল। আর, নলিনীর দেহগত কোমলতার কলঙ্কক্ষালনের দুরূহ প্রয়াস কি কম কৌতুকাবহ?

অনুরূপ কৌতুকরঙ্গের অপর একটি উৎকৃষ্ট গল্প 'রসময়ীর রসিকতা'। স্ত্রী রসময়ী রুদ্রমূর্তি ধারণ করে অনবরত স্বামী ক্ষেত্রমোহনের সঙ্গে ঝগড়ায় নামেন। বিবাহিত জীবনের আঠারো বছর এভাবে অতিক্রান্ত হলে কটুভাষিণী রসময়ী একদিন স্বর্গতা হলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ক্ষেত্রমোহন পুনর্বিবাহের আয়োজন করলেন। কিন্তু বিবাহের কথাবার্তা শুরু হতে-না-হতেই রসময়ীর হস্তাক্ষরে-লিখিত পত্র আসতে লাগল, এবং তাতে ক্ষেত্রমোহনকে বেশ শাসানো হচ্ছে। এই ভৌতিক ব্যাপার নিয়ে অনেক গবেষণা হল, বিবাহ স্থগিত রইল। পরে আবিষ্কৃত হল যে, রসময়ী তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই চিঠিগুলি রেখে গিয়েছিলেন। এই গল্পে লেখকের কৌতুকসৃষ্টির উপাদান হচ্ছে, মৃত্যুর পরেও স্বামীর ওপর রসময়ীর নিজ অধিকার অটুট রাখার হাস্যকর বাসনা।

ঘটনাসন্নিবেশচাতুর্যে হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়াস বিখ্যাত 'মাস্টার মহাশয়' গল্পটিতে লক্ষিত হয়। 'প্রণয়পরিণাম' গল্পে প্রভাতকুমার অকালপক্ক এক কিশোরের অবাস্তব প্রণয়স্বপ্নের ওপর একঝলক সস্নেহ কৌতুকের হাসি ছড়িয়ে দিয়েছেন। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে পোস্টআপিসের ডাকবাবু বিমলচন্দ্র গাঙ্গুলির বিকৃত রোম্যান্স-প্রবণতা লেখকের কৌতুকের বক্রহাসি আকর্ষণ করেছে। 'বিবাহের বিজ্ঞাপন'

অবস্থাপন্ন যুবক রাম আওতের রোম্যান্টিক অভিযান ও গুণ্ডার কবলে পড়ে তার হৃতসর্বস্ব হওয়ার ঘটনাটি লেখকের রসিকতাবোধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তৎকালীন রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিস্ট ব্যক্তিবিশেষের অসংগত আচরণের মধ্যেও তিনি হাস্যরসের উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে 'উকিলের বুদ্ধি,' 'হাতে হাতে ফল' গল্পদুটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। 'খোকার কাণ্ড' স্বামীস্ত্রীর ধর্মবিশ্বাসের বিরোধকে কেন্দ্র করে রচিত হাস্যরসাত্মক সুন্দর একটি গল্প। কৌতুক-রসোচ্ছল এরকমের আরো বহু গল্প প্রভাতকুমার লিখেছেন।

তবু প্রভাতকুমারকে ঠিক হাস্যরসিক বলা যায় না। তাঁর লেখনী থেকে গভীর রসের গল্পও আমরা পেয়েছি। সার্বজনীন মানবসত্যের দিকেও প্রভাতকুমার মাঝেমধ্যে তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করে ধরেছেন, যে স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা সর্বস্থানিক ও সর্বকালিক তার রূপায়ণেও তিনি উৎসাহী। 'দেশি ও বিলাতী' গল্পসংগ্রহ পুস্তকটিতে গ্রথিত 'ফুলের মূল্য' আর 'মাতৃহীন' গল্পদুটিতে মানুষের সুকোমল হৃদয়বৃত্তির যে-প্রকাশ আমরা দেখি তা দেশ-কাল-জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বচারী— ইংরেজ বাঙালির সমস্ত ব্যবধান সেখানে সম্পূর্ণ মুছে গেছে।

'কাশীবাসিনী,' 'আদরিণী' ও 'দেবী' এই তিনটি গল্প করুণরসাত্মক। ছোট গল্প হিসাবে এগুলি যে প্রথমশ্রেণীর রচনা, সমালোচকেরা এবিষয়ে একমত। প্রথমোক্ত গল্পটিতে এক পদস্খলিতা মাতার দুহিতৃস্নেহের মর্মস্পর্শী আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে। যে হৃদয়যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এই বিপথগামিনী জননী নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন তার বর্ণনা পাঠকচিত্তকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে।

দ্বিতীয়োক্ত গল্পে মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে [প্রাণীটি হল একটি হাতী, আদর করে তার নাম রাখা হয়েছে 'আদরিণী'] মানুষ হৃদয়প্রীতির সূত্রে জড়িয়ে পড়েছে। রসুলগঞ্জের হাটে বাধ্য হয়ে এই 'আদরিণী'কে পাঠিয়ে দিলে তার আঘাত 'আদরিণী'র পক্ষে যেমন মর্মান্তিক হয়েছে, তেমনি হাতীর মালিক মোক্তার জয়রাম মুখুজ্জ্যের পক্ষে—একের মৃত্যু অপরের মৃত্যুকে ডেকে এনেছে।

শেষোক্ত 'দেবী' গল্পের পরিণতি অতীব শোককরুণ। শক্তিসাধক শ্বশুর কালীকিঙ্কর একদিন স্বপ্নাদেশ পেলেন যে, জগজ্জননী কালী কৃপা করে তাঁর পুত্রবধূ দয়াময়ীর মূর্তিতে তাঁর গৃহে অবতীর্ণা হয়েছেন। সেদিন থেকে মানবী দয়াময়ী দেবীর পদে অভিষিক্তা হলেন। দয়াময়ী কিন্তু দেবী হতে চায় না, চায় মানবীরূপে বাঁচতে। কিন্তু অপরের ধর্মসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস তার সেই অভিলাষ চরিতার্থ হতে দিল না। ঘটনার ঘূর্ণীচক্রে পড়ে ক্রমে দয়াময়ীর নিজেরই বিশ্বাস হতে লাগল যে, সে প্রকৃতই বুঝি দেবী। কিন্তু একদা নিদারুণ এক আঘাতে নিজের দেবীত্বে অদৃষ্টবিড়ম্বিতা দয়াময়ী বিশ্বাস হারাল, এবং আপনার অসহনীয় দেবীমহিমা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে গলায় দড়ি লাগিয়ে আত্মহত্যা করল। অন্ধধর্মসংস্কারের মূলে তার এই আত্মবলিদান কারুণ্যে মর্মবিদারী!

ছোটগল্প লিখে প্রভাতকুমার বাঙালির অন্তর জয় করেছেন, প্রচুর খ্যাতির

অধিকারী হয়েছেন। সাম্প্রতিককালের অনেক ছোটগল্পকার উৎকৃষ্ট গল্প লিখেছেন, কিন্তু সর্বস্তরের পাঠকের প্রীতি আকর্ষণ করতে তাঁরা পারছেন না। কারণ সুস্থ জীবনের প্রসন্নতা তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন, যুগের যন্ত্রণায় জীবন তাঁদের কাছে তিক্ততায় পূর্ণ, বিস্বাদ। সুতরাং তাঁদের রচনা কী করে মধুস্বাদী হবে? প্রভাতকুমার সমস্যাকণ্টকিত জীবনের রূপকার নন, তাঁর দৃষ্টি উদার প্রসন্ন, তাঁর সৃষ্টি অনাবিল হাসির লাবণ্যে সিক্ত। এ কারণে সাধারণ পাঠক প্রভাতকুমারকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি জানায়।

॥ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ একদা বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের [১৮৭৬-১৯৩৮] চকিত আবির্ভাব সকলকে চমকিত করেছিল। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পে প্রতিভার মৌলিকতার এমন একটি ছাপ ছিল যা কোনো সাহিত্যরসিকের দৃষ্টি এড়ায়নি। অল্পকালের মধ্যে পাঠকসমাজের কাছে শরৎ চট্টোপাধ্যায় যে-সমাদর পেলেন সত্যিই তার তুলনা হয় না।

খুব অল্পবয়সেই শরৎচন্দ্র সাহিত্যনির্মাণে ব্রতী হন। তাঁর বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর তখন 'কাশীনাথ' উপন্যাসখানি রচিত হয়। তাঁর প্রথমমুদ্রিত গল্পটির নাম 'মন্দির'—এর জন্যে তিনি 'কুন্তলীন পুরস্কার' পেয়েছিলেন [১৯০২ ইংরেজী সালে]। চৌদ্দ থেকে বাইশ বছরের মধ্যে শরৎচন্দ্র বড়দিদি, চন্দ্রনাথ ও দেবদাস রচনা করেন। 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' গল্পটি প্রকাশিত হলে [১৯০৭] তাঁর খ্যাতি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৩ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর জীবনের সুদীর্ঘ তেরটি বৎসর শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে কাটিয়েছেন, সেখানে সরকারি অফিসে কেরানীর কাজ করিতেন তিনি। ১৯১৬ সালে রেঙ্গুন ত্যাগ করে বাঙলাদেশে চলে আসেন। এখানে এসেই শরৎচন্দ্র পূর্ণোদ্যমে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। বাঙলা উপন্যাস-সাহিত্যকে তিনি কী পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছেন তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

অসামান্য সৃজনীক্ষমতার অধিকারী ছিলেন শরৎচন্দ্র। তাঁর রূপসৃষ্টির অপূর্ব মৌলিকতা ও রম্যতা সর্বজনস্বীকৃত। বঙ্কিম-রবীন্দ্রের লালিত বাঙলা কথাসাহিত্যের পরিধি তিনি যে কতখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন, এর মধ্যে কতখানি বৈচিত্র্য এনেছেন সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার পরিচয়দান একরূপ অসম্ভব আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে শরৎচন্দ্র একটি নূতন পথে অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন। অতিশয় সংবেদনশীল হৃদয়, জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, আর সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তা সাহিত্যসংসারে তাঁকে নতুন রসধারার উৎসের সন্ধান দিয়েছে।

বাঙলার মধ্যবিত্তশ্রেণীকে কেন্দ্র করেই শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসের ধারা আবর্তিত হয়েছে। তাঁর নির্মিত সাহিত্যে বর্তমানে বাঙলার সমাজ সম্পর্কে বিরাট একটি জিজ্ঞাসা। ক্ষমাহীন, নিষ্করুণ, মূঢ়তায় আচ্ছন্ন, আত্মপীড়ননিরত বাঙালি-সমাজের বিশ্বস্ত আলেখ্য তিনি দেশের পাঠকসাধারণের সমক্ষে উন্মোচিত করে ধরেছেন।

অত্যাচারিত মানবের আত্মার ক্রন্দন শরৎসাহিত্যের পাতায় পাতায় প্রতিধ্বনিত। মধ্যবিত্তসমাজের দুঃখবেদনার এতবড়ো কাব্যকার বাঙলাদেশে ইতঃপূর্বে আমরা দেখিনি।

শরৎসাহিত্যে যে-প্রশ্নটি বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে তা অর্থনীতি কিংবা রাজনীতির নয়—সমাজনীতির। সমাজের যে-কঠিন অনুশাসনে নরনারীর জীবন অনুক্ষণ এমনভাবে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে তাতে আছে কোন্ সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের আদর্শ? যে-সমাজব্যবস্থা মানুষের প্রাণশক্তিকে তিলে তিলে ক্ষয়িত করছে, সেই সমাজশক্তির স্বরূপ কী? তবে লক্ষ্য করতে হবে, শরৎচন্দ্র বহুবিধ সমস্যাবিষয়ে আমাদের সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন, কিন্তু তার সমাধানের প্রতি কোনো ইঙ্গিত করেননি।

নারীচরিত্রচিত্রণে তিনি আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নারীজীবনের অনুচ্চারিত বেদনার অগাধ উপলব্ধি তাঁর সাহিত্যকে একটা উজ্জ্বল অপূর্বতা দান করেছে। নারীর অবচেতন প্রবৃত্তি এবং সজ্ঞান সংস্কার এ দুয়ের বিচিত্র দ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্রের রচনায় অদ্ভুত লিপিকুশলতাসহকারে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর উত্তম ট্র্যাজেডিগুলিতে নারীর প্রাধান্য কারো দৃষ্টি এড়াবার নয়। এতখানি নিবিড় সহানুভূতিযোগে, এমন প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী ভাষায়, নারীর কথা আর কোন্ বাঙালিলেখক বাণীবদ্ধ করেছেন?

মনস্তত্ত্বমূলক কথাসাহিত্যের যে-ধারাটি রবীন্দ্রনাথে প্রথম সূচিত হল তাকে ব্যাপ্তি দান করলেন বাঙলার সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাসকার শরৎচন্দ্র। মানব-মানবীর মনোলোকের দ্বার তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সমক্ষে অবারিত ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর কবিপ্রাণের প্রগাঢ় অনুভূতি। সমাজস্থ অসহায় মানুষের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি ও মমত্ববোধ, অন্তরের সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়ে তাদের বেদনার মুখে ভাষাদান, সমাজের অন্যায়অবিচারের বিরুদ্ধে অবিরল প্রতিবাদ উচ্চারণ, মানবিক সত্যকেই সকল সত্যের সেরা সত্য বলে সোচ্চার ঘোষণা, তাঁর উপন্যাসনিচয় আর গল্পমালাকে সকলের প্রাণের সামগ্রী করে তুলেছে। লীলাচঞ্চল নদীপ্রবাহের ন্যায় গতিশীল ও গীতধর্মী ভাষা তাঁর রচনাকে যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনি রসঘন করেছে।

শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ বাস্তবের দিকে তাকিয়েছেন, আমাদের পরিচিত সংসার থেকে উপকরণ কুড়িয়ে নিয়ে সাহিত্যের সৌন্দর্যলোক নির্মাণ করেছেন। এই হিসেবে তাঁকে আমরা 'রিয়ালিস্ট' অর্থাৎ বাস্তবতন্ত্রী বলতে পারি। কিন্তু নগ্নতা, নিরাবরণ, কুশ্রীতা, বিকৃত রুচি, ইত্যাদি নিয়ে যে একরকম 'রিয়ালিজম্' সাহিত্যে দেখা দিয়েছে শরৎচন্দ্রের বস্তুতান্ত্রিকতা সেই রকমের নয়। বাস্তবে ঘটলেও সব ঘটনাই যে সাহিত্যের সত্য নয়, শরৎচন্দ্র তা জানতেন। তাই, তিনি সর্বপ্রকার বাস্তবকে তার উলঙ্গ নিরাবরণতায় বিকৃত সাহিত্যে স্থান দেন নি। যা আড়ালে থাকবার তাকে আড়ালেই রেখেছেন, যা গোপনে রাখবার তাকে আবরণে ঢেকেছেন। সূক্ষ্মবিচারে শরৎচন্দ্রকে আমরা 'আইডিয়ালিস্ট' বা ভাববাদীও বলতে

পারি। স্পর্শকাতর চিত্তের আবেগ শরৎচন্দ্রের বস্তুতান্ত্রিকতাকে একরকম রোম্যান্টিক আদর্শবাদে রূপান্তরিত করেছে।

কাহিনীগঠন, চরিত্রনির্মাণ, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ, প্রকাশরীতি—সর্বক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্র স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ভাষারীতি অত্যন্ত সহজ সরল, কিন্তু অপরের অননুকরণীয়। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাসমৃদ্ধ মনোরম গীতিভঙ্গিমা তাঁর ভাষায় অনুপস্থিত বটে, কিন্তু প্রাঞ্জলতা-ঋজুতার গুণে এ ভাষা অতিশয় চিত্তাকর্ষক। পরবর্তীকালের উপন্যাসকারদের মধ্যে অনেকেই শরৎচন্দ্রের কাছে নানাভাবে ঋণী। শরৎরচনাবলী সাহিত্যকর্ম হিসেবে অতিশয় বিশিষ্ট।

উপন্যাসের দিকেই শরৎচন্দ্রের শিল্পিমানসের সমধিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মনে হয়, ছোটগল্প তাঁর প্রতিভার ঠিক উপযুক্ত বাহন নয়। তাঁর রচিত সত্যকার ছোটগল্প সংখ্যায় অল্প। সে যা হোক, যে-কয়টি গল্প তিনি লিখেছেন সেগুলিতে তাঁর প্রতিভার ছাপ সুপ্রকট।

বাস্তব জীবনের কঠিন ভূমিতেই ছোটগল্পকার শরৎচন্দ্রের পদচারণা, মৃত্তিকার আকর্ষণ এড়িয়ে স্বপ্নসুন্দর কল্পলোকের দিকে তিনি ধাবিত হননি। একটা বিশেষ কালের সীমায় আবদ্ধ বাঙ্‌লার সমাজ, বাঙালির জীবন ও বাঙ্‌লার জলবায়ুর স্থানীয় রূপ—এদের সঙ্গে তাঁর যে প্রত্যক্ষ পরিচয় সেই পরিচয়কে পাথেয় করে, এবং নিজের ভাবুকতাময় দৃষ্টি নিয়ে তিনি গল্পরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন—বাঙ্‌লার সমাজজীবনের কতকগুলি হৃদয়গ্রাহী চিত্রে এঁকেছেন। এমন গভীর বর্ণে অঙ্কিত আলেখ্য অন্যকোনো লেখকের হাত দিয়ে বেরুয়নি। শরৎচন্দ্রের লেখা যে উপন্যাস বাঙালিচিত্তকে আলোড়িত করেছে সেই উপন্যাসের রস ছোটগল্পের পাত্রেও তিনি পরিবেশন করে গেছেন।

শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পগুলির বিশিষ্টতা রয়েছে। সাধারণত ছোটগল্পের আয়তন ক্ষুদ্র এবং এর পটভূমিও সংকীর্ণ। কিন্তু শরৎচন্দ্র এমন কয়েকটি গল্প লিখেছেন যেগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। এতে পটভূমি বেশ বিস্তীর্ণ, চরিত্রের বা পাত্রপাত্রীর সংখ্যা অধিক। কাহিনীগুলি যেন উপন্যাসের পক্ষেই বেশি উপযোগী। আবার, কতকগুলি গল্প ক্ষুদ্রাবয়ব হলেও এদের অন্তঃপ্রকৃতি খাঁটি ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে না। এগুলি যেন উপন্যাসের খসড়া—বিস্তৃত বিশ্লেষণ যুক্ত হলে এরা সহজেই উপন্যাস হয়ে উঠতে পারত। আরো উল্লেখ করা যেতে পারে, ঘটনার বৈচিত্র্য নয়, ছোটবড়ো চরিত্রের হৃদয়ঘটিত দ্বন্দ্ব, এদের তীব্র অন্তর্বিপ্লব ও সংকটের রূপায়ণ শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গল্পের লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। এরা ঘটনার তরঙ্গাভিঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে না—চরিত্রগুলির হৃদয়ের তলদেশে যে আবর্তসংকুল স্রোতোবেগ রয়েছে, এক চরমমুহূর্তে তাকে বাইরে উৎক্ষিপ্ত করে দেয়।

সাংকেতিকতা কিংবা আকস্মিকতার চেয়ে একটা সুনির্দিষ্ট পরিণামের ইঙ্গিতদানই এদের বৈশিষ্ট্য।

বাঙালির পারিবারিক জীবনের বিপরীতমুখী সংঘাত, হৃদয়মনের বিভিন্ন বৃত্তির বক্রতির্যক গতি, সমাজ ও সংস্কারের কঠিন প্রাচীরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে নরনারীর সত্তার গভীরে যে-সর্বনাশা ঘূর্ণীপাকের সৃষ্টি হয় তার রুদ্ধগর্জনধ্বনি, সমাজদ্বারা অবহেলিত মানুষের ভাগ্যবিড়ম্বনা, মূঢ়তার অচলায়তনে অবস্থিত মনুষ্যের বিকৃত মূর্তি, সামাজিক অসাম্যবৈষম্যজনিত বহুবিধ অনাচার—এই সমস্তই শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের উপজীব্য। এতদ্ব্যতীত, মাতৃস্নেহ ও নারীহৃদয়ের করুণা তাঁর কতকগুলি গল্পকে অমৃতধারায় নিষিক্ত করেছে।

শরৎচন্দ্রের গল্পবলার ভঙ্গিটি মনোজ্ঞ, ভাষা প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী, ভাবের সুমিত কালসংযম ও ঘটনানির্বাচনক্ষমতা খুবই প্রশংসার্হ। 'মহেশ' গল্পটি শরৎপ্রতিভার এক অতি-উত্তম সৃষ্টি। তা ছাড়া, সতী, মন্দির, অনুরাধা, একাদশী, বৈরাগী দর্পচূর্ণ, মামলার ফল, ছবি, বিলাসী, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, মেজদিদি প্রভৃতি গল্পে শরৎচন্দ্র কম লিপিকুশলতার পরিচয় দেননি।

* * *

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যনির্মাণপ্রতিভার পূর্ণতম অভিব্যক্তি তাঁর উপন্যাসগুলিতে। ছোটগল্পের স্বল্পায়তন পরিধিতে তাঁর সঞ্চরণ যেন বাধাগ্রস্ত। উপন্যাসের বিস্তৃত ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র অনায়াসগতি, এখানে তাঁর লেখনী নির্বাধ। অনেকগুলি উপন্যাসের রচয়িতা তিনি। এদের মধ্যে পল্লীসমাজ, দেবদাস, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত [চারটি পর্বে সমাপ্ত], গৃহদাহ, দেনাপাওনা, দত্তা, পথের দাবি, বিপ্রদাস, শেষপ্রশ্ন প্রভৃতি উল্লেখ্য। এ ছাড়া, শরৎচন্দ্রের কয়েকটি বই রয়েছে যেগুলি উপন্যাসধর্মী রচনা কিন্তু উপন্যাসের ব্যাপ্তি নেই বলে এদের বড়োগল্প বলা হয়ে থাকে, যেমন—বড়দিদি, পণ্ডিতমশাই, পরিণীতা, চন্দ্রনাথ, অরক্ষণীয়া, বৈকুণ্ঠের উইল, নিষ্কৃতি ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙলাসাহিত্যে দুজন খুব শক্তিমান ঔপন্যাসিকের অভ্যুদয় হয়েছিল—আমরা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কথাই বলছি। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙলা উপন্যাসের স্রষ্টা। বঙ্কিম বাঙলা উপন্যাসসাহিত্যের প্রবর্তয়িতাই শুধু নন, বঙ্কিমের হাতে এ শিল্পটি সর্বাঙ্গসুন্দর পরিণতিও লাভ করেছিল। প্রধানত অভিজাতসম্প্রদায় ও সমাজের উচ্চস্তরের নরনারীই বঙ্কিমসাহিত্যে বড়ো একটি স্থান জুড়ে রয়েছে। বঙ্কিমের প্রায় সবগুলি উপন্যাস রোম্যান্সলক্ষণাক্রান্ত। অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ, কল্পনার অবন্ধন বিস্তার, অতীত ইতিহাসের রাজ্যে স্বপ্নচারণা ইত্যাদি বঙ্কিমের উপন্যাসমালাকে বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করেছে। মানব-হৃদয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় তেমন লক্ষিত হয় না। তুলিকার দুয়েকটা বড়ো আঁচড়ে মানবমনের শক্তিশালী প্রবৃত্তিনিচয়ের আলোছায়ার খেলাকেই বঙ্কিম

তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। প্রচলিত সমাজনীতির আদর্শকেই বঙ্কিম মেনে নিয়েছেন।

বঙ্কিমের পরেই রবীন্দ্রের আত্মপ্রকাশ। উপন্যাস লিখতে বসে রবীন্দ্রনাথ অভিজাতসম্প্রদায়ের দিকে তাকালেন না, বাঙলার মধ্যবিত্তসমাজকেই তিনি তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য করে নিলেন। এদের দৈনন্দিন জীবনের আপাততুচ্ছতা ও দীনতার অন্তরালে হৃদয়ের যে-বিচিত্র খেলা চলেছে, রবীন্দ্রনাথ তার রূপায়ণেই মনোযোগী হলেন। প্রচলিত আদর্শের মাপকাঠি দিয়ে তিনি মানুষের আচার-আচরণকে বিচার করতে বসেননি, প্রায় সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি নিয়েই জীবনের বাস্তব সত্যের দিকে তাকিয়েছেন; তার সর্বপ্রকার দুর্বলতাসমেত মানুষকে তিনি নিজ সাহিত্যসংসারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

স্বীকার করতেই হয়, বঙ্কিমের তুলনায় রবীন্দ্রবিরচিত উপন্যাসে বাস্তবের প্রতিফলন অপেক্ষাকৃত বেশি। আমাদের কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে এক নতুন ধারা প্রবর্তন করলেন—নীতির ক্ষেত্রে পক্ষপাতশূন্যতায়, বাস্তবের সহজ স্বীকৃতিতে, সাহিত্যের পাতায় মানুষের প্রবৃত্তি ও হৃদয়দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে।

জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র গল্পে-উপন্যাসে এই রবীন্দ্রপ্রবর্তিত ধারারই অনুসারী। রবীন্দ্রানুবর্তন তাঁর রচনায় অতিশয় স্পষ্ট। তথাপি শরৎচন্দ্রের মৌলিকতা অবিসংবাদিত। বাঙলা উপন্যাসের ক্ষেত্রটিকে খুব বেশি না বাড়ালেও এর মধ্যে যে-পরিবর্তন তিনি আনলেন, এককথায় তা বৈপ্লবিক। তাঁর সমাজজিজ্ঞাসা আরো উগ্র, প্রচলিত অকরুণ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ প্রবলতর, উচ্চকণ্ঠ। চল্লিশপঞ্চাশ বছর আগেকার বাঙলাপল্লীসমাজের মূঢ়তা, হৃদয়হীনতা ও কদর্য স্বার্থপরতার চেহারাটি শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ উন্মোচিত করেছেন। আমাদের সমাজ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব সকলেরই জানা—'সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানি না'—এ কণ্ঠস্বর একজন বিদ্রোহীর।

শরৎচন্দ্রের কাছে নীতিবোধের উৎস ধর্মগ্রন্থের জীর্ণ পাতা নয়, এক্ষেত্রে তিনি মানুষের জীবন্ত হৃদয়ের দিকেই তাকিয়েছেন—মানবতাই তাঁর কাছে উচ্চতম নীতি। শরৎচন্দ্রের বিরচিত উপন্যাসপাঠে আর কী লাভ হয় জানি না, জানি শুধু, এগুলি পড়লে মানুষের হৃদয় চক্ষুষ্মান হয়ে উঠে। মানবমানবীর হৃদয়ের প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা অগাধ, তাঁর কাছে মানুষের মূল্য মানুষহিসাবে। অকুণ্ঠ মানব-স্বীকৃতি, মনুষ্যজীবনের নবমূল্যায়ন, শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসকে গভীর অর্থবহ করে তুলেছে।

বিষয়বস্তুর দিকে তাকিয়ে শরৎচন্দ্রের বড়োগল্প ও উপন্যাসগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তাঁর কতকগুলি বইয়ে বাঙালিপরিবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘাতের—স্নেহ-ঈর্ষা-স্বার্থবোধকে কেন্দ্র করে—বিরোধের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, যেমন—বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, নিষ্কৃতি, বৈকুণ্ঠের উইল প্রভৃতি বইতে। দ্বিতীয়ত, কয়েকটি উপন্যাসে সমাজঅনুমোদিত প্রেমের বিচিত্র লীলা মনোজ্ঞ

বাণীরূপ পরিগ্রহ করেছে, যেমন—চন্দ্রনাথ, বড়দিদি, কাশীনাথ, স্বামী, দেবদাস, বামুনের মেয়ে, পরিণীতা, পণ্ডিতমশাই প্রভৃতি বইতে। তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে সমাজনিন্দিত প্রেমের আলেখ্য চিত্রিত। প্রণয়ানুভূতির দুর্নিবার প্রভাব, মানবমনের অতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, সমাজের হৃদয়হীন কঠোরতা, প্রতিরুদ্ধ প্রেমের অশ্রুসিক্ত কারুণ্য, সামাজিক বিধিবিধানে পীড়িত নরনারীর প্রাণশক্তির অপচয়ের ছবি শেষোক্ত শ্রেণীর উপন্যাসগুলিতে শরৎচন্দ্র চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন।

শরৎচন্দ্রের প্রধান তিনটি উপন্যাস—চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত, গৃহদাহ—উপরে-কথিত শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এগুলির মাধ্যমে উপন্যাসকার যেন বলতে চেয়েছেন, একনিষ্ঠ প্রেম তথাকথিত সতীত্বের চেয়ে বড়ো। নারীত্বের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র মহৎধারণা পোষণ করতেন। যেসব নারী সমাজের চোখে পতিতা তাদের মধ্যে তিনি উচ্চতর মনুষ্যত্বের প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন।

'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্রের বহু আলোচিত একখানি উপন্যাস। এর প্রধান চরিত্র সাবিত্রী, সতীশ, কিরণময়ী, উপেন্দ্র প্রভৃতি। এতে নায়কনায়িকা যদি কেউ থাকে তাহলে তারা হল সতীশ আর সাবিত্রী। শরৎচন্দ্রের পরিকল্পিত আদর্শনায়ক ও আদর্শনায়িকার বৈশিষ্ট্যগুলি এ দুটি চরিত্রে পূর্ণভাবে বর্তমান। সাবিত্রী ও কিরণময়ীকে অসতী বলতে শরৎচন্দ্র নারাজ। তাদের অচরিতার্থ জীবনের বেদনা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। সতীশ-সাবিত্রীর মিলনের বাধা তাকে ব্যথিত করেছে। কিন্তু সমাজের মুখের দিকে তাকিয়ে এই বাধার প্রাচীর তিনি ভাঙতে পারেননি। কিরণময়ীর জীবন পিপাসা ছিল অমেয়, কিন্তু সে বঞ্চিত হয়েছে, পরিশেষে সে পাগল হয়ে গেল। কিরণময়ীর দ্বৈতব্যক্তিত্ব—তার প্রেমার্তি ও ভোগবাসনা—উপন্যাসে সুন্দর ফুটেছে। উপন্যাসহিসেবে 'চরিত্রহীন' অতিশয় বিশিষ্ট।

এইরূপ আরেকখানি বিশিষ্ট আখ্যায়িকা হল 'গৃহদাহ'। এখানে নায়ক মহিম, নায়িকা অচলা; প্রতিনায়ক সুরেশ। মহিম ও সুরেশের দ্বৈত আকর্ষণে অচলার চিত্তের দোলাচলবৃত্তি এবং শেষপর্যন্ত তার জীবনের শোচনীয় পরিণতি এ উপন্যাসের প্রধান বর্ণিতব্য বিষয়বস্তু। এতে অচলার দেহের অশুচিকে লেখক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেই দেখেছেন। নারী মোহবশে কিংবা সাময়িক ভুলভ্রান্তিতে দাম্পত্যনীতির বিরোধিতা করলেও, অবচেতন মনের স্তরে স্বামীর প্রতি নিষ্ঠার বর্তমানতাহেতু তার স্বামীপ্রেমের সমাধি রচিত হয় না—এ-ই বোধকরি 'গৃহদাহ' বইটিতে প্রচারিত শরৎচন্দ্রের তত্ত্বকথা। সমালোচ্য উপন্যাসে অচলা ও সুরেশের ভূমিকা সুচিত্রিত, মহিমের ব্যক্তিত্ব অস্পষ্ট, তাঁর আচরণ অস্বাভাবিক—মানবিকতায় সজীব তিনি নন।

শরৎচন্দ্রের প্রণীত প্রসিদ্ধ একখানি উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'। আত্মস্মৃতি, ভ্রমণকথা, উপন্যাস—'শ্রীকান্ত'-নামে আখ্যায়িকাখানি এই ত্রিবর্ণে রঞ্জিত। এর প্রধান আলোচ্য রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের আবাল্যপ্রণয়, দীর্ঘকালের প্রতিরুদ্ধ প্রেম পরিণামে এতে চরিতার্থতা লাভ করেছে। নারীর সংস্কার ও প্রবৃত্তিজীবনের দ্বন্দ্ব আখ্যায়িকা-

খানিতে চমৎকারভাবে রূপায়িত। দূরবিস্তৃত জীবনপথে পরিক্রমাকালে শ্রীকান্ত বহু নরনারীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছে, তাদের কাহিনী উপন্যাসে বর্ণিত মূলকাহিনীর সঙ্গে মিশে গিয়ে তাকে স্ফীতকায় করে তুলেছে। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার লিপিচিত্রণে 'শ্রীকান্ত' অতিশয় মনোজ্ঞ। ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, অভয়া-চরিত্র শরৎচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি—হৃদয়গ্রাহী এদের জীবনালেখ্য। উপন্যাসের সংহতি না থাকলেও, এতে ধারাবাহিকতা আছে; ভাবের ঐক্য খুব বেশী বিচলিত হয়নি। এর রসব্যঞ্জনা নিঃসংশয়িত। 'চরিত্রহীন' আখ্যায়িকায় শরৎচন্দ্রের ভাবজীবনের ও 'শ্রীকান্ত' আখ্যায়িকায় তাঁর বাস্তবজীবনের প্রতিফলন লক্ষ্য করবার বস্তু।

* * *

শরৎচন্দ্রের লেখা একটি বড়োগল্প বা ক্ষুদ্রাকৃতি উপন্যাস ['নিষ্কৃতি'] ও একটি ছোটগল্পের ['মহেশ'] সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই:

॥ নিষ্কৃতি ॥ গিরিশ, হরিশ ও রমেশ, এবং তাঁদের স্ত্রী যথাক্রমে সিদ্ধেশ্বরী, নয়নতারা ও শৈলজা, এবং তাঁদের পুত্রকন্যা নিয়ে ভবানীপুরের একটি যৌথ ব্রাহ্মণ-পরিবার। গিরিশ ও হরিশ সহোদর ভাই, রমেশ খুড়তুত ভাই। গিরিশ ও হরিশ উকিল। রমেশ কোনো কাজকর্ম করতেন না। গিরিশের উপার্জিত অর্থে বিরাট সংসার প্রতিপালিত হয়। হরিশ বিদেশে থাকেন, রমেশ বড় ভাইয়ের ওপর নির্ভরশীল। গিরিশের স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীর গৃহিণী হলেও তাঁর স্নেহলালিতা জা শৈল সংসারের সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিজেই সম্পাদন করে এমন কি লোহার সিন্দুকের চাবিগোছাও তার হাতে। এইরূপে বেশ সুখেশান্তিতে দিন কাটছিল। সহসা মেজভাই হরিশ একদিন মফঃস্বল থেকে বদলী হয়ে সদরে আসলেন। সুতরাং তাঁর সংসার অপর দুভায়ের সংসারের সঙ্গে মিলিত হল।

হরিশের স্ত্রী নয়নতারা অত্যন্ত স্বার্থপরায়ণা নারী। সে এসেই সিদ্ধেশ্বরী ও শৈলকে পরস্পর পৃথক ও শত্রুভাবাপন্ন করবার চেষ্টা করতে লাগল। শৈল নানা সদ্গুণে ভূষিতা হলেও তার বাহ্যচরিত্র এমন ছিল যার সুযোগ নিয়ে সরলহৃদয়া অথচ বুদ্ধিহীনা সিদ্ধেশ্বরীকে নয়নতারা সহজেই বশীভূত করে ফেলল। নয়নতারার চক্রান্তে অল্পদিনের মধ্যেই শৈলর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তার স্বামী কিছুই উপার্জন করে না, অথচ এ বাড়ীতে আর একদণ্ড থাকা চলে না। তাই, একরূপ নিরুপায় হয়েই স্বামীপুত্রকে নিয়ে শৈল একদিন তাদের দেশের বাড়ীতে চলে গেল। এই বাড়ীটিও আবার রমেশের নিজস্ব নয়, বড়ভাই গিরিশের খরিদ করা।

নয়নতারার স্বার্থবুদ্ধি সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে; শৈলকে ভবানীপুরের বাড়ী থেকে তাড়িয়েও সে নিশ্চিন্ত হতে পারল না,—দেশের বাড়ী থেকেও শৈলদের উৎখাত করবার জন্যে স্ত্রৈণ স্বামী হরিশকে দিনরাত সে উস্কাতে লাগল। হরিশ, স্ত্রীর প্ররোচনায়, বড় ভাইকে না জানিয়ে, ছোট ভাই রমেশের নামে দেওয়ানি মোকদ্দমা শুরু করে দিল। রমেশ খুবই বিপন্ন হয়ে পড়ল। সংসার চালাবার টাকা সে জোগাড় করতে পারে না, মোকদ্দমার খরচ চালায় কী করে। এরূপ

একটি সংকটাপন্ন অবস্থায় যা স্বাভাবিক তা-ই হতে লাগল—শৈলর ভাসুরদত্ত গহনাগুলি সব একে একে সে বেচে দিল। এভাবে একবৎসর কাটাবার পর শৈল যেদিন তার গায়ের শেষ গহনাখানি খুলে নিয়ে স্বামীর হাতে তুলে দিল সেদিন তার বেদনাবিদ্ধ হৃদয় থেকে এই কথাগুলি বেরিয়ে এল—'ঠাকুর, আর তো কিছু নেই এবার যেমন করে হোক্ আমাকে নিষ্কৃতি দাও।' শৈল চোখে অন্ধকার দেখছে, সংসারের দুঃখজ্বালা থেকে সে চিরকালের জন্যে মুক্তি চায়। তার অভিলষিত 'নিষ্কৃতি' কথার অর্থ হল—মৃত্যু।

শৈল-রমেশের অবস্থা যখন একান্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে সেই সময় কার্যোপলক্ষে গিরিশ একবার দেশে এল। চিরকালের স্নেহপালিত ভ্রাতৃবধূকে শীর্ণা জীর্ণা ও নিরাভরণা দেখে তাঁর উদার প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগল। এই আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় তিনি সেই মুহূর্তেই ছোটভাই রমেশের স্ত্রী শৈলর নামে দেশের সমুদয় বিষয়সম্পত্তি লেখাপড়া করে দিলেন। এর পর কলকাতায় ফিরে এলে সকলে যখন তাঁর নির্বুদ্ধিতার জন্যে তাঁকে গঞ্জনা দিতে লাগল, তখন তিনি বললেন—'ভরাডুবি থেকে মুখুজ্যেবংশকে আমি নিষ্কৃতি দিয়ে এসেছি।' গিরিশের কথিত নিষ্কৃতি দেওয়ার অর্থ হল পারিবারিক কলহের শোচনীয় পরিণামের হাত থেকে মুখুজ্যেবংশকে তিনি রক্ষা করলেন। শৈলর প্রার্থিত 'নিষ্কৃতি' ভাসুরের ভিন্ন ধরণের 'নিষ্কৃতি'-তে পরিণত হল।

শরৎচন্দ্র বাঙ্‌লার যৌথপরিবারের সুন্দর একটি চিত্র এঁকেছেন 'নিষ্কৃতি' বইখানিতে। এখানে কতিপয় চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতের নিপুণ বর্ণনা আছে। আমাদের সুখের সংসারে কী করে ভাঙন ধরে, স্বার্থবুদ্ধি একটা স্বচ্ছল পরিবারকে কীভাবে সর্বনাশের অভিমুখে অগ্রসর করে দেয়, উদারপ্রাণ ব্যক্তির উজ্জ্বল ত্যাগধর্মিতায় বাঙালিপরিবার ভরাডুবি থেকে যেমন করে রক্ষা পায়, 'নিষ্কৃতি' বইখানিতে গ্রথিত কাহিনীর মাধ্যমে শরৎচন্দ্র তা আমাদের দেখিয়েছেন। বাঙালির সংকীর্ণপরিসর গৃহজীবনের মধ্যে কত বৈচিত্র্যই-না শরৎচন্দ্র দেখতে পেয়েছেন, এবং এসবের চিত্রাঙ্কনে তাঁর শিল্পসিদ্ধি অসামান্য। 'নিষ্কৃতি' আখ্যায়িকায় বর্ণিত প্রত্যেকটি চরিত্র যেমন বাস্তব তেমনি প্রত্যক্ষবৎ। বাঙালির ঘরের কথা, একান্ত আপন জনের মতো, শরৎচন্দ্র ছাড়া অন্যকোনো লেখক বাণীবদ্ধ করতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

॥ মহেশ ॥ শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের উজ্জ্বলতম নিদর্শন 'মহেশ'। এখানে তাঁর লিপিচাতুর্য আমাদের বিস্মিত করে। এ গল্প একবার পড়লে মনের ওপর দাগ কেটে যায়। 'মহেশ' পল্লীবাঙ্‌লার দারিদ্র্যক্লিষ্ট সর্বহারা এক চাষী পরিবারের করুণ কাহিনী।

কাশীপুরের প্রজাশোষক ব্রাহ্মণভূস্বামী শিবচরণবাবুর জমিদারিতে গফুর জোলার বাস। একেবারে নিঃস্ব সে। অবিশ্রান্ত অভাব-অনটনের সঙ্গে নিত্য সংগ্রাম করে তার দিনগুলি কাটে। সংসার তার বড়ো নয়। তিনটি মাত্র প্রাণী—

গফুর নিজে, তার মা-মরা দশ বছরের মেয়ে আমিনা, আর বুড়ো একটি ষাঁড়—আদর করে গফুর তার নাম রেখেছে 'মহেশ'। এই অবলা জীবটির প্রতি গফুরের মমতার শেষ নেই।

সেবার পর-পর দু'সন অজন্মা হল। গফুর কোনোরকমে মাস দুয়েকের খোরাক জোগাড় করেছিল, কিন্তু এককুটা খড়ও সে পেল না। বৃষ্টিতে তার ঘরের ফুটো চাল দিয়ে জল গড়ায়, মহেশ অভুক্ত থাকে। ষাঁড়টির বুকের সব-কয়টি পাঁজর গোনা যায়। মুসলমান-চাষী গফুর তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি পায় না। অস্পৃশ্য বলে পুকুরের জল সংগ্রহ করাও তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, অপরে দিলে তবে সে একটু পেতে পারে।

বৈশাখের দিন। জমিদারের পুরোহিত তর্করত্ন রোগদুর্বল গফুরকে 'হারামজাদা', 'পাষণ্ড', বলে গালিগালাজ করে; তার অপরাধ, দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কেন সে ষাঁড়টিকে না-খেতে দিয়ে বাবলাতলায় বেঁধে রেখেছে। কিন্তু গফুর যখন তর্করত্নের কাছে কাহন দুই খড় ধার চায় তখন তিনি তাকে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গবাণ হেনে দ্রুতপদক্ষেপে চলে যান।

গফুরের যত চিন্তাভাবনা মহেশের জন্যে—বেঁধে রাখলে না খেয়ে মরবে, ছেড়ে দিলে প্রতিবেশীর অনিষ্টসাধন করবে। নিরুপায় হয়ে স্নেহাতুর গফুর ঘরের জীর্ণ চাল থেকে পুরানো পচা খড় টেনে নিয়ে মহেশকে খেতে দেয়, নিজের জন্যে বাড়া-ভাত তার ক্ষুধার্ত মুখে তুলে ধরে।

সেদিন জ্বরে শয্যাগত গফুর খবর পেল যে, মানিকঘোষের লোকেরা মহেশকে খোঁয়াড়ে দিয়েছে, যেহেতু ষাঁড়টি তাদের বাগানে ঢুকেছে। খবর শুনে দুর্গত গফুর তার শেষসম্বল পিতলের থালাটি একজনের দোকানে বাঁধা রেখে মহেশকে মুক্ত করল। খোঁয়াড় থেকে ফিরবার পথে মনে মনে সে স্থির করে ফেলল, মহেশকে কসাইয়ের কাছে বেচে দেবে; তাকে যে খেতে দেওয়ার মতো সামর্থ্য তার নেই। একজন মুসলমানক্রেতার কাছ থেকে দুটি টাকা বায়নাও নিয়ে ফেলল সে। কিন্তু পরের দিন এই কসাই ষাঁড়টিকে নিয়ে আসতে গেলে গফুর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তাকে তাড়িয়ে দিল—বায়নার টাকা-দুটি নিক্ষেপ করল মাটিতে। হিন্দুজমিদারের কানে গেল—গফুর কসাইয়ের কাছে গরু বিক্রী করতে চেয়েছিল। এই অপরাধের জন্যে নিজের কান মলে, নাকে খৎ দিয়ে, তাকে মার্জনা ভিক্ষা করতে হল।

নিঃসম্বল গফুরের দিন আর চলে না। দিনমজুরের খোঁজে বেরুল সে, কিন্তু কাজ মিলল না। ক্ষুধায়তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ভরাদুপুরে সে বাড়ী ফিরল। কন্যা আমিনার কাছে ভাত চেয়ে সে পেল না—ঘরে একমুঠো চাল নেই। তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে মেয়ের কাছে জল চেয়ে যখন জলও পেল না তখন গফুর ধৈর্য হারিয়ে মেয়ের গায়ে দু ঘা বসিয়ে দিল। চোখের জল মুছতে মুছতে কলসী নিয়ে মেয়েটি জলের সন্ধানে বার হল।

এমন সময় পেয়াদা এসে জানাল, এক্ষুনি তাকে জমিদার সদরে হাজির হতে হবে। আত্মবিস্মৃত গফুর পেয়াদাকে বলে বসল যে, কারো হুকুমের চাকর সে নয়, কাছারিবাড়ীতে এখন সে যেতে পারবে না। এই ঔদ্ধত্য জমিদার সহ্য করলেন না। তাকে সদরে টেনে নেওয়া হল, এবং যখন সে বাড়ী ফিরল তখন বেদম প্রহারে তার চোখ-মুখ-সর্বাঙ্গ ফুলে উঠেছে, বুকের ভিতর তার দুঃসহ অপমানের সুতীব্র জ্বালা।

উঠান থেকে সহসা আমিনার আর্তস্বর শোনা গেল। বাইরে এসে সে দেখে আমিনা মাটিতে পড়ে রয়েছে, মাটির কলসটি ভেঙে গেছে, আর, উঠানে-ছড়ানো-জল মহেশ তৃষ্ণার্ত জিহ্বা দিয়ে মরুভূমির মতো শুষে নিচ্ছে। অপ্রকৃতিস্থ গফুরের মাথায় খুন চেপে বসল। হাতের কাছে ছিল লাঙলের ফাল। সেটি তুলে নিয়ে গফুর মহেশের মাথায় সজোরে আঘাত করল। সেই প্রচণ্ড আঘাতে মুহূর্তেই মহেশের জীবনান্ত হল। কিয়ৎক্ষণ পরে গ্রামের মুচিরা এসে মৃত মহেশকে ভাগাড়ে নিয়ে গেল।

দুপুর গেল। সন্ধ্যা এল। তারপর গভীর রাত্রি। গফুর কন্যা আমিনার হাত ধরে পথে এসে দাঁড়াল। এ গ্রামে তার আর বাস করা সম্ভব নয়—সে চলেছে ফুলবেড়ের চটকলে, মজুরের কাজ করতে। উঠান পেরিয়ে সেই বাবলাতলায় এসে দাঁড়াল গফুর। সেখানে বাঁধা থাকত তার আদরের মহেশ—বহুকালের সঙ্গী, বন্ধু ও অন্নদাতা। হঠাৎ গফুর হু হু করে কেঁদে উঠল—কোথায় গেল তার প্রাণের মহেশ। অতঃপর ঊর্ধ্ব-আকাশের দিকে নিজের অসহায় দৃষ্টি প্রসারিত করে ধরে সর্বস্বান্ত গফুর আল্লাহ্‌র কাছে এই বলে নালিশ জানাল যে, যারা তার মহেশকে মাঠের ঘাস আর তৃষ্ণার জল থেকে বঞ্চিত করেছে, আল্লাহ্ যেন তাদের কসুর মাপ না করেন।

কন্যার হাত ধরে অন্ধকার পথে গফুর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। পিছনে পড়ে রইল একটি ঘটি আর থালাটা—জিনিসগুলো মহেশের প্রায়শ্চিত্তে লাগবে।

করুণরসাশ্রিত আশ্চর্য একটি গল্প শরৎচন্দ্র আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। বাঙলার এক নিরন্ন লাঞ্ছিত চাষীর জীবনকথা কী বিচিত্র বর্ণে রূপায়িত হয়েছে এই গল্পে। 'মহেশ' ছোটগল্পই অথচ এর পটভূমি কী বিস্তীর্ণ, আর, এর রসনিবিড়তা কি কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে?

'মহেশ'কে কেন্দ্র করে গোটা পল্লীসমাজের কত মানুষের চিত্র নিখুঁত ফুটেছে। একনিমেষেই আমরা চাক্ষুষ করলাম ব্রাহ্মণজমিদারকে, ব্রাহ্মণপণ্ডিত তর্করত্নকে, পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ মাণিক ঘোষকে, গো-ব্যবসায়ী কসাইটিকে, আর, গরুর মমতাকাতর মালিক গফুর জোলাকে। বর্ণনার বাহুল্য ব্যতিরেকেই, সামান্য দুয়েক কথায়, এদের প্রত্যেকের চরিত্র সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। একালের ব্রাহ্মণের ধর্ম আচারের মরুবালিতে শুকিয়ে গিয়ে লুপ্ত হতে বসেছে, জীবন্ত মানুষের চেয়ে নিষ্প্রাণ আচারই তাদের কাছে বড়ো। গফুর উপেক্ষিত অতিনগণ্য একজন চাষা,

অথচ চরিত্রমহিমায় এদের সকলকে সে ছাড়িয়ে গেছে। সে সর্বহারা, কিন্তু মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে দেয়নি।

এ গল্পের সবচেয়ে লক্ষণীয় বস্তু হল—মূক একটি প্রাণী মানুষের কাহিনীর রসকেন্দ্রে বিরাজ করছে। গল্পটিতে মহেশ অতিশয় বিশিষ্ট একটি চরিত্রের স্থলাভিষিক্ত। প্রকৃতপক্ষে এই মহেশ গ্রামবাঙলার নিঃস্ব চাষারই প্রতীক। তার প্রতি দরিদ্রতম গফুরের হৃদয়মমতার যে রসসেচন তারই ধারায় 'মহেশ' গল্পটি সঞ্জীবিত। বাক্যহারা পশু হলেও, মানুষের মতোই, সে সবকিছু বোঝে যেন—নিঃশব্দে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করবার পর একদিন সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বেরিয়ে পড়েছে। মহেশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গফুরেরও চাষাজীবনের মৃত্যু হল—এখন সে চটকলের মজুর।

নবম অধ্যায়

॥ কাব্য ও কবিতা ॥

ভূমিকাবাক্য :

এবার আধুনিক পর্বের অর্থাৎ একালের [ব্রিটিশ আমলেই বাঙলা সাহিত্যে একালের শুরু] বাঙলা কাব্যকবিতার কথা। প্রাক্‌ব্রিটিশ-যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যু [১৭৬০] প্রাচীনতন্ত্রী বাঙলা কাব্যের একরূপ অবসান ঘোষণা করল বলা যেতে পারে। ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের পরবর্তী কবিওয়ালা, পাঁচালিকার ও টপ্পাসংগীত-রচয়িতারা অবশ্য আরো কিছুকাল আমাদের পুরাতন কাব্য-ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এঁদের রচনার মধ্যে সত্যিকার শিল্পোৎকর্ষ তেমন কিছু ছিল না। স্থূল আনন্দ বিলিয়ে—ক্ষণস্থায়ী সাহিত্য-উত্তেজনা সৃষ্টি করে—এঁরা কবিতা ও গানের আসর থেকে যথাকালে বিদায় নিয়েছেন।

তারপর নতুন যুগের শুরু। ইংরেজ-আমলের কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় আধুনিকতার প্রথম অঙ্কুরোদ্‌গম। নবযুগের পূর্ণজাগরণের সমস্ত লক্ষণ তাঁর রচনাবলীতে অবশ্যই অনুপস্থিত। তিনি ছিলেন কিছুটা জাগ্রত, কিছুটা সুপ্ত—এক আলোআঁধারি জগতের মানুষ ঈশ্বর গুপ্ত। কিন্তু একথা স্বীকার্য যে, আধুনিক সাহিত্যাদর্শের গোড়াপত্তন করলেন তিনি। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙলা কবিতায় অনেকগুলো নতুন জিনিস আনলেন। কাব্যের বিষয়বস্তুনির্বাচনে তিনি মৌলিকতা দেখিয়েছেন। কবির নিজের ভাবনায় ও সমাজচেতনায় প্রথমপ্রকাশ দেখলাম তাঁর লেখায়, প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাব্যে তিনি প্রথম আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁকে নিঃসংশয়ে বঙ্গভূমিতে দেশবাৎসল্যের প্রথম উদ্গাতা বলা যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত আবিলতামুক্ত হাস্যরস আমাদের প্রথম পরিবেশন করলেন তিনি। রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী বাঙলা কবিতার শৈশবদিনের বিশিষ্ট কবি এই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। কাব্যের রূপরীতির বিচারে তিনি প্রাচীনপন্থী, কিন্তু মনোভঙ্গির দিক থেকে দেখলে তাঁকে একালের কবি বলতে কোন বাধা নেই।

ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক কাব্যের জমি তৈরী করলেন, কিন্তু তাঁর হাত দিয়ে সাহিত্যের উৎকৃষ্ট ফলন তেমন হল না। যথার্থ আধুনিক কাব্য এখনো দূরবর্তী—এর জন্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অভ্যুদয়কাল পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। ১৮১২ ইংরেজি সালে ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম, ১৮৬০ ইংরেজি সালে মাইকেলের

যুগান্তরকারী রচনা 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের আত্মপ্রকাশ। এই মাঝখানের স্বল্প-পরিসর সময়টিতে একজনমাত্র উল্লেখযোগ্য কবির আবির্ভাব হয়, তাঁর নাম—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যরচনের ক্ষেত্রে রঙ্গলাল কিছুটা স্বাতন্ত্র দেখিয়েছেন। দেবতার মহাত্ম্যখ্যাপনে তিনি উৎসাহী হলেন না, চিরবিচরিত ধর্মের আঙিনায় পদক্ষেপ করলেন না, নিজের কাব্যনির্মাণের উপাদান খুঁজলেন ইতিহাসের পাতায়—রচিত হল 'পদ্মিনী-উপাখ্যান', 'কাঞ্চিকাবেরী'। এদের বিষয়বস্তুর নতুনত্ব অনস্বীকার্য। কাব্যের কায়াগঠনেও রঙ্গলাল পুরোনো রাস্তা মাড়ালেন না, মঙ্গলকাব্যের রূপ-রীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে ইংরেজি কাব্যপন্থার শরণ নিলেন। দেশাত্মবোধের বলিষ্ঠ প্রকাশের জন্যেও রঙ্গলালের কবিকৃতি স্মরণীয়। এসব বৈশিষ্ট্য দেখালেও রঙ্গলালকে কিন্তু আধুনিক যুগের সত্যকার প্রতিনিধি-কবি বলা যায় না। ঈশ্বর গুপ্তের তুলনায় তিনি অবশ্যই অগ্রবর্তী কবি, তথাপি একথাও সত্য যে, ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্‌লাসাহিত্যে যে-ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন, তার গণ্ডী কাটিয়ে রঙ্গলাল অধিকদূরে এগিয়ে যেতে পারেন নি।

বাঙ্‌লা কবিতাকে চেহারায় ও অন্তঃপ্রকৃতিতে পূর্ণাঙ্গ আধুনিক করে তুললেন মধুসূদন দত্ত। আমাদের দেশে এতবড় শক্তিমান কবি এর আগে আর জন্মাননি। মাতৃভাষায় য়ুরোপীয় আদর্শের উত্তম কাব্য রচনা করা যেসম্ভব, তিনিই তা আমাদের দেখালেন—ঈশ্বর গুপ্ত আর রঙ্গলালের যুগে তিনি একরূপ অসাধ্যসাধন করলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ক্লাসিক্যাল সাহিত্য মধুসূদনের হাতের মুঠোয় ছিল; পাশ্চাত্ত্য মহাকবিকুলের ভাবকল্পনাকে তিনি বাঙ্‌লা ভাষার খাতে বইয়ে দিলেন, এক আশ্চর্য অভিনব ছন্দের [মিল্টনী ছন্দ অমিত্রাক্ষর] প্রবর্তন করলেন। আকৃতি ও ভাবধর্মে তাঁর লেখা কাব্যকবিতা [যেমন—মহাকাব্য, নাট্যধর্মী খণ্ডকাব্য, পাশ্চাত্ত্য 'ওড্‌'-জাতীয় কবিতা, 'সনেট' বা চতুর্দশপদী কবিতা ইত্যাদি] এতখানি দুর্ধর্ষ স্বতন্ত্রতার পরিচয়বাহী যে, তাকে প্রথমে কেউ সহজ স্বীকৃতি জানাতে পারেনি —সেকালে এই কবিবিদ্রোহীকে বরখাস্ত করা কঠিনই ছিল। তাঁর ভাবকল্পনা, তাঁর ছন্দোরীতি-ভাষাভঙ্গি-অলংকারবিন্যাস—সবকিছুই অভিনব। যেখানে আগে জলতরঙ্গ বাজত সেখানে তিনি আমাদের অর্গান বাজনা শোনালেন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধে এবং স্বানুভূতির প্রকাশেও মাইকেল নিঃসন্দেহে আধুনিক।

পশ্চিমারীতির মহাকাব্যের প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করলেন তিনি, সেই পথে শোনা গেল হেম-নবীনের পদসঞ্চার। তারপর, ওই রাস্তা স্বাভাবিক কারণে রুদ্ধ হল, কৃত্রিম মহাকাব্যের যুগ তখন অবসিত। তার স্থানটি অধিকার করে নিল একদিকে গদ্যে-লেখা উপন্যাস, অন্যদিকে, আধুনিক-প্রকৃতির 'লিরিক' বা গীতি-কবিতা। একালের গীতিকবিতার আসল পথপ্রদর্শক হলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। বিহারীলালে যে-নতুন কাব্যধারার শুরু, রবীন্দ্রনাথের হাতে তার পরিপূর্ণতা। মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র কিছু কিছু লিরিক অবশ্য লিখে গেছেন, তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভূতির—সুখদুঃখ-আনন্দবেদনার—প্রকাশক গীতিধর্মী রচনা কিঞ্চিৎ আমাদের

উপহার দিয়েছেন। কিন্তু যথার্থ লিরিকের প্রাণধর্মের উজ্জ্বল পরিচয় তাতে সর্বথা ফোটে নি, ফুটেছে বিহারীলালের রচনায়। বাঙ্‌লা কবিতার মোড় তিনি ফিরিয়ে দিলেন, সেই পথ ধরেই আধুনিক গীতিকাব্যের সর্বাঙ্গীণ-সম্পূর্ণ বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার রসোচ্ছল যে-মূর্তি গড়লেন, ভারতীয় সাহিত্যে তার তুলনা নেই। এতবড়ো গীতিকবি য়ুরোপেও খুব বেশি জন্মান নি।

রবীন্দ্রযুগে কয়েকজন কবি গীতিকবিতা লিখেছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের স্বকীয়তাও দেখিয়েছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি কাব্যলোকের নির্মাতা তাঁরা কেউ নন। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর কিছুসংখ্যক কাব্যকার রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে পাশ কাটিয়ে ভিন্ন সুরের কবিতা লিখবার প্রয়াসী। এঁদেরই আমরা সাম্প্রতিক কবিগোষ্ঠী নামে চিহ্নিত করেছি। সাম্প্রতিক কবিতার সম্ভাবনা ও স্থায়িত্বের বিচার করবে ভাবীকাল।

কয়েকজন বিশিষ্ট আধুনিক কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

॥ মধুসূদন দত্ত ॥ আমরা এতাবৎকাল বাঙ্‌লাকাব্যের কুঁড়েঘরখানিতেই বাস করছিলাম যেন, প্রতিভাধর মধুসূদন দত্তের [১৮২৪-১৮৭৩] কবিপ্রাণের যাদুশক্তিতে এই কুঁড়েঘর রাতারাতি বিশাল এক অট্টালিকায় পরিণত হল। মধুসূদনের কাব্যরচনক্ষমতা আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে, মাত্র চার বৎসরকালের [১৮৫৯-৬২] সারস্বত সাধনায় তাঁর হাতে বাঙ্‌লা কাব্যের জন্মান্তর হল। একেই বলে প্রতিভার অসাধ্যসাধন। বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব সত্যই এক স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। একজন যুগপ্রবর্তক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। আধুনিক বাঙ্‌লা কাব্যের শক্তিমান পথিকৃৎ তিনি। তাঁর হাতে যে-ধরণের সাহিত্য জন্মলাভ করল, আকৃতি ও প্রকৃতিতে আমাদের দেশে তা সম্পূর্ণ নতুন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিকর্মের সঙ্গে মাইকেলের রচনাসম্ভারের কোনোই মিল নেই। একদিকে বহুবিধ মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবগীতি, শাক্তগীতি; অন্যদিকে, মধুসূদনের কৃত তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী ইত্যাদি; এদের মধ্যে যে প্রভেদ তা সামান্য নয়—একেবারে দিন ও রাত্রির প্রভেদ। দেবতার স্বপ্নাদেশ পেয়ে মধুসূদন কাব্যরচনে প্রবৃত্ত হননি, কোনো ধর্মের মাহাত্ম্যকীর্তন করতে তিনি হাতে লেখনী তুলে নেননি—কাব্যলক্ষ্মীর নিগূঢ় নির্দেশেই তিনি সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

মধুসূদনের কবিজীবনের প্রারম্ভ যেমন অদ্ভুত, তেমনি, অদ্ভুত এর সমাপ্তি। এ যেন রাতের আকাশের বহ্নিমান এক প্রকাণ্ড উল্কাপিণ্ড—দুরন্ত গতি আর তীব্রতম রশ্মিমালা নিয়ে চকিতে আবির্ভাব ও ক্ষণপরে নিঃশেষে বিলীন হয়েযাওয়া। যতক্ষণ আকাশে বিরাজমান থাকে ততক্ষণ জলন্ত উল্কার অস্তিত্বের স্বরূপটি ঠিক বুঝতে পারা যায় না, নিভে-গেলে-পর উপলব্ধি করতে পারি তার সত্যকার পরিচয়। বাঙ্‌লা সাহিত্যে মধুসূদন যে-আলোকশিখা ছাড়িয়ে গেলেন এতদিনে তার উজ্জ্বলতা হয়তো

কিছুটা কমেছে, কিন্তু নির্বাপিত হয় নি। পরবর্তী কবিদলের কাব্যকবিতার মধ্য দিয়ে ওই শিখার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

এবার আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যমালার কিঞ্চিৎ পরিচয় নেব। পাঁচখানি তাঁর কাব্যগ্রন্থ—তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা ও চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

তিলোত্তমাসম্ভব মাইকেলের প্রথম কবিকর্ম। কাব্যখানি চারটিমাত্র সর্গে সমাপ্ত। এর আখ্যানবস্তু অতিশয় সামান্য। উচ্চতর শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ কোনো পরিচয় এতে নেই। ভাষা, ছন্দ ও স্তবন্ধন-কল্পনা নিয়ে মধুসূদন এখানে যেন অভিনব এক কাব্যলেখায় মেতেছেন। ভবিষ্যতে যে-কবি মহাকাব্যসংরচনে নামবেন, 'তিলোত্তমাসম্ভব'-এ তারই প্রস্তুতি চলছে যেন; কবি বুঝি তৈরি করলেন পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্যের একটি খসড়া। বর্তমান ছন্দিত রচনাটিতে মাইকেল দেশীয় কাব্যপুরাণ ও দেশীয় কাব্যরীতির ওপর য়ুরোপীয় ভাবকল্পনার কিঞ্চিৎ বর্ণসম্পাত করেছেন। 'তিলোত্তমাসম্ভব'-এর রূপলোকটিকে এক অবাস্তব স্বপ্নের অরণ্য বলা যেতে পারে—মধুসূদনের অপটু হাতের চিহ্ন কাব্যখানির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে। তথাপি কবিকৃতিহিসেবে এর নবত্ব সকল কাব্যামোদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাস্তবিকপক্ষে ১৮৬০ সালে 'তিলোত্তমাসম্ভব'-এর আত্মপ্রকাশ বাঙ্লা সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা করেছে, এর মধ্যেই প্রথম আমরা শুনলাম রোমান্টিক ভাবধারার প্রথম কলধ্বনি।

সমালোচ্য কাব্যে জয়পরাজয়ের একটি ক্ষীণ কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। কাহিনীটি এই :

সুন্দ-উপসুন্দ অত্যন্ত পরাক্রমশালী দুই দৈত্যভ্রাতা। এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গলোকের অধিকার হারিয়েছেন। হৃতস্বর্গ কী উপায়ে পুনরুদ্ধার করা যায় তা জানবার জন্যে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতা ব্রহ্মলোকে গিয়ে বিশ্বনিয়ন্তা ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মা তাঁদের কথা শুনে বললেন, বরপুষ্ট দৈত্যভ্রাতৃদ্বয় সমরে অজেয়, উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েই তাদের উচ্ছেদসাধন সম্ভব।

আবার এক নতুন সমস্যা—বিচ্ছেদ ঘটানো যায় কী করে? এমন সময় দৈববাণী শুনতে পেলেন দেবতারা : বিশ্বকর্মাকে দিয়ে এক অলোকসামান্যা সুন্দরী সৃষ্টি করা হোক, এই নারীই দৈত্যভ্রাতৃযুগলের মধ্যে বিচ্ছেদ আনবে। দেববৃন্দের অনুরোধে শিল্পী বিশ্বকর্মা জগতের সমুদয় বস্তু থেকে তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করে নির্মাণ করলেন এক পরমাশ্চর্য রমণীমূর্তি—সৌন্দর্যে অনুপমা। মূর্তিটিতে যথাসময়ে প্রাণসঞ্চার করা হল। এই অপূর্বসুন্দর নারীরই নাম 'তিলোত্তমা'। কামদেবতা মদন রূপসী তিলোত্তমাকে নিয়ে দৈত্যপুরীতে প্রবেশ করলেন।

সুন্দ-উপসুন্দ তার রূপে উন্মত্ত হয়ে উঠল, উভয়ে চাইল তাকে নিজের অধিকারে আনতে। এতকালের পারস্পরিক প্রীতি তারা একমুহূর্তে ভুলে গেল, দুভাইয়ের শুরু হল সাংঘাতিক সংঘর্ষ, এবং এতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে দুজনেই প্রাণত্যাগ করল। অতঃপর ইন্দ্রাদি দেবগণ অপরাপর দৈত্যদের যুদ্ধে অনায়াসে পরাজিত করে হারানো স্বর্গরাজ্য নিজেদের অধিকারে ফিরিয়ে আনলেন।

'তিলোত্তমাসম্ভব' নারীর মোহিনীশক্তির জয়গাথা, লিরিকের দীপ জালিয়ে কবি রূপসৌন্দর্যের আরতি করেছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নারীর এই বিশ্ববিজয়িনী মূর্তির উদাত্ত সংগীত আমাদের শুনিয়েছেন তাঁর অবিস্মরণীয় লিরিক 'উর্বশী'র মাধ্যমে।

'তিলোত্তমাসম্ভব' আদ্যন্ত অমিত্রাক্ষরে রচিত। পয়ার-লাচাড়ি-প্লাবিত বাঙ্‌লা কাব্যসাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পয়ার-লাচাড়ি ইত্যাদি ছন্দ এতকালযাবৎ আমাদের শুনিয়েছে অল্পতরঙ্গ স্রোতস্বিনীর কুলকুলধ্বনি, মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দই প্রথম আমাদের শোনাল উত্তাল মহাসমুদ্রের কল্লোলসংগীত।

মধুসূদনের সর্বোত্তম কবিনির্মিত মেঘনাদবধ-কাব্য—১৮৬১ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থখানি মধুসূদনকে অমরতা দান করেছে। এতে কবির যুগান্তকারী প্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত। 'মেঘনাদবধ'-এ বিষয়বস্তুর অসামান্যতা কিছু নেই, আছে সামান্য উপকরণে অসাধারণ রূপসৃষ্টির কুশলতারপরিচয়। ক্ষুদ্র একটি ঘটনাকে শক্তিধর মাইকেল মহাকাব্যোচিত উদাত্ততা [sublimity] দিয়েছেন। হৃদয়ের বহুবিচিত্র ভাবানুভূতিকে গভীর-গম্ভীর সংগীতে ফোটাবার কী আশ্চর্য ক্ষমতা বাঙ্‌লা ভাষায় রয়েছে, এই কাব্যে মধুসূদন তা আমাদের দেখালেন।

'মেঘনাদবধ' নামটিই গ্রন্থখানিতে বর্ণিত কথাবস্তুর ইঙ্গিতবাহী। রামানুজ লক্ষ্মণের হাতে লঙ্কেশ্বর রাবণের বীরপুত্র মেঘনাদের নিধন-ঘটনাই বর্তমান কাব্যের বর্ণনীয়। এর মূল আখ্যান বাল্মীকির রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও, সংস্কৃত কিংবা বাঙ্‌লা রামায়ণ পড়ে মধুসূদন এ কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেননি। আলোচ্যমান কাব্যে মানবের পৌরুষদৃপ্তমূর্তির যে-আলেখ্য রূপায়িত, ও নিয়তিকবলিত মানুষের মর্মান্তিক পরাজয়ের যে-কাহিনী বাণীবদ্ধ হয়েছে তার আদর্শের জন্যে মাইকেল প্রধানত গ্রীককবি হোমারের কাছেই ঋণী। হোমারের কাব্যভাবনা মধুসূদনকে প্রাণিত করেছিল। অবশ্য হোমারই শুধু আমাদের কবির একমাত্র ঋণদাতা নন, কাব্যখানি লিখতে বসে মধুসূদন বস্তুত ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের নানা কবির কাব্য-ভাণ্ডার থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। মাইকেল একদিকে যেমন ভারতীয় সাহিত্যের বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতির দ্বারস্থ হয়েছেন, অন্যদিকে, তেমনি, পশ্চিমা সাহিত্যের হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো, মিলটন ও বায়রণের দিকে তাকিয়েছেন। 'মেঘনাদবধ' য়ুরোপীয় শিল্পাদর্শেই রচিত।

কাব্যখানির কায়াগঠনে মধুসূদন যদিও মাধুকরীর আশ্রয় নিয়েছেন তথাপি আমরা দেখতে পাব, এতে তাঁর মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হয় নি। কারণ, কঙ্কাল যেখান

থেকেই সমাহৃত হোক, তাঁর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছে কবির সৃজনীপ্রতিভা। এর ছত্রে ছত্রে আমরা মধুসূদন দত্তের কবি-আত্মার স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। আর, এতে মাইকেলের পরুষকণ্ঠস্বরটি যে-কোনো পাঠক চিনে নিতে ভুল করবেন না।

নয়টি সর্গযুক্ত মেঘনাদবধ-কাব্যে কবি সুকৌশলে লঙ্কাযুদ্ধের তিন দিন ও দুই রাত্রির ঘটনা গ্রথিত করেছেন।

প্রথম সর্গের নাম—'অভিষেক'। বীণাপাণির আহ্বান ও বন্দনাগানে কাব্যের আরম্ভ। তারপর বস্তুনির্দেশ। রাজসভায় সমাসীন লঙ্কাধিপতি রাবণ দূতের মুখে প্রিয়পুত্র বীরবাহুর নিধনবার্তা শুনলেন। এতে অসহ্য হৃদয়যন্ত্রণা অনুভব করলেন তিনি। সহসা রাণী চিত্রাঙ্গদা সভাস্থলে প্রবেশ করে অনুযোগের সুরে বললেন, তাঁদের বীরসন্তান বীরবাহু প্রাণ হারাল পিতারই [অর্থাৎ রাবণের] দোষে। রাবণ পত্নীকে প্রবোধবাক্য শুনিয়ে, রাক্ষস সেনাকে রণসাজে সজ্জিত হওয়ার আদেশ দিলেন। এমন সময়ে পুরীর প্রাসাদউদ্যান থেকে পরাক্রান্ত পুত্র মেঘনাদ ছুটে এসে শোকাতুর পিতা রাবণের কাছে লঙ্কাযুদ্ধে সৈনাপত্য প্রার্থনা করলেন। পুত্রের প্রার্থনা লঙ্কেশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত হল। মেঘনাদের অভিষেকে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গের সকল ঘটনা ঘটেছে সুরলোকে—স্বর্গভূমির অধিবাসী দেবদেবিগণ এর অভিনেতা। দেবরাজ ইন্দ্র রক্ষোকুলরাজলক্ষ্মীর মুখে মেঘনাদের অভিষেক-সংবাদ শুনে বিচলিত হলেন। অতঃপর তিনি ইন্দ্রাণীকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাস অভিমুখে যাত্রা করলেন। দেবতাদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎ-বধের অস্ত্র পেলেন। অজেয় মেঘনাদের মৃত্যু আসন্ন হয়ে উঠল—রামানুজ এখন দৈববলে বলী। দ্বিতীয় সর্গটির নাম—'অস্ত্রলাভ'।

তৃতীয় সর্গ 'সমাগম' নামে চিহ্নিত। লঙ্কার প্রমোদউদ্যানে স্বামী মেঘনাদের প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব দেখে বধূ প্রমীলা শঙ্কিতা হয়ে উঠলেন। তাঁকে পুরীতে প্রবেশ করতে হবে। রামচন্দ্রের সেনাবাহিনী লঙ্কাবেষ্টন করে রয়েছে। তিনি অশ্বে আরোহণ করে বীরবিক্রমে লঙ্কার দিকে অগ্রসর হলেন, রামচন্দ্র তাঁকে বাধা দিলেন না। পুরীতে পৌঁছে যথাকালে তিনি স্বামীর সঙ্গে মিলিত হলেন।

চতুর্থ সর্গ, নাম—'অশোকবন'। অশোকবনে সীতা বন্দিনী। মেঘনাদ সেনাপতিপদে বৃত হয়েছেন, তাই, লঙ্কাপুরী আজ উৎসবে মেতেছে। চেড়ীদল সীতাকে ছেড়ে উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেছে। এই অবসরে বিভীষণের স্ত্রী সরমা সীতার কাছে এলেন, রাবণ কীরূপে তাঁকে হরণ করল, তাঁর মুখে তা শুনতে চাইলেন। সীতা রাবণের দুষ্কার্যের কথা ধীরে ধীরে বলে যেতে লাগলেন। সীতা-সরমা-সংবাদ মেঘনাদবধের শাখাকাহিনী—এর মাধ্যমে কবি সুকৌশলে অনেকগুলি অতীত ঘটনা ও ভাবী ঘটনার উপর আলোকপাত করেছেন।

'উদ্যোগ' নাম রেখেছেন কবি পঞ্চম সর্গের। বহু বাধা, বহু প্রলোভন অতিক্রম করে, লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রীদেবী মহামায়ার প্রসাদে, লক্ষ্মণ আপনার অভীষ্ট বর

লাভ করলেন। ধীরে প্রভাতসমাগম হল, প্রমীলা ও মেঘনাদ শয্যা ছেড়ে উঠলেন। মেঘনাদকে আজ যুদ্ধে নামতে হবে। মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাঁর অনুমতি নিয়ে, মহারথী মেঘনাদ যজ্ঞশালার দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রমীলা দেবী ভগবতীর কাছে স্বামীর কুশল প্রার্থনা করলেন। লক্ষ্মণ-কর্তৃক চণ্ডীর পূজা ও বরপ্রাপ্তি-ঘটনাই পঞ্চম সর্গের প্রধান বর্ণনায়।

ষষ্ঠ সর্গের নাম রাখা হয়েছে—'বধ'। নিকুম্ভিলাযজ্ঞাগারে মেঘনাদ আপন ইষ্টদেবতার আরাধনায় রত। এরূপ একটি অবস্থায় বিভীষণকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মণ তস্করের মতো সেই যজ্ঞগৃহে সহসা প্রবেশ করলেন। ইন্দ্রজিৎ সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। দেবঅস্ত্রধারী লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হবার কোন সুযোগ দিলেন না, একরূপ বিনাযুদ্ধে তাঁকে হত্যা করলেন। ইন্দ্রজিতের হত্যাকার্য সুসম্পন্ন করে লক্ষ্মণ শিবিরে রামচন্দ্রের কাছে ফিরে এলেন।

সপ্তম সর্গের নাম—'শক্তিনির্ভেদ'। রাত ভোর হতে-না-হতেই ইন্দ্রজিতের নিধনবার্তা লঙ্কানগরীতে ছড়িয়ে পড়ল। কৈলাসে মহাদেব মেঘনাদের শোচনীয় মৃত্যুতে বিষণ্ণ। ভক্ত রাবণকে রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত করবার জন্যে তিনি অনুচর বীরভদ্রকে লঙ্কায় পাঠিয়ে দিলেন। অমিতপ্রতাপ পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ শুনে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, ভাগ্য তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন। পুত্রহন্তার প্রতিশোধ নিতে হবে—তিনি নিজেই এবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। রাবণ শক্তিশেলে লক্ষ্মণকে আহত করলেন, সংজ্ঞাহারা হয়ে রামানুজ ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

অষ্টম সর্গ—'প্রেতপুরী'। সেই দিনের যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য অস্ত গেল। শক্তিশেলবিদ্ধ লক্ষ্মণের পাশে শ্রীরাম রোরুদ্যমান অবস্থায় বসে আছেন। ভক্তবৎসলা পার্বতী রামচন্দ্রের মনোবেদনায় ব্যথিত। তাঁর অনুরোধে মায়াদেবী লঙ্কায় আবির্ভূতা হলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরাম প্রেতপুরীতে গেলেন, এবং প্রেতাত্মিত দশরথের কাছ থেকে লক্ষ্মণের পুনর্জীবনলাভের উপায় জেনে নিলেন।

নবম তথা শেষ সর্গের নাম—'সংস্ক্রিয়া'। মূর্ছাহত লক্ষ্মণ সংজ্ঞা ফিরে পেলেন। রাত্রি প্রভাত হল। রামচন্দ্রের শিবিরে আনন্দকোলাহল। রক্ষোরাজ রাবণের মুখে বিষাদের ছায়াপাত হয়েছে, তিনি বুঝলেন—তাঁর পরাভব সমাসন্ন। পুত্রের প্রেতকৃত্য সমাপনের জন্যে রামচন্দ্রের কাছে সপ্তাহকালের যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করলেন রাবণ। শ্রীরাম তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন। তারপর শ্মশানদৃশ্য। শ্মশানশয্যায় মৃত স্বামীর পাশে শোকাতুরা প্রমীলা উপবিষ্টা। সিন্ধুতীরে চিতা জ্বলে উঠল, দেখতে দেখতে বীরদম্পতীর নশ্বর দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। চিতাভস্ম সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে রাক্ষসবৃন্দ অশ্রুসিক্ত চোখে শূন্য লঙ্কায় ফিরে এল। পুরীর সর্বত্র শোকের মসীকৃষ্ণ ছায়া, অতঃপর—'সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে'।

অশ্রুতে মেঘনাদবধ-এর আরম্ভ, অশ্রুতেই এ কাব্য শেষ হয়েছে।

মেঘনাদবধ-কাব্যে মধুসূদন মানুষের পৌরুষবীর্যের মহিমা কীর্তন করেছেন।

বাল্মীকির কল্পিত শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ কাব্যখানিতে রাবণ-মেঘনাদের পাশে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। পুরুষকারের সাধক, আত্মপ্রত্যয়শীল রাবণ ও মেঘনাদই কবির চোখে শ্রদ্ধেয়—দেবতার কৃপাপ্রার্থী রামলক্ষ্মণকে তিনি কাপুরুষ বলেই জ্ঞান করেন। লঙ্কেশ্বর ও তৎপুত্র মেঘনাদ অমিত শৌর্যের আধার, কিন্তু নয়তির নির্মম বরোধিতায় তাঁদের পরাজয় মানতে হল। মেঘনাদবধ দৈবাহত পুরুষের জীবনে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। ছন্দগরিমা, বাগ্‌বিভূতি, অলঙ্কারসজ্জা, চরিত্রচিত্রণকুশলতা, দূরাভিসারী কল্পনা, মধুসূদনের মেঘনাদবধ-কাব্যকে এক উচ্চাঙ্গের শিল্পকর্মের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। /

মেঘনাদবধকাব্য-প্রকাশের অল্পকাল পরে, ১৮৬১ সালে, কবির **ব্রজাঙ্গনা** প্রকাশিত হয়। 'ব্রজাঙ্গনা' বলতে কবি এখানে ব্রজনারী শ্রীরাধাকেই বুঝিয়েছেন। কাব্যটির সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বস্তু হল এর লিরিক ভঙ্গি, রোমান্টিক কল্পনা। সর্বসমেত আঠারোটি পদ এতে রয়েছে। খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষা নিলেও মধুসূদন যে নিজের বাঙালিত্ব—বাঙ্‌লার বৈষ্ণবতন্ত্রের প্রভাব—এড়াতে পারেন নি তার প্রমাণ এই 'ব্রজাঙ্গনা'। ব্যক্তিজীবনে যেমন, তেমনি, কবিজীবনেও মাইকেল ছিলেন বৈচিত্র্যের সন্ধানী। তাই, অমিত্রাক্ষর ছন্দে অপূর্ব দক্ষতা দেখাবার পর মিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধে নতুন ধরণের একটি গীতিকাব্য রচনা করলেন। /

জাঙ্গনার পদনিচয়কে মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য 'ওড্‌'-জাতীয় কবিতার সমগোত্রেয় বলেছেন। এতে প্রযুক্ত ছন্দের পরিচয়ও কবি জানিয়েছেন—বন্ধু রাজনারায়ণকে একখানা চিঠিতে তিনি লিখেছেন: 'আমি তোমাদের স্কন্ধে পয়ার বা ত্রিপদী চাপাইতে চাহিতেছি না—ইতালীয় মিশ্রছন্দকে বাঙ্‌লায় আনা যায় না কী?' যুগপ্রাচীন পয়ার-লাচাড়ির মিশ্রণসাধন করেই মধুসূদন অভিনব ছন্দের রূপকল্প [pattern] নির্মাণ করলেন। 'ব্রজাঙ্গনা'-য় চরণ ও স্তবক-গঠনের ক্ষেত্রে কবি যে-বৈচিত্র্য ফুটিয়েছেন তা লক্ষ্য করবার মতো। মত্রাক্ষর-ছন্দ-নির্মাণে মাইকেল কতখানি কুশলী ছিলেন তার পরিচয় অনেকেরই জানা নেই।

'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে শ্রীরাধার কথা থাকলেও একে কিছুতেই বৈষ্ণবপদাবলীর পর্যায়ভুক্ত করা চলে না: কারণ, বৈষ্ণব কবির প্রগাঢ় আত্মিক অনুভূতি এতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, পদাবলীসাহিত্যের ভাবৈশ্বর্যও এখানে মিলবে না। বৈষ্ণবগীতি মুখ্যত গানের জিনিস, 'ব্রজাঙ্গনা' নিছক গীতিকবিতা—পাঠ করবার জন্যে লেখা। বৈষ্ণবের পদাবলী ঈশ্বরীয় প্রেমের কবিতা, মধুসূদনের বিরচিত পদগুলি প্রকৃতি-প্রেমাশ্রয়ী। সে যা হোক, 'ব্রজাঙ্গনা' নিঃসন্দেহে সেকালে পাঠকের অকুণ্ঠ সমাদর পেয়েছিল।

১৮৬২ সালে কবির পত্রিকাকাব্য **বীরাঙ্গনা** প্রকাশিত হয়। এই চতুর্থ কাব্যখানিতে মাইকেল পুনর্বার অমিত্রাক্ষর ছন্দের আশ্রয় নিলেন। বর্তমান পুস্তকখানিতে গ্রথিত হয়েছে এগারজন 'বীর' অর্থাৎ নায়িকা-আদর্শের 'অঙ্গনা'র [নারীর] বিরহভাবনাযুক্ত প্রেমানুভবমূলক পত্র। অবশ্য দুয়েকটি পত্রে ভিন্ন সুরের

পরিচয় পাওয়া যায়। রোমক কবি Ovid-এর 'Heroides' কাব্যখানি পত্রাকারে রচিত। এই আদর্শে ইংরেজ কবি Pope-এরও কিছু রচনা রয়েছে। অনুমান করা যায়, 'বীরাঙ্গনা'য় এ দুজন কবির কাব্যরীতি কতকটা অনুসৃত হয়েছে। Ovid পুরাণকথিত বিভিন্ন নায়িকাকে নতুন মূর্তিতে গড়েছেন; মধুসূদন ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত কয়েকজন নারীর হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন। এসব নারী পৌরাণিক যুগের, কিন্তু 'ব্রজাঙ্গনা'র কাব্যভাবনা আধুনিক কালের।

কবির কল্পিত চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান, তাদের ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট। এই কাব্যে পতিপ্রেমের উজ্জ্বল আলেখ্য যেমন আছে, তেমনি সমাজ-অস্বীকৃত প্রেমের শিল্পসম্মত রূপায়ণও স্থান পেয়েছে। দুঃশলা, ভানুমতী, শকুন্তলা, রুক্মিণী, শূর্পণখা, তারা, কৈকেয়ী, জনা, জাহ্নবী প্রমুখ নারীর কত বিচিত্র মনোভাবকে কবি নিপুণতাসহকারে ছন্দোবদ্ধ করেছেন। 'ড্রামাটিক' ও 'লিরিক'-এর চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে, গম্ভীর ও ললিত দুটি সুর মিলে এখানে ঐকতান রাগিণীর সৃষ্টি করেছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্ণবিকশিত শিল্পরূপটি 'ব্রজাঙ্গনা'তেই মেলে।

১৮৬৬ সালে মাইকেলের চতুর্দশপদ কবিতাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। ফরাসাদেশে অবস্থানকালে তিনি নতুন একশ্রেণীর কবিতা লিখলেন, এবং তার নাম রাখলেন—'চতুর্দশপদী কবিতা', যার ইংরেজি নাম—'সনেট'। ইতালীয় কবি পেত্রার্ক সনেট রচনা করে জগৎজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন। মধুসূদন প্রত্যক্ষত এই কবিরই লেখা কবিতাগুলি পড়ে 'চতুর্দশপদী' রচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন। অবশ্য কেবল ইতালীয় সনেটের নয়, ইংরেজি সনেটের প্রভাবও মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছে লক্ষ্য করা যায়। অপরবিধ কয়েকটি বস্তুর ন্যায়, সনেটজাতীয় কবিতাও, বাঙ্‌লা সাহিত্যে মধুসূদনের দান।

কবি-মধুসূদনকে জানতে গেলে যেমন তাঁর 'মেঘনাদবধ' অবশ্যপঠনীয়, তেমনি, ব্যক্তিমানুষ মধুসূদনের অন্তরঙ্গ পরিচয় জানতে চাইলে তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' একরূপ অপরিহার্য। এ বই কবির নিভৃত অন্তরলোকের বাতায়ন, এর ফাঁক দিয়ে মাইকেলের হৃদয়দেশটিকে পরিষ্কার চিনে নিতে পারা যায়। এখানে কবি নিঃসঙ্কোচে আত্মোন্মোচন করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত আশাআকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা-বেদনার মুখে ভাষা দিয়েছেন। 'চতুর্দশপদী'-পাঠে আমরা আরো জানতে পারি, খ্রীস্টান মাইকেল মনেপ্রাণে হিন্দুবাঙালি ছিলেন। বহুদূরবর্তী ফরাসীদেশের ভের্সাই-তে প্রবাসজীবন কাটাবার কালে বাঙ্‌লার কপোতাক্ষ নদ তাঁর মনের কোণে উঁকি দিয়ে যায়; আগমনী ও বিজয়ার গান তিনি একমুহূর্তের জন্তেও ভুলতে পারেন না; পৃথিবীর অগণন কবিদলের কাব্যসুধা তাঁকে তৃপ্তি দিলেও কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, এমন কি, ঈশ্বর গুপ্তের কবিমূর্তিও তাঁর মানসদৃষ্টির সমক্ষে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করতে থাকে।

মধুসূদনের লেখা বাঙলা সনেটগুলিতে আঙ্গিকগত ত্রুটি কিছু কিছু অবশ্যই

রয়েছে। তথাপি স্বীকার করতেই হয়, সনেটের আত্মার স্পন্দনটি তিনি ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন। আমাদের সনেট কবিতার ইতিহাসে তাঁর নামটি স্মরণীয় হয়ে রইল।

আখ্যানমূলক কাব্যরচনার মধ্য দিয়ে মধুসূদনের কবিজীবনের আরম্ভ, গীতিময় রচনা চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্য দিয়ে ওই জীবনের সমাপ্তি।

মাইকেলের রচনার বিচ্ছিন্ন কয়েকি নিদর্শন :

॥ ক ॥ অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে—
'ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা?—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।...

—মেঘনাদবধ-কাব্য

॥ খ ॥ এই দেখ ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি—
চিকন গাঁথন।
দোলাইব শ্যামগলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেমফুলডোরে তাঁরে করিব বন্ধন।
হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন?...
মধু—যার মধুধ্বনি— কহে কেন কাঁদ, ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন?

—ব্রজাঙ্গনা কাব্য

॥ গ ॥ ক্ষত্রকুলবালা আমি, ক্ষত্রকুলবধূ
কেমনে এ অপমান সব, ধৈর্য ধরি
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে;
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্তনগরে
লভি অন্তে। যাচি চিরবিদায় ও পদে।
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, 'কোথা জনা?' বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি 'কোথা জনা?' বলি।

—বীরাঙ্গনা কাব্য

॥ ঘ ॥ সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;

সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়ামন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।
আর কি হে হবে দেখা ? যতদিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারিরূপ কর তুমি ; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সংগীতে।

—চতুর্দশপদী কবিতাবলী

॥ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মধুসূদনের সমকালে যে-কবিব্যক্তিটি বাঙালি-সমাজে অজস্র সমাদর পেয়েছিলেন তিনি—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৩৮-১৯০৩]। হেমচন্দ্রকে খুবই ভাগ্যবান বলা যেতে পারে, নিজের কবিশক্তির অনুপাতে তিনি অনেক বেশি কবিখ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন ; এমন কি, মাইকেলের কীর্তি হেমচন্দ্রের যশোরাশির তলায় একদা চাপা পড়েছিল। অবশ্য ইতিহাসের বিচার অন্যরূপ—তার পাতায় আজ মধুসূদনের নাম উজ্জ্বলতর হয়ে ফুটে উঠেছে, হেমচন্দ্রের স্ফীতকায় খ্যাতি বিস্মরণের গোধূলিছায়ায় প্রায় বিলীন হয়ে গেছে।

হেমচন্দ্র হুগলি জেলার মানুষ। ১৮৫৫ সালে কলিকাতার হিন্দুস্কুল থেকে তিনি জুনিয়র বৃত্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্যে প্রবেশ করেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৮৫৭ সালে তিনি সিনিয়র বৃত্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ওই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। উক্ত বৎসরেই হেমচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ১৮৫৯ সালে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ; এবং বি. এল্. উপাধি পেলেন ১৮৬৬ সালে। হেমচন্দ্র প্রথমে কেরাণীর কাজ, তারপর শিক্ষকতার কাজ, তারপর কিছুকাল মুন্সেফের কাজ করে অবশেষে হাইকোর্টে ওকালতিব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করলেন। এইটি তাঁর স্থায়ী পেশা। শেষ বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন, ফলে তাঁকে আইনব্যবসায় ছাড়তে হল। আর্থিক অনটন ও সাংসারিক নানান অশান্তি কবির দুঃসহ মনঃপীড়ার কারণ হয়েছিল। ১৯০৩ সালে হেমচন্দ্র শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

হেমচন্দ্রের রচনাবলীকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়, যেমন—মহাকাব্য, ক্ষুদ্রকায় আখ্যানকাব্য, দেশপ্রেম ও জাতীয়তামূলক কবিতা, সমাজ, রাজনীতি, ইত্যাদি বিষয়ে ব্যঙ্গ ও কৌতুকরসাত্মক কবিতা, নিসর্গাশ্রয়ী কবিতা। কবি

বিদেশি রচনার কিছু কিছু অনুবাদও করেছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে চিন্তাতরঙ্গিণী, বীরবাহু, বৃত্রসংহার, আশাকানন, ছায়াময়ী, দশমহাবিদ্যা এবং 'কবিতাবলী' উল্লেখযোগ্য।

কবির প্রথম কাব্যপ্রয়াস চিন্তাতরঙ্গিণী। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। এখানে হেমচন্দ্র ভারতচন্দ্র-রঙ্গলালের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেননি, এখনো তিনি ঈশ্বর গুপ্তের ঐতিহ্যের অনুসারী। 'চিন্তাতরঙ্গিণী' কবির কাঁচা হাতের লেখা; বিষয়বস্তু ছাড়া লক্ষ্য করবার মতো তেমন কিছুই এতে নেই। রীতির দিক দিয়ে এখানে প্রাচীন ধারার অনুসৃতিই চোখে পড়ে! হেমচন্দ্রের এক প্রতিবেশী বাল্যবন্ধু উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। এই শোচনীয় ঘটনা কবিকে বিচলিত করেছিল, তার ফলেই বইখানির সৃষ্টি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে নির্বাচিত হওয়ায় 'চিন্তাতরঙ্গিণী' হেমচন্দ্রকে কিছু কবিখ্যাতি এনে দিয়েছিল।

হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ বীরবাহু, প্রকাশকাল ১৮৬৪ সাল। দেশানুরাগের স্ফুরণ এর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্বদেশপ্রেম, দেশের ঐতিহ্য ও পুরাকীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা, এবং তজ্জনিত এক প্রবল উদ্দীপনা বাঙালি-কবিসম্প্রদায়কে মাতিয়ে তুলেছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁরা জাতির অতীত গরিমা সন্ধান করে ফিরছিলেন। এই যুগাদর্শের প্রেরণা হেমচন্দ্রের রচনাতেও সক্রিয় রয়েছে বিদেশির শাসনশৃঙ্খলে আবদ্ধ মাতৃভূমির হীনাবস্থা কবিকে ব্যথিত করেছিল, এর প্রতিক্রিয়ায় মুমূর্ষু জাতিকে তিনি স্বদেশপ্রেমে উদ্বোধিত করতে চেয়েছিলেন—'বীরবাহু কাব্য'-এ তাঁর দেশভক্তির প্রথম অঙ্কুরোদ্গম।

কাব্যখানিতে একটি আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। আখ্যানটির কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, এ সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এতে গ্রথিত কাহিনীটি পাঠানশক্তির কনোজ-আক্রমণ, এবং কনোজের যুবরাজ বীরবাহু কী ভাবে ওই আক্রমণ প্রতিরোধ করে দিল্লীর সিংহাসনে বসল, তারই সতেজ সরল বর্ণনা। হিন্দুযুবক বীরবাহুর দেশপ্রীতি, তার বীর্যবত্তা ও সাহসিকতা, তার রণোন্মাদনা কবির লেখনীতে সুন্দর ফুটেছে। কথাবস্তুর বিচারে 'বীরবাহু' কাব্যহিসেবে আধুনিক, কিন্তু শিল্পাদর্শের বিচারে এ কাব্য প্রাচীনপন্থী।

এর পর প্রকাশিত হল হেমচন্দ্রের সর্বাধিক উল্লেখ্য কবিকৃতি 'বৃত্রসংহার'। প্রকাশকাল ১৮৭৭ সাল। এটি দীর্ঘায়তন মহাকাব্য, চব্বিশটি সর্গে সমাপ্ত। কাব্যখানির বিষয়বস্তু ভারতীয় পুরাণকথা থেকে সমাহৃত। কাঠামোটি পুরাণাশ্রয়ী হলেও এর রূপাদর্শে পাশ্চাত্ত্য এপিকরীতির প্রভাব অনায়াসলক্ষ্য। এই কাব্যটিতে হেমচন্দ্র প্রত্যক্ষত মধুসূদনের প্রদর্শিত পথে পদক্ষেপ করেছেন। মধুসূদন লিখলেন 'মেঘনাদবধ', হেমচন্দ্র লিখলেন 'বৃত্রসংহার'—উভয় কাব্যে দেবশক্তির সঙ্গে দানবশক্তির সংঘাত বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া, একদিকে রাম-রাবণ, মেঘনাদ-প্রমীলা, সীতা-সরমা; অন্যদিকে, ইন্দ্র-বৃত্র, রুদ্রপীড়-ঐন্দ্রিলা, শচী-ইন্দুবালা—চরিত্রগুলির সাদৃশ্য সকলেরই চোখে পড়বে। সমালোচ্য কাব্যখানিতে হেমচন্দ্র যে

অমিত্রচ্ছন্দ ব্যবহার করেছেন, তারো প্রবর্তয়িতা মধুসূদন দত্ত। সুতরাং মাইকেলের কাছে হেমচন্দ্রের কবিঋণ সামান্য নয়। সে যা হোক, এতে হেমচন্দ্রের স্বকীয়তার পরিচয়ও কিছু আছে। সে-যুগের পাঠকসমাজের কাছে 'বৃত্রসংহার' প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিল।

কাব্যহিসেবে 'বৃত্রসংহার'-এর উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্পর্কে দুচারটি কথা আমরা বলব। কিন্তু তৎপূর্বে এতে বর্ণিত কাহিনীটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই :

বৃত্র ছিলেন অসুরদের প্রতাপান্বিত রাজা। ত্রিভুবনবিদিত তাঁর পরাক্রম। আবার, বৃত্রাসুরের ভক্তি ও তপস্যাশক্তিও কম ছিল না। এরই বলে মহাদেবকে পরিতুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে তিনি একটি ত্রিশূল ও সংগ্রামে অজেয়ত্ব-বর লাভ করেন। এভাবে বরপুষ্ট হয়ে দানবরাজ বৃত্র একদা স্বর্গরাজ্য অধিকার করলেন। দেবতারা নিজেদের বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হলেন, আশ্রয় নিলেন পাতাল-পুরীতে। দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী শচী সখী চপলার সঙ্গে নৈমিষারণ্যে অবস্থান করতে লাগলেন, এবং নিরুপায় ইন্দ্র কুমেরুপর্বতে গিয়ে, নিয়তিদেবীর আরাধনায় রত হলেন।

দৈত্যপতি বৃত্রের স্ত্রী ঐন্দ্রিলা ছিলেন শচীর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণা। তিনি স্বামীকে অনুরোধ জানালেন শচীকে এনে তাঁর দাসীরূপে নিযুক্ত করতে। পত্নীকে তাঁর মনোবাঞ্ছাপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৃত্র সেনাপতি ভীষণকে পাঠালেন নৈমিষারণ্যে,—শচীকে সে ধরে নিয়ে আসবে। অসুরসেনাপতি ভীষণের আগমন-বার্তা শুনে বিপন্না শচীদেবী পুত্র জয়ন্তকে স্মরণ করলেন। জয়ন্তের হাতে ভীষণ নিহত হল। দৈত্যপক্ষীয় দূত স্বর্গরাজ্যে গিয়ে বৃত্রকে ভীষণের নিধনসংবাদ জানালে তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ পুত্র রুদ্রপীড়কে শচীকে হরণ করে আনবার আদেশ দিলেন। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত রুদ্রপীড়ের আক্রমণ ঠেকাতে পারল না, নৈমিষারণ্য থেকে শচী অপহৃতা হলেন।

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র কঠোর তপস্যায় নিয়তিদেবীর তুষ্টিবিধান করলেন। নিয়তির আদেশে শিবের উদ্দেশে কৈলাসাভিমুখে ছুটে গেলেন তিনি। ইন্দ্রের মুখে শচীর অপহরণবৃত্তান্ত শুনলেন মহাদেব। আপন ভক্তের এই দুষ্কৃতি মহাদেবকে রোষাবিষ্ট করল। দধীচি-মুনির অস্থিতে বজ্রাস্ত্র নির্মাণ করিয়ে ওই ভয়াল অস্ত্রে বৃত্রাসুরকে আক্রমণ ও সংহার করবার উপদেশ দিলেন তিনি বিপন্ন ইন্দ্রকে। অতঃপর দেবরাজ দধীচির শরণ নিলেন। দেবদলকে সুরলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে মহাপ্রাণ দধীচি তনুত্যাগ করলেন। তাঁর দেহাস্থি থেকে বিশ্বকর্মা-কর্তৃক 'বজ্র' নামে সাংঘাতিক অস্ত্র নির্মিত হল।

ওদিকে, শচীদেবী দৈত্যভবনে বন্দিনীরূপে অবস্থান করছেন। তাঁর মর্মবেদনার দিনগুলিতে রুদ্রপীড়পত্নী ইন্দুবালা তাঁকে প্রায়শ সঙ্গদান করতেন, সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করতে চাইতেন। একদিন তা বুঝতে পেরে দৈত্যরাজমহিষী ঐন্দ্রিলা অত্যন্ত কুপিতা হয়ে উঠলেন। তিনি পুত্রবধূকে শাস্তি দিতে ও শচীদেবীকে

পদাঘাত করতে উদ্যতা হলে দেবতা অগ্নি আর জয়ন্ত এসে উভয়কে সুমেরুপর্বতে নিয়ে গেলেন। নিরপরাধা সতীনারীর ওপর অত্যাচারে বিশ্বনীতি আহত হল, ঐন্দ্রিলার স্বামী বৃত্রাসুরের পতন আসন্ন হয়ে উঠল—আরাধ্য দেবতা মহাদেব তাঁর প্রতি এখন সম্পূর্ণ বিমুখ।

অতঃপর ধর্মবলে বলীয়ান দেববৃন্দ পাপমতি দানবরাজকে আক্রমণ করলেন। দেবদৈত্যের এই সংগ্রামে প্রথমে রুদ্রপীড় প্রাণ হারাল। তারপর বিশ্বকর্মার নির্মিত ইন্দ্রের নিক্ষিপ্ত বজ্রাস্ত্রের আঘাতে নিহত হলেন দৈত্যপতি বৃত্র। বৃত্রাসুরের পতনে স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক হল। দেবতারা তাঁদের হৃতরাজ্য উদ্ধার করলেন।

এইবার গ্রন্থখানির কাব্যোৎকর্ষের কথা। 'বৃত্রসংহার' লিখে হেমচন্দ্র 'মহাকবি' আখ্যা পেয়েছিলেন, মধুসূদনের সঙ্গে তুলনায় দাঁড়াবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। 'বৃত্রসংহার'-এর আখ্যানবস্তু মহাকাব্যের উপযোগী একথা অবশ্যস্বীকার্য। এতে পরিকল্পনার বিশালতা আছে, সমুচ্চ নৈতিক ভাবাদর্শের রূপায়ণ আছে, বর্ণনীয় বিষয়ের [দেবশক্তির কাছে বলদৃপ্ত পশুশক্তির শোচনীয় পরাভব এর মূল বর্ণনীয়] মহিমা আছে। কিন্তু এতসব বস্তুর বর্তমানতা সত্ত্বেও শিল্পকৃতি হিসেবে এ কাব্যের মূল্য খুব বেশি নয়। একে আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ'-এর সঙ্গে তুলনায় যোগ্য বলে বিবেচনা করি না। এ যেন মহাকাব্যের একখানি কঙ্কাল, এতে প্রাণের উত্তাপ নেই, 'রস'-নামীয় বস্তুটির স্পন্দন এখানে অতিশয় ক্ষীণ। হেমচন্দ্র মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর এই প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

কবির এতখানি ব্যর্থতার কারণ কী? উত্তরে বলা যায়, মহাকাব্য হেমচন্দ্রের নিম্নতর প্রতিভার উপযোগী বিচরণক্ষেত্র নয়, খণ্ডকাব্য আর গীতিকবিতাই হল তার উপযুক্ত বিহারভূমি। এক-এক কবির শিল্পসিদ্ধি এক-একটি বিশেষ এলাকায়, নিজস্ব এলাকা ছেড়ে ভিন্নতর ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করলে ব্যর্থতা অনিবার্য। অনুকরণের মোহে পড়ে হেমচন্দ্র মহাকাব্যের দুর্গম পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তাই, তাঁর সকল শ্রম পণ্ড হয়েছে। ভাষার ওপর হেমচন্দ্রের সত্যিকার আয়ত্তি ছিল না, ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষা তিনি খুঁজে পাননি—প্রসাধনকলাবর্জিত, নীরস, বৈচিত্র্যহীন ভাষায় তিনি কাব্যের কায়াগঠন করেছিলেন। এর ফলে 'বৃত্রসংহার' কলাশ্রীসৌষ্ঠব থেকে বঞ্চিত হয়েছে, শোভন পারিপাট্যের অভাবে চিত্তগ্রাহী কবিকর্ম হয়ে ওঠেনি। আলোচ্যমান কাব্যে প্রকাশভঙ্গির চারুতা নেই, শিল্পচাতুর্যের কোনো পরিচয় নেই। কবি জনসাধারণের দিকে তাকিয়ে বইখানি লিখেছেন, রসজ্ঞের কথা একেবারেই ভাবেননি।

'বৃত্রসংহার' কাব্যের আরো একটি বড়ো ত্রুটি হল, যে-অমিত্রচ্ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে হেমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না, মধুসূদনের প্রভাবে এসে, সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দকেই তিনি তাঁর কাব্যের প্রধান বাহনরূপে গ্রহণ করেছেন। তার ফল দাঁড়িয়েছে এই, হেমচন্দ্রের হাতে অমিত্রচ্ছন্দ মিলহীন পয়ারে পর্যবসিত হয়েছে

—মাইকেলের প্রবর্তিত এই অভিনব ছন্দটির কোনো বিশিষ্টতাই এতে ফোটেনি। ছন্দের যে-প্রবহমানতা, শব্দের যে-অদ্ভুত ধ্বনিতরঙ্গ মধুসূদনের প্রযুক্ত অমিত্রাক্ষরকে অপূর্ব সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছে তা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় লক্ষিত হয় না। পয়ার-লাচাড়ির সংস্কার বর্জন না করতে পারলে অমিত্রাক্ষরের নির্বিচার প্রয়োগ কাব্যে রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে যে কতবড়ো ব্যর্থতা ডেকে আনে, হেমচন্দ্রের রচনাবলী তার দৃষ্টান্তস্থল। মিল তুলে নিলে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতে ব্যবহৃত পয়ারের যে-চেহারাটির দাঁড়ায়, হেমচন্দ্রের নির্মিত ছন্দটি তারই অনুরূপ।

মোটকথা, 'বৃত্রসংহার' কাব্যহিসেবে সার্থক সৃষ্টি নয়, একে মহাকাব্যের ফাঁপা ফানুস বলা যেতে পারে—গদ্যাত্মক বক্তৃতার হালকা গ্যাসে পূর্ণ। কাব্যখানিতে ভালো মালমসলা কম ছিল না, কিন্তু কবির অক্ষমতার জন্যে এ মহৎ শিল্পকৃতি হয়ে ওঠেনি। বালুকাময় ভূমিতে পিরামিডনির্মাণ কি সম্ভব? তবে বর্তমান কাব্যের দুয়েকটি জায়গায় হেমচন্দ্র কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—এর প্রারম্ভ-অংশটি সুন্দর, বিশ্বকর্মার কর্মশালার বর্ণনাটি অবশ্যই প্রশংসার্হ—মিল্টন এবং দান্তের অনুকরণ সত্ত্বেও।

আশাকানন-এর প্রকাশকাল ১৮৭৬ সাল। এটি একখানি রূপক-কাব্য।

কবি স্বপ্নের রাজ্যে গিয়ে আশাদেবীর সাক্ষাৎ পান এবং তাঁর সঙ্গে আশাকাননে প্রবেশ করেন। সেখানে রয়েছে কর্মক্ষেত্র, রত্নোদ্যান, যশঃশৈল, প্রণয়োদ্যান, শোকারণ্য, স্নেহ-উপবন, নৈরাশক্ষেত্র, ইত্যাদি। এসকল স্থানে ঘুরে-বেড়িয়ে কবি মানবের বিভিন্ন প্রকৃতিবিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হলে স্বপ্নের কানন স্বপ্নবৎ শূন্যে মিলিয়ে যায়।

এ কাব্য দশটি 'কল্পনা' বা সর্গে বিভক্ত এবং আগাগোড়া ত্রিপদীছন্দে লেখা। ইতঃপূর্বে রূপককাব্য বাঙলায় আর রচিত হয়নি, এই হিসেবে আমাদের সাহিত্যে একে নতুন জিনিস বলা যেতে পারে। অক্ষয়কুমার দত্তের লিখিত 'স্বপ্নদর্শন' অনেকটা এ জাতের রচনা। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ রূপক নাট্যে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'আশাকানন'-এ হেমচন্দ্র ভাবীকালের ভারতবর্ষের উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন। তথাপি উন্নত কাব্যের মর্যাদা একে দেওয়া যায় না।

এর পরের রচনা ছায়াময়ী—১৮৮০ সালে প্রকাশিত। এ কাব্যের ভাবকল্পনার জন্যে হেমচন্দ্র ইতালীয় কবি দান্তের কাছে ঋণী, এতে দান্তেপ্রণীত 'ডিভাইনা কমেডিয়া'র ছায়াপাত হয়েছে। দান্তে তাঁর কাব্যে স্বর্গ, নরক, পরলোক ইত্যাদির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা খ্রীষ্টধর্মের অনুমোদিত। পক্ষান্তরে, হেমচন্দ্রের গ্রথিত স্বর্গনরকাদির বর্ণনা হিন্দুধর্মের অনুসারী।

'ছায়াময়ী' কাব্য 'পল্লব' নামে সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। শ্মশানবর্ণনায় কাব্যখানি শুরু হয়েছে। এক ব্যক্তির স্নেহের দুলালী কন্যার মৃত্যু হয়েছে। ওই মৃত কন্যার শব কোলে নিয়ে তিনি শোকাতুর অবস্থায় শ্মশানে এসে উপস্থিত

হয়েছেন। বিজন শ্মশানভূমিতে তাঁর মনে এই ভাবনার উদয় হল—লোকান্তরিত কন্যাটি আজ কোথায় বিরাজ করছে? মৃত্যুতে কি জীবের সমস্ত অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় সেই লোকটি যখন এরূপ চিন্তা করছেন এমন সময়ে অকস্মাৎ রাত্রির আকাশের কোল থেকে এক দেবী পৃথিবীতে নেমে এলেন। তিনি শোকক্লিষ্ট ব্যক্তিটিকে তাঁর কন্যার শবের দাহসংস্কার করতে বললে তাই করা হল। দেবী তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁর অশরীরী দুহিতাকে দেখাবেন। এর পর দেবীর সঙ্গে তিনি ঊর্ধ্বে নক্ষত্রলোকে চলে গেলেন। সেখানে জীবআত্মা নিজ নিজ কর্মফলভোগ করে। নরকের ভয়ংকর দৃশ্যসব তিনি দেখলেন। তারপর দেবীকে তাঁর অনুরোধ, তিনি এখন যেন নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করেন। নরক-প্রদর্শনান্তে বিশ্বকেন্দ্রস্থ ধর্মরাজের বিচারপ্রণালী দেখিয়ে দেবী তাঁকে মর্তপৃথিবীতে নিয়ে এসে বললেন, তিনিই তাঁর কন্যা—'এবে অবিনাশী আত্মাময় এ শরীর—ঘুচেছে স্বপন'।

মানবাত্মার বিনাশ নেই এ-ই হল দেবীর বক্তব্য। বলা বাহুল্য, এ বক্তব্য কবিরই। কবিকল্পনার তেমন কোনো চমৎকারিত্ব, কাব্যভাবনার লক্ষণীয় কোনো অভিনবত্ব না থাকলেও 'ছায়াময়ী' সুখপাঠ্য একখানি গ্রন্থ।

পরবর্তী রচনা দশমহাবিদ্যা—১৮৮২ সালে প্রকাশিত। এখানে হেমচন্দ্রের কল্পনা তত্ত্বাশ্রয়ী এবং আধ্যাত্মমুখী। আমাদের তন্ত্রে ও পুরাণে দশমহাবিদ্যা [কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এরাই—the ten forms of Sakti] আদিশক্তিরই দশটি রূপাভিব্যক্তিমাত্র। হেমচন্দ্র তান্ত্রিক ও পৌরাণিক কল্পনার সঙ্গে আধুনিক কল্পনা মিশিয়ে উক্ত দশ-মহাবিদ্যাকে কাব্যে প্রতিফলিত করেছেন।

সতী দেহত্যাগ করলে অবিদ্যাগ্রস্ত হয়ে মহাদেব ব্যাকুল কান্নায় ফেটে পড়লেন। চরাচর শংকরের সঙ্গে কেঁদে আকুল। শোকাচ্ছন্ন কৈলাসে নারদ এসে উপস্থিত হলেন, তাঁর হাতে বীণা ঝংকৃত হয়ে চলেছে। সেই বীণাধ্বনিতে অনন্ত জিজ্ঞাসা—কী করে এই জড়ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হল? জড়বিশ্বে চেতনার সঞ্চার কী করে হল? কোথা থেকে এল অসংখ্য প্রাণীকুল? কোন্ মহাশক্তির কেন্দ্র থেকে জীবনধারা উৎসারিত?

মহাদেব সাময়িকভাবে মোহাবিষ্ট হয়েছিলেন, নারদের বীণার ঝংকারে তাঁর মোহ কেটে গেল। ধ্যানদৃষ্টিতে তিনি সতীর-স্বরূপ প্রত্যক্ষ করলেন—'সতী অনাদ্যাত্মরূপিণী ভবপ্রসবিনী'—বিশ্বসৃষ্টির কারণস্বরূপা অনাদি মহাশক্তি তিনি। মহাদেব বিশ্বচরাচরের ওপরকার মায়ার আবরণ সরিয়ে দিলেন; নারদ দেখতে পেলেন, মাটির ধূলি থেকে মহাকাশের সৌরমণ্ডল পর্যন্ত এক অনাদি শক্তির লীলা চলেছে, ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারটি এই শক্তিরই সৃষ্টি এবং এর দ্বারাই পরিচালিত—'অর্থহীন জড়ের নর্তন' বলে কিছুই এখানে নেই। শুধু তা নয়, বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ক্রমবিবর্তনের ছন্দে বিধৃত, এ ধাবিত হচ্ছে এক মঙ্গলময় পরিণামের পথে। এই

বিবর্তনের দশটি স্তরে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের দশটি রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এ রূপ কিন্তু আসলে সে আদ্যাশক্তি মহামায়ার। উক্ত দশ ব্রহ্মাণ্ডের দশ অধিষ্ঠাত্রীদেবীই দশমহাবিদ্যা। মহাবিদ্যা দশমূর্তিতে প্রকাশমানা হলেও মূলে কিন্তু অদ্বৈতরূপিণী।

এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে কবি আমাদের বুঝাতে চেয়েছেন, জগৎসংসারের আদিকারণ মহাশক্তির বিনাশ বা ক্ষয় নেই, শক্তি রূপান্তর গ্রহণ করে কিন্তু কখনো ধ্বংস পায় না। এর প্রকাশ কখনো রুদ্র, কখনো শান্ত। এক রহস্যময় শক্তির প্রভাবে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবই শৃঙ্খলাবদ্ধ, সকলই মানুষের কল্পনাতীত শুভ কামনায় গ্রথিত। মানুষ যতক্ষণ মায়াচ্ছন্ন থাকে ততক্ষণ বস্তুর রূপান্তরগ্রহণকে তার বিনাশ বলেই মনে করে এবং শোক-মোহে কাতর হয়। কিন্তু যখন অবিদ্যাজাল ছিন্ন হয়ে যায় তখন মানুষ উপলব্ধি করে, জগৎসংসারে নতুন-কিছু আসে না, এখান থেকে কোনোকিছু চিরকালের জন্যে নষ্ট হয়েও যায় না—মূলশক্তি তার রূপ বদলায় মাত্র। স্পষ্টত বুঝতে পারা যায়, 'দশমহাবিদ্যা' কাব্যে কবি দেবীর দশটি মূর্তির সঙ্গে মানবসভ্যতার দশ অবস্থার সংযোজনা করতে চেয়েছেন। একে পৌরাণিকী কল্পনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান বলা যেতে পারে।

'দশমহাবিদ্যা'-র কয়েকটি অংশ অতিশয় সুন্দর, রসের স্ফুরণে চিত্তাকর্ষক। সতীশূন্য কৈলাসের বর্ণনাটি প্রথমশ্রেণীর কবির লেখনীরই উপযুক্ত।

সর্বশেষে হেমচন্দ্রের লেখা ছোট ছোট কবিতাগুলির কথা। দীর্ঘায়তন কাব্যে দক্ষতা দেখাতে না পারলেও ক্ষুদ্রাকার গীতিকবিতাজাতীয় রচনাগুলিতে তিনি কুশলতা দেখিয়েছেন, সন্দেহ নেই। তাঁর এসকল রচনা সেকালে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। এগুলিকে খাঁটি 'লিরিক' বলা চলে না এবং এরা সর্বাঙ্গসুন্দরও নয়। তবু এগুলি পড়তে খারাপ লাগে না। 'কবিতাবলী' নামীয় গ্রন্থের অশোকতরু, পদ্মের মৃণাল, লজ্জাবতী লতা, যমুনাতটে, হতাশের আক্ষেপ, ভারতসংগীত, গঙ্গা, পদ্মফুল প্রভৃতি কবিতাগুলিকে মনোজ্ঞই বলতে হবে। জাতীয় ভাবের উদ্বোধক 'ভারতসংগীত' কবিতাটিতে হেমচন্দ্র চারণকবির ভূমিকায় অবতীর্ণ। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে কবি কয়েকটি উপভোগ্য কবিতা লিখেছিলেন, যেমন— হায়, কি হলো', 'নেতার—নেতার,' ইলবার্ট বিল,' 'টেনেন্সি বিল', ইত্যাদি। অধুনা এগুলির কথা অনেকেই ভুলে গেছেন।

হেমচন্দ্রের কাব্য-কবিতায় ত্রুটিবিচ্যুতি অনেক রয়েছে। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করতে হয়, উনিশের শতকের শেষার্ধের প্রতিনিধি-কবি ছিলেন তিনি।

কবির রচনার কিছু নিদর্শন :

॥ ক ॥ ঘোর নাদে বিকট চীৎকারি
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি
ছিঁড়িতে লাগিলা গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলী,
ছুঁড়িতে লাগিলা ক্রোধে—বাসবে আঘাতি,
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়ে।

ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্নপ্রায়—কাঁপিল জগৎ।
উজাড় স্বর্গের বন, উড়িল শূন্যেতে
স্বর্গজাত তরুকাণ্ড। গ্রহতারাদল
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে।
—বৃত্রসংহার

॥ খ ॥ সন্ধ্যাগগনে নিবিড় কালিমা অরণ্যে খেলিছে নিশি ;
ভীতবদনা পৃথিবী দেখিছে ঘোর অন্ধকারে মিশি।
হী হী শবদে অটবী পূরিছে জাগিছে প্রমথগণ,
অট্টহাসেতে বিকট্ ভাসেতে পূরিছে বিটপী বন।
—ছায়াময়ী

॥ গ ॥ কৈলাস-অম্বরময় তারাসূর্য অনুদয়,
ক্ষণকালে নিখিল সকল।
তমশ্ছন্ন দিগাকাশ, কেবলি করে উল্লাস
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠের গরল ॥
ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ স্কন্ধে কভু তুলি হাত
সতারে করেন অন্বেষণ।
পরশিতে পুনর্বার সুকুমার তনু তাঁর
মমতার অভ্যাস যেমন ॥
—দশমহাবিদ্যা

॥ ঘ ॥ ভাবি শুধু কেন বিধি করিলা এমন—
এত শোভা বাস যার
পঙ্কেতে জনম তার,
পঙ্কজ বলিয়া তারে ডাকে সাধুজন।
জানি না বিধির হায় রহস্য কেমন।
ওরে শুদ্ধচেতা পদ্ম!

হায়, বিধি, এ মনও কি তেমতি বিধানে
বাঁধিলা এ দেহপুটে?
কলুষ-পঙ্কেতে ফুটে,
তাই এত ক্ষিপ্ত মন ডোবে ভাসে বানে?
বুঝেছি, রে শতদল, অচ্ছেদ্য বন্ধনে
তাই তুই আমি বাঁধা,
একসঙ্গে হাসা কাঁদা,
তাই, ওরে পদ্মফুল, এ মিল দুজনে।

ভুলিব না তোরে, পদ্ম;
ভুলিব না, ভুলিব না, জীবনে মরণে॥
—'পদ্মফুল' : কবিতাবলী

॥ নবীনচন্দ্র সেন ॥ মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেন—এই তিনজন কবিকে বিশেষ একটি কাব্যাদর্শের সূত্রে একত্রে গ্রথিত করে 'ত্রয়ী' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। হেম-নবীন মাইকেলেরই অনুগামী, কিন্তু তাঁর কাব্যমন্ত্রের যথার্থ উত্তরসাধক এরা কেউ নন। তাই, বলতে হয়, মহাকাব্যের আসরে মধুসূদন দত্ত অসঙ্গ। কিছুটা যুগধর্মের প্রভাবে এবং কিছুটা সমগোত্রের কবির অভাবে মাইকেলি কাব্যরীতি ক্রমশ শীর্ণকায় হয়ে বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রান্তরে হারিয়ে গেছে।

মধুসূদন-হেম-নবীন সমকালীন কবি। এঁদের কাব্যকীর্তি যত্নসহকারে আলোচনার যোগ্য। পূর্বে বলেছি হেমচন্দ্র ভাগ্যবান কবি—উচ্চতর কবিপ্রতিভার অধিকারী না-হয়েও তিনি প্রথমশ্রেণীর শিল্পীর সম্মান পেয়েছিলেন। কিন্তু নবীনচন্দ্রের দুর্ভাগ্য, সেকালের সমালোচকরা তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত উপেক্ষা দেখিয়েছেন—বিরূপ মন্তব্যই হয়েছিল তাঁর কবিবিদায়। তৎকালীন সমালোচক-গোষ্ঠী হেমচন্দ্রের বহুনিম্নে নবীনচন্দ্রের স্থান নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু একালের কাব্যবোদ্ধারা সেকালের বিচারকের রায় উল্টে দিয়েছেন—কালপ্রবাহে নবীন-কবি ভেসে উঠেছেন, আর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় তলিয়ে গেছেন।

নবীনচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্‌লার নবজাগৃতির ভাবধারায় লালিত, মধুসূদন-হেমচন্দ্রের ন্যায় তিনিও যুগাদর্শের একজন বিশিষ্ট কবি। উনিশের শতকে য়ুরোপীয় শিক্ষাসংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাঙালির চিত্তোন্মেষ ঘটেছে—সে আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে, আত্মোন্নতির দিকে মন দিয়েছে; দেশ ও জাতিকে চিনতে শিখেছে, জাতীয় দৈন্যস্মরণে নিজেকে সে পীড়িত বোধ করেছে, পরাধীনতার জ্বালা তাকে উন্মত্তবৎ করে তুলেছে। তার চিত্তে জেগেছে বিদেশিশাসনের প্রতিরোধস্পৃহা, আর, জাতীয় গৌরবের পুনরুজ্জীবনস্বপ্নে তখন সে বিভোর। এমন একটি যুগে এদেশের মাটিতে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব। নবীনচন্দ্রের কাব্যে জাতির আশাআকাঙ্ক্ষা, বহুবিচিত্র স্বপ্ন ও অভিলাষ ধ্বনিত হয়েছে। বলা যেতে পারে, যুগের কণ্ঠে তিনি ভাষা দিয়েছেন। যুগসমস্যায় তিনি উৎকণ্ঠিত, তার সমাধান সম্পর্কে অনুক্ষণ ভাবিত ও উদ্বেগে ক্লিষ্ট। নানাবিধ দোষত্রুটি সত্ত্বেও নবীনচন্দ্রের রচনাবলী—তাঁর রঙ্গমতী, পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস ইত্যাদি রচনা—বিগত শতাব্দীর বাঙ্‌লার এক অভিনব কাব্যপ্রচেষ্টা। মধুসূদন ও নবীনচন্দ্রের উজ্জ্বল নাম একসঙ্গেই স্মরণীয়।

নবীনচন্দ্র সেন চট্টগ্রামের মানুষ। ইংরেজি ১৮৪৭ সালে তাঁর জন্ম। চট্টগ্রাম শহরে থেকে কৈশোরে তিনি লেখাপড়া করেন: এ সময়ে অশান্তচিত্ততা ও দুরন্তপনার জন্যে তাঁকে 'Wicked the Great' আখ্যা দেওয়া হয়; কিন্তু বুদ্ধি

পেয়ে যেদিন তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন [১৮৬৩] সেদিন সকলে তাঁর এই কৃতিত্বে বিস্মিত বোধ করেছে। ১৮৬৭ সালে কলিকাতার জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশন থেকে নবীনচন্দ্র বি. এ. পাশ করেন। অতঃপর প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট হন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। ১৯০৯ সালে কবির মৃত্যু হয়।

বাল্যকাল থেকেই নবীনচন্দ্র কাব্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর একেবারে প্রথম দিককার রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। পরে মাইকেলের প্রভাবে আসেন। তাঁর ওপর হেমচন্দ্রের কোন প্রভাব নেই, তবে রঙ্গলালের দিকে মাঝেমধ্যে তিনি তাকিয়েছেন। ইংরেজ কবিদের মধ্যে একদা বায়রণ তাঁর খুব প্রিয় ছিল, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গেই বায়রণের প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন। মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ ও গীতা নবীনচন্দ্র খুব মন দিয়ে পড়েছিলেন—এইসব বইয়ের ওপরই কবির ত্রয়ীকাব্য রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস ইত্যাদির ভিত্তি রচিত।

কবি যে-বইখানি প্রথম প্রকাশিত করলেন তার নাম 'অবকাশরঞ্জিনী'। এটি তাঁর প্রথমযৌবনের দিনে লেখা।* এ গ্রন্থের নামটিতে বায়রণের 'Hours of Idlenss' গ্রন্থখানির নামের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। 'অবকাশরঞ্জিনী' গীতি-কবিতার বই। এতে গ্রথিত কবিতাগুলি কবির রোম্যান্টিক মনের পরিচয় বহন করে। এগুলিতে লেখকের প্রণয়ানুভবের কথা আছে, স্বদেশানুরাগের উজ্জ্বল প্রকাশ আছে, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ভাবনার প্রতিফলন আছে। কবিহৃদয়ের উত্তাপের স্পর্শে এসব কবিতা উপভোগ্য।

'অবকাশরঞ্জিনী' একখানি সুখপাঠ্য গীতিকবিতা-সংকলন-পুস্তক, সন্দেহ নেই। কিন্তু হৃদয়াবেগের অসংযত প্রকাশের জন্যে এতে সন্নিবেশিত কবিতাগুলি অনিন্দ্য শিল্পরূপ পায়নি, রসসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। কবি লেখনীকে সংযমে শাসিত করতে জানতেন না, অবাধিত উচ্ছ্বাস তাঁর লেখা লিরিকের সৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ণ করেছে। কিছুটা মিতভাষী হতে পারলে নবীনচন্দ্র খুব বড়ো একজন গীতিকবির মর্যাদা পেতেন। তাঁর লেখা উল্লেখ্য একটি গীতিকবিতা 'কীর্তিনাশা'।

পরবর্তী কাব্য পলাশীর যুদ্ধ [১৮৭৭] লিখে নবীনচন্দ্র সেন বঙ্গীয় কাব্য-ক্ষেত্রে উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা পেলেন। একসময় এই ঐতিহাসিক গাথাকাব্যখানি শিক্ষিত বাঙালির খুবই আদরণীয় গ্রন্থ ছিল। অসংখ্য ত্রুটি সত্ত্বেও এ বইতে নবীনচন্দ্রের শক্তিমত্তার দীপ্ত স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে। 'পলাশীর যুদ্ধ' নবীন-কবির জ্বলন্ত দেশ-প্রেমের কাব্য। বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনীকে কেন্দ্র করে পরাধীনতার গ্লানিজর্জর কবির অন্তর্দাহ ও বেদনাবহ্নি এতে আবেগস্পন্দিত ভাষায় প্রকাশ লাভ করেছে। এ বুঝি স্বদেশবাৎসল্যের আগ্নেয়গিরির গৈরিক নিঃস্রাব। পরাধীনতায় রুদ্ধকণ্ঠ জাতির মর্মজ্বালার মুখে নবীনচন্দ্র অগ্নিস্রাবী ভাষাদান করেছেন। একদিকে অকারণে দেশের স্বাধীনতা-লোপ, পররাজ্যলোভী বিদেশিশক্তির কাছে কলঙ্কিত আত্মসমর্পণ, অন্যদিকে, দেশের

মানুষের নীচতা, কাপুরুষতা, স্বার্থসর্বস্বতা ও ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা উভয়ই কবির গভীর চিত্তক্ষোভের কারণ হয়েছে। স্বজাতি দেশদ্রোহিতা না করলে বাঙলার তথা গোটা ভারতের স্বাধীনতানাট্যের ওপর যবনিকাপাত হত না। সেদিন বাঙালি স্বেচ্ছায় দাসত্ববরণ করেছে, এই শোকাবহ ঘটনার সান্ত্বনা কোথায়? দেশানুরাগী কবির স্বাজাত্যাভিমানে প্রচণ্ড আঘাতের প্রতিক্রিয়াতেই 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের সৃষ্টি।

নবীনচন্দ্র ইতিহাসের সতর্ক পাঠক ছিলেন না। তা ছাড়া, ইংরেজরচিত অধসত্য ও মিথ্যায় আকীর্ণ ইতিবৃত্তই ছিল তাঁর অবলম্বন। তাই, কাব্যখানিতে কোনো কোনো চরিত্র সঠিক রূপায়িত হয়নি, সিরাজের চরিত্রকে কলঙ্ক স্পর্শ করেছে। কিন্তু নবাব সিরাজদ্দৌলার দুর্ভাগ্যের প্রতি কবির দরদবোধের অভাব ছিল না, এবং এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে তাঁর নিবিড় দেশপ্রীতি। রাণী ভবানীর তেজোদৃপ্ত বাণী, বীর মোহনলালের মর্মচ্ছেদী কাতরোক্তি অবিস্মরণীয়। রণশয্যায় শায়িত মৃত্যুমুখী মোহনলাল যে-খেদোক্তি আমাদের শুনিয়েছে, তা স্বদেশপ্রেমিক ও স্বজাতিবৎসল বাঙালিমাত্রেরই আর্তনাদ:

কোথা যাও, ফিরে চাও সহস্রকিরণ।
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে, দেব, করিলে গমন,
আসিবে যবনভাগ্যে বিষাদ রজনী।...
কী ক্ষণে উদয় আজি হইলে তপন!
কী ক্ষণে প্রভাত হল বিগত শর্বরী;
আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি।

মোহনলালের সত্তার সঙ্গে কবির অন্তরাত্মা বুঝি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

স্বজাতিনিন্দা রুচিকর কখনো হতে পারে না, কিন্তু আত্মকলহে মেতে যারা জাতীয় জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে তারা কি ধিক্কারযোগ্য নয়? এদের উদ্দেশে নবীনচন্দ্রের উচ্চারিত ধিক্কারবাণী বাঙালিসন্তান আজো লজ্জার সঙ্গে স্মরণ করে:

সাধে কি বাঙালি মোরা চিরপরাধীন?
সাধে কি বিদেশি আসি দলি পদভরে
কেড়ে লয় সিংহাসন? করে প্রতিদিন
অপমান শত শত চক্ষের উপরে;
স্বর্গ মর্ত করে যদি স্থান বিনিময়,
তথাপি বাঙালি নাহি হবে একমত;
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জয়!
কার্যকালে খোঁজে সব নিজ নিজ পথ।

কথাগুলি চক্রান্তকারী কপট জগৎশেঠের, কিন্তু সাধারণভাবে বাঙালিচরিত্র সম্পর্কে অবশ্যই প্রযোজ্য। ক্ষুদ্রস্বার্থপরিচালিত হয়ে সেদিন মুষ্টিমেয় বাঙালি নিজ মাতৃভূমিকে নির্বিচারে বিদেশির হাতে তুলে দিয়েছে, জাতির এ কলঙ্ক কদাপি ঘুচবার নয়।

পাঁচটি সর্গে 'পলাশীর যুদ্ধ' গ্রথিত। সিরাজকে রাজ্যভ্রষ্ট করবার চক্রান্তে কাব্যের আরম্ভ, এই দুর্ভাগ্য যুবকের হত্যাসাধন ও বিজয়ী ইংরেজের উৎসবের বর্ণনা দিয়ে এই কাব্যের পরিসমাপ্তি। গ্রন্থখানি সুপরিণত রচনা নয়, কবির কাঁচা হাতের লেখা। এর ভাবে ও ভাষায় বায়রণের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। বায়রণ যেমন অনিয়ন্ত্রিত হৃদয়োচ্ছ্বাসের কবি, তেমনি নবীনচন্দ্র। ভাবাবেগের অতিরেক 'পলাশীর যুদ্ধ'-এর শিল্পকলাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তথাপি কাব্যখানির স্থানে স্থানে যে বর্ণনা-সৌন্দর্য ফুটেছে তা প্রশংসার যোগ্য।

ক্লিওপেট্রা [১৮৭৭] প্রণয়ভাবকেন্দ্রিক ক্ষুদ্রকায় রোম্যান্টিক কাব্য। সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ক্লিওপেট্রা আপনার অতুলনীয় রূপৈশ্বর্যের মাদকতা ছড়িয়ে সিজার ও এ্যাণ্টনিওর হৃদয় জয় করেছিল, কিন্তু পরিণামে তাকে নিজহাতে পান করতে হল জ্বালাময় হলাহল। এই প্রণয়তাপিতা নারীর অন্তর্বেদনার মর্মস্পর্শী চিত্র কাব্যখানিকে মনোজ্ঞ করে তুলেছে।

অতঃপর **রঙ্গমতী**। এটি একখানি আখ্যায়িকা-কাব্য। প্রকাশকাল ১৮৮৫ ইংরেজি সাল। এর রূপাদর্শে স্কটের কাব্যরীতির অনুসৃতি আছে। এখানে কবি জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ, আর্যস্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের স্বপ্নে বিভোর। এই স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটি ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনী। এতে যে আখ্যান বর্ণিত হয়েছে তা ইতিহাসের পাতা থেকে আহৃত নয়—পুরাপুরি কাল্পনিক। কাব্যের দেশভক্ত নায়ক বীরেন্দ্র কবি নবীনচন্দ্রেরই আত্মপ্রতিবিম্ব। নায়িকার নাম কুসুমিকা।

আর্যজাতির পরাকীর্তি বীরেন্দ্রকে মোগলবিদ্বেষী করে তুলেছে, স্বাধীনতা-স্পৃহা তাকে মোগলের হাত থেকে পিতৃরাজ্য-পুনরুদ্ধারসাধন-ব্রতে প্রাণিত করেছে, শিবাজির সংস্পর্শে এসে সে মুক্তিপাগল হয়ে উঠেছে। কিন্তু পিতৃব্য মর্কটরায়ের চক্রান্তে তার মায়ের জীবন যেমন শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, তেমনি, তার নিজজীবনেও শোকাবহ ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে। কুসুমিকা নামে একটি মেয়েকে বীরেন্দ্র ভালোবাসত, তাকে সে পায়নি, এবং তার স্বাধীনতাস্বপ্নও বাস্তবে সত্য হয়ে উঠেনি। ভাগ্যের বিরোধিতায় বীরেন্দ্র ও কুসুমিকাকে অকাল-মৃত্যুবরণ করতে হল। এতে কবি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করেছেন।

পরবর্তী ত্রয়ীকাব্য রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস-এ নবীনচন্দ্র যে-একতাবদ্ধ অখণ্ড ভারতরাজ্যের স্বপ্নসুন্দর ছবি এঁকেছেন তার পরিকল্পনা এই 'রঙ্গমতী'তেই সূচিত।

নবীনচন্দ্রের কবিকল্পনা ও কাব্যনির্মাণশক্তির উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে **রৈবতক** [১৮৮৬], **কুরুক্ষেত্র** [১৮৯৩] এবং **প্রভাস** [১৮৯৬] নামের কাব্য-তিনখানিতে।

এদের মধ্যে আখ্যানগত যোগসূত্র রয়েছে বলে এগুলিকে একখানি মহাকাব্যের তিনটি পৃথক খণ্ড বলাই সংগত। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ধারাবাহিক চিত্রণ এই Trilogy বা কাব্যত্রয়ীর অখণ্ডতা রক্ষা করেছে।

সরকারি-কার্যোপলক্ষে নবীনচন্দ্র কিছুকাল প্রাচীন-ঐতিহাসিক স্মৃতিযুক্ত রাজগিরে অবস্থান করেছিলেন। সে-সময়ে তিনি আমাদের জাতীয় মহাকাব্য মহাভারত পাঠ করেন। মহাভারত পড়ে কবি এক অভিনব কাব্যরচনার প্রেরণা পান। এর ফলেই রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস কাব্যের সৃষ্টি। নিষ্কাম প্রেম ও নিষ্কাম কর্মের আদর্শে আর্যঅনার্যের মিলন, বিশাল ভারতবর্ষে বিভেদের মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা, মহামানব শ্রীকৃষ্ণের এক মহাজাতিগঠনের মহৎ স্বপ্ন ও ভারতজোড়া হিন্দুসংস্কৃতির পত্তন বর্তমান কাব্যত্রয়ীর মর্মকথা।

জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ কবি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতে অখণ্ড-ধর্মরাজ্য-সংস্থাপনের প্রয়াস। এক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষের এই মহানায়কের সহায় ছিল অর্জুনের বাহুবল, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জ্ঞানবল, সুভদ্রার প্রীতি ও শৈলজার প্রেমবল। শ্রীকৃষ্ণ যে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন তার প্রকাণ্ড বাধাস্বরূপ বর্তমান ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধ্বজাবাহী দুর্বাসার প্রতিহিংসা ও অনার্যবংশসম্ভূত বাসুকির সংশয়। কাব্যত্রয়ীর কেন্দ্রীয় ঘটনা হল যথাক্রমে—সুভদ্রাহরণ, অভিমন্যুবধ ও যদুবংশধ্বংস।

শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক জীবনকথাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে নবীন সেনের ত্রয়ী কাব্যের প্রকাণ্ড সৌধ ; কবির উদ্দেশ্য—স্বজাতির সমক্ষে পূর্ণমনুষ্যত্বের ভাস্বর আদর্শস্থাপন, অসাম্য-বৈষম্য-বিভেদে দুর্বল অধঃপতিত স্বদেশবাসীকে সাম্যমন্ত্রে-উজ্জীবিত এক মহাধর্মসাম্রাজ্যের উচ্চভূমিতে তুলে ধরা। নবীনচন্দ্র মহাজাতি-গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই, তিনি ভারতনাট্যের সূত্রধার শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর মহৎ কাব্যের প্রধান চরিত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। কবির চোখে শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনায়ক—মহাভারতের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান ত্রয়ী কাব্যে কবি কৃষ্ণের অত্যুজ্জ্বল মনুষ্যত্বকে জীবনের নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে স্তরে স্তরে বিকশিত করে তুলেছেন। 'রৈবতক-কাব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্যলীলা, প্রভাসকাব্য অন্তিমলীলা লইয়া রচিত। রৈবতক কাব্যে উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ, এবং প্রভাসে শেষ।' মাধুর্যসিক্ত লীলা, কঠিন কর্মসংঘাত ও প্রশান্ত বৈরাগ্য—বাসুদেবের জীবনের এই তিন পর্যায়। এরই রূপায়ণ দেখি উক্ত ত্রয়ীতে।

জাতিভেদ, কর্মভেদ, রাজ্যভেদ, সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতবর্ষকে কোন্ সর্বনাশের পথে টানছে তা উপলব্ধি করা দেশানুরাগী জাতিবৎসল কবির পক্ষে কঠিন কিছু ছিল না। জাতির এই শোচনীয় অধোগতির প্রতিকার কোন্ পথে, কবি তারও নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন :

যতদিন খণ্ডরাজ্য রহিবে ভারতে আর্য-
জাতি খণ্ডে খণ্ডে পার্থ রহিবে নিশ্চয় ;
রহিবে এ রাজ্যভেদ ধর্মভেদময়।

সুতরাং এমন একটি অখণ্ড মহারাজ্য গড়ে তুলতে হবে যেখানে মানুষের মধ্যে জাতিবর্ণের কোন বৈষম্য থাকবে না, যার প্রতিষ্ঠাভূমি হবে সাম্য, প্রীতি, ন্যায়, দয়া। এ 'বড়ই দুরূহ ব্রত', সন্দেহ নেই। কিন্তু মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ়সংকল্প, নব্যভারত রচনা করবেন তিনি :

এক ধর্ম, এক জাতি,
একই সাম্রাজ্যনীতি,
সকলের এক ভিত্তি,—সর্বভূতহিত।
সাধনা নিষ্কাম কর্ম,
লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম—
একমেবাদ্বিতীয়ম্, করিব নিশ্চিত,
ওই ধর্মরাজ্য, 'মহাভারত' স্থাপিত।

নবীনচন্দ্রের রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস এ যুগের নতুন মহাভারত। এই ত্রয়ী-কাব্যের পরিকল্পনা বিরাট, ভাবাদর্শ মহত্ত্বব্যঞ্জক, এতে বর্ণিত ঘটনাসংস্থান বহুধা-বিস্তৃত। পরিকল্পনার বিশালতায় নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ী মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' ও হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার'কে অনেকদূর ছাড়িয়ে গেছে।

নবীনের 'ত্রয়ী'তে উচ্চপ্রশংসার যোগ্য যেমন অনেককিছু রয়েছে, তেমনি, বহুল দোষত্রুটিও এতে বিদ্যমান। আর্যঅনার্যের সংঘাত ও ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণশূদ্রের যে-মৈত্রীর কথা এতে বর্ণিত হয়েছে তা সর্বথা ইতিহাসের সমর্থন পাবে না। পুরাণকথিত দুর্বাসা-চরিত্রের মহিমা এখানে খর্ব হয়েছে। সুভদ্রার ভূমিকা পৌরাণিকতার স্পর্শবর্জিত। কৃষ্ণার্জুনের ব্যক্তিত্বে বলিষ্ঠতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। সুলোচনার তরল রসিকতা ও চাপল্য কাব্যের গম্ভীর মর্যাদার পক্ষে হানিকর। মহাকাব্যে-প্রত্যাশিত সামঞ্জস্য এখানে বিচলিত। রচনারীতিতে শৈথিল্য সুপ্রকট। গাম্ভীর্যের সঙ্গে তরলতা মিশে গিয়ে উদ্দিষ্ট রসের স্ফুরণকে ব্যাহত করেছে। বর্ণনার অতিবিস্তার ও পল্লবিত ভাষণ কাব্যখানিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গীতিধর্মী করে তুলেছে। তা ছাড়া, নবীনচন্দ্রের শব্দভাণ্ডারের পরিধি সীমিত, অনেক সময়ে তাঁর ভাষা ভাবানুভূতির নাগাল খুঁজে পায় না। অমিত্র-ছন্দকেও কবি ঠিক স্ববশে আনতে পারেন নি। আসল কথা হল নবীনচন্দ্রের প্রতিভা গীতিকবির, কিন্তু যুগের প্রভাবে তিনি নামলেন মহাকাব্য-সংরচনে। হেমচন্দ্রও এ ভুলটি করেছিলেন।

এতসব ত্রুটি সত্ত্বেও অকৃত্রিম কবিত্বের উৎসারে, পরিকল্পনার বিরাটত্বে, অভিনব জাতীয়তার প্রাণদ স্পর্শে রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস উজ্জ্বল মহিমায় দীপ্তিমান। এই শ্রেণীর কাব্যপ্রয়াস বাঙলা সাহিত্যে অদৃষ্টপূর্ব।

এরপর নবীনচন্দ্র তিনজনমহামানবের অমর জীবনকে কাব্যরূপদান করলেন—লিখলেন খ্রীস্ট, অমিতাভ ও অমৃতাভ—প্রথমটিতে যিশু খ্রীস্টের, দ্বিতীয়টিতে গৌতম বুদ্ধের, তৃতীয়টিতে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা ছন্দে গ্রথিত হয়েছে। এইসব দেবকল্প পুরুষের অর্চনার আসল উদ্দেশ্য হল স্বদেশের মানুষের সমক্ষে পূর্ণ-মনুষ্যত্বের আদর্শ উপস্থাপন। কবি এঁদের দেবতারূপে গড়েননি—এই মর্তপৃথিবীর রক্তমাংসের মানুষহিসেবেই দেখেছেন। মানুষকে দেবতা বানিয়ে পূজা নিবেদন করবার এতটুকু অভিপ্রায় কবির ছিল না। তবে মানুষ যে আত্মিক শক্তিতে দেবকল্প হয়ে উঠতে পারে সে কথা বিস্মৃত হননি।

কবির শেষজীবনের কাব্যে সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণীই উদ্‌গীত। 'খ্রীস্ট' কাব্যে মহামানবতার স্বীকৃতি আছে, কিন্তু কবিহৃদয়ের উত্তাপ এখানে অনুপস্থিত। বুদ্ধচরিতের মাহাত্ম্যখ্যাপনে কবিপ্রাণের সহজ স্ফূর্তি অনুভব করা যায়। এজন্যে 'অমিতাভ' কাব্যগুণোপেত। নবীনচন্দ্রের প্রাণের উল্লাসের অপেক্ষাকৃত অধিক স্ফুরণ ঘটেছে 'অমৃতাভ' কাব্যে, এর কারণ হল বৈষ্ণবধর্মের প্রতি কবিচিত্তের সহজ প্রবণতা। 'অমিতাভ'তে শান্তরসের প্রাধান্য, 'অমৃতাভ'তে করুণরসের। সংসার-জীবন থেকে প্রেমদেবতা শ্রীচৈতন্যের বিদায়গ্রহণ অতিশয় বিষাদময় একটি ঘটনা, 'অমৃতাভ' কাব্যখানিতে এই ঘটনাটি কারুণ্যের উৎস হয়েছে। 'অমৃতাভ' কবির শেষ ও অসম্পূর্ণ কাব্য।

কবির সৃজনীক্ষমতা এখন ক্ষয়িষ্ণুতার মুখে, প্রতিভা স্তিমিত হয়ে এসেছে। অধিকাংশ কবিই শেষ পর্যন্ত প্রতিভার দীপ্তি হারিয়েছেন, নবীনচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

কবির রচনার সামান্য নমুনা :

॥ ক ॥ কি দিব উত্তর? আমি কেন ভালবাসি?
আমি পারাবার-সম,
হায়, ভালবাসা মম,
কেন উপজিল সিন্ধু!—এই অম্বুরাশি,
কে বলিবে? কে বলিবে, কেন ভালবাসি।

যে-তরু অনন্তছায়া হৃদয় আমার
করিয়াছে, আজ, প্রিয়ে!
কেমনে চিরিয়ে হিয়ে
দেখাব সে পাদপের অঙ্কুর কোথায়?
কেন ভালবাসি, হায়! বুঝাব তোমায়।

যাবে না। বিহারীলালের কাব্যে তা সুপ্রকট। একারণে বিহারীলালকে আমরা বাঙ্‌লা কবিতার প্রথম লিরিক কবি বলতে চেয়েছি।

আধুনিক যুগে বিহারীলালের পূর্বে এবং তাঁর সমকালের কয়েকজন বাঙালি কবি—যেমন মধুসূদন-হেম-নবীন—গীতিকবিতা নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু লিরিকের পূর্ণায়ত রূপটি এঁদের কাব্যে রচনায় লক্ষ্য করা যায় না। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র গীতিকবি যদিও ছিলেন, রোম্যান্টিক কল্পনার ঐশ্বর্য তাঁদের ছিল না। তাঁদের রচনায় সুদূরের অভিলাষ, নিসর্গতন্ময়তা, জানার মধ্যে অজানার রহস্যস্পর্শন, বস্তুর অতীত মনোরাজ্যে স্বপ্নসঞ্চরণ ইত্যাদি কোথাও তেমন চোখে পড়ে না। মাইকেলের 'চতুর্দশপদী কবিতা' হৃদয়ভাবুকতার উদাহরণরূপে গণ্য হতে পারে। কিন্তু নির্বিষয় ও শুদ্ধ মনোগত ভাব নিয়ে, কল্পনার পক্ষবিস্তার করে কাব্যলোকে যে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করা যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত আমাদের সমক্ষে তিনি উপস্থিত করেন নি—করেছেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। বিহারীলালে এসে আমরা দেখলাম, বস্তুজগৎ নয়, কবির মনোলোক কাব্যে প্রাধান্য লাভ করতে করতে সমস্ত কাব্যই মনোময় হয়ে উঠেছে। এই মনোময়তা আধুনিক আদর্শের গীতিকবিতার খুব বড়ো একটি লক্ষণ।

মাইকেলের যুগে বিহারীলালের মতো আত্মসমাহিত গীতিকবির আবির্ভাব একেবারে অপ্রত্যাশিত না হলেও অনেকটা আকস্মিক। ভাবনিমগ্ন বিহারীলালের দিকে সেকালের পাঠকসাধারণের দৃষ্টি বড়ো একটা আকৃষ্ট হয়নি। তিনি যে সবারই অলক্ষ্যে নতুন যুগের প্রভাতী গাইছেন তা সেদিনকার অধিকাংশ লোক একেবারেই বুঝতে পারে নি। তাঁর কাব্যের মর্মজ্ঞ রসিক সেদিনও যেমন সংখ্যায় ছিল অত্যল্প, আজিকার দিনেও তাই। একহিসেবে বিহারীলাল কবির কবি। কবি ছাড়া তাঁর কাব্যকবিতার সন্ধান অপর কেউ রাখেন বলে মনে হয় না। এস্থলে রবীন্দ্রের উক্তি স্মর্তব্য : 'যাহারা দৈবক্রমে এই বিজনবাসী কবির সংগীতকাকলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল তাহাদের নিকটে তাঁহার আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত।' তিনি খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক আর সমালোচকের দ্বারস্থ হননি। বাইরের দিকে না তাকিয়ে কেবল নিজের হৃদয়কে প্রামাণ্য করে, নিজের ভাষায় নিজের ছন্দে গীতিময় কবিতা লিখে গেছেন।

যথোচিত কবিযশ ভাগ্যে না জুটলেও একদিক থেকে দেখলে বিহারীলাল সৌভাগ্যবান। তিনি কয়েকজন প্রতিভাবান কবিকে তাঁর ভাবশিষ্যরূপে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজ গুরুর আসনে বসিয়ে ভক্তিমিশ্র অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বিহারীলালের বিদ্যালয়েই তিনি কবিতার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। রবীন্দ্র-সমকালীন কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, সুপরিচিত কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং আরো অনেকে কাব্য সাধনার ক্ষেত্রে বিহারীলাল চক্রবর্তীর শিষ্যত্ব স্বীকার করে নিজেদের ধন্য মেনেছেন। যিনি এতসব কবির গুরুস্থানীয়, অপরিসীম তাঁর গৌরবমর্যাদা।

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতার নিমতলা অঞ্চলে এক নিম্নমধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারে বিহারীলালের জন্ম। বিদ্যালয়ে যথাযীতি শিক্ষাগ্রহণ বলতে যা বোঝায়, কবির তা হয়নি বললে চলে। অল্পকাল তিনি জেনারেল এসেমব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসনে এবং বছর তিনেক সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন। সংগীত ও কবিতার প্রতি আশৈশব তাঁর অনুরাগ ছিল। ছেলেবেলায় যাত্রা, পাঁচালি, ইত্যাদি শুনতে তিনি খুবই ভালোবাসতেন। কেবল বাইরে গান শুনেই বিহারীলাল সন্তুষ্ট থাকতেন না, বাড়ীতে এসে সুর সংযোগে সেগুলির পুনরাবৃত্তি করতেন, এবং গীতের কোনো অংশ ভুলে গেলে তা নিজেই পূরণ করে নিতেন। পরের লেখা গীতের অংশ পূরণ করতে করতে ক্রমে তিনি নিজেই গান বাঁধতে আরম্ভ করেন। একে কবির কাব্যরচনার প্রস্তুতিপর্ব বলা যায়।

বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস বেশিদূর অগ্রসর না হলেও তাঁর জ্ঞানস্পৃহা ও সাহিত্যানুরাগ বেড়েই চলে। নিজের উদ্যমে, প্রতিবেশীর কাছে, এবং কখনো বন্ধুর সাহচর্যে, তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্য অনুশীলন করতে থাকেন। সংস্কৃতের কয়েকজন বিখ্যাত কবির এবং শেক্সপীয়র, বায়রণ প্রমুখ দুচারজন ইংরেজ কবির রচনার সঙ্গে তাঁর মোটামুটি পরিচয় ছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা, নিধুবাবু ও দাশুরায়ের গানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। সমকালীন বাঙলা কবিতাও যে তিনি মন দিয়ে পড়তেন তা বুঝতে পারা যায় ওই নব্যসাহিত্যরীতির প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাবের প্রকাশ থেকে।

জীবনের প্রথমের দিকে তিনি দুই নিকটজনকে হারিয়েছেন—জননীকে ও জায়াকে। অন্তরঙ্গবন্ধুবিয়োগজনিত মনঃপীড়াও তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। পরে তিনি আবার বিবাহ করেছেন, জনক হয়েছেন। কিন্তু জীবনের প্রথম পর্বে যে-বিয়োগবেদনা তাঁর অন্তরে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, যে-শূন্যতাবোধের মধ্যে তাঁকে নিক্ষেপ করে গেছে, সেই ক্ষতযন্ত্রণা তিনি কদাপি ভুলতে পারেন নি, তাঁর অন্তরে সেই শূন্যতার হাহাকার কখনো সম্পূর্ণ ঘোচেনি। বোধ করি, এজন্যেই বিহারীলাল বিরহভাবুকতার কবি—বিরহের ব্যথা-বাষ্প দিয়ে তিনি রোদনভরা স্বপ্নের ভুবন রচনা করেছেন।

তাঁর অপর এক নেশা ছিল সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদনা। 'পূর্ণিমা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। এই পত্রিকাতেই তাঁর অনেকগুলি কবিতা ছাপা হয়। যে-কাগজখানির মাধ্যমে বিহারীলালের যথার্থ কবিপরিচয় সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় তার নাম 'অবোধবন্ধু'। কবির 'নিসর্গসন্দর্শন', 'বঙ্গসুন্দরী', 'বন্ধুবিয়োগ', 'সুরবালা কাব্য' প্রভৃতি রচনা 'অবোধবন্ধু'তেই প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। এই পত্রিকাতেই বালকবয়সে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল চক্রবর্তীর

লেখা কবিতা পড়েন এবং এক আলোআঁধারি মায়াকুহেলিকাঘেরা রূপজগতের সন্ধান পান।

বিহারী-কবির সর্বোত্তম কাব্যগ্রন্থের নাম 'সারদামঙ্গল'। পরে তিনি আরো দুখানি কাব্য রচনা করেন, নাম—'বাউলবিংশতি' ও 'সাধের আসন'। এতদ্ব্যতীত 'মায়াদেবী' ও 'শরৎকাল' পরবর্তী সময়ে রচিত।

১৮৯৪ সালে, ৫৯ বছর বয়সে, বিহারীলাল লোকান্তরিত হন।

বিহারীলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ : **সংগীতশতক**, ১৮৬২ ইংরেজি সালে প্রকাশিত। কৈশোর ও প্রথমযৌবনের বিচিত্র ভাবানুভূতি ও নানাবিধ অভিজ্ঞতার কথা এতে ছন্দোবদ্ধ হয়েছে। সেকালের পাঠকের কাছে বইটি সমাদর পায়নি। কিন্তু ভাবীকালে এ গ্রন্থের রচয়িতা যে অদ্ভুত কবিত্বশক্তির পরিচয় দেবেন তার কিছু কিছু আভাস বইখানিতে মেলে : 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়ে দেখ তাই, পেলেও পাতে পার লুকান রতন'—এমন আশ্চর্য পঙ্‌ক্তি যাঁর লেখনীনিঃসৃত তাঁর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে কোনো সংশয় থাকে না। কবির দৃষ্টি অন্তর্মুখী, ভাষা ও ছন্দ নতুন, কাব্যমন্ত্র অভিনব। 'এই সংগীতশতক' লিখে কবি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

'সংগীতশতক' রচনার পর ছ-সাত বছর বিহারীলালের কোনো কাব্য প্রকাশিত হয়নি। ১৮৭০ সালে পর পর চারখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হল—**বঙ্গসুন্দরী**, নিসর্গসন্দর্শন, বন্ধুবিয়োগ ও প্রেমবাহিনী। **বন্ধুবিয়োগ** কাব্যে কবি তাঁর প্রথমা পত্নী ও তিন বাল্যবন্ধুর বিয়োগজনিত বেদনা প্রকাশ করেছেন। প্রকাশে আন্তরিকতার স্পর্শ আছে, রচনারীতিতে কিন্তু সর্বথা স্বাতন্ত্র্য ফোটেনি। 'বন্ধু-বিয়োগ' পয়ারে লেখা, চারটি সর্গে গ্রথিত।

বঙ্গসুন্দরী কাব্য দশটি সর্গে সমাপ্ত। এতে নারীবন্দনা, কবিকল্পিত 'সুরবালা' এবং কয়েকটি ক্ষীণ আখ্যায়িকা অবলম্বনে চিরপরাধীনা, করুণাসুন্দরী, উন্মাদিনী, বিরহিণী, প্রিয়তমা প্রভৃতি নারীর বিভিন্ন চিত্র রূপায়িত হয়েছে এবং তৎসম্পর্কে কবির সহানুভূতিযুক্ত হৃদয়োচ্ছ্বাস পরিব্যক্ত হয়েছে। বাঙালি নারীর চরিত্রমাধুর্য বিহারীলালকে মুগ্ধ করেছিল, বঙ্গললনা যে কত মহীয়সী, এই কাব্যটিতে লেখক তা-ই দেখিয়েছেন। 'বঙ্গসুন্দরী'র প্রথম সর্গে কতকগুলি আশ্চর্যসুন্দর পঙ্‌ক্তি আছে। চতুষ্পার্শ্বের সমাজসংসারের সঙ্গে তাঁর মনের মিল হয় না, তাই :

সর্বদাই হুহু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন,
চারিদিকে ঝালাপালা
উঃ কী অনন্ত জ্বালা,
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ যেমন!

এ কাব্যে বিহারীলাল পল্লীগ্রামের বর্ণনা দিয়ে খাঁটি পল্লীবাসী হতে চেয়েছেন। কবির এই মনোভাবের ব্যাখ্যানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের সকলের মনে দৈবী অসন্তোষ [divine discontent] রয়েছে। ফলে, শহরবাসী কবি পল্লীর জন্য ব্যাকুল, আবার, পল্লীবাসীর চিত্ত নাগরিক জীবনের স্বাদগ্রহণের জন্যে নিত্য উন্মুখ। বস্তুত, কোন কবির কাব্যেই পরিপূর্ণ আত্মসন্তুষ্টি বা নির্বিরোধ সুখের কথা পাওয়া যায় না। সুখসন্তোষ যখন একরূপ দুষ্প্রাপ্য তখন কবির এই 'সর্বদাই হুহু করে মন' এরূপ উক্তির কারণ সহজে উপলব্ধি করা যায় ; পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছেন না বলে এই দেশ ছেড়ে, অন্য কোথাও গিয়ে অবিক্ষুব্ধ মনের শান্তি আহরণের অভিলাষ জ্ঞাপন করেছেন কবি।

সাতটি সর্গে **নিসর্গসন্দর্শন** সমাপ্ত হয়েছে। এতে কবি পয়ার ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এতে প্রধানত পাই কবির প্রকৃতিরসসম্ভোগের কথা। সমুদ্রদর্শন, নভোমণ্ডল, ঝটিকাসম্ভোগ প্রভৃতি কবিতা এই গ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতিলোকের বিভিন্ন অবস্থা,—প্রভাতের বিহঙ্গকাকলীমুখর আনন্দোৎসব, সূর্যতাপিত মধ্যাহ্নের উদাস মূর্তি, অন্ধকারসমাবৃত সন্ধ্যার বৈরাগ্য,সংগীত বিহারীলালের লেখনীতে মনোজ্ঞ বাণীরূপ পেয়েছে। নিসর্গপ্রকৃতির কোমলমধুর আলেখ্য-অঙ্কনে কবি দক্ষতা দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতির সংসারে যা বিরাট, মহান, উদাত্তগম্ভীর, তার বর্ণনায় তিনি তেমন সিদ্ধিলাভ করেন নি। 'সমুদ্রদর্শন'-এ সমুদ্রপ্রকৃতির কয়েকটি বর্ণনা সত্যই চমৎকার, সহজ কবিত্বে অতিশয় হৃদয়গ্রাহ্য। যেমন, মানবদৃষ্টিতে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপমালা দেখে কবি লিখেছেন :

কোনোটি-বা ফলেফুলে অতি সুশোভন
নন্দনকানন যেন স্বর্গে শোভা পায় ;
সম্ভোগ করিতে কিন্তু নাহি লোকজন,
বিধবা-যৌবন যেন বিফলেতে যায়।

উনিশের শতকের কবি—রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবির রচনায় যে-পরাধীনতার বেদনা আত্মপ্রকাশ করেছে, 'সমুদ্রদর্শন' কবিতায় রচয়িতার মনেও সেই বেদনা জেগেছে।

চতুর্থ সর্গে 'নভোমণ্ডল'-এর বর্ণনায় মনোরম কবিকল্পনার স্পর্শ আছে :

হালিগাঁথা ছায়াপথ, গোচ্ছা সেলিহার,
তোমার বিশাল বক্ষে সেজেছে উচিত ;
যেন এক নিরমল নির্ঝরের ধার,
সুবিস্তৃত-উপত্যকায়-বক্ষে প্রবাহিত।

শূন্যে শূন্যে মেঘমালে নাচিয়ে বেড়ায়
চঞ্চলা চপলা বালা তব নৃত্যকরী

যেন মানসসরোবর-লহরী-লীলায়
উল্লাসে সন্তরে সব অলকাসুন্দরী।

এজাতের নিসর্গচিত্রণ বিহারীলাল চক্রবর্তীর রোম্যান্টিক মনোভাবের পরিচয়বাহী।

বিহারীলালের কবিপ্রাণের সত্যকার জাগরণের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করেছে প্রেমপ্রবাহিনী কাব্য। এখানে কবির রচনারীতির বৈশিষ্ট্যের মুদ্রাঙ্কন রসজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টি এড়াবার নয়। এই কাব্যে বিষাদে নিমগ্ন কবি প্রণয়-বস্তুটির সন্ধানী। সংসারে প্রকৃত প্রেমের মর্যাদা নেই, এই সত্যটি উপলব্ধি করে যখন তিনি হতাশাগ্রস্ত হলেন তখন অকস্মাৎ তাঁর চিত্তে দৈবী আনন্দের স্পর্শ লাগল। সহসা আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হলেন কবি। মোহিনী কল্পনা এখন কবির হাত ধরে বিশ্বব্যাপী প্রেমের জগৎটি তাঁকে দেখাচ্ছে, তাতে 'শান্তিসুখময় এক রসে' কবির হৃদয়দেশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কাব্যটিতে পরবর্তী 'সারদামঙ্গল'-এর পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর সর্বোত্তম কবিকৃতি **সারদামঙ্গল**। নিবিড় প্রেমানুভব ও তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যচেতনা—এই যুগ্মপ্রেরণা কাব্যখানির রচনার মূলে সক্রিয় রয়েছে। বর্তমান প্রেমকাব্যে কবি তাঁর অন্তরবাসিনী প্রেয়সী বা কাব্যলক্ষ্মী বা 'আনন্দরূপিণী মানসমরালী'-কে বিশ্বব্যাপ্ত সৌন্দর্যের শ্বেত শতদলের ওপর দাঁড় করিয়ে এক অভূতপূর্ব রাগিণীতে সুখদুঃখ, বিরহমিলনের গীতিময় শ্লোক উচ্চারণ করেছেন, রবীন্দ্রের ভাষায়—'সোনার শ্লোক'। সেকালের বঙ্গীয় কাব্যে এহেন প্রণয়সংগীতের তুলনা নেই। বিহারীলালের 'সারদা' তাঁর ধ্যানধৃতা মায়াময়ী এক আশ্চর্য নারীমূর্তি—নারী+প্রেম+প্রকৃতির সৌন্দর্যে গড়ে উঠেছে এর কল্পকায়া। এই রহস্যময়ী রমণীটির সম্পর্কে কবিমানসের বহুবিধ প্রতিক্রিয়া 'সারদামঙ্গল'-এ বর্ণিত হয়েছে। 'সারদা' কখনো কবিকে দেখা দিতেছেন, আবার পরমুহূর্তেই কবিকে তীব্র বিরহের মধ্যে নিক্ষেপ করে অন্তর্হিত হচ্ছেন। চিরবিরহী বিহারীলাল সুকুমার কল্পনা দিয়ে সৌন্দর্যবিভাসিত যে অপরূপ 'বিরহের স্বর্গলোক'—'কামনার মোক্ষধাম'—নির্মাণ করছেন, তারই নাম 'সারদামঙ্গল'।

এ কাব্য পড়তে গেলে প্রথমে কবির বিরহভাবনাটি লক্ষ্য করতে হবে। বন্ধুজনের অকালবিয়োগ, প্রিয়তমার আকস্মিক মৃত্যু, কবির অন্তরে শূন্যতার সৃষ্টি করেছে, তীব্র বিরহবেদনা জাগিয়েছে। এই বেদনার মুখে তিনি ভাষা দিতে চেয়েছেন। যার প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে মানুষের অন্তরবেদনা সুরময় বাণীতে প্রকাশিত হয়, কবি সেই বাগ্দেবীর সান্নিধ্যলাভের অভিলাষী। কিন্তু কল্পনার অধীশ্বরী বাগ্দেবী সরস্বতীর প্রসন্নতা থেকেও বুঝি তিনি বঞ্চিত। এই তিন রকমের বেদনা কবিকে উন্মত্তবৎ করে তুলেছিল—বেদনার সূত্রেই বন্ধু-প্রিয়া-সরস্বতী এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছে।

সম্ভোক্ত বেদনার প্রাণকেন্দ্রে কিন্তু কবির প্রিয়তমাই বিরাজমানা।

যে প্রেয়সীকে তিনি বাস্তবলোকে হারিয়েছেন তাকে পেতে চেয়েছেন কবি কল্পনার ভূমিতে। বাস্তবে যে-নারী গৃহের সংকীর্ণ গণ্ডীতে সঞ্চরণ করে বেড়াতেন, মৃত্যুর পর সমস্ত ভুবনে তিনি ব্যাপ্ত হয়ে পড়লেন। কবির অন্তরে তিনি প্রেমানন্দ-ময়ী, বাইরে বিশ্ববিকাশিনী সৌন্দর্যস্বরূপিণী—প্রেমের জগৎ থেকে সৌন্দর্যজগতে, সৌন্দর্যের জগৎ থেকে প্রেমজগতে কবির নির্বাধ আনাগোনা। নিজের একান্ত-প্রেয়সী কখন যে বিশ্বের সৌন্দর্য প্রতিমায় পরিণত হয়েছেন, কবি নিজেও বুঝি তা জানেন না। বলা বাহুল্য, সৌন্দর্যপ্রতিমা বলেই, 'সারদামঙ্গল' কাব্যের সারদা বা সরস্বতী আমাদের প্রচলিত ধারণার সরস্বতী থেকে বিভিন্ন। কবির ভাবদৃষ্টিতে মানবসংসারে তিনি কখনো জননী, কখনো ভগিনী, কখনো কন্যারূপে প্রতিভাত হন]

ভাবময়ী সারদার হ্লাদিনী-রূপের সঙ্গে কবি প্রেমলীলায় তন্ময় হয়ে থাকেন, অন্তরে অগাধ রসের ও তৃপ্তির সন্ধান পান; তাই, বিরহবেদনাও তাঁর কাছে চিরানন্দের উৎস হয়ে উঠে :

তুমিই মনের তৃপ্তি, তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমা হারা হলে আমি প্রাণহারা হই,
করুণা কটাক্ষে তব প্রাণ পাই অভিনব—
অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে রই।
যে কদিন আছে প্রাণ করিব তোমার ধ্যান,
আনন্দে ত্যজিব তনু ও রাঙা চরণতলে॥

'সারদামঙ্গল'-এর প্রারম্ভে কবি করুণাময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বন্দনা করেছেন। পরে বাল্মীকির তপোবনে তাঁর আবির্ভাব বর্ণিত হয়েছে। সেই হিমাদ্রিশিখর আলো করে দেবীর সহসা আত্মপ্রকাশ, সেই তমসাতীরে প্রভাতাগমে ক্রৌঞ্চদম্পতীর মিলনছবি, ব্যাধের নিষ্ঠুরতা ও বাল্মীকির ললাটে জ্যোতির্ময়ী 'যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে'র কান্নারূপগ্রহণ ও বাল্মীকির করুণাবিহ্বলতা—এসকলের অনুপম চিত্র কবি অতিশয় নিপুণতাসহকারে এঁকেছেন। সারদাদেবীর এই করুণা-মূর্তির বর্ণনার পর তাঁর সুবর্ণপদ্মাসীন সৌন্দর্যমূর্তি চিত্রিতে হয়েছে, এবং পরিশেষে কবি সারদার নিকট মনপ্রাণ সমর্পণ করে একান্ত ভক্তের ন্যায় তাঁর সেবায় ধন্য হতে চেয়েছেন।

এর পরবর্তী সর্গগুলিতে প্রেমিকের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। দেবী প্রণয়াস্পদারূপে আবির্ভূতা হয়ে বিচিত্র সুঃখদুখের সংগীতে কবির হৃদয় পরিপূর্ণ করে তুলেছেন। কবি 'কখনো অভিমান, কখনো বিরহ, কখনো আনন্দ, কখনো বেদনা, কখনো ভর্ৎসনা কখনো স্তবে' নিজের কাব্যকুঞ্জ মুখর করে তুলেছেন।

সহসা কবির সন্দেহ হয়েছে, তাঁর এই প্রেমের বস্তুর অন্বেষণ ভ্রান্তি। কিন্তু কবি নিজ হৃদয়ের গভীরে অনুসন্ধান করে দেখেছেন, এ তাঁর কাছে অতীব সত্য :

তবে কি সকলি ভুল ? নাই কি প্রেমের মূল ?
বিচিত্র গগনফুল কল্পনালতার।
মন কেন রসে ভাসে, প্রাণ কেন ভালোবাসে
আদরে পরিতে গেলে সেই ফুলহার ?
শত শত নরনারী দাঁড়ায়েছে সারি সারি,
নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখানি ?
হেরে হারানিধি পায়, না হেরিলে প্রাণ যায়,
এমন সরল সত্য কি আছে না জানি।

এইভাবে কবি সকল দ্বিধাসংশয় কাটিয়ে উঠেন এবং আবেগবশে তাঁর সারদার সঙ্গে মধুর প্রণয় বর্ণনা করেন এবং তাঁর নিজ রসস্ফূর্তি অপূর্ব ভাষায় বিবৃত করেন।

কবি গ্রন্থখানি শেষ করেছেন হিমালয়শিখরে প্রণয়িনী সারদার সঙ্গে মিলনানন্দের চিত্র এঁকে প্রণয়াস্পদাকে বিশ্বের মধ্যে স্থাপন করে তিনি তার মানবীয় ভাববিলাস বর্ণনা করেছেন এবং আপনার বিমল আনন্দ স্বর্গে-মর্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

অতঃপর সাধের আসন। এতে কবি তাঁর কল্পিত নারীমূর্তি সারদার স্বরূপ স্পষ্ট করে বুঝাতে চেয়েছেন। 'সাধের আসন'-কে 'সারদামঙ্গল'-এর পরিশিষ্ট হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে ওই সারদাকে কবি দার্শনিক ভঙ্গিতে বিশ্বের ঐক্যতত্ত্বরূপে দেখবার প্রয়াসী। স্থানে স্থানে উভয় গ্রন্থের ভাবসাদৃশ্য সকলেই লক্ষ্য করবেন। দশটি সর্গ, উপসংহার ও কয়েকটি গানে সম্পূর্ণ এই কাব্যের প্রথম সর্গে কবি লিখেছেন :

আহা, বিশ্ব-পরকাশি
উদার সৌন্দর্যরাশি
জলে-স্থলে আকাশে সদাই বিরাজিত।
যেদিকে ফিরিয়া চাই,
সৌন্দর্যে ডুবিয়া যাই ;

পরম আনন্দময়ী !
কে তুমি, মা, কান্তিরূপে সর্বরূপে বিভাসিত।

'সারদামঙ্গল' বস্তুত এই আনন্দলক্ষ্মীরই গান।

'সাধের আসন'-এ বিহারীলাল যে-আনন্দলক্ষ্মীর কথা বলেছেন, তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে তাঁকে বিশ্বাত্মা বা বিশ্বদেবী বলা যেতে পারে—এক

মহাশক্তি তিনি। ইনি একাধারে জ্ঞানরূপিণী, চৈতন্যরূপিণী এবং কান্তিরূপিণী অর্থাৎ সৌন্দর্যময়ী। সেজন্যে সারদা একদিকে যেমন যোগীর ধ্যেয়, তেমনি অন্যদিকে, কবির আরাধ্যা। 'যোগীন্দ্রের ধ্যানধন'ই বিহারীলালের 'হৃদ্‌পদ্মে সরস্বতী'র রূপে প্রতিভাত হয়েছে। সারদা কবির কাছে রহস্যময়ী হলেও এঁর সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি অত্যন্ত স্পষ্ট :

প্রত্যক্ষে বিরাজমান,
সর্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা;
কবির যোগীর ধ্যান,
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ,
মানবমনের তুমি উদার সুষমা।

বিহারীলাল চক্রবর্তীকে প্রেমের রহস্যবাদী কবি [love mystic] বলা যেতে পারে। সর্বদা তিনি প্রেমধ্যানে তন্ময় ও সৌন্দর্যধ্যানে বিভোর হয়ে থাকতেন। চিত্তের এরূপ ভাববিভোর অবস্থায় তাঁর কণ্ঠ থেকে গান উৎসারিত হত। এই সংগীতের যে শ্রোতা আছে একথা তিনি প্রায়শ ভুলে যেতেন। পাঠকের দিকে দৃষ্টি রেখে কাব্যকবিতা লিখতেন না বলে তাঁর রচনা সর্বথা ভাবের উৎকৃষ্ট রূপনির্মিতি হয়ে ওঠেনি। উত্তম কবিতা কেবল গূঢ়ভাবব্যঞ্জক নয়, তার বাণীদেহ থেকে বিচিত্র-কলাকৌশল-সঞ্জাত চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্যের দ্যুতিও বিচ্ছুরিত হয়। অর্থাৎ কবিকে শুধু ভাবুক হলে চলে না, তাঁকে কারুকৃৎ বা শিল্পীও হতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিহারীলাল বিশুদ্ধ শিল্পী নন। একারণে বড়ো একজন ভাবসাধক হয়েও মহৎ কাব্যশিল্প আমাদের কাছে তিনি তুলে দিতে পারেননি।

সে যা হোক, কবির কাছ থেকে যা আমরা পেয়েছি তার মূল্য সামান্য নয়। 'সারদামঙ্গল' কবিকে অমর করে রেখেছে। কাব্যখানি বস্তুত আধুনিক গীতিকবিতার গঙ্গোত্রী।

দশম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮৬১-১৯৪১]

রবীন্দ্র-প্রতিভা প্রসঙ্গে :

যতই সাবধানী হোন, যে-কোন লেখকের পক্ষে, রবীন্দ্রালোচনায়, অতিভাষণ এড়িয়ে চলা অত্যন্ত কঠিন। কবির দুর্লভ দৈবী প্রতিভার বহুবিচিত্র প্রকাশ আমাদের একেবারে অভিভূত করে দেয়. তাঁর নির্মিত সাহিত্যের বিশাল অরণ্যপ্রদেশে প্রবেশ করলে আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত হই। রবীন্দ্রের সৃজনী প্রতিভা সর্বতোমুখী, সাহিত্য ও জীবনের প্রায় সকল ভূমিতে অবলীলায় বিচরণ করেছেন বলে মহাপ্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিসার্বভৌম। এতখানি শক্তিমান কাব্য-নির্মাতা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসেও দুচারজনের বেশি যে নেই এমন একটি কথা বললে ভুল করা হয় না।

অতিন্দ্রিয় সাধনায় কবি-রবীন্দ্র বাণীকে স্ববশে এনেছিলেন; তাঁর পরমাশ্চর্য বাগবিভূতি বঙ্গসরস্বতীকে অপরূপ কলাসৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে, ভাষা-ছন্দ ও সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করেছে। গদ্যে ও পদ্যে যে-কীর্তি তিনি রেখে গেছেন, তা শুধু আমাদের সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর যে-কোন সাহিত্যে নিঃসংশয়িতভাবে অভূতপূর্ব। বাণীশিল্পী রবীন্দ্রনাথ সকল কালের সকল দেশের বিপুল এক বিস্ময়। রচনায় এমন কোনো রূপ নেই যা তাঁর লেখনীর স্পর্শের বাইরে রয়ে গেছে, এবং কী গদ্যে কী পদ্যে, ভাবের যে অফুরন্ত রূপসৃষ্টি তিনি করেছেন তার প্রত্যেকটি রীতি বা ভঙ্গি অসাধারণ নবত্বে দীপ্তিমান। সৃষ্টির এত প্রাচুর্য, রূপভঙ্গিমার এত বৈচিত্র্য যখন দেখি তখন মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না এসব বস্তু একজন মানুষেরই একক সাধনার ফলজাত।

রবীন্দ্রনাথ কী কী লিখেছেন এ প্রশ্ন না করে জিজ্ঞাসা করা উচিত, কী তিনি লেখেননি। একটু আগেই বলেছি, সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে তাঁর অবারিত প্রবেশাধিকার। গদ্যে তিনি লিখেছেন ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ, সমালোচনা, কথিকা, ভ্রমণকথা, পত্রাবলী, গদ্যকবিতা, ইত্যাদি; পদ্যে তিনি লিখেছেন গীতিকবিতা—গীতিকবিতা এক সঙ্গে কত রূপ ধরে এ যদি কেউ দেখতে চান তবে তাঁকে রবীন্দ্রের গীতিকবিতার দিকে দৃষ্টি মেলে ধরতে বলি। আবার, এই পদ্যেই কবি লিখেছেন গাথা, গীতিনাট্য, নাট্যকাব্য, নাটক আর অসংখ্য গান—যে-গানের বাণী ও সুরের মোহিনী মূর্ছনা শ্রোতার চিত্তকে সৌন্দর্যচেতনার এক সুরম্য ভূমিতে

উত্তীর্ণ করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু গীতিকার নন, সুরকারও বটেন। তা ছাড়া, স্বতন্ত্র এক গীতিরীতিরও [style] প্রবর্তন করে গেছেন তিনি।

রবীন্দ্রপরিচিতির ইতি টানা এখনো হয়নি। আরো বহুক্ষেত্রে তাঁর আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব বিকশিত। রবীন্দ্রনাথ চিত্রী ও নৃত্যশিল্পবিৎ; তিনি দার্শনিক, প্রজ্ঞাবান পুরুষ; তিনি শিক্ষাব্রতী, সংস্কারক ও জননায়ক; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মনীষীদের সঙ্গে তিনি সর্বদা ভাব ও চিন্তার বিনিময় করেছেন। কেবল রসক্ষেত্রেই তাঁর বিহরণ ছিল না, সংসারের বিচিত্র কর্মের ক্ষেত্রেও কবি নিজ শক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন; জাতীয় আন্দোলনে তিনি সাড়া দিয়েছেন, দেশের সংগঠনমূলক কাজে যত্নবান হয়েছেন—তাঁর দীর্ঘায়ত জীবনে কর্মে নিষ্ঠা আর রসোচ্ছল উপলব্ধির মধ্যে তেমন কোনো বিরোধ কখনো দেখা যায়নি।

রবীন্দ্রনাথ ভাবনার জগতে যেমন মহত্তর সমন্বয়ের প্রয়াসী, তেমনি, কর্মজীবন ও সাহিত্যিক জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের একান্ত অভিলাষী। কবি পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা করেছিলেন, তাই, শুধু সাহিত্যচর্চাকেই নিজ আত্মার একতম আরামস্থল বলে জানেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা কেবল মহৎ একজন কবিরূপেই পাইনি, ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতায়ভরা আমাদের জীবনের মাঝখানে তিনি ছিলেন পূর্ণতর মানবতার জ্যোতির্ময় বিগ্রহ, স্বর্গে মর্তে চলাচলের সোনার সিঁড়ি রচনা করেছিলেন তিনি। দৈব প্রেরণা ও প্রতিভার আধার এমন একজন মহিমান্বিত পুরুষকে পেয়ে আমরা—বাঙালিরা—নিজেদের ধন্য মনে করি।

॥ রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সাহিত্যকর্ম ॥

কাব্য-কবিতা :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিকৃতির বিশালতা, ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য সত্যই বিস্ময়াবহ। পঁয়ষট্টি বছরের অধিককাল ধরে কাব্যকবিতার যে-শিল্পলোক তিনি নির্মাণ করেছেন, নিরলস সাধনায় যে আশ্চর্য বাণীজগৎ তিনি গড়ে তুলেছেন, পৃথিবীর সাহিত্যে তার তুলনা নেই বললে কিছুই অত্যুক্তি করা হয় না। কবি হাতে লেখনী ধারণ করেন তাঁর প্রথমকৈশোরে, আর, সেই লেখনীর গতি স্তব্ধ হয় একাশী বৎসর বয়সে—মৃত্যুলগ্নের প্রাক্‌কালে। বার্ধক্য কবির দেহকে জীর্ণ করেছে, কিন্তু তাঁর মনের সজীবতা, কল্পনার সরসতা ও প্রজ্ঞাদৃষ্টির স্বচ্ছতাকে ম্লান করতে পারেনি।

রবীন্দ্রপ্রতিভা পরিণামমুখী। বিচিত্র ভাবানুভূতি, বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এ অতিশয় বিশিষ্ট একটা পরিণামে গিয়ে পৌঁছেছে। এরূপ এক-একটা অভিজ্ঞতার স্তরকে আমরা রবীন্দ্রের দীর্ঘায়ত কবিজীবনের এক-একটি পর্ব বা পর্যায়

নামে চিহ্নিত করতে পারি। প্রত্যেকটি পর্বে কবিচিত্তকে একটি বিশেষ ভাবপ্রেরণা-বশীভূত দেখতে পাওয়া যায়, এবং সেই প্রেরণাবশেই কবির গীতিময় আত্মপ্রকাশ ঘটে। নিঃশেষে আত্মোন্মোচনের পর এই প্রেরণার প্রভাব যখন ক্ষীণতর হয়ে আসে কবি তখন ভিন্নতর একটা ভাবানুভূতির ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেন—আরম্ভ হয় নবতন সৃষ্টিধারা। এইভাবে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রকবিস্বভাবের লক্ষণীয় ধর্ম হল এর বিরামহীন গতিশীলতা—ভাব থেকে ভাবান্তরে, এক উপলব্ধি থেকে অপর এক উপলব্ধির জগতে, নিরন্তর অগ্রসরণ। একারণে কোনো-একটা বিশেষ পর্বভুক্ত রচনাবলীর মধ্যে কবির বহুমুখী সৃষ্টিপ্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় মিলবে না। রবীন্দ্র-কাব্যের মহিমা এর সমগ্রতায়—যেমন বিরাট বনস্পতির।

সাধারণভাবে বলতে গেলে সন্ধ্যাসংগীত থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার শুরু। গ্রন্থখানা কবির উনিশ বৎসর বয়সে লেখা। বলা বাহুল্য, উক্ত গ্রন্থটি কবির লিখিত প্রথম কাব্য নয়, ইতিঃপূর্বে অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়েছে, যেমন—**বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী**, ইত্যাদি। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনের ইতিহাসে এইসব রচনা একারণে উল্লেখ্য নয়, এগুলির মধ্যে কবির প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় প্রস্ফুট হয়ে ওঠেনি। এগুলিকে সাহিত্যসংসারে রবীন্দ্রের হাতেখড়ির কাজ বলা যেতে পারে। এসব লেখায় ভাবাকুলতা ও ভাবালুতা আছে, তার বেশী কিছু নয়। কবিকিশোরের উক্ত-সব বই শিশুর স্খলিতপদের অস্থির চলনের চিত্রটি মনে করিয়ে দেয়।

সে যাক্! রবীন্দ্রনাথ আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন 'সন্ধ্যা-সংগীত'-এ। এতে দেখতে পাওয়া যায়, লেখকের বলবার ভঙ্গিতে স্বকীয়তা ফুটেছে, ভাষা ও ছন্দোরীতিতে নিজস্বতার ছাপ পড়েছে, ভাষণ 'গদ্‌গদ' হলেও তা যে এক বিশেষ কবিব্যক্তির এ বুঝতে কষ্ট হয় না। সন্ধ্যাপ্রকৃতির আলোআঁধারি প্রকাশের মধ্যে যে একটা বিষাদের ভাব পরিব্যক্ত হয়, 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর সুরে সেই ভাবেরই প্রাধান্য। কেমন যেন একটা অনির্দেশ্য বিষাদের বেদনা কবিচিত্তকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে, কবির অবস্থান এক রুদ্ধ হৃদয়াবেগের কারাগারে। এই যে অনির্বাচ্য বিষাদবেদনা তার মূলীভূত কারণ হল বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগের অভাব।

'সন্ধ্যাসংগীত'-এর পর প্রভাতসংগীত—আঁধারের আস্তরণ সরে যাওয়ার পর রৌদ্রঝলমল প্রভাতের আত্মউন্মোচন। অন্তর্নিহিত শক্তির বলে কবি বিষাদের ঘোর কাটিয়ে উঠলেন, বহির্জগৎকে নিজের প্রাণলোকে আহ্বান করলেন, নিসর্গ-প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর শুভদৃষ্টি হয়ে গেল যেন। এখানেই রবীন্দ্রকাব্যে বিশ্বৈক্যানুভূতির সূত্রপাত—প্রকৃতি ও মানবকে প্রীতিনিবেদন, নিখিল সংসারকে আত্মার আত্মীয় বলে অনুভব করা। 'প্রভাতসংগীত'কে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার প্রথম জাগরণের কাব্য বলা যেতে পারে। হঠাৎ মুক্তির উল্লাসে কবিপ্রাণ অধীর—একটা বিক্ষুব্ধ চঞ্চল মানসিক অবস্থার রচনা এই কাব্যখানি।

এর পর কবি লিখলেন **ছবি ও গান**। বহির্বিশ্বের ছবি ও অন্তরলোকের গান এ কাব্যে বিধৃত হয়েছে। এতে দেখি, কবির হৃদয়ে প্রশান্তি নেমেছে, প্রাণের অনির্দিষ্ট আশাআকাঙ্ক্ষা একটা নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে চাইছে। প্রথমযৌবনের কাব্য বলে সৌন্দর্যবিভোরতা, উদ্বেল ভাবপ্রবণতা, প্রণয়বাসনার তীব্রতা এই বইয়ের বহুতর কবিতায় প্রকট হয়ে উঠেছে। কথায় তিনি ছবি আঁকছেন, গান গাইছেন, কিন্তু নিপুণ শিল্পরচনকৌশল এখনো কবির আয়ত্তের বাইরে। তাঁর পাকা হাতের লেখার জন্যে আরো কিছুকাল আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

পরবর্তী কাব্য **কড়ি ও কোমল** অনেক বেশি পরিণত মনের রচনা। এতে কবি যে বাণীভঙ্গিতে, যে সুরে নারীর আরতিবন্দনা করেছেন, বাঙ্‌লা গীতিকাব্যে তার তুলনা নেই। এ সময় মৃত্যুর রহস্যও কবির মনকে ভাবিয়ে তুলেছে। একান্ত প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত হৃদয়যন্ত্রণা কবিকে বিচলিত করেছে। জীবনরঙ্গভূমিতে মরণের চকিত আবির্ভাব কবির আনন্দানুভবের 'কড়ি'র মধ্যে বেদনার 'কোমল' মিশিয়ে দিল।

অতঃপর **মানসী** প্রকাশিত হল। 'মানসী' কবির সৃজনীশক্তির প্রায় পূর্ণজাগরণের পরিচয় বহন করছে। মানবীয় প্রেম ও প্রকৃতিসম্ভোগ, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, সৌন্দর্যব্যাকুলতা, এক দুর্নিরীক্ষ সত্তাকে উপলব্ধির সীমায় ধরবার আকুল আগ্রহ, পার্থিব জীবনের ভোগপ্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও এক অনির্দেশ্য অভাববোধ —এ সমস্তই মোটামুটি 'মানসী'র কবিতাগুচ্ছের আশ্রিত বিষয়বস্তু। এ কাব্যে কবির প্রকৃতিপরিচয় গভীরতর হয়েছে, মানবহৃদয় প্রকৃতির একেবারে অন্তঃপুরের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এতে নিসর্গবিষয়ে রবীন্দ্রের একটি বিশিষ্ট প্রত্যয় সুপরিব্যক্ত। এই প্রত্যয়টি হল—প্রকৃতি চেতনাময়ী, স্নেহময়ী—মনোমদ সৌন্দর্যের যবনিকার অন্তরালে তাঁর প্রাণোদ্বেল সত্তাটি সতত স্পন্দমান। বসুন্ধরার সহিত আত্মীয়ভাস্থাপনের বাসনা, অপ্রাপণীয় সৌন্দর্যের পশ্চাতে ধাবমান কবিচিত্তের গতি 'মানসী'কে বিশিষ্টতা দিয়েছে। কাব্যখানি ছন্দগৌরবেও সমৃদ্ধ। এখানে রবীন্দ্রকবিজীবনের একটি পর্বের শেষ।

সোনার তরী-কে দিয়ে দ্বিতীয় পর্বের শুরু। 'সোনার তরী'-র কবিতাগুলি লিখবার কালে রবীন্দ্রনাথ পদ্মাতীরে বাস করছিলেন। এই পদ্মাপ্রবাসকালেই কবি প্রকৃতির নিকটতম সান্নিধ্যে এসেছিলেন, গ্রামবাঙ্‌লার লোকসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। পদ্মার আতিথ্যগ্রহণ কবির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। এ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ একদিকে প্রকৃতিব্যাকুল, সৌন্দর্যস্বপ্নবিহারী, 'সুদূরের পিয়াসী', অন্যদিকে মানবজীবনের প্রতি তাঁর অনুরাগ অতিশয় প্রবল। সৌন্দর্যতৃষ্ণার সঙ্গে বাস্তবজীবনপিপাসা মিশে গিয়ে এখানে দুটি বিপরীতমুখী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। স্বপ্ন ও বাস্তবের যুগলধারায় 'সোনার তরী' আন্দোলিত। 'সোনার তরী'-র স্বর্ণতটে উত্তীর্ণ রবীন্দ্রের কবিপ্রতিভা পূর্ণবিকশিত, বলা যেতে

পারে। কবি এখন উঁচুদরের শিল্পী হয়ে উঠেছেন, তাঁর কাব্যকলার ঐশ্বর্য মুগ্ধবিস্ময়ে দেখবার বস্তু হয়ে উঠেছে।

এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখ্য রচনা চিত্রা। সৌন্দর্যতন্ময়তা, সুদূরব্যাকুলতা আর প্রগাঢ় পৃথিবীপ্রীতি 'চিত্রা'র প্রধান সুর। 'চিত্রা'তে 'সোনার তরী'-কাব্যে প্রকাশিত কবির মর্তমমতা গভীরতর হয়েছে, লক্ষ্য করা যায়। পূর্বদৃষ্ট এই মর্তমমতা বা অসাধারণ পৃথিবীপ্রীতিই চিত্রা'-য় বাস্তবমানবপ্রীতির রূপ নিয়েছে। 'এবার ফিরাও মোরে' নামক বিখ্যাত কবিতাটি উক্ত বাস্তবমানবপ্রীতি এবং দুঃখদুর্যোগের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ পরিণামের পথে কবির অগ্রসরণের অভিলাষ প্রকাশ করছে। বাস্তববিমুখ 'রঙ্গময়ী কল্পনা'র জগৎ থেকে কবি বুঝি ধীরে ধীরে সরে আসছেন। নবজাগ্রত মনুষ্যত্বের চেতনা কবিকে স্বপ্নাতুর অবস্থায় আর থাকতে দিচ্ছে না; বড়ো মানবজীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় সাধনের পালা আসন্ন, নিরুদ্দেশ যাত্রা' সমাপ্তির দিকে। সমালোচ্য কাব্যে কবির 'জীবনদেবতা'-বিষয়ক কয়েকটি কবিতা আছে।

'সোনার তরী'-কে যদি বলি স্বপ্নলোকে বিহরণের কাব্য, তবে 'চিত্রা'-কে বলব স্বপ্নলোক থেকে ক্রমশ অপসরণের কাব্য—এরকম স্বপ্নভঙ্গ কবিজীবনে কয়েকবার ঘটেছে। এর পর সুদূরাভিসারী কল্পনায় পাখা গুটিয়ে কবি মর্তমৃত্তিকা স্পর্শ করলেন। এই ভূমিটির নাম 'চৈতালি'।

চৈতালী-তে কবির দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্ব ও কাব্যধারার দিকপরিবর্তনের পরিচয় আভাসিত। এখন সুদূরব্যাকুলতা নয়, ধূলিধূসর প্রত্যক্ষ চলমান বস্তুবসংসার কবি-রবীন্দ্রের কাব্যভাবনার বিষয়বস্তু হয়েছে: মুক্তপ্রকৃতির সঙ্গে কবি সহজ সরল হৃদয়ের সম্পর্ক পাতিয়েছেন, ক্ষুদ্রতুচ্ছ, সামান্য-সাধারণকে এখন তাঁর কাছে আর উপেক্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে না। কী সুন্দর এই মাটির পৃথিবী, কী সুন্দর এই মনুষ্য-জীবন? সবকিছু আশ্চর্য, সবকিছুই দুর্লভ। এই হল সত্যকার মর্তপ্রীতি। চৈতালি-তে কালিদাস ও তাঁর তপোবনপ্রীতি রবীন্দ্রনাথেও সংক্রামিত হয়েছে। কবি এখন থেকে ধীরে ধীরে সংস্কৃতসাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশ করছেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি সুগভীর অনুরাগ কবিকে ধীরে ধীরে প্রাচীন ভারতকে অবলম্বন করে অভিনব জাতীয়তার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়েছে।° ফলে 'কথা' ও 'কাহিনী'-র চিত্ররূপময় অপূর্ব কবিতাগুলি আমরা পেয়েছি।

'চৈতালি' কাব্যে কালিদাসপ্রীতি ও তপোবনপ্রীতির মধ্যে কবির যে-প্রাচীনানুরাগের সূচনা দেখা গিয়াছে, 'কথা'-'কাহিনী'-'কল্পনা'য় তা স্পষ্টতর হয়েছে, 'নৈবেদ্য' কাব্যে পূর্ণবিকাশ লাভ করেছে। এসব কাব্যে মানবমহিমা, মনুষ্যত্বের সমুচ্চ আদর্শ, মহাজীবনের গান একের পর এক উচ্চকণ্ঠে উদ্গীত হয়েছে। যে-জীবন শৌর্যেবীর্যে দীপ্ত, কঠিন ত্যাগে সমুজ্জ্বল, আত্মার শক্তিতে বিভাসিত, স্বার্থকলুষের ঊর্ধ্বচারী, সেই মহত্তর জীবনের আদর্শ ও বাণী কবিকণ্ঠে এখন ধ্বনিত হচ্ছে।

সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি-কল্পনাকে নিয়ে রবীন্দ্র কবিজীবনের দ্বিতীয় পর্বের শেষ।

ক্ষণিকা-নৈবেদ্য-উৎসর্গ-শিশু-স্মরণ তৃতীয় পর্বের অন্তর্গত। সংস্কৃত কাব্য ও কবিতায় একান্ত আনন্দলিপ্সু মনোভাবের যে প্রকাশ, সেই মনোভাব নিয়ে 'ক্ষণিকা'র ক্ষণিক মুহূর্তের অবারিত আনন্দের কবিতাগুলি রচিত। নৈবেদ্য কাব্যে কবির জাতীয়তাবোধ বা অতীতের প্রতি আগ্রহ কবিকে উপনিষদে প্রকাশিত ভারতের মহিমা এবং আদর্শভাবুকতাময় ভগবৎ প্রেরণার দিকে নিয়ে গেছে। 'নৈবেদ্য'-এর পর প্রকৃতিরসভাবুকতার মধ্য দিয়ে কবি অরূপানুভূতির এক রহস্যময় লোকে প্রবেশ করলেন। উৎসর্গ কাব্যে দেখা যায়, বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন আনন্দময় শুদ্ধ রসোপলব্ধির প্রতি কবির আগ্রহ। স্মরণ ও শিশু এই সময়কার রচনা। শিশুর মধ্যে কবি অসীমের রহস্য দেখতে পান। তাঁর দেহমনে বিশ্বের মাধুর্যসৌন্দর্য অনুক্ষণ তরঙ্গিত হয়। শিশুচিত্তের কল্পনাপ্রবণতার ও বিচিত্র জিজ্ঞাসার মনোজ্ঞ চিত্র এঁকেছেন কবি। কবির পত্নীবিয়োগে 'স্মরণ' রচিত। এই কাব্যে স্ত্রীর মৃত্যু কবিকে মৃত্যুর রহস্যচিন্তায় নিয়োজিত করেছে।

খেয়া গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি-বলাকা-পলাতকা-শিশু ভোলানাথ চতুর্থ পর্বের কাব্য। খেয়াতে স্পষ্টত রবীন্দ্রনাথ বাউলধর্মী মনোভাব নিয়ে জীবনের অন্তর্লোকে প্রবেশ করেছেন, বস্তুজগতের প্রয়োজন-সম্পর্ক-ত্যাগের দ্বারা অরূপ-উপলব্ধির [লীলারসময় ঈশ্বরের অনুভূতির] তত্ত্ব বিবৃত করেছেন এবং নিসর্গরসভাবুকতা থেকে অরূপভাবুকতায় প্রয়াণ করতে চেয়েছেন।

অরূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা আমাদের প্রাচীন ঈশ্বরবিষয়ক ধারণা থেকে স্বতন্ত্র। তিনি প্রকৃতি ও জীবনের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত লীলাময় বিশুদ্ধ কাব্যরসলোকে আস্বাদ্য একটি সত্তাবিশেষ, অতএব শাস্ত্রের বস্তু নয়, কাব্যোপলব্ধির বস্তু। রবীন্দ্রনাথের অরূপ-উপলব্ধির বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি যেমন প্রাকৃতিক কমনীয়তার মধ্যে অরূপের সাক্ষাৎ লাভ করেন, তেমনি, প্রাকৃতিক ভয়ংকর রূপের মধ্যেও। বরংচ দুঃখদুর্যোগের মধ্যে এই অরূপ তাঁর নিকট অধিকতর সত্যভাবে ধরা দিয়েছে। প্রকৃতির ভয়ংকর রূপের মধ্যে যাঁর প্রকাশ দেখলেন তাঁকে ক্রমশ মানুষের সর্ববিধ দুঃখবরণের প্রেরণারূপে লক্ষ্য করলেন। এরই ফলে একালে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি-র সর্বনাশকে নির্ভয়ে বরণ করা, মৃত্যুকে-[redacted] করা এবং অজানার পথে ছুটে চলার বাণী প্রকাশিত হল।

'গীতাঞ্জলি'-বলাকা-য় [ও 'ফাল্গুনী' নাট্যে] রবীন্দ্রনাথ কুসংস্কার-মুক্তি এবং জীবনের অবিরাম চলার কথা প্রকাশ করলেন। 'গীতালি'তে 'যাত্রী'-কবির দুঃখবরণের উৎসাহ সম্যক প্রকাশ পেয়েছে, এবং 'বলাকা'য় [ও 'ফাল্গুনী'তে] মৃত্যুর দ্বারা নবায়মান, জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে সর্বদা অগ্রসরণশীল জীবনকেই কবি যথার্থ জীবন বলে মনে করেছেন। নিজের অনুভূতিতে গতির সুর উপলব্ধি করে কবি বিশ্বের সৃষ্টির মধ্যে এই গতির স্পন্দন লক্ষ্য করলেন, এবং পরিবর্তন ও ধ্বংসকে সত্যরূপে গ্রহণ করলেন।

'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের অতিশয় বিশিষ্ট একখানি কাব্য। এর মাধ্যমে কবি

আমাদের মুক্ত প্রাণের গান শুনিয়েছেন, এই মরা জাতির চিত্তদেশে উচ্ছল যৌবনশক্তি সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। জড়ত্ব-জীর্ণতা আর মোহের জটিল জালে আমরা আবদ্ধ, 'বলাকা'-গীতি ওই বন্ধনজাল ছিন্ন করে আঘাতসংঘাতের মধ্য দিয়ে মানবাত্মার চরম সার্থকতার পথে এগিয়ে চলার প্রেরণা জোগায়। 'বলাকা'-র কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের ললাটে 'যৌবনের রাজটিকা' পরিয়ে দিয়েছেন, জীবনবোধের এক পরমাশ্চর্য বিশালতায় সকলকে তুলে ধরেছেন। ভাবের গভীরতায়, আবেগের তীব্রতায়, ভাষার দীপ্তিতে, ছন্দের অভিনবত্বে 'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথমার্ধের শ্রেষ্ঠ কাব্য, নির্দ্বিধায় একথা বলা যায়।

'বলাকা'-র পর কবি দুখানি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন—পলাতকা ও শিশু ভোলানাথ। এ দুটি কাব্যে অল্পবিস্তর 'বলাকা'-র ভাবচিন্তার প্রভাব দেখা যায়। 'পলাতকা'য় বাস্তবের মধ্যেও বাস্তবাতীত এক রহস্যময় সত্তার পদসঞ্চার শুনতে পাই আমরা, 'শিশু ভোলানাথ'-এ অনাসক্ত জীবনের প্রাণোচ্ছল চঞ্চলতা।

পরবর্তী পর্যায়ের কাব্যগুচ্ছ হল পূরবী-মহুয়া-বনবাণী-পরিশেষ। পূরবী-তে রবীন্দ্রের কণ্ঠে বেজে উঠল বেলাশেষের গান। অস্তাচলের ধারে এসে রবিকবি পূর্বাচলের দিকে তাকালেন, অতীতের 'সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি'কে গোধূলিক্ষণের আলোকে বিস্মৃতির তামসলোক থেকে উদ্ধার করতে চাইলেন। 'পূরবী' কাব্যে কবির দৃষ্টি দুদিকে প্রসারিত—পশ্চাতে ও সম্মুখে। পশ্চাতে হারানো কৈশোর-যৌবনের মধুময় সহস্র স্মৃতি, প্রকৃতি-উপভোগের অমেয় আনন্দ; সম্মুখে বৈতরিণীকূলের ওপারের ঘনায়মান অন্ধকার, মরণের দূরশ্রুত অস্পষ্ট পদধ্বনি। ফিরে পাওয়ার আনন্দ ও ছেড়ে-যাওয়ার বেদনা, এই মিশ্র অনুভূতির জন্যে কবিকণ্ঠনিঃসৃত পূরবী রাগিণীও সর্বমিশ্র হয়ে পড়েছে। বর্তমান কাব্যে কবিচিত্তের আসক্তি ও বৈরাগ্য রৌদ্রছায়ার লুকোচুরিখেলার সৃষ্টি করেছে। মানবজীবন, মানবহৃদয়, প্রকৃতির উদার সৌন্দর্যসুষমা এখন তাঁর কবিতার বড়ো উপজীব্য। 'ধরণীর কোণে' 'একটুকু বাসা' আর 'কিছু ভালোবাসা' পেলেই কবি 'দুদিনের কাঁদা আর হাসা'কে নিয়ে শান্তি ও তৃপ্তিতে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারেন। স্বর্গের অমৃত নয়, এই মাটির পৃথিবীর প্রীতিরসই এখন কবি-রবীন্দ্রের অভিলষিত।

পরিণত বার্ধক্যে অপূর্ব প্রণয়গাথা মহুয়া লিখে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অবাক করে দিলেন। কবি-বুঝি দ্বিতীয়বার যৌবনের রাজ্যে জেগে উঠলেন—এ যেন অকালবসন্তের আবির্ভাব। 'মহুয়া'র কবিতাগুলি থেকে বার্ধক্যবিজয়ী যৌবনের 'হঠাৎ-আলোর ঝলকানি' বিচ্ছুরিত হচ্ছে, আর তাতে 'ঝল্‌মল্' করে উঠছে আমাদের চিত্ত। বাঙ্‌লাসাহিত্যে এমন বীর্যদীপ্ত প্রেমের সংগীত ইতঃপূর্বে কদাপি আমরা শুনিনি। 'মহুয়া'-পর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে জৈববৃত্তিরূপে নয়, মৃত্যুঞ্জয় একটি প্রকাণ্ড শক্তিরূপে দেখেছেন—নারীকে আত্মার সঙ্গিনী বলে জেনেছেন। এ প্রেম প্রণয়ীযুগলের কাছে বন্ধন নয়, এ প্রণয় আত্মাকে মুক্তির পথে এগিয়ে দেয়, বৃহত্তর

সংসারের সঙ্গে যুক্ত করে চিত্তদেশ বিপুল বিশ্বাসে ভরে তোলে। এর শক্তিপ্রভাবে নরনারী বিচ্ছেদ, এমন কি, মৃত্যুকে পর্যন্ত হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারে।

রবীন্দ্রের প্রকৃতিরসভাবুকতার এক অভিনব প্রকাশ দেখতে পাই বনবাণী-তে। নিসর্গের মর্মলোকে কবির অবারিত প্রবেশাধিকার, অন্তঃকর্ণে তিনি অরণ্যের আদিমতম বাণীটি শুনতে পান, বনদেশের তরুলতার সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করেন। 'ধরায় প্রাণের লেখা চিরতরঙ্গিত'—একদা কবি বলেছিলেন, 'বনবাণী,-তে এই প্রাণশক্তিরই বিচিত্র তরঙ্গদোলার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

পরিশেষ কাব্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী বলাকা, পূরবী, বনবাণী ইত্যাদি বইগুলির ভাবধারায় অনুবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। দুঃখ-দুর্যোগ মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যে-মানুষ নিজ আত্মার প্রকাশকে উজ্জ্বল করে তুলছে, 'পরিশেষ' এ কবি সেই মানুষের জীবনরহস্যের কথা আমাদের শুনিয়েছেন, কবি আপনার আত্মদর্শনের কথা বলেছেন, আত্মস্বরূপ বিশ্লেষ করেছেন।

'পুনশ্চ' থেকে আরম্ভ করে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত বইগুলিকে রবীন্দ্রজীবনের শেষ পর্যায়ের কাব্য বলা যেতে পারে।

জগৎ ও জীবনের প্রতি কবির অনিঃশেষ অনুরাগ, বাস্তবের মধ্যে অ-পূর্বপরিচিত বিচিত্র রসের সন্ধানতৎপরতা, সম্মুখে প্রসারিত 'চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি'-কে দুচোখ মেলে অতৃপ্ত পিপাসায় চেয়ে-দেখে, সাধারণ সামান্য মানুষকে অমেয় প্রীতির আলিঙ্গন জানানো, কীট-পতঙ্গ-আদি মানবেতর প্রাণীলোকের বিষয়ে অশেষ কৌতূহলপরায়ণতা, বাস্তববিচিত্রতায় এক অজ্ঞেয় ব্যঞ্জনার অনুভব, প্রত্যক্ষকে ছাড়িয়ে একটা দুজ্ঞেয় অলক্ষ্যের বোধ, মৃত্যুর কূলে দাঁড়িয়ে 'দূর হতে দূরে—অনাহত সুরে সোনার ঘণ্টার ঢং ঢং' ধ্বনি শুনতে পাওয়া 'পরীর দেশের বন্ধ দুয়ারে হানা' দেবার তীব্র একটা অভিলাষ ইত্যাদি নানান্ কিছু রবীন্দ্রের শেষ পর্যায়ের কাব্যে ঘুরে ফিরে উঁকি দিয়ে গেছে। কবির প্রতিভার দীপ্তি এখনো উজ্জ্বল—কবি নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যের সন্ধানী। ভাববস্তু ও আঙ্গিকের অভিনবত্ব এই অন্তিম পর্বভুক্ত কতকগুলি রচনার মধ্যে অতিশয় প্রেক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। একালে রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা সৃষ্টি করলেন, প্রচলিত ছন্দোরীতিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, কাব্যে গদ্যের স্বভাবোক্তির আশ্রয় নিলেন। এককালে পদ্যের সমুদ্রসৃষ্টি করেছিলেন যে-কবি, সেই কবিই এখন নির্মাণ করলেন গদ্যবাণীর মহাদেশ।

বিষয়বস্তুর কৌলীন্য গদ্যকবিতার লেখক রবীন্দ্রনাথ একরূপ ভুলে গেছেন, পোশিল বক্তব্যের দিকে ঝোঁক হ্রাস পেয়েছে। আগে যে-সব বস্তুকে কবি অস্পৃশ্য বলে জেনেছেন, এখন তারাই তাঁর কাব্যে এসে ভিড় জমিয়েছে, যেমন—ভবঘুরে কুকুর, ছেঁড়া কাঁথা, মাসিক-তিনটাকা-মাইনের পণ্ডিত, কোলাব্যাঙ, গোবরে পোকা, ইত্যাদি ইত্যাদি। পুনশ্চ, শেষসপ্তক, পত্রপুট, শ্যামলী এই চারিখানি কাব্যে রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দ ব্যবহার করেছেন। অন্তিম পর্বের প্রথমের দিকে কবি

গদ্যকে যে তাঁর কাব্যসরস্বতীর বাহন করলেন তার কারণ হল সর্বপ্রকার পদ্যছন্দকে তিনি একালের নতুন চেতনা, নতুন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি প্রকাশের অনুপযোগী বলেই মনে করেলেন।

সমালোচ্য পর্বের মধ্যে পড়ে প্রধানত এই কাব্যগ্রন্থগুলি : পুনশ্চ, শেষসপ্তক, পত্রপুট, শ্যামলী, প্রান্তিক, সেঁজুতি, আকাশপ্রদীপ, নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে এবং কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'শেষ লেখা'। এদের সম্পর্কে সামান্য দুচার কথা বলছি।

গদ্যছন্দের প্রথম কাব্য পুনশ্চ নামটি থেকে বুঝতে পারা যায়, পূর্ববর্তী কাব্যকবিতায় যে-কথা অনুচ্চারিত হয়ে গেছে এতে তা পরিব্যক্ত করবেন কবি। 'সর্বব্যাপী সামান্যের স্পর্শ' পাওয়ার জন্য তাঁর চিত্ত এখন ব্যাকুল, আশেপাশের দৈনন্দিক জীবনযাত্রার ছবিগুলো ফোটাতেই কবির আনন্দ। এ বইতে আমাদের অতিপরিচিত মানুষ ও বস্তুর চেহারাগুলির অনাড়ম্বর মিছিল চোখে পড়ে। 'পরিশেষ' থেকেই রবীন্দ্রকাব্যে প্রসঙ্গের পরিবর্তন শুরু হয়, এ ঝোঁক আরো স্পষ্ট হল 'পুনশ্চ'-তে। এতে রবীন্দ্রনাথ মানুষকে পূর্ণ কাব্যমূল্য দিয়েছেন। তিনি বারংবার আমাদের জানিয়েছেন—'আমি তোমাদেরি লোক'. সাধারণ মানুষের কবি বলে তাঁর নাম 'খ্যাত হোক' এ-ই বর্তমানে কবির মনোগত বাসনা। বাস্তবনির্ভর রসের প্রাধান্য এবং উদার মানবীয়তা 'পুনশ্চ' কাব্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

শেষসপ্তক রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার কাব্যায়ন। মহাবিশ্বজীবনের প্রেক্ষাপটে নিজেকে তুলে ধরে কবির আত্মসন্ধান ও আত্মদর্শনই 'শেষসপ্তক'-এর মূলসুর। কবি এখন মানবসত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্যে উৎসুক, আত্মার সত্যমূল্য-নির্ধারণের প্রয়াসী। কবিচিত্ত একালে আসক্তিশূন্য, বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষুদ্রতুচ্ছ দৃশ্যপটের দিকে তাকিয়ে কবি অনুভব করছেন অগাধ বিস্ময়, অনিঃশেষ আনন্দ। মৃত্যুর শূন্যময়তা কবি স্বীকার করেন না, মানবের আত্মাকে তিনি মৃত্যুঞ্জিৎ বলেই জেনেছেন—মৃত্যুর তোরণের মধ্য দিয়ে নবতর জীবনের পথে সে চিরঅগ্রসরমাণ।

তারপর বিখ্যাত পত্রপুট। অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ, প্রবল মানবানুরাগ ও মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, দুঃখরত মানুষের সংগ্রামবিক্ষুব্ধ ও জীবনের অংশীদার হতে না-পারার জন্যে অন্তরে গ্লানিবোধ ও আন্তরিক আক্ষেপোক্তি, পশ্চিমের পররাজ্যলোভী হিংস্র সভ্যতার প্রতি ধিক্কারবাণী-উচ্চারণ, মর্ত্যসংসার থেকে বিদায়ের প্রাক্‌কালে 'উদাসীন পৃথিবী'কে প্রণামনিবেদন, পরিচিত বস্তু-আশ্রয়ে অজ্ঞানের অনুসন্ধান ইত্যাদি 'পত্রপুট' কাব্যখানিতে প্রকাশ পেয়েছে।

শ্যামলী-তে পূর্বকথিত দুটি কাব্যের তত্ত্বভাবুকতার স্পর্শ তেমন নেই। এখানে কবি অপেক্ষাকৃত সহজের মধ্যে সঞ্চরণ করেছেন, মানুষ ও প্রকৃতি ক্ষণে ক্ষণে তাঁর চোখে বিস্ময়ের চমক লাগিয়ে যাচ্ছে ; অপ্রত্যাশিত আবেগে কবির মন ক্ষণে ক্ষণে আন্দোলিত হচ্ছে। গদ্যছন্দের পালা এখানে শেষ হল।

প্রান্তিক থেকে সুরু করে পরবর্তী কাব্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত পদ্যছন্দই প্রয়োগ করেছেন—কোথাও মিলযুক্ত, কোথাও মিলহীন। কবি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। রোগমুক্তির পরেই 'প্রান্তিক'-এর কবিতাগুলি লেখা। মৃত্যুর বাস্তব স্পর্শ কবিকে এক অলৌকিক চেতনার অধিকারী করেছে, তাঁর চিত্তে পার্থিব যাবতীয় বাসনার মালিন্য থেকে মুক্তির আগ্রহ তীব্রতর হয়ে উঠেছে। আত্মিক জ্যোতির রহস্য-উন্মোচনের জন্যে তিনি ব্যাকুল। চিত্ত পরমবৈরাগ্যে অধিষ্ঠিত হলেও জীবনের প্রতি তাঁর অনুরাগ একটুকু কমেনি। মানবতাকে লাঞ্ছিত দেখে 'মহাকাল-সিংহাসনে-সমাসীন বিচারক'-এর নিকট এই বলে প্রার্থনা জানিয়েছেন: 'শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে, কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী কুৎসিত বীভৎসা-'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন'; পীড়নমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, বিদায় নেওয়ার আগে কবি উচ্চকণ্ঠে তাদের ডাক দিয়েছেন—'দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।' নির্যাতিত মনুষ্যত্ব তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলেছে।

সেঁজুতি কাব্যে রবীন্দ্রনাথ মহাপ্রস্থানের পথের পথিক। এই পথিকের মন বলে—'নহে দূর, নহে দূর'। একদিকে চৈতন্যসীমা পেরিয়ে এক দুর্নিরীক্ষ্য সত্তার বোধ, অনির্বাচ্য অস্তিত্বের অলৌকিক উপলব্ধি, বিচিত্রিত যবনিকার অন্তরালে চরম সত্যের রহস্যময় সংকেত এবং যাত্রার ব্যাকুলতা; অন্যদিকে, চিরসুন্দর রূপময় বিশ্বধারা, অনিঃশেষ জীবনানুরাগ—এককথায়, অমর্তচেতনা ও মর্তচেতনার দ্বন্দ্ব; বিশাল বৈরাগ্য আর আসক্তিবিজড়িত পৃথিবীপ্রীতির ভিন্নমুখী টানাপোড়েনে 'সেঁজুতি'র কাব্যকায় নির্মিত। কবিগুরুর 'সেঁজুতি'—মরণের-ফ্রেমে-বাঁধানো মর্তমমতাস্নিগ্ধ জীবনের একখানি অপূর্ব আলেখ্য।

আকাশপ্রদীপ-কে মধুর স্মররণের কাব্য বলা যেতে পারে। দূর-অতীতে হারিয়ে যাওয়া তারুণ্যের দিনগুলিকে কবি স্মরণ করছেন, বর্তমানের সঞ্চয় যতই কমে আসছে ততই কৈশোরে আর প্রথমযৌবনের স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে কবি কাব্য-বস্তু কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। চোখ বুজে অতীতের ধ্যান করতে কবির ভালো লাগে। 'আকাশপ্রদীপ'-এ কবিমানস মুখ্যত রোম্যান্টিক।

নবজাতক কাব্যে নতুন এক উপলব্ধির জগতে কবির পুনর্জন্ম হল যেন। কবি পৃথিবীতে 'শান্তম্ শিবম্'-কে যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি, অশান্তি, কুশ্রীতা জীবনযাত্রার দুঃখগ্লানির বিষয়েও সচেতন হয়েছেন। তাই যান্ত্রিক সভ্যতার নিষ্ঠুরতাকে তিনি ধিক্কার হানেন, দুঃখের পথে ধাবমান মানুষকে সর্বশক্তি নিয়োগে অমানবীয়তার সমাধিশয্যারচনার প্রেরণা যোগান; এবং নিজের 'সুকুমারী লেখনী', মানবজীবনের আঘাতসংঘাতের দিকটিকে পৌরুষদীপ্ত বাণীতে ফোটায়নি বলে কবির লজ্জাবোধজনিত আক্ষেপও কম নয়।

সানাই এ রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রকৃতি মুখ্যত রোম্যান্টিক। পুরানো দিনের

স্মৃতিরোমন্থন, সুদূরের পিপাসা, প্রকৃতিরস-আস্বাদন, ইত্যাদি 'সানাই'-এর বিশিষ্টতা। এখানে বিচিত্র বস্তুর চিত্রশালা দেখতে পাওয়া যায়, অতিক্ষুদ্র খুঁটিনাটিও কবির সচেতন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নি। কাঁঠালের ভূতিপচা, আমানি, মাছের আঁশ, মরা বিড়ালের দেহ—সংসারের এই সংগতি ও অসংগতির মধ্যে—'সানাই লাগায় তার সারঙের তান'। উপস্থিত কাব্যে স্বপ্ন ও বাস্তব পাশাপাশি নির্বিরোধ স্থান পেয়েছে।

রোগশয্যায় ও আরোগ্য—নামে স্বতন্ত্র দুখানি গ্রন্থ হলেও এ দুটি আসলে একটি বইয়ের দুটি খণ্ড, এদের একসঙ্গে পাঠ করতে হবে। ১৯৩৮ সালের অসুখের পর কবি লিখেছিলেন 'প্রান্তিক', ১৯৪০-এ কবি যখন গুরুতররূপে অসুস্থ তখন, এবং রোগ থেকে সেরে উঠে, সমালোচ্য গ্রন্থদুটিতে সন্নিবেশিত কবিতাগুলি রচনা করেন।

কবির দুর্দম প্রাণশক্তির কাছে রোগযন্ত্রণা পরাভূত হয়েছে, রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে তিনি একের পর এক কবিতা লিখে গেছেন। ব্যাধি কবির দেহে মালিন্য সঞ্চার করেছে, কিন্তু কবিতাগুলিতে এতটুকু মলিনতা কিংবা বিষণ্ণতার স্পর্শ নেই। প্রকৃতিলোকের মতো নিত্যনির্মল প্রসন্নতা রবীন্দ্রের অন্তরলোকেও। তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠেছে আনন্দের গান, পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হচ্ছে: 'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।' বই-দুখানির পাতায় পাতায় পৃথিবীপ্রীতি, মানবপ্রীতির বাণী ঘোষিত হয়েছে। খ্যাতির বিষয়ে কবি একেবারে মোহমুক্ত, লোকমতের বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন। কারণ—'নির্মম ভবিষ্য জানি অতর্কিতে দস্যুবৃত্তি করে কীর্তির সঞ্চয়ে', সুতরাং 'আজি তার হয় হোক প্রথম সূচনা'। জীবনের গোধূলিধূসর ক্ষণে কবি যেন নতুন দৃষ্টি লাভ করলেন; নতুন চোখে জগতের যা-কিছু দেখছেন—অতিতুচ্ছ, অতিক্ষুদ্র বস্তু—সমস্তকিছুকেই প্রেম ও প্রেমের আলিঙ্গনে বাঁধছেন। তাঁর প্রেম বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। পূর্বেকার কাব্যে কবির ব্যক্তিগত কথা এত সহজভাবে কোথাও পরিব্যক্ত হয়নি।

'আরোগ্য'-এর 'ওরা কাজ করে' কবিতাটি মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রের উল্লেখ্য একটি রচনা—সাধারণ মানবগোষ্ঠীকে, বিপুল জনতাকে, তিনি সমুচ্চ মর্যাদা ও মহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এতে প্রমাণিত হল রবীন্দ্রনাথ রঙিন স্বপ্ন-কল্পনার গজদন্তমিনারের বাসিন্দা নন—তিনি সমাজসচেতন, সময়সচেতন—কালের রথের গতি কোন্‌দিকে তা তাঁর অজানা ছিল না। আমরা জানি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ঘৃণা, যুদ্ধবাজদের উলঙ্গ উন্মত্ততার উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ, তাঁর কবিতায় অগ্নিবর্ষী হয়ে উঠেছে।

পরবর্তী জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে প্রকাশিত সর্বশেষ গ্রন্থ। এই কাব্যটি জন্মমৃত্যুর মিলনমোহনায় দাঁড়িয়ে লেখা। মৃত্যুর তরী যেন প্রস্তুত, জোয়ার এলেই কবি তরীতে উঠে পড়বেন। বইটিতে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে, কিন্তু কালো নয়—রঙিন ছায়া। আমরা শুধু জীবনকে উপভোগ করি, কবি জীবন এবং মৃত্যু

উভয়কে উপভোগ করেছেন। তা না হলে আসন্ন মৃত্যুর ঘনায়মান ছায়ায় অবস্থান করে কবি এরূপ নির্মল আনন্দ ও শান্তির বার্তা আমাদের শোনাতে পারতেন না—'আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ্‌' কিংবা, 'বিরাট আকাশে বনে বনে ধরণীর ঘাসে ঘাসে/সুগভীর অবকাশ পূর্ণ হয়ে আছে/গাছে গাছে/অন্তহীন শান্তি-উৎসস্রোতে'।

এ বইতে একদিকে প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতির প্রতি কবির গভীর ভালোবাসা, অন্যদিকে, মানবমহিমায় তাঁর অবিচল আস্থা। তিনি যেন দিব্যচক্ষে দেখছেন : 'দিন বদলের পালা এল ঝোড়ো যুগের মাঝে'। পৃথিবীতে অনেক পাপ জমেছে, চুকিয়ে দিতে হবে তার দাম, প্রলয় আসন্ন; প্রলয়ের পরে নবজন্ম, নতুন সৃষ্টি; তার বন্দনাগান গেয়ে কবি বললেন—'আজ সেই সৃষ্টির আহ্বান ঘোষিছে কামান'। বহুশ্রুত 'ঐকতান' এই 'জন্মদিনে' কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতা। রবীন্দ্রকাব্যে উৎকৃষ্ট রচনাগুলির মধ্যে এর স্থান খুব উঁচুতে। দুঃখের বিলাসিতা আর 'শৌখিন মজদুরি' নিয়ে যেসব কবির বেসাতি, শুধু 'ভঙ্গি দিয়ে' যারা 'চোখ ভোলায়,' 'সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি' 'চুরি' করে, রবীন্দ্রের 'ঐকতান' তাদের লজ্জা দেবে। জনগণের প্রাণের কথা কবি বলতে পারেননি, এ অবশ্যই নিন্দার কথা। তাঁর আশা ও বিশ্বাস, এদেশে একদিন 'অখ্যাতজনের নির্বাক মনের' কাব্যকারের অভ্যুদয় হবে, বিদায়লগ্নে সেই ভাবীকালের কবিকে রবীন্দ্র-কবি 'বারংবার নমস্কার' জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর আত্মপ্রকাশ করল শেষলেখা। এতে মানবসত্তার দুরবগাহতার কথা আছে, মৃত্যুর কথা আছে, জীবন-উপলব্ধির কথা আছে, মহামানবের জয়ধ্বনি আছে, আর আছে 'মর্তের অন্তিম প্রীতিরসে' হৃৎপাত্র পূর্ণ করে, 'মানুষের শেষ আশীর্বাদ' নিয়ে, এ পৃথিবী ছেড়ে, প্রসন্ন চিত্তে লোকান্তরে প্রয়াণের কথা। 'শেষলেখা' এক আশ্চর্য কবিতার বই। এর জগৎটি আলোক-আঁধারে, ঘুমে-জাগরণে গড়া, অর্থ, ছুঁতে গেলে মায়াময় ছায়ার মতো পালায়। ছোট ছোট কবিতা, বাক্য সংহত, শুনতে অনেকটা বৈদিক ঋষির মন্ত্রের মতো :

রূপনারাণের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম, এ-জগৎ
স্বপ্ন নয়।

অথবা :

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি,
মেলেনি উত্তর।

বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি,
পেল না উত্তর ॥

এরূপ রচনাকে কোন্ নামে চিহ্নিত করা যায়? এরা প্রচলিত কবিতার সদৃশ কী? কোনো সজ্জা নেই, কলাকৌশল নেই, মিলবিন্যাস নেই, ছন্দের ঝংকার নেই, এতকালের পরিচিত কাব্যের সমস্ত রীতি এখানে উপেক্ষিত। অথচ এগুলি আমাদের সত্তার গভীরে গম্ভীর ওঙ্কারধ্বনির মতো বাজতে থাকে। এদের কবিতা না বলে রবীন্দ্র-কবির 'বাণী' বলাই বোধ করি সংগত। এরূপ কবিতা কেউ কোনোদিন লেখেন নি, আর রবীন্দ্রের মতো মহাকবি না জন্মালে ভাবীকালেও কেউ যে লিখতে পারবেন এ কল্পনাতীত।

রবীন্দ্রকাব্যপরিচায়িকার এখানে ইতি টানা হল।

নাটক :

রবীন্দ্রনাথের অপরূপ কাব্যৈশ্বর্যের তুলনায়, অন্তত বিস্তারের দিক থেকে তাঁর নাট্যরচনাবলী খুব নিম্নে স্থান পাবে। কৈশোর থেকেই আখ্যানমূলক গীতিকাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে কবি গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এই শ্রেণীর রচনা স্বরূপত নাট্য নয়—নাট্যাকারে কাব্য অর্থাৎ আখ্যান এবং চরিত্র থাকলেও অথবা কোথাও চরিত্রের অন্তরে ও বাইরে অল্পবিস্তর সংঘাত দেখা গেলেও তা অতিদ্রুত চিত্তের ভাববিপ্লবের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে, এবং দীর্ঘ সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলি আগুন্ত আত্মভাবুকতার প্রশ্রয় দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এইরূপ উচ্ছ্বাসপূর্ণ নাট্যরচনা রুদ্রচণ্ড তাঁর কুড়ি বৎসর বয়সে লেখা। এতে ঘটনার বাহুল্য নেই, চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের ও ঘটনার সংঘাত ভাবময়, আর, এই নাট্যকাব্যটি মেলোড্রামায় সমাপ্ত। একটি অসংযত ভাবের লীলা 'রুদ্রচণ্ড' নাটকটিকে ঘিরে রয়েছে। এর পর কালমৃগয়া নামে একখানি গীতিময় নাটিকা রচিত হয়। চরিত্রগুলি নানা নতুন সুরের গীতের মধ্য দিয়ে এতে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করেছে। এই শ্রেণীর আরেকটি রচনা মায়ার খেলা। এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির প্রতিশোধ নামে একটি নাট্যকাব্য লেখেন। নাট্যের দিক থেকে নয়, ভাবের দিক থেকে, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এ নাটিকাখানিতেই প্রথম রবীন্দ্রের একটি অতিপ্রিয় ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে; ভাবনাটি হল—বিশ্বের স্নেহসম্পর্ক ত্যাগ করে সন্ন্যাস-অবলম্বনে মুক্তি মেলে না, কেউ এরূপ করলে মানবপ্রকৃতি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এ রচনাটি পুরাপুরি কাব্য—দৃশ্যে

বিভক্ত হলেও, আত্মভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ একক চরিত্রের আরম্ভ ও পরিণাম-প্রদর্শক কাব্য।

এইভাবে কৈশোরে লেখা নাটকাকৃতি রচনা-দুটি ['রুদ্রচণ্ড' ও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'] কাব্য হলেও, পরবর্তীকালের লেখা বিসর্জন' এবং 'রাজা ও রাণী'-কে কাব্য বলে উপেক্ষা করা চলে না। একথা স্বীকার্য-যে, রবীন্দ্রনাট্যকৃতিমাত্রেই অল্পবিস্তর ভাবধর্মী। কিন্তু তাই বলে তিনি নাট্যরচনার ঐকান্তিক প্রয়াস করেননি অথবা তাঁর নাট্যরচনায় নাটকীয়তা নেই, এরূপ মনে করা ঠিক নয়। 'রাজা ও রাণী', বিসর্জন', 'গোড়ায় গলদ', 'চিরকুমার সভা', 'প্রায়শ্চিত্ত' এবং বিশেষভাবে তপতী'র মধ্যে যথার্থ নাটকনির্মাণে কবি উৎসাহিত হয়েছিলেন, এরই প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলিতে প্রচলিত সাধারণ নাটকের মূল নীতিগুলির সুস্পষ্টঅনুসরণ করা হয়েছে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ও সমাজের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, এক প্রবৃত্তির সঙ্গে ভিন্ন প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব—যা সাধারণ উত্তম নাট্যের মূলীভূত বিষয়—তা এইসব রচনার মধ্যে পরিস্ফুট। এছাড়া, ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বেরও অভাব নেই। কাহিনী ও প্লটের নাটকীয় গ্রন্থন, নাটকের সক্রিয় গতিশীলতায় বহু চরিত্রের ও ঘটনার সংযোগ, সার্থক অঙ্ক ও দৃশ্য-যোজনা এবং প্রারম্ভ থেকে পরিণাম পর্যন্ত পঞ্চসন্ধিসমন্বিত সুপরিকল্পিতনাট্যধর্মের প্রয়োগের চেষ্টা এসব রচনায় সকলেই লক্ষ্য করবেন।

প্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগ, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত নাট্যরীতির বহুল পরিবর্তন ঘটেছে। পঞ্চাঙ্ক নাটক থেকে একাঙ্কিকায়, বাস্তবধর্ম থেকে ভাবধর্মে রূপান্তর, দৃশ্যপটাদী আনুষঙ্গিক উপকরণের প্রয়োজনবোধে রূপান্তর ইত্যাদি নাট্যসৃষ্টিকে নতুনতর পথে পরিচালিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের বিপুল নাট্যকৃতিতেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটেছে। সাধারণ নাটক থেকে ভাবধর্মিতা ও সংকেতধর্মিতায় রূপান্তরের মধ্য দিয়েনৃত্য ও সংগীতের সঙ্গে নাটকের আভ্যন্তরীণসংযোগেবহুবিচিত্র শিল্পকলায় রবীন্দ্রনাথ মনোনিবেশ করেছেন। সমগ্রভাবে লক্ষ্য করলে তাঁর নাট্যকলায় কাব্যধর্ম বা ভাবধর্মের অনুবৃত্তির সূত্রটিই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় বটে, এবং রবীন্দ্রসমালোচক টমসন সাহেবের উক্তি—"Tagore's dramas are vehicle of ideas rather than expression of acticns"—মোটামুটি রবীন্দ্রনাথের নাট্য সম্পর্কে যথার্থ উক্তি। তথাপি কবি যে-সকল স্থানে সাধারণ নাটকনির্মাণে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং সাধারণনাটকের আদর্শ বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন, সেই প্রয়াসের দিকটি উপেক্ষিত হলে চলবে না।

শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডির আদর্শে বহু নাটক রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও রাজা ও রাণী নাট্য রচনায় শেক্‌স্‌পীয়রের আদর্শ অল্পাধিক গ্রহণ করেছেন। এ নাটকে কবি জালন্ধরের রাজা বিক্রমের, রাণী সুমিত্রার প্রতি আসক্তিবিজড়িত প্রেম, ও প্রজাপুঞ্জের প্রতি রাণীর কর্তব্যবোধের সংঘাত দেখিয়েছেন। এই সংঘাত-সংঘর্ষের পরিণামেই ট্র্যাজেডি। নাটকখানিতে কুমারসেন ও ইলার প্রণয়বৃত্তান্তের

ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে এবং সুমিত্রার আকস্মিক মৃত্যুর দৃশ্য দেখিয়ে মেলোড্রামার মতো করে নাটকটি শেষ করা হয়েছে। রাজা ও রাণীর বিরোধের কবিপ্রদর্শিত এই পরিণাম কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকে। কিন্তু বুঝে নিতে হবে, 'রাজা ও রাণী'র অসাফল্য কবির নাট্যসৃষ্টিরই অসাফল্য, বিশেষ কোনো আদর্শ-ভাবধর্মের জন্যে এরূপ ঘটেনি। এই নাটকের সংস্কারসাধন করে পরবর্তীকালে কবি 'তপতী' রচনা করেছিলেন।

পরবর্তী নাটক **বিসর্জন** রবীন্দ্রনাথের অতিশয় শক্তিশালী শিল্পকৃতি। প্রেমের সঙ্গে প্রথা ও কুসংস্কারের দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে প্রেমের জয়, এই ভাবটি নাট্যরচনার মূল হলেও, রচনায় চরিত্রাঙ্কন, প্লটের গ্রন্থন, দৃশ্যাদির সংযোজন মধ্যে ভাবপ্রধান হয়ে বইটির নাটকীয়তাকে একেবারে খর্ব করে দিয়েছে এরূপ মনে করা অসমীচীন হবে। গোবিন্দমাণিক্যই যদিও নাটকটির সর্বগুণসম্পন্ন নায়ক, কিন্তু অঙ্কনের দিক থেকে রঘুপতির চরিত্রই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই উগ্র ও অমিতশক্তিসম্পন্ন চরিত্রটি নির্মাণ করে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে নি, প্রকট মিথ্যা ও গোপন জঘন্য ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত করে চারিত্রটিকে তিনি অনেকটা হীন করে ফেলেছেন—সে তাঁর নাট্যসৃষ্টিরই অসাফল্য। অন্যথায় রঘুপতির অনুতাপ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে হয়তো চমৎকার ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করা যেত।

কিন্তু 'বিসর্জন'-এ ট্র্যাজেডি রচনায় রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল না, শান্তরসে সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটানোই তাঁর অভিপ্রেত ছিল। তাই, বিরোধকে অধিকদূর অগ্রসর হতে না দিয়েই মাঝপথে আকস্মিকভাবে ছেদ টেনেছেন। জয়সিংহের আত্মহত্যা রঘুপতির চরিত্রের আকস্মিক পরিবর্তন আনল। বস্তুতঃ, এই আকস্মিকতার দ্বারা যুক্ত হয়ে নাটকের পরিণাম বহুল পরিমাণে মেলোড্রামার মতো হয়েছে। যাই হোক, ভাবধর্মী হলেও নাটকীয় প্রস্তুতির দিক থেকে 'বিসর্জন' উল্লেখযোগ্য, এতে সন্দেহ নেই।

'বিসর্জন'-এর পরবর্তী রচনা **চিত্রাঙ্গদা** সৌন্দর্যসৃষ্টিতে ও ভাবাভঙ্গির চমৎকারিত্বে অপূর্ব। এর রচনার পশ্চাতে—প্রেমে ও জীবনযাত্রায় পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যেই নারীপুরুষের মিলন সার্থক, রূপমোহ ও স্থূল দেহকামনার চরিতার্থতার মধ্যে নয়—এরূপ একটি আইডিয়া বিদ্যমান থাকলেও ওই ভাবাদর্শ নাটকাটির সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ করেনি। অবশ্য নাটিকাটিতে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের পরিচয় ক্ষীণ, যৌবন ও সৌন্দর্যস্বপ্নের চিত্র অধিক, সেইদিক থেকে এ চিত্রকাব্যময়। 'চিত্রাঙ্গদা' ঘটনাবিরল এবং বিরলচরিত্রও বটে। বলা যেতে পারে, এতে কাব্যের সঙ্গে নাট্যের সম্মিলন ঘটানো হয়েছে।

'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিসর্জন'-এর সঙ্গে তুলনায় **মালিনী** অধিকতর ভাবপ্রেরণার দ্বারা গ্রথিত। 'মালিনী'র উপাখ্যানটি বৌদ্ধকাহিনী থেকে গৃহীত এবং কল্পনার দ্বারা মিশ্রিত। এতে রবীন্দ্রনাথ মানবতাধর্মের জয়ঘোষণা করেছেন। মালিনী' ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয়—এই তিনটিই বর্তমান নাটিকার প্রধান চরিত্র। এর মধ্যে

রাজকন্যা মালিনার চরিত্রচিত্রণ অভিনব, সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্ষেমংকরের চরিত্র-নির্মাণেই সমধিক কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয়েছে। 'মালিনী'তে নাট্য অপেক্ষা কাব্যের অংশই অধিক, যদিও প্লটের গ্রন্থন মন্দ নয়।

'মালিনী'র প্রায় সমকালে নতুন পর্যায়ের নাট্যকাব্য লিখতে রবীন্দ্রনাথ প্রবৃত্ত হন—**বিদায় অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন, নরকবাস, কর্ণকুন্তীসংবাদ, সতী, লক্ষ্মীর পরীক্ষা**। এদের কলেবর সংক্ষিপ্ত, চরিত্র স্বল্প, ঘটনা মাত্র একটি। অথচ এই সংক্ষিপ্ত অবয়বের মধ্যেই এ গুলিতে উৎকৃষ্ট নাটকীয়তার পরিচয় রয়েছে। 'গান্ধারীর আবেদন' তো তীব্র সংঘর্ষে পূর্ণ এবং অংশবিশেষে উত্তম নাটকের সমকক্ষ হওয়ার যোগ্য। এগুলি নাট্যাকারে কাব্য, সন্দেহ নেই, কিন্তু এগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে নানা আকারে অভিব্যক্ত নাট্যগুণও উপেক্ষণীয় নয়।

এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার আর-একটি নতুন লক্ষণ দেখা যায়—তিনি গদ্যে সংলাপযোজিত করে হাস্যরসপূর্ণ **গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা** এবং আধা-ঐতিহাসিক আধা-পারিবারিক' **প্রায়শ্চিত্ত** নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। এগুলিকে রবীন্দ্রনাথের পুরাপুরি নাটক বলতেই হবে। ঘটনার পরিদৃশ্যমানতা, দ্বন্দ্বসংঘাত প্রভৃতি কোথাও বেশি কোথাও কম; কিন্তু চরিত্রগঠনে, ঘটনাসংস্থাপনে সংলাপের ক্ষেত্রে নাটকীয় বৈশিষ্ট্যের দীপ্তিতে এগুলি ঝলমল করছে। এখানে বাস্তবসংসারের নরনারীরা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, সকলেই অতি-পরিচিত; এই মানুষগুলিকে দেখতে আমাদের বেশ মজা লাগে—এদের চলাফেরা, কথাবার্তা, কাজকর্ম কেমন কৌতুকাবহ। 'চিরকুমার সভা'-র অক্ষয়, 'গোড়ায় গলদ'-এর গদাই, 'বৈকুণ্ঠের খাতা'-র বৈকুণ্ঠ কার না চেনা। মার্জিত, শিষ্ট হাস্যরস-সৃষ্টিতে রবীন্দ্রের দক্ষতা উচ্চপ্রশংসার যোগ্য।

এর পর থেকে নাট্যরচনায় গদ্যের প্রবাহ চলতে' লাগল। সংকেতধর্মী বিচিত্র নাটক রচনাতেও কবি গদ্যসংলাপের রীতি রক্ষা করেছেন।

'কাহিনী'-র নাট্যকাব্যগুলি। [গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তীসংবাদ, ইত্যাদি] এবং 'চিরকুমারসভা'-র মতো হাস্যোচ্ছল এবং সংস্কৃতসাহিত্যের সম্পৃক্ত নাটক রচনার পরের পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ কাব্যের মধ্যে যেমন নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেন, তেমনি, নাট্যরচনাতেও নতুনতর ভাব ও ভঙ্গির প্রবর্তন ঘটান। **শারদোৎসব, রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন**, 'গীতাঞ্জলি' ও গীতিমালা'-এর সমসাময়িক রচনা। প্রকৃতিব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে অরূপরাজ্যে পরিভ্রমণের স্পৃহা যেমন একালের কাব্য ও সংগীতগুলি নিয়ন্ত্রিত করেছে, তেমনি; নাট্যরচনাকেও অতিরিক্ত ভাবময় ও অরূপরাজ্যে প্রবেশের সাংকেতিক মাধ্যম করে তুলেছে। তা ছাড়া, বর্তমানের ধনতন্ত্রশাসিত সমাজের বহুতর সমস্যা, আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার অতিশয় নিষ্ঠুরতার দিকও রবীন্দ্রনাথ দুয়েকখানি নাটকে নৈপুণ্যসহকারে রূপায়িত করেন। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক মানবীয় সংঘর্ষের দিকটি এই সকল নাট্যে স্বাভাবিকভাবেই স্থান পায়নি। বলা বাহুল্য, প্রয়োজনবশে এইসকল নাটকে প্রচুর সংগীতের সহায়তা গ্রহণ করা

হয়েছে। এইরূপ নাট্যের ধারা **ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী** থেকে **তাসের দেশ**-এ শেষ হয়েছে।

শারোদৎসব-এ নিসর্গব্যাকুলতার মধ্যে কবির অরূপানুভব স্পষ্ট। 'আমার নয়নভুলানো এলে' এই হল শরৎ-প্রকৃতির মধ্যে অরূপসত্তার সঞ্চরণ সম্পর্কে অরূপসন্ধানী রবীন্দ্রের বিস্ময়বোধক উক্তি। **রাজা** নাটকে কবি দেখিয়েছেন, এই অরূপসত্তা কেবল সুন্দর নয়, ভয়ংকর; ভয়ংকর হলেও অরূপ বরণীয় এ যাঁরা মনে করেন তাঁরাই যথার্থভাবে একে লাভ করেন। **অচলায়তন**-এ এই ভয়ংকর অরূপ 'গুরু'র বেশে দেখা দিয়ে বহুদিনের প্রথা ও সংস্কারের প্রাচীর বিধ্বস্ত করেছে। **ডাকঘর**-এ নিসর্গ-সম্পর্কের মধ্যে মুক্তির রহস্য দেখানো হয়েছে' এবং মুক্ত মানবাত্মার কাছে অরূপ কীভাবে ধরা দেয় তাও দেখানো হয়েছে। নাট্যগুলিতে সাংকেতিক রূপকৌশল লক্ষণীয়।

একই সময়ে লিখিত **ফাল্গুনী** নাট্যে প্রাণের মুক্তি ও যৌবনের জয়যাত্রার কথা উল্লিখিত হয়েছে। যা জরাগ্রস্ত, প্রথাবদ্ধ, গতিহীন, তার প্রতি তাব্র বিরাগ এই নাট্যে দেখানো হয়েছে **নটরাজ-ঋতুরঙ্গ**-পালার গীতিনাট্যগুলি নিসর্গের মধ্যবর্তী আনন্দরসপিপসার দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। **মুক্তধারা** ও **রক্তকরবী** নাট্যে মানুষের মুক্তির বাস্তবোচিত রূপ উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে—প্রথমটিতে রাষ্ট্রীয় নিষ্পেষণ এবং অপরটিতে ধনউৎপানকারীর শোষণ থেকে মুক্তি। আধুনিক সভ্যতা যন্ত্রসহায়, অর্থ ও পণ্যবাণিজ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর প্রতাপ অপরিসীম, কিন্তু মূলে এ অমানবীয়। কারণ, লক্ষ লক্ষ মানুষকে দাসে পরিণত করে এ আপন অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করে। যন্ত্রের কবলে একবার পড়লে মানুষের আর রক্ষা নেই। সে নিজ সত্তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যন্ত্রে পরিণত হয়। অথচ মূলে মানবের প্রাণসত্তা আনন্দময়। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ স্থূল রূঢ় এবং যান্ত্রিকতাগ্রস্ত নিপীড়িত জীবনের মধ্যে অরূপানন্দের মাধুর্য প্রবেশ করিয়ে জীবনের সঙ্গে তাঁর উপলব্ধ অরূপকে যুক্ত করেছেন।

নৃত্যগীতাদিসংবলিত ঋতুনাট্য এবং আরো পরবর্তীকালে মূকাভিনয় এবং শুধু নৃত্যের দ্বারা প্রকাশিত নাটিকা রবীন্দ্রনাট্যশিল্পকলাকে অপরিসীম বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করেছে। **চণ্ডালিকা, শ্যামা** প্রভৃতির দিকে তাকালে বুঝতে পারা যায় যে জীবনের গোধূলিপর্বেও কবি নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যের সন্ধানী ছিলেন, কত নতুন নতুন পথে তিনি লেখনীকে পরিচালিত করেছেন।

স্বীকার করতে হবে রবীন্দ্রনাথের নাটক যতখানি ভাবের ততখানি ঘটনার নয়। এ কারণে তাঁর নাট্যাবলীর অধিকাংশ মঞ্চসাফল্য অর্জন করেনি। তবে এও মনে রাখতে হবে কেবল মঞ্চসাফল্যই সার্থক ও উত্তম নাটকের একতম মাপকাঠি নয়। সে যাই হোক, বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্য যে কবির প্রতিভার দানে সমৃদ্ধ হয়েছে এ-কথা অনস্বীকার্য।

তাঁর লেখা নাটকনাটিকা সংখ্যায় বহু—চল্লিশেরও বেশি। কত বিচিত্র

ধরনের নাটক তিনি রচনা করেছেন। বিশেষত, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষার শেষ ছিল না। বাঙ্‌লা নাটকে রবীন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দান রূপক-সাংকেতিক নাট্যরচনাগুলি। কবিহিসেবে রবীন্দ্রনাথ অবিস্মরণীয়, কিন্তু আমাদের নাট্যসাহিত্যেও তাঁর কীর্তি সকলেই স্মরণ করবেন।

প্রবন্ধ :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল পৃথিবীর মহত্তম কবিদের অন্যতম নন, গদ্যশিল্পী হিসেবে তাঁর সঙ্গে তুলনায় দাঁড়াতে পারেন, দেশবিদেশে এমন লেখকেরও সংখ্যা একেবারে মুষ্টিমেয়। কবিতা ও গান বাদ দিলে, বিস্তার ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে কবির প্রবন্ধরচনাই সর্বাগ্রগণ্য। কী সাহিত্য-শিল্প সমালোচনা-ছন্দ-শব্দতত্ত্বের প্রসঙ্গে, কী ধর্ম-দর্শন-শিক্ষা-রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি-ইতিহাসের আলোচনায়, কী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার চিন্তনের ক্ষেত্রে—সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের লেখনী স্বচ্ছন্দ, অনায়াস—সর্বত্র তার গদ্যলেখা দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বে ও প্রকাশরীতির চারুত্বে অপূর্বতা লাভ করেছে : য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র, য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী, পঞ্চভূত, চারিত্রপূজা, বিচিত্র প্রবন্ধ, প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ, আত্মশক্তি, রাজাপ্রজা, স্বদেশ, শিক্ষা, ধর্ম, মানুষের ধর্ম, শান্তিনিকেতন, সঞ্চয়, জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, আত্মপরিচয়, ছিন্নপত্র, ভানুসিংহের পত্রাবলী, পথে ও পথের প্রান্তে, পত্রধারা, পথের সঞ্চয়, রাশিয়ার চিঠি, যাত্রী, জাপানে-পারস্যে, ছন্দ, বাঙ্‌লা-ভাষাপরিচয়, কালান্তর, সভ্যতার সংকট ইত্যাদি কত অসংখ্য গদ্যগ্রন্থই-না তিনি লিখেছেন। এসকল বইয়ের নামের দিকে তাকালেই কবির মননভাবনার ব্যাপকতা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়।

বঙ্কিমের পর বাঙ্‌লা প্রবন্ধকে রূপগত ও রসগত ঐশ্বর্য দান করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রের গদ্য মহাকবির। কবির প্রবন্ধরীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দুয়েকটি কথা এখানে বলে নিই। যেখানে তথ্যের প্রাধান্য সেখানে রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি যুক্তিধর্মী। তবে যুক্তির দাবি যতই মেনে চলুন, রচনার অঙ্গে কারুকলার লাবণ্যসঞ্চার করতে কখনো তিনি ভুলেন নি। কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত, কোনো ধ্রুব মীমাংসায় পৌঁছবার জন্যে তিনি তেমন ব্যগ্র নন। কবি-প্রবন্ধকার রবীন্দ্র লিখতে বসে ভাবেন, ভাবতে ভাবতে লেখেন—লেখা শুরু করে দিয়ে ভাবনা ও কল্পনার জাল বুনেন। তাঁর রচনা কুত্রাপি তথ্যকণ্টকিত নয়, যুক্তিসর্বস্ব নয়, বুদ্ধির চতুর খেলা নয়। মেঘের কোলে বিদ্যুৎবিলসনের মতো কবির বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে সুকুমার অনুভূতি, সূক্ষ্ম ভাবনা, কল্পনার বর্ণাঢ্য বিচ্ছুরণ অবলীলায় উঁকি দিয়ে যায়। কেবল বক্তব্যের যথাযথ উপস্থাপনায় কবির তৃপ্তি নেই, বলবার ভঙ্গিটির দিকেও তাঁর প্রখর দৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়—আত্মকথা,

পত্রধারা, ভ্রমণকাহিনী, ভাষা-শিল্প ও সাহিত্য, এবং চরিত্র। এদের আরো এক-রকমের পর্যায়বিন্যাস হতে পারে—আত্মভাবনামূলক এবং প্রসঙ্গাত্মক। পত্রগুচ্ছ, আত্মপরিচয়, ধর্মদেশনা, ভ্রমণকাহিনী শিল্পসাহিত্য বিষয়ক আলোচনা ইত্যাদি প্রথম ভাগটিতে পড়ে। এর মধ্যে দেখতে পাই কবিদার্শনিক রবীন্দ্রের ভাবসত্তার প্রতিফলন। ওপরে কথিত দ্বিতীয় ভাগটির অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ প্রসঙ্গাত্মক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলির মধ্যে শতাব্দীর অধিনায়ক রবীন্দ্রের প্রদীপ্ত মনস্বিতার পরিচয় মুদ্রিত। কবি দার্শনিক নয়, ভাবুক নয়,—ব্যক্তিমানুষ রবীন্দ্রনাথকে চিনতে হলে তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। কর্মী, সংস্কারক ও ভাবনায়ক রবীন্দ্রনাথের মহিমা কবি-রবীন্দ্রের-মহিমার চেয়ে কম-কিছু নয়।

রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবনে প্রবেশের চাবিকাঠি তাঁর আত্মপরিচয়মূলক লেখাগুলি। এইসব রচনার সঙ্গে পরিচয় থাকলে কবির নির্মিত সাহিত্যের মর্মলোকের দ্বারমোচন অনেকখানি সহজ হয়ে ওঠে। আত্মপরিচয়, জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা ইত্যাদিকে রবীন্দ্রের আত্মকথা বলা যেতে পারে। এরূপ আত্মকথার পরিপূরক হল ছিন্নপত্র, পথে ও পথের প্রান্তে, চিঠিপত্র প্রভৃতি গ্রন্থ। কবির ব্যক্তি-জীবন ও অন্তর্জীবনের কথা আরো বহুতর রচনায় বিকীর্ণ। তাঁর পত্রধারা অনেকস্থলে প্রবন্ধেরই নামান্তর মাত্র। এগুলিতে বিচিত্র চিন্তার ঐশ্বর্য ও ভাবানুভূতির মনোজ্ঞ রূপায়ণ। লক্ষণীয়, কবির অনেক ভ্রমণকাহিনী পত্রাকারে লিখিত, যেমন—য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র, রাশিয়ার চিঠি ইত্যাদি। এগুলি নানা ভাবনার তরঙ্গে আন্দোলিত, বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা এখানে বসে ভিড় করেছে। লেখনভঙ্গির আশ্চর্য কৌশলে রবীন্দ্রের চিঠিপত্র, ভ্রমণপঞ্জী সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

এরপর উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য। সমালোচনা কেমন করে সৃষ্টিকর্ম হয়ে ওঠে, কবি এ আমাদের প্রথম দেখালেন। এমন উচ্চাঙ্গের সমালোচনা বাঙলা সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট বলতে হবে। কবির 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থখানির তুলনা হয় না। এ বইয়ের মাধ্যমে সমালোচনার একটি নতুন আদর্শ তিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করলেন—গভীর শ্রদ্ধা ও আনন্দই যে সমালোচনার উৎস, তা আমাদের আভাসে বুঝিয়ে দিলেন; যে-লেখককে আমি ভালবাসি, সেই ভালোবাসা অপর দশজনের চিত্তে সঞ্চারিত করে দেওয়াই সমালোচকের সবচেয়ে বড়ো কাজ এও আমাদের বুঝতে শেখালেন।

তাঁর আধুনিক সাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, সাহিত্যের পথে প্রভৃতি অতি-উত্তম গ্রন্থ। কবির "পঞ্চভূত' একটি অসাধারণ বই। তাঁর বহুবিচিত্র ভাবনা এখানে এক অভিনব আঙ্গিকে বাণীবদ্ধ। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' কবির একখানি অতিশয় উল্লেখ্য প্রবন্ধের বই। যে-শ্রেণীর রচনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে তাকে অধুনা আমরা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ—ইংরেজিতে Personal Essay—বলে থাকি। তথ্যজ্ঞাপন কিংবা তত্ত্বালোচন এখানে রচয়িতার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য—পাঠকের

আনন্দবিধান। এতে যে-সকল রচনা রয়েছে সেগুলিতে আনন্দস্বরভিত অবকাশ-মুহূর্তের রূপময় তত্ত্বকথা বলতে ইচ্ছে করে। 'ধর্ম', 'সঞ্চয়', 'মানুষের ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন'-প্রবন্ধমালায় কবির ধর্মানুভব ও দার্শনিক প্রত্যয় বা উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে। এসব বইতেও বিচারবিশ্লেষণের চেয়ে কবির অনুভূতিই বড়ো হয়ে উঠেছে। কাব্যধর্মী, অলংকারসজ্জায় মণ্ডিত 'সাধু' গদ্যরীতি, আর, গতিশীল, সতেজ দীপ্তিতে চোখধাঁধানো 'চল্‌তি' গদ্যরীতির ওপর রবীন্দ্রনাথের কী অসামান্য আয়ত্তি, তাঁর প্রবন্ধাবলী পড়লে তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

কত রকমের অভিনব আঙ্গিকে কবির প্রবন্ধমালা গ্রথিত। আর, রচনায় ভাবচিন্তার বৈভবের কথা যদি বলি তবে পৃথিবীর কোন্ প্রবন্ধশিল্পীর সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের তুলনা দেব? একটি নামও মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গদ্যে বড়ো, না, কবিতায়, এ প্রশ্নের সমাধান সহজ নয়।

ছোটগল্প :

রবীন্দ্রপ্রতিভার আর-এক মহার্ঘ দান ছোটগল্প। চলমান জীবনের বহুবিধ ঘটনার খণ্ড ভগ্নাংশকে নিয়ে তার মাধ্যমে গূঢ় গভীর জীবনসত্যকে বিদ্যুৎচমকের মতো উদ্ভাসিত করে দেখানো, ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎ সত্তাকে ফুটিয়ে তোলা—এই যে বিশেষ ধরণের সাহিত্যকর্ম তা আমাদের প্রথম শেখালেন রবীন্দ্রনাথ। রবি-কবির হাতে বাঙ্‌লা ছোটগল্পের শুধু গোড়াপত্তন হল না, একে তিনি বারো আনা পূর্ণতা দিলেন, আমাদের সাহিত্যের এই ভাণ্ডারটিকে আশ্চর্যরূপে সমৃদ্ধ করে তুললেন। বাঙ্‌লা গল্পের এই অতি-আত্যন্তিক প্রসারের যুগেও কবির লেখা ছোটগল্পমালাকে বাদ দিয়ে এ ধরণের রচনার কোনো আলোচনাই চলতে পারে না। রবীন্দ্রের গল্পগুলি কেবল ঐতিহাসিক কারণেই স্মরণীয় নয়, এদের প্রভূত সাহিত্যের মূল্যও রসিকমণ্ডলীর স্বীকৃত। 'গল্পগুচ্ছ'-এর আঙ্গিক ও ভাষা যে একদা বাঙালি সাহিত্যকারদের একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে ষাট-সত্তর বছরের আগে—বাঙ্‌লা সাহিত্যে যখনো বঙ্কিমযুগ চলছে—তখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'গল্প[redacted] গ্রথিত নিখুঁত-সুন্দর গল্পগুলি। উনিশের শতকের শেষ দশকটিকে রবীন্দ্রের ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। তিরিশ বছরে পদক্ষেপ করে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচনায় হাত দিলেন। এসময়ে কোন্ পরিবেশে কবির দিনগুলি কাটছে তা-ও জেনে রাখা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রের আসল কাজ 'আশমানদারী', এহেন স্বপ্নলোকের অধিবাসী মানুষটির ওপর ভার পড়ল 'জমিদারি' তদারকের। জোড়াসাঁকোর প্রাসাদ ছেড়ে কবি এলেন মধ্যবঙ্গে—পদ্মার বুকে বোটে, পদ্মার তীরে শিলাইদহের কুঠিতে—কবির বাস। কালিগ্রাম, পতিসর, সাজাদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন—বেশির ভাগ নৌকায়, কখনো কখনো গরুর গাড়ীতে চেপে। চলাচলের পথে

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে—কৌতূহলী চোখ মেলে—কবি দেখে নিচ্ছেন পল্লীবাঙলার বহুবর্ণরঞ্জিত দৃশ্যপট; সন্নিকটস্থ লোকালয়ের জীবনধারার অশ্রান্ত কলধ্বনি অহর্নিশ প্রবেশ করছে তাঁর কানে, বিভিন্ন স্তরের লোক এসে 'রাজাবাবু' রবীন্দ্রের চারপাশে ভিড় জমাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাঙলার প্রকৃতি ও মানুষের ছবি আঁকা হয়ে যাচ্ছে কবির মনের পটে। রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে যা ছিল অপরের অ-দৃষ্ট, তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল তাঁর একালের কবিতায় আর ছোটগল্পে। প্রথমটিতে বস্তুর ভাবরূপ, দ্বিতীয়টিতে তার বাস্তব রূপ। ইতঃপূর্বে কবি প্রকৃতি ও মানবের এতখানি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে কখনো আসেননি। 'গল্পগুচ্ছ'-এর গল্পমালায় এই প্রকৃতি-মানবের ঐকতান রাগিণী ধ্বনিত হয়েছে।

কবির অধিকাংশ উৎকৃষ্ট গল্প, যেমন,—ছুটি, শাস্তি, দুরাশা, কঙ্কাল, অতিথি, নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ, একরাত্রি, কাবুলিওয়ালা, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র এবং নষ্টনীড় ইত্যাদি—হিতবাদী, ভারতী, বালক, সাধনার যুগেই লেখা হয়েছে। তখন কবি সৃষ্টির আনন্দে একেবারে ডুবে গিয়েছিলেন। এতখানি একাগ্রতাসহকারে—একেবারে দুহাতে—ছোটগল্প আর কখনো লেখেননি তিনি।

এর পর ১৮১৪ সালে 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হলে কবি পুনর্বার ছোটগল্প-লেখার বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করলেন। কবির হাত দিয়ে কয়েকটি উত্তম গল্প বেরুল, যার মধ্যে অত্যন্ত বিখ্যাত একটি গল্পের নাম 'স্ত্রীর পত্র'। 'পয়লা নম্বর', 'হৈমন্তী', 'হালদারগোষ্ঠী' প্রভৃতি রচনা 'সবুজপত্র'-এর আমলেই সৃষ্টি। এগুলি রবীন্দ্রের ছোটগল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভূত। পদ্মার আতিথ্য থেকে কবি এখন দূরে সরে এসেছেন, ফলে তাঁর গল্পেরও পটপরিবর্তন হল—পল্লীজীবন স্থান ছেড়ে দিল শহুরে জীবনকে। রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত গল্পগুলি বক্তব্যে, বাচনভঙ্গিতে, স্বাদে স্বতন্ত্র, এরা আধুনিক মননের স্পর্শযুক্ত। এদের মধ্যে কোথাও কোথাও তত্ত্বের দেখা মেলে। কাব্যানুভূতির সঙ্গে তত্ত্বের মিশ্রণে এগুলি অপূর্বতা পেয়েছে।

জীবনের একেবারে অপরাহ্ণবেলায় রবীন্দ্রনাথ আর-একবার ছোটগল্পের খাতে লেখনী চালনা করলেন। তাঁর 'তিনসঙ্গী' বইখানি এসময়ে লিখিত তিনটি গল্পের সংকলন। কবির সর্বশেষ গল্প বেরোয় 'প্রবাসী'-তে—মৃত্যুর কয়েকমাস আগে। শেষের দিকের লেখাগুলিতে প্রতিপাদ্যে শাণিত যুক্তিতর্কের স্ফুলিঙ্গ আছে, ভাষার দীপ্তি আছে, কিন্তু পূর্বেকার সেই মনোধর্মের সুগভীর আবেদন যেন কমে এসেছে। তথাপি বৈচিত্র্যে, নতুনত্বে এবং উজ্জ্বলতায় এগুলি সাহিত্যপাঠকের প্রশংসা পাবে।

বহুবিধ গল্প রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এদের বিচিত্রতা লক্ষ্য করবার মতো। সমাজজীবনের কোনো একটা বিশেষ দিকের প্রতি কবি ঝোঁকেননি, তাঁর কৌতূহলী দৃষ্টি বিভিন্ন দিকে প্রসারিত। কবির অধিকাংশ গল্প মধ্যবিত্তজীবনকে নিয়ে লেখা। অবশ্য দৈনন্দিন খুঁটিনাটির চিত্র রবীন্দ্রনাথের গল্পে তেমন মিলবে না; এইদিক থেকে বিচার করলে তথাকথিত 'বাস্তব' তিনি নন। তথাপি রবীন্দ্রের গল্পগুলিকে

অবাস্তব বলবার জো নেই, কল্পনার পথ ধরে এরা বাস্তব সত্যে গিয়ে পৌঁছেছে। প্রতিভাবানের কল্পনা যেমন দূরগামী, তেমনি অন্তর্ভেদী। ফলে তাঁদের কল্পনা, কোনোরূপ বিরোধিতা না করে, বাস্তবের হাত ধরেই চলে। অধুনা আমাদের মন যৎপরোনাস্তি বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে; তাই কোনোকিছুতে কল্পনার ছোঁয়া লাগলেই তাদের আমরা অস্পৃশ্যশ্রেণীভুক্ত করি। কিন্তু এ সত্যটি ভুললে চলবে না যে, কেবল বাস্তবচিত্রণের জোরেই কোনো লেখা সার্থক সাহিত্য হয়ে ওঠে না—গূঢ়গভীর জীবনসত্যকে উদ্‌ঘাটিত করার জন্যে উচ্চতর কবিকল্পনা একরূপ অপরিহার্য। প্রধানত কাব্যকার হয়েও রবীন্দ্রনাথ অতি উঁচুদরের একজন গল্পলেখক।

কত বিচিত্র ধরণের গল্প কবি বাঙালিপাঠককে উপহার দিয়েছেন—প্লট-জাঁকানো গল্প, সামান্য-সাধারণ ঘটনাকে নিয়ে গল্প, মনস্তত্ত্বের-গভীরে-ডুব-দেওয়া গল্প, রোম্যান্সরঞ্জিত গল্প, জীবন ও প্রকৃতির সমন্বিত রূপের গল্প, সমাজসমস্যামূলক গল্প, হাসির গল্প—কী না তিনি লিখেছেন। 'গুপ্তধন'-এর আখ্যান গোয়েন্দাকাহিনীর মতোই কৌতূহলোদ্দীপক; 'উদ্ধার'-এ ঘটনায় এতটুকু ঘোরপ্যাঁচ নেই, অথচ এ একেবারে সোজা এসে মনকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়; 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে', 'মণিহারা' প্রভৃতি গল্প রবীন্দ্রের বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক মনের সৃষ্টি। এগুলিতে কবির রোম্যান্সরচনার শক্তি সাফল্যের তুঙ্গ সীমা স্পর্শ করেছে—কল্পনার বিস্তারে, বর্ণনের চাতুর্যে, ভাষার বিস্ময়কর চারুকলায়, অদ্ভুত পরিবেশনির্মাণের কৌশলে, ভাবানুভূতির ঐশ্বর্যে বাঙলা সাহিত্যে এরা অতুলন। প্রকৃতি ও মানবজীবনের সমন্বিত রূপ দেখিতে পাই 'সুভা', 'অতিথি', 'একরাত্রি', 'পোস্টমাস্টার', 'ছুটি' প্রভৃতি গল্পে। এসব রচনায় নিসর্গপ্রকৃতি পশ্চাৎপট মাত্র নয়, এখানে প্রকৃতি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে, প্রায়-সজীব চরিত্র হয়ে উঠেছে—যেমন, কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকে।

রবীন্দ্রের দক্ষতা মানবহৃদয়ের অগাধ রহস্যের দ্বারোন্মোচনে, সামান্যের মধ্যে অসামান্যের আবির্ভাব দেখানোতে। বাঙালিজীবন সাধারণত অনুত্তরঙ্গ হলেও তার মধ্যে কত অতৃপ্তি, কত বুভুক্ষা, কত বৈচিত্র্য লুকানো আছে তা রবীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের দেখালেন। তাঁর ঝোঁক বেশি মনস্তত্ত্বের দিকে, কাহিনীর চেয়ে চরিত্রই তাঁর গল্পে অধিক উজ্জ্বল; ঘটনার চমক নয়, ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্যেই কবির গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক এবং সমৃদ্ধ।

শ্রেণীচেতনাকে কবি কোথাও বড়ো করে দেখাননি। মানুষের কোনো জাত মানেন না তিনি—সর্বমানবিক হৃদয়সত্যের দিকেই তাঁর দৃষ্টিনিবদ্ধ। 'বোষ্টমী', 'কাবুলিওয়ালা' প্রভৃতি গল্পে মানুষের সামাজিক পরিচয় ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে তার মর্মনিহিত শুচিশুভ্র মমতা যা মানুষকে দেশ-জাতি-ধর্মের সীমিত গণ্ডীর বাইরে টেনে নিয়ে আসে।

সাম্প্রতিক গল্পের ধারা অনেকখানি বদলে গেছে। কাব্যের মাধুর্য, লিরিকের স্বাদ, এখন লেখক-পাঠক কারো অভিলষিত নয়, বস্তুবিন্যাসে এতটুকু ফাঁক কিংবা

শিথিলতা কেউ সহ্য করেন না। একালে সাহিত্যের সুরপরিবর্তন হলেও, বলা আবশ্যক, আজকের বাঙলা গল্পের এই যে দ্রুতপ্রসার তার মূলে রয়েছে গল্পকার রবীন্দ্রের গভীরচারী প্রেরণা। গল্পের ক্ষেত্রেও তো রবীন্দ্রনাথ আমাদের আধুনিকতার পথিকৃৎ।

উনিশের শতকে পৃথিবীতে তিনজন খুব বড়ো গল্পকার জন্মেছিলেন—এডগার অ্যালান-পো, আন্তন-চেকভ, আর গী-দ্য মোপাসাঁ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গল্পকার-হিসেবে এঁদেরই সমস্তরের লেখক—বর্তমান প্রসঙ্গে এ-ই হল আমাদের সর্বশেষ কথা।

উপন্যাস :

বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় রবীন্দ্রপ্রতিভা বিকীর্ণ। কবির এই বহুমুখী সৃষ্টিক্ষমতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্ববর্তী আলোচনায় গ্রথিত হয়েছে। এবার তাঁর উপন্যাসের কথা।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'বউঠাকুরাণীর'-হাট'-এর প্রকাশকাল ইংরেজি ১৮৮৩ সাল, তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ ইংরেজি সালে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কবির প্রণীত উপন্যাসাবলীর রচনার কাল-পরিধি হল মোটামুটি পঞ্চাশ বৎসর। উপরে কথিত দুই প্রান্তবর্তী উপন্যাস-দুটির মাঝখানে এ কয়টি বইয়ের অবস্থান—রাজর্ষি, চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, দুইবোন এবং চার অধ্যায়। বউঠাকুরাণীর হাট ও মালঞ্চ-কে নিয়ে রবীন্দ্রের মোটা বারোখানি উপন্যাস আমরা পাচ্ছি।

উপরে কথিত অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যে দেশে কত বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেছে, আমাদের সমাজে ও চিন্তায় কত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, বহিরাগত নানা ভাবতরঙ্গ এসে কবির চিত্তদেশটিকে প্রহত করেছে—আলোচ্যমান উপন্যাসগুলি প্রধানত তারই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াজাত। যুগপ্রভাবিত পরিবেশের ভিন্নতা রবীন্দ্রকৃত উপন্যাস-নিচয়ে বিষয়গত পার্থক্য এনে দিয়েছে। এদের মধ্যে আঙ্গিকগত ও রূপকলাগত পার্থক্যও কম নয়। মনে রাখতে হবে রচয়িতার শিল্পদৃষ্টিও কালের ব্যবধানে ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের লেখা; চোখের বালি ও নৌকাডুবি তাঁর অবসিতপ্রায় যৌবনের দিনের রচনা; প্রৌঢ়ত্বে তিনি লেখেন গোরা, ঘরে-বাইরে ও চতুরঙ্গ; বার্ধক্যে প্রকাশিত হল শেষের কবিতা, যোগাযোগ, দুইবোন, চার অধ্যায় আর মালঞ্চ। রবীন্দ্র-উপন্যাসের আলোচনায় কাল, পরিবেশ, বিষয়বস্তু, পটভূমি ইত্যাদির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথ যখন উপন্যাস-লেখায় হাত দেন তখনো বঙ্কিম জীবিত, তখন আমাদের সাহিত্যসংসারে বঙ্কিমের প্রভাব সর্বত্রচারী। এই কালেই আত্মপ্রকাশ

করল কবির প্রাথমিক পর্যায়ের দুখানি আখ্যায়িকা—বউঠাকুরানীর হাট এবং রাজর্ষি। বই-দুটিতে বঙ্কিমীরীতির প্রভাব অতিশয় স্পষ্ট। এখনো রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব পথটি খুঁজে পাননি, তাই, পূর্বসূরীর প্রদর্শিত পথেই পদক্ষেপ করেছেন। অবশ্য মনোরম গল্প বলার কৌশলটি লেখকের আয়ত্তে, আবহাওয়ার সৃষ্টিতে তিনি দক্ষ। কিন্তু বাস্তবের অভিজ্ঞতা এখনো স্বল্প বলে জীবনের প্রশস্ত ভূমিতে তাঁর স্বচ্ছন্দ পরিক্রমা সম্ভব হয়নি। এখানে কয়েকটি চরিত্রকে নিয়ে কবি যেন পুতুল-খেলা খেলেছেন। পাঠক আখ্যায়িকা-দুখানিতে রবীন্দ্রসাহিত্যসুলভ সূক্ষ্ম মননশীলতা ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দেখতে পাবেন না, আঙ্গিকগত কোন মৌলিকতাও তাঁদের চোখে পড়বে না। এদের মধ্যে কেবল লক্ষ্য করবেন, রবীন্দ্রের বিশিষ্ট জীবনবোধের কিঞ্চিৎ স্ফুরণ আর তাঁর গদ্যভঙ্গির সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত।

এর পর প্রায় ষোল সতেরো বছর-কাল রবীন্দ্রনাথ আখ্যায়িকা রচনায় হাত দেননি। এই কতিপয় বৎসর তাঁর প্রতিভা উৎসারিত হয়েছে অজস্র গানে-কবিতায়-ছোটগল্পে-প্রবন্ধে। তবে এরই মধ্যে কবি প্রচুর বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, জীবনরহস্যের গভীরে ডুব দিয়েছেন, মানুষের মনোলোকের অলিগলিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন—মানবচরিত্রে বৈচিত্র্য তাঁকে বিস্মিত করেছে। এই অভিজ্ঞতার সঞ্চয়কে উপন্যাসকার রবীন্দ্র কাজে লাগালেন বহুশ্রুত চোখের বালি-তে। এ যুগান্তকারী একখানি আখ্যায়িকা; এর মধ্য দিয়ে বাঙলা মতত্তত্ত্বমূলক সামাজিক উপন্যাসের গোড়াপত্তন হল। এখানে রবীন্দ্রনাথ পূর্বের সেই মনোজ্ঞ কাহিনীর জালবোনার ঝোঁক পরিহার করলেন, সমাজসমস্যাবিচারে প্রবৃত্ত হলেন; আখ্যায়িকায় দেখা দিল প্রখর ব্যাপক বিশ্লেষণমুখিতা, কাহিনী পেল কঠিন সজীব বাস্তব ভিত্তি।

এ বইতে যে-সমস্যা আলোচিত হয়েছে, বঙ্কিমের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এও তার অবতারণা দেখা যায়। 'চোখের বালি'-র বিনোদিনী 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর রোহিণীকে মনে পড়িয়ে দেয়। অথচ এ দুটি নারীর জীবনপরিণামের মধ্যে কত পার্থক্য। এরূপ হবার কারণ হল, বঙ্কিম সমাজের প্রচলিত নিয়মশৃঙ্খলাকে বিচলিত হতে দেননি, বালবিধবা রোহিণীর তীব্র জীবনপিপাসা ও প্রণয়বাসনাকে স্বীকৃতি জানানো বঙ্কিমের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ মানবমনবীর হৃদয়ধর্মকে অস্বীকার করতে পারেন নি, নারীর মানবাধিকার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে যথাসম্ভব প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন—জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নির্লিপ্ত শিল্পীর। বাস্তবের আলোকে—মনস্তত্ত্বের রঞ্জনরশ্মিপাতে—মানবের জীবনকে ও নরনারীর হৃদয়কে দেখেছিলেন বলে তাঁর চিত্রিতা বিনোদিনীকে বঙ্কিমের কল্পিতা রোহিণীর মতো শোচনীয় মৃত্যুবরণ করতে হয়নি। অবশ্য এ সত্যটিও মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথকেও সমাজের মুখের দিকে তাকাতে হয়েছে, ভালোবাসার পূর্ণঅধিকার নারীকে তিনিও দিতে পারেন নি। যাই হোক, 'চোখের বালি' লিখে রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যে নতুন হাওয়া বইয়ে দিলেন। এর জন্যে তিনি নিন্দাবাদও শুনেছেন প্রচুর।

পরবর্তী উপন্যাস হলেও, নৌকাডুবি পূর্ববর্তী 'চোখের বালি'-র তুলনায় দুর্বল রচনা। এতে কাহিনীবর্ণন, ঘটনাবিন্যাস, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের পরিচয় ফোটেনি এমন নয়, তথাপি আখ্যায়িকার পরিণতি কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকে। উপন্যাসকার এখানে সনাতনীদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজে লেখনীকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন বলে মনে হয়।

এর পর লেখা হয় গোরা। উনিশ-শ পাঁচ সালের স্বদেশী আন্দোলন গোটা দেশে যে-জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন ঘটিয়েছিল, সেই প্রাণচঞ্চল যুগের অত্যুজ্জ্বল ইতিহাস এই মহৎ উপন্যাসখানির বৃহৎ পশ্চাৎভূমি। 'গোরা'তে রূপ পেয়েছে রবীন্দ্রের উদারপ্রেমভিত্তিক বিশ্বমানবতার আদর্শ। স্বজাতির বন্ধনমুক্তির প্রয়াসকে রাজনীতিক চেতনাকে রবীন্দ্রনাথ সেদিন উৎসাহসহকারে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। কিন্তু স্বদেশী উন্মাদনার হিংসাত্মক প্রকাশকে, ইংরেজবিদ্বেষের রক্তাক্ত পথে মুক্তির সন্ধানকে কবি কোনোমতেই সমর্থন জানাতে পারেননি। জাতীয় আন্দোলন সর্বপ্রকার সংকীর্ণতামুক্ত হোক—হীনতা, কুশ্রীতা, কুটিল হিংসার ঊর্ধ্বে অবস্থান করুক, এ-ই ছিল কবির অভিপ্রেত। কোথায় আমাদের দুর্বলতা, অর্জনের পূর্বে কীভাবে আমরা নিজেদের অন্তরের বন্ধনদশা কাটিয়ে উঠতে পারি, দেশবাসীকে কবি তার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং এও বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার চেয়েও মানবপ্রেম এবং মনুষ্যত্বের সাধনা বড়ো। সেদিন কবি জাতীয়তার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, হিন্দুসমাজের অনুদারতাকে ভর্ৎসনা জানিয়েছেন—তাঁর এই মনোভাব 'গোরা'-র মধ্যে প্রকাশিত।

এ উপন্যাসে বিচারবিতর্ক অনেকখানি স্থান অধিকার করেছে, মতবাদ প্রবল হয়ে উঠেছে। অবশ্য মানবের চিরন্তন হৃদয়সত্যের সঙ্গে এসব বস্তুর যোগ রয়েছে বলে এ বই শুদ্ধ মতবাদপ্রচারের বাহন হয়ে ওঠেনি। আনন্দময়ী 'গোরা'-র অবিস্মরণীয় এক নারীচরিত্র। অনেক সমালোচকের মতে 'গোরা' রবীন্দ্রনাথের সর্বোত্তম উপন্যাস।

কবি-রবীন্দ্রের উপন্যাসের ধারা নিয়মিত নয়। দীর্ঘ ছয় বছরের ব্যবধানে—'সবুজপত্র'-এর আমলে [১৩১৬ সালে]—কবির দুখানি উপন্যাস বেরুল, নাম—'ঘরে-বাইরে' ও 'চতুরঙ্গ'। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র'-কে দেখে মনে হয়েছিল—'এল দুর্দম নবযৌবন ভাঙনের মহারথে'। পত্রিকাখানি কথা বলে নতুন সুরে, নতুন ভঙ্গিতে। রবীন্দ্রনাথ কাগজখানির সঙ্গে যুক্ত হলেন, এর পাতায় বিখ্যাত 'বলাকা'র কয়েকটি কবিতা লিখলেন, লিখলেন 'ফাল্গুনী' নাটক, আর, লিখলেন ঘরে-বাইরে যা বাঙ্‌লাদেশে জাগলো প্রচণ্ড ঝড়।

সেদিনকার দেশব্যাপী রাজনীতিক ঝোড়ো হাওয়ার উত্তপ্ত পটভূমিতেই 'ঘরে-বাইরে' রচিত। এই হাওয়ায় আমাদের ঘরের আনন্দের পর্দা উড়ে গেল, বাইরের সঙ্গে তার যোগের কোনো বাধা আর রইল না যেন। নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ এসেছিল স্বদেশী প্রচার করতে, বিমলা [নিখিলের স্ত্রী] ওই অনন্ত

বক্তৃতা শুনে অত্যন্ত অভিভূত হল, সন্দীপের প্রতি সে মাদকতাময় একটা আকর্ষণ অনুভব করল। সন্দীপও বন্ধুপত্নী বিমলাকে নিজের হৃদয়ানুরাগ জানাল। 'ঘরে-বাইরে' এই পারস্পরিক আকর্ষণের কাহিনী। একদিকে ভারতীয় জীবনাদর্শে দীক্ষিত শান্ত সংযত প্রকৃতির পুরুষ নিখিলেশ, অন্যদিকে, পাশ্চাত্য ভোগবাদী আদর্শে উদ্দীপ্ত সন্দীপ, মাঝখানে মোহগ্রস্ত বিমলা। দুই বিপরীতমুখী জীবনাদর্শ বিমলাকে বিমূঢ় বিভ্রান্ত করেছে। যে-প্রশান্ত জীবনচর্যা রবীন্দ্রনাথের গ্রহণীয় তাকে তিনি ফুটিয়েছেন নিখিলেশ-চরিত্রে, বিরুদ্ধধর্মী ভোগসর্বস্ব জীবনবাদের রূপায়ণ দেখি সন্দীপের মধ্যে। শেষপর্যন্ত বিমলা স্বামী নিখিলেশের কাছে ফিরে এসেছে, কিন্তু বিমলার সত্যকার ভালোবাসা নিখিলেশ পেল কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর উপন্যাসে অনুচ্চারিত রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের যুগের আলোর দিক ও অন্ধকারের দিক উভয়ই দেখেছিলেন। উপন্যাসহিসেবে 'ঘরে-বাইরে' সত্যই অসাধারণ।

'চতুরঙ্গ' আখ্যায়িকাখানিতেও দুই ভিন্নমুখী জীবনবোধের সংঘাত রূপায়িত। একদিকে ভক্তিমার্গের পথিক শচীশ—কামনা ও কামিনী তার কাছে পরিত্যাজ্য, অন্যদিকে, জীবনের সহজ স্বাভাবিক আশাআকাঙ্ক্ষায় আন্দোলিত দামিনী। দামিনী নারী, সে পুরুষের আশ্রয় চায়, তার প্রবল জীবনানুরাগ। কিন্তু শচীশ যে-পথে অগ্রসরমান সেই পথ দামিনীর নয়। তাই, সে ঝুঁকল যথার্থ জীবনবোধসম্পন্ন পুরুষ শ্রীবিলাসের দিকে। এখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সুস্পষ্ট। বাস্তবসম্পর্কশূন্য জীবনতত্ত্ব মানবিক সত্যের বিরোধী, হৃদয়ধর্মকে উপেক্ষা করলে জীবন রিক্ত হয়ে যায়, কেবল বিড়ম্বনাই সৃষ্টি করতে থাকে। 'চতুরঙ্গ'তে উপন্যাসকারের অন্তর্দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম, মনস্তত্ত্বের বর্ণাঢ্য ঘাতপ্রতিঘাতে এই আখ্যায়িকার ঘটনা ও চরিত্র অবলীলায় অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু যথার্থ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস এ নয়, পূর্ণায়ত হলে 'চতুরঙ্গ' রবীন্দ্রনাথের অতি-উৎকৃষ্ট উপন্যাসের গৌরব পেত।

পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস যোগাযোগ-এ নারীর অধিকারের প্রশ্নটিই উত্থাপিত হয়েছে। স্বামীস্ত্রী মানসপ্রকৃতিতে যদি একরূপ না হয়, রুচিতে, শীলে, উভয়ের মধ্যে যদি বড়োরকমের পার্থক্য দেখা দেয় তাহলে দাম্পত্যজীবনে কী সাংঘা[illegible] বাধে, তা আমরা দেখতে পাই বর্তমান আখ্যায়িকাখানিতে। মধুসূদন জোরা গায়ের জোরে স্ত্রী কুমুদিনীকে নিজ অধিকারে আনতে চেয়েছে, কিন্তু কুমুদিনীর স্বাধিকারবোধ প্রবল ধাক্কায় বারংবার তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। মন জয় করে নিয়েই নারীকে পেতে হয় এ বোধ মধুসূদনের ছিল না; তাই, স্ত্রী হয়েও কুমুদিনী তার নাগালের বাইরে থেকে গেছে। পরিশেষে দেখা গেল, যে-স্বামীকে কুমু এতকাল মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি, তার কাছেই সেদিন সে নতিস্বীকার করল যেদিন তার নারীত্বের অধিকারবোধের সঙ্গে যুক্ত হল নিজের আসন্ন মাতৃত্বচেতনা। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

শেষের কবিতা রচিত হয় 'যোগাযোগ'-এর সমকালে। অথচ আঙ্গিক

ভাষারীতি, বিষয়বস্তু, জীবনভাবনা—সর্বক্ষেত্রেই উভয়ের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য। এ এক নতুন ধরনের রোমান্স, বাঙ্‌লা সাহিত্যে এজাতের আখ্যায়িকা এর আগে কখনো লেখা হয়নি, রবীন্দ্রসাহিত্যেও আর দ্বিতীয়টি নেই।

এখানে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে ছিল 'স্যাটায়ার' রচনা করা। সেকালের তরুণ লেখকেরা যৌবনের আস্ফালন করছিল, 'বুড়ো' রবীন্দ্রকে তারা বলেছিল 'সেকেলে' এতে কবি কৌতুকবোধ করেছিলেন, ওঁদের যৌবনের আস্ফালনকে স্তব্ধীভূত করে দেবার জন্যেই লিখলেন 'শেষের কবিতা'। যেন বলতে চাইলেন, ওহে, তোমরা যৌবনের মর্ম কী জান—এই দেখ আসল যৌবনের চেহারা। যে নব্যতন্ত্রীরা রবিঠাকুরকে 'out of date' বলে আগ্রহ করতে চায় তাদেরই চোখ ফোটাবার জন্যে কবি হাতে লেখনী তুলে নিয়েছিলেন।

কিন্তু শেষপর্যন্ত বিদ্রূপের সুর কবির যৌবনের প্রতি মমতায় সিক্ত হল, লেখক নিজেই রোমান্সের মদিরায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েলেন—অমিতরা ও লাবণ্যরা সবলে তাঁর সহানুভূতি কেড়ে নিল। ফলে অপূর্বসুন্দর একটি প্রেমকাহিনী লেখা হয়ে গেল। এই প্রেমের জগৎটি বাস্তবসম্পর্কবিরহিত, নায়কনায়িকারা সকলেই যেন মায়াজড়ানো এক অপরূপ রূপকথার সংসারের অধিবাসী। তাদের হাস্যে-লাস্যে, বন্ধনভারমুক্ত প্রাণের গানে 'শেষের কবিতা' মুখর হয়ে উঠেছে। এই যৌবনের কাব্যখানিতে লিরিকের অজস্র কলধ্বনি শোনা যায়, মুহুর্মুহু শাণিত কথার উল্কাবৃষ্টি হয়। বাঙ্‌লা গদ্যের আশ্চর্য প্রকাশশক্তি, গতি ও দীপ্তি যদি কেউ দেখতে চান তাহলে তাঁকে আমরা 'শেষের কবিতা' বইখানি পড়তে অনুরোধ করব।

কবির পরিণত বার্ধক্যে প্রকাশিত তিনখানি আখ্যায়িকার নাম-'দুইবোন', 'মালঞ্চ' এবং 'চার অধ্যায়'। এগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র, উপন্যাসের ব্যাপ্তি এদের নেই।

প্রথমোক্ত দুখানি বইকে যুগ্ম-আখ্যায়িকা বলা যেতে পারে। এরা প্রেম-জীবনের মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী। দুটি আখ্যায়িকাতেই দেখি, স্ত্রীর জীবৎকালে স্বামী অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হয়েছে, ফলে এতকালের দাম্পত্যজীবনে ফাটল ধরেছে। দুইবোন-এর অসুস্থ শর্মিলা স্বামীর সুখকেই নিজের সুখ জেনে নতুন আবির্ভূতা রমণীর হাতে আপন স্বামীকে তুলে দিতে বেদনাবোধ করেনি। কিন্তু মালঞ্চ-এর অসুস্থ নীরজার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। সে জানে, তার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, আর, স্বামীর মনটিকে ধরে রাখাও তার পক্ষে সম্ভব নয়; তথাপি মৃত্যুর প্রাক্‌কালে তার মুখে শুনি—'পারলুম না, পারলুম না—দিতে পারব না, পারব না।' নীরজার আচরণই স্বাভাবিক, মেয়েরা প্রাণ থাকতে স্বামীকে অন্যকোনো নারীর হাতে সঁপে দিতে পারে না। শর্মিলার আচরণ অস্বাভাবিক, কারণ, সে জীবনসত্যের বিরোধিতা করেছে।

ভারতের রাজনীতিক আন্দোলন চার অধ্যায়-এর পটভূমি। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের দিকে বাঙ্‌লাদেশে সন্ত্রাসবাদ চূড়ান্ত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

দেশের বহু তরুণতরুণী এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। বিদেশি-শাসকের কবল থেকে মাতৃভূমির উদ্ধারসাধনকল্পে এদের অকুণ্ঠ আত্মবলি দেশপ্রাণতার পরিচয়বাহী সন্দেহ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এভাবে আত্মবিসর্জনকে সমর্থন জানাতে পারেননি, তাঁর মতে, এ হল প্রাণশক্তির অপচয়; কয়েকজন ইংরেজ মেরে দেশোদ্ধারের মতো কঠিন কাজ কখনো সম্পাদিত হতে পারে না—এ হল কবির বিশ্বাস। দেশের যুবকদল সংগঠনকার্যে ব্রতী হোক, হিংসার পথ তারা বর্জন করুক, কবি বারবার একথা বলেছেন। মানবসত্যকে হিংসাবিদ্বেষের ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি। সন্ত্রাসবাদের বহ্নিশিখার মধ্যে মেয়েদের টেনে-নিয়ে-আসাটাকেও কবির ভালো লাগেনি। বিপ্লবীদলে অনেক যুবক যোগ দিয়েছে—কেউ দেশের টানে, কেউ নারীর আকর্ষণে। তাই, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে। স্বভাবের বিরোধিতা করলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়—'চার অধ্যায়'-এর এলা ও অতীনের চরিত্র কবির এই বক্তব্যটির দিকে ইঙ্গিত করছে যেন।

উপন্যাসকার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মোটামুটি এই কথাগুলি বলা চলে :

বঙ্কিমের উত্তরাধিকারকে পাথেয় করে উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি নিজের পথটি বেছে নেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে তিনি দীপ্ত স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিক রোম্যান্সের ভূমিতে কবির বিচরণ স্বচ্ছন্দ নয়, ঘটনার মধ্যে তিনি যেন অস্বস্তি বোধ করেন। মানবের মনোলোকের রহস্য-উন্মোচনেই কবির সমধিক আনন্দ। মনস্তত্ত্বমূলক, বাস্তবপ্রধান সামাজিক উপন্যাসে তাঁর হাত খোলে বেশি। প্রধানত রাজাবাদশা আর অভিজাতসমাজের মানুষ নিয়ে বঙ্কিমের কারবার, তাঁর আখ্যায়িকায় অতিলৌকিকের স্পর্শ রয়েছে; পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথের আখ্যায়িকাগুলির উপকরণ জুটিয়েছে বাঙলার মধ্যবিত্তসমাজ, অবশ্য এরা সমাজসৌধের উঁচুতলার বাসিন্দা। রবীন্দ্রের উপন্যাসেও রোম্যান্স রয়েছে, কিন্তু তা বাইরের ঘটনার ওপর নির্ভরশীল নয়, তার আশ্রয় নিবিড় আত্মীয়তাবন্ধনে আবদ্ধ মানুষ ও প্রকৃতি, এবং মানবমানবীর রহস্যময় হৃদয়-লোক। যুক্তিনিষ্ঠ, মননপ্রধান বিশ্লেষাত্মক উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রের বড়ো একটি দান। একালের ঔপন্যাসিকেরা, বলতে গেলে, রবীন্দ্রপ্রদর্শিত পথেই চলাফেরা করেছেন।

এখানে স্মর্তব্য, রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি; তাই তাঁর নির্মিত উপন্যাসগুলিতে কবিমানুষটির প্রতিফলন সুপ্রকট। কবির লেখা আখ্যায়িকায় কাব্যসৌন্দর্য পাঠকের অতিরিক্ত একটি লাভ। তা ছাড়া, বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের ভাবমন্ত্র শরৎচন্দ্রকে প্রাণিত করেছে, রবীন্দ্রকৃত কয়েকখানি উপন্যাস শরৎসাহিত্যের অগ্রদূত।

বাঙ্‌লা ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

বাঙ্‌লা ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

॥ বাঙ্‌লা সাধুভাষা ও চলিত ভাষার রূপ ॥

বাঙ্‌লা ভাষার অবস্থা আজ বেশ বাড়বাড়ন্ত, বাঙ্‌লা সাহিত্য বর্তমান কালে বিশ্বের সাহিত্যদরবারে তাহার আসনটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রায় এক সহস্র বৎসর হইল বাঙ্‌লা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্‌লা গদ্যের উদ্ভব হয় ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে। ইহার পূর্বে বাঙ্‌লা গদ্যের প্রচলন যে ছিল না তাহা নয়। কিন্তু তাহার অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ ছিল দলিলদস্তাবেজে, চিঠিপত্রে, ব্যবহারিক জীবনের ভাববিনিময়-ক্ষেত্রে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমগ্র বাঙ্‌লা সাহিত্য রচিত হইয়াছে পদ্যের ভাষায়। বাঙ্‌লা গদ্যের আয়ুষ্কাল দেড়শত বছরের বেশি নয়। চারপাঁচশত বৎসর পূর্বে বাঙ্‌লা গদ্যের রূপ কী রকম ছিল, তদানীন্তন কাব্যের ভাষা হইতে তাহার মোটামুটি একটি ধারণা করা যায়।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি উন্নত ভাষারই বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষার সাহিত্যিক রূপ এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সামাজিক মানুষের কথোপকথনের রূপের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য বিদ্যমান। সাহিত্যিক ও মৌখিক-ভেদে বাঙ্‌লা ভাষারও রূপ বিচিত্র। যে-ভাষায় কথাবার্তা বলা হয় তাহার নাম মৌখিক বা কথ্যভাষা। ইহার অপর একটি নাম চলিত ভাষা। আর, যে-ভাষায় সাধারণত গদ্যসাহিত্য লিখিত হইয়া থাকে তাহা সাহিত্যিক ভাষা বা লৈখিক ভাষা—ইহা সাধুভাষা-নামেই সকলের কাছে পরিচিত।

বাঙ্‌লাদেশের অঞ্চলভেদে মৌখিক ও কথ্যভাষার রূপ বিভিন্ন। ইহাদের মধ্যে ভাষার প্রকৃতিগত ঐক্য থাকিলেও শব্দের রূপগত পার্থক্য ও ধ্বনিগত বৈষম্য কম নয়। বাঙ্‌লার দুইটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের [যেমন, একদিকে চট্টগ্রাম ও অন্যদিকে বাঁকুড়া-বীরভূম] অধিবাসীগণের কথাবার্তা তুলনা করিলেই এই বৈষম্য যে কতখানি তাহা সহজেই অনুভূত হইবে। লৈখিক ভাষার আকৃতি ও প্রকৃতি সর্বজনবোধ্য—বাঙ্‌লা ভাষার মৌলিক সার্বজনীন রূপটিই লৈখিক বা সাধুভাষার ভিত্তি। কিন্তু অঞ্চলবিশেষে প্রচলিত ভাষাগুলির—যে-ভাষাকে উপভাষা [dialect] বলা হয়—রূপ ভিন্নতর বলিয়া উহা সমগ্র বাঙালি জনসাধারণের সহজবোধ্য নয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বাঙ্‌লা সাহিত্যিক বা সাধুভাষার পাশাপাশি নানা অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষা ও উপভাষা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু এই মধ্যে কলিকাতা-অঞ্চলের—ভাগীরথীনদীর তীরবর্তী স্থানের ভদ্রসমাজে মৌখিক ভাষাই সমগ্র বঙ্গদেশের শিক্ষিত জনগণ কর্তৃক পারস্পরিক ভাববিনিময়ের

ও কথোপকথনের প্রধান বাহনরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালি এই ভাষাটির মাধ্যমে পরস্পরের সহিত কথাবার্তা বলিবার চেষ্টা করেন। এই বিশেষ মৌখিক ভাষাকেই বলা হয় চলিত ভাষা। বাঙ্‌লা সাধুভাষাকে ইংরেজিতে আমরা বলি 'Standard Literary Bengali', আর, এই চলিত ভাষাটিকে বলি 'Standard Colloquial Bengali'।

কলিকাতা-অঞ্চলের মৌখিক ভাষাটি, যাহাকে আমরা বিশেষভাবে 'চলিত ভাষা' নামে চিহ্নিত করিয়াছি, বর্তমান সময়ে বাঙ্‌লা গদ্যসাহিত্যে সাধুভাষার পার্শ্বেই নিজের একটি বিশিষ্ট স্থান করিয়া লইয়াছে। শুধু তাহা নয়, অধুনা ইহা গদ্যসাহিত্যে বাঙ্‌লা সাধুভাষার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের বহু খ্যাতনামা লেখক এই ভাষাতেই সাহিত্য নির্মাণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। "অতএব, আজকালকার সাহিত্যে ব্যবহৃত বাঙ্‌লা ভাষার দুইটি রূপ : [এক] সাধুভাষা—Standard Literary, এবং [দুই] চলিত ভাষা—Standard Colloquial। আধুনিক বাঙ্‌লার মুদ্রিত পুস্তকপত্রিকাদি, গদ্য ও পদ্য, পড়িয়া বুঝিতে হইলে এই দুইপ্রকার ভাষা সম্বন্ধেই জ্ঞান থাকা আবশ্যক।" সাধুভাষার যেমন নানা বিশিষ্ট নিয়মরীতি রহিয়াছে, তেমনি চলিত ভাষারও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ও নিয়ম আছে।

কতকগুলি কারণে কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলনিবদ্ধ মৌখিক ভাষা [অর্থাৎ উপভাষা বা dialect] সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হয়। 'বাঙ্‌লাদেশের রাজধানী কলিকাতা সমগ্র বাঙালিজাতির প্রধান শিক্ষাক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্র হওয়ায়, এবং সাহিত্যিক, রাজনীতিক প্রভৃতি সকল বিষয়ের কেন্দ্র হওয়ায়, কলিকাতা-অঞ্চলে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা গত দেড়শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া বাঙ্‌লাদেশের সকল শ্রেণীর অধিবাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। এতদ্ভিন্ন বিগত তিনচারিশত বৎসর ধরিয়া ভাগীরথীনদীর তীরে অবস্থিত নবদ্বীপও বাঙ্‌লার আধ্যাত্মিক ও আধিমানসিক জীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়া আসিয়াছে। সাহিত্যবিষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই পশ্চিম-বঙ্গের এই অঞ্চলের একটা প্রাধান্য সমগ্র বঙ্গদেশে স্বীকৃত। কলিকাতার মৌখিক ভাষা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সমস্ত বিষয়ে এই প্রাধান্যের অধিকারী।' ঠিক এইভাবেই পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা সাহিত্যের ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাঙ্‌লা সাধুভাষা প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন কথিত ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও অপরাপর প্রাদেশিক ভাষার [অর্থাৎ উপভাষার] প্রভাবেও ইহা প্রভাবিত।

সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে যে-পার্থক্য সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তাহা প্রধানত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপঘটিত। আধুনিক সাধুভাষায় যে-সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় তাহা চলিত ভাষায় প্রযুক্ত রূপসমূহ হইতে পূর্ণতর অর্থাৎ চলিত ভাষায় ঐগুলি কতক পরিমাণে সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। যেমন, সাধুভাষায় আমরা ব্যবহার করি—আসিতেছি, শুনিতেছি, করিলাম, চলিলাম ; চলিত ভাষায় এইগুলি

কিছুটা সংকুচিত হইয়া—আসছি, শুনছি, করলাম, চললাম—ইত্যাদি রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সর্বনামের ক্ষেত্রে সাধুভাষায় ব্যবহৃত হয় 'তাহারা', 'ইহাকে', 'ইতাতে' প্রভৃতি পদ, চলিত ভাষায় ইহাদের রূপ হইল 'তারা', 'একে', 'এতে', ইত্যাদি। আবার, ইহাও লক্ষণীয় যে, বর্তমানে সাধুভাষার উপর চলিত ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের প্রভাব লক্ষিত হইতেছে; যেমন, 'হরি তো রামকে চেনে না, সে-ও একটা কথা বটে।' বিশুদ্ধ সাধুভাষায় 'চেনে না' ও 'সে-ও' পদের পরিবর্তে 'চিনে না', 'তাহা-ও' প্রযুক্ত হওয়া উচিত। সাধুভাষা অপেক্ষা চলিত ভাষাতেই স্বরসংগতি ও অভিশ্রুতিজনিত স্বরধ্বনির পরিবর্তন বেশি দেখা যায়। তৎসম শব্দের প্রয়োগ সাধুভাষায় যত অধিক, চলিত ভাষায় তত নয়। চলিত ও সাধু উভয় ভাষাতেই বিদেশি শব্দের ব্যবহার আছে। তবে চলিত ভাষায় ইহার প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অধিক। সাধুভাষাকে কিছুটা কৃত্রিম মনে হইলেও ইহার সুষমামণ্ডিত গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য অবশ্যস্বীকার্য। চলিত ভাষা অপেক্ষাকৃত জীবন্ত, ইহার গতি লঘু এবং প্রতিদিনের মৌখিক ভাষার সঙ্গে ইহার যোগাযোগ নিবিড়। উভয়েই নিজ নিজ বিশেষ নিয়ম মানিয়া চলে, সুতরাং রচনায় এই দুই ভাষার মিশ্রণ সর্বৈব বর্জনীয়। নিম্নে সাধুভাষা ও চলিত ভাষার দুইটি নমুনা উদ্ধার করিতেছি :

সাধুভাষা : 'সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারিদিকে যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহু-যোজনবিস্তৃত পীতাম্বরী শাটী। তাহার উপর মাতার অলংকারস্বরূপ তালবৃক্ষশ্রেণী—সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ—সরল, সুপত্র, শোভাময়। মধ্যে নীলসলীলা বিরূপা, নীল-পীত-পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্রমধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে। চারিপাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্তি।'

চলিত ভাষা : আমি একবার একটা ছাপার কল অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। যন্ত্রটা একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষের কাজ একা করছে, মানুষের চেয়ে সুচারু ও দ্রুতভাবে। এতে করে ভারি একটা আনন্দ হল। কিন্তু একটি পাখীকে উড়তে দেখে যে আনন্দ, তার সঙ্গে সেদিনের আনন্দের তফাৎ ছিল। পাখীর ডানায় মধ্যে নানা কলবল কী ভাবে কাজ করছে তাঁর খোঁজই নেই, ওড়ার সুন্দর ছন্দই সেখানে দেখা দিয়ে মনকে উড়িয়ে নিয়ে গেল কোন্ দেশে, তার ঠিক নেই।'

প্রথম পর্ব

প্রথম অধ্যায়

॥ বর্ণ ও ধ্বনি-প্রকরণ ॥

[ক] ভাষায় নিরর্থক শব্দের প্রয়োগ হয় না। যে-সকল শব্দের প্রয়োগ হয় তাহার প্রত্যেকটির অর্থ আছে। আর, মানুষ যে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান করে তাহা এই শব্দসমূহের উচ্চারণের মাধ্যমে।

যখনই কোন শব্দ উচ্চারিত হয় তখন উহার ধ্বনিরূপ আমরা দেখিতে পাই। কোনো শব্দে একটি ধ্বনি, আবার, কোনো শব্দে একাধিক ধ্বনির সমাবেশ থাকে। 'রাম' শব্দে র্ + আ + ম্ + অ—এই চারিটি ধ্বনি বিদ্যমান। অতএব ধ্বনি বলিতে বুঝায় শব্দের অংশ। আবার, যদি বলি 'সরোবরে' তবে উহাকে বিশ্লেষণ করিলে (স্ + অ + র্ + ও + ব্ + অ + র্ + এ)—এই আটটি ধ্বনি পাওয়া যায়। 'চন্দ্রচূড়-জটাজালে' (মাইকেল)—ইহার মধ্যে 'চন্দ্রচূড়' শব্দে (চ্ + অ + ন্ + দ্ + র্ + অ + চ্ + উ + ড্ + অ) নয়টি ধ্বনি আর 'জটাজালে' শব্দে (জ্ + অ + ট্ + আ + জ্ + আ + ল্ + এ) আটটি ধ্বনি রহিয়াছে। অতএব ধ্বনির সংজ্ঞা হইতেছে:

ভাষায় উচ্চারিত শব্দকে বিশ্লেষ করিলে যে-ক্ষুদ্রতম অংশ পাওয়া যায়, তাহাকে **ধ্বনি** বলে।

[খ] এই ধ্বনিকে আমরা প্রকাশ করি কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে। অতএব যে-সকল সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে ধ্বনিকে প্রকাশ করা হয় তাহাকে বলে **বর্ণ** (letter)। অথবা যে-চিহ্নগুলি ধ্বনিনির্দেশক তাহাদিগকে বলে বর্ণ। অ, আ, ক, খ প্রভৃতির উচ্চারণে যে-সকল ধ্বনি শুনা যায় উহাদের প্রতীক হইতেছে অ, আ, ক, খ প্রভৃতি বর্ণগুলি। বৈয়াকরণদের মতে 'বর্ণাৎ কারঃ'—বর্ণ বুঝাইতে 'কার' প্রত্যয়ের যোগ হয়। যেমন, অ-কার ক-কার প্রভৃতি। এই 'অ'-কার হইতে 'হ'-কার পর্যন্ত বর্ণসমূহকে বলে **বর্ণমালা** (alphabet)। উহার অপর নাম 'লিপি'। যেমন, রাজা অশোকের সময়ের 'ব্রাহ্মী লিপি'।

[১] বর্ণের শ্রেণীবিভাগ

সমস্ত বর্ণমালা স্বর ও ব্যঞ্জনভেদে প্রধানত দুইপ্রকার।

যে-ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়াই পূর্ণভাবে উচ্চারিত হইতে পারে তাহাকে বলে **স্বরধ্বনি**। স্বরধ্বনির প্রতীক বা চিহ্নকে বলে 'স্বরবর্ণ' অর্থাৎ নিজেই যে শোভা পায়। বর্ণকে আবার 'অক্ষর'ও বলা হইয়া থাকে।

(যে-ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া পূর্ণভাবে উচ্চারিত হইতে পারে না তাহাকে বলে ব্যঞ্জন ধ্বনি।) এই ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীক বা চিহ্নকে বলে ব্যঞ্জনবর্ণ। নিম্নে বাঙ্‌লা বর্ণমালা দেওয়া হইল।

স্বরবর্ণ—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ (ৠ) ঌ এ ঐ ও ঔ।

ব্যঞ্জনবর্ণ—ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব। শ ষ স হ। ড় ঢ় য়। ং ঃ।

শুদ্ধ ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ স্পষ্ট হয় না বলিয়া উহাদের সঙ্গে স্বরবর্ণ যুক্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। অকার-যুক্ত হইয়াই সকল ব্যঞ্জন উচ্চারিত হয়। উপরের রূপগুলি অকার-যুক্ত রূপ। শুধু ব্যঞ্জনবর্ণের রূপ হইল—ক্ খ্ গ্ ঘ্ ইত্যাদি।

[দ্রঃ—অ, আ প্রভৃতি স্বরধ্বনি যখন উচ্চারণ করা হয় তখন উচ্চারণের সময় নিশ্বাসবায়ু মুখের মধ্যে কোনো বাধা পায় না। আর, ব্যঞ্জনধ্বনি যখন উচ্চারণ করা হয় তখন উহাদের উচ্চারণের সময়ে শ্বাসবায়ু পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে প্রথমে বাধা পায়, পরে উহা আত্মপ্রকাশ করে। ইহাই হইল স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির পার্থক্য।]

[২] অক্ষর

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, বর্ণের আর-একটি নাম অক্ষর। অ, ক প্রভৃতিকে যেমন অক্ষর বলে, কোনো শব্দের উচ্চারণকালে উহার যে পরিমাণ অংশ একসঙ্গে উচ্চারিত হয় সেই পরিমাণ অংশকেও বলে অক্ষর (Syllable)। যদি বলি 'আকাশ' তবে উহাতে দুইটি অক্ষর আছে—আ-কাশ। এইরূপ যদি বলি 'উচ্চারণ' তবে উহাতে তিনটি অক্ষর বিদ্যমান—উচ্‌-চা-রণ। বাঙ্‌লাভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির সহিত যুক্ত না হইয়াও একটি স্বরধ্বনি একটি 'অক্ষর'রূপে পরিলক্ষিত হয়। যেমন—'এসব বৃত্তান্ত যত পড়ুয়ার গণে' (বৃন্দাবনদাস)—এখানে 'এ'-একটি একাক্ষর।

[৩] স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর

অক্ষর দুইভাগে বিভক্ত—স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত। যে-অক্ষরের শেষে স্বরবর্ণ উচ্চারিত হয় তাহাকে স্বরান্ত অক্ষর বলে ; যথা—

'কহিতে অন্তরে আশা মুখে নাহি ফুটে ভাষা'

যে অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে তাহাকে বলে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর ; যথা—

'শীতল শরীর দেখি মলয় পবন'

(শীতল্। শরীর্। পবন্)

আর, পূর্বোক্ত 'আশা' ও 'ভাষা' শব্দের অন্তে আ-কার উচ্চারিত হয়

বাঙ্‌লা অন্ত্য অকারের উচ্চারণ

এই অন্ত্য অকারও দুইরূপে উচ্চারিত হয়, (ক) ধ্বনিহীন বা হসন্তরূপে এবং (খ) ও-ধ্বনিরূপে। প্রথমটিকে অনুচ্চারিত অ এবং শেষেরটিকে উচ্চারিত অ বলে।

(ক) অনুচ্চারিত অকার (সেই অকারযুক্ত ব্যঞ্জনটি হসন্ত লইয়া উচ্চারিত হয়)—কাজ, হাত, মন, বোধ, জয়, বিজয়, ইত্যাদি।

বাঙ্‌লায় অন্ত্য অকার প্রায়শ অনুচ্চারিত থাকে। তবে ইহার ব্যতিক্রমও প্রচুর আছে।

(খ) উচ্চারিত অন্ত্য অকারের সর্বত্র ও-ধ্বনি হয়।

(১) অন্ত্য অকারে সংযুক্তব্যঞ্জন থাকিলে ঐ অকার উচ্চারিত ও-ধ্বনি হয়। কর্ম (কর্মো), হস্ত (হস্তো), দন্ত, দণ্ড, কাষ্ঠ, ভিন্ন, স্তম্ভ, ইত্যাদি। অনুস্বার-পূর্বক বা বিসর্গ-পূর্বক এক ব্যঞ্জনকে যুক্তব্যঞ্জন বলিয়া ধরা হয় এবং উচ্চারণ করা হয়। এইজন্ত এইগুলির অকারও উচ্চারিত হয়। যেমন—অহিংস, বিংশ, দুঃখ, ইত্যাদি।

(২) অন্ত্য অকার হ-যুক্ত বা ঢ়-যুক্ত হইলে অকার উচ্চারিত হয়। যেমন—স্নেহ, দেহ, গুহ, দ্রোহ, মূঢ়, গাঢ়, দৃঢ়, ইত্যাদি।

(৩) অনুজ্ঞা মধ্যমপুরুষের ('তুমি'র) ক্রিয়াপদের এবং ইব, ইল, ইত, বিভক্ত্যন্ত ক্রিয়াপদের অন্ত্য অকার উচ্চারিত হয়। বল (বলো), দেখ (দেখো), কর (করো), করিব, দেখিল, ভাবিল, ইত্যাদি।

(৪) ণিজন্ত ক্রিয়ার ভাববাচ্য কৃদন্ত পদের ন-যুক্ত অকার উচ্চারিত হয়। খাওয়ান (খাওয়ানো), দেখান (দেখানো), পড়ান (পড়ানো), ইত্যাদি।

(৫) তর, তম বা ক্ত (ত) প্রত্যয়ান্ত পদের অন্ত্য অকার উচ্চারিত হয়। উচ্চারিত, লঘুতম, হত, বিস্তৃত, পীত, হৃত, পূত, ইত্যাদি।

(৬) দ্বিরুক্ত শব্দ বা সহচর-যুক্ত শব্দের অন্ত্য অকার প্রায়শ উচ্চারিত হয়। পড়-পড, কাঁদ-কাঁদ, জড-সড়, ইত্যাদি। কিন্তু হন্‌-হন্‌, কম্‌-সম্‌, ইত্যাদি ক্ষেত্রে হয় না।

(৭) পূর্ববর্ণ ঐ, ঔ বা ঋকারযুক্ত হইলে অন্ত্য অকার উচ্চারিত হয়। শৈব, তৈল, ভৌম, পৌর, কৃশ, বৃষ, ইত্যাদি।

(৮) কয়েকটি সর্বনামজাত ও অন্যান্য বিশেষণ শব্দের অন্ত্য অকার উচ্চারিত হয়। যেমন—কাল, ভাল, খাট, বড়, ছোট, যত, তত, অত, যেন, হেন, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, কাল (কল্য), ভাল (কপাল), খাট (চৌকি), ইত্যাদিতে আবার অনুচ্চারিত। এইগুলি অ-তৎসম শব্দ।

(৯) সংখ্যাবাচক কয়েকটি শব্দের অন্ত্য অকার উচ্চারিত হয়—এগার, বার, তের, চৌদ্দ, পনের, যোল, সতের, আঠার, (এই আটটি শব্দ)।

(১০) সমাসবদ্ধ শব্দের প্রথম শব্দের অন্ত্য অকার উচ্চারিত হয়। জনগণ, গণতন্ত্র, পদতল, তলদেশ, দেশসেবী, ইত্যাদি।

(গ) বাঙ্‌লা অকারের আর-একটি উচ্চারণ আছে, তাহাকে দীর্ঘ উচ্চারণ

কহে। দুইটি অকারযুক্ত বর্ণ পর পর থাকিলে এবং অন্ত্য অকার উচ্চারিত না হইলে পূর্বেরটি দীর্ঘ হয়। যেমন—জ-ল, ত-য়, ব-ল ; তুচ্ছার্থে অনুজ্ঞা মধ্যমপুরুষের ক্রিয়াতে —কর্, চল্, ধর্, সর্, ইত্যাদি। দ্বিস্বর শব্দের দ্বিতীয় স্বর (অকার) অনুচ্চারিত হইলেই এইরূপ হয়। এইপ্রকার ঝোঁক বাঙ্‌লাভাষার একটি বৈশিষ্ট্য, প্রায় সর্বত্রই এই ঝোঁক দেখা যায়।

আ-কারের উচ্চারণ ঃ বাঙ্‌লা আকারের উচ্চারণ দুই প্রকার—দীর্ঘ ও হ্রস্ব। দীর্ঘ উচ্চারণ ইংরেজি large-এর 'a'-এর মতো। অকারান্ত দ্বিস্বর (দ্ব্যক্ষর) শব্দের অন্ত্য অ অনুচ্চারিত হইলে তৎপূর্বস্থিত আকার দীর্ঘ হইয়া উচ্চারিত হয়। বাজ, হাত, শাঁখ, গান ইত্যাদি।

আকারের হ্রস্ব উচ্চারণই বাঙ্‌লায় সমধিক। রাজা, মানা, হারা, রামা ইত্যাদি।

ই-কার ও ঈ-কার ঃ সংস্কৃতে এই দুইটির প্রথমটি হ্রস্ব, শেষেরটি দীর্ঘ। কিন্তু বাঙ্‌লা ইকারের উচ্চারণ হ্রস্বদীর্ঘ দুই-ই হয়। দিন, ভিন (ভিন্ন হইতে), শিব, দিক্, তিন, বিশ, পঁচিশ, ইত্যাদি স্থলে উচ্চারণ দীর্ঘ। দিনক্ষণ, দিনরাত, ইত্যাদি স্থলে উচ্চারণ হ্রস্ব। দীর্ঘ ঈকারের উচ্চারণও অনুচ্চারিত অন্ত্য অকারের পূর্বে দীর্ঘ, অন্যত্র প্রায়ই হ্রস্ব। বস্তুত, ঈকারের মূল্য বাঙ্‌লাভাষায় ইকার হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে। তবে 'কি' এই পদটি অব্যয় হইলে উচ্চারণ হ্রস্ব হয়, এবং সর্বনাম বা বিশেষণ হইলে উচ্চারণ দীর্ঘ হয়। যেমন—

তুমি কি পড়িয়াছ (প্রশ্নার্থক অব্যয়) ?
তুমি কী পড়িয়াছ (সর্বনাম) ?

উ-কার ও ঊ-কার ঃ বাঙ্‌লায় ই-ঈকারের মতোই এই দুইটি স্বরের উচ্চারণে প্রভেদ প্রায় নাই বলিলেই চলে। অন্ত্য অকার অনুচ্চারিত হইলে, অন্যান্য স্বরের ন্যায় উকার বা ঊকারও দীর্ঘ হইয়া উচ্চারিত হয়। রূপ, কুঁজ, ফুল, কুল,— এইগুলির উচ্চারণ দীর্ঘ। রূপো, কুঁজো, কুলীন, ভূপেন্দ্র—এইগুলির উচ্চারণ হ্রস্ব।

ঋ-কার ঃ এই স্বরটির বাঙ্‌লায় উচ্চারণমূল্য রি, রী, এই দুইটির মতো। পূর্ববৎ (ই-উ-বৎ) হ্রস্বদীর্ঘ বিবেচনা করিতে হইবে। কৃত (ক্রিতো), মৃত (ম্রিতো), হ্রস্ব। ঋণ (রীন্) দীর্ঘ। কিন্তু তৃণ (ত্রিনো) হ্রস্ব—ইত্যাদিরূপে বুঝিতে হইবে।

ৠ-কার ঃ পিতৄণ (বাপের দেনা) প্রভৃতি এক-আধটি প্রায় অপ্রচলিত তৎসম শব্দ ছাড়া এই দীর্ঘ ৠকারের প্রয়োগ বাঙ্‌লায় পাওয়া যায় না। তাই বাঙ্‌লা ভাষায় ইহার উপযোগিতা নিতান্ত কম।

এ-কার ঃ এই স্বরটিকে সংস্কৃতে সন্ধ্যক্ষর (যুক্তস্বর) কহে। কিন্তু বাঙ্‌লায় ইহার সে মূল্য নাই। বাঙ্‌লায় ইহার উচ্চারণ দুইটি—সহজ ও বিকৃত। সহজ উচ্চারণ হ্রস্বদীর্ঘ দুইপ্রকারই হয়। পূর্ববৎ দীর্ঘ উচ্চারণ হয়, অর্থাৎ অন্ত্য অকার অনুচ্চারিত হইলে তৎপূর্ববর্তী একার দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, নচেৎ হ্রস্ব উচ্চারিত হইবে।

যেমন—দেশ, মেষ, বেশ ইত্যাদি দীর্ঘ। কিন্তু এসে, এবার, ইত্যাদি স্থলে হ্রস্ব। একস্বরক একারও দীর্ঘ। যেমন—যে, এ, কে, বে ইত্যাদি।

একারের বিকৃত উচ্চারণ সংস্কৃতে নাই। বাঙ্‌লাভাষায় এইপ্রকার উচ্চারণ অ্যা'-কারের মতো। এক, একা, দেখো (অ্যাক্‌, অ্যাকা, দ্যাখো), ইত্যাদি। বগার (ব্যাগার), বেজার (ব্যাজার) প্রভৃতি কয়েকটি স্থলে 'বে' এই উপসর্গটিরও বিকৃত উচ্চারণ হয়। অন্যত্র হয় না। বেপরোয়া, বেকায়দা, বেহেড, ইত্যাদি স্থলে উচ্চারণ সহজ (দীর্ঘ)।

বাঙ্‌লা ছন্দে একারকে একটি স্বর বলিয়াই ধরা হয়। ছন্দে অবশ্য হ্রস্বদীর্ঘের কল্পনা স্বতন্ত্র প্রণালীতে করণীয়।

ঐ-কার: ঐকার সংস্কৃতে সন্ধ্যক্ষর বা যুক্তস্বরবর্ণ। বাঙ্‌লাতেও এইটির সন্ধ্যক্ষরের বা যুক্তস্বরবর্ণের মূল্য আছে। বাঙ্‌লাতে ইহার মূল্য ও+ই।

বাঙ্‌লায় এই স্বরবর্ণের উৎপত্তি লক্ষ্য করার মতো। দধি = দহি = দই = দোই = দৈ—এইরূপে এই স্বরটির রূপায়ণ ঘটিয়াছে। বাঙ্‌লা ছন্দে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহাকে দুইটি স্বর ধরা হয়।

ও-কার: এইটি সংস্কৃতে সন্ধ্যক্ষর হইলেও বাঙ্‌লায় এটি একস্বর। একারের মতোই হ্রস্বদীর্ঘ কল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু ইহার কোন বিকৃত উচ্চারণ বাঙ্‌লা ভাষাতে নাই। শোক, বোধ, কোন্‌, জোঁক ইত্যাদি স্থলে উচ্চারণ দীর্ঘ। শোকাকুল, বোধোদয়, ইত্যাদি স্থলে হ্রস্ব। বাঙ্‌লা ছন্দে একার ও ওকারকে একটি স্বর বলিয়াই ধরা হয়।

ঔ-কার: সংস্কৃতের মতো বাঙ্‌লাতেও ঔকার যুক্তস্বর বা সন্ধ্যক্ষর। বাঙ্‌লাতে ইহার মূল্য ও+উ। বাঙ্‌লা ছন্দে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঔকারকে দুইটি স্বর বলিয়া ধরা হয়। হৌক = হ+উক = হো+উক = হোউক = হৌক। মৌ—মধু = মহু = মউ = মোউ = মৌ।

বাঙ্‌লা স্বরবর্ণের স্বরমূল্য: বাঙ্‌লা স্বরবর্ণের পর্যালোচনায় দেখা গেল, সংস্কৃতে দীর্ঘস্বর ঠিক যাহাকে বলা হয়, বাঙ্‌লায় তাহা নাই। কেবল উচ্চারণবশে দীর্ঘত্ব ঘটে, তাহা অ, ই, উ, ঋ এই হ্রস্বস্বরগুলিরও ঘটিতে পারে। তাছাড়া, ঐ ঔ এই দুইটি মাত্র সন্ধ্যক্ষর আছে। এ ও এই দুইটি সন্ধ্যক্ষর নহে। এই দুইটি হ্রস্বস্বরেরই তুল্য, উচ্চারণে দীর্ঘও হইতে পারে।

সংস্কৃতানুসারী বাঙ্‌লা ছন্দে কিন্তু স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ-মূল্য ঠিক সংস্কৃতের মতোই হইবে। ঐ ঔ এই দুইটিকেও একটি দীর্ঘস্বর বলিয়াই ধরা হইবে, যুগ্মস্বর বলিয়া নহে। এ ও-কেও দীর্ঘস্বর বলিয়া ধরা হইবে। আ ঈ ঊ এইগুলিকেও দীর্ঘস্বর বলিয়া ধরিতে হইবে। ঋকারকেও রি (রী) বলিয়া কল্পনা করিলে চলিবে না, উহাকে হ্রস্ব ঋ বলিয়া ধরিতে হইবে। নচেৎ, 'অমৃত' শব্দের প্রথম অকার দীর্ঘ হইয়া যাইত (অম্রিত—যুক্তব্যঞ্জনের পূর্বে থাকায় দীর্ঘ)।

[খ] বাঙ্‌লা ব্যঞ্জনবর্ণ

ক খ গ ঘ ঙ প্রভৃতি পাঁচ-পাঁচটি করিয়া বর্ণসমূহকে বলে বর্গ। এইরূপ পাঁচটি বর্গ আছে—কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ। এই পঁচিশটি ব্যঞ্জনকে **বর্গীয়বর্ণ** বা **স্পর্শবর্ণ** বলে।

য র ল ব এই চারিটিকে **অন্তঃস্থ বর্ণ** কহে [স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যবর্তী বলিয়া]।

শ ষ স হ এই চারিটিকে **উষ্মবর্ণ** কহে; কারণ এই সকল বর্ণের উচ্চারণকালে জিহ্বার ঘর্ষণে উষ্মার বা তাপের সঞ্চার হয়।

বর্গের প্রথম-দ্বিতীয়, শ ষ স, ও বিসর্গ (ঃ)—এই কয়টিকে **অঘোষ বর্ণ** কহে।

বর্গের তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম, হ য ব র ল, ও অনুস্বার (ং)—এই কয়টিকে **ঘোষ** (ঘোষবৎ) বর্ণ কহে।

আবার ঃ বর্গের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং য র ল ব—এই কয়টিকে **অল্পপ্রাণ বর্ণ** কহে।

বর্গের দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং শ ষ স হ—এই কয়টিকে **মহাপ্রাণ বর্ণ** কহে।

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণস্থান

কবর্গ, হ, ঃ	উচ্চারণস্থান	কণ্ঠ (কণ্ঠ্য বর্ণ)
চবর্গ, য, শ	উচ্চারণস্থান	তালু (তালব্য বর্ণ)
টবর্গ, র, ষ	উচ্চারণস্থান	মূর্ধা (মূর্ধন্য বর্ণ)
তবর্গ, ল, স	উচ্চারণস্থান	দন্ত (দন্ত্যবর্ণ)
পবর্গ	উচ্চারণস্থান	ওষ্ঠ (ওষ্ঠ্য বর্ণ)

ইহা ছাড়াও, পাঁচটি পঞ্চম বর্ণের একটি অতিরিক্ত উচ্চারণস্থান আছে, সেটি নাসিকা। এইজন্য এই কয়টিকে (ঙ ঞ ণ ন ম) **অনুনাসিক বর্ণ** বলা হয়। পক্ষান্তরে, এই পাঁচটি বর্ণ যথাক্রমে কণ্ঠ্যবর্ণ, তালব্যবর্ণ, ইত্যাদিও বটে। মুখ ও নাসিকার সহযোগে ইহারা উচ্চারিত হয়, এজন্য ইহাদের নাম অনুনাসিক বর্ণ।

ইহা ছাড়া, ড় ঢ় য় এই তিনটি বাঙ্‌লার নূতন সম্পদ। কিন্তু বি[illegible] করিয়া দেখিলে এই বর্ণ তিনটি যথাক্রমে (টবর্গীয়) ড, ঢ, এবং য এই তিনটি বর্ণের অবস্থান-বিশেষ মাত্র। স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী ড, 'ড়' হয়; স্বরদ্বয়মধ্যবর্তী ঢ, 'ঢ়' হয়; স্বরদ্বয়মধ্যবর্তী য, 'য়' হয়।

শব্দের প্রথমে ড, ঢ বা য থাকিলে তাহার উচ্চারণ স্বাভাবিক থাকে। ব্যঞ্জনযুক্ত হইলেও স্বাভাবিক থাকে। তবে বাঙ্‌লাভাষার ত্রুটি এই যে; আমাদের য-ফলা প্রভৃতির প্রায়শ উচ্চারণ স্পষ্ট হয় না। সহস্‌-ব্যঞ্জনটি দ্বিরুক্ত হইয়া উচ্চারিত হয়।

কবর্গ ঃ ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচটি কণ্ঠ্যবর্ণ। ক অল্পপ্রাণ, অঘোষ। খ মহাপ্রাণ, অঘোষ। ক-ধ্বনির সঙ্গে হ-ধ্বনি যুক্ত করিলেই খ-ধ্বনি হয়।

গ অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ বর্ণ। ঘ মহাপ্রাণ ঘোষবৎ। গ-ধ্বনির সঙ্গে হ-ধ্বনি যুক্ত করিলেই ঘ ধ্বনি পাওয়া যাইবে।

ঙ অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ অনুনাসিক (কণ্ঠ্যবর্ণ)। গকারের অনুনাসিক উচ্চারণই ঙ। সকল উচ্চারণই তৃতীয়ের অনুনাসিক উচ্চারণ। তবে বাঙ্‌লা ঙ-কার অনেকটা অনুস্বারের মতো উচ্চারিত হয়। রঙ্‌, সঙ, বেঙ্‌, ইত্যাদি হসন্ত উচ্চারণে আমরা এই বর্ণের অস্তিত্ব অনুভব করি। অন্য একটি স্থলেও ইহার অস্তিত্ব আছে, সেটি হইল 'ক খ গ ঘ'-এর পূর্বে যুক্ত অনুস্বার-এর উচ্চারণে। অঙ্ক, শঙ্খ, বঙ্গ, সঙ্ঘ, ইত্যাদি তৎসম শব্দে ইহার উচ্চারণ সুস্পষ্ট।

চবর্গ : চ ছ জ ঝ ঞ এই পাঁচটি তালব্য বর্ণ। চ অল্পপ্রাণ অঘোষ, ছ মহাপ্রাণ অঘোষ। চ-কারের সঙ্গে হ-কার যুক্ত হইলে ছ এর উচ্চারণ পাওয়া যায়।

জ অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ বর্ণ। ঝ মহাপ্রাণ ঘোষবৎ বর্ণ। জ-কারের সঙ্গে হ কার যুক্ত করিলেই ঝ-ধ্বনি মিলিবে।

ঞ অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ সানুনাসিক (তালব্য বর্ণ)। জ-কারের অনুনাসিক উচ্চারণই ঞ। তৎসম শব্দ ভিন্ন বাঙ্‌লায় ঞ-কার নাই বলিলেই চলে। তৎসম শব্দে চ ছ জ ঝ এই চারিটি বর্ণের পূর্বে ঞ-কার পাওয়া যায়, যেমন—বঞ্চিত, বাঞ্ছা, রঞ্জিত, ঝঞ্ঝা। যাচ্‌ঞা শব্দটিতে চ-কারের পরে ঞ-কার পাওয়া যায়। জ্‌ + ঞ এই যুক্তবর্ণটিও তৎসম শব্দে যথেষ্ট পাওয়া যায়। বাঙ্‌লায় ইহার উচ্চারণ একটু স্বতন্ত্র, সংস্কৃতের মতো নহে, যেমন—বিজ্ঞ (বিগ্‌গোঁ), প্রজ্ঞা (প্রোগ্‌গাঁ), ইত্যাদি।

টবর্গ : ট ঠ ড ঢ ণ এই পাঁচটি মূর্ধন্যবর্ণ। ট অল্পপ্রাণ অঘোষবর্ণ। ঠ মহাপ্রাণ অঘোষবর্ণ। ড অল্পপ্রাণ ঘোষবর্ণ। ঢ মহাপ্রাণ ঘোষবর্ণ। ণ অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ অনুনাসিক বর্ণ।

ড ও ঢ এই দুইটি বর্ণ দুইটি স্বরের মধ্যবর্তী হইলে যথাক্রমে ড় ও ঢ়-রূপে উচ্চারিত হয়। জিহ্বার নিম্নদেশ দ্বারা দন্তমূলে তাড়ন করিলে ড় ধ্বনিটি উৎপন্ন হয়। ঢ়-ধ্বনি ড়-ধ্বনিরই মহাপ্রাণ মাত্র।

ণ কারের উচ্চারণ বর্তমানে বাঙলায় ঠিক হয় না বলিলেই চলে। ইহার বর্তমানে উচ্চারণ ন কার (দন্ত্য)। তবে ট ঠ ড ঢ এই চারিটি বর্ণের পূর্বে ণ-কারের প্রকৃত উচ্চারণ পাওয়া যায়। ষ-কারের পরেও এই উচ্চারণ অনেকটা পাওয়া যায়— কণ্টক, এরণ্ড, কণ্ঠ, চুণ্টি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, ইত্যাদি।

তবর্গ : ত থ দ ধ ন এই পাঁচটি দন্ত্যবর্ণ। ত অল্পপ্রাণ অঘোষ। থ মহাপ্রাণ অঘোষ। দ অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ। ধ মহাপ্রাণ ঘোষবৎ। ন অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ অনুনাসিক বর্ণ।

পবর্গ : প ফ ব ভ ম এই পাঁচটি ওষ্ঠ্য বর্ণ। প অল্পপ্রাণ অঘোষ। ফ মহাপ্রাণ অঘোষ। ব অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ। ভ মহাপ্রাণ ঘোষবৎ। ম মহাপ্রাণ

ঘোষবৎ অনুনাসিক বর্ণ। ফ ও ভ-এর উচ্চারণ যথাক্রমে প ও ব-এর মহাপ্রাণ রূপ, অর্থাৎ প্‌+হ এবং ব্‌+হ।)

য র ল ব: (এই কয়টি অন্তঃস্থ বর্ণ। এইগুলি বর্গীয়বর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যবর্তী বলিয়া ইহাদিগকে অন্তঃস্থ (মধ্যবর্তী) বর্ণ কহে।) স্বরধ্বনিরই প্রকৃতপক্ষে ব্যঞ্জন রূপান্তর বলিয়া এই ধ্বনিগুলিকে অর্ধস্বর বলা হয়।)

য: য-এর উচ্চারণ বাঙ্‌লায় জ-কারেরই মতো। কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উচ্চারণ ছিল 'ই+অ'-এর অনুরূপ। এইটি মাহাপ্রাণ ঘোষবৎ অন্তঃস্থ তালব্য বর্ণ। ব্যঞ্জনের পরে য-কার থাকিলে (অর্থাৎ য-ফলা হইলে) ইহার উচ্চারণ পূর্বস্থিত ব্যঞ্জনেরই অনুরূপ হয়। যথা, অদ্য—অদ্‌দো, নিত্য—নিত্‌তো, ইত্যাদি। য-ফলাতে জ কারের উচ্চারণও ক্বচিৎ পাওয়া যায়, যথা—উদ্যোগ—উদ্‌জোগ। ইহার মূল ইঅ-উচ্চারণও বাঙ্‌লায় ক্বচিৎ দেখা যায়। ত্যাগিয়া—তেয়াগিয়া (ক্রিয়াপদে পদ্যে)। ইহাকে অর্ধস্বর (Semi-vowel)-ও বলা হয়। আদ্যবর্ণে য-ফলা থাকিলে তাহার উচ্চারণ বাঙ্‌লায় দ্বিবিধ হয়—অ্যা এবং এ। যথা, ব্যবহার (ব্যাবহার), ব্যয় (ব্যায়), ব্যক্তি (ব্যাক্তি), ইত্যাদি।

র: (জিহ্বাকে কম্পিত করিয়া, জিহ্বা দিয়া দন্তমূলে পুনঃপুনঃ আঘাত করিলে, র-ধ্বনি উৎপন্ন হয়। এইজন্য ইহাকে কম্পজাত ধ্বনি বলা হয়।) ইহাকে তরলস্বর (liquid)-ও বলা হয়। ইহা প্রকৃতপক্ষে 'ঋ+অ'-এর অনুরূপ। বাঙ্‌লা র-কার অনেকটা দন্ত্যবর্ণ। কিন্তু সংস্কৃত র ফলা অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ মূর্ধন্য অন্তঃস্থ বর্ণ।

ল: জিহ্বাগ্রভাগে ও দন্তমূলের সাহায্যে ল-কার উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণকালে উভয় পার্শ্ব দিয়া বায়ু নিষ্কাশিত হয় বলিয়া ইহাকে পার্শ্বিক ধ্বনি বলা হয়। ল-কারকে তরলস্বর (liquid)-ও বলা হয়। ইহা অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ দন্ত্য অন্তঃস্থ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ 'ঌ+অ' এর অনুরূপ।

অন্তঃস্থ ব: ইহার উচ্চারণ বাঙলায় বর্গীয় ব-এর সঙ্গে অভিন্ন। ইহাকে অর্ধস্বর বলা হয়। ইহার প্রকৃত উচ্চারণ 'উ+অ'-এর অনুরূপ। ব্যঞ্জনযুক্ত ব অর্থাৎ ব-ফলার উচ্চারণ প্রায়শ পূর্ববর্ণের অনুরূপ হয়। যথা—সাধ্বী (সাধ্‌ধী), পক্ব (পক্‌কো), ইত্যাদি।

ব-কার শব্দের আদ্যবর্ণে যুক্ত থাকিলে তাহা উচ্চারিত হয় না। যথা—স্বামী, ক্বচিৎ, জ্বালা, দ্বারা, ইত্যাদি। ব-কার অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ দন্তৌষ্ঠ অন্তঃস্থ বর্ণ। বাঙ্‌লায় অবশ্য ইহার ঔষ্ঠ্য উচ্চারণই দেখা যায়। ইহার প্রকৃত উচ্চারণ পাওয়া যায় স্বামী, স্বাদ প্রভৃতি শব্দের কথ্যরূপ সোয়ামী, সোয়াদ প্রভৃতিতে [স্বা = স্‌+আ = সো +আ = সোয়া]।

বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব-এর পরিচয় খুব স্পষ্ট নহে। শিক্ষার্থীদের প্রতি আমাদের উপদেশ হইবে, কয়েকটি বর্গীয় ব-যুক্ত শব্দ মনে রাখা। এখানে কয়েকটি শব্দ দেওয়া গেল: বন্ধন, বন্ধু, বোধ, বুদ্ধি, বক, বল, বালক, বহিঃ, বহু, বাণ, বাধা,

বিম্ব, শব্দ, অব্দ, বুভুক্ষা, বৃহৎ, ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন প্রায় সমস্তই অন্তঃস্থ ব।

শ ষ স হ: এই চারিটিকে উষ্মবর্ণ কহে। শ ষ স এই তিনটির উচ্চারণকালে শিশ্ দিবার ন্যায় শব্দ হয় বলিয়া এইগুলিকে শিশ্ধ্বনি বলা হয়। বাঙ্লায় এই তিনটি ধ্বনির উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য নাই, তিনটির উচ্চারণ ইংরাজি 'sh' বা সংস্কৃত 'শ'-এর মতো। তৎসম শব্দগুলিতেও বাঙ্লাতে প্রায়শ তিনটি স-কারের উচ্চারণগত পার্থক্য লক্ষ্য করা হয় না। তবে স-কারের ত-থ-যোগে প্রকৃত উচ্চারণ প্রায়শ পাওয়া যায়; যথা—অস্ত, আস্থা, ইত্যাদি। শ-কারের চ-ছ-যোগে এবং ষ-কারের ট-ঠ যোগে প্রকৃত উচ্চারণ অনেকটা পাওয়া যায়; যথা—পুনশ্চ, শিরশ্ছেদ, অষ্ট, অধিষ্ঠান, ইত্যাদি। এইরূপ উচ্চারণ হইবার কারণ হইল, সহস্ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির স্থানগত সাদৃশ্য। শ ষ স মহাপ্রাণ অঘোষ বর্ণ।

হ-কার-ধ্বনি কণ্ঠনালীতে উৎপন্ন হয়। ইহা উষ্ম ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণ। শ ষ স-ধ্বনির মতো এই ধ্বনিটিতেও শ্বাস যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ প্রলম্বিত করা যায়। এই কারণে এই চারিটি বর্ণকেই উষ্মবর্ণ কহে। হ-কার মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রাণ। বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণে হ-ধ্বনি যুক্ত করিলেই যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের ধ্বনি পাওয়া যায়। হ-ধ্বনি পূর্ববঙ্গ-অঞ্চলের বাঙ্লায় প্রায় অনুচ্চারিত থাকে। অধিকন্তু স বা শ-ধ্বনি হ-ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়; যথা শালা—হালা, সকলে—হগলে ইত্যাদি।

অনুস্বার (ং): এইটি পঞ্চম বর্ণের, বিশেষত মকারের, অবস্থানভেদ মাত্র। পদান্তস্থিত মকার স্থানে, ব্যঞ্জন পরে থাকিলে, অনুস্বার (ং) হয়। এই ধ্বনিটি মৌলিক নহে। অঙ্ক, শঙ্কা, সঙ্গ প্রভৃতি স্থানে অংক, শংকা, সংগ প্রভৃতি লিখিলে ভুল হইবে; কারণ, বর্গীয় বর্ণ পরে, পদান্তস্থিত পঞ্চমবর্ণস্থানেই অনুস্বার আদেশ হয়, মৌলিক পঞ্চমবর্ণস্থানে নহে। বর্গীয় বর্ণ পরে না থাকিলে শুধু অনুস্বারে হইবে, পঞ্চম নহে। কাজেই সম্বাদ, কিম্বা প্রভৃতি অশুদ্ধ। এই ধ্বনিটি অঘোষ, মহাপ্রাণ অনুনাসিক। স্বরদ্বয়মধ্যে ছাড়া এই ধ্বনিটি তৎসমশব্দে ব্যবহৃত হয় না কিন্তু বাঙ্লায় এই ধ্বনিটি পদান্তেও ব্যবহৃত হয়, এবং সেস্থলে ইহার উচ্চারণ ঙ-কারের অনুরূপ হয়। যেমন—রং (ঙ্), ব্যাং (ঙ্), সং (ঙ্), ঢং (ঙ্), ইত্যাদি। স্বয়ং, সোঽহং, এবং, সুতরাং, বরং, ইত্যাদি (এইসবগুলিও মকারস্থানে আদেশ)।

বিসর্গ (ঃ): এই ধ্বনিটির উচ্চারণ বাঙ্লায় অনেকটা হ-কারের অনুরূপ। তৎসম শব্দে ছাড়া পদমধ্যস্থিত এই ধ্বনি বাঙ্লায় বড়ো একটা পাওয়া যায় না। এই ধ্বনি পরবর্তী ব্যঞ্জনের অনুরূপ হইয়া বাঙ্লায় উচ্চারিত হয়, যেমন—দুঃখ (দুক্খো), দুঃসহ (দুস্সহো)। তৎসমশব্দে পদান্তস্থিত বিসর্গ বাঙ্লায় প্রায় উচ্চারিত

হয় না। যেমন—শ্রেয়ঃ, পুনঃ, রজঃ, তমঃ, পয়ঃ, যশঃ, পুনঃপুনঃ, ইত্যাদি। খাঁটি বাঙ্‌লায় এই ধ্বনি শুধু অব্যয় পদের অন্তে উচ্চারিত হয়। আঃ, উঃ, ও, ইত্যাদি।

মনে রাখিতে হইবে, এই ধ্বনিটি মৌলিক নহে, স-কার বা র-কারের অবস্থানভেদ মাত্র। পদান্তস্থিত স-কার বা র-কার বিসর্গ হইয়া যায়। যশস্ (যশঃ), রজস্ (রজঃ), তমস্ (তমঃ) পুনর্ (পুনঃ), প্রাতর্ (প্রাতঃ)। কখপফ শষস, এই বর্ণ কয়টি পরে থাকিলেও প্রায়শ স-কার বা র-কার স্থানে বিসর্গ হইয়া যায়। পয়ঃপান, প্রাতঃকৃত্য, যশঃ, ইত্যাদি।

চন্দ্রবিন্দু (ँ): অনুস্বার ছাড়াও একটি অনুনাসিক ধ্বনি আছে, তাহার বাঙ্‌লায় নাম 'চন্দ্রবিন্দু'। অনুস্বারের ন্যায় এই ধ্বনিটিও পঞ্চমবর্ণের অবস্থানভেদ মাত্র, স্বতন্ত্রধ্বনি নহে। তৎসম শব্দে এই ধ্বনিটি প্রায় পাওয়া যায় না। অনুস্বার বা পঞ্চম স্থানে এই ধ্বনিটির আদেশ হয়; যেমন, চন্দ্র—চাঁদ, বংশ—বাঁশ, হংস—হাঁস, পঙ্ক—পাঁক, অঙ্ক—আঁক, শঙ্খ—শাঁখ, ইত্যাদি। কয়েকটি স্থলে চন্দ্রবিন্দুর মূলে পঞ্চমবর্ণ বা অনুস্বার থাকে না, এমনও দেখা যায়। যেমন, অক্ষি—আঁখি, প্রোথিত —পোঁতা, হাস্য—হাসি (উচ্চারণে 'হাঁসি')।

এই ধ্বনিটি নাসিকা হইতে উচ্চারিত হয়, এইজন্য ইহার অপর নাম অনুনাসিক। ইহা অল্পপ্রাণ, ঘোষবৎ বর্ণ।

ক্ষ: এটিকে একটি পৃথক্ ধ্বনি বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ক+ষ এই ধ্বনি-দুইটির যোগফল মাত্র। ঈক্ষ্, রক্ষ্, ক্ষিপ্ প্রভৃতি সংস্কৃত ধাতুতে (বাঙ্‌লা তৎসম শব্দে বহুপ্রচলিত) প্রযুক্ত থাকায়, ইহা মৌলিক ধ্বনির মতোই মনে হয়। পদের আদিতে ক্ষ-ধ্বনি খ-রূপে উচ্চারিত হয়; যথা—ক্ষীণ—খীন, ক্ষমা—খমা। অনত্র ক্ষ-ধ্বনির বাঙ্‌লায় উচ্চারণ হয় ক্খ-ধ্বনিরূপে। যেমন, বক্ষ—বক্খো, রক্ষা—রক্খা, বিক্ষিপ্ত—বিক্খিপ্তো, ইত্যাদি।

[গ] যুক্তবর্ণ

(দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জন একত্র মিলিত হইলে তাহাকে যুক্ত বা সংযুক্তবর্ণ বলে।) ইহার উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট বর্ণকয়টির প্রকৃত উচ্চারণের সমষ্টি মাত্র। তৎসম শব্দেই যুক্তবর্ণের সমাবেশ সমধিক দেখা যায়। কিন্তু অতৎসম শব্দেও ইহা নিতান্ত বিরল নহে। বাঙ্‌লায় যুক্তবর্ণের উচ্চারণের দিকে ঝোঁক কম। তবে বিদেশী শব্দে এই উচ্চারণ পাওয়া যায়।

তৎসম শব্দের উচ্চারণে দেখিতে পাই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাঙ্‌লায় যুক্তবর্ণগুলি কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া উচ্চারিত হয়, কোথাও-বা কোনো কোনো বর্ণ প্রায় অনুচ্চারিত থাকে।

ম-ফলা পঞ্চমভিন্ন বর্গীয়বর্ণে যুক্ত হইলে, শ ষ স-এ যুক্ত হইলে, তাহার প্রায়শ উচ্চারণ হয় শুধু অনুনাসিক (চন্দ্রবিন্দু)। ইহাতে পূর্বব্যঞ্জনের প্রায়শ দ্বিত্ব হয় (বাঙ্‌লায় উচ্চারণে)। যথা, রুক্মিণী (রুক্কিঁনি), আত্মা (আত্‌তাঁ), পদ্মিনী

(পোদ্দি'নী), ভীষ্ম (ভিশ্‌শোঁ), শ্মশান (শঁশান) অকস্মাৎ (অকোশ্‌শাঁৎ), ইত্যাদি।

য-ফলাযুক্ত বা ব-ফলাযুক্ত উচ্চারণকালে আমরা প্রায়শ সেই বর্ণ দ্বিরুক্ত করিয়া উচ্চারণ করি। যথা, বশ্য—বশ শো, কাম্য—কান্‌মো, বাক্য—বাক্‌কো, পক্ক—পক্‌কো, তন্বী—তন্‌নী, অশ্ব—অশ্‌শো, অদ্বৈত—অদ্‌দৈত, ইত্যাদি।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই ধ্বনিপরিবর্তনটি বর্ণসমীকরণ ছাড়া কিছুই নয়। এইটি প্রগত বর্ণসমীকরণ।

য-ফলা বা ব-ফলা কখনো কখনো উচ্চারিত হইয়া থাকে। সেক্ষেত্রে য-কার জ-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন, উদ্যোগ—উদ্‌জোগ। তদ্বৎ—তদ্‌বৎ, সদ্ব্যয়—সদ্‌ব্যয়। হ্‌-যুক্ত য-ফলা 'জ্ঝ্‌'-এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। বাহ্য (বাজ্‌ঝো), সহ্য (সোজ্‌ঝো)।

পদের আদিতে ব-ফলা থাকিলে সেই ব-কার প্রায়ই অনুচ্চারিত থাকে। ত্বরা—তরা, জ্বলা—জলা, ক্বচিৎ—কচিত, ধ্বনি—ধনি।

র-ফলা বাঙলায় যথারীতি উচ্চারিত হয়। রেফ-ও যথারীতি হয়, কিন্তু রেফ-যোগে হ-কার ভিন্ন সকল ব্যঞ্জনেরই দ্বিত্ব হয়।

ক্ষ : এই বর্ণটি প্রকৃতপক্ষে ক্‌+ষ। ইহার আলোচনা বর্ণ ও ধ্বনিপ্রকরণে পূর্বেই করা হইয়াছে। বাঙলায় ইহা 'ক্‌খ' এইরূপে উচ্চারিত হয়। পদের আদিতে শুধুই 'খ'-রূপে উচ্চারিত হয়।

জ্ঞ : এই যুক্তবর্ণটি জ্‌+ঞ যোগে নিষ্পন্ন। কিন্তু বাঙ্‌লায় ইহা গ্‌গঁ-রূপে উচ্চারিত হয়। বিজ্ঞ—বিগ্‌গঁ, আজ্ঞা—আগ্‌গাঁ। এই যুক্ত উচ্চারণটি বিচিত্র। মনে হয়, প্রথমার্ধে চবর্গ কবর্গে পরিণত হইয়াছে এবং ঞ-কার সমীভবনের ফলে গ্‌-কারে পরিবর্তিত হইয়াছে। তবে পঞ্চমের চিহ্নরূপে চন্দ্রবিন্দুটি উচ্চারণে প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বা চতুর্থ বর্ণের দ্বিত্ব হইলে তাহার প্রথমটি যথাক্রমে প্রথম বা তৃতীয়বর্ণে পরিবর্তিত হয়। রেফের পর দ্বিত্ব হইলে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট দেখা যায়। মূর্খ (মুর্ক্‌খ) অর্ঘ (অর্গ্‌ঘ), বর্ধমান (বর্দ্‌ধমান), দর্ভ (দর্ব্‌ভ), ইত্যাদি। এইটি সংস্কৃতভাষার নিয়ম। ফলত, ভাষাতত্ত্বেরই নিয়ম, বাঙ্‌লার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নহে।

[ঘ] বর্ণদ্বিত্ব

তৎসম শব্দের বর্ণদ্বিত্ব বাঙ্‌লায় যথারীতি উচ্চারিত হয়। সত্তা, লজ্জা, উচ্চ, তদ্দেশ, সম্মান।

রেফযোগে যে-বর্ণদ্বিত্ব হয়, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার আছে। রেফের পরে (অর্থাৎ স্বরের পরস্থিত র-কারের পরে) হ-কার ভিন্ন সকল ব্যঞ্জনেরই দ্বিত্ব হয়। কিন্তু এই দ্বিত্ব বিকল্পে হয় বলিয়া সাধারণত ইহা বানানে লেখা হয় না। তর্ক, কার্য, সর্ব, সূর্য, ইত্যাদি। বাঙ্‌লা ভাষায় রেফের পরে দ্বিরুক্ত ব্যঞ্জন না লেখার দিকেই আধুনিককালে ঝোঁক সমধিক। যদিও উভয়ই শুদ্ধ তবু নিষ্প্রয়োজনে দ্বিত্ব ব্যবহার না করাই সুবিধাজনক বলিয়া ইহা প্রায়শ ব্যবহৃত হয় না।

কথ্যবাঙ্‌লায় রেফযুক্ত ব্যঞ্জন উচ্চারণকালে দ্বিরুক্ত ব্যঞ্জনটি উচ্চারিত হয়, রেফের উচ্চারণ হয় না। তর্ক—তক্‌কো, মূর্খ—মুক্‌খো (মুক্‌খু), স্বর্গ—সগ্‌গো।

র-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে স্বর থাকিলে সেই ব্যঞ্জনের উচ্চারণকালে দ্বিত্ব হইয়া যায় (বিকল্পে)। বক্র (বক্‌ক্রো), গোগ্রাস (গোগ্‌গ্রাস), ব্যাঘ্র (ব্যাঘ্‌ঘ্রো), অশ্রু (অশ্‌শ্রু), পুত্র (পুত্‌ত্রো), ইত্যাদি।

[ঙ] ধ্বনিবিলোপ

পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই দেখা যাইবে, নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ধ্বনিবিলোপ ঘটে :

(ক) অ-ধ্বনির লোপ। পদান্তস্থিত অকার উচ্চারণকালে বাঙ্‌লায় অনেক স্থলে লুপ্ত হয়, যেমন—নাম, জন, ধন, বক, জল, বিষ, সেক।

(খ) পদের আদিবর্ণে স্থিত ব-ফলাটি প্রায়শ উচ্চারিত হয় না। যেমন—ত্বরা, ধ্বনি, জ্বলা, স্বাদ।

(গ) ক্ষ (ক্+ষ) ধ্বনি পদের আদিতে থাকিলে তাহার ক-কারটি লুপ্ত হয়, শুধু খ-কারটি উচ্চারিত হয়। যেমন, ক্ষীণ (খীন), ক্ষয় (খয়), ক্ষমা (খমা)। এই খ-কারটি ষ-কারেরই রূপ। (ক্ষ = ক্+ষ = ক্+খ)।

(ঘ) স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী হ-কার কথ্যবাঙ্‌লায় প্রায়শ উচ্চারিত হয় না।

(ঙ) অন্যান্য বিবিধ প্রকারের জন্য ধ্বনিপরিবর্তন-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

(২) একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি

স্বরবর্ণ : অ-কারের দ্বিবিধ উচ্চারণের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রথমত অ-কার দ্বিবিধ—উচ্চারিত ও অনুচ্চারিত। উচ্চারিত অ-কারের উচ্চারণ দ্বিবিধ—অ এবং ও। অনুচ্চারিত অ-কার অর্থে সহস্‌ ব্যঞ্জনের হসন্ত উচ্চারণ মাত্র। উচ্চারিত অ-কারের পরবর্তী অক্ষরে ই-কার বা উ-কার থাকিলে সেই অ-কার ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়। অন্যান্য অ-কারের অ-বৎ বিশুদ্ধ উচ্চারণ হয়। যেমন, তনু (তোনু), মণি (মোনি), কিন্তু রমা, সভা। স্বরপ্রকরণে ইহার বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

অ-কারের উচ্চারণ বাঙ্‌লায় দুই প্রকারের—হ্রস্ব ও দীর্ঘ। যথা, হ্রস্ব—লতা, মজা, ইত্যাদি ; দীর্ঘ—বাণ, হাত, বাজ, ইত্যাদি। স্বরপ্রকরণে ইহার বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

ঈ-কার প্রায়শ হ্রস্বরূপে উচ্চারিত হয়। ই-কারও কচিত দীর্ঘরূপে উচ্চারিত হয়। স্বরাঘাতের প্রভাবেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। উ ঊ-ক্ষেত্রেও এই একই কথা বলা চলে।

এ-কারের উচ্চারণও বাঙ্‌লায় ত্রিবিধ—হ্রস্ব এ, দীর্ঘ এ এবং অ্যা। হ্রস্ব এ-কার—ঘরে, সেবা, করে, ইত্যাদি। দীর্ঘ এ-কার—দেশ, কেশ, কে, দে ইত্যাদি। অ্যা উচ্চারণ—একা, কেন, দেখা, বেচা (কিন্তু, কেনা), ইত্যাদি।

ও-কারের উচ্চারণও বাঙ্‌লায় দুই প্রকারের—হ্রস্ব ও দীর্ঘ। হ্রস্ব—বোনাই, শোকাকুল, ইত্যাদি। দীর্ঘ—বোধ, শোক, বোঝা, জোঁক, কোপ ইত্যাদি।

হ্রস্ব ই-কারের একটি বিকৃত উচ্চারণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। 'কি' এই শব্দটির উচ্চারণে 'কি' এবং 'কী' এই দুই প্রকার উচ্চারণ পাওয়া যায়। এই উচ্চারণগত পার্থক্যের মূলে আছে অর্থগত পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এইদিকে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলত, তিনি লিখিবার কালেও 'কি' এবং 'কী' এই দুইভাবে লেখা আরম্ভ করেন। তদবধি এই প্রকার দ্বিবিধ বানানই বাঙ্‌লার বহুল প্রচলিত হইয়াছে।

'কি'—হ্রস্ব উচ্চারণ, অব্যয়। সে কি এসেছিল? আমি কি একটা মানুষ নই?

'কী'—দীর্ঘ উচ্চারণ, বিশেষণ বা সর্বনাম। সে কীই-বা জানে, কীই-বা বোঝে। 'গ্রামের ছেলেদের শিক্ষাই-বা কী, আর শহরতই-বা কী'—রবীন্দ্রনাথ। কী বক্‌ছো? কী সুন্দর!

তুমি কি খেয়েছ? তুমি কী খাচ্ছ?—বাক্যদ্বয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট বোঝা যায়। তাই আজকাল এইরূপ বানানে লেখাই প্রচলিত হইয়াছে।

ব্যঞ্জনবর্ণঃ বর্গীয় দ্বিতীয় বা চতুর্থ বর্ণ পদান্তস্থিত হইলে, তাহা যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় বর্ণরূপে উচ্চারিত হয়। যথা, মুখ, (মুক্), বাঘ (বাগ্), রথ (রত্), সাধ (সাদ্), লোভ (লোব্)। বাঙ্‌লায় পদান্তের অ-কার উচ্চারিত না হওয়ায় এই বর্গীয় বর্ণকয়টি পদান্ত বলিয়া ধরা হইয়াছে।

য-কার ও ব-কার ফলারূপে উচ্চারিত হইলে যে উচ্চারণবৈশিষ্ট্য ঘটে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পদের আদিস্থিত য-ফলা কখনো অ্যা কখনো-বা এ-রূপে উচ্চারিত হয়। পদের আদিস্থিত ব-ফলা প্রায় অনুচ্চারিত থাকে। অন্যত্র ব-ফলা প্রায়শ পূর্ববর্ণের মতোই (দ্বিরুক্ত হইয়া) উচ্চারিত হয়, কখনো বা স্বরূপেই উচ্চারিত হয়। ষ-কারের ট-বর্গের বা ণ-কারের পূর্বে অবস্থিতি হইলে, তাহার প্রকৃত উচ্চারণ পাওয়া যায় [illegible]চিৎ শ-কারবৎ উচ্চারণ হয়।

য-ফলাযুক্ত হইলে হ-কারের উচ্চারণ পরবর্ণের সারূপ্য লাভ করে, অর্থাৎ য-কার (বাঙ্‌লায় জ) হইয়া উচ্চারিত হয়। পক্ষে য-কারটি ঝ-কারবৎ উচ্চারিত হয় (মহাপ্রাণ হ-কারের প্রকৃতিগত এই উচ্চারণ)। ফলা 'হ্য' এই যুক্ত উচ্চারণটি হয় জ্ঝ। স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী হ-কার কথ্যবাঙ্‌লায় প্রায়শ উচ্চারিত হয় না। পদের আদিস্থিত হ-কারের প্রকৃত উচ্চারণ হইয়া থাকে।

ক্ষ ও জ্ঞ এই দুইটি যুক্তবর্ণের উচ্চারণবৈশিষ্ট্য পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে (যুক্তবর্ণ দ্রষ্টব্য)। ফলত, ষ-কার ক-কারের পরে যুক্ত হইলে খ-কারবৎ উচ্চারিত হয় দেখা গেল। 'জ্ঞ' উচ্চারণটি বিচিত্র। দেখা যাইতেছে, জ-কার কবর্গান্বিত হইয়াছে এবং ঞ-কার সমীভবনের ফলে গ-কার হইয়াছে। অনুনাসিকটি (চন্দ্রবিন্দু) উচ্চারণে রহিয়া গিয়াছে (গ্, গঁ)।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ সন্ধিপ্রকরণ ॥

সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মম ক্লেশ। —কৃত্তিবাস
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া। —ঐ
নবদ্বীপে আসিয়াছে এক **দিগ্বিজয়ী** -বৃন্দাবনদাস
যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে
ব্যয়িলি হায়, —মধুসূদন

উপরে স্থূলাক্ষর শব্দগুলি অর্থাৎ 'সিংহাসনে', 'পদ্মালয়া', 'দিগ্বিজয়ী' ও 'যশোলাভ' এই কয়েকটি শব্দ বিশ্লেষ করিলে দেখা যায় উহাদের মধ্যে একটি বর্ণের সহিত অপর আর একটি বর্ণের মিলন ঘটিয়াছে। যেমন 'সিংহ + আসন', 'পদ্ম + আলয়', 'দিক্ + বিজয়ী', 'যশঃ + লাভ'। প্রথম দুইটিতে স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলন ঘটিয়াছে; তৃতীয়টিতে ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণের এবং চতুর্থটিতে অ এবং বিসর্গ-স্থানে ও-কার হইয়াছে। প্রথমটিতে যে মিলন উহাকে বলে স্বরসন্ধি, তৃতীয়টির মিলনকে ব্যঞ্জনসন্ধি এবং চতুর্থটির মিলনকে বিসর্গসন্ধি বলে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দুইটি বর্ণ পরস্পর অত্যন্ত সন্নিহিত হইলে যুগপৎ উচ্চারণের ফলে ধ্বনির যে পরিবর্তন ঘটে তাহাকে বলে সন্ধি।

সন্ধি হইলে কেবল দুইটি বর্ণের যে মিলন হয় তাহা নহে—কখনো দুইটি বর্ণের কেবল মিলন ঘটে, কখনো পূর্ববর্ণের বিকৃতি হয়, আবার, কখনো পরবর্ণ বিকার প্রাপ্ত হয়। কোথাও উভয় বর্ণই বিকৃত হয়; কোথাও বা পূর্ববর্ণের লোপ হয়; কখনো বা পরবর্ণের লোপ হয়; কখনো বা একটি বর্ণ আসিয়া উভয় বর্ণের মধ্যে বসে।

অতএব দেখা যাইতেছে, সন্ধি তিন প্রকার—(ক) স্বরসন্ধি, (খ) ব্যঞ্জনসন্ধি, (গ) বিসর্গসন্ধি। উপরে উদ্ধৃত 'সিংহাসন' ও 'পদ্মালয়' স্বরসন্ধির উদাহরণ; 'দিগ্বিজয়ী' শব্দটি ব্যঞ্জনসন্ধির উদাহরণ, এবং 'যশোলাভ' শব্দটি বিসর্গসন্ধির উদাহরণ।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, দুইটি স্বরধ্বনি সন্নিহিত হইলেও যদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয় তবে সেখানে সন্ধি করার প্রয়োজন হয় না। যথা, অনুমতি-অনুসারে; স্ত্রী-আচার; দাসবৎ কর্ম করি আজ্ঞা-অনুসার।

বাঙ্লা ভাষার ও সংস্কৃত ভাষায় সন্ধির বৈশিষ্ট্য পৃথক্ :

সংস্কৃতে একপদে, ধাতু ও উপসর্গের মধ্যে এবং সমাসে সন্ধি নিত্য। বাঙ্লা ভাষায় 'তৎসম' শব্দ ছাড়া এ নিয়ম দেখা যায় না। সংস্কৃত ভাষায় বাক্যের বিভিন্ন

পদের মধ্যে সন্ধি করা বা না করা লেখকের ইচ্ছাধীন। কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষায় এ নিয়ম খাটে না। যথা, দাতা আয়াতি (দাতা আসেন)। এস্থলে 'দাতায়াতি' এরূপ লেখা চলিতে পারে। কিন্তু যদি বলি 'দাতাসেন' তবে উহার অর্থবোধ হইবে না। তাই এ জাতের সন্ধি একেবারেই অচল। খাঁটি বাঙ্‌লায় বাক্যের মধ্যে উচ্চারণের ফলে সন্ধিজনিত পরিবর্তন দেখা গেলেও উহা লিখিত হয় না। যথা বড়+ঠাকুর> বট্‌ঠাকুর, হাত্‌+ধরা>হাত্‌ধরা প্রভৃতি। অতএব দেখা যাইতেছে খাঁটি বাঙ্‌লায় উচ্চারণকালে যে সন্ধি শ্রুত হয় বানানে তাহা সর্বদা লিখিত হয় না। তবে আর্‌ না কালী>আন্নাকালী (কোনো বালিকার নাম)—এস্থলে ব্যঞ্জনসন্ধিতে পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের প্রভাবে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

সংস্কৃতে সন্ধি, যথা শে+অন>শয়ন (একপদে), মহা+ওষধি>মহৌষধি (সমাস), অতি+উক্তি>অত্যুক্তি (ধাতু ও উপসর্গ)।

তবে মনে রাখিতে হইবে, সমাসস্থলে যেখানে সন্ধি করিলে উচ্চারণে বাধা উপস্থিত হয় সেখানে বাঙ্‌লা সন্ধি করা উচিত নহে। যদি বলি 'অনুমত্যানুসারে' তবে উহা খারাপ শোনায় বলিয়া এভাবে সন্ধি না করাই বিধেয়।

মোটকথা, বাঙ্‌লা সন্ধি ও সংস্কৃত সন্ধির মধ্যে একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও বাঙ্‌লা সন্ধির উপর সংস্কৃত সন্ধির প্রভাব লক্ষিত হয়। তদ্ভব, অর্ধতৎসম ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাঙ্‌লাভাষা সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধির নিয়মই মানিয়া চলে। মূলগত উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের কথা ছাড়িয়া দিলে বাঙ্‌লা সন্ধি ও সংস্কৃত সন্ধির মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই।

এইবার প্রথমে আমরা সংস্কৃত সন্ধির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব :

(১) স্বরসন্ধি

স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসন্ধি বলে।

[ক] অ-কারের কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ+অ>আ ; অ+আ>আ
আ+অ<আ ; আ+আ>আ

যথা, নর+অধম>নরাধম ; দেব+আলয়>দেবালয়
মহা+অর্ঘ>মহার্ঘ ; মহা+আশয়>মহাশয়

এইরূপ—কুশাসন, তৃষ্ণাতুর, মৃগাঙ্ক, চরণামৃত, রত্নাকর, আশাতীত।

প্রয়োগ—(i) শ্রীরাম বলেন 'হে ভরত, প্রাণাধিক।' —কৃত্তিবাস
(ii) দুঃখানলে প্রাণ দহে —কবিকঙ্কণ
(iii) ভারতের পুণ্যাশ্রম—মহাতীর্থ সব ; —নবীন সেন

[খ] ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া হয় ঈ-কার এবং উহা পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

ই+ই>ঈ ; ই+ঈ>ঈ

ঈ+ই>ঈ ; ঈ+ঈ>ঈ

যথা, মুনি + ইন্দ্র>মুনীন্দ্র ; প্রতি+ঈক্ষা>প্রতীক্ষা

মহী + ইন্দ্র>মহীন্দ্র ; পৃথ্বী + ঈশ্বর>পৃথ্বীশ্বর

এইরূপ—ক্ষিতীশ, মহীশ, অতীব, গিরীন্দ্র, লক্ষ্মীশ, সতীশ, প্রতীতি, পরীক্ষা, সুধীন্দ্র।

প্রয়োগ—(i) **পরীক্ষা** দেখিতে তব আইল দেবগণ। —কৃত্তিবাস

(ii) **মুনীন্দ্রে** তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজাইলা। —হেমচন্দ্র

(iii) অরবিন্দ, **রবীন্দ্রের লহ** নমস্কার। —রবীন্দ্রনাথ

[গ] উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঊ-কার হয় এবং উহা পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

উ+উ>ঊ ; উ+ঊ>ঊ

ঊ+উ>ঊ ; ঊ + ঊ>ঊ

যথা, বিধু + উদয়>বিধূদয় ; লঘু+ঊর্মি>লঘূর্মি

বধূ+উক্তি>বধূক্তি ; ভূ + ঊর্ধ্ব>ভূর্ধ্ব

এইরূপ—কটূক্তি, বধূচিত, বধূৎসব, সাধূক্তি, সূক্ত, সরযূর্মি।

প্রয়োগ—বিশ্বামিত্র বলিলেন—দেব, আমি না বুঝিয়া সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া তোমায় অনেক **কটূক্তি** করিয়াছি। —হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

[ঘ] অ কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া এ-কার হয় এবং ঐ এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ বর্ণ (অ+আ)+ই বর্ণ (ই+ঈ)>এ

অ + ই>এ ; অ+ঈ>এ

আ + ই>এ ; আ+ঈ>এ

যথা, দেব + ইন্দ্র>দেবেন্দ্র ; গণ + ঈশ>গনেশ

মহা + ইন্দ্র>মহেন্দ্র ; রমা + ঈশ>রমেশ

এইরূপ—নরেশ, যথেষ্ট, রমেশ, মহেন্দ্র, স্বেচ্ছা, মহেশ্বর, সুরেশ, সর্বেশ্বর।

প্রয়োগ—আরবের উদ্ভাবনের ফলে রামায়ণশাস্ত্রের **যথেষ্ট** শ্রীবৃদ্ধি হয়।

—আবদুল কাদের

[ঙ] অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয় এবং ঐ ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ বর্ণ+উ বর্ণ>ও

অ + উ>ও ; অ + ঊ>ও

আ+উ>ও ; আ+ঊ>ও

যথা, নীল+উৎপল>নীলোৎপল ; এক+উনবিংশতি>একোনবিংশতি
মহা+উৎসব>মহোৎসব ; গঙ্গা+ঊর্মি>গঙ্গোর্মি

এইরূপ—হিতোপদেশ, নবোঢ়া, চন্দ্রোদয়, পাদোদক, মহোচ্চ, আদ্যোপান্ত।

প্রয়োগ—ঐদিন পূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান।

—দেবেন্দ্রনাথ

[চ] অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া 'অর্' হয়, অর্-এর অ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং 'র্' রেফ হইয়া পরবর্ণের মস্তকে যায়।

অ বর্ণ+ঋ বর্ণ>অর্ (বা আর্—মাত্র তৃতীয়া তৎপুরুষে)
অ+ঋ>অর্ ; আ+ঋ>অর্
যথা, দেব+ঋষি>দেবর্ষি ; মহা+ঋষি>মহর্ষি

এইরূপ—রাজর্ষি, তৃষ্ণার্ত (তৃষ্ণা+ঋত), শোকার্ত।

প্রয়োগ—সঙ্গে দেবর্ষি ও মহর্ষিগণও আবির্ভূত হইলেন।

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

[ছ] অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐ-কার হয় এবং ঐ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ বর্ণ+এ ; ঐ>ঐ
অ+এ>ঐ অ+ঐ>ঐ
আ+এ>ঐ আ+ঐ>
যথা, জন+এক>জনৈক মত+ঐক্য>মতৈক্য
তথা+এব>তথৈব মহা+ঐরাবত>মহৈরাবত

এইরূপ—হিতৈষী, মহৈশ্বর্য, সবৈব।

প্রয়োগ—স্বদেশ-হিতৈষী চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

[জ] অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঔ-কার হয় এবং ঔ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ+ও>ঔ অ+ঔ>ঔ
আ+ও>ঔ আ+ঔ>ঔ
যথা, দিব্য+ওষধি>দিব্যৌষধি, উত্তম+ঔষধ>উত্তমৌষধ
মহা+ওষধি>মহৌষধি, মহা+ঔষধ>মহৌষধ

এইরূপ—চিত্তৌদার্য, জলৌঘ, পরমৌষধ, বনৌষধি।

প্রয়োগ—কুইনাইন্ ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

[ঝ] ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে ই-ঈ-স্থানে য্ হয় এবং ঐ য্-তে পরবর্তী স্বর যুক্ত হয়।

ই-বর্ণ+অন্য স্বরবর্ণ>ই-বর্ণস্থানে য

যথা, যদি + অপি > যদ্যপি প্রতি + আশা > প্রত্যাশা

পরি + অটন > পর্যটন ইতি + আদি > ইত্যাদি

অতি + অন্ত > অত্যন্ত নদী + অম্বু > নদ্যম্বু

এইরূপ—প্রত্যুত্তর, প্রত্যেক।

প্রয়োগ—কোন স্থান হইতে একটি কপর্দকও আয়ের প্রত্যাশা ছিল না।

—যোগীন্দ্রনাথ বসু

[ঞ] উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে উ-ঊ-কারের স্থানে 'ব্' হয় এবং ব্-এর সহিত পরবর্তী স্বর যুক্ত হয়।

উ-বর্ণ + অন্য স্বরবর্ণ > উ-বর্ণস্থানে ব্

যথা, অনু + অয় > অন্বয় অনু + এষণ > অন্বেষণ

সু + অল্প > স্বল্প মনু + অন্তর > মন্বন্তর

এইরূপ—স্বচ্ছ, পশ্বধম, বহ্বাড়ম্বর, বধ্বাদি, অন্বিত।

প্রয়োগ—প্রভুর অনুমতি লইয়াই তিনি সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন।

—জলধর সেন

[ট] এ-কার ও ঐ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে এ-কারের স্থানে 'অয়্' হয় এবং ঐ-কারের স্থানে 'আয়্' হয়।

(১) এ + স্বরবর্ণ > এ স্থানে অয়্

ঐ + স্বরবর্ণ > ঐ স্থানে আয়্

যথা, নে + অন > নয়ন, শে + অন > শয়ন

গৈ + অক > গায়ক, নৈ + অক > নায়ক

প্রয়োগ—দুটি কমলদলের মত আয়ত নয়নে ফোয়ারার মত অশ্রু ছুটিল।

—শরৎচন্দ্র

[ঠ] স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ও-কারের স্থানে 'অব্', ঔ-কারের স্থানে 'আব্' হয়।

ও + স্বরবর্ণ > ও স্থানে অব্

ঔ + স্বরবর্ণ > ঔ স্থানে আব্

যথা, ভো + অন > ভবন পো + অন > পবন

নৌ + ইক > নাবিক ভৌ + উক > ভাবুক

এইরূপ—গবেষণা, পবিত্র।

প্রয়োগ—নূতন ধান্যে হবে নবান্ন তোমার ভবনে ভবনে।

—রবীন্দ্রনাথ

[ড] ঋ-ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ঋ-স্থানে 'র্' হয় এবং 'র্' পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়, আর পরের স্বর র-কারের সহিত যুক্ত হয়।

ঋবর্ণ + অন্য স্বরবর্ণ > ঋবর্ণ-স্থানে র্

যথা, পিতৃ + আলয় > পিত্রালয় পিতৃ + আদেশ > পিত্রাদেশ

এইরূপ—পিতৃচ্ছা, পিত্রেষণা, মাত্রাদেশ।

প্রয়োগ—বালকটি পিত্রালয় হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।

* স্বরসন্ধি-নিয়মের ব্যতিক্রম

(১) সমাসে 'ওষ্ঠ' শব্দ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত অ-কার বা আ-কারের বিকল্পে লোপ হয়। যথা, বিম্ব + ওষ্ঠ > বিম্বোষ্ঠ বা বিম্বৌষ্ঠ।

(২) 'গো' শব্দের পর 'ইন্দ্র', 'অস্থি' ও 'অক্ষ' শব্দ থাকিলে ও-কারস্থানে 'অব' হয়; 'ঈশ' থাকিলে 'অব্' আর 'অব' দুইই হয়। যথা, গো + ইন্দ্র > গবেন্দ্র, গো + অস্থি > গবাস্থি, গো + অক্ষ > গবাক্ষ ; কিন্তু গো + ঈশ > গবেশ বা গবীশ।

(৩) ঈর কিংবা ঈরিন্ শব্দ পরে থাকিলে, 'স্ব' শব্দের অ-কার ঐ-কার হয় এবং পরস্থিত ঈ-কারের লোপ হয়। যথা, স্ব + ঈর > স্বৈর (free); স্ব + ঈরী > স্বৈরী (uncontrolled), স্বৈরিণী (a woman of loose moral)।

(৪) ঊহিনী শব্দ পরে থাকিলে অক্ষ শব্দের অন্ত্য অ-কার এবং পরস্থিত ঊ-কার লুপ্ত হয়। যথা, অক্ষ + ঊহিনী > অক্ষৌহিণী।

(৫) শকন্ধু প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

যথা, শক + অন্ধু > শকন্ধু, কুল + অটা > কুলটা (a prostitute), সীমন্ + অন্ত > সীমন্ত, মনস্ + ঈষা > মনীষা (intellect), সার + অঙ্গ > সারঙ্গ (deer) পতৎ + অঞ্জলি > পতঞ্জলি (মুনিবিশেষের নাম) পৃষৎ + উদর > পৃষোদর।

প্রয়োগ—রামগোপালের অনন্যসাধারণ মনীষা ও মনস্বিতা আদর্শস্থল ছিল।

—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

॥ অনুশীলনী ॥

১। সন্ধি কাহাকে বলে? উহা কয়প্রকার ও কি কি?

২। সংস্কৃত সন্ধি ও বাঙ্‌লা সন্ধির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?

৩। স্বরসন্ধি কাহাকে বলে? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৪। বাঙ্‌লা সন্ধির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কি জান লেখ।

৫। **সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ**

হিমাচল, জলাশয়, মুনীন্দ্র, কটূক্তি, মহর্ষি, বনৌষধি, নাবিক, পরমৌদার্য, ভবন, গবাক্ষ, গবেন্দ্র।

৬। **সন্ধি কর এবং প্রত্যেকটির সাহায্যে এক একটি বাক্য রচনা কর।**

অনু + এষণ, শীত + ঋত, নৈ + অক, নব + ঊঢ়া, দেব + ইন্দ্র, পরি + ঈক্ষা, তথা + অপি, মহা + অর্ণব, রমা + ঈশ, স্ব + ঈর।

* সমস্ত জিনিসটাকে 'নিয়মবহির্ভূত স্বরসন্ধি' বলে দিলেই চলে। নিয়মের দরকার হয় না।

(২) ব্যঞ্জন-সন্ধি

[ক] চ্ কিংবা ছ্ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়। যেমন, শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র, উদ্ + চ্ছেদ = উচ্ছেদ।

[খ] হ্রস্ব স্বরবর্ণের পর ছ থাকিলে ছ-স্থানে চ্ছ হয়; যেমন, বি + ছেদ = বিচ্ছেদ, তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া, পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ, অব + ছেদ = অবচ্ছেদ।

[গ] জ কিংবা ঝ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে জ্ হয়। যেমন, যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন, জগৎ + জন = জগজ্জন, উদ্ + জ্বল = উজ্জ্বল।

[ঘ] ল পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে ল্ হয়। যেমন, বিদ্যুৎ + লেখা = বিদ্যুল্লেখা, উদ্ + লেখ = উল্লেখ।

[ঙ] স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ বর্ণ অথবা য-র-ল-ব-হ পরে থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। যেমন, দিক্ + অন্ত = দিগন্ত, ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত, বাক্ + ঈশ্বরী + বাগীশ্বরী, ষট্ + দর্শন = ষড়্দর্শন, প্রাক্ + জ্যোতিষ = প্রাগ জ্যোতিষ, অপ্ + জ = অব্জ [পদ্ম], জগৎ + বাসী = জগদ্বাসী।

[চ] পদের অন্তস্থিত ত্-কার কিংবা দ্-কারের পর হ থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া দ্ধ হয়। যেমন, উদ্ + হৃত = উদ্ধৃত, উদ্ + হৃত + উদ্ধৃত, তৎ + হিত = তদ্ধিত, জগৎ + হিত = জগদ্ধিত।

[ছ] যদি ত্-কার অথবা দ্-কারের পর তালব্য শ থাকে তাহা হইলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ এবং তালব্য শ-স্থানে ছ হয়। যেমন, উদ্ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস, চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি।

[জ] য-র-ল-ব-হ-শ-ষ-স-এর পূর্ববর্তী ম্ স্থানে অনুস্বার হয়। যেমন, সম্ + বাদ = সংবাদ, সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন, বশম্ + বদ = বংশবদ। কিন্তু, সম্ + রাজ [রাট্] = সম্রাজ [সম্রাট্]।

[ঝ] ন কিংবা ম পরে থাকিলে বর্গীয় বর্ণের স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যেমন, জগৎ + নাথ = জগন্নাথ, বাক্ + ময় = বাঙ্ময়, চিৎ + ময় = চিন্ময়, মৃৎ + ময়ী = মৃন্ময়ী, উদ্ + নীত = উন্নীত।

[ঞ] স্পর্শবর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার হয় অথবা যে-বর্গের বর্ণ পরে থাকে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যেমন, সম্ + কলন = সংকলন অথবা সঙ্কলন; সম্ + গীত = সংগীত অথবা সঙ্গীত; সম্ + চয় = সংচয় অথবা সঞ্চয়; কিন্তু ম্ পদান্ত না হইলে [পদমধ্যগত হইলে] ম্ স্থানে শুধু পঞ্চম বর্ণ হয়, অনুস্বার হয় না। যেমন, শাম্ + ত = শান্ত, গম্ + তব্য = গন্তব্য, অম্ + কন = অঙ্কন, শম্ + কা = শঙ্কা।

[ট] যদি বর্গের তৃতীয় অথবা চতুর্থ বর্ণের পরে বর্গের প্রথম অথবা দ্বিতীয় বর্ণ থাকে কিংবা শ, ষ, স থাকে তাহা হইলে তৃতীয় অথবা চতুর্থ বর্ণের স্থানে

সেই বর্গের **প্রথম বর্ণ** হয়। যেমন, হৃদ্ + কমল = হৃৎকমল, ক্ষুধ্ + পীড়িত = ক্ষুৎপীড়িত।

[ঠ] **'উদ্'** উপসর্গের পর **'স্থা'** ধাতুর **স-কারের লোপ** হয়। যেমন, উদ্ + স্থান = উত্থান, উদ্ + স্থিত = উত্থিত।

[ড] **'সম্'** উপসর্গের পর 'কার', 'কৃত' শব্দ থাকিলে উক্ত উপসর্গের **ম্**-স্থানে **অনুস্বার** হয় এবং এই অনুস্বারের পর একটি 'স'-এর আগম হয়। যেমন, সম্ + কৃত = সংস্কৃত, সম্ + কার = সংস্কার।

[ঢ] **'পরি'** উপসর্গের পর 'কার', 'কৃত' প্রভৃতি শব্দ থাকিলে একটি **স**-এর আগম হয় এবং এই **দন্ত্য স** মূর্ধন্য **ষ**-তে পরিবর্তিত হইয়া যায়। যেমন, পরি + কার = পরিষ্কার।

[ণ] **ষ**-এর পরবর্তী **ত** ও **থ**-স্থানে যথাক্রমে **ট** এবং **ঠ** হয়। যেমন, কৃষ্ + তি = কৃষ্টি, ষষ্ + থ = ষষ্ঠ।

[ত] **উষ্মবর্ণ** পরে থাকিলে পদমধ্যস্থিত **ম্**-স্থানে অনুস্বার হয়। যেমন, হিম্ + সা = হিংসা, দন্ + শন = দংশন, ইত্যাদি।

প্রয়োগ—১। রত্নাকরের রামনাম **উচ্চারণে** অধিকার ছিল না।

—রামেন্দ্রসুন্দর

২। **উজ্জ্বল** প্রভাতের পর **উজ্জ্বলতর** মধ্যাহ্ন দেখা গেল কেন?

—চন্দ্রশেখর

৩। শিষ্যগণ হানিবারে **উদ্যত** হইলা। —বৃন্দাবন দাস

৪। বাল্যাবস্থায় আমাদের নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিসকল কিরূপে পরিচালনা করা উচিত, তাহা এক্ষণে সংক্ষেপে **উল্লেখ** করা যাইবে।

—গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৫। ব্যবসায় না করিলে বাঙালির **উদ্ধার** হইবে না। —চন্দ্রশেখর

৬। **দিগন্ত** থেকে **দিগন্ত** পর্যন্ত মৃত্যু। —রবীন্দ্রনাথ

৭। কে আর যজমান সাজিয়া তাহার এই অসমাপ্ত যজ্ঞ **উদ্‌যাপন** করিবে?

—যাদবেশ্বর তর্করত্ন

৮। **জগন্মাতা** পুত্র তাঁর ক্ষুদ্র কীট আদি। —গিরিশচন্দ্র

৯। **সংশয়ে ও আশঙ্কায়** তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল।

—রবীন্দ্রনাথ

বিসর্গ-সন্ধি

[ক] **চ** অথবা **ছ** পরে থাকিলে **বিসর্গ**-স্থানে **শ্** হয়, **ট** অথবা **ঠ** পরে থাকিলে **বিসর্গ-স্থানে ষ্** হয়, এবং **ত** অথবা **থ** পরে থাকিলে **বিসর্গ**-স্থানে **স্** হয়। যেমন, নিঃ + চয় = নিশ্চয়, নিঃ + চল = নিশ্চল, শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ, ধনুঃ + টংকার = ধনুষ্টংকার, ইতঃ + ততঃ = ইতস্ততঃ, মনঃ + তাপ = মনস্তাপ।

[খ] স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম বর্ণ অথবা য-র-ল-ব-হ পরে থাকিলে র-জাত **বিসর্গ**-স্থানে **র্** হয়, এই র্ রেফ্ হইয়া পরবর্ণের মস্তকে যায়। যেমন, পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম, অন্তঃ + যামী = অন্তর্যামী, অন্তঃ + হিত = অন্তর্হিত।

[গ] **র** পরে থাকিলে **ই-কার** ও উ-কারের পরবর্তী **বিসর্গের লোপ হয়** এবং **উহার পূর্বস্বর দীর্ঘ** হয়। যেমন, নিঃ + রোগ = নীরোগ, নিঃ + রস = নীরস, চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষুরোগ।

[ঘ] **অ, আ** ভিন্ন স্বরবর্ণের পরবর্তী বিসর্গের পরে যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম বর্ণ এবং য-ব-ল ব-হ থাকে তাহা হইলে **বিসর্গ**-স্থানে **র্** হয়, র্ রেফ হইয়া পরবর্ণের মস্তকে যায়। যেমন, দুঃ + দম = দুর্দম, আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ, নিঃ + ঝর = নির্ঝরি, মুহুঃ + মুহুঃ = মুহুর্মুহুঃ।

[ঙ] **অ-কার,** বর্গের তৃতীয়-চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ অথবা য র-ল-ব-হ পরে থাকিলে **অ-কারের পরস্থিত বিসর্গ 'ও'** হয় এবং ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন, ততঃ + অধিক = ততোধিক, মনঃ + যোগ = মনোযোগ, পুরঃ + হিত = পুরোহিত, সরঃ + বর = সরোবর, সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত, তপঃ + বল = তপোবল, মনঃ + গত = মনোগত, মনঃ + জ = মনোজ, তপঃ + বন = তপোবন, ইত্যাদি। **মনে রাখিতে হইবে** যে বর্গের **প্রথম** ও **দ্বিতীয়** বর্ণ এবং **শ, ষ, স,** পরে থাকিলে এই **নিয়ম প্রযুক্ত হয় না**। যেমন, মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট, পয়ঃ + প্রণালী = পয়ঃপ্রণালী, শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া, আয়ুঃ + শেষ = আয়ুঃশেষ ইত্যাদি।

[চ] ক্, খ্, প্, ফ্ পরে থাকিলে অ-কার বা আ-কারের পরস্থিত **বিসর্গ** স্থানে **স্** হয়। যেমন, নমঃ + কার = নমস্কার, শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর, পুরঃ + কার = পুরস্কার, ভাঃ + কর = ভাস্কর, তিরঃ + কার = তিরস্কার। কিন্তু **মনে রাখিতে হইবে, অ, আ ভিন্ন** স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গ 'ষ' হয়। যেমন, নিঃ + ফল = নিষ্ফল, আবিঃ + কার = আবিষ্কার, বহিঃ + কার = বহিষ্কার, ভ্রাতুঃ + পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র, ইত্যাদি।

[ছ] **অ-কারের** পরবর্তী **র-জাত** বিসর্গের পরে যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম বর্ণ অথবা য র-ল-ব-হ থাকে তাহা হইলে উক্ত বিসর্গ-স্থানে র্ হয়। যেমন, প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ, অন্তঃ + গত = অন্তর্গত, অহঃ + নিশ = অহর্নিশ, অহঃ + অহ = অহরহ। কিন্তু 'রাত্রি' শব্দ পরে থাকিলে 'অহন্' শব্দের র-জাত **বিসর্গ** স্থানে **র্ হয় না**। সুতরাং **অহঃ + রাত্র = অহোরাত্র**।

দ্রষ্টব্য ঃ নিম্নলিখিত শব্দগুলি **নিপাতনে সিদ্ধ ঃ**

তৎ + কর = তস্কর, আ + চর্য = আশ্চর্য, বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি, বন + পতি = বনস্পতি, গো + পদ = গোষ্পদ, ষট্ + দশ = ষোড়শ, দিব্ + লোক = দ্যুলোক, হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র, ইত্যাদি।

প্রয়োগ—১। **নির্মম** বিধাতা, এ কি নিয়ম তোমার? —কুমুদরঞ্জন

২। **নির্বিকার** সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল। —সত্যেন্দ্রনাথ

৩। কোথা গেল রবি সুদূর **দিগন্ত**-মাঝে। —প্রমথনাথ

৪। দাঁড়াইয়া জীবনের **প্রাণান্ত** সন্ধ্যায় —প্রমথনাথ

৫। হিমাদ্রি আপনি মুকুট-আকারে হের
শোভে **শিরোদেশে**। —যোগীন্দ্রনাথ

৬। কিন্তু প্রতিশৈলে তার, প্রতি নদীকূলে, রয়েছে **অঙ্কিত**, বৎস।

৭। পাপরূপ পিশাচ যাদের **হৃদাসন** —কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

৮। ভূতের মতন চেহারা যেমন **নির্বোধ** অতি ঘোর। —রবীন্দ্রনাথ

৯। পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে **প্রাতরাশে** বসিয়াছি এমন সময় **বহির্দ্বারে** শব্দ উত্থিত হইল। —প্রভাতকুমার

প্রকৃত বাঙ্‌লা সন্ধি

পূর্বে যাহা দেখান হইল, তাহা সংস্কৃতানুগ সন্ধি। সন্ধির মূল হইল ধ্বনিতত্ত্বগত প্রক্রিয়া যাহা প্রায়শ স্বাভাবিক, ক্বচিৎ সেই সেই ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্যে যুক্ত। সুতরাং আমরা পূর্বে যাহা দেখাইয়াছি, সেইগুলি বাঙ্‌লায় প্রচলিত (তৎসম) শব্দেই প্রয়োজ্য হইবে। শুদ্ধ বাঙ্‌লার যে সন্ধি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

মনে রাখিতে হইবে, সংস্কৃতে যেমন সমাসস্থলে সন্ধি অবশ্যকর্তব্য, বাঙ্‌লায় সেরূপ নহে। বাঙ্‌লায় স্বরসন্ধি বহুস্থলে না করিয়াই পদদ্বয়কে যুক্ত বা সমাসবদ্ধ করা হইয়া থাকে। তৎসম শব্দ সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে। কিন্তু অতৎসম শব্দের আবার ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মানুগভাবে সন্ধি করা হইয়া থাকে। ফলত, বাঙ্‌লা সন্ধি না হইবে কোথায় বলা যায় না বটে, কিন্তু হইবে কোথায় কীভাবে তাহা অনেকটা বলা যায়।

কথ্যবাঙ্‌লার স্বর ও ব্যঞ্জন সন্ধি, বিশেষত ব্যঞ্জনসন্ধি, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্‌লা সন্ধির আর-একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, বহুক্ষেত্রে আমরা কথা বলিবার কালে যেমন উচ্চারণ করি, লিখিবার কালে সেরূপ সন্ধি করিয়া লিখি না। যথা, সাত চড়ে ('সাচ্চড়ে' লিখি না), পাঁচজনে ('পাঁজ্জনে' নহে), ইত্যাদি।

সাধারণত সন্ধির নিয়মানুসারে হইলেও, তৎসম ও অতৎসম শব্দে সন্ধি করা অনুচিত। তবে এরূপ সন্ধিও কোথাও কোথাও মানিয়া লইতে হয়। যেমন, মনো-মাঝে ; 'মাঝে' সংস্কৃত নহে, তবুও এরূপ শব্দ বাঙ্‌লায় চলে। মনঃ+অন্তর মনোন্তর। কিন্তু বাঙ্‌লায় মনঃ হইতে 'মন' ধরিয়া লইয়া 'মনান্তর' চলিতেছে। আইনানুগ, আইনানুসারে, প্রচুর চলিতেছে।

[ক] বাঙ্‌লা স্বরসন্ধি

(ক) স্বরধ্বনির পরে স্বরধ্বনি আসিলে প্রথমটির কোথাও কোথাও লোপ হয়।

যথা, বার+এক>বারেক। তিল+এক>তিলেক। যত+এক>যতেক।

এরূপ—খানেক, অর্ধেক, লক্ষেক, মুহূর্তেক। [অ+এ>এ]
তেমনি, এমনি, তখনি, যখনি, কাহারো।

প্রয়োগ—(১) বারেক তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে —রবীন্দ্রনাথ
(২) অপূর্ব প্রত্যয় দীপ্ত যথেক কাঞ্চন —সরোজরঞ্জন

(খ) চলিত কথায় সন্ধিতে কোথাও কোথাও মধ্যস্থিত স্বরবর্ণের লোপ হয়। যথা,

যা + ইচ্ছে + তাই>যাচ্ছেতাই।
বোকা + চন্দ্র>বোকচন্দ্র।
কাঁচা + কলা>কাঁচকলা
ঘোড়া + গাড়ী>ঘোড়গাড়ী।

(গ) সাধু বাঙ্‌লা সমাসের বেলায় সন্ধি করিবার নিয়ম আছে, কিন্তু খাঁটি বাঙ্‌লায় ভাষার প্রকৃতি অনুসারে সমাসে সন্ধি করিবার প্রয়োজন নাই।

প্রমোদোদ্যান না লিখিয়া প্রমোদ-উদ্যান
রক্তামাশয় " " রক্ত-আমাশয়
রাজান্তঃপুর " " রাজ-অন্তঃপুর
দেশোদ্ধার " " দেশ-উদ্ধার
মানাপমান " " মান-অপমান

(ঘ) নিম্নলিখিত খাঁটি বাঙ্‌লার সন্ধিগুলি লক্ষ্য কর :

ছেলে + আমি>ছেলেমি। কোটি + এক>কোটিক। খানি + এক>খানিক। গোটা + এক>গোটাক। খানা + এক>খানেক।

(ঙ) সন্ধি করিলে যদি শ্রুতিকটু না হয় তবে সন্ধি করা উচিত, অন্যথা নহে। যথা, গুর্বাজ্ঞা, হেমন্তর্তু, বুদ্ধ্যনুসারে এরূপ সন্ধি না করিয়া গুরুর আজ্ঞা, হেমন্ত-ঋতু, এবং বুদ্ধি-অনুসারে এইপ্রকার লেখা উচিত।

প্রয়োগ—বস্ত্র-অলঙ্কারে কিছু নাহি প্রয়োজন। —কৃত্তিবাস

(চ) সংস্কৃত ভাষায় একটি বাক্যের অন্তর্গত যে-কোনো পদের মধ্যে সন্ধি করা যাইতে পারে কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষায় সেরূপ সন্ধি সম্ভবপর নহে। যথা, অনন্তম্ অপূজয়ন্ অমরাঃ>অনন্তমপূজয়ন্নমরাঃ (সংস্কৃত), কিন্তু বাঙ্‌লায় যদি বলি,—অনন্ত আসিলে অমরগণ হইলেন আনন্দিত, তবে সন্ধি করিলে দাঁড়াইবে—অনন্তাসিলেঽমরগণ হইলেনানন্দিত—এরূপ চলে না।

[খ] বাঙ্‌লা ব্যঞ্জনসন্ধি

বাঙ্‌লা ব্যঞ্জনসন্ধির মূলে আছে পদান্তের অ-কারের উচ্চারণ না করা। কখনো কখনো পদান্তস্থিত অন্যান্য স্বরও উচ্চারিত হয় না এমন দেখা যায়।

বর্গের তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চমবর্ণ বা য র ল ব পরে থাকিলে, বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়; যেমন—পাঁচ + জন = পাঁজ্‌জন; পাঁচ + ভূত = পাঁজ্‌ভূত, এক + গা = এগ্‌গা (গয়না); যত + দিন = যদ্দিন।

বর্গের প্রথম দ্বিতীয় বর্ণ পরে থাকিলে, বর্গের চতুর্থ বর্ণস্থানে সেই বর্গের প্রথম বর্ণ হয়। বাঘ + কোথায় = বাক্‌কোথায় ; আধ + খানা = আৎখানা।

পরে চবর্গ থাকিলে, পূর্বের তবর্গস্থানে চবর্গ হইয়া যায়। হাত + জোড়া = হাজ্জোড়া ; নাতি (নাত) + জামাই = নাজ্জামাই ; বদ্‌ + জাত = বজ্জাত।

বর্গপঞ্চম পরে থাকিলে বর্গীয়বর্ণস্থানে প্রায়শ পঞ্চমবর্ণ হয়। কাঁদ + না = কান্না ; রাঁধ্‌ + না = রান্না।

র-কারের পরে ব্যঞ্জন থাকিলে র প্রায়শ সেই ব্যঞ্জনে পরিবর্তিত হয়। তোর + যত = তোর + জতো = তোজ্জতো ; বাপের + জন্মে = বাপেজ্জন্মে ; কর্‌ + তা = কত্তা ; কর + তাল = কত্তাল ; ঘোড়ার + ডিম = ঘোড়াড্ডিম ; মার্‌ + না = মান্না ; ব্যাটার + ছেলে = ব্যাটাচ্ছেলে ; আমার + তাতে কী = আমাত্তাতে কী ; তার + চলছে না = তাচ্চলছে না ; আমার + টাকা = আমাট্টাকা।

টবর্গ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত তবর্গস্থানে টবর্গ হয়। হাত + টান = হাট্‌টান। এত + টুকু = এট্‌টুকু। পুরুত + ঠাকুর = পুরুট্‌ঠাকুর। রথ + টানা = রট্‌টানা।

শ বা স পরে থাকিলে চ-কারস্থানে শ বা স হয়। পাঁচ + শ = পাঁশ্‌শ। পাঁচ + সের = পাঁস্‌সের।

বাঙলার আর-এক প্রকার সন্ধি আছে, তাহাকে প্রকৃতপক্ষে সন্ধি বলা উচিত নয়, তাহা অন্ত্যবর্ণলোপ মাত্র।

ঘোড়া + গাড়ি = ঘোড়গাড়ি ; ঘোড়া + সওয়ার = ঘোড়সওয়ার ; নাতি + জামাই = নাতজামাই (পরে সন্ধিতে নাজ্জামাই) ; জগৎ + বন্ধু = জগবন্ধু ; জগৎ + মোহন = জগমোহন ; মুখ + খানি = মুখানি (প্রায়শ পদ্যে)।

বাঙলার যে-সন্ধিগুলি উপরে দেখান হইল, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, বাঙলায় সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম বহুলাংশে মানা হয় যদিও সর্বত্র নহে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। সন্ধি কর :

আদি + অন্ত, পৈ + অক, বঙ্গ + উপসাগর, দেব + ঋষি, কথা + অমৃত, দেব + ঈশ, জল + ঊর্মি, হিত + এষণা, গিরি + ঈশ, সু + আগত, ঢাকা + ঈশ্বরী, নৌ + ইক, দীর্ঘ + আয়ু, মাতৃ + অনুমতি, শে + অন, কুল + অটা, অন্ন + অন্ন, সীম + অন্ত, গো + অক্ষ।

২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

শীতার্ত, নাবিক, ভবন, নায়ক, মনীষা, অক্ষৌহিণী, বাগেন্দ্র, বিম্বোষ্ঠ, পবিত্র, অত্যুক্তি, হিতৈষী, জনৈক, স্বাগত, অত্যন্ত, ক্ষণিক, সর্বোৎকৃষ্ট, চন্দ্রোদয়, দেবর্ষি, বধূক্তি, সতীশ, রবীন্দ্র, মহেন্দ্র, শোকার্ত।

৩। **সন্ধি কর :**

যাচ্ + না, নিঃ + রব, চক্ষুঃ + রোগ, দিক্ + অন্ত, পরি + ছেদ, সৎ + শুক্ল, তদ্ + ছবি, বিপদ্ + জাল, চলৎ + শক্তি, জগৎ + হিত, দিক্ + নাগ, বাক্ + ময়।

৪। **সন্ধি বিশ্লেষণ কর :**

উচ্ছ্বাস, জগন্মাতা, উল্লিখিত, বাঙ্ময়, দুশ্চরিত্র, শিরশ্ছেদ, মনোভাব, অন্তর্যামী, স্বর্গত।

৫। **সংস্কৃত ও বাঙ্‌লা সন্ধির বৈশিষ্ট্য কী?**

৬। বাঙ্‌লা সন্ধির নিজস্ব কোনো নিয়ম আছে কী? উদাহরণসহ সংক্ষেপে আলোচনা কর। [কলি. মাধ্য. ১৯৪৬]

চতুর্থ অধ্যায়

॥ ণত্ববিধান ও ষত্ববিধান ॥

[১] ণত্ব-বিধান

যে নিয়মে ন-কার ণ-কারে পরিণত হয় তাহাকে বলে **ণত্ব-বিধান**। নিম্নে যে-সকল নিয়ম প্রদর্শিত হইল সেই নিয়ম বাঙ্‌লা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত বা 'তৎসম' শব্দের বেলায় খাটিবে। খাঁটি বাঙ্‌লায় কিন্তু ণত্ববিধানের কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। তবে যে যে স্থলে খাঁটি বাঙ্‌লা সংস্কৃতের প্রভাব এড়াইতে পারে নাই সেখানে কিন্তু উচ্চারণের কোনো বৈষম্য না থাকায় বহুস্থলে ন ও ণ দুইই চলে। যথা—সোনা, সোণা; রাণী, রানী; ঝরনা, ঝরণা প্রভৃতি।

বিদেশি শব্দস্থলেও যেখানে ণ-কার দেখা যায় সেখানে কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাবই উহার কারণ। যেমন—ট্রেণ, জার্মাণী প্রভৃতি শব্দে। এস্থলে ট্রেন, জার্মানী-ও লিখিতে পারা যায়।

[তৎসম শব্দের উপর প্রযুক্ত নিয়মাবলী]

(ক) ঋ, র্, ষ্ এর পরবর্তী 'ন'-কার মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যথা—তৃণ, মসৃণ, পূর্ণ, বর্ণ তীক্ষ্ণ প্রভৃতি।

প্রয়োগ—(১) শূন্য দৃষ্টি, শীর্ণ বাহু তুলি

(২) তাহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইতে পারে কিন্তু ধীরবুদ্ধি হয় না।

—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(খ) স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, ও য্, ব্, হ্ মধ্যে থাকিলে ন মূর্ধন্য ণ হয়। যথা—পাষাণ, হরিণ, দর্পণ, ব্রাহ্মণ, গৃহিণী, বিভীষণ, কিরণ, অন্বেষণ, প্রাণ প্রভৃতি।

প্রয়োগ—(১) বিভীষণগৃহিণী বিমল চরিত্রানুরাগিণী সরমা

—কালীপ্রসন্ন ঘোষ

(২) ঈশ্বরের **অন্বেষণে** কোথায় যাইতেছ? —বিবেকানন্দ

(৩) এস, **ব্রাহ্মণ**, শুচি করি মন। —রবীন্দ্রনাথ

(গ) অন্তবর্ণ ব্যবধান থাকিলে হয় না। যথা—অর্চনা, কীর্তন, অর্জুন, উপার্জন প্রভৃতি।

প্রয়োগ—(১) হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম-**উপার্জন**? —গিরিশ ঘোষ

(ঘ) পদের অন্তস্থিত দন্ত্য 'ন মূর্ধন্য 'ণ' হইবে না। যথা—রূপবান, শ্রীমান্ প্রভৃতি।

প্রয়োগ—স্বদেশে কোলমাত্রই **রূপবান্**, অন্তত আমার চোখে।

—সঞ্জীবচন্দ্র

(ঙ) বাঙ্‌লা ক্রিয়াপদের অন্তস্থিত 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয় না। যথা—পারেন, মারেন, ধরেন প্রভৃতি।

(চ) ন-কার ত-বর্গযুক্ত হইলে 'ণ' হয় না। যথা—ক্রন্দন, বন্ধন, গ্রন্থ।

প্রয়োগ—অরণ্য পুরিল তার কাতর **ক্রন্দনে**। —বিহারীলাল

(ছ) ন-কার ট-বর্গযুক্ত হইলে নিত্য 'ণ' হয়। যথা—ভাণ্ডার, চণ্ডিকা, কণ্ঠ, বণ্টন, লুণ্ঠন প্রভৃতি।

প্রয়োগ—দণ্ডক **ভাণ্ডার** যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? —মাইকেল

(জ) প্র, পরা, পরি, নির্—এই চারিটি উপসর্গের পরবর্তী ধাতুর আদিস্থিত দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হইবে। যথা—প্রণাম, পরিণাম, নির্ণয়, প্রণীত প্রভৃতি। কিন্তু 'প্রনষ্ট'—এস্থলে 'ন'-কারই থাকে।

প্রয়োগ—(১) পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহ ভাই, সবারে আমি **প্রণাম** করে যাই।

—রবীন্দ্রনাথ

(২) যে-ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য তাহাতেই গ্রন্থ **প্রণীত** হওয়া উচিত। —বঙ্কিমচন্দ্র

(ঝ) অয়ন শব্দের দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়। যথা—চান্দ্রায়ণ, পরায়ণ, নারায়ণ প্রভৃতি।

প্রয়োগ—মুদিয়া নয়ন 'নারায়ণ নারায়ণ' করিল স্মরণ। —রবীন্দ্রনাথ

(ঞ) প্র, পূর্ব, অপর শব্দের পরবর্তী অহন্ শব্দের ন মূর্ধন্য ণ হয়। যথা—প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ।

প্রয়োগ—নিত্য **অপরাহ্নে** আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম। —সঞ্জীবচন্দ্র

(ট) সমাসে যদি পূর্বপদে ঋ র্ ষ্ থাকে এবং পরপদে ন্ থাকে তাহা হইলে দন্ত্য 'ন' স্থানে মূর্ধন্য 'ণ' হয় না। যথা—হরিনাম, দুর্নাম, রঘুনন্দন প্রভৃতি।

প্রয়োগ—(১) উভয় গায়ক বলে—**শ্রীরঘুনন্দন**। —কৃত্তিবাস

(ঠ) ফাল্গুন, গগন ও ফেন শব্দে সর্বদা 'ন' হইবে।

প্রয়োগ—পদ্মাবতীসহ চণ্ডী হাসেন **গগনে**। —কবিকঙ্কণ

(ড) কতকগুলি শব্দের স্বভাবত 'ণ' হয়। যথা—মণি, গুণ, বেণী, গণ্য, কঙ্কণ, পাণি, গৌণ, বাণিজ্য, স্থাণু, ঘুণ, চিক্কণ, নিপুণ, লবণ, লাবণ্য, বিপণি, চাণক্য, মাণিক্য, কল্যাণ, পুণ্য, ফণা, অণু প্রভৃতি।

প্রয়োগ—(১) **ফণিনীর** মত পিঠে বেণী ঝুলিছে। —গোলাম মোস্তাফা

(২) মাণিক্য অঙ্গুরী সপ্ত নৃপতির ধন। —কবিকঙ্কণ

(৩) মিছা মণি মুক্তা হেম। —ঈশ্বর গুপ্ত

[২] ষত্ববিধান

(ক) অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক্ ও র্-বর্ণের পর প্রত্যয়ের দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যথা—শ্রীচরণকমলেষু, কল্যাণবরেষু, আকর্ষণ, ভীষণ, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি।

প্রয়োগ—(১) সদা করিতেন সেবা **লক্ষ্মণ** সুমতি। —মাইকেল

(২) **দাক্ষায়ণীর** অভিশাপ বাণ। —করুণানিধান

(খ) 'সাৎ'-প্রত্যয়ের দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয় না। যথা—ভূমিসাৎ, ধূলিসাৎ, অগ্নিসাৎ।

(গ) উপসর্গের ই-কার বা উ-কারের পরবর্তী ধাতুর আদিস্থিত 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যথা—অভিষেক, নিষিক্ত, অনুষ্ঠান, নিষিদ্ধ প্রভৃতি।

প্রয়োগ—সেইদিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি **নিষিক্ত** হইল।

(ঘ) সমাসে দুইটি পদ একপদে পরিণত হইলে, এবং প্রথম পদের শেষে ই, উ, ঋ থাকিলে, পরবর্তী আদিস্থিত দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ'-তে পরিণত হয়। যথা—যুধিষ্ঠির, মাতৃষ্বসা, অগ্নিষ্টোম, সুষমা (সু + সমা), গোষ্ঠ (গো + স্থ) প্রভৃতি।

(ঙ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির ষ-কার স্বাভাবিক :

আষাঢ়, পাষাণ, ঔষধ, পাষণ্ড, অভিলাষ, মহিষ, নিকষ, প্রদোষ, দোষ, পুরুষ প্রভৃতি।

প্রয়োগ—(১) শৈশবের **ঊষা**-অন্তে, হইল আমার
প্রকৃতি-প্রভাতসনে জীবন প্রভাত। —নবীন সেন

(২) ভুলে যাই শোক-তাপ **অশেষ** জঞ্জাল। —গিরিশ ঘোষ

(চ) বিদেশি শব্দেও সংস্কৃত বানানের নিয়ম গৃহীত হইয়াছে। এ সকল স্থলে উচ্চারণ অনুসারে 'শ' বা 'স' লেখা উচিত। যথা—ষ্টেশন (স্টেসন লেখা উচিত)।

এইরূপ তক্তাপোষ, জিনিষ, বালাপোষ প্রভৃতির স্থলে তক্তাপোশ, জিনিস, বালাপোশ লেখা উচিত।

নমুনা ॥

১। ণত্ববিধানের সাধারণ নিয়মগুলি উদাহরণসহ লেখ।

২। ষত্ববিধানের সাধারণ নিয়মগুলি উদাহরণসহ লেখ।

৩। বর্ণাশুদ্ধি থাকিলে সংশোধন কর :

দুর্ণাম, প্রাহ্ন, বিষ্ময়, কুসক, ঘোষণা, জার্মাণী, সোণালী, তুসার, ধরেণ, মূর্ছণা, তুন, পোশ, মেস, নিসিদ্ধ।

৪। স্বাভাবিক 'ণ' এবং 'ষ'-বিশিষ্ট ছয়টি শব্দের প্রয়োগ কর।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে ণত্ব ও ষত্বের কারণ নির্দেশ কর।

বৃংহণ, অন্তর্বণ, অপরাহ্ণ, প্রণাম, রামায়ণ, ঋষভ, পরিষ্কার, বৈষম্য, মাতৃষসা, অগ্নিষ্টোম।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ বাঙ্‌লা উচ্চারণ ও ধ্বনিপরিবর্তনের কতকগুলি বিশিষ্ট রীতি ॥

চলিত ভাষা বর্তমানে বাঙ্‌লা সাধুভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে।

"আবার, এই 'চলিত ভাষা' এখন আরো সোজা হয়ে আসছে। সাধারণ বাঙালির 'চল্‌তি শব্দের' উচ্চারণের জন্য বইয়ের চলিত ভাষা আবো সরলভাবে চালু হচ্ছে। 'অভিশ্রুতি', 'স্বপ্রশ্রুতি', 'স্বরসংগতি', 'স্বরভক্তি' ইত্যাদি শব্দরীতির সৃষ্টির ফলে এখন 'করিয়া' হয়েছে 'কোরে', 'এক' হযেছে 'এ্যাক', 'মুক্তি' হয়েছে 'মুকতি'...আমরাও তাই শব্দের ধরাবাঁধা গণ্ডী থেকে মুক্তি পেযে 'আধুনিক চলিত ভাষায়' (চল্‌তি ভাষা) লেখাপড়া আরম্ভ করেছি।"

নিম্নে বাঙ্‌লা শব্দরীতির বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে।

[ক] স্বরসংগতি : Vowel Harmony

বাঙ্‌লায়, বিশেষ করিয়া, বাঙ্‌লার মৌখিক বা চলিত ভাষায়, পূর্বের তথা পরের স্বরধ্বনির প্রভাবে পদস্থিত অন্য অক্ষরের স্বরধ্বনির উচ্চারণস্থানে মধ্যে একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। বাঙ্‌লা ভাষার উচ্চারণগত এই বৈশিষ্ট্যকেই বলা হয় 'স্বর-সংগতি'। এরূপ পরিবর্তনের মূলকথা হইল পদস্থিত স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটা আকর্ষণের ভাব। এই আকর্ষণের ফলে শব্দের অভ্যন্তরস্থিত বিভিন্ন

প্রকৃতির স্বরধ্বনিগুলি একটা সংগতি বা সামঞ্জস্যের সূত্রে গ্রথিত হয়, যেমন—'দেশি' >'দিশি'; এই দৃষ্টান্তে দেখা যাইতেছে, পরবর্তী অক্ষরের ঈ-কারের প্রভাবে পূর্বাবস্থিত অক্ষরের এ-কার ই-কারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তদ্রূপ—বিলাতি> বিলেতি>বিলিতি; উড়ানী>উড়ুনী; ইচ্ছা>ইচ্ছে; বীনা>বিনে>বিনি; পূজা>পুজো; মূলা>মূলো; তিনটা>তিনটে; শুনা>শোনা; কুড়াল>কুড়ুল; ইত্যাদি।

কিন্তু এই স্বরধ্বনির পরিবর্তনবিষয়ে একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে। "যেখানে শব্দের আদিতে 'না'-অর্থে 'অ' বা 'অন্' এবং 'সহিত'-অর্থে অথবা 'সম্পূর্ণ'-অর্থে 'স' বা 'সম্' বসে সেখানে অ-কার ও-কারে পরিবর্তিত হয় না" অর্থাৎ স্বরসংগতিজনিত ধ্বনির কোনো পরিবর্তন ঘটে না। যেমন—'অতি'-র উচ্চারণ 'ওতি' 'অমুক'-এর উচ্চারণ 'ওমুক', 'চলুন'-এর উচ্চারণ 'চোলুন'; কিন্তু অধীর, অসুখ, অনিশ্চিত, অনিয়ম, সসীম, সবিনয়, প্রভৃতি শব্দগুলি ওধীর, ওসুখ, ওনিশ্চিত, ওনিয়ম, সোসীম, সোবিনয়-রূপে উচ্চারিত হয় না। এই ধ্বনিপরিবর্তনের বিশিষ্টতার মূলকথা হইতেছে, উঁচু [স্বর] নীচুকে [নীচু স্বরকে] উঁচুতে টানে, নীচু উঁচুকে নীচে নামাইয়া লয়। স্বরধ্বনির এরূপ আকর্ষণের প্রভাবেই শব্দগুলির রূপান্তর ঘটে। [বাঙ্‌লা স্বরধ্বনি-গুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—উঁচু, মধ্য ও নীচু। ই এবং উ উচ্চস্বর : এ, ও এবং অ মধ্যস্বর; অ্যা এবং আ নিম্নস্বর।]

[খ] অপিনিহিতি : Epenthesis

শব্দের মধ্যস্থিত কিংবা অন্তস্থিত ই-কার অথবা উ-কার স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া কিংবা স্বস্থানে থাকিয়াও যদি অব্যবহিত পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে আসিয়া যায় তবে তাহাকে 'অপিনিহিতি' বলে। বাঙ্‌লা ভাষার উচ্চারণের একটি বিশিষ্টতা হইল শব্দের মধ্যস্থিত বা অন্তস্থিত ই-কার কিংবা উ-কারকে পূর্ব হইতে উচ্চারণ করিয়া ফেলিবার প্রবণতা; যেমন—আজি>আইজ; কালি>কাইল; রাখিয়া>রাইখ্যা; রাতি>রাইত; করিয়া>কইর‍্যা; সাথুআ>সাউথুআ>সাইথুআ>সেথো; জলুয়া> জউলুয়া>জইলুয়া>জলো; মাছুয়া>মাউছুয়া>মাইছুয়া>মেছো; সত্য>সইত্ত; কাব্য>কাইব্‌ব, ইত্যাদি। শব্দের এই বিশিষ্ট উচ্চারণরীতিকে 'পূর্বাভাসাত্মক ধ্বনি-বিপর্যয়' বলা যাইতে পারে—The transference of a semi-vowel to the syllable preceding that in which it originally occurred—'পূর্বস্থিত অক্ষরে, অন্তঃস্থ-বর্ণের আনয়ন।' দেখা যাইতেছে, অপিনিহিতি শুধু ধ্বনিবিপর্যয় নয়, আরো বেশি কিছু—পূর্বাভাসহেতুক আগমও ইহার মধ্যে রহিয়াছে। যেমন—মাছুয়া>মাউছুয়া; এখানে ছু-এর 'উ' স্বস্থানে রহিয়া গেল, আবার, 'ছ'-এর পূর্বেও পূর্বাভাসহেতুক উ-কারের আগম ঘটিল। তদ্রূপ, সাথুয়া>সাউথুয়া; করিয়া>কইর‍্যা, প্রভৃতি। বর্তমানে কেবল পূর্ববঙ্গে এইরূপ উচ্চারণরীতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু একসময় পশ্চিমবঙ্গেও ইহা প্রচলিত ছিল। মনে রাখিতে হইবে, য-ফলার মধ্যে ই-ধ্বনি রহিয়াছে

বলিয়াই সত্য, কাব্য প্রভৃতি শব্দ অপিনিহিতির ফলে 'সইত্ত', 'কাইব্ব'-রূপে পরবর্তিত হইয়াছে।

[গ] অভিশ্রুতি : Umlaut বা Vowel Mutation

শব্দস্থিত অপিনিহিতিজনিত ই-কার বা উ-কার উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্বর-ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া যখন তাহার রূপ পরিবর্তিত করিয়া দেয়, তখন তাহাকে 'অভিশ্রুতি' বলে। যেমন—করিয়া>কইর্যা>করে>কোরে, মাছুয়া>মাউছুয়া> মাইছুয়া>মেছো; জলুয়া>জউলুআ>জইলুআ>জলো>জোলো; মারিয়া> মেরে; করিতে>কইরিতে>কোর্‌তে। এইসব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, অভিশ্রুতি অপিনিহিতির উপরই নির্ভরশীল—দ্বিতীয় প্রকারের স্বরধ্বনির পরিবর্তন অর্থাৎ অপিনিহিতি ভিন্ন প্রথম প্রকারের স্বরধ্বনির রূপান্তর অর্থাৎ অভিশ্রুতি সম্ভব নয়। উপরিলিখিত উদাহরণে রাখিয়া>রাইখিয়া>রাইখ্যা [অপিনিহিতি]>রেখে [অভিশ্রুতি]। এখানে আ+ই+আ-স্বরধ্বনির এ+এ-তে রূপান্তর সম্ভব হইয়াছে অপিনিহিতি ই-এর প্রভাবে, এবং পূর্বস্থিত স্বরের এই নবরূপধারণকেই 'অভিশ্রুতি' বলা হইয়া থাকে। অপিনিহিতির প্রসারের ফলেই অভিশ্রুতির আত্মপ্রকাশ।

পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষায় এবং পশ্চিমবঙ্গের সুদূর প্রান্তের ভাষায় অভিশ্রুতিজনিত স্বরের পরিবর্তন দেখা যায় না। পূর্ববঙ্গের ভাষায় অপিনিহিতির ই-স্বরধ্বনি এখনো উচ্চারিত হয়। 'বাঙ্‌লা চলিত ভাষার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই অভিশ্রুতি। এই রীতি অনুসারে নির্মিত বহু শব্দ ও পদ চলিত ভাষা হইতে এখন অল্পে-অল্পে সাধুভাষাতেও গৃহীত হইতেছে। যথা—সাধুভাষার অনুমোদিত রূপ থাকিয়া, চাহিয়া, মাইয়া, ছাইলা, ইত্যাদি স্থলে থেকে, চেয়ে, মেয়ে, ছেলে ইত্যাদি।'

[ঘ] অপশ্রুতি : Ablaut বা Vowel Alterance.

শব্দের মধ্যে ধাতুর মূল স্বরধ্বনির যদি অপগমন অর্থাৎ বিকার ঘটে তবে তাহাকে 'অপশ্রুতি' বলে। যেমন—'চল্' ধাতু—চলে, ণিজন্ত 'চালে' [চালায়, চলায়); 'পড়্' ধাতু পতনে—'পড়ে', কিন্তু ণিজন্ত 'পাড়ে'। এরূপ পরিবর্তন আত্মপ্রকাশ করে ধাতুর মূল স্বরকে অবলম্বন করিয়া। ধাতুর মূল স্বরধ্বনির অবস্থাগতিকে এই স্বরপরিবর্তনধারাটি ভারতের আদিআর্যভাষা সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাঙ্‌লায় আসিয়া গিয়াছে। সুতরাং অপশ্রুতির আদিম উৎস হইতেছে সংস্কৃতভাষায় ধাতুর স্বরের গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণাত্মক পরিবর্তন। নিম্নের একটি দৃষ্টান্ত হইতে সংস্কৃতে গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও ধাতুর স্বর-ধ্বনির পরিবর্তনটি সহজে বুঝা যাইবে। মূলধাতু 'বদ্'>বদ্—যেমন, বদতি, বশংবদ [গুণ]; বাদ্—যেমন, অনুবাদ [বৃদ্ধি]; উদ্—যেমন, অনূদিত [সম্প্রসারণ]। এই গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণের ব্যাপক নামকরণ হইয়াছে 'অপশ্রুতি'। বাঙ্‌লায় চল্>চাল্; পড়্>পাড়্; মরে>মারে, ইত্যাদিতে স্বরবৈচিত্র্য অপশ্রুতিরই ফল। ধাতুর মূল স্বরধ্বনির এরূপ পরিবর্তন বাঙ্‌লায় মিলে না—ইহার জন্য সংস্কৃতের দ্বারস্থ হইতে

হইবে; যেমন—বাঙ্‌লা 'চলে' কথাটি সংস্কৃত 'চলতি' কথারই পরিবর্তনে উদ্ভূত—চলতি>চলদি>চলই>চলে; ঠিক তেমনি, 'চালো' কথাটি—সংস্কৃত চালয়তি>চালেতি>চালেদি>চালেই>চালে। 'চলে' এবং 'চালে' এই উভয় শব্দের মূলধাতু হইতেছে 'চল্'; কিন্তু অবস্থাগতিকে 'চল্' হইতে 'চলে' এবং 'চালের' উৎপত্তি।

[ঙ] য়-শ্রুতি ও [অন্তঃস্থ] ব-শ্রুতি ধ্বনি : Euphonic Glides

বাঙ্‌লায় পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি স্বরধ্বনির দ্রুত উচ্চারণকালে উহাদের মধ্যে য়-ধ্বনির [y] অথবা ব-ধ্বনির [w] = বাঙ্‌লায় ওয় [ও] আগম হয়। জিহ্বা অসতর্কভাবে এই যে দুইটি ধ্বনি উচ্চারণ করে উহারাই 'শ্রুতিধ্বনি' নামে পরিচিত। উচ্চারণের সুবিধা এবং শ্রুতিমাধুর্যের জন্যই এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনি-দুইটির আগম ঘটে; যেমন—√যা+আ-প্রত্যয়যোগে যাআ>যাওয়া; এখানে অন্তঃস্থ ব-শ্রুতিধ্বনির আগম ঘটিয়াছে; তদ্রূপ—√খা+আ খাআ>খাওয়া। বাঙ্‌লায় ও-কার দ্বারা ব-শ্রুতিধ্বনি নির্দেশিত হইয়া থাকে। এইভাবেই কেতক>কেঅঅ>কেআ> কেয়া; মোদক>মোঅঅ>মোআ>মোয়া; কেঅড়া>কেওড়া; ধোআ>ধোওয়া; পিআনো [piano]>পিয়ানো; নাহা>নাআ>নাওয়া। অনেক সময় য়-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতির মধ্যে অদলবদলও দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন, দেয়াল—দেওয়াল; ছাআ—ছায়া, ছাওয়া, ইত্যাদি।

[চ] বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি : Anaptyxis বা Vowel Insertion

উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্তব্যঞ্জনের ভিতরে স্বরধ্বনির আনয়ন ব্যাপারকে বলা হয় 'বিপ্রকর্ষ' বা 'স্বরভক্তি'। শব্দগুলিকে খুব সহজে উচ্চারণ করার দিকে বাঙ্‌লা ভাষায় একটা প্রবণতা সহজে লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্‌লা ভাষার বিপ্রকর্ষরীতির বহুল প্রচলন দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত যুগেও এই রীতিটি প্রচলিত ছিল। ছন্দের প্রয়োজনে ও শ্রুতিমধুরতার জন্য বাঙ্‌লা কবিতার ভাষায় বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির প্রাচুর্য দেখা যায়—গ্রাম্য উচ্চারণেও এই রীতিটি বিশেষ প্রবল। বিপ্রকর্ষে নানা-প্রকার স্বরের আগম হয়; যেমন—কর্ম>করম; মর্ম>মরম; ধর্ম>ধরম; জন্ম>জনম; ভক্তি>ভকতি; মুক্তি>মুকতি; মূর্তি>মূরতি [অ-কারের আগম]। প্রীতি>পিরীতি; মিত্র>মিত্তির; শ্রী>ছিরি [ই-কারের আগম]। রাজপুত্র>রাজপুত্তুর; শুক্রবার>শুকুরবার; দুর্জন>দুরজন [উ-কারের আগম]। গ্রাম্য>গেরাম; শ্রাদ্ধ>ছেরাদ্দ [এ-কারের আগম]। শ্লোক>শোলোক [ও-কারের আগম]।

[ছ] বর্ণবিপর্যয় : Metathesis

শব্দস্থিত বর্ণের স্থানপরিবর্তনকেই বলা হয় বর্ণবিপর্যয়। যেমন—বাক্স>বাস্ক; রিক্সা>রিস্কা; নেত্র>নেত্ত>নেতা>তেনা [ছেঁড়া কাপড় অর্থে]; হ্রদ>হদ>দহ; লাফ>ফাল (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত], ইত্যাদি।

[জ] **বর্ণসমীকরণ বা সমীভবন : Assimilation**

বিভিন্ন বর্গের ব্যঞ্জনধ্বনি পাশপাশি অবস্থিত থাকিলে, উচ্চারণের সুবিধার জন্য, ধ্বনি-দুইটিকে একই বর্গের ধ্বনিতে রূপান্তরিত করা হয়; অর্থাৎ সংযুক্ত ব্যঞ্জন [conjunct consonant] দ্বিত্ব ব্যঞ্জনে [double consonant] পরিণত হইয়া সমতা প্রাপ্ত হয়—ইহারই নাম 'সমীকরণ' বা 'বর্ণসমীভবন'। যেমন, ধর্ম>ধম্ম; কর্ম> কম্ম; মূর্খ>মুখ্খু; ধরতে>ধত্তে; কর্তা>কত্তা, ইত্যাদি। পূর্বের ধ্বনি পরের ধ্বনিকে পরিবর্তিত করিলে তাহাকে বলে 'প্রগত' সমীভবন; পরের ধ্বনি পূর্বের ধ্বনিকে পরিবর্তিত করিলে তাহাকে বলে 'পরাগত' সমীভবন; আর, যেখানে দুইটি ধ্বনিই পরস্পরের প্রভাবে পড়িয়া রূপান্তরিত হয়, তাহাকে বলে 'অন্যোন্য' সমীভবন।

[ঝ] **শব্দস্থিত স্বরধ্বনিলোপ ও বর্ণবিলোপ**

অনেক সময় দেখা যায়, শ্বাসাঘাতের অভাব ঘটিলে বা একই বর্ণের পাশাপাশি সমাবেশ ঘটিলে অক্ষরস্থিত স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণের বিলোপ ঘটে—ইহাকেই বলা হয় বর্ণবিলোপ অথবা স্বরধ্বনিলোপ; যেমন—সংস্কৃত অলাবু>বাঙ্‌লা লাউ; অভ্যন্তর>ভিতর; উদ্ধার>ধার; এরণ্ড>রেড়ী; অতসী>তিসি; নাতিনী> নাত্‌নী; নারিকেল>নারকেল; বড়দাদা>বড়দা; ছোটদিদি>ছোড়দি; অতিথি> অতিথ, ইত্যাদি। আদি স্বরধ্বনি, মধ্যস্বরধ্বনি ও দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটির লোপকে কথ্য ভাষায় ইংরেজিতে যথাক্রমে বলা হয়—Aphesis, Syncope এবং Haplology.

[ঞ] **স্বরাগম : Prothesis**

উচ্চারণের সৌকর্যার্থে শব্দের আদিতে স্বরবর্ণের আগম ঘটিলে তাহাকে স্বরাগম বলা হয়। এই স্বরাগমের প্রভাবে কয়েকটি ইংরেজি শব্দ বাঙ্‌লায় বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রাকৃত ভাষাতেও স্বরাগমরীতি মিলে এবং বাঙ্‌লায় অঞ্চলবিশেষের ভাষায় মাঝে মাঝে ইহা লক্ষিত হয়; যেমন—স্কুল>ইস্কুল; স্টীমার>ইস্টিমার; স্টেশন>ইস্টিশন; স্ত্রী>ইস্তিরি; স্পর্ধা>আস্পর্দা, ইত্যাদি।

[ট] **লোকব্যুৎপত্তিজাত শব্দ : Folk etymology**

ধ্বনির সমতাহেতু কোন শব্দ বিকৃত হইয়া ভিন্নতর রূপ গ্রহণ করিলে তাহাকে 'লোকব্যুৎপত্তি' বলে। মূল শব্দের সঙ্গে সুস্পষ্ট পরিচয়ের অভাবেই লোকমুখে শব্দের এইরূপ বিকৃতি ঘটে, যেমন—ইংরেজি 'আর্ম চেয়ার' হইতে বাঙ্‌লা 'আরাম চেয়ার'; ইংরেজি 'হস্‌পিটাল' হইতে বাঙ্‌লা 'হাসপাতাল' ইত্যাদি।

[ঠ] **বিষমীভবন : Dissimilation**

বিষমীভবন বর্ণসমীকরণেরই ঠিক বিপরীত ব্যাপার—ইহাতে শব্দস্থিত দুইটি সমব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটির রূপান্তর ঘটে। যেমন, লাল>নাল; লাঙ্গল>নাঙ্গল; পোর্তুগিজ 'আর্মারিও'>বাঙ্‌লা 'আলমারি' ইত্যাদি।

পরিভাষা

আদেশ—প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের (বা তাহার অংশবিশেষের) যে রূপের পরিবর্তন ঘটে তাহাকে বলে আদেশ। যথা—বৃদ্ধ শব্দ স্থানে জ্য।

আগম—যাহা প্রকৃতির অন্তর্গত কিংবা প্রত্যয়ও নহে এই প্রকার নূতন বর্ণের আবির্ভাবকে বলে আগম। যথা—স্পর্ধা>আ-স্পর্ধা, এখানে 'আ'-কার আগম।

বিভাষা বা বিকল্প—হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, অথবা যে-কোনোটি হইতে পারে এইরূপ বিধান বুঝাইলে তাহাকে 'বিভাষা' বলে। ইহাকে বিকল্পও বলা যায়। যথা—বিম্ব+ওষ্ঠ>বিম্বোষ্ঠ অথবা বিম্বৌষ্ঠ।

উপধা—অন্ত্যবর্ণের পূর্ববর্ণকে বলে উপধা। যথা—'গম্' (গ+অ+ম্) ধাতুর অ-কার উপধা।

ইৎ—কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে যে-বর্ণ উচ্চারিত হয়, কিন্তু কার্যকালে থাকে না, উহার নাম ইৎ (Indicatory letter)। 'ইৎ'-অর্থে যাহা চলিয়া যায়, থাকে না। (√ই to go); যথা—'অনট্' প্রত্যয়ের ট্। কার্যকালে 'অনট্' প্রত্যয়ের 'অন' মাত্র থাকে 'ট্' থাকে না। উহা কেবল স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-কার নির্দেশ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, সুতরাং উহা ইৎ।

নিপাতন—ব্যাকরণের সাধারণ সূত্রের দ্বারা যখন পদসিদ্ধি হয় না কিন্তু বিশেষ সূত্রের প্রয়োজন হয়, তখন উহার নাম নিপাতন (Grammatical irregularity), যথা—প্র+উঢ়>প্রৌঢ় (সাধারণ নিয়মে হওয়া উচিত 'প্রোঢ়')।

গুণ—প্রত্যয় বা বিভক্তি প্রভাবে ধাতু বা শব্দের ই, ঈ এর এ-কারে; উ ঊ এর ও-কারে, ঋ, ৠ এর অর্-এ পরিণতিকে গুণ বলে। যথা—বিদ্+অ=বেদ, কৃ+অন=করণ।

বৃদ্ধি—প্রত্যয় বা বিভক্তিপ্রভাবে শব্দের বা ধাতুর অ, আ এর আ কারে; ই, ঈ এ এর ঐ-কারে; উ, ঊ, ও কারের ঔ-কারে; ঋ, ৠ এর আর্-এ পরিণতিকে বৃদ্ধি বলে। যথা—বস্+ঘঞ্=বাস; বুদ্ধি+অণ=বৌদ্ধ।

সম্প্রসারণ—প্রত্যয় বা বিভক্তিপ্রভাবে শব্দ বা ধাতুর য, র, ব-এর যথাক্রমে ই, ঋ, উ-কারে পরিণতিকে সম্প্রসারণ বলে। যথা—যজ+ক্ত=ইষ্ট; গ্রহ্+ক্ত =গৃহীত; বস্+ক্ত=উষিত।

॥ অনুশীলনী ॥

১। সংজ্ঞানির্দেশপূর্বক দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও:

আদেশ, উপধা, নিপাতন।

২। আগম, ইৎ ও বিভাষার ব্যাকরণশাস্ত্রে উপযোগিতা কী তাহা বুঝাইয়া দাও।

৩। দৃষ্টান্তসহ নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলির সংজ্ঞা নির্দেশ কর:

স্বরসংগতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি, য়-শ্রুতি, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি, স্বরাগম, বিষমীভবন

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম অধ্যায়

॥ পদপ্রকরণ ॥

< পদ ও পদের বিভাগ >

মনের ভাবপ্রকাশের জন্য আমরা যাহা বলি তাহাই আমাদের ভাষা একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এই ভাষা গঠিত হয় কতকগুলি বাক্যকে লইয়া। আবার কতকগুলি পরস্পর অন্বিত পদ লইয়া বাক্য গঠিত হয়। শব্দ যখন বিভক্তিযুক্ত হয় তখন উহাকে বলে পদ।

'বুদ্ধিমান্ বালকেরা সর্বদা সযত্নে তাহাদের পাঠ অভ্যাস করে'।

এটি পরস্পর-সম্বন্ধবিশিষ্ট কতকগুলি পদের সমুচ্চয়। এখানে 'বালকেরা' এটি বিভক্তিযুক্ত শব্দ। ইহা ছাড়া, বাক্যের প্রতিটি শব্দে বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে। 'বুদ্ধিমান্' একটি বিশেষণ। উহাতে বিভক্তি যুক্ত না হইলেও উহা কিন্তু পদ। আবার, 'সযত্নে' এটি ক্রিয়াবিশেষণ। উহাতে কিন্তু 'এ' বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে। 'সর্বদা' পদটি অব্যয়, উহার কোনো রূপান্তর হয় না। 'তাহাদের' পদটি সর্বনাম, কারণ, উহা বিশেষ্য পদ 'বালকেরা' পদের পরিবর্তে বসিয়াছে। 'পাঠ' পদটি কর্ম। কর্মপদে কখনো কখনো বিভক্তি থাকে না। 'অভ্যাস করে' ক্রিয়াপদ।

অতএব দেখা যাইতেছে, পদ পাঁচপ্রকার—বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়। এইবার আমরা পদের প্রকারভেদ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

অ আ ক খ প্রভৃতিকে বাঙ্‌লায় বর্ণ নহে।

যদি কয়েকটি বর্ণ একত্র হইয়া একটি অর্থ প্রকাশ করে (কচিৎ একটি বর্ণেও অর্থ প্রকাশ করে) তবে তাহাকে শব্দ বলে। বিভক্তিযুক্ত শব্দকে বলে পদ।

পদ প্রথমত দুইপ্রকার—নামপদ ও ক্রিয়াপদ। নামপদ চারিপ্রকার—বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয়। ক্রিয়াপদ একইপ্রকার।

অব্যয় নামপদ ও ক্রিয়াপদ উভয়ই হইতে পারে। ক্রিয়া-অব্যয়, যথা—করিয়া, দেখিয়া, করিতে, দেখিতে ইত্যাদি।

ফলত, প্রচলিত রীতি অনুসারে পদ পাঁচপ্রকার হইল—বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ও অব্যয়। একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।

একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। অব্যয়ও পদ, তবে তাহার উত্তর যে বিভক্তি যুক্ত হয়, তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। অব্যয় শব্দ নহে। সমাসবদ্ধ প্রাতিপদিকও শব্দ, তাহাতেও যথারীতি বিভক্তি যোগ করিলে তাহা পদ হয়।

বিশেষ্য : যাহা কোনো বস্তু বা ব্যক্তির নাম বুঝায় তাহাকে বিশেষ্য কহে। বস্তু অর্থে এখানে দ্রব্য গুণ কর্ম বুঝাইতেছে। যেমন—মনুষ্য, পর্বত, মহত্ত্ব, গমন, ইত্যাদি। এইভাবে বিশেষ্যপদকে পাঁচভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

(ক) **সংজ্ঞাবাচক**—যে বিশেষ্যপদ কোনো ব্যক্তি, স্থান, প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির নাম বুঝায় তাহাকে বলে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য। যথা—রাম, আকবর, তাজমহল, দিল্লী, বন্তী, সুরেন্দ্রনাথ, রসারোড, গোদাবরী, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি।

প্রয়োগ—**সিদ্ধেশ্বরী** চুপ করিয়া আছেন। —শরৎচন্দ্র

(খ) **জাতিবাচক**—ইহা দ্বারা বস্তু, ব্যক্তি, জীবজন্তু প্রভৃতির শ্রেণী ও শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটিকে বুঝায়। যথা—ইংরেজী, জাপানী, পর্বত, ব্রাহ্মণ, ব্যাঘ্র, মানব, কলম, পথ প্রভৃতি।

প্রয়োগ—বিধাতার ভুলে, **মানবের** কুলে জনম হয়েছে তার।

—দ্বারকানাথ অধিকারী

(গ) **বস্তুবাচক**—গণনায় যে বস্তুর সংখ্যা নির্ণীত হয় তাহাকে জাতিবাচক, আর ওজনের দ্বারা যে বস্তু পরিমাণ করা যায় তাহা বস্তুবাচক। যথা—তৈল, চুন, দুধ, স্বর্ণ, মাংস প্রভৃতি।

প্রয়োগ—**তৈল** বিনা চুলে জটা, অঙ্গ গেল ফেটে। —ভারতচন্দ্র

(ঘ) **গুণবাচক**—গুণ, দোষ, অবস্থা প্রভৃতি বুঝায় গুণবাচক বিশেষ্য। যথা—বীরত্ব, সাহস, ছেলেমি, দয়া, ক্ষমা, আরোগ্য প্রভৃতি।

প্রয়োগ—ভারত **বিনয়ে** কয়··· —ভারতচন্দ্র

(ঙ) **ক্রিয়াবাচক**—কোনো কার্যের নামকে বলে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। যথা—শয়ন, অধ্যয়ন, উত্থান, বসা, যাওয়া, নাচন প্রভৃতি।

প্রয়োগ—সদা করিতেন **সেবা** লক্ষ্মণ সুমতি। —মাইকেল

বিশেষণ : যাহা নামপদের বা ক্রিয়াপদের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে, তাহাকে বিশেষণ বলে। বিশেষ্য বা সর্বনামের বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ বা বিশেষণের বিশেষণ—বিশেষণ এই তিনপ্রকার। ইহাদের যথাক্রমে নাম-বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ এবং বিশেষণ-বিশেষণ কহে। অব্যয় পদের বিশেষণও কচিৎ দেখা যায়, তাহাও, নাম-বিশেষণ মাত্র। ক্রিয়া-অব্যয়ের বিশেষণও কচিৎ দেখা যায়, তাহাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলিতে হইবে। ক্রমিক উদাহরণ, যথা—সুন্দর পুরুষ। সাত জন্ম। দ্রুত চলিতেছে। অতি বাজে কথা। নিতান্তই তার মতো (নাম-অব্যয়ের বিশেষণ)। দ্রুত চলিয়া ফল কী (ক্রিয়া-অব্যয়ের বিশেষণ)।

বিশেষ্যের বিশেষণ—যে বিশেষণ বিশেষ্যের দোষ অথবা গুণ প্রকাশ করে তাহাকে বলে বিশেষ্যের বিশেষণ। যথা—সুগন্ধি পুষ্প, চালাক ছেলে, রাঙা শাড়ী প্রভৃতি।

প্রয়োগ (১) তিনি দক্ষের **আদরিণী কন্যা**। —দীনেশ সেন

(২) লভিলা **অভীষ্ট** বর। —যোগেন্দ্রনাথ

বিশেষণের বিশেষণ—যে বিশেষণ বিশেষণের দোষগুণ প্রকাশ করে তাহাকে বলে বিশেষণের বিশেষণ। যথা—**খুব** চালাক ছেলে।

প্রয়োগ—পুরী যাইবার **সুন্দর** পাকা পথ আছে।

ক্রিয়া-বিশেষণ—যে শব্দ ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তাহাকে বলে ক্রিয়া-বিশেষণ। যথা—**মন্দ মন্দ** বাতাস বহিতেছে।

প্রয়োগ—(১) ভরত **উচ্চৈঃস্বরে** ডাকিলেন—'আয়, আয়, আয়।'

(২) আমি **সোৎসাহে** সম্মতি জানাইলাম।

—কালিদাস রায়

ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ—যে বিশেষণ ক্রিয়াবিশেষণের বিশিষ্ট অবস্থা প্রকাশ করে তাহাকে বলে ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ। যথা—লোকটা **বেশ সুন্দর** লিখেছে তো!

ইহা ছাড়া, বিশেষণের আরো কয়েকটি ভেদ স্বীকার করা হয়। যেমন, সর্বনামের বিশেষণ, সর্বনামীয় বিশেষণ, বিশেষ্য-বিশেষণীয়-বিশেষণের বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণীয়-বিশেষণের বিশেষণ ও পূরণবাচক বিশেষণ।

সর্বনামের বিশেষণ—যে বিশেষণ সর্বনামকে বিশেষিত করে তাহাকে বলে সর্বনামের বিশেষণ। যথা—**মূর্খ** আমি, তাই, তোমার মতো লোককে বিশ্বাস করেছিলাম।

সর্বনামীয় বিশেষণ—সর্বনাম পদ অথবা তদ্ধিতান্ত সর্বনাম যখন অন্য সর্বনামকে বিশেষিত করে তখন তাহাকে বলে সর্বনামীয় বিশেষণ। যথা—

"**এই সেই** জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি।" —বিদ্যাসাগর

বিশেষ্য-বিশেষণীয়-বিশেষণের বিশেষণ—যে বিশেষণপদ বিশেষ্যের বিশেষণের বিশেষণকে বিশেষিত করে। যথা—বাগানের খুব সুন্দর লাল ফুলটি দেখ।

প্রয়োগ—**অতি** বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। —ভারতচন্দ্র

ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ—যে বিশেষণ ক্রিয়াবিশেষণকে বিশেষিত করে তাহাকে বলে ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ। যথা—তুমি **বেশ** সুন্দর লেখো তো!

পূরণবাচক বিশেষণ—সংখ্যা বা পূরণবাচক শব্দ অনেক সময় বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়। যথা—(সংখ্যাবাচক) ছয়টি আম, সাতটি মানুষ। (পূরণবাচক) সপ্তম দিবস, ষষ্ঠ বালকটি।

অবশেষে আর একপ্রকার বিশেষণের নাম করিব। সেটিকে বলে **বাক্যাত্মক বিশেষণ।**

সময়ে সময়ে একটি বাক্যও বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়, উহাকে বলে বাক্যাত্মক বিশেষণ। যথা—**সবপেয়েছির** দেশ। এইরূপ বিশেষণকে বহুপদময় বিশেষণও বলে।

প্রয়োগ—আমাদের ডিঙিকে **যাচ্ছেতাই** বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিলেন। —শরৎচন্দ্র

ইহা ছাড়া, বিধেয় বিশেষণ বলিয়া আর একপ্রকার বিশেষণ আছে। উহার সংজ্ঞা, যথা—

বিধেয় বিশেষণ—যে বিশেষণ বিধেয়াংশে প্রযুক্ত হইয়া উদ্দেশ্য পদের গুণ প্রকাশ করে তাহাকে বিধেয় বিশেষণ বলে। যথা—বিদ্যাসাগর **জ্ঞানী** ছিলেন।

বিশেষণের তারতম্য

দুইটি পদার্থের তুলনা করিয়া উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইতে সংস্কৃতে তর বা ঈয়স্ (ঈয়ান্) প্রত্যয় সেই পদের বিশেষণের উত্তর যুক্ত হইয়া থাকে।

তিন বা ততোধিক পদার্থের তুলনা করিয়া উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইতে সংস্কৃতে তম বা ইষ্ঠ প্রত্যয় সেই পদের বিশেষণের উত্তর যুক্ত হইয়া থাকে। এই তারতম্য বাচক প্রত্যয়গুলি তৎসম শব্দে বাঙ্‌লায় যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু খাঁটি বাঙ্‌লা শব্দে তারতম্যবাচক প্রত্যয় বিশেষ কিছু ব্যবহৃত হয় না বিশেষণ শব্দটি অবিকৃতই থাকিয়া যায়। কেবল চেয়ে, অপেক্ষা, থেকে, হইতে (হতে) এই অনুসর্গগুলি বিশেষ্যের পরে এবং বিশেষণের পূর্বে বসে। যথা, রাম লক্ষ্মণের চেয়ে বড়ো। শ্যাম সকলের অপেক্ষা ছোট।

তৎসম বিশেষণেও অনেক সময় তর তম প্রভৃতি যুক্ত না হইয়াই বাঙ্‌লায় প্রযুক্ত হয়। যেমন—সীতার চেয়ে সতী। দেবতার অপেক্ষাও মহৎ। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট।

বিশেষণ তৎসম শব্দে, ঈয়স্থন্ (ঈয়ান্) বা ইষ্ঠ-যোগে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এইগুলি নিম্নে দেখান যাইতেছে। তর, তম এই দুইটির পাশে পাশে ঐগুলি ব্যবহৃত হয়। যথা—গুরুতম, গরিষ্ঠ, মহত্তর, মহীয়ান্।

মূল শব্দ	তর বা ঈয়ান্-যোগে	তম বা ইষ্ঠ-যোগে
লঘু	লঘুতর বা লঘীয়ান্	লঘুতম, লঘিষ্ঠ
গুরু	গুরুতর বা গরীয়ান্	গুরুতম, গরিষ্ঠ
মহৎ, মহান্	মহত্তর বা মহীয়ান্	মহত্তম, মহিষ্ঠ
বৃদ্ধ	বৃদ্ধতর বা বর্ষীয়ান্, জ্যায়ান্	বৃদ্ধতম, বর্ষিষ্ঠ, জ্যে
প্রশস্য	শ্রেয়ান্	শ্রেষ্ঠ

মূল শব্দ	তর বা ঈয়ান্-যোগে	তম বা ইষ্ঠ-যোগে
অল্প	কনীয়ান্	কনিষ্ঠ
বহু	ভূয়ান্	ভূয়িষ্ঠ
বলী	বলবত্তর, বলীয়ান্	বলবত্তম, বলিষ্ঠ
প্রিয়	প্রিয়তর, প্রেয়ান্	প্রিয়তম, প্রেষ্ঠ
মৃদু	মৃদুতর	মৃদুতম
যুবন্	কনীয়ান্, যবীয়ান্	কনিষ্ঠ, যবিষ্ঠ
পাপিন্	পাপীয়ান্	পাপিষ্ঠ

উদাহরণ, যথা—

(১) নারিকেলগাছ আমগাছ অপেক্ষা **উচ্চতর**।
(২) পৃথিবীর সকল মহাদেশের মধ্যে এসিয়া **বৃহত্তম**।
(৩) জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতে **গরীয়সী**।
(৪) তাজমহল সম্রাট শাজাহানের **মহীয়সী** কীর্তি।
(৫) রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর **শ্রেষ্ঠ** কবিগণের **অন্যতম**।

বিশেষণ পদ প্রয়োগে বিশেষ বক্তব্য

বিশেষ্যপদের পূর্বে বিশেষণপদের সুষ্ঠু প্রয়োগ বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। যেমন—নীরস কথা, প্রচুর ধান্য, অনন্ত আকাশ, মলিন বস্ত্র, প্রশস্ত পথ প্রভৃতি।

অতএব সার্থক বিশেষণের প্রয়োগ শিক্ষা করা খুবই প্রয়োজনীয়। তবে অনেক সময়ে বিশেষণপদের অশুদ্ধ প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন,—'স্বর্গত' না বলিয়া 'স্বর্গীয়' লেখা। এরূপ, অগাধ ঘুম না বলিয়া গাঢ় ঘুম বা প্রগাঢ় নিদ্রা, বাষ্পীয় শকট না বলিয়া বাষ্পচালিত শকট বলা উচিত।

নিম্নে সার্থক বিশেষণের একটি তালিকা দেওয়া হইল:

অচলা ভক্তি	অভিনব সংস্করণ	পলিত কেশ
অগাধ জল	আণবিক শক্তি	বায়বীয় পদার্থ
অনাঘ্রাত পুষ্প	ইষ্ট সাধনা	ভূয়সী প্রশংসা
অতুল ঐশ্বর্য	উদ্দাম যৌবন	ম্লান মুখ
অগণিত নক্ষত্র	ঐকান্তিক ভক্তি	যান্ত্রিক যুগ
অটুট স্বাস্থ্য	কোমল শয্যা	রক্তিম আভা
অবিরাম বৃষ্টি	গ্রাম্য ভাষা	লেলিহান জিহ্বা
অনুপম সৌন্দর্য	ঘরোয়া আলোচনা	বরেণ্য অতিথি
অম্লান কুসুম	চলন্ত গাড়ী	শোচনীয় মৃত্যু
অব্যক্ত বেদনা	চাক্ষুষ প্রমাণ	সন্দিগ্ধ মন
অপার করুণা	চিরন্তন সত্য	আলাপী লোক

অপূর্ব মহিমা	জটিল প্রশ্ন	অকেজো মানুষ
অনন্ত আকাশ	ঝগড়াটে ছেলে	মেঘলা দিন
অদ্ভুদ স্বপ্ন	ডাহা মিথ্যা	পিছল পথ
অমূল্য উপদেশ	তন্ময় চিত্ত	অনর্গল বক্তৃতা
অপ্রতিহত প্রভাব	দয়ালু হৃদয়	প্রাণপণ চেষ্টা
অমায়িক ব্যবহার	দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য	ফুটন্ত ফুল
অবারিত দ্বার	নশ্বর জগৎ	বাদলা হাওয়া
	নির্বিকার চিত্ত	

সর্বনাম ঃ বিশেষ্যপদের একাধিকবার উল্লেখ না করিয়া তাহার পরিবর্তে যাহা ব্যবহৃত হয় তাহাকে সর্বনাম বলে। কখনো কখনো বাক্য বা বাক্যাংশের পরিবর্তেও সর্বনামপদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমি, তুমি, আপনি, তুই—এই সর্বনাম কয়টির উল্লেখকালে অবশ্য বিশেষ্যপদ পূর্বে ঠিক থাকে না, কল্পনা করিয়া লইতে হয়।

উদাহরণ—রাম বাল্যকালে বিবিধ মহৎ কার্য করেন। তিনি পিতৃসত্য পালনার্থে বনে যান। সন্তুষ্ট মানব সবচেয়ে সুখী। সে নিজেও তা জানে (বাক্যের বদলে সর্বনাম)। আমি ত তোমারে চাহিনি জীবনে।

বাঙ্লায় সর্বনাম সাধারণত সাত প্রকার ঃ

(ক) **ব্যক্তিবাচক সর্বনাম**—তুমি, আমি, আমরা, তোমরা, আপনি, সে, তাহারা, তিনি, আমার, তোমার প্রভৃতি।

প্রয়োগ—(ক) **তোমারে** রাজত্ব দিয়া রাম গেল বন। —কৃত্তিবাস

(খ) **তুমি** কেন শ্রীরামের ঘটাইলে বন ? —ঐ

(খ) **প্রশ্নবোধক সর্বনাম**—কি, কে, কোন্‌টি প্রভৃতি।

প্রয়োগ—(ক) কিন্তু শক্রদের সেবা **কে** করবে ? —নবীনচন্দ্র সেন

(খ) **কে** আছ মায়ের মুখপানে চেয়ে ?

(গ) বল **কে** কেঁদেছ নীরবে ?

(গ) **নির্দেশক সর্বনাম**—ইহা, উহা, এই, ওই, এইটি, ঐটি প্রভৃতি।

প্রয়োগ—**ওই** দেখা যায় কুটীর কাহার অদূরে। —রবীন্দ্রনা

(ঘ) **সম্বন্ধসূচক সর্বনাম**—যে, যিনি, যাহা, তাহা, যাহারা, তাহারা, তাহাদের প্রভৃতি।

প্রয়োগ—হে মোর দুর্ভাগা দেশ **যাদের** করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে **তাহাদের** সবার সমান। —রবীন্দ্রনাথ

(ঙ) **আত্মবাচক সর্বনাম**—স্ব, স্বয়ং, নিজে, আপনি প্রভৃতি।

প্রয়োগ—**আপনি** আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়।

(চ) **অনির্দেশক সর্বনাম**—কেহ, কেউ, কে প্রভৃতি।

প্রয়োগ—**কেহ** গালি দেয়, কেহ করে দূর দূর।

(ছ) **পরিমাণবাচক সর্বনাম**—যত, তত, কত, এত, প্রভৃতি।

প্রয়োগ—**যত** পায় বেত না পায় বেতন…

ক্রিয়া: যে পদ কোনো কাজ করা বুঝায়, তাহাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন—সে গৃহে **যাইতেছে**। আমি তাহাকে ঘৃণা **করি**। তুমি এ-কথা **বলিতে গেলে** কেন? আমার কলমটি **হারাইল** কে?

ক্রিয়ার বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাইতেছে।

অব্যয়: কতকগুলি শব্দ আছে যেগুলির উত্তর বিভক্তি যুক্ত হয় না এবং যেগুলির লিঙ্গ, বচন, পুরুষ প্রভৃতি নির্ণয় করা যায় না। এগুলি বাক্যের অন্তর্গত পদ বা পদসমষ্টির অথবা বাক্যাংশের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেয়। এরূপ পদকে বলে **অব্যয়**। যেমন—হাঁ, না, বাঃ প্রভৃতি। ইহার বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাইতেছে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। পদ কাহাকে বলে? উহা কয়প্রকার ও কী কী?

২। বাক্যে ব্যবহারভেদে পদগুলির শ্রেণীবিভাগ কর এবং প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

৩। বিশেষ্যপদ কয়প্রকার ও কী কী?

৪। সংজ্ঞানির্দেশপূর্বক উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও:

বস্তুবাচক বিশেষ্য, জাতিবাচক বিশেষ্য ও গুণবাচক বিশেষ্য।

৫। বিশেষণপদ কাহাকে বলে? উহা কয়প্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটির উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৬। দৃষ্টান্তসহ সংজ্ঞা নির্দেশ কর:

বিশেষ্যের বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ, অব্যয়ের বিশেষণ, সংখ্যাবাচক বিশেষণ, বিধেয় বিশেষণ।

৭। বিশেষণের তারতম্য সম্বন্ধে বিশেষ কথাগুলি উদাহরণের সাহায্যে পরিষ্কার করিয়া লেখ।

৮। উৎকর্ষসূচক ঈয়স্ ও ইষ্ঠ প্রত্যয়ের যোগে নিম্নলিখিত শব্দগুলির রূপপরিবর্তন দেখাও:

গুরু, বৃদ্ধ, প্রশস্ত, অল্প, ক্ষুদ্র, মহৎ, পাপী ও দীর্ঘ।

৯। নিম্নলিখিত শূন্যস্থানগুলিতে উপযুক্ত বিশেষণপদের প্রয়োগ কর:

— বাক্য; — বদন; — উৎস; — কাল; — মুখ; — স্বভাব; — চরিত্র; — চেষ্টা; — শক্তি; —দৃশ্য।

১০। সর্বনাম পদ কাহাকে বলে? উহা কয়প্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

১১। ক্রিয়াপদ ও অব্যয় পদের সংজ্ঞানির্দেশপূর্বক উদাহরণ দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

।। লিঙ্গ, বচন ও পুরুষ ।।

[১] লিঙ্গ

বিশেষ্য বা বিশেষণের তিনটি ভেদ করা হয়। পুরুষবাচক, স্ত্রীবাচক ও ক্লীববাচক শব্দগুলিকে যথাক্রমে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ বলা হয়। অব্যয় বা ক্রিয়াপদের লিঙ্গ থাকে না। সর্বনামের লিঙ্গ থাকিলেও লিঙ্গানুসারে তাহার আকৃতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। তবে কতকগুলি সর্বনাম শুধু ক্লীবলিঙ্গেই ব্যবহৃত হয় (সে, পুং, স্ত্রী,—তাহা, ক্লীব)। বিশেষণ ও বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গেই শুধু রূপের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু বিশেষণপদের লিঙ্গ ঠিক নিজস্ব নহে, বিশেষ্যের লিঙ্গানুসারে উহার লিঙ্গ নিরূপিত হয়।

পুংলিঙ্গে বা ক্লীবলিঙ্গের নিজস্ব কোনো চিহ্ন নাই। স্ত্রীলিঙ্গেই শুধু স্ত্রীত্ববোধক প্রত্যয় যুক্ত হয়, কোথাও-বা অন্যবিধ পরিবর্তনও ঘটে। সর্বনামেই শুধু ক্লীববাচী কয়েকটি শব্দ আছে। স্ত্রীত্ববাচী কোনো বৈশিষ্ট্য সর্বনামে নাই।

কোনো কোনো শব্দ আবার পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কেই বুঝায়। ঐগুলিকে উভলিঙ্গ বলে। কিন্তু এইগুলির কোনো আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নাই ; যেমন—বন্ধু, মিত্র, শিশু ইত্যাদি। আবার, এমন শব্দ আছে, যাহা পুং-স্ত্রী উভয়কেই একসঙ্গে বুঝায়। যেমন, দম্পতি, যুগল, ইত্যাদি। এইগুলিকে পুংলিঙ্গ বলাই উচিত।

পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে যে, বাঙলায় ঠিক সংস্কৃতের মতো পুং-ক্লীবলিঙ্গ স্থির করা থাকে না। বাঙলায় সাধারণত অচেতন পদার্থকে ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া ধরা হয়। সুতরাং বিশেষ্য সম্বন্ধে এই কথা বলিলে সম্ভবত ঠিক হয় যে, যাহাকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করা যায়, তাহাকেই পুংলিঙ্গ বলা চলে—অন্যগুলি ক্লীবলিঙ্গ। অবশ্য ইহা ছাড়াও কতকগুলি আছে নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ—তাহাদের স্ত্রীত্ববোধক আ বা ঈ সঙ্গেই থাকে, পুংলিঙ্গে এইগুলির প্রয়োগ নাই। যেমন, লতা, মক্ষিকা প্রভৃতি। এইগুলির স্ত্রীসূচক বৈশিষ্ট্য নাই। আবার, কতকগুলি শব্দ আছে, যাহাদের স্ত্রীলিঙ্গে আকৃতি কল্পনা করা গেলেও অর্থবিরোধই ঘটে, সেগুলি নিত্য-পুংলিঙ্গ। যেমন, অকৃতদার, বিপত্নীক, স্ত্রৈণ, ইত্যাদি। আবার কতকগুলি এইরূপেই অর্থগত নিত্য-স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন—সপত্নী, বিধবা, পতিব্রতা, ইত্যাদি। এইগুলি প্রায় সবই তৎসম শব্দ, তাই, সংস্কৃতানুসারেই ইহাদের লিঙ্গ নির্ধারিত হইয়াছে।

একজাতীয় শব্দ আছে, যাহার পুংলিঙ্গ হইতে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন করা চলে না, কারণ, ঐরূপ শব্দের শুধু পুংলিঙ্গ বা শুধু স্ত্রীলিঙ্গেরই প্রয়োগ ভাষায় পাওয়া যায়।

অন্ত শব্দ দ্বারা এইগুলির পরিবর্তন করা হইয়া থাকে। এই পরিবর্তন অর্থকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে। যেমন, বাবা-মা, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ইত্যাদি।

কতকগুলি পুংবাচক শব্দের আবার দুই অর্থে দুইটি স্ত্রীলিঙ্গ পদ হয়—একটি পত্নী-অর্থে, একটি জাতি-অর্থে। যেমন, দাদা—দিদি, বৌদি; দেওর—ননদ, জা; শূদ্র—শূদ্রা, শূদ্রী; আচার্য—আচার্যা, আচার্যানী, ইত্যাদি। অন্যান্য অর্থ-পার্থক্য থাকিলে একাধিক স্ত্রীলিঙ্গ পদ কোথাও কোথাও দেখা যায়। যথা, সূর্য—সূরী, সূর্যা। স্থল—স্থলী, স্থলা। তবে এই সমস্ত শব্দ নিতান্তই সংস্কৃত, বাঙ্‌লায় ইহাদের প্রয়োগ বেশি নাই।

একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, বাঙ্‌লায় বিশেষণপদের উত্তর যে বিশেষ্যানুযায়ী স্ত্রীপ্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহার প্রয়োগক্ষেত্র খুবই সংকীর্ণ। আজকাল তৎসম বিশেষ্যপদেও স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ কমই ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো স্থলে এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ বাঙ্‌লায় অপ্রযুক্ত বলাই চলে। যথা—গুরুতরা ঘটনা, প্রবলা লজ্জা, ব্যর্থা চেষ্টা, ইত্যাদি প্রয়োগ বাঙ্‌লায় প্রায় অচল।

বাঙ্‌লা ভাষার নিজস্ব স্ত্রীপ্রত্যয় (আনী, নী, ইনী, ইত্যাদি) কয়েকটি আছে। ইহাও মনে রাখা দরকার যে, দেশি ও বিদেশি বিশেষণগুলির স্ত্রীলিঙ্গ নাই বলিলেই চলে। ভালো, খারাপ, খুব, বেজায়, জোর, তোফা, ইত্যাদি বিশেষণ কস্মিন্‌কালে স্ত্রীলিঙ্গে কোনরূপ পরিবর্তিত হয় না।

॥ লিঙ্গ পরিবর্তন ॥

বাঙ্‌লায় পুংলিঙ্গ শব্দসকল দুইটি অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত হয়—(১) স্ত্রীজাতি অর্থে ও (২) পত্নী অর্থে।

পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করিবার নিয়ম :

পুংলিংঙ্গ শব্দ আ, ঈ, আনী প্রভৃতির যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

আ-যোগে

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অধীন	অধীনা[১]	চণ্ড	চণ্ডা[৩]
অনাথ	অনাথা[২]	গায়ক	গায়িকা[৪]
অজ	অজা	কৃশ	কৃশা
প্রথম	প্রথমা	কোকিল	কোকিলা
দ্বিতীয়	দ্বিতীয়া	শ্রদ্ধেয়	শ্রদ্ধেয়া
	তৃতীয়া	প্রিয়	প্রিয়া
জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা	দীন	দীনা
লেখক	লেখিকা	বালক	বালিকা

১ কাঁদিবে অধীনা রমা—মাইকেল। ২ অনাথিনী মাগিছে সহায়—রবীন্দ্রনাথ।
৩ চণ্ডী পদও হয়। ৪ কেন-বা নাচিছে নট গাহিছে গায়কী—মাইকেল।

প্রয়োগ- -এমত সময় কুলিদের কতকগুলি **বালকবালিকা** আসিয়া আমার গাড়ী ঘেরিল।

—সঞ্জীবচন্দ্র

ঈপ্-যোগে

পুংলিঙ্গ

গোপ	গোপী	দাস	দাসী
মৎস্য	মৎসী	বৈষ্ণব	বৈষ্ণবী
কপোত	কপোতী	শংকর	শংকরী
তাদৃশ	তাদৃশী	চণ্ডাল	চণ্ডালী
মানব	মানবী	একাদশ	একাদশী
ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী	চাতক	চাতকী
নদ	নদী	রজক	রজকী
বুদ্ধিমান্	বুদ্ধিমতী	খনক	খনকী
বর্ষীয়ান্	বর্ষীয়সী	নর্তক	নর্তকী
নেতা	নেত্রী	নিশাচর	নিশাচরী
কর্তা	কর্ত্রী	গুণবৎ	গুণবতী
তপস্বী	তপস্বিনী	হিরণ্ময়	হিরণ্ময়ী

প্রয়োগ—(১) **ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী** উভয়ে অবাক হইয়া গেলেন।

—খগেন্দ্রনাথ মিত্র

(২) গাহিল কুঞ্জে **কপোতকপোতী** দুটি। —রবীন্দ্রনাথ

আনীপ্-যোগে

লিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	
ইন্দ্র	ইন্দ্রাণী	ব্রহ্মণ্	
ঈশ	ঈশানী	বরুণ	বরুণানী
রুদ্র	রুদ্রাণী	ব্রহ্মা	
ভব	ভবানী	শিব	শিবানী
শর্ব	শর্বাণী		(শিবা)
অরণ্য	অরণ্যানী	হিম	হিমানী ('হিমসমূহ)

নিম্নে কয়েকটি শব্দ 'ইনী'-যোগে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত হইয়াছে। উহারা কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণমতে অশুদ্ধ।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সিংহ	সিংহিনী	পাগল	পাগলিনী
হেমাঙ্গ	হেমাঙ্গিনী	সাপ	সাপিনী
কাঙাল	কাঙালিনী	মালী	মালিনী
কুরঙ্গ	কুরঙ্গিণী	বৈরাগী	বৈরাগিণী
অভাগা	অভাগিনী	বিহঙ্গ	বিহঙ্গিনী

বিকল্প প্রত্যয়-যোগে

চন্দ্রমুখ	চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখা	ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়ী
সুকেশ	সুকেশী, সুকেশা		(পত্নী-অর্থে)
মাতুল	মাতুলানী, মাতুলী,		ক্ষত্রিয়াণী, ক্ষত্রিয়া
	মাতুলা		(জাতীয়া স্ত্রী-অর্থে)
উপাধ্যায়	উপাধ্যায়ানী	আচার্য	আচার্যানী
	(পত্নী-অর্থে)		(আচার্যের পত্নী)
	উপাধ্যায়ী (উভয় অর্থে)		আচার্যা (শিক্ষয়িত্রী)

নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ্য কর

সম্রাট্	সম্রাজ্ঞী	বিদ্বান্	বিদুষী
শ্বন্	শুনী	অগ্নি	অগ্নায়ী
শ্বশুর	শ্বশ্রূ	মনু	মনায়ী, মনাবী
রাজা	রাজ্ঞী, রাণী	সূর্য	সূর্যা, সূরী
পতি	পত্নী	শূদ্র	শূদ্রী (পত্নী-অর্থে)
পুরুষ	স্ত্রী		শূদ্রা (জাতি-অর্থে)

নী-যোগে

জেলে	জেলেনী	খোট্টা	খোট্টানী
কলু	কলুনী	তাঁতি	তাঁতিনী
ডাক্তার	ডাক্তারনী	প্রেত	প্রেতনী
বেদে	বেদেনী	কামার	কামারনী
মেছো	মেছোনী	চাঁড়াল	চাঁড়ালনী
মাস্টার	মাস্টারনী	গয়লা	গয়লানী

আনী-প্রত্যয়যোগে

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মেথর	মেথরানী	নাপিত	নাপিতানী
ঠাকুর	ঠাকুরানী	ধোপা	ধোপানী
চাকর	চাকরানী	চৌধুরী	চৌধুরানী

ইনী-প্রত্যয়যোগে

চাতক	চাতককিনী	কাঙাল	কাঙালিনী
নাগ	নাগিনী	রজক	রজকিনী
বাঘ	বাঘিনী	সাপ	সাপিনী

ঈ-প্রত্যয়যোগে

কাকা	কাকী	বুড়া	বুড়ী
পিসা	পিসী	খোকা	খুকী
খুড়া	খুড়ী	মেসো	মাসী
মামা	মামী	কুঁদুলে	কুঁদুলী
শালা	শালী	ছাত্র	ছাত্রী

বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগে

চাকর	ঝি	বাপ	মা
জনক	জননী	স্বামী	স্ত্রী
রাজা	রানী	ভূত	পেত্নী
পিতা	মাতা	কর্তা	গিন্নী
শ্বশুর	শাশুড়ী	বর	কনে

প্রয়োগ—**বাপ-মার** কোল জুড়ে থাক্ সুন্দর তুই খোকা তুই ভাল থাক্ রে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

নিম্নলিখিত পরিবর্তন ও তাহাদের অর্থের প্রতি লক্ষ্য কর ঃ

পুলিংঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ (পত্নী অর্থে)	স্ত্রীলিঙ্গ (সাধারণ স্ত্রী অর্থে)
দাদা	বৌদিদি	দিদি
পুত্র	পুত্রবধূ	কন্যা
ভাগনা, ভাগ্নে	ভাগ্নেবৌ	ভাগ্‌নী
ভাই	ভাজ	বোন
ছেলে	বৌ	মেয়ে
ভ্রাতা	ভ্রাতৃবধূ	ভগিনী, ভগ্নী
দেওর, দেবর	জা	ননদ, ননদী
শালা	শালাজ	শালী

পুং বা স্ত্রীবাচক শব্দের প্রয়োগে

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	
কবি	মহিলাকবি	পুরুষমানুষ	মেয়েমানুষ
প্রভু	প্রভুপত্নী	মুনি	মুনিপত্নী
বেটাছেলে	মেয়েছেলে	গয়লা	গয়লা-বৌ
ঠাকুর-পো	ঠাকুর-ঝি	সভাপতি	সভানেত্রী

দেশি-বিদেশি শব্দের লিঙ্গপরিবর্তন

সাহেব	সাহেবা, মেম, বিবি	দাদা	দাদী
গোলাম	বাঁদী	চাচা	চাচী
ভাই	ভাবী (বৌদিদি)	ফুপা (পিসে)	ফুপু (পিসি)
খালু (মেসোমশায়)	খালা (মাসীমা)	নানা (দাদামশায়)	নানি (দিদিমা)
নবাব, বাদ্‌শাহ্	বেগম		
শাহ্‌জাদা (রাজপুত্র)	শাহ্‌জাদী (রাজকন্যা)		
বেটা	বেটী		
লর্ড	লেডী		
মামু	মামানী		
খানসামা	আয়া		
শওহর (স্বামী)	আহলিয়া (স্ত্রী)		
মিয়া (সম্ভ্রান্ত পুরুষ)	বিবি (সম্ভ্রান্ত মহিলা)		

কতকগুলি প্রয়োগ :

(১) **অভাগী**-করমদোষে —চণ্ডীদাস।

(২) **জনকজননী** প্রাণ গুণের **সাগর** —কৃত্তিবাস।

(৩) পিতৃশ্রাদ্ধ করে রাম **ফল্গু নদী** তীরে —ঐ

(৪) যে ঘরে **সতিনী** রহে দুঃখানলে প্রাণ দহে —কবিকঙ্কণ।

(৫) আমি **চণ্ডী** আইলাম তোরে দিতে বর। — ঐ

(৬) পরিচ্ছেদ নাহি **সন্ধ্যা দিবস রজনী**। — ঐ

(৭) সখার **কুমারী** হয় আপন **ঝিয়ারী** —কাশীরাম দাস।

(৮) আর কি ক্ষমতা রাখ **এলোকেশী** —কবিরঞ্জন।

(৯) আর আর গৃহী **গৃহিণী** আছে যারা। —ভারতচন্দ্র।

(১০) **অলক্ষণা সুলক্ষণা** যে হই সে হই। —ঐ

(১১) **সুকেশিনী** শিরোশোভা কেশের ছেদনে —মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

(১২) **চাতকিনী কুতুকিনী** ঘন দরশনে। —ঐ

॥ অনুশীলনী ॥

লিঙ্গ কয়প্রকার ? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

লিঙ্গবৈচিত্র্য সম্বন্ধে কী জান, লেখ।

৩ নিত্যপুংলিঙ্গ ও নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ শব্দের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৪ ক্ষুদ্রার্থবাচক স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত তিনটি শব্দের নাম কর।

৫ নিম্নলিখিত শব্দগুলির লিঙ্গ পরিবর্তন কর :

সেবক, গায়ক, ছাত্র, মনুষ্য, ঠাকুর, অভিনেতা, কবি, সভাপতি, অকুণ্ঠ, গরীয়সী, সম্রাট, ব্রাহ্ম রাজা, বর্ণ, সেবক, ভৃত্য, নর্তক, আয়ুষ্মান, আহ্লাদ, বিক্রেতা, প্রিয়তম, মাস্টার, চাকর, গুণবান্, সুন্দর, স্বর্গত, মেড়া, শূকর, জনক, মৎস্য, বণিক, গর্দভ, নিঃস্ব, ভ্রাতা।

৬। নিম্নলিখিত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলির পুংলিঙ্গ শব্দ বল :

রাজ্ঞী, রূপসী, ধাত্রী, নন্দিনী, পিসী, যামিনী, প্রেয়সী, ভ্রমরী, খ্যাতনাম্নী, তন্বী।

[২] বচন

১। যাহা দ্বারা কোন পদার্থের সংখ্যা বুঝায় তাহাকে বলে **বচন**। বাঙ্‌লা ভাষার বচন দুটি—একবচন ও বহুবচন। সংস্কৃতে দ্বিবচন আছে।

(ক) যাহার দ্বারা একটিমাত্র বস্তু বা ব্যক্তি বুঝায় তাহাকে বলে একবচন। যথা,—লোক, বালক, বৃক্ষ, প্রভৃতি।

(খ) যাহা দ্বারা একাধিক বস্তু বা ব্যক্তি বুঝায় তাহাকে বহুবচন বলে। যথা—লোকগুলি, বালকেরা, বৃক্ষসকল প্রভৃতি।

একবচন—একবচনে বাঙ্‌লায় কোনোপ্রকার প্রত্যয় যোগ হয় না। যথা—গাছ, ঘর, পাতা।

কখনো কখনো টি, টা, গাছি, গাছা, খানা, খানি প্রভৃতি নির্দেশক শব্দের প্রয়োগ একবচন বুঝাইয়া দেয়। যথা—লাঠিটা, বালকটি, বইখানা, দুধটুকু প্রভৃতি। উহাদের উত্তর বিভক্তিরও প্রয়োগ হয়। যথা—বালকটিকে, লাঠিদ্বারা, বইখানা হইতে। সময় সময় এই নির্দেশক অংশগুলি আবার একবচন ছাড়াও বিশেষ্যের অবস্থা প্রকাশ করে।

কোনো কোনো সময়ে ইহারা সংখ্যাবাচক বিশেষণের পূর্বে থাকিয়া অনির্দিষ্ট ভাব প্রকাশ করে। যথা—খানদশেক রুটি, জন-পাঁচ লোক, প্রভৃতি।

কতকগুলি শব্দ নিত্য একবচনান্ত। উহারা ক্রিয়াবাচক, ধাতুবাচক, গুণবাচক ও তরল দ্রব্যবাচক শব্দ। উদাহরণ, যথা—ভদ্রতা, মাধুর্য, বীরত্ব, স্বর্ণ, দুধ প্রভৃতি।

বহুবচন করিবার নিয়ম

(ক) বিশেষ্যের পর বহুবচনবাচক শব্দ ব্যবহার করিয়া বহুবচনে পরিবর্তিত করা হয়।

সাধারণত প্রাণিবাচক বিশেষ্যের পরে রা, এরা প্রভৃতি যোগ করিতে হয়। যথা —পাখী, পাখীরা। বালক, বালকেরা।

প্রাণী ও অপ্রাণী উভয় বাচক শব্দের উত্তর গুলি, গুলা যোগ করিয়া বহুবচন হয়। যথা—ছেলেগুলা, মেঘগুলি, পাতাগুলি।

(খ) দিগের, দের, দিগকে যোগ করিয়াও বহুবচন করা যাইতে পারে। যথা—বালকদিগের, বালকদের, ছেলেদিগকে প্রভৃতি।

(গ) বিশেষ্যের সহিত বর্গ, গণ, বৃন্দ, রাজি, কুল, মালা, দল, মণ্ডল, গ্রাম, শ্রেণী প্রভৃতি যোগ করিয়া। যথা—প্রজাবর্গ, মনুষ্যগণ, সভ্যবৃন্দ, বৃক্ষরাজি, অলিকুল, পর্বতমালা, দস্যুদল, মেঘমণ্ডল, ইন্দ্রিয়গ্রাম, তরুশ্রেণী প্রভৃতি।

(ঘ) বিশেষ্যের পূর্বে অনেক, বিস্তর, অসংখ্য, অজস্র প্রভৃতি বহুত্ববোধক বিশেষণ বসাইয়াও একবচনকে বহুবচনে পরিণত করা যায়। যথা—অনেক কথা, বিস্তর আম, অসংখ্য তারকা, অজস্র টাকা প্রভৃতি।

(ঙ) কখনো কখনো সংখ্যা বা সমষ্টিবাচক শব্দ বিশেষ্যের পরে বসে। যথা—শিক্ষক পাঁচজন (বিশেষ পাঁচজন শিক্ষক), বালিকা তিনটি (বিশেষ তিনজন বলিকা)।

(চ) বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ দুইবার প্রয়োগ করিলে বহুবচন বুঝায়। যথা—

বিশেষ্য—বনে বনে, ভাই ভাই, দিন দিন, ঝুড়ি ঝুড়ি, ঠাঁই ঠাঁই।

তুং—'আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার' —রবীন্দ্রনাথ
'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির'
'বনদেবীর দ্বারে দ্বারে গভীর শঙ্খধ্বনি' —রবীন্দ্রনাথ

বিশেষণ—ছোট ছোট ছেলে, বড বড় গাছ, বাছা বাছা লোক।

(ছ) সর্বনাম পদের দুইবার প্রয়োগে বহুবচন বুঝান হয়। যথা—কে কে (কাহারা) সেখানে যাইবে? যে যে (যাহারা) না পড়িবে সে সে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইবে।

(জ) অসমাপিকা ক্রিয়া প্রয়োগের দ্বিরুক্তিতে বহুবচন করা যাইতে পারে। যথা —আম খাইয়া খাইয়া তাহার আম আর ভাল লাগে না।

(ঝ) বহুত্বসূচক ক্রিয়াবিশেষণের প্রয়োগে অনেক সময়ে বহুবচনের প্রতীতি হয়। যথা—সে এখানে **হামেশাই** আসে।

(ঞ) জাতি বুঝাইতে একবচনের প্রয়োগ হয়। যথা—**মানুষ** মরণশীল।

(ট) বিশেষ অর্থে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের বহুবচনে প্রয়োগ হয়। যথা—এ গ্রামে পাঁচজন রাম আছে।

(ঠ) বিশেষ অর্থে সমষ্টিবাচক বিশেষ্যের বহুবচনে প্রয়োগ হয়। যথা—দুটি **সৈন্যদল** যাত্রা করিল।

(ড) গুণবাচক বস্তুর নামের সহিত কখনো কখনো 'খানা'-'খানি'র প্রয়োগ হয়। যথা—ভাবখানা ভাল নয়।

তু°—সেই লজ্জা-আভাখানি। —রবীন্দ্রনাথ

(ঢ) পরিমাণবাচক বিশেষণের সহিত টা-টি, খানি-খানা ব্যবহৃত হয়। যথা—এতটা, এতখানা, অনেকটা।

(ণ) যুগ্ম শব্দের প্রয়োগেও অনেক সময় বহুত্বের বোধ জন্মে। যথা—লোকজন, বন্ধুবান্ধব।

২। নিম্নে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বহুবচনের রূপগুলি লক্ষ্য কর :

বিশেষ্য

জন	জনগণ	ভাই	ভায়েরা
লোক	লোকেরা	মা	মায়েরা
বই	বইগুলি	গাছ	গাছগুলি
ফুল	ফুলগুলি	আরোহী	আরোহিগণ
গুণী	গুণিগণ	দর্শক	দর্শকবৃন্দ
সুধী	সুধীবৃন্দ	শিক্ষক	শিক্ষকগণ

সর্বনাম

আমি	আমরা	যে	যাহারা
তুমি	তোমরা	সে	তাহারা
তুই	তোরা	তিনি	তাঁহারা
আপনি	আপনারা	কে	কাহারা
উহা	উহারা	যিনি	যাঁহারা

॥ অনুশীলনী ॥

১। বচন কাহাকে বলে ও উহা কয় প্রকার?

২। একবচনে প্রয়োগ সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম বল।

৩। পুঞ্জ, মালা, সমূহ, রাজি, গণ, কুল—এগুলিকে শব্দের শেষে যোগ করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর।

৪। বাঙ্‌লায় বহুবচন কোন্ কোন্ উপায়ে বুঝানো যাইতে পারে? প্রত্যেকটির একাধিক উদাহরণ দাও।

৫। 'কখনো কখনো বহুবচন একবচন নির্দেশ করে'—উদাহরণের সাহায্যে বিবৃত কর।

৬। 'একবচনের দ্বারা বহুত্বের নির্দেশ করা যায়।'—দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৭। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও

(ক) দ্বিরুক্ত সর্বনামের প্রয়োগে বহুত্বনির্দেশ;

(খ) ক্রিয়াবিশেষণের প্রয়োগে বহুত্বনির্দেশ;

(গ) বিশেষ্যের দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুত্বনির্দেশ।

৮। ব্যাকরণগত টিপ্পনী লেখ:

(ক) 'গেলে সে বাজার
সারা দিনে আর
দেখা পাওয়া তার ভার' —রবীন্দ্রনাথ

(খ) 'বনে বনে উড়ে তোমার রঙীন বসনপ্রান্ত'। —রবীন্দ্রনাথ

(গ) 'টুটি গেল সরমখানি'।

(ঘ) 'ছেলেমেয়ে ভিড় করেছে চৌদিকে তার আঙিনাতে'।
—গোলাম মোস্তাফা

(ঙ) 'মধুর ক্ষুদের লাগি যার দ্বারে দ্বারে ফিরে
আসে ভগবান্।' —কালিদাস রায়

[৩] পুরুষ

বিশেষ্য এবং সর্বনামের যেরূপ বচনভেদ দেখা যায়, পুরুষভেদও সেইরূপ দেখা যায়।

পুরুষ তিনটি—উত্তম পুরুষ (First Person); মধ্যম পুরুষ (Second Person); প্রথম পুরুষ (Third Person)।

আমি আমরা—উত্তম পুরুষ

তুমি, তোমরা—তুই, তোরা,—আপনি, আপনারা—মধ্যম পুরুষ

বাকি সমস্ত বিশেষ্য ও সর্বনাম, যেমন—সে, তাহারা, তিনি, তাঁহারা প্রভৃতি এবং রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি প্রথম পুরুষ।

অতএব শুধু সর্বনাম পদেরই পুরুষ আছে, বিশেষ্য পদের কেবল প্রথম পুরুষ ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ নাই।

মধ্যম পুরুষের সর্বনামের তিনটি রূপ হয়:

সাধারণ—তুমি, তোমরা

অসম্ভ্রমসূচক—তুই, তোরা

সম্ভ্রমসূচক—আপনি, আপনারা।

প্রথম পুরুষের সর্বনামের দুটি রূপ—

সাধারণ—সে, তাহারা।

সম্ভ্রমসূচক—তিনি, তাঁহারা

ক্রিয়াপদের পুরুষ থাকে এবং পুরুষ অনুসারে তাহার পরিবর্তনও প্রভূত ঘটে। তবে ক্রিয়াপদের পুরুষ সম্পূর্ণরূপে কর্তৃবাচ্যে কর্তৃকারকের অধীন এবং কর্মবাচ্যে কর্মকারকের অধীন। যথা

সে, তাহারা খায়। তুমি, তোমরা খাও। আমি, আমরা খাই। তিনি, তাঁহারা খান। আপনি, আপনারা খান। তুই, তোরা খাস্। রাম, শ্যাম খায়।

॥ অনুশীলনী ॥

১। বাঙ্‌লায় পুরুষ কয় প্রকার ও কী কী?

২। মধ্যম ও প্রথম পুরুষের ভেদ থাকিলে তাহা লেখ।

তৃতীয় অধ্যায়

(১) কারক ও বিভক্তি

বিশেষ্য অথবা তৎস্থানীয় পদের সংখ্যা ও কারকের যাহা বোধ জন্মাইয়া দেয় তাহাকে বলে বিভক্তি। আর, কোনো বাক্যে ক্রিযাপদের সহিত যাহার অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকে তাহাকে **কারক** বলে। বাঙ্‌লায় কারক ছয় প্রকার: কর্তা, **কর্ম**, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ। ক্রিযার সহিত কোনো সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া **সম্বন্ধ** বা **সম্বোধন**-কে কারক বলা হয় না—**ইহাদের নাম পদ**। যে-পদের সাহায্যে কাহাকেও আহ্বান করা হয় তাহাকে বলে সম্বোধন।

[ক] **কর্তৃকারক বা কর্তাকারক:**

যাহার দ্বারা কোনো ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সে কর্তা। কর্তৃকারকে সাধারণত প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন, **বায়ু** প্রবাহিত হইতেছে। মেঘ হইতে **বৃষ্টি** পড়িতেছে। প্রথমা ছাড়াও, কর্তৃকারকে স্থলবিশেষে নানা বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন, **রামকে** আজ কলিকাতায় যাইতে হইবে (দ্বিতীয়া বিভক্তি)। **তাহাকে দিয়া** এই কাজটি চলিবে না (তৃতীয়া বিভক্তি)। তাড়াতাড়ি বাহির হইতে হইল বলিয়া **সুনীলের** আজ ভাত খাওয়াই হইল না (ষষ্ঠী বিভক্তি)। **দশে** মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ (সপ্তমী বিভক্তি)। **পাগলে** কী না বলে, **ছাগলে** কী না খায় (সপ্তমী বিভক্তি)।

[খ] **কর্মকারক :**

কর্তা যাহা করে অথবা যাহা দ্বারা ক্রিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে, অর্থাৎ যে-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়ার কর্ম হয় তাহাই কর্ম। কর্মকারকে সাধারণত দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন, শিক্ষকমহাশয় ছাত্রদিগকে ব্যাকরণ শিখাইতেছেন। 'ফুলদল দিয়া কাটিলা কি 'বধাতা শাল্মলী'-তরুবরে' —মাইকেল।

কর্মকারকে প্রথমা, সপ্তমী বিভক্তিরও প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, শিশুকর্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে (প্রথমা)। অন্ধজনে দয়া করিবে (সপ্তমী)।

কতকগুলি অবস্থাবাচক ক্রিয়ার কোনো কর্ম থাকে না—ইহাদের নাম অকর্মক ক্রিয়া। যেমন—থাকা, লাগা, হাটা, বাঁচা, মরা ইত্যাদি। কয়েকটি অকর্মক ক্রিয়ার সমধাতুজ কর্ম হইয়া থাকে। সমধাতুজ কর্মের অপর নাম সমধাতুক, ক্রিয়াসম অথবা ধাত্বর্থক কর্ম, এবং এই কর্মগুলির পূর্বে অনেক সময় বিশেষণ পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন, বড বাঁচা বাচিলাম। দৌড়ের প্রতিযোগিতায় সে কী দৌড়টাই না দৌড়াইল। সকর্মক ক্রিয়ার কোনো কোনো স্থলে দুইটি কর্ম থাকে, ইহাদের একটির নাম মুখ্য (প্রধান), অপরটির নাম গৌণ (অপ্রধান) কর্ম। এই কর্মদুইটির মধ্যে যেটি'ত দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন থাকে সেইটি গৌণকর্ম এবং যেটিতে বিভক্তির চিহ্ন থাকে না সেইটি মুখ্যকর্ম। যেমন, মাতা শিশুকে (গৌণ) চাঁদ (মুখ্য) দেখাইতেছেন। "কখনো কখনো সকর্মক ক্রিয়ার দুইটি কর্ম থাকে—উহাদের মধ্যে একটিকে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য করিয়া অপবটির দ্বারা কিছু বলা হয়, অথবা অপরটিকে প্রথমটির উপর আরোপ করা হয়। যথা—হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া সম্মান করে। পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা জানিয়া পূজা করিবে। এই দুইটি বাক্যে 'বুদ্ধদেব' ও 'পিতামাতাকে'-কে উদ্দেশ্য করিয়া অন্য শব্দগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ কর্মপদকে উদ্দেশ্য কর্ম বলে এবং আরোপিত অন্য কর্মকে ('অবতার' ও 'দেবতা') বিধেয় কর্ম বলে।

[গ] **করণকারক :**

প্রধানত যাহার সাহায্যে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহাকে করণকারক বলে। করণকারকে সাধারণত তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন, ছুরি দিয়া পেন্সিলটি কাটিয়া দাও। ইহা ছাড়া, অন্যান্য বিভক্তিযোগেও করণকারক হইয়া থাকে। যেমন, তাহারা তাস খেলিতেছে (প্রথমা)। আমা হতে এই কার্য হবে না সাধন (পঞ্চমী)। এমন ইটপাথরের বাড়ী শক্ত তো হবেই (ষষ্ঠী)। কলমের খোঁচা দিও না, ওর চোখে লাগবে (ষষ্ঠী)। 'সেইখানে একটি স্যাতলা প্রকাণ্ড সাদা মারবেলের বাড়ী'—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এ কাজটা নিজ হাতে তুমি করো, অন্য কারো উপর ভার থাকে না যেন (সপ্তমী)। ফুটফুটে জ্যোৎস্নাতে সমস্ত আকাশ একেবারে ভরে গিয়েছে (সপ্তমী)। 'কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল'।—হেমচন্দ্র

[ঘ] সম্প্রদানকারক :

যাহার উদ্দেশ্যে কিছু করা হয় কিংবা যাহাকে কোনো কিছু দান করা হয় তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে। সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তির (দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্নই বাঙ্‌লায় চতুর্থী বিভক্তির চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়) প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন, **দরিদ্রকে** ধন দান করিলে, **তৃষ্ণার্তকে** জল দান করিলে, **ক্ষুধার্তকে** অন্ন দান করিলে পুণ্য হয় (দ্বিতীয়া বিভক্তিযোগে সম্প্রদানকারক)। সম্প্রদান-কারক ষষ্ঠী, সপ্তমী বিভক্তিরও প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন, '**দেবতার** ধন, কে যায় ফিরায়ে লয়ে, এই বেলা শোন' (ষষ্ঠী বিভক্তি)। **শিবের** মন্দিরে পূজা দিতে যাইতে হইবে (ষষ্ঠী বিভক্তি)। সকল কার্যফল **ভগবানে** সমর্পণ করিবে (সপ্তমী বিভক্তি)। 'দেবতার ধন' ও 'শিবের মন্দির' কথাগুলির মধ্যে সম্প্রদান-সম্বন্ধ রহিয়াছে।

[ঙ] অপাদানকারক :

যাহা হইতে ঘটনা বা কার্যের উৎপত্তি হয় বা যাহা হইতে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির চলন, পতন, উত্থান, গ্রহণ, নির্গম, ইত্যাদি সংঘটিত হয়—এককথায়, যাহা হইতে ক্রিয়ার কার্য সম্পাদিত হয়, তাহাকে অপাদান কারক বলে। অপাদান কারকে সাধারণত পঞ্চমী বিভক্তিই হইয়া থাকে। কিন্তু যেহেতু বাঙ্‌লায় পঞ্চমী বিভক্তির কোনো চিহ্ন নাই সেহেতু অনুসর্গ—হইতে, অপেক্ষা, অবধি, পর্যন্ত, চেয়ে, থেকে—প্রভৃতির যোগে অপাদানকারক গঠিত হয়। যেমন, **বৃক্ষ হইতে** অবতরণকালে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। গতকল্য **বৈকাল হইতে** তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। **মাতাপিতার চেয়ে** আর বড়ো দেবতা নাই। **তোমার কাছ থেকে** আমি আজ পাঁচ টাকা ধার নেবো। অপাদানকারকে তৃতীয়া, ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তিরও যোগ হয় ; যেমন, চোরকে এত মার মেরেছে, তার **মুখ দিয়ে** অজস্র রক্ত বেরুচ্ছে (তৃতীয়া)। 'ইন্দ্রনাথের **ক্ষত দিয়া** রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল'—শরৎচন্দ্র। যেখানে **বাঘের** ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়' (ষষ্ঠী)। কত **ধানে** কত চাল হয় তা আমি বেশ জানি (সপ্তমী)। **খনিতে** সোনা পাওয়া যায় (সপ্তমী)। 'বিরত সতত **পাপে** দেবকুল'—মাইকেল।

[চ] অধিকরণকারক :

ক্রিয়ার আধারকেই অধিকরণ বলে। অর্থাৎ যে স্থান, কাল, বিষয় কিংবা অবস্থাকে আশ্রয় বা অবলম্বন করিয়া কোনো ঘটনা ঘটে অথবা কোনোকিছু বিদ্যমান থাকে তাহাকে অধিকরণকারক বলা হয়। অধিকরণকারকে সাধারণত সপ্তমী বিভক্তিরই প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, সন্ধ্যার **পূর্বেই গৃহে** ফিরিয়া আসিবে। অধিকরণকারকে প্রথমা, তৃতীয়া, পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্নও ব্যবহৃত হয়। যেমন, অনাবৃষ্টিতে **এ বৎসর** ভালো ফসল জন্মায় নাই (প্রথমা)। **কাল** তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম কিন্তু গিয়ে দেখলাম তিনি **বাড়ী** নেই (প্রথমা)। তোমার গ্রামের

পাশ দিয়াই তো নদীটি বহিয়া গিয়াছে (তৃতীয়া)। রাস্তার শোভাযাত্রাটি **ছাদ থেকেই** দেখতে পাবে (পঞ্চমী)।

অধিকরণ তিনপ্রকার : (ক) **আধারাধিকরণ,** (খ) **কালাধিকরণ** ও (গ) **ভাবাধিকরণ**। দৃষ্টান্ত : (ক) এই **পুকুরে** অনেক মাছ আছে (আধারাধিকরণ)। **বাঙ্‌লাদেশে** হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বাস (আধারাধিকরণ)। 'রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদীসৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে'—বঙ্কিমচন্দ্র (আধারাধিকরণ)। (খ) গ্রামের পথঘাট **বর্ষাকালে** কাদায় ভরিয়া যায় (কালাধিকরণ)। তাঁহার অসুস্থতার সময় আমাকে **তিন রাত্রি** জাগিতে হইয়াছিল (কালাধিকরণ)। (গ) এত **দুঃখ-কষ্টে** পতিত হইয়াছেন তথাপি তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই (ভাবাধিকরণ)। শকুন্তলা যখন **পতিচিন্তায়** মগ্ন তখন দুর্বাসা কণ্বের তপোবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন (ভাবাধিকরণ)।

আধারাধিকরণ আবার তিনভাগে বিভক্ত :—

(১) অভিব্যাপক, (২) ঐকদেশিক, (৩) সামীপ্যসূচক।

অভিব্যাপক :—**তিলে** তৈল আছে। ঐকদেশিক :—**বনে** বাঘ আছে।

সামীপ্যাধিকরণ :—চরকার দৌলতে তার **দুয়ারে** (দুয়ারের কাছে) বাঁধা হাতী।

এ পর্যন্ত সংক্ষেপে আমরা কারক ও বিভক্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। বিস্তৃত আলোচনা পরে করিব।

(২) বিভক্তি ও অনুসর্গ

বাঙ্‌লা ভাষায় কতকগুলি বিভক্তি আছে, ইহারা পদের অংশরূপেই ব্যবহৃত হয়, স্বতন্ত্র ব্যবহৃত হইতে পারে না। এইগুলিকেই বিশুদ্ধ বাঙ্‌লা বিভক্তি বলা যায়।

কর্তৃকারকে—এ, তে (এতে)।

সম্প্রদান ও কর্মকারকে—কে, এ, রে (এরে)।

অধিকরণ ও করণকারকে—এ, তে (এতে)।

সম্বন্ধপদে—এর, র।

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি অব্যয় আছে, যাহারা বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, আবার, স্বাধীনভাবেও ব্যবহৃত হইতে পারে। এইগুলিকে বলে **কর্মপ্রবচনীয়, অনুসর্গ বা পরসর্গ**। ইহাদের কয়েকটি উদাহরণ :

করণকারকে—দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক।

সম্প্রদানকারকে—নিমিত্ত, হেতু, জন্য, লাগিয়া, তরে, কারণ।

অধিকরণকারকে—কাছে, মধ্যে, উপরে, নিকটে, উপর, প্রতি।

ইহা ভিন্ন আরো কয়েকটি অনুসর্গ বিভিন্ন অর্থে বাঙ্‌লায় ব্যবহৃত হয়। যেমন—সঙ্গে, সাথে, সনে, আগে, ছাড়া, বিনা, ব্যতীত, পানে, দিকে, পাশে, পাছে, চেয়ে, অপেক্ষা, পিছে, বই, বাহিরে, ভিতরে, মাঝে, মাঝারে, ঠাঁই ইত্যাদি।

(৩) কারকবিভক্তি ও অকারক বিভক্তি

ক্রিয়ার সঙ্গে যে-পদের সম্বন্ধ থাকে, তাহাকে কারক কহে। কারক জন্য যে বিভক্তি প্রয়োগ হয়, তাহাকে কারকবিভক্তি কহে। অন্যান্য বিভক্তিকে অকারক বিভক্তি কহে। সম্বন্ধপদ ও সম্বোধনপদ কারক নহে। তবে সম্বোধনপদে সর্বদাই শূন্য বিভক্তি হয়। এতদ্ভিন্ন নিম্নে অকারক বিভক্তি কয়েকটি দেওয়া গেল :

সঙ্গে, সনে, সাথে, বিনা, ছাড়া, ব্যতীত, নীচে, বিহনে, মাঝে, মাঝারে, ভিতরে, বাহিরে, পাশে ইত্যাদি।

(৪) কারকবিভক্তি সম্বন্ধে অতিরিক্ত কথা

কারক কাহাকে বলে তাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। কারকজনিত যে বিভক্তি তাহাকে বলে **কারকবিভক্তি**। অনুসর্গ অথবা অন্য উপপদ-যোগে যে বিভক্তি বিহিত তাহাকে উপপদবিভক্তি বলে। বিশেষ্য বা সর্বনামের উত্তর কে, রা, এ প্রভৃতি কয়েকটি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এই চিহ্নগুলির নাম **বিভক্তি**। কোন কোন কারকে কী কী বিভক্তি হয় তাহা বলা হইতেছে।

কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া, করণে তৃতীয়া, সম্প্রদানে চতুর্থী, অপাদানে পঞ্চমী, অধিকরণে সপ্তমী ও সম্বন্ধে ষষ্ঠী।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, শব্দ যখন বিভক্তিযুক্ত হয় তখন তাহাকে পদ বলে। এই পদ দুইপ্রকার—**নামপদ** ও **ক্রিয়াপদ**। শব্দের উত্তর যে সকল বিভক্তি হয় তাহাদিগকে বলে **শব্দবিভক্তি**, আর, ধাতুর উত্তর যে সকল বিভক্তি যুক্ত হয় তাহাদিগকে বলে **ধাতুবিভক্তি**। শব্দবিভক্তির যোগে নামপদ এবং ধাতুবিভক্তির যোগে ক্রিয়াপদ সাধিত হয়। শব্দবিভক্তিগুলি কী কী তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। প্রত্যেক বিভক্তির দুইটি করিয়া বচন—একবচন ও বহুবচন।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	অ	রা, এরা
দ্বিতীয়া	কে, রে, য়	দিগকে, দিগেরে, দিগে, দিকে, দের, দেরে, দেরকে।
তৃতীয়া	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক	দিগের দ্বারা, দের দ্বারা, দিগের দিয়া, দের দিয়া, দিগের কর্তৃক, দের কর্তৃক, গুলি-গুলা কর্তৃক, দিয়া, দ্বারা।
চতুর্থী	কে, রে, য়	দিগকে, দিগেরে, দিগে, দিকে, দের, দেরকে।
পঞ্চমী	হইতে	দিগের হইতে, দের হইতে, থেকে।
ষষ্ঠী	র, এর	দিগের, দের, গুলির, গুলার, সমূহের, সকলের।

	একবচন	বহুবচন
সপ্তমী	এ, য়, তে, এতে	দিগে, দিগেতে, দিগতে, এর কাছে, নিকটে মধ্যে।

(ক) প্রথমার একবচনের বিভক্তিটি সর্বদাই লোপ পায়।

রাম গৃহে যাইতেছে। **পাতা** পড়িতেছে।

(খ) দ্বিতীয়ার একবচনের বিভক্তিও অনেক সময়ে লোপ হয়।

সে **চাঁদ** দেখিতেছে। বালকটি **আম** খাইতেছে।

এখানে 'রাম' ও 'পাতা' এই দুইটি পদে প্রথমা বিভক্তি এবং 'চাঁদ' ও 'আম' এই দুইটি পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি লোপ পাইয়াছে।

এখন উপরি-কথিত বিভক্তির যোগে শব্দের রূপ কী ভাবে করিতে হয়, তাহা দেখ :

বালক

প্রথমা	বালক	বালকেরা
দ্বিতীয়া	বালককে, বালকেরে,	বালকদিগকে, বালকদিগেরে
তৃতীয়া	বালক দ্বারা, বালক দিয়া, বালক কর্তৃক	বালকদিগের দ্বারা, বালকদের দ্বারা, বালক-দিগের দিয়া, বালকদের দিয়া, বালকদিগের কর্তৃক, বালকদের কর্তৃক
চতুর্থী	বালককে, বালকেরে	বালকদিগকে, বালকদিগেরে
পঞ্চমী	বালক হইতে	বালকদিগের হইতে, বালকদের হইতে
ষষ্ঠী	বালকের	বালকদিগের, বালকদের
সপ্তমী	বালকে, বালকেতে	বালকদিগে, বালকদিগেতে

বালিকা

প্রথমা	বালিকা	বালিকারা
দ্বিতীয়া	বালিকাকে, বালিকারে	বালিকাদিগকে, বালিকাদিগেরে
তৃতীয়া	বালিকা দ্বারা, বালিকাকে দিয়া, বালিকা কর্তৃক	বালিকাদিগের দ্বারা, বালিকাদের দ্বারা, বালিকাদিগের দিয়া, বালিকাদের দিয়া, বালিকাদিগের কর্তৃক, বালিকাদের কর্তৃক
	বালিকাকে, বালিকারে	বালিকাদিগকে, বালিকাদিগেরে
পঞ্চমী	বালিকা হইতে	বালিকাদিগের হইতে, বালিকাদের হইতে
	বালিকার	বালিকাদিগের, বালিকাদের
সপ্তমী	বালিকায়, বালিকাতে	বালিকাদিগে, বালিকাদিগেতে

ফুল

একবচন	বহুবচন
প্রথমা—ফুল	ফুলগুলি
দ্বিতীয়া—ফুলকে, ফুল	ফুলগুলিকে, ফুলগুলি
তৃতীয়া—ফুলের দ্বারা, ফুল দিয়া	ফুলগুলি দ্বারা, ফুলগুলি দিয়া
চতুর্থী—ফুলকে	ফুলগুলিকে
পঞ্চমী—ফুল হইতে, ফুল থেকে	ফুলগুলি হইতে, ফুলগুলি থেকে
ষষ্ঠী—ফুলের	ফুলগুলির
সপ্তমী—ফুলে	ফুলগুলিতে

স্ত্রীলিঙ্গ 'মা' শব্দ

প্রথমা—মা	মারা, মায়েরা
দ্বিতীয়া—মাকে, মায়ে	মাদিগকে, মাদেরকে
তৃতীয়া—মা দ্বারা, মায়ের দ্বারা, মাকে দিয়া, দিয়ে	মায়ের দ্বারা, মাদিগের দ্বারা, মায়েদের দ্বারা-দিয়া-দিয়ে
চতুর্থী—মাকে, মায়ে	মাদিগকে, মাদেরকে
পঞ্চমী—মা হইতে, মা থেকে	মায়েদের থেকে, মাদের হইতে
ষষ্ঠী—মার, মায়ের	মাদের, মায়েদের, মাদিগের
সপ্তমী—মায়ে, মায়েতে, মাতে	মাদিগেতে, মাদিগের মধ্যে, মায়েদের মধ্যে

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্‌লায় লিঙ্গভেদে শব্দরূপের কোনোপ্রকার বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না।

উত্তম পুরুষ 'আমি' শব্দ

প্রথমা—আমি, মুই	আমরা, মোরা
দ্বিতীয়া—আমায়, আমাকে	আমাদিগকে (আমাদিকে), মোদিকে
তৃতীয়া—আমা দ্বারা	আমাদিগের দ্বারা
চতুর্থী—আমায়, আমাকে	আমাদিগকে (আমাদিকে), মোদিকে
পঞ্চমী—আমা হইতে, মো হতে	আমাদিগের হইতে
ষষ্ঠী—আমার, মোর	আমাদিগের (আমাদের), মোদের
সপ্তমী—আমায়, মোতে, আমাতে, আমার মধ্যে	আমাদিগের (আমাদের) মধ্যে, মোদের মধ্যে

দ্রঃ—মো (মু) পদ্যে ও কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হয়।

সর্বনাম 'তুমি' শব্দ

একবচন	বহুবচন
প্রথমা—তুমি	তোমরা
দ্বিতীয়া—তোমাকে (তোমারে), তোমায়	তোমাদিগকে, তোমাদিগে, তোমাদের, তোমাদেরকে
তৃতীয়া—তোমা দ্বারা, তোমার দ্বারা, তোমা কর্তৃক, তোমাকে দিয়া-দিয়ে, তোমায় দিয়ে, তোমা হইতে-হতে	তোমাদিগের দ্বারা, তোমাদের দ্বারা, তোমাদিগ কর্তৃক, তোমাদের দিয়া-দিয়ে, তোমাদের হইতে-হতে
চতুর্থী—তোমাকে (তোমারে), তোমায়	তোমাদিগকে, তোমাদিগে, তোমাদের, তোমাদেরকে
পঞ্চমী—তোমা হইতে-হতে, তোমার নিকট হইতে, তোমা থেকে	তোমাদিগের, তোমাদের হইতে হতে-থেকে
ষষ্ঠী—তোমার (তব)	তোমাদের, তোমাদিগের
সপ্তমী—তোমাতে, তোমার মধ্যে-মাঝে	তোমাদিগেতে, তোমাদিগের মধ্যে-মাঝে

সর্বনাম 'তুই' শব্দ (অনাদরে)

প্রথমা—তুই	তোরা
দ্বিতীয়া—তোকে, তোরে	তোদিগে
তৃতীয়া—তোর (তো) দ্বারা	তোদের দ্বারা
চতুর্থী—তোকে, তোঁরে	তোদিগে
পঞ্চমী—তোর হইতে	তোদের হইতে
ষষ্ঠী—তোর	তোদের
সপ্তমী—{ তোঁতে / তোর মধ্যে	তোদের মধ্যে

আপনি (সম্মানার্থে)

প্রথমা—আপনি	আপনারা
দ্বিতীয়া—আপনাকে	আপনাদিগকে

	একবচন	বহুবচন
তৃতীয়া—	আপনার দ্বারা আপনা দ্বারা	আপনাদিগের দ্বারা আপনাদের দ্বারা
চতুর্থী—	আপনাকে	আপনাদিগকে
পঞ্চমী—	আপনা হইতে	আপনাদিগের হইতে
ষষ্ঠী—	আপনার (আপনাকার)	আপনাদিগের (আপনাদের)
সপ্তমী—	আপনাতে, আপনায়, আপনার মধ্যে	আপনাদিগের মধ্যে

নিজ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা—	নিজ	নিজেরা, নিজে-নিজে
দ্বিতীয়া—	নিজেকে, নিজেরে, নিজকে	নিজদিগকে, নিজেদের, নিজেদেরকে
তৃতীয়া—	নিজের দ্বারা, নিজেকে দিয়া, নিজ দ্বারা	নিজেদের দিয়া, নিজদিগদ্বারা, নিজদিগকে দিয়া, নিজেদের দ্বারা
চতুর্থী—	নিজেকে, নিজেরে, নিজকে	নিজদিগকে
পঞ্চমী—	নিজ হইতে, নিজের থেকে	নিজদিগ হইতে, নিজেদের থেকে
ষষ্ঠী—	নিজ, নিজের	নিজ-নিজ, নিজের-নিজের, নিজদিগের
সপ্তমী—	নিজতে, নিজেতে, নিজের মধ্যে বা মাঝে	নিজদিগতে, নিজেদের মধ্যে বা মাঝে, নিজেদেরতে

দ্রঃ—'স্বয়ম্' এই অব্যয়ের ব্যবহার কেবল কর্তাকারকেই হয়।

প্রথম পুরুষ (Third Person)

সে

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা—	সে	তাহারা, তারা
দ্বিতীয়া—	তাকে	তাহাদিগকে
সম্প্রদান—	তাহাকে	……প্রভৃতি

তিনি

একবচন	বহুবচন
প্রথমা—তিনি	তাঁহারা
দ্বিতীয়া—তাঁহাকে	তাঁহাদিগকে……ইত্যাদি।

তাহা, তা

প্রথমা—তাহা, তাই, সেটা, সেটি, সেখানা, সেখানি	সে-সব, সে-গুলা সে-গুলি, সে-সকল…… প্রভৃতি।

নির্ণয়সূচক সর্বনাম (Demonstrative Pronouns) :

কোন ব্যক্তি অথবা বস্তুকে নির্দেশ করে—এই অর্থে নির্ণয়সূচক সর্বনাম।

অন্তিক-নির্ণয়বাচক (Near or Proximate Pronouns) :

এ, এই

প্রথমা—এ, এই	ইহারা, এরা
দ্বিতীয়া / **সম্প্রদান** } ইহাকে, একে	এদিগকে, ইহাদিগকে
……ইত্যাদি	

নিকটবর্তী কোনো ব্যক্তির পরিবর্তে বসে, এ কারণে উহার নাম অন্তিক নির্ণয়সূচক সর্বনাম।

ইনি

প্রথমা—ইনি	ইঁহারা, এঁরা, এনারা
দ্বিতীয়া / **সম্প্রদান** } ইঁহাকে, এঁকে,	ইঁহাদিগকে, এঁদিগকে
……ইত্যাদি	

(প্রত্যক্ষব্যঞ্জক) **ইহা** (এ) ; **ইঁহা** (এঁ)—সম্ভ্রম অর্থে

প্রথমা	(ব্যক্তিবাচক) এ, এই, ইনি	ইহারা, এরা, ইঁহারা, এঁরা
	(বস্তুবাচক) ইহা, এটা	এসব, এগুলি
দ্বিতীয়া / **চতুর্থী**	(ব্যক্তিবাচক) ইহাকে, একে,	ইহাদিগকে, এদিকে
	ইঁহাকে, এঁকে	ইঁহাদিগকে, এঁদিকে
	(বস্তুবাচক) এটাকে	ইহাদিগকে, এদিকে
তৃতীয়া	ইহা (-র) দ্বারা	ইহাদিগের দ্বারা, ইহাদের দ্বারা
	ইঁহা (-র) দ্বারা	ইঁহাদিগের দ্বারা, ইঁহাদের দ্বারা
	এর দ্বারা, এঁর দ্বারা	এদের দ্বারা, এঁদের দ্বারা

	একবচন	বহুবচন
পঞ্চমী—	ইহা হইতে, ইঁহার হইতে, এ হতে, এঁর হতে	ইহাদের হইতে, ইঁহাদের হইতে, এদের হতে, এঁদের হতে
ষষ্ঠী—	ইহার, এর, ইঁহার, এঁর	ইহাদের, এদের, ইঁহাদের, এঁদের
সপ্তমী—	ইহার মধ্যে, ইহাতে, এতে	ইহাদের মধ্যে, এদের মধ্যে
	ইঁহার মধ্যে, ইঁহাতে, এঁতে	ইঁহাদের মধ্যে, এঁদের মধ্যে

পরোক্ষবাচক **উহা** (**ও**), সম্ভ্রমসূচক **উঁহা, ওঁ, উনি**

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা (ব্যক্তিবাচক)	ও, ওই, উহা, উনি	উহারা, ওরা, উঁহারা,
(বস্তু)	উহা, ওটা	এগুলি, ওসব
দ্বিতীয়া / চতুর্থী	উহাকে, ওকে, উঁহাকে, ওঁকে, উহা, ওটা	উহাদিগকে, উঁহাদিগকে, ওদিগে, ওঁদিগে
করণ :	উহা, উহার, উঁহার, ওর, ওঁর } দ্বারা	উহাদের, ওদের, উঁহাদের, ওঁদের } দ্বারা
অপাদান :	উহা হইতে, উঁহা "	উহাদের হইতে, থেকে
সম্বন্ধ :	উহার ওর, উঁহার, ওঁর	উঁহাদের, ওঁদের
অধিককরণ :	উহার মধ্যে, ওর ", উঁহার ", ওঁর ", উহাতে, ওতে, উঁহাতে, ওঁতে	উহাদের মধ্যে, ওদের ", উঁহাদের ", ওঁদের "

সম্বন্ধসূচক সর্বনাম

যাহা (যা), যে এবং সম্ভ্রমার্থে যাঁহা (যাঁ), যিনি

	একবচন	বহুবচন
কর্তা :	যে, যেই, যাঁহা, যিনি, যেটা	যাহারা, যাঁহারা, যাঁরা, যারা, যেগুলি

	একবচন	বহুবচন
কর্ম ও সম্প্রদান	যাহা, যাঁকে	যাহাদিগকে, যাঁহাদিগবে
	য়েটাকে	যাদিকে, যাঁদিকে
করণ :	যাহার দ্বারা	যাহাদিগের দ্বারা
	যার "	যাদের "
	যাঁহার "	যাঁহাদিগের "
	যাঁর "	যাঁদের "
অপাদান :	যাহা হইতে	যাহাদের হইতে
	যাঁহা হইতে	যাঁহাদের হইতে
	যা হতে	যাদের হতে
অধিকরণ—	যাহার মধ্যে	যাহাদের মধ্যে
	যার "	যাদের "
	যাঁহার "	যাঁহাদের "
	যাঁর "	যাঁদের "
	যাহাতে, যাভে	

কাহা (কা), কে এবং সম্ভ্রমার্থে **কাঁহা (কাঁ)**

	একবচন	বহুবচন
কর্তা :	(ব্যক্তি) কে, কেহ, কেউ, কোন	কাঁহারা, কাঁরা
	(বস্তু) কি, কিছু, কোন্, কোন্টা	কোন্গুলি
কর্ম ও সম্প্রদান :	কাহাকে, কাঁহাকে কাকে, কাঁকে	কাহাদিগকে, কাঁহাদিগকে, কাদেরকে, কাঁদেরকে
করণ	কাহার দ্বারা	কাহাদের দ্বারা
	কাহা "	কাদের "
	কাঁহার "	কাঁহাদের "
	কাঁহা "	কাঁদের "
	কার "	
	কাঁর "	

	একবচন	বহুবচন
অপাদান	কাহার হইতে	কাহাদের হইতে
	কাহা হইতে	কাদের হইতে
	কাঁহার হইতে	কাঁহাদের হইতে
	কাঁহা হইতে	কাঁদের হইতে
	কার হতে	
	কাঁর হতে	
সম্বন্ধ	কাহার, কার	কাহাদের, কাদের
	কাঁহার, কাঁর	কাঁহাদের, কাঁদের
অধিকরণ	কাহার মধ্যে	কাহাদের মধ্যে
	কার মধ্যে	কাদের মধ্যে
	কাঁহার মধ্যে	কাঁহাদের মধ্যে
	কাঁর মধ্যে	কাঁদের মধ্যে

সমষ্টিবাচক সর্বনাম (সব, সকল)
নিত্যবহুবচন

কর্তা—সব, সবাই, সবগুলি, সকল, সকলে।

কর্ম ও সম্প্রদান—সবকে, সবাইকে, সবাকে (পদ্যে), সবগুলিকে, সকলকে, সকলগুলিকে।

করণ—সবার দ্বারা, সবাইকে দিয়া, সকলের দ্বারা, সকলকে দিয়া।

অপাদান—সব হইতে, সবার চেয়ে, সকল হইতে, সকলের থেকে, সব থেকে, সবচেয়ে।

সম্বন্ধ—সবার, সবাকার, সবাইকার, সকলের, সকলকার।

অধিকরণ—সবার মধ্যে, সকলের মধ্যে, সবাতে, সবেতে, সকলে।

কারক সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য আরো কয়েকটি কথা ঃ

১। ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় আছে তাহাকে বলে কারক। যদি বলি—
'রাজা তীর্থক্ষেত্রে ভাণ্ডার হইতে স্বহস্তে দরিদ্রদিগকে ধন দিতেছেন।'
এই বাক্যে ক্রিয়াপদ—'দিতেছেন'। এটিকে অবলম্বন করিয়া নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানিতে পারা যাইবে বাক্যে কোন্ কোন্ পদের সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ বিদ্যমান ঃ

কে দিতেছেন ?—রাজা (কর্তৃকারক)

কী দিতেছেন ?—ধন (কর্মকারক)

কিসের দ্বারা ?—স্বহস্তে (করণ কারক)

কাহাকে ?—দরিদ্রদিগকে (সম্প্রদান কারক)

কোথা হইতে ?—ভাণ্ডার হইতে (অপাদান কারক)

কোথায় ?—তীর্থক্ষেত্রে (অধিকরণ কারক)

অতএব দেখা যাইতেছে, উপরের উত্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত রাজা, ধন, স্বহস্তে, দরিদ্রদিগকে, ভাণ্ডার, ও তীর্থক্ষেত্রে—এগুলি কারক, যেহেতু 'দিতেছেন' এই ক্রিয়ার সহিত উহাদের অন্বয় হইয়াছে।

তবে এগুলি সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত অন্বিত বলিয়া কারকসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে দেখা যাইতেছে। কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত অন্বিত পদগুলিও কারক হইয়া থাকে।

যথা, তাহাকে দেখিয়া আমি বলিলাম। এখানে 'তাহাকে'—কর্মকারক, উহা 'দেখিয়া' এই অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম হইয়াছে।

প্রয়োগ—(১) স্বহস্তে গড়িলা তুমি, ভুষিতে পৌরবে। —মধুসূদন দত্ত।

(২) ভ্রমে নিত্য অবিরত দ্বারা নিখিয়া। —হেমচন্দ্র।

২। ক্রিয়াশূন্য বাক্যেও কারকত্ব স্বীকার করা হয়। যেমন,—

'গতি তার সিন্ধুঅভিমুখে' —হেমচন্দ্র।

এখানে 'হয়' ক্রিয়া উহ্য।

৩। সম্বন্ধে বিহিত ষষ্ঠীর কারকত্ব নাই, কারণ উহার ক্রিয়ার সহিত অন্বয় নাই।

আমরা তাহা হইলে দেখিলাম যে, কারক ছয়টি—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

এইবার কর্তৃকারক সম্বন্ধে কতকগুলি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় লইয়া আলোচনা করিব।

কর্তৃকারক

কর্তৃবাচ্যের কর্তাকে বলে উক্তকর্তা। কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। এই বিভক্তির চিহ্ন প্রায় দেখা যায় না। অনেকস্থলে কর্তৃকারকে অ, এ, তে, য় এই বিভক্তির চিহ্ন থাকে। যেমন, বালক চাঁদ দেখিতেছে। লোকে বলে। গরুতে ঘাস খায়। ঘোড়ায় গাড়ী টানে।

প্রয়োগ—(১) পুণ্যবান্ লোক পান লক্ষ্মীরূপা নারী।

(২) লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন।

(৩) বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে ?

(৪) ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না বলে।

৪। বিভিন্ন অর্থে কর্তায় 'এ' বিভক্তি হয়।

(ক) বহুত্বসূচক 'এ'—দশে মিলি করি কাজ।

(খ) ব্যতিহারসূচক 'এ'—যমে-মানুষে টানাটানি।

৫। উপরি-কথিক স্থলগুলি ছাড়া নিম্নলিখিত স্থলে কর্তায় বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় :

(ক) কর্তায় ২য়া

প্রয়োগ—তাহার পর ঋষিকে ওকালতি পরীক্ষা দিতে হইবে।

(খ) কর্তায় ৩য়া—[কর্মবাচ্যের কর্তা,—অনুক্তকর্তা]

প্রয়োগ—পরিশ্রমে অক্ষম অনেক আত্মীয়স্বজন হৃদয়বান গৃহস্থ কর্তৃক প্রতিপালিত হয়।

(গ) কর্তায় ৬ষ্ঠী

প্রয়োগ—লক্ষ্মণের সংজ্ঞালাভ হইলে, তিনি জানকীর চৈতন্যসম্পাদন করিলেন।

(ঘ) ভাববাচ্যের কর্তা—অনুক্তকর্তা

তাহাকে যাইতে হইবে।

আমার এখন যাইতে হয়।

(ঙ) কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা—চায়ের জল ফুটছে।

(চ) অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা—

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

সে কাশী গিয়া শাস্ত্র পাঠ করিবে।

(ছ) প্রযোজ্য ও প্রযোজক কর্তা—

যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাহাকে বলে প্রযোজ্য, আর, যে কার্য সম্পন্ন করাইয়া লয় তাহাকে বলে প্রযোজক। প্রযোজকে প্রথমা এবং প্রযোজ্যে দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া বিভক্তি হয়। উদাহরণ—চাকরকে দিয়া বাজার করাইয়াছি।

যথা—রাম চাঁদ দেখিতেছে।

মাতা রামকে চাঁদ দেখাইতেছেন।

(জ) কখনো কখনো প্রযোজ্যের সহিত 'দিয়া' যোগ করা হয়—

আমি তাহাকে দিয়া এই কাজটি করাইয়া লইব।

(ঝ) নিরপেক্ষ কর্তা—(Nominative Absolute)

সূর্য উঠিলে পদ্ম বিকশিত হইবে।

এখানে বিচার করিলে দেখা যায়, সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা বিভিন্ন, এরূপ অবস্থায় সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তাকে নিরপেক্ষ কর্তা বলে।

(ঞ) সমধাতুজ কর্তা (ধাত্বর্থক বা ক্রিয়াসম কর্তা)

ক্রিয়াপদ যে-ধাতু হইতে সৃষ্ট, উহার কর্তাটিও যদি সেই ধাতু হইতে সাধিত হয় তবে সেই কর্তাকে বলে সমধাতুজ কর্তা। উদাহরণ—যথা—রাঁধুনী রাঁধিতেছে।

(ট) বাক্যাংশ কর্তা—সমাপিকা ক্রিয়াশূন্য কোনো বাক্যাংশ বিশেষ্যের মতো কোনো বাক্যের কর্তা হইতে পারে। যথা—পরের অপকার করাই এ সকল দুষ্ট লোকের পেশা।

(৩) আমায় **নিজহাতে** গড়া বিপদের মাঝে বুকে করে নিয়ে রয়েছে।

—রজনীকান্ত সেন

২। করণকারকের ব্যবহার দেখা যায় সাধন, উপায়, উপলক্ষণ, হেতু ও কাল অর্থে।

সাধন—**আলোয়** যাবে আঁধার কেটে।

উপায়—**পরিশ্রমে** সদা কর অর্থ উপার্জন।

উপলক্ষণ—দুঃখের **বেশে** এসেছ বলে
তোমায় নাহি ডরিব হে।

৩। খেলিবার উপকরণও করণ কারক হয়, এবং উহাতে প্রায়ই দ্বিতীয়া বিভক্তি হইলে উহাতে কোনো চিহ্ন থাকে না। যথা—বালকেরা মাঠে **ফুটবল** খেলিতেছে।

৪। করণে কখনো কখনো **পঞ্চমী** বিভক্তি হয়। যথা—**টাকা হ'তে** অনেক কাজই হয়।

৫। করণে **ষষ্ঠী**—**জলের** দাগ সহজেই মুছে যায়। ফুলের **ঘায়ে** কন্যা মূর্ছা যান।

সম্প্রদান কারক

১। স্বত্ব ত্যাগ করিয়া যাহাকে কিছু দান করা যায় তাহাই সম্প্রদান কারণ। সম্প্রদান কারকে সাধারণত চতুর্থী বিভক্তি হয়।

যথা—রাজা **পুত্রকে** রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনে গেলেন।

তবে যেখানে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া না দেওয়া হয়—অর্থাৎ ভয়ে, বলে অথবা দেয় বস্তু বলিয়া যেখানে দেওয়া হয় বুঝায় সেখানে সম্প্রদান কারক হয় না। যথা—

রজককে বস্ত্র দিতেছে।
ডাকাতকে সর্বস্ব দান করিল।
গুরু **শিষ্যকে** উপদেশ দিতেছেন।

এস্থলে 'রজককে', 'ডাকাতকে' ও 'শিষ্যকে'—সম্প্রদান কারক নহে। এগুলিকে কর্মকারক বলিতে হইবে।

২। সম্প্রদান কারকে অনেক স্থলে সপ্তমী বিভক্তি হয়।

যথা—(১) **অন্ধজনে** দেহ আলো।
(২) না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন **বরে**।

৩। সম্প্রদানে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।

যথা—**দেবতার** (দেবতাকে প্রদত্ত) ধন কে যায়
ফিরায়ে লয়ে এই বেলা শোন্। —রবীন্দ্রনাথ

অপাদান কারক

১। যাহা হইতে অপায় বা বিচ্ছেদ বুঝায় তাহাকে অপাদানকারক বলে। আর, যাহা হইতে ভয়, উৎপত্তি, বিরতি প্রভৃতি বুঝায় তাহারও অপাদান-সংজ্ঞা হয়। অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

যথা—**বৃক্ষ** হইতে পত্র পড়িতেছে।
বাঘ থেকে ভয় পাচ্ছে।
বীজ হইতে অঙ্কুর হয়।

২। অপাদানকারক অনেক সময়ে আধার বা স্থান, অবস্থা, কাল, দূরত্ব কিংবা তারতম্য বুঝায়। যথা—

আধার—রাজা মুনিকে দেখিয়া **সিংহাসন** হইতে উঠিয়া পড়িলেন।
স্থান—**কলিকাতা** হইতে শ্রীরামপুর খুব বেশী দূর নয়।
অবস্থা—নকুল **গাছ** থেকে (গাছে চড়া অবস্থায়) জল খুঁজতে লাগলেন।
দূরত্ব—**কাশী** থেকে হিমালয় বহুদূরে অবস্থিত।
তারতম্য—**রাম** অপেক্ষা শ্যাম অনেক ছোট।

অধিকরণ কারক

১। ক্রিয়ার আধারকে বলে অধিকরণ কারক। অর্থাৎ কর্তা যে-আধারে অবস্থান করিয়া ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে অথবা কর্মকে যাহা ধারণ করে এরূপ আধারভূত বস্তুকে অধিকরণ কারক বলে।

এই অধিকরণ কারক মোটামুটি তিনপ্রকার—

(ক) স্থানাধিকরণ, (খ) কালাধিকরণ ও (গ) ভাবাধিকরণ

স্থানাধিকরণ—স্থান যেখানে আধার হয় তাহাকে বলে স্থানাধিকরণ। যথা—**জলে** মাছ থাকে।

কালাধিকরণ—যে কালে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাকে বলে কালাধিকরণ। যথা—'আজি কি তোমার মধুর মুরতি হেরিনু শারদ **প্রভাতে**'।

ভাবাধিকরণ—একটি ক্রিয়ার কাল দ্বারা অন্য ক্রিয়ার কাল নিরূপিত হইলে, যে-ক্রিয়ার কাল দ্বারা এইরূপ হয় তাহাকে ভাবাধিকরণ বলে। যথা—**সূর্যোদয়ে** পদ্ম বিকশিত হয়।

এখানে সূর্যের উদয়-ক্রিয়ার কাল, বিকাশ-ক্রিয়ার কালকে সূচিত করিতেছে, এজন্য প্রথমটিতে সপ্তমী বিভক্তি হইল। ইহাই সংস্কৃত ভাবে ৭মী (Nominative Absolute)।

আধার চারিভাগে বিভক্ত—সামীপ্য, ঐকদেশিক, অভিব্যাপক ও বৈষয়িক।

সম্বন্ধ পদ

১। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সম্বন্ধ পদের অন্য পদের (বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের) সহিত সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু ক্রিয়ার সহিত উহার অন্বয় না থাকায় উহা কারক নহে। বিভিন্ন অর্থে সম্বন্ধ পদের ব্যবহার দেখা যায়। যথা—

(ক) **কর্তৃসম্বন্ধ**—সিংহের ডাক। নদীর প্রবাহ।

(খ) **কর্মসম্বন্ধ**—বইএর পড়া। চাঁদের দেখা।

(গ) **করণ-সম্বন্ধ**—হাতের লেখা। কলমের খোঁচা।

(ঘ **সম্প্রদান সম্বন্ধ**—ব্রাহ্মণের দান। গরীবের ধন।

(ঙ) **অপাদান সম্বন্ধ**—বাঘের ভয়। চোখের জল।

(চ) **অধিকরণ সম্বন্ধ**—বনের পশু। জলের মাছ।

(ছ) **জন্য-জনকত্ব সম্বন্ধ**—রাজার ছেলে। গরুর বাচ্চা।

(জ) **স্ব স্বামিত্ব সম্বন্ধ**—রামের বাড়ী। তোমার ঘর।

(ঝ) **আধারাধেয় সম্বন্ধ**—ঘটির জল। থালার ভাত।

(ঞ) **সংযোগ সম্বন্ধ**—ছাতার বাঁট। কাপড়ের পাড়।

(ট) **বিশেষণ সম্বন্ধ**—সোনার সংসার। গুণের ভাই।

(ট) **রূপক সম্বন্ধ**—শোকের সমুদ্র। জ্ঞানের আলো।

(ড) **প্রকৃতি-বিকৃতি সম্বন্ধ**—সোনার আঙটি।

(ঢ) **অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ**—জ্ঞানীর মাথা। মন্দিরের চূড়া।

(ণ) **নিমিত্ত সম্বন্ধ**—টাকার শোক। রান্নার হাঁড়ি।

২। সম্বন্ধ পদে 'র', 'এর' যেমন যুক্ত হয়, তেমনি, উহার উত্তর কার (কের, কেকার) বিভক্তির কাজ করে। যথা—আজিকার>আজকের। এইরূপ, কালিকার >কালকার>কালকের, আগেকার, সবাকার, সকলকার, দোঁহাকার, আপনকার, মাঝখানকার, বাহিরেকার, কালকেকার প্রভৃতি।

৩। যদি একই পদের একাধিক পদের সহিত মিলিত সম্বন্ধ থাকে তবে শেষ পদের শেষেই ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন—অনিল ও বিধুর ভাই আমাদের পরম বন্ধু। আবার, যখন বলি, 'অনিলের ও বিধুর ভাই আমাদের পরম বন্ধু'—এখানে উভয় পদের পৃথক পৃথক সম্বন্ধ বুঝাইতে প্রতি পদেই ষষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে।

সম্বোধন পদ

১। যাহাকে আহ্বান করা যায় তাহাকে বলে সম্বোধন পদ। সংস্কৃতে সম্বোধনে যেমন শব্দের রূপান্তর হয়, খাঁটি বাঙ্‌লা শব্দের সেইরূপ হয় না। তবে যে-সকল 'তৎসম' শব্দ বাঙ্‌লায় ব্যবহৃত হয় উহারা সংস্কৃত শব্দের মতোই পরিবর্তনসহ। বাঙলায় ওহে, ওরে, হ্যাঁগো, লো প্রভৃতি সম্বোধনসূচক অব্যয়।

তৎসম শব্দের সম্বোধনের দৃষ্টান্ত ; যথা—

প্রয়োগ ঃ (ক) হে **রাম**, বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন। —কৃত্তিবাস
(খ) হে **বাল্মীকি**, জ্ঞানবান্। ঐ
(গ) শুন শুন, ওহে **মিশ্র**, পরম বান্ধব। —বৃন্দাবন
(ঘ) রে প্রমত্ত **মন** মম, কবে পোহাইবে রাতি ? —মাইকেল
(ঙ) হে **মাতঃ** বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে। —রবীন্দ্রনাথ

২। কখনো কখনো সম্বোধনসূচক অব্যয় মাত্রের প্রয়োগ হয়। যথা—**ওগো**, শুনছ ?

৩। খাঁটি বাঙ্লায় সম্বোধন পদের কোনো পরিবর্তন হয় না। যথা—ওহে **বন্ধু** ! হে **মুনি** !

৪। সম্বোধনের বহুবচনে 'রা' কিংবা গুলা (গুলো), গণ, সমূহ প্রভৃতি প্রযুক্ত হয়। যথা—ওগো **মায়েরা** ! ওহে **ছেলেগুলো** ! হে **বন্ধুগণ** !

বিভক্তি ও অনুসর্গ

বিভক্তি একটি বর্ণ অথবা বর্ণসমষ্টি। উহা শব্দের সহিত অব্যবধানে যুক্ত হইয়া তাহার কারকাদি ও অন্য অর্থ পরিস্ফুট করে। অনুসর্গ প্রকৃতপক্ষে একজাতীয় অব্যয়। উহারা শব্দের পরে বসিয়া কারকাদি এবং অন্য অর্থ স্পষ্ট করে। বিভক্তিগুলির স্বাধীন অস্তিত্ব ও প্রয়োগ নাই, কিন্তু অনুসর্গগুলি ভিন্ন অর্থে স্বাধীনভাবে প্রযুক্ত হয়। যথা—'এ' (বিভক্তি) ; চেয়ে (অনুসর্গ)।

অতএব অনুসর্গের সংজ্ঞা ; যথা—

কতকগুলি পদ বিভক্তি নহে অথচ বিশেষ্য পদের পরে বসিয়া বিভক্তির ন্যায় কাজ করে বলিয়া উহাদিগকে অনুসর্গ বলে।

যথা—তোমার **জন্য** আমি এত কষ্ট করিলাম।
সুখের **লাগিয়া** এ ঘর বাঁধিনু।

এইপ্রকার অনুসর্গকে কর্মপ্রবচনীয় কিংবা কারক অনুসর্গ বলা হয়। **নিম্নে কারক-বিভক্তির পরিবর্তে অনুসর্গের ব্যবহার দেখান হইল ঃ**

করণে—দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক। যেমন—**নাক দিয়া** ঘ্রাণ লও। **গঙ্গাজল দ্বারা** দেবতার পূজা কর। **কালিদাস কর্তৃক** শকুন্তলা কাব্য বিরচিত হইয়াছিল।

সম্প্রদানে—জন্য, তরে, হেতু, কারণ, লাগিয়া। যেমন—**পুত্রের জন্য** এই বইখানি কিনিলাম। 'সকলে আমরা **পরের তরে**'।

অপাদানে—হইতে, থেকে, নিকট হইতে, কাছ থেকে, নিকট থেকে। যেমন—**গাছ হইতে** পাতা পড়িল। **বন্ধুর কাছ থেকে** কোনো খবর পাই নাই।

অধিকরণে—কাছে, মধ্যে, নিকটে। যেমন—পিতার কাছে লোক পাঠাইলাম। বনের মধ্যে বাঘ বাস করে।

আবার, এমন কতকগুলি অনুসর্গ বাঙ্‌লা সাধুভাষায় এবং চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় যেগুলির যোগে প্রথমাদি বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন—

(ক) নামে, ইতি, ভিন্ন, ছাড়া, ব্যতীত, বিনা, বলিয়া প্রভৃতি অব্যয়ের যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়।

দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

হরি ছাড়া এ বিপদে কে মোর সহায়?

রাম ব্যতীত কেহ এই কাজ করিতে পারে না।

দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?

তোমার ভাই বলিয়া আমি কিছু বলিলাম না।

(খ) ধিক্‌, ধন্যবাদ প্রভৃতির যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—পাপীকে ধিক্‌। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

(গ) পৃথক্‌, ভিন্ন প্রভৃতির যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—রাম হইতে শ্যাম পৃথক। শ্যাম হইতে যদু ভিন্ন।

(ঘ) প্রতি, পর, সমীপে, অধীন, সঙ্গে, অপেক্ষা, চেয়ে, পক্ষে, উপরে, উপর, নিমিত্ত, নীচে, পানে, বাহির, বিহনে, মতো, কারণ, মাঝে প্রভৃতির যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—

দরিদ্রের প্রতি দয়া করা উচিত।

সন্ধ্যার পর সে এখানে আসিল।

বৃক্ষের সমীপে একটি কুটীর আছে।

তোমার সঙ্গে আমি যাইব না।

সুজনের সহিত সদা আলাপ করিবে।

স্বর্ণ অপেক্ষা রৌপ্যের মূল্য অল্প।

রামের চেয়ে শ্যাম বুদ্ধিমান।

আমার পক্ষে তোমার এ ঔদ্ধত্য সহ্য করা সম্ভব নহে।

পর্বতের উপরে (উপর) একটি বড় গাছ দেখা যাইতেছে।

অধ্যয়নের নিমিত্ত আমি কাশী যাইব।

আলোর নীচে অন্ধকার।

আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

তখন শ্যাম ঘরের বাহিরে গেল।

তোমার বিহনে সবই অন্ধকার।

তাহার মতো দাতা আর নাই।

এখানে আসিলে তুমি কিসের কারণ।
'বুকের মাঝে কয় সে কথা' —রবীন্দ্রনাথ

কতকগুলি বিশিষ্ট প্রয়োগ

(ক) সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল। —চণ্ডীদাস
(খ) শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি। ঐ
(গ) তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার॥ —কৃত্তিবাস
(ঘ) ভরতের প্রতি রাম, কি অনুজ্ঞা হয়? ঐ
(ঙ) প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি। ঐ
(চ) এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার। ঐ
(ছ) কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার। —বৃন্দাবন দাস
(জ) আশ্রমে কি হেতু গতি, কিবা অভিলাষ।

চতুর্থ অধ্যায়

[ক] ক্রিয়াপদ

পূর্বে বলা হইলেও পুনরায় বলিতেছি, বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ কহে। পদ দুই প্রকার—নামপদ ও ক্রিয়াপদ।

প্রতিটি শব্দকে বিশ্লেষ করিলে সাধারণত দুইটি অংশ পাওয়া যায়—প্রকৃতি ও প্রত্যয়। মৌলিক ভাবপ্রকাশক অংশটিকে প্রকৃতি কহে এবং প্রকৃতির অর্থসংপ্রসারণার্থ তাহার সঙ্গে যাহা যোজিত হয় তাহাকে প্রত্যয় কহে। যেমন, বিদ্যাবত্তা = বিদ্যাবৎ + তা; এখানে 'বিদ্যাবৎ' (বিদ্যাবান্) প্রকৃতি, এবং 'তা' প্রত্যয়। এই প্রকৃতিকে আবার বিশ্লেষ করা যায়। বিদ্যাবৎ (বিদ্যাবান্) = বিদ্যা + মতুপ্। এই 'বিদ্যা' প্রকৃতিটিকেও আবার বিশ্লেষ করা যায়। বিদ্যা = বিদ্ + ক্যাপ্। এই 'বিদ্' প্রকৃতিটিকে আর বিশ্লেষ করা যায় না, তাই ইহাকে বলে মূল প্রকৃতি।

তৎসম শব্দে মূল প্রকৃতি বলিতে ধাতুকেই বুঝায়। কিন্তু বাঙলা শব্দে মূল প্রকৃতি ধাতু না হইয়া নাম বা প্রাতিপদিকও হইতে পারে। যেমন—মাতা, পিতা এই শব্দ-দুইটির মূলে মা ও পা এই দুইটি মূল প্রকৃতি আছে। কিন্তু বাঙলায় মা, বাবা এই দুইটির মূলে কোনো প্রকৃতি নাই, ইহারাই মূলপ্রকৃতি, কারণ, উহাদের আর বিশ্লেষণ সম্ভবপর নহে।

মূল প্রকৃতি দুই প্রকার—নাম (প্রাতিপদিক) ও ধাতু। নাম বা ধাতু, বিভক্তিযুক্ত করিয়া ভাষায় ইহাদের প্রয়োগ করিতে হয়। এই বিভক্তি আবার কখনো কখনো লুপ্ত হয়—কিন্তু সেখানেও বিভক্তি যোগ করা হইয়াছে বলিয়াই ধরিতে হইবে।

যেমন, রাম যায়। 'মালী বলি ফুকারিয়া' (রবীন্দ্রনাথ)। বাড়ী যায়। এই বাক্যগুলিতে রাম প্রথমাবিভক্তিযুক্ত, মালী দ্বিতীয়াবিভক্তিযুক্ত এবং বাড়ী সপ্তমী-বিভক্তিযুক্ত। তবে এই বিভক্তিগুলি লুপ্ত হইয়াছে, এইমাত্র।

[বি দ্র :—আধুনিক বৈয়াকরণগণ পদের অন্তে বিভক্তি চিহ্ন না থাকিলে, ঐরূপ পদকে শূন্য বিভক্তিযুক্ত পদ ও 'রা', 'কে', 'দিয়া', 'দ্বারা', 'কর্তৃক', হইতে, থেকে, তে, এ, য় প্রভৃতি বিভক্তিকে প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী না বলিয়া বলেন, "কর্তার রা বিভক্তি, কর্মে কে বিভক্তি, করণে দিয়া বিভক্তি" ইত্যাদি। ছাত্রগণও এইরূপ বলিবে।]

কাজ কর—এইস্থলে 'কর' এই অংশটিও বিভক্তিযুক্ত (অনুজ্ঞা মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থে), তবে এখানেও শূন্য বিভক্তি যোগ হইয়াছে অর্থাৎ বিভক্তি লুপ্ত হইয়াছে। ফলত, এখানে রাম, মালী, বাড়ী, নাম নহে, নামপদই বটে। 'কর্' এইটি ধাতু নহে, ক্রিয়াপদই বটে।

ধাতুপ্রকৃতি বা ধাতু চারিপ্রকার : (ক) মৌলিক বা সিদ্ধধাতু, (খ) সাধিত ধাতু, (গ) সংযোগমূলক ধাতু, (ঘ) যৌগিক ধাতু।

(ক) **মৌলিক ধাতু :**

কর্, দেখ্, উঠ্, জান্, ইত্যাদি।

ধাতু বিভিন্ন বিভক্তি বা প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকে। তাই, তাহার স্বরূপ বাহির করিয়া লইতে হয়। উত্তমপুরুষের বর্তমান কালে ধাতুর যে রূপ হয়, তাহা হইতে 'ই' অংশটুকু বাদ দিলে মূলধাতুটি পাওয়া যাইবে। যেমন—লিখি (লিখ্), বুঝি (বুঝ্), বিলাই (বিলা), জন্মি বা জন্মাই (জন্ম বা জন্মা, একার্থক), বেড়া, কিলা ইত্যাদি।

(খ) **সাধিত ধাতু :**

যে-ধাতুকে বিশ্লেষ করিলে আর-একটি ধাতু এবং এক, বা একাধিক প্রত্যয় পাওয়া যায়, সেই ধাতুকে সাধিত ধাতু কহে। সাধিত ধাতু বিবিধপ্রকার।

(১) প্রযোজক বা নিজন্ত ধাতু : বুঝ্ হইতে—বুঝা, শুন্ হইতে—শুনা, মর্ হইতে—মার্, চল্ হইতে—চালা, ইত্যাদি।

(২) কর্মবাচ্যের ধাতু বা কর্মকর্তৃবাচ্যের ধাতু : শুনা (শোনা)—বাজনাটা শোনায় বেশ। বিকা—বিনামূল্যে বিকাইব।

(৩) নামধাতু : জুতা—জুতাইয়া লম্বা করা। বেতা, ধমকা, হাতড়া, ছোবলা, খোঁড়া, ইত্যাদি।

(৪) ধ্বন্যাত্মক ধাতু : কন্‌কনা, টগ্‌বগা, ঝন্‌ঝনা, হাঁচ, ইত্যাদি।

(গ) **সংযোগমূলক ধাতু :**

কর্, হ, পা, দে, প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে বিশেষ্য বিশেষণাদি যোগ করিয়া সংযোগমূলক হয়।

কর্ যোগে : লাভ কর্, বর্জন কর্, নিন্দা কর্, স্নান কর্, রক্ষা কর্, স্থির কর্, জিজ্ঞাসা কর্, ক্রন্দন কর্, হাস্য কর্, পান কর্, যোগ কর্, পাক কর্, ত্যাগ কর্ ইত্যাদি।

হ-যোগে : বড়ো হ, সুখী হ, রাজী হ, শান্ত হ, গত হ, ইত্যাদি।

পা-যোগে (কর্তৃবা) : কষ্ট পা, আনন্দ পা, লজ্জা পা, টের পা, ইত্যাদি।

পা-যোগে (কর্মবা) : ভূতে পা, ক্ষিধে পা, ঘুম পা, তেষ্টা পা, ইত্যাদি।

দে-যোগে : হাত দে, কথা দে, জবাব দে, শাস্তি দে, হাঁচি দে, ধাক্কা দে, ইত্যাদি।

অন্যান্য প্রয়োগে : ভালো বাস্, ভয় খা, পাক খা, গোল্লায় যা, অস্ত যা, খাবি খা, পথে আস্, বিষম খা, উঁকি মার্, লাফ মার্, সাঁতার কাট্, ইত্যাদি।

(ঘ) যৌগিক ধাতু : দুইটি ধাতু মিলিয়া একটি ধাতুর অর্থ প্রকাশ করে। ইহার প্রথম অংশটি অসমাপিকা (ইয়া-প্রত্যয় বা ইতে-প্রত্যয়-যোগে), দ্বিতীয় অংশটি হইল একটি সমাপিকা ক্রিয়া। প্রথম অংশটিরই অর্থগত প্রাধান্য থাকে, কিন্তু প্রথম অংশটি অসমাপিকা ক্রিয়া বলিয়া তাহার যোগে রূপের পরিবর্ত ঘটে না—কেবল দ্বিতীয় অংশটি মৌলিকধাতু বলিয়া তাহার সঙ্গে যথানিয়মে বিভক্তির যোগ হয়। এ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হইল, ক্রিয়াদ্বয়ের মৌলিক অর্থ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ করা।

ইয়া যোগে : করিয়া উঠ্, বুঝিয়া উঠ্, বলিয়া বস্, চাহিয়া বস্, উঠিয়া পড়, খাইয়া ফেল্, সারিয়া ফেল্, গড়িয়া তুল্, বুঝিয়া দেখ্, বসিয়া থাক্, চাহিয়া থাক্ থাকিয়া যা, চলিয়া যা, পড়িয়া যা, হারিয়া যা, দেখিয়া নি, বুঝিয়া নি, বলিয়া যা, লিখিয়া যা, ইত্যাদি।

ইতে-যোগে : বুঝিতে পার্, দেখিতে পা, খাইতে পা, খাইতে চা, শুইতে চা, বলিতে থাক্, ইত্যাদি।

সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া : ক্রিয়া প্রথমত দুই প্রকার—সকমক ও অকমক। যে-ক্রিয়া স্বভাবত কর্ম গ্রহণ করে, তাহাকে সকর্মক ক্রিয়া বলা হয়। যে-ক্রিয়া স্বভাবত কর্ম গ্রহণ করে না, তাহাকে অকর্মক ক্রিয়া বলা হয়। পড়্, দেখ্, খা, জান্, ইত্যাদি সকর্মক ক্রিয়া। হাস্, কাঁদ্, শু, ঘুমা, থাক্, নড়, হ, ইত্যাদি অকর্মক ক্রিয়া।

কর্ম গ্রহণ না করিলে (কর্ম অবিবক্ষিত থাকিলে) সকর্মক ক্রিয়াও অকর্মকের মতো ব্যবহৃত হয়। যেমন— আমি জানি, সে দেখে ইত্যাদি।

সকর্মক ক্রিয়া আবার কখনো দুইটি কর্ম গ্রহণ করে, তাহাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া কহে। ই দুইটি কর্মের মধ্যে একটি মুখ্য, অন্যটি গৌণ। বাঙলায় ব্যক্তিবাচক কর্মটি গৌণ, এবং বস্তুবাচক কর্মটি মুখ্য হইয়া থাকে। যেমন—তাহাকে কটু কথা বলিয়াছি। মাতাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিও। এখানে 'তাহাকে' ও 'মাতাকে' গৌণ কর্ম এবং 'কথা' ও 'ইহা' মুখ্য কর্ম। তাই বলা ও জিজ্ঞাসা-করা এই দুইটি দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

অকর্মক ক্রিয়া কর্ম গ্রহণ করে না বলিয়াছি বটে, কিন্তু অকর্মক ক্রিয়াও একপ্রকার কর্ম গ্রহণ করে, তাহাকে **সমধাতুজ কর্ম** কহে। এইসব ক্ষেত্রে অকর্মক ক্রিয়াজাত ভাববোধক কর্মই ব্যবহৃত হয়। যেমন, কী খেলাই খেলছে। আজ বেজায় মার মেরেছে। শেষ ঘুম ঘুমাচ্ছে। শক্ত চাল চেলেছে। এই কর্মগুলি সাধুভাষায়ও একেবারে বিরল নহে। সকর্মক ক্রিয়ারও সমধাতুজ কর্ম হইতে পারে, যেমন—সে কী খাওয়াই না সেদিন খেল। তরুণ কী পড়াই না পড়েছে।

সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া: ক্রিয়াকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া। যে-ক্রিয়া বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ বুঝাইতে পারে না তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া কহে। যেমন, কাজ **দেখিয়া** কিছুতে **বুঝিতে** পারিলাম না। এখানে 'দেখিয়া' ও 'বুঝিতে' এই দুইটি অসমাপিকা ক্রিয়া, এবং 'পারিলাম' একটি সমাপিকা ক্রিয়া।

অসমাপিকা ক্রিয়ার ভেদ: অসমাপিকা ক্রিয়ার তিনটি ভেদ দেখা যায়। (ক) করিয়া, দেখিয়া, ইত্যাদি ইয়া-প্রত্যয়যোগে। (খ) করিতে, দেখিতে, ইত্যাদি ইতে-প্রত্যয়যোগে। (গ) করিলে, দেখিলে, ইত্যাদি ইলে-প্রত্যয়যোগে।

ক্রিয়ার রূপ: ধাতুকে বিভক্তিযুক্ত করিলেই তাহাকে ক্রিয়া কহে। আমরা 'ধাতুর রূপ' বুঝাইতেই এখানে 'ক্রিয়ার রূপ' বলিতেছি। বাঙ্‌লা ভাষায় ক্রিয়ার রূপভেদের কারণ প্রধানত কাল ও পুরুষ। পুরুষ তিনপ্রকার, পূর্বেই তাহা বর্ণিত হইয়াছে। কাল তিনটি ও তাহার প্রধান ভেদগুলির কথাও একটু পরে উল্লেখিত হইতেছে। ক্রিয়ার কয়েকটি গণ বাঙ্‌লা ভাষায় মানা হয়, তাহার কারণে ক্রিয়াগুলির রূপভেদ হয়। ক্রিয়ার পুরুষ এবং কাল অনুসারে ভেদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। গণ অনুসারে ভেদের দৃষ্টান্তও পরে দেওয়া হইতেছে। তাহাতে আবার সাধু ও চলিত ভাষায় ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য আছে। কোনো কোনো ক্রিয়াও আবার এমন আছে যাহা সাধু বা চলিত ভাষাতেই প্রযুক্ত হয়।

মনে রাখিতে হইবে, বচন অনুসারে বাঙ্‌লাভাষায় ক্রিয়ার রূপে কোনো পার্থক্য হয় না।

করৃ, হ, যা ধাতুর রূপ (নিত্যবৃত্ত বর্তমা

সাধু		চলিত	
করি, হই, যাই	**উত্তম পুরুষ**	সাধুবৎ	
করেন, হয়েন, যায়েন (হন) (যান)	গুরু	করেন, হন, যান,	গুরু
কর, হও, যাও	সামান্য **মধ্যম পুরুষ**	কর, হও, যাও	সামান্য
করিস, হইস্ যাইস্ (হস) (যাস্)	তুচ্ছ	করিস্, হস্, (হোন্) যাস্	তুচ্ছ

সাধু	পুরুষ		চলিত	
করেন, হয়েন, যায়েন (হন) (যান)	গুরু	প্রথম পুরুষ	করেন, হন (হোন), যান	গুরু
করে, হয়, যায়	সামান্য		করে, হয়, যায়	সামান্য

শু, লিখ্, আছ্ (নিত্যবৃত্ত অতীত)

সাধু		পুরুষ		চলিত
শুইতাম, লিখিতাম, থাকিতাম		উত্তম পুরুষ		শুতাম, লিখিতাম, থাকতাম
শুইতেন, লিখিতেন, থাকিতেন	গুরু	মধ্যম পুরুষ	গুরু	শুতেন, লিখতেন, থাকতেন
শুইতে, লিখিতে, থাকিতে	সামান্য		সামান্য	শুতে, লিখতে, থাকতে,
শুইতিস্, লিখিতিস্, থাকিতিস্	তুচ্ছ		তুচ্ছ	শুতিস্, লিখতিস, থাকতিস্
শুইতি, লিখিতি, থাকিতি				শুতি, লিখতি, থাকতি
শুইতেন, লিখিতেন, থাকিতেন	গুরু	প্রথম পুরুষ	গুরু	শুতেন, লিখতেন থাকতেন
শুইত, লিখিত, থাকিত	সামান্য		সামান্য	শুত, লিখত, থাকত

[খ] ক্রিয়ার কালভেদ

ক্রিয়ার সময়কেই বলা হয় **'কাল'**। এই কাল প্রধানত তিনপ্রকার : **বর্তমান, অতীত** ও **ভবিষ্যৎ**। এই তিনপ্রকারের কালকে আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। **বর্তমান কালের** তিন বিভাগ : (ক) সাধারণ বা নিত্য, (খ) ঘটমান, (গ) পুরাঘটিত। **অতীত কালের** চারি বিভাগ : (ক) সাধারণ বা নিত্য, (খ) নিত্যবৃত্ত, (গ) ঘটমান, এবং (ঘ) পুরাঘটিত। **ভবিষ্যৎ কালের** তিন বিভাগ : (ক) সাধারণ, (খ) ঘটমান, এবং (গ) পুরাঘটিত।

(১) **সাধারণ বা নিত্যবর্তমান :** সাধারণভাবে অর্থাৎ সচরাচর যখন কোনো ক্রিয়ার ব্যাপার ঘটে তাহাকে সাধারণ বা নিত্যবর্তমান কাল বলা হয়। যেমন, বাড়ির পাশের মাঠটিতেই আমরা **খেলি**। সে প্রতি রবিবারে কলিকাতা হইতে গ্রামের বাড়িতে **যায়**। কোনো ঐতিহাসিক-ঘটনার বিবৃতির ক্ষেত্রেও নিত্য-বর্তমান কাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, মানবজাতির দুঃখনিবৃত্তির জন্যই বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ **করেন**। মুসলমানদের মধ্যে তুর্কীরাই সর্বপ্রথম বঙ্গদেশ

জয় করে। অনুজ্ঞা অর্থেও উত্তম পুরুষে নিত্য বর্তমানের প্রয়োগ হয়। যেমন, এবার চল, মাঠে খেলা করিতে যাই।

'রামের প্রসাদে লোক পায় নানা সুখ'—কৃত্তিবাস

(২) **ঘটমান বর্তমান বা ভূতাসন্ন বর্তমান**ঃ যে ক্রিয়ার কার্য ঘটিতেছে, এখনো শেষ হয় নাই, তাহাকে ঘটমান বর্তমান কাল বলে। যেমন, আজ সকাল হইতেই টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করিতেছেন।

'পল্লীমায়ের বুক ছেড়ে আজ
যাচ্ছি (যাইতেছি) চলে প্রবাস-পথে'—গোলাম মোস্তাফা

(৩) **পুরাঘটিত বর্তমান**ঃ কিছুকাল পূর্বে যে-কার্য ঘটিয়াছে অথচ যাহার ফল বা প্রভাব এখনো বর্তমান, তাহাকেই পুরাঘটিত বর্তমান কাল বলা হয়। যেমন এইবার গাছে অজস্র ফল ধরিয়াছে। বর্ধমান হইতে গতকাল সন্ধ্যায় আমি কলিকাতায় আসিয়াছি। পূজার সংখ্যার কাগজে প্রকাশের জন্যই আমি কবিতাটি লিখিয়াছি। 'অর্ঘ্যপাত্রে বুঝিয়াছি কেবল তোমায় প্রভু শব্দ অবশিষ্ট, ওহে নৃপমণি'।

(৪) **সাধারণ অতীত বা নিত্যঅতীত বা অদ্যতনী**ঃ যে ক্রিয়া কোনো অনির্দিষ্ট অতীত সময়ে সংঘটিত হইয়াছে তাহা বুঝাইতে সাধারণ অতীত বা নিত্য-অতীত কালের প্রয়োগ হয়। যেমন লক্ষ্মণের প্রতি সরোষে ধাবিত হইয়া মেঘনাদ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। পিতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া মণিকারা দেশে ফিরিল। 'আনিল তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে'—কবিকঙ্কণ।

(৫) **নিত্যবৃত্ত অতীত**ঃ অতীতকালে কোনো কাজ সর্বদা বা কিছুকাল ধরিয়া নিয়মিতভাবেই ঘটিত, এই অর্থেই নিত্যবৃত্ত অতীতের প্রয়োগ হয়। যেমন, গ্রামে থাকিতে আমি প্রতিদিনই নদীতীরে বেড়াইতে যাইতাম। বালকটিকে তিনি সকালবিকাল দুই বেলাই পড়াইতেন। 'যোগাতেন আনি নিত্য ফলমূল বীর সৌমিত্রি',—মাইকেল।

(৬) **ঘটমান অতীত**ঃ অতীতকালের অসম্পন্ন ক্রিয়ার বুঝাইতে ঘটমান অতীত-এর প্রয়োগ হয়। যেমন গৃহের বাসিন্দারা রাত্রিতে যখন ঘোরে ঘুমাইতে-ছিল তখনই ঘরে চোর প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি যখন নিবিষ্টচিত্তে লিখিতেছিলেন তখন একজন লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল।

(৭) **পুরাঘটিত অতীত**ঃ অতীতকালে সংঘটিত কোনো ক্রিয়ার পূর্বে ঘটিত ক্রিয়া বুঝাইতে পুরাঘটিত অতীত ব্যবহৃত হয়। যেমন, গেল বৎসর আমি উপন্যাসটি লিখি, তার আগের বৎসরই লিখিয়াছিলাম কবিতার বইটি। বহুপূর্বে ঘটিয়া গিয়াছে এমন ঘটনা বুঝাইতেও পুরাঘটিত অতীত কালের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন, অতি শিশুকালে আমি একবার ঘাট হইতে পড়িয়া গিয়াছিলাম।

'গ্রন্থকারদিগের মধ্যে বহুতর ব্যক্তি এই সকল সঙ্কীর্ণ পথের পথিক হইয়াছিলেন' —অক্ষয়কুমার দত্ত।

(৮) সাধারণ বা সামান্য ভবিষ্যৎ : যে-কাজ এখনো হয় নাই, যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহাকে সাধারণ বা সামান্য ভবিষ্যৎ বলে। যেমন, আগামীকাল আমি দিল্লী রওনা **হইব**। আবার তিনি আমাদের মধ্যে ফিরিয়া **আসিবেন**। 'কি **করিব** একা ঘরে রয়ে'—ভারতচন্দ্র।

(৯) ঘটমান ভবিষ্যৎ : যে-ক্রিয়া ভবিষ্যতে ঘটিতে থাকিবে তাহা ঘটমান ভবিষ্যৎ দ্বারা দ্যোতিত হয়। যেমন, যে-রকম আবহাওয়া দেখিতেছি তাহাতে মনে হয় সামনের কয়দিন ধরিয়া সমানে বৃষ্টি **হইতে থাকিবে**। আগামী কাল এমন সময়ে আমি স্টীমারে পদ্মানদী পার **হইতে থাকিব**।

(১০) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ : অতীতকালে কোনো ক্রিয়া ঘটিয়াছিল বা ঘটিয়া থাকিতে পারে এই অর্থে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগ হয়। যেমন, আমার স্মরণ হইতেছে না, হয়তো একথা তোমায় আমি **বলিয়া থাকিব**। হয়তো এই কাহিনী কাহারো কাছে যদুবাবুই বিবৃত **করিয়া থাকিবেন**।

উপরে ক্রিয়ার কালভেদের যে-পরিচয় দেওয়া হইল, রূপ ও অর্থের দিক দিয়া, উহাদিগকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায় : (ক) সরল বা **মৌলিক কাল**, (খ) মিশ্র বা **যৌগিক কাল**। নিত্যবর্তমান, নিত্যঅতীত, নিত্যবৃত্ত অতীত এবং সাধারণ ভবিষ্যৎ মৌলিক কাল-এর অন্তর্গত; আর, ঘটমান বর্তমান, ঘটমান অতীত, ঘটমান ভবিষ্যৎ, পুরাঘটিত বর্তমান, পুরাঘটিত অতীত এবং পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ যৌগিক কাল-এর অন্তর্ভুক্ত।

[গ] অব্যয়

লিঙ্গ, বচন বা বিভক্তিভেদে যে সকল পদের কোনোই রূপান্তর ঘটে না তাহাদিগকে বলে অব্যয়। বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ ও অর্থভেদে অব্যয় নানা প্রকারের। তথাপি কেবল অর্থের দিক হইতে, অব্যয়কে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) অনন্বয়ী বা ভাববোধক অব্যয় এবং (খ) অন্বয়ী অব্যয় বা সংযোজক অব্যয়। ইহাদের প্রত্যেকটির আবার অনেক উপবিভাগ আছে।

(ক) ভাববাচক অব্যয়

১। **ঘৃণা বা বিরক্তিসূচক**—ছি, ছিছি, ধিক্, ধেৎ, থু, ওয়াক্ থু, দুত্তোর, কী বিপদ্, কী জ্বালা, কী ঘেন্না, রামরাম, ঘেন্নায় মরি প্রভৃতি। ছি ছি ছি, তোমায় ধিক্, তোমায় সহস্র ধিক্।—গিরিশচন্দ্র

২। **ভয় বা দুঃখসূচক**—বাপরে, উঃ, আঃ, মারে, বাবারে, বাবা, মাগো, একি, ওরে, প্রভৃতি। যথা—

মাগো, কী ভীষণ লোক।
বাবারে, কী ভীষণ মূর্তি।

৩। **প্রশংসাসূচক**—বাহবা, বহুৎ আচ্ছা, বলিহারি, সাবাস, ধন্য প্রভৃতি। উদাহরণ—বলিহারি, তোমার কি ভদ্র আচরণ!

৪। **বিস্ময়সূচক**—আহা, বলিহারী, বাঃ, কিবা প্রভৃতি।
যথা—আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়।

৫। **অনুমোদনাত্মক**—আচ্ছা, বেশ, হাঁ, হুঁ প্রভৃতি।
যথা—বেশ তো, তুমি যেতে চাও, যাও।

৬। **সম্মতিসূচক**—বটে, আচ্ছা, হাঁ, ভাই, প্রভৃতি।
যথা—আচ্ছা, তোমার কথাই সত্য বলিয়া ধরিলাম।

৭। **অসম্মতিসূচক**—না, আদৌ না, একদম না প্রভৃতি।
যথা—না, মোটেই না, তুমি যা বলছ সব মিথ্যা।

৮। **শোক বা খেদসূচক অব্যয়**—হায়, হায় হায়, হায়রে প্রভৃতি।
যথা—চিরস্থির কবে নীর, হায়রে, জীবননদে?

৯। **করুণাসূচক**—আহা, আহারে, বেচারা, বাছা আমার প্রভৃতি।
যথা—বেচারা, শেষে অনাহারে প্রাণ হারালো।

১০। **অনুকারাত্মক**—ঝন্‌ঝন্‌, ঠন্‌ঠন্‌, ঝাঁ ঝাঁ, বম্‌বম্‌, গম্‌গম্‌, ছম্‌ছম্‌।
যথা—গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে গ্রামের উন্মুক্ত প্রান্তর সকল তখন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল।

(খ) সংযোজক অব্যয়

১। **সমুচ্চয়ী**—এবং, ও, অতএব, সুতরাং, আর, অথবা, তবু, তথাপি, বরং, অথচ প্রভৃতি। যথা—রাম এবং শ্যাম উভয়েই বুদ্ধিমান্‌।

২। **পদান্বয়ী**—নিমিত্ত, জন্য, সহ, সহিত, মতন, মত, সঙ্গে, প্রভৃতি। যথা—পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য বালকটি খুবই পরিশ্রম করিয়াছিল।

৩। **বৈকল্পিক অব্যয়**—অথবা, কিংবা, নতুবা, না প্রভৃতি। উদাহরণ—তুমি অথবা রাম কাল আমার সহিত দেখা করিবে।

৪। **সঙ্কোচক অব্যয়**—কিন্তু, অথচ, বরঞ্চ, তবু, তথাপি, প্রভৃতি। যথা—রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না।

৫। **প্রশ্নবাচক অব্যয়**—কেন, কি, নাকি, তো প্রভৃতি। যথা—তিনি নিজে আর আসেন না কেন?

৬। **উপমাবাচক**—ন্যায়, মতন, মত, পারা, পানা ইত্যাদি। যথা—তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই।

৭। **অবস্থাত্মক অব্যয়**—খাঁ খাঁ, ছট্‌পট্‌, ছল্‌ছল্‌ প্রভৃতি। যথা—দিক্‌বধূ যেন ছল্‌ছল্‌ আঁখি অশ্রুজলে —রবীন্দ্রনাথ

৮। **ব্যবস্থাত্মক অব্যয়**—তাহা হইলে, সেইজন্য, তবে প্রভৃতি। যথা—তোমার ভাই যদি আমার বাড়ী আসে **তবে** আমি তাহার সহিত কলিকাতায় যাইব।

৯। **কারণাত্মক অব্যয়**—কারণ, যেহেতু, এজন্য, বাস্তবিকই প্রভৃতি। যথা—**বাস্তবিকই** মন্দির ও কড়াই উচ্চারণ সম্বন্ধে তাহার ত্রুটি ছিল। —রবীন্দ্রনাথ

১০। **সমাপ্তিসূচক অব্যয়**—শেষটায়, আখেরে প্রভৃতি। যথা—**আখেরে** তাকে বহু কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল।

১১। **বাক্যালঙ্কার অব্যয়**—(যাহা বাক্যের সৌন্দর্য বর্ধন করে) বটে, না, তো প্রভৃতি। যথা—বুড়ো বিরক্ত হইল, কহিল, **না** ত কি ? —শরৎচন্দ্র

১২। **নিত্যসম্বন্ধী**—যত…তত, এত…যে, বরং…তবু প্রভৃতি। যথা—**যত** উর্ধ্বে উঠিতেছি বায়ুস্তর **ততই** ক্ষীণতর হইতেছে। —জগদীশচন্দ্র বসু

১৩। **ক্রিয়াপদ অব্যয়**—বলিয়া, করিয়া, প্রভৃতি। যথা—কাননের সরোবরে একটি ফুটেছে কী **করিয়া**। —রবীন্দ্রনাথ

ইহা ছাড়া আরো কতকগুলি অব্যয় পদ আছে। এইগুলিও অধিকাংশই বিশেষণরূপে এবং কতকগুলি বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—নানা, হেন, বৃথা, কিঞ্চিৎ, ঈষৎ প্রভৃতি (বিশেষণরূপী অব্যয়); অবশ্য, সহসা, সর্বদা, পুনরায় প্রভৃতি (ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত অব্যয়); আজকাল, তো, না, প্রভৃতি (বিশেষ্যরূপী অব্যয়); যত, তত, এত, আর প্রভৃতি (সর্বনামরূপে ব্যবহৃত অব্যয়)। কোনো কোনো অব্যয় বিচিত্র অর্থে বাক্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। নিম্নের উদাহরণগুলিতে 'না' অব্যয়টির বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখানো হইতেছে :

[১] **না**—তুমি **না** আমায় বইটি দেবে বলেছিলে ? (প্রশ্ন)
সেই **না** কন্যার মাথায় ছিল মেঘবরণ চুল। (পাদপূরণ)
আমাকে একটি টাকা দাও **না**। (অনুরোধ)
আজ থিয়েটারে যেও **না**। (নিষেধ)

কাজটা কারো না ; **না**, এ কাজটা আমাকে করতেই হ... না তোমার নিকট হইতে আজ **না** শুনব না (অসম্মতি)। আমাকে তুমি সে কথাটি বলিবে, **না**, আমিই বলিব ? মানুষের ধর্ম কী ? **না**, পরের আত্মার মধ্যে (অথবা) নিজেকে দেখা, নিজের আত্মার মধ্যে পরকে দেখা (অবধারণ অর্থে)।

[২] **কিন্তু**—সে বিদ্বান্ **কিন্তু** দরিদ্র (সংকোচ)।

অর্জুন ও দুর্যোধন দুইজনেই শ্রীকৃষ্ণকে দলভুক্ত করিতে গিয়াছিলেন। অর্জুন সে কার্যে সাফল্য লাভ করিলেন **কিন্তু** দুর্যোধন অকৃতকার্য হইলেন।

[৩] ই—শ্যামই সেখানে গিয়াছে। (কেবল)
চন্দ্র উঠিলেই জগৎ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়। (নিশ্চয়ই)
এ কাজ না-ই বা করিলে। (অবশ্য)
ও—শ্যাম ও যদু সেখানে যাইবে (সংযোজন)।
ও গোবিন্দ, আমার কথা শুনতে পাও না? (সম্বোধন)
ওঃ! তুমি কী ভয়ানক ছেলে। (বিস্ময়)
ও যে তোমাকে দেখতে পেয়েছে, তা আমি আগেই জানি।
(নির্দেশ)
ও ছেলেটা একেবারে গোল্লায় গেছে। (বিশেষণসূচক)
তোমার কথাও যা কাজও তা। (তুলনা)
যেন—সে যেন আর এখানে না আসে। (ক্রোধ)
তার মুখটি যেন চাঁদ। (উপমা)
দেখো তুমি যেন পড়ে না যাও। (সাবধান)
ভগবান যেন তোমার কল্যাণ করেন। (প্রার্থনা)
বালিকার মূর্তি যেন একটি দেবীপ্রতিমা। (উৎপ্রেক্ষা)

[ঘ] উপসর্গ

কতকগুলি অব্যয় (প্র, পরা, অপ, সম, অনু, অব, নির্, দুর্, অভি, বি, অধি, সু, উত্, অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, আ,) ধাতুর পূর্বে বসিয়া উহার অর্থের নানারূপ পরিবর্তন ঘটায়—এই অব্যয়গুলিকে 'উপসর্গ' বলে। নিম্নে উপসর্গ-যোগে ধাতুর অর্থ পরিবর্তন-এর উদাহরণ:

প্র—প্রহার, প্রকৃতি, প্রকাশ, প্রস্থান, প্রদান প্রভৃতি।

প্রয়োগ—'**জীবন-প্রবাহ** বহি' কালসিন্ধু পানে ধায়।

পরা—পরাজিত, পরাজয়, পরাভব, পরাক্রান্ত প্রভৃতি।

প্রয়োগ—পরাক্রান্ত জয়মল্ল স্বর্গে গিয়াছেন।

অপ—অপমান, অপরাধ, অপকার প্রভৃতি।

প্রয়োগ—তপ্ত সূর্যকর তাহার সুকুমার কপোলের লাবণ্যবিভা **অপহরণ** করিয়া লয় নাই।

সম্—সমাপ্ত, সঙ্গম, সমর্পণ প্রভৃতি।

প্রয়োগ—সমস্ত দিনের আলস্য ত্যাগ করিয়া রাত্রির নিদ্রায় শরীর মন **সমর্পণ** করিলাম।

অনু—অনুমান, অনুভব, অনুগমন, অনুরাগ, অনুমোদন প্রভৃতি।

প্রয়োগ—**অনুরত** হয়ে দেও **অনুরাগজল**।

অব—অবনত, অবলোকন, অবজ্ঞা, অবমান প্রভৃতি।

প্রয়োগ—এরূপ **অবমাননা** আমি কখনই সহ্য করিতে পারিব না

নির্—নিরীক্ষণ, নির্বাণ, নির্গমন, প্রভৃতি।

প্রয়োগ—কোন্ বিধি **নির্মাণ** করিল দুইজনে।

দুর্—দুর্গতি, দুর্নীতি, দুর্দান্ত প্রভৃতি।

প্রয়োগ—লোকটি নিজের দুষ্কর্মের ফলে আজ এতখানি **দুর্গতি**-লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে।

অভি—অভিষেক, অভিশাপ, অভ্যাস, অভিমান প্রভৃতি।

প্রয়োগ—পাদুকার **অভিষেক** করিয়া তথায়। —কৃত্তিবাস

বি—বিচার, বিষাদ, বিকৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি।

প্রয়োগ—যাইতে যাইতে রাণী করিছে **বিষাদ**। —কৃত্তিবাস

অধি—অধিবাস, অধিবাসী, অধিষ্ঠান, অধিকার প্রভৃতি।

প্রয়োগ—কালি রাম রাজা হবে আজি **অধিবাস**। —কৃত্তিবাস

সু—সুকর, সুবৃষ্টি, সুলভ প্রভৃতি।

প্রয়োগ—৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। **সুবৃষ্টি** হইল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইয়া উঠিল। —বঙ্কিমচন্দ্র

উদ্—উৎকৃষ্ট, উৎপন্ন, উৎফুল্ল প্রভৃতি।

প্রয়োগ—ভারবির রাজনীতিজ্ঞান সত্যই **উৎকৃষ্ট** ও প্রশংসনীয়।

অতি—অতিক্রম, অতিরিক্ত, অতিবাহিত প্রভৃতি।

প্রয়োগ—এইরূপে শীতকাল **অতিবাহিত** হইল।

নি—নিযুক্ত, নিবৃত্তি, নিষেধ, নির্দয় প্রভৃতি।

প্রয়োগ—ঈশ্বর তাহাদের প্রতি **নির্দয়** হইলেন।

প্রতি—প্রতিজ্ঞা, প্রতিবাসী, প্রতিষ্ঠিত প্রভৃতি।

প্রয়োগ—যাহা নিন্দা শুনা যায় তাহা কেবল **প্রতিবাসীর**। —সঞ্জীবচন্দ্র

পরি—পরিশ্রম, পরিধান, পরিচয়, পরিতৃপ্ত প্রভৃতি।

প্রয়োগ—দুই ভাই করেন বাকল **পরিধান**। —কৃত্তিবাস

অপি—বাঙ্লায় ইহার প্রয়োগ বিরল।

উপ—উপসর্গ, উপহার, উপকার, উপনীত প্রভৃতি।

প্রয়োগ—ভোগেতে না হয় মতি, স্বর্গভোগ **উপসর্গ** সার। —ঈশ্বরচন্দ্র

আ—আহত, আঘাত, আদেশ প্রভৃতি।

প্রয়োগ—**আঘাত** লাগিলে ঘায়ে জলে তা যেমন। —কৃত্তিবাস

[ঙ] বাঙলা উপসর্গ

কতকগুলি অব্যয় বা অব্যয়জাতীয় শব্দ বাঙ্‌লায় নামপদের পূর্বে বসিয়া উপসর্গের মতো কাজ করে। ঠিক উপসর্গ বলিতে যাহা বুঝায়, খাঁটি বাঙ্‌লায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্‌লায় উপসর্গ বলিয়া যাহা পরিচিত তাহাদের অনেকগুলিই শব্দের পূর্বে অবস্থিত তদ্ধিত-প্রত্যয় ছাড়া অন্য কিছু নয়। বাঙ্‌লা উপসর্গের দ্বারা গঠিত কয়েকটি শব্দের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

অনা—অনামুখো, অনাসৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি।

প্রয়োগ—সেই **অনামুখো** লোকটা এখানে কী করতে এসেছিলে ?

না—নারাজ, নাচার, নামঞ্জুর প্রভৃতি।

প্রয়োগ—তিনি সেখানে যেতে **নারাজ**।

বে—বে-আদব, বেমালুম, বেহায়া প্রভৃতি।

প্রয়োগ—তুমি এ কথাটা একেবারে **বেমালুম** অস্বীকার করলে।

গর—গরমিল, গররাজি প্রভৃতি।

প্রয়োগ—এ চাকরিটি নিতে তুমি আর **গর্‌রাজি** হয়ো না।

নিম—নিমরাজি, নিমখুন প্রভৃতি।

প্রয়োগ—তাঁহাকে জোর করে ধরাতে তিনি সেখানে যেতে **নিম্‌রাজি** হয়েছেন।

হা—হা-ভাত, হা-পিত্যেশ, হা-হুতাশ, প্রভৃতি।

প্রয়োগ—তোমার মা তোমার জন্যে কতদিন ধরে **হা-পিত্যেশ** করে বসে আছেন।

ফি—ফি-বছর, ফি-রোজ, ফি-বার প্রভৃতি।

প্রয়োগ—**ফি-বছরই** এইরূপ কোনো-না-কোনো ঘটনা ঘট্‌ছেই।

হর—হরদম্‌, হরেক রকম, হররোজ প্রভৃতি।

প্রয়োগ—সে এখানে **হরদম** আসতো।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ সমাস ॥

'সমাস' শব্দের অর্থ সংক্ষেপ। সমাসের সাহায্যে বহু ভাবকে অল্পকথায় বলা যায়। সমাস সংস্কৃত ভাষায় অবশ্যকর্তব্য না হইলেও উহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সাধু বাঙলায় সমাসবদ্ধ পদ খুবই দেখা যায়। খাঁটি বাঙলাতেও সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ সংখ্যায় কম নহে। সাধু বাঙলায় যে সমাস করা হয় উহা সংস্কৃত নিয়মানুসারে।

পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদ মিলিত হইয়া একপদে পরিণত হইলে তাহাকে **সমাস** বলে। সাধারণত দুইপদে সমাস হয়। সাধু বাঙলায় দুইয়ের অধিকপদেও সমাস হয়। খাঁটি বাঙলায় সাধারণত দুইপদে সমাস হয়। সমাসের অন্তর্গত পদগুলির বিভক্তির লোপ হয় এবং পরে নূতন বিভক্তি যুক্ত হয়। তবে যেখানে বিভক্তির লোপ হয় না তাহাকে বলে অলুক্ সমাস (এখানে 'লুক্' শব্দের অর্থ লোপ)। সমাসে কিন্তু সন্ধি অবশ্যকর্তব্য। যে-কয়েটি পদ লইয়া সমাস করা হয় তাহাদের নাম **সমস্যমান পদ**, এবং সমাসবদ্ধ পদটিকে বলা হয় **সমস্তপদ**। যে-বাক্য সমস্যমান পদগুলির পরস্পর সম্পর্ক নিরূপণ করে তাহার নাম **ব্যাসবাক্য, বিগ্রহবাক্য** বা **সমাসবাক্য**। সমাসবদ্ধ পদের প্রথমটির নাম **পূর্বপদ** এবং শেষেরটির নাম **উত্তরপদ**। যেমন. 'শোকাকুল' একটি সমস্তপদ। 'শোকের দ্বারা আকুল' হইতেছে ব্যাস, বিগ্রহ বা সমাসবাক্য; 'শোক' ও 'আকুল' পদ দুইটি সমস্যমান পদ; 'শোক' পূর্বপদ এবং 'আকুল' উত্তরপদ।

সমাস সাধারণত ছয় প্রকারের: **দ্বন্দ্ব, দ্বিগু, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, অব্যয়ীভাব ও বহুব্রীহি।**

[এক] **দ্বন্দ্ব সমাস**: যে-সমাসে সমস্যমান পদের প্রত্যেকটির অর্থপ্রাধান্য থাকে এবং পূর্বপদ ও উত্তর পদ সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত থাকে, তাহার নাম দ্বন্দ্ব সমাস। দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদগুলি প্রথমা বিভক্তিযুক্ত হয়। যেমন—হাট ও বাজার = হাটবাজার; রাধা ও শ্যাম = রাধাশ্যাম; কৃষ্ণ ও অর্জুন = কৃষ্ণার্জুন। তদ্রূপ, দেবাসুর, শোকতাপ, হিতাহিত, বনজঙ্গল, গানবাজনা, ভূতপেত্নী, মুখচোখ, চালাকচতুর, দেনাপাওনা, সোনারূপা, কোলেপিঠে, দুধেভাতে, মায়েঝিয়ে, বাপ-বেটাতে, সুখদুঃখ, নামধাম, জন্মমৃত্যু, দেবদৈত্য, বৃক্ষলতা, জমাখরচ, গমনাগমন, হাতীঘোড়া, অগ্রপশ্চাৎ, মেয়েজামাই, আমকাঁঠাল, জোয়ারভাঁটা, শীতবসন্ত, ধর্মার্থ-কামমোক্ষ, রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শ, শঙ্খচক্রগদাপদ্ম, ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাসকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—যেমন, সমাহার দ্বন্দ্ব, অলুক্ দ্বন্দ্ব, সমার্থক দ্বন্দ্ব। দুই বা ততোধিক পদের একসঙ্গে অবস্থান [সমাহার] বুঝাইলে সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস হয়। যেমন—অহি ও নকুল = অহিনকুল, ধনুঃ ও শর = ধনুঃশর, ইত্যাদি। যে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না তাহাকেই বলে অলুক্ দ্বন্দ্ব। যেমন—মায়েঝিয়ে, বনেবাদাড়ে, বুকেপিঠে, ইত্যাদি। যে-দ্বন্দ্ব সমাসে বিভিন্ন বস্তুর সংযোগ না বুঝাইয়া অনুরূপ বস্তুর সংযোগ বুঝায় তাহারই নাম সমার্থক দ্বন্দ্ব। যেমন,—কাগজপত্র, ভাগবাঁটোয়ারা, রাজরাজড়া।

[দুই] **দ্বিগুসমাস** : যে সমাসে পূর্বপদটি সংখ্যাবাচক এবং পদটির দ্বারা সমাহার বা সমষ্টি বুঝায়, তাহাকে বলে দ্বিগুসমাস। সংস্কৃতে দ্বিগুসমাস তিন প্রকার —তদ্ধিতার্থে, উত্তরপদ পরে ও সমাহারে। বাঙ্‌লায় 'উত্তরপদ পরে'— ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না, তবে তদ্ধিতার্থে ও সমাহারার্থে দ্বিগুসমাস হয়।

তদ্ধিতার্থে—পাঁচটি গোরুর বিনিময়ে ক্রীত>পঞ্চগু। ষট্ (ছয়) মাতার অপত্য>ষাণ্মাতুর (কার্তিক)। এইরূপ দ্বৈমাতুর, সাতকড়ি, পাঁচকড়ি প্রভৃতি।

উত্তরপদ পরে—পাঁচটি গোরু ইহার ধন>পঞ্চগবধন। এই প্রকার প্রয়োগ বাঙ্‌লায় দেখা যায় না।

সমাহার—পঞ্চ বটের সমাহার>পঞ্চবটী, শত অব্দের সমাহার>শতাব্দী, পঞ্চ নদের সমাহার>পঞ্চনদ, চারটি রাস্তার সমাহার>চৌরাস্তা, তিন মাথার সমাহার> তেমাথা, সপ্ত অহন্-এর সমাহার>সপ্তাহ। এইরূপ—নবগ্রহ, নবরত্ন, সাতঘাট, দুবেলা, ত্রিলোকী, পঞ্চপাণ্ডব, পাঁচসিকে, তেরাত্রি, পাঁচসেরী, পঞ্চপ্রদীপ, সপ্ততীর্থ, চৌমোহানী, ত্রিভুবন, সাতসমুদ্র, অষ্টপ্রহর, ত্রিপদী প্রভৃতি।

দ্রঃ—'দশচক্র' কিন্তু দ্বিগুসমাসনিষ্পন্ন নহে, উহা ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসনিষ্পন্ন [দশের চক্র (চক্রান্ত)]।

সংখ্যাবাচক পদ পূর্বে থাকিলেই যে দ্বিগুসমাস হয় এরূপ নহে। যথা—'একেশ্বর' কর্মধারয় সমাস।

[তিন] **কর্মধারয়** : যেখানে সাধারণত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে সমাস হয় এবং যে-সমাসে বিশেষ্য পদ বা উত্তর পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, উহারই নাম কর্মধারয় সমাস। মনে রাখিতে হইবে, এই সমাস যে শুধু বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে হয় তাহা নহে— বিশেষণ-বিশেষ্য, বিশেষণ-বিশেষণ, বিশেষ্য-বিশেষ্য পদেও হয়। এই সমাসে সমস্যমান পদগুলি বিশেষ্য-বিশেষণভাবের এবং একবিভক্তিক হইলে সমানাধিকরণ হয়। দুটি পদই এ সমাসে প্রথমান্ত হইয়া থাকে। যেমন—মহান্ যে ঋষি = মহর্ষি, নীল যে উৎপল = নীলোৎপল, পূর্ণ যে চন্দ্র = পূর্ণচন্দ্র, রাজা অথচ ঋষি = রাজর্ষি, পুণ্য এমন অহন্ (দিন) = পুণ্যাহ, অগ্রে সুপ্ত পরে উত্থিত = সুপ্তোত্থিত, পণ্ডিত হইয়াও মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ, বীর যে পুরুষ = বীরপুরুষ, দেব যিনি ঋষি = দেবর্ষি, মহৎ যে

জন = মহাজন, নতুন এমন বউ = নতুনবৌ, কাঁচা অথবা মিঠা = কাঁচামিঠা, আধ এমন পাকা = আধপাকা, মিঠা অথচ কড়া = মিঠাকড়া ইত্যাদি।

বিশেষণ + বিশেষ্য : রক্তচন্দন, শুভবিবাহ, মহাজন, পুণ্যভূমি, পূর্ণচন্দ্র, বৌভাত, কটূক্তি, পাকাগিন্নি, গরমজল, খাসমহল, ফুলবাবু, খোসমেজাজ, ভাঙাহাট, হারাধন, নবদম্পতি, কাঁচকলা, উড়োজাহাজ, সজনী, পুণ্যাহ, নেকনজর, হালফ্যাশান, হেডমাস্টার, ভালোমানুষ, মহামুস্কিল, নতুনবউ, হেডমৌলভী, কাঁচাধান, মধুরমিলন, দিব্যচক্ষু প্রভৃতি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষণটির পরনিপাত হইয়া থাকে; যেমন—ভাজা যে মাছ > মাছভাজা ; এইরূপ—চালভাজা, ঘা-কতক, তাপসবৃদ্ধ আলু-সিদ্ধ, জলপড়া প্রভৃতি।

বিশেষ্য + বিশেষ্য : যে রাজা সেই ঋষি > রাজর্ষি। এইরূপ—লাটসাহেব, সম্রাট্‌কবি, গঙ্গানদী, জবাফুল, ছিদ্রপথ, আম্রফল, বটগাছ, পিতাঠাকুর, ধ্রুবতারা, দয়া-গুণ, ক্ষমাধর্ম, প্রভৃতি।

বিশেষণ + বিশেষণ : যে হৃষ্ট সেই পুষ্ট > হৃষ্টপুষ্ট। এইরূপ—করুণ-কোমল, ভীমকান্ত, সহজসরল, ভীষণমধুর, ধীরগম্ভীর প্রভৃতি।

কর্মধারয় সমাসকে নানা ভাবে ভাগ করা যায়—মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, রূপক কর্মধারয়, উপমান কর্মধারয় ও উপমিত কর্মধারয়।

যে-কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যে বিশ্লেষণমূলক মধ্যপদের লোপ হয় তাহাকে বলে **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়**। যেমন—সিংহচিহ্নিত আসন = সিংহাসন, ভিক্ষালব্ধ অন্ন = ভিক্ষান্ন, বট নামক বৃক্ষ = বটবৃক্ষ, পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন, ঘরে পালিত জামাই = ঘরজামাই, তেল মাখিবার ধুতি = তেলধুতি, হাতে পরিবার ঘড়ি = হাতঘড়ি, ইত্যাদি। এইরূপ—তুফানমেল, চণ্ডীমণ্ডপ, যমযন্ত্রণা, সিন্দুরকৌটা, বৌভাত, মৌমাছি, গন্ধবণিক, ডাকগাড়ী, মনিব্যাগ প্রভৃতি।

যে-কর্মধারয় সমাসে উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে সাদৃশ্যপ্রসূত অভেদ কল্পনা থাকে তাহাকে **রূপক কর্মধারয়** সমাস বলে। এই সমাসে উপমেয় পূর্বপদ ও উপমান উত্তরপদ হয়। ['উপমা' অলংকারে দুইটি বস্তুর মধ্যে তুলনা করা হয়। যে বস্তুকে তুলনা করা হয় তাহার নাম উপমেয় এবং যে বস্তুর সহিত তুলনা করা হয় তাহার নাম **উপমান**। যেমন—শোকরূপ অগ্নি = 'শোকাগ্নি'—এখানে শোক-কে অগ্নির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। 'শোক' কথাটি হইতেছে উপমেয় আর, 'অগ্নি' কথাটি হইতেছে উপমান।]

রূপক কর্মধারয় সমাসের দৃষ্টান্ত : শোকরূপ অনল = শোকানল, রোষরূপ বহ্নি = রোষবহ্নি, মুখরূপ চন্দ্র = মুখচন্দ্র, বিষাদরূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু, আঁখিরূপ পাখী = আঁখি-পাখী, কীর্তিরূপ মেখলা = কীর্তিমেখলা, জ্ঞানরূপ আলোক = জ্ঞানালোক, মনরূপ মাঝি = মনমাঝি। তদ্রূপ, প্রেমডোর, কীর্তিধ্বজা, দুঃখসাগর, দুর্ভাবনানাগিনী, চরণকমল, দয়াসমুদ্র, দেহপিঞ্জর, কালচক্র, মোহনিদ্রা, প্রভৃতি।

যে-কর্মধারয় সমাসের পূর্বপদটি উপমান এবং উপমান-উপমেয়ের সাধারণ ধর্মটি উত্তরপদ, উহাকেই বলে **উপমান কর্মধারয় সমাস**। যেমন—তুষারের মত শীতল = তুষারশীতল, সিঁদুরের মত রাঙা = সিঁদুররাঙা, কুসুমের মত পেলব = কুসুমপেলব, চন্দ্রের মতো কান্ত = চন্দ্রকান্ত, ফুটির মত ফাটা = ফুটিফাটা, শৈলের মতো উন্নত = শৈলোন্নত, বজ্রের মতো কঠিন = বজ্রকঠিন, মিশির মতো কালো = মিশকালো, ইত্যাদি।

যেখানে উপমান ও উপমেয়ের সমাস হয় কিন্তু সাধারণত গুণবাচক শব্দের উল্লেখ থাকে না সেখানে **উপমিত কর্মধারয় সমাস** হয়। এখানে উপমান উত্তরপদ ও উপমেয় পূর্বপদ, যেমন—পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ, চরণ কমলের ন্যায় = চরণকমল, মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র, বাহু বল্লরীর ন্যায় = বাহুবল্লরী, ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য: উপমান ও উপমিত কর্মধারয় এবং **উপমিত ও রূপক কর্মধারয়** সমাসের পার্থক্যটি ভালো করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের যোগেই **উপমান কর্মধারয়** সমাস হইয়া থাকে এবং ইহাতে সমস্তপদটি বিশেষণ। যেমন—কুসুমের [বিশেষ্য] মতো কোমল [বিশেষণ] = কুসুমকোমল। এখানে 'কুসুমকোমল' কথাটি বিশেষণ। **উপমিত সমাস** হয় দুইটি বিশেষ্য পদ লইয়া এবং ইহাতে সমস্তপদটি বিশেষ্য। যেমন—চরণ (বিশেষ্য) কমলের (বিশেষ্য) ন্যায় = 'চরণকমল'। এখানে 'চরণকমল' বিশেষ্য পদ। উপমিত কর্মধারয় সমাসে উপমেয়ের প্রাধান্য থাকে, কিন্তু রূপক কর্মধারয় সমাসে উপমানের প্রাধান্যই অধিক লক্ষিত হয়। তদুপরি, উপমিত কর্মধারয়ে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে একটা স্পষ্ট ভেদের প্রতীতি বর্তমান থাকে কিন্তু রূপক কর্মধারয়ে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে কোনোপ্রকার ভেদের প্রতীতি থাকে না।

[চার] **তৎপুরুষ সমাস**: যে সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির লোপ হয় এবং উপরপদের অর্থই প্রাধান্য লাভ করে তাহাকে **তৎপুরুষ সমাস** বলে। সমাসে সাধারণত পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হইয়া থাকে। পূর্বপদের যে বিভক্তির বিলোপ ঘটে তাহারই নামানুসারে 'তৎপুরুষ' সমাস নাম গ্রহণ করে। তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার: দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ, চতুর্থী তৎপুরুষ, পঞ্চমী তৎপুরুষ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ, সপ্তমী তৎপুরুষ।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ: দেবকে আশ্রিত = দেবাশ্রিত, দুঃখকে অতীত = দুঃখাতীত, ভাতকে রাঁধা = ভাতেররাঁধা, গঙ্গাকে প্রাপ্ত = গঙ্গাপ্রাপ্ত, বিস্ময়কে আপন্ন = বিস্ময়াপন্ন, চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী [ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়া], চিরকাল ধরিয়া শত্রু = চিরশত্রু, অতিক্রান্ত, স্বর্গত, কাপড়কাচা, জলতোলা, বাসনমাজা, রথদেখা, কলাবেচা, দুঃখাতীত, আলুবোনা, করুণাশ্রিত, জ্ঞানলিপ্সায়, হস্তগত, বৃক্ষারূঢ়, বয়ঃপ্রাপ্ত, দাড়িকামানো, জলপিপাসা, জলজিজ্ঞাসা, ধানকাটা, পানসাজা, মাছধরা প্রভৃতি।

তৃতীয়া তৎপুরুষ : শোক দ্বারা আকুল = শোকাকুল, মেঘ দ্বারা আবৃত = মেঘাবৃত, কণ্টক দ্বারা আকীর্ণ = কণ্টকাকীর্ণ, বিস্ময় দ্বারা বিহ্বল = বিস্ময়বিহ্বল, বাদুড়ের দ্বারা চোষা = বাদুড়চোষা, তেল দ্বারা চিটে = তেলচিটে, চেষ্টা দ্বারা লব্ধ = চেষ্টালব্ধ, বাক্ দ্বারা দত্তা = বাগ্‌দত্তা, শোক দ্বারা ঋত = শোকার্ত। এইরূপ—বিদ্যাহীন, জলকাচা, তাসখেলা, পাথরচাপা, বুদ্ধিহীন, কাঁচিছাঁটা, ঝাঁটাপেটা, করাতচেরা, গুণান্বিত, মধুমাখা, পাতাছাওয়া, শিরোধার্য, বাষ্পচালিত, পদদলিত, গামছাবাঁধা, পিতৃহীন, মোহাচ্ছন্ন, শ্রমলব্ধ প্রভৃতি।

চতুর্থী তৎপুরুষ : ধর্মাচরণের নিমিত্ত পত্নী = ধর্মপত্নী [নিমিত্তার্থে চতুর্থী], বিয়ের জন্য পাগলা—বিয়েপাগলা, ডাকের জন্য মাশুল = ডাকমাশুল, মেয়েদের জন্য স্কুল = মেয়েস্কুল, চুষিবার জন্য কাঠি = চুষিকাঠি, চোষের জন্য কাগজ = চোষকাগজ, পাগলাদের নিমিত্ত গারদ = পাগলাগারদ, ধানের জন্য জমি = ধানজমি, মালের জন্য গুদাম = মালগুদাম, ব্রহ্মকে (ব্রাহ্মণকে) দত্ত = ব্রহ্মদত্ত। এইরূপ—মরণকাঠি, ব্রাহ্মণার্পিত, খাইখরচ, নাটমন্দির, যূপকাষ্ঠ, পুত্রশোক, বালিকাবিদ্যালয়, পূজাপুষ্প, হিন্দুকলেজ, মড়াকান্না, অনাথআশ্রম প্রভৃতি।

পঞ্চমী তৎপুরুষ : সিংহাসন হইতে চ্যুত = সিংহাসনচ্যুত, বিদেশ হইতে আগত = বিদেশাগত, শাপ হইতে মুক্ত = শাপমুক্ত, দুগ্ধ হইতে জাত = দুগ্ধজাত, সত্য হইতে ভ্রষ্ট = সত্যভ্রষ্ট, লোক হইতে ভয় = লোকভয়, দল হইতে ছাড়া = দলছাড়া, বোঁটা হইতে খসা = বোঁটাখসা, বিলাত হইতে ফেরত = বিলাতফেরত, জন্ম হইতে অন্ধ = জন্মান্ধ, যুদ্ধ হইতে উত্তর = যুদ্ধোত্তর। এইরূপ—ভোগসুখ, বৃক্ষাবতীর্ণ, গৃহনির্গত, স্কুলপালানো, গাছপাড়া, শাপমুক্ত, ব্যাঘ্রভীত, বৃন্তচ্যুত, ধর্মভয়, জলাতঙ্ক, ব্রাহ্মণেতর, জেলখালাস, বিপন্মুক্ত, পদচ্যুত, প্রাণপ্রিয়, মেঘমুক্ত, ঝুলিঝাড়া প্রভৃতি।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ : বনের পতি = বনস্পতি, কবিদের গুরু = কবিগুরু, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ, পাটের ক্ষেত = পাটক্ষেত, ঠাকুরের ঝি = ঠাকুরঝি, টেকের ঘড়ি = টেকঘড়ি, পথের রাজা = রাজপথ, হংসের রাজা = রাজহংস, দরিয়ার মাঝ = মাঝদরিয়া, পথের মাঝ = মাঝপথ। এইরূপ—চাবাগান, ফুলবাগান, ভাগ্যবিধাতা, বিশ্বস্রষ্টা, সূর্যোদয়, বৃষ্টিপাত, ছাত্রাবাস, জগদীশ্বর, বাণীবন্দনা, মহিলামহল, ঠাকুরপো, তালপাতা, কর্মফল, রথতলা, দিল্লীশ্বর, বিমানবহর, সৈন্যদল, রাজবৃন্দ, রাক্ষসরাজ প্রভৃতি।

সপ্তমী তৎপুরুষ : বৃক্ষে পক্ব = বৃক্ষপক্ব, বনে জাত = বনজাত, দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত = দুষ্ক্রিয়াসক্ত, গাছে পাকা = গাছপাকা, গায়ে হলুদ = গায়েহলুদ [অলুক্], ছাঁচে ঢালা = ছাঁচেঢালা [অলুক্], বাটায় ভরা = বাটাভরা, থালায় ভর্তি = থালাভর্তি, যুধি (যুদ্ধে) স্থির = যুধিষ্ঠির [অলুক্]। যে-তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না তাহাকে অলুক্ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন—ঘিয়ে ভাজা = ঘিয়েভাজা, ঘোড়ার ডিম = ঘোড়ারডিম (ষষ্ঠী), ভ্রাতুঃ (ভাইয়ের) পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র (ষষ্ঠী), বাচঃ পতি = বাচস্পতি (ষষ্ঠী), পরাৎ পর = পরাৎপর (পঞ্চমী), মাতৃ-

সার=সারাৎসার (পঞ্চমী), হাতে কাটা=হাতেকাটা (সপ্তমী)। এইরূপ—অপত্যস্নেহ, কোণঠাসা, গর্ভশয়ান, বাক্‌পটু, বাটাভরা, জ্ঞানানুরাগ, রণবীর, কর্মনিপুণ, ক্রীড়াকুশল, আতপশুষ্ক, পাপাসক্তি, ঘরপোড়া, জলমগ্ন প্রভৃতি।

নঞ্ তৎপুরুষ সমাস: 'নঞ্' একটি সংস্কৃত অব্যয়, ইহার অর্থ হইল 'না' বা 'নাই'। এই নঞ্-অর্থবোধক অব্যয়ের সহিত পরপদের যে সমাস হয় তাহার নাম নঞ্ তৎপুরুষ সমাস। বাঙলায় নঞ্-এর স্থানে না, অনা, অ, বে, গর্ হয়। যেমন- ন জানা=অজানা, ন অভ্যস্ত=অনভ্যস্ত, ন কেজো=অকেজো, ন অতি দীর্ঘ=নাতিদীর্ঘ, মিল নাই=অমিল কিংবা গরমিল, ন সরকারি=বেসরকারি, মঞ্জুর নয়=না-মঞ্জুর। এইরূপ— অনাসৃষ্টি, অনাদর, অব্রাহ্মণ, অভাব, অনুচিত, অমানুষ, অনৈক্য, অসময়, নগণ্য, অবাঙালি, গরহাজির, আধোয়া, নারাজ, আঘাটা, বেরসিক, অনাদায়ী, অনিচ্ছা, অসুর, আকাল প্রভৃতি।

উপপদ-তৎপুরুষ: উপপদের (সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়যুক্ত পদের পূর্বে উপসর্গ বসে এবং অন্য শব্দও বসে। উপসর্গ ভিন্ন শব্দকে উপপদ বলে।) সহিত কৃদন্ত পদের যে সমাস হয় তাহার নাম উপপদ-তৎপুরুষ সমাস। আরো সহজ কথায়, বিশেষ্যের সহিত কৃদন্ত পদের সমাসই উপপদ-তৎপুরুষ সমাস। যেমন—জলদান করে যে=জলদ, ব্রহ্ম জানে যে=ব্রহ্মজ্ঞ, পাদ (পা) দিয়া পান করে যে=পাদপ, ধনকে জয় করিয়াছে যে=ধনঞ্জয়, ছেলেকে ভুলায় যাহা=ছেলেভুলান, হালুই (হালুয়া) করে যে=হালুইকর, বাজি করে যে=বাজিকর, ভূ তে চরে যে=ভূচর, উভ-তে চরে যে=উভচর, 'খ'-তে (আকাশে) চরে যে=খেচর। এইরূপ—শ্রুতিধর, যশস্কর, কৃতজ্ঞ, জাতিস্মর, কুম্ভকার, মধ্যবর্তী, দিবাকর, নিশাচর, হাতভাঙা, ধামাধরা, জগদ্দল, ভাতমারা, সর্বনাশা, দুইফোঁড় প্রভৃতি।

প্রাদি তৎপুরুষ: 'প্র' প্রভৃতি উপসর্গ ও কৃদন্ত পদ এবং অব্যয় ও নাম-পদের যে সমাস তাহার নাম প্রাদি তৎপুরুষ সমাস। যেমন, প্র (প্রকৃষ্ট) ভাত (জ্যোতিঃ)=প্রভাত, অভিগত মুখ=অভিমুখ, কু (কুৎসিত) পুরুষ=কাপুরুষ, অতি (অতিক্রান্ত) মানব (মানবকে)=অতিমানব, উদ্‌গত বেলাকে=উদ্বেল, উৎক্রান্ত শৃঙ্খলকে=উচ্ছৃঙ্খল, উদ্‌গত নিদ্রাকে=উন্নিদ্র, ইন্দ্রিয়কে অতিক্রান্ত=অতীন্দ্রিয়, কেন্দ্রকে উৎক্রান্ত=উৎকেন্দ্র ইত্যাদি।

[পাঁচ] অব্যয়ীভাব সমাস

যে-সমাসে অব্যয়পদ পূর্বে থাকে এবং পূর্বপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাহার নাম অব্যয়ীভাব সমাস। ইহাতে সমস্তপদটি অব্যয় হইয়া যায় এবং তাহা ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—কূলের সমীপে=উপকূল, কণ্ঠের সমীপে=উপকণ্ঠ (সামীপ্য অর্থে), বনের সদৃশ=উপবন, দ্বীপের সদৃশ=উপদ্বীপ (অভাব অর্থে) ভিক্ষার অভাব=দুর্ভিক্ষ, মিলের অভাব=গরমিল, ঝঞ্ঝাটের

অভাব = নিরুৎপাত (অভাব অর্থে), শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া = যথাশক্তি, সাধ্যকে অতিক্রম না করিয়া—যথাসাধ্য (অনতিক্রম অর্থে), দিনে দিনে = প্রতিদিন, ঘরে ঘরে = প্রতিঘর (বীপ্সার্থে), পাদ হইতে মস্তক পর্যন্ত = আপাদমস্তক, সমুদ্র হইতে হিমাচল পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল (পর্যন্ত অর্থে); কথার সদৃশ = উপকথা, জীবন পর্যন্ত = আজীবন, কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ, রূপের যোগ্য = অনুরূপ, অক্ষির সমীপে = প্রত্যক্ষ। এইরূপ—

সামীপ্য—উপনগরী, উপবন, উপকণ্ঠ, সমক্ষ, অনুষঙ্গ, উপকূল প্রভৃতি।

বীপ্সা—অনুক্ষণ, প্রতিক্ষণ, প্রত্যেক, প্রত্যহ, মাথাপিছু, ফিসন, মণপ্রতি, সেরকরা, হররোজ প্রভৃতি। [ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণ]

অভাব—হাভাত, বেকায়দা, গরমিল, নির্মক্ষিক, বেবন্দোবস্ত প্রভৃতি।

সাদৃশ্য—উপনয়ন, উপপত্নী, উপনেত্র, প্রতিধ্বনি, বিমাতা, প্রতিমূর্তি প্রভৃতি।

যোগ্যতা—অনুকূল, অনুগুণ, অনুরূপ প্রভৃতি। [গুণের যোগ্য = অনুগুণ]

অনতিক্রম—যথারীতি, যথাপূর্ব, যথাশক্তি, যথাশাস্ত্র, যথাসাধ্য, যথেচ্ছ, যথাজ্ঞান প্রভৃতি।

সীমা ও ব্যাপ্তি—আশ্বিনতক, রাতনাগাদ, আসমুদ্র, আমরণ, আজন্ম, আবাল্য, আজানু প্রভৃতি।

পশ্চাৎ—অনুগমন, অনুতাপ, উপেন্দ্র, অনুরথ, অনুপদ।

সম্মুখ—প্রত্যক্ষ প্রভৃতি।

আতিশয্য—হাপিত্যেশ প্রভৃতি, [পিত্যেশের (প্রত্যাশার) আতিশয্য] •

বৈপরীত্য—প্রতিপক্ষ প্রভৃতি।

আনুপূর্ব্য—অনুজ্যেষ্ঠ প্রভৃতি।

বাঙ্‌লা অব্যয়ীভাব—যা-খুশী, গরমিল, ফি-বছর, যা-পারি, আঘাটা প্রভৃতি।

[ছয়] বহুব্রীহি সমাস

যে-সমাসে পূর্ব বা উত্তরপদের কোনো প্রাধান্য থাকে না এবং সমাসনিষ্পন্ন পদটি (সমস্তপদটি) অন্য একটি পদের প্রাধান্য সূচিত করে, উহাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন—শূল পাণিতে যাহার = শূলপাণি (মহাদেব), বজ্র পাণিতে যাহার = বজ্রপাণি (ইন্দ্র), পীত অম্বর যাহার = পীতাম্বর (কৃষ্ণ), অহংকার নাই যাহার = নিরহংকার, মৎস্যের ন্যায় গন্ধ যাহার (স্ত্রী) = মৎস্যগন্ধা, ঊর্ণা নাভিতে যাহার = ঊর্ণনাভ, কেশে কেশে (ধরিয়া) যুদ্ধ = কেশাকেশি, লাঠিতে লাঠিতে (প্রহার করিয়া) যুদ্ধ = লাঠালাঠি, কানে কানে যে কথা = কানাকানি, আটহাত পরিমাণ যার = আটহাতি, মৃগের মতন নয়ন যাহার = মৃগনয়না, গায়ে হলুদ হয় যে উৎসবে = গায়েহলুদ, হায়া (লজ্জা) নাই যাহার = বেহায়া, নাই তার যার = বেতার, চৌ (চারিটি) হইয়াছে চির (খণ্ড) যাহার = চৌচির, সমান তীর্থ (গুরু) যাহার

৯। পূর্বাহ্নে হউক, অপরাহ্নে হউক, রঘুনাথের বাড়িতে গিয়া রঘুনাথকে ডাকিলে সাড়াশব্দ পাইবে না। (একদেশী সমাস)

১০। অম্লান চিরআরতি আলোক আঁখিযুগ জল জল। (নঞ্‌ তৎ)

১১। প্রভাকর-প্রভাতে প্রভাতে মনোলোভা। (উপপদতৎ)

১২। পাঁচবছরের ভ্রাতুষ্পুত্র ভাঙানো কাঠিগুলো ধরিয়া বসিয়াছিল। (অলুক সমাস)

১৩। বঙ্কিমবাবু 'বিষয়ান্তরে' ব্যাপৃত হওয়াতে তাহা হস্তান্তরে গেল। (নিত্যসমাস)

১৪। একটি ব্যথিত প্রশ্ন ক্লান্তক্লিষ্ট স্বর। (কর্মধা)

১৫। বেহুলা শশব্যস্তে জাগিয়া দেখিতে পাইলেন। (উপমান কর্মধা)

১৬। সিংহগড়ের দুর্গচূড়ায় পুরুষসিংহ উঠিল ত্বরায়। (উপমিত কর্মধা)

১৭। মনমাঝি, তোর বৈঠা নেরে,
আমি আর বাইতে পারি না। (রূপক কর্মধা)

১৮। পলান্ন আর ফুল্‌কো লুচি
কাঁপছে অবিশ্রান্ত। (মধ্যপ-সমাস)

১৯। সপ্তাহকালে সাতশত প্রাণ নিঃশেষ হয়ে গেল। (সমাহার দ্বিগু)

২০। নরবানরের হাতে অবশ্য মরণ। (দ্বন্দ্ব সমাস)

২১। ভূতের মতন চেহারা যেমন
নির্বোধ অতিঘোর। (বহুব্রীহি)

তৃতীয় পর্ব

প্রথম অধ্যায়

॥ শব্দপ্রকরণ ॥

<শব্দ ও পদের পার্থক্য>

অর্থযুক্ত বর্ণসমষ্টিকে শব্দ কহে। শব্দ ও পদের পার্থক্য এই যে, শব্দকে বিভক্তিযুক্ত করিলেই তাহা পদ হয়।

শব্দ দ্বিবিধ—প্রাতিপদিক বা নাম, এবং ধাতু। নামকে বিভক্তিযুক্ত করিলে তাহাকে নামপদ কহে এবং ধাতুকে বিভক্তিযুক্ত করিলে তাহাকে ক্রিয়াপদ কহে। ফলত, পদও দ্বিবিধ—নামপদ ও ক্রিয়াপদ। যেমন—'পিতা' একটি নাম, ও 'দেখ্' একটি ধাতু। এই উভয়ই শব্দ। কিন্তু 'পিতাকে দেখিব' বলিলে, 'পিতাকে' নামপদ ও 'দেখিব' ক্রিয়াপদ হইল। ইহার ফলে বিভক্তিও দুইপ্রকার হইতেছে—নামবিভক্তি ও ধাতুবিভক্তি।

বাঙলা ভাষায় নামপদে বহুক্ষেত্রে এবং ক্রিয়াপদেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভক্তি লুপ্ত হয়। সেক্ষেত্রে তাহা পদ বটে—কারণ, বিভক্তিযুক্ত হইলেও এইগুলির বিভক্তি পরে লুপ্ত হইয়াছে। যেমন—'বাড়ি চল্' এই বাক্যে 'বাড়ি' এইস্থলে সপ্তমী বিভক্তি আছে, তবে লুপ্ত হইয়াছে। 'চল্'—এখানেও বর্তমান অনুজ্ঞায় বিভক্তি লুপ্ত হইয়াছে।

বাঙলা ভাষার উপাদান বা শব্দভাণ্ডার

বাঙলা ভাষার উপাদান বলিতে আমরা ইহার শব্দসম্ভারকেই বুঝিয়া থাকি। যে-সকল শব্দ লইয়া এই ভাষার সৃষ্টি তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণী বা পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পাঁচপ্রকারের শব্দ লইয়া বাঙলা ভাষা গঠিত হইয়াছে: তদ্ভব, তৎসম, অর্ধতৎসম, দেশি ও বিদেশি। নিম্নে ইহাদের স্বরূপপ্রকৃতির পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি:

[ক] তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দ: এই 'তদ্ভব' শব্দগুলিকে লইয়াই মুখ্যত বাঙলা ভাষার সৃষ্টি—এইগুলিই বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ বা খাঁটি উপাদান। অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্যজাতি যে-ভাষায় কথা বলিত তাহার নাম বৈদিক সংস্কৃত। বিজয়ী আর্যের ভাষা, বিজিত অনার্যজাতি কর্তৃক গৃহীত হইবার ফলে, এবং অনার্য

সাধারণ পরিবর্তনধর্ম-অনুসারে, বংশপরম্পরাক্রমে, জনগণের মুখে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইতে থাকে। এই বিকৃত বা পরিবর্তিত বৈদিক সংস্কৃতেরই নাম হইল 'প্রাকৃত' অর্থাৎ দেশের লোকসাধারণের ভাষা। এই প্রাকৃতভাষাও আবার কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া 'অপভ্রংশ'-এর রূপ গ্রহণ করিল, এবং অপভ্রংশের আরো বিকৃতির ফলেই বাঙ্‌লা ভাষার উদ্ভব। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে-সকল বৈদিক সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃত ও অপভ্রংশ-স্তরের মধ্য দিয়া ক্রমশ রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্‌লা শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছে, উহারাই বাঙ্‌লা তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দ। 'তৎ' অর্থাৎ বৈদিক কথিত সংস্কৃত, তাহা হইতে 'ভব' অর্থাৎ উৎপত্তি যাহার, এই অর্থে 'তদ্ভব'।

এই শ্রেণীর শব্দগুলি প্রাচীন আর্যভাষার নিকট হইতে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বলিয়া ইহাদিগকে প্রাকৃতজ শব্দও বলা হইয়া থাকে। যেমন— সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' শব্দটি প্রাকৃতে 'কণ্‌হ'-রূপে পরিবর্তিত হইল, তাহা হইতে আরও পরিবর্তনের ফলে বাঙ্‌লা কান, কানু, কানাই [কান+আদরার্থে 'উ' কিংবা 'আই' প্রত্যয়যোগে] শব্দের উদ্ভব। এইরূপে, সংস্কৃত চন্দ্র>বাঙ্‌লা চাঁদ। তদ্রূপ, হস্ত> হত্থ>হাত; সন্ধ্যা>সঞ্‌ঝা>সাঁঝ; মধ্য>মজ্‌ঝ>মাঝ; সর্প>সপ্‌প>সাপ; মৃত্তিকা>মট্টিআ>মাটি; নৃত্য>নচ্চ>নাচ; অস্মে>অম্‌হে>আমি; শৃণোতি> সুণদি>শুণই>শুনে; অষ্টাদশ>অট্‌ঠারহ>আঠারো; গ্রাম>গাঁব>গাঁও, গাঁ। এইরূপ, খট্টু>খাট; ভক্ত>ভাত; গোষ্ঠ>গোঠ; পিত্তল>পিতল; দুহিতা>ঝি; গুম্ফ>গোঁফ; দংশ>ডাঁশ; চন্দ্রাতপ>চাঁদোয়া; চটক>চড়াই; আদর্শিকা> আরশি; আরত্রিক>আরতি; পিচ্ছিল>পিছল প্রভৃতি। এইগুলি খাঁটি বা মৌলিক বাঙ্‌লা শব্দ। প্রাকৃত হইতে যে-সকল 'দেশি' ও 'বিদেশি' শব্দ বাঙ্‌লায় প্রবেশ করিয়াছে, একহিসাবে তাহাদিগকেও 'তদ্ভব' বা 'প্রাকৃতজ' বলিতে পারা যায়।

[খ] **তৎসম শব্দ:** বাঙ্‌লা ভাষা তাহার উৎপত্তিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিককাল পর্যন্ত আবশ্যকমতো যে সকল শব্দ সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করিয়াছে এবং উচ্চারণে যাহাদের কোনরূপ বিকৃতি ঘটে নাই—এইরূপ শব্দগুলিই 'তৎসম' নামে পরিচিত। 'তৎসম' অর্থে সংস্কৃতসম শব্দ। ['সংস্কৃত' আদি আর্যভাষা বৈদিকেরই একটি অর্বাচীনতর রূপভেদ-মাত্র। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেই সাহিত্যিক ভাষারূপে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঋগ্বেদের ভাষা যখন পুরাতন হইয়া আসিতেছিল, সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য হইয়া উঠিতেছিল এবং লোকমুখে ইহার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তখন ভাষার গতিরোধ করা অসম্ভব দেখিয়া সে যুগের পণ্ডিতজন 'মৌখিক ভাষাকে ত্যাগ করিয়া প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার চর্চায় ও তাহার রক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন, তাহার ব্যাকরণ লিখিলেন। এই শিষ্ট ও সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃত নামে খ্যাত হইল।' প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনি ইহাকে 'লৌকিক' নামে চিহ্নিত করিয়াছেন, এবং পরে ইহা 'দেবভাষা' নামেও অভিহিত হইতে থাকে। সংস্কৃত ভাষা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের মানসিক সংস্কৃতির বাহন হইয়া উঠে।]

আদিআর্যভাষার যে-সকল শব্দ নানাযুগের রূপান্তরের মধ্য দিয়া বিকৃত অবস্থায় বাঙ্‌লায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের অবিকৃত মূলরূপ মিলে সংস্কৃতে। সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডার বিপুল—যখনই প্রয়োজন বোধ করিয়াছে, বাঙ্‌লা ভাষা সংস্কৃত হইতে শব্দরাজি ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। তৎভব শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দের পার্থক্য এই যে, তদ্ভব শব্দগুলি বৈদিক শব্দ হইতে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়া বিকৃত অবস্থায় বাঙ্‌লায় আসিয়াছে। কিন্তু তৎসম শব্দগুলি বিভিন্ন যুগের রূপপরিবর্তনের ধারাপথে বাঙ্‌লায় আসে নাই, লৌকিক সংস্কৃত ভাষা হইতে সরাসরি ইহারা বাঙ্‌লা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। তৎসম শব্দ ভাষায় ঋণস্বরূপ গৃহীত, তদ্ভব শব্দগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত—উভয়ের উৎপত্তির ইতিহাস ভিন্ন। কতকগুলি তৎসম শব্দের উদাহরণ: কৃষ্ণ, চন্দ্র, হস্ত, মস্তক, মৃত্তিকা, রাত্রি, সন্ধ্যা, মধ্য, ধর্ম, কর্ম, কার্য, বৃদ্ধ, বৃত্ত, বৃক্ষ, পিতা, মাতা ইত্যাদি।

[গ] **অর্ধতৎসম শব্দ:** যে-সকল সংস্কৃত শব্দ ভাষায় ঋণস্বরূপ গৃহীত হইবার পর লোকমুখে উচ্চারণে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মূলরূপ বিশুদ্ধ রাখিতে পারে নাই, এইরূপ বিকৃত সংস্কৃত শব্দকেই বলা হয় অর্ধ-তৎসম। তৎসম শব্দের বিকারেই অর্ধ-তৎসম শব্দের সৃষ্টি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এইরূপ শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রাম্য উচ্চারণে এবং কবিতার ভাষায় অর্ধ-তৎসম শব্দের ব্যবহার খুব বেশি। উদাহরণ: সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' শব্দটি বাঙ্‌লায় তৎসম, ইহা হইতে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়া রূপ পরিবর্তনের ফলে আমরা পাইতেছি 'কান', 'কানু' বা 'কানাই' শব্দ – বাঙ্‌লা শব্দভাণ্ডারে যাহার নাম তদ্ভব বা প্রাকৃতজ। কিন্তু সংস্কৃত শব্দ 'কৃষ্ণ' বাঙ্‌লায় গৃহীত হইবার পর লোকমুখে তাহার বিকৃতি ঘটিবার ফলে একটি নূতন রূপ দাঁড়াইয়াছে 'কেষ্ট'—এই শব্দটি বাঙ্‌লায় অর্ধ তৎসম। তদ্রূপ, সংস্কৃত 'গৃহিণী' হইতে তদ্ভব 'ঘরণী' কিন্তু অর্ধতৎসম হইল গিন্নি বা গিন্নী। এইভাবে নিমন্ত্রণ>নেমন্তন্ন; শ্রদ্ধা>ছেদ্দা; বৈষ্ণব>বোষ্টম; মিত্র>মিত্তির; চন্দ্র>চন্দর; মহোৎসব>মোচ্ছব; গ্রাম> গেরাম; প্রণাম>পেন্নাম। এইরূপ, শ্রী>ছিরি; প্রসাদ>পেসাদ; মূর্খ>মুখ্যু; শ্রাদ্ধ>ছেরাদ্দ; গাত্র>গতর> গা (তদ্ভব); যত্ন>যত্নি প্রভৃতি অর্ধ-তৎসম শব্দের উদ্ভব হইয়াছে।

[ঘ] **দেশি শব্দ:** বাঙ্‌লা ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের মূল প্রতিরূপ সংস্কৃতে মিলে না। এই জাতের শব্দগুলি দ্রাবিড় এবং কোলভাষা হইতেই বাঙ্‌লায় প্রবেশ করিয়াছে—ইহাদিগকে বলা হয় 'দেশি' শব্দ। ভারতের সর্বত্র গৃহীত শিষ্টজনের ভাষায় এইসকল শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না—বাঙ্‌লাদেশের প্রাচীন অধিবাসী দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক জাতির ভাষার নিকট-সম্পর্কে আসার ফলেই এই অনার্য শব্দগুলি আর্যভাষা বাঙ্‌লায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে। এইগুলি বাঙ্‌লা ভাষার মৌলিক শব্দ নয়, ইহারা আগন্তুক শব্দ। বিদেশি শব্দগুলিও এই 'আগন্তুক' পর্যায়ে পড়ে। বাঙ্‌লা ভাষায় যে-সব শব্দ ভারতীয় আর্যেতর

হইতে উদ্ভূত নয়, অনার্য কিংবা ভারতের বাহিরে প্রচলিত ইন্দোয়ুরোপীয় কিংবা সেমীয় ভাষা হইতে গৃহীত সে-সকল শব্দই বাঙ্‌লায় 'আগন্তুক' নামে অভিহিত। তদ্ভব, তৎসম এবং অর্ধতৎসম শব্দগুলিই বাঙ্‌লা ভাষার যথার্থ মৌলিক উপাদান।

অবশ্য অনেকগুলি 'দেশি' শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়াই বাঙ্‌লায় প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু ভাষার মূল বিচার করিয়া শব্দের শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে এইজাতীয় শব্দকে প্রাকৃতজ বা তদ্ভব না বলিয়া 'দেশি'ই বলিতে হইবে। কারণ, এগুলি মূলত আর্যশব্দ নয়। কিন্তু একজন ভাষাতাত্ত্বিক বলিতেছেন [অধ্যাপক সুকুমার সেন], যে-সব অনার্য শব্দ সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হইবার পর প্রাকৃত স্তরের ভিতর দিয়া বাঙ্‌লায় আসিয়াছে সেগুলিকে 'দেশি' না বলিয়া 'তদ্ভব' বা 'প্রাকৃতজ'ই বলিতে হইবে। বাঙ্‌লা ভাষার সৃষ্টির পর যে-সব আর্যশব্দ বাঙ্‌লায় গৃহীত হইয়াছে, উক্ত ভাষাতাত্ত্বিকের মতে সেগুলিই যথার্থ 'দেশি' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। কতকগুলি 'দেশি' শব্দের উদাহরণ : গাড়ী, ঘুড়ী, ঝাড়, ঝাউ, ঢিল, ঝাণ্ডা, ঝান্নু, ঝোপ, টোপর, ছাল, পেট, কামড়, ডাগর, ঢেউ, ডিঙা, ঝাঁটা, ঝোল, ঝিঙা, ডাহ', ডাঁসা, কদলী, কলা, তামলী ইত্যাদি।

[ঙ] **বিদেশি শব্দ :** বাঙ্‌লাভাষার উৎপত্তির পর নানা বিদেশি জাতির ভাষা হইতে যে সকল শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে সেগুলিই বাঙ্‌লার বিদেশি উপাদান। বহু প্রাচীনকাল হইতেই কয়েকটি বিদেশি শব্দ ভারতীয় আর্যভাষা সংস্কৃতে স্থানলাভ করিয়াছে এবং ইহাদেরই কয়েকটি প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাঙ্‌লায় আসিয়াছে। এইরকম শব্দগুলিকে 'বিদেশি' হইলেও, 'আগন্তুক' আখ্যা না দিয়া, 'প্রাকৃতজ' বা 'তদ্ভব' বলাই ভালো। যেমন—গ্রীক 'দ্রাখ্‌মে' হইতে সংস্কৃতে 'দ্রম্য', তাহা হইতে প্রাকৃতে 'দম্ম', তাহা হইতে বাঙলায় 'দাম'। প্রাচীন পারসিক 'মোচক'>প্রাকৃত মোচিও>বাঙ্‌লা মুচি ; পহ্‌লবী 'পোস্ত' [লিখিবার চামড়া]>সংস্কৃত পুস্তিকা>প্রাকৃত পোত্থিআ> বাঙ্‌লা পুঁথি, পুথি ; গ্রীক্ 'সুরিংকস্'>সংস্কৃত সুড়ঙ্গ>বাঙ্‌লা সুড়ঙ্গ, সুড়ঙ্। গ্রীক 'গোনস' [gonos]>সংস্কৃত কোণ>বাঙ্‌লা কোণ ; গ্রীক্ 'কেণ্ট্রণ্' [Kentron]> সংস্কৃত কেন্দ্র>বাঙ্‌লা কেন্দ্র [তৎসম] ইত্যাদি।

মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর হইতেই বাঙ্‌লা ভাষায় অধিক পরিমাণ বিদেশি শব্দের আমদানী হইতে থাকে। পাঁচ শ' বছরেরও অধিককাল ধরিয়া মুসলমানেরা এদেশ শাসন করে এবং মুসলমান আমলে ফারসী রাজভাষা ছিল বলিয়া বাঙ্‌লা ভাষার উপর তাহার কম প্রভাব পড়ে নাই। বাংলা ভাষায় প্রায় আড়াই হাজার শব্দ হইল ফারসী। এই ফারসীর মারফতে কয়েকটি আরবী এবং তুর্কী শব্দও ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্‌লায় কয়েকটি ফারসী শব্দের নমুনা : আমীর, ওমরা, উজীর, মালিক, হুজুর, জখম, তাঁবু, তোপ, বন্দুক, খাজনা, দারোগা, মজুর, বীমা, হিসাব, গ্রেপ্তার, মোকদ্দমা, নালিশ, দরখাস্ত, দলিল, আদালত, কবর, কাফের, নমাজ, মসজিদ, মক্তব [illegible]

কোর্মা, খাতা, চশমা, চাবুক, ছবি, জামা, মলম, মিছরি, রুমাল, শরবৎ, লাগাম, পোশ, হালুয়া, হুঁকা ইত্যাদি।

খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পোর্তুগীজরা বাঙ্‌লাদেশে বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে আসে। ইহার ফলে প্রায় শতাধিক পোর্তুগীজ শব্দ বাঙ্‌লায় প্রবেশ করিয়াছে; যেমন—আনারস, তামাক, চাবি, বালতী, ইস্ত্রী, কামরা, গুদাম, নীলাম, ক্রুশ, যীশু, পেয়ারা, পেঁপে, কপি, বোতল, বোতাম, ইত্যাদি। তাসখেলার বিষয়ে কয়েকটি শব্দ ওলন্দাজ ভাষা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে; যেমন—হরতন, রুইতন, ইস্কাবন (কিন্তু 'চিড়িতন' ভারতীয় শব্দ), তুরুপ। আর-একটি ওলন্দাজ শব্দ হইতেছে 'ইস্ক্রুপ'। কার্তুজ, কুপন, রেস্তোরাঁ কথাগুলি ফরাসী। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বাঙ্‌লাদেশ ইংরেজজাতির বশ্যতা স্বীকার করিল। ফলে য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বাঙালির উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। বাঙ্‌লা ভাষার উপর ইংরেজির প্রভাব কতখানি বিস্তৃত তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। এখানে সামান্য কয়েকটি ইংরেজি শব্দের নমুনা দিতেছি: আপিস, ইস্কুল, বেঞ্চি, ডাক্তার, লাট, পুলিস, গেলাস, লণ্ঠন, গারদ, সান্ত্রী, কৌশলী, জাঁদরেল, লজঞ্চুস, বাক্স ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন ইংরেজির মধ্য দিয়া এশিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানা দেশের ভাষার কতকগুলি শব্দ বাঙ্‌লায় প্রবেশ করিয়াছে।

ইহা ছাড়া, বাঙ্‌লা ভাষায় আরো একজাতের শব্দ আছে, যাহা 'মিশ্রশব্দ' (Hybrids) নামে পরিচিত। সাধারণত বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দের সংযোগে অথবা একশ্রেণীর শব্দের সহিত অন্যশ্রেণীর প্রত্যয়াদির মিশ্রণে ইহাদের সৃষ্টি। যেমন—রাজাউজীর, হাটবাজার, হেডপণ্ডিত, পুলিশসাহেব, বেটাইম ডেপুটিগিরি ইত্যাদি।

একহাজার বছরের অধিককাল হইল প্রাকৃতের পরিবর্তনের ফলে বাঙ্‌লা ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। তদ্ভব, তৎসম ও অর্ধতৎসম ইহার মৌলিক উপাদান। তদুপরি, বাঙ্‌লা ভাষা অনার্য কোল, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষা হইতে, বিদেশি ফারসী, পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজি হইতে অনেক শব্দ গ্রহণ করিয়াছে—এইগুলি ভাষার আগন্তুক উপাদান। মৌলিক ও আগন্তুক শব্দের সমবায়ে বাঙ্‌লা ভাষার ভাণ্ডার অনেকখানি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এ ভাষার অবস্থা এখন বেশ বাড়বাড়ন্ত। বাঙালির ভাষা তাহার যথার্থই গৌরবের বস্তু।

নিম্নে আরো কতকগুলি বিদেশি শব্দের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল:

অস্ট্রেলিয়া—ক্যাঙারু প্রভৃতি।

ফরাসী—বুরুশ, বুর্জোয়া প্রভৃতি।

চীনা—লুচি, চা, চিনি প্রভৃতি।

তুর্কী—বাবু, লাশ, চাকু, কোর্মা, গালিচা, দারোগা, মুচলেকা প্রভৃতি।

ফারসী—বাগিচা, বালিশ, কাগজ, জামা, রুমাল, আইন, [illegible] কলম প্রভৃতি।

পোর্তুগীজ—আলমারি, পেরেক, সাবান, মিস্ত্রী, চাবি, বিস্কি প্রভৃতি।
পেরু—কুইনাইন প্রভৃতি।
ওলন্দাজ—টেক্কা প্রভৃতি।
ইংরেজি—গ্লাস, বেঞ্চি, রেল, মাস্টার, স্কুল, চেয়ার, বল, ডাক্তার প্রভৃতি।
জাপানী—যুযুৎসু, রিক্সা, হারিকিরি প্রভৃতি।
গুজরাটী—হরতাল।
তামিল—চুরুট প্রভৃতি।
আফ্রিকীয়—জেব্রা প্রভৃতি।
বর্মা—লামা, লুঙ্গি প্রভৃতি।
হিন্দী—কচুরী, চানাচুর প্রভৃতি।

॥ অনুশীলনী ॥

১। তদ্ভব, তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দ কাহাকে বলে উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। (উ. মা. ১৯৬০)

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির শ্রেণীবিভাগ কর :

টেলিগ্রাফ, পেরেক, আওয়াজ, তলব, কেষ্ট, পেন্নাম, ঘোমটা, মোম, লাইব্রেরী, দাম, পূজা, পুতুল, বছর, জমিদার, গোলাম, বারুদ, মোচ্ছব, দরিয়া, খুন, কাবু, গামলা।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে তৎসম শব্দগুলির পরিবর্তে তদ্ভব বা দেশি অথবা বিদেশি শব্দ লেখ, এবং তদ্ভব, দেশি বা বিদেশি শব্দের পরিবর্তে তৎসম শব্দ লেখ :

জানালা, শ্রম, ভিখারী, কামরা, অনুগ্রহ, পাখা, নম্বর, নিকুঞ্জ, তলব, মিঠা, সিন্ধ, কলম, ফরিয়াদ, মেরামত, গীর্জা, শৈথিল্য, ডিঙি, পাস, শ্রবণ, বাঘছাল গামছা, আবার, দগ্ধ, ডোবা, মাস্টার, কৃশাঙ্গ, হরণ, কার্য, প্রসূন, সোজা।

৪। 'মৌলিক ও আগন্তুক শব্দের সমবায়ে বাঙ্‌লা ভাষার ভাণ্ডার অনেকখানি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।' —আলোচনা কর।

[গ] ধ্বন্যাত্মক শব্দ

কতকগুলি অর্থহীন ধ্বনির সমবায়ে বাঙ্‌লা ভাষায় অসংখ্য অর্থপূর্ণ শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশেষ রকমের ধ্বনিই এইসকল শব্দের প্রাণ বলিয়া শব্দগুলিকে 'ধ্বন্যাত্মক' শব্দ বলা হইয়া থাকে। এই জাতের শব্দের সাহায্যে বিচিত্র রকমের ভাব

সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা যায়। বাঙ্‌লা ভাষার বর্ণনশক্তি ইহাদের দ্বারা অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের দৃষ্টান্ত :

কন্‌কনে, কর্‌করে, খট্‌খটে, খিট্‌খিটে, কচ্‌মচ্, কল্‌কল্, কুচ্‌কুচ্, খল্‌খল্, খিল্‌খিল্, ধুক্‌ধুক্, কচ্‌কচ্, খ্যাচখ্যাচ, ক্যা-ক্যা, শোঁ শোঁ, সাঁ সাঁ, শন্‌শন্, বন্‌বন্, ঝির্‌ঝির্, চুক্‌চুক্, খড়াস্‌খড়াস্, পত্‌পত্, তুল্‌তুলে, ঢল্‌ঢলে, ধব্‌ধবে, লিক্‌লিকে, ড্যাব্‌ডেবে, ভড়াক্, ধক্, কট্, চট্, খাঁক্, পট্, ফোঁস্, তিড়িং, চিক্, ভোঁস্, হুস্, ঘ্যাঁচ্, টকাস্ ইত্যাদি। নানান ধ্বনির অনুসরণেই প্রথমে এইসকল শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু এমন-সব ধ্বন্যাত্মক শব্দ পরে পরে সৃষ্ট হইয়াছে, ধ্বনির সহিত যাহাদের দ্বারা দ্যোতিত ভাবের বিশেষ কোনো সম্পর্কই নাই; যেমন—খাঁ খাঁ, ছম্‌ছম্, ধূ ধূ ইত্যাদি। ধ্বনিবাচক শব্দের কখনো কখনো একক প্রয়োগ হয়। যথা—ফোঁস, শপাং, ঢিপ, ঠং, বোঁ প্রভৃতি। কখনো-বা অবিকৃত দ্বিত্ব দেখা যায়। যথা—গুম্‌গুম্, চিন্‌চিন্, ঝুপঝুপ, টিকটিক্ প্রভৃতি। আবার, কখনো-বা বিকৃত দ্বিত্বও দেখা যায়। যথা—ধুপ্‌ধাপ, টগ্‌বগ, টকাটক্, ঝিনিঝিনি, ধমাধম্, চিড়বিড় প্রভৃতি।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ

ছট্‌পট্—লোকটি যন্ত্রণায় ছট্‌পট্ করিতে লাগিল।

কন্‌কন্—শীতে আমার হাত-পা কন্‌কন্ করিতে লাগিল।

কল্‌কল্, ছল্‌ছল্—কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ শব্দে পর্বতের গাত্র বাহিয়া তটিনী বহিয়া যাইতেছে।

ঝন্‌ঝন্—বাসনগুলি ঝন্‌ঝন্ শব্দে মেঝের উপর পড়িল।

খিল্‌খিল্—মেয়েটি খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

চক্‌চক্—নদীর জলের উপর সূর্যের কিরণসমূহ চক্‌চক্ করিতে লাগিল।

গিজ্‌গিজ্—রথযাত্রায় রাস্তায় লোক গিজ্‌গিজ্ করিতেছিল।

টগ্‌বগ—কেটলিতে তখন জল টগ্‌বগ করিয়া ফুটিতেছিল।

হন্‌হন্—তুমি হন্‌হন্ করে এখন কোথা চলেছ?

ধূ ধূ—মধ্যাহ্নে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে।

থৈ থৈ—'দিক্‌চক্ররেখাহীন মহাসমুদ্র চারিদিকে থৈ থৈ করছে।'

—প্রবোধকুমার

ঘুট্‌ঘুট্—অমাবস্যার রাত্রির অন্ধকার ঘুট্‌ঘুট্ করছে।

ঝম্‌ঝম্—তখন ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি আরম্ভ হল।

ফুটফুটে—ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় প্লাবিত ধরণীর অপূর্ব মূর্তি আমাদের চোখে পড়িল।

বিড়বিড়—তুমি বিড়বিড় করে কী বলছ?

ধেইধেই—বালকটি আনন্দে ধেইধেই করিয়া নাচিতে লাগিল।

টাপুরটুপুর—'বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর নদে এল বান'।

হুড়হুড়—লোকগুলো হুড়হুড় করে ঘরে ঢুকলো।

ঝরঝর—ঝরঝর ধারে মেঘ বিজুলি হানে। —রবীন্দ্রনাথ।

থরথর—ভয়ে সে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

নিম্নলিখিত পদ্যটি লক্ষ্য কর :

(ক) এই দেখ, 'জলজল্' 'টলটল্' 'ঢলঢল্'।
নাই তীর নাই তল, এই চোখ 'ছলছল্'। —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

(খ) গান 'গুন্‌গুন্' মঞ্জীর 'রুণ্‌রুণ্'
বোল তার 'ফিস্‌ফিস্' চুল তার 'মিশ্‌মিশ্' — ঐ

শব্দদ্বৈত বা দ্বিরুক্ত শব্দের অর্থ

বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম প্রভৃতি শব্দের দ্বিত্বরূপে অবস্থান বাঙ্‌লা ভাষার একটি লক্ষণীয় বিশিষ্টতা— শব্দের এইরূপে অবস্থানকেই (reduplication of forms) শব্দদ্বৈত বলা হয়। বাঙ্‌লা শব্দদ্বৈতের বিধি বিধান বিচিত্র। একই শব্দের পুনরাবৃত্তি, একটি শব্দের সঙ্গে সমার্থক বা অনুরূপ অর্থযুক্ত আর-একটি শব্দের সংযোগ, কিংবা অনুকার অথবা বিকারজাত শব্দযোগে শব্দদ্বৈত হইয়া থাকে। এই দ্বিরুক্ত শব্দগুলি কখনো সাধারণ অর্থের, কখনো বা উহাদের প্রয়োগবৈচিত্র্যে বিভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জক হয়। আবার, অনেক সময়ে উহাদের অর্থটি এত সূক্ষ্ম যে উহা কেবল অনুমানের সাহায্যেই নির্ধারিত হয়। দ্বিরুক্ত শব্দের উদাহরণ :

তলে-তলে, মানে-মানে, চোখে-চোখে, ভালোয়-ভালোয়, উপরে-উপরে, খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়, হাঁড়ি কুঁড়ি, জল টল, আঁট সাঁট, অলি-গলি, বকা-ঝকা প্রভৃতি।

নিম্নে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে শব্দদ্বৈতের বা দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ দেখান হইতেছে :

(ক) পৌনঃপুনিকতা বা পুনরাবৃত্তি বুঝাইতে : দিনে-দিনে, পাতায়-পাতায়, ঘরে-ঘরে, পথে পথে প্রভৃতি।

প্রয়োগ—'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির'।

(খ) সাদৃশ্য বা ঈষদ্ভাব বুঝাইতে : জ্বর-জ্বর, খুশি-খুশি, হাসি-হাসি, শীত-শীত প্রভৃতি

প্রয়োগ—আজকে সকাল থেকেই বেশ শীত শীত করছে।

(গ) ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা বুঝাইতে : হেসে-হেসে, নেচে-নেচে, যেতে-যেতে, চলতে-চলতে প্রভৃতি।

প্রয়োগ—বালিকাটি কেমন নেচে-নেচে বেড়াচ্ছে।

(ঘ) অনুকার-বিকারমূলক শব্দদ্বৈতে মূলশব্দের স্বরবর্ণাদির এবং ব্যঞ্জন-বর্ণাদির পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। যথা—টুপুর-টাপুর, টুপ্-টাপ, হুড়্-দাড়, জল-টল, ঘোড়া-টোড়া, বই-টই প্রভৃতি।

প্রয়োগ—'টুপুর-টাপুর বৃষ্টি পড়ে'।

(ঙ) অবজ্ঞা অর্থে—ভাত-কাত, আজে-বাজে প্রভৃতি।

প্রয়োগ—আজে-বাজে কী সব কথা বলছো।

(চ) বীপ্সা অর্থে—ঘরে-ঘরে, ফুলে-ফুলে, বছর-বছর, জনে-জনে, দিনে-দিনে, ক্ষণে-ক্ষণে প্রভৃতি।

প্রয়োগ—ক্ষণে-ক্ষণে তাহার মতির পরিবর্তন ঘটে।

(ছ) সাদৃশ্য বুঝাইতে—মুখে-মুখে, চোখে-চোখে, হাতে-হাতে, কাঠে-কাঠে প্রভৃতি।

প্রয়োগ—শাশুড়ী ও বৌ—দু'জনেই ঝগড়াটে, এবারে বেশ কাঠে-কাঠে মিলেছে।

(জ) নিরবচ্ছিন্নতা বুঝাইতে—পাশে-পাশে, পিছে-পিছে, উপরে-উপরে প্রভৃতি।

প্রয়োগ—রাজার অনুচরেরা সর্বদা রাজার পাশে-পাশে থাকে।

(ঝ) পৌনঃপুন্যবাচক—হেসে-হেসে, গলায়-গলায়, চলাচলি, গড়াগড়ি প্রভৃতি।

প্রয়োগ—বন্ধুটি হেসে-হেসে বল্লে।

(ঞ) তীব্র আকাঙ্ক্ষা—টাকা-টাকা ; পুতুল-পুতুল ; জল-জল প্রভৃতি।

প্রয়োগ—মেয়েটি সর্বদাই পুতুল-পুতুল করছে।

(ট) আসন্নতাবাচক—মর-মর ; যায়-যায় ; কাঁদ-কাঁদ প্রভৃতি।

প্রয়োগ—লোকটি তখন মর-মর।

(ঠ) পারস্পরিকতাবাচক—টানাটানি, চাওয়া-চাওয়ি, মারামারি প্রভৃতি।

প্রয়োগ—সে আমাকে টানাটানি করে সেখানে নিয়ে গেল।

[ঘ] যুগ্মশব্দ

বাঙ্লা ভাষায় যুগ্মশব্দ বা জোড়া শব্দের বহুল প্রচলন দেখা যায়। ইহারা প্রায় সমার্থক। কখনো-বা উহারা বিপরীতার্থকও বটে। এগুলি এমনই শব্দ যে, ভিন্ন অর্থ বা বিকৃত বা অবিকৃত পুনরাবৃত্তি উহাদের মধ্যে নাই। এজন্য উহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে যুগ্মশব্দ। এই যুগ্মশব্দগুলি তিন প্রকারের :

(১) সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক, (২) বিপরীতার্থক এবং (৩)

১। সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক যুগ্মশব্দ:

হাসিখুশি, ভুলভ্রান্তি, ঘরবাড়ি, আলাপপরিচয়, চালাকচতুর, কাজকর্ম, আপদবিপদ, পাহাড়পর্বত, কূলকিনারা, সুখশান্তি, ধ্যানধারণা, ছেলেছোকরা, ঠাট্টাতামাসা, রীতিনীতি, জগৎসংসার, পোষাকপরিচ্ছদ, আশাভরসা, ধনদৌলত, বন্ধুবান্ধব, রাজাবাদশা, লোকজন, ভাবগতিক প্রভৃতি

প্রয়োগ—(ক) এ বিষয়ে ভুলভ্রান্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

(খ) সমুদ্রের কূলকিনারা কিছুই মিলে না।

২। বিপরীতার্থক যুগ্মশব্দ: আকাশপাতাল, দোষগুণ, ভালোমন্দ, সুখদুঃখ, আগাগোড়া, মানঅপমান, ইতরভদ্র, পাপপুণ্য, কেনাবেচা, মরণবাঁচন, দেনাপাওনা, হাসিকান্না, সত্যমিথ্যা, অগ্রপশ্চাৎ, দিনরাত, জন্মমৃত্যু, রাজাপ্রজা প্রভৃতি।

প্রয়োগ সে আমার কথা শুনে আকাশপাতাল ভাবতে লাগলো।

৩। বিভিন্নার্থক যুগ্মশব্দ: কালিকলম, চোরচোর, ঘরদোর, আইন-আদালত, জামাকাপড়, অন্নবস্ত্র, চালডাল, আলনা চিরুনী, জলবায়ু, খাতাপত্র, বিছানা-পত্র, চালডাল, তরুলতা প্রভৃতি।

প্রয়োগ—কোন্ দেশের তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

॥ অনুশীলনী ॥

১। 'শব্দদ্বৈত' কাহাকে বলে? উহা কী কী ভাবে নিষ্পন্ন হয়?

২। নিম্নলিখিত অর্থব্যঞ্জক শব্দদ্বৈতগুলির উদাহরণ দাও:

(ক) পুনরাবৃত্তি বুঝাইতে; (খ) ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা বুঝাইতে; (গ) অবজ্ঞা অর্থে; (ঘ) সাহিত্য বুঝাইতে; (ঙ) নিয়মানুবর্তিতা বুঝাইতে।

৩। নিম্নলিখিত শব্দদ্বৈতগুলি কী কী অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা নির্দেশ কর:

পাশেপাশে, মুখেমুখে, ঘরেঘরে, টুপ্‌টাপ্, হেসেহেসে।

৪। বাক্য রচনা কর: নেচে-নেচে, হুড়্‌হুড়, খনে-খনে, পিছে-পিছে, মর-মর, ভাই-ভাই।

৫। সমার্থক, বিপরীতার্থক এবং ভিন্নার্থক যুগ্মশব্দের [illegible] করিয়া [illegible]।

দ্বিতীয় অধ্যায়

[ক] সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়

ধাতুর সহিত যে-সকল প্রত্যয় যোগ করিয়া নূতন শব্দ গঠিত হয় সেইগুলিরই নাম 'কৃৎপ্রত্যয়'। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি কৃদন্ত নামে পরিচিত। বাঙ্‌লা ভাষায় কৃৎপ্রত্যয়গুলি সাধারণত প্রাকৃতের প্রত্যয় বা শব্দ হইতে উদ্ভূত। তবে কয়েকটি খাঁটি সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়ও বাঙ্‌লা ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। কৃদন্ত শব্দগুলি বিশেষ্য কিংবা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়।

কৃৎপ্রত্যয়ের সাহায্যে মৌলিক শব্দ (Primitive word) গঠিত হয়।

তব্য অনীয় য, ক্যপ্, ণ্যৎ।

'উচিত', 'কর্তব্য' এই অর্থে ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে উপরিলিখিত প্রত্যয়গুলি হয়। ক্রমিক উদাহরণ; যথা—

তব্য—গম গন্তব্য, ভূ—ভবিতব্য, দৃশ্—দ্রষ্টব্য, দা—দাতব্য, কৃ—কর্তব্য, হন্—হন্তব্য।

প্রয়োগ: (ক) তিনি আপন গন্তব্য পথে চলিলেন।

(খ) এখানে দ্রষ্টব্য অনেক কিছু আছে।

অনীয় গম্ গমনীয়, কৃ—করণীয়, ভক্ষ্—ভক্ষণীয়, পূজ্—পূজনীয়, বৃ—বরণীয়, দৃশ্—দর্শনীয়।

প্রয়োগ: আমার এ বিষয়ে করণীয় কী আছে?

য -সহ্—সহ্য, লভ্—লভ্য, গৈ—গেয়, হা—হেয়, রম্—রম্য।

প্রয়োগ: (ক) গেয় পদগুলি তিনি অতি যত্নসহকারে লিখিলেন।

(খ) বালকটির সহ্যগুণ সত্যই প্রশংসনীয়।

ক্যপ্— কৃ—কৃত্য, শাস্—শিষ্য, ভৃ—ভৃত্য।

প্রয়োগ: (ক) বাল্মীকির শিষ্য মোরা নাহি চিনি পিতা। —কৃত্তিবাস

(খ) রাজা তখন ভৃত্যেরে কহিলেন ডাকি।

ণ্যৎ—কৃ—কার্য, বচ্—বাচ্য (যাহা বলা উচিত), গ্রহ্—গ্রাহ্য, ভুজ্—ভোগ্য (ভোগের সামগ্রী) ও ভোজ্য (আহারের সামগ্রী), বচ্—বাক্য (সম্পূর্ণ অর্থযুক্ত পদসমষ্টি)।

প্রয়োগ—কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন? —কৃত্তিবাস

ক্ত—অতীতকাল বুঝাইতে কর্মবাচ্যে এবং সময়ে সময়ে কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় হয়।

গম্—গত, নম্—নত, সৃজ্—সৃষ্ট, মৃ—মৃত, কৃ—কৃত, জ্ঞা—জ্ঞাত, গৈ—গীত, নী—নীত। প্র-ভা—প্রভাত, উৎ-ই—উদিত।

প্রয়োগ—(ক) বিভাবরী প্রভাত উদিত ভানুমান। —কৃত্তিবাস

(খ) দুই ভাই গীত গায় বাজাইয়া বীণা। —ঐ

শতৃ—বর্তমানকালে ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে শতৃ (অৎ) প্রত্যয় হয়। 'শতৃ' প্রত্যয়ের ব্যবহার বাংলায় খুবই বিরল।

গম্—গচ্ছৎ, জ্বল—জ্বলৎ, পঠ্—পঠৎ, চল্—চলৎ।

প্রয়োগ (ক) এই ব্যাপারটি তাঁহার পঠদ্দশায় ঘটিয়াছিল।

(খ) আমার এখন চলচ্ছক্তি নাই।

শানচ্—বর্তমানকালে কর্তৃবাচ্যে ও কর্মবাচ্যে ধাতুর উত্তর শানচ্ (মান, আন, ঈন) প্রত্যয় হয়।

বিদ্—বিদ্যমান, শী—শয়ান, বৃত্—বর্তমান, আস্—আসীন, মৃ—ম্রিয়মাণ, যজ্—যজমান।

প্রয়োগ—অগ্নিশুদ্ধা হইলেন দেব বিদ্যমানে। —কৃত্তিবাস

ক্তি—অনট্ ধাতুর উত্তর ভাব অর্থে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়।

গম্—গতি, গৈ—গীতি, দৃশ্—দৃষ্টি, মন্—মতি, তৃপ্—তৃপ্তি, নী—নীতি, হা—হানি স্মৃ—স্মৃতি

প্রয়োগ সব কোন জন্মে মোর না কর দুর্গতি। —কৃত্তিবাস

অনট্—কৃ—করণ, গম্ গমন, দৃশ্—দর্শন, অর্প—অর্পণ, ভুজ্ ভুজন, পূজ্—পূজন, স্না—স্নান।

প্রয়োগ—এখানে স্নান ও ভোজন করিয়া গমন কর।

ঘঞ্—ধাতুর উত্তর 'ভাব' অর্থে ঘঞ্ (অ) প্রত্যয় হয়।

নশ্—নাশ, পচ্—পাক, ভুজ্ ভোগ লভ্—লাভ, শুচ্—শোক, ভূ ভাব, আ—চর্+ঘঞ্—আচার, প্র—কৃ+ঘঞ্—প্রকার, বি—সৃ+ঘঞ্—বিসার, অনু—রঞ্জ্+ঘঞ্—অনুরাগ প্রভৃতি।

প্রয়োগ—অন্তগর্ত হয়ে দেও অনুরাগ-জল। —ঈশ্বর গুপ্ত।

অচ্—ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত ধাতুর উত্তর অচ্' প্রত্যয় হয়।

চি—চয়, (এরূপ সমুচ্চয়, নিচয়) নী—নয় (এরূপ প্রণয়, বিনয়) জি—জয়, ক্রী—ক্রয় প্রভৃতি।

প্রয়োগ—(ক) শশিভালে শোভা সমুচ্চয় —রামেশ্বর

(খ) কর যত হবে জয়, —হেমচন্দ্র

অপ্—'ঘঞ্' প্রত্যয়ের অর্থে কখনো কখনো 'অপ্' প্রত্যয় হয়।

স্ত—স্তব; স্তু—স্তব; দ্রু—দ্রব; স্তু—স্তব।

প্রয়োগ—করিলা ব্রহ্মার স্তব যত দেবগণ।

ক্বিপ্—কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় হয়। ক্বিপ্ প্রত্যয়ের কিছুই থাকে না।

ধর্ম + বিদ্—ধর্মবিৎ, ব্রহ্ম + বিদ্—ব্রহ্মবিৎ, সম্ + পদ—সম্পদ্। এরূপ বিদ্যুৎ, ব্রহ্মহা, সভাসদ্, উপনিষৎ প্রভৃতি।

প্রয়োগ—সভাসদ্গণ সকলেই রাজাকে বলিলেন।

ণক, ষক, তৃচ্

কর্তৃবাচ্যে এই সকল প্রত্যয় হয়।

ণক—নী—নায়ক, রক্ষ্—রক্ষক, ভক্ষ্—ভক্ষক, সাধ্—সাধক প্রভৃতি।

ষক—নৃৎ—নর্তক, খন্—খনক প্রভৃতি।

তৃচ্—গ্রহ—গ্রহীতৃ, কৃ—কর্তৃ, নী—নেতৃ, দা—দাতৃ প্রভৃতি।

প্রয়োগ—(ক) যত দাতা জীবে হরি হরিলেন দয়া।

(খ) যেই রক্ষক সেই ভক্ষক হওয়া উচিত নহে।

(গ) দাতা দরিদ্রদিগকে ধন দান করিতেছেন।

অ—সংস্কৃতে যেখানে 'ইচ্ছা' অর্থে 'সন্' প্রত্যয় হয় সেখানে ঐ প্রকার সনন্ত ধাতু হইতে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ গঠন করিতে হইলে 'অ' প্রত্যয় যোগ করিতে হয়। এই প্রত্যয়ান্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

জিজ্ঞাস্—জিজ্ঞাসা, দিদৃক্ষ্—দিদৃক্ষা, পিপাস্—পিপাসা, চিকীর্ষ—চিকীর্ষা প্রভৃতি।

প্রয়োগ—কী আর জিজ্ঞাসা কর আইলাম তব ঘর। —কবিকঙ্কণ

উ—সনন্ত ধাতুর উত্তর 'উ' প্রত্যয়ের যোগে বিশেষণ পদ গঠিত হয়।

জিজ্ঞাসু, বুভুক্ষু, জিগীষু, লিপ্সু। এগুলি ছাড়া অসূয়া, দীক্ষা, শিক্ষা, রক্ষা, লজ্জা, পীড়া প্রভৃতি শব্দও 'অ'-প্রত্যয়ান্ত।

প্রয়োগ—আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া এখানে আসিলাম।

ণ্বি—অংশ—ভজ্—অংশভাক্। এইরূপ দুঃখভাক্ প্রভৃতি।

খচ্—একটি কর্ম উপপদ থাকিলে ধাতুর উত্তর খচ্ (প্রত্যয় হয় এবং কর্মপদটির পর একটি 'ম্' আগম হয়। 'যে করে' এই অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয়।

শুভ—কৃ—শুভঙ্কর, প্রিয়—বদ্—প্রিয়ংবদা। এইরূপ বসুন্ধরা, বিশ্বম্ভর, ভয়ঙ্কর, পরন্তপ, ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি।

প্রয়োগ—(ক) অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে বলিলেন।

(খ) শুন, ধনঞ্জয় চিত্তে হইল অস্থির। —কাশীরাম দাস

ট—কর্তৃবাচ্যে—অধিকরণবাচক শব্দ পূর্বে থাকে এরূপ চর্ ধাতু এবং দিবা প্রভৃতি শব্দযুক্ত কৃ ধাতুর উত্তর 'ট' প্রত্যয় হইয়া থাকে। ভূ—চর্—ভূচর, খে—চর্—খেচর। এই প্রকার বনচর, দিবাকর, অর্থকর, নিশাচর, প্রভাকর, পুষ্টিকর।

ক—জ্ঞা, প্রী এবং আ-কারান্ত ধাতুর উত্তর 'ক' প্রত্যয় হয়। 'যে করে' এই অর্থে 'ক' প্রত্যয় হয়

নৃ—পা+ক—নৃপ ; বি—জ্ঞা+ক—বিজ্ঞ ; স্থ—স্থা—স্থ ; জল—দা—জলদ ; প্রী—প্রিয়।

প্রয়োগ—বিজ্ঞব্যক্তিরা সকলেই তাঁহার কথা মানিয়া লইলেন।

ড—কর্তৃবাচ্যে গম্ ধাতুর পূর্বে একটি উপপদ থাকিলে উহার উত্তর 'ড' প্রত্যয় হয়।

সর্ব—গম্+ড—সর্বগ, ভুজ—গম্+ড—ভুজগ। এইরূপ পারগ, দুর্গ, খগ।

ইন্—ব্রত বা শীল বুঝাইতে কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর 'ইন' প্রত্যয় হয়। পুংলিঙ্গে 'ঈ' ও স্ত্রীলিঙ্গে 'ইনী' রূপ গ্রহণ করে। উৎসাহী, বিদ্রোহী, মনস্বী, মিথ্যাবাদী, অনুরাগী, সত্যবাদী, অধিকারী।

ত্র—শাস্ত্র, ক্ষেত্র, বস্ত্র, পাত্র, নেত্র।

প্রয়োগ—সাশ্রুনেত্রে শিশুবৃন্দ আকুল হৃদয়।

উ—সাধু, স্বাদু, কারু।

অণ্—কর্মপদ পূর্বে থাকিলে একল ধাতুর উত্তর যে 'অ' প্রত্যয় হয়, তাহাকে 'অণ্' বলে। তন্তু—বে—তন্তুবায়, কুম্ভ—কৃ—কুম্ভকার, চাটুকার।

ন—যজ্—যজ্ঞ, তৃষ্—তৃষ্ণা, যাচ্—যাচ্ঞা।

প্রয়োগ—(ক) বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ করা উচিত।

(খ) যজ্ঞস্থানে দুই ভাই করেন প্রবেশ। —কৃত্তিবাস

বর—ঈশ্বর, স্থাবর, যাযাবর।

প্রয়োগ—সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী —ভারতচন্দ্র

ভু—কর্তৃবাচ্যে 'ভূ' ধাতুর উত্তর 'ডু' প্রত্যয় হয়। প্রভু, বিভু।

প্রয়োগ—প্রভু ভৃত্যকে বলিলেন।

বাঙ্‌লা কৃৎপ্রত্যয়

অন—নাচ্—নাচন, বাঁধ্—বাঁধন, ধর্—ধরণ, মর্—মরণ, বাঁচ্—বাঁচন

প্রয়োগ—তাহার মরণ-বাঁচন তো আমার হাতে।

অন্ত—জীব্—জীবন্ত, বাড়্—বাড়ন্ত, চল্—চলন্ত।

প্রয়োগ—চলন্ত গাড়ীতে উঠা উচিত নয়।

অত—ফেরত, মান্—মানত।

প্রয়োগ—সে একজন বিলাত-ফেরত ডাক্তার।

আই—বাছ্—বাছাই, ঢাল্—ঢালাই, যাচ্—যাচাই, চড়্—চড়াই।

প্রয়োগ—'চড়াই' পথে চলল আমাদের গাড়ী। —রবীন্দ্রনাথ

আও—ছাড়াও, ঘেরাও, বনিবনাও, চড়াও।

প্রয়োগ : সে আমার বাড়ী **চড়াও** হয়েছিল।

আন, আনো—জানান্—জানানো, মানান্—মানানো, ঠকান্—ঠকানো।

আনি, আনী, অনী, অনি, উনী, উনি।

উড়ানী, উড়ানি, উড়নি, উড়ুনি, শুনানী, শোনানী।

প্রয়োগ : মকদ্দমার '**শুনানি**'র দিন এমাসের ১২ তারিখে।

ইয়ে—গা—গাইয়ে, বলিয়ে, নাচিয়ে, খাইয়ে।

প্রয়োগ : সে একজন **গাইয়ে-বাজিয়ে** লোক।

ই—মারামারি, ঝকিঝিকি, হাসাহাসি।

প্রয়োগ : এই কথা শুনে তারা **হাসাহাসি** করতে লাগলো।

অ—কাদকাঁদ (কাঁদ + অ = কাঁদ)।

প্রয়োগ : ললিতা **কাঁদকাঁদ** হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কী ...... শেখরদা ?' —শরৎচন্দ্র

উক—ভাবুক, মিশুক।

প্রয়োগ : রমানাথ ছিলেন একজন **ভাবুক** ব্যক্তি।

উ—ঢালু, চালু, নাতারু।

ও—ডুবো, উড়ো।

প্রয়োগ : সে **উড়ো**জাহাজে করে বিলাতে গেল

উনে—কাঁদুনে, কউনে।

প্রয়োগ : পুলিশ **কাঁদুনে** গ্যাস ছাড়লো।

অল—ফাটল, পাকল।

আল—মিশাল, ঘোরাল

প্রয়োগ : সে জল-**মিশাল** দুধ দেয়।

আচ, আচে—ছোঁয়াচ, ছোঁয়াচে।

আরী, উরী—ডুবারী, ডুবুরী, কাটারী।

আট—জমাট, ভরাট।

প্রয়োগ : **জমাট** অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না।

ওয়ারা—মাতোয়ারা, বাঁটোয়ারা।

প্রয়োগ : সে প্রাণ**মাতোয়ারা** গান গাহিল।

ই- ডুবি, ভাজি।

প্রয়োগ : রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি পড়েছ ?

ইত—জানিত, করিত

ওয়া—যাওয়া।

প্রয়োগ : আমার দ্বারের সমুখ দিয়া
যেজন করে আসা-যাওয়া ; —রবীন্দ্রনাথ

তা—ফেরৎতা

প্রয়োগ : আমরা বিলেত-ফেরৎতা ক'ভাই। —দ্বিজেন্দ্রলাল

তি—গুন্‌তি

প্রয়োগ : ফলগুলি গুন্‌তি করিয়া রাখ।

না—বাজনা, কাঁদনা, কান্না।

প্রয়োগ : নিখিল শোকে আকুল মনে নূপুরবাজনা। — রবীন্দ্রনাথ

নি—ছাঁকনি।

প্রয়োগ : চা-টা ছাঁকনি দিয়া ছাঁকিয়া লও।

নী—গাঁথনী।

প্রয়োগ : এ বাড়ীটা কাঁচা-গাঁথনীর।

নো—গলানো।

প্রয়োগ : শরতের রৌদ্র যেন সোহাগায় গলানো নির্মল সোনার মতো রঙ্ ধরেছে। —রবীন্দ্রনাথ

॥ অনুশীলনী ॥

১। কৃৎপ্রত্যয় কাহাকে বলে?

২। নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলি কী কী অর্থে ধাতুর উত্তর যুক্ত হয়; উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

তব্য, ণ্যৎ, অ, আই, অন্ত, ক্ত, শানচ্, ইন, অন্, অচ, ত, উয়া, ইয়ে।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লেখ :

পোষাক, জিজ্ঞাসা, ধনঞ্জয়, সুকর, নৃপ, অনুরাগী, সিন্ধু, নাচান, ঝাড়ন, দয়া, গুন্‌তি, চাকনি, কান্না।

৪। প্রত্যয় নির্ধারণপূর্বক অর্থ লেখ :

দর্শনীয়, জাগরূক, চালক, জোড়ক, কাঁপন, ঈশ্বর, ভ্রমণ, দণ্ড, জনক, ভুজগ, উদর্ঘর, মাড়াই, পেটাও।

৫। নিম্নলিখিত ধাতু ও প্রত্যয়-যোগে শব্দ গঠন কর :

পা + ওয়া, দা + অন, চাক্ + অন্, উড় + উনি, ঋণ + ক্ত, জন্ + ণ, স্ম + ঙচ্, পড় + উয়া, দৃশ্ + তব্য, ভূ + ক্যপ্, গা + অন, মৃদ্ + ই, চল্ + অন্ত, খোর্ + আই।

[খ] তদ্ধিতপ্রত্যয়

শব্দ বা নামপ্রকৃতির সহিত বিভিন্ন অর্থে কতকগুলি প্রত্যয় যোগ করিয়া নূতন শব্দ সাধিত হয়, ইহাদিগকে তদ্ধিতপ্রত্যয় বলে। তদ্ধিতপ্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন শব্দগুলি তদ্ধিতান্ত শব্দ নামে অভিহিত। কৃৎপ্রত্যয়ের ন্যায় তদ্ধিতপ্রত্যয়ও তিন প্রকার—সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশী।

সংস্কৃত তদ্ধিতপ্রত্যয়

ষ্ণ—ভরত + ষ্ণ = ভারত ; রঘু + ষ্ণ = রাঘব ; পাণ্ডু + ষ্ণ = পাণ্ডব ; পুত্র + ষ্ণ = পৌত্র ; দুহিতা + ষ্ণ = দৌহিত্র ; শিশু + ষ্ণ = শৈশব ; বস্তু + ষ্ণ = বাস্তব ; মনু + ষ্ণ = মানব ; নিশা + ষ্ণ = নৈশ।

প্রয়োগ—শৈশবে যাহার সাথে ভ্রমি শিশুরসন্ধানে

ষ্ণ্য—দিতি + ষ্ণ্য = দৈত্য ; অদিতি + ষ্ণ্য = আদিত্য ; চণক + ষ্ণ্য = চাণক্য ; সুন্দর + ষ্ণ্য = সৌন্দর্য ; সুজন + ষ্ণ্য = সৌজন্য ; সুহৃদ্ + ষ্ণ্য = সৌহৃদ্য।

প্রয়োগ—ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তের তক্ষশিলা নগরীতে মহামতি **চাণক্যের** জন্ম হয়।

ষ্ণি—রাবণ + ষ্ণি = রাবণি ; দশরথ + ষ্ণি = দাশরথি ; সুমিত্রা + ষ্ণি = সৌমিত্রি ; অরুণ + ষ্ণি = আরুণি।

প্রয়োগ—কী করিল রণে পুনঃ **সৌমিত্রি** কেশরী ? —মাইকেল

ষ্ণিক—(ইক) বেদ + ষ্ণিক = বৈদিক, নীতি + ষ্ণিক = নৈতিক, গিরি + ষ্ণিক = গৈরিক, বিষয় + ষ্ণিক = বৈষয়িক, ধর্ম + ষ্ণিক = ধার্মিক, মানস + ষ্ণিক = মানসিক।

প্রয়োগ—প্রকৃত **মানসিক** শিক্ষা না হইলে জ্ঞানলাভ সহজ হয় না।

—গুরুদাস

ষ্ণেয়—গঙ্গা + ষ্ণেয় = গাঙ্গেয়, ভগিনী + ষ্ণেয় = ভাগিনেয়, বিমাতৃ + ষ্ণেয় = বৈমাত্রেয়, নিকষা + ষ্ণেয় = নৈকষেয়, কুন্তী + ষ্ণেয় = কৌন্তেয়।

প্রয়োগ—ক নটি আমাদের **বৈমাত্রেয়** ভ্রাতা।

ষ্ণায়ন—দক্ষ + ষ্ণায়ন = দাক্ষায়ণ

ঈন—সর্বাঙ্গ + ঈন = সর্বাঙ্গীণ, প্রাতঃকাল + ঈন = প্রাতঃকালীন।

প্রয়োগ—আমাদের **সর্বাঙ্গীণ** কুশল জানিবেন

আলু—নিদ্রালু, দয়ালু, তন্দ্রালু, ভাবালু।

প্রয়োগ—পরের দুঃখে **দয়ালু** বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইত।

ল—শ্যামল, মাংসল, শ্রীল, বৎসল, পুষ্কল, বকুল, শীতল।

প্রয়োগ—তোমার **শ্যামল** শোভার বুকে বিদ্যুতেরি জ্বালা। —রবীন্দ্রনাথ

ইমন্—নীল + ইমন্ = নীলিমা, কাল + ইমন্ = কালিমা, মহৎ + ইমন্ = মহিমা। এইরূপ—রক্তিমা, অণিমা, দ্রাঘিমা, তনিমা, জড়িমা।

প্রয়োগ—'ধৌত তব তপ্ত **তনিমা**' —রবীন্দ্রনাথ।

ইত—জাত হইয়াছে অর্থে।

পুষ্প—পুষ্পিত, পুলক—পুলকিত, অঙ্কুর—অঙ্কুরিত। এইরূপ, পিপাসিত, তৃষিত, বুভুক্ষিত, রোমাঞ্চিত।

প্রয়োগ—ভাবে **পুলকিত** অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে। —কৃত্তিবাস

আছে অর্থে—

বতুপ্, মতুপ্

যত্ন + বতুপ্ = যত্নবান্, জ্ঞান + বতুপ্ = জ্ঞানবান্। এইরূপ—ধনবান্, বলবান্, দয়াবান্।

মতি + মতুপ্ = মতিমান, ধনুস্ + মতুপ্ = ধনুষ্মান।

প্রয়োগ—(ক) আজকের দিনে পৃথিবীতে যারা সক্ষম তারা মন্ত্রশক্তিতে **শক্তিমান্**।

(খ) শ্রীরাম বলেন,—হে বাল্মীকি, **জ্ঞানবান্**।

বিন্—যশস্ + বিন্ = যশস্বী, তেজস্ + বিন্ = তেজস্বী। এইরূপ—তপস্বী, পয়স্বিনী, মেধাবী, মায়াবী।

প্রয়োগ—হে **রাজ-তপস্বিবীর**, তোমার সে উদার ভাবনা বিধির ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া গেছে। —রবীন্দ্রনাথ

ইল, শ, র—পঙ্কিল, মধুর, পাণ্ডুর, রোমশ, ফেনিল, জটিল।

প্রয়োগ—পুরীতে **ফেনিল** সমুদ্রদর্শনে তিনি বিস্মিত হইলেন।

ময়ট্—দারুময়, হিরণ্ময়, জলময়, স্বর্ণময়, অন্ধকারময়।

প্রয়োগ—সেই সূচীভেদ্য **অন্ধকারময়** নিশীথে শব্দ হইল, 'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?' —বঙ্কিমচন্দ্র

মাত্র—বিন্দুমাত্র।

প্রয়োগ—আমি সে বিষয়টির **বিন্দুমাত্র**ও জানি না।

ঈয়সু, ইষ্ঠ—গুরু + ঈয়সু = গরীয়স্ + ঈপ্ স্ত্রীলিঙ্গে = গরীয়সী। প্রশস্ + ইষ্ঠ = শ্রেষ্ঠ।

প্রয়োগ—(ক) জননী ও জন্মভূমি স্বর্গাপেক্ষা **গরীয়সী**।

(খ) অর্জুন বীরগণের মধ্যে **শ্রেষ্ঠ**।

তর, তম—গুরু + তর = গুরুতর। প্রিয় + তম = প্রিয়তম।

প্রয়োগ—(ক) বালকটি **গুরুতর** অপরাধ করিয়াছে।

(খ) 'ফুলগুলি আমাদের কাছে সেই **প্রিয়তমের** দূত হয়ে আসে। —রবীন্দ্রনাথ

শস্—ক্রম + শস্ = ক্রমশ।

প্রয়োগ—সেই ভীষণ শব্দ **ক্রমশ** নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

তন, ত্য—চিরম্ + তন = চিরন্তন। দক্ষিণা + ত্য = দাক্ষিণাত্য। পুরা + তন = পুরাতন।

প্রয়োগ—**দাক্ষিণাত্যে** একটি **পুরাতন** নগরী ছিল।

চি্ব—বশ+চি্ব+ভূ+ক্ত=বশীভূত। এইরূপ, পুঞ্জীভূত।

প্রয়োগ—মাতা শিশুকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিলেন।

তস্—প্রধান+তস্=প্রধানত।

প্রয়োগ—ঐ গ্রামে প্রধানত ব্রাহ্মণের বাস।

ত্র—সর্ব+ত্র=সর্বত্র।

প্রয়োগ—তখন রাজ্যে সর্বত্রই একটা বিশৃঙ্খলার ভাব দেখা দিল।

তুল, ব্য—মাতুল, পিতৃব্য।

প্রয়োগ—মাতুল বালকটিকে অনেক বুঝাইলেন।

ডামহ—পিতামহ, মাতামহ।

প্রয়োগ—পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনকে কত সদুপদেশ দিলেন।

ধাচ্—শতধা।

প্রয়োগ—যে আশা একদা ভারত গ্রাসিয়াছিল সে আজি শতধা।

—রবীন্দ্রনাথ

সাৎ—ভস্মসাৎ।

প্রয়োগ—গৃহটি অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

দা—একদা।

প্রয়োগ একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।

—দ্বিজেন্দ্রলাল

থাচ্—তথা।

প্রয়োগ—তাহার কথা শুনিয়া আমি তথায় গমন করিলাম।

বিশিষ্টার্থে তদ্ধিতপ্রত্যয়

ক্ষুদ্রার্থক প্রত্যয়—মানব+ক=মানবক (ক্ষুদ্র মানব); বৃক্ষ+ক=বৃক্ষক (ক্ষুদ্র বৃক্ষ)।

ভূতপূর্বার্থক প্রত্যয়—অধ্যাপক+চরট্ (ভূতপূর্ব অধ্যাপক)।

স্বার্থিক প্রত্যয়—বন্ধু+অণ্ (অ)=বান্ধব।

বহ্বার্থক প্রত্যয়—বহু+শস্=বহুশঃ।

যোগার্থক প্রত্যয় দণ্ড+য=দণ্ড্য; বধ+য=বধ্য

বাঙ্‌লা তদ্ধিতপ্রত্যয়

আ—জল+আ=জলা। নুন (লবণ)+আ=লোনা, বাঘ+আ=বাঘা, চীন+=চীনা, পশ্চিম+আ=পশ্চিমা।

প্রয়োগ—তাহার বাড়ীর পাশে একটি জলাভূমি।

আই—চোর+আই=চোরাই। কান (কৃষ্ণ)+আই=কানাই। এইরূপ ঠাই, বড়াই, পাটনাই, মোগলাই।

প্রয়োগ—ধনগত বৈষম্যের **বড়াই** আমাদের দেশে এসেছে পশ্চিম মহাদেশ থেকে। —রবীন্দ্রনাথ

আনী, আনা—বাবুয়ানী। মুন্সিয়ানা।

প্রয়োগ—অযথা '**বাবুয়ানী**' করা উচিত নহে।

আমি—আম, মি, ম—ইতর + আমি = ইতরামি, বাঁদর + আমি = বাঁদরামি। দুষ্ট + আমি = দুষ্টামি। পাক + আম = পাকাম। বুড়ো + মি = বুড়োমি। ছেলে + মি = ছেলেমি। ছেলে + ম = ছেলেম।

প্রয়োগ—তাহার **বাঁদরামি** আমি আর সহ্য করিতে পারি না।

আরি, আরী, আর—শাঁখ + আরী = শাঁখারী। ভিখ্ + আরী = ভিখারী। চাম + আর = চামার। জুয়া + আরী = জুয়ারী। মাঝ + আরি = মাঝারি।

আরু, রু—বোম + আরু = বোমারু। গো + রু = গোরু। শজা + রু = শজারু।

প্রয়োগ—রাখাল **গোরুর** পাল লয়ে যায় মাঠে।

আল, আলো—ঝাঁঝ + আলো = ঝাঁঝালো। ধার + আলো = ধারালো। রস + আল = রসাল। দুধ + আল = দুধাল। জোর + আল = জোরাল।

প্রয়োগ—সে **ধারালো** ছুরিখানিতে **রসাল** ফল কাটিয়া খাইল।

আলি—ঠাকুর + আলি = ঠাকুরালি।

প্রয়োগ—আমাদেরি এই কুটিরে দেখেছি মানুষের **ঠাকুরালি**।

—সত্যেন্দ্র দত্ত

ই, ঈ—চাকর + ই = চাকরি। দাম + ঈ = দামী। দরদ + ঈ = দরদী। ভাব + ঈ = ভাবী। গোলাপ + ঈ = গোলাপী। বাঙাল + ই = বাঙালি। নবাব + ই = নবাবি। দোকান + ঈ = দোকানী। ঢাক + ঈ = ঢাকী। শান্তিপুর + ঈ = শান্তিপুরী। দেশ + ঈ = দেশী। পশম + ঈ = পশমী। রেশম + ঈ = রেশমী।

প্রয়োগ—ভোলানাথ শেষে আট টাকা বেতনের সামান্য একটি **চাকরি** যোগাড় করিল।

ইয়া, এ—পাথর + ইয়া > পাথুরিয়া। খরচ + এ = খরচে। শহর + ইয়া = শহরিয়া > শহুরে। জাল + ইয়া = জালিয়া > জেলে। মোট + ইয়া = মোটিয়া > মুটে। উত্তর + ইয়া = উত্তরিয়া > উত্তুরে।

প্রয়োগ—আমার ছেলেটা খুবই **খরচে**।

ঈন—রঙ + ঈন = রঙীন।

উ—ঢালা + উ = ঢালু। কান (স্কন্ধ) + উ = কান্ধু। ছুঁচ + উ = ছুঁচু।

প্রয়োগ—আমরা পাহাড়ের **ঢালু** পথে চলিতে লাগিলাম।

উক—পেট + উক = পেটুক। লাজ + উক = লাজুক। মিথ্যা + উক = মিথ্যুক।

প্রয়োগ—**লাজুক** ছেলেটি সেখানে কোন কথাই বলিতে পারিল না।

উয়া, ও—মাছ + উয়া = মাছুয়া > মেছো। জল + উয়া = জলুয়া > জলো। মাঠ + উয়া = মাঠুয়া > মেঠো। টাক + উয়া = টাকুয়া > টেকো। ঝড় + উয়া, ও = ঝড়ো।

প্রয়োগ—বাদলা সাঁঝে ঝোড়ো হাওয়া নুইয়ে চলে বাঁশের বন।

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

তা, তি—নাম + তা = নামতা, বাঙ্‌ + তা = বাঙ্‌তা, চাক + তি = চাকতি।

প্রয়োগ— তুমি নামতাও জান না।

উড়িয়া (উড়ে)—সাপ + উড়িয়া (উড়ে) = সাপুড়িয়া > সাপুড়ে। হাত + উড়িয়া (উড়ে) = হাতুড়িয়া > হাতুড়ে। ভূত + উড়িয়া (উড়ে) = ভূতুড়িয়া > ভূতুড়ে।

প্রয়োগ—আমরা সেই ভুতুড়ে বাড়ীর পাশ দিয়ে গেলাম।

এল—সিঁধ + এল = সিঁধেল। আঁটা + এল = এঁটেল। ফুল + এল = ফুলেল।

প্রয়োগ—বিপিন প্রতিদিন স্নানের পূর্বে ফুলেল তেল ব্যবহার করিত।

বিদেশী তদ্ধিতপ্রত্যয়

অট (ট), অটা (টা), আটিয়া, আটে, টে—সাপ + অট = সাপট। দাপ + অট = দাপট। ঝাপ + অট = ঝাপট। জমা + ট = জমাট। ভরা + ট = ভরাট। চেপ + টা = চেপটা। ভাড়া + আটিয়া = ভাড়াটিয়া। ঘোলা + টে = ঘোলাটে।

প্রয়োগ—ঝড়ের দাপটে ঘরের সার্শিগুলো শব্দ করে উঠলো।

কিয়া—শত + কিয়া = শতকিয়া। কড়া + কিয়া = কড়াকিয়া।

প্রয়োগ—বালকগুলি তখন কড়াকিয়া পড়িতেছিল

ওয়ান—গাড়ি + ওয়ান = গাড়োয়ান।

প্রয়োগ—গাড়ওয়ান কুলি ডাকিতে গেল।

ওয়ালা—বাড়ীওয়ালা। ফেরিওয়ালা। বাসনওয়ালা। গাড়ীওয়ালা। কাপড়ওয়ালা।

প্রয়োগ—বাড়ীওয়ালার ভাড়ার বিল আসিল।

খানা—ছাপা + খানা = ছাপাখানা।

প্রয়োগ—ছাপাখানা আজ বন্ধ থাকিবে।

গিরি—চেলা + গিরি = চেলাগিরি। গুরু + গিরি = গুরুগিরি।

প্রয়োগ—এ বাজারে গুরুগিরি করে সংসার চালান সহজ ব্যাপার নয়।

চি—তবলা + চি = তবলচি। খাতা + চি = খাতাঞ্চি। খাজনা + চি = খাজাঞ্চি।

প্রয়োগ—তবলচির তবলা বাজানোর সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল।

খোর—সুদখোর। মদখোর। ঘুষখোর।

প্রয়োগ—ঘুষখোরটাকে দেখে সে রেগে উঠলো।

দান, দানী—আতরদান। কলমদান। পিকদানি।

প্রয়োগ—কলমদানে কলমটি রাখ।

বাজ—ফন্দিবাজ। ধাপ্পাবাজ। মামলাবাজ।

প্রয়োগ—তার মতো ধাপ্পাবাজ আমি কখনো দেখিনি।

সই—দশাসই। মানানসই। জলসই। চলনসই। টেকসই।

প্রয়োগ—জামাটা খুবই টেকসই।

গর—(নিপুণার্থে) বাজি+গর=বাজিগর; কারি+গর=কারিগর; সওদা+গর=সওদাগর

তর—হিন্দি তরহ্ হইতে। এমন+তর=এমনতর, যেমন+তর—যেমনতর।

নবিশ—হিসাব+নবিশ—হিসাবনবিশ; নকল+নবিশ—নকলনবিশ (অভিজ্ঞ অর্থে এই প্রত্যয়টি হয়)

পনা—গিন্নি+পনা (আচরণার্থে)—গিন্নিপনা, ন্যাকা+পনা—ন্যাকাপনা, বীর+পনা—বীরপনা।

অনুশীলনী ॥

১। কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিতপ্রত্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

২। নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলি কোন কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়, উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও:

ঝ, ঝি, ত্ব, ইমন্, আটি-টী, অন্, অম্ব, আ, আণ্, ওয়ালা, তরো, মতুপ্, বিন্, ইন্, ল, ইমন, ইত, ময়ট্।

৩। নিম্নলিখিত প্রত্যয়যোগে কী কী পদ গঠিত হয়, বল।

জগৎ+আই, রঘু+অণ্, লাথি+আনো, মাস্টার+নি, নেকা+আমি, চাঁদ+আ, গুদাম+জাত।

৪। প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্দেশ কর:

জমানো, গাঁজাখোর, খুনটি, ধড়ীবাজ, ভাটীয়াল, হিন্দুস্থানী, সাহেবী-আনা, বনেদে, শতকিয়া, বাগিচা।

৫। —ওয়ালা, —গর, —গির, —ইয়ার, —পানা, এই প্রত্যয়গুলি দিয়া শব্দ রচনা কর, এবং বাক্য রচনা করিয়া শব্দগুলির প্রয়োগ দেখাও।

চতুর্থ পর্ব

॥ প্রথম অধ্যায়

< বাক্যপ্রকরণ >

[ক] বাক্যের লক্ষণ ও বাক্যের প্রকারভেদ

কয়েকটি পদ একত্র হইয়া যদি একটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে, তবে সেই পদসমষ্টিকে বাক্য কহে। 'রাম বই পড়ে' একটি বাক্য। 'এস' এই একটিমাত্র পদ দ্বারাও একটি বাক্য গঠিত হইতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে কর্তা উহ্য আছে, কল্পনা করিতে হইবে। এইভাবে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া প্রভৃতির এক বা একাধিক পদ উহ্য থাকিলেও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝাইলে তাহাকে বাক্য বলা হইবে। মূলকথা, প্রতিটি বাক্যে একটি কর্তা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়াপদ থাকা চাই।

মনে রাখা উচিত যে, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত পদসমূহকে বলে বাক্য।

(ক) যোগ্যতা—বাক্যে অবস্থিত পদসমূহের মধ্যে পরস্পরের সহিত যে অর্থগত সম্বন্ধ আছে তাহার জ্ঞানের পথে বাধা না হওয়াকে বলে যোগ্যতা। 'অন্ধ বালকটি চন্দ্র দেখিতেছে'—এইটি বাক্য। কিন্তু অন্ধ বালকের চক্ষু না থাকায় সে চন্দ্র দেখিতে পায় না। অতএব চন্দ্রদর্শনে অন্ধ বালকের যোগ্যতা নাই বলিয়া উহা প্রকৃতপক্ষে বাক্য হইল না।

(খ) আকাঙ্ক্ষা—বাক্যের অর্থজ্ঞানের জন্য একটি পদ শুনিবার পর যদি অপর পদ শুনিবার ইচ্ছা হয়, তবে ঐ পদ-দুটির সম্বন্ধকে আকাঙ্ক্ষা বলে। যথা—'রাম গ্রামে'…বলিলে আরো শুনিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে। অতএব উহা বাক্য নহে। তবে যদি বলা যায় 'গমন করিতেছে' তাহা হইলে উহা বাক্য।

(গ) আসত্তি—পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত পদসমূহকে বাক্যের মধ্যে যথাসম্ভব ক্রমানুযায়ী স্থাপনের নাম আসত্তি। এই আসত্তি যদি না থাকে তবে যোগ্যতা ও আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পদগুলিও বাক্য বলিয়া গণ্য হয় না। যথা—সে গিয়াছিল সহিত ভ্রাতার গ্রামে সত্বর।

এখানে এলোমেলোভাবে পদগুলি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া উহা বাক্য নহে। ঐটিকে যদি 'সে ভ্রাতার সহিত সত্বর গ্রামে গিয়াছিল' বলা যায় তবে উহা বাক্য।

বাক্যের দুইটি অংশ থাকে—উদ্দেশ্য ও বিধেয়। যে-অংশ সম্বন্ধে কিছু বলা হইতেছে, তাহাকে উদ্দেশ্য কহে। যে-অংশে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলা হইতেছে,

তাহাকে বিধেয় কহে। 'সমীর কলেজে যাইবে'—এই বাক্যটিতে 'সমীর' এই অংশটি সম্বন্ধে বলা হইতেছে যে, সে 'কলেজে যাইবে', সুতরাং 'সমীর' এখানে উদ্দেশ্য। আবার, 'সমীর' এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইতেছে যে, সে কলেজে যাইবে। এই বক্তব্য অংশটুকু 'কলেজে যাইবে' হইল বিধেয়।

বাক্যে পদের অবস্থান ঃ

বাক্যে সাধারণত কর্তৃপদ পূর্বে বসে, এবং ক্রিয়াপদ শেষে বসে। অন্যান্য কারক-বিভক্তিযুক্ত বা অপর বিভক্তিযুক্ত পদগুলি মধ্যে বসে। যেমন, তাহার মাতা পুত্রের সহিত বেড়াইতে গিয়াছেন।

বাক্যবিভাগ ঃ

বাক্য তিনপ্রকার—সরল, জটিল বা মিশ্র ও যৌগিক বাক্য।

যে-বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়াপদ একটিমাত্র, তাহাকে বলে সরল বাক্য। যেমন, আমি তোমার সঙ্গে যাইব। যতীনের মাতা পীড়িত (আছেন)।

যদি কোনো বাক্যে প্রধান বাক্যাংশের অন্তর্ভূত অপর একটি (বা একাধিক) বাক্যাংশ থাকে, তখন সেই সমগ্র বাক্যটিকে জটিল বা মিশ্র বাক্য কহে। যেমন, 'রাজা যাহাকে অনুগ্রহ করেন তাহার ভালো হয়'। 'তাহার ভালো হয়' মুখ্য বাক্যাংশ। 'রাজা যাহাকে অনুগ্রহ করেন' মুখ্য বাক্যাংশের অন্তর্ভূত বাক্যাংশ। এই বাক্যাংশ 'তাহার' এই পদের বিশেষণ।

'যদি সে আসে তবে আমি যাইতে পারি'। 'তবে আমি যাইতে পারি' মুখ্য বাক্যাংশ। 'যদি সে আসে' অন্তর্ভূত বাক্যাংশ। এই বাক্যাংশ প্রধান বাক্যাংশের অন্তর্গত ক্রিয়াপদকে (যাইতে পারি) বিশেষিত করিয়েছে, তাই, এটি ক্রিয়া বিশেষণ।

দুই বা ততোধিক সরল বাক্য (অথবা সরল ও জটিল বাক্য) সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের সাহায্যে যুক্ত করা হইলে, সেই সমগ্র বাক্যটিকে যৌগিক বাক্য কহে। কয়েকটি বাক্যের যোগের ফলে জাত বলিয়া ইহার নাম যৌগিক বাক্য। যেমন, 'সে মহা ধূর্ত লোক, কিন্তু আমিও নিতান্ত হাবা নই'। 'উদ্যোগের ফলে না হয় এমন কার্য নাই, তবে অদৃষ্টকেও একেবারে উপেক্ষা করা চলে না'। এই দুইটি বাক্যই যৌগিক বাক্য। কারণ উভয়স্থলেই প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে দুইটিই এক-একটি পৃথক্ বাক্য। এই বাক্যগুলিকে প্রথমস্থলে 'কিন্তু' এবং দ্বিতীয় স্থলে 'তবে' এই অব্যয় দ্বারা যুক্ত করা হইয়াছে।

[খ] বাক্যান্তরীকরণ

সরল বাক্যকে জটিল বা যৌগিক বাক্যে, জটিল বাক্যকে সরল বা যৌগিক বাক্যে, এবং যৌগিক বাক্যকে সরল বা জটিল বাক্যে পরিবর্তিত করাকে বাক্যান্তরীকরণ (অন্য বাক্যে পরিবর্তিত করা) কহে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। বলাই বাহুল্য, বাক্যের তাৎপর্য পরিবর্তিত করা কোনো ক্ষেত্রেই চলিবে না।

সরল বাক্যের অন্তর্গত কোনো পদ অথবা পদসমষ্টিকে (Phrase-কে) আনুষঙ্গিক বাক্যে (Clause-এ) পরিণত করিলে জটিল বা মিশ্র বাক্য হয়।

সরল বাক্যের বাক্যান্তরীকরণ ঃ

সরল হইতে জটিল ঃ ১। রামবাবু তাঁহার পুত্রটিকে লইয়া আনন্দে আছেন—সরল বাক্য। রামবাবুর যে-পুত্রটি আছে, তাহাকে লইয়া তিনি আনন্দে আছেন—জটিল বাক্য।

২। সে আমার প্রাপ্য টাকা শীঘ্রই পরিশোধ করিবে- সরল বাক্য।
যে টাকা আমার পাওয়া উচিত সেই টাকা সে শীঘ্রই পরিশোধ করিবে। জটিল বাক্য।

৩। শ্রমশীল ছাত্রেরাই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে—সরল বাক্য।
যে সকল ছাত্র শ্রম করে তাহারাই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে—জটিল বাক্য।

৪। তাহার কথা আমি শুনি নাই—সরল বাক্য।
সে যে কথা বলিয়াছে তাহা আমি শুনি নাই—জটিল বাক্য।

৫। প্রজার সুখেই রাজা সুখী হয়েন - সরল বাক্য।
প্রজা যদি সুখী হয় তবে রাজা সুখী হয়েন—জটিল বাক্য।

সরল হইতে যৌগিক ঃ (পূর্বোক্ত সরল বাক্যগুলিকে মূল ধরিয়া) যৌগিক বাক্য - ১। রামবাবুর একটি পুত্র আছে এবং তাহাকে [illegible] তিনি আনন্দে আছেন।

২। তাহার নিকট আমার টাকা প্রাপ্য আছে এবং সে শীঘ্রই তাহা পরিশোধ করিবে।

৩। ছাত্রেরা শ্রম করে এবং পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে

৪। সে কথা বলিয়াছে কিন্তু আমি তাহা শুনি নাই।

৫। প্রজা সুখী হয় এবং রাজা সুখী হন।

জটিল বাক্যের বাক্যান্তরীকরণ ঃ

জটিল হইতে সরল ঃ ১। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে—জটিল বাক্য। তোর ডাক শুনে কেউ না [illegible] (তুই) একলা চল রে।– সরল বাক্য।

২। তুমি যে পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছ তাহা আমাকে জানাও নাই কেন? —জটিল

তোমার পরীক্ষায় সাফল্যের কথা আমাকে জানাও নাই কেন?—সরল বাক্য

৩। আমাদের যাহা বলিবার, বলিয়াছি। —জটিল বাক্য

আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি। —সরল বাক্য

৪। কেন বিস্মিত হইলাম, বুঝিতে পারিতেছি না। —জটিল বাক্য

বিস্মিতির কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। —সরল বাক্য

৫। যদি তুমি পরিশ্রম কর তবে সাফল্য লাভ করিবে। —জটিল বাক্য

পরিশ্রম করিলে তুমি সাফল্য লাভ করিবে। —সরল বাক্য

জটিল হইতে যৌগিক: (পূর্বোক্ত জটিল বাক্যটিকে মূল ধরিয়া) যৌগিক বাক্য—তোর ডাক শুনে কেউ না আসতে পারে, তবু তুই একলা চল রে।

যৌগিক বাক্যের বাক্যান্তরীকরণ:

যৌগিক হইতে সরল বা জটিল: ১। যৌগিক বাক্য—রামবাবু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু মনোবল হারান নাই। সরল বাক্য- রামবাবু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াও মনোবল হারান নাই। জটিল বাক্য—যদিও রামবাবু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, তথাপি তিনি মনোবল হারান নাই।

২। তুমি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছ কিন্তু তাহা আমাকে জানাও নাই কেন?

৩। আমাদের বলিবার ছিল এবং আমরা তাহা বলিয়াছি।

৪। আমরা বিস্মিত হইলাম কিন্তু উহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।

৫। তুমি পরিশ্রম কর এবং সাফল্য লাভ করিবে।

[এই বাক্যগুলির **সরল** ও **জটিল** রূপ উপরে দ্রষ্টব্য]

[গ] বাক্যের অন্যবিধ বিভাগ

অর্থের দিক দিয়া [illegible] বাক্যের প্রকার অনুরূপে নির্দিষ্ট করা যায়— অস্ত্যর্থক, নাস্ত্যর্থক, নির্দেশক, প্রশ্নবোধক ইত্যাদি।

সরল বাক্যকেই অস্ত্যর্থক বা নাস্ত্যর্থক বলিতে হয়, কারণ, এই দুইটির একটি অর্থাৎ অস্ত্যর্থক বা নাস্ত্যর্থক না হইয়া তো কোন বাক্যেরই উপায় নাই।

সে যায়। সে কি যায়? সে যেন যায়— ইত্যাদি সমস্ত বাক্যই অস্ত্যর্থক। এইগুলিকেই—সে যায় না। সে কি যায় না? সে যেন না যায়— ইত্যাদি নাস্ত্যর্থক বাক্যে পরিবর্তিত করা যায়।

অস্ত্যর্থক বা নাস্ত্যর্থক, এই দ্বিবিধ বাক্যকে আবার নিম্নরূপে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(১) নির্দেশক—সে সুখে আছে। রাবের অদৃষ্ট মন্দ।

(২) প্রশ্নবোধক—রাজা কি ন্যায় বিচার করেন? এটা কি তাঁর কর্তব্য নয়?

(৩) অনুজ্ঞাবোধক—দেশের ও দশের সেবা করো।

(৪) নিশ্চয়বোধক—আমি যাইবই। সে কখনই আসিবে না।

(৫) সন্দেহবোধক—সে হয়তো আমাকে সন্দেহ করে না। তুমি নিশ্চয়ই ভাবিতেছ, আমি তোমার কথা ভাবি না।

(৬) বিস্ময়বোধক—আ! লাগছে যে! কী কথাই বললে!

(৭) নির্ভরতাবোধক (শর্তবোধক)—যদি তার মতো হয়, আমার আপত্তি নাই।

এই বাক্যগুলিকে এই রূপ হইতে রূপান্তরে পরিণত করা যায়। যেমন—অস্ত্যর্থক হইতে নাস্ত্যর্থক: সে অবশ্যই সুখী—সে সুখী না হইয়া পারে না। নাস্ত্যর্থক হইতে অস্ত্যর্থক: এই ঠাণ্ডায় বাহির হইবে না।—এই ঠাণ্ডায় ঘরেই থাকিবে। নির্দেশক হইতে প্রশ্নবোধক: রামের অদৃষ্ট মন্দ—রামের অদৃষ্ট কী মন্দ নয়? অনুজ্ঞাবোধক হইতে প্রশ্নবোধক: মাতার আদেশ পালন করো—মাতার আদেশপালন কি তোমার উচিত নয়? নির্দেশক হইতে বিস্ময়বোধক: আমার কপাল মন্দ—হায় রে আমার কপাল!

॥ অনুশীলনী ॥

১। বাক্য কাহাকে বলে?

২। যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি কাহাকে বলে?

৩। বাক্যের অংশ কী কী? নাম কর।

৪। বাক্য কয়প্রকার ও কী কী?

৫। বাক্যের অবান্তর ভেদ কী কী? উদাহরণসহ উহাদের নাম কর।

৬। নিম্নলিখিত সরল বাক্যগুলিকে জটিল ও যৌগিক বাক্যে পরিণত কর:

(ক) ধার্মিকেরাই সুখী। (খ) পরহস্তগত ধন সকল সময় কাজে লাগে না।

(গ) পড়িলেই শিখিতে পারিবে।

(ঘ) আমরা পৌঁছিয়াই এই কথা শুনিলাম।

(ঙ) পথে চলিতে চলিতে আমরা নানা দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম।

[খ] বাচ্য : বাচ্যপরিবর্তন

ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রিয়ার যে-রূপভেদের দ্বারা তৎসম্পাদিত কার্য কাহাকে প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়, সেই রূপভেদকে ক্রিয়ার বাচ্য বলে।

বাচ্য চারিপ্রকার: কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্য।

কর্তৃবাচ্যে কর্তাই বাক্যের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে এবং ক্রিয়াপদটি কর্তার অনুগামী হইয়া থাকে। কর্তৃবাচ্যে কর্তায় প্রথমা হয়, এবং ক্রিয়া সকর্মক হইলে কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন, মাতা শিশুকে চন্দ্র দেখাইতেছেন। রামচন্দ্র রক্ষোরাজ রাবণকে নিহত করিয়াছিলেন।

কর্মবাচ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে কর্মপদটি এবং ক্রিয়াপদটি কর্মপদের অনুগামী হয় অর্থাৎ এখানে কর্মপদই প্রধানভাবে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত। কর্মবাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া ও কর্মে প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন, রক্ষোরাজ রাবণ রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। শিশু কর্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে।

ভাববাচ্যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম থাকে না এবং ক্রিয়াপদটিই বাক্যের মধ্যে প্রধান বলিয়া গৃহীত হয়। এই বাক্যে কর্তা ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয় না। ভাববাচ্যে ক্রিয়াপদ প্রথমপুরুষের হয় এবং কর্তায় দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ষষ্ঠী বা সপ্তমী বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, আমাকে কাল দেশে যাইতে হইবে। তোমার কবে কলিকাতা আসা হইল? তোমায় পড়িতে হইবে না। ভয়ানক বিপদে পড়া গেল। দিনে ঘুমাইতে নাই।

কর্মকর্তৃবাচ্যে কর্মপদ কর্তৃপদের স্থানটি অধিকার করে যে এখানে ক্রিয়াপদের অন্বয় বা সম্পর্ক কর্মপদের সহিত। তা ছাড়া, ঐ বাচ্যে ক্রিয়াপদে কর্তৃবাচ্যের রূপ থাকে। কর্মকর্তৃবাচ্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে কর্মই যেন নিজে কাজটি সম্পন্ন করিতেছে বলিয়া প্রতীতি জন্মায়। যেমন, কাপড়টা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তাঁর বই বাজারে খুব কাটে। ঐ শোন, মন্দিরে শঙ্খ বাজে।

এক বাচ্যস্থিত বাক্যকে অন্যবাচ্যে পরিবর্তিত করাকে বলা হয় বাচ্যপরিবর্তন বা বাচ্যান্তরীকরণ।

কর্তৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্যে :

(ক) তিনি বাঘ দেখিয়াছেন। [কর্তৃবাচ্য]
বাঘ তৎকর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে। } [কর্মবাচ্য]
অথবা, তাঁহার বাঘ দেখা হইয়াছে। }

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় প্রকারের বাচ্যান্তরীকরণই বেশি প্রচলিত।

কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে :

(ক) তুমি কবে আসিয়াছ? [কর্তৃবাচ্য]
তোমার কবে আসা হইয়াছে? [ভাববাচ্য]
(খ) দিনে ঘুমাইও না। [কর্তৃবাচ্য]
দিনে ঘুমাইতে নাই। [ভাববাচ্য]

কর্মবাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে :

(ক) রাম কর্তৃক শ্যাম প্রহৃত হইয়াছে। [কর্মবাচ্য]

২। নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক শব্দ ও বাক্যাংশগুলির অর্থ লেখ :

আদায়-কাঁচকলায়; একমাঘে শীত পালায় না; উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুনো; যমের ঘরের মাসী, কনের ঘরে পিসী; ঘরের ঢেঁকি কুমীর; ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া; ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে; ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো; ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়; মাছিমারা কেরানী; ভাগের মা গঙ্গা পায় না; সোনার পাথরবাটী; শকুনি মামা; শিবরাত্রির সলতে; সাতরাজার ধন।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ শব্দের অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগ ॥

কোনো ভাষার শব্দকে নানা দিক দিয়া বিচার করা যায়। ব্যুৎপত্তি অনুসারে শব্দের একরকম শ্রেণীবিভাগ, আবার, অর্থে বিভিন্নতা অনুসারে আর-একরকম শ্রেণীবিভাগ। অর্থের দিক দিয়া বিচার করিলে বাঙলা শব্দকে তিনটি শ্রেণীতে ফেলা যায় : [এক] যৌগিক শব্দ—Words of derivative sense, [দুই] রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ—Derived words of specialised sense, [তিন] যোগরূঢ় শব্দ—Compound words of specialised sense.

[ক] একাধিক যৌগিক শব্দের যোগে অথবা মূলশব্দ বা ধাতুর সহিত প্রত্যয়ের যোগে কতকগুলি শব্দের সৃষ্টি হয়। এইরূপ সমাসবদ্ধ বা সাধিত শব্দের অর্থ নির্ভর করে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান অর্থাৎ অংশের উপর—এই জাতীয় শব্দকেই যৌগিক শব্দ বলে। শব্দের যে-অর্থ হওয়া উচিত, যৌগিক শব্দ তাহাই প্রকাশ করে। যেমন, অণ্ডজ = অণ্ড – জন্ + ড [ডিম হইতে যে-জীবের উৎপত্তি]; 'অণ্ড' [ডিম] এই নামপ্রকৃতির এবং 'জন্' এই ধাতুপ্রকৃতির সহিত 'ড'-প্রত্যয়-যোগে যে-শব্দটি [অর্থাৎ 'অণ্ডজ'] গঠিত হইল তাহা হইতে শব্দটির যে অর্থ দ্যোতিত হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে। যৌগিক শব্দগুলিতে শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অর্থযোগে সম্পূর্ণ শব্দের অর্থ উপলব্ধি হইয়া থাকে। কতকগুলি দৃষ্টান্ত : দা + তৃচ্ = দাতা [যিনি দান করেন]; রাজার পুত্র = রাজপুত্র [রাজার ছেলে]; পড্ + উয়া = পড়ুয়া [অধ্যয়নশীল], গা + ইয়া = গাইয়া > গাইয়ে [যে গান করে]; চালাক + ই = চালাকি [চালাকের ভাব] ইত্যাদি। [মূলশব্দ বা ধাতুকে 'প্রকৃতি' বলে।]

[খ] যে-সকল প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ তাহাদের উপাদানস্বরূপ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ দ্যোতিত না করিয়া অন্যকিছু বিশেষ পদার্থ বা কার্যাদি বুঝাইয়া থাকে,

তাহাদিগকেই রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন, 'সন্দেশ' শব্দের মূলঅর্থ হইল 'সংবাদ', পরে পরে ইহার বিশেষ অর্থ দাঁড়াইল 'তত্ত্ব' বা সংবাদ লইবার উপলক্ষে প্রেরিত 'মিষ্টান্ন'-বিশেষ। 'কুশল' শব্দের ধাতুপ্রত্যয়গত অর্থ হইল 'যে কুশ তোলে', কিন্তু প্রচলিত বিশেষ অর্থ হইল 'দক্ষ'। 'দারুণ' শব্দের মূল অর্থ 'দারু বা কাষ্ঠনির্মিত', ইহার প্রচলিত অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'কঠিন'। একটি বিশেষ অর্থদ্যোতক এই প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দই 'রূঢ়ি' নামে পরিচিত।

[গ] সমাসবদ্ধ অথবা একাধিক শব্দ বা ধাতুর দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দ যখন কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাহাদিগকে বলা হয় যোগরূঢ় শব্দ। ইহারা অপেক্ষিত অর্থ দ্যোতিত না করিয়া বিশেষ একটি অর্থ জ্ঞাপিত করে। দৃষ্টান্ত : 'সরোজ' [সরঃ – জন্ + ড], ইহার অপেক্ষিত অর্থ হইল 'সরোবরে জন্মায়' এমন পদার্থ, কিন্তু যোগরূঢ় অর্থ হই 'পদ্ম', 'রাজপুত' শব্দের অপেক্ষিত অর্থ 'রাজার ছেলে,' কিন্তু যোগরূঢ় অর্থ 'জাতিবিশেষ'; 'জলদ' [জল – দা + ক] শব্দের অপেক্ষিত অর্থ 'যে জল দান করে,' কিন্তু বিশেষ অর্থ 'মেঘ'; তদ্রূপ 'দণ্ডবৎ'—মূল অর্থ 'দণ্ডের ন্যায়', বিশেষ অর্থ 'প্রণাম'; 'বৈবাহিক'—মূল অর্থ 'বিবাহের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত', কিন্তু বিশেষ অর্থ 'পুত্র বা কন্যার শ্বশুর'।

॥ অনুশীলনী ॥

১। শব্দের অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধ লেখ।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির দৃষ্টান্তসহ সংজ্ঞা নির্দেশ কর :
যৌগিক, রূঢ়, যোগরূঢ়।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলি কোন্ শ্রেণীর শব্দ তাহা নির্দেশ কর :
বৈবাহিক, সরোজ, কুশল, রাজপুত্র, অগুরু, পড়ুয়া, সন্দেশ, চালাকি, দারুণ, দণ্ডবৎ।

চতুর্থ অধ্যায়

॥ শব্দের অর্থপরিবর্তন ॥

কোনো ভাষার অন্তর্গত কতকগুলি শব্দের নানাভাবে অর্থপরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনধারাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় :

[ক] **অর্থের সংকোচ :** যখন কোনো শব্দ ইহার ব্যাপক অর্থটি দ্যোতিত না করিয়া সংকীর্ণ একটি অর্থ সংকেতিত করিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে শব্দটির অর্থসংকোচ ঘটিয়াছে। যেমন, 'অন্ন' শব্দের মূল অর্থ 'আহার্য সামগ্রী', কিন্তু প্রচলিত অর্থ 'ভাত'; 'করী' শব্দের মূল অর্থ 'কর আছে যাহার', কিন্তু প্রচলিত অর্থ 'হাতী', 'সম্বন্ধী'-র মূল অর্থ 'যাহার সহিত সম্বন্ধ আছে', কিন্তু প্রচলিত অর্থ 'শ্যালক'—এইসব দৃষ্টান্তে শব্দের অর্থসংকোচ ঘটিয়াছে।

[খ] **অর্থের বিস্তার বা প্রসার :** অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো একটি শব্দ প্রথমে একটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হইত, কিন্তু পরে পরে তাহার একটি সাধারণ অর্থ দাঁড়াইয়া যাইবার দৃষ্টান্ত মিলে। বুঝিতে হইবে, সেখানে অর্থের প্রসার ঘটিয়াছে। যেমন, 'কালি' শব্দটির আদিম অর্থ 'কালো রঙ্', কিন্তু এখন 'কালি' বলিতে যে-কোনো রঙের কালি বুঝায়—লাল কালি, নীল কালি, সবুজ কালি ইত্যাদি। 'তৈল' শব্দের আদিম অর্থ 'তিলের নির্যাস', কিন্তু বর্তমানে 'তৈল' বলিতে আমরা শুধু তিলতৈল বুঝি না—নারিকেল তৈল, সরিষার তৈল, ইত্যাদি নানাপ্রকার তৈলকেই বুঝি। 'গঙ্গা' শব্দ হইতে 'গাঙ্' কথার উৎপত্তি। কিন্তু 'গাঙ্' বলিতে এখন কেবল গঙ্গানদীকে বুঝায় না, যে-কোনো নদী অর্থে 'গাঙ' কথাটির প্রয়োগ হইয়া থাকে। এইসব ক্ষেত্রে শব্দের অর্থ বিস্তারলাভ করিয়াছে।

(গ) **নূতন অর্থের আগম :** অনেক সময় দেখা যায়, শব্দের মূল অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে এবং একটি নূতন অর্থের আবির্ভাব ঘটিয়াছে—ইহাই নূতন অর্থের আগম। যেমন, সংস্কৃত 'ঘর্ম' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'গরম', কিন্তু বাঙ্লায় ইহার অর্থ হইতেছে 'স্বেদ' বা 'ঘাম'। 'সচরাচর' শব্দের মূল অর্থ ছিল চরাচরসহ [জগৎ], কিন্তু বাঙ্লায় দাঁড়াইয়াছে 'সাধারণত'। 'পাষণ্ড' শব্দের মৌলিক অর্থ 'ধর্মসম্প্রদায়', কিন্তু বাঙ্লায় ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'ধর্মজ্ঞানহীন', 'অত্যাচারী', 'নিষ্ঠুরহৃদয় ব্যক্তি'। 'কৃপণ' কথাটির মূল অর্থ 'কৃপার পাত্র' কিন্তু বাঙ্লায় 'ব্যয়কুণ্ঠ ব্যক্তি'। 'কেচ্ছা' [আরবী 'কিস্‌সা' শব্দ হইতে] শব্দের মৌলিক অর্থ 'কাহিনী' বা 'গল্প', বাঙ্লায় ইহার অর্থ 'কুৎসা'।

[ঘ] অর্থের উন্নতি : সাধারণ অর্থের পরিবর্তে কোনো খুব উচ্চ একটি ভাব দ্যোতিত করিলে, বুঝিতে হইবে, সেই শব্দটির অর্থের উন্নতি ঘটিয়াছে। যেমন, 'সম্ভ্রম' শব্দের মৌলিক অর্থ 'ভয় করা', প্রচলিত অর্থ 'সম্মান'; 'মন্দির' শব্দের সাধারণ অর্থ 'গৃহ', কিন্তু প্রচলিত অর্থ 'দেবালয়'।

[ঙ] অর্থের অবনতি : অর্থাৎ পূর্বে সাধারণ বা উচ্চভাবব্যঞ্জক ছিল, এখন অর্থের অবনতি ঘটিয়াছে। যেমন, 'ইতর' শব্দের মৌলিক অর্থ 'অন্যলোক', কিন্তু বর্তমানে চলিত অর্থ হইতেছে 'ছোটলোক'। 'মহাজন' কথাটির মৌলিক অর্থ হইল 'মহান্ ব্যক্তি,' কিন্তু বাঙ্লায় ইহার প্রচলিত অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'যে টাকা ধার দেয়'। তদ্রূপ, 'ঠাকুর' [গুরুজন বা দেবতা]>'ঠাকুর' = পাচকব্রাহ্মণ; ঝি [মূল অর্থ 'কন্যা']>'ঝি' = চাকরাণী। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অপেক্ষা হীনতর অর্থ দ্যোতনাকেই অর্থের অবনতি বলে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। 'ভাষার অন্তর্গত কতকগুলি শব্দের নানাভাবে অর্থের পরিবর্তন ঘটে'—এই কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন কর।

২। অর্থসংকোচ এবং অর্থের উন্নতি বলিতে কী বুঝ, তাহা উদাহরণের সাহায্যে বিবৃত কর।

৩। কালি, তৈল, গঙ্গা, ঘর্ম, ভাত, মন্দির ও ঝি—এই শব্দগুলির কোন্‌টিতে অর্থের সংকোচ, বিস্তার, আগম, উন্নতি ও অবনতি ঘটিয়াছে তাহার বিশদ আলোচনা কর।

দুয়ের মধ্যে একটি—অন্তর। পূর্বকাল সম্বন্ধীয়—পূর্বকালীন। অপরের আশ্রয় ব্যতীত অধিষ্ঠান করে—স্বাশ্রয়ী। নিজের চোখে দেখিয়াছে যে—প্রত্যক্ষদর্শী। গোপন করিতে ইচ্ছুক—জুগুপ্সু। ভূষণাদির শব্দ—টুংকার, শিঞ্জন। যে শত্রুকে বধ করে—শত্রুঘাতী। শুনিবামাত্র যাহার মুখস্থ হইয়া যায়—শ্রুতিধর। পরিব্রাজকের ভিক্ষা—মাধুকরী। বর্ণমালার ক্রম বা পরম্পরা রক্ষা করিয়া—বর্ণানুক্রমিকল

॥ অনুশীলনী ॥

১। নিম্নলিখিত বাক্য বা বাক্যাংশগুলির প্রত্যেকটিকে একপদে প্রকাশ কর :

যাহা বিচার দ্বারা ঠিক করা যায় না ; যাহার কিছু নাই ; যাহার প্রতিবিধান করা যায় না ; যাহার বালকত্ব ঘুচিয়াছে ; যাহা পুনঃ পুনঃ দুলিতেছে ; যাহা প্রমাণ করা যায় না ; যে ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন ; বিশ্বজন সম্বন্ধীয় ; যাহা যাহার জানা আছে ; যাহা দুঃখে লাভ করা যায় ; যাহার অন্তর্দিকে দৃষ্টি নাই ; যে নারীর হাস্য শুচি ; যে নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে ; যাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে ; যাহার কুলশীল জানা নাই।

২। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির প্রতিশব্দ লিখ :

একই গুরুর শিষ্য ; পান করিবার ইচ্ছা ; পাণ্ডুর তনয় ; চক্ষুর সম্মুখে ; যাহা পূর্বে ছিল ; হরিণের চামড়া ; ভূষণাদির শব্দ ; বাঘের চামড়া।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ কতকগুলি ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট প্রয়োগ ॥

১। [করা]

গা করা—এ কাজে মোটেই তুমি গা করছ না [গরজ করা, উদ্যম দেখানো] সেইজন্যই তো কাজটি শেষ হচ্ছে না। হাত করা—পুলিশকে সে হাত [করে রেখেছে, বশে আনা], সুতরাং তার শাস্তি পাওয়ার ভয় নেই। মানুষ করা—বউদি আমাকে মানুষ করে না কেন [লালনপালন করা], পরের ছেলে কখনো আপন হয় না। গাড়ী করা—এত দূরের পথ হেঁটে যেও না, গাড়ী করেই [গাড়ীতে চড়ে, গাড়ী ভাড়া করে] যেও। মাথায় করা—তুমি দোষ করেছ, বকবো না তো কি মাথায় করে [খুব আদর দেখানো] নাচবো ? মুখ করা—এই ছেলেটা ভারি অভদ্র, কথায় কথায় সকলকে মুখ করে [গালাগালি করা]।

২। [কাটা]

মাথা কাটা—তোমার চালচলন অতি কুৎসিত হয়ে উঠেছে, এমন করে আর আমাদের মাথা কেটো না [অপমান ডাকিয়া আনা]। জিভ কাটা—লোকটা জিভ কেটে [লজ্জিত হওয়া] বললে, আরে রাম রাম, ও কি কথা বলছেন। আঁচড় কাটা—তুমি যতই কাঁদ না কেন, ও কান্নায় তাদের মনে এতটুকু আঁচড় কাটবে না [গভীর রেখাপাত করা]। ছড়া কাটা—লোকটি বেশ ছড়া কাটতে জানে [ছড়া আবৃত্তি করা]। বই কাটা—বাজার এখন খুব মন্দা, বইটি একেবারেই কাটছে না [বিক্রী হওয়া]। নাককান কাটা—ওই বজ্জাত লোকটার নাককান কেটে দিলেই ঠিক হয় [জব্দ করা, খুব বেশি লজ্জা দেওয়া]।

৩। [ধরা]

মনে ধরা—জিনিসটি আমাদের বেশ মনে ধরেছে [পছন্দ হওয়া]। দর ধরা—একটু সস্তা করে এগুলির একটা দর ধরে দিন [মূল্য স্থির করা], তাহলে সবগুলিই কিনে নেবো। হাত ধরা—বড়সাহেব তো আপনার হাত ধরা [নিতান্ত বাধ্য], আমার একটা গতি করুন। মদ ধরা—যেদিন শুনলাম যে সে মদ ধরেছে [মদ্যপান অভ্যাস করা], সেদিন বুঝলাম তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মাথা ধরা—আমার আজ খুব মাথা ধরেছে [শিরঃপীড়া হওয়া], এ কাজটা এখন শেষ করতে পারব না। ভুল ধরা—কথায় কথায় এমন ভুল ধরলে [দোষ দেখানো] কী করে সে এ কাজটি সম্পাদন করবে?

৪। [লাগা]

মনে লাগা—তার কথাগুলি আমার বেশ মনে লেগেছে [পছন্দ হওয়া]। চমক লাগা—সে এমনভাবে কথা বললে, সবারই চমক লেগে গেল [আশ্চর্যান্বিত হওয়া]। আগুন লাগা—মাঝরাতে তার ঘরে আগুন লাগল [সংযুক্ত হওয়া]। দাগ লাগা—কাপড়ে কী সব দাগ লেগেছে [ময়লা স্পর্শ করা], ওটা প'রো না। চোখ লাগা—এত লোকের চোখ লাগলে [নজর পড়া] কি আর জিনিস ভালো থাকে। বিষম লাগা—ভাত খাওয়ার সময় তার বিষম লাগল [খাওয়ার সময় খাদ্যদ্রব্য গলায় লাগা], আর খাওয়াই হল না।

৫। [মারা]

পাখীটাকে অমন করে ঢিল মেরো না [নিক্ষেপ করা], মরে যাবে যে। এমন করে চাল মেরে [চালাকি দেখিয়ে] কি সারাটি জীবন কাটিয়ে দেবে? তোমাকে হাতে নয়, ভাতেই মারবে [কষ্ট দেওয়া]। পকেট মেরেছে [চুরি করা] বলেই পুলিশ লোকটিকে ধরে নিয়ে গেল। রমেন গ্রাম থেকে সেই যে ডুব মারলো [আত্মগোপন করা], বহুদিন তার আর কোন খোঁজখবর পাওয়া গেল না।

৬। [তোলা]

ছেলেটি ভারি দুষ্টু, সব সময় হাত তোলে [প্রহার করা]। যে-রোগে ধরেছে, এবার সে পটল তুলবে [মারা যাওয়া]। এত টাকা সে খরচ করলে, কিন্তু গ্রামের লোক তবু তাকে জাতে তুললে না [সমাজভুক্ত করিয়া লওয়া]। এত হাই তুলছ কেন [হাই ছাড়া, আলস্য প্রকাশ করা], ঘুম পেয়েছে নাকি? জুয়া খেলে সব টাকা খুইয়েছে, এবার তার দোকানপাট তুলতে হবে [ব্যবসায় গুটানো]। কোম্পানী এবার বহু লোক তুলে দিয়েছে [বরখাস্ত করেছে]।

৭। [উঠা]

এত সাধছি, এত করছি তবু কিছুতেই তার মন উঠছে না [সন্তুষ্ট হওয়া]। তুমি যা যা বলেছ সব কথাই আমার কানে উঠেছে [কর্ণগোচর হওয়া]। জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই উঠছে, দেখছি [বৃদ্ধি পাওয়া]। টাকা খরচ করে জাতে ওঠার [সামাজিক মর্যাদালাভ করা] প্রবৃত্তি আমার নেই। ক'দিন ধরে জিতেন খুব কষ্ট পাচ্ছে, তার চোখ উঠেছে [চোখের একপ্রকার অসুখ]। লাভের কথা দূরে থাক, খরচই যে উঠছে না [আদায় হওয়া]। লোকটা উঠছে [উন্নতিলাভ করছে]।

৮। [দেখা]

সে আমার দিকে চেয়েও দেখে না [দৃষ্টিপাত করা]। আমি এখন আর একটা কাজ দেখছি [অনুসন্ধান করছি]। ভেবে দেখ [চিন্তা করা], তুমি একাজ করতে পারবে কিনা। ডাক্তার তার বুক দেখছে [পরীক্ষা করা]।

৯। [দেওয়া]

আমি তার কথায় কান দিই না [শুনা]। রাম এক মূর্খের হাতে মেয়েটিকে দিয়েছে [বিবাহ দেওয়া]। প্রভু ভৃত্যকে সেখানে যেতে হুকুম দিলেন [আদেশ করা]। ভৃত্যটি উনানে আগুন দিল [অগ্নিসংযোগ করা]।

১০। [যাওয়া]

এ কাজে তোমার মান যাবে না [নষ্ট হওয়া]। যুদ্ধে রাজার প্রাণ গেল [মৃত্যু হওয়া]। সে নিদ্রা যাইতে পারিল না [ঘুমান]। তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ মিটে গেল [শেষ হওয়া]।

১১। [পড়া]

এ ভুলটা আমার চোখে পড়েনি [দেখা]। তার কথাটা আমার তখন মনে পড়ল [স্মরণ হওয়া]। চোরটি পুলিশকে দেখে সরে পড়ল [পলায়ন করা]। এতক্ষণে আমার পেটে দুটো ভাত পড়ল [খাওয়া]।

১২। [রাখা]

ভগবান্ তোমাকে **বাঁচিয়ে রাখুন** [দীর্ঘায়ু করা]। আমি একটি **চাকর রাখলাম** [নিযুক্ত করা]। আমি তাঁর আদেশ **মাথায় রাখি** [সম্মান করা]। **রাখ রাখ** [ছেড়ে দেওয়া], অভিযোগে কী ফল ?

১৩। [চলা]

এত কম টাকায় **সংসার চলে না** [নির্বাহ করা]। ছেলেটির সারাদিন **মুখ চলছে** [খাওয়া]। ঘড়িটা আর **চলছে না** [বিকল হওয়া]। ওই দেখ, কেমন কুল কুল করে **চলেছে** ছোট নদী [প্রবাহিত]।

১৪। [মানা]

গুরুজনকে সর্বদা **মানিয়া চলিবে** [সম্মান দেখান]। মাতাপিতার আদেশ **মানিয়া চলিবে** [পালন করা]। তার সান্ত্বনাবাক্যে মন যে **মানে না** [আশ্বস্ত হওয়া]। তুমি কি **ভুত মান** [বিশ্বাস করা]? 'আহা, কিবা **মানিয়েছে** রে' [দেখান]। 'দহন সমান **মানে** নিশি-শশাঙ্কে' [মনে করা]।

১৫। [মজা]

তারা চার ইয়ারে মিলে বেশ **মজা লুটছে** [আনন্দে মেতে উঠা]। পুকুরটি **মজে গেছে** [শুষ্ক হওয়া]। সব কলাগুলিই **মজেছে** [পাকা]। **মজাবো না, মজাবো না** [বিপদে ফেলা]। '**মজিল** মনভ্রমরা কালীপদনীলকমলে' [আসক্ত হওয়া]।

১৬। [টানা]

রুল টেনে লেখ [রুল দিয়ে রেখা অঙ্কিত করা]। সে **তামাক টানে** [খায়]। **ঘোমটা টেনে** বৌটি সরে গেল [মুখ আবৃত করা]। সে তাকে **টেনে** এক চড় মারল [সজো[redacted]

১৭। [ছাড়া]

দুর্জনের সঙ্গ **ছাড়িয়া দিবে** [ত্যাগ করা]। সে কাপড় **ছাড়িয়া** পরিতে বসিল [পরিবর্তন করা]। আজ দুদিন হল রাম ঘর **ছেড়ে গেছে** [ত্যাগ করা]। এতক্ষণে মাথা **ছাড়িল** [রোগের উপশম হওয়া]। আচার খেয়ে তার **মুখ ছাড়ল** [বিস্বাদভাব কাটা]।

১৮। [থাকা]

সে সর্বদা পিতার কাছে **থাকে** [অবস্থান করা]। সে কারুর কথায় **থাকে না** [সম্বন্ধ রাখা]। ওকাজ এখন **থাক** [রাখিয়া দাও]। আর **থাকতে না** পেরে বললুম [সহ্য করা]।

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ কতকগুলি বিশেষ্য পদের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ ॥

[কান]

তার মতো কানকাটা [নির্লজ্জ] লোকের পক্ষে সবকিছু করাই সম্ভব। তুমি বেসুরা গান করছো, বড্ড কানে লাগছে [শ্রুতিকটু বোধ হওয়া]। কথাটা আমার কানে উঠেছে [শ্রুতিগোচর হওয়া]। বাজে লোকের কথায় কান দিও না [গ্রাহ্য করা]। কথাটা কানে গেল কি [শুনিতে পাওয়া]? তিনি বড়ো কান পাতলা [কোনো কথা শুনলে তা পেটে রাখতে পারে না এমন] লোক, খুব সাবধানে কথা বলবে।

[চোখ]

এতদিনে তার চোখ ফুটলো [জ্ঞানের উদয় হওয়া]—বুঝলে, 'যম-জামাই-ভাগ্‌না, এ তিন নয় আপনা।' লোকটার উপর চোখ রেখো [নজর রাখা], তার চুরির অভ্যাস আছে। ছেলেটাকে চোখে চোখে রাখবে [সতর্ক দৃষ্টি রাখা], কখন যে কী বিপদ ঘটবে তার ঠিক নেই। এমন করে পা'টা মাড়িয়ে দিলে, চোখের মাথা খেয়েছ [অন্ধ হওয়া] নাকি? চোখ উঠেছে [চোখের একপ্রকার ব্যাধি] বলে এ কয়দিন পড়াশুনা মোটেই করতে পারিনি।

[মাথা]

আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়েছে [নষ্ট করা]। মাথা খাও [দিব্য দেওয়া], কলকাতায় পৌঁছামাত্রই একখানা চিঠি লিখো। ...বাবু আমাদের গ্রামের মাথা [শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি]। পড়াশুনায় ছেলেটির বেশ মাথা আছে [মেধাবী অর্থে]। সব বিষয়েই তুমি মাথা ঘামাও কেন [চিন্তা করা] বল দেখি? সবকিছুই পারবো কিন্তু তার কাছে কিছুতেই মাথা বিক্রী করতে পারব না [বশ্যতা স্বীকার করা।]

[হাত]

সকলের কাছে হাত পাতা [ভিক্ষা করা] তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। ছেলেটার একটু হাতটান [চুরিস্বভাব] আছে, সাবধানে থেকো। এ দুর্দিনে হাত না গুটালে [খরচ কমানো] সংসার চালানো তোমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। শরীরে অসুস্থতার জন্যে এ কয়দিন কোনো কাজেই হাত দিতে পারিনি [আরম্ভ করা]। আমার কাছে এসেছো, কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোনো হাত

মেই [প্রভাব অর্থে]। কত কাজ পড়ে আছে—একটু হাত চালাও [দ্রুত কাজ করা], নতুবা খুব অসুবিধের পড়তে হবে। সকলে হাত না লাগালে [সাহায্য না করলে] কাজ হবে কী করে ?

[মুখ]

এমন জঘন্য কাজ করে মুখ দেখাতে [সমাজে চলা] তোমার লজ্জাবোধ হয় না ? মুখ চেয়ে কথা বলা [খাতির করা] রামবাবুর স্বভাব নয়। বউটি তাদের ছেলেটাকে 'মুখপোড়া' বলে গাল দিলে। গোপাল সেদিন যে-কাজটা করলে তার জন্যে বাপমায়ের মুখে চুনকালি [অত্যন্ত দুর্নাম হওয়া] পড়লো। লেখাপড়া করে মানুষ হও, যেন আমাদের মুখ রাখতে [মর্যাদা রক্ষা করা] পার। একদিন তাদের দুজনার মধ্যে কত না ভাব ছিল, কিন্তু আজ পরস্পরের মুখ-দেখা [সাক্ষাৎকার] পর্যন্ত বন্ধ হয়েছে। কথায় কথায় মুখ করা [কটু বলা] তোমার রোগে দাঁড়িয়েছে। এইবার মুখের মত [সমুচিত শিক্ষা] হয়েছে।

[বুক]

মায়ের বুকফাটা [করুণ] কান্না শুনে সবারই চোখে জল এলো। সাহসে বুক বেঁধে [দৃঢ়চিত্ত হওয়া] একাজে নেমে পড়ো, নিশ্চয়ই তুমি সফল হবে। ছেলের গৌরবকথা শুনে মায়ের বুক উঁচু [গর্ব অনুভব করা] হয়ে উঠলো। তাকে আমি বুকে করে [পরম আদরযত্নে] মানুষ করেছি। যতই প্রতিবাদ কর না কেন, একথা আমি বুক ঠুকে [সংসাহস প্রকাশ করিয়া] বলবই বলব। শত্রুকে বুকেপিঠে [সকল দিক দিয়ে] চেপে ধরো।

[গা]

দেখছি, আমার কথাটি তুমি গায়েই মাখছো না [গ্রাহ্য করা]। আর ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবে [আত্মগোপন করা] ? গা করছ না [গরজ করা] বলেই এ কাজটি শেষ হতে এত দেরী লাগল। এইটুকু ছেলের গায়ে হাত তুলতে [প্রহার করা] তোমার লজ্জাবোধ হয় না ? তাঁকে এত বকেও তোমার গায়ের ঝাল মিটল না [আক্রোশ মিটান] ? কাজটার কথা ভাবলেই গায়ে জ্বর আসে [নিতান্ত অনিচ্ছাবোধ]।

সপ্তম অধ্যায়

৷ কতকগুলি বিশেষণ পদের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ ॥

পাকা : পাকা [ত্রুটিহীন] কাজ, পাকা বাড়ী [দালান], পাকা কথা [চূড়ান্ত কথা], পাকা [ওস্তাদ] চোর, পাকা [বাঁধান] রাস্তা, পাকা [বিচক্ষণ] লোক, পাকা দেখা [বিবাহের চূড়ান্ত হওয়ার দেখা] ইত্যাদি।

কাঁচা : কাঁচা [অনিপুণ] লেখা, কাঁচা [ত্রুটিপূর্ণ] কাজ, কাঁচা [নগদ] পয়সা, কাঁচা [অপরিণতবুদ্ধি] লোক, কাঁচা [অপূর্ণ] ঘুম, কাঁচা [অদগ্ধ] ইট, কাঁচা [ইটের নহে] বাড়ি, কাঁচা [স্ট্যাম্প ইত্যাদি না দেওয়া] দলিল ইত্যাদি।

ছোট : ছোট [তুচ্ছ] কথা, ছোট [ক্ষুদ্র] মন, ছোট [আভিজাত্যহীন] ঘর, ছোট [অন্ত্যজ, নীচ নজরের] লোক, ছোট [নিকৃষ্ট] নজর, ছোট [সংক্ষিপ্ত] গল্প ইত্যাদি।

অষ্টম অধ্যায়

৷ সনন্তজাত ও যঙন্তজাত শব্দ ॥

সনন্ত ও যঙন্ত ধাতুর প্রয়োগ বাঙ্‌লা ব্যাকরণে লক্ষিত হয় না—সংস্কৃত সনন্ত ও যঙন্ত ধাতুজাত বিশেষ্য বা বিশেষণ পদগুলিই বাঙ্‌লায় সাধারণত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংস্কৃতে 'ইচ্ছা' অর্থে ধাতুর উত্তর 'সন্' প্রত্যয় হয়, এবং কয়েকটি বিশেষ ধাতুর উত্তর পৌনঃপুন্য ও অতিশয় অর্থে 'যঙ্' প্রত্যয় হয়। এই সনন্ত-যঙন্ত ধাতু হইতে উৎপন্ন পদগুলিই **সনন্তজাত ও যঙন্তজাত শব্দ**-নামে পরিচিত। যেমন :

মূলধাতু	সনন্তধাতু	প্রত্যয়	সিদ্ধপদ	অর্থ
পা	পিপাস্ (?)	অঙ্*	[illegible]	পান করিবার ইচ্ছা
দৃশ্	দিদৃক্ষ্	উ	দিদৃক্ষু	দেখিতে ইচ্ছুক
হন্	জিঘাংস্	অঙ্	জিঘাংসা	হননের ইচ্ছা
জ্ঞা	জিজ্ঞাস্	অঙ্	জিজ্ঞাসা	জানিবার ইচ্ছা
জি	জিগীষ্	অঙ্	জিগীষা	জয় করিবার ইচ্ছা
ভুজ্	বুভুক্ষ্	অঙ্	বুভুক্ষা	ভোজন করিবার ইচ্ছা
দীপ্ যঙন্ত	দেদীপ্য	শানচ্ [মান]	দেদীপ্যমান	অতিশয় দীপ্ত
রুদ্ "	রোরুদ্য	শানচ্ [মান]	রোরুদ্যমান	অতিশয় রোদনশীল
দুল্ "	দোদুল্য	শানচ্ [মান]	দোদুল্যমান	[illegible]

(?) পা + সন্ = পিপাস্।

* অঙ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গবাচক 'আ' [illegible]

॥ অনুশীলনী ॥

১। নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলির বিভিন্ন প্রয়োগ দেখাও :
দেখা, যাওয়া, মারা, লাগা, তোলা, উঠা, পড়া, চলা।

২। নিম্নলিখিত বিশেষ্যপদগুলির বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ দেখাও :
চোখ, হাত, কান, মুখ, বুক, পা।

৩। সনন্ত ও যঙন্ত ধাতুর চারিটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৪। বাক্য রচনা কর :
দিদৃক্ষু, জিঘাংসা, জিগীষা, দোদুল্যমান, দেদীপ্যমান।

নবম অধ্যায়

অশুদ্ধিসংশোধন

[ক]

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রজ্জলিত	প্রজ্বলিত	পৃথকায়	পৃথগয়
অনুমত্যানুসারে	অনুমত্যনুসারে	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
সারথী	সারথি	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
অদ্যাপিও	অদ্যাপি	যশরাশি	যশোরাশি
অন্তরেন্দ্রিয়	অন্তরিন্দ্রিয়	নিরোগ	নীরোগ
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	দুরাবস্থা	দুরবস্থা
উজ্জল	উজ্জ্বল	শিরোশোভা	শিরঃশোভা
ইতিমধ্যে	[redacted]	বয়োপ্রাপ্ত	বয়ঃপ্রাপ্ত
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	শিরপীড়া	শিরঃপীড়া
মনীষি	মনীষী	শিরোপরি	শিরউপরি
যদ্যাপি	যদ্যপি	বক্ষোপরি	বক্ষউপরি
সম্বাদ	সংবাদ	দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট
জগবন্ধু	জগদ্বন্ধু	ইহাপেক্ষা	ইহা অপেক্ষা
মনোযোগ	মনোযোগ	ব্যাথা	ব্যথা
জ্যোতীন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র	উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ
সদ্যজাত	সদ্যোজাত	আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত
বাগেশ্বর	বাগীশ্বর	পরপোকার	পরোপকার
এতদ্বারা	এতদ্দ্বারা	অনাটন	অনটন

[খ]

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্ভূত	অদ্ভুত	দূর্গা	দুর্গা
বাল্মীকী	বাল্মীকি	পরিস্কার	পরিষ্কার
আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা	মৃণ্ময়ী	মৃন্ময়ী
ভাগিরথী	ভাগীরথী	হিরন্ময়ী	হিরণ্ময়ী
মধুসুদন	মধুসূদন	ব্যাবসায়	ব্যবসায়
ধ্বংশ	ধ্বংস	সন্মত	সম্মত
দুর্বিসহ	দুর্বিষহ	মুহুর্ত	মুহূর্ত
অমাবশ্যা	অমাবস্যা	স্বরস্বতী	সরস্বতী
গ্রস্থ	গ্রস্ত	বিকীরণ	বিকিরণ
বন্দ	বন্ধ	বিদ্যুতাগ্নি	বিদ্যুদগ্নি
পিপিলিকা	পিপীলিকা	বিদ্যুতালোক	বিদ্যুদালোক
সাহার্য	সাহায্য	সাক্ষাত	সাক্ষাৎ
দুরুহ	দুরূহ	হাঁসপাতাল	হাসপাতাল
ময়ুর	ময়ূর	শান্তনা	সান্ত্বনা
আলচ্য	আলোচ্য	উদ্গীরণ	উদ্গিরণ

[গ]

গগণ	গগন	আহ্নিক	আহ্নিক
অগ্রনী	অগ্রণী	চিহ্ন	চিহ্ন
অগ্রহায়ন	অগ্রহায়ণ	অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ
নিরাপদেষু	নিরাপৎসু	সায়াহ্ণ	সায়াহ্ন
গননা	গণনা	দূর্ণাম	দুর্নাম
আস্পদ	আস্পদ	[illegible]	প্রনষ্ট
আশীষ	আশিস্	বিসম	বিষম
আনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক	ভীস্ম	ভীষ্ম
চানক্য	চাণক্য	সর্বাঙ্গীন	সর্বাঙ্গীণ
তিরস্কার	তিরস্কার	নিস্ফল	নিষ্ফল
পরিস্কার	পরিষ্কার	পুরস্কার	পুরস্কার
কল্যাণীয়েসু	কল্যাণীয়েষু	উত্যক্ত	উত্ত্যক্ত

[ঘ]

অঘী	অঘা	সুকেশিনী	সুকেশী বা সুকেশা
চাতকিনী	চাতকী	রজকিনী	রজকী
গায়কী	গায়িকা	পিশাচিনী	পিশাচী

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ত্রিনয়নী	ত্রিনয়না	কৌলিন্য	কৌলীন্য
কুরঙ্গিনী	কুরঙ্গী	ননদিনী	ননদ
অনাথিনী	অনাথা	কেবলমাত্র	কেবল
অসহনীয়	অসহনীয় বা অসহ্য	সিঞ্চন	সেচন
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	ঐক্যতান	ঐকতান
অজানিত		জাগ্রত	জাগ্রৎ বা জাগরিত
আলস্যতা	আলস্য বা অলসতা	নিন্দুক	নিন্দক
অধীনস্থ	অধীন	চোষ্য	চূষ্য
গড্ডালিকা	গড্ডলিকা	কথিতব্য	কথয়িতব্য
মহত্নপকার	মহোপকার	জাত্যাভিমান	জাত্যভিমান
আভ্যন্তরীণ	অভ্যন্তরীণ	প্রার্থিতব্য	প্রার্থয়িতব্য
ঐক্যতা	ঐক্য, একতা	প্রযুজ্য	প্রযোজ্য
সৃজন	সৃষ্টি বা সর্জন	নিরক্ত	নীরক্ত
পৌরহিত্য	পৌরোহিত্য	পক্ক	পক্ব
জাগরুক	জাগরূক	উৎকৃষ্টতম	অত্যুৎকৃষ্ট
জ্ঞাতার্থে	জ্ঞানার্থে	পৈত্রিক	পৈতৃক
প্রফুল্লিত	প্রফুল্ল	সাক্ষী দেওয়া	সাক্ষ্য দেওয়া
দোষণীয়	দূষণীয়	কল্যাণীয়াষু	কল্যাণীয়াসু

[ঙ]

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
যুবাগণ	যুবগণ	মহিমাময়	মহিমময়
হৃষিকেশ	হৃষীকেশ	শ্রেয়বোধ	শ্রেয়োবোধ
যোগীবর	যোগিবর	রূপায়ন	রূপায়ণ
রাজাগণ	রাজগণ	ভ্রাম্যমান	ভ্রাম্যমাণ
সমিচীন	সমীচীন	ম্রিয়মান	ম্রিয়মাণ
কালীদাস	কালিদাস	ক্ষীয়মান	ক্ষীয়মাণ
দুরাত্মাগণ	দুরাত্মগণ	নির্দোষী	নির্দোষ
[illegible]	স্থাণু	সাবধানী	সাবধান
বণিতা	বনিতা	নির্ধনী	নির্ধন
ভৌগলিক	ভৌগোলিক	সান্ত্বনয়পূর্বক	সান্ত্বনয়ে, অনুনয়পূর্বক
কুৎসিৎ	কুৎসিত	মৌনতা	মৌন
[illegible]	জয়, সমর্থ	প্রসারতা	প্রসার
[illegible] পর্যন্ত	আকণ্ঠ বা কণ্ঠ পর্যন্ত	লক্ষ্যণীয়	লক্ষণীয়

দ্রষ্টব্য : মাতাপিতৃহীন—যাহার মাতা ও পিতা নাই।
পিতৃমাতৃহীন—যাহার পিতার মাতা নাই।
মাতৃপিতৃহীন—যাহার মাতার পিতা নাই।

[চ]

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনুবাদিত	অনূদিত	শারিরিক	শারীরিক
কিম্বা	কিংবা	রামায়ন	রামায়ণ
স্বচ্ছল	সচ্ছল	কৌতুহল	কৌতূহল
সমৃদ্ধশালী	সমৃদ্ধিশালী	ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ
ভূমিষ্ট	ভূমিষ্ঠ	পরিত্যজ্য	পরিত্যাজ্য
স্বত্ব	স্বত্ব	মহারথী	মহারথ

॥ অনুশীলনী ॥

১। নিম্নলিখিত পদগুলি শুদ্ধ করিয়া লেখ :

গলাধকরণ, প্রাণীদেহ, ইদানিন্তন, শাশ্বতী, আবাল্যপর্যন্ত, সযত্নপূর্বক, গুণীগণ, তড়িতাহত, গায়কী, বঙ্কদেশ, বাল্মীকী, স্বরস্বতী, মহিমামণ্ডিত, শ্রদ্ধাস্পদ, নিরভিমানী, দুরাবস্থা, সশঙ্কিত, মহিত, দৈন্যতা, নিরপরাধিনী, রুচিবান্, উৎকর্ষতা, স্পন্দন, বিদ্যুতালোক, প্রতিযোগীতা।

২। ব্যাকরণগত টীকা লেখ :

অন্তঃশীলা, অণুবীক্ষণ, গলাবাজি, মন্তরতন্তর, গৌরাঙ্গিনী, পঞ্চবটী, সমভিব্যাহারে, যাচ্ছেতাই, হানাহানি, চূর্ণীকৃত, বনস্পতি।

দশম অধ্যায়

॥ ভিন্নার্থক শব্দ ॥

বাঙলা ভাষায় বহু শব্দের বিভিন্নার্থে প্রয়োগ দেখা যায়। নিম্নে সেইরূপ কতকগুলি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখান হইল :

[ক]

অর্থ

ধন—অর্থের জন্য মানুষ কী না করে।

জন্য—পরার্থে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি জীবন উৎসর্গ করেন।

মানে—এই শব্দের অর্থ লেখ।

অভিপ্রায়—সে কী অর্থে যে আমাকে এ কাজ করতে বললো তা বুঝতে পারলাম না।

অঙ্ক

সংখ্যালিখন—জ্যোতিষী অঙ্ক পাতিয়া গণনা করিতে আরম্ভ করিল।

ক্রোড়—শিশুটি মাতার অঙ্ক আশ্রয় করিল।

গণিতশাস্ত্র—বালকটি অঙ্কে পাকা।

নাটকের পরিচ্ছেদ—শকুন্তলা সাত অঙ্কে সমাপ্ত।

অম্বর

আকাশ—সুনীল অম্বরের প্রতি চাহিয়া দেখ।

বস্ত্র—পীতাম্বর হরিকে স্মরণ কর।

অপেক্ষা

চেয়ে—রাম শ্যামের অপেক্ষা বেশি বুদ্ধিমান্।

প্রতীক্ষা—আমি এতদিন তাহার অপেক্ষায় ছিলাম।

অথর্ব

চতুর্থ বেদ—অথর্ববেদ বেদচতুষ্টয়ের অন্যতম।

শক্তিবিহীন—লোকটি বৃদ্ধবয়সে অথর্ব হইয়া পড়িয়াছে।

আগম

লাভ—এমাসে আমার অর্থাগমের সম্ভাবনা আছে।

শাস্ত্র—রামের ভ্রাতা আগমশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

ব্যাকরণের সংজ্ঞাবিশেষ—'আস্পদ'-পদে সুট্ আগম হইয়াছে।

উত্তর

দিক্‌বিশেষ—ভার[redacted]য় অবস্থিত।

পরবর্তী—রবীন্দ্রোত্তর যুগে আরো কয়েকজন নবীন কবি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন।

জবাব—ছেলেটি কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিল।

বিরাটরাজের পুত্র—উত্তর অর্জুনের শৌর্য দেখিয়া বিস্মিত হন।

অসাধারণ—সেই মহাত্মার লোকোত্তর চরিত্রে রাজা মুগ্ধ হইলেন।

ক্রমশ—লোকটি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কুল

সমূহ—সন্ধ্যায় বিহঙ্গকুল নীড়ে ফিরিয়া যায়।

বংশ—সৎকুলে জন্মগ্রহণ ঈশ্বরাধীন।

ফলবিশেষ—এ গাছের কুলগুলি খাইতে মিষ্ট।

পালা

স্তূপ—খড়ের পালায় তাহারা আগুন লাগাইয়া দিল।
পর্যায়—এবার আমাদের সেখানে যাবার পালা।
পালন করা—স্বাস্থ্যের নিয়ম পালা সকলেই উচিত।

কাণ্ড

গুঁড়ি—এই গাছের কাণ্ডটি বেশ মোটা।
ঘটনা—দেখি, বালকটি ঘরে এক কাণ্ড বাধিয়েছে।
সর্গ—সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়েও ছেলেটির গ্রন্থে-বর্ণিত কাহিনীর সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়নি।

কর

হাত—সে কর জোড় করিয়া বলিল।
খাজনা—শুনা যায়, পাকিস্তানে জিজিয়াকরের পুনঃপ্রবর্তন করা হইয়াছে
কিরণ—এত অন্ধকার যে রবির করও সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না।

পক্ষ

পাখী—রঘুনাথ পক্ষধরের পাখা ছেদন করিয়া বাঙলায় ফিরিয়া আসেন
তরফ—তাহার পক্ষে কেহ বলিবার ছিল না।
মাসার্ধ—পনের দিনে এক পক্ষ হয়।

বর্ণ

অক্ষর—ব্যঞ্জনবর্ণগুলির নাম কর।
জাতি—বর্ণে বর্ণে নাহি যে প্রভেদ
সকল জগৎ ব্রহ্মময়।
রঙ—সূর্যের অশ্বগুলি শ্বেতবর্ণ।

গুণ

যোগ্যতা—গুণের আদর সর্বত্র।
দড়ি—নাবিক নৌকাটির গুণ টানিয়া চালাইতে লাগিল।
গণিতের প্রক্রিয়াবিশেষ—তিনকে চার দিয়া গুণ কর।
ধর্ম—শৈত্যই জলের গুণ।

ঘন

মেঘ—আকাশ তখন ঘনঘটাময় হইয়া উঠিল।
নিবিড়—এখানে বৃক্ষসকল ঘনসন্নিবিষ্ট।
সমান তিনটি রাশির গুণফল—দুইয়ের ঘনফল কত হবে, বল।
ঘোর, গভীর—'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা'।

[খ]

নিম্নে আরো কতকগুলি শব্দের বিভিন্নার্থ দেওয়া হইল :

কর্ম—উৎসব-অনুষ্ঠান, কাজ, সুকৃতি-দুষ্কৃতি, চাকরি।
কাল—সময়, সবনাশ, সর্বনাশের হেতু, যম, মৃত্যু।
কথা—উল্লেখ, অনুরোধ, উক্তি, প্রসঙ্গ, অঙ্গীকার, আলাপ।
কলা—চন্দ্রের ষোড়শ ভাগ, কৌশল, বিদ্যা।
তত্ত্ব—পারমার্থিক জ্ঞান, মূলবিষয়, বিদ্যা, উপহার, সংবাদ।
চাল—চাউল, আশ্রয়, ফন্দি, ব্যবহার, ঘরের ছাউনি।
জাল—ফাঁদ, সমূহ, নকল, প্রবঞ্চনা।
তারা—নক্ষত্র, অক্ষিগোলক, দেবী।
দণ্ড—শাস্তি, লাঠি, কালমাত্রা।
দ্বন্দ্ব—বিবাদ, (ব্যাকরণে) সমাস, যুগল, বিবাদ।
ধর্ম—পুণ্যকাজ, স্বভাব, যম, গুণ
তাল—ফল, স্তূপ, ধাক্কা, গীত-বাদ্য-নৃত্যে কালের বিভাগ।
ডাক—আহ্বান, চিঠিবিলির সরকারি ব্যবস্থা, পিশাচ, ধ্বনি, খ্যাতি।
ছল—চাতুরী, প্রসঙ্গ, কপট, দোষ, উপলক্ষ।
বার—বাহির, সপ্তাহের বিভিন্ন দিন, দফা।
পত্র—চিঠি, কাগজের পৃষ্ঠা, পাতা, দ্রব্যাদি।
পূর্ব—দিগ্‌বিশেষ, প্রাচ্যদেশ, প্রাচীন।
বাম—প্রতিকূল, মহাদেব, বাঁ-দিক্‌।
বর—স্বামী, প্রসাদ, শ্রেষ্ঠ।
ভূত—প্রেত, উপাদান, অতীতকাল, জীব।
ভার—বোঝা, কঠিন, সমূহ, বিষণ্ণ।
ভাব—ভঙ্গি, আ[illegible] অস্তিত্ব, মনের অবস্থা, চিন্ত
বাস—বস্ত্র, সুগন্ধ, গৃহ, অবস্থান।
রাগ—ক্রোধ, বর্ণ, অনুরাগ।
হরি—বিষ্ণু, হরণ, সাপ, জল, ব্যাঙ।
সন্ধি—বর্ণদ্বয়ের মিলন, যুদ্ধবিরতি, জোড়, গাঁট, তিথিদ্বয়ের মিলন।
লোক—জন, স্থান, ভৃত্য।
রস—নির্যাস, অলংকারশাস্ত্রকথিত আদি, বীর, করুণ ইত্যাদি ; আন[illegible] দেহের ধাতুবিশেষ।
মুখ—আনন, মুখগহ্বর, প্রবেশপথ, সম্মুখভাগ, [illegible]
মাথা—মস্তক, বুদ্ধি, শীর্ষ, অগ্রভাগ, মোড়, নেতা

একাদশ অধ্যায়

॥ প্রতিশব্দ ॥

একটি শব্দের পরিবর্তে তদর্থবোধক অপর যে-সকল শব্দের ব্যবহার হয় তাহাদিগকে বলে উক্ত শব্দের প্রতিশব্দ। অতএব একটি শব্দের এক অথবা একাধিক প্রতিশব্দ দেখা যায়।

ভাষায় একই শব্দকে বার বার ব্যবহার করিলে শ্রুতিসুখকর হয় না। এ কারণে প্রতিশব্দ জানা থাকিলে ঐ প্রকার শ্রুতিকটুতা পরিহার করা যায়।

নিম্নে কয়েকটি শব্দের প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইল :

চন্দ্র—বিধু, সোম, শশধর, হিমকর, শশী, চাঁদ, মৃগাঙ্ক, হিমাংশু, হিমকর, কলানিধি, নিশাকর।

সূর্য—রবি, ভাস্কর, মিত্র, আদিত্য, তপন, দিবাকর, অর্ক, অরুণ, ভানু, অংশুমালী, দিননাথ, বিভাবসু, মার্তণ্ড।

অগ্নি—অনল, বহ্নি, বৈশ্বানর, কৃশানু, পাবক, হুতাশন, জাতবেদা, ঊর্ধ্বশিখ, কৃষ্ণবর্ত্মা।

অন্ধকার—তিমির, তমিস্রা, তমসা, তমঃ, আঁধার।

ঈশ্বর—বিধাতা, ঈশ, বিভু, বিধি, জগদীশ্বর, সৃষ্টিকর্তা, ভগবান্।

গঙ্গা—ভাগীরথী, সুরধুনী, জাহ্নবী।

নদী—তটিনী, স্রোতস্বিনী, তরঙ্গিণী, সরিৎ, স্রোতোস্বিনী।

পৃথিবী—ধরা, মহী, ধরণী, বসুন্ধরা, বসুমতী, মেদিনী, ক্ষিতি, ভূ, ভুবন।

বায়ু—বাতাস, সমীর, সমীরণ, বাত, প্রভঞ্জন, গন্ধবহ।

মেঘ—বারিদ, জলদ, জীমূত, পর্জন্য, অম্বুদ, বারিবাহ।

রাত্রি—নিশা, যামিনী, রজনী, শর্বরী।

সর্প—ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম, অহি, [redacted]।

হস্তী—গজ, দ্বিজ, কুঞ্জর, মাতঙ্গ, হাতী, করী, দ্বিরদ।

স্বর্গ—সুরলোক, দেবলোক, বৈকুণ্ঠ, ত্রিদিব, স্বঃ।

সমুদ্র—উদধি, বারিধি, জলধি, সাগর, রত্নাকর, পারাবার।

রাজা—নৃপতি, নরপতি, নরপাল, ভূপতি, মহীপাল।

হস্ত—হাত, পাণি, ভুজ, কর।

মাতা—অম্বা, জননী, মা, প্রসূতি, গর্ভধারিণী।

যুদ্ধ—রণ, বিগ্রহ, সমর, আহব, সংগ্রাম।

বিদ্যুৎ—বিজলী, চঞ্চলা, চপলা, সৌদামিনী, ক্ষণপ্রভা।

পদ্ম—নলিনী, কমল, কমলিনী, পদ্মিনী, অব্জ, উৎপল।

মৃত্যু—মরণ, মহাপ্রয়াণ, তিরোভাব, মহাপ্রস্থান।

নারী—বামা, মহিলা, রমণী, বনিতা, কামিনী, যোষিৎ, অবলা, স্ত্রী।
চক্ষু—চোখ, অক্ষি, লোচন, নেত্র, নয়ন, অম্বক।
মিত্র—বন্ধু, সুহৃদ, সখা, সহচর।
মনুষ্য—মানব, মানুষ, মনুজ, নর, জন।
পর্বত—শৈল, গিরি, অচল, নগ, ভূধর।
পতি—ভর্তা, নাথ, স্বামী, বর।
ধনু—চাপ, শরাসন, কার্মুক, কোদণ্ড।
পত্নী—দারা, জায়া, ভার্যা, সহধর্মিণী।
দিবস—দিন, অহঃ, দিবা।
তরঙ্গ—ঢেউ, বীচি, ঊর্মি, লহরী
কেশ—চুল, কুন্তল, চিকুর।
কোকিল—পিক, কলকণ্ঠ, অন্যপুষ্ট, পরভৃত।
আকাশ—গগন, অম্বর, শূন্য, ব্যোম, নভঃ, অন্তরীক্ষ, নভস্তল।

দ্বাদশ অধ্যায়

< উক্তিভেদ [Narration] >

উক্তিভেদে বাক্যের আকারের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন দুইপ্রকার—অপরোক্ষ বা সরল উক্তি (Direct form), আর পরোক্ষ বা বক্র উক্তি (Indirect form)।

(ক) বক্তার হুবহু কথাগুলি যদি অন্য ব্যক্তি কর্তৃক বিবৃত হয় তবে তাহাকে বলে অপরোক্ষ বা সরল উক্তি।

(খ) আর, বক্তার কথাগুলি যদি অন্য ব্যক্তি নিজের কথায় প্রকাশ করে তবে উহাকে বলে পরোক্ষ বা বক্র উক্তি। যথা,

অপরোক্ষ—রাম বলিল, 'আমি স্কুলে যাই নাই।'

পরোক্ষ—রাম বলিল যে সে স্কুলে যায় নাই।

উক্তিপরিবর্তন (Change of Narration)

বাংলা ভাষায় উক্তিপরিবর্তনের কোনো নিয়ম নাই। ইহার প্রবর্তন বাংলায় হইয়াছে ইংরেজির অনুকরণে। অপরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তিত করিতে হইলে নিম্নোক্ত নিয়মগুলি মনে রাখিতে হইবে :

(ক) অপরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ-চিহ্ন (quotation marks) প্রযুক্ত হয়। পরোক্ষ উক্তিতে ঐ চিহ্ন তুলিয়া দিয়া 'যে' প্রভৃতি সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার করিতে হয়।

(খ) অপরোক্ষ উক্তিতে প্রথম ক্রিয়াপদটি যে কালের হইবে, পরোক্ষ উক্তিতে ক্রিয়াপদটি অনেক সময়ে সেই কালের হইবে।

(গ) পরোক্ষ উক্তির সর্বনাম পদের পুরুষ, অপরোক্ষ উক্তির আরম্ভের সর্বনাম পদ অনুসারে পরিবর্তিত করিতে হয়।

(ঘ) এই, সেই, এখানে, সেখানে প্রভৃতি বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ পদগুলি পরোক্ষ উক্তিতে প্রায়ই পরিবর্তিত করিতে হয়। উদাহরণ :

অপরোক্ষ—সে আমাকে বলিয়াছিল, 'আমি বড় গরিব।'

পরোক্ষ সে আমাকে বলিয়াছিল যে সে বড় গরিব।

অপরোক্ষ—রাম বলিল, 'আমি গৃহে যাইতেছি।'

পরোক্ষ রাম বলিল যে সে গৃহে যাইতেছে।

আবার ভাব অনুসারে বাক্যে আকারের পরিবর্তন ঘটে। যেমন,

অপরোক্ষ—সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি থাক কোথায়?'

—সে আমাকে আমার বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিল।

অপরোক্ষ	পরোক্ষ
১। ইন্দ্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'তুমি ক্ষেপিয়াছ নাকি? তোমার দোষ কী? তুমি যাবে কেন?'	১। ইন্দ্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিল আমি ক্ষেপিয়াছি কিনা, আমার কোনো দোষ আছে কিনা, এবং আমি কেন যাইব।
২। সে বলল—'থাক, আমার ব্যাপারী, আমার অত খোঁজে দরকার কী?'	২। সে থামিতে বলিয়া বলিল যে আমার ব্যাপারী সে, তাহার অত [illegible]নো দরকার নেই।
৩। সে বলিল,—'তাহলে হবেন রাজি? বাঁচালেন।'	৩। তিনি রাজি হইবেন কিনা সম্মতি জানিয়া সে যে আশ্বস্ত হইল ইহা প্রকাশ করিল।
৪। বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করলাম—'বুঝলাম না তো? ঘেটে মরা কি?'	৪। আমি তাঁহার কথা বুঝিতে পারি নাই এবং 'ঘেটে মরা' কথার অর্থ কী, বিমূঢ়ভাবে তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম।
৫। বেশ বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলাম, 'কী হে, ব্যাপার কী বল দিকিন?'	৫। বেশ বিস্মিত হইয়াই আমি তাহাকে ব্যাপারটি কী তাহা বলিবার জন্য প্রশ্ন করিলাম

॥ অনুশীলনী ॥

১। উক্তি পরিবর্তন কর :

(ক) গোবর মাথাটা নেড়ে জিভ কামড়ে বলল—'আরে ছিঃ! আবার এ সব বাড়াতে গেলে যে অধর্ম, দাদা। এ, নেহাৎ একটু দরকার পড়ে গিয়েছিল ভাই—'

'বলতেই হবে যে দাদা, না না করেও তো খানিকটা পাপ স্পর্শ হোলই—আমার কথা বলছি—আপনারা তো আগুনের মতো নিষ্পাপ, কিছুই জানেন না। না বললে তো শুদ্ধ হতে পাচ্ছি না।'

(খ) অমরবাবু দোতলা থেকে নেমে এসে ডাকহাঁক করেন, 'কই গো, ভাত বাড়নি? এ কী, বিজয় যে বসে! ছি ছি, কী কাণ্ড! আচ্ছা তোমাকেও বলি। বিজয়, বরাবর পরই রয়ে গেলে? অফিসের টাইম হয়ে গেছে, চুপ করে বসে আছ 'বৌদি, ভাতটা দিয়ে দিন' এটুকু বলতে পার না?"

'না না, এই তো এলাম, এই তো এলাম।' আরক্ত মুখে বলেন বিজয়বাবু, 'আপনিও তো অফিস যাবেন।'

ভাবসম্প্রসারণ, বস্তুসংক্ষেপকরণ ও মর্মার্থলেখন-বিষয়ে দুয়েকটি কথা

ভাবসম্প্রসারণ [Amplification]

গদ্য ও পদ্য, উভয়বিধ রচনাতেই রচয়িতা কখনো কখনো এমন বাক্য ব্যবহার করেন যা আকারে সংহত, কিন্তু তাৎপর্যে গভীর ও ব্যাপক। এইসব অংশ এমনই এক-একটা ঘনসংবদ্ধ উক্তি হয়ে ওঠে, মূল কথাপ্রসঙ্গ থেকে অনায়াসে যাকে বিশ্লিষ্ট করে আনা যায়। সেই বিশেষ রচনাপ্রসঙ্গে ওই উক্তিটি ব্যবহৃত হলেও মানবজীবন সম্পর্কে কোনো-না-কোনো সাধারণ সূত্র তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। এই প্রচ্ছন্ন সত্যটিকে প্রকাশ করাই ভাবসম্প্রসারণের মূল উদ্দেশ্য। স্বভাবতই, মূল উক্তিতে যা ছিল সংক্ষিপ্ত সংহত, তাকে যথাসম্ভব বিশদ করে না দেখালে সেই সত্য স্পষ্ট হয় না।

ভাবসম্প্রসারণের সময়ে তাই উদ্ধৃত অংশটিকে প্রথমে বুঝে নিতে হবে। কোন্ কথাগুলি নিছক অলংকরণ, কোন্‌টি মূল বক্তব্য, তা স্পষ্ট করে মনে মনে নির্বাচন করে নিতে হয়। অতঃপর সেই মূল-সূত্রটি-প্রসঙ্গে একটি ছোটো কিন্তু স্বাধীন আলোচনা লিখতে হবে। চিন্তার সংলগ্নতা, চিন্তার বিকাশ এবং ভাষার ওপর প্রভুত্ব, এ-সবই বিচার করা হবে ভাবসম্প্রসারণের পরীক্ষায়। প্রয়োজনমতো কোনো কোনো তুলনীয় উদাহরণ, উপযোগী সমতুল্য আদর্শের উল্লেখ, রচনাকালে ব্যবহার করা চলতে পারে। তবে স্মরণীয় যে, মূল ভাবটিকে অতিক্রম করে লেখা যেন অত্যন্ত ছড়িয়ে না পড়ে। প্রবন্ধরচনার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক স্বাধীনতা লেখক গ্রহণ করতে পারবে, ভাবসম্প্রসারণে তেমন নয়। সংযমের প্রয়োজন এখানে অনেক বেশি।

'এখানে কবি বলছেন' জাতীয় শব্দগুচ্ছের ব্যবহার ভাবসম্প্রসারণে বর্জন করা ভালো। এমন-কি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে রূপক-সহযোগে মূল বক্তব্য উপস্থাপিত হলে সেখানে রূপকের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবারও দরকার নেই। সমস্ত আবরণটির অন্তরালে মূল যে ভাবটি আছে, তাকে মনে রেখে সে-সম্পর্কে বিশদ মন্তব্য লিখে যাওয়াই ভাবসম্প্রসারণের যথার্থ পদ্ধতি হবে।

বস্তুসংক্ষেপকরণ [Pre´cis-writing]

বস্তুসংক্ষেপকরণ ঠিক ভাবসম্প্রসারণের বিপরীত কথা নয়। উল্লেখিত একটি অংশের মূল ভাবটিকে সংক্ষেপ করে বলার নাম হলো মর্মার্থলেখন। বস্তুসংক্ষেপ-করণের বেলায় অন্তর্নিহিত ভাবটিকে মাত্র নিষ্কাশন করে নিলে চলবে না, রচনার

ব্যবহৃত প্রধান তথ্যগুলি প্রায় সবই উল্লেখ করতে হবে। তবে যে-কোনো রচনাই কিছু-পরিমাণ অলংকৃত পল্লবিত থাকে,—বস্তুসংক্ষেপকরণে সেই বাহুল্য যথাসম্ভব বর্জন করে, অলংকার যথাসাধ্য পরিহার করে, নির্দিষ্ট একটি আয়তনের মধ্যে সব কথা গুছিয়ে দিতে হবে।

ভাবসম্প্রসারণে যেমন চিন্তার বিকাশ ও ভাষার প্রসারশক্তি লক্ষণীয়, বস্তু-সংক্ষেপকরণে তেমনি ভাষার সংহরণশক্তি ও চিন্তার সংযম লক্ষণীয়। সাধারণত বলা হয় যে, উল্লেখিত অংশের এক-তৃতীয়াংশ আয়তনের মধ্যে মূল কথাবস্তুকে সংক্ষিপ্ত করে আনতে হবে। একেবারে গাণিতিক নিয়মে পুরোপুরি এই হিসেব না মিলতে পারে, তবে আয়তনের এই সীমাকে মনে রাখা ভালো। আমার নিজের রচনার ওপর কতটা নিয়ন্ত্রণশক্তি আছে, বস্তুসংক্ষেপকরণে তার ভালো পরীক্ষা হয়ে যায়।

মর্মার্থলেখন [Substance-writing]

ভাবসম্প্রসারণের বিপরীত রূপ মর্মার্থলেখন। বস্তুসংক্ষেপকরণে সমগ্র তথ্য এবং বস্তুকে যথাসাধ্য সংক্ষেপে সাজিয়ে দেবার দিকে মন দিতে হয়। কিন্তু মর্মার্থলেখনে সেই তথ্যাবলীর অন্তর্নিহিত মূল ভাবটিকে মাত্র উল্লেখ করতে হবে। ফলে স্বভাবতই মর্মার্থলেখন আয়তনে ছোটো হয়, কিন্তু তাই বলে কোনো নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দেওয়া মর্মার্থলেখনের উদ্দেশ্য নয়। লেখক যদি মনে করেন যে, মূল ভাবটি প্রকাশ করতে উল্লেখিত অংশের প্রায় সমান আয়তন তাঁকে ব্যবহার করতে হচ্ছে, তাও তিনি করতে পারেন। এখানে আয়তন বহির্ভূত কথা, ভাবটিকে স্পষ্ট করে তোলার দিকেই সমস্ত মনোযোগ।

যে-সমস্ত উদাহরণ-অলংকরণ-যোগে একটি মূল ভাবকে উত্থাপিত করা হয়, মর্মার্থলেখনের বেলায় তার সমস্তটাই বর্জন করতে হবে। কথাটিকে লেখক কীভাবে প্রমাণ করেছেন তা ব্যাখ্যা করার দরকার নেই, উদাহরণ ইত্যাদি ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, নিছক সত্যটিকে উপস্থাপিত করে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।

বস্তুসংক্ষেপকরণের জন্যে নির্বাচিত হতে পারে ঘটনাপ্রধান বা বর্ণনাপ্রধান যে-কোনো অংশ। কিন্তু যে-রচনাংশে কোনো ভাব বা Idea প্রধানত প্রচ্ছন্ন হয়ে নেই, এমন উদ্ধৃতি থেকে মর্মার্থলেখন সম্ভব নয়। ভাবপ্রধান রচনাংশই মর্মার্থলেখনের জন্যে নির্বাচিত হয়।

॥ নবম শ্রেণী ॥

কুরুপাণ্ডব

< ভাবসম্প্রসারণ >

॥ ১ ॥ **অগ্নি প্রচ্ছন্ন থাকিলেও অনায়াসেই পরিজ্ঞাত হয়।**

[পৃ. ২৬]

যথার্থ শক্তি সহজেই স্বয়ম্প্রকাশ। প্রাত্যহিক জীবনে এই আক্ষেপ অনেক সময়ে আমরা শুনি যে, সুযোগের অভাবে যোগ্যতা তার প্রকাশের পথ পেল না। এ-আক্ষেপ কতটা মাননীয়, সেকথা ভেবে দেখবার যোগ্য। বাস্তবিকপক্ষে, যোগ্যতা কখনো সুযোগের প্রতীক্ষা করে না, যে-কোনো অবকাশে যে-কোনো পরিবেশে সে নিজেকে প্রমাণ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি নাট্যপরিকল্পনাকালে লক্ষ্য করেছিলেন, বিচিত্র পুঞ্জীভূত আবর্জনাস্তূপ ভেদ করে কেমন এক রক্তকরবী ফুটে উঠেছিল, যেন সমস্ত জড়ত্বের বাধাকে উপহাস জানিয়ে সে ঘোষণা করছিল: আমাকে মারতে পারলে কই! এই যেমন প্রাণশক্তির অদম্য প্রকাশ সমস্ত প্রতিকূল বিরোধিতার মধ্যেও সে যেমন নিজেকে ঘোষণা করতে ভোলে না—সত্যিকার প্রতিভাও তেমনি। আগুন তার দাহিকাশক্তি আর তার বর্ণোজ্জ্বল দ্যুতি নিয়ে কেমন করে সংগোপনে থাকবে? যদি ভস্মে চাপা থাকে, তার মধ্য থেকে আগুন ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে প্রকাশ করে যায়—আগুনের এই ধর্ম, শক্তির এই ধর্ম। প্রতিভার শক্তি তাই স্বতঃপ্রকাশ, তাকে প্রচ্ছন্ন রাখবার অথবা দমন করবার চেষ্টা যেমন নিতান্ত নিষ্ফল, তেমনি, এ-আক্ষেপ [illegible] যে, প্রতিভা তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি লাভ করল না।

॥ ২ ॥ **প্রমত্ত ব্যক্তি নিতান্তই গর্তমধ্যে পতিত হয়।**

[পৃ. ৩৭]

বাইবেলে একটি জরুরি কথা আছে: Strait is the gate and narrow the way which leadeth unto life, and few there be that find it! জীবনের পথ মসৃণ নয়, উত্থানপতনবন্ধুর। এই পথ অতিক্রম করে স্থির লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার ক্ষমতা সকলেরই নেই, সঙ্কীর্ণ পথ এবং ছোট দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করবার ক্ষমতা অল্প লোকেরই আয়ত্তে আছে। নানা প্রলোভন, প্রবঞ্চনা, হতাশা এবং উদ্যমহীনতা শেষ পর্যন্ত আমাদের সিদ্ধির পথে পৌঁছতে দেয় না: কোনো-

কোনো নেতির মধ্যে জীবনকে অবরুদ্ধ করে রেখে দেয়। জাতীয়-জীবনের যে-কোনো মহানায়কের জীবনী সন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই কত প্রতিকূল প্রত্যাঘাত থেকে আত্মরক্ষা করে তাঁদের স্থির পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হয়েছে। তিলমাত্র ভ্রান্তিতে, ক্ষণেকের ক্লান্তি বা আত্মপরাভবে তাঁদের জীবন শোচনীয়তার গভীরে নিমজ্জিত হয়ে যেতে পারত। প্রত্যেকটি পদক্ষেপের সতর্কতাই ক্রমে তাঁদের মহনীয়তার দিকে অগ্রসর করে নিয়ে গেছে।

কিন্তু সাধারণ জীবনে এই সতর্কতার প্রয়োজন আমরা তেমনভাবে অনুভব করি না। সর্ববিধ প্রমত্ততার মধ্যে নিজেদের আমরা আচ্ছন্ন করে রাখি; যশাকাঙ্ক্ষা, ধনাকাঙ্ক্ষা, শক্তির আকাঙ্ক্ষা—আকাঙ্ক্ষার কোনো শেষ নেই। আর, এই আকাঙ্ক্ষার দ্বারা মত্ত মানুষ তার স্থিরবুদ্ধি অনায়াসে হারিয়ে ফেলে, দূরে চলে যায় তার কর্তব্য-অকর্তব্যের বোধ শুভের দৃষ্টি থেকে ক্রমে সে বঞ্চিত হয়, এবং তখন জীবনের সেই সঙ্কীর্ণ পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নিষ্ফলতার এক অতল গহ্বরে সে স্খলিত হয়ে পড়ে।

॥ ৩ ॥ স্বার্থ চিন্তার সময়ে লোকের ভ্রমে পতিত হওয়া বিচিত্র নহে।

[পৃ. ৫৮]

বুদ্ধি এবং বিবেকের সর্বাঙ্গীণ চালনায়, তার বিস্তারে ও ব্যবহারে, মানুষ অভ্রান্ত জীবনপথের নিবিষ্টপথিক হতে পারে। কিন্তু এই বুদ্ধিবিবেকের শিথিলতা সৃষ্ট হলেই পথিক পথ থেকে বারে বারে সরে যায়, নানা ভুলে ভরে ওঠে তার

স্বার্থচিন্তার দ্বারা মানুষ কেবলই নিজেকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে টেনে নিয়ে আসে। যে-মুক্তদৃষ্টির সাহায্যে জীবনের পথ সহজ ও ঋজু হতে পারত, স্বার্থান্ধ ব্যক্তি সেই দৃষ্টির প্রসাদ থেকে বঞ্চিত। যেমন একচক্ষু হরিণ জানে না কোন্ দিক থেকে তার বিপদ আসন্ন, নিজেকে সে মনে করে যথেষ্ট সতর্ক, অথচ মৃত্যুবাণ বিপরীত দিক থেকে তাকে এসে বিদ্ধ করে—স্বার্থান্ধ ব্যক্তিও তেমনি বিচারবুদ্ধিহীন, সামগ্রিকতাকে লক্ষ্য করা তার পক্ষে ঠিক তেমনি অসম্ভব। ফলে তার পক্ষে পদে পদে বিভ্রম স্বাভাবিক। অন্ধ কেমন করে পথ চলবে, অপরের সাহায্য বিনা? স্বার্থচিন্তামগ্ন ব্যক্তিও তেমনি জীবনের বৃহৎ ভূমিতে বিচরণের যোগ্য নয়. পথ এবং বিপথের প্রভেদ সে উপলব্ধি করে না। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাপঙ্‌ক্তি মনে পড়ে: 'স্বার্থমগ্ন যে-জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে'। বাঁচার যোগ্য জীবন অর্জন করতে হলে, স্বচ্ছদৃষ্টির আবরণহীন প্রসাদ অর্জন করতে হলে, স্বার্থচিন্তাকে সবলে দূরে ঠেলে দিতে হবে।

॥ ৪ ॥ পৃথ্বীতলে ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ।

[পৃ. ৩৮]

পঞ্চেন্দ্রিয়-দ্বারা এই পাঞ্চভৌতিক জগৎকে আমরা সমগ্রভাবে অনুভব করি, তার আনন্দে লীন হয়ে আমরা জীবনের মহিমা উপলব্ধি করি। তখন মনে হয়, জীবনের এই সামগ্রিক আস্বাদের চেয়ে গূঢ়তর আর-কোনো সত্য নেই, সৃষ্টির পরম রহস্য যেন আমরা এরই মধ্যে স্পর্শ করতে পেরেছি।

কিন্তু এমন কোনো মুহূর্ত যদি আসে যখন আমাদের ভাগ্যবিধাতার কাছে পরীক্ষা দিতে হবে, যখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে যে, কোন্ বস্তুর জন্যে আমি আর-সমস্তই ত্যাগ করতে প্রস্তুত, তখনই—আমাদের নিশ্চিত ধারণাগুলি অল্পে অল্পে বিপর্যস্ত হতে শুরু করে। আমরা তো কতই কল্পনা করি, যদি আমরা সর্বশক্তিমান্ হতাম, যদি আমাদের ইচ্ছাপূরণ হতো, আমরা যা চাই তা-ই যদি আমাদের অনায়াস-আয়ত্তগম্য হতো! কিন্তু ইচ্ছাপূরণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে কোনো বরদাতা এসে যদি আজ জিজ্ঞাসা করেন—কী তুমি চাও, একটিমাত্র প্রার্থনা করবার অধিকার আছে তোমার,—মানুষ তবে কী প্রার্থনা করত? কোন্ বস্তু শ্রেষ্ঠ কামনার ধন, কী প্রার্থনা করলে পরমুহূর্তেই নতুনতর কোনো প্রার্থনার জন্যে আর আকুলতার বেদনা জন্মাবে না? ধন চাই? যশ চাই? পুত্রপরিজনে-সমৃদ্ধ সংসার চাই? অনন্ত জীবন চাই? কিন্তু কোনো প্রত্যাশাই শেষ তৃপ্তির দিকে আমাদের নিয়ে যায় না। সম্পদ্ বা প্রতিষ্ঠা যে-সুখ নিয়ে আসে তা ক্ষণকালীন, তা কখনোই জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ নয়। গভীরতর অভিনিবেশে এ-সত্য সহজে ধরা পড়ে।

তখন ক্রমে মানুষ উপলব্ধি করে, পৃথিবীতে ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ। ধর্মের অর্থ এখানে দেবাচার নয়, ঈশ্বরচিন্তন মাত্র নয়। যা ধারণ করে থাকে, যার মধ্যে অস্তিত্ব বিধৃত, সেই সত্তার অনুভবই ধর্ম। মানুষের প্রতিষ্ঠা মনুষ্যত্বের ধর্মে, অপরাপর জীবের স্থিতি মাত্র জীবধর্মে। মানুষের ধর্ম এই জীবধর্মের চেয়ে বড়ো, কঠিনতর তার পরীক্ষা, সূক্ষ্মতর তার আচরণ। এই ধর্মের যথাযথ অনুশীলনেতেই মানুষ সত্যকার তৃপ্তি অর্জনে সক্ষম, এর দ্বারা অধিকৃত যে সুখ তা-ই পরিণামে স্থায়ী হতে পারে; তাই, ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ। যে-অব্যক্ত বাসনাগুলির তাড়নায় মানবজীবন অশান্ত দিশাহীন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, ধর্মাচরণের ধৈর্যে তা ক্রমে অপগত হয়। জীবনকে একটা সুষম সামঞ্জস্যের মধ্যে স্থাপিত করে দিয়ে ধর্ম তার আপন কর্তব্য সমাপন করে। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো মনে হতে পারে এই ধর্ম পরিণামে কেবল দুঃখবাহী, জীবনের প্রত্যক্ষ উল্লাসভূমি থেকে সে আমাদের বহিষ্ক্রান্ত করে দেয়। কিন্তু যথার্থ জীবনানন্দ আছে জীবনের প্রত্যক্ষে নয়, তার গাঢ় অবতলে। ক্রমশ তাকে আবিষ্কার করে নেবার যে তৃপ্তি, ধর্মের দ্বারাই মানুষ তা অর্জন করে।

করতে পারে, তবু তার আজন্মলালিত সংস্কারের মধ্যে সামাজিক বিধিনিষেধের যা কর্তব্যাকর্তব্যের দায়ভাগ কিছু থেকে যায়, তাকে অতিক্রম করা বিবেকবান মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

তাই, বিবেকী পুরুষের চিত্তে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। কেননা, কর্তব্যের গুরুভার তাঁকে বহন করতে হয়, আবার, এই ভারবহনের বেলা তাঁর হৃদয় হয়তো পদে পদে ক্ষুণ্ণ বিপর্যস্ত হয়; হৃদয় আর বিবেকের সংঘর্ষে তাঁর ব্যক্তিপুরুষ সমগ্র কাল জুড়ে মথিত হতে থাকে। পরিণামে বিবেককেই যদি জয়ী না করা যায়, তবে যথার্থ মনুষ্যত্বের গৌরব থেকে তিনি মুহূর্তমধ্যে স্খলিত হয়ে যান। মনুষ্যত্বের পরীক্ষা তাই কঠোরতম পরীক্ষা।

রামচন্দ্রের ইতিহাস আমাদের মনে পড়ে। বৎসরের পর বৎসর বর্ণনাতীত দুঃখভোগ করবার পর যে সীতাকে তিনি রাক্ষসগ্রাস থেকে উদ্ধার করে আনলেন, তাকে কি তাঁর পুনর্বার বিসর্জন দিতে হলো না? প্রজারঞ্জনের মহৎ দায়িত্ব পালন করবার জন্যে শপথবদ্ধ রাজা রামচন্দ্র পত্নীবিরহাতুর প্রেমিক রামচন্দ্রকে অবজ্ঞা করতে বাধ্য হলেন—হৃদয়ের ক্রন্দনকে উপেক্ষা করে তাঁর কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিতে হলো। এইভাবেই বিধাতা পরীক্ষা করে নেন, দুঃখবহন করবার সামর্থ্যের মধ্যেই মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। অলৌকিক কর্তব্যের ভার যাঁকে দেন বিধাতা, তাঁর বক্ষে অপার বেদনা।

॥ ৯ ॥ ক্ষত্রিয়বৃত্তিতে ধিক্, যেহেতু অর্থলাভার্থে দয়িত ব্যক্তির হত্যা-সম্পাদন করিতে হয়।

[পৃ ৯৫]

একসময়ে আমাদের সমাজে শ্রেণীগুলি সুনির্দিষ্ট ছিল। জীবনপ্রণালী ও জীবিকার ভেদ অনুসারে শ্রেণীভেদ নির্ণীত ছিল। জ্ঞানের চর্চায়, তপস্যার শান্তিতে ছিল ব্রাহ্মণত্বের পরিচয়, আর, ক্ষত্রিয়ধর্মের প্রকাশ ছিল শস্ত্রের আস্ফালনে শরবর্ষণের প্রয়োগে। ক্ষত্রিয় তাই অন্যের স্পর্ধা সইতে পারে না, যে কোনো যুদ্ধ আহ্বানে মুহূর্তমধ্যে সাড়া না-দেওয়া তার পক্ষে অশেষ কাপুরুষতা। শান্তি যেমন ব্রাহ্মণের ধর্ম, সংগ্রাম তেমনি ক্ষত্রিয়ের। এই ক্ষাত্রধর্মের বশবর্তী হয়ে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকেও অস্ত্রধারণে উত্তেজিত হতে হয়, নতুবা সে ধর্মহীন বলে উপহসিত হবে।

কিন্তু সংগ্রাম যদি হয় আত্মজনের মধ্যে? বন্ধুজনের বিপক্ষে? পরিবেশ-চক্রান্তে কখনো কখনো এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে যাকে আমি প্রিয়জন বলে জানি তারো বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করতে আমি বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম এমনই নিদারুণ হৃদয়হীন যে, তেমন ক্ষেত্রেও আমার পশ্চাদপদ হবার কোনো উপায় নেই, সংগ্রামের শেষ লক্ষ্য জয়লাভকে আমার স্পর্শ করতেই হবে। এই জয়ে কী

পাবে সেই জয়ী? হয়তো পার্থিব ঐশ্বর্য, পার্থিব সুখ। এই পার্থিবতার অভিমুখে অগ্রসর হতে গিয়ে হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে কেবলই আহত করে চলতে হয়, এই হলো ক্ষাত্রধর্মের করুণ পরিণতি।

॥ ১০ ॥ নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইলেও নিজ দুষ্কর্ম বিস্মৃত হইয়া দৈবকে নিন্দা করে।

[পৃ. ১৩৭]

স্বভাবপাপিষ্ঠ কখনোই নিজের দোষগুলির দিকে ফিরে তাকায় না। নিজের প্রতি স্পষ্টত লক্ষ্য করলে হয়তো তার পাপের কিঞ্চিৎ উপশম হতে পারত, আত্মবিচারণায় সংশোধনের সামান্য অবকাশ মিলত। দুরাত্মার দুষ্কৃতিগুলি যখন কোথাও প্রতিহত হয় না, তার জীবনের গর্বিত অবাধ দিনগুলি যখন চলতে থাকে, তখন সে পৃথিবীকে শয়তানের রাজত্ব বলে মনে করে। তারই অসদিচ্ছাগুলির ওপর সবকিছু নির্ভর করে, এই প্রবল প্রত্যয়ে তখন সে স্থিত থাকে। কিন্তু চিরকাল তো এই একই অবস্থা টিকে থাকে না। লব্ধভ্রম শয়তানেরও পতন একদিন আসন্ন হয়। সেই মহাপতনের দিনে সে কি ক্ষণিকের জন্যে উপলব্ধি করে যে, তারই অবিমৃষ্যকারিতা এবং দুষ্ক্রিয়াশক্তির অমোঘ ফল হিসেবে এই পতন? এ-অনুভব যে কখনোই আসে না এমন অবশ্য বলা যায় না। বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিগুলির মধ্যে আমরা দেখি যে, মহাসর্বনাশের শিয়রে উপস্থিত হয়ে দুরাচারীরা তাদের চেতনা ফিরে পায়, আত্মধিক্কারে হাহাকার করে, কিন্তু প্রত্যাবর্তিত হবার কোনোই উপায় তখন আর থাকে না। তবে যারা আরো পতিত, আরো নীচাশয়, তাদের পক্ষে শেষ মুহূর্তের এই হাহাকারও সম্ভবপর নয়। শেষমুহূর্তেও তারা নিজেদের অভ্রান্ত বলে বিবেচনা করে, নিজের অতীত জীবনের সকল দুষ্কৃতির কথা বিস্মৃত হয়ে যায়। এ যে তার কর্মফল, এই বিষময় পরিণাম তার জীবন-যাপনের কার্যকারণসূত্রেই আগত, এ-কথা তার উপলব্ধিতে ধরা পড়ে না। সে তখনো অভিযোগশীল, সে তখনো মনে করে, দৈবের চক্রান্তে তার এই অন্যায় পরিণাম, এ তার প্রাপ্য নয়।

বস্তুসংক্ষেপকরণ

॥ ১ ॥ অনন্ত পরীক্ষায় নির্দিষ্ট খ্যাতিলাভ করিলেন।

[পৃ ১১-১২। শব্দসংখ্যা প্রায় ৪০০]

< রাজপুত্রদের অস্ত্রপরীক্ষা >

রাজন্যবর্গ, অন্তঃপুরিকাবৃন্দ এবং রাজ্যের সমগ্রবিধ কৌতূহলী প্রজাসাধারণ ক্রমে রঙ্গস্থলে উপনীত হলেন। গুরু দ্রোণাচার্য মাঙ্গলিক আচারের দ্বারা অনুষ্ঠানের

শুভসূচনা ঘোষণা করেন। অস্ত্রাবলী পুঞ্জীকৃত হলো। বয়সানুক্রমে পাণ্ডব এবং কৌরব-ভ্রাতৃবৃন্দ পরীক্ষাস্থলে প্রবেশ করলেন। চতুর্দিকে অস্ত্র নিক্ষেপ করে, দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করে স্থির বা অস্থির লক্ষ্য ভেদ করে, বিবিধ রথচালনা-কৌশল প্রদর্শন করে কুমারেরা দর্শকবৃন্দকে অভিভূত করলেন। বিশেষত, অর্জুনের কলা-কৌশল সকলকে বিমোহিত করল। অশ্বে বা গজে আরোহণ করে পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হলে, কিংবা ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের কালে, দর্শককুলের মধ্যে অনেকে এর পক্ষ, অনেকে ওর পক্ষ অবলম্বন করে উৎসাহবাক্যে উত্তেজনা প্রকাশ করতে লাগল। উত্তেজিত যোদ্ধৃযুগলকে অশ্বত্থামা বহুকষ্টে নিবারণ করলেন। অতঃপর গুরুর নির্দেশে রাজপুত্রদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জুন একাকী বিবিধ অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করে প্রজাবৃন্দের অশেষ সাধুবাদ অর্জন করলেন, এবং পুত্রের গৌরব লক্ষ্য করে মাতা কুন্তী আনন্দে অভিভূত বোধ করলেন।

॥ ২ ॥ রাজা দুর্যোধন শকুনির ··· অমর্ষানলে দগ্ধ হইতেছে।

[পৃ. ৩১-৩২। শব্দসংখ্যা প্রায় ২৪০]

< দুর্যোধনের ঈর্ষা >

ময়দানবকৃত অত্যাশ্চর্য সভাস্থলে আমন্ত্রিত হয়ে দুর্যোধন ও শকুনি সবিস্ময়ে বিচরণ করতে লাগলেন। এমন বিচিত্রভাবে নির্মিত সেই গৃহ যে স্ফটিককে জল মনে করে অথবা দ্বার মনে করে তাঁরা প্রত্যাহত হলেন, উপস্থিত ব্যক্তিদের পরিহাস-ভাজন হলেন। আবার, পরমুহূর্তেই জলকে স্ফটিক মনে করে তার মধ্যে নিমজ্জিত হলেন এবং এরপর থেকে নিতান্তই বিমূঢ়বুদ্ধি হয়ে জলকে স্থল আর স্থলকে জল মনে করতে থাকলেন। পাণ্ডবদের এই ঐশ্বর্যই দুর্যোধনের দারুণ ঈর্ষার কারণ, তদুপরি ভীম প্রমুখের উপহাসবাণী তাঁর অন্তরকে নিরন্তর বিদ্ধ করতে লাগল। স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনকালে বিমর্ষ দুর্যোধন মাতুল শকুনির কাছে অকপটে স্বীকার করলেন যে, ঈর্ষায় তাঁর চিত্ত দগ্ধ হচ্ছে।

৩ ॥ অর্জুন কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার ······পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।

[পৃ. ৬৬। শব্দসংখ্যা প্রায় ২২০]

< শ্রীকৃষ্ণের পক্ষগ্রহণ >

আত্মপক্ষের সমৃদ্ধির জন্যে অর্জুন কৃষ্ণসকাশে দ্বারকায় যাচ্ছেন, এই গোপন সংবাদ জেনে দুর্যোধন দ্রুতগামী অশ্বে অর্জুনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁরা দুজনেই যখন রাজভবনে পৌঁছলেন কৃষ্ণ তখন নিদ্রিত। দুর্যোধন তাঁর শিয়রে আর অর্জুন তাঁর পদতলে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। নিদ্রোত্থিত কৃষ্ণ প্রথমেই অর্জুনকে দেখলেন। আগে এসেছেন, এই দাবিতে দুর্যোধন কৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু কৃষ্ণ জানালেন যে অর্জুনকে তিনি আগে

দেখেছেন, অতএব উভয়কেই তিনি সাহায্য করবেন। এক পক্ষে তিনি নিজে থাকবেন এবং তিনি যুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণ করবেন না, অপর পক্ষে তাঁর অতিশিক্ষিত এক অর্বুদ নারায়ণী সেনাকে তিনি দান করবেন। অর্জুন কৃষ্ণকেই প্রার্থনা করলেন, দুর্যোধনও সন্তুষ্ট চিত্তে নারায়ণীসেনাসহ প্রস্থান করলেন।

॥ ৪ ॥ ইত্যবসরে অর্জুন জয়দ্রথকে প্রতিজ্ঞা সফল করিয়াছেন।

[পৃ. ১২৪-১২৫। শব্দসংখ্যা প্রায় ৩২০]

< জয়দ্রথবধ >

জয়দ্রথসমীপে উপস্থিত হবার জন্যে অর্জুন বিপুল বিক্রমে কৌরবসৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন। কিন্তু কৌরববীরেরা যত্নসহকারে জয়দ্রথকে ব্যূহমধ্যবর্তী করে রেখেছিলেন। সূর্য ক্রমেই অস্তোন্মুখ হচ্ছে দেখে কৌরবপক্ষের উৎসাহ তীব্রতর হলো। অর্জুন ক্রমেই রুষ্ট থেকে রুষ্টতর হয়ে উঠছিলেন এবং অসামান্য বীরত্ব-সহকারে শত্রুসৈন্য ছিন্ন করছিলেন। কিন্তু জয়দ্রথের সামনে উপস্থিত হতে তাঁর তখনো বহু সময় বাকি। এই সংকটসময়ে সূর্য ক্ষণকের জন্যে মেঘাবৃত হলো এবং যুদ্ধরত উভয়পক্ষেরই মনে হলো অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে, কেননা, সূর্য অস্তগত। প্রকৃত অবস্থা বুঝে কৃষ্ণ সতর্ক করে দিলেন সব্যসাচীকে, তিনি জানালেন, এ মেঘ মাত্র। ইতোমধ্যে উল্লাসের আধিক্যে জয়দ্রথ তাঁর সতর্ক পরিবেষ্টন থেকে বহিষ্ক্রান্ত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন ভীষণ শরসন্ধানে তাঁর মস্তক ছিন্ন করে নিলেন। আর, সঙ্গে সঙ্গেই মেঘমুক্ত সূর্য রক্তাভা নিয়ে দৃশ্যগোচর হওয়াতে সকলে জানল, জয়দ্রথবধ সূর্যাস্তের পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে, অর্জুনের শপথ রক্ষা হয়েছে।

॥ ৫ ॥ ইতিমধ্যে কর্ণ চেতনা ন্যায় ধরাশায়ী হইল।

[পৃ ১৩৭-১৩৮। শব্দসংখ্যা প্রায় ৩০০]

< কর্ণার্জুন >

যখন পারস্পরিক শরবর্ষণে কর্ণ ও অর্জুনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ তীব্র হয়ে উঠেছে, সহসা সেই সময়ে দৈবঅভিশাপ সফল করে কর্ণের রথচক্রের গতি রুদ্ধ হলো, মেদিনী-প্রোথিত চক্র কর্ণকে হতবুদ্ধি করে দিল। কর্ণ অর্জুনের কাছে সময় ভিক্ষা করলেন, বীরোচিত ব্যবহারের প্রত্যাশা জানালেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, এই ধর্মবিবেক ইতঃপূর্বে কর্ণের মধ্যে দেখা যায় নি। সাম্প্রতিক এই অঘটন যে দৈবের নির্বন্ধ নয়, বরং তাঁর পূর্বকৃত পাপগুলিরই প্রায়শ্চিত্ত, একথা কর্ণ যেন মনে রাখেন। উত্তেজিত কর্ণ তখন ভয়ংকর আঘাতে অর্জুনকে ধরাশায়ী করে রথচক্রকে মেদিনীমুক্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত হলেন। কিন্তু কিছুতেই এ-কাজ তিনি সম্পন্ন করতে পারলেন না। ইতোমধ্যে অর্জুনের মূর্ছাভঙ্গ হলো এবং অতর্কিত অবসরে দারুণ এক অস্ত্রনিক্ষেপে তিনি কর্ণের শিরশ্ছেদন করলেন, বীরবর কর্ণের দেহ ছিন্ন হয়ে ধরণীতলে পতিত হলো।

॥ ৬ ॥ ইতিমধ্যে পাণ্ডবগণ সেই হ্রদকূলে……সত্যাসত্যতা পরীক্ষা করো।

[পৃ. ১৪৬-১৪৭। শব্দসংখ্যা প্রায় ৪০০]

< হ্রদাশ্রিত দুর্যোধন >

হ্রদকূলে উপনীত হয়ে যুধিষ্ঠির আত্মগোপনকারী দুর্যোধনের উদ্দেশে নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করতে লাগলেন। স্বজনবান্ধব সকলেরই ধ্বংসের হেতুস্বরূপ হয়ে এখন নিজ প্রাণ রক্ষার জন্যে পলায়ন,—এ কখনোই বীরধর্ম নয়। দুর্যোধন অবশ্য জানালেন যে, তিনি মাত্র বিশ্রামলাভার্থে হ্রদপ্রবিষ্ট আছেন। শূন্য শ্মশানের মতো রাজ্য এখন আর তিনি চান না, পাণ্ডবরাই তা ভোগ করুন—তাঁর মুখে এমন করুণাবাক্য শুনে যুধিষ্ঠির উপহাস করলেন। পাণ্ডবেরা এখন তো আর দানের প্রত্যাশায় নেই ; শেষ দ্বন্দ্বযুদ্ধে যাঁর জয় হবে, রাজ্য শেষপর্যন্ত তাঁরই পক্ষের অধিকারভুক্ত হবে, এ তো সহজ কথা। উপর্যুপরি তিরস্কারবাক্যে দুর্যোধনের ধৈর্যভঙ্গ হলো, হ্রদ থেকে বহির্গত হয়ে তিনি ধর্মসংগত যুদ্ধের প্রত্যাশা জানালেন, একের সঙ্গে বহুর অথবা নিরস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রীর যুদ্ধ তো অনুচিত। পরিহাস-সহকারে যুধিষ্ঠির মনে করিয়ে দিলেন যে, আজ বিপন্ন বলেই এমনভাবে ধর্মের কথা মনে পড়লো দুর্যোধনের, অভিমন্যুবধের সময়ে এ তত্ত্বচিন্তা তাঁদের মনে ওঠেনি ! তাহলেও যুধিষ্ঠির প্রতিশ্রুত হলেন যে পাণ্ডবপক্ষের যে-কোন একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করলেই চলবে। মহাহর্ষসহকারে দুর্যোধন তখন যে-কোনো একজনকে গদাযুদ্ধের জন্য আহ্বান করলেন।

মর্মার্থশ্লেষণ

॥ ১ ॥ তুল্যবীর গুরুশিষ্যের সংঘটন …যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

[পৃ. ৫৯-৬০]

ক্ষাত্রধর্মের প্রেরণায় বীর যখন অস্ত্রধারণ করেন, তাঁর কাছে সমস্তরকম ভেদাভেদ তখন তুচ্ছ হয়ে যায়। প্রয়োজন হলে প্রিয় আত্মজনের প্রতিও তাঁর অস্ত্র প্রয়োগ করতে হয়, শিষ্য হয়ে গুরুর বিপক্ষেও যুধ্যমান হতে হয়। কিন্তু প্রকৃত বীর তখন মনের মধ্যে কোনো তীব্র গ্লানি পোষণ করেন না ; তিনি মনে রাখেন যে, তিনি কেবল কর্তব্যের দ্বারাই আবদ্ধ। গুরুর প্রতি হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতে তিনি পরাঙ্মুখ হন না, কিন্তু এই নিবেদনের পরই অস্ত্রক্ষেপণ তাঁর পক্ষে অনিবার্য হয়ে ওঠে।

॥ ২ ॥ কাম ও ক্রোধের বশীভূত····· সাম্রাজ্য ভোগ করো

[পৃ. ৭৫]

রিপুর বশবর্তী মানুষ সৎ-বুদ্ধির দ্বারা কখনোই অভিভূত হয় না। সৎ-অসৎ উচিত-অনুচিতের ভেদ তখন তার কাছে বিলুপ্ত হয়ে যায়, হিতাকাঙ্ক্ষীদের শুভবাণী তখন তার কাছে নিতান্তই অগ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয়। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সে-ব্যক্তি তার নিজ-চরিত্রকেই জয় করতে পারে নি, রিপুর দ্বারা সে পরাজিত। নিজের কাছেই যে পরাজিত সে কি অন্যকে জয় করবার আশা করতে পারে? নিজের ওপর যার প্রভুত্ব নেই অন্যের ওপর কেমন করে সে প্রভুত্ব স্থাপন করবে? অন্তত এই বিবেচনার দ্বারা মানুষ নিজেকে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরিয়ে

.. - ।। ইহাদের উপরই আমার সমস্ত···· অকীর্তি থাকিয়া যাইবে।

[পৃ. ৭৭]

যথার্থ মনুষ্যত্ব লোভ বা ভয়ের শাসনে তার লক্ষ্যপথ থেকে বিচ্যুত হয় না। চিরজীবন যেখানে কোনো মানুষ স্নেহ-প্রেম-সম্মানের দ্বারা ভূষিত হয়েছে, যাদের সহায়তায় তার জীবন ও ঐশ্বর্য গড়ে উঠেছে—তাদের বিপদের দিনে কি তাদেরই সাহায্যার্থে তার প্রাণপাত করা উচিত নয়? এখানে কেবল কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন আছে, মনুষ্যত্বের দাবি আছে, অন্য কোনো বিবেচনাই এখানে আর প্রশ্রয় পেতে পারে না। তদুপরি, এই সাহায্য-না-করার অর্থ যদি এই হয় যে, ভুবনবিজয়ী বীরের সঙ্গে যুদ্ধলিপ্ত হতে হলো না—তাহলে সে তো আরো লজ্জার বিষয়, অকীর্তির বিষয়। বীরত্বও মনুষ্যত্বের অঙ্গ। আর, বীরপুরুষ সংগ্রামভয়ে ভীত হওয়ার চেয়ে মৃত্যুবরণকে ——— ——ন।

॥ ৪ ॥ এইসমস্ত আত্মীয়গণ······আমি যুদ্ধ করিব না।

[পৃ. ৮৪

বীরধর্ম ভয়ানক। কর্তব্যের প্রয়োজনে বীর ক্ষত্রিয়কে অনেকসময়ে আত্মীয়বান্ধবের বিরুদ্ধেই অস্ত্রোত্তোলন করতে হয়। এই দুঃখদায়ক মুহূর্তে যথার্থ বীরব্যক্তি কখনো কখনো হৃদয়ের দ্বারা চালিত হয়ে নিতান্ত অবসন্ন বোধ করতে পারেন। বিশ্বসম্পদলাভের প্রত্যাশাতেও এমন গর্হণীয় কর্ম—আত্মীয়বিনাশরূপ কর্ম সম্পাদনচিন্তায় চিত্ত স্বভাবতই শিথিল হতে পারে। এই শিথিলতা বীর

॥ ৫ ॥ যে চিরন্তন ঘটনাপরম্পরার ফলে……মঙ্গল লাভ হইবে।

[পৃ. ৮৫]

মানুষ মনে করে যে, কার্যসমূহের নিয়ন্তা স্বয়ং মানুষ, তার সংঘটন অথবা তার নিরোধ এ-দুইয়ের ক্ষমতা তার নিজ প্রতিভার ওপরেই নির্ভরশীল। কিন্তু গভীরতর দৃষ্টিতে জানা যায় যে, উপরিউক্ত ধারণা কেবল মোহমুগ্ধ মানুষের পক্ষেই সম্ভব; বাস্তবিকপক্ষে, সে নিজে যন্ত্রস্বরূপ, নিমিত্তমাত্র। অন্তর্যামীর কোনো এক বৃহৎ অভিপ্রায় কার্যকারণসম্পর্কের মধ্য দিয়ে, নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেই প্রবাহে সৎ-বিবেক-সম্পন্ন মানুষের একমাত্র কর্তব্য স্ব-ধর্মানুযায়ী নির্দিষ্ট কর্মাবলীর সুসম্পাদন।

॥ ৬ ॥ বাসুদেব স্বীয় বাহুযুগল … দূরীকৃত হইবে না।

[পৃ. ১৫০-১৫১]

অধর্ম সমস্ত সময়েই অধর্ম। অনুচিত আচরণের সমর্থনকল্পে ইচ্ছানুযায়ী নানাপ্রকার যুক্তিজাল বিস্তার করা অসম্ভব নয়, কিন্তু শেষবিচারে তা সমস্তই নিষ্ফল হয়ে পড়ে। বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করবার জন্যে, অথবা ক্রোধোচিত শপথপালনের জন্যে, কৃত হলেই যে অনাচার সমর্থনীয় হতে পারে, এমন নয়। বস্তুত, রিপুর বশবর্তী হয়েই মানুষ সদাচারবিধি লঙ্ঘন করে, পরে হয়তো তার সপক্ষে নানা কারণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়। অধর্মাচারী এমন ব্যক্তি কোনোকালেই সুযশের অধিকারী হন না, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

গল্পে উপনিষদ

< ভাবসম্প্রসারণ >

॥ ১ ॥ **দম, দান, দয়া—ইহা আমাদের পিতামহ প্রজাপতির একটি বড়ো শিক্ষা।**

['দ'। পৃ. ৪]

মনুষ্যত্বের প্রধান শিক্ষা সংকীর্ণ আত্মপরতা থেকে মুক্তি এবং বিশ্বাত্মবোধের জাগরণ। জৈবধর্মবশে আমরা সর্ববিধ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীন এবং আত্মরক্ষার জন্যে ব্যাকুল। কিন্তু যখন জীবনদ্রষ্টা মহর্ষিকুলের সমীপে দীক্ষার জন্যে সমবেত হই, তখন প্রথমেই আমরা এই প্রবৃত্তিমোচনের শিক্ষালাভে ধন্য হই। দম, দান, দয়া, প্রাচীন উপনিষদে এই 'দ'-কার আদি তিন গুণকে মনুষ্যধর্মের সর্বোত্তম গুণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনগুণের আচরণেই আমাদের উদ্বুদ্ধ হতে হবে। দম, দান, দয়া: অর্থাৎ আত্মদমন, দানব্রত ও দয়াধর্ম। এই তিনের দ্বারাই আমরা নিজগণ্ডী থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হবার পথ খুঁজে পাই।

মানুষ প্রবৃত্তির বশীভূত। জন্মের সূত্রেই সে লাভ করে ষড়্‌রিপুময় অস্তিত্ব। কিন্তু কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য—এই রিপুগুলিকে তাদের নিজ নিজ অবাধ মুক্তিতে বিকশিত হতে দেওয়া পাশব লক্ষণ। তাঁকেই আমরা তত বড়ো মানুষ বলে গণ্য করি, যিনি এই বৃত্তিগুলিকে দমন করার সাধনা করেন এবং অবশেষে এদের পরিপূর্ণ দমনের দ্বারা শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বে উপনীত হন। যাঁরা অধ্যাত্মসাধক তাঁরা তো বটেই—এমন কী, যে-কোনো সাধনার ক্ষেত্রে যাঁরা বড়ো, তাঁদের সকলের ক্ষেত্রেই আমরা দেখি এই প্রবৃত্তিমুক্তির প্রক্রিয়া।

আত্মদমন সম্ভবপর হলে [illegible] মানুষের পক্ষে অনায়াসসাধ্য হয়। তখন কৃপণের মতো সঞ্চয়ের দিকেই সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ হয় না, দানের দ্বারা যে ঐশ্বর্যের যথার্থ ব্যবহার তা সে উপলব্ধি করে। পরের মঙ্গলার্থে নিযুক্ত অর্থ তখন চরিতার্থ হয়। আমাদের গার্হস্থ্যজীবনেও তাই দেখি দানের শিক্ষা একটি বড়ো শিক্ষা। দরিদ্র ভিক্ষার্থী অতিথিকে আমাদের দেশে দেবতারূপে গণ্য করা হয়েছে। যে নিজে দীন, সেও একমুষ্টি ভিক্ষা অর্পণ করতে না পারলে মনে মনে ব্যথা বোধ করে।

তেমনি দয়া। জীবে দয়া পরম ধর্ম, অহিংসা পরম ধর্ম—এ যে-কোনো একক দেশের একক মহাত্মার বাণীবিকিরণ, এমন নয়। বিশু থেকে চৈতন্য পর্যন্ত যুগযুগান্তরে দেশদেশান্তরে মানবহিতৈষীরা সকলেই এই সদ্বৃত্তির ঘোষণায় উচ্চকণ্ঠ। [illegible] যখন যথার্থই মানবপ্রীতির বীজ উপ্ত হয়, তখনই আমরা [illegible]

প্রসারিত করে নিতে পারি। দম, দান ও দয়া এই তিনের দ্বারা স্রষ্টা আমাদের তখন সার্থকতম মনুষ্যত্বে উন্নীত করে দেন।

॥ ২ ॥ প্রাণের কথা শুনিলে শুষ্ক তরু পর্যন্ত মঞ্জরিত হয়, জীবন্ত মানুষের আর কথা কী।

[প্রাণের জয়। পৃ. ১১]

পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যা আমরা সহজে গ্রহণ করিতে পারি, তাকেই একমাত্র সত্য বলে কখনো কখনো আমাদের ভ্রম জন্মায়। কিন্তু সত্যের এই বোধ আপাত-বোধ। গভীর অনুপ্রবেশের ফলেই মূল সত্য আবিষ্কার করা সম্ভব। পৃথিবীতে বাহ্যবস্তুর বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের তো সীমা নেই। কিন্তু বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের কোনো অন্তরালস্থিত মূল আছে কি? কোন্ মহা অস্তিত্ব ধারণ করে আছে এদের সবাইকে?

এই সমস্ত প্রশ্ন আর অনুসন্ধান থেকেই দেশে দেশে যুগে যুগে কত দার্শনিকের উদ্ভব হলো। আমাদের দেশে সুপ্রাচীনকাল থেকে ঋষির সাধনায় সত্যের স্বরূপ নির্ণীত হয়ে আসছে। সেই ঋষির কণ্ঠে আমরা জেনেছি, সমস্ত পার্থিব বস্তুর মধ্যে প্রাণশক্তির উদ্দীপনা, এই প্রাণের মন্ত্রই ঈশ্বরমন্ত্র।

কিন্তু দেহ দৃষ্টিগোচর, প্রাণ তো তা নয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে অঙ্গুলিনির্দেশ করে তো বলা যাবে না: এই হলো প্রাণ। আমরা তাই আমাদের এই অন্তরতম নিগূঢ়তম মূলসত্তাকে দৈনন্দিন জীবনে বিস্মৃত হয়ে থাকি, বহিরাবরণকে প্রাধান্য দিতে শুরু করি। সত্যদ্রষ্টা দার্শনিকের দুয়ারে উপস্থিত হলে তখনই কেবল বুঝতে পারি যে অবাঙ্মনসোগোচর সেই প্রাণপ্রবাহের কত শক্তি। সেই প্রবাহের দ্বারাই বিশ্বের বিচিত্র বস্তুর মধ্যে অজ্ঞাত একটি ঐক্য সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে। এক মানুষের সঙ্গে অপর মানুষ, এক জীবের সঙ্গে অপর জীব, এমন-কী, জীবজগতের সঙ্গে উদ্ভিদ্‌জগৎ এইভাবে একসূত্রে বাঁধা হয়ে আছে। উদ্ভিদ্ যে প্রাণময়, সে তো কেবল দার্শনিকের অলীক কল্পনা নয়, বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত সত্য। যেমন প্রাণবিহীন একটি মানুষ জীর্ণ শরীর একটি শব ভিন্ন আর-কিছুই নয়, প্রাণপরিত্যক্ত একটি বৃক্ষশাখাও তেমনি শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড মাত্র। অথচ যে-মুহূর্তে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়, জীবন জেগে ওঠে, তখনই ঐ শাখা কত পত্রপুষ্পে পল্লবিত সুশোভিত হয়ে ওঠে। জীবনের এই আকস্মিক লাবণ্য কে এনে দিতে পারত, সর্বসঞ্চরমান প্রাণ যদি তা না দিত?

॥ ৩ ॥ সত্যকেই পরম বল ও ভরসা করিতে হইবে। তাহাতে লোকচক্ষে হারিলেও জিত, নিজের মনের কাছে কখনও দৈন্য আসে না।

[সত্যকাম। পৃ. ২৪]

দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ এবং লাভক্ষতির চিন্তাতেই আমরা অধীর থাকি। এই অধীরতা কত মিথ্যাচরণে আমাদের প্রবৃত্ত করায়, কত হীনতার মধ্যেই মুহুর্মুহু

আমাদের নিক্ষেপ করে। লোকভয় রাজভয় মৃত্যুভয় পদে পদে তাড়না করে, তার দ্বারাই আমাদের সমস্ত কর্মবিধি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।

কিন্তু আমাদের মধ্যে যিনি যথার্থ মনুষ্যত্বের সাধনা করেন, তিনি এই আপাতসুখকর জীবনে তুষ্ট নন, তিনি সত্যাভিলাষী। সত্যের প্রতি তাঁর আসক্তি যদি দৃঢ় না হয় তবে তিনি জীবনেরশ্রেয়কে লাভ করতে পারেন না। তাই তাঁর চলার পথ আর-সকলের পথ থেকে পৃথক। তাই, তাঁকে তাঁর চতুর্দিকের পরিপার্শ্ব থেকে মুহুর্মুহু আঘাত করা হয়, যাঁকে আমরা নিজের মতো করে পাই না, তাঁকেই আমরা সন্দেহ করি, ঘৃণা করি, আঘাত করি। আপন পরিবেশের এই অবিরল ঘৃণা-অবজ্ঞার আক্রমণ সহ্য করতে হবে সত্য-পথের পথিককে। কিন্তু তিনি কোন্ শক্তিবলে সহ্য করেন এই দুঃসহ প্রতিকূলতা? আত্মশক্তিই সেই শক্তি, সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও আপ্রাণ ভালোবাসাই সেই শক্তি। এই শক্তিবলে তিনি উপলব্ধি করেন, বাহিরের এই আক্রমণগুলি কত তুচ্ছ, অবজ্ঞেয়! এর কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। নিত্যপরিবর্তমান জনমানসে এক-একসময়ে এক-এক অনুভূতির উদয় হয়, তার কী-বা মূল্য! কিন্তু সত্যের কোনো ক্ষয় নেই, সমস্ত পরিবর্তনের অন্তরালে সত্য নবপ্রতিষ্ঠিত থেকে আমাদের পথ প্রদর্শন করে, সে আমাদের যথার্থ অমরত্বের দ্বারে পৌঁছে দেয়। সত্যদ্রষ্টা মানুষ তাই নির্ভীক, দ্বিধাহীন, অবিচল। প্রেয়কে পরিত্যাগ করে তিনি শ্রেয়ের সন্ধানে সতত তৎপর।

॥ ৪ ॥ যিনি সত্যে স্থিত তিনিই ব্রাহ্মণ। সত্য এবং সরলতাই ব্রাহ্মণের পরিচয়।

[গুরু গৌতম। পৃ. ২৮]

কর্মব্রতভেদে হিন্দুসমাজ একদিন চতুঃশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানলাভেচ্ছু, জপতপদীক্ষাজ্ঞানের মধ্যে যাঁর জীবন নিমগ্ন, তিনি ব্রাহ্মণ। যিনি বাহুবলে শৌর্যের দ্বারা দেশ রক্ষা করেন তিনি ক্ষত্রিয়। দৈনন্দিন ব্যবহারিক জগতের উপ[illegible]ই বৈশ্যের অধিকার। নিম্নতর কর্মের ভার শূদ্রে অর্পিত।

কিন্তু একদিন যা ছিল কর্মানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ, ক্রমে স্বাভাবিক নিয়মে তা পরিণত হলো একটি প্রচলিত অন্ধ-অভ্যাসে মাত্র। জন্মগত অধিকারবলেই আমি আমার শ্রেণী অর্জন করি—আত্মদীক্ষার দ্বারা নয়, কর্মে নিবিষ্টতার দ্বারা নয়, সত্যাশ্রয়ের দ্বারা নয়: এই হলো ক্রমে স্বাবাভিক। ফলত, আজ আর এই শ্রেণীর দিকে মাত্র দৃষ্টিপাত করে আমি বুঝে নিতে পারি না যথার্থই কার কোন্ চরিত্র। যাঁকে ব্রাহ্মণ বলে দেখতে পাই, মনে মনে যাঁকে পূজ্য বলে স্থির করি, হঠাৎ হয়তো দেখি তাঁর আচরণে সত্যকার কোনো ব্রাহ্মণত্ব নাই। ব্রাহ্মণত্ব তো কেবল একটা উপাধিপরিচয় মাত্র নয়। ও তো একটা গুণবাচক নাম। সেই গুণগুলির অভাব থাকলেও, মাত্র জন্মসূত্রেই একজন ব্রাহ্মণ; আবার, সেই গুণ

সত্ত্বেও জন্মকারণে অপর একজনকে যদি বলি শূদ্র—তবে বুঝতে পারি ঐ শব্দগুলির আজ আর কোনো অর্থগত তাৎপর্য নেই।

তথাপি যথার্থ মনুষ্যত্বের সন্ধান যিনি করেন, তিনি জানেন কার কী মূল্য, কার কী পরিচয়। যখন বাঙলাদেশে শাক্তবৈষ্ণবের মধ্যেই ভেদকলহের অন্ত ছিল না, নিম্নবর্ণের আর কী-কথা—তখনই চৈতন্যদেবের মতো একজন ঐক্যবিধায়ক মহামানবের জন্ম সম্ভব হলো। কিন্তু কী তিনি ঘোষণা করলেন? 'সকলে আমার মতে দীক্ষা নাও'—এ তাঁর মূলকথাই নয়। তিনি বললেন: 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ'। দ্বিজ কে? চণ্ডালও ব্রাহ্মণ, এমন-কী, ব্রাহ্মণের চেয়ে বড়ো হতে পারে। কখন? যখন সে হরিভক্তিপরায়ণ, ভক্তির দ্বারা তার চিত্ত যখন নির্মলতা লাভ করেছে। হরিভক্তি অথবা যে কোনো ঐশী শক্তির দ্বারা চিত্তের সমস্ত গ্লানি যখন নির্মূল করে নেওয়া যায়, তখন সত্যের মূর্তি নিমেষে আমার চোখের সামনে প্রতিভাত হতে থাকে। তখন আমি লোকায়ত পৃথিবীর সকল বঞ্চনা এবং লোলুপতা অনায়াসে উপেক্ষা করে যেতে পারি। মানসিক এই সরলতা ও সত্যসন্ধান—এর চেয়ে বড়ো মনুষ্যত্ব, এর চেয়ে বড়ো ব্রাহ্মণত্ব আর কী হতে পারে? তাই, একথা মনে রাখাই ভালো যে, যে ব্রাহ্মণ সে-ই সত্যাশ্রয়ী নয়, যে সত্যাশ্রয়ী তাকেই বলি ব্রাহ্মণ।

॥ ৫ ॥ মর্ত্যলোকের সকলেই জন্মিয়া, শস্যের মতো—ধানের মতো, পাকিয়া বুড়ো হইয়া মরিতেছে, মরিয়া আবার ঐ শস্যেরই মতো নূতন করিয়া জন্মিতেছে।
[নচিকেতা। পৃ ৪৭]

মর্ত্য শব্দটির মধ্যেই 'মৃত্যু' শব্দের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে। সৃষ্টির বহিরবয়বে যা-কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর, সে-সমস্ত অনিত্য, মায়াময় মরণশীল। জীবলোকের—বিশেষত মানবলোকের—সামান্য যতটুকু আয়ুষ্কাল, তারই মধ্যে কত অমরত্বের স্বপ্ন দেখা দিতে থাকে। খণ্ডকালকে অনন্তকাল বলে ভ্রম হয় এবং মনে হয় যেন আমারই প্রয়োজনে আমারই [illegible] জগৎ সৃষ্ট; প্রতিদিনই কত আয়ু বিনষ্ট হয়ে যায় চোখের সামনে, তথাপি মানুষ তার আপন স্বপ্নে বিভোর থাকে, এই তো আশ্চর্য।

মৃত্যু একটি স্থির এবং নিশ্চিত পরিণতি। তাকে অতিক্রম করা যায় না, এ উপলব্ধির জন্যে অবশ্য আমাদের প্রচুর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সেই নিত্যধার্য পরিণামের পরেও একটি প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়। প্রশ্নটি এই: মৃত্যুতেই কি সব শেষ? আচার্য জগদীশচন্দ্রের সেই শোককাতর বিহ্বল উক্তি এখানে স্মরণ করতে পারি: যে যায় সে তবে কোথায় যায়।

মৃত্যু অনিবার্য নয়, এ প্রসঙ্গে সকলে একমত হবেন। কিন্তু মৃত্যুর পরপারে কী রহস্য, তার উন্মোচনে দার্শনিকেরা একই সত্যে পৌঁছতে পারেন না। কারো-বা ধারণা, মৃত্যুতেই সবকিছুর শেষতম পরিণাম, সবই শেষ। কেউ-বা বলেন,

জীবন চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে আসে। জন্ম থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যু থেকে জন্ম এই ক্রমাবর্তনে মহাজীবনের লীলাচঞ্চল পদক্ষেপগুলি আবর্তিত হচ্ছে। এই জীবনচক্রের কোনো ক্লান্তি নাই। বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে বৃক্ষ, তার পত্র, পুষ্প এবং ফল। ফলের থেকে বীজ। এবং পুনরায় সেই চক্রাবর্তন। মানুষও তেমনি জীবনের পর জীবনে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে আসে, তার কোনো পরম ক্লান্তিও নেই, চিরন্তনতাও নেই :

জন্ম-মৃত্যু দোঁহে লয়ে জীবনের খেলা—
যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা পা-ফেলা !

॥ ৬ ॥ ধনু হইতে শরের ন্যায় বাক্য একবার মুখ হইতে নির্গত হইলে আর ফিরান যায় না।

[নচিকেতা। পৃ. ৪৮]

মনীষীরা কখনো কখনো বলেন, বাক্যই ব্রহ্ম। বাক্যের শক্তি অমোঘ। পরমসৃষ্টিরহস্য অবশ্য অবাঙ্‌মনসোগোচর, কিন্তু সৃষ্টিজাত অনুভূতিগুলিকে বাক্যের দ্বারাই আমরা প্রকাশ করতে চাই। জ্ঞানীব্যক্তি সেইজন্যে মনে করেন, এই মহাশক্তির ব্যবহারে সতর্কতা-অবলম্বন সর্বতোভাবে বিধেয়। বাক্‌সংযম এই কারণে মস্ত বড়ো একটি গুণ। যারা বহুভাষী, তারা সেই কারণেই অপভাষীও বটে। 'সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর' এই প্রচলিত সুভাষিতটি এখানে স্মরণীয়। এবং হয়তো এই কারণেই, বাক্যের অপপ্রয়োগ রোধ করবার জন্যেই হয়তো, কোনো কোনো সাধককে আমরা মৌনব্রত পালনে উৎসুক দেখি।

বাক্যের যদি এই মহিমা, তবে তাকে লঘুভঙ্গিতে প্রয়োগ কখনোই সমর্থনীয় হতে পারে না। এই লঘুতার দ্বারা অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে, তাদের সব উচ্চারণেরই মূল্য নেই, প্রয়োজনমতো কথা তাঁরা ফিরিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু বিপদ এই যে, একবার উচ্চারিত হয়ে গেলে, ধরে নিতে হবে, তার সৃষ্টিও হয়ে গেছে। সৃষ্ট বস্তুকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, সৃষ্ট বাক্যকেও তেমনি প্রত্যাহার করা যায় না। বক্তা হয়তো প্রত্যাহার করে নিতে উদ্‌গ্রীব হতে পারেন, কিন্তু বাক্যটি যে প্রযুক্ত হয়েছে একথা সকলেরই মনে গাঁথা রইল। ধনু থেকে নিক্ষিপ্ত শর যেমন তীব্র বেগে দূরে চলে যায় এবং ধনুকের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, বাক্যও তেমনি একবার ব্যবহৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে বক্তার আয়ত্তের অতীত হয়ে অনেক দূরে চলে যায়। অতএব বিবেচক ব্যক্তি বাক্যপ্রয়োগে যথোচিত সাবধান থাকেন। অসতর্কের বিপদ পদে পদে। দশরথকে তাঁর কথার মূল্য দিতে হয়েছিল প্রাণবিসর্জন-স্বরূপ পুত্রনির্বাসনে। রবীন্দ্ররচিত 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটির কথা মনে পড়ে। অসহায়া জননীর অনভিপ্রেত উক্তি 'চল্‌ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে' কত নির্মমভাবে প্রযুক্ত হলো তাঁর দুর্বল কিশোর সন্তানের ওপর।

॥ ৭ ॥ সকলেই বৃক্ষে উঠিয়া ফলের আহরণে রত, ফলের রসাস্বাদনেই মুগ্ধ, পত্রপুষ্পের শোভাদর্শনেই বিভোর। বৃক্ষের মূল জানিল কে? গোটা বৃক্ষকে জানিল কে?

[নচিকেতা। পৃ. ৫৫]

কর্মেই তোমার অধিকার, ফলের কথা ভেবো না: গীতায় শ্রীকৃষ্ণের এই মহদুপদেশ আমরা জ্ঞানে জানি বটে, কিন্তু আমাদের সাধারণ আচরণের মধ্যে এই বাণীর প্রতিফলন বড়োই দুর্লভ। অনায়াসগ্রাহ্য ফলটির প্রতিই আমাদের সমস্ত আসক্তি নিবদ্ধ থাকে। জীবনলাভে ধন্য হয়েছি, এখন সেই জীবনের রস আমূল পান করে নেবার জন্যেই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ: এই জীবনদর্শনের দ্বারাই সংসারের অধিকতর সম্প্রদায় তাদের জীবন চালনা করে। কেন এই জীবন, এ জীবনের মূল্য কোথায়, কী এর পরিণাম—এই তত্ত্বচিন্তায় ভারাক্রান্ত হয় কয়জনের মন? পৃথিবীর বহিঃসৌন্দর্যে আমার চক্ষু-কর্ণ পরিতৃপ্ত। কিন্তু কোথায় এই সৌন্দর্যের উৎস, তার সারভূত সত্তা, কী তার যথার্থ স্বরূপ—এসব গুরুভাবনায় আর্দীন হয় কতজনের চিন্তা? বস্তুত, এসকল চিন্তা জীবনের গভীর অনুধ্যানের বিষয়, দর্শনের জন্ম হয় এই ধ্যান থেকেই। আশা করা যায় না যে, মানুষমাত্রই সেই দার্শনিক প্রজ্ঞার অধিকারী হবেন এবং জগৎ-জীবনের আদিরহস্য সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু কৌতূহলকাতর হবেন।

অথচ এও সত্যি যে, অনুরূপ কৌতূহলের অথবা জ্ঞানের অভাবে আমাদের উপভোগও হয় খণ্ডিত। পৃথিবীর সমগ্র সত্য আমাদের অজানা থেকে যায়, এবং ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ড-সৌন্দর্য-মাত্র লক্ষ্যগোচরে থাকে। ফলে আমরা অল্পই পাই। উপনিষদের ঋষি সে-কারণে প্রথমাবধি সতর্ক করে দেন: ভূমৈব সুখম্। নাল্পে সুখমস্তি। অল্পে সুখ নেই, ভূমাতেই সুখ। জন্মান্ধ যখন তার স্পর্শশক্তির দ্বারা কোনো বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করে, সত্যিই তার কতটা রূপ সে জানে? অন্ধের হস্তীদর্শন কথাটির তাই প্রচলন—চার অন্ধের সেই গল্প আমরা সবাই জানি। সমগ্রকে না উপলব্ধি করে খণ্ড কোনো টুকরোকে জেনে ঐ অন্ধ-চারজনের মতোই এক অবোধ তৃপ্তি আমরা অর্জন করতে পারি, তার বেশি কিছু নয়। সম্পূর্ণ জ্ঞান থেকেই সম্পূর্ণ তৃপ্তির জন্ম। সৃষ্টির মূল রহস্যকে উপলব্ধি করবার সাধনা না করলে এই সম্পূর্ণ জ্ঞানের দেখা মেলে না।

॥ ৮ ॥ মহাকালের দিকে চাহিয়া দেখিলে সমস্তই তো অল্প, অতি অল্প।

[নচিকেতা। পৃ. ৬০]

একটি ছোট্ট পিপীলিকার কাছে আমার ঘরের সামান্য দেওয়ালটাই কত বড়ো, যেন এক মস্ত মরুভূমির মতো। কিন্তু আমার কাছে তার সমস্ত পরিমাপ অনায়াসে জানা হয়ে গেছে, তাকে আমি আমার নিকট-সীমার মধ্যে পাই—আমার কাছে সেটি তাই নিতান্ত তুচ্ছ। পিপীলিকা আর আমার অনুভূতিতে এমন ভিন্নতা

কেন? জ্ঞানের বিষয় যখন একই, জ্ঞানের প্রকৃতি তখন এমন স্বতন্ত্র কেন? কেননা আমার তুলনায় পিপীলিকার আকার-অবয়ব অভিজ্ঞতা-জ্ঞান সবকিছু তুচ্ছ। তার অর্থ এই যে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয়ের অনুপাত অনুসারেই বিষয়টির স্বল্পতা অথবা বিরাটত্ব স্থিরীকৃত হয়।

অভিমানী মানুষ কখনো কখনো ধারণা করে যে তার অভিজ্ঞতাই চূড়ান্ত, তার জ্ঞানসীমাই জ্ঞেয় বস্তুর শেষ সীমা। তার জ্ঞানশক্তির বহির্গত যা-কিছু, তাকে সে জ্ঞাতব্য বলে মনে করে না, তার অস্তিত্ব অবধি সে স্বীকার করে না। কিন্তু এই আত্মপ্রসাদের বাইরে এসে যখন আমরা দাঁড়াই, বিশ্বরহস্যের মূল যখন ঈষৎ-পরিমাণেও চিন্তা করার চেষ্টা করি—তখন নিমেষমধ্যে আমাদের তুচ্ছতা উপলব্ধি করতে পারি। হায়, মহাবিশ্বের তুলনায় আমাদের অস্তিত্ব তো পিপীলিকার চেয়ে কোনো অংশে অধিক নয়। এই অনুভবে সহসা পৌঁছই না বলেই তো ক্ষুদ্র বস্তুকেও বৃহৎ বলে আমাদের বোধ হয়, পিপীলিকার কাছে যেমন দেয়াল। আমার এই সংসার-পরিজন-পরিবেশ কত বৃহৎ! আমার আয়ত্তগত এই ভূমণ্ডল কত বৃহৎ! আমার এই মনুষ্যজন্মটিই-বা কত বৃহৎ! কিন্তু না, কখনো কখনো মনে হতে পারে, জীবন পর্যাপ্ত নয়, জীবন বড়ো ছোটো, সীমাবদ্ধ। হৃদয়মধ্যে এই চেতনা সহসা জাগ্রত হলে আমি কি ঈশ্বরের কাছে আরো জীবন প্রার্থনা করে নেব? শত-র পরে সহস্র, সহস্রের পর লক্ষ বৎসর আয়ুষ্কামনা করে আমি কি আত্মতৃপ্তি অর্জন করব? তখন মনে পড়ে যায়, লক্ষ বা কোটি—আমাদের কল্পনাশক্তির কাছে যার তুল্য বিশালতা দুর্লভ—পরমব্রহ্মের বিবেচনায় তা চোখের একটি পলকপাত-মাত্র। সেই অল্পের প্রতি অভিমুখীনতা আমাদের সত্যের থেকে অনেক দূরবর্তী করে রাখে। অসীমের প্রতি ঔৎসুক্য জাগ্রত হলে তবেই আমরা বিশ্বস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারব, মহাকালের আভাস পাব।

॥ ৯ ॥ ধীর ব্যক্তি যাঁহারা, তাঁহারাই প্রেয় পরিহার করিয়া কেবল শ্রেয়কে

[নচিকেতা। পৃ. ৬২]

সুখ এবং আপাতসুখের মধ্যে এক মস্ত প্রভেদ আছে। শারীরিক স্বস্তি, জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য—এই হলো আমাদের সংসারজীবনের ধারণায় সর্বোত্তম সুখ। এই সুখ কিন্তু তুচ্ছ, আপাত—এরই নামকরণ করা যায় প্রেয়। কিন্তু যা পরম সুখ, যার আবাস জীবনের উপরিতলে নয়, গোপনে গভীরে অবস্থিত—তাই হলো শ্রেয়।

এ খুব স্বাভাবিক যে, অধিকাংশ ব্যক্তি গভীরতার অনুসন্ধানে উৎকণ্ঠিত নন। দৈনন্দিন জীবনযাপনের রমণীয়তা অনুসন্ধান করেই তাঁরা তৃপ্ত থাকেন। সমগ্রের পরিবর্তে খণ্ড, মহত্তের পরিবর্তে তুচ্ছ, স্বরূপের পরিবর্তে রূপের মোহতেই তাঁরা মুগ্ধ থাকেন। প্রেয়কে বরণ করে তাঁরা তৃপ্ত।

কিন্তু যিনি স্থিতধী ব্যক্তি, জীবনের চলচপলতা যাঁর সত্যদৃষ্টিকে ম্লান করতে

পারে না. তিনি উপরিউক্ত প্রাপ্যগুলি প্রাপনীয় বলেই গণ্যই করেন না। তিনি প্রেয়কে অকাতরে ত্যাগ করতে পারেন, শ্রেয়োত্তপস্থার আনন্দ তিনি জেনেছেন। তিনি জানেন যে, এই মুহূর্তের সুখলাভেচ্ছায় আত্মবিসর্জন দিলে চিরন্তনসুখ আয়ত্তের অতীত হয়ে যায়। প্রেয়-র প্রলোভন প্রতিমুহূর্তে তাঁকে দিক্‌ভ্রান্ত করতে আসে, কিন্তু তিনি সবলে তার মায়া ছিন্ন করে চলে যান।

পুরাণকথায় আমরা বারংবার পড়ি, ধ্যানতন্ময় মুনিঋষির তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্যে, তাঁদের মরণশীল মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞান মানুষ করে রাখবার জন্যে, দেবতারা বারংবার তাঁদের সামনে বিচিত্র প্রলোভন তুলে ধরেন। এসব কাহিনীর তাৎপর্য কী? ঐ রূপকের আড়ালে মানবজীবনের মূল সাধনার ইতিহাসই প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে। প্রেয়োবোধের দ্বারা আমাদের চিত্ত আলস্যমন্থর অবশ হয়ে আসে। যিনি তাকে বশীভূত করতে পারেন, যে-কোনো তীব্র দুঃখকেও যিনি বরণীয় বলে মনে করতে পারেন, শ্রেয় অবশেষে তাঁকে আশীর্বাদ করে যায়। মনুষ্যকুলে তিনি অনায়াসে তখন শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেন।

॥ ১০ ॥ এই জিজ্ঞাসা, এই সংশয়, এই ভয়ের অনুভূতি সাধনার প্রথম সোপান। এই সংশয়ই বিচার এবং বৈরাগ্য।

[দেবাসুরের আত্মজ্ঞান। পৃ, ১১০]

অতিনিশ্চয়তার বোধ জ্ঞানলাভের পক্ষে প্রবল বাধাস্বরূপ। নিশ্চিতভাবে যদি আমি জেনে যাই যে অনায়াসলভ্য আপাতরম্য বিষয়গুলিই শেষ সত্য, তার উপভোগেই যদি আমার জীবন বাহিত হয়—তবে প্রকৃত সত্য কোনোদিনই আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হতে পারে না। যে-কোনো বিষয়েরই গভীর থেকে গভীরতর পরিচয় আছে। সেই গভীরতরের রহস্য কার কাছে উন্মোচিত হতে পারে? যিনি জিজ্ঞাসু, জানতে যিনি উৎসুক, তাঁর কাছে। কিন্তু অতিনিশ্চয়তা তো এই প্রশ্নগুলিকে প্রথমেই নির্জীব করে দেয়। যদি আমার সংশয় না জাগে তবে জিজ্ঞাসাও জাগে না; যদি জিজ্ঞাসা না জাগে তবে সত্যকে আমি [illegible]। তাই, সংশয় বা অনিশ্চয়তার অনুভূতি সত্যসাধনার পক্ষে প্রাথমিক প্রয়োজন।

আমাদের অনেকের এরকম ধারণা যে, প্রশ্ন করা সহজ, উত্তর বলাই কঠিন। উত্তরদান বা সমস্যার সমাধান যে বাস্তবিকই কঠিন কর্ম তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্মরণীয় যে, প্রশ্ন করাও কঠিন। আমরা সকলেই কি ঠিক জিজ্ঞাসাটি তুলে ধরতে পারি? এমন কি, জিজ্ঞাসা আমাদের মনে সব সময়ে জেগে ওঠে কি? যে-কোনো সুলভ সহজ সমাধানেই আমরা শিশুর মতো তৃপ্ত হয়ে যাই, 'তারো পর কী' এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে না। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মতো আমরা প্রতিপদে রায় রামানন্দকে প্রশ্ন করতে পারি না: 'এহো বাহ্য, আগে কহ আর'।

জ্ঞানতপস্বী ক্রমেই বাহ্যবস্তু থেকে অপসৃত হতে হতে আন্তর-সত্যে

পৌঁছবার উপক্রম করেন। বিচার-বিশ্লেষণের সজাগ যুক্তিশীল মনন তাঁর সহায়। এই বিচার যদি অগ্রসর হতে থাকে, তবে শুদ্ধ তপস্বী হয়তো ক্রমে বৈরাগ্যের উপলব্ধিতে পৌঁছে যাবেন। যেমন পদ্মফুলের পাঁপড়ি ছাড়াতে ছাড়াতে অবশেষে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, তেমনি বাহ্যবস্তুকে অতিক্রম করতে করতে করতে শেষে সত্যরূপে এক মহাপূর্ণতাকে উপলব্ধি করেন জ্ঞানীপুরুষ। তখন বিশ্বজগতের বহির্বিলাসকে তাঁর মনে হয় নিতান্ত উপেক্ষণীয় বস্তু।

॥ ১১ ॥ বিদ্যার এমনই মহিমা। সেখানে ছোটোবড়ো উচ্চনীচ কোনও ভেদ নাই।

[বৈশ্বানরপুরুষ। পৃ. ১২৫]

মানুষের আপনরচিত সমাজে ভেদবুদ্ধি আর শ্রেণীবিন্যাসের অন্ত নেই। কর্মের ভেদ, বর্ণের ভেদ, বৃত্তির ভেদ, ঐশ্বর্যের ভেদ—সহস্রবিধ ভিন্নতায় আমরা একের থেকে অন্যে পৃথক হয়ে থাকি। এই ভেদবুদ্ধি থেকে কেউ বা বড়ো, কেউ-বা ছোটো।

কিন্তু বিদ্যার ক্ষেত্রে এই ছোটোবড়োর সমস্ত বৈসাদৃশ্য লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। দ্বিজ-চণ্ডালের ভেদে দ্বিজকে বলি উত্তম। কিন্তু চণ্ডালকেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে যদি সে বিদ্যার দ্বারা অধিকৃত হয়। রাজাকে প্রজা দেবতারূপে পূজা করে, কিন্তু প্রজাও পূজনীয় হতে পারে যদি সে বিদ্যার দ্বারা আশ্রিত হয়। এবং এই বিদ্যার ক্ষেত্রে বস্তুত কোনো অধিকারভেদ চলে না।

একথা অবশ্য ঠিক যে, আধুনিক কাল বিদ্যার এই সহজ মহিমা স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত হবে। যে-কাল স্বয়ং ভ্রষ্ট, সেখানে সত্যের প্রতি অভিমুখীনতা প্রত্যাশিত নয়। ফলে এইকালে বিদ্যাকেও যেন গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে, মানুষ তার অধিকারবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে চায় বিদ্যারও জগৎ। শূদ্রের সংস্কৃতশিক্ষার অধিকার আছে কিনা, শাস্ত্র ভাষায় রূপান্তরিত হতে পারে কিনা, স্ত্রীজাতি পুরুষের মতোই শিক্ষার অধিকারিণী কিনা—উনবিংশ শতকের বাঙলাদেশে এ নিয়ে বিতর্ক-বিদ্বেষের অবধি ছিল না। আজো পর্যন্ত [illegible] বিদ্যা যেন ঐশ্বর্যশালীদেরই অধিকার, ধনহীন ব্যক্তি সেখানে পঙ্‌ক্তিচ্যুত, অস্পৃশ্য।

কিন্তু এ তো বিদ্যার স্বাভাবিক অবস্থা নয়। এ তার অপপ্রয়োগ মাত্র। যেখানে যথার্থ বিদ্যার মহিমা আমরা উপলব্ধি করতে শিখি, সেখানে জানি, এর তুল্য মহিমময় আর কিছু নয়। রাজা বড়ো, না, বিদ্বান্‌ বড়ো? সংস্কৃত সেই শ্লোকটির কথা মনে পড়ে এখানে : স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্‌ সর্বত্র পূজ্যতে। এই সর্বপ্রভাবী শক্তিতো বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা।

॥ ১২ ॥ জ্ঞানীদের নিকট অজ্ঞানীদের জীবন মৃত্যুর তুল্য।

[বৈশ্বানরপুরুষ। পৃ. ১২৮]

জীবন ও মৃত্যুর প্রভেদ আমাদের চোখে অত্যন্ত স্পষ্ট। দেহধারণ করে

পঞ্চেন্দ্রিয়-দ্বারা যখন জগৎ আস্বাদন করতে পারি, দৈনন্দিন সংসারজীবন যখন অবাধে পালন করে যেতে পারি, তখন এবং ততক্ষণই আমাদের জীবন। এর অবসানেই মৃত্যু।

কিন্তু জীবনের এ একটা আপাতধারণা মাত্র। একশত জনের মধ্যে নিরানব্বই জন আমরা এই ধারণাতে পরিতুষ্ট। কিন্তু সত্যদ্রষ্টা ঋষির কাছে এই জীবনমৃত্যুর ধারণা তুচ্ছ। এমন জীবনকে তাঁরা মৃত্যুর নামান্তর বলেই জানেন, যা সত্যবোধের দ্বারা পরিস্ফুত নয়। ইংরেজি প্রবচনবাক্যে যখন শুনি : Cowards die many times before taeir death—তখন সেই বহুসংখ্যক মৃত্যুর তাৎপর্য কী? টিঁকে থাকা আর বেঁচে থাকা তো ঠিক সমার্থক শব্দ নয়। কোনোরকমে দেহধারণ করে পশুর মতো টিঁকে থাকা যায়। কিন্তু মানুষ তো অনুভবময় মননময়—মানুষ এমন করে টিঁকে থেকে মাত্র সুখী হতে পারে না। যে-মানুষের অনুভব ও মনন-শক্তি যত কম ততই সে সাধারণ পশুর সমীপবর্তী, ততই সে টিকে থাকার মধ্যেই বেঁচে থাকার একমাত্র সার্থকতা দেখে। তাদের দৃষ্টিতে যা জীবন, সত্যদ্রষ্টার দৃষ্টিতে তা সেইজন্যই জীবন্মৃত্যু, কেননা, তা মানবত্বের মৃত্যু, মানবাত্মার সুপ্তি।

তাই দেশে দেশে যুগে যুগে মহামানবের আবির্ভাব হয়, অমৃতকে তাঁরা জেনেছেন এই ঘোষণা করে তাঁরা সমগ্র জনতাকে আহ্বান করে বলেন : উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত—আর ঘুমিও না, জেগে ওঠো। কিন্তু বাস্তবিকই কি জনতা ঘুমন্ত হয়ে আছে? এ কি আক্ষরিক সত্য? তা নয়। এর গূঢ় তাৎপর্য এই যে, মানুষ তার নিভৃতে নিহিত আত্মপুরুষকে সুপ্ত রেখে জীবনের প্রকৃত সাধনা থেকে দূরবর্তী হয়ে গেছে। তাদের এই মূঢ় জগৎ থেকে পরিত্রাণ করতে চান জ্ঞানীপুরুষ।

বস্তুসংক্ষেপ ও ব্যাকরণ

১॥ এই বিশাল সৃষ্টির মধ্যে……একেবারে হেয় হইয়া পড়ে।

[দেবগণের ব্রহ্মদর্শন। পৃ. ১৪] ॥ শব্দসংখ্যা প্রায় ১০৫ ॥

ঋষিরা দেবতাদের খুশি করেন, প্রতিদানে দেবতারা অসুরদের নিধন করেন এবং জগতের হিতসাধনে ব্যাপৃত থাকেন; আর অসুররা জিঘাংসাভরে চতুর্দিকে ধাবমান : এই ছিল প্রাথমিক অবস্থা—ব্রহ্মজ্ঞান তখন কারোরই ছিল না। সৃষ্টি-রহস্যের মূল কী, এ জিজ্ঞাসা তাঁদের মনে গাঢ়তর হোক, ব্রহ্ম এমন ইচ্ছা করলেন। তখনই ঋষিরা ব্রহ্মমন্ত্র জপ করতে শুরু করলেন, ব্রহ্মজ্ঞানে-ধন্য দেবতারা সর্বশক্তিমান হয়ে উঠলেন, আর অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অসুরকুল সকলের কাছে হেয় অবজ্ঞেয় বলে প্রতিপন্ন হলো।

॥ ২ ॥ এমনি বৎসরের পর বৎসর……দয়া করিয়া বলুন।
[ব্রহ্মচারী সত্যকাম। পৃ. ৩০-৩১] ॥ শব্দসংখ্যা প্রায় ১৬৫ ॥

বহুবৎসরব্যাপী ঐকান্তিক সেবা যত্নে সত্যকামের ধেনুসংখ্যা সহস্রে পৌঁছল। সত্যকামের প্রতি প্রীত বায়ুদেবতা কোনো-এক বৃষভের কণ্ঠে ভর করে তাঁকে এ-কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কেবল তাই নয়, এতকালের ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা সত্যকামের চিত্ত নির্মল হয়েছে জেনে বায়ুদেবতা তাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করবার জন্যে উৎসাহী হলেন। সত্যকামও সেই জ্ঞানলাভে তাঁর ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন।

॥ ৩ ॥ নচিকেতার শুভবুদ্ধির……যমের কাছে যাইতে দাও।
[নচিকেতা। পৃ. ৪৬-৪৭] ॥ শব্দসংখ্যা প্রায় ২৬০ ॥

নচিকেতার মনে হলো, যজ্ঞান্তে রুগ্ন জীর্ণ গাভী দান করলে তাঁর পিতার অমঙ্গল হবে। যজ্ঞের দক্ষিণাহিসেবে তাই তিনি আত্মসমর্পণ করার আকাঙ্ক্ষা করলেন। কার কাছে তিনি সমর্পিত হবেন, পিতাকে বারংবার এই প্রশ্ন করতে অবশেষে পিতা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন : 'যমকে দিলাম তোমাকে'। এ-কথা শুনে নচিকেতা প্রথমে নিতান্ত বিচলিত হলেন। তিনি তো কর্তব্যে ত্রুটি করেন না, তিনি তো পুত্র বা শিষ্যহিসেবে অধম নন, তবে কেন পিতা তাঁর প্রতি রোষাবিষ্ট হয়ে ওই কথা উচ্চারণ করলেন? যাহোক, উচ্চারিত পিতৃবাক্যকে নিষ্ফল হতে দেওয়া চলে না। পিতৃসত্যরক্ষার জন্যে তিনি জানালেন, যমের কাছেই তিনি যাবেন।

॥ ৪ ॥ রাজা তখন ধীরে ধীরে……শব্দমুখর হইয়া উঠিয়াছে।
[যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গী। পৃ. ৭৪-৭৫] ॥ শব্দসংখ্যা প্রায় ৩২০ ॥

রাজা জনক সমবেত ঋষিকুলকে জানালেন, উপস্থিত শ্রেষ্ঠ ঋষিকে দান করবার জন্যে স্বর্ণমণ্ডিত পাঁচশত ধেনু তিনি প্রস্তুত রেখেছেন। এখানে কে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ তা তিনি জানেন না, অনুগ্রহ করে তিনি যেন স্বয়ং এই দান গ্রহণ করেন। কিন্তু কে আত্মপরিচয় দিয়ে বলবেন, আমি শ্রেষ্ঠ? যজ্ঞভূমি নিশ্চল শব্দহীন হয়ে রইল। অকস্মাৎ ঋষিমণ্ডলীর মধ্যস্থল থেকে দিব্যপ্রভাময় জটাধারী এক প্রৌঢ় ঋষি সমুত্থিত হলেন এবং ধীরবচনে তাঁর শিষ্যকে আদেশ করলেন, যেন ধেনুগুলি সে আশ্রমে নিয়ে যায়। শিষ্যবর গুরুর আদেশ-পালনে উদ্যত হলে অপর ব্রাহ্মণেরা যেন স্বপ্নোত্থিত হলেন। আক্রোশভরে তাঁরা চিৎকার করে উঠলেন এবং সুকঠোর ব্যঙ্গবাক্যে এই স্পর্ধার হেতু জানতে চাইলেন। কিন্তু আবেগমথিত এই যজ্ঞসভায় যাজ্ঞবল্ক্যের সৌম্য শান্তি কিছুমাত্র বিচলিত হলো না।

॥ ৫ ॥ জিজ্ঞাসু ঋষিগণ বেদবিৎ পণ্ডিত……নিখিলের ক্ষুধা মিটিয়া যাইবে।
[বৈশ্বানরপুরুষ। পৃ. ১৩৪ ॥ শব্দসংখ্যা প্রায় ১৭৫ ॥

বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের কাছে রাজা অশ্বপতি বৈশ্বানরপুরুষের কথা এবং

আত্মঅগ্নিহোত্র-যজ্ঞের কথা বলছেন। বৈশ্বানরপুরুষকে না জেনে অগ্নিহোত্রে আহুতিদান সম্ভব নয়। এ কে জেনে যাঁরা হোম করেন, তাঁদের যজ্ঞে বিশ্বজগৎ পরিতৃপ্ত হবে। আত্মজ্ঞানী হলে তাঁর আত্মা বৈশ্বানরের আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়, তাই, সেখানে ব্রাহ্মণচণ্ডাল ভেদ থাকে না। একারণে আত্মজ্ঞানী অগ্নিহোত্রীর তৃপ্তিবিধানের জন্যে জগৎসংসার উদ্‌গ্রীব থাকে।

॥ ৬ ॥ যদি বৎস, গাছটির একটি শাখা……জগৎ বিধৃত আছে।

[তত্ত্বমসি। পৃ. ১৫৪-১৫৫] ॥ শব্দসংখ্যা প্রায় ১০০ ॥

প্রাণের লীলা আমরা বাহিরে দেখি, কিন্তু তার মূল উৎসশক্তি নিহিত আছে জীবাত্মায়। দেহের যে-অংশটি সেই জীবাত্মা-দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, সে অংশটি জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। সমস্ত দেহই যদি পরিত্যক্ত হয়, তবে জীব মৃত বলে গণ্য হয়। কিন্তু জীবের মৃত্যু জীবাত্মার মৃত্যু নয়। জীব মরণশীল, আত্মা অমর।

মর্মার্থলেখন

॥ ১ ॥ মৃত্যুরাজ যম যে সাক্ষাৎ ধর্ম……ইহাই তো তাঁহার রাজ্য নয়।

[নচিকেতা। পৃ. ৪৯-৫০]

যম যে কেবল নরকের দেবতা তা নয়। মানুষের জীবনাচরণে সুকৃতি ও দুষ্কৃতির পরিমাপ করেন তিনি, তিনি সর্বজ্ঞ বিচারক। ধর্মানুশাসনের দ্বারা অবশেষে তিনি সেই মানুষের জীবনাবসানে তাঁর গতিলোক স্থির করে দেন। পুণ্যময় জীবনযাপনান্তে যারা পরপারে আসে তাদের স্থান দেন যম স্বর্গলোকে, আর দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তিবিধান করেন তিনি তাদের নরকে নিক্ষেপ করে।

॥ ২ ॥ বিত্তসম্পত্তি দ্বারা কোনো লোকের ……জল পান করিবে না।

[নচিকেতা। পৃ. ৬০-৬১]

সত্যদ্রষ্টা মানুষ বিত্তসুখ অথবা অনুরূপ কোনো ভোগ্যসুখই প্রার্থনা করতে উৎসুক নন। কারণ, তত্ত্বজ্ঞ জানেন, এসবই আপাতসুখকর কিন্তু পরিণামরমণীয় নয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তির কাছে ক্ষুদ্র প্রার্থনা করা যায়; কিন্তু যখন আমরা মহাশক্তিমান বিরাটের মুখোমুখি হই তখনো কি তুচ্ছ কামনার মধ্যে নিজেদের নিবদ্ধ রাখব? তা সম্ভব নয়। নচিকেতারও প্রার্থনা তাই দুর্গমতম তত্ত্বজিজ্ঞাসায়। আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, আত্মতত্ত্বের উপদেশ ভিন্ন আর-কিছুই তিনি যমের কাছে প্রার্থনা করতে পারেন না।

॥ ৩ ॥ আনন্দো ব্রহ্ম · ··শুদ্ধজ্ঞান বা চিৎ, পরমচৈতন্য।

[ভৃগুর তপস্যা। পৃ. ৭১]

সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির মূল উৎস এবং উদ্দেশ্য নিহিত আছে মহাআনন্দের উপলব্ধিতে। সমস্ত শক্তির অন্তরালে আছে এই নন্দিত করবার শক্তি, তাই, আনন্দই ব্রহ্ম। বহির্জাগতিক সৌন্দর্যবিকাশের মধ্যেই এই আনন্দের বহিরবয়ব রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি।

॥ ৪ ॥ সেই স্বাধীন পবিত্র বৈদিক অবরোধ তো দূরের কথা।

[গার্গী। পৃ. ৭৯]

মধ্যযুগের সংস্কারাচ্ছন্ন কাল থেকে আমাদের দেশে নারীকে ঘিরে এক কঠিন অবরোধপ্রথার সৃষ্টি হয়েছে। তাই, অধুন' নারী পুরুষসমাজের চেয়ে অনেক দূরবর্তী অজ্ঞানের মধ্যে বাস করেন। কিন্তু প্রাচীন বৈদিকযুগে নারীপুরুষের ভেদ এমনভাবে দেখা দেয়নি। জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীরও অধিকারভুক্ত ছিল, এবং সেই কারণেই তখন মহীয়সী ব্রহ্মবাদিনী নারীর অভাব ছিল না।

॥ ৫ ॥ পতির প্রয়োজনের নিমিত্তই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জানা হয়।

[যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী। পৃ. ৯৫]

অদৃশ্যনিবাসী এক আত্মার দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত। এই আত্মার উপলব্ধি ও মননের দ্বারাই আমাদের সত্যদর্শন ঘটে, তাঁকে জানলেই বিশ্বরহস্যের মূল জানা হয়। আমরা এই মূলসত্য বিস্মৃত হয়ে থাকি। আমরা মনে করি, পতি-পত্নী-পুত্রে-পরিবৃত সংসার অথবা ধনৈশ্বর্য কিংবা দেশাচার—এর মধ্যেই আমাদের সকল ভালোবাসা নিহিত। কিন্তু তখন আমরা মনে রাখি না যে, বস্তুত এই সকলেরই অন্তরালে আত্মাকে ভালোবাসি বলে, আত্মাকে কামনা করি বলেই, পতিপত্নীপুত্র পরস্পরের প্রিয়। ধন বা দেবতাকে প্রত্যাশা করি বলে নয়, তার ভিতর থেকে আত্মাকে স্পর্শ করতে পারি বলেই তা আমাদের প্রিয়। সর্বময় এই আত্মার উপলব্ধি তাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

॥ ৬ ॥ আজ তোমার বুদ্ধি নির্মল স্পর্শ করিতে পারে না।

[দেবাসুরের আত্মজ্ঞান। পৃ. ১১৭]

ভ্রান্ত ধারণাবশে আমরা দেহভূমি ও জড়জগতের মধ্যেই আত্মাকে অন্বেষণ করে বেড়াই, কিন্তু এভাবে তো আত্মাকে লাভ করা যায় না। যখন আমাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়, নির্মল হয়, তখন আমরা সত্য উপলব্ধি করতে পারি। তখন আমরা জানি যে, মরণশীল বিশ্ববস্তুর মধ্যে আত্মাকে পাব না, ইন্দ্রিয়-দ্বারা তাঁকে গ্রহণ করা যাবে না। শরীরের মধ্যে আত্মার আবাস, কিন্তু শরীরই আত্মা নয়। আত্মা সমস্ত কিছুর অতীত।

॥ ৭ ॥ প্রত্যেক ঋষিই বৈশ্বানরপুরুষের······অনুভব করে নাই।

[বৈশ্বানরপুরুষ। পৃ. ১৩১]

সত্যকে যদি তার সম্পূর্ণতায় না জানি, তবে তাকে কিছুমাত্র জানা হয় না, এমন-কি, ভুল জানা হয়। সমস্ত অংশকে একত্র জড়িত করে যে পূর্ণস্বরূপ তাকেই উপলব্ধি করা প্রয়োজন। অংশের স্বতন্ত্র ধারণা থেকে সে-সম্পর্কে আমাদের কোনো বোধই জন্মায় না। যাঁরা আত্মার উপাসনা করেন, তাঁদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই দেখা যায় এমনি খণ্ডের সাধনা। তাই, তাঁদের সিদ্ধির পথ রুদ্ধ।

॥ ৮ ॥ মাটির জিনিস পৃথিবীতে······বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানা হয়।

[পিতা ও পুত্র। পৃ. ১৪৭]

মূল উপাদানের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। সেই উপাদানে রচিত হতে পারে শত সহস্র পৃথক বস্তু, নানা উপকরণ ও প্রকরণের দ্বারা তার রূপ হয়তো পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এ পরিবর্তন তো আপাত-মাত্র। মৌলিক সত্তা তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। জ্ঞানলাভেচ্ছু যদি ঐ প্রতিটি ভিন্ন বস্তুর ব্যাখ্যা-অন্বেষণে ব্যাপৃত হন তবে তাঁর পরিশ্রম বিফল হয়। কেননা, আপাতকেই তিনি দেখেন, মূল তাঁর দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়।

< ভাবসম্প্রসারণ >

॥ ১ ॥ তরু হতে যেবা হয় সহিষ্ণু, তৃণ হতে দীনতর,
সেই বৈষ্ণব—জয়গৌরব ভাবে না সে কভু বড়ো!
—ত্রিরত্ন—[পৃ. ৩]

বৈষ্ণবসাধকেরা প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভে ধন্য হতে চেয়েছেন। কিন্তু মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম সম্ভ্রম কোথায়? আমরা মনে ভাবি, বহিঃসম্পদ এবং ঐশ্বর্যবহুলতায় মানুষের মহিমা। তাই, আমরা নিজেদের চতুর্দিকে প্রভূত পরিমাণ ধন এবং যশের সঞ্চয় বাড়িয়ে তুলতে চাই। আর, এই সাধনা যদি চরিতার্থ হয় তবে আমাদের অহংকারের অবধি থাকে না। কিন্তু এই কি প্রকৃত মনুষ্যত্ব? মানুষের গৌরব তো তার হৃদয়ের প্রসারে, অনুভবের গভীরতায়। তাই, প্রকৃত সাধক বহির্জগৎকে ততো লক্ষ্য করেন না, নিজের অন্তরকেই তিনি ক্রমে দীক্ষিত করে তোলেন। এই দীক্ষার উপায় কী? পার্থিব যশ এবং ধনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাছে পরম বরণীয় নয়, অহংভাবকে দূরে সরিয়ে রাখা, ধৈর্যতিতিক্ষার শিক্ষা করা, এই-ই তাঁর একমাত্র স্মরণীয় পথ।

অহংভাবই মানুষের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা। 'আমি আমি' রবই এই পৃথিবীর সমস্ত দুঃখবিবাদের মূল হেতুস্বরূপ। আমাদের প্রত্যেকরই ছোটো ঘর থেকে এই স্বার্থপরতার সূত্রপাত, অবশেষে ক্রমে তাকেই দেখি দেশেদেশে হানাহানির কারণ-হিসেবে। এই আত্মপরতা তাই সর্বতোরূপে বর্জনীয়। কবি তাই কাতর প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেন: 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে'।

প্রকৃত বৈষ্ণবেরও এই অভিলাষ। ধনগৌরব, যশোগৌরব তাঁর কাম্য নয়, তিনি অর্জন করতে উৎসুক নম্রতা ও সহিষ্ণুতা। তরুর কাছে থেকে তাঁর সহিষ্ণুতার শিক্ষা, দীন তৃণের কাছে নম্রতার দীক্ষা। প্রখর রৌদ্রতাপ সহ্য করে অবিচল দাঁড়িয়ে থাকে বৃক্ষকুল, প্রলয়ঝড়ের তাণ্ডব সে মাথা পেতে গ্রহণ করে অনায়াসে। কিন্তু মানুষকে সে কী দেয় তার পরিবর্তে? ছায়া দেয়, আশ্রয় দেয়, ফল দেয়। প্রকৃত বৈষ্ণবও এমনিভাবে জীবনের সকল দুঃখকাতরতাকে অনিমেষ সহ্য করে তাঁর পরিপার্শ্বকে ভালোবাসায় ভরে দেবেন। কিন্তু এই দানের জন্যে তিনি কি কোনো গর্ব বোধ করবেন! না, তাহলে তাঁর মনুষ্যত্ব থেকে পতন। যেমন তৃণ তার শ্যামল সৌন্দর্যের দ্বারা পৃথিবীর বুক ভরে রাখে, অথচ মানুষের পদতলে সে যেমন নীরবেই আড়াল হয়ে থাকে, নিজেকে সে যেমন কখনোই অত্যন্ত ঘোষণা করে না, বৈষ্ণব-

সাধকও ঠিক তেমনই আত্মবিলোপপরায়ণ হবেন। সকলকে তিনি তাঁর বিনীত স্নিগ্ধতার দ্বারা মুক্ত করে রাখবেন। বৈষ্ণবের এই মনোগত আকাঙ্ক্ষাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম প্রার্থনা।

॥ ২ ॥ নিমাইয়ের দান বিনয়দৈন্য, নিতাইয়ের দান ক্ষমা,
দৈন্যই যদি হন নারায়ণ, ক্ষমা যে তাঁহার রমা।

—ত্রিরত্ন—[পৃ. ৪]

প্রচলিত কথায় বলে, বিদ্যা বিনয় দান করে। কেন এ-কথা বলা হয়? কেননা, প্রকৃত বিদ্যা মানুষকে ক্রমশ বুঝিয়ে দেয় জগৎ কত সীমাহীন, তার তুলনায় আমাদের জ্ঞান কত তুচ্ছ। তাই যদি, তবে কিসের ওপর নির্ভর করে এত দম্ভ আমরা প্রকাশ করি? যে অল্পই জানে সে-ই অহংকারী হতে সাহসী হয়। কিন্তু সত্যিকার জ্ঞানী বিনয়কেই মনুষ্যত্বের সার বলে গণ্য করেন।

এই বিনয়ই হলো দীনতা। কিন্তু বাহিরের বিচারে যাঁকে দীন বলে মনে করি, অন্তরে তো তিনিই সর্বাধিক সম্পন্ন ব্যক্তি। বাহিরে যে ঐশ্বর্যের অহংকারে মদমত্ত, অন্তরে সে-ই প্রকৃত দীন।

যখন মানুষ দীনতার এই বিনয় আপন চরিত্রের অংশ করে তুলতে পারে, তখন সে তার পরিপার্শ্বকে সহ্য করতে পারে সহজে, ক্ষমাও করতে পারে সহজে। জীবনের বহির্ভূমিতে যে-সমস্ত দুঃখপ্রবঞ্চনার আঘাত অথবা আক্রমণ, তা আমাদের অসহ্য মনে হয় তখনই যখন নিজেকে অতিক্রম করে আর-কিছুই আমরা ভাবতে পারি না। অহংবোধ যদি তীব্র না হয় তবে এই আঘাতগুলিও আর সহনাতীত থাকে না। মানুষের প্রতি সহজাত প্রেম ও মমত্ববোধ তখন আমাদের হৃদয়ে মহৎ ক্ষমার বৃত্তি জাগ্রত করে দেয়। দীনতা ও ক্ষমা, এই দুইয়ে মিলে তাই মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ রূপ।

আমাদের জাতীয় জীবনে নিমাই-নিতাইয়ের আবির্ভাবও যেন এই সত্যেরই দ্যোতক। প্রখর নৈয়ায়িক নিমাই একদিন গঙ্গার জলে তাঁর পাণ্ডিত্যের অভিমান বিসর্জন করতে কুণ্ঠিত হয় নি; আর, ক্ষমার প্রতিমূর্তি নিতাই একদিন 'মেরেছে কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না' বলে বুকে টেনে নিয়েছিলেন জগাই-মাধাইকে। এই আচরণের সামনে অত্যাচারী হতবুদ্ধি হয়ে যায়, অবিশ্বাসীর প্রাণে বিশ্বাসের স্নিগ্ধ বারিকণা সিঞ্চিত হয়ে যায়।

॥ ৩ ॥ জীবহিতে প্রাণ যেবা করে দান জীবনে তাহারি জয়।

—অম্বরীষের যজ্ঞ—[পৃ. ৮]

অল্পদিনের জন্যে এই পৃথিবীতে আসে মানুষ। আমাদের তো অজানা নয় মানবজীবন নশ্বর। এই ক্ষণস্থায়ী সময়টুকু কীভাবে আমরা যাপন করব। কারো কারো মনে হয়তো এই ভাব উদিত হয়, জীবন তো দুদিনের, তাই, যাবজ্জীবেৎ [illegible] ঘৃতং পিবেৎ। কিন্তু এ একেবারে বস্তুবাদী স্বার্থবাদী

অপজীবনের মন্ত্র। আত্মসুখের প্রয়াসে ঋণ করে ঘৃত পান করা সম্ভব, কিন্তু তাই কি জীবনের সব ?

আমাদের দেহ মরণশীল কিন্তু মানবাত্মা অমর। মানুষ চলে যায়, তার সুকৃতি থেকে যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক মানুষের এইসব সুকৃতির ওপরেই যুগযুগান্তের অভ্রভেদী মানবমহিমা স্থির হয়ে উচ্চচূড়া তুলে আছে। তাই, মৃত্যুর মধ্যেও মানুষ অমর থাকে—তার দেহে নয় বটে, কিন্তু তার আত্মিক মহিমার ঘোষণায়।

এই মহিমা অর্জিত হয় কেমনভাবে ? ঈশ্বরসেবার দ্বারা ? কিন্তু ঈশ্বর কোথায় ? এক সন্ন্যাসীকবির উদ্‌গীত মন্ত্রোচ্চারণ আমাদের মনে পড়ে : জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। পরের জন্যে যার হৃদয় মথিত হয়ে ওঠে, পরের মঙ্গলের জন্যে সর্বাধিক আত্মসুখ বিসর্জনে যে প্রস্তুত, সে-ই তো যথার্থ মানব-নামের অধিকারী। জগতে যাঁরা ধর্মগুরু অথবা মানবনেতা, তাঁদের জীবন পর্যালোচনা করলে এই সত্যেরই জীবন্ত প্রতিরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। বুদ্ধ বা চৈতন্যের মতো তারা যে কেবল গৃহসুখ তুচ্ছ করেই বেরিয়ে এসেছেন তাই নয়, জোয়ান অব আর্ক অথবা খ্রীস্টের মতো তারা প্রাণ বিসর্জন পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু খ্রীস্টের প্রাণদান তো ভ্রান্তপথচারীদের অন্ধচোখ খুলে দেবার জন্যেই। এই জীবনোৎসর্জন তাই মহত্তম আত্মদান।

আমাদের জীবন বহুদিনের জন্যে নয়। মৃত্যুকে অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে সাধ্যাতীত। তাই যদি সত্য তবে মৃত্যুকে আর ভয় করে চলি কেন ? কেন তাকে মহৎ সার্থকতায় ভরে দিই না ? এই বোধ যার হৃদয়ে জেগেছে, শহীদ হতে সে দ্বিধা করে না। মনুষ্যকল্যাণের জন্যে নিজজীবনকে উৎসর্গ করে বস্তুত সে জীবনেরই জয় ঘোষণা করে।

॥ ৪ ॥ ভয়ে প্রাণ মান যে করিবে দান প্রেম সে তো সঁপিবে না,
টাকা দিয়ে শুধু মাথা কেনা যায়, হৃদয় যায় না কেনা।

—রাজা ও মন্ত্রী—(পৃ. ২০)

আমরা প্রতিটি মানুষ দুটি অস্তিত্বের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত। একটি আমাদের ছোটো অংশ, সে লোভমোহ ষড়রিপু দ্বারা প্রতিমুহূর্তে নিন্দিত। আরেকটি আমাদের সুপ্ত গভীরতম অংশ, হৃদয়ের প্রাসাদে তার প্রতিষ্ঠা।

সাংসারিক জীবনঘূর্ণির মধ্যে যখন আমাদের প্রতিমুহূর্ত অতিক্রান্ত হতে থাকে, তখন আমরা আমাদের সেই সুপ্ত অংশ মহত্তম অংশটিকে প্রায়ই ভুলে থাকি। তখন আমরা ছোটো হয়ে যাই, তুচ্ছতম ব্যক্তির দ্বারাও তখন আমরা অনায়াসে বশীভূত, আর-পাঁচটা জীবের সঙ্গে তখন আমাদের ভেদ থাকে না কিছু। তখন আমরা বস্তু-জগৎকেই চূড়ান্ত বলে জানি, দেহসুখের চেয়ে বড়ো আর-কোনো আদর্শই তখন আমাদের টানে না। আদর্শভ্রষ্ট এই অবস্থায় মানুষ সামাজিক অর্থবন্ধনকেই বড়ো করে দেখে।

সন্দেহ নেই যে, অর্থের দ্বারা জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য অনেকটাই অর্জিত হতে পারে। আর, এই স্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্ক্ষায় মানবচিত্ত ক্ষণে ক্ষণে দুর্বলভাবে আত্মদান করে, অর্থের কাছে সে বিক্রীত হয়ে যায়। কিন্তু সেইজন্যেই কি মনে করব, অর্থই পৃথিবীর চূড়ান্ত সত্য? অর্থবান ব্যক্তি হয়তো এই তৃপ্তির দ্বারা অধিকৃত হতে পারেন। তখন তাঁর মনে রাখা কর্তব্য যে, টাকা মানুষের ছোটো অংশটাকে কিনে নেয় বটে, কিন্তু হৃদয় অর্থবন্ধনে ধরা দেয় না। হৃদয়কে অর্জন করা যায় কেবল হৃদয়ের দ্বারা। যদি প্রেমের শক্তি ব্যবহৃত না হয় তবে আমাদের গভীর সুপ্ত অংশটি স্পৃষ্ট হতে পারে না। এই উপলব্ধিতে পৌঁছলে ঐশ্বর্যমদমত্ত অর্থবান্ জানতে পারেন, টাকার দ্বারা যে-পৃথিবী বশ হয় সে খুব ছোটো হীন পৃথিবী, সমগ্র মানুষকে অর্জন করবার ক্ষমতা তার নেই।

॥ ৫ ॥ যোগি-ঋষিগণ জ্ঞানে ধ্যানে তপে দেখিতে না পায় যাঁরে,
সহজ সরল প্রেমভক্তিতে গৃহে পাওয়া যায় তারে।
—অজু ন মিশ্র—(পৃ. ৪১)

ঈশ্বরসাধনার উপায় কী, এই প্রশ্নে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে বিচিত্র মতভিন্নতা। ভারতবর্ষ বিশেষভাবেই অধ্যাত্মসাধনার দেশ, তাই, এদেশে সাধনার বিচিত্র সেই পথ যুগে যুগে চিহ্নিত হয়ে আছে। কারো কারো মতে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে। তাঁরা জ্ঞানযোগী, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে তাঁরা তাদের সাধনাকে অগ্রসর করে নেন। কোন সম্প্রদায়-বা কর্মযোগী, বিচিত্র কর্মযাপনার মধ্যে ঈশ্বরকে তারা সন্ধান করেন। কিন্তু অপর এক ধারায় দেখি, এই জ্ঞান বা ধ্যান নিষ্ফল বলে কল্পিত, এই ধারায় সাধকেরা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-অর্পণকেই একমাত্র সাধনা বলে গণ্য করেন। এঁরা ভক্তিযোগী।

ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবনে এই ভক্তিযোগই সর্বাধিক প্রশ্রয় লাভ করেছে। জ্ঞানের চর্চা অথবা কর্মানুষ্ঠানের জাঁকজমক ক্রমে মানুষকে অভিমানীও করে তুলতে পারে। অথবা ক্রমে জ্ঞান বা আচার-অনুষ্ঠানই বৃহৎ অবয়ব লাভ করে তার মূল লক্ষ্যস্বরূপ ঈশ্বরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, লক্ষ্যের চেয়ে উপায় হয়ে ওঠে আরো বড়ো। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিমুহূর্তের হৃদয়সংযোগ যদি অনুভব করতে চাই, তবে অনায়াস ভক্তিকল্পনাই তার সবচেয়ে বড়ো উপায়।

এইজন্যেই কবিকণ্ঠে আমরা ধ্বনিত হতে শুনি: 'যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা'। আচার-অনুষ্ঠানের শুষ্কতায় অনেক সময়েই এই ভালোবাসা তার যথার্থ স্ফূর্তি লাভ করে না, আমরা জানতে পারি না: 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর'। জ্ঞান বা ধ্যানের গর্বে আমরা আত্মমগ্ন হয়ে যাই, চতুর্দিকের সংসারজীবনের পরিপূর্ণতা আমাদের চোখেই পড়ে না। ঈশ্বরের অভিপ্রেত এই সৃষ্টির মধ্যে যে কোনো একটা সংগতি আছে তা আমরা ভুলে যাই, ঈশ্বরও তখন আমাদের প্রতি বিমুখ হন। তাই, সরল ভক্তি ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর-সাধনা করতে হয়। 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর' এই প্রবচনের সার্থকতা তখনই দেখা দেয়।

॥ ৬ ॥ সম্পদপদ লভি যে অতীত দৈন্যের দান ভুলে
সে তো নরাধম ঘৃণ্য চরম, ফল পেয়ে ভোলে ফুলে।
—উজীর ও বাদশাহ্—[পৃ. ৪৪]

মানুষ ক্রমে ছোটো থেকে বড়ো হয়, প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে নিজেকে সে উন্নীত করে তোলে। আত্মসাধনার এই নীতি অবশ্যই প্রশংসার্হ; দীনতা থেকে আত্মবলে যে সম্পন্নতায় আরোহণ করে সে কেবল সেই কারণেই আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে।

কিন্তু তাই বলে দৈন্য কি ঘৃণ্য? দীনতা অপরাধ নয়, তা ঘৃণারও বস্তু নয়। তথাপি অনেক সময়ে আমরা লজ্জার সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, উচ্চগৌরবী মানুষ অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে নিম্নস্তরকে উপেক্ষা করে। যে সহৃদয় সমবেদনার দ্বারা তাকে তারা আপন মহিমায় স্বীকার করে নিতে পারত, মানবচরিত্রে প্রায়ই আমরা সেই মহৎবৃত্তির অভাব লক্ষ্য করি। সবচেয়ে দুঃখের অভিজ্ঞতা হয় তখন, যখন দেখি, আজ যে দীনকে সরিয়ে দিচ্ছে দূরে, সে-ও একদিন অতীতে তারই তুল্য ছিল। ধনগৌরবে মানুষ তার তুচ্ছ অতীতকে অনায়াসে বিস্মৃত হয়ে যায়, কিন্তু আমাদের জীবনবিধাতা তা স্মরণে রাখেন।

দারিদ্র্যও একরকম শিক্ষা। এ তো অনেক সময়েই দেখা যায় যে, পরিবেশের প্রতিকূল প্রত্যাঘাত যত তীব্র হয়ে ওঠে; তার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষাও মানুষের ততই প্রখর হয়ে ওঠে, আর এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সে এতদিনের দারিদ্র্যকে অতিক্রম করে আসে। এদিক থেকে বিচার করলে আমার বর্তমান সম্পদের হেতু তো আমার একদাকালের সেই দুর্দিন। আমি আমার স্রষ্টাকে ঘৃণা করব, অস্বীকার করব? যেমন ফুলেরই থেকে ফলের জন্ম, আর ফলেই আমাদের প্রয়োজন মেটে বলে ফুলকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না—বর্তমানের গরিমা তেমনি অতীতের সাধনাকে তুচ্ছ করবার সাহস যেন না করে। যথার্থ মনুষত্বে যে দীক্ষিত সে সবিনয়ে তার সৃষ্টির ইতিহাসকে স্মরণে রাখে। যে অমানুষ, সে-ই কেবল মনে মনে ভাবে, সে স্বয়ম্ভূ। তার অকৃতজ্ঞতার মতো ধিক্কারযোগ্য আরকিছু নেই।

॥ ৭ ॥ শুধু হাত দিয়ে সেবা নয় সেবা, নাহি সেবে যদি প্রাণ,
শ্রদ্ধার সহ না দিলে ব্যর্থ রাজভোগ্যেরও দান।
—বাল্মীকি মুচি—[পৃ. ৫০]

জীবে সেবা পরম ধর্ম। একদিকে যেমন দীনদুঃখী-পীড়িত-আহত, অন্যদিকে তেমনি অতিথি-অভ্যাগত—সৎ গৃহস্থের পক্ষে এঁরা সকলেই পূজনীয়, সেব্য। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল কিংবা ভগিনী নিবেদিতার মহৎ সেবাব্রত ইতিহাসে স্বর্ণবর্ণে লিখিত হয়ে থাকে; আবার, অতিথি স্বয়ং ভগবান্ এই ধারণা থেকে আমরা চিরকাল উচ্চারণ করি 'অতিথিনারায়ণ'। সভ্য মানুষের পালনীয় এই আচার যদি আমরা ক্ষণতরে বিস্মৃত হই, আমাদের ভাগ্যবিধাতা তবে আমাদের উপর রুষ্ট হন। অন্যমনা শকুন্তলার অতিথিবিমুখতা লক্ষ্য করে দুর্বাসামুনি যেমন অভিসম্পাত

করেছিলেন, অলক্ষ্যে সেই শাপ আমাদেরও উপর বর্ষিত হতে পারে একথা যেন না আমরা ভুলি।

জীবে সেবা পরমধর্ম। কিন্তু সেবার পদ্ধতি কি? তার উপকরণ কোথায়? যিনি প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী রাজচক্রবর্তী, তিনি তাঁর পাদ্যঅর্ঘ্য-সহযোগে অতিথি-সেবাকে মহোৎসবের তুল্য করে তুলতে পারেন। কিন্তু যে দীন, মহোৎসবের বিপুল সম্ভার যার আয়ত্তের অতীত, সে কেমন করে অতিথির পূজা করে? তবে কি ঐশ্বর্যেই সেবা সম্ভব? ঐশ্বর্যহীনতায় নয়?

তা যদি আমরা ভাবি তবে সেবার বিকৃত অর্থ আমাদের মনে আমূলপ্রোথিত হয়ে আছে। মানবসেবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ মানবহৃদয়। বিদুরের ক্ষুদেই শ্রীকৃষ্ণ পরম তৃপ্ত হতে জানেন, অথবা দ্রৌপদীর 'অন্নপাত্রে কণামাত্র শাক তাঁর ক্ষুধা নিবৃত্তি করে, কেন? কেননা, সেখানে তো অর্পিত হয়েছে বিনীত ভালোবাসার সঙ্গে। এই হৃদয়ের স্পর্শ যেখানে আছে, সেখানে উপকরণের আয়োজনবাহুল্যের অভাব কোনো অভাব বলেই গণ্য নয়। আর, যেখানে মূল এই হৃদয়সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে সেখানে অতুল বৈভবেও সেবা পরিপূর্ণ নয়। বরং হৃদয়হীন ঐশ্বর্যদান অপমানের স্বরূপ। মানুষের মন মানুষের মনকেই চায়, আর, তারই স্পর্শে তার সব ব্যথাকাতরতার অবসান, তার আশ্রয়পিপাসার শান্তি। উপকরণ সেখানে তুচ্ছ, মিথ্যা।

॥ ৮ ॥ পরের বেদনা সেই বুঝে শুধু যেজন ভুক্তভোগী,
রোগযন্ত্রণা সে কভু বোঝে না হয়নি যে কভু রোগী।

—ক্রীতদাস—[পৃ. ৫১]

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, জুতো যে পরে কেবল সেই জানে কাঁটা কোথায় বিঁধছে। মানবপ্রকৃতির একটি মূল লক্ষণ এই প্রবাদটির মধ্যে নিহিত।

বস্তু আর অনুভূতির মধ্যে একটা প্রকাণ্ড প্রভেদ আছে। রূপগুণ-আকার-আয়তনের বর্ণনা দ্বারা বস্তুকে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, দূরবর্তী বস্তুকেও দৃশ্যমান বলে কল্পনা করানো সম্ভব। যে কখনো পাহাড় দেখে নি, তার কাছে পাহাড়ের নিপুণ বর্ণনায় কোনো একটা রূপ প্রতিভাত হতে পারে। কিন্তু অনুভূতি অবয়বহীন, তার কোনো বর্ণনা চলে না। সুখদুঃখ-আনন্দবেদনার অনুভূতিগুলি কেবল অনুভবগম্য, বর্ণনাসাধ্য নয়। যে কখনো দুঃখ উপলব্ধি করেনি তাকে তাই কোনোদিন দুঃখের স্বরূপ বোঝানো যায় না, সুখের আবির্ভাব যার জীবনে ঘটেনি তাকে সুখ বোঝানোও ততটাই বিড়ম্বনা।

বাঙালি কবি বলেছেন, 'চিরসুখীজন ভ্রমে কি কখন ব্যথিতবেদন বুঝিতে পারে? কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?' বাস্তবিক, নিজ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধ অনুভূতিগুলিই আমাদের কাছে সজীব, অন্য অনুভূতির অস্তিত্ব আমরা প্রায় স্বীকার করি না। তাই, ধনী দরিদ্রের

বেদনা অনুভব করেন না; আবার, কোন্ আনন্দে ঈশ্বরপ্রেমী সন্ন্যাসী দিবারাত্র মাতোয়ারা থাকেন, গৃহস্থজন তা চিন্তা করে বিস্ময়বিমূঢ় হন।

অবশ্য এর সঙ্গে আমাদের এ-ও স্মরণ করা উচিত যে, মানবপ্রকৃতির এটা সাধারণ লক্ষণ হলেও এর ব্যতিক্রমও নিতান্ত দুর্লভ নয়। যদি সত্যি সত্যি জগতে কোথাও একে অপরের হৃদয় উপলব্ধি না করত, তবে এই পৃথিবী এক মহাশ্মশানের উপমাস্থল হয়ে থাকত মাত্র। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ যখন বৃদ্ধ রুগ্ন শোকার্ত ও মৃত মানবদের দেখে তাঁর রাজকীয় সুখ নিমেষে বিসর্জন দিতে চাইলেন, তখন কি আমরা বলব যে চিরসুখীজন ব্যথিতবেদন বুঝতে পারে না? ভুক্তভোগী না হলেও মহৎ মানুষের প্রসারিত কল্পনা নিজেকে অপরের মধ্যে প্রক্ষেপ করে দেখতে পারে, অপরের দুঃখ নিজের বলে কল্পনা করতে পারে। সচরাচর এমন ঘটে না বটে, কিন্তু কখনো কখনো এমন ঘটতে পারে বলেই মানুষ তার সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত আশা পোষণ করে।

॥ ৯ ॥ যতো পুঁথিগত জ্ঞানবিদ্যার ভার
সকলি অসার, ভব-নদী পারে কি মূল্য আছে তার?
—দুই পণ্ডিত—[পৃ. ৫৬]

বর্ণগন্ধময় দৃশ্যমান এই পাঞ্চভৌতিক জগত, আমাদের চোখে এই-ই হলো সর্বাধিক সত্য। যা-কিছু প্রত্যক্ষগোচর, তাকেই আমরা পরম সত্য বলে ধারণা করতে পারি, অপরোক্ষ অনুভূতিগুলিকে আমরা বড একটা গ্রাহ্য করি না। কিন্তু এই জগতের মূল উৎস কোথায়? মানুষ কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়? এই সৃষ্টির আদিরহস্য কী? এইসব ভাবনা থেকে দার্শনিক প্রজ্ঞা ক্রমে জানতে পারে যে, প্রত্যক্ষ এই বস্তু-পৃথিবীই সর্বস্ব নয়, এর অন্তরালে আছে এক অলৌকিক বিভূতিজাল। সেই অতীন্দ্রিয় জগৎ পরাজগৎ, দৃশ্যমান বস্তুজগৎ বস্তুত মায়াময় অপরাজগৎ।

এই পরাজগৎকে যখন মানুষ তার হৃদয়ের মধ্যেই জগৎস্বরূপে অনুভব করতে পারে, তখন বস্তুজাগতিক সুখদুঃখ-ঐশ্বর্য-দীনতা তার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ অবজ্ঞেয় বলে প্রতিভাত হয়। জ্ঞানবিদ্যার বিচিত্র আয়োজনে বস্তুপৃথিবী সম্পর্কে আমাদের ধারণাবলী পরিপুষ্ট হয়। এমন-কি, পরাজগৎ সম্পর্কে আমরা নানা জ্ঞান আহরণ করে পুঁথিগত বিদ্যার পরিচয় দিতে পারি। কিন্তু তখনো পর্যন্ত আমরা ব্যর্থ। কেননা, যদি আমার হৃদয়ের মধ্যে, সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যে সেই পরাজগৎকে উপলব্ধি করে আমার সমগ্র জীবন তার অনুরূপ যোগ্য করে তুলতে না পারি, তবে সমস্ত জ্ঞানবিদ্যা ব্যর্থ হয়ে যায়। পরমঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের কতটা উপযুক্ত হতে পেরেছি তার বিচার আমার ঈশ্বরজ্ঞানের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে ঈশ্বরভক্তির পরিমাণের ওপর। আর, যে-পরিমাণ ভক্তি আমার চরিত্রের আয়ত্ত হয়ে ওঠে, সেই পরিমাণেই আমার চরিত্র ইহবিমুখ পরামুখীরূপে রচিত হয়ে যায়। এই চরিত্ররচনাতেই সমগ্র

জীবনের সার্থকতা ; জ্ঞানার্জনের শুষ্ক পদ্ধতি ঐ পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দেয় না যদি-না সত্য অনুভব তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

॥ ১০ ॥ ধর্মের তরে দুঃখস্বীকার তপ বই কিছু নয়,
ব্যর্থ হয় না কোন তপস্যা, ধর্মেরই হয় জয়।

—দুর্বাসার পরীক্ষা—[পৃ. ৬৭]

দুঃখ কাকে বলে? স্থূল দেহমনের অসুখকেই বলি দুঃখ। আমি অনেক দেহস্বাচ্ছন্দ্য কামনা করি, কিন্তু পাই না, তাই আমি দুঃখী। আমি অনেক ঐশ্বর্যের প্রতি লুব্ধ, সেই ঐশ্বর্যের অভাবে আমার দুঃখ। আমার দেহ জীর্ণ হয়, রুগ্ন হয়, তাই আমার দুঃখ। অথবা আমার প্রিয়জন পৃথিবীবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অজানা জগতে পরিক্রান্ত হয়ে গেল, আমার দুঃখের সীমা রইল না।

কিন্তু গভীর অভিনিবেশে লক্ষ্য করা যায়, এ-সবই পার্থিব দুঃখ। পার্থিব জীবনকে যখন শেষ সত্য বলে গণ্য করি, দেহময় জগৎকে যখন পরাজগৎ বলে ভ্রম করি, একমাত্র তখনই ঐ সব দুঃখ আমার চিত্তভূমিকে আলোড়িত করে যায়। কিন্তু দেহময় এই পার্থিব জীবনই কি একান্ত পরিণামী সত্য?

ধর্মপথচারীরা তা মনে ভাবেন না। ধর্মের উজ্জ্বল বিভায় তাঁরা অন্তরের অভ্যন্তরে আরো একটি অদৃশ্য পথ লক্ষ্য করেছেন, সেই পথ অনুসরণ করে চলতে চলতে তাঁরা পরাসত্যে ঈশ্বরসান্নিধ্যে পৌঁছে যাবেন। তাই, যথার্থ ধার্মিক জানেন যে, প্রচলিত দুঃখাবলী সহ্য করে যাওয়ার মধ্যেই মানুষের মহৎ পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হতে না জানে, ধর্মের পথে তার চলা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। দুঃখের কাছে নতি স্বীকার করে পার্থিব সুখমায়ার প্রত্যাশায় যদি আমি ঘূর্ণিত হই, তবে পরাজগতের পথ ক্রমেই আমার কাছে সংগুপ্ত হয়ে আসে। আর, যদি ধর্মের শক্তি বলীয়ান হয়, যদি এ-বিশ্বাস প্রবল হয় যে, দৃশ্যমান এই প্রত্যক্ষ জগৎ তুচ্ছ, তবে দুঃখই আমার কাছে নতি স্বীকার করে। তখন রামপ্রসাদের মতো আমি বলতে পারি, 'আমি কি দুঃখেরে ডরাই? দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই'।

সাধক রামপ্রসাদের মতো সকল ধর্মসাধকেরই এই দুঃখের গর্ব। ধার্মিক ধর্মের কাছে কী প্রত্যাশা করেন?—'দুঃখ নব নব'। নতুন নতুন দুঃখের পরীক্ষায় কতদূর তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেন, তাই দেখেন সাধক। সেইজন্যেই তো ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রসাধনার এত প্রতিপত্তি।

॥ ১১ ॥ শুধু আপনারি দেশে সমাদর রাজা বাদশার,
গুণীর আদর মান সব ঠাঁয়ে এই দুনিয়ার।

—গুণীর পুরস্কার—[পৃ. ৭৪]

বিদ্যার গরিমাপ্রসঙ্গে সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে, স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। কেবল বিদ্যা নয়, এই কথাটিকে আরো একটু সাধারণ অর্থে

প্রয়োগ করা সম্ভব গুণেরও প্রসঙ্গে। রাজা কেবল নিজের দেশেই মহিমার অধিকারী, কিন্তু গুণীর আদর সর্বত্র। কেননা, রাজা যে শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করে তা ভীতিসম্ভ্রমজাত শ্রদ্ধা, তা স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ের উপঢৌকন নয়। ফলে রাজমহিমার শক্তিপ্রতাপ যতদূর বিস্তৃত, ততদূর পর্যন্তই জনজীবনে তাঁর প্রভাব। সেই সীমার বহির্ভূত জগতে তাঁকে কে চেনে? সেখানে তো অন্য পাঁচজনের সঙ্গে রাজার কোনো ভেদ নেই! এমন রাজাও অবশ্য আছেন যিনি সুশাসক। পালক এবং সেবক এই দুই রূপেই প্রজার সুমঙ্গল তিনি অহরহ কামনা করেন। কিন্তু এঁর প্রতি প্রজাকুলের যে শ্রদ্ধা তাকেও স্বার্থগন্ধবিমুক্ত বলা যায় না। সেও তো গভীরতর অর্থে কৃতজ্ঞতারই প্রকাশ মাত্র। এর ও মধ্যে এক দেনাপাওনার সম্পর্ক রচিত হয়ে যায়।

কিন্তু যিনি যথার্থ গুণী, তাঁর অধিকার মানবসাধারণের হৃদয়ে বিস্তৃত। কোনো শাসনের ভয়ে, ঐশ্বর্যের মহিমায়, প্রাপ্তির প্রত্যাশায় অথবা দানের কৃতজ্ঞতায় তাঁর প্রতি বিনীত নিবেদনের প্রয়োজন ছিল না কিছু। তথাপি কেন যে কোনো দেশে : যে-কোনো কালে তিনি আদৃত হন? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—তিনি অধিকার বিস্তার করেন জনচেতনার আদর্শবোধের ওপর। তাদের হৃদয়ের মধ্যে বিকীর্ণ হয় তাঁর প্রভাবরশ্মি।

॥ ১২ ॥ প্রতিহিংসা ঘৃতাহুতি—সে তো শুধু ক্ষতের অনলে,
সে অনল নিভে শুধু বিগলিত হৃদয়োৎস-জলে।
—কৃষ্ণার প্রতিহিংসা—[পৃ. ১২৫]

পশুসমাজে ক্ষমার অস্তিত্ব নেই। যে মারে, সেই বাঁচে, এই মন্ত্রই জীবলোকের সর্বত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। তাই, শক্তির অমিত প্রয়োগে আত্মজীবন রক্ষা করার প্রেরণাও যেমন সেখানে স্বাভাবিক, যে-কোনো আঘাতকে প্রত্যাঘাতে ফিরিয়ে দেবার প্রকৃতিও তাদের ততটাই অনিবার্য। মানুষও এই ব্যাপ্ত জীবজগতের একটা অংশমাত্র, মানবসমাজেও তাই এই বৃত্তিগুলি আমরা অবিরাম দেখে যাই।

কিন্তু জীবজগতে মানব যে শ্রেষ্ঠতার দাবি ঘোষণা করে, সে কিসের জোরে? সে তো এই গর্বে যে, পশু তার আপন স্বভাবের অধীন, কিন্তু মানুষ চায় তার স্বভাবকে অতিক্রম করতে, স্বভাব তার দাস। তাই মানবসমাজে এমন মহাজীবন মাঝে মাঝে ভাস্বরদীপ্তিতে দেখা দেয়, যা আমাদের জীবনে নতুন নতুন দিক্ষা সঞ্চার করে।

হিংসার পরিবর্তে প্রতিহিংসা, সে তো সকলের জন্যে স্বাভাবিক। কিন্তু এতে কি হিংসার নিবৃত্তি হয়? বরং জিঘাংসাবৃত্তি ক্রমশ স্থূলতর অবয়ব লাভ করে এক মহাধ্বংসের মুখে ফেলে দেয় পৃথিবীকে। এই পরমহিংসার মুখ থেকে জীবনকে রক্ষা করবার উপায় কী? কীভাবে অন্তর থেকে হিংসার বীজ সম্পূর্ণ উৎপাটিত হয়ে যাবে? প্রতিহিংসার দ্বারা নয়, ক্ষমার দ্বারা। যুগে যুগে ধর্মাধিনায়ক মহামানবেরা এই বাণীই ঘোষিত করে গেছেন। ক্রুশবিদ্ধ হবার মুহূর্তেও যিশুখৃস্ট বলেছিলেন, ঈশ্বর, এদের ক্ষমা করো, এরা জানে না কী করছে। 'মেরেছে কলসীর কানা তাই

বলে কি প্রেম দেব না' বলে জগাই-মাধাইকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন নিত্যানন্দপ্রভু। বুদ্ধ যে-মহামন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন তার সূত্র হলো 'অহিংসা পরম ধর্ম', আর, সেই মন্ত্রের জীবন্ত প্রতিরূপ আধুনিক জগৎ দেখে নিল গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবে। এক হৃদয়ের প্রেম অন্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হতে পেলেই জগতে হিংসার প্রভাব দূরীকৃত হয়ে যায়, এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় রেখে হিংসাকে বরণ করতে হবে ক্ষমার দ্বারা, প্রতিহিংসার আঘাতে নয়।

বস্তুসংক্ষেপকরণ

॥ ১ ॥ রক্ষক ও ভক্ষক [শব্দসংখ্যা প্রায় ২২০]

এক রাজার দুরারোগ্য ব্যাধি। রাজবৈদ্যকে হতাশ দেখে রাজপুরোহিত দৈববিধান দিলেন, সুলক্ষণ এক বালককে মহাশক্তির উদ্দেশ্যে বলি নিবেদন করলে রাজা সুস্থ হবেন। বিচারকও এর অনুমোদন করলেন। প্রভূত অর্থবিনিময়ে এক দরিদ্র জনকজননীর কাছে থেকে পুত্র লাভ করা গেল। বধ্যভূমিতে নীত হয়ে পৃথিবীর লীলা স্মরণ করে সেই বালক অকস্মাৎ হেসে উঠলো। আপনতম প্রতিপালক জনকজননী, অন্যায়প্রতিকারক বিচারক, দেশরক্ষক নৃপতি এবং নিখিল-আশ্রয় বিশ্বমাতা: এক নিরপরাধ বালকের নিধনে এঁরা সকলেই সম্মত, কেবল আপন-আপন-স্বার্থলোভে। নামত যাঁরা রক্ষক, কার্যত তাঁরা ভক্ষক। বালকের মুখে এই কথা শুনে ব্যাধিগ্রস্ত নৃপতির চৈতন্যোদয় হলো, বালকটিকে তিনি মুক্তি দিলেন।

॥ ২ ॥ নারীর শক্তি [শব্দসংখ্যা প্রায় ৩০০]

রাঠোরপতি সূর্যসিংহ তাঁর সেনানায়ক শূরসিংহকে সংগ্রামে প্রেরণ করেছেন। শিরোহীপতি অর্জুনসিংহ রাঠোরবংশে তাঁর কন্যাসম্প্রদানে সম্মত হননি, এই অপমানের প্রতিশোধগ্রহণই ছিল সংগ্রামের হেতু। অচিরেই শিরোহীদল পর্যুদস্ত হলো, বন্দী অর্জুনসিংহ সন্ধিকামনা জানালেন, রাঠোরের সকল দাবি মেনে নিতে এখন তিনি প্রস্তুত। কিন্তু প্রতিহিংসায় উন্মত্ত শূরসিংহ সন্ধির সমস্ত সূত্রই প্রত্যাখ্যান করেছেন, এমন সময়ে তাঁর শিবিরদুয়ারে দেখা দিলেন শিরোহীমহিষী। তাঁর ভগিনীতুল্য আবেদনে নম্র হলো শূরসিংহের মন, সন্ধিসর্ত স্বীকার করে তিনি শিবির সংহরণ করে চলে এলেন। নারীর আবেদনে বিচলিত হয়েছেন এই অপরাধে কিন্তু শূরসিংহের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হলো। আর, বধ্যভূমিতে শূরসিংহ যখন মৃত্যুবরণে প্রস্তুত, তখন জানা গেল, রাঠোরমহিষীর আবেদনক্রমে সূর্যসিংহ তাঁকে মুক্তিদান করতে সম্মত হয়েছেন।

॥ ৩ ॥ উজির ও বাদশাহ [শব্দসংখ্যা প্রায় ৩০০]

ওমরাহরা প্রত্যহই বাদশার কাছে নালিশ জানান উজীরের বিরুদ্ধে। যদি কোনো গোপন দুরভিসন্ধি অথবা অসদাচরণ না-ই থাকবে তবে গভীর

রাতে নিত্য তিনি কোথায় যান? উত্ত্যক্ত বাদশা অবশেষে একদিন রাত্রে গোপনে অনুসরণ করলেন উজীরকে। দেখা গেল, এক জীর্ণ কুটীরে প্রবেশ করে উজীর তাঁর বহুমূল্য পরিধেয় পরিত্যাগ করে ভিখারী মেষপালকের সাজ গ্রহণ করেছেন এবং ঈশ্বরের নামজপে মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন। বিস্মিত বাদশা তাঁকে ডেকে এই অভিনব আচরণের হেতু জিজ্ঞাসা করলেন। উজীর জানালেন, অতীতে তিনি ছিলেন এক দরিদ্র মেষপালক। আজ ঐশ্বর্যের মদে অন্ধ হয়ে সেই অতীতকে যদি তিনি অস্বীকার করেন তবে তা হবে মহাপাতক-তুল্য। দিবসের ঐশ্বর্যগ্লানি থেকে পরিশুদ্ধ হবার জন্যেই তাঁর এই নিশীথকালীন নিভৃত আত্মনিবেদন।

॥ ৪ ॥ মুচির মোচন [শব্দসংখ্যা প্রায় ২৫০]

ঈশ্বরধ্যানে জীবনযাপন করেন আলিমসাহেব। তাঁর গৃহদুয়ারে এক মুচির আস্তানা। রাত্রে যখন তিনি ধ্যানে মগ্ন থাকেন, মুচি আর তার ইয়ারবন্ধুদের প্রমত্ত কোলাহল তখন সকল সীমা অতিক্রম করে যায়, থেকে থেকে ধ্যান ভেঙে যায় আলিমসাহেবের। কিন্তু কোনো-এক রাত্রে এই নিত্যকার উপদ্রব ঘটল না, অনেক প্রতীক্ষা করেও আলিম মুচির কোনো সাড়া পেলেন না। মুচির কোনো অমঙ্গল ঘটল বুঝি, এ-আশঙ্কায় আলিম ধ্যানে স্থির থাকতে পারলেন না। পরদিন যখন জানলেন দুর্বিনীত মুচিকে শাস্তি দেবার জন্যে শৃঙ্খলিত করেছে পাইক, আলিমের প্রাণ কেঁদে উঠল। এই প্রথম তিনি নিজাম দরবারে উপস্থিত হলেন স্বয়ং মুচির মুক্তিপ্রার্থনা নিবেদন করতে। তখন সেই মুচির শারীরিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে যেন মানসিক মুক্তিও ঘটল। কৃতজ্ঞ অভিভূত মুচি কোরাণ স্পর্শ করে শপথ নিল, জীবনে কখনো আর সে মদ্যপান করবে না।

॥ ৫ ॥ আহ্বান [শব্দসংখ্যা প্রায় ২০০]

হৃদয়মধ্যে অকস্মাৎ ঈশ্বরের আহ্বান ধ্বনিত হয়ে উঠতেই রাজকার্য পরিত্যাগ করলেন রাজমন্ত্রী। রাজা বোঝেন না, মন্ত্রী তাঁর এত সমাদর অবহেলা করে কোন্ প্রভুর সেবায় রত। [redacted] তাঁর নতুন প্রভু রাজরাজেশ্বরের মহিমা বর্ণনা করলেন। ঈশ্বর নিজেই তাঁর সেবকের ভরণপোষণের ভার নেন, তাকে সর্বদা তিনিই রক্ষা করে চলেন, শত অপরাধে অনায়াসে তাঁর ক্ষমা অর্জন করা যায়; তিনি অজর অমর, আর তাঁর সেবা করতে পারলে অনায়াসে এই ভববন্ধন অতিক্রম করা যায়। রাজার চেয়ে তিনি কি তবে আরো বড়ো রাজা নন? এই ঈশ্বরমহিমার কাছে রাজা এখন প্রসন্নচিত্তে তাঁর মন্ত্রীকে সমর্থন করতে পারলেন।

মর্মার্থলেখন

॥ ১ ॥ ঘন বনে তপ……দীনতায় ভরা দিনের সুপ্রভাত।

—শ্রীদাম সখা—[পৃ. ১৬-১৭]

সংসার পরিত্যাগ করে কোনো কোনো সাধক ঈশ্বরের অন্বেষণে বনবাসব্রত গ্রহণ করেন। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো তপস্যা সংসারের মধ্যে ঐশ্বর্যপরিবৃত থেকে মুক্তির সাধনা। এই ব্রত যিনি পালন করতে পারেন, ঐশ্বর্যের স্থূল গরিমা তাঁকে স্পর্শ করে না। সব কিছুর মধ্যেও তিনি বিনীত দীনতার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারেন। সাত্ত্বিকতার এই শ্রেষ্ঠ চর্চাতেই সবচেয়ে বেশি ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করা যায়।

॥ ২ ॥ আমার শরীরে শোণিত ঝরুক……করিতেছে বর্ষণ।

—পারিয়া সাধক—[পৃ. ২৩]

দেবতাকে মানুষ মন্দিরের অভ্যন্তরে বন্দী করে রাখে। যিনি সর্বমানবের প্রভু আধুনিক সমাজে তিনি ঐশ্বর্যের সমারোহে অবরুদ্ধ। সেখানে শুচি-অশুচি ধনীনির্ধনের ভেদে প্রকৃত ভক্তির মূল্য অন্তর্হিত হয়ে যায়। ভক্তহৃদয়ের কাতর প্রতীক্ষা জাগে কেবল সেই দিনের জন্যে, যে দিন মানুষের রচিত এই মিথ্যা আবরণ দূর করে দিয়ে ভগবান্ তাঁর প্রেমস্বরূপে সকল মানবের সামনে আবির্ভূত হবেন।

॥ ৩ ॥ কহিলেন প্রভু, তোমার……তব বেদনাতাপিত বুক।

—উৎপলা ও পটচারা—[পৃ. ৩১-৩২]

প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় বিহ্বল শোক যখন আমাদের আচ্ছন্ন করে, তখন শান্তির প্রত্যাশায় আমরা ধর্মের কাছে, দেবতার কাছে ঘুরি ফিরি। কিন্তু অনুরূপ শোককে বা গভীরতর শোককে যিনি হেলায় জয় করেছেন, সেই মানুষের মহৎ আদর্শই আমাদের সবচেয়ে বড় পাথেয় হতে পারে, একথা আমরা ভুলে থাকি। আপন অন্তরের মধ্যেই নিবৃত্তিশক্তির উৎস আছে, তাকেই জাগ্রত করে তোলা চাই।

॥ ৪ ॥ ভীমসেনে ডাকি ইন্দ্রপ্রস্থে……আমি হইতাম খুশি।

—বাল্মীকি মুনি—[পৃ. ৪৭-৪৮]

কেবল যে ঈশ্বরই মহৎ তা নয়, ঈশ্বরের যিনি প্রকৃত সেবক, প্রকৃত ভক্তপূজারী তাঁরও মহিমা অপার। সেই ভক্তকে যিনি শ্রদ্ধা জানাতে পারেন না, তাঁর ঈশ্বরসাধনা অসম্পূর্ণ, অসম্পন্ন থেকে যায়। ঐশ্বর্যের ঘোষণায় নয়, ঈশ্বর তুষ্ট হন প্রেমবিনীত স্বভাবে।

॥ ৫ ॥ গভীর নিবিড় প্রেম যে……দুঃখ তো তার তপ।

—বাঁকা ও বাঁকা—[পৃ. ৮১]

ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেম অনুভব করলে পার্থিব সুখলালসা নিমেষে তুচ্ছ প্রতিভাত হয়। বহির্জাগতিক অর্থে যাকে দুঃখ বলে বোধ হয়, প্রকৃত ভক্তসাধক তাকে সানন্দে বরণ করে নেন জীবনে।

॥ ৬ ॥ **কহিলেন নৃপ, শুন যথার্থ……তাহাদেরি দেওয়া ধনে।**

—দানের পাপ—[পৃ. ৯৭]

রাজা প্রজাপালনের দায়িত্ব বহন করেন বলেই তিনি রাজা। তাঁকে মনে রাখতে হয় যে, তিনি প্রজাদের বেতনভোগী সেবক, প্রজাকরে প্রজাদের মঙ্গলবিধানই তাঁর সাধনা। সেই কর্তিকরণের পর যা অবশিষ্ট থাকে, অথবা নিতান্ত স্বোপার্জিত যে ধন, তা-ই রাজা ব্যবহার করতে পারেন দানের জন্যে। কেবলমাত্র দানে কোনো পুণ্য নেই, দানের উৎস কী তাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। পাপে-অর্জিত অর্থ দান করলে যে পাপ দূরীভূত হয়, এ ধারণা সত্য নয়।

॥ ৭ ॥ **গঙ্গার জলে প্রয়াগে কুম্ভ শিবের সেবা।**

—তীর্থফল—[পৃ. ১০৭]

তীর্থকরণের কোন মূল্য নেই, যদি জীবপ্রেমে হৃদয় করুণার্দ্র না হয়। অলৌকিক দেবতার সেবা করার অজুহাতে যদি লৌকিক বেদনাকে আমি উপেক্ষা করি, মুমূর্ষুকে জলদানের পরিবর্তে যদি মৃন্ময় দেবমূর্তির পদতলে আমি জলসিঞ্চন করি, তবে আমার সমস্ত তীর্থফল ব্যর্থ হয়ে যায়। জীবসেবাই প্রকৃত ঈশ্বরসেবা, এই মন্ত্র সাধকের পক্ষে সকল সময় স্মরণীয়।

॥ ৮ ॥ **কহিলেন প্রভু, একটি তো তুমি পরমধর্ম জেনো।**

—উর্ব্বরী—[পৃ. ১১১-১১২]

পার্থিব দেহের অবসানে প্রিয়জন শোকবিহ্বল নৈরাশ্যের মধ্যে মগ্ন হয়ে যায়। একথা সে উপলব্ধি করে না যে, মায়াময় এই জগতে জীবন কত নশ্বর, যুগে যুগে সকল ক্রন্দন তুচ্ছ করে মৃত্যু তার পথপরিক্রমায় রত। এই সত্য মনে স্থিরভাবে উপলব্ধি করে মানুষ যদি তার হৃদয়কে শোকতাপের ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে, তবেই সে আদর্শস্থানীয়। শোকের দ্বারা পরাভূত হওয়া নয়, শোককে পরাভূত করাই মনুষ্যধর্ম।

॥ ৯ ॥ **বহুদিন থেকে কুব্জ বামন …. কুঁজের জন্য নয়।**

—কুব্জের প্রার্থনা—[পৃ. ১১৯]

দৈহিক খর্বতা অথবা বাহ্যরূপের অভাব মানুষের পক্ষে মর্মান্তিক দুঃখের নয়, কেননা, মানবলোকে হৃদয়বৃত্তিই সবচেয়ে বড়ো পরিচয়। মানুষ ঘৃণ্য হয় কেবল তার মানসিক নীচতার দ্বারা। কোনো কোনো মানুষকে পৃথিবীতে দেখি যারা একই সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক কুব্জতায় দেবতারও অভিশাপভাজন হয়ে ওঠে।

॥ ১০ ॥ **শীলানন্দ সে মহাস্থবির….. তুমি বন্ধু লভিবে নির্বাণ।**

—অজন্তা গুহায়—[পৃ. ১২১]

তপস্বী তার ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের জন্যে ভগবৎচিন্তায় দিনযাপন করেন। কিন্তু শিল্পীর তপস্যা স্বতন্ত্র। তিনি যখন ঐহিক সুখদুঃখ তুচ্ছ করে শিল্পরচনায় মগ্ন হয়ে যান, তাঁর শিল্পের মধ্য থেকে তখন যুগযুগান্তরব্যাপী বাণী প্রকাশিত হতে থাকে। সাধারণ তপস্বীর চেয়ে তাই আরো সার্থক ও মহৎ তাঁর তপস্যা।

॥ দশম শ্রেণী ॥

রাজর্ষি

<ভাবসম্প্রসারণ>

প্রশ্ন ১॥ শান্তি সুখ আপনার মধ্যেই আছে, কেবল জানিতে পাই না।

[চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৭২]

শোনা যায়, মনোমদ গন্ধে পাগল হয়ে কস্তুরীমৃগ বনে বনে ঘুরে বেড়ায়; সে নিজেই জানে না যে, ওই সুবাসের উৎসটি বিরাজ করছে তার নিজনাভিদেশে। যে-বস্তুটি একান্ত কাছে রয়েছে, মূঢ়তা আর বিভ্রান্তির বশে তাকে বাইরে খোঁজে উন্মাদপ্রায় মৃগ। সংসারের মোহাচ্ছন্ন মানবমানবীর আচরণও অনেকটা এই কস্তুরীমৃগের মতো। মানুষ সুখসন্ধানী, শান্তি তার অভিলষিত। এ দুটি বস্তুকে আয়ত্ত করবার জন্যে প্রয়াসের আর শেষ নেই। কোথায় রয়েছে সুখ আর শান্তি? পৃথিবীর প্রায়-যাবতীয় মানুষই ভাবে—বিত্তসম্পদ, খ্যাতিপ্রতিপত্তি, প্রচুর ভোগ্যবস্তু হাতের মুঠোয় যদি মেলে তাহলে বেশ সুখশান্তিতে তার দিনগুলি কাটে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? কবে কার সুখভোগের বাসনা চরিতার্থ হয়েছে? বস্তুসম্ভার—যেমন, অর্থ-বিত্ত-মান-খ্যাতি—যতই প্রভূত হোক, পৃথিবীর কোন্ মানুষের বাসনার পূর্ণনির্বাপন ঘটিয়েছে? অমেয় ভোগের অধিকারী হয়েও কি সংসারের কোনো মানুষ আজ পর্যন্ত বলতে পেরেছে যে, মনে সে বিনির্মল নির্বিরোধ শান্তি পেয়েছে? এর উত্তর নিশ্চয়ই নেতিবাচক।

এইজন্যে নেতিবাচক যে, সুখশান্তি বস্তুগত একেবারেই নয়, এ হলো মনোগত। পার্থিব বস্তুনিচয় ভোগবাসনা কেবল বাড়িয়েই চলে, তৃপ্ত কখনো করে না। এইজন্যে বাসনাব্যাকুল নরনারীর কণ্ঠে অবিরাম উচ্চারিত হচ্ছে শুনতে পাই: আরো চাই—আরো। কিন্তু এই মুহূর্তের প্রাপ্তি পরমুহূর্তে মনের তলে ভিন্নতর প্রাপ্তির অঙ্কুরোদ্গম ঘটাচ্ছে, এবং তাকে পাওয়ার জন্যে মানুষের আকুতিও ক্রমবর্ধমান হয়ে চলেছে। কে না জানে যে, বহ্নিতে ইন্ধন জোগালে শিখা আরো লেলিহান হয়ে ওঠে। কিন্তু বহির্মুখ মানুষ এ সত্যটি উপলব্ধি করে কৈ?

তবে মানুষের কি করণীয়? প্রকৃত সুখশান্তি কোন্ উপায়ে লভ্য? শাস্ত্রে এর উত্তর আছে—অন্তরে সন্তোষকে লালিত করেই সুখার্থীকে—প্রকৃতশান্তি-আকাঙ্ক্ষীকে সংযত হতে হবে, গোপনচারী আমাদের লুব্ধ ক্ষুধিত কামনাবাসনাকে করতে হবে শৃঙ্খলিত। আর উপনিষদের বাণীতে কি আমরা শুনতে পাইনে যে, মানুষের অন্তর্লোকেই লুকানো রয়েছে অগাধ-আনন্দ-প্রদায়ী সুধাভাণ্ড? কেবল মোহান্ধতার জন্যেই বহির্মুখ আমরা তার সংবাদ পাই না। অন্তর্মুখ হতে পারলেই মানবমানবী এর সন্ধান পায়। দুঃখের প্রচণ্ড অভিঘাতে যেদিন আমরা বাইরের জগৎ থেকে দৃষ্টি

ফিরিয়ে তাকে অন্তরদেশে নিবদ্ধ করি সেদিন এই লুকানো-অমৃতের আস্বাদ পাই। এরকম এক বিরলমুহূর্তে সুখ শিশুর মুখের হাসির মতোই সহজ হয়ে ওঠে, বস্তুবিমুখ চিত্ত পরমাশান্তির পরশ পেয়ে নিজেকে ধন্য মানে।

॥ ২ ॥ দুঃখ যে পাপেরই ফল তাহা কে বলিল, পুণ্যের ফলও হইতে পারে। কত ধর্মাত্মা আজীবন দুঃখে কাল কাটাইয়াছেন

[দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ । পৃ. ১১৮]

পাপ ও পুণ্যকে সহজবুদ্ধি মানুষ সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িয়েছে। পাপাচারী তার দুষ্কর্মের ফল ভোগ করবে, দুঃখ পাবে ; অপরপক্ষে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠাতা পুণ্যবান ব্যক্তি বিনির্মল সুখের অধিকারী হবেই হবে—সাধারণ মানুষের এরূপই ধারণা। বোঝা যাচ্ছে, দুঃখানুভব, এদের ধারণায়, সুখানুভূতির বিপরীত একটি বস্তু। কিন্তু দুঃখকে এইভাবে দেখাটা ঠিক দেখা নয়, যেহেতু দুঃখ-কথাটির নিজস্ব তাৎপর্য রয়েছে—সর্বক্ষেত্রে সুখের বিপরীত মানস-অবস্থা এ নয়।

সুখ হলো স্থূলবস্তুভোগ অথবা এ জাতীয় বস্তুর প্রাপ্তিজাত তৃপ্তি। কিন্তু স্বেচ্ছাবৃত দুঃখ,স্থলবিশেষে অনিবার্য আনন্দদায়ক সামগ্রীও হতে পারে। ভোগীজনের দুঃখ আর মনুষ্যত্বের দুঃখ স্বরূপত বিভিন্ন ; প্রথমটা অভাববোধজনিত, দ্বিতীয়টা বৃহৎ প্রাণের ত্যাগধর্মসম্ভূত। মহাপ্রাণেরা নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ করে ; তাদের উদার প্রেমানুভব হৃদয়ের বৃন্তে যে ফুল ফোটায়, বাইরে তা দুঃখমূর্তি, কিন্তু আভ্যন্তরিক রূপে সে আনন্দগন্ধী। যার মন যতো বড় তার দুঃখবোধও তত বেশি ; বিশ্বকে যে প্রেমের আলিঙ্গনে বেঁধেছে, নানা কারণে তাকে দুঃখ পেতে হয়। এই দুঃখবোধ পবিত্র প্রাণের ভালোবাসার ফল, ব্যক্তিগত লাভক্ষতির সঙ্গে এর সম্পর্কমাত্র নেই। কত কত সমাজসংস্কারক এবং ধর্মপ্রচারক তাঁদের মানবপ্রেম ও প্রবল ঈশ্বরানুরাগের জন্যে বিরুদ্ধবাদীদের হাতে নির্দয়ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন, এমন কি, মৃত্যুপর্যন্ত বরণ করেছেন। এসব মানুষের অশেষবিধ নির্যাতনভোগ নিশ্চয়ই পাপের শাস্তি নয়, কেননা, তাঁরা [redacted]চ্চতর মানবধর্মের সাধক, সত্যাশ্রয়ী— তাঁদের পুণ্যাত্মা বলতেই হবে। এবং তাঁরাই এ সংবাদটি রাখেন যে, সত্য ও সুন্দরের দেবতা মাঝে মাঝে দুঃখের মূর্তিতেই দেখা দেন।

॥ ৩ ॥ কর্তব্যের কাছে ভাই বন্ধু কেহ নাই

[ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । পৃ. ১২১]

মানুষের মনুষ্যত্ব যথাযথ তার কর্তব্যপালনে। কিন্তু এ কাজটি সহজ একেবারেই নয়, কখনো কখনো অত্যন্ত দুরূহ হয়ে ওঠে, কেননা, বিস্তর বাধা একে অতিক্রম করতে হয়। কিসের বাধা ?—ব্যক্তিগত লোভ ও স্বার্থের আর হৃদয়দৌর্বল্যের। লোভ ও স্বার্থবুদ্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো কঠিন, সন্দেহ নেই ; কিন্তু কঠিনতর হলো—

দুর্বলবৃত্তি সময়ে সময়ে চিত্তে যে-দুর্বলতার সৃষ্টি করে তাকে কাটিয়ে ওঠা। কথাটা পরিষ্কার করে বলা যাক্। স্নেহ-প্রেম-প্রীতি মনুষ্যের মানবিক সত্তার অতিশয় মূল্যবান উপকরণ; যার হৃদয়ের গভীরে এই সুকুমার বৃত্তিনিচয়ের উৎসরণ নেই, তাকে মানুষ বলি কী করে? অথচ এমনো দেখতে পাই, এসকল উত্তম বস্তুও মানুষকে কর্তব্যভ্রষ্ট করছে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। যেমন, কোনো ব্যক্তি বিচারকের উচ্চ-আসনে বসেছেন। তাঁর কাছে সুবিচারই প্রার্থিত। যদি দেখা যায়, উক্ত বিচারকের কোনো বন্ধু-ভাই-স্বজন গুরুতর অপরাধ করে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে তখন বিচারক কি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বেন না? এরূপ অবস্থায় তাঁর মনে দ্বন্দ্বসংঘাত দেখা না দিয়ে পারে না—একদিকে মমত্ববোধের আকর্ষণ, অন্যদিকে ন্যায়বিচারের মর্যাদারক্ষণ অর্থাৎ বিচারকের দায়িত্ব ও কর্তব্যপালন। মমতা যদি তাঁর চিত্তদেশকে আচ্ছন্ন করে তাহলে তিনি অবশ্যই কর্তব্যচ্যুত হবেন; পক্ষান্তরে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে যদি সচেতন থাকেন, তবে নিশ্চয়ই স্নেহান্ধতার ঊর্ধ্বে উঠে যাবেন। এতে তাঁর কর্তব্যধর্ম অক্ষত থাকবে। অন্ধভালোবাসার তামসিক দুর্বলতা থেকে কর্তব্যপালনের কঠিন রাজ্যে জাগরিত হবার মধ্যেই মনুষ্যত্ব। কর্তব্যপরায়ণ মানুষের নিশ্ছিদ্র নিরপেক্ষতার কাছে আত্মীয় অনাত্মীয়, শত্রুমিত্র সকলেই সমান মূল্য বহন করে।

॥ ৪ ॥ দুরন্ত অশ্বকে দ্রুতবেগে ছুটাইয়া শান্ত করিতে হয়।

[দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৫৩]

বাক্যটি উপমাত্মক। এখানে 'দুরন্ত অশ্ব' মানবমানবীর প্রবল শক্তিমান কামনাবাসনাগুলির স্বভাবের দিকেই ইঙ্গিত করছে যেন। মানুষের ভোগমুখী প্রবৃত্তিনিচয়ের চাহিদার অন্ত নেই, এদের সংযত করা বড়ো সহজ কথা নয়। পরাক্রান্ত প্রবৃত্তিকে কোন্ উপায়ে বশ করতে হয়? ভোগ্যবস্তু জুগিয়ে? কদাপি নয়। কারণ, মানবের ক্ষুধাতৃষ্ণা যেমন অনিঃশেষ, তেমনি, এদের তৃপ্তিবিধান অসম্ভব একটি ব্যাপার। চরিতার্থতালাভের নিত্যসুযোগ মানবীয় কামনাবাসনাগুলিকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে—প্রবৃত্তির চর্চায় অভাববোধ ক্ষয় পায় না কখনো, ক্রমবর্ধমান হয়েই ওঠে। [illegible] অবস্থায় মানুষের মনকে কঠিন না চাওয়ার বাঁধনে নিয়ে ফেলতে হবে, অভ্যাস [illegible] হবে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন। তখন ভোগসর্বস্ব প্রবৃত্তিগুলি সুযোগের অভাবে নির্জীব [illegible] বাধ্য, না-পাওয়ার প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে সে শ্রান্ত হয়ে পড়বেই, এবং [illegible] মানবে। গতিবেগের উন্মাদনা অশ্বকে দুরন্ত করে তোলে, দূরে-দূরান্তরে [illegible] দিলে কিছুক্ষণ পরে সে শান্ত হয়। এই অশ্বজীবনের সত্য মানবজীবনেও [illegible] খেয়ে-খেয়ে ক্ষুধা যে মরে যায়, এ তো আমাদের সকলেরই জানা। [illegible] সে-কথা খাঁটি।

প্র/ প্র। হৃদয় যার কঠিন হইয়া গিয়াছে দেবীর কথা সে শুনিতে পায় না।

[তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ১২]

মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয় বহির্জগতের সঙ্গে তার মনের সংযোগ ঘটায়, এই ইন্দ্রিয়গ্রামকে বাদ দিয়ে জাগতিক কোনো জ্ঞান আহরণ সম্ভব হতে পারে না। চোখ না থাকলে মানুষ কেমন করে বস্তুবিশ্ব দেখতে পেত, কান না থাকলে কী উপায়ে শুনতে পেত বিচিত্র ধ্বনিপুঞ্জ! তবু প্রশ্ন থেকে যায়। চোখ দিয়ে বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কতটুকুই বা আমরা দেখি! ব্যক্ত-অব্যক্ত ধ্বনিপ্রবাহের কতখানিই বা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের আয়ত্তে! অকিঞ্চিৎকর অংশমাত্র।

কেবল তা নয়। চোখের দেখা অনেক সময়েই বস্তুর সত্যস্বরূপের সংবাদ দেয় না। তাই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সঙ্গে মন-নামক পদার্থটিকে যুক্ত করে দিতে হয়। কানের সাহায্যে সবকিছু কি আমরা সঠিক শুনতে পাই! পাই না। হৃদয়ের শোনাটাই যথার্থ শোনা। হৃদয় দিয়ে—অন্তরের ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির যোগে—যে না-শুনেছে, বলবো, কিছুই শোনেনি সে।

দুয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে কথাটি বুঝাই। সন্তানের না-বলা বাণীও মা ঠিক ঠিক বুঝতে পারেন। কেমন করে! হৃদয়ানুভবের আশ্চর্য শক্তি দিয়ে। তারপর বলি কতকাল ধরে দুঃখপীড়িতের ক্রন্দন এ বিশ্বের দিকে দিকে ধ্বনিত হচ্ছে; কিন্তু কান থাকতেও লক্ষকোটি নরনারী তা শুনতে পায়নি, বধিরেই থেকেছে। যদি শুনতে পেত তাহলে আর্তজনের চোখের জল মুছাতে এগিয়ে আসতো তারা। আর মহামানব বুদ্ধ। আর্তসংসারের কান্নার ধ্বনি মুহূর্তে কানের ভিতর দিয়ে তাঁর মর্মলোকে প্রবেশ করেছিল, এতে বিচলিত হয়েছিল তাঁর করুণাকাতর চিত্ত। মানবের দুঃখমোচনের কঠোর সংকল্প নিয়ে তিনি রাজপুরী থেকে পথে এসে দাঁড়ালেন, এবং এই অবিস্মরণীয় মানবমিত্র উদার কণ্ঠে প্রচার করলেন মৈত্রী-করুণা-অহিংসার বাণী। গোটা পৃথিবীর দুঃখকে নিজ হৃদয়ে তিনি লালন করেছিলেন, মানুষের যাবতীয় দুঃখের নিঃশেষে নির্বাপণই ছিল গৌতম বুদ্ধের জীবনসাধনা। হৃদয়হীন হলে জগতের দুঃখ এসে তাঁর বক্ষোদেশে কি আঘাত হানতো।

এতক্ষণে বোধ করি আমরা বুঝতে পেরেছি, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত আরো একটি নিভৃতচারী ইন্দ্রিয় মানুষের রয়েছে, তার নাম হৃদয় বা অন্তর। ঊর্ধ্বে অমর্ত্যলোক থেকে মানবের কাছে মঙ্গলচেতনা, আনন্দচেতনা, সৌন্দর্যচেতনা আর প্রেমচেতনার আলোক নেমে আসে এই হৃদয়ের পথে। ঈশ্বরের—বিশ্বপিতা বা বিশ্বমাতার—আদেশ বলো, নির্দেশ বলো, বাণী বলো—এ-সমস্ত-কিছু মানুষ শোনে অন্তঃকর্ণস্বরূপ তার হৃদয় দিয়ে। ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ, প্রেমময়; [illegible] করুণাময়ী। জগৎপিতা ও জগন্মাতার করুণা ও মমতার বাণী প্রতিনিয়ত [illegible] হচ্ছে মানবজীবনের বহুমুখী লীলায়, জীবলোকে আর প্রকৃতির সংসারে। [illegible] আমাদের কজন তা শুনতে পায়! সাধারণ [illegible]। [illegible]

যে শোনে না, তার কারণ হলো, এদের কেউ প্রথা ও সংস্কারের রুদ্ধদ্বারে অচলায়তনে চিরবন্দী, কেউ শুষ্কশাস্ত্র ও কঠিন বৈরাগ্যের চর্চায় রত, কেউ ভয়ংকর পূজাবিধিকে ভগবৎসাধনা বলে জেনেছে—হৃদয়বত্তার সঙ্গে এরা একেবারেই অপরিচিত। হৃদয়ের স্পর্শকাতরতা যে হারিয়ে ফেলেছে, কী করে সে ভগবানের প্রেমের বাঁশি শুনবে? ওই বাঁশির ধ্বনি এদের পাষাণহৃদয়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে, কঠিন প্রাণে দেবতার বাণী সাড়া জাগায় না। সে-ই বধির যে হৃদয়হীন।

৭। মুকুট পরা শক্ত, কিন্তু মুকুট ত্যাগ করা আরো কঠিন।

[চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৫১]

মুকুট কার জন্যে? রাজ্যেশ্বরের জন্যে। সিংহাসন, ন্যায়দণ্ড, মুকুট, ইত্যাদি বস্তু রাজশক্তিরই নিশ্চিত চিহ্ন। সুতরাং মুকুট পরার অর্থ রাজত্ব লাভ করা—রাজা হওয়া। রাজক্ষমতার অধিকারী কজনেই-বা হয়। এ সৌভাগ্য অত্যন্ত সীমিত। তাই, রাজা হওয়া সহজ নয়, বিশেষ করে—আদর্শরাজা। সত্যকার রাজার কত দায়িত্ব কত বিচিত্র কর্তব্য! সে-দায়িত্ব সুশাসনের, রাজ্যের শৃঙ্খলারক্ষণের; সে-কর্তব্য প্রজাপুঞ্জের দুঃখবিদূরণের, তাদের সর্বতোমুখী কল্যাণবিধানের। রাজমুকুটের নীচে আত্মগোপন করে রয়েছে সহস্ররকমের চিন্তা, রাজসিংহাসনের মণিমুক্তার ঝিলিক সর্বক্ষণ বিচ্ছুরিত করে সমূহ বিপদের সংকেত। ওই সংকেত উপেক্ষা করে যে-রাজা ভোগসুখে ডুবে থাকেন, প্রজাবর্গের অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, তাঁর রাজক্ষমতা গ্রহণ বালুচরের ওপর সৌধনির্মাণ ছাড়া আর কী? এজন্যেই বলা হয়েছে, মুকুট পরা যাকে-তাকে সাজে না, যথার্থ রাজ্যাধীশ হওয়া সহজ কথা নয়।

আবার রাজকীয় ক্ষমতা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করা আরো কঠিন কাজ। কার পক্ষে কঠিন? ভোগী রাজার পক্ষে—আসক্তিবিজড়িত যার মন। প্রচণ্ড ক্ষমতা ধূলিমুষ্টির মতো ছুঁড়ে দিয়ে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করতে কে চায়? মুকুট-সিংহাসনাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে অবারিত প্রতাপপ্রচারের অন্ধ-মত্ততা, উদ্দাম বাসনায় লুব্ধতা, অবাধ অধিকারবোধের মোহাচ্ছন্নতা। এতসব বস্তুর নাগপাশ কাটিয়ে নিরাসক্তির মুক্ত প্রাঙ্গণে বেরিয়ে আসাটা কি এতই সহজ ব্যাপার? রাজা হয়েও নিবৃত্তির গেরুয়া [illegible] নিজ রাজবেশটিকে যিনি অনুলিপ্ত করতে পেরেছেন, মুকুটত্যাগ কেবল তাঁর পক্ষেই [illegible]। এমন আদর্শনিষ্ঠ রাজাকেই আমরা বলে থাকি 'রাজর্ষি', যেমন—রবীন্দ্রনাথের [illegible] মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য।

৮। বন্দীও যেমন বদ্ধ, বিচারকও তেমন বদ্ধ।

[অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৬৭]

'[illegible] করা হবে' অপরাধীকে। কে অপরাধী? রাষ্ট্রের বিধিবিধান [illegible] যে ভঙ্গ করে, সে। অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্যই তার

বন্দীদশা। অপরাধী নিজ দুষ্কৃতির জন্যে যদি শাস্তি না পায় তাহলে মানুষের সমাজজীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে, উদ্ধত অন্যায় যত্রতত্র মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ পায়—ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই তো যে-কোন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। অন্যায়কারী যতই ক্ষমতাপন্ন হোক, প্রতিপত্তিশালী হোক, রাষ্ট্ররচিত আইনের শৃঙ্খলে সে বদ্ধ; বিচারে অপরাধ প্রমাণিত হলে রাষ্ট্রবিধি-অনুযায়ী শাস্তিভোগ তাকে করতেই হবে সুপরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় অন্যায়ের মার্জনা নাই।

অন্যদিকে অপরাধীর বিচার যিনি করবেন—যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি বিচারক—কাকেও মার্জনা করতে তিনি পারেন না। বিচারকালে ব্যক্তিগত পক্ষপাত কিছুমাত্র প্রশ্রয় পেলে ন্যায়নীতি লঙ্ঘিত হয়, বিচারের মূল শিক্ষাই পণ্ড হয়ে যায়। রাষ্ট্রের প্রবর্তিত দণ্ডবিধি তিনি মেনে চলবেন—শাস্তির যোগ্য ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেবেন, অপরাধের সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া না গেলে অভিযুক্তকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেবেন। ন্যায়পরতাই হল আসল বিচারক, ব্যক্তি-মানুষ বিচারকটি ন্যায়ের বাহকমাত্র। বিচারককে ব্যক্তিভাবনা, পক্ষপাত, হৃদয়াবেগ সবকিছু সংযত করে, কেবল ন্যায়নীতির দিকে দৃষ্টি স্থিরবদ্ধ রেখে আপন কর্তব্য করে যেতে হবে। এমন কি, দেশের যিনি রাজা, আপনার শাসনে তিনি আপনি বদ্ধ। এই দিক থেকে দেখলে তিনি একপ্রকার বন্দী।

॥ ৮ ॥ পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার দিবার জন্য জগতে দেবতার সহস্র অনুচর আছে।

[অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৬৫]

ঈশ্বর ন্যায়াধীশ। মানুষের পাপপুণ্যের বিচার তিনিই করে থাকেন বলে আমরা জানি; পাপীর শাস্তিবিধান এবং পুণ্যাত্মাকে পুরস্কারদানে শ্রেষ্ঠ অধিকারী তিনিই। কারণ, ভগবান সর্বতচক্ষু, তাঁর দৃষ্টি দূরযানী ও গভীরচারী। কিন্তু ঈশ্বরের সেই বিচারশালা কোথায়? কোনো অলৌকিক স্বর্গলোকে নয়, মানবসংসারেই তা স্থাপিত। মানবমানবীর লোকান্তরপ্রাপ্তির পর ন্যায়াধীশ ভগবান দূর স্বর্গভূমিতে তাঁদের সদসৎ কর্মের বিচারে বসেন এরূপ একটি সংস্কার বর্জনীয়। আমাদের এই লৌকিক সংসারে পাপপুণ্যের বিচার নিত্যই চলছে। এখানে বিশ্বলোকেশ্বরের প্রতিনিধি হলেন রাজা, তাঁর ওপর বিচারের গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত। তাঁর কাজ তো ঈশ্বরেরই কাজ। আর, শুধু রাজাকেই একতম বিচারক বলি কেন, বিধাতা প্রত্যেক বিবেকী মানুষের হাতেই আপন ন্যায়দণ্ড অর্পণ করেছেন; কোন্‌টি সৎকর্ম, কোন্ অসৎকর্ম এঁরাই তার নির্দেশ দেন। পাপীর দণ্ড এড়াবার উপায় নেই, পুণ্যবান পুরস্কৃত না হয়ে পারেন না। এর অন্যথা যদি হতো তাহলে বিশ্বনীতি [universal moral order] বলে কোনো বস্তুই থাকত না, তখন সমাজসংসারে মুহূর্তে এক অরাজকতার

বিপর্যয় ঘটে যেত। দেবতার অনুচরেরা বিচারকের বেশে এখানে সর্বদা বিচরমান থাকেই এরূপ শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না।

হিংসার নিকটে বলিদান দেওয়া শাস্ত্রের বিধি নহে, হিংসাকে বলি দেওয়াই শাস্ত্রের বিধি।

[অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৩২]

হিন্দুর কোনো কোনো ধর্মীয় শাস্ত্রে অদৃশ্যলোকবিহারী দেবতার উদ্দেশে—আরাধ্য দেবতার প্রীত্যর্থে—জীববলির নির্দেশ আছে। আমাদের কয়েকটি বিশেষ পূজানুষ্ঠানে এই বলিদানপ্রথা দূরকালাগত। সাত্ত্বিক পূজার সঙ্গে তামসিক পশুবলি কী করে যুক্ত হলো তার ইতিহাস বলতে গেলে বিস্তর কথার অবতারণা করতে হয়। সে-অবকাশ এখানে নেই। শুধু এইটুকু বলবো, পশুবলি-প্রথার উদ্ভবের মূলে রয়েছে মানুষের স্বার্থবুদ্ধি, অমানবিক হিংসার মূল্যে মানুষ দেবতার প্রীতি বা কৃপা অর্জন করতে চেয়েছে। কিন্তু স্বার্থান্ধ মানব এ সত্যটি উপলব্ধি করেনি যে, করুণাময় দেবতা জীবরক্তে কখনোই তৃপ্ত হতে পারেন না; যে-হিংসাবৃত্তি দেবত্ব ও মানবীয়তার বিরোধী, দেবতা কি তার প্রশ্রয় দিতে পারেন? আসলে মানুষ নিজের হিংসাবৃত্তিকে দেবতার আসনে বসিয়ে আপন স্বার্থ চরিতার্থ করবার প্রয়াস পেয়েছে। সুতরাং বলির রক্ত দেবতা নয়, মানবের হিংসা-নামীয় দানবই, পান করেছে। মূঢ়তাবশে মানুষ দীর্ঘকাল তা বুঝতে পারেনি।

কিন্তু তার মনে শুভবোধের যখন উদ্বোধন হলো, প্রকৃত ধর্মবোধের জাগরণ ঘটল, সে তখন বুঝল, হিংসার আশ্রয়ে দেবতাকে প্রীত করা যায় না, তাঁর চরণে নিবেদন করতে হয় বিনির্মল ভক্তি। তবু সংস্কার দুর্মর, তাই, অনেকের কাছেই শাস্ত্রবাক্য অলঙ্ঘ্য বলে মনে হয়েছে। একারণে আজো দেখতে পাই, পশুর রক্তে মৃত্তিকা রঞ্জিত না হলে দেবীপূজার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, শাস্ত্র অভ্রান্ত নয়, অপরিবর্তনীয় নয়—মানুষই শাস্ত্র গড়ে, শাস্ত্র ভাঙে; দেবতারাও মানুষের সৃষ্টি। আর এও বলবো, যে-শাস্ত্র মানবধর্মবিরোধী, নিরতিশয় ইতরবৃত্তি হিংসার উদ্বোধক, শাস্ত্রই ও নয়। তার উচ্চারিত বাক্য বাক্যমাত্র—প্রীতিপূর্ণ মানবহৃদয় তাকে মেনে চলতে বাধ্য হবে কেন?

তাহলে, মানুষের নিবেদিত কোন্ বলি পেলে দেবতারা খুশি হবেন? তার অন্তরের হিংসা প্রভৃতি রিপুগুলি। রিপুতাড়িত মানুষ শুচিশুদ্ধ দেবতার করুণার অযোগ্য। এই রিপুনিচয় মানুষকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে আনে। মানুষ হিংসাদি রিপুকে যতখানি ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছে; ততখানিই দেবতার সমীপবর্তী হয়েছে। মনুষ্যত্ববিকাশের পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ালে, যে-কোন অনুষ্ঠান—শাস্ত্রবিহিত হলেও—পালন করা অকর্তব্য। যথার্থ শাস্ত্র মানবসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে হিংসার

॥ পাপের শেষ কোথায় গিয়ে হয় কে জানে! পাপের একটি বীজ যেখানে পড়ে সেখানে দেখিতে দেখিতে গোপনে কেমন করিয়া সহস্র বৃক্ষ জন্মায়, কেমন করিয়া অল্পে অল্পে সুশোভন মানবসমাজ অরণ্যে পরিণত হইয়া যায়, তাহা কেহ জানিতে পারে না।

[দশম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৪১]

কাকে বলি পাপ? যা মনুষ্যত্বকে হনন করে, যা মানুষের শ্রেয়োতপস্যালব্ধ কল্যাণ-আদর্শকে পঙ্গু করে দেয়, সুকুমার বৃত্তির আশ্রয়ে লালিত মানবসন্তানকে পারস্পরিক হানাহানির গ্লানিপঙ্কিল কুশ্রীতার মধ্যে সবলে টেনে নিয়ে আসে, তার নামই পাপ। যেমন, হিংসা আর লোভ। এক সহজপ্রীতির সূত্রে মনুষ্যসমাজ বাঁধা রয়েছে, তাই, সমাজকে আমরা শোভনসুন্দর দেখতে পাই। কিন্তু অন্তরে হিংসা প্রবেশ করে ওই বাঁধনটি ছিঁড়ে দেয়, ফলে মানুষে-মানুষে প্রীতির মধুময় সম্পর্কটি ক্রমে বিষাক্ত হয়ে ওঠে। সমাজসংসারে কল্যাণশ্রীর বিরোধী বলেই হিংসা পাপ। মানবচিত্ত যখন লোভের বশবর্তী হয় তখন সে নীতিজ্ঞান হারিয়ে ফেলে, নির্বিচারে পরদ্রব্য আত্মসাৎ করতে চায়, শোষণে মেতে ওঠে, দুর্নীতির আশ্রয় লয়। এতে সমাজের সমূহ অকল্যাণ। তাই, লোভ পাপ।

মারাত্মক ব্যাধির মতোই এই পাপ-বস্তুটি সংক্রামক। ব্যক্তিজীবন থেকে সমাজজীবনে সকলের অলক্ষ্যে এ ছড়িয়ে পড়ে, একের পাপ অপর দশজনকে স্পর্শ করে—এর বিষাক্ত প্রভাব দুরতিক্রম্য। আত্মবিস্তারশীল বৃক্ষের বীজ যেমন বিনাযত্নে কোনো একটি ভূমিভাগকে গ্রাস করতে করতে মনুষ্যবসতির অযোগ্য অরণ্যের রূপ ধরে, তেমনি, পাপ ধীরে ধীরে সমাজের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়, গড়ে ওঠে সাংঘাতিক পাপচক্র; শান্তিময় জনপদ গড়ে তুলতে হলে অরণ্যের উৎসাদন আবশ্যক; সুস্থ সবল সমাজের জন্যে তেমনি যে কোনো রকমের পাপকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা প্রয়োজন। একবার যদি এ শাখাপ্রশাখা বিস্তারের সুযোগ পায় তাহলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অধঃপতন অনিবার্য; কেননা, নীতিভ্রষ্ট মানুষের অপঘাতমৃত্যু রোধ করা অসম্ভব।

কারো মনে যখন প্রথম পাপের উদ্ভব হয় তখন কোনো বিশিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনই হয়তো লক্ষ্যরূপে থাকে—কোনো বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে পাপাচরণ করা হচ্ছে, এর পরেই পাপকে বিদায় করে দেওয়া হবে, এরূপ ভেবে মানুষ পাপের পথে এগিয়ে যায়। আসলে কিন্তু ব্যাপারটি সেরূপ নয়, উক্তরূপ চিন্তা আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কী? পাপ মানবচিত্তে একবার প্রবেশপথ পেলে ওখানে দৃঢ়ভিত্তি বাসা বাঁধে এবং মনুষ্যত্বকে কীটের ন্যায় কাটতে থাকে। তখন মানুষের কল্যাণবুদ্ধি লোপ পায়, মানবিক মূল্যবোধ কোথায় তলিয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় মানুষ আর মানুষ থাকে না, পশুর স্তরে নেমে আসে। এক পাপ অপর এক পাপের জন্ম দেয়, একজন আর-একজনকে পাপের ভূমিতে টানে। এর ভয়াবহ পরিণাম হলো গোটা সমাজের মহতী বিনষ্টি। পাপের শেষ কোথায়, বলা কঠিন।

॥ ১১ ॥ মানবহৃদয়ই প্রকৃত মন্দির, সেইখানে খড়্গ শাণিত হয় এবং সেইখানেই শতসহস্র নরবলি হয়। দেবমন্দিরে তাহার সামান্য অভিনয় হয় মাত্র।

[চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৭১]

হিন্দুর কোনো কোনো দেবমন্দিরে পশুবলির প্রথা আছে—পূর্বকালে নরবলিও দেওয়া হতো। পূজা-অনুষ্ঠানে দেবীর সম্মুখে জীবকে বলি দেওয়া স্বার্থান্ধ মানুষের দারুণ হিংসাবৃত্তির চরিতার্থতাসাধন ছাড়া আর কী? এই অমানবীয় হিংসার মূল কোথায় প্রোথিত? মানবের অন্তরে। হৃদয় যখন মূঢ়তায় আচ্ছন্ন হয় তখন মানব-মানবীর বিবেকচেতনা ও কল্যাণবুদ্ধি লোপ পায়। চিত্তের এইরূপ মূঢ় অবস্থায় মানুষ ভক্তিপিপাসিতা জগন্মাতাকে রক্তলোভাতুরা বলে জেনে ভুল করে বসে, এবং দেউলপ্রাঙ্গণ পশুর রক্তে ভেসে যায়। হিংসার উদ্ভবক্ষেত্র স্বার্থযুক্ত মানুষের হৃদয়, জীবহত্যার প্রথম প্রস্তুতি চলে এখানেই—মন্দিরে পশুবলির বীভৎস অনুষ্ঠানও গোপন প্রস্তুতিরই বহিরঙ্গ প্রকাশ-মাত্র।

দেবতা বল, মন্দির বল, পূজাবিধি বল, বিচিত্র আচারপ্রথা বল—এ সমস্ত-কিছুই তো উদ্ভাবন করেছে মানুষ। স্বার্থবোধ তার মধ্যে যখন প্রবল হয়ে উঠেছে তখন সে হিংসাবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছে; আবার, শ্রেয়বুদ্ধির প্রেরণায় যখন সে সর্বপ্রকার ক্ষুদ্রস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে তখন জীবকে অকাতরে বিলিয়েছে মঙ্গল-সুন্দর প্রেম—সংকীর্ণ অহংসর্বস্বতা রূপান্তরিত হয়েছে উদার মৈত্রীভাবনায়। কাজেই সত্যকার মন্দির হলো মানবহৃদয়, প্রেমের উদ্ভাসনে কখনো পবিত্র, স্বার্থবোধের কলুষে কখনো কলঙ্কিত।

মন্দিরে পশুবলি নিঃসন্দেহে অতীব গর্হিত একটি প্রথা। তাই, হৃদয়বান বিবেকী মানুষ এই কুৎসিত প্রথা নিরোধ করতে চায়। কিন্তু দেবদেউলে বলি দেওয়া বন্ধ হলেই কি মানবচিত্ত হিংসামুক্ত হবে এবং মানুষ জীবহত্যার দিকে আর ঝুঁকবে না? অবশ্যই নয়। তাহলে এই পাপক্লিষ্ট প্রথা কোন্ উপায়ে রোধ করা যেতে পারে? উপায় হলো সর্বাগ্রে মানবের মনে প্রেমচেতনার উদ্বোধন ঘটানো। এ যদি ঘটানো যায় তবে হিংসার পথে পদক্ষেপ সে [illegible] না; জীবনজননীকে রক্তপিপাসিতা কখনো ভাববে না। তখন কল্যাণময়ী দেবীর সম্মুখে জীববলি আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। বস্তুতপক্ষে, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ই মানুষকে সত্য-সুন্দর-কল্যাণের অভিমুখে চালিত করে। যতদিন হৃদয় স্বার্থযুক্ত থাকবে ততদিন মন্দিরে জীবহত্যা চলবেই।

॥ ১২ ॥ পাপ করিয়া শাস্তি বহন করা যায়, কিন্তু মার্জনার বহন করা যায় না।

[অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৬৮]

[illegible] পাপকাজ করে ফেলতে পারে, এতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নেই। কিন্তু [illegible], এই পাপবোধ বা অপরাধবোধ তাকে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ

করতে থাকে। এরূপ যন্ত্রণাদায়ক মানসিক অবস্থায় পাপের যথোপযুক্ত শাস্তিই তার কাম্য, শাস্তি না পেলে তীব্র অন্তর্দাহের হাত থেকে যেন মুক্তি নেই। স্বকৃত পাপকর্মের জন্যে শাস্তি মাথা পেতে নিতে চায় কেন মানুষ? চায় এই কারণে যে, ওই শাস্তি চিত্তদেশে দুঃখের যে-আগুন জ্বালাবে তাতে পাপের কলঙ্করেখা নিঃশেষে পুড়ে গিয়ে অন্তর বিনির্মল হয়ে উঠবে। পাপের শাস্তি না পেলে, পাপস্খালন না-হবার জন্যে, অপরাধবোধের কণ্টক মানুষকে অনুক্ষণ বিদ্ধ করতে থাকে। এরই নাম বিবেকদংশন, এর জ্বালা দুঃসহ। এ থেকে পরিত্রাণলাভের উপায় হলো প্রাপ্য শাস্তিভোগ। শাস্তির পরিবর্তে মার্জনা পেলে অপরাধী মনে স্বস্তি পায় না, পেতে পারে না। তাই বিবেকীজনের মুখে শুনতে পাই—অপরাধের জন্যে আমাকে শাস্তিই দাও, মার্জনা দিয়ে আমাকে অনিঃশেষ মর্মযন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষেপ করো না।

॥ ১৩ ॥ বনে কেবল একটা উদ্ভিদ্ পালন করিয়া তোলা যাইতে পারে। মানুষ মনুষ্যসমাজেই গঠিত হয়।

[ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৩১]

যার যথা স্থান—কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত। অরণ্য নিসর্গপ্রকৃতির উদার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে, মনুষ্যবসতির বহুদূরে এর অবস্থান—লোকসঙ্ঘের সংঘাতমুক্ত। এরূপ নিরুপদ্রব ভূমিভাগই উদ্ভিদ্‌শিশুর লালনের উপযুক্ত স্থান। মানুষ বন কেটে লোকালয় গড়ে, তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা অরণ্যপ্রদেশকেও গ্রাস করতে চায়। কাজেই স্বার্থপরায়ণ মানুষ বনের শত্রু, এবং নিঃসন্দেহে বৃক্ষরাজিরও। বৃক্ষশিশু এহেন মানুষ থেকে যত দূরে থাকতে পারে ততই তার পক্ষে মঙ্গল। লোকালয়ে বৃক্ষজীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন। তাই, উদ্ভিদের পক্ষে অনুকূল স্থান হলো বনভূমি।

মানুষ কিন্তু উদ্ভিদ্ নয়। আকৃতি ও প্রকৃতিতে উভয়ে বিলক্ষণ স্বতন্ত্র। এ-কারণে বন উদ্ভিদ্‌জীবনের বিকাশের পক্ষে প্রশস্ত ক্ষেত্র হলেও, মানবসন্তানকে ওই স্থানে যথার্থ মানুষরূপে গড়ে তোলা কদাপি সম্ভব হতে পারে না। মনুষ্যশিশুর সর্বাঙ্গীণ-সম্পূর্ণ চরিত্রবিকাশের জন্যে চাই মনুষ্যসমাজ। একথা ঠিক যে, বনে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কুটিল কুশ্রীতা নেই, নেই দ্বেষহিংসার ও কুৎসিত আত্মসর্বস্বতার ক্লেদাক্ত গ্লানি; সেখানে রয়েছে প্রকৃতির অবারিত সৌন্দর্য, অনাবিল শান্তি, শান্তরসাপ্লুত পবিত্রতা। মানবসমাজের কলুষমুক্ত বলে, কোনো কোনো শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ এরূপ মনোভাব পোষণ করেন যে, লোকালয়ের কোলাহল থেকে দূরে অবস্থিত বনপ্রদেশ মানবশিশুর চরিত্র গড়বার উপযুক্ত স্থান।

কিন্তু এহেন একটি মনোভাব নিশ্চয়ই অনেকের সমর্থন পাবে না। মনুষ্যজীবনের বিস্তর সমস্যা, মানবসন্তানের চরিত্রবিকাশের পথটি যেমন বঙ্কিম তেমনি জটিল। বড়ো সংসারের, বহু মানুষের, সম্পর্কে তাকে আসতে হয়, বিরোধ-সংঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটি সামঞ্জস্যে না পৌঁছোলে তার চলে না। তার কত দায়দায়িত্ব, কত বিচিত্র কর্তব্য ও আদর্শ; ভালোমন্দ, সদসৎ, পাপপুণ্য নানা

কিছুরই সঙ্গে মানবশিশুর পরিচয়ের প্রয়োজন। তাকে নিতে হবে অনেক, তেমনি অনেক দিতেও হবে। এই দ্বান্দ্বিক পথে অগ্রসর হতে না পারলে, কী করে সে গোটা মানুষ হয়ে উঠবে! সুতরাং তার জন্যে চাই কোমলে-কঠিনে মিশ্রিত পরিবেশ। বনভূমিতে এরূপ একটি পরিবেশ কোথায় মিলবে! বন মানবসন্তানের ক্ষণকালের আবাসস্থল হতে পারে; কিন্তু তার সর্বক্ষণের বিচরণক্ষেত্র মনুষ্যসমাজ—সমাজবিচ্যুত মানুষ সম্পূর্ণ-মানুষ কখনোই নয়।

॥ ১৪ ॥ দিনরাত প্রখর বুদ্ধিমানের সঙ্গে থাকিলে বুদ্ধি লোপ পায়। ছুরিতে অবিশ্রাম শাণ পড়িলে ছুরি ক্রমেই সূক্ষ্ম হইয়া অন্তর্ধান করে, একটা মোটা বাট কেবল অবশিষ্ট থাকে।

[ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ। পৃ: ১০৬]

বুদ্ধির চর্চা ভালো, জীবনে চলার-পথে বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার্য। জগতে নির্বোধের বিড়ম্বনা যে কতখানি তা অবিদিত কারো নয়। বুদ্ধিকে কাজে না লাগাতে পারলে চতুষ্পার্শ্বের সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যে মানুষ নিজের অস্তিত্বই হয়তো রক্ষা করতে পারত না। তবু বলতে হয় বুদ্ধির অতিচর্চা ভালো নয়। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় বুদ্ধি যদি উপায়হিসাবে প্রযুক্ত না হয়ে লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় তাহলে নানান জটিলতা দেখা দিতে বাধ্য। কারণে-অকারণে অতিবুদ্ধির কসরৎ দেখাতে দেখাতে মানুষের মন তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে, এতে জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়। জগতে বহুবিধ অশান্তির কারণ সূক্ষ্মবুদ্ধির খেলা। শাণিত বুদ্ধি যদি কার্যসিদ্ধির পরিবর্তে পদে পদে গোলমালই সৃষ্টি করতে থাকে তবে মনুষ্যজীবনে এর আবশ্যকতা কী। প্রখরবুদ্ধিমানদের কাণ্ডকারখানা দেখে কখনো কখনো এমন মনে হয় যে, বুদ্ধিসুদ্ধি আদৌ তাদের নেই; আর, এ জাতের মানুষের সঙ্গে সর্বদা যারা অবস্থান করে তারাও কেমন যেন নির্বোধ বনে যায়। বুদ্ধির যে-নির্দিষ্ট স্থান আছে তা তাকে না দিলে মূঢ়তা প্রকাশ পায় সত্য; কিন্তু বুদ্ধিসর্বস্বতার বিপদ হলো তা সহজকে জটিল করে তোলে, আর নিজের-হাতে-তৈরী-করা বুদ্ধির ঘূর্ণীপাকে গিয়ে পড়লে কোথায় থাকে মনের শান্তি-স্বস্তি-আনন্দ!

॥ ১৫ ॥ অধিকাংশ সময়েই আরম্ভ আমাদের আয়ত্ত, শেষ আমাদের আয়ত্ত নহে।

[সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২৫]

কোনো কাজ বলো, ঘটনা বলো, কোনো চিন্তা বলো—এদের প্রত্যেকটি আরম্ভ ও পরিণতির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। একটি কাজ নিজের ইচ্ছামতো আমরা আরম্ভ করতে পারি, কিন্তু শেষাবধি এ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা একরূপ অসম্ভব। সুরুতে যে-কাজটি থাকে ক্ষুদ্র, এগিয়ে চলতে চলতে তা বৃহৎ আকার ধারণ করে; যা ছিল একজনের বা কয়েকজনের, ক্রমশ তার ওপর

নানাদিক থেকে বহুর প্রভাব পড়তে থাকে। ক্ষুদ্র যতখানি আমাদের আয়ত্তে, বিরাট ততখানি নয়। ক্ষুদ্রের গতিপ্রবাহ রোধ করা সহজ, কিন্তু তার নানামুখী বিপুল বিস্তার দুর্বার হয়ে ওঠে। সংকীর্ণ খালের স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করতে তেমন বেগ পেতে হয় না, পক্ষান্তরে, প্রমত্ত পদ্মাকে বাঁধবে এমন সাধ্য কার? সামান্য ঘটনা দুর্ধর্ষতালাভ করে কীরূপে সকলের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, যে-কোনো গণআন্দোলনের দিকে তাকালে তা বুঝতে পারি।

কার্য ও ঘটনায় এই সত্যটি মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করবার মতো। এক চিন্তা অপর চিন্তার জন্ম দেয়; চিন্তার সঙ্গে চিন্তা যুক্ত হয়ে তা এমন গতিবেগ লাভ করে যে, ওই স্রোতে পড়ে মানুষের ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়। জন্মমুহূর্তে বাধা দিতে না পারলে চিন্তার গতিধারা অপ্রতিরোধনীয় হয়ে উঠবেই, তখন তার কাছে অবশেষে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কাজেই, বলা যায়, কোনো কিছুর শুরু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছাধীন, ওর পরিণাম কিন্তু নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার বাইরে।

Impt.

মানুষ যখন মরিতেছে তখন কিসের জাত? ভগবানের সৃষ্ট মানুষ যখন মানুষের প্রেম চাহিতেছে তখনই বা কিসের জাত?

[একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৪৮]

অনাসক্ত পরহিতৈষণায় যাঁরা প্রাণিত, মানুষে-মানুষে সর্বপ্রকার বিভেদবৈষম্যের প্রাচীর ডিঙিয়ে সকলকেই তাঁরা উদার প্রেমের আলিঙ্গনে বাঁধেন। এঁরা সাম্যাসাম্যের উদ্গাতা, এঁদের দৃষ্টিতে সারা জগতে একটিমাত্র জাত রয়েছে, এর নাম—মানুষ। মানুষ যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে, ক্ষুধায়-রোগে-মহামারীতে মনুষ্যজীবন যখন বিপর্যস্ত, এসকল মহাপ্রাণেরা তখন দুর্গতের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। যে-জাতিধর্মের বিভেদ মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, মানবে-মানবে ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরিয়েছে, পরস্পরকে ঘৃণাবিদ্বেষের চোখে দেখতে শিখিয়েছে, এই মানব-প্রেমিকের দল তাকে চিত্তের সংকীর্ণতাপ্রসূত বলেই জানেন। ঈশ্বরের রাজ্যে অসাম্যের বিরোধী এঁরা, মনুষ্যত্বধর্মেরই সাধক। জাতিসম্প্রদায় নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকেই এঁরা ভালোবাসেন, এঁদের সেবা সর্বত্রচারী, মানব-মানবীর কোনো সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়।

মানুষমাত্রেই ভগবানের সৃষ্ট জীব, আকৃতি ও প্রকৃতিতে মূলত এক। ঈশ্বরের রচিত এই যে মহান ঐক্য, এ পথই তো সকলের অনুসরণীয়। একে যারা ছিন্নভিন্ন করে দেয় তারা নিঃসংশয়িতভাবে মানবদ্রোহী, বিধাতার বিচারে এদের অপরাধ অমার্জনীয়। মনুষ্যত্বের নিশ্চিত প্রকাশ সেবাধর্মে; জনসেবায় নেমে যারা জাতের কথা ভাবে, ভিন্নসম্প্রদায়ভুক্ত বলে কোনো বিশেষ আর্তের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা মনুষ্যত্বকেই লাঞ্ছিত করে। উদারতাই সত্যকার বড়ো

প্রেমের লক্ষণ, মনুষ্যত্বের পরিচয়বাহী। প্রেম যেখানে সংকীর্ণ তা প্রেমই নয়, অধর্মের স্পর্শে কলঙ্কিত। মানুষ হয়ে মানবধর্মের মর্যাদা রক্ষা করে যে চলে না তাকে মনুষ্য বলি কী করে!

বস্তুসংক্ষেপ

॥ ১ ॥ আষাঢ় মাস। সকাল····· রক্তের দাগ মুছিয়া ফেলিয়াছে।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ২০০ । ৮–৯]

< এত রক্ত কেন >

এক আষাঢ়ের সকাল বেলা। ঠাণ্ডা বাতাস আসন্ন বৃষ্টির ইঙ্গিত জানাচ্ছে। গোমতী-নদীর এপারে-ওপারে বাদলার আঁধার ঘনিয়েছে। রাজা নদীর ঘাটে স্নান করেতে এসেছেন, সঙ্গে হাসি আর তাতা। কাল রাত্রে নদীতীরবর্তী মন্দিরে একশো-এক মহিষ বলি হয়েছে, ঘাটের সোপানে একটি রক্তস্রোতের রেখা এখনো দেখা যাচ্ছে। এ দেখে হাসির বেদনার্ত কণ্ঠের প্রশ্ন—এত রক্ত কেন? কথাগুলি রাজার হৃদয়ে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করলো। ভাইবোনে জল দিয়ে এই রক্তের দাগ মুছে ফেলল। হাসির ব্যাথিত প্রশ্নটি কিন্তু রাজা ভুলতে পারলেন না।

॥ ২ ॥ রাজার সভা বসিয়াছে দেবীর কথা সে শুনিতে পায় না।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ২৩৫ । পৃ. ১১-১২]

< বলি নিষেধ >

রঘুপতি ভুবনেশ্বরী-দেবী-মন্দিরের পুরোহিত, চতুর্দশ দেবতার পূজার জন্যে রাজবাড়ির দান গ্রহণ করতে এসেছেন রাজসভায়। রাজার প্রদত্ত পশুই হবে উক্ত পূজার প্রথম বলি। রাজা বলির পশু দিতে অস্বীকার তো করলেনই, এবছর থেকে তাঁর আদেশে মন্দিরে বলিপ্রথা একেবারে নিষিদ্ধ হলো—জীবের রক্তপাত করুণাময়ী বিশ্বমাতার অসহনীয়। রাজার এই আদেশ সকলকে বিস্মিত করলো। রঘুপতি যখন জিজ্ঞেস করলেন, তবে এতকাল ধরে দেবী রক্তপান করে এলেন কী করে, প্রত্যুত্তরে রাজা বললেন, জীবরক্ত এতাবৎকাল অজ্ঞজনের মূঢ় সংস্কারের হিংস্র পিপাসাই মিটিয়েছে, দীর্ঘকালের রক্তপান তাদের হৃদয়কে পাষাণ করে তুলেছে বলে বেদনাতুরা বিশ্বজননীর অপ্রসন্নতার সংবাদটি তারা পায় নি।

॥ ৩ ॥ ভুবনেশ্বরী-দেবী-মন্দিরের ভৃত্য··· ··· তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ১৩০ । পৃ. ১৫]

< দেবীমন্দিরে ভৃত্য রাজপুত-ক্ষত্রিয় জয়সিংহ >

ত্রিপুরার রাজবাড়ির পুরাতন ভৃত্য সুচেতসিংহ জাতিতে রাজপুত-ক্ষত্রিয়। মৃত্যুকালে তার পুত্র জয়সিংহ ছিল শিশু। রাজার নির্দেশে ভুবনেশ্বরী-মন্দীরের

পুরোহিত রঘুপতি তাকে পালন করেন। এই মন্দিরটি সঙ্গে জয়সিংহের যেন নাড়ীর যোগ, দেবীপ্রতিমা তাঁর মায়ের স্থান অধিকার করেছে। মন্দিরের বাগানের বৃক্ষ-লতা-পুষ্প জয়সিংহের অন্তরঙ্গ সঙ্গী, এদের সঙ্গে তাঁর প্রাণের নিঃশব্দ আলাপন চলে। এ সংবাদ কিন্তু বাইরের কেউ জানে না। লোকসাধারণকে মুগ্ধ করে জয়সিংহের বিপুল দৈহিক শক্তি ও তাঁর অসীম সাহস।

॥ ৪ ॥ গোমতী-নদীর দক্ষিণদিকের ... অঙ্গে করিয়া আনিতেন।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ১৭০। পৃ. ২৭]

< গোমতীর তীর >

গোমতীর দক্ষিণ-তীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোরম। বর্ষার জলধারা বহুমুখে ছুটেছে। পাথরছড়ানো উঁচু জমি বিদীর্ণ করে নানান্ গাছ আকাশে মাথা তুলেছে। এরই মাঝখানে একটি স্থান অপেক্ষাকৃত বৃক্ষবিরল। অবারিত নীল আকাশ, নদীর স্রোতোধারা, পরপারে বিচিত্রবর্ণ শস্যক্ষেত্র—এইটি গোবিন্দ-মাণিক্যের বড় প্রিয় স্থান। রাজা প্রতিদিন একাকী এখানে এসে ধ্যানে বসতেন—অতিশয় প্রেক্ষণীয় তাঁর প্রশান্ত মূর্তি। আজকাল বর্ষার দিনে যখনই তিনি আসতেন, রাজার সঙ্গে থাকতো তাতা।

॥ ৫ ॥ দ্রুতগতি রঘুপতির নিকট গিয়াই ... এই চরণে উপহার দিব।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ২৩৫। পৃ. ৩৫-৩৬]

< জয়সিংহের প্রতিজ্ঞা >

রঘুপতির প্রতি জয়সিংহের অনুযোগ, দেবীর আদেশ দেবীর মুখেই শুনতে চেয়েছিলেন জয়সিংহ, অন্তরালে লুকিয়ে থেকে কেন রঘুপতি তাঁর প্রশ্নের জবাব দিলেন। এতে রঘুপতি রুষ্ট হলেন—দেবীর সেবক হিসেবে দেবীর কথা বুঝবার এবং প্রচার করবার অধিকার তাঁর রয়েছে, কোনোরূপ প্রশ্ন করা নয়, গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে নেওয়াই তার কর্তব্য। জয়সিংহের সংশয় আরো বাড়লো; হোক্ গুরুর আদেশ, রাজহত্যা কিছুতেই তিনি ঘটতে দেবেন না। স্বয়ং মায়ের মুখ থেকে কোনো নির্দেশ না-শোনায় তিনি রাজার কাছে নক্ষত্র-রঘুপতির ষড়যন্ত্রের কথা যে প্রকাশ করে দিয়েছেন, নির্দ্বিধায় গুরুকে একথা জানালেন। নিরুদ্ধক্রোধে রঘুপতি জয়সিংহকে দেবীপ্রতিমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে বাধ্য করলেন যে, ২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে জয়সিংহ নিজে রাজরক্তে দেবীর পূজা করবেন।

॥ ৬ ॥ বেলা পড়িয়া আসিল ... স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন

[শব্দসংখ্যা প্রায় ২৯০। পৃ. ৩৮-৩৯]

< গহন অরণ্যে দুই ভাই >

ঊর্ধ্বে মেঘাবৃত আকাশ, চতুষ্পার্শ্বে আসন্ন সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকার—রাজা ভাই নক্ষত্রকে নিয়ে অরণ্যের দিকে চলেছেন। দীর্ঘাকৃতি গাছেরা বনের

ঘনতর করে তুলেছে। সন্ধ্যাকালে কাকের অবিশ্রাম চীৎকারে বনভূমির নির্জন পরিবেশটি কেমন যেন শঙ্কাজটিল হয়ে উঠেছে। ভয়ার্ত নক্ষত্রের পা আর এগুতে চায় না, তাঁর পাপমনে কী একটা সন্দেহের রেখাপাত হয়েছে। পালাতে পারলে তিনি বাঁচেন কিন্তু তার জন্যে যে-উদ্যমের প্রয়োজন তা সহসা কে যেন হরণ করে নিয়েছে। অরণ্যমধ্যবর্তী একটি জলাশয়ের কাছে গিয়ে রাজা গম্ভীরকণ্ঠে বললেন —'দাঁড়াও'। গোটা নিস্তব্ধ বনপ্রদেশ রাজার ওই কণ্ঠস্বরে কাঁপতে কাঁপতে স্তব্ধ হয়ে গেল বুঝি। বনের বৃক্ষরাজির মতোই ভীতিবিহ্বল নক্ষত্ররায়ও নির্বাক—নিস্পন্দ।

॥ ॥ নক্ষত্ররায় রাজার হাত ধরিয়া····পৃথিবী শীতল করুন।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ২০০। পৃ. ২৪-২৩]

< রাজার শান্তিকামনা >

রাজা গোবিন্দমাণিক্য অনুজ নক্ষত্রকে সঙ্গে করে অরণ্য থেকে যখন প্রাসাদমুখী হলেন তখন সূর্যাস্তের শেষরশ্মিমালা পৃথিবীর বুক থেকে প্রায় মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রাসাদের দিকে না গিয়ে রাজা মন্দিরে এলেন। সেখানে রঘুপতি আর জয়সিংহের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। সংকোচে-আড়ষ্ট নক্ষত্ররায়কে পাশে টেনে নিয়ে রাজা রঘুপতিকে প্রণাম জানালেন। অন্তরে বিদ্বেষ পুষে রেখে পুরোহিত রাজাকে রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। পুরোহিতের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে রাজা তাঁকে এই সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন—রাজ্যে কোনোপ্রকার হিংসা-দ্বেষ মাথা না তোলে, ভ্রাতৃবিরোধ না ঘটে, অখণ্ড শান্তি সর্বত্র বিরাজ করে—ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যেন সচেষ্ট থাকেন।

মন্দির আজ সহস্র দীপে··· পাষাণপ্রতিমা বিচলিত হইল না।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ৩১০। পৃ. ৫৬-৫৭]

< জয়সিংহের রাজরক্তদান >

[উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬১]

মধ্যরাত্রে দেবীর পূজা। বাইরে ঝড়বৃষ্টির মাতামাতি শুরু হয়েছে। দীপালোকে উজ্জ্বলিত মন্দির নির্জন, অভ্যন্তরে রঘুপতি একা। পূজা ও বলির আয়োজন একরূপ সম্পন্ন। দূরে রাত্রিচর শৃগালের রব উঠল। ঝড়-বিদ্যুৎ, বলির খড়্গ, নরমুণ্ড সব মিলে দেবীমন্দিরে এক ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি হলো। পূজার সময় যতই নিকটবর্তী হচ্ছে, রঘুপতির উৎকণ্ঠাও বেড়ে চলেছে। কী এক কারণে তাঁর চিত্ত আজ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এহেন একটি মুহূর্তে সহসা এক বিপর্যস্ত অবস্থায়, জয়সিংহ, তার সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে, মন্দিরে প্রবেশ করলো। তখন রঘুপতি চাপাকণ্ঠে জানতে চাইলেন, সে রাজরক্ত এনেছে কিনা। জয়সিংহের প্রত্যুত্তর

—রাজরক্ত নিয়ে এসেছে, কিন্তু এই রক্ত নিজহাতে সে দেবীর চরণে অঞ্জলি দেবে। প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই রাজপুত-ক্ষত্রিয় আপন পূর্বপুরুষের প্রসঙ্গ তুলে বললো, তার ধমনীতেও রাজরক্ত বইছে। তারপর চকিতে তীক্ষ্ণ ছুরি নিজের বুকে বসিয়ে দিয়ে দেবীপ্রতিমার পদতলে পড়ে গেল। পাষাণী মাতা কিন্তু নির্বিকার।

॥ ৯ ॥ পাহাড়ের উপরে বিজয়গড়……দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ১৯০ । পৃ. ৭৫-৭৬]

< রঘুপতির বিজয়গড়ে গমন >

অরণ্যের প্রান্তে বিজয়গড়ের দুর্গটি আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। রঘুপতি অরণ্যদেশ থেকে বেরিয়ে দুর্গের সমীপবর্তী হলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে প্রহরারত সৈন্যরা শৃঙ্গ বাজিয়ে দিয়ে আক্রমণোদ্যত হলো। রঘুপতি তাদের পৈতা দেখিয়ে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিলেন এবং দুর্গমধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন, আশ্রয় না পেলে মুসলমান-সৈন্যদের হাতে অচিরে তিনি প্রাণ হারাবেন। দুর্গাধিপতি ব্রাহ্মণভক্ত হিন্দুরাজা বিক্রমসিংহ রঘুপতিকে আশ্রয় দিলেন।

॥ ১০ ॥ দীর্ঘ পথ। কোথাও-বা নদী……আহা, এ কি সুখী।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ২১৫ । পৃ. ৯৭-৯৮]

< দুরদৃষ্ট নক্ষত্র রায় >

নক্ষত্রকে নিয়ে নদী-বন-প্রান্তর-গ্রামের মধ্য দিয়ে রঘুপতি চলতে লাগলেন। গ্রাম্যজীবনযাত্রার বহুবিধ টুকরো ছবি বিষণ্ণ নক্ষত্রের বড়ো ভাল লাগছিল, কিন্তু কোথাও দাঁড়িয়ে দেখবার উপায় ছিল না; এই জীবনলীলা ও প্রকৃতি-সংসার নক্ষত্রের কাছ থেকে ছায়াচিত্রের ন্যায় কেবল দূরে সরে যাচ্ছিল। দুরন্ত নিয়তির মতো রঘুপতি নক্ষত্রের ব্যক্তিত্বকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন, তাকে নিজ ইচ্ছামতো পরিচালিত করছিলেন তিনি। নক্ষত্রের কাছে পথপার্শ্বের দীন-দুর্গতের জীবনও পরমকাম্য বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী রঘুপতির হাত এড়াবার এতটুকু শক্তি তার ছিল না।

॥ ১১ ॥ ত্রিপুরায় ইঁদুরের উৎপাত……তাহার হৃদয়ে গ্রহণ করেন।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ১৯৫ । পৃ. ১১৬-১১৭]

< নক্ষত্ররায়ের ত্রিপুরা-আক্রমণ >

একবার ইঁদুরের উৎপাতে ত্রিপুরায় প্রায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এই বিপর্যয়ের জন্য সকলে দায়ী করল রাজাকে। কিন্তু কয়েকমাস পরে জুম ফসল কাটবার সময় এসে গেল, ফসল ভালোই হলো; প্রজাদের মধ্যে আনন্দকোলাহল

জেগে উঠল—রাজার প্রতি তাদের অসন্তোষের ভাব কেটে গেল। এরূপ একটি সময়ে রাজ্যলোভী নক্ষত্ররায় মোগল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ত্রিপুরার দুয়ারে হানা দিল। সৈন্যরা গ্রামে গ্রামে লুটপাট শুরু করলো। প্রজাপুঞ্জের লাঞ্ছনার অবধি রইল না। এ সংবাদে রাজা গোবিন্দমাণিক্য খুবই ব্যথিত হলেন। বাহিরের শত্রু রাজ্য আক্রমণ করেছে, বেদনা সেইজন্যে নয়; ভ্রাতৃস্নেহ বিসর্জন দিয়ে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই অস্ত্রধারণ করেছে এই শোচনীয় ঘটনাই রাজার দুঃসহ হৃদয়যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছে।

॥ ১২ ॥ রাজা তাহার অতিথিকে ·····সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়াছে।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ২২৫ । পৃ. ১৭০-১৭১]

< গোবিন্দমাণিক্য-রঘুপতি-মিলন >

রঘুপতিকে দেখে রাজা ভাবলেন, বুঝি নক্ষত্রের কাছ থেকে কোনো সংবাদ নিয়েই তিনি এসেছেন। কিন্তু রঘুপতি বললেন, জয়সিংহের শুভ্রভাস প্রীতির আদর্শই তাঁকে প্রীতিমন্ত্রের শ্রেষ্ঠ সাধক রাজর্ষি গোবিন্দমাণিক্যের কাছে সবলে ঠেলে দিয়েছে। ব্রাহ্মণ-রঘুপতি চেয়েছিলেন অখণ্ড প্রতাপ, সর্বময় আধিপত্য—হিংসার পথে। কিন্তু এসব বস্তুর মধ্যে যথার্থ সুখের স্পর্শ তিনি পাননি; উপলব্ধি করেছেন—আত্মতৃপ্তিতে নয়, মঙ্গলধন্য আত্মব্যাপ্তিতেই প্রাণের আরাম এবং আনন্দ। এই নিবিড় উপলব্ধিতে তিনি পৌঁছেছেন গোবিন্দমাণিক্যের কল্যাণসুন্দর জীবনাদর্শ দেখে। রঘুপতি এতকাল জড়তা-মূঢ়তা অন্ধসংস্কারকেই দেবীর আসনে বসিয়ে তাদের সেবা করেছেন। এর ফল অনিঃশেষ হৃদয়যন্ত্রণা। আজ সেই মূঢ়তার বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত; তাঁর বাসনা—তিনি মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের মঙ্গলকর্মের সঙ্গী হবেন।

মর্মার্থলেখন

॥ ১ ॥ রাজা বলিলেন, 'এ বৎসর ····· নাস্তিকের মতো কহিতেছে।'

(পৃ. ১২-১৩)

আমাদের সংস্কারবিজড়িত মন প্রথাসিদ্ধ পূজারীতিকে অনুসরণ করেই চরিতার্থ বোধ করে। পশুবলির দ্বারা দেবীকে তুষ্ট করা যাবে এই অন্ধ বিশ্বাসে সে চালিত হয়। বিশ্বের প্রতিটি জীবই তো মায়ের সন্তান—বিশ্বজননী কিভাবে পশুবধে তুষ্ট হতে পারেন তা অনেকেই ভেবে দেখে না। এই বীভৎস বলিপ্রথা বিচারবোধ-হীন মানুষের মূঢ়তারই পরিচায়ক। মানবের স্বার্থদুষ্ট হিংসাবৃত্তি করুণাময়ী জগৎ-জননীকে পর্যন্ত খর্পরধারিণী করে তুলেছে। এহেন হিংস্রপ্রথার বিরোধিতা যারা

করে, হিন্দুর দেবায়তনে শাস্ত্রাভিমানী পুরোহিতসম্প্রদায় তাদের বলে নাস্তিক—পাষণ্ড। কিন্তু এই পরমসত্যটি বুঝে নিতে হবে যে, দেবীর নামে তারা বলিদান করলেও দেবী জীবহিংসায় কখনোই খুশি হন না—বেদনার্তই হন।

॥ ২ ॥ শোনো বৎস, তোমাকে তবে··· ··উপলক্ষ্য হইলাম।

[পৃ. ২২]

বিশ্বব্যাপারটাই জগন্মাতা মহামায়ার মায়া—অসংখ্য জীবের জন্ম ও মৃত্যু তো তাঁরই প্রকাণ্ড একটি খেলা। ভালোমন্দ পাপপুণ্য বলে কোনকিছুই এখানে নেই; এমন কি হত্যাকর্মকেও পাপ বলা যায় না। মৃত্যুকেই তো বলি হত্যা। সংসারে গণনাতীত জীব কতভাবেই তো প্রতিনিয়ত মরছে, মুহূর্তে মুহূর্তে কত ক্ষুদ্র প্রাণীকে আমরা পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাচ্ছি। মৃত্যুবলি মায়ার অধীশ্বরী মহাকালীর অভিপ্রেত। মানুষ এই হত্যাকার্য বা মৃত্যুর উপলক্ষ ছাড়া আর কী? এরূপ অবস্থায় হত্যাকারীকে পাপ স্পর্শ করবে কেন?

॥ ৩ ॥ তখন জয়সিংহ প্রতিমার দিকে··· আমি সহিতে পারিব না।

[পৃ. ২২-২৩]

কোনো কোনো শাস্ত্র বিশ্বজননীর সংহারমূর্তির উপাসনার কথা বলে মায়ের উদ্দেশে জীববলির নির্দেশ দেয়। ওই মূর্তি কী ভয়ানক—জগন্মাতা রক্তলোভাতুরা। কিন্তু প্রীতিমন্ত্রের সাধক ভক্তজনের মন মায়ের উক্ত রাক্ষসীমূর্তিকে সহ্য করতে পারে না, সংশয়ে কাতর হয়ে ওঠে। তার কম্পিত কণ্ঠের জিজ্ঞাসা—নিখিলজননী যিনি, পিশাচীর ন্যায় সন্তানের রক্তে তিনি আপনার পিপাসা মেটান কী করে? যে-শাস্ত্র মমতাময়ী মা-কে রাক্ষসী বলে, তার কাছে এই শাস্ত্রবাক্য সম্পূর্ণ মিথ্যা—মায়ের স্নেহসুকোমল করুণামূর্তিই সে প্রত্যক্ষ করতে চায়।

॥ ৪ ॥ মধ্যাহ্নে সংসারের আবর্তের ··· প্রেমসমুদ্রের পথ দেখিতে পান।

[পৃ. ২৮-২৯]

কুটিল সংসারের শতসহস্র জটিলতা মানুষের মনকে অতিসংকীর্ণ একটি গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে—সহজসুন্দর সেখান থেকে নির্বাসিত। বিচিত্রভাবনা-পীড়িত মানবের এই বন্দী হৃদয়কে সৌন্দর্যস্নাত আনন্দলোকে মুক্তি দিতে পারে সরল-প্রাণ একটি শিশুর পবিত্র সান্নিধ্য আর নির্জন নিসর্গপ্রকৃতি। এদের স্নিগ্ধ পূত স্পর্শ মানুষকে বিষাক্ত বৈষয়িকতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে অসীম প্রেমের উদার রাজপথের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়।

॥ ৫ ॥ গোবিন্দমাণিক্য অতিশয় বিষণ্নমুখে ·····অপসৃত হওয়াই ভালো।

[পৃ. ৩৭-৩৮]

নক্ষত্ররায়ের ভ্রাতৃত্ববিরোধী হিংসাকুটিল আচরণ দেখে উদারহৃদয় গোবিন্দমাণিক্য অত্যন্ত বেদনা অনুভব করলেন। যেখানে ভাইয়ের সঙ্গে

সহজপ্রীতি বিশ্বিত হয় সেখানে মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত। হিংসা-দ্বেষ-লোভ আদি বৃত্তি তো-অরণ্যচারী পশুরই ধর্ম, এরা যদি মানবসংসারে অবাধে বাসা বাঁধে তাহলে মনুষ্য-জাতির স্থান কোথায়? হিংসালোভের এই উলঙ্গ আত্মপ্রকাশ দেখে রাজ্যসম্পদ গোবিন্দমাণিক্যের কাছে একেবারে মূল্যহীন নিরর্থক বলে মনে হলো। ভ্রাতৃস্নেহের মধ্যেও ঈর্ষার বিষ প্রবেশ করেছে বুঝতে পেরে তিনি সিংহাসন ত্যাগের সংকল্প করলেন।

॥ ৬ ॥ রাজা কহিলেন, 'কেন মারিবে……রাজা হইতে হয়।'

[উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬১] [পৃ. ৪০]

গোবিন্দমাণিক্য প্রকৃত রাজ্যেশ্বরের প্রকাণ্ড দায়িত্ব ও অশেষ কর্তব্যের কথা বলছেন।

সিংহাসন আর রাজমুকুটই কি রাজার সমস্ত পরিচয় বহন করে? কদাপি তা নয়—মহৎ প্রভুত্বের ওপরই সত্যকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। রাজার কর্তব্য ও দায়িত্ব বিপুল। বহু মানুষের কল্যাণচিন্তায় তাঁর অন্তর সর্বদা অস্থির, অসংখ্য প্রজা-সাধারণের সুখদুঃখের অংশীদার তাঁকে হতেই হবে, সুশাসনের গুরুভার তাঁর ওপর ন্যস্ত। প্রচণ্ডপ্রতাপ দেখিয়ে প্রজাদের বশে রেখে, ভোগবিলাসিতায় গা ডুবিয়ে, যিনি রাজ্য চালান, রাজার ছদ্মবেশে তিনি দস্যুতাই করেন। জনগণের পুঞ্জীকৃত রোষে তাঁর রাজত্ব সহসা একদিন ধুলোয় গুঁড়োতে বাধ্য। কল্যাণকর্মে রত থেকে প্রজাপুঞ্জের হৃদয়লোক যিনি অধিকার করতে পারেন, রাজমহিমা কেবল তারই প্রাপ্য। অপর রাজাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসা যায় কিন্তু যথার্থ 'রাজা' হওয়া অন্য কথা।

॥ ৭ ॥ মহারাজ খাপ হইতে তরবারি……অরণ্যে ডাকিয়া আনিয়াছি।

[পৃ. ৪০-৪১]

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য রাজ্যলোভাতুর ঈর্ষাকাতর নক্ষত্ররায়ের হাতে নিজের তরবারি তুলে দিলেন এবং সেই নির্জন বনভূমিতে তাঁকে [গোবিন্দ-মাণিক্যকে] নিরুদ্বেগে হত্যা করতে বললেন। স্বার্থপরবশ হয়ে ভাই যদি ভাইয়ের বুকে ছুরি বসাতে চায় তবে এই দুষ্কর্মের একমাত্র উপযুক্ত স্থান জনমানবশূন্য অরণ্য। জনাকীর্ণসমাজে ভ্রাতৃহত্যা ঘটলে তার পাপস্পর্শ গোটা সমাজকে পঙ্কিল করে তুলবে, এহেন অপকর্মের একটি উদাহরণ শত উদাহরণের জনয়িতারূপে দেখা দেবে।

॥ ৮ ॥ জয়সিংহ বলিলেন, প্রভু……নির্বাসিত করিয়া দিয়াছেন।

[পৃ ৪৫-৪৬]

রঘুপতির প্রতি জয়সিংহের অনুযোগ: তিনি বিশ্বজননীকে পরমস্নেহময়ী মা বলে জেনেছিলেন—করুণাময়ী মাতার ভক্তসেবক হয়ে তাঁর চিত্তের যে আবাল্য

। নিশ্চিন্ততা ছিল স্বয়ং রঘুপতি তা ভেঙে দিয়েছেন। রঘুপতির ব্যাখ্যানে দেবী যার মাতৃস্বরূপিণী নেই, হয়ে পড়েছেন রুদ্ররূপা ভয়ংকরী ; জননীকে তিনি নির্বিকার াক্তি করে তুলেছেন, হিংসা ও রক্তপাতের অধিদেবতা বলে কল্পনা করেছেন ; তাই, য়সিংহের হৃদয় আজ আশ্রয়চ্যুত, সংকটাপন্ন।

॥ ৯ ॥ বিল্বন-ঠাকুর রাজাকে কহিলেন·····কাজ বাড়াইতে হয়।

[পৃ. ১০৬-১০৭]

সূক্ষ্মবুদ্ধির অতিচর্চা মানুষের স্বাভাবিক সহজ বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মক্ষমতার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের কাজে লাগাবার জন্যে বুদ্ধির প্রয়োজন ; কিন্তু বুদ্ধির কসরৎ আসল কাজের কথা ভুলে গিয়ে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন উদ্দেশ্যের চেয়ে উপায়টি প্রাধান্য পায়। অতিরিক্তরকম বুদ্ধির চর্চা কাজের পরিধিকে কেবল বাড়িয়েই চলে। রাজা এবং বিল্বনের আলোচনায় এই সত্যটিই ধরা পড়ল।

॥ ১০ ॥ রাজা কহিলেন, 'আমি ·····আমাদের শোকের কারণ ঘটিবে।'

[পৃ. ১২০-১২১]

রাজকর্তব্য অতিশয় কঠিন। এই কর্তব্যপালনের জন্যে চাই অকম্পিত চিত্তস্থৈর্য। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রতিকূলশক্তি মাথা না তোলে ততক্ষণ রাজ্যপরিচালনা সহজ বলেই মনে হয়। কিন্তু রাজার আসল পরীক্ষা সংকটের দিনে। এহেন দুঃসময়ে কেউ কেউ পলায়নীমনোবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে রাজ্যত্যাগ করে চরম কর্তব্যভীরুতার পরিচয় দেন, এবং গুরুতর কর্তব্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে এই ফাঁকিকে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলে চালাতে চান। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের মন বৈরাগ্যমুখী হয়ে উঠলে বিল্বন-ঠাকুর তাঁকে তাঁর বিপুল কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, এবং কঠোর হস্তে দুষ্টের দমন করতে বললেন।

॥ ১১ ॥ এই ছায়াশীতল প্রবাহের স্নিগ্ধ ·····প্রশান্ত হইয়া উঠিলেন

[উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬২] [পৃ. ১৫১-১৫২]

নানান্-সমস্যা-কণ্টকিত সংসার মানুষের মনকে অহর্নিশি কত ভাবেই-না পীড়িত করে তোলে। মানুষ এই পীড়ার হাত থেকে মুক্তি পায় নির্জন প্রশান্ত প্রকৃতির নিকটসান্নিধ্যে এসে। এখানে অগাধ শান্তি, অমেয় সান্ত্বনা। নিসর্গপ্রকৃতির স্নিগ্ধস্পর্শ পেয়ে মানবমানবী মুহূর্তে তার মর্মান্তিক দুঃখবেদনার কথা ভুলে যায় প্রকৃতিলোক উদার প্রশান্তি ও অনাবিল নবীনতার লীলানিকেতন। তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে মানবের পীড়িত সংকুচিত অন্তরও অচিরে নবীকৃত হয়ে ওঠে, নিশ্চিন্ত শান্তির সুধার আস্বাদ পায়। ছায়াশীতল স্তব্ধ শৈলতলে আশ্রয় নিয়ে রাজ্যত্যাগী গোবিন্দমাণিক্য সম্পূর্ণরূপে অহংবিস্মৃত হলেন, সর্ববিধ মানসিক অশান্তির বহু উঠে গেলেন।

॥ ১২ ॥ সহসা রাজত্ব ছাড়িয়া দিয়া……তাহার বিশ্রাম ছিল না।

[পৃ. ১৫৩]

এমনো দেখা যায়, কী এক আন্তরপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ অবলীলাক্রমে খুববড়ো-একটা-কিছু ত্যাগ করে বসেছে, এবং এতে এতটুকু পীড়া মনের কোণে সে অনুভব করে নি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বহুকাল ধরে প্রতিদিনের যে-জীবনযাত্রায় সে অভ্যস্ত তাকে ছাড়তে গিয়ে কী সংগ্রামই-না তার করতে হয়েছে। ক্ষুদ্র ছোট নানান্ অভ্যাস মানুষের দৈনন্দিন কাজে ও ভাবনায় এমনভাবে জড়িত থাকে যাকে দূর করতে হলে দীর্ঘকালীন একনিষ্ঠ সাধনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রাজ্যত্যাগী গোবিন্দমাণিক্য নির্জন বনবাসে ওই সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন।

॥ ১৩ ॥ গোবিন্দমাণিক্য চাহিয়া দেখিলেন · এ কেবল পৃথিবীর দোষ।

[পৃ. ১৬৬-১৬৭]

সন্ন্যাসী বা ফকিরের বেশ ধারণ করলেই মানুষ সর্বত্যাগী হয়ে যায় না। বাধ্য হয়ে যে দরিদ্রের জীবন বরণ করেছে, নিজেকে পৃথিবীর শতসহস্র মন্দভাগ্য দরিদ্রজনের পঙ্‌ক্তিভুক্ত করে দেখতে তার দ্বিধাসংকোচের শেষ নেই। আসলে মনের পরিবর্তন ঘটা প্রয়োজন। ফকির যদি পার্থিব বাসনামুক্ত হতে না পারে তবে মিথ্যা তার ফকিরী। পোশাক-আষাকে নয়, সন্যাকার বৈরাগ্য মনোভঙ্গিতে ভোগসমৃদ্ধ জীবন থেকে প্রতিকূল ভাগ্য যাকে দারিদ্র্যে নিক্ষেপ করেছে, আপনার বিগতদিনের অতি-উচ্চমর্যাদাকে সে ভুলবে কী করে। কেবলই তার মনে হতে থাকে, নিঃস্বতায় সে পতিত হয়েছে অদৃষ্টের চক্রান্তে। তাই, এই মানুষটি নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে গোটা পৃথিবীকে দায়ী করে।

ফকিরবেশী সুজা এবং তার কন্যাদের গাত্রআবরণ দেখে আর তাদের চোখে-মুখে-আচরণে প্রতিফলিত মনের ভাব লক্ষ্য করে রাজর্ষি গোবিন্দমাণিক্যের ওপরের এই কথাগুলি মনে হয়েছিল।

॥ ১৪ ॥ গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়া·· ·· সন্ন্যাসীও সাজিতে হয় নাই।

[পৃ. ১৬৭-১৬৮]

বাহিরের ভড়ংকে কখনো বড়ো করে দেখেন না প্রকৃত সন্ন্যাসী। যথার্থ ত্যাগধর্মী তিনি, কিন্তু ত্যাগ নিয়ে এতটুকু গর্বিত মনোভাব তাঁর নেই। তাঁর আচরণে জগৎ ও জীবনের প্রতি নির্মম উদ্ধত বিরূপতা কদাপি প্রকাশ পায় না; একটা সহজপ্রীতির বন্ধনে গোটা সংসারটাকে তিনি বাঁধেন, সকলকে আপনার করে নেন। তাঁর মন বাসনাবিজড়িত নয় বলে পার্থিব ভোগের ক্ষেত্র থেকে তিনি অনেক দূরে; আবার, সমস্ত জগতের তিনি অন্তরে, কারণ, বিনির্মল প্রীতির সূত্রে মানবজীবনের সঙ্গে তিনি বাঁধা।

রামায়ণী কথা

< ভাবসম্প্রসারণ >

॥ ১ ॥ গভীর দুঃখে পড়িয়া লোকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। হৃদয়ে অমানিশার তুল্য শোক, নৈরাশ্য বা অনুশোচনার ঘোর অন্ধকার ঘনীভূত না হইলে সেই জ্ঞান আসে না।

[পৃ. ১৭-১৮]

গ্রন্থ পাঠ করে মানবজীবনের বিচিত্র রহস্য ও জটিলতা-বিষয়ে আমরা জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু বস্তুত এই জ্ঞান অসম্পূর্ণ, খণ্ডীকৃত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা যে-শিক্ষালাভ হয়, তার তুল্য আর-কিছুই নয়। আবার, যতক্ষণ এই অভিজ্ঞতা জীবনের উপরিতলকে মাত্র অবলম্বন করে থাকে ততক্ষণ অন্তর্গূঢ় জীবনসত্যটিকে আমরা স্পর্শ করতে পারি না। দুঃখের তীব্রতায় মানুষের যথার্থ আত্মোপলব্ধি ঘটে, তখনই জীবনের গহন রহস্যগুলি তার দৃষ্টিপথে ধরা দিতে থাকে।

সুখে মানুষ বহির্মুখী, দুঃখে সে অন্তর্মুখী। যতক্ষণ জীবন সুখচপলতায় প্রবাহিত হতে থাকে, মানুষ সেই স্রোতের মধ্যে তৃপ্তনিশ্চিত ভঙ্গিতে আত্মসমর্পণ করে, এই ভাসমান অবস্থাকেই একমাত্র সত্য বলে জ্ঞান করে। কিন্তু দুঃখের আঘাতে তার এই আত্মসন্তুষ্ট মানসিকতা আকস্মিকভাবে প্রতিহত হয়। তখন সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একবার তাকে আত্মবিচার করে নিতে হয়, আর এই পথে ক্রমশ সে জীবনের সত্য অভিজ্ঞতাগুলিকে অর্জন করতে থাকে। জীবনদার্শনিক যথার্থ ধর্মচারী, তাই দুঃখকেই জীবনের পথে সবচেয়ে বরণীয় বলে মনে করেন; দুঃখের পথেই আত্মজ্ঞান এবং বিশ্বজ্ঞান সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি রচনায় গান্ধারীর আচরণে এই দুঃখপ্রভাব সুন্দর চিত্রিত করেছেন। ধর্মপথচারিণীকে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'কী দিবে তোমারে ধর্ম'? 'দুঃখ নব নব' এই ছিল গান্ধারীর উত্তর। এই উত্তরই যথার্থ সত্যজ্ঞানীর উত্তর।

॥ ২ ॥ আম্রতরুচ্ছেদন করিয়া পলাশমূলে জলসেচন করিয়া মূঢ় ব্যক্তি শেষে ফল না পাইলে বিস্মিত হয়, পলাশফুল হইতে আম্রফল উদ্গত হয় না।

[পৃ. ১৮]

কার্যকারণের অমোঘ সম্পর্কসূত্রেই বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু স্বার্থমগ্ন মানুষ এ সত্য স্পষ্ট মনে রাখে না। প্রত্যেক মুহূর্তেই সে জীবনের শ্রেষ্ঠ ফলগুলি প্রত্যাশা করে, মনে রাখে না যে, ফসল ঘরে তুলবার জন্যে দীর্ঘদিনের প্রযত্ন ও সাধনা প্রয়োজন। পরিজন, পরিচিত, প্রতিবেশী, সকলেরই দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে, তাদের সুখ এবং সর্বোজ্জ্বল আনন্দ লক্ষ্য করে তার মনে অক্ষম ঈর্ষার সঞ্চার হয়। জীবন-বিধাতাকে সে ধিক্কার দিতে থাকে এই অভিযোগে: কেন তাদের অর্জিত সুখ আমারো উপর বর্ষিত নয়!

ইংরেজীতে একটি প্রবাদবাক্য আছে : as you sow, so you reap—যেমন বুনেছো তেমনি ফসল। অথবা বাংলা প্রবচনটিও স্মরণ করতে পারি : যেমন কর্ম তেমন ফল। কর্মের অনুরূপই তার ফললাভ হল, এ-কথা যদি কেউ উপলব্ধি না করতে পারে তবে তার তুল্য মূঢ় আর কে আছে। সমস্ত কৈশোরকাল অলস অকর্মণ্যতায় অতিবাহিত করে কেউ যদি আশা করে যে, সে মস্ত জ্ঞানী হবে অথবা লোকবরেণ্য কর্মী হবে, তবে তার সে আশা কি কোনদিনই পূর্ণ হতে পারে? অতীত জীবন-যাপনের রীতি অনুসারেই ভাবীজীবনের সংগঠন ভিতর থেকে গড়ে ওঠে, এ-তত্ত্ব সকলের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

॥ ৩ ॥ দেশপর্যটনে মনের ভাব লঘু হয়।

[পৃ. ৩৫]

ইংরেজীতে একটি কথা আছে : a rolling stone gathers no moss! যে জীবন রুদ্ধ, গতিহীন—তার মধ্যে স্বভাবতই নানারকম ক্লেদ জমে উঠবার অবকাশ পায়, কিন্তু সচল জীবনস্রোতকে সেই ক্লিন্নতা স্পর্শ করতে পারে না। কূপমণ্ডুকতায় আচ্ছন্ন মানুষ ব্যাপক দৃষ্টির প্রসাদলাভে ধন্য হয় না, তাই, নিজের মধ্যে কুণ্ঠিত হতে হতে তার মনে নৈরাশ্য ও ক্লান্তির বোঝা জমে ওঠে। সার্থক জীবনদ্রষ্টারা সকল সময়েই তাই এই পরামর্শ দেবেন : আত্মবৃত্তে আবদ্ধ থেকো না, বহির্বিশ্বে প্রসারিত হয়ে পড়ো। রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি মনে পড়ে। পাষাণ কারা-গুহার অন্ধকার ভেদ করে দুর্দম বেগে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল নির্ঝর, এই উল্লাস ঐ কবিতাটির ছন্দে-শব্দে হিল্লোলিত হয়েছে। বিশ্বের মধ্যে সঞ্চরমানতার এই আনন্দ আমরাও কি আমাদের জীবনে বরণ করে আনব না? দেশভ্রমণের সহজ উপায় অবলম্বন করে মানুষ এই মুক্তির স্বাদ অন্তরে গ্রহণ করতে পারে।

মানবসমাজে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। তার কথাবার্তা আচার-আচরণ পোশাক-পরিচ্ছদ সর্বত্রই সীমানাহীন বৈচিত্র্য। বহু-দেশ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে এই বৈচিত্র্যের আস্বাদ আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আর তখন, যে ব্যক্তিগত সাময়িক দুঃখকে আমার জীবনের সর্বনাশ বলে মনে হচ্ছিল তা যেন ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। 'চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি' এই কথার সত্য সুর তখন আমাদের হৃদয়ে রণিত হতে থাকে।

॥ ৪ ॥ প্রকৃতির সৌন্দর্যরাশি নগর ও পল্লীতে লোকভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। মানুষ বনলক্ষ্মীকে প্রকৃতির গৃহছাড়া করিয়া দেয়।

[পৃ. ৩৫]

প্রকৃতি মানুষের চেয়ে প্রাচীনতর। কিন্তু মানবসমাজ উন্নতচেতনাসম্পন্ন সঙ্ঘবদ্ধ একটি শক্তিমান্ সমাজ, আত্মরক্ষা এবং আত্মবিস্তারের স্বাভাবিক প্রেরণায়

প্রকৃতিকে সে ব্যবহার করে। শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যানী, বিপুল-প্রসারিত নীল দিকচক্রবাল, নিত্যগর্জমান সংক্ষুব্ধ প্রলয়সমুদ্র আমাদের দৃষ্টিকে নন্দিত করে, কল্পনাকে অভিভূত করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু জীবনধারণের পক্ষে, প্রাত্যহিক বসবাসের পক্ষে ওগুলি যথেষ্ট উপযোগী নয়, এ-ও সত্য। সভ্যতার ক্রমবিকাশে তাই দেখি ক্রমেই মানুষ এই প্রকৃতির উচ্ছেদ সম্পন্ন করে, বিশাল বনস্পতি মানবিক কুঠারাঘাতে ছিন্ন হয়ে যায়, আর সেখানে আধুনিক যন্ত্রযানের প্রতিষ্ঠা হয়। কোনো কোনো নদীতে যেমন চর ধীরে ধীরে সমস্ত জলরাশিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, নগর-সভ্যতার বিস্তারে যন্ত্র আর কলকারখানা তেমনি করে ক্রমে শ্যামল প্রকৃতিকে ধ্বংস করে দেবার ব্রত নয়। দুচোখ ভরে সবুজের রস পান করা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব প্রয়োজন বটে, কিন্তু আধুনিক নগরজীবনে তার আর কোনো সহজ সুযোগ নেই।

একেবারে কি নেই? জ্ঞানের দ্বারা কাজের মানুষ এ-ও জেনে নিয়েছে যে, সৌন্দর্যচর্চা ও সুন্দরের উপভোগ মনের জন্যে জরুরি, তাই, শ্রেষ্ঠ নগরীগুলিতে রচিত উদ্যানেরও অভাব নেই। সহজস্ফূর্ত বৃক্ষসবুজের প্রতিকল্প আজ কষ্ট-রচিত উদ্যানশোভা। কিন্তু এই শোভার মধ্যে প্রাচুর্যেরও অভাব, আত্মারও অভাব। বনলক্ষ্মীকে মানুষ অপহৃত করে দিয়েছে। তার নগরজীবনে এখন আছে নিক্তি-মাপা সৌন্দর্য।

॥ ৫ ॥ পক্ক শস্যের যেরূপ পতনের ভয় নাই, সেইরূপ মনুষ্যেরও মৃত্যুর জন্য নির্ভয়ে প্রতীক্ষা করা উচিত—কারণ, উহা অবধারিত।

[পৃ ৪২]

মহাপ্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে এমন সাধ্য কারো নেই। 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে? চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে?'—এও সেই অমোঘ নিয়মের অন্তর্গত। এক হিসেবে লক্ষ্য করলে এইটেই বিশ্বের প্রধানতম এবং প্রবলতম নিয়ম, সৃষ্টি ও ধ্বংসের পর্যায়ক্রমিক এই বিন্যাস। মানুষ অল্পদিনেই তার অভিজ্ঞতায় জেনে নেয় যে, ধ্বংস এবং মৃত্যু জীবনের অনিবার্য পরিণাম মাত্র, শেষ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে সকল সংগ্রাম নিষ্ফল হয়ে যায়। কিন্তু এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হৃদয় যেন সর্বাঙ্গীণভাবে গ্রহণ করে না, আমাদের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা এইখানে। অবধারিতের জন্যে প্রতীক্ষাই যেখানে কর্তব্য, সেখানে আমরা কত কাকুতিমিনতির প্রতিরোধ রচনা করতে যাই। ধর্মরাজের প্রশ্নোত্তরে যুধিষ্ঠির তাই মানুষের এই দুর্বলতাকে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় বলে বর্ণনা করেছিলেন।

প্রতিরোধ রচনার প্রয়াস থেকেই ভীতির জন্ম। আমি প্রাণপণ বলে অমূল্য বস্তু রক্ষা করতে চাই, আবার মনে মনে স্পষ্টই জানি যে, কখনোই এ রক্ষণসাধ্য নয়—তখনই ভয় দেখা দেয়। ভয়ব্যাকুলতার এই লজ্জাজনক চরিত্র মানুষকে ক্রমে সত্যবোধহীন কাপুরুষ করে তোলে। মুহূর্তে মুহূর্তে সে-কাপুরুষ মৃত্যুর অলীক ছায়া

দেখে কেঁপে ওঠে। অথচ, যদি পরিণামে মৃত্যুকে স্থির জেনে জীবনের সম্পন্ন দিনগুলিকে বীরের মত উপভোগ করে যাই, মানবজীবন তবে তার পরিপূর্ণ সার্থকতায় পৌঁছতে পারে।

॥ ৬ ॥ স্ত্রী, পুত্র ও জ্ঞাতিদের সহিত মিলন দৈবাধীন, কখন চিরবিরহ উপস্থিত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই।

[পৃ. ৪৩]

যখন জীবনরসে মগ্ন আছি, তখন জানি না সেই জীবনের উৎসরহস্য কী? জীবন কোথা থেকে সঞ্চারিত হলো, কোথায় তার অন্তিম পরিণতি—আদি-অন্তের এই ধারণা সবসময়ে আমাদের বিচলিত করে না। কিন্তু যখন সেই দার্শনিক জিজ্ঞাসাগুলি নিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়ি, ক্রমে তখন এই সত্য আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে যে, সমস্ত জীবন কেবলই এক আকস্মিকের মালা। কোনো নির্ধারিত পূর্ব-কল্পনা এর পশ্চাদ্‌ভূমিতে আছে কিনা তা আমরা জানতে পারি না। মানুষের জ্ঞান ও কল্পনার যে সীমাবদ্ধ জগৎ তার দ্বারা জীবনের সমস্ত গ্রন্থিগুলি মোচন করা যায় না, জীবনের সকল ঘটনার সম্যক্ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে এই অসীম প্রবাহ কেমন করে, কার শক্তিবলে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে? অলৌকিক এক দৈবের ধারণা তখন অনিবার্য হয়ে ওঠে, দৈবপ্রভাবকে মনে মনে স্বীকার করে নিতে মানুষ তখন বাধ্য হয়। মানুষ যতদূর নিয়মের অস্তিত্ব বুঝে নিতে পারে, তার দ্বারা তার আত্মজীবনের ঘটনাপ্রবাহের সমস্ত আকস্মিকতা ব্যাখ্যা করা যায় না, দৈবযোগ বলে অনেকটা অংশ ছেড়ে দিতে হয়।

আর, এ যদি সত্য হয় যে, আমাদের স্বজনবান্ধবদের সঙ্গে মিলন, কেবল আকস্মিকের খেলা মাত্র, তবে সে-মিলন ভাঙলেই বা এত বিচলিত হই কেন? শোকাহত মানবহৃদয়ের প্রতিষেধক হিসেবে তাই বারংবার মোহমুদ্গরের ব্যবস্থা দেওয়া হয়—'দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমার' এই আক্ষেপধ্বনিতেই পরিপূরিত করে তোলা হয়েছে মানব সংসার।

কিন্তু এ ক্রন্দন অনুচিত। আর দৈবের ওপর এমন নিবিড় নির্ভরশীলতার ফলে যে-জীবন-দর্শন উপস্থিত হতে পারে, তাও সর্বতোভাবে বরণীয় নয়। বিচ্ছেদের জন্য চিত্তকে প্রস্তুত করে রাখা ভালো, কিন্তু এই প্রস্তুতিতে যেন জীবনবৈরাগ্য উপস্থিত না হয়, তাও বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে।

॥ ৭ ॥ ক্ষত হইতে যে ত্রাণ করে সেই 'ক্ষত্রিয়'।

[পৃ. ৪৫]

একসময়ে ভারতবর্ষের সমাজ পেশা ও জীবিকা অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই চতুর্বর্গে বিভক্ত সেই সমাজ। সমাজের সাত্ত্বিক প্রকাশ যাঁদের মধ্যে তাঁরা ব্রাহ্মণ। আর, ক্ষত্রিয়ের আচরণ রজঃগুণ-সমন্বিত। বীর্যবত্তার প্রকাশই ক্ষত্রিয়ের স্বভাবধর্ম। ব্রাহ্মণের বল জ্ঞানে, ক্ষত্রিয়ের প্রকাশ শক্তিতে।

কিন্তু এই শক্তি কেমন শক্তি? ক্ষত্রিয় কি তবে বলদর্পী? তার প্রবল বাহুবলের সামনে ক্ষীণজীবী প্রজাকুল কি সতত সন্ত্রস্ত? অত্যাচারেই কি তার স্বভাবের প্রকাশ? তা কখনো নয়। ক্ষত্রোচিত মহিমায় রাজা রাজ্যশাসন করে, সে তো অত্যাচারের জন্যে নয়, অত্যাচার উপশমের জন্যে। শক্তির প্রকাশ কোথায় প্রয়োজন, আর কোথায়-বা শক্তির আস্ফালন দানবিক ব্যবহার-মাত্র—যথার্থ ক্ষত্রিয় তা উপলব্ধি করে। ক্ষত থেকে যে ত্রাণ করে সেই ক্ষত্রিয়—শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করলে এই সুন্দর অর্থটিতে আমরা পৌঁছাতে পারি। 'দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো; নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না মানো' এই মহামন্ত্র শিরে ধারণ করেই ক্ষত্রিয় তার কর্তব্যভার বুঝে নেয়। শক্তির প্রকাশেই তার ধর্মের প্রকাশ, কিন্তু তাকে যত্নে বিচার করে চলতে হয় কোথায় শক্তির প্রকাশ দুঃখীর ত্রাণের জন্যে, দুর্বলের রক্ষার জন্যে—আর কোথায় শক্তি দুর্বলের প্রতি অত্যাচার। অতএব মদমত্ত উচ্ছৃঙ্খল বলপ্রয়োগ ক্ষাত্রধর্ম নয়, সুবিবেকী শক্তিমান্ ত্রাতার ভূমিকাই যথার্থ ক্ষাত্রধর্ম।

॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি অপমানিত হইয়া প্রতিশোধ না লয় সে পৌরুষশূন্য কৃপার্হ।

[পৃ. ৭৫-৭৬]

সৌজন্য, কমনীয়তা এবং ক্ষমাশীলতা যে পুরুষচরিত্রকে উদার মাহাত্ম্য দান করে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যেখানে শক্তি আছে কিন্তু তার উগ্র প্রকাশ নেই বরং সুসংযত ছন্দে তা বাঁধা—সেখানেই সৌন্দর্যের প্রকাশ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, শক্তিকে সকল সময়েই কর্মহীন প্রকাশহীন করে রাখতে হবে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে যদি ব্যবহৃত হতে না পারল তবে সে-অস্তিত্বের কী অর্থ। সেই উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিজেকে যে প্রমাণ করতে পারে না, সে অক্ষম, কাপুরুষ।

কোন্ ক্ষেত্র শক্তিপ্রকাশের উপযুক্ত? বহিঃশত্রু যেখানে দুর্বলের ওপর অত্যাচার বা অবিচার করে, রাজশক্তি যেখানে অধর্মচারী বা নীতিবিবেকহীন, সেসব ক্ষেত্রে প্রজাতাবর্গের মহামন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে শক্তির ব্যবহারই উচিত কর্তব্য। সেখানে সঙ্কোচের বিহ্বলতা বীরের পক্ষে অপমানস্বরূপ।

আবার, যেখানে অকারণ অপমানে লাঞ্ছিত হতে হয়, সেখানে তার প্রতিকারার্থে বলপ্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। তার পরিবর্তে যদি শক্তিমান অপমানিত ব্যক্তি নীরব হয়ে থাকেন, সে শুধু তার বলবীর্যহীনতা প্রমাণ করে, তার ক্ষমাশীলতার উদাহরণ হয় না। কেননা, যে-নীচব্যক্তি অপমান করতে সাহস করে, উপযুক্ত প্রতিফলের অভাবে তার স্পর্ধা অত্যন্ত গগনস্পর্শী হয়ে উঠতে থাকে, এবং সমাজে অকল্যাণের মাত্রা বেড়ে যায়। পরোক্ষে এই অকল্যাণের দায়িত্ব বহন করতে হবে সেই শক্তিমানকে [illegible] তিনি তার প্রতিবিধান করেননি।

ক্ষমতাশীলতা গুণ, কিন্তু সর্বত্রই তা গুণের বিষয় নয়। রবীন্দ্রনাথের দুইটি কবিতা-পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে :

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

এখানেও সেই অন্যায়সহ্যকারীর কথা। ন্যায়নীতিভঙ্গকারী অপরাধী বটে, কিন্তু সে অপরাধ যে নীরবে সহ্য করে তারো আচরণ প্রশংসনীয় নয়। সেও ঘৃণা বা কৃপার পাত্র। হয় তার অন্যায় প্রতিরোধ করবার শক্তি নেই, নতুবা তার শক্তি সত্ত্বেও কোনো বিবেক নেই।

॥ ৯ ॥ অতি দীন ও অশক্ত ব্যক্তিরাই দৈবের দোহাই দিয়া থাকে।

[পৃ ১৪৪]

জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, নানা প্রতিকূল সমস্যা ও বিঘ্নের কণ্টক অতিক্রম করেই পথ চলতে হয়। প্রত্যেক মুহূর্তে জীবন তাই আমাদের কাছে সাহস ও সতর্কতা দাবি করে। নিপুণ নাবিক যেমন প্রতিমুহূর্তে সচেতনভাবে আকাশের প্রলয় এবং সমুদ্রের তরঙ্গকে লক্ষ্য রাখে, অন্যমনস্ক হলেই যেমন তরী বিপন্ন হতে পারে, জীবনপথে মানুষেরও ঠিক ততটা সামর্থ্য ও সচেতনতা প্রয়োজন।

কিন্তু সকলেই এ সামর্থ্যের অধিকারী নয়। অধিকাংশ মানুষ আরামপ্রিয় এবং উদাসীন, দুরূহ জীবনব্রত-বিষয়ে স্বভাবত অজ্ঞান। এইসব মানুষ যখন কোনো প্রবল প্রতিরোধের সামনে দাঁড়ায়, মুহূর্তমাত্র তারা শির উন্নত স্থির রাখতে পারে না, ধূলিসাৎ হয়ে পড়ে। তারা চিত্তে দীন, দেহে শক্তিহীন। তখন তারা কেবল আক্ষেপ ও হাহাকারে দিক্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে তোলে, অপর কোনো প্রতিকারের উপকরণ তাদের আয়ত্তে নেই।

এই দুর্বল মানসিকতা থেকেই দৈববোধের সৃষ্টি। মানুষ যতক্ষণ নিজের ক্ষমতার নির্ভরে জীবন-প্রশ্নের মীমাংসা করে নিতে পারে, ততক্ষণ তার দায় নেই, পুরুষকারকেই ততক্ষণ শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলে মনে করতে বাধা নেই। কিন্তু যখনই পুরুষকারের অতীত হয়ে আসে সংঘাতগুলি, মানবিক শক্তির প্রয়োগে যখন কোনো কল্যাণ সম্ভব হয় না তখন মানুষ অগত্যা এক কল্পলোক সৃজন করে নেয়। সেই কল্পলোকের সর্বনিয়ন্তা সর্বশক্তিধর দেবতা, অলৌকিক তার অস্তিত্ব। অলৌকিক এই দৈবশক্তি দ্বারাই তার জীবন চালিত, নিয়ন্ত্রিত—এই ধারণায় মানুষ তখন অভ্যস্ত হতে থাকে। কিন্তু যথার্থ পৌরুষে অভিমানী ব্যক্তি কখনো বলেন না, 'হায় এ তো দৈবের লীলা!' 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' এই নীতি অবলম্বন করে তিনি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেন। শক্তিমানের সহায় পুরুষকার, আর দুর্বলের নির্ভর দৈব-কল্পনা।

॥ ১০ ॥ মিত্রলাভ অতি সুলভ, কিন্তু মৈত্রী রক্ষা করাই কঠিন।

[পৃ. ১৭৮]

মানুষ সমাজবন্ধনে আবদ্ধ, তার স্বভাবের মধ্যেই নিহিত আছে এই সঙ্ঘপ্রিয়তা। একাকীর নির্বাসনকে মানুষ ভয় করে। তাই জীবনে চলার পথে যত তার সাময়িক সঙ্গী জোটে, সকলেরই সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের জন্যে তার হৃদয় স্বভাবত উৎসুক থাকে। এইভাবে মৈত্রীপরম্পরায় ব্যক্তির পরিচয় যেমন বিস্তৃত হয়, আত্মবিস্তারের আনন্দোপলব্ধিতেও তেমনি সে তার জীবন সার্থকতা খুঁজে পায়।

পারস্পরিক উন্মুখতার ফলে মৈত্রীলাভ এইভাবে অপেক্ষাকৃত সহজ হয় বটে কিন্তু মৈত্রীরক্ষা সাধনার বস্তু। সঙ্ঘপ্রিয়তা যেমন মানুষের স্বভাবজাত, তেমনি এ-ও সত্য যে, মানবিক বৈচিত্র্যের অন্ত নেই, প্রতি মানুষ প্রতি মানুষের চেয়ে স্বতন্ত্র। ইচ্ছা, আদর্শ, রুচি, প্রণালী—কোনোবিষয়ে দুজন ব্যক্তি ঠিক একই পথের পথিক নয়। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সঞ্চার করতে পারলেই বন্ধুতা সম্ভব। কিন্তু তা কি সহজ? যদি আমি আমার ইচ্ছা-রুচিকে সর্বতোভাবে বন্ধুর ওপর প্রয়োগ করতে ব্যগ্র হয়ে উঠি, যদি তার বৈশিষ্ট্য নিয়েই তাকে সহ্য করতে না পারি, যদি আমি নিজেকে অনেকটা ত্যাগ না করতে পারি, দুই বিপরীতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস যদি আমার চেতনায় না থাকে—তবে বন্ধুত্বরক্ষা কঠিন কাজ। মনে রাখা উচিত যে, মৈত্রীও একটি শিল্প, সুন্দরতম জীবনশিল্প। সেই শিল্প অনায়াসে আপনিই গড়ে ওঠে না, পরিকল্পিত সাধনার দ্বারা তাকে রচনা করে তুলতে হয়।

বস্তুসংক্ষেপকরণ

॥ ১ ॥ অভিষেকের সমস্ত অনুষ্ঠান……এই দুই বর।

[পৃ. ৭-৮। শব্দসংখ্যা প্রায় ২৫০]

< কৈকেয়ীর প্রার্থনা >

হৃষ্টমনা রাজা কৈকেয়ীকে রামাভিষেকের সুসংবাদ দেবার জন্যে সন্ধ্যালয়ে তাঁর প্রাসাদে এলেন। কিন্তু কৈকেয়ী তখন ছিলেন রোষমন্দিরে, বিশৃঙ্খল বসনভূষণে তাঁর রোষ স্বয়ম্প্রকট। উৎকণ্ঠিত রাজা তাঁর ক্রোধ উপশম করবার জন্যে যথাবিধি জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, এবং অবশেষে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, কৈকেয়ীর যে-কোনো অভিপ্রেত বস্তু আজ তিনি দান করবেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে কৈকেয়ী দুটি বর প্রার্থনা করলেন। প্রাণপ্রিয় রামের নামে শপথ নিয়ে রাজা সেই বরদানে আজ স্বীকৃত। কিন্তু অপ্রত্যাশিত নিদারুণ দুটি প্রার্থনা তাঁর কানে পৌঁছলো। একটি বরে কৈকেয়ী রামের চতুর্দশবৎসর বনবাস দাবি করেন, আর, অন্যটিতে তাঁর দাবি ভরতের রাজ্যাভিষেক।

॥ ২ ॥ এই সময় হইতে মহারাজ……প্লাবিত হইতেছিল।

[পৃ. ১১-১২। শব্দসংখ্যা প্রায় ২২০]

< শোকাচ্ছন্ন দশরথ >

দশরথ মৃত্যুতুল্য শোকে বাক্‌রহিত, মাঝেমাঝেই এখন তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। তাঁর প্রিয়তম রাম যখন সামনে এলেন, অপরাধবোধে আচ্ছন্ন রাজা পুত্রের মুখের দিকে তাকাতে পারলেন না। তিনি কেবল গভীর বেদনাভরে রামের কথা শুনলেন। দেবতাপ্রতিম পিতার সত্যরক্ষার জন্যে রামচন্দ্রের কাছে কোনো কর্মই দুরূহ নয়, তিনি বনগমনে এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কৈকেয়ী যখন রামকে জানালেন যে, সেই বনগমনের পূর্ব পর্যন্ত দশরথ অনশনে থাকবেন, অথবা যখন দূরে সকলের ক্রন্দনরোল ও দশরথের প্রতি ধিক্কারবাক্য শ্রুত হতে লাগল, রাজা তখন বিমূঢ় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছিলেন।

॥ ৩ ॥ তখন বর্ষাকাল…… কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিলেন।

[পৃ. ১৮-১৯। শব্দসংখ্যা প্রায় ২১০]

< অন্ধমুনি-পুত্রবধ >

বর্ষাকালে এক স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় যুবক দশরথ মৃগয়ার্থে পার্বত্য জঙ্গলে ভ্রমণ করছিলেন। সেই পার্বত্যভূমি তখন প্রাকৃতিক শোভায় রমণীয় হয়ে আছে। সেখানে কোনো ঝর্ণা থেকে জল সংগ্রহ করতে এসেছিলেন এক ঋষিপুত্র। কিন্তু বিভ্রান্ত রাজা ঐ শব্দ লক্ষ্য করে হস্তিভ্রমে শরক্ষেপ করলেন। পরমুহূর্তেই মানবকণ্ঠের আর্তনাদ তাঁর ভ্রান্তিমোচন করল, অন্ধমুনির একমাত্র সরল ঐ পুত্রটির মৃতদেহ বহন করে মুনির কাছে এলেন রাজা। পুত্রভ্রমে যখন মুনি ও মুনিপত্নী দশরথকে সাদরসম্ভাষণ জানালেন, ভীত-ত্রস্ত রাজা তখন আত্মপরিচয় বিবৃত করে তাঁর মহাঅপরাধের কথা নিবেদন করলেন।

॥ ৫ ॥ কিন্তু এক হস্ত চন্দনচর্চিত……প্রয়োগ করিতে লাগিল।

[পৃ. ২৮-২৯। শব্দসংখ্যা প্রায় ২০০]

< বনবাসের আয়োজন >

কৌশল্যাসমীপে উপনীত রাম তাঁর হৃদয়ের তীব্র বেদনা গোপন করতে পারলেন না। দুঃখবাক্যে মহাবিপদের বিষয়টি তাঁকে জ্ঞাপন করলেন, জানালেন যে রাজকীয় বসনে তাঁর আর কোনো অধিকার নেই। সমস্ত সংবাদ শুনে কৌশল্যা বিপন্ন বোধ করলেন। আর্তক্রন্দনে তিনি জানালেন যে, পতিস্নেহহীন এই জীবনে রামচন্দ্রই তাঁর একমাত্র অবলম্বন, বনবাসে রামের অনুগামিনী হওয়া ভিন্ন তাঁর কোনো সুখ নেই। শোকাহতা মাতৃমূর্তি এবং সান্ত্বনাদানরত রামচন্দ্রের বিদায়প্রার্থনায় দৃপ্ত লক্ষ্মণকে ক্রমে উত্তেজিত করে তুলল, পিতার বিরুদ্ধে বাক্য প্রয়োগ করতেও তিনি দ্বিধান্বিত হলেন না।

॥ ৬ ॥ কৃষ্ণসর্প ও হিংস্রজন্তুসঙ্কুল……সম্পাদন করি নাই।

[পৃ. ৩৭-৩৮। শব্দসংখ্যা প্রায় ২০০]

< রামচন্দ্রের আত্মবিস্মৃতি >

রাত্রির অন্ধকারে গভীর অরণ্যের মধ্যে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ আজ পথহারা। হিংস্র শ্বাপদের ভয় তুচ্ছ করে এখানেই তাঁদের রাত্রিযাপন করতে হবে। এক বৃক্ষতলে আশ্রয় নিলেন তাঁরা, কিন্তু অনভ্যস্ত জীবনের প্রথম এই অভিজ্ঞতা সকলেরই পক্ষে দুঃসহ হলো। এতই দুঃসহ যে স্বভাব-উদার শ্রীরাম সহসা আত্মবিস্মৃত হলেন এবং লক্ষ্মণের কাছে অনেক পরিতাপের কথা বললেন। কামবশবর্তী দশরথ তাঁর তুল্য পুত্রকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করেন নি, দারুণস্বভাবা কৈকেয়ী হয়তো কৌশল্যাকে হত্যাও করতে পারেন। ইচ্ছা হলেই বাহুবলে এইসব দুষ্কীর্তির প্রতিকার করতে তিনি সক্ষম, কিন্তু তিনি যে সত্যবদ্ধ, তাই উপায়ান্তরহীন।

॥ ৭ ॥ কতদূরে যাইতে যাইতে……তোমার পক্ষে উচিত নহে।

[পৃ. ৫২-৫৩। শব্দসংখ্যা প্রায় ২৭০]

< আত্মত্যাগী জটায়ু >

সীতা-অন্বেষণে ব্যাকুল রাম বনপথে রাক্ষসের পদচিহ্ন, সীতার অলংকার এবং বিক্ষিপ্ত ভগ্ন যুদ্ধোপকরণ দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। রাক্ষসেরা সীতাকে আহার করেছে, এই ধারণায় তিনি বিশ্বের যাবতীয় বস্তু সংহারের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। লক্ষ্মণ অনেক সান্ত্বনাবাক্যে রামচন্দ্রকে প্রবোধ দিলেও তাঁর শান্তি ফিরে এলো না। এমন সময়ে মুমূর্ষু বিশালকায় জটায়ুকে দেখে রাম শরক্ষেপে প্রস্তুত হলেন, কিন্তু মুহূর্তমধ্যেই জটায়ুর কথায় নিজের ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে পারলেন। জটায়ু জানালেন যে, সীতাপহারক রাবণের সঙ্গে সংগ্রাম করেই তাঁর এই আসন্নমৃত্যুর অবস্থা, সীতাকে রক্ষা করবার জন্যে তিনি যথাসাধ্য প্রযত্ন করেছিলেন, কিন্তু শেষরক্ষা তাঁর পক্ষে আর সম্ভবপর হয় নি।

॥ ৮ ॥ ভরত জ্যেষ্ঠের পদতলে ……জীবন বিসর্জন করিব।

[পৃ. ৯৯। শব্দসংখ্যা প্রায় ১১০]

< ভরতের ভ্রাতৃভক্তি >

জননীকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত-চিন্তায়-ব্যাকুল ভরত বহু যত্নে, অনুনয়ে রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিতে চাইলেন, বনবাসদণ্ড নিজে বহন করতে চাইলেন। অনশন-ব্রতধারী ভরতকে কোনক্রমেই বিমুখ করতে না পেরে অবশেষে রাম তাঁকে তাঁর পাদুকা উপহার দিলেন। সেই পাদুকা শিরে বহন করে ফিরে এলেন ভরত, প্রতিজ্ঞা করলেন যে, পাদুকার প্রতিনিধিমাত্র হয়ে তিনি চতুর্দশ বৎসর রাজ্যচালনা করবেন

॥ ৯ ॥ রামায়ণে লক্ষ্মণের মত ধৈর্য সূচিত হইয়াছে।

[পৃ. ১২১। শব্দসংখ্যা প্রায় ১০০]

< লক্ষ্মণের পুরুষকার >

ভ্রাতৃপ্রেমে অন্ধ লক্ষ্মণ তাঁর সমস্ত পৌরুষ রামচন্দ্রের জন্যে সমর্পণ করেছিলেন। দারুণ বিপদেও তিনি আত্মহারা হন নি। কবন্ধকবলে গ্রস্ত হয়েও তিনি আত্মরক্ষার চেয়ে সীতা ও রামের সুখের কথাই চিন্তা করেছেন; কেবল এই অনুরোধটুকু জানিয়েছেন যে, সুখের জীবনে রাম যেন তাকে মনে রাখেন।

॥ ১০ ॥ এই উচ্চ স্পর্ধার পতন দেখিয়া শিহরিয়া উঠি

[পৃ. ১৫০-১৫১। শব্দসংখ্যা প্রায় ১৪০]

< সবনিন্দিতা কৈকেয়ী >

ভরতের দ্বারা ধিকৃত হবার পর কৈকেয়ীকে রামায়ণ-কাহিনীতে আর বড়ো দেখা যায় না। অল্প দু' একটি চিত্রে তাঁর লজ্জাকরুণ অসহায় পরিণাম কল্পনা করা যায়। অতি দীন সেই চিত্র,—সকলের দ্বারা দূষিত নিন্দিত হয়ে গর্বোন্নতা সেই রাণী আজ আত্মগোপনশীলা। শত্রুঘ্নের সমীপেই তিনি অবস্থান করেন, কিন্তু পুত্র তাঁকে কোনো প্রিয়সম্ভাষণ করে না। লাঞ্ছনার এই শোকাবহ অবস্থান যেন আদিকবিও বিশদভাবে দেখাতে সাহস করেন নি।

মর্মার্থলেখন

॥ ১ ॥ মহারাজ শিবি সত্যরক্ষার করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

[পৃ. ৯]

সত্যের প্রতি আনুগত্য যথার্থ মহত্ত্বের লক্ষণ। সত্যাশ্রয়ী জীবনকে যে সবসময়ে লৌকিক সুখের অভিমুখে নিয়ে চলে, তা বলা যায় না। বরং অনেক সময়ের সত্যবদ্ধ মানুষ দেখে, সত্যপালন কঠোরতম দুঃখযন্ত্রণার বেশে তার সামনে আবির্ভূত। কিন্তু এই দুঃখক্ষতের আশঙ্কায় বিচলিত না হয়ে যিনি প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থাকেন, তাঁরই মহিমা জগতে ঘোষিত হয়।

॥ ২ ॥ দেশপর্যটনে মনের ভার প্রফুল্ল হইলেন।

[পৃ ৩৫]

সঙ্কীর্ণতার বন্ধনে মনের মধ্যে নৈরাশ্য ও ক্লান্তির বোঝা জমে ওঠে। বহির্জগতের মধ্যে আত্মপ্রসার করতে পারলে এই ক্লান্তির অপনোদন সম্ভব হয়।

প্রকৃতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ও বিচিত্র দেশের অভিজ্ঞতা মানুষকে তার সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী থেকে মুক্ত করে দেয় এবং তার হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত গ্লানিকে ধীরে ধীরে স্নেহভরে সরিয়ে দেয়। দেশভ্রমণ তাই ব্যথাহত চিত্তের মহৌষধ।

॥ ৩ ॥ ভরত যদি সত্য সত্যই····· অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করি।

[পৃ. ৪১]

যুদ্ধে জয়লাভ সুকাম্য বটে, কিন্তু আত্মীয়বর্গের সঙ্গে যুদ্ধ অপরাধ। নিকট-আত্মীয়কে যদি শত্রুরূপে গণ্য করিতে হয় এবং তাকে নিধন করে যদি স্বর্গসুখও লাভ করতে হয় তবে সে-সুখের বা জয়কীর্তির কী মূল্য আছে! সত্যকার বীর এবং মহানুভব ব্যক্তি সুহৃৎ-স্বজনের বিনাশ কামনা করেন না, বরং তার পরিবর্তে আত্মত্যাগ তাঁর কাছে অনেক বেশি করণীয় বলে বোধ হয়।

॥ ৪ ॥ মনুষ্যের সুদৃশ্য দেহ··· এখন আমার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

[পৃ. ৪২-৪৩]

জীবন অনিত্য। চিরপ্রবহমান জীবনধারা মৃত্যুর অভিমুখে নিশ্চিত ধাবিত হচ্ছে, তার গতি রোধ করবার ক্ষমতা আমাদের আয়ত্তের অতীত। যা নিশ্চিত, স্থিরভাবে তাকে মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অতীত প্রত্যাবৃত্ত হয় না, মৃত্যুর প্রতিরোধ নেই—একথা জেনে মৃতের জন্য হাহাকার শমিত হয়। জীবনের মধ্যে যে আত্মীয়তা গড়ে ওঠে সে তো কেবল দৈবপ্রভাবে, সেই অলৌকিক প্রভাবেই আবার তা মৃত্যুদ্বারা ছিন্ন হয়ে যাবে। এই জ্ঞানে যাঁর মন দৃঢ় হয়েছে, তিনি শোকতাপহীন প্রশান্তচিত্তে জীবনের কর্তব্যগুলি সমাপন করে যান।

॥ ৫ ॥ সংগীতের ন্যায় মানবজীবনেরও ·····উহা আবিষ্কৃত হয়।

[উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬০] [পৃ. ৮৫]

যে-কোনো একটি ব্যক্তির জীবনে অসংখ্য ঘটনা এবং চরিত্রের সমাবেশ হয়, বিচিত্র আচরণের মধ্যে সেই ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই বৈচিত্র্যের সমাবেশে কখনো কখনো পরস্পর বিরোধিতা লক্ষ্যগোচর হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু আপাতদৃষ্টির এই বিরোধিতার অন্তরালে সেই চরিত্রের একটি মূল সত্য, প্রকৃত পরিচয় প্রচ্ছন্ন থেকে যায় সমস্ত আচরণের মধ্যে মাঝেমাঝেই সেই মূল পরিচয়টি প্রকাশিত হয় এবং ব্যক্তিচরিত্রটি আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

॥ ৬ ॥ তুমি কি এই কার্য······দৈবের প্রশংসা করিতেছেন?

[উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬১] [পৃ. ১১৪-১১৫]

জীবনের ঘটনাবলীকে বিচার করবার দুই স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি আছে। অনেকে মনে করেন যে, সমগ্র ঘটনার অন্তরালে কোনো এক মহাশক্তি সতত সক্রিয়। এ

শক্তির নাম দৈব। কখনো মানুষ দেখে যে, তার সুপরিকল্পিত অপ্রত্যাশিত জীবন সহসা অপ্রত্যাশিত আঘাতে ভেঙে পড়ছে। দৈবলীলা বলেই অনেকে একে মেনে নিতে অভ্যস্ত। কিন্তু অপর আরেকদল বলবেন, আত্মপৌরুষের দ্বারা প্রতিকূলতার সঙ্গে যিনি সংগ্রাম করতে পারেন না, সেই দুর্বলের পক্ষেই দৈবের উচ্চারণ সম্ভব। যথার্থ পুরুষ লৌকিক অপরাধের প্রতিক্রিয়া লৌকিক উপায়ে সম্পন্ন করতে চান, দৈবকে লক্ষ্য করবার দম্ভ প্রকাশ করাতেও তিনি কখনো অপারগ নন।

॥ ৭॥ আজ আমরা স্বেচ্ছায় · · ভাবিতে ভুলিয়া যাইতেছি।

প্রকৃত সৌহার্দ্যের শিক্ষা মানবজীবনের এক বড়ো শিক্ষা; আধুনিক কালে আমরা সেই সৌহার্দ্যের অনেক তত্ত্বকথা বলি, বিশ্বমৈত্রীর মন্ত্র উচ্চারণ করি। কিন্তু যে-লোক আপন-ঘরে মৈত্রী রচনা করিতে জানে না, সে কেমন করে বিশ্বমৈত্রীর সেতু স্থাপন করবে? আমাদের জীবনে একদিন যে পারিবারিক সম্প্রীতি, বিশেষত ভ্রাতৃবাৎসল্য ছিল—যার সুন্দরতম উদাহরণ রামলক্ষ্মণের কাহিনী—সেই প্রীতির বন্ধন আজ কোথায়? বাঙালির জীবনে একান্নবর্তীপ্রথা ভেঙে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, এক মহাস্বার্থপরতার চক্রান্তে আমরা প্রত্যেকে ঘূর্ণিত। ভ্রাতার দুঃখে আমরা সহমর্মী নই, ভ্রাতার সুখে আমাদের হৃদয়ের কোনো অংশ নেই। আপন ভ্রাতাকে যে দূর করে দিয়েছে, বিশ্বজনকে সে কেমন করে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ করবে?

< ভাবসম্প্রসারণ >

॥ ১ ॥ করম-বিপাকে গতাগতি পুনপুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ।—প্রার্থনা। [পৃ. ১]

আমাদের ধর্মদর্শনে বলে, এই জীবন মায়াময়, অসার। সাংসারিক বিচিত্র দুঃখতাপ ও মোহবন্ধের দ্বারা আমরা জীবকুল নিত্য-আচ্ছন্ন। এই মোহ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? পরম-ঈশ্বরের ধ্যান এবং তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার সাধনা আমাদের এই ইহজীবনের অবিদ্যা থেকে মুক্ত করতে পারে। কিন্তু এত সহজে তো জীব তার স্রষ্টার মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে পারে না—তার জন্যে অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত অধ্যবসায় ও অশেষ সুকৃতির প্রয়োজন। আমাদের ধর্ম জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তাই, এ-কথা মনে করার কোনো হেতু নেই যে মৃত্যুই আমাদের পরিত্রাণ। জীবনের দাহ এবং অজ্ঞানতা থেকে মৃত্যু মুক্তি দেয় বটে, কিন্তু আবর্তমান জীবনচক্রে আবার নতুন জন্মে আমরা ফিরে আসি। জন্ম থেকে মৃত্যু, আবার তার থেকে জন্ম—এই হলো সেই চক্র। ভাগীরথীর উৎস ও পরিণতি বর্ণনা করে আচার্য জগদীশচন্দ্র ধ্বংসসৃষ্টির এই যুগল রূপটিকেই একদিন উপলব্ধি করেছিলেন।

একেবারে মুক্তি কি তবে সম্ভব নয়? সাধকশ্রেষ্ঠরা তা বলেন না। বহু জীবনের সুকৃতি অর্জনের দ্বারা ক্রমে আমাদের সকল অবিদ্যা যদি দূরীভূত হতে থাকে, কর্ম-বিপাকের যদি অবসান হয়, সুকৃতির পুণ্যকর্মফল-হিসেবে তবে আমাদের মোক্ষ বা নির্বাণ আয়ত্তে আসে। কিন্তু এই ফললাভ দুরূহতম আত্মসাধনার বিষয়। এমন-কী, বৌদ্ধজাতকের কাহিনীগুলিতে এই তো দেখানো হয় যে, বুদ্ধকেও তাঁর পরম নির্বাণ-লাভের পূর্বে কত অসংখ্যবার কায়াপরিগ্রহ করতে হয়েছিল।

তাই পৃথিবীতে পৌনঃপুনিক যাওয়াআসার এই আবর্তন যদি মেনে নিতে হয়, মানুষের পক্ষে একমাত্র করণীয় ঈশ্বরধ্যানে চিত্তনিবেশ করা হয়তো এক জন্মে নয়, হয়ত জন্মজন্মান্তরে মোক্ষলাভ সম্ভব। কিন্তু প্রতি জন্মই সেই লক্ষ্যের প্রতি আমাদের ঈষৎমাত্র অগ্রসর করে দেবে, এই বিশ্বাস মনে রেখে পরম স্রষ্টার কাছে আত্মনিবেদনে আমাদের জীবন ব্যাপিত হওয়া উচিত। সৎপ্রসঙ্গ সদাচরণ ক্রমে আমাদের কর্মদোষ দূর করে দেবে।

॥ ২ ॥ আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।—ঈশ্বরী পাটনী।
[উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৭৪] [পৃ. ১৯]

প্রত্যেক মানুষ মনে মনে ঈশ্বরের প্রতি এক সুগভীর অভিমান পোষণ করে। সে মনে করে, ঈশ্বর তাকে তার প্রাপ্য সামগ্রী থেকে কেবলই বঞ্চিত করে

রেখেছেন। কোনোদিন যদি আমার জীবনবিধাতা আমার সম্মুখে এসে আশীর্বাদের বরাভয় নিয়ে দাঁড়ান তবে সেই সমস্ত প্রাপ্য হয়তো আমি প্রার্থনা করে নিতে পারি।

কিন্তু হায়, মানুষ কখনো ভাবেনা যে প্রার্থনাই পৃথিবীতে সকলের চেয়ে কঠিন। যদি ঈশ্বর এসে জিজ্ঞাসা করেন কী তুমি চাও, তার কী উত্তর দেবে মানুষ? সে কি ভেবেছে, যে, এই দুর্নিরীক্ষ্য প্রশ্নের কোনো শেষ উত্তর নেই? প্রথমে মনে হয় বটে, আমি ধনজনমান হাত পেতে নেব; কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখি সে-আকাঙ্ক্ষার কোনো শেষ নিবৃত্তি নেই। যতই পাওয়া যায়, আকাঙ্ক্ষা ততই আরো অশান্ত হয়ে ওঠে, ক্ষোভ অভিমান ও অহংকারে ততই আরো পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে মানবহৃদয়।

বস্তুর সন্তোষই জীবনের দুর্লভতম বস্তু। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী স্মরণ করা যেতে পারে। ঈশ্বর তাঁর সেরা সামগ্রীগুলির ব্যবহারে মানুষ সৃষ্টি করলেন এবং পৃথিবীতে তাদের স্থাপন করলেন। তখন তাঁর মনে হলো, এই বহুশক্তিভূষিত মানুষ কি তবে তার স্রষ্টাকে কখনো আর মনে করবে? তাই, মানুষের হৃদয়ে আরেকটি সামগ্রী তিনি মিশ্রিত করে দিলেন—অসন্তোষ। অসন্তোষের বশেই মানুষ নিত্য ধাবমান্ হয়ে পরম চরিতার্থকে অন্বেষণ করে বেড়াবে, কিন্তু তার শেষ পাবে না, এই হলো মানুষের প্রতি বিধাতার চরম অভিশাপ।

এ-অভিশাপ থেকে যে মুক্ত হতে পারে তার চেয়ে ভাগ্যবান্ আর কেউ নয়। সন্তোষ তার করায়ত্ত, জীবনে তার অপরিমেয় সুখ। কিন্তু কেমন করে এই সন্তোষ অর্জন করা যায়? আমার জন্যে এবং আমার পরিবার-পরিজনের জন্যে বিলাসদ্রব্যের সর্ববিধ আয়োজন একরকম সুখ দেয় বটে, কিন্তু সেই সুখের তো কোনো স্থায়িত্ব নেই। গভীরতর অর্থে তাকে সুখও বলা যায় না, তা বরং নতুন নতুন দুঃখেরই উৎপাদক। কিন্তু ন্যূনতম প্রয়োজনের মধ্যেই যদি আমার চিত্ত নিহিত করতে পারি আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনা যদি আমি দূর করে দিতে পারি, তার চেয়ে সুখকর আর কিছু নয়। কতটুকু প্রয়োজন মানুষের? জীবনধারণ করার মতো সামগ্রীই তো তার পক্ষে যথেষ্ট। বিলাস-উপকরণহীন সহজ স্বচ্ছন্দ দৈনন্দিনতায় বাঙালিচিত্তের একটি অংশ অত্যন্ত তৃপ্তিভরে জীবন অতিক্রম করে যায়। 'আমার ঘরে চাল আছে আর গাছে তেঁতুলপাতা আছে, আর আমার কিসের প্রয়োজন'—দানোন্মুখ কৃপালু রাজার উদ্দেশ্যে এই শান্ত কথাগুলি আমাদের দেশের পণ্ডিত অনায়াসেই উচ্চারণ করতে পেরেছেন। বিলাসবহুল আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতা এই তৃপ্তি অনুভব করতে পারেনা, এই তার অভিশাপ। বাপুজীর একটিমাত্র বস্ত্রাবরণ দেখে পরিহাস করে [illegible]সমাজ বলেছে—'প্রাচ্যের ঐ অর্ধনগ্ন ফকির।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা [illegible]ছে, সেই ফকিরের আত্মিক শক্তি ও প্রশান্তির কাছে জগৎ শিক্ষার্থীর মতো [illegible]। বিধাতা যদি আজ আমাদের কাছে তাঁর দানপাত্র নিয়ে

সত্যিই উপস্থিত হন, আমরা যেন এই বিনত উচ্চারণের দ্বারা আমাদের সমগ্র সন্তোষ আয়ত্ত করে নিতে পারি। আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

৩॥ সিন্ধুমূলে জলবিন্দু বিশ্বমূলে অণু সমগ্রে প্রকাশ।

—মানববন্দনা। [পৃ. ৮২]

বৃহৎ বস্তু সহজেই দৃষ্টিগোচর। তাই বৃহতের প্রতি আমাদের এক অনায়াস শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়। একের চেয়ে বহু; ব্যক্তির চেয়ে দল, অল্পের চেয়ে অধিক আমাদের কাছে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। প্রকৃতির একটি ছোটো ফুলকে যে আমরা অনাদর অবহেলা করি এমন নয়, কিন্তু অনেক বেশি মহিমার অধিকারী বলে মনে করি পাহাড়সমূদ্রের বিশালতাকে।

কিন্তু ছোটো মানেই কি অবজ্ঞেয়? ছোটো বলেই কি সহজ? রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাপঙ্‌ক্তি মনে পড়ে, বিধাতার প্রবল শক্তিতে পাহাড় এই উচ্চচূড়া তুলেছে বটে, কিন্তু ঈশ্বর 'লক্ষ যুগের স্বপ্নে পেলেন প্রথম ফুলের গুচ্ছ'।

বস্তুত অল্পের মধ্যেই বিরাটের শক্তি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। বঙ্কিমের কমলাকান্ত যেমন অনুভব করেছিল, বিন্দু বিন্দু জল নিয়েই সমুদ্রপ্রবাহ—'আমি এ বারিবিন্দু সমুদ্রে মিশাই না কেন? প্রতিটি বিন্দুর মধ্যে যদি গুণ না থাকে, তবে তার সমবায়েই-বা গুণের উৎপত্তি হবে কেমন করে? শূন্যের সঙ্গে যতই শূন্য যোগ করি না কেন, ফল তো শূন্যই থেকে যায়। সংখ্যার সঙ্গে সংখ্যা যোগ করতে করতেই ক্রমে সংখ্যা হয়ে ওঠে বিরাট।'

বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপিতাকে বলা হয়েছে 'মহতো মহীয়ান্'। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার 'অণোরণীয়ান্'। মহতের চেয়ে মহৎ তাঁকে আমরা যতটা মনে রাখি, অণুর চেয়ে অণু তাঁকে ততটা আমরা লক্ষ্য করি না। তাই হয়তো প্রতি জীবকে, সৃষ্টির প্রতি উপাদান-কণিকাকে অপমান করেও আমরা সমগ্র সৃষ্টি বা স্রষ্টাকে ভালোবাসবার ভাণ করি। আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমে দেখিয়েছে, বস্তুর এই উপাদানের ক্ষুদ্রতম একক কোথটি কোথায়। বিজ্ঞান তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, পরীক্ষা করে দেখেছে, এবং আজ আমরা তার প্রসাদে জানি যে, আণবিক শক্তিই পৃথিবীর প্রচণ্ডতম শক্তি, তার প্রবল ঘূর্ণনেই নির্মিত হয়ে আছে দৃশ্যগোচর বিরাট বিশ্বজগৎ।

পিতার মহাকারবার এই জিন-দুনিয়াটা,
মানুষই তাঁহার মহা মূলধন, কর্ম তাহার খাটা।

—চাষার ঘরে। [পৃ. ১১৪]

পৃথিবীতে মানুষের সীমাহীন অপমান। একদিকে একশ্রেণীর মানুষ ধনসম্পদের গরিমায় উচ্চচূড়াধিষ্ঠিত, অন্যদিকে সাধারণ মানবজনতা তাদের দ্বারা অবহেলিত, লাঞ্ছিত। ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে তার অধিকার উপলব্ধি করে না অধিকাংশ মানুষ। ঈশ্বর-উপলব্ধির অর্থ কী দাঁড়াবে থাকে যদি সে তাঁর সৃষ্টিকে সম্মান না করে?

রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির ভগবৎ-প্রেমানুভূতির মধ্যেও তাই মনে করিয়ে দিতে ভোলেন না যে :

তিনি গেছেন, যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ।

মানুষকে তাই উপলব্ধি করতে হবে তার আত্মমর্যাদা এবং আত্মশক্তি। ঈশ্বরের কী অভিপ্রায়? তিনি চান, কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ তার জীবনকে সুরচিত করবে। কর্মেই তোমার অধিকার, একথা কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গণে অর্জুনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। আধুনিক এক কবির উচ্চারণে শুনি, 'বিশ্বকর্ম যেথায় মত্ত কর্মে হাজার করে সেথা যে চারণ চাই'। কর্মযোগের চারণ হিসেবে মানুষ যদি দলে দলে অগ্রসর হয়ে আসে, তবেই তো আত্মঅবমাননার অপরাধ থেকে সে মুক্তি লাভ করবে।

৫॥ পায়ের তলার ধুলা সেও যদি কেও পদাঘাত করে,
নিমেষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি তার শিরোপরে।
—চাষার ঘরে। [পৃ. ১৪]

সমস্ত বস্তুর সমান মূল্য নয়, সমান প্রয়োজন নয়। কিন্তু মূল্যভেদে মর্যাদার নির্ণয় হয় না। আপন আপন অধিকারে আপন আপন ভূমিতে সকলেই সমান-মর্যাদার অধিকারী। ও-লোকটা আমার চেয়ে বেশি উপার্জন করে, অতএব আমি অতি তুচ্ছ—ব্যর্থ, এই ভাবনা মহাপাপের তুল্য। কেননা, এই ভাবনা আমাদের মনে এক নীচ দীনতাবোধ সঞ্চার করে দেয়, ক্রমে আমাদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট [illegible] হয়ে আসে।

আত্মবিশ্বাসই শক্তির মূল উৎস। সেই বিশ্বাস নাশ হলে আমরা সর্বতোভাবে দুর্বল হয়ে পড়ি। তখন বহির্বর্তী শক্তিমানের দল সহজেই আমাদের ঘৃণা করে, লুণ্ঠন করে, লাঞ্ছনা দেয়। আর আমরা হয়তো এই প্রাপ্যকেই নিয়তিনির্ধারিত বলে গণ্য করে নীরবে অশ্রুপাত করি।

কিন্তু যে অত্যাচারী, পরপীড়ক, তার মনে রাখা উচিত যে ক্রমিক এই লাঞ্ছন অবশেষে প্রতিশোধরূপে প্রত্যাঘাত হয়ে ফিরে আসতে পারে। উপেক্ষা হয়তো সহ্য করা সম্ভব, কিন্তু অকারণ আঘাত সহ্য করার মতো মূঢ়তায় মানুষ চিরকাল অব থাকে না। অন্যায় কি আমরা সহ্য করব? তাহলে তো আমরা অন্যায়কারীর মতোই ঘৃণ্য কাপুরুষ বলে গণ্য হব—'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে'। দেশে দেশে যুগে যুগে এই অন্যায়ের প্রতিকারকহিসেবে গণঅভ্যুত্থান তাই আমরা দেখতে পাই। প্রবল শক্তিমত্তায় শাসককু [illegible] নিশ্চিন্ত উচ্ছৃঙ্খলতায় ভেসে যায়, তখন আকস্মিক আঘাতের মতো জেগে ও সমাজের দুর্বল জনসাধারণ। প্রচণ্ড প্রতিশোধের প্রতিহিংসায় তখন আর সে দুর্ব নেই, আর [illegible] আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। ফরাসী বিপ্লবের কালে, রুশবিপ্লবে [illegible] [illegible] আমাদের এই সত্যেরই ইঙ্গিত দিয়েছে। আবার, আমাদের দে

পরাধীনতার দুঃস্বপ্নের দিনে যে জাগ্রত জনআন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তারও কথা মনে পড়ে যাবে এই সূত্রে।

॥ ৩॥ নাই ভগবান, নাইক ধর্ম যাদের শিক্ষামূলে,
ছিন্নমস্তা শিক্ষা সে শুধু শয়তানী ইস্কুলে।

চাষার ঘরে। [পৃ. ৭২. ৫]

আধুনিক সভ্যতা মূলত প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে পশ্চিমী জীবনদর্শনের ওপর। য়ুরোপের জীবন ইহমুখী, পার্থিব সুখসম্পদের কামনা ও প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের পরমতম আদর্শ বলে গণ্য করে য়ুরোপ। এরই থেকে জন্ম নিয়েছে মেটেরিয়ালিজম, এক বস্তুবাদী ভোগসর্বস্ব দার্শনিক চিন্তা। বর্তমান শতাব্দীতে এই চিন্তা যে কেবল য়ুরোপকেই আচ্ছন্ন করে আছে তা নয়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য-নির্বিশেষে সমগ্র জাগতিক সভ্যতার ওপরে অধুনা তার প্রভাব।

সভ্যতার প্রাণমন্ত্রের ওপরই নির্ভর করে শিক্ষাবিধি। জীবন পথের উপযোগী করে তুলবার যোগ্য করে রচিত হয়েছে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা। তাই, দেশিবিদেশি শিক্ষাপদ্ধতি কেবল শিক্ষার্থীর ঐহিক সুখতৃপ্তিকেই লক্ষ্য করে অগ্রসর হয়েছে, তার আত্মিক উন্নয়নের পরিকল্পনা এই ব্যবস্থায় দূরীকৃত।

অথচ ভারতীয় শিক্ষাবিধিতে একদিন এই অপুষ্ট অপূর্ণ রীতি প্রচলিত ছিল না। শিক্ষার কাল ছিল ব্রহ্মচর্যের কাল, আত্মিক কৃচ্ছ্রসাধনার কাল। শিক্ষার স্থান ছিল তপোবন-পরিবেষ্টনে গুরুগৃহ। এ তো কেবল হিসেবে-বাঁধা অল্প কয়েকদণ্ডের শিক্ষালাভ নয়, সূর্যোদয় থেকে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত দীর্ঘ দিবারাত্রির সম্পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন। শিক্ষার দ্বারা তখন সম্পন্ন হতো একটি সামগ্রিক চরিত্রগঠন; এবং বলা বাহুল্য, চরিত্রের সমগ্রতা রক্ষার জন্যে বস্তুবোধও ছাত্রের পক্ষে যতটা জরুরি ছিল, আত্মবোধও ঠিক ততটাই। স্রষ্টাকে না জানলে সৃষ্টি জানা যায় না, এই সত্য মনে রেখে ভগবৎ-চিন্তা শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গরূপে বিবেচিত হতো।

কিন্তু বস্তুবাদী আধুনিক সভ্যতায় ভগবানের স্থান কোথায়, ধর্মের স্থান কোথায়! ভগবানের পরিবর্তে এখন স্বর্ণমুদ্রা, আর, ধর্মের পরিবর্তে বিজ্ঞান আমাদের সমস্ত দৃষ্টি হরণ করে নিয়েছে। আমরা এখন আর উপলব্ধি করি না যে, আধুনিক শিক্ষা আংশিক শিক্ষা। মানুষকে খণ্ড খণ্ড করে যেন ছিন্ন করা হয়েছে, তার চরিত্রের সমগ্রতা এখন বিনষ্ট হয়ে গেছে। এই ছিন্নমস্তা-শিক্ষার অভিশাপ বিদূরিত করতে না পারলে মানবসমাজের মঙ্গল দূরপরাহত।

॥ ৪ ॥ জগৎজননী মা যদি না হতো খোপাটি পেত কি খোঁটা
গোলাপ পেত কি রাঙা চেলি তার—কদলী গরব গোটা।

—ভক্তির মুক্তি। [পৃ. ১২৮]

পৃথিবীর প্রকৃতিসৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনের মধ্যে মোহসঞ্চার হয়। এত সৌন্দর্য সৃষ্টি করল কে? যেদিকেই তাকাই না কেন, এক অসীম সংবেদিতে

পরিপূর্ণ হয়ে আছে দৃশ্যজগৎ। উদ্ভিদ্‌জগৎ এবং জীবজগৎ সর্বত্রই এই সংগতি, যেন কোনো নিপুণ চিত্রকরের তুলিকাতে সৃষ্ট হয়েছে, সামঞ্জস্যে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে বিশ্ব-পটের চিত্রখানি।

কিন্তু চিত্রকরের এই উপমাটিও যথেষ্ট নয়। স্রষ্টার যে-সকাতর স্নিগ্ধ-মমতার আভাস পাওয়া যায় সমস্ত বিশ্ববস্তুর অন্তরালে, তাতে স্রষ্টাকে সুবৎসল অন্তঃকরণের কোনো মানবমূর্তি অথবা মানবীমূর্তি বলে বোধ হয়। নারীর অন্তঃকরণের গভীরতা নিরূপিত হয় তার স্নেহের পরিমাণে। যে-অপরিমেয় স্নেহধারায় বিশ্ব-গঠন সম্ভব হয়েছে, তাতে স্রষ্টা সম্পর্কে একটা মাতৃত্বের ধারণা আমাদের মনে সহজেই গড়ে ওঠে।

সৃষ্টিশক্তিকে এই মাতৃস্বরূপে বন্দনা করা বাঙ্‌লাদেশের পক্ষে সবচেয়ে সার্থক। অপরাপর সভ্যতার চেয়ে ভারতীয় সভ্যতাতেই মাতৃকাতন্ত্রের প্রচলন বেশি, খ্রীস্টান যে-আবেগে পরমপিতাকে আহ্বান করেন, হিন্দুজাতি সেই গাঢ়তম আবেগে উচ্চারণ করেন মাতৃনাম। কিন্তু ভারতেরও অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে যেন বাঙ্‌লাদেশের পল্লী-জীবনাশ্রিত সাধনাধারায় এই মাতৃ-আহ্বান সত্যতম রূপে ধরা দিয়েছে। এরই চূড়ান্ত ফল প্রত্যক্ষ করি রামপ্রসাদের আবেশবিহ্বল গানগুলিতে।

কেন এই মাতৃস্বরূপে আহ্বান? প্রাত্যহিক জীবনে দেখি, মা তাঁর সন্তানের মঙ্গলের জন্যে কেবলই উৎকণ্ঠাকাতর। সেখানে একের সঙ্গে অপরের ভেদ নেই, প্রত্যেকেরই সমান মর্যাদা। সাজসজ্জায় খাদ্যপানীয়ে রক্ষণাবেক্ষণে বেষ্টন করে রেখে প্রত্যেক সন্তানের পিছনেই মা যেন তাঁর স্নেহবিহ্বল চিত্তখানি পাঠিয়ে দেন। বিরাট প্রাকৃতিক জীবনেও এই যে সংগতি, সৌন্দর্য, নীতিনিয়ম—একজন কারো সজাগ স্নেহ-দৃষ্টি-এর পিছনে সতত সঞ্চরমান না থাকলে এ কি কখনোই সম্ভব হতে পারত? তাই, ভক্তসাধক তাঁর আপন যুক্তিতে অনুভব করে নেয় যে, জগৎপালক মূলত স্ত্রী-স্বরূপিণী, মাতৃস্বভাবা। সেই জগৎজননীর করুণাবশেই পৃথিবী এত মধুর।

বস্তুসংক্ষেপকরণ

॥ ১ ॥ সুধা ছানিয়া কেবা······দেখে যুগে যুগে। [পৃ. ৫-৬]

—শ্যামসুন্দর। [শব্দসংখ্যা প্রায় ১০০]

শ্যামের দেহ যেন অমৃতে রচিত। চাঁদের থেকে তাঁর মুখ, জবাফুল থেকে তাঁর কপোল সৌন্দর্য সঞ্চয় করেছে। তাঁর ওষ্ঠ বিম্বফলের চেয়ে, হাত হাতীর শুঁড়ের চেয়ে, কণ্ঠ কম্বুর চেয়ে, স্বর কোকিলের চেয়ে সুন্দর। পাষাণবিস্তৃত বক্ষপট এবং কদলীবৃক্ষের মতো উরুতে শ্যামের সৌন্দর্য যুগ যুগ ভক্তচিত্তকে মোহিত করে

॥ ২ ॥ দিনে দিনে বাড়ে……টোপর দেয় শিরে। [পৃ. ৭-৯]
—কালকেতুর বিক্রম। [শব্দ সংখ্যা প্রায় ১৫০]

রূপে-বলে কালকেতু ক্রমে অমিত যৌবনের অধিকারী হয়ে ওঠে। তা সুন্দর অবয়ব, তার অনুপম গুণাবলী। তার কপালে কালো চুল, গলায় জালের কাঠি মণিবন্ধে লোহা; বিশাল বক্ষ, সুন্দর মুখ, আকর্ণবিস্তৃত চোখ—যেমন বীরে আকৃতি, তেমনই বীরের সজ্জা। সমবেত বন্ধুমণ্ডলীতে সহজেই তাকে প্রধান বলে চেনা যায়, সকলেই তার শক্তিতে সহজে অভিভূত হয়ে পড়ে; সর্বলক্ষণ পরিপূ দেখে ব্যাধনন্দন কালকেতুকে ধনুক অর্পণ করে দীক্ষা দেওয়া হলো।

॥ ৩ ॥ চেতন পাইয়া নাথ……ভিখারী রাঘবে। [পৃ ৩১-৩৩]
—রামের বিলাপ। [শব্দসংখ্যা প্রায় ৩৯০]

নিশ্চেতন লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে রাম তাঁর কাতর বিলাপোক্তি উচ্চারণ করছেন লক্ষ্মণ তাঁর চিরসামরিক প্রহরার মতো পাশে পাশে অতন্দ্র হয়ে থেকেছেন, বনবাসে জীবনে তিনিই ছিলেন রামচন্দ্রের ঐকান্তিক সহায়। কিন্তু তাঁকে আর সীতাকে যেন বিস্মৃত হয়ে আজ এহেন লক্ষ্মণ সৈন্যবেষ্টিত অবরোধের মাঝখানে বিগতজীবন কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব হলো? সীতা-উদ্ধারের ব্রত, পাপীর শাস্তিবিধানে কর্তব্য অবহেলা করে কেমন করে চলে গেলেন লক্ষ্মণ? তিনি কি জানেন না যে তাঁর অবর্তমানে, রাঘবপক্ষের সকলেই নিতান্ত পঙ্গু শক্তিহীন?—যদি তিনি জীবন ফিরে পান, রাম তবে সীতা উদ্ধারের ব্রতও ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন। কেননা কেবল তো তাঁর আত্মবেদনা নয়, লক্ষ্মণহীনভাবে যদি তিনি অযোধ্যায় পুনঃপ্রবেশ করেন, সুমিত্রা, উর্মিলা এবং পুরবাসীজনকে কী বলে তিনি প্রবোধ দেবেন? যে দেবতাকে নিত্য আরাধনা করেছেন রাঘব, তাঁর কাছে তিনি লক্ষ্মণের পুনর্জীবনের জন্যে কাতর প্রার্থনা নিবেদন করছেন।

॥ ৪ ॥ বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল……বঙ্গে বিজয়-ঘোষণা। পৃ. ৫৫-৬০] 9
—পলাশীর যুদ্ধ। [শব্দসংখ্যা প্রায় ৩২৫]

বৃটিশসৈন্য এবং নবাবসৈন্য মুখোমুখি যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। রণবাদ্য ধ্বনি হলো, বৃটিশকামান থেকে অতর্কিত একটি গোলা এসে মীরমদনের প্রাণ হরণ করল। বৃটিশদল আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠল, আর আকস্মিক এই বিপদের মুখে নবাবসৈন্যরা ভীতত্রস্ত হয়ে পলায়নের আয়োজন করল। তখন মোহনলাল বীরোচিত উৎসাহবাক্যে তাদের ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন। রণভূমি থেকে দূরে গেলে যে জীবনরক্ষা করা সম্ভব হবে, এমন তো নয়। আর যদি তা হয়ও তবু ক্ষাত্রধর্মে এই অপমানের পর কেমন করে তারা স্বজনসমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে সেনাপতি এবং তাঁর সৈন্যদল কেন যে নিষ্ক্রিয় পুতুলের মতো স্তব্ধ হয়ে আছে বাঙলার স্বাধীনতা বিপন্ন দেখেও কেন তারা যুদ্ধে অগ্রসর নয়, তা বোঝা যায় না এই বীরবাক্যে অনেকের চৈতন্য হলো, আবার তুমুল সংগ্রামের সূত্রপাত হলো

কিন্তু ইংরেজ পক্ষের পরাজয় আসন্ন বলে যখন মনে হচ্ছে, হঠাৎ সে-সময়ে যুদ্ধবিরতির আদেশ ঘোষিত হলো। নবাবসৈন্য বিমূঢ় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতেই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বৃটিশসৈন্য তাদের ধ্বংস করে ফেলল। এমনি করে তাদের বঙ্গবিজয় সম্পন্ন হলো।

॥ ৫ ॥ নিম্নে যমুনা বহে .... আছে ওই নদীতলে। [পৃ. ৮৯-৯২]
—নিষ্ফল উপহার। [শব্দসংখ্যা প্রায় ২২৫]

একদিকে পর্বতশ্রেণী, অন্যদিকে যমুনার প্রবাহ। মাঝখানে শালতালের বনশ্রেণী। পথচিহ্নহীন জনমানবহীন এই গহন ভূমিতে শিখগুরু ভগবৎচিন্তায় মগ্ন, সেখানে এসে উপস্থিত হলেন শিষ্য রঘুনাথ। তিনি সঙ্গে এনেছেন গুরুপ্রণামী, কনক হীরকে গাঁথা দুটি বলয়। প্রোজ্জ্বল এই বলয়দুখানি ভালো করে দেখলেন গুরু, ঈষৎ হেসে আবার তিনি পাঠে মনোনিবেশ করলেন। এমন সময়ে একটি বলয় নদীজলে গড়িয়ে পড়তেই হাহাকার করে উঠলেন রঘুনাথ, জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু সমস্ত দিনের ব্যাকুল পরিশ্রম বৃথা হলো, শ্রান্ত সিক্ত রঘুনাথ উঠে এসে অচপল প্রশান্ত পাঠরত গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন: কোথায় পড়েছে সেই বালাটি। অপর বালাটি জলে নিক্ষেপ করে গুরু হতচকিত রঘুনাথকে তার স্থান নির্দেশ করে দিলেন।

॥ ৬ ॥ তরী হতে অবতরি · আপনার কুটিরের পানে। [পৃ ১৪৩-১৪৬]
—বাঙালির সাধ। [শব্দসংখ্যা প্রায় ৩১০]

দেবী-মহেশ্বরী ভবানন্দ-গৃহাভিমুখে চলেছেন, তাঁর অনুসরণ করছে পাটনী ঈশ্বরী। পারের কড়ি সে পেয়েছে. কিন্তু ঈশ্বরী তাঁর পরিচয় না জেনে নৌকায় ফিরে যাবে না। এ নারী যে সামান্য নয় তা সে অনুভব করেছে। দেবী যে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন তা সত্য নয়। কুলীনকন্যা, স্বামী সতীনের সঙ্গে কলহ করে আশ্রয়-সন্ধানে চলেছেন, সেই আত্মপরিচয় থেকে এইমাত্র বুঝেছিল পাটনী। তখন দেবী জগদীশ্বরী তাঁর যথার্থ পরিচয় দিলেন, ঈশ্বরীর ওপর তুষ্ট হয়ে তাকে বরদান করতেও চাইলেন। ঈশ্বরী অন্নপূর্ণার কাছে অল্পই আকাঙ্ক্ষা জানাল, তার সন্তান যেন মোটামুটি খেয়ে-পরে বাঁচে এই তার প্রার্থনা। এই মাত্র? মোক্ষ, মুক্তি, চির-স্বর্গবাস, ধনৈশ্বর্য আর অথবা অতুল রাজ্যধন এসব কিছুই নয়। না, ঈশ্বরীর ওই অলৌকিক সম্পদগুলিতে কিছু প্রয়োজন নেই, তাতে আরো দুঃখ বাড়ে। সে শুধু সন্তোষ চায়, আর কিছু নয়। অন্নপূর্ণা সেই বর তাকে প্রসন্নচিত্তে দান করলেন।

॥ ৭ ॥ শাতিল-আরব··· ··তোমার শির। [পৃ. ১৪৭-১৪৯]
—শাত-ইল আরব। [শব্দসংখ্যা প্রায় ৩০০]

আরব-বীরদের বীর্যবত্তায় শাতিল-আরবের তীরভূমি চিরপবিত্র হয়ে আছে। যুগে যুগে এখানে তুর্কী, যুনানী, মেস্রী সেনাদল যুদ্ধ করেছে, স্বাধীন বেদুঈনদের

শিরচ্ছেদ হয়েছে এর তীরে। কত রক্ত বহন করে এনেছে শতদ্রু-নদী, সে রক্ত মিশেছে এসে শান্তির-আরবে, যেন উন্মাদিনীর রণনৃত্যের মতো সেই দৃশ্য। অশ্রুভরা চোখে নারীরা এসেছে তরবারি-হাতে। সমস্ত রকম অত্যাচার সহ্য করেছে আরবাসবসী কিন্তু মাথা নত করে নি। আজ সে পরাধীন, তাই অন্য এক পরাধীন দেশের কবি তার জন্য সহমর্মিতা বোধ করেন।

মর্মার্থলেখন

॥ ১ ॥ মাধব, বহুত মিনতি করি······তুয়া পরসঙ্গে।

—প্রার্থনা। [পৃ. ১]

জীবনযন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণলাভের জন্যে মানুষ ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন করে। ঈশ্বরের করুণাই তার জীবনপথের সর্বোত্তম পাথেয়। ঈশ্বর তো তাঁর সৃষ্ট জীবের গুণাগুণ বিচার করেন না, তার প্রতি স্বভাবতই তিনি স্নেহশীল। সেই স্নেহ-লাভে ধন্য হলে মানুষ ক্রমশ মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারবে, জন্মজন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে সেই মুক্তির দিকে সে অগ্রসর হবে।

॥ ২ ॥ শুনিলে তোমার কথা······জগৎ আনন্দ তুমি, ভুবনমোহিনী।

—সীতার পঞ্চবটীবাস। [পৃ. ৩০]

যার নিজের আনন্দিত হবার এবং আনন্দ দান করবার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, তার কাছে কোনো পরিবেশই দুঃখকর নয়। বহিরৈশ্বর্য এবং বিলাস-আড়ম্বর তুচ্ছ হয়ে যায়, যদি আমরা হৃদয়ের মধ্যে প্রসাদ অনুভব করি। তাই, মধুরস্বভাব পতিগরবিতা সীতার কাছে বনবাসই ছিল আনন্দময়, তার তুলনায় রাজভোগের আকর্ষণ কিছুমাত্র বেশি নয়।

॥ ৩ ॥ প্রতিদিন অংশুমালী······কি দশা হবে আমার।

—কবির অন্ধদশা। [পৃ. ৫৪-৫৫]

দৃষ্টির প্রসাদে আমরা পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য অনুভব করি। সেই দৃষ্টি যদি একদিন চোখ থেকে নির্বাপিত হয়ে যায় তার চেয়ে বেদনার বিষয় আর কী হতে পারে। বরং জন্মান্ধ এক হিসেবে ভাগ্যবান যে বিশ্বমধুরিমা সে কখনো প্রত্যক্ষ করে নি। কিন্তু পরিণত বয়সের অন্ধতা দুঃসহ। সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, ঋতুর আসাযাওয়া, জীবজগৎ, স্বজনবান্ধবের মুখশ্রী এসকলই অতীত অভিজ্ঞতা হয়ে স্মৃতির মধ্যে গাঁথা থেকে, কিন্তু তার রসোপভোগের শক্তি আর তার ফিরে আসবে না।

॥ ৪ ॥ দাঁড়া রে দাঁড়া রে······ক্ষত্রিয়বীর্য, দেখাব কেমন।

—পলাশীর যুদ্ধ। [পৃ. ৫৭-৫৮]

ভীতত্রস্ত পলায়নপর সৈন্যকুলের প্রতি বীরের আহ্বান ঘোষণা করেছেন মোহনলাল। যে সেনা, সে কি কখনো আত্মপ্রাণরক্ষার জন্য কাপুরুষ হতে পারে

ভারতবর্ষের এই লাঞ্ছনা তার আত্মীয়পরিজনের পক্ষে নিরতিশয় লজ্জার কারণ হবে। বিশেষত, বাঙলার স্বাধীনতা নির্ভর করে আছে এই যুদ্ধের ফলাফলের ওপর। সেই ঐশ্বর্যরক্ষার জন্যে পরম দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবনমরণ পণ করে সবলের এখন রণক্ষেত্রে ধাবিত হতে হবে।

॥ ৫ ॥ সেই আদিযুগে যবে..... দেব, না মানব—প্রস্তর-লগুড়ে ?
—মানববন্দনা। [পৃ. ৭৭-৭৮]

সভ্যতার আদিতম যুগে মানব যখন চেতনা লাভ করেছে, তখন সে দেবতার ওপর নির্ভর করে নি, বরং আত্মশক্তিতেই আস্থা স্থাপন করেছে। প্রকৃতির সর্ব-অঞ্চলে তখন মানুষ তার সহায় অন্বেষণ করেছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতা সৃষ্টি করেই তারা দৃঢ় হলো। ধরিত্রী তখন বাসযোগ্য নয়; বিরূপ প্রতিকূল সংঘর্ষের সম্ভাবনায় প্রতি পদক্ষেপ প্রতিহত হয়। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যে মানবসঙ্ঘ প্রস্তর বা কাষ্ঠের ব্যবহার আরম্ভ করে নিল। দেবতা নয়, সেই আদিযুগে মানুষই ছিল মানুষের পরিত্রাতা।

॥ ৬ ॥ নমি তোমা নরদেব..... শরণ্য একেরে,—আত্মার আত্মীয়।
—মানববন্দনা। [পৃ. ৮১-৮২]

মানুষের মহিমার ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে পার্থিব সভ্যতা। অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে জীবনকে মধুময়, পরিপার্শ্বকে সৌন্দর্যময় করে রচনা করেছে, আজ এই সভ্যতার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলে আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু স্মরণীয় যে, এই পরিণামের জন্যে প্রতিটি মানুষই আমার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। আপাতদৃষ্টিতে এক-কে ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ মনে হয়, কিন্তু বস্তুত একের সঙ্গে এক যুক্ত হতে হতে সে বিরাট অবয়ব লাভ করে। শক্তির উৎস সেই এক আমাদের প্রণম্য।

॥ ৭ ॥ বাহু বাড়াইয়া গুরু..... আছে ওই নদীতলে।
[উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬০] নিষ্ফল উপহার। [পৃ. ৯০-৯২]

সংসারী জনের কাছে কনক-হীরকের অনেক মূল্য, সে তাই তার বুদ্ধিমতো মূল্যবান গুরুপ্রণামী এনে দেয়। গুরু কিন্তু শিষ্যের এই আসক্তির বন্ধন লক্ষ্য করে মনে মনে কৌতুক বোধ করেন। স্বর্ণবলয় যদি জলমগ্ন হয়ে যায় তাতে শিষ্য হয়তো হাহাকার করে ওঠে, গুরুর কাছে তা পরিহাসের বিষয়। অজ্ঞানতিমির থেকে শিষ্যকে মুক্ত করে আনবার জন্যে সাধনা করেন গুরু,—যদি একটি বলয়ের জন্যে ব্যাকুল অন্বেষণে রত থাকে শিষ্য, গুরু তবে অপরটিকেও জলে নিক্ষেপ করে তাকে বুঝিয়ে দেন যে বিষয়বাসনা ভগবৎসাধনার একান্ত পরিপন্থী।

॥ ৮ ॥ শুনতে যান ভারত-কথা......প্রাণের একতারাতে।
বাসনা। [পৃ. ১০৮-১০৯]

সহজ সরল পল্লীজীবনের জন্যে কবিহৃদয় আকুলতা অনুভব করে। ছোট্ট একটি স্নেহমমতাময় ঘর, আরণ্য প্রকৃতির মুক্তাবেষ্টী, করুণ পুরাণকাহিনীর আবেশ আর

নিবিড় ঈশ্বরতন্ময়তা—এই নিয়েই কবি তাঁর জীবনের সকল সুখস্বপ্ন বয়ন করেন। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতাকেও এমনি করে তিনি স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে উন্নয়ন করে নেন।

॥ ৯ ॥ হ্যাখ, মানুষের কষ্ট থাকে না……দেশজোড়া দুর্দিনে।
[উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬১]—চাষার ঘরে। [পৃ. ১১৪-১১৫]

মানুষ স্বভাবত ছোটো নয়। কোনো কোনো পরিবেশ হয়তো তাকে ছোটো করে দমিত করে রাখতে চায়। কিন্তু পরিবেশের এই চক্রান্তে মানুষ কি তার আত্মশক্তিকে ভুলে থাকবে? বিশ্বস্রষ্টার সন্তান আমি, এই দৃঢ়-প্রত্যয়ে যদি আমি কর্মভূমিতে সক্রিয় হয়ে নেমে আসি, তবে আমার পক্ষে সকল দুঃখ অতিক্রম করা সম্ভব হবে। কেবল এই আত্মশক্তির উদ্বোধন প্রয়োজন, নিজেকে ভালো করে চিনে নিতে হবে। কেমন করে এই আত্মবোধ জন্মায়? শিক্ষার গুণে। আধুনিক যে-শিক্ষা কেবল বস্তুপৃথিবীকেই চেনায়, ধর্মে বা ঈশ্বরবোধে যে-শিক্ষার পরিশোধন হয় না, তার দ্বারা অবশ্য আত্মোন্নয়ন সম্পূর্ণত সম্ভবপর নয়। যে শিক্ষা সমগ্র চরিত্রকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে সেই দেশোপযোগী শিক্ষার দ্বারা নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে হবে। তবেই আমরা জানব যে আমরা ক্ষুদ্র হলেও তুচ্ছ নই, অপরের দেওয়া অপমান মাথায় নেমে এলে আমরা নিজেরাই সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকার করতে পারব।

॥ ১০ ॥ সবচেয়ে যে অল্পে ছিল খুসি……হৃদয় শ্মশানবাসী।
ছিন্নমুকুল। [পৃ. ১১৭-১১৮]

ছোট্ট একটি শিশুর মৃত্যু হৃদয় শূন্য করে দিয়েছে। শিশুর জগৎ ছোটো, ক্ষুদ্র একটি পরিসর সে তার জীবনকালে অধিকার করে থাকে। কিন্তু বহির্দৃষ্টিতে যা সীমাবদ্ধ, অন্তরের দৃষ্টিতে তার কোন সীমা পাওয়া যায় না। অন্তরের স্নেহ-অনুভবের জগতে সেই শিশুই সমস্ত দিক্‌দিগন্তে প্রভাব বিস্তার করে রাখে। তাই, যখন বিদায়ের করুণ সুর ধ্বনিত হলো, অজানা অন্ধকার দেশে সে যখন তার পুতুলখেলার ছোটো জগৎ ছেড়ে চলে গেল, সমস্ত হৃদয় তখন শ্মশানভূমির মতো হাহাকারময় হয়ে উঠেছে।

॥ ১১ ॥ পাড়ায় আজিকে তর্ক হয়েছে……মায়ের গভীর স্নেহ।
—ভক্তির মুক্তি। [পৃ. ১২৮-১২৯]

বিশ্বস্রষ্টাকে ভক্ত মানবরূপেই অনুভব করে। কেবল মানবরূপ বলা যথেষ্ট নয়, বলা উচিত—মাতৃস্বরূপ। মাতা যেমন গভীর স্নেহে, কাতর উৎকণ্ঠায়, অনলস আয়োজনে তাঁর সন্তানের আহার্য, পরিচ্ছদ, সাজসজ্জার জন্যে মনোযোগী হন, বিশ্বের সকল বস্তুতে আমরা যেন তেমনই এক প্রতিচ্ছবি দেখি। প্রতিটি প্রকৃতিচিত্র যেন এই মাতৃসোহাগ বক্ষে ধারণ করে সুন্দর হয়ে আছে। তাই বিশ্বসৃষ্টির মূলে ভক্তজন এক সদাজাগ্রত জননীর নিবিড় কল্পনা অনুভব করে।

॥ ১২ ॥ পাটনী চিনিয়া যায়……চিরদিন থাকে দুধে-ভাতে।
—বাঙালির সাধ। [পৃ. ১৪৪-১৪৬]

স্বভাব-সন্তুষ্ট সাধারণজনের চিত্তে অলৌকিক ধর্মের আবেদন বড়ো একটা সাড়া তোলে না। মুক্তির জন্যে মোক্ষের জন্যে তার চিত্ত কাতর নয়। ধনৈশ্বর্যের প্রাচুর্যের প্রতিও সে স্বভাবত কোনো প্রলোভন বোধ করে না। এসবই তার কাছে অলীক স্বপ্নের মতো, অথবা জানে যে, এসবই কেবল প্রচুরতর দুঃখকে বহন করে আনবে। তার সবচেয়ে বড়ো উচ্চাশা—ছোটো এক শান্তিময় জীবন। সন্তানপরিজনের সাহচর্যে সে সহজ জীবন যাপন করতে চায়, তাই, তার কাছে দুবেলা দুমুঠি অন্নের চেয়ে বড়ো কামনার বিষয় আর কিছু নেই।

॥ ১৩ ॥ এই উঠানে এ জেলখানায়……থাকতে ভাল না বেসে।
[উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬২] কারার শরৎ। [পৃ. ১৫৫-১৫৬]

ইটের কারাগারে যদি মানুষ বন্দী হয়ে থাকে, তবু সে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ থেকে একেবারে বঞ্চিত হয় না। বহির্ভুবনে প্রকৃতি যে-রূপরস বিকীর্ণ করে দেয় তার সঙ্গে হয়তো প্রাচীর-অন্তরালে বন্দীজনের দেখাশোনা হয় না। কিন্তু তথাপি প্রকৃতি তাকে আরেক রকম সৌন্দর্যের আস্বাদ দিয়ে যায়। এ মুক্ত চাঞ্চল্যের সৌন্দর্য নয়, স্নিগ্ধ স্থিরতার সৌন্দর্য। যখন এই সৌন্দর্যের অনুভব সম্ভব হয়, বন্দী মানুষ তখন হৃদয়মধ্যে একরকম সান্ত্বনা বোধ করিতে পারে।

একাদশ শ্রেণী ॥

সীতার বনবাস

<ভাবসম্প্রসারণ>

॥ ১ ॥ অকৃত্রিম প্রেম কী পরম পদার্থ। কী সুখ, কী দুঃখ, কী সম্পত্তি, কী বিপত্তি, কী যৌবন, কী বার্ধক্য—সকল অবস্থাতেই একরূপ ও অবিকৃত।

[দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। অনু. ৪]

[উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৪]

এখানে সত্যকার ভালবাসার স্বরূপধর্ম বর্ণিত হয়েছে।

মনের দিক থেকে সুস্থ মানবমানবীমাত্রেই জীবনে কোন-না-কোনো সময়ে ভালোবাসা নামীয় একটা বস্তুর দুর্নিবার প্রভাবে এসে থাকে। কেউ কারুকে কদাপি ভালোবাসেনি, মন একথা বিশ্বাস করতে চায় না। চায় না এইজন্তে যে প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-ভালোবাসা সর্বস্থানিক ও সর্বকালিক মানুষের স্বভাবধর্ম, কিংবা বলা যায়—সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ ভালোবাসে এও যেমন সত্য, আবার, তেমনি সর্বক্ষেত্রে ভালোবাসার গভীরতা একরূপ নয় এও স্বীকার করতে হয়। কথাটিকে ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায়, বাস্তবসংসারে অকৃত্রিম ভালোবাসা দুর্লভতম একটি বস্তু। কেন? প্রায়শই দেখা যায়, স্বার্থের স্পর্শে এই ভালোবাসা মালিন্যযুক্ত হয়, বিকৃত হইয়া পড়ে! আমরা কি দেখতে পাই না যে পারস্পরিক প্রণয়প্রীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বার্থবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত? কোথাও দেহগত রূপযৌবন, কোথাও স্থূলভোগবাসনা, কোথাও আর্থিক নির্ভরতা, কোথাও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা পরস্পরকে প্রীতির সূত্রে বাঁধে। দেখা যায়, যেখানে উক্ত-সব বস্তুর অভাব ঘটেছে, স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে, সেখানে ভালোবাসাও ক্রমে শুকিয়ে গেছে। পিছনে পড়ে রয়েছে শুধু তার অস্পষ্ট ক্ষীণ স্মৃতি। সুখ দেয় বলেই মানুষ ভালোবাসার জন্তে পাগল, কিন্তু সুখের বদলে দুঃখ যদি বরণ করতে হয় তাহলে ভালোবাসার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

তাই বলে সংসারে স্বার্থলেশশূন্য ভালোবাসা যে অভাবনীয় একটি বস্তু, এমন নয়। নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রকৃতি কী? সে নিজের সুখের কথা ভাবে না, স্বার্থের চিন্তা করে না, দুঃখকে ডরায় না, ইন্দ্রিয়জ বাসনার পারবশ্য তার জন্যে নয়। নরনারী, স্বামীস্ত্রী, দুই সুহৃৎ, পিতামাতা ও সন্তানের প্রণয়-প্রীতি-স্নেহের আকর্ষণ যেখানে আত্মিক সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে বাইরের কোনো প্রভাব তাকে বিচলিত কিংবা খর্ব করতে পারে না—সুখদুঃখ, সম্পদবিপদ সকল অবস্থায় সে অম্লান অপরিবর্তিত থাকে; আত্মার বন্ধন অবস্থাবিপর্যয়ে ছিন্ন হবার নয়। এহেন ভালোবাসা

বিরলদৃষ্ট বটে, কিন্তু এর অস্তিত্বের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। ইতিহাসে-কাব্যে-পুরাণে এই কৃত্রিমতাবিরহিত ভালোবাসার স্বাক্ষর স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রয়েছে।

॥ ২ ॥ যাবজ্জীবন ঘৃণাস্পদ হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভালো।

[তৃতীয় পরিচ্ছেদ। অনু. ৮]

মানুষের প্রধানতম জৈবধর্ম বেঁচে-থাকার নিরলস চেষ্টা। তার যাবতীয় কর্মের বেশিরভাগই প্রত্যক্ষত এই জৈবপ্রকৃতির অনুসারী, পরোক্ষত এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত। যে-নিভৃত গোপন অংশটির প্রেরণায় মানুষ আপনার জীবসীমাকে লঙ্ঘন করে, তার প্রকাশ সদাসর্বদা আমাদের চোখে পড়ে না। মনুষ্যসংসারে সচরাচর আমরা কী দেখি? দেখি যে, অধিকাংশ মানবমানবী নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে স্থূলবাস্তবভূমিতে বিচরণ করছে, উচ্চ কোনো আদর্শ, মহৎ কোনো ভাবনা, মহিমাদীপ্ত কোনো স্বপ্নসাধ তাদের নেই, কোনোমতে প্রাণধারণ করেই তারা তৃপ্ত; মনুষ্যত্বের মর্যাদা কী বস্তু এরা তা একেবারে জানে না।

কিন্তু এমন মানুষও রয়েছে যারা নিজেদের শুধু জীবমাত্র মনে করে না,— 'মানুষ' এই অভিধার মর্যাদা সম্বন্ধে অনুক্ষণ তারা সচেতন। যে মুহূর্তটিতে মানুষ 'মানুষ', সেই মুহূর্তে জীবসীমার বহুঊর্ধ্বে তার অবস্থান। তখন তার দৃষ্টি কায়ক্লেশে বেঁচে-থাকার দিকে নয়—মানবিক মহিমার দিকে তখন তার অকম্পিত সংকল্প, বাঁচবো তো মানুষের মতোই বাঁচব, সম্মান-প্রতিষ্ঠার দৃঢ় দুর্গে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবো। এই জাতের মনুষ্য জীব হয়েও আত্মিক মহিমায় উজ্জীবন্ত, কখনো যদি সম্মান-সম্ভ্রম-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর বেঁচে-থাকা-ব্যাপারটির সংঘাত উপস্থিত হয় তখন সে অকাতরে নিজপ্রাণটি বিসর্জন দেয়, আপনার মনুষ্যত্বের অমর্যাদা কদাপি ঘটায় না। অপরের অশ্রদ্ধা কুড়ানো তার পক্ষে অভাবনীয়—মৃত্যুরই তুল্য। এখানেই মনুষ্যত্বের সাধকের সঙ্গে, মহৎ-চরিত্রের সঙ্গে, নামেমাত্র মানুষের আর মানবেতর প্রাণীর পার্থক্য। এই কারণেই, যে মানুষকে পৃথিবীর সকলের কাছ থেকে তীব্র ঘৃণা, রুষ্ট অভিশাপ কুড়োতে হয়, তার বেঁচে-থাকা কলঙ্কিত অস্তিত্ব বহন-মাত্র।

॥ ৩ ॥ সকলেই আপন আপন কার্যের ফলভোগ করে।

[চতুর্থ পরিচ্ছেদ। অনু. ১৫]

এ সংসারে মানুষ প্রতিনিয়ত কর্মচক্রে ঘুরছে, কাজ তাকে করতেই হয়। প্রতিটি কাজেরই কোনো-না-কোনরূপ ফলাফল আছে; প্রায়শ তা আমরা চাক্ষুষ করি, ফল কর্মানুসারী না হয়ে পারে না। এইজন্যেই তো বলা হয়—'যেমন কর্ম তেমন ফল'। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে কার্যের ফলাফল প্রত্যক্ষগোচর নয়, দেখতে পাই, ফল কার্যানুগ হলো না। কেন এরূপ হয়, ঘটনা দেখে নিরূপণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। একান্ত সৎপ্রকৃতির, উদারপ্রাণ ব্যক্তি কেন কষ্ট পায়? আবার, সংশয়াতীতভাবে যে দুর্জন, দেখা যায়, বেশ নির্বিরোধ সুখে-আরামে দিনাতিপাত

করছে সে। এর কারণ কী, তা আপাতত বুঝে-ওঠা সত্যই কঠিন। কিন্তু কর্ম আর তার ফলে বৈপরীত্য যতই প্রকট হোক-না কেন, এর নীতিসম্মত ব্যাখ্যা হিন্দুদর্শনে মেলে। এদেশীয় দার্শনিকরা বলেন, মানুষ তার পূর্বজীবনের কর্মফল পরবর্তী জীবনে বহন করে নিয়ে আসে; তাই সাধুব্যক্তি দুঃখভোগ এবং অসাধু লোকের সুখসম্ভোগ দেখে বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই—মানুষকে পূর্বকৃত সৎ কিংবা অসৎ কর্মের ফলভোগ করতেই হবে। মানবের সুখদুঃখের এই তত্ত্বটি আমাদের দর্শনশাস্ত্রে 'কর্মবাদ' নামে আখ্যাত হয়েছে। যে-কর্মের যে-জাতীয় ফল প্রত্যাশিত, তার সঙ্গে বাস্তবের মিল দেখা না গেলেও কার্যকারণের অচ্ছেদ্য সম্পর্কটিকে অস্বীকার করা যায় না। নিসর্গসংসারে নিয়মের যেমন ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই, তেমনি মানবসংসারেও—স্বকৃত কর্মফল এড়াতে কেউ পারে না।

॥ ৪ ॥ সংসারে কিছুই চিরদিনের জন্য নহে। বৃদ্ধি হইলেই পতন হয়, সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটে, জীবন হইলেই মরণ হইয়া থাকে।

[পঞ্চম পরিচ্ছেদ। অনু. ৪]

একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ফরাসী মনীষী বার্গসঁ-র একটি উক্তি মনে পড়ছে: 'We change without ceasing, and the state itself is nothing but change. There is no feeling, no idea, no volition, which is not undergoing change at every moment'. এর মর্মার্থ হলো, মানবজীবন নিত্যপরিবর্তমানতার স্রোতে ভাসমান, প্রতিমুহূর্তেই আমাদের মধ্যে রূপান্তর চলছে; দুটি পরিবর্তনের মধ্যকার যে-অবস্থাটি তাও পরিবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়; মানুষের জীবনে এমন-কোনো অনুভূতি, চিন্তা বা ভাবনা নেই যা এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। বার্গসঁ-দর্শনে পরিবর্তমানতাই জগৎসংসারের সত্যকার রূপ। 'The world is an eternal flux'—নদী যেমন অবিরাম চলছে, তেমনি, এই নিখিল বিশ্ব গতির স্রোতে ভাসছে। সুতরাং স্থিরতা বিশ্বের স্বরূপধর্মের বিরোধী। হিন্দুদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, গ্রীকদর্শনেও এই গতিতত্ত্বের অর্থাৎ জগৎ ও জীবনের পরিবর্তনপ্রবাহের কথা বলা হয়েছে। কাজেই কোনোকিছুর দীর্ঘস্থায়িত্ব দেখে তাকে চিরস্থায়ী বলে মনে করলে ভুল করা হবে।

তাহলে আসল কথা হলো, জগতে বিবর্তন আছে, স্থিরতা বা স্থায়িত্ব নেই। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—যেমন বৃক্ষজীবন। এ ক্ষেত্রে কী দেখি আমরা? বীজ থেকে অঙ্কুর, অতঃপর যথাক্রমে ডালপালা, শাখাপ্রশাখা এবং ফুল। সর্বশেষে ফুলের ফলত্বলাভ, এবং কোনো একদিন তার ঝরে-পড়া। এই বৃক্ষজীবনের সত্য মানবজীবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—শৈশব কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্য, তারপর অনিবার্য মৃত্যু। প্রকৃতিলোকে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন—এইভাবে উভয়ের ক্রমাবর্তন। জন্মমৃত্যু, দিনরাত্রির মতোই ক্ষয়বৃদ্ধি, আলোছায়া, সুখ-দুঃখ, ভালো মন্দ, হাসিকান্না, মিলনবিরহ পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হচ্ছে। এদের একটির চিরকালীন আধিপত্য কুত্রাপি

এবং কদাপি সম্ভব নয়। পরিবর্তন না থাকলে এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের বিচিত্র অস্তিত্বই সম্ভব হতো না কখনোই। সুতরাং গতি বা পরিবর্তনের পটভূমিতে জগৎ এবং জীবনকে দেখাই সত্যদেখা। পরিবর্তনকে যারা জীবনের স্বাভাবিক পরিণাম বলে বুঝতে শিখেছে তারা অবস্থাবিপর্যয়ে বিচলিত হয় না, সবকিছুকে শান্তচিত্তে গ্রহণ করিবার নিশ্চিত শক্তি পায়।

॥ ৫ ॥ গভীর জলধি কখনো অল্পকারণে আকুলিত হয় না, সামান্য বায়ু-বেগের প্রবাহে হিমাচল কখনো বিচলিত হইতে পারে না।

[তৃতীয় পরিচ্ছেদ। অনু. ২]

নিসর্গসংসারের দুটি বস্তু এখানে অনেকটা মানবজীবনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রকৃতিলোকে বিরাট ও ক্ষুদ্রের আচরণ যেমন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তেমনি মনুষ্যলোকে। মহাসমুদ্রের অনন্তবিস্তার, তার নিতল গভীরতা; হিমালয় পর্বত সমুন্নতিতে নভোচুম্বী, তার বিশালতা বিশ্বের বিস্ময়। প্রকৃতিজগতের এই দুটি রূপপ্রকাশ—উদাত্ততা (Sublimity) ও গাম্ভীর্যে অতিশয় প্রেক্ষণীয়। বিশাল-গম্ভীর সমুদ্র ক্ষীণগতি বায়ুপ্রবাহের স্পর্শে আন্দোলিত হয় না, কিন্তু ক্ষুদ্রপরিসর অগভীর নদী সামান্য বাতাসে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে—তার বিস্তৃতি ও গভীরতা নেই বলে বিরুদ্ধশক্তিকে সে প্রতিহত করতে পারে না, একটুতেই চঞ্চলতা আর বিক্ষোভ প্রকাশ করে। ভূকম্পনে উন্নতশীর্ষ মহীধর বা পর্বত অকম্পিত থাকে, অমেয় তার প্রতিরোধশক্তি; কিন্তু ওই কাঁপনে ছোট পাহাড়ের চূড়ার কী অবস্থা হয়, মুহূর্তে গুঁড়িয়ে গিয়ে সে মাটিতে লুটায়। বিরাট ও ক্ষুদ্রের মধ্যে এই যে প্রভেদ তা কারো দৃষ্টি এড়ায় না।

নিসর্গজগতের এই পার্থক্য মনুষ্যসমাজেও লক্ষ্য করবার মতো। মানুষের জীবনে সর্বদাই বিরোধীশক্তি এসে আঘাত করে, নানান্ দৈবদুর্বিপাক দেখা দেয়, কত ধরণের বাধা আসে, বিপদ আসে। এইসব ঘটনার অভিঘাতে অল্পশক্তিমান মানুষের মন দারুণভাবে নাড়া খায়, সামান্যতম বাধার সম্মুখে তারা মস্তক নমিত করে। এজাতের মানুষ একটুখানি বিপদের আশঙ্কায় কাতর হয়ে পড়ে, ন্যূনতম দুঃখে চিত্তের ধৈর্য হারায়। কিন্তু যাঁরা বীর্যবন্ত পুরুষ, যাঁরা বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সমুচ্চ আদর্শলোকে যাঁদের বিহরণ, তাঁরা যে-কোনো বিপর্যয়ের সম্মুখে অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন, দুঃখবিপদ, এমন কি, মৃত্যুকেও উপেক্ষা করে চলেন, নিজ কর্তব্যের পথ থেকে বিন্দুমাত্র সরে দাঁড়ান না। উপরে-কথিত সমুদ্র ও পর্বত এইশ্রেণীর মানুষেরই যেন প্রতিরূপ।

॥ ৬ ॥ আশার আশ্বাসনী-শক্তির ইয়ত্তা নাই।

[অষ্টম পরিচ্ছেদ। অনু. ১৬]

আমাদের কোনো-এক কবি বলেছেন: 'ধন্য আশা কুহকিনী!' কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। কুহকজালরচনের আশ্চর্য শক্তি এই মায়াবিনী আশার। ভাবছি, পৃথিবীর

মানবমানবীর অন্তরদেশে আশা যদি তার নিভৃত নীড় রচনা না-করতো তাহলে তাদের অবস্থাটি কী হতো। তারা কি বিষণ্ণকরুণকণ্ঠে বলতো না—জীবন যে দুর্বহ হয়ে উঠল, বাঁচি কেমন করে! তবে কি বুঝতে হবে, আশাই এ সংসারে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে? উত্তরে বলবো—হ্যাঁ।

জীবনের দূরবিস্তার ভূমিতে আমাদের চলার পথটা কুসুমাস্তীর্ণ নিশ্চয়ই নয়; এ পথ বন্ধুর, কাঁটা মাড়িয়ে চলতে হয়। তখন বেদনার্ত মানব মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে বলে: I fall upon the thorns of life, I bleed, I weep'. অন্তহীন প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকার নামই তো জীবন। সংগ্রামী মানুষের জীবনে অশেষ দুঃখ, তার ব্যথার পরিমাপ হয় না, পদে পদে নিরন্ত্র ব্যর্থতা ধরার মানবমানবীকে লাঞ্ছিত করে। এরূপ অবস্থায় গোটা জীবনটাকে বিস্বাদ অর্থশূন্য তাৎপর্যহীন বলে মনে হয়। কিন্তু তবু তো মানুষ বাঁচে, মাটির মায়া কাটাতে পারে না।

এ কেমন করে সম্ভব হয়? সম্ভব হয় আশার সঞ্জীবনস্পর্শে। ক্ষয়ক্ষতি-দুঃখশোক, হতোদ্যম আর বিফলতাপীড়িত নরনারীর বেদনাচ্ছন্ন দৃষ্টিকে আশা তুলে ধরে ভবিষ্যতের দিকে, তার চোখে মাখিয়ে দেয় স্বপ্নের অঞ্জন, আর কানে কানে বলতে থাকে—এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো—তোমার সম্মুখে অচিরে খুলে যাবে সাফল্যের স্বর্ণদ্বার, সমস্ত ব্যর্থতা ও শূন্যতাবোধের গ্লানি শরতের লঘুভার মেঘের মতো কোথায় মিলিয়ে যাবে। আশার এই আশ্বাসনীশক্তির প্রভাবে মৃতকল্প ব্যক্তি দীর্ঘপরমায়ুর স্বপ্ন দেখে, বন্ধ্যা নারী সন্তানের মধুময় স্পর্শ পায়, সর্বহারা মহৈশ্বর্যের প্রাসাদ গড়ে, হৃতশক্তি মানুষ চতুর্গুণ উৎসাহে কর্মের ফেনিল আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আশার ক্ষমতা কী বিপুল। যে আশা হারিয়েছে তার কিছুই নেই। আশা না থাকলে সংসার কখন মরুময় হয়ে উঠত। মানুষকে ঈশ্বরের খুব বড়ো একটি দান এই আশা।

॥ ৭ ॥ সকল অদৃষ্টাধীন।

[চতুর্থ পরিচ্ছেদ। অনু. ১৬]

যুগে যুগে মানুষ নিজ জীবনের ঘটনার সঙ্গে অদৃষ্ট-নামীয় এক অস্পষ্ট ও রহস্যজড়িত ব্যাপারকে যুক্ত করে আসছে। এই বস্তুটি আসলে যে কী, তা অদ্যাবধি কেউ বুঝে উঠতে পারেনি। সত্যই এ দুর্জ্ঞেয়। মানুষ আপনার শক্তি ও সাধ্যমতো কাজ করে যায়, একটি নির্দিষ্ট ধারায় জীবনটি গড়ে তুলতে চায়। কেউ সফল হয়, কেউ আবার শতচেষ্টাতেও সাফল্য কুড়োতে পারে না। তখন বিফলপ্রযত্ন মানুষ বলে ভাগ্যবৈগুণ্য বা অদৃষ্টের প্রতিকূলতার কথা। কার্য ও তার ফলের মধ্যে যদি কোন সামঞ্জস্য চোখে না পড়ে তাহলে অজ্ঞেয় অদৃশ্য একটি শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়, এবং তাতে মানুষের কিছু সান্ত্বনাও মেলে। ঘটনাপ্রবাহকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না কেন? সংসারের মানবমানবী অকারণে দুঃখভোগ করে কেন? ঘটনাসংযোজে

রাজা পথের ভিখারি হচ্ছে, আবার, সর্বরিক্ত মানুষ প্রভূত বিত্তের মালিকানা পাচ্ছে,—এর যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা কী? সাধারণ বুদ্ধিতে যে-ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না, তাকেই আমরা বলে থাকি—অদৃষ্ট-পরিচালিত। প্রসঙ্গত, কাব্যকাহিনীর সীতার কথা মনে পড়ছে। তিনি নিজে নিষ্কলুষা; স্বামী রামচন্দ্রও বহুগুণযুক্ত পুরুষ। অথচ এই রাজনন্দিনী রাজবধূ গোটা জীবনটা দুঃখে কাটালেন। কেন এরূপ হলো এর কোন সদুত্তর নেই। দীর্ঘশ্বাসমোচন করে আমরা শুধু বলতে পারি—অদৃষ্ট তাঁর প্রতিকূল ছিল।

বস্তুসংক্ষেপকরণ

॥ ১ ॥ অষ্টাবক্র সকলে কুশলবার্তা…… রঘুকুলধুরন্ধর হইবেন কেন?

[প্রথম পরিচ্ছেদ। অনু. ৬-৭। শব্দসংখ্যা প্রায় ৩১০]

< অষ্টাবক্রের আগমন ও শ্রীরামের প্রজানুরঞ্জনের অঙ্গীকার >

অষ্টাবক্র সীতাকে বশিষ্ঠদেবের এই আশীবাণী শোনালেন যে, সীতা বীরপ্রসবিনী হবেন। অতঃপর তিনি রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করে বললেন, অরুন্ধতী, শান্তা ও মহিষীগণ জানিয়েছেন, শ্রীরাম যেন জানকীর প্রত্যেকটি অভিলাষ যথাসম্ভব পূরণ করেন। এরপর অষ্টাবক্র পুনর্বার সীতাকে জানালেন যে, অযোধ্যায় এসে ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁকে [সীতাকে] নবকুমারশোভিত অবস্থায় দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অষ্টাবক্র-মুনির মারফৎ বশিষ্ঠদেব শ্রীরামকে সর্বদা প্রজাপালনে যত্নবান থাকতে উপদেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। অষ্টাবক্রের মুখে এই নির্দেশ শুনে রামচন্দ্র বললেন, প্রজাসাধারণের চিত্ততৃপ্তিবিধানের জন্যে সর্বপ্রকার সুখভোগ ত্যাগ করা তো সামান্য কথা—প্রাণপ্রিয়া জানকীকে বিসর্জন দিতেও তিনি প্রস্তুত আছেন। রামচন্দ্রের রঘুকুলোচিত বাক্যে সীতা হর্ষপ্রকাশ করলেন।

॥ ২ ॥ সীতা অন্যদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া……সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

[প্রথম পরিচ্ছেদ। অনু. ১৫। শব্দসংখ্যা প্রায় ১৪৫]

[উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬২]

< রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের দক্ষিণারণ্যের আলেখ্যদর্শন >

দক্ষিণভারতের একটি অরণ্যের আলেখ্য কেমন চমৎকার চিত্রিত হয়েছে। এই দক্ষিণারণ্যের নদীতীরবর্তী তপোবনাশ্রমে বানপ্রস্থধর্মাবলম্বীদের বাস। জনস্থানপ্রদেশের নৈসর্গিক দৃশ্যটি কী মনোরম। প্রস্রবণগিরির চূড়াটি সতত-সঞ্চরমান নীলমেঘে সমাচ্ছন্ন, সেখানকার অধিত্যকা বৃক্ষরাজির ছায়ায় স্নিগ্ধ, গিরিপাদমূলে স্বচ্ছতোয়া গোদাবরীনদী প্রবহমানা। এহেন সুদৃশ্য স্থানে একদা

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের বনবাসের দিনগুলি পরমানন্দে কেটেছিল—আলেখ্যদর্শনে রামের মনে সেই পূর্বস্মৃতি জেগে উঠল।

॥ ৩ ॥ রামের নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে……দুর্মুখ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

[দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। অনু. ৭-৮। শব্দসংখ্যা প্রায় ৩২০]

< দুর্মুখ-আনীত সংবাদ >

দুর্মুখ কী সংবাদ বহন করে এনেছে তা শুনবার জন্যে রামচন্দ্র অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ভীষণ সংকটে পড়ল দুর্মুখ, শঙ্কিত হল সে—রাজমহিষীর অপবাদের কথা প্রভুকে শোনাতে তার সাহস হল না। কিন্তু শ্রীরামের নিদারুণ উৎকণ্ঠা দেখে নিরুপায় হয়ে, কক্ষান্তরে গিয়ে, দুঃখিতচিত্তে দুর্মুখ রামচন্দ্রকে জানাল, দেশব্যাপী প্রজাগণ রামের সুখ্যাতি করছে, মাত্র দুয়েকজন সীতার চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান—ওদের মুখেই সীতা-সম্পর্কে কিছু কিছু কুৎসাবাক্য উচ্চারিত হচ্ছে। সীতা এতকাল রাবণের গৃহে বাস করেছিলেন বলে পরিত্যাজ্য—তাদের এরূপ মত। রাজ্যপাল হয়ে শ্রীরাম এবিষয়ে নির্বিকার থাকলে প্রজাদের গৃহে গৃহে অনাচার দেখা দিতে পারে; কারণ, রাজার আচরণই তো সর্বদা প্রজাপুঞ্জের অনুকরণীয়। এহেন দুঃসমাচার জ্ঞাপন করতে হলো বলে দুর্মুখ শ্রীরামের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করল।

॥ ৪ ॥ দুর্মুখমুখে সীতাসংক্রান্ত অপবাদবৃত্তান্ত……উভয়সংকটে পড়ে নাথ

[দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। অনু. ৯। শব্দসংখ্যা প্রায় ১৪০]

< শ্রীরামের উভয়সংকট >

প্রজারা সীতার নামে অপবাদ দিচ্ছে, দুর্মুখের মুখে এই কথা শুনে, দুঃসহ মর্মযন্ত্রণায় অশ্রুমোচন করতে করতে শ্রীরাম ভাবতে লাগলেন, দুর্ভাগ্য যেন তাঁর নিত্য সহচর হতে চলেছে। অভিষেকের প্রাক্কালে নির্বাসন, রাবণকর্তৃক সীতাহরণ প্রভৃতি অবাঞ্ছিত ঘটনা রামচন্দ্রের অশেষ মনঃপীড়ার কারণ হয়েছে। সীতার অপবাদ একবার দূর হয়েছে, কিন্তু আবার নতুন করে সেই অপবাদ দেখা দিয়ে ঘোর দুর্বিপাকের সূচনা করছে। এখন কি তাঁর করণীয়। অমূলক বলে লোকাপবাদ উপেক্ষা করবেন, না, নিরপরাধা জেনেও সীতাকে বর্জন করবেন এই ভাবনায় তাঁর চিত্ত পীড়িত। বিমূঢ় শ্রীরাম অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষত হতে লাগলেন।

॥ ৫ ॥ লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্যা জানকী……পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে থাকিবেক।

[তৃতীয় পরিচ্ছেদ। অনু. ৭। শব্দসংখ্যা প্রায় ২২৫]

< কেন লক্ষ্মণ সীতানির্বাসনের বিরোধী >

রাম প্রজাবর্গের প্রীত্যর্থে সীতা বর্জনের সংকল্প করলেন। লক্ষ্মণ বিনীতভাবে অগ্রজকে এই নিষ্ঠুর সংকল্প থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে সচেষ্ট হলেন। সীতানির্বাসনের



বিরুদ্ধে লক্ষ্মণের যুক্তি হল : দুর্বৃত্ত রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল, কিন্তু রাবণবধের পর বানর-রাক্ষস, দেবতা ঋষি এবং আরো বহুজনের সমক্ষে লঙ্কায় বন্দিনী সীতার চারিত্রিক শুচিতা পরীক্ষা করা হয়েছে—অগ্নিশুদ্ধ পত্নীকেই তো শ্রীরাম গ্রহণ করেছেন। কাজেই সীতাচরিত্রের পবিত্রতা সম্পর্কে প্রশ্ন করবার সুযোগ কোথায় ? তা ছাড়া, জনসাধারণের কুৎসারটনা বাস্তবভিত্তি ও সত্যবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাদের কথামতো কাজ করতে গেলে রাজ্যচালনা বিঘ্নিত হতে বাধ্য ; এতে ন্যায় ও সত্যের মর্যাদাও রক্ষিত হয় না। এরূপ অবস্থায় জানকীকে ত্যাগ করলে অধর্মই হবে।

॥ ৬ ॥ এইরূপ আক্ষেপ করিয়া রাম·····তাহার প্রবৃত্তি ও উৎসাহ রহিল না।

[ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। অনু. ৭। শব্দসংখ্যা প্রায় ১৮৫]

< বিরহকাতর রামের প্রাত্যহিক জীবনচিত্র >

লক্ষ্মণের প্রবোধবাক্যে আত্মসংবরণ করে শ্রীরাম পরদিন থেকে রাজকার্যে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর নিভৃত অন্তর্দেশে প্রিয়তমাবিচ্ছেদের গভীর ক্ষত, কিন্তু বাইরে তাঁর মূর্তি প্রশান্ত—অবিচল এই আপাতধৈর্যশীল পুরুষকে দেখে সকলে প্রশংসা করতে লাগল। রামচন্দ্রের বেদনাদীর্ণ হৃদয়ালোকের সংবাদ প্রজাসাধারণের অপরিজ্ঞাতই রইল। রাজকার্য থেকে দূরে বিশ্রামকক্ষে গেলে তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেত, কান্নায় ফেটে পড়তেন ; লক্ষ্মণের প্রবোধ দানের চেষ্টা তাঁর অধীরতা আরো বাড়িয়ে তুলত। এহেন মানসিক অবস্থায় রাজকার্য ছাড়া অন্যকোনো কার্যে শ্রীরাম উৎসাহ পেতেন না।

॥ ৭ ॥ জননীর অনির্বচনীয়স্নেহসহকৃত প্রযত্ন·····কঙ্কালমাত্রে পর্যবসিত হইল।

[পঞ্চম পরিচ্ছেদ। অনু. ১৪। শব্দসংখ্যা ২৩৫]

< তপশ্চারিণী সীতা >

লবকুশ বড়ো হয়ে গেছে, সুতরাং তাদের প্রতি অহূক্ষণসজাগ মাতৃদৃষ্টির প্রয়োজন এখন আর রইল না—নিশ্চিত মনে সীতা তপশ্চর্যায় রত হলেন। তাঁকে বিনা অপরাধে ত্যাগ করে নির্মমতা দেখালেও স্বামীর প্রতি সীতা অণুমাত্র বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন নি। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস, ভাগ্যবৈগুণ্যেই তিনি জীবনে এত কষ্ট পাচ্ছেন ; এখনো পূর্বের মতোই শ্রীরাম জানকীর প্রীতি ও ভক্তির পাত্র। সর্বদা স্বামীর মঙ্গলকামনা ও তপশ্চর্যা ছাড়া আর কিছুই তিনি জানেন না। দিনের বেলাটি তপস্যাদিতে তাঁর কেটে যেত, রাত্রিকালে প্রবল শোকবেগে মুহ্যমানা হয়ে পড়তেন। দীর্ঘ বারোটি বছর ধরে ক্রমাগত বিচ্ছেদযন্ত্রনার পীড়নে বিপর্যস্তা সীতার দেহ কঙ্কালসার হয়ে গেল।

॥ ৮ ॥ বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ……শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া মীমাংসিত হইল।

[ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। অনু. ৪-৫। শব্দসংখ্যা প্রায় ১৭০]

< সীতার স্বর্ণমূর্তি গড়ে যজ্ঞ সমাপনের সিদ্ধান্ত >

হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশ, যজ্ঞাদি ধর্মকর্ম সস্ত্রীক অনুষ্ঠেয়। এই কারণে বশিষ্ঠ পত্নীবিরহিত শ্রীরামকে পুনর্বার বিবাহ করতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র এ প্রস্তাবে সম্মতি জানাতে পারলেন না কিছুতেই। অবস্থার বিপাকে পড়ে সীতাকে বিসর্জন দিলেও রামের মনোজগতে সীতাকে ছাড়া আর কারুরই স্থান ছিল না—অন্য নারীর পাণিগ্রহণ তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অনেক তর্কের পর জানকীর সুবর্ণপ্রতিমা নির্মাণ করে যজ্ঞসমাধার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

॥ ৯ ॥ মহর্ষি বাল্মীকি সীতার অবস্থা……কিরূপ বলেন, দেখা আবশ্যক।

[ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। অনু. ৮। শব্দসংখ্যা প্রায় ৩২৫]

< সীতা ও লবকুশের পুনর্বাসন-বিষয়ে বাল্মীকির চিন্তা >

সীতা বারো বছর বনবাসে কাটিয়েছেন। বাল্মীকি দেখলেন যে সীতার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে, তাঁর বাঁচবার আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। তার ওপর লবকুশ দুভায়ের বয়স হতে চলেছে। রাজকুমারের উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ করতে না পারলে ভবিষ্যতে রাজ্যশাসন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। অতএব পুত্রদ্বয়সহ জানকীর স্বামী রামচন্দ্রকর্তৃক পুনর্গৃহীতা হোন, মহর্ষির এরূপই ইচ্ছা। এখন, কী উপায় তাঁর অবলম্বনীয়। এ বিষয়ে শ্রীরামের কাছে সংবাদ পাঠাবেন, না, তৎপূর্বে লক্ষ্মণ ও বশিষ্ঠের সঙ্গে পরামর্শ করবেন—এরূপ নানান্ চিন্তায় মহর্ষি ব্যাকুল হলেন।

॥ ১০ ॥ কুমারেরা ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত……তোমারা আবাসে গমন কর।

[সপ্তম পরিচ্ছেদ। অনু. ৬-৭। শব্দসংখ্যা প্রায় ২৬৫]

< শ্রীরামসমক্ষে কুশ ও লবের রামায়ণ-গান >

লবকুশ রামের সমীপে এলে তাদের চেহারার সঙ্গে নিজের ও সীতার অবয়বের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে রামচন্দ্র সহসা কেমন যেন একটা আকুলতা অনুভব করলেন। শুনলেন, তারা রামায়ণ গান করে—তাদের তিনি গান গাইতে বললেন। লবকুশের সংগীত চিত্তহারী, সকলে মুগ্ধ হল। পরদিবস বাল্মীকিরচিত সেই অপূর্ব কাব্যের অপরাপর অংশ শুনবার বাসনা জানিয়ে রাম সেদিনকার মতো সভাভঙ্গ করলেন।

॥ ১১ ॥ রাম সে-দিবসে সত্বর সভাভঙ্গ……পাষাণহৃদয় আর কে আছে?

[সপ্তম পরিচ্ছেদ। অনু. ৮-৯। শব্দসংখ্যা প্রায় ৩১০]

< কুশলবকে দেখে রামের চিন্তা >

কারা এই দুই কুমার লবকুশ, বিশ্রামভবনে গিয়ে রামচন্দ্র তা ভাবতে

লাগলেন। ছেলে-দুটিকে দেখে কেন তিনি বাৎসল্যে স্নাত হলেন? এরা তাঁর নিজেরই পুত্র! কিন্তু তাই বা কী করে সম্ভব—হিংস্র জন্তুতে আকীর্ণ বনমধ্যে পরিত্যক্তা হয়ে সীতা নিশ্চয়ই অপঘাতে প্রাণ হারিয়েছে। কাজেই সীতার সন্তান তারা হতে পারে না। পরমুহূর্তে অন্য এক চিন্তা তাঁর মনে জাগল—বালকদ্বয়ের অঙ্গে যে সীতার অবয়ব সাদৃশ্য নির্ভুলভাবে ফুটে উঠেছে। হয়তো বাল্মীকির তপোবনাশ্রমে আশ্রয়প্রাপ্ত সীতার যুগ্মসন্তান এই লবকুশ। এইভাবে শ্রীরাম মনে মনে নানা বিতর্ক করতে লাগলেন। মুহূর্তে তার সকল হৃদয় বেদনায় আচ্ছন্ন হল, নির্মলচরিত্রা সীতার প্রতি নির্দয় আচরণ তিনি করেছেন—আত্মধিক্কার ও মানসযন্ত্রণায় রামচন্দ্র জর্জরিত হলেন।

॥ ১২ ॥ কিয়ৎক্ষণ পরে কৌশল্যা......অণুমাত্র সংশয় রহিল না।

[অষ্টম পরিচ্ছেদ। অনু. ৭-৮। শব্দসংখ্যা প্রায় ২৮০]

< লবকুশের পরিচয়লাভ >

কৌশল্যা কুশলবকে তাদের ও তাদের পিতামাতার, নাম জিজ্ঞাসা করলে দুভাই নিজেদের নাম জানাল, কিন্তু বাপমায়ের নাম বলতে পারল না—মাতা তপস্বিনী, পিতাকে কখনো তারা দেখেনি; শুধু এইটুকু জানে যে, বাল্মীকির শিষ্য তারা। তবে কুশলব তাদের মায়ের চেহারার ও তাঁর মনঃকষ্টের যে বিবরণ দিল তাতে কারুরই বুঝতে অসুবিধে হলো না যে সীতাই সেই দুঃখিনীনারী—জীবন্মৃতা হয়ে আছেন। মনের সংশয় সম্পূর্ণ দূর করার জন্যে কৌশল্যা বাল্মীকিকে ডেকে আনলেন। মহর্ষি সব ঘটনা খুলে বললেন। তখন নিঃসংশয়িতভাবে সকলে জানলেন, কুশলব রামসীতার সন্তান। সীতা এখনো বেঁচে রয়েছেন জেনে সবাই আশ্বস্ত হলেন।

॥ ১৩ ॥ রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবান্......আমি পরিত্রাণ বোধ করি।

[অষ্টম পরিচ্ছেদ। অনু. ১৩। শব্দসংখ্যা প্রায় ১৯০]

< নিরুপায় রামচন্দ্রের দুঃখ ও অসহায়তাবোধ >

মহর্ষির উদ্দেশ্যে শ্রীরাম বললেন, তিনি নিজে জানেন যে সীতা অপাপবিদ্ধা, তথাপি প্রজাবর্গের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে সীতাকে তিনি নির্বাসন দিয়েছেন। সীতার চরিত্র বিষয়ে প্রজাসাধারণের সন্দেহ এখনো দূর হয়নি, তাই সীতাগ্রহণ সম্ভব কিছুতেই নয়। সীতাবিরহিত জীবনে রামচন্দ্রের কী সুখ! অহর্নিশি তাঁর হৃদয় যন্ত্রণার শেষ নেই, রাজধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে ব্যক্তিগত সুখস্বর্গ থেকে তো তিনি চিরকালের জন্যে নির্বাসিত হয়েছেন। সীতাকে বর্জন করার মতো পাপও তাঁকে করতে হয়েছে। কে শুনতে পাচ্ছে তাঁর প্রাণসত্তার নিঃশব্দ ক্রন্দন! এই মর্মজ্বালায় হাত থেকে তাঁর বাঁচবার একমাত্র উপায় হলো—মৃত্যু।

॥ ১৫ ॥ এইরূপ বলিতে বলিতে আহ্লাদভরে……সহধর্মিণীকার্য সম্পন্ন করিতেছেন।

[অষ্টম পরিচ্ছেদ। অনু. ১৬। শব্দসংখ্যা প্রায় ২৪০]

< আশামুগ্ধা সীতার বিচিত্রস্বপ্নরচন >

স্বামীর সঙ্গে মিলনলগ্ন আসন্ন, তিনি পুনর্গৃহীতা হতে চলেছেন, এই নিশ্চিত আশায় সীতার অন্তর আনন্দোদ্বেল হলো। স্বপ্ন ও কল্পনার বিচিত্রবর্ণ জাল বুনে চলেছেন তিনি। জাগ্রত অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখছেন: স্বামী তাঁকে গ্রহণ করেছেন, প্রথমপ্রিয়সমাগমমুহূর্তে স্বামীস্ত্রী কারো বাক্‌স্ফূর্তি হচ্ছে না, বহুবিধ ভাবের বর্ণাঢ্য রেখাপাত হচ্ছে উভয়ের মনে—লজ্জা, অভিমান, আনন্দমিশ্র বেদনা, এবং আরো কত কী; যেন স্বামীর সঙ্গে সীতা উপবিষ্টা, আত্মীয়স্বজনের প্রীতিলাভ করে এতকালের দুঃখ ভুলেছেন, চারিদিকে বর্ষিত হচ্ছে আনন্দাশ্রু; তাঁর স্বর্ণমূর্তি যেন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, শ্রীরামের পাশে যেন যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করেছেন তিনি। হায়, আশা কুহকিনীই বটে।

মর্মার্থলেখন

॥ ১ ॥ রাম মনে মনে এইরূপ আলোচনা……সুখের সীমা থাকিত না।

[দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। অনু. ৩-৪]

স্বপ্নের মধ্যে শোকসূচক শব্দ করে সীতা কেঁদে উঠলেন। রাম বুঝতে পারলেন, আলেখ্যদর্শনে সীতার মনে অতীত বিরহের স্মৃতি জেগে উঠেছে, তাই তাঁর এহেন কাতরতা প্রকাশ। জানকীর বিনির্মল প্রেমানুভবের কথা ভাবতে ভাবতে রামচন্দ্র খাঁটি প্রেমের মহিমার প্রসঙ্গ তুলে বললেন, অকৃত্রিম ভালোবাসা দুর্লভ একটি বস্তু, এ স্বার্থলেশশূন্য—সুখেদুঃখে সমান গভীর ও অপরিবর্তিত থাকে। নিঃস্বার্থ প্রেম সুলভ হলে মানবসংসার স্বর্গে পরিণত হতো।

॥ ২ ॥ ক্ষণকাল পরে চেতনাসঞ্চার হইলে……অরণ্যপ্রায় প্রতীয়মান হইতেছে।

[দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। অনু. ১১]

ক্ষণকাল পরে চেতনালাভ করে শোকাতুর রাম বললেন, সংজ্ঞা যদি ফিরে না পেতেন ভালোই হতো, তিনি বেঁচে যেতেন, সীতানির্বাসনের প্রয়োজন আর হতো না। লোকরঞ্জনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কি বিষম বিপদ তিনি ডেকে আনলেন। তাঁকে স্বামীত্বে বরণ করে নিরপরাধা সীতার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। তারপর রাম সীতার প্রতি তাঁর অমানবিক আচরণের কথা স্মরণ করে নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিলেন। সীতাহারা রামের সম্মুখে আজ হাহাকার ভরা এক মহাশূন্যতা মুখব্যাদান করে রয়েছে।

॥ ৩ ॥ এইভাবে কিয়দ্দূর গমন করিলে পর……আর্যপুত্রকে দেখিতে পাইব না।

[চতুর্থ পরিচ্ছেদ। অনু. ১৩]

কিছুদূরে গেলে সহসা সীতার চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিল। লক্ষ্মণকে তিনি বললেন, অকস্মাৎ তাঁর মন কী এক অজ্ঞাত দুর্ভাবনায় পূর্ণ হয়েছে, যেন কোথাও কোনোরূপ একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে এরূপ আশঙ্কা তাঁর মনে জাগছে ? না হলে হৃদয় এমন হাহাকার করে কেন ? রাম তাঁর সঙ্গে তপোবনে আসবেন বলেছিলেন, কেন তিনি এলেন না একথা ভেবে সীতা ব্যাকুল হচ্ছেন। হয়তো-বা স্বামীর সঙ্গে আর কোনোদিনই তার দেখা হবে না—এই চিন্তায় সীতা অতিমাত্রায় অধীরা হয়ে পড়লেন। এ অধীরতার প্রকাশ লক্ষ্মণকে তাঁর উৎকণ্ঠিত প্রশ্নে।

॥ ৪ ॥ সীতার এইরূপ ব্যাকুলতা ও কাতরতা……বিলম্ব করিও না।

[চতুর্থ পরিচ্ছেদ। অনু. ১১]

সীতার এ-হেন অস্থিরতা ও চঞ্চলতা দেখে লক্ষ্মণের দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। তিনি স্থির করলেন, আসল ঘটনা যতই মর্মঘাতী হোক, সীতাকে খুলেই বলবেন। কিন্তু বলতে গিয়ে লক্ষ্মণের মুখে সেই হৃদয়বিদারক কথা কিছুতেই বেরুল না। এতে সীতা আরও শঙ্কিত হলেন, বুঝলেন, হয়তো কোথাও কী একটা সর্বনাশ ঘটেছে। তাঁর মনে জাগল রামচন্দ্রের কথা—স্বামীর সর্বাঙ্গীণ কুশল তো! শ্রীরাম যদি কুশলে থাকেন তবে আর কোনো সর্বনাশকেই তিনি গ্রাহ্য করেন না। লক্ষ্মণকে উৎকণ্ঠাতুরা সীতার বারংবার অনুরোধ, কী হয়েছে, তিনি যেন অবিলম্বে খুলে বলেন।

॥ ৫ ॥ সীতা চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য……এইজন্যই জীবিত রহিয়াছি।

[চতুর্থ পরিচ্ছেদ। অনু ১৪-১৫]

কিছুক্ষণ পর নিজের শোকোচ্ছ্বাস সংযত করে বেদনাজড়িত কণ্ঠে সীতা বললেন, রাজকন্যা-রাজবধূ হয়েও তার জীবনে দুঃখভোগই একমাত্র সত্য। তিনি ভেবেছিলেন, দীর্ঘকাল পরে সুখের সময় এলো; কিন্তু সে সৌভাগ্যও তাঁর স্থায়ী হলো না, বিধাতা বুঝি বাদ সাধলেন। অথবা বিধাতার প্রতিই বা তিনি দোষারোপ করেন কেন। এ তার নিজ কর্মেরই দোষ—পূর্বজন্মে কোন নারীকে হয়তো সীতা পতিবিরহিতা করেছিলেন, এই জন্মে তার ফল ফলছে—তাই সীতার এহেন দুর্ভোগ।

॥ ৬ ॥ চেতনাসঞ্চার হইলে, সীতা……তাহার অধিকার-বহির্ভূত নই।

[চতুর্থ পরিচ্ছেদ। অনু. ১৭]

হৃতচেতন সীতা চেতনা ফিরে পেয়ে নিজের হৃদয়যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে, স্বামী রামচন্দ্রের কথাই শুধু ভাবতে লাগলেন—সীতাকে নির্বাসনে দিয়ে শ্রীরাম

নিশ্চয়ই নিতান্ত অস্থির হয়ে পড়েছেন, এতক্ষণে কত-না কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। কাজেই, লক্ষ্মণকে সীতার অনুরোধ, অযোধ্যায় সত্বর ফিরে গিয়ে তিনি যেন রামকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করেন। সীতানির্বাসনের জন্যে রামচন্দ্রের ক্ষোভ কিসের? প্রজানুরঞ্জন তো রাজার বড়ো একটি কর্তব্য, সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে তিনি রাজধর্মই পালন করেছেন। শ্রীরাম কর্তব্যনিষ্ঠ মহৎ রাজ্যপাল, এবং পতিপ্রাণা সীতার ঐকান্তিক কামনা, জন্মে জন্মে এরূপ স্বামী যেন তিনি পান।

॥ ৭ ॥ সীতাকে বনবাস দিয়া, রাম……তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল।

[পঞ্চম পরিচ্ছেদ। অনু. ১]

সীতাকে শ্রীরাম নিজপ্রাণের মতোই ভালবাসিতেন, উভয়ের দেহ ভিন্ন হলেও দুজনে ছিলেন একাত্ম। সীতার পাতিব্রত্যবিষয়ে রামচন্দ্র একটুকু সংশয় পোষণ করতেন না। প্রজাবর্গের মনস্তুষ্টির জন্যেই শ্রীরামকে এহেন শুদ্ধশীলা স্বামীগতপ্রাণা রমণীকে নির্বাসিত করতে হলো। সীতা-বিরহিত রামের আত্মিক অস্তিত্ব আজ বিপন্ন, নিদারুণ যন্ত্রণা তাঁর হৃদয়দেশটিকে আচ্ছন্ন করেছে। শোকাতুর রামচন্দ্র বহির্জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে একান্তে বসে প্রাণপ্রিয়তমার কথা ভাবতে লাগলেন।

॥ ৮ ॥ লক্ষ্মণ পুনরায় পরম যত্নে……রাজকার্যে মনোনিবেশ করুন।

[পঞ্চম পরিচ্ছেদ। অনু. ২]

শোকবিদ্ধ চেতনাহারা রামের সংজ্ঞা ফিরিয়ে এনে লক্ষ্মণ নানাভাবে তাঁকে প্রবোধ দিতে লাগলেন—তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা, শোকাচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠে অগ্রজ যথাপূর্ব রাজকার্যে মনোনিবেশ করুন। তিনি এই বলে রামকে বোঝাতে লাগলেন যে সীতাবর্জন-ঘটনা অদৃষ্টের চক্রান্ত: তা না হলে তিনি নিরপরাধা প্রিয়তমা পত্নীকে বিসর্জন দিবেন কেন! আর শ্রীরামের ন্যায় একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি তো নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে জগৎপ্রবাহ অস্থির, চঞ্চল—বিরহমিলন, জীবনমৃত্যু সবকিছুই কালধর্মে সংঘটিত হয়—তাঁর মতো ব্যক্তির শোকে বিহ্বল হয়ে পড়া কি সংগত। লক্ষ্মণের অনুরোধ, শ্রীরাম শোক পরিহার করুন, রাজকার্যে আবার মন দিন—লোকসেবকের শোকাভিভূত হওয়া অবিধেয়।

॥ ৯ ॥ রাম কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া……কলঙ্ক ঘোষণা করিবেক।

[পঞ্চম পরিচ্ছেদ। অনু. ৫-৬]

লক্ষ্মণের কথায় শ্রীরামচন্দ্র বুঝতে পারলেন, শোকের বেগে ভেসে-যাওয়া উচিত নয়, কর্তব্যকর্মের শাসনে শোককে সংযত না করলে ক্রমেই তা বেড়ে যাবে। বিশেষত, যে প্রজানুরঞ্জনের প্রেরণায় জানকীবিসর্জনের মতো ভয়নক কাজ তিনি করেছেন, এখন শোকে মজ্জমান থেকে রাজকর্তব্যের প্রতি উপেক্ষা দেখালে, অ

ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ সত্যটি উপলব্ধি করে রামচন্দ্র অবিলম্বে রাজকার্যে যোগ দিতে মনস্থ করলেন। কিন্তু তীব্র শোক কাটিয়ে ওঠা কি সহজ, বিরহযন্ত্রণা তাঁর চিত্তকে যে বিকল করে দিচ্ছে। রামের এই উপলব্ধি হলো: কী কঠিন রাজার কর্তব্য, কোন্ সুখে যে রাজত্ব মানুষের অভিলষিত তা রামচন্দ্র বুঝে উঠতে অক্ষম। নিজে রাজা হওয়ার জন্যেই তো তাঁকে হৃদয়ের সমস্ত কোমল বৃত্তি উৎপাটিত করে পত্নীকে বিসর্জন দিতে হলো, আর, ভবিষ্যতের জন্যে তিনি কুড়িয়ে গেলেন কেবল স্তূপীকৃত অপযশ।

॥ ১০ ॥ এ পর্যন্ত রাম, সীতাগতপ্রাণ বলিয়া····· অন্যথাভাব ঘটিয়াছে।

[ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। অনু. ১১]

সীতা, রাম কর্তৃক নির্বাসিতা হয়েও, এতকাল এই ভেবে নিজের মর্মযন্ত্রণা ভুলতে চেষ্টা করেছেন যে, প্রজানুরঞ্জনের জন্যে বাধ্য হয়েই স্বামী তাঁর প্রতি নির্দয়তা দেখিয়েছেন; তাই রামের ভালোবাসায় তাঁর অণুমাত্র সংশয় জন্মেনি। আজ কিন্তু সীতার ওই ভাবনার মোড় ঘুরল—সস্ত্রীক রাজাই কেবল অশ্বমেধযজ্ঞ করতে পারেন। তবে কি রামচন্দ্র পুনর্বার বিবাহ করেছেন, তাহলে তো সীতার প্রতি রামের ভালোবাসা অচল নেই—এই ভেবে সীতা একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

১১ ॥ সীতা নিতান্ত আকুলচিত্তে···· সৌভাগ্যগর্ব আবির্ভূত হইল।

[ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। অনু. ১২-১৩]

স্বামী রামচন্দ্রের যে-ভালোবাসা দুঃখিনী সীতার জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু, সেই ভালোবাসা হারিয়েছেন মনে করে সীতা বিশ্বভুবন অন্ধকার দেখছিলেন, জীবন তাঁর কাছে একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পুত্রদ্বয়ের মুখে যখন শুনলেন, সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিকৃতি গড়ে শ্রীরাম যজ্ঞকার্য সম্পাদন করেছেন, তখন মুহূর্তে তাঁর সমস্ত শোকবেদনা দূর হলো, আনন্দাশ্রুতে দুচোখ পরিপ্লাবিত হলো, নির্বাসনদুঃখ তিনি ভুলে গেলেন।

॥ ১২ ॥ তাহার দুই সহোদরে তদীয়··· প্রীতিরসে পূর্ণ না হয়।

[সপ্তম পরিচ্ছেদ। অনু. ৩]

বাল্মীকির নির্দেশে লবকুশ রামায়ণ গান করে, শুনে সকলেই অভিভূত হয়। এ গানে মুগ্ধ না হয়ে কারুরই উপায় ছিল না। কারণ, শ্রীরামের পুণ্যচরিত্র নিয়ে মহর্ষি অনুপম ছন্দিত ভাষায় ওই কাব্য রচনা করেছেন; তদুপরি গায়ক-দুজন যেমন সুকণ্ঠ তেমনি প্রিয়দর্শন; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বীণাযন্ত্রের সুললিত ধ্বনি; যেখানে এতগুলি গুণের একত্র সমাহার, তা মনোজ্ঞ হবে না কেন?

॥ ১৩ ॥ বাল্মীকি পূর্বেই কুশ ও লবকে……রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।
[অষ্টম পরিচ্ছেদ। অনু. ৩]

লবকুশের গান আরম্ভ হলো। গানের কথাবস্তুতে রামসীতার প্রণয়প্রসঙ্গ বর্ণিত। গান শুনে রামচন্দ্র আত্মহারা হয়ে পড়লেন। এই শিশুগায়ক-দুইটির আকৃতির সঙ্গে শ্রীরাম ও সীতার অবয়বসাদৃশ্য সকলেই লক্ষ্য করলো। শ্রোতাদের মুগ্ধদৃষ্টি সুদর্শন লবকুশের প্রতি স্থিরবদ্ধ।

॥ ১৪ ॥ সীতা, কৌশল্যার প্রেরিত……তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই।
[অষ্টম পরিচ্ছেদ। অনু. ১৬]

কৌশল্যার প্রেরিত শিবিকা দেখে সীতা ভাবলেন, ভাগ্যদেবতা এতদিনে তাঁর প্রতি বুঝি প্রসন্ন হলেন—তবে স্বামীর সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলনলগ্ন সমাগত। রামচন্দ্রের প্রণয়ানুরাগ সম্বন্ধে সীতা সংশয়ান্বিতা ছিলেন না কখনো, তাঁর [সীতার] স্বর্ণমূর্তি নিয়ে যজ্ঞ করে তিনি তো পত্নীপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন; আর তাঁকে যে শ্রীরাম নির্বাসিত করেছেন তা তো লোকরঞ্জনের অনুরোধে। এখন স্বামীকর্তৃক পুনর্গৃহীতা হতে চলেছেন, এই ভেবে সীতার চিত্ত স্ফুরিত হতে লাগলো।

॥ ১৫ ॥ রাম, অতিমহতী লোকানুরাগপ্রিয়তার……এরূপ বোধ হয় না।
[অষ্টম পরিচ্ছেদ। অনু. ২০-২১]

সর্বজনসমক্ষে আবার নিজের শুদ্ধতার নিঃসংশয় প্রমাণ দিতে হবে শুনে সীতা যেন বজ্রাহত হলেন এবং সহসা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। তখন রাজসভায় শোকের ঝড় বয়ে গেল। কুশলব আর্তনাদ করে উঠল, শ্রীরাম আর জননী কৌশল্যা চেতনা হারালেন। শতচেষ্টাতেও সীতার চেতনা ফিরিয়ে আনা গেল না—তিনি মৃত্যুর দেশে পদক্ষেপ করেছেন। নম্রতায়, সরলতায় ও পাতিব্রত্যে সীতা অনুপমা। সর্বগুণান্বিতা হয়েও তিনি আমৃত্যু বর্ণনাতীত দুঃখ ভোগ করে গেলেন—এমন ভাগ্যলাঞ্ছিতা নারী কুত্রাপি দেখা যায় নি।

প্রীতিসংসারে সর্বব্যাপিনী। মানুষের সংসারে তার চিত্রটি রসে-বর্ণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, অন্যত্র হয়তো প্রচ্ছন্ন। অন্যত্র যা স্বভাব-মাত্র, মানুষ তাকে নানা আয়োজনে সাজসজ্জায় পরিপূর্ণ করে তুলে আস্বাদন করে। এই আস্বাদনের অভ্যাস ক্রমে মানুষকে পরস্পরের বন্ধনে জড়িত করে দেয়। পরিবেশ যদি ছিন্ন করে দেয়, পশু তবে একাকী বাস করতে পারে। কিন্তু 'মানুষের মন চায় মানুষের মন' একাকীত্বের নির্বাসনে মানুষ বাঁচতে পারে না। তাই, সে তার চারপাশে একটি স্বরচিত সমাজ গড়ে তোলে, ভালোবাসার সূত্রবন্ধনে রচিত সেই সমাজের মধ্যেই তার সার্থক অধিবাস।

একভাবে ভেবে দেখতে গেলে সমগ্র সৃষ্টির মূলেও তো এই প্রীতিরস সিঞ্চিত হয়ে আছে। ঈশ্বরের অভিপ্রেত এই সৃষ্টির তাৎপর্য কী? ঈশ্বর এক ছিলেন, তিনি বহু হবার ইচ্ছা করলেন। কেননা, সেই বহুত্বের মধ্যে নিজেকে তিনি আস্বাদন করতে পারবেন। সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে তাই প্রেমের সম্পর্ক, রসিক সাধকেরা এই তত্ত্ব আমাদের বলেন। কেবল সাধক কেন, কবিকণ্ঠেও তো এই মন্ত্রই আমরা থেকে থেকে ধ্বনিত হতে শুনি; 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে'। এই উপলব্ধি নিয়েই কবি গেয়ে ওঠেন: 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছ নীচে।' সেই প্রেমময় ঈশ্বরের অনুভব যদি আমার হৃদয়মধ্যে গাঢ় হয়ে ওঠে তো আমি বুঝতে পারি: 'যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা'। এই বিস্তীর্ণ জীবনভূমিতে এই ভালোবাসার ব্রত নিয়েই শক্তি পায় মানুষ, তার জীবন ফুলে-ফলে পল্লবিত হয়ে ওঠে।

॥ ৪ ॥ তোমাকে কখনও জানিতে পারিব না—জানিতে চাহিও না—যেদিন জানিব সেইদিন আমার সুখ যাইবে। কাম্য বস্তুর স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে?

—পতঙ্গ—[পৃ. ২৫]

মানবচরিত্রের এই বড়ো এক বিস্ময়, চিরকাল সে ধাবিত হয় অজানিতের উদ্দেশে। অজানাকে জানা, অধরাকে ধরা, অপ্রাপ্যকে পাওয়া—এই তার বিলাস।

কিন্তু কেন তার এই বিলাস? যে-বস্তুকে সে কামনা করে সেই বস্তুর গৌরবই কি এর কারণ? প্রথম প্রথম তাই মনে হয় বটে। ধনৈশ্বর্যে-পরিপূর্ণ জীবন যখন আমি প্রার্থনা করি তখন সন্দেহ থাকে না যে সে-জীবন গরিমাময়। কিন্তু যে-ব্যক্তি জীবনলাভে ধন্য হয়েছে সে কি নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করে? না, বরং দেখি সে অন্যতর কোনো জীবনের জন্যে মনে মনে ব্যাকুলতা বোধ করে। লৌকিক প্রাপ্তিই হোক অথবা অলৌকিক প্রাপ্তিই হোক, কোনো প্রাপ্তিতেই মানবচিত্ত একান্ত স্থির হয়ে থাকে না। এক চিরক্রন্দন তার বক্ষমধ্যে ধ্বনিত হতে থাকে: 'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোন্‌খানে'। তখন আমরা বুঝি যে, বস্তুর মহিমা আমাদের তত আকর্ষণ করে না, গোপনীয়তার রহস্য যত আকর্ষণ করে আমাদের। যা দূরে আছে, অপ্রাপ্য দুর্লভতার বিস্ময়ে ভরা আছে, তা যখন কাছে

পাই তখন হয়তো তাকে দেখি খুব সাধারণ। সেইজন্তেই যা হাতের মুঠোয় পাওয়া গেল তার চেয়ে দূরবর্তী-কিছু আমাদের অধিকতর প্রত্যাশার বস্তু। কবি তাই বলেন : 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।'

চাওয়া-পাওয়ার এই সমস্তার মধ্যে বস্তুত আরো একটা কথা লুকানো আছে। মানুষ কি বস্তুকেই চায়, না, দুর্লভকেই চায়? সুলভের চেয়ে দুর্লভের প্রতি কেন তার এই আকর্ষণ? কেননা, এর মধ্য থেকে সে গোপন একটি আত্মপ্রসাদ মনে মনে অনুভব করে। যা সুলভ, যা সকলেরই আয়ত্তগম্য, তাকে নয়—আমি অর্জন করে নিতে চাই অপর সকলের শক্তির অতীত এক দুর্লভ সামগ্রীকে—এই চেতনার মধ্যে আমার একটা শক্তির পরীক্ষা আছে। আত্মশক্তির অভিমানে মানুষকে দূরবর্তীর অভিমুখী করে।

॥ ৫ ॥ পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই। —আমার মন—[পৃ. ২০]

সুখ কী? শারীরিক আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তিরই নাম কি সুখ? আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে। ধন দাও, রূপ দাও, হিংসা দূর করো, যশ দাও—চণ্ডীর কাছে আত্মনিবেদনেও এই মন্ত্র আমরা উচ্চারণ করে থাকি। কিন্তু হিংসা কি দূর হয়? ধনজন রূপযশের কামনা আমাদের ক্রমেই এক পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে, কার চেয়ে কার অধিকার বেশি হবে এই প্রতিযোগিতায় আবিল হয়ে ওঠে মানবচিত্ত। অথবা যদি তা নাও হয়, এই প্রতিযোগী সংঘর্ষ থেকে নিজেকে যদি দূরবর্তী করেও রাখি, তথাপি দেখি অভিলষিত সুখে আমার হৃদয় নিবৃত্ত হয় না। কেননা, পার্থিব এই সুখকামনাগুলির কোনো অন্ত পাওয়া যায় না। একের পর দুই, দুয়ের পরে তিন, তিনের পরে চার—এমনি করে আমাদের প্রত্যাশা কেবলই ঊর্ধ্বে থেকে ঊর্ধ্বতরে চলে যায়, আর, এক চিরকালীন সুখহীনতায় আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

মানসিক সুখ বা তৃপ্তিলাভের উপায় তবে এ নয়। সন্তোষের চেয়ে বড়ো আর-কোনো সুখ নেই, এবং এই সন্তোষ অর্জন করতে হলে যথার্থ মানবিকতার দীক্ষা নিতে হবে। যথার্থ মানুষ জীবজগতে আপন শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করে। সে বলে, যদিও আমি জীব তথাপি জীবপ্রকৃতিকে আমি স্ববলে অস্বীকার করতে পারি।

আত্মরক্ষণ জীবপ্রকৃতির স্বভাবজ ধর্ম। মানুষও যে অন্ধভাবে এই ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয় না এমন নয়। কিন্তু এই পৃথিবীতেই কত মহামানবকে আমরা প্রত্যক্ষ করি যাঁরা অকাতরে পরহিতের কামনায় আত্মবিসর্জন করেন। জীবদেহ নশ্বর, যে-কোনো একদিন পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাওয়া তার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী—এই যখন আমি জানি, তখন কোনো স্থায়ী মঙ্গলের জন্যেই কেন আমরা প্রাণ বিসর্জন করি না? মহাজনেরা এইভাবে চিন্তা করেছেন বলেই দেশে দেশে যুগে যুগে

কত ধর্মাধিনায়ক, দেশনেতা, সমাজসংস্কারক, আমাদের সামনে আবির্ভূত হতে পেরেছেন।

এই আত্মবিসর্জন কোন্ আত্মে'র বিসর্জন? আমাদের অস্তিত্বের যে-অংশ ধূলিশয়ান, প্রাত্যহিক সাংসারিক লোভের দ্বারা জীর্ণ, সেই আত্মার বিসর্জন। কিন্তু এই বিসর্জনের দ্বারা আমরা আমাদের মধ্যে অপর এক সুপ্ত অংশের আবাহণ সম্পন্ন করি, নিজেদের উন্নীত করে তুলি আধ্যাত্মিক সীমায়। এই অধি-আত্মার উপলব্ধিই মানবজীবনের পরম সুখ। একবার যে সেই সুখের মহিমা জেনেছে সে নিজেকে অমৃতের পুত্র বলে জগৎসমক্ষে ঘোষণা করে দিতে পারে।

॥ ৬ ॥ চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী।

—বিড়াল—[পৃ. ৪১]

[উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেন্টাল, ১৯৬০]

ন্যায়ের বিচার সামাজিক বিচার। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। আপন অভিরুচিতেই সে সমাজ গড়ে তুলেছে, সেই সমাজরক্ষার দায়িত্বও তাই তার। কীভাবে সমাজ রক্ষিত হবে? পারস্পরিক বিশ্বাসমতে কতকগুলি পদ্ধতি আমরা গড়ে তুলেছি। এটা করতে নেই, ওটা করা অপরাধ—ইত্যাকার নির্দেশনাময় একরকম অপরাধবোধ সমাজভূমিতে স্থিরীকৃত হয়ে আছে।

'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়' এই শিক্ষা আমরা লাভ করি একেবারে শিশুবয়স থেকে। পরিণত মানুষের কাছে এ অতি-সহজ বিচার যে, চোর শাস্তির যোগ্য।

কিন্তু পরিণত-মানুষ কি কেবল এটুকু বিচারেই শান্ত হতে পারে? সে যেমন অপরাধের শাস্তিবিধান করে, তেমনি, অপরাধের মূল উৎপাটনেরও চেষ্টা করে। 'পাপীকে ঘৃণা করো না, পাপকে ঘৃণা করো' এই মহাজনবচন উচ্চারণেরও মূলে আছে সেই উৎপাটনের প্রয়াস। চোর কেন চুরি করে? স্বভাবে? যে চোর সে-ও তো মানুষ। আর-পাঁচজন মানুষের মতো নয় কেন সে? মানুষ কি স্বভাবতই অসৎস্বভাব, অথবা পরিবেশের চক্রান্তক্রমে তাকে নীতিভ্রষ্ট করে তোলে? এইসব মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে আর তখন আমরা বধির হয়ে থাকতে পারি না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি সামাজিক ব্যবস্থাপনার মধ্যেই অন্যায়ের বীজ উপ্ত হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু পৃথিবীর কোনো কোনো সমাজব্যবস্থায় দেখি যে, এই প্রাথমিক ভিত্তিগত দাবী থেকে জনতাকে বঞ্চিত রেখেছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী এই ব্যক্তিবর্গ সমগ্র ধনসম্পদ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিয়েছে, আর, যাদের রক্তপাতে শরীরপাতে সমস্ত সভ্যতার প্রাসাদ গড়ে উঠেছে, তাদের নিক্ষেপ করে দিচ্ছে ক্ষুধাকাতর হাহাকারের মধ্যে। নিঃস্ব মুমূর্ষু এই জনসাধারণ কি তখন সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করবে, ধর্মাধর্মের চুলচেরা বিশ্লেষণে কালপাত করবে?

তারা তখন আত্মরক্ষার জন্যে মরীয়া হয়ে ওঠে। একদিকে কেউ হয়তো আত্মহত্যায় প্রলুব্ধ হয়, অন্যদিকে কেউ চলে আসে আত্মার হত্যায়। তারা কেড়ে খায়, যদি শক্তির অভাব ঘটে তবে অগত্যায় চুরিই তাদের জীবনরক্ষার একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়ায়।

সন্দেহ নেই যে; ধার্মিকের চোখে, নৈয়ায়িকের চোখে, এই চৌর্য দূষণীয়। কিন্তু মানবিক চোখে? এই দৃশ্য অন্যায়ের মুখে অসহায় এই জনতাযূথকে তাড়িত করে আনল কে? সমাজশাসক ধনীসমাজ। সেই সমাজের অনেক অর্থ, এবং আরো অনেক তাদের অপচয়। সেই অপচয় রুদ্ধ করে; তাদের হাতে সঞ্চিত বহুলতম অর্থভাগ বাহিরসমাজে মুক্ত করে জীবনের এই অপচয় কি তারা রোধ করতে পারত না? যে চোর, সে চৌর্যের অপরাধে দোষী। কিন্তু মমতাহীন উচ্ছৃঙ্খল এই ধনিকসমাজ কি সাধু মানুষকে চোর বানাবার নিষ্ঠুরতম অন্যায়ে অপরাধী নয়?

॥ ৭ ॥ পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষেই হউক আর যাই হউক, কখনও তো এ পর্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না।
—কমলাকান্তের জোবানবন্দি—[পৃ. ৬৩]

সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে এক মহাশক্তি সততা সক্রিয়। সেই শক্তির পরিমাণ কী, প্রকৃতি কী, তার কোনো আকার আয়তন আছে কিনা, মানুষ তা ধারণা করতে পারে না। ধারণাতীত এই মহা-উৎসকেই আমরা নাম দিয়েছি ঈশ্বর। ঈশ্বর অনন্ত, অনাদি। কোনো সীমার বন্ধনে তাঁকে আমরা কখনোই কল্পনা করতে পারি না, কেননা, তিনি অসীম।

তবু মানুষের কল্পনা কোনো একটি স্পষ্ট রূপ ছাড়া স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না। যা ধারণাতীত তাকেও মানুষ নিজ ধারণার দ্বারা অধিগম্য করতে চায়, মূলত যা অরূপ তাকেও সে কোনো রূপের বন্ধনে নিয়ে আসতে উৎসুক। কোনো কোনো ধর্মসম্প্রদায় অবশ্য অসীম নিরাকার ঈশ্বরেরই ধ্যান করে, কিন্তু কোনো কোনো সম্প্রদায় তাকে নিজ-কল্পনানুসারে কতকগুলি প্রতিমামূর্তির আয়তনে নিয়ে আসে এবং সেই মূর্তির মধ্যে তাদের দেবতাকে যেন প্রত্যক্ষ করে।

যেন প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ করে না। কেননা, চাক্ষুষ দৃষ্টির দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি কেবল ইন্দ্রিয়গম্য বস্তুকে। যা বস্তু নয়, অনুভব—তাকে কি আমরা প্রত্যক্ষ করি? আর, ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনুভব তো সকল অনুভবের সেরা অনুভব, গভীরতম অনুভব। ধর্মের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে গুহার মধ্যে, সকলে তা সহজে দেখতে পায় না; শাস্ত্র তাই একথা বলে। তাই, ঈশ্বরপ্রেমী বা ঈশ্বরবিশ্বাসী হওয়ার অর্থই এ নয় যে ঈশ্বরকে তিনি প্রত্যক্ষ দেখতে পাবেন, সাধকেরা তাকে দেখতে পান হৃদয়ানুভবের মধ্যেই জীবন্ত।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্মরণীয় যে, হিন্দুসমাজের কোনো কোনো ধর্ম

এই দাবি খুব প্রবলভাবেই ঘোষণা করেন যে, ঈশ্বর তাঁদের সামনে প্রত্যক্ষ 'রূপ'-এর মতোই সত্য। চৈতন্যদেব যে কেবল কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদপ্রায় হয়েছিলেন তাই নয়, কৃষ্ণরূপ তিনি অহরহ তাঁর সামনে চাক্ষুষ করেছেন, এই অলৌকিক বিশ্বাসই আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস। আবার, এই সেদিনই তো আমাদের জীবনের মধ্যে ছিলেন আধুনিক কালের সাধকচূড়ামণি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। রামপ্রসাদের গানে মাতাপুত্রের যে-অভিমানসম্পর্ক রচিত হয়েছিল, রামকৃষ্ণ যেন তারই মূর্তিমান রূপ পরিগ্রহ করে এলেন। কালীমূর্তি তাঁর কাছে কেবল মৃন্ময় হয়ে রইল না; নিবিড় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি এই দাবি ঘোষণা করলেন যে, কালীমাতা তাঁর সামনে সর্বতোভাবে প্রত্যক্ষ। ফলে, একথা আমরা বলতে পারি না যে, পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করার দাবি কারো নেই। মাত্র এই পর্যন্ত আমরা স্বীকার করতে পারি যে, অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই এই প্রত্যক্ষীকরণ সম্ভবপর নয়, এবং অনেক ধর্মসম্প্রদায় এই বিষয়টিকে উপহাস্য বলেও মনে করেন।

বস্তুসংক্ষেপকরণ

॥ ১ ॥ রমণীমণ্ডলী এ সংসারের নারিকেল……পরিত্যাগ করাই ভাল।

—মনুষ্যফল—[পৃ. ৯-১০] [শব্দসংখ্যা প্রায় ২৭৫]

নারীজাতির সঙ্গে নারিকেলের একটি সাদৃশ্য আছে। নারিকেলের জল যেমন শ্রমহর, তৃপ্তিদায়ী, নারীর স্নেহও তেমনি। জীবনপথের নানা সংগ্রামে মানবচিত্ত যখন ক্ষতবিক্ষত হয়, নারীর স্নেহভালোবাসাই তখন তার সবচেয়ে বড়ো পাথেয়। নারীর সংসারবুদ্ধির সঙ্গে তুলনীয় নারিকেলের শস্য। তরুণ বয়সে এই বুদ্ধির মাধুর্যময়তার দিকটিই মাত্র লক্ষ্য করা যায়, প্রবীণতার সঙ্গে সঙ্গে তা কঠিন বিবেচনাময় হয়ে ওঠে। নারিকেল ভাঙলে তবেই তার মালা পাওয়া যায়, তাই সবসময়ে সে অর্থেক। নারীর বিদ্যাও তেমনি অসম্পূর্ণ এবং নিষ্প্রয়োজন। আর, নারীর রূপ নারীকেলের ছোবড়া, সংসারজীবনের পক্ষে ঐ দুই-ই সমানভাবে পরিত্যাজ্য। এইভাবে নারী ও নারিকেলের তুলনা সাজানো সম্ভব।

॥ ২ ॥ বাবুর বৈঠকখানায় সেজ জ্বলিতেছে……মরিতে পাব না?

—পতঙ্গ—[শব্দসংখ্যা প্রায় ২৪০] [পৃ. ১৪-১৫]

নসীরামবাবুর বৈঠকখানায় একদিন কমলাকান্ত আফিমে নেশাচ্ছন্ন। বৈঠকখানার আলোর চতুর্ধারে এক পতঙ্গ গুঞ্জনধ্বনিতে উড্ডীয়মান। নেশার ঘোরে কমলাকান্ত যেন পতঙ্গের কথা শুনতে পেলেন, যেন আলোর সঙ্গে পতঙ্গের কোনো

আগে প্রদীপের আলোর চারিদিকে কোনো কাচের ঘেরা ছিল না, তাই পতঙ্গ অনায়াসে উড়ে আসত এবং পুড়ে মরত। এখন কাচের আবরণ তার এই

মৃত্যুপথের বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু এই মৃত্যু যখন সে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিচ্ছে, বিধবা হিন্দুনারীর প্রতি যেমন সহমরণদণ্ড প্রয়োগ করা হয় সে-রকম পর-প্ররোচিত নয় যখন তার মৃত্যু, তখন এই আবরণের বাধা কেন, পতঙ্গ তা বুঝতে পারে না।

॥ ৩ ॥ আমার মন কোথায় গেল……মন চুরি করেন নাই।

—আমার মন—[শব্দ সংখ্যা প্রায় ২৩৫] [পৃ. ১৮-১৯]

কমলাকান্ত তাঁর হারানো মনের অন্বেষণে ব্যাপৃত। রান্নাঘরে তাঁর মন পড়ে আছে কি? বর্ণগন্ধময় বিচিত্র সুপাচ্য ভোজ্যের আয়োজন যেখানে, সেখানে যে মনের আকর্ষণ আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। পোলাও-কাবাব কোফতা মাছ-মাংস-লুচি ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করে, সেই ক্ষুধার অনুসরণে মন হয়তো পাকশালা-অভিমুখী হয়। এই সুখাদ্য যিনি রন্ধন করেন ও পরিবেশন করেন, কুৎসিতদর্শনা বৃদ্ধা হলেও তাঁকে সুন্দরীতম বলে বোধ হয়। কিন্তু আজ কমলাকান্ত অনুভব করছেন যে, তাঁর মন এখন এ-সব ভোজ্যবস্তুর প্রতি নিবিষ্ট হয়ে নেই, অন্যত্র তার অনুসন্ধান করতে হবে।

॥ ৪ ॥ দেখিলাম অকস্মাৎ……তাঁহার ভাবনা কি?

—আমার দুর্গোৎসব—[পৃ. ৩৬-৩৭] [শব্দসংখ্যা প্রায় ৩৩০]

অনন্ত অন্ধকারাশ্রিত কালস্রোতে ভাসমান কমলাকান্ত আজ একাকী। সে তাই আজ ভীতত্রস্ত হৃদয়ে তার দেশজননী বঙ্গভূমির জন্যে আর্তনাদ করে। শারদীয়া দুর্গা-প্রতিমা শত্রুনিপীড়ক উজ্জ্বল বরাভয়মূর্তি যেন তার মানসনয়নে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভাগ্য বিদ্যা বল ও সিদ্ধির প্রতিরূপে মহামাতার সঙ্গে আছেন লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিকেয় গণেশ। এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের চিত্র অতীতের গর্ভে লীন হয়ে গেছে, কিন্তু এই চিত্রই আমাদের সকল ভরসাস্থল, সকল শক্তির মূল উৎস।

তাই, কমলাকান্ত আজ এই মাতৃমূর্তির পদতলে তার ব্যাকুল পূজা নিবেদন করে। সে তো একা নয়, সমগ্র দেশবাসী কোটি কোটি সন্তান একত্র ভক্তিভরে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় সেই মাতৃস্বরূপকে আজ আবাহন করবে। নৈরাশ্যের তবে কোনো কারণ নেই। ধনধান্যে-পরিপূর্ণ যে ধরিত্রী আমাদের ধাত্রীমাতা, তাঁর কাছে আমরা সকল শক্তির প্রসাদলাভে ধন্য হব।

॥ ৫ ॥ ভৃঙ্গরাজ বলিতে লাগিলেন…চোঁ-বোঁই কি এত কত কটু? [পৃ. ৫৯-৬০]

—বাঙালীর মনুষ্যত্ব—(শব্দসংখ্যা প্রায় ২৫০)

ভ্রমর অবিরত গুঞ্জনধ্বনি তুলে উড্ডীয়মান। কিন্তু কেবল ভ্রমর নয়, বাঙ্‌লাদেশের সর্বত্রই সকল সময়ে এই গুঞ্জনধ্বনি কানে বাজে। রাজামহারাজার উমেদারি দলভিত্তিরাবে, আবার, রাজা হবার প্রত্যাশা যাঁর মনে তাঁর উমেদারী রাজদ্বারে। ইংরেজিশিক্ষিত যুবাপুরুষেরা চাকুরীপ্রার্থী হয়ে দ্বারে দ্বারে উমেদারিতে রত। উকিল রা কোর্টে অবিরাম সত্যমিথ্যার জাল বোনে আর জজসাহেবদের খোশামোদ করে।

দেশহিতৈষীরা অবিরাম বক্তৃতাস্রোতে দেশকে ভাসিয়ে দেন। আবার, লেখক-নামে পরিচিত ব্যক্তিদের তো কথার কোনো অবসানই নেই। এইভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, অবিরাম কথা-বলার আর কাজ না-করার অপরাধ দেশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, ভ্রমর কিছু দলছুট নয়।

মর্মার্থলেখন

॥ ১ ॥ বহুকাল-বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায়……
তোমার হৃদয়কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।
—একা—(পৃ. ৩-৪)

মানবহৃদয় সঙ্গপ্রত্যাশী। সঙ্গের অভাব তার পক্ষে নিতান্ত বেদনাদায়ক। এই বেদনা হয়তো অনেক সময়ে সুপ্ত থেকে যায়, কিন্তু কখনো কখনো অদম্যরূপে তার প্রকাশ ঘটে। বহির্জগৎ যখন আনন্দে উচ্ছল, প্রকৃতি যখন সৌন্দর্যের সাজ পরে, তখনই, মানবহৃদয় এই দুঃখ আরো অধিকভাবে অনুভব করে। কেননা, তখন সে দেখে, জাগতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করার উপযুক্ত আনন্দ তার মধ্যে সঞ্চিত নেই। তাই, সৌন্দর্য নিঃসঙ্গ হৃদয়ের সুপ্ত বেদনাকে জাগিয়ে দেয়। এ কাজ সবচেয়ে বেশি করে যা করতে পারে তা হলো সংগীত। সংগীতধ্বনি একবার আমাদের অন্তরতম সত্তাকে এই সত্য জানিয়ে দিয়ে যায় যে, সকলের সঙ্গে মিলনপ্রয়াসেই জীবনের সার্থকতা।

॥ ২ ॥ সে সুখ আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী……
কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনদী।
—একা—(পৃ. ৫৬)

পৃথিবীতে সুখদুঃখ ভালোমন্দ সবই একাকার মিশ্রিত হয়ে আছে। মানুষ তার যৌবনকালে সুখটিকে, ভালোটিকে নির্বাচন করে দেখতে জানে; কেননা যৌবনে মানুষ অনেক ভবিষ্যৎ-আশা তার সামনে দেখে, আপন শক্তির গৌরবে যৌবনে আর-পাঁচটা জিনিসকে তুচ্ছ করতে পারে। কিন্তু বার্ধক্যে, যখন সমস্ত সম্ভাবনা অতিক্রম করে জীবন প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখী এসে পৌঁছায়, তখন মানুষ অনেক অভিজ্ঞ। সেই অভিজ্ঞতার প্রভাবে সে কথা আর মনে করতে পারে না যে, এই পৃথিবী কেবল আনন্দময়, তার দুঃখের ছিদ্রের দিকগুলিতে তখন তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

॥ ৩ ॥ এ দেশের সিবিল সার্বিসের সাহেবদিগকে……
তার পরে ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে পারো।
—মনুষ্যফল—(পৃ. ৮)

ব্রিটিশযুগে এদেশের শাসনব্যবস্থায় উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন দূরদেশের ইংরেজরা। তাঁদের বাহিরের জৌলুস অনেক, কিন্তু যোগ্যতা সামান্যই। অনেক

লোক সেই জৌলুসে মুগ্ধ হয়। তাঁদের ব্যবহার অসৌজন্যমূলক, আক্রমণাত্মক। তবে বিনয়ের দ্বারা, অবিরাম সেলাম-খোসামোদের দ্বারা, যদি আপ্যায়ন করা যায় তবে তাঁরা বশীভূত হতে পারেন।

॥ ৪ ॥ দেখ, পুড়িয়া মরিতে আমাদের······

আমাদের সঙ্গে স্ত্রীজাতির তুলনা?

—পতঙ্গ—(পৃ. ১৫)

আলোয় পুড়ে-মরা পতঙ্গের স্বভাব। এই মরণ সে স্বাধীন ইচ্ছাতেই নির্বাচন করে নেয়। হিন্দুনারীকে যেমন একদিন মৃত স্বামীর চিতায় জীবন্ত দগ্ধ করা হতো, পতঙ্গের মৃত্যু তেমন অপরের দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়। এ মৃত্যু ভরসাহীনের মৃত্যু নয়, দগ্ধ হওয়াকেই পতঙ্গ তার পরম পরিণাম মনে করে।

॥ ৫ ॥ যদি জ্বলন্ত রূপে শরীর না ঢালিলাম······

জ্বলন্ত রূপশিখায় গা ঢালিব।

—পতঙ্গ—(পৃ. ১৫)

তীব্র রূপের আকর্ষণে হৃদয় স্বভাবত আলোড়িত হয়। সেই রূপ হৃদয়ের পক্ষে শান্তিজনক অথবা মঙ্গলদায়ক নাও হতে পারে, তথাপি রূপের প্রতি বিমুখতা অর্জন করা সম্ভব নয়। নিরন্তর অভ্যাসের পৌনঃপুনিকতা আমাদের ক্লান্ত করে দেয়, তার স্বভাবত আমরা নিষ্ক্রান্ত হতে চাই বৈচিত্র্যময় বহির্জগতে।

॥ ৬ ॥ মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক-একটি বহ্নি আছে

আমরা পতঙ্গ না তো কি?

—পতঙ্গ—(পৃ. ১৬-১৭)

কোনো একটা স্থির আকর্ষণ ভিন্ন মানুষ জীবনের আনন্দ খুঁজে পায় না। জ্ঞান, ধর্ম, রূপ, ধন, মান—কোন্ মানুষের যে এর কোন্‌টির প্রতি আসক্তি তা বলা যায় না, কিন্তু এমনি কোনো আসক্তি তার পক্ষে অপরিহার্য। সবাই যে তাদের কাম্য বস্তুর স্বরূপ জেনে চরিতার্থ হতে পারে এমন অবশ্য নয়, অনেকেরই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তারা হয়তো এক আকর্ষণ থেকে অন্য আকর্ষণে ঘুরে বেড়ায়, কোনটিরই শেষ পায় না। কিন্তু অনেকে এই চরিতার্থতা অর্জন করে, তাদের আমরা মহাপুরুষ বলে গণ্য করি। মানব-জীবনের এই আসক্তি এবং চরিতার্থতা-অচরিতার্থতার কাহিনী গড়ে ওঠে পৃথিবীর কাব্যসাহিত্য।

॥ ৭ ॥ লঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন চাই······

হায়, কে বলবে, কত দিনে!

—আমার মন—(পৃ. ২০-২১)

মানুষ সুখ অন্বেষণ করে। কিন্তু কিসে তার যথার্থ সুখ তা খুঁজে পায় না। ধন-যশ ইন্দ্রিয়সুখের আকাঙ্ক্ষা তাকে প্রলুব্ধ করে বটে, তবে দেখা যায় যে, শেষপর্যন্ত হৃদয় তার দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় না, সন্তোষ অনায়ত্ত থেকে যায়। তার কারণ

এই যে, আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কেবল আত্মপরতাই সক্রিয়। আত্মপরতায় সুখ নেই, আত্মপরতায় পরিজন-পরিবারকে অনেক দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু মূলত মানুষ সঙ্গলোভী। অপর হৃদয়ের সান্নিধ্যসংস্পর্শ তার একান্ত অভিলষিত। এই কামনা পরিপূরণ করতে গেলে মানুষকে একদিন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, পরের জন্যে যতটা অনুকম্পা অনুভব করা যায়, ততটাই সুখ মানুষ আয়ত্ত করে। পরসুখের জন্যে আত্মদানই আত্মসুখের পরম উপায়।

॥ ৮ ॥ কি ইংরেজী, কি, বাঙ লা, যে সাময়িক পত্র……
তোমারা স্বচ্ছন্দে পূজা করো। —আমার মন (পৃ. ২২-২৩)

আধুনিক সভ্যতা বাহিরের জাঁকজমককেই পরম উপাস্য বলে জ্ঞান করে। এই সভ্যতা বস্তুবাদী, ইহজাগতিক সুখচিন্তাতেই একান্ত মগ্ন। টাকার মূল্য তাই এ-জগতে অসীম। ইংরেজদের প্রভাবে বাঙ্লার সমাজজীবনেও এই অর্থকেন্দ্রিকতার সঞ্চার হয়েছে, ইংরেজদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে, বাঙালিও স্মিথ এবং মিল-এর জীবনদর্শনকে সকল দর্শনের সার বলে গণ্য করেছে। ইহজাগতিক মঙ্গল বা হিতবাদী চিন্তার জন্যে এই অর্থসঞ্চয়ে আধুনিক সমাজ এতই তৎপর যে, সে ভুলে যায় হৃদয়ের কোনো মূল্য আছে, সততার কোনো মূল্য আছে। সমস্তকিছুর বিনিময়ে এ-সমাজ অর্থের পিছনে ধাববান্।

॥ ৯ ॥ আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে……
কত কোটি ভক্ত ডাকিবে, মা! মা! মা!
—আমার দুর্গোৎসব—(পৃ. ৩৮)

দেশমাতৃকার প্রত্যক্ষগোচর রূপ হৃদয়মধ্যে অহরহ জাগ্রত করে না রাখলে দেশবাসী কর্মোৎসাহ পায় না। দেবমূর্তির অবয়বে সেই দেশ যেন আমাদের সামনে আজ উপস্থিত। যদি তাকে বরণ করে যথাযোগ্য উপাচারে পূজা নিবেদন না করি, যদি মনের দুষ্প্রবৃত্তিগুলিকে দূরীকৃত করে মাতৃপূজার আয়োজন না করি তবে আমাদের জীবন নিতান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। আর, মাতৃপূজায় যদি আমরা সার্থক হই, দেশময় তবে আনন্দোৎসবের নূতন আয়োজনে জনতাচিত্ত আলোড়িত হয়ে উঠবে।

॥ ১০ ॥ দেখো শয্যাশায়ী মনুষ্য, ধর্ম কী……
আমি তোমার ধর্মের সহায়।
—বিড়াল—(পৃ. ৪১)

অলস অকর্মণ্য মানুষ মনে রাখে না যে আত্মপরতা মনুষ্যধর্ম নয়, প্রকৃত মানুষ পরের মঙ্গলের জন্যে জীবন-উৎসর্জনেও প্রস্তুত থাকে। স্বেচ্ছায় এই মহৎ ধর্ম-পালনের জন্যে অনেকেই অগ্রসর হয়ে আসে না। কিন্তু পরিস্থিতিগুণে যদি একের অব্যবহৃত দ্রব্য অপরের উপকারের কারণ হয়, তবে তো কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। কেননা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে মনুষ্যধর্মের পথে অনেকটা অগ্রসর হয়ে গেল।

॥ ১১ ॥ আমি চোর বটে……তাহার দণ্ড হয় না কেন?

—বিড়াল—[পৃ. ৪৯]

চৌর্য একটি সমাজবিগর্হিত সর্বনিন্দিত অপরাধ। কিন্তু কোনো কোনো মানুষ কি স্বাভাবতই চোর? বিশ্লেষ করিলে দেখা যায় যে, নিদারুণ অভাবের তাড়নাই চৌর্যের মূল। জীবনরক্ষার জন্তে খাওয়াপরার সংস্থান সকলেরই প্রয়োজন। সমাজের কোনো কোনো ব্যক্তি যদি ধনৈশ্বর্যের ওপর তাঁদের সর্বময় প্রভুত্ব বিস্তার করেন তবে দেশে এক কৃত্রিম দারিদ্র্য সৃষ্ট হয়। দরিদ্রকে চৌর্যের পথে ঠেলে দিয়ে অর্থলোভী কৃপণ ধনীরাই এইভাবে অধিকতর দোষী হয়ে ওঠেন।

॥ ১২ ॥ দেখ, যদি অমুক শিরোমণি… · অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে।

বিড়াল—[পৃ. ৪২]

পৃথিবীতে সকলেই সমভোগাধিকার নিয়ে জন্মায়। কিন্তু সমাজের কৃত্রিম ব্যবস্থায় কেউ ধনী, কেউ বা দরিদ্র। দারিদ্র্যের দুঃখব্যথা ধনী উপলব্ধি করে না। অনেক সময়েই দেখা যায়, নিছক প্রাণধারণের জন্ম যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত আহরণ করে ধনী কার্পণ্যের সঙ্গে তা সঞ্চিত করে অথবা ঔদার্যের সঙ্গে তা বিলাসে-ব্যসনে নষ্ট করে। যাদের প্রয়োজন, তারা যদি এই নষ্ট অর্থ লাভ করত, মানুষের দুঃখ অনেকটা দূরীভূত হতো। কিন্তু অর্থবান্ ব্যক্তি যদি বা অর্থ ব্যয় করে তা কদাচিত যোগ্য সংপাত্রে অর্পিত হয়। একদিকে তা চ'লে যায় অপর অর্থবানেরই কাছে, আবার, অন্যদিকে তা সংগ্রহ করে খোসামুদে ব্যক্তিত্বহীন পারিষদবর্গ।

॥ ১৩ ॥ চোরকে ফাঁসি দাও ·····আমি আপত্তি করিব না।

বিড়াল—[পৃ. ৪৪]

সমাজরক্ষার্থে মানুষ কতকগুলি বিধিনিষেধের প্রবর্তন করেছে। এই বিধিনিষেধকে বলি আইন, এবং আইনভঙ্গকারী অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার রীতি সর্বত্র প্রচলিত। কিন্তু এই রীতি ব্যবহার করবার সময়ে আমরা যেন মানবিক বোধ থেকে বিচ্যুত না হই। চোরকে শাস্তি দেবার সময়ে যেন মনে রাখি যে, একদিন চোরও আর-পাঁচজন সাধারণের মতোই ছিল। নিদারুণ অভাববোধই তাকে এই পথে নিয়ে এসেছে। ঐশ্বর্যের স্বাচ্ছন্দ্যে আজ যারা সমাজে সাধুরূপে পরিচিত, অভাবের দুঃসহতা তাদেরও কি এই পথে টেনে আনতে পারত না? বিচারের কালে শুষ্ক আইননীতির কথা মাত্র মনে না ভেবে এই মানবিক দিকের বিবেচনাকেও যথোপযুক্ত মূল্য দিতে হবে।

॥ ১৪ ॥ তোমাদের জাতির ঘ্যানঘ্যানানি……ভালো লাগে না।

—বাঙালির মনুষ্যত্ব—[পৃ. ৬০-৬১]

আবেদন-নিবেদন এবং প্রভৃত প্রগল্‌ভতায় অভ্যস্ত বাঙালিসমাজের ভবিষ্যৎ খুবই দুশ্চিন্তার বস্তু। আপন আপন কর্তব্য নীরবে সম্পাদন করে বাঙালার প্রত্যেক

সবচেয়ে বড়ো মহিমা। অনেক কথা বলার চেয়ে অনেক কাজ করবার এই অভ্যাস যদি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তবেই মঙ্গল, নতুবা সমূহ বিপদ।

॥ ১৫ ॥ পূর্বকালে মহারাজ জেমজিৎকে……কি একটা right নয়?

—কমলাকান্তের জোবানবন্দি—[পৃ. ৭৭]

আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা আত্মিক শক্তির চেয়ে বাহুশক্তির ওপরেই অধিকতর নির্ভরশীল। এই শক্তিমত্ততার ফলে দেখা যায় 'জোর যার, মুলুক তার' এই নীতিই ইতিহাসের মূল মানদণ্ড হয়ে উঠেছে। ন্যায়অন্যায়ের বিচার এখানে অবান্তর। ন্যায়নীতিহীন প্রমত্ত এই অবস্থাকেই আজ আমরা সভ্য সমাজের অনুসরণীয় আদর্শ মনে করে গর্ব বোধ করি।

॥ ১৬ ॥ এদেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি ……ছড়াইয়া পড়ে।

—মনুষ্যফল—[পৃ. ১১]

বাঙলাদেশে যাঁরা দেশহিতৈষী নামে পরিচিত, তাদের বাহ্য আড়ম্বর যতটা, শক্তি ও যোগ্যতা ঠিক ততটা নয়। নানারূপে আত্মপ্রকাশ করবার জন্যে তাঁরা অত্যন্ত ব্যাকুল। কিন্তু সেদিকে তত মনোযোগী না হয়ে কর্মশীলতার অনুরাগী হলে হয়তো তাঁদের উপযোগিতা কিছু বাড়ত। যখন সত্যিকার কঠোর পরীক্ষা উপস্থিত হয়, তখন এই দুর্বল দেশহিতৈষীরা তাঁদের স্বরূপ প্রকাশ করেন; তখন আমরা দেখি যে, দেশে কেবল কিছু আবর্জনাই সঞ্চিত হয়েছে, ফললাভ কিছুমাত্র ঘটে নি।

॥ ১৭ ॥ অধ্যাপক-ব্রাহ্মণগণ সংসারের · · মাতিয়া উঠিয়াছে।

—মনুষ্যফল—[পৃ. ১১-১২]

সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতসমাজ কেবল দুরূহ শব্দসমাসের প্রতি মনোযোগী, দেশীয় চিত্তের যথার্থ বিকাশপ্রসঙ্গে তাঁরা নিতান্ত উদাসীন। সহজ স্বাভাবিকতার প্রতি তাঁদের আক্রোশ। তাঁদের ভাষায় হয়তো একটা নিজস্ব মাদকতা আছে, যার ফলে অনেক লেখক এই ভাষা মাঝে মাঝে তাঁদের রচনায় ব্যবহার করেন—কিন্তু এই ভাষার কোনো স্বাস্থ্যশ্রী নেই।

॥ ১৮ ॥ তুমি কি? . তা আমি……কাহার সুখ থাকে?

—পতঙ্গ—[পৃ. ১৬]

[illegible] একটি জীবনাদর্শের প্রতি স্থির আসক্তি মানুষের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। [illegible] লক্ষ্য করে সে ক্রমেই জীবনপথে অগ্রসর হতে পারে কিন্তু আদর্শের [illegible] আদর্শকে শেষ পর্যন্ত আয়ত্ত করা, তার পক্ষে তৃপ্তিকর নয়; কারণ, [illegible] আকর্ষণ কেটে যায়

চরিতকথা

ভাবসম্প্রসারণ :

॥ ১ ॥ মানবজীবনের যাতে স্ফূর্তি ধর্মের তথায় অধিকার। সাহিত্য মানবজীবনের স্ফূর্তি অতএব সাহিত্য ধর্মের অধিকারবহির্ভূত নহে।

[মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। পৃ. ৪৩]

অধুনা অনেকেই সাহিত্য-নামীয় শিল্পকর্মটিকে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে দেখতে অস্বীকৃত। এঁরা সাহিত্যের অন্তনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। এদের মতে ধর্মনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইত্যাদি কোনোকিছুরই প্রচারণা সাহিত্যে থাকবে না—সাহিত্যশিল্পের স্বাধীনতার সপক্ষে এঁরা। পক্ষান্তরে, কেউ কেউ আবার সাহিত্যকে ধর্মভাবনা থেকে বিমুক্ত-কিছু-রূপে দেখতে নারাজ। অবশ্য এই শ্রেণীর সমালোচক-গোষ্ঠী 'ধর্ম' কথাটিকে তার সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেননি ; 'ধর্ম' বলতে এখানে কোনো আনুষ্ঠানিক বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়—ইংরেজিতে যার প্রতিশব্দ হলো 'Religion'। য়ুরোপীয় 'রিলিজন' আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বরানুভূতির সঙ্গে যুক্ত ; কিন্তু ভারতীয় 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ আরো ব্যাপক—যা সমগ্র মানবজীবনকে ধারণ করে রয়েছে তাকেই বলি আমরা 'ধর্ম'। ভারতবর্ষীয় 'ধর্ম' মানবসত্তার সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটায়, মানুষের দৃষ্টিকে কল্যাণমুখী করে তোলে, মানুষকে মঙ্গলসুন্দর জীবনচর্যায় প্রাণিত করে। ধর্মবুদ্ধি ব্যতিরেকে ব্যক্তিজীবন কিংবা সমাজজীবন টিকতে পারে না। এ কারণে ধর্মকে আমরা লোকস্থিতি বা সমাজরক্ষার সহায়ক বলেই জানি।

এ-ই যদি ধর্মের স্বরূপ হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে, সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মানুষঙ্গের কোনো বিরোধ নেই। মানুষে মানুষে প্রীতিস্নিগ্ধ সম্পর্কস্থাপন, মানুষের অতীতে-ভবিষ্যতে সেতুরচন, মানবীয় সত্তার উদ্বোধন ঘটানো সাহিত্য এবং ধর্ম উভয়েরই লক্ষ্য। মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনই যদি উভয়ে চায় তাহলে সাহিত্যকে ধর্মের এলাকার বাইরে রাখি কেন? বস্তুত, ধর্ম কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করলে সাহিত্য আর ধর্মের মধ্যে সকল বিরোধ ঘুচে যায়। ভারতবর্ষীয় সাহিত্যকে ব্যাপক ধর্মচেতনার সঙ্গে যুক্ত করেই দেখেছে। এইযুক্তে ভারতবর্ষে বৈদিক সাহিত্যকে আমরা ধর্মের গণ্ডীভুক্ত বলেই জানি। এতে উচ্চতর [illegible] আদর্শ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এসব [illegible] হাত মেলাতে সাহিত্যের কোনো বাধা নেই।

॥ ২ ॥ বিজ্ঞানের ও সাহিত্যের দৃষ্টি একই দিকে।

[বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ১০০]

কেউ যদি হঠাৎ বলে বসে যে, সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ আছে, তাহলে এর প্রতিবাদে কিছু বলা সহজ হয় না। কেননা, স্থূলদৃষ্টিতে দেখলে উভয়ের মধ্যে তেমন কোনো লক্ষণীয় মিল খুঁজে বার করা কঠিন হয়ে পড়ে; মনে ধারণা জন্মে, উভয়ের পদক্ষেপ বুঝি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি ভূমিতে।

কাকে বলি বিজ্ঞান? যে-শাস্ত্র পরীক্ষা-প্রমাণ-যুক্তি ইত্যাদির যোগে এই বিশ্ব-সংসারের পদার্থরাজির সূক্ষ্মতত্ত্ববিষয়ে জ্ঞান আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে, আমরা বিজ্ঞান বলি তাকে। বাস্তব-সংসারকে নিয়েই এই শাস্ত্রটির কারবার। এখানে ব্যক্তিগত ভাবনা-অনুভূতির স্থান নেই, অবাস্তবমনোহর কল্পলোকে স্বপ্নপ্রয়াণের এতটুকু সুযোগে নেই—বিজ্ঞানের নির্ণীত সাধারণ সত্য [general truth] যুক্তির ওপর নির্ভরশীল, প্রমাণসাপেক্ষ—মানবসাধারণের প্রতীতিকে এ কখনো লঙ্ঘন করবে না।

পক্ষান্তরে, সাহিত্যের রূপলোকে গড়ে ওঠে সমাজবদ্ধ মানুষের বহুবিচিত্র ভাব ও ভাবনা আর রহস্যময় হৃদয়জগতের সূক্ষ্ম অনির্বাচ্য অনুভূতিকে ভিত্তি করে। এখানে লৌকিক-অলৌকিক, বাস্তব-অবাস্তব, প্রত্যক্ষগম্য সত্য ও অবন্ধন কল্পনায় অবাধ প্রবেশাধিকার রয়েছে। বিজ্ঞানী স্বপ্ন দেখেন না, দেখেন কবিশিল্পী ও সাহিত্যকার,—বিজ্ঞানীর কাছে স্বপ্ন তো বাস্তবভিত্তিবিরহিত মায়ামাত্র। কিন্তু সাহিত্যনির্মাতাগণের মুখে এর বিপরীত কথাই আমরা শুনতে পাই: 'বস্তু হতে সেই মায়া তো সত্যতর'; অথবা—'আমি শুধু স্বপ্ন দেখি, আর সকলি বিড়ম্বনা।'

এ থেকেই সাধারণ মানুষের সিদ্ধান্ত হলো, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের গতি বিপরীতমুখী—উভয়ের মিলনক্ষেত্র কল্পনা করা অসম্ভব।

কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে যদি দেখি তাহলে বুঝতে পারা যাবে, এক জায়গায় উভয়ের লক্ষ্যের মধ্যে মিল আছে; সে হলো জগৎ ও জীবনের অগাধ রহস্যসমুদ্রে এ দুয়ের আত্মনিমজ্জন, উদ্দেশ্য—অনুদ্‌ঘাটিতে সৌন্দর্য ও অনির্ণীত সত্যের আবিষ্কার। জগতের দূরবিস্তার পথে আমরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলি, চতুষ্পার্শ্বের বস্তুপুঞ্জকে চোখে দেখেও যেন দেখতে পাই না। আমরা লোকসাধারণের কাছে পৃথিবীর সবকিছুই অতি-সামান্য সুতরাং রহস্যময় কিছুই আমাদের দৃষ্টির সমক্ষে ধরা পড়ে না। কিন্তু সাহিত্যরচয়িতারা মানবসংসার ও প্রকৃতির সংসারের গোপনচারী সৌন্দর্যকে প্রতিফলিত করেন তাঁদের শিল্পনির্মিতির মধ্যে। তা চাক্ষুষ করে অপার বিস্ময়ে আমরা বলে উঠি, এই অপরূপসুন্দর এতকাল কোথায় লুকিয়ে ছিল! সাহিত্যিক আনন্দলোক রচনা করেন; আর, যা আনন্দ দেয় তাই সুন্দর। সাহিত্যকার বস্তুর অন্তর্লীন সৌন্দর্যের সন্ধান করেন, মানুষকে আনন্দ দান করাই তাঁর বড়ো কাজ।

বিজ্ঞানীও সৃষ্টির রহস্যসন্ধানী, তাঁরো বড়ো কাজ হলো জগতের মানব-মানবীর জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য এনে দেওয়া। আমাদের এই পরিচিত সংসার কত রহস্যে সমাচ্ছন্ন, সাধারণ লোকের সাধ্য নেই এ আবরণ উন্মোচন করে। তাই, পদার্থের সত্যের সন্ধান এরা পায় না, বস্তুর অন্তহীন রহস্যের সম্মুখে কেবল নির্বাক হয়ে থাকে। বিজ্ঞানী কিন্তু তাঁর অনলস সাধনা ও অতন্দ্র তপস্যার যোগে বিশ্বের রহস্য ক্রমাগত উদ্‌ঘাটিত করে চলেছেন; দূরকে নিকটে আনা, অদৃশ্যকে ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত করা, অপরিচিতকে পরিচয়ের সূত্রে বাঁধা একমাত্র বিজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান ও সাহিত্য দু'য়েরই লক্ষ্য রহস্যসন্ধান। তা-ই-যদি হয় তবে এদের মধ্যে মিল নেই একথা বলি কী করে?

॥ ৩ ॥ **প্রচলিত অর্থনীতির উপরে আর-একটা নীতি আছে, তাহা উচ্চতর মানবনীতির অঙ্গীভূত।**

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পৃ. ১১]

ধনসঞ্চয়, ধনের বণ্টন, অর্থ বিনিয়োগ, অর্থের যথোপযুক্ত ব্যয়, ইত্যাদি বিষয়ে যে-শাস্ত্র নির্দেশ দেয় তাকেই বলা হয় অর্থনীতিশাস্ত্র। ব্যক্তিস্বার্থ এবং সমাজস্বার্থ—অর্থনীতির দৃষ্টি উভয়ের দিকেই নিবদ্ধ। আর্থিক ব্যাপারে ব্যক্তি-মানুষের কল্যাণ হোক, এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর সমাজও উপকৃত হোক, অর্থনীতি এ-ই চায়। প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থবিত্ত আমার রয়েছে, ওই অতিরিক্ত অংশ সমাজকল্যাণে ব্যয় করতে আমি ইচ্ছুক—এরূপ ক্ষেত্রে অর্থব্যয়ে অর্থনীতিশাস্ত্রের সমর্থন অবশ্যই আছে। কিন্তু যেখানে আমার দুর্গত অবস্থা, নিজ জীবিকারও সংস্থান হয় না, সেখানে ঋণ করে পরের দুঃখমোচনে আমি তৎপর হব, এ কিন্তু অর্থনীতির অনুমোদন কখনো পাবে না। প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্রের রীতিই এই।

আরো কথা আছে। অনেক সময় এমন মানুষও দেখা যায়, যার, দৈহিক সামর্থ্য আছে, পরিশ্রম করলেই অর্থাগম হয়, অথচ অলসতা-অকর্মণ্যতার জন্যে নিদারুণ আর্থিক সংকটে পড়েছে সে। করুণাপরবশ হয়ে এহেন মানুষকে কেউ যদি অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে যায় তাহলে অর্থনীতি তার এ কাজটিকে কি সমর্থন করবে? এর উত্তর নেতিবাচক। উক্ত শাস্ত্রটি তখন বলবে, এরূপ কাজ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, নিষ্কর্মা অপদার্থের দলকে দয়া দেখিয়ে প্রশ্রয় দিলে সমাজ জীবিকাসমস্যাকণ্টকিত হয়ে উঠবে—অলস ব্যক্তি কদাপি দয়ার পাত্র বলে বিবেচিত হতে পারে না। চরিত্রহীন দরিদ্রের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কেননা, অপরের করুণা-আকর্ষণের কোনো অধিকার [illegible]দের নেই। বুঝতে কষ্ট হয় না, স্থলবিশেষে এই প্রচলিত অর্থনীতি বড়োই নির্মম—[illegible]যোগ্যকে, অক্ষমকে—এ কখনো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে না।

কিন্তু উপরে-কথিত অর্থনৈতিক বিধিবিধান অনুযায়ী সকলের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় না। যাঁরা মানবতাধর্মের সাধক, মানবপ্রীতি যাঁদের চিত্তে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে, যাঁরা সত্যই মহানুভব, নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তাঁরা অর্থনীতির নির্দেশ লঙ্ঘন করে যান—এতদপেক্ষা আরো একটা উচ্চতর নীতি তাঁদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। এর নাম মানবনীতি। আর্তজনের ক্রন্দনে মুহূর্তে এঁদের হৃদয় বিগলিত হয়, অপার করুণায় এঁরা দুর্গতের দিকে ছুটে যান, তাদের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। সেবাকে যাঁরা ব্রতরূপে গ্রহণ করেছেন তাঁরা দুঃখক্লিষ্ট মানবমানবীর দুঃখের কারণ খুঁজতে যান না, দুঃখমোচনই তাঁদের লক্ষ্য। এতে সমাজের কোনরূপ অনিষ্টসাধন হচ্ছে কিনা, তা যেন তাঁদের জানবার জিনিসই নয়। এঁরা এইটুকু শুধু জানেন যে, মানবতা বা মানবধর্মই সকল ধর্মের ওপরে; দুঃখীজনের চোখের জল মুছাতে পারলেই এরা নিজেদের জীবন সার্থক হলো, মনে করেন। এহেন উদার মানবধর্ম বা সেবাধর্মের এক জীবন্ত বিগ্রহ হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—চিরটি জীবনে ধরে যিনি পরের দুঃখে কেঁদেছেন।

॥ ৪ ॥ মহতের আসনভূমি তীর্থস্বরূপ।

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পৃ. ২১]

তীর্থক্ষেত্র পরমপবিত্র স্থান—পুণ্যভূমি তীর্থমন্দিরে দেবতা প্রতিষ্ঠিত, দেবতার পূতস্পর্শে তীর্থস্থানের ধূলিমাটি পর্যন্ত শুচিসুন্দর হয়ে ওঠে। পুণ্যকামী মানুষ তাই তীর্থংকর হতে চায়, তীর্থদেবতাকে চাক্ষুষ করবার জন্তে বহুদূরদেশে যেতেও তাদের এতটুকু কুণ্ঠা নেই। তীর্থদর্শন করতে না পারলে তারা জীবনটি ব্যর্থ হলো বলে মনে করে।

তীর্থদর্শন করলে কতখানি পুণ্যার্জন হয় তা পুণ্যাকাঙ্ক্ষীরই উপলব্ধির বিষয়। তবে আমরা এটুকু বুঝি যে, মানবচিত্তে তীর্থভূমির প্রভাব বড়ো কম নয়। বাস্তব-সংসারে থেকে থেকে মানুষের মন আপনা থেকেই কেমন যেন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, নানাপ্রকার হীনতা ও কুশ্রীতায় পঙ্কিল হয়ে ওঠে, ফলে মানুষ ভুলে বসে মানবত্বের মহিমা। কিন্তু তীর্থদেবতার সম্মুখীন হলে মানবসত্তা, অন্তত ক্ষণকালের জন্তে, এক উচ্চভূমিতে উত্তীর্ণ হয়, প্রাত্যহিকতার পুঞ্জীকৃত গ্লানির বন্ধন থেকে মুক্তি পায়, ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতার কলুষস্পর্শ থেকে সে কিছুটা যেন দূরে সরে আসে। তীর্থ করার এই লাভটি উপেক্ষণীয় মোটেই নয়। তীর্থ তাই মানবাত্মার আরামের স্থান, শান্তিনিকেতন—ক্ষেত্র তো বটেই।

এখন আমরা বলতে চাই, দূরদূরান্তরে—নিসর্গসংসারে দুর্গম স্থানে—যেখানে যেখানে দেবতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, সে-স্থানই কেবল তীর্থক্ষেত্র নয়, মহৎব্যক্তিগণের কর্মক্ষেত্র বিশেষ বিশেষ স্থানগুলিও তীর্থ-নামে আখ্যাত হতে পারে। আমাদের সংস্কৃতসাহিত্যে একথার সমর্থন আছে—'মহাত্মাসিতমহীস্থিতানি তীর্থাং প্রচক্ষতে'—'মহতের আসনভূমি তীর্থস্বরূপ'। যে-স্থানে বসে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষেরা লোক-

কল্যাণের সাধনা করেছেন, সেই-সেই স্থান পবিত্রতায় মণ্ডিত হয়েছে—পুণ্যভূমির ভগবন্নামের জন্যে মর্যাদা পেয়েছে। ওপরে তীর্থদর্শনের যে-ফল বর্ণিত হয়েছে, এসকল স্থান দর্শন করলেও অনুরূপ ফললাভ হয়। কারণ, এই স্থানগুলি লোকোত্তর পুরুষদের শুভ্রভাস জীবনের পবিত্র স্মৃতির সঙ্গে জড়িত; মানুষ হয়েও, চরিত্রগুণে, এসব মহাপুরুষ দেবকল্প। দেবতাকে যেমন আমরা পরমভক্তিভরে পূজা নিবেদন করি, এঁদের পুণ্যস্মৃতিও তেমনি আমাদের প্রাণের পূজা আকর্ষণ করে। এহেন দেবকল্প পুরুষ যেখানে নিজেদের আসন পেতেছেন সেখানে তীর্থ না গড়ে উঠতে পারে কী?

॥ ৫ ॥ ছোট বীজ হইতে বড় গাছ হয়, এবং ছোট গাছের মাহাত্ম্য যাহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই বড় কাজের সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছেন।

[অধ্যাপক মক্ষমূলর। পৃ. ৬৮]

যাঁরা প্রকৃত কর্মী, কর্মসম্পাদনের সত্যকার ক্ষমতা যাঁদের রয়েছে, তাঁরা কখনো কাজ বেছে বেড়ান না, ছোট কাজের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন না—ছোট হোক, বড়ো হোক, যে-কোনো কাজের সিদ্ধির দিকেই তাঁদের দৃষ্টি স্থিরবদ্ধ থাকে। প্রত্যেকটি কর্মে তাঁদের সমান আগ্রহ আর অতি-আত্যন্তিক নিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। ক্ষুদ্র কাজ কেন তুচ্ছ বলে বিবেচিত হবে? এদের মধ্যেই তো অনেক সময়ে বড়ো কাজের প্রকাণ্ড সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। বনস্পতি কি একদিনে তার বিশালতা পেয়েছে? একদা সে তো একটি ক্ষুদ্র বীজাকারেই ছিল, শাখাপ্রশাখা, পত্রকাণ্ড ইত্যাদি নিয়ে বিরাট মহীরুহের রূপটি পেতে তার সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়েছে। সুরুতে যে ছিল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, পূর্ণাঙ্গ পরিণতিতে পৌঁছানোর পর বিপুল তার আকৃতি-আয়তন। প্রকৃতির সংসারের এই দৃষ্টান্তটি এ সত্যের প্রতিই অঙ্গুলিসংকেত করে যে, ছোটর বুকেই সংগুপ্ত থাকে ভাবীকালের বৃহৎ। সুতরাং ক্ষুদ্র-কোনকিছু ক্ষুদ্র বলেই, উপেক্ষার বস্তু নয়।

ঠিক তেমনি, ছোট কাজকে অবজ্ঞা দেখানো অনুচিত। কে না-জানে যে, ছোট কাজ করতে করতে বড়ো কাজ করার নৈপুণ্য জন্মে! এই নৈপুণ্য মানুষকে বৃহৎ কর্মে লিপ্ত হওয়ার প্রেরণা ও সামর্থ্য যোগায়। প্রথমে বড়ো কাজে হাত দিয়ে ব্যর্থকাম হওয়ার চয়ে ছোট কাজে সিদ্ধিঅর্জনই কি গৌরবজনক নয়? অথবা, যে কথা আগে বলা হয়েছে—বৃহৎ ছোটকে বাদ দিয়ে নয়, তাকে জড়িয়ে এবং ছাড়িয়ে গিয়ে। কর্মজগতে যাঁরা বিপুল সাফল্যের অধিকারী, ছোট কাজের প্রতি কদাপি তাঁরা উপেক্ষাপরায়ণ ছিলেন না। ছোট কাজকে যে তুচ্ছ বলে জানে, সে কোনো বড়ো কাজের যোগ্য কিনা, সন্দেহ। এ প্রসঙ্গে আমাদের একজন কবি বলছেন, দেখুন:

বিশ্বকর্মা দয়া করে দাও-না কিছু কাজ কর্মশালার তব,
বড়ো কাজে দিলেই হাত পাব দারুণ লাজ, ছোট কাজেই রব।

বজ্র যেথা নির্ঘোষে তার কানে লাগায় তালা,
উত্তাপে যার রুদ্ধশ্বাস—গাত্রে ধরে জ্বালা—
সহ্য আমার হয় কি না হয় আজ।
সইতে শিখি দিনে দিনে একটু দূরে থেকে,
করতে শিখি কর্মী যারা তাদের দেখে দেখে,
পরতে শিখি শক্ত কাজের যোগ্য যেই সাজ,
চর্ম-বর্ম নব—
বিশ্বকর্মা, দয়া করে দাও-না কিছু কাজ কর্মশালায় তব।

॥ ৬ ॥ যে ব্যক্তি কাজ করে তাহারই ভ্রান্তি ঘটে। যে ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়, তাহার ভ্রান্তির আবিষ্কার বিধাতার অসাধ্য।

[অধ্যাপক মক্ষমূলর। পৃ. ৬৩]

প্রাত্যহিক সংসারে মানুষকে কাজ করতেই হয়, কেননা, মানুষ বলেই সে কর্মচক্রে বাঁধা। ভালো হোক, মন্দ হোক, ছোট হোক, বড় হোক, কাজ না করে মানুষের উপায় নেই, মানবজীবনের প্রতিষ্ঠা কর্মের সফলতার ওপরেই নির্ভর করে। তবে এ-ও সত্য যে, কর্মক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কৃতী ব্যক্তিরও প্রমাদ ঘটে—ভুলচুক হয়। এতে কিন্তু অগৌরবের কিছু নেই, অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। কারণ, ভুল তো মানুষেই করে—যেহেতু মানুষ ঈশ্বরের ন্যায় নিশ্ছিদ্র পূর্ণতার অধিকারী নয়, জ্ঞান ও শক্তির অপূর্ণতা মানুষমাত্রেরই থাকবে। অথবা, যন্ত্র যদি হতো তবে হয়তো কর্মী মানুষ ভুল করত না—যন্ত্রের ভুল হয় না। ভ্রমপ্রমাদ ঘটুক না তাতে তার লজ্জিত হওয়ার কি আছে? ক্রমবর্ধমান কুশলতা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে সে তো নিজের কৃত ভুল প্রতিনিয়ত সংশোধন করে নিচ্ছেই। মানুষ কাজ যে করে যাচ্ছে, বিঘ্ন দেখলে পিছিয়ে পড়ছে না, প্রকাণ্ড প্রমাদও যে তার কর্মোদ্যম নির্বাপিত করতে পারছে না, এখানেই তো মস্তবড়ো গৌরব। মানুষকে একথাটি মনে রাখতে হবে যে, কর্মের এলাকায় ভুলভ্রান্তি তার অপরিহার্য সহচর। ভুল ঘটতে পারে এই লজ্জায় কর্মের পথ থেকে মানুষ দূরে সরে আসবে এ কোনো কাজের কথা নয়।

ভুল কার হয় না? যে জড়ধর্মী, নিষ্কর্মা, অলস—তার। যেখানে কর্ম অনুপস্থিত সেখানে ভুল বলে কিছুই নেই। নিষ্কর্মার দল ভুল করে না বটে, কিন্তু তারা কোনো কাজই করে না। সুতরাং তাদের প্রমাদমুক্ততার অহংকার অপদার্থের দম্ভ ছাড়া আর কী? এসব অপদার্থরা রবীন্দ্র-কবীর 'কৃতীর প্রমাদ' নামে ছোট একটি কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়:

টিকি মুণ্ডে চড়ি উঠি কহে 'ওগো নাড়ি—
হাত পা প্রত্যেক কাজে ভুল করে ভারি।'
হাত-পা কহিল হাসি, 'হে অভ্রান্ত চুল,
কাজ করি আমরা যে, তাই করি ভুল।'

॥ ৭ ॥ আপনার জাতিকে যে চেনে না, সে যেন কৃত্রিম স্বদেশানুরাগের আস্ফালন না করে।

[উমেশচন্দ্র বটব্যাল। পৃ. ৭৫]

স্বদেশপ্রেম পবিত্রসুন্দর অতিশয় মূল্যবান একটি বস্তু—লোকদেখানো শুধু বাগাড়ম্বর এ নয়। চিত্তের অনুরাগ যেখানে, সেখানে পরিচয়ের নিবিড়তা থাকতেই হবে; যাকে আমি চিনি না, জানি না, তার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শনের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না—অপরিচিতকে কে আলিঙ্গনে বাঁধে? প্রকৃত যে স্বদেশপ্রেমী, নিজ মাতৃভূমির সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ—দেশের মানুষ, দেশের ধূলিমাটি, দেশের পুরাতন ইতিকথা, দেশের ঐতিহ্য—সবকিছুর সঙ্গেই হাজার বাঁধনে সে বাঁধা, তার দেশানুরাগ খাঁটি জিনিস। কৃত্রিমতাশূন্য এহেন স্বদেশপ্রীতির একটা গৌরব আছে।

কিন্তু অনেকে সস্তায় দেশপ্রেমী সেজে দশজনের বাহবা পেতে চায়। কারো কারো কাছে স্বদেশানুরাগ মানসিক একটা বিলাসের সামগ্রী, কেউ কোনো একটা স্বার্থবোধে নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা দেখায়। এদের দেশপ্রীতি অত্যন্ত কৃত্রিম একটি ব্যাপার। মেকি জিনিসের কানাকড়ি মূল্য নেই, মেকি বস্তুর প্রাপ্য ঘৃণামিশ্র উপহাস। শৌখীন দেশবাসীর দ্বারা দেশ ও জাতির কী কল্যাণ সাধিত হতে পারে? বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে ফাঁপা বাক্যের রঙিন ফানুস উড়িয়ে কে কখন দেশের বড়ো কাজ করতে পেরেছে? বাগাড়ম্বরে ক্ষণিকের প্রশংসা হয়তো মেলে, স্বার্থসিদ্ধি হয়তো হয়, কিন্তু স্বদেশের উন্নতিবিধানের পথ এ নয়। স্বদেশকে আমরা যথার্থ ভালোবাসতে শিখিনি বলেই দেশোন্নতি-বিষয়ক আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা-উদ্যম এমনভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। দেশ আর জাতির প্রতি যার প্রাণের টান নেই তার মুখে স্বদেশপ্রেমের বুলি মানায় না।

॥ ৮ ॥ দরিদ্রের মনোরথ হৃদয়ে থাকিয়াই লয় পায়।

[উমেশচন্দ্র বটব্যাল। পৃ. ৭৯]

মানুষের কামনাবাসনার শেষ নেই। হৃদয়ের গোপন গভীরে লালিত এসব কামনাবাসনাকে বাস্তবে চরিতার্থ করে তোলা সহজ নয়। মানুষ তো অনেককিছুই পেতে চায়, অথচ তার চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে দুস্তর একটি ব্যবধান থেকেই যায়। কেন এরূপ হয়? হয়—কোথাও শক্তিসামর্থ্যের অভাবে, কোথাও অবস্থার প্রতিকূলতায়। যার শক্তি সামান্য তার কামনা মনের কোণে প্রকাশ পেয়ে বুদ্বুদের ন্যায় ধীরে ধীরে মনের তলে মিলিয়ে যায়, বাস্তবে সফল হয়ে উঠে না। একদিন সে উপলব্ধি করে, কাম্যবস্তুলাভের আশা বহুদূরবর্তী হয়ে গেছে। তখন তার চতুর্দিকে বিরাজ করতে থাকে বৃহৎ এক শূন্যতা।

দারিদ্র্য যেমন ব্যক্তির থাকতে পারে, তেমনি জাতির, এবং দারিদ্র্যও নানাপ্রকারের। বস্তুগত দারিদ্র্য, কর্মক্ষমতাগত দারিদ্র্য, চিন্তার ক্ষেত্রে

ইত্যাদি বহুবিধ দারিদ্র্যের সঙ্গে সকলের পরিচয় রয়েছে। ব্যক্তি কিংবা জাতির মধ্যে এদের কোনো-কোনোটি কিংবা একসঙ্গে সবগুলি, প্রকট হয়ে উঠলে কোনো বৃহৎ অথবা মহৎ কর্মসম্পাদন করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না, তার মনোবাসনা কদাপি সফল হবার নয়। বহুবাসনায় প্রাণপণে নানাকিছু সে চায়, কিন্তু ভাগ্যে জোটে শুধুই গ্লানিময় ব্যর্থতা। তাই বলতে পারি, দরিদ্রের মনোরথ মরুপ্রান্তরের মরীচিকাতুল্য—কেবল আশার উদ্রেকই করে, নিবৃত্তি এনে দেয় না।

॥ ৯ ॥ বিজ্ঞান দিন দিন আপনাকে সংশোধিত ও উন্নত করিয়া থাকে কিন্তু অজ্ঞানের মূর্তি চিরকালই একরূপ।

[অধ্যাপক মক্ষমূলর। পৃ. ৬২]

জাগতিক পদার্থনিচয়ের সত্যস্বরূপ আবিষ্কারের সাধনা বিজ্ঞানীর। বিজ্ঞান-সাধকেরা অবিচল-নিষ্ঠা সহযোগে জগৎব্যাপারের রহস্য-আবরণ একের পর এক উন্মোচন করে চলেছেন। তাঁদের নিত্যনতুন আবিষ্কারে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার দিন দিন সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। ক্রমসঞ্চিত অভিজ্ঞতার দ্বারা বিজ্ঞান আপনাকে পুষ্ট করে বলে সে কোথাও স্থির হয়ে বসে নেই, চলমানতাই তার ধর্ম। যা চলমান, তাকে পরিবর্তনশীল হতেই হবে। এ কারণে বিজ্ঞানজগতের সত্য নিত্য-পরিবর্তমানতার স্রোতে ভাসছে, আধুনিক আবিষ্ক্রিয়া পুরাতন চিন্তাকে একেবারে বদলে দিচ্ছে। বিজ্ঞানের পরিধি কত বিস্তৃত, কিন্তু ব্যক্তিমানুষের ওই জ্ঞান আহরণের শক্তি কতখানি সীমাবদ্ধ। শক্তি যেখানে সীমিত সেখানে কোনো একজন বিজ্ঞানী সত্যের পূর্ণায়ত রূপটিকে ধরবেন কী করে। তাছাড়া, তাঁর গবেষণার ত্রুটি থেকে যেতে পারে, ফলে বস্তুর যে-সত্যটিকে তিনি আবিষ্কার করেছেন বলে মনে করেছেন, তা অপর একজন বিজ্ঞানীর গবেষণার আলোকে ভুল বলেই প্রমাণিত হতে পারে। এসব কারণে বিজ্ঞান আপনাকে প্রতিনিয়ত সংশোধন করে নিয়ে সত্যতর এবং উন্নততর হয়ে উঠছে। ভ্রান্তিকে সযত্নে লালন করে কোনরূপ মূঢ়তার পরিচয় দেওয়া বিজ্ঞানীর প্রকৃতি নয়।

কিন্তু এইভাবে সত্যকে স্বীকার করে নেবার ইচ্ছা অজ্ঞানের নেই। অজ্ঞান স্থাণু, জড়বৎ চলৎশক্তিবিরহিত, নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দিকে এতটুকু দৃষ্টি তার নেই। পৃথিবীতে জ্ঞানের নিত্যবিকাশ ঘটছে, পক্ষান্তরে, অজ্ঞান অন্ধসংস্কার আর মূর্খতাকে মূলধন করে নিশ্চল বসে আছে। বিজ্ঞান যদি হয় আলো তবে অজ্ঞান অন্ধকার। আলোর কত-না রূপান্তরগ্রহণ, কত চক্ষুবিনোদন বিচিত্রতা। [illegible] অন্ধকারের কোনো রূপপরিবর্তন নেই, সে কেবলই আঁধার—বৈচিত্র্যহীন [illegible]বর্জিত।

॥ ১০ ॥ বীর্য অর্জন করিয়া [illegible] ক্ষমতা একা ব্রাহ্মণেরা [illegible]

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পৃ. ৩৬]

[illegible] পদার্থ ও সার পদার্থ মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে, সেখানে

প্রথমটি পরিহার করে দ্বিতীয়োক্ত বস্তুটির সমাহরণ নিঃসন্দেহে প্রতিভাসাধ্য একটি কাজ। এ কাজটি সামান্যজনের সাধ্যাতীত। যাঁরা প্রতিভাধর, ভালোমন্দের বিচার-বোধ তাঁদের অতিশয় প্রখর। মন্দর থেকে ভালোটিকে তাঁরা অনায়াসে বেছে নিতে জানেন। শক্তিহীনেরা এক্ষেত্রে কিন্তু নির্বিচার; কোন্ জিনিসটি শুভফলপ্রদ, কোন্ জিনিসটি মন্দ বলে বর্জনীয়, তা তারা বুঝতেই পারে না। প্রতিভাবানদের সারবস্তু-নির্বাচনের বিশেষ ক্ষমতাটি রাজহংসের আশ্চর্য আচরণের কথা মনে করিয়ে দেয়। শোনা যায়, দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে দিলেও ওপরে-কথিত হাঁসেরা জলের অংশ বাদ দিয়ে ঠিক দুধের অংশটি পান করে নেয়। অপর কোনো জীব এরূপ করে এমনটি অদ্যাপি শুনতে পাওয়া যায়নি। তাই, বলতে বাধা নেই, প্রতিভাধরেরা মনুষ্যকুলে রাজহংস। তাঁদের সমাহৃত বিশেষ কোনো বস্তু কিংবা ভাব—কী ব্যক্তিজীবনের, কী সমাজজীবনের—পুষ্টিবর্ধক, ক্ষতিকর-কিছুকেই তাঁরা আমল দেন না। সমাহরণ যেখানে বিচারশূন্য সেখানে ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা। দৃষ্টান্ত দিলে কথাগুলির সত্যতা সহজে বুঝতে পারা যাবে।

পশ্চিমী হাওয়া এদেশে যখন প্রথম বইতে আরম্ভ করল তখন ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালিরা য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্ধ অনুরাগী হয়ে উঠলেন। আমাদের জাতীয় জীবনে পশ্চিমাগত শিক্ষাদীক্ষার কতটুকু ভালো, আর কতটুকু মন্দ এঁরা বুঝতে চাইলেন না—মূঢ় অনুকরণের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন। এর জন্যে জাতিকে কম বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়নি। বলতে হবে, রাজহংসের মতো নির্বাচনের অদ্ভুত ক্ষমতা নিয়ে এঁরা জন্মান নি। কিন্তু বঙ্কিম প্রমুখ মনীষীরা এক্ষেত্রে যে-আচরণ দেখালেন তা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের যা-কিছু ভালো তা গ্রহণ করতে এঁরা দ্বিধান্বিত হলেন না; কিন্তু যে-ভাবটি, যে-বস্তুটি, আহরণ করলে জাতীয় জীবন বিপর্যস্ত হবার সম্ভাবনা, সেগুলিকে এঁরা দূরে সরিয়ে রাখলেন। এঁরা আত্মসমর্পণ করতে চান নি, চেয়েছিলেন সমন্বয়—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মিলনই ছিল এঁদের অভিলষিত। বঙ্কিম-আদি বাঙালি যুগন্ধর পুরুষদেরই উপমান হলো গ্রহণবর্জনে পারদর্শী রাজহংস।

॥ ১১ ॥ যাহার জীবন আছে, তাহাকে দুই দিকের টানাটানির মধ্যে কাজ করিতে হয়।

অথবা,

বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির নিরন্তর মাধ্যাকর্ষণের নামই জীবন।

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২৮]

মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীসকল যে কোন্ আদিম-কাল থেকে সংগ্রামী [illegible] করে আসছে। এই অবিরত সংগ্রাম তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে। বলতে—প্রকৃতির সংসার আর, হিংস্র প্রাণীকুলের সংসার। ইতর

সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে নিষ্করুণ প্রকৃতি এবং প্রবলতর জীবসমাজের সঙ্গে। কিসের জন্য এদের সংগ্রাম? আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার জন্যে। প্রকৃতি যখন তার প্রতিকূল শক্তি নিয়ে প্রাণীদের তাড়না করে, সেই আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে এদের কত-না সক্রিয় হতে হয়। নতুবা এরা টিঁকে থাকবে কেমন করে? প্রবলতর জীবনের হিংস্রতার কবল থেকে পরিত্রাণলাভের জন্যেও কি এদের কম প্রয়াস করতে হয়? একদিকে প্রাণীদের অস্তিত্বরক্ষার অন্তর্হীন বাসনা, অন্যদিকে প্রকৃতির সংসারের অবিরাম বিরুদ্ধতা, এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বেঁচে থাকার নামই তো জীবন। এ যে করতে পারল না তার অস্তিত্বের বিলুপ্তি অনিবার্য।

ওপরে-কথিত টিঁকে থাকবার জন্যে সংগ্রাম, ক্রমবিবর্তনবাদীদের ভাষায়—struggle for existence—মানবসমাজেও কে না লক্ষ্য করেছেন? সুদূর অতীতকাল থেকে বর্তমানকাল অবধি প্রকৃতির ওপরে জয়ী হওয়ার কী অশ্রান্ত প্রচেষ্টায় মানুষ নিরত। মানুষের অধিকাংশ সৃষ্টিকর্মের মূলে প্রেরণা জুগিয়েছে তার প্রকৃতিজয়ের দুর্দম প্রয়াস। প্রকৃতিকে সেবাদাসী না করা পর্যন্ত সংগ্রামী মানুষের যেন স্বস্তি নেই। বহিঃপ্রকৃতি তাকে যতই বিপর্যয়ের মুখে টানে ততই সে আত্মরক্ষার অভিনব উপকরণরাজি পুঞ্জীকৃত করে তোলে। এ যদি না পারত তাহলে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মানবজাতির চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যেত। তা যে এতাবৎকাল হলো না তার কারণ হচ্ছে সৃষ্টিপ্রক্রিয়াশীল বুদ্ধিমান মানুষের সামঞ্জস্যস্থাপনের অত্যদ্ভুত ক্ষমতা। লক্ষ্য করতে হবে, মানুষ আর জীবকুল সংগ্রামে সতত নিযুক্ত, কিন্তু জড়পদার্থপুঞ্জ সংগ্রাম কাকে বলে, জানে না। জানবে কীরূপে, তাদের যে জীবন নেই। জীবন যার আছে, তাকে জীবনযুদ্ধে নামতেই হবে।

॥ ১২ ॥ যাহা ধরিয়া আছে তাহাই ধর্ম।

[মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। পৃ. ৪৩]

'ধর্ম' কথাটিকে বাঙ্‌লায় আমরা ইংরেজি 'রিলিজন' কথাটির প্রতিশব্দরূপে সচরাচর ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু বুঝে নিতে হবে, ধর্ম আর রিলিজন সর্বাংশে এক ব্যাপার নয়। য়ুরোপীয় রিলিজন-এর সঙ্গে লৌকিক জীবনের ঊর্ধ্বচারী আধ্যাত্মিকতার নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। য়ুরোপে ধর্ম বলতে ঈশ্বর, পরকাল, অতিলৌকিক পদার্থবিষয়ে বিশ্বাস এবং কয়েকটি বিশেষ আনুষ্ঠানিক আচরণকে বোঝায়। ধর্ম-বস্তুটি সেখানে [illegible]সীমাবদ্ধ, মতবাদের মধ্যে ধৃত, সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত। ওদেশে ধর্ম একটি [illegible] ব্যাপার মাত্র। য়ুরোপীয়েরা ধর্মকে বিচিত্রকর্মান্বিত জীবনের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে [illegible] আনেনি।

কিন্তু ভারতবর্ষ তার উপলব্ধ ধর্মকে মঠ-মন্দিরের সীমায় আবদ্ধ করে রাখেনি, কেবল [illegible]র ঈশ্বরভাবনা ও উপাসনাপ্রণালীর সঙ্গে যুক্ত করেনি,—একে মানবজীবনের বিপুল কর্মধারার মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিয়েছে। ভারতীয় চিন্তায় গোটা

মনুষ্যজীবনকে যা ধরে রয়েছে, তা-ই ধর্ম। ধর্ম এখানে ব্যক্তির সত্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের অনুকূল, লোকস্থিতি বা সমাজরক্ষার সহায়ক—রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, লোকব্যবহার—কিছুই ধর্মের এলাকার বাইরে নয়। এ উপলব্ধি থেকেই সমাজধর্ম, দেশধর্ম, জাতিধর্ম, রাষ্ট্রধর্ম প্রভৃতি কথার সৃষ্টি। আবার, প্রত্যেকটি মানুষের মানবিকতার প্রকাশক অবশ্যকর্তব্য কর্মকে আমরা তার ধর্ম বলেই জানি; যেমন, পুত্রের প্রতি পিতা ও মাতার যে কর্তব্য তা পিতৃধর্ম ও মাতৃধর্ম, প্রজার প্রতি রাজার যে কর্তব্য তা রাজধর্ম, একজন মানুষের প্রতি অপর একজন মানুষের যে কর্তব্য তা মনুষ্যধর্ম। উক্তসব কর্তব্যপালনের মধ্য দিয়ে পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, মনুষ্যত্ব ইত্যাদির প্রকাশ। বলতে পারি. এই কর্তব্যগুলিই পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, মনুষ্যত্ব ইত্যাদিকে ধরে রয়েছে। তেমনি, ক্ষমা-অহিংসা, দান-দয়া, ইত্যাদিও ধর্মের অঙ্গীভূত, কেননা, মনুষ্যত্ব নামীয় বস্তুটি এদের ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। এমন কি, বিশ্বজগৎ যে-নিয়মশৃঙ্খলায় পরিচালিত, ভারতীয় দৃষ্টিতে তা-ও ধর্ম। ভারতবর্ষে ধর্ম কথাটির অর্থ যতখানি ব্যাপক, এমনটি য়ুরোপে নয়। আমরা জেনেছি, শুধু মনুষ্যজাতি নয়—নিখিলচরাচর ধর্মের দ্বারা ধৃত ও নিয়ন্ত্রিত।

॥২৩॥ মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে, সেই দলের নাম—সমাজ। দল বাধিয়া বাস করিতে হইলে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিতে হয়, নতুবা দল ভাঙিয়া যায়।

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পৃ. ২৯]

বহুদূরে অপসৃত সেই অতীত যুগে, যখনো মানুষ সভ্যতার লেশমাত্র আলো পায়নি, যখনো সে যাপন করছে অরণ্যচারী ভ্রাম্যমান জীবন, তখনো দেখি মানবসন্তান যূথবদ্ধ হয়ে চলতে শিখেছে। কেন মানুষ নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে না, কেন সে দল বাঁধে? এর উত্তর হলো—তার জৈববৃত্তির নির্দেশনায়। কিসের এই নির্দেশ?—আত্মরক্ষার। একক মনুষ্যের শক্তি কতটুকুই বা। বনের একটি পশুর আক্রমণের মুখে কতখানি অসহায় সে! বাইরের বলশালী শত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে হলে অপর দশজনের সহায়তার প্রয়োজন; বহুর সম্মিলিত শক্তির ওপর ভর করে দাঁড়ালে দুর্বল 'এক' বলবত্তায় প্রবল হয়ে উঠতে পারে—সঙ্ঘবদ্ধতার শক্তি দুর্জয়। ক্রমসঞ্চিত অভিজ্ঞতা প্রতিকূলতায়-পরিবেষ্টিত মানুষকে দল বাঁধতে শেখালো এবং মানুষের এই দলকেই বর্তমানের সুসভ্য মানুষ সমাজ নামে চিহ্নিত করেছে।

দলগঠন করা যেমন বড়ো একটি কাজ, ততোধিক বড়ো কাজ হলো দলকে স্থায়িত্বদান করা। দলের বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিস্বার্থবোধকে তার উগ্র প্রকাশে বাধা দিতে হয়, ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকে সংযমশাসনে বাঁধতে হয়। দল বা সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি উচ্চকণ্ঠে নিজ নিজ প্রাধান্য ঘোষণা করে তাহলে দল টিঁকতে পারে না, সঙ্ঘবদ্ধ জীবন খণ্ডীকৃত হয়ে ভেঙে পড়ে। আমাদের মধ্যে যে-একটি আদিম পশু সংগুপ্ত রয়েছে, অহংসর্বস্ব বলে, তার তুষ্টি

দলগতস্বার্থবিষয়ে সে কিন্তু প্রায়শ অন্ধ। দলরক্ষার প্রয়োজনে ধর্মবুদ্ধি অর্থাৎ কল্যাণাত্মিকা বুদ্ধি দিয়ে এই পশুটির উগ্রতাকে শাসিত করতে হবে, প্রত্যেককে তার জীবনচর্যাকে মঙ্গলবোধের স্পর্শে উন্নত করে তুলতে হবে। সমাজবদ্ধ মানুষের ধর্মানুশাসিত এই যে জীবন, এরই নাম নৈতিক জীবন। তাই, দল বা সমাজরক্ষার প্রধান উপায় হলো নৈতিক-জীবন-যাপন।

॥ ১৪ ॥ কঠোরতার সহিত কোমলতার সমাবেশ ব্যতীত মনুষ্যচরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না।

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পৃ. ১৪]

আমরা যাকে পূর্ণাঙ্গ মানবচরিত্র বা আদর্শ-পুরুষচরিত্র বলি, তা বিপরীতধর্মী গুণের একত্র-সমাবেশের ওপর নির্ভরশীল। মানুষের মধ্যে সাধারণত কোনো-একটা বিশেষ গুণেরই বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মানবিক গুণ, সে যা-ই হোক না কেন, মনুষ্যচরিত্রে তার শোভনসুন্দর স্ফুরণ সর্বদা বাঞ্ছিত। স্নেহ দয়া প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলি যে-মানুষকে আশ্রয় করে মূর্ত হয়ে উঠেছে, কোমল গুণের আধার বলে, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতেই হবে। কিন্তু আদর্শচরিত্রের গৌরব কি তাঁর প্রাপ্য? না। যাঁর চরিত্র শুধু কোমলতা দিয়ে গড়া তিনি অবিচার-অত্যাচারের সম্মুখে বীর্যদীপ্ত মূর্তি নিয়ে দাঁড়াবেন কী করে? যেখানে দুর্জনকে সবলে আঘাত হানতে হবে, দুর্বলকে দর্পিত শক্তির কবল থেকে রক্ষা করতে হবে, উদ্ধত অন্যায়কে ধুলোয় গুঁড়িয়ে দিতে হবে, সেখানে কোমলচিত্ত মানুষ তো সংগ্রামে অশক্ত। এরূপ ক্ষেত্রে কোমলগুণযুক্ত ব্যক্তি অবশ্যই যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবেন না; সে-কারণে দশজনের চোখে দুর্বল বলেই প্রতিপন্ন হবেন তিনি।

আবার বীর্যে ও দৃঢ়তায়, সাহসে ও বলিষ্ঠতায়, যিনি সহজেই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন, তাঁর মধ্যে যদি সুকুমার মানবিক গুণের একান্ত অভাব লক্ষিত হয়, তাহলে তাঁর চরিত্রের বিশুদ্ধ কঠোরতা অপরের কাছে পীড়াদায়ক একটি বস্তু হয়ে উঠবে—লোকমুখে তাঁর নিন্দাবাণী উচ্চারিত হবে।

তাই, পূর্ণাঙ্গ মানবচরিত্রে কোমলতা ও কঠোরতার যথোচিত সমাবেশ চাই—একাধারে চাই বজ্রের কাঠিন্য আর পুষ্পের মৃদুতা। যে মানুষ করুণাবিগলিত হয়ে অশ্রুপাত করেন, সেই মানুষটিই যদি প্রয়োজন হলে রোষদীপ্ত চক্ষু নিয়ে, বজ্রগর্জনে, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ছুটে যেতে পারেন, তবেই তিনি আকর্ষণ করতে সমর্থ হবেন সর্বজনের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। আদর্শচরিত্র এরূপই হয়। যেমন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পরের দুঃখে ঈশ্বরচন্দ্র কত কেঁদেছেন; কিন্তু বাঙালিসমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যখন তিনি [illegible] করেছেন তখন তাঁর পৌরুষমণ্ডিত মূর্তিটি বজ্রধারী বনস্পতির অকম্পিত দৃঢ়তা দেখিয়েছে। কোমলে-কঠোরে মিলে বিদ্যাসাগর-চরিত্র অভিনব প্রেক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

॥ ১ ॥ রত্নাকরের রাম-নাম-উচ্চারণে……সহজে খুঁজিয়া পাই না।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ২২৫। পৃ. ১-২]

< বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সমুচ্চ মহনীয়তা >

বাঙালিজাতির মধ্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সত্যিই একটি বিস্ময়ের ব্যাপার। আমাদের এই বাঙ্‌লাদেশে ঈশ্বরচন্দ্র অনন্ত ব্যক্তিত্ব। বাক্‌সর্বস্বতা, কর্মভীরুতা, কুটিলতা প্রভৃতি দীর্ঘকাল ধরে বাঙালির চরিত্রে অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। আমরা সহজ সরলতাকে বিসর্জন দিয়ে বসেছি, কাপট্যের আশ্রয় নিয়েছি, সহৃদয়তা-নামীয় বস্তুটির সঙ্গে কোনো পরিচয়ই বাঙালির নেই। অথচ বিদ্যাসাগর-চরিত্র এ থেকে কত স্বতন্ত্র এ-কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতিতর্পণের কোনো অধিকার বাঙালিজাতির আছে কিনা, সন্দেহ।

॥ ২ ॥ আশ্চর্য এই, এত প্রভেদ……ঋণস্বীকার করিতে হয় নাই।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ২৬০। পৃ. ৭-৮]

< বিদ্যাসাগরে খাটি বাঙালিত্ব >

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো খাটি বাঙালি খুব কমই দেখা যায়। তাঁ চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শজাত নয়, এগু' সম্পূর্ণই তাঁর নিজস্ব ব্যাপার—বাঙালিসমাজজীবন তথা পুরুষানুক্রমিক ঐতি থেকেই এসেছে। ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকাল যে পরিবেশে কেটেছে সেখানে পাশ্চা সভ্যতার প্রবেশ ঘটেনি। সেই বালকবয়সেই তাঁর চরিত্রের মূল উপাদানগু গঠিত হয়েছিল। উত্তরজীবনে তিনি বহু য়ুরোপীয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলে কিন্তু এতে তাঁর চরিত্র এতটুকু বদলায়নি। বিদ্যাসাগরের মধ্যে পাশ্চা জাতিসুলভ যে-সকল গুণাবলী লক্ষ্য করা যায় তা সাদৃশ্যমূলক, প্রভাবজা মোটেই নয়।

॥ ৩ ॥ পশ্চাত্যদেশে ফিলানথ্রপি-নামে……যেন তাহার প্রণোদক।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ১৮০। পৃ. ৯-১০

< পাশ্চাত্যজাতির লোকহিতৈষণার স্বরূপ >

পাশ্চাত্যদেশে যে-বস্তুটি লোকহিতৈষণা বা জনসেবা-নামে পরিচিত প্রাচ্যভূমিতে তাকে আমরা বলে থাকি মানবপ্রীতি। কিন্তু উভয়ে স্বরূপগত বিভিন্ন য়ুরোপীয়দের মধ্যে প্রাণসত্তার অনিরুদ্ধ প্রকাশ অতিশয় প্রেক্ষণীয়। প্রাণের সে দুর্বার আবেগের উচ্ছলনকে ব্যক্তিগত জীবনের সীমিত পরিধির মধ্যে যেন আ

ধরে রাখা যাচ্ছে না, দিকে দিকে বহু মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ছে এবং রূপ নিচ্ছে বিশ্বমানবহিতৈষণায়। পাশ্চাত্ত্যদেশীয় তরুণের দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে যেমন এই অবন্ধন প্রাণাবেগ প্রকাশিত, ঠিক তেমনি, বিশ্বমানবকে কুণ্ঠাহীন প্রীতিনিবেদনেও তা সমান আগ্রহী। উভয় ক্ষেত্রেই প্রাণের অবাধ স্ফূর্তির মুদ্রণ স্পষ্টরেখ। য়ুরোপীয় মানবপ্রীতির লক্ষ্য যতখানি পরের হিতসাধন, তার চেয়ে অনেক বেশি যেন আপন ব্যক্তিত্বের প্রকাশন।

॥ ৪ ॥ বিদ্যাসাগর একজন সমাজসংস্কারক……মেরুদণ্ড মন্ডিত করেন।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ২০৫। পৃ ১৬-১৭]

<সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগর>

বিদ্যাসাগর আমাদের সমাজে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করেছিলেন। সমাজ-সংস্কারমূলক এই দুরূহ কাজটিকে তিনি নিজের সর্বোত্তম সৎকর্ম বলে মনে করতেন। প্রাকৃতিক নিয়মে, আপন অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর দ্বারা মানুষ প্রতিনিয়ত তাড়িত হচ্ছে। তার ওপরে আপনার রচিত কতকগুলি অকরুণ অনুশাসন মানুষকে পীড়িত করতে থাকবে, বিদ্যাসাগরের তা সহ্য হতো না। তাঁর সমাজসংস্কার-প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে চিত্তের এই করুণাপ্রবণতা। বাঙালিঘরের বিধবাদের দুঃখে বিদ্যাসাগরের হৃদয় বেদনার্ত হয়েছিল, এদের দুঃখবিদূরণকল্পে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন তিনি। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কী কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে তাঁকে। তখন আমরা দেখতে পেলাম তাঁর ব্যক্তিত্বের অনমনীয়তা। কোমলতা ও কঠোরতার অপূর্ব সমাবেশে বিদ্যাসাগর-চরিত্র সত্যই অ-সাধারণ।

॥ ৫ ॥ মানবজীবনের একটা গোড়ার কথা…… পাশবপ্রবৃত্তি বলিয়া থাকি।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ২৫০। পৃ. ২৮-২৯]

<মানবজীবনের ও জৈবসামঞ্জস্য>

যাকে আমরা জীবন বলে থাকি তা আসলে একটা সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা ছাড়া আর কী? মানুষ থেকে অতিক্ষুদ্র একটি কীটের মধ্যে এই চেষ্টা প্রতিনিয়ত লক্ষিত হয়। বাহিরের প্রকৃতির বিরুদ্ধশক্তি জীবকুলকে—প্রাণীকে—সর্বক্ষণ তার বিনাশের মুখে টানছে, অপরপক্ষে, জীবসমূহের অন্তর্নিহিত দুর্বার প্রাণশক্তি এই বিরুদ্ধতার সঙ্গে অব্যাহত সংগ্রাম করে চলেছে। যার জীবন নেই তার এই সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টাও নেই। একটা পর্বত নিসর্গপ্রকৃতির নিষ্ঠুর আক্রমণে অনুক্ষণ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে; ক্ষয়পূরণ কী করে করতে হয়, সে জানে না। কিন্তু একটা পিঁপড়া প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে সর্বশক্তিনিয়োগে আহার্যাদি সংগ্রহ করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে অবিরাম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুকে একপাশে দূরে ঠেলে রাখার অক্লান্ত প্রয়াসই হলো জীবনের মূলকথা; এবং এই

উদ্দেশ্যেই বংশবৃদ্ধি—আমি মরে গেলে আমারই মতো একটি জীবকে আমার শূন্যস্থানে রেখে যাওয়া। অপর সকল জীবের ন্যায় মানুষও এরূপ সামঞ্জস্যস্থাপন করে যাচ্ছে। এই জৈবপ্রবৃত্তির ক্ষেত্রে মানবেতর জীব বা প্রাণীর সঙ্গে মনুষ্যসন্তানের কোনো পার্থক্য নেই।

॥ ৬ ॥ মানুষ অতি দুর্বল জীব .... মহাযুদ্ধ সেখানে নিরন্তর চলিতেছে।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ২০০। পৃ. ২৯-৩০]

< মানুষের অন্তর্জীবনে মঙ্গলবোধ ও জৈবপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব >

আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার নিরন্তর চেষ্টা মনুষ্যসহ সমস্ত জীবেরই আদিম একটি প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির প্রেরণায় দুর্বল অথচ বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ সমাজ নামে একটি বস্তু গড়ে তুলছে। সমাজের লক্ষ্য সমষ্টির বৃহত্তর কল্যাণ। সমাজ রক্ষিত হলে ব্যক্তিমানুষের নিরাপত্তাও বাড়ে। সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে ব্যক্তিরও সমূহ বিপদ। তাই, সমাজকে বাঁচিয়ে না রাখলে চলে না। এতে বাঁচাতে গিয়ে মানুষকে একটি দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়—সহজাত জৈবপ্রবৃত্তির সঙ্গে তার কল্যাণবুদ্ধির দ্বন্দ্ব। জৈবপ্রবৃত্তি আত্মসর্বস্ব, অহংকেন্দ্রিক ; মানবের শ্রেয়বোধ কিন্তু সমাজমুখী। প্রথমটির দৃষ্টি আত্মতৃপ্তির দিকে ; দ্বিতীয়টির দৃষ্টি আত্মব্যাপ্তির অভিমুখে—বহুর কল্যাণসাধন এর অভিলষিত। এইকারণে সমাজরক্ষার বাসনা—মানুষের শ্রেয়বোধ বা ধর্মবোধ—অনেকসময় তার জৈবপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধতা করে। এই দুয়ের দ্বন্দ্ব মানবের অন্তর্জীবন বিক্ষত।

॥ ৭ ॥ নবেলের মতো এই মানসিকসাহিত্যও ... ন্যূনতা স্বীকার করিবে না।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ১৭০। পৃ. ৩৩]

< সংস্কৃতির মিশ্রণ ও বাঙ্‌লাসাহিত্যের নানাদিক >

ভারত চিরকালই বিদেশি জিনিসকে স্বদেশে স্থান দিয়ে আপনার করে নিয়েছে। বহির্ভারতীয় দুয়েকপ্রকার উদ্ভিদ ও ফসলের বীজ এদেশের মাটিতে বেশ ধরে গিয়েছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বহিরাগত কিছু কিছু বস্তু আমরা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছি। পশ্চিমী হাওয়া না বইলে আধুনিক বাঙলাসাহিত্য আজ এতখানি সমৃদ্ধ হয়ে উঠত কী? উপন্যাসসাহিত্য এবং মাসিকপত্রিকা-আদি বস্তুর জন্যে আমরা প্রত্যক্ষভাবে য়ুরোপের কাছে ঋণী। এসব জিনিস বঙ্কিমের আগেই বাঙ্‌লাসাহিত্যসংসারে প্রবেশ করেছে, কিন্তু এদের সত্যিকার সমৃদ্ধি ঘটেছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই।

॥ ৮ ॥ বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে শিক্ষিত..... সংকোচ বোধ করিল না।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ২০০। পৃ ৩৯-৪০]

< বাঙালির সম্মুখে ধর্মপ্রচারক বঙ্কিমের স্বদেশীয় শাস্ত্রস্থাপন >

বঙ্কিমের পূর্বে রাজা রামমোহন রায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈদিক ও

ঔপনিষদিক গ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যা বাঙলাদেশে প্রচারণায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। এঁদের প্রচারিত ধর্মতত্ত্বের মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের অনুবর্তীরা সার্বভৌমিক ধর্মের সারসংকলন করতে গিয়ে বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়েছিলেন। বিদেশ থেকে ধর্মতত্ত্ব-আহরণ হয়তো তেমন দোষের কিছু নয়; কিন্তু বিদেশি বস্তুর আকর্ষণে স্বদেশের শাস্ত্র উপেক্ষিত হওয়াটা সত্যই পরিতাপের বিষয়। ধর্মপ্রচারক বঙ্কিম আমাদের দেখালেন, ধর্মের উচ্চাদর্শ স্বদেশেই রয়েছে, এই জন্যে বিদেশের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই। জাতীয় জীবনে এই ঘরেফেরার ডাকের মূল্য অসামান্য।

॥ ৯ ॥ যুগধর্ম-সংস্থাপনের জন্য যিনি……উহা তাঁহারই মূর্তি।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ১৮০। পৃ. ৪০-৪১]

< বঙ্কিম-আরাধিত যুগদেবতা >

বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারত থেকে শ্রীকৃষ্ণের বিস্মৃতপ্রায় এক মূর্তি উদ্ধার করে দেশবাসীর সমক্ষে তুলে ধরেন। সে-মূর্তি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যমূর্তি—যে রূপে যুগে যুগে তিনি দুষ্টের দমন এবং সাধুজনের প্রতিষ্ঠাবিধান করেন; এককথায়, এই কৃষ্ণ-ধর্ম-সংস্থাপয়িতা। ভারতবর্ষীয় মানুষ কৃষ্ণের এই মূর্তিটিকে একরূপ ভুলতে বসেছে। এদেশে শ্রীকৃষ্ণের অপর-এক মূর্তির আরাধনাই বহুপ্রচলিত। তা হলো তাঁর প্রেমময় মাধুর্যমূর্তি। এই মূর্তিতে বাঙালি তথা ভারতবাসীর মনোলোকে দীর্ঘকাল ধরে তিনি বিরাজ করেছেন। যুগপুরুষ বঙ্কিম কিন্তু যুগধর্মের প্রয়োজনে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পার্থসারথিকেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করলেন—অতিশয় কঠোর-নির্বিকার, রুদ্রভয়ংকর এঁর মূর্তি। বঙ্কিম এঁদের যুগদেবতা বলে জেনেছিল।

॥ ১০ ॥ জৈবপদার্থ কিরূপে পচিয়া… রাসায়নিক প্রক্রিয়া নহে।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ২০০। পৃ. ৫১-৫২]

< জৈবপদার্থের পচনক্রিয়ায় আসল হেতু কী >

জৈববস্তু কী করে পচে এর যথার্থ উত্তর রসায়নবিদ্‌গণ বহুকাল দিতে পারেন নি। এঁরা এতাবৎকাল শুধু এই ব্যাপারটি জানতেন যে, বায়ুতে অবস্থিত অম্লজানের সংস্পর্শে এলে জৈবপদার্থের অঙ্গারভাগ ক্রমে পুড়ে গিয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানী হর্মান হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজই সর্বপ্রথম জৈববস্তুর পচনক্রিয়ার আসল রহস্যটি আবিষ্কার করেন। তিনি দেখালেন যে, পচনশীল বস্তুনিচয়ে অতিক্ষুদ্র অদৃশ্যপ্রায় একপ্রকার জীবাণু আত্মবিস্তার করে তাদের পচনক্রিয়া ঘটায়। যে জৈবপদার্থে এসব জীবাণু আত্মবিস্তারসাধন করতে পারে না, অম্লজানের সংস্পর্শে এলেও সেগুলি কদাপি, কিছুতেই পচবে না। পদার্থের পচনকার্যটি আসলে কোনো-রূপ রাসায়নিক ব্যাপার নয়, এ সম্পূর্ণ একটি জৈবপ্রক্রিয়া; জীবাণুর অদৃশ্য অবস্থিতিই ওই কার্যের মূলীভূত কারণ।

॥ ১১ ॥ অতি প্রাচীনকাল হইতে শুনিয়া……মনুষ্যমধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ১৬৫। পৃ. ৫৫-৫৬]

< জ্ঞানের তিন মহলে হেলম্‌হোলৎজ-এর অবাধ বিহরণ >

মানুষের ইন্দ্রিয়নিচয়ের সঙ্গে জ্ঞান-বস্তুটির যথার্থ কী সম্বন্ধ, কিরূপে জ্ঞানের উদ্ভব হয় এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর তেমন কেউ আবৎ দিতে পারেনি। এক জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাহিরের জড় প্রকৃতির আলোড়ন-আন্দোলন ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারপথে মস্তিষ্কে পৌঁছে সেখানে অন্তঃকরণের সাহায্যে নানাবিধ সংকেত-মূর্তি পরিগ্রহ করে। এইভাবেই জ্ঞানের উৎপত্তি। আমাদের মনই গ্রহণবর্জনের পর জ্ঞাত বস্তুকে জীবনের পুষ্টি ও তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কাজে লাগাচ্ছে। মানুষের জ্ঞানের মূলত তিনটি বিভাগ। পদার্থবিদ্যার কারবার জড়জগৎকে নিয়ে; জীববিদ্যা ও শারীরবিদ্যা ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ-বিষয়ে আলোচনা করে; ইন্দ্রিয়নিচয়ের প্রেরিত বার্তা অন্তঃকরণ কিরূপে নানাপর্যায়ে বিন্যস্ত করে জ্ঞানের জগৎ নির্মাণ করছে, মনস্তত্ত্ববিদ্যা তার আলোচনায় রত। এই তিনটি বিজ্ঞান জ্ঞানসাম্রাজ্যের তিনটি প্রকাণ্ড দেশ। বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক একজন এই তিন মহাদেশের কোনো-একটির চর্চায় ব্যাপৃত। কিন্তু হেলম্‌হোলৎজ-এর অসাধারণ কৃতিত্ব হলো, জ্ঞানের উক্ত তিন মহলেই তিনি অবলীলায় সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছেন।

॥ ১২ ॥ তিনি ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে……সেই বন্ধু হারাইয়াছি।

[শব্দসংখ্যা প্রায় ২৭৫। পৃ. ৬৫-৬৭]

< ভারতবন্ধু ম্যাক্সমূলর >

ম্যাক্সমূলের ন্যায় আরো অনেক পাশ্চাত্যপণ্ডিত প্রাচ্যবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে ভারতবিদ্যাবিদ্‌ এই মনীষীর পার্থক্য হলো ম্যাক্সমূলর ভারতবর্ষকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন। ভারতবর্ষ য়ুরোপকে কী শিক্ষা দিতে পারে এ নিয়ে তিনি গ্রন্থরচনা করে গেছেন, ভারতের কৃতী সন্তানদের বিষয়ে জীবনচরিতও তিনি লিখেছেন। কারাবাসে প্রেরিত লোকমান্য তিলককে স্বকৃত ঋগ্বেদসংহিতা পাঠানো এবং আরো নানা ছোটখাটো ব্যাপারে ম্যাক্সমূলর ভারতের প্রতি তাঁর সুগভীর অনুরাগের পরিচয় দিয়েছেন। সম্ভবত তাঁর ধারণা ছিল যে, তাঁর স্বপ্নের ভারতভূমির সঙ্গে বাস্তব ভারতবর্ষের মিল হবে না—একারণেই তিনি এদেশে পদার্পণ করেন নি। ভারতবাসীও এহেন একজন মনীষীকে হৃদয়ে নিবিড়তম ভালোবাসায় জড়িয়ে এর প্রতিদান দিয়েছিল। ম্যাক্সমূলর লোকান্তরিত হওয়ায় আমরা এক বিশিষ্ট ভারতবন্ধুকে হারিয়েছি।

তিনি যে উগ্র বাঙালিত্ব বজায় রাখতেন, তা যেন দেশবাসীর অধিকাংশের পরানুকরণের বিরুদ্ধে এক উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ।

॥ ৩ ॥ রাজ্যশাসন ও সমাজশাসন……আশা করিতে পারা যায়।

[পৃ. ১২]

মানবচরিত্রের বহু ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনের জন্যে রাষ্ট্র, সমাজ এবং ধর্ম অনেক ব্যবস্থা করেছে ; নীতিশাস্ত্র ও শিক্ষার বিস্তার মানুষের মনের পরিবর্তন ঘটাতে চাইছে ; বিচারালয়, কয়েদখানা শাস্তি দিয়ে পাপীকে সতর্ক করে দিচ্ছে। কিন্তু এতকালের এত চেষ্টাও মানবচরিত্রের ত্রুটি বদলায়নি। যদি কোনদিন সহজাত প্রবৃত্তিগুলির মতোই দয়াবৃত্তি ও পরোপকারবাসনা প্রভৃতি মানুষের হৃদয়লোকের অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়ায়, তবে মনুষ্যজাতি তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হতে পারে।

॥ ৪ ॥ সমাজের বর্তমান অবস্থায়……পরিচ্ছেদ-বিশেষের সাক্ষ্য দিবে।

[পৃ. ১৩]

স্বার্থস্পর্শবিরহিত পরোপকারবৃত্তি আজকের মানুষের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না। প্রায়ই এ-ই চোখে পড়ে যে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে লোকে পরের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। কিন্তু যদি কোনদিন এমন অবস্থা হয় যে, ক্ষুধাতৃষ্ণা-নিবারণ, আত্মরক্ষার প্রয়াস প্রভৃতি জৈববৃত্তির মতোই পরোপকারবাসনাও মানব-চিত্তের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাহলে সেদিন সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটবে ; তখন ধর্মশিক্ষা ও নীতিপ্রচারণা, রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ শাসন ইত্যাদি কিছুরই আর প্রয়োজন থাকবে না। আসল কথা, পরার্থপরতা মনুষ্যভাবের অঙ্গীভূত হওয়া চাই।

॥ ৫ ॥ ঈশ্বর এবং পরকাল সম্বন্ধে……অবকাশ লাভ করিবে।

[পৃ. ১৪-১৬]

ঈশ্বর ও পরকাল-বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় তেমন ভাবিত ছিলেন না। আমাদের মর্ত্যসংসার অনবচ্ছিন্ন সুখের স্থান নয়, মানুষের জীবনে বিস্তর দুঃখকষ্ট আছে—এই বাস্তব সত্যটিই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছিল। একারণে বিশ্বপিতার মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় হতে পারেননি। মনুষ্যই বিদ্যাসাগরের ভাবনার ও কর্মের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ; মানুষের প্রতি কর্তব্যসম্পাদন ছাড়া অন্যকিছুর কথা তিনি চিন্তা করতে পারেননি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই অতিআত্যন্তিক মানবপ্রীতির আদর্শটি সকলের অনুসরণীয়।

॥ ৬ ॥ একশ্রেণীর সমালোচক আছেন……তাহা হইলে তাহা কাব্য হয় না

[পৃ. ২৭

উপন্যাসসাহিত্যের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে সমালোচকমহলে মতভেদ আছে

একশ্রেণীর সমালোচক মনে করেন, উপন্যাস প্রত্যক্ষ বাস্তবের বিশ্বস্ত বাণীরূপ ছাড়া আর-কিছু নয়; অপর একশ্রেণীর মতে উপন্যাস ধর্ম ও নীতিশিক্ষার বাহন মাত্র। কিন্তু বলতে হয়, এঁদের কেউই উপন্যাসশিল্পের যথার্থ স্বরূপটি ধরতে পারেননি। যেহেতু উপন্যাস একপ্রকারের কাব্য, এবং যেহেতু সৌন্দর্যসৃষ্টিই কাব্যশিল্পের মূলকথা, সেহেতু উপন্যাসকে সৌন্দর্যরচনের দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করতে হবে। বর্ণিতব্য কথাবস্তু যা-ই হোক-না কেন, সৌন্দর্যসমৃদ্ধ রূপকর্ম না হলে উপন্যাস কদাপি কাব্যের মর্যাদা পেতে পারে না।

॥ ৭ ॥ **বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী···শান্তিলাভে বাধ্য হইয়াছিলেন।**

[পৃ. ৩০-৩১]

বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসগুলির কেন্দ্রীয় সমস্যায় একটি নিগূঢ় ঐক্য আছে। এগুলির নায়কদের জীবনে শ্রেয়বোধ ও প্রেয়বোধের তীব্রদ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। এসব চরিত্রের মধ্যে যাঁদের অন্তর্লোকে ধর্মবুদ্ধির স্ফুরণ ঘটেছে তাঁরা বিদীর্ণচিত্ত হলেও শেষপর্যন্ত জয়লাভ করেছেন; আবার, নিজেদের যাঁরা প্রবৃত্তির তাড়নার ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পারেননি, তাঁদের কেউ অনিঃশেষ হৃদয়যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, কেউ-বা মর্মান্তিক আত্মহননের মধ্যে অন্তিম শান্তি খুঁজেছেন।

॥ ৮ ॥ **বাঙলাসাহিত্যে তাঁহার কোন্ কাজ···ঘরে ডাকিয়া আনেন।**

[উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬১] [পৃ. ৩৩-৩৪]

বাঙলাসাহিত্যের মাধ্যমে স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেমিক বঙ্কিম ইংরেজি-অনুরাগী বাঙালির দৃষ্টিকে নিজঘরের দিকে ফিরালেন। বিদেশি ভাষার মোহ কাটিয়ে উঠে মাতৃভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে তিনি আমাদের উপদেশ দিলেন। বঙ্কিমের পূর্বে রামমোহন রায় বুঝেছিলেন, দেশীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ না করলে জাতীয় উন্নতি সম্ভব হবে না। তাই, মাতৃভাষার অনুশীলনে তিনি তৎপর হয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টি থেকে মাতৃভাষা অপসৃত হলো, ইংরেজিভাষাবাহিত য়ুরোপীয় সংস্কৃতি গোটা দেশকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ফলে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের ভাগ্যে জুটল নিদারুণ উপেক্ষা। এই গ্লানিজনক বিজাতীয়তা ও পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বাঙালিকে বাঁচালেন বঙ্কিমচন্দ্র।

॥ ৯ ॥ **সাহিত্যকে ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন···দেখিবার প্রয়োজন নাই।**

[পৃ. ৪৩-৪৪]

আমাদের দেশে 'ধর্ম' কথাটি সুপ্রাচীনকাল থেকেই অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে—কেবল আধ্যাত্মিক ভাবনাচিন্তার অর্থে নয়। মানবজীবনের বিচিত্র বিকাশ ও কর্মের সঙ্গে ভারতীয় ধর্মচেতনা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, ব্যক্তির ও

সমষ্টির যথার্থ কল্যাণ এর বড়ো কথা। এই ব্যাপক অর্থের দিক থেকে দেখলে সাহিত্যও ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত, বলতে কোনো বাধা নেই। সাহিত্য মানবে-মানবে সৌহার্দের সেতুরচনা করে, বৃহত্তর সমাজকল্যাণ তারো লক্ষ্য। ধর্মের সঙ্গে একারণেই সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

॥ ১০ ॥ ইউক্লিডের সময় হইতে…করিয়াই নিরস্ত হইতে হইল।

[পৃ. ৫৯]

মানুষ অতিপ্রাচীনকাল থেকে কতকগুলি তথ্য বা তত্ত্বকে অবশ্যসত্য—তর্কাতীত সত্য বলে মেনে আসছে। দার্শনিক কাণ্টই প্রথম এইসব স্বতঃসিদ্ধতার সম্বন্ধে গুরুতর প্রশ্ন তুললেন; তিনি দেখালেন যে, এগুলি মানুষের মনের সৃষ্টিমাত্র। কিন্তু ইউক্লিডের নির্দেশিত জ্যামিতিক মূলসত্যগুলির বিষয়ে কাণ্ট বা অন্য কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। কিন্তু হর্মান হেল্‌মহোলৎজ এই স্বতঃসিদ্ধগুলির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে, এসব বস্তুও মানুষের মনগড়া সত্যমাত্র—মানবমনের বাইরে কোন সত্য নেই।

॥ ১১ ॥ মক্ষমুলের সংস্কৃতশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার…কেহই অস্বীকার করিবেন না।

[পৃ. ৬০-৬১]

একালের ভাষাবিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও প্রখ্যাত সংস্কৃতশাস্ত্রী ম্যাক্সমূলরের দান সামান্য নয়। তাঁর পূর্বে সংস্কৃতভাষার প্রাচীনত্ব আবিষ্কার করে উইলিয়ম জোন্স জাতিতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানের ধারণায় আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন। আগে 'হিব্রু'ভাষাকে য়ুরোপীয় ভাষাগুলির, এবং ইহুদিজাতিকে পৃথিবীর যাবতীয় মানবসন্তানের আদি-উৎস বলে মনে করা হতো। কিন্তু সংস্কৃতভাষার প্রাচীনতা প্রতিষ্ঠিত হলে পর দেখা গেল, পূর্বোক্ত এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক; বরংচ সংস্কৃতভাষার সঙ্গে য়ুরোপীয় ভাষাগুলির, এবং ভারতীয় আর্যজাতির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যজাতিসমূহের নিকটতম সম্পর্কটি ধরা পড়ল। ম্যাক্সমূলরের অক্লান্ত গবেষণা আর্যভাষা ও আর্যজাতিগুলির সম্বন্ধনিরূপণে কম সহায়তা করেনি।

॥ ১২ ॥ ঋগ্বেদসংহিতার প্রচার…সযত্নে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

[পৃ. ৬২]

ঋগ্বেদকে ম্যাক্সমূলার মানবজাতির সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বলে মনে করতেন। এই গ্রন্থের সাহায্যে তিনি আর্যজাতির ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছিলেন, আর্যদের ভারত-আগমনের কাল এবং আর্যপূর্ব ভারতের সামাজিক অবস্থা নিরূপণেরও প্রয়াস করেছিলেন। এবিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি সর্বজনগ্রাহ্য না হলেও, তাঁর পাণ্ডিত্য, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের তুলনা বিজ্ঞানের ইতিহাসে কদাচিৎ চোখে পড়ে।

॥ ১৩ ॥ শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তীক্ষ্ণ…চিরকৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ।

[পৃ. ৬৮-৬৮]

পাশ্চাত্ত্যদেশীয় অনেক পণ্ডিত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁদের ধারণায় ভারতবর্ষ এক মৃতসভ্যতার দেশ। এদেশের প্রতি ওইসব পণ্ডিতমণ্ডলীর তেমন কোনো অনুরাগ দেখা যায়নি—ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাঁদের পাণ্ডিত্যপ্রকাশের উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমুলর কিন্তু ভারতবর্ষকে—ভারতভূমির সুপ্রাচীন সভ্যতাকে—অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বর্তমানে দুর্দশাগ্রস্ত হলেও, এককালে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি মহিমাদীপ্ত ছিল, এ সত্যটি তাঁর মতো অন্য কেউ উপলব্ধি করেন নি। প্রাচীন ভারতকে এই গৌরবদানের জন্যে মাক্সমূলরের কাছে আমাদের ঋণ সামান্য নয়।

॥ ১৪ ॥ সম্প্রতি স্বদেশের ইতিহাস-উদ্ধারের… সর্বতোভাবে উপহাস্য।

[পৃ. ৭৪-৭৫]

স্বদেশের ইতিহাস-অনুশীলন পুরাতনকালে যেমন গুরুত্ব পায়নি, আধুনিককালেও তেমনি অবহেলিত থেকে গেছে। এর কারণ হলো আমাদের দেশপ্রীতির অভাব। আমরা স্বদেশানুরাগ বলতে এখন যা বুঝি প্রাচীনকালে তা ছিল না; বর্তমানকালেও বিজাতীয় শিক্ষাবৈগুণ্যে আমাদের অন্তরে প্রকৃত দেশপ্রেম উদ্বোধিত হয়নি। স্বদেশপ্রেম ছাড়া দেশীয় ইতিহাসচর্চার উন্নতি হতে পারে কী করে!

॥ ১৫ ॥ শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে দণ্ডায়মান…অবসর ঘটিয়া উঠে নাই।

[পৃ. ৭৮]

উমেশচন্দ্র বটব্যালের বৈদিকসাহিত্যের আলোচনা ঠিক বস্তুভিত্তিক ছিল না। প্রাণের কি এক প্রকাণ্ড পিপাসায় তিনি অতীত ভারতের এক স্বপ্নসুন্দর দৃশ্যের দিকে নিজের দৃষ্টি প্রসারিত করে ধরতেন। তথ্যনিষ্ঠার দিক দিয়ে দেখলে অপর কয়েকজন বাঙালি মনীষীর বৈদিক সাহিত্যের আলোচনার মূল্য হয়তো অপেক্ষাকৃত বেশী। কিন্তু অন্যদিক থেকে উমেশচন্দ্রের বৈদিকসাহিত্যচর্চার বিশেষ একটি মূল্য আছে। অতীতে অপসৃত ভারতবর্ষ উমেশচন্দ্রের মর্মলোকে যে সুন্দরতর আদর্শোজ্জ্বল জীবনের আকুতি জাগাতো, তারই পরিপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর বৈদিক আলোচনায়।

॥ ১৬ ॥ সাহিত্যচর্চায় জীবন অতিবাহিত…এইরূপ উদাহরণ বিরল।

[পৃ. ৯১]

রজনীকান্ত অবস্থার প্রতিকূলতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চডিগ্রি যেমন লাভ করতে পারেননি, তেমনি, শারীরিক বৈকল্যহেতু জীবিকা-অর্জনের ব্যাপারেও সুবিধা করে উঠতে

পারেননি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এহেন একটি অবস্থায় সাহিত্যচর্চাকে তিনি নিজ জীবনের বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করলেন। এ যে নিতান্ত দুঃসাহসের কাজ তাতে অণুমাত্র সন্দেহ নেই। এই দুঃসাহসের পিছনে সক্রিয় ছিল তাঁর নিবিড় সাহিত্যপ্রীতি।

॥ ১৭ ॥ বলেন্দ্রের আলোচ্য বিষয়···ইহাই প্রতিপন্ন হইবে।

[পৃ. ৯৯]

বলেন্দ্রসাহিত্যের আলোচনার পরিধি বিস্তৃত—মানুষের জীবন ও মানবসমাজ, কাব্য ও অন্যবিধ শিল্পকর্ম ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর আলোচনাপদ্ধতিতে দুটি জিনিস লক্ষণীয়। বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি আলোচ্য বিষয়ের বিচার করেছেন, আবার, বিষয়টির সৌন্দর্য-উপভোগের দিকেও আপনার রসানুভূতিকে সদাজাগ্রত রেখেছেন। যেখানে সৌন্দর্য বিনষ্ট সেখানে বলেন্দ্রনাথ কঠোর সমালোচক। কিন্তু তাঁর বিরূপ মন্তব্য মৃদুশ্লেষমিশ্র। আরো লক্ষ্য করতে হবে, দোষপ্রদর্শনের চেয়েও তিনি বেশি জোর দিয়েছেন সমালোচ্য বস্তুর অন্তর্লীন সৌন্দর্যের ওপর। এক্ষেত্রটিতে তাঁর দক্ষতার প্রশংসা করতেই হয়।

সংকল্প ও স্বদেশ

< ভাবসম্প্রসারণ >

॥ ১ ॥ যাব আজীবনকাল পাষাণকঠিন
সরণে
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ
সুধা আছে সেই মরণে।

[—ভৈরবী গান ঃ পৃ. ১৫]

বাইবেলে বলা হয়েছে জীবনের দ্বার সংকীর্ণ, অল্প লোকেই সেখানে প্রবেশ করতে পারে। এ কোন্ জীবন? আমাদের চতুর্দিকে যে মানুষের মেলা, সেখানে তা দেখি জীবনযাপন অনায়াস; অন্তত, আয়াসসাধ্য হলেই তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। কিন্তু মানবজীবনের যথার্থ পথ এই পরিকীর্ণ তুচ্ছতার মধ্যে নয়, অনায়াস অবহেলার মধ্যে নয়। পশু তার আপন শক্তিতে কিছু গড়ে তোলে না, বিধাতার দেওয়া শক্তিই তার সর্বস্ব, মানুষের তো গৌরব এই যে, সে আপন শক্তিতে সংসারজীবনের সুষমা রচনা করে চলে। রচনার এই গৌরব যদি আমি প্রত্যাশা করি, তবে দুরূহ কঠিন কর্তব্যের ভার আমাকে বরণ করে নিতে হবে। নিশ্চিত আরামের সুখশয্যায় অনেকেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকতে চায়। কিন্তু উপনিষদ বলেছেন, 'যে শুয়ে থাকে তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে, অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।' 'চরৈবেতি'র মন্ত্র অঙ্গীকার করে জীবনের পথে অগ্রসর হয়ে যাব। তখন কি আলস্যমায়া পরিহার করতে হবে না? তখন কঠিন জীবনপথে দৃঢ়মনস্ক হয়ে অগ্রসর হতে হবে।

মহাজীবনের এই ব্রত। আর, এই ব্রতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে দুঃখের বাণী, মৃত্যুর বাণী। মৃত্যু তো কখনো কখনো বরণীয় বলে বোধ হয়। যখন দেখি যে, ব্যাপকতর মঙ্গলের আয়োজনে আমার জীবনকে আহ্বান করা হয়েছে, তখন তো আমি গৌরবান্বিত। জীবন তো চিরদিন স্থির থাকবার জন্যে নয়, মৃত্যুকে অনিবার্য বলেই জানি। তাই যদি সত্য, তবে মহৎ ব্রতের জন্যে আত্মদান করে কেন সেই মৃত্যুকে আমরা সার্থক, স্মরণীয় করে তুলি না? সত্যিকার জীবনের পথে যে পৌঁছতে চায়, এই মৃত্যুর পরীক্ষা তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে। মৃত্যু তার কাছে ভয়ের নয়, আনন্দের।

॥ ২ ॥ বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থময় যে-জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

[—এবার ফিরাও মোরে ঃ পৃ. ১৯]

[উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেন্টাল, ১৯৬৩]

'যতদিন জীবন আছে, সুখে কাটানো যাক, ঋণ করে ঘী খাওয়া যাক' : এই পরামর্শ দেবার মতো অনেক লোক পাওয়া যায়। বস্তুত, সংসারের অধিকাংশ নরনারীই এহেন পরামর্শলাভের জন্য উন্মুখ, কেননা, জীবনযাপনের এ হলো এক দায়িত্বশূন্য কুসুমাস্তীর্ণ পথ। কিন্তু জৈব আকাঙ্খার পরিপূর্ণ তৃপ্তিই যদি মানবলোকের সর্বোত্তম সিদ্ধি বলে গণ্য হতো, তবে শতাব্দীর পর শতাব্দ ব্যাপী এই দর্শন বিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্যের কী প্রয়োজন ছিল মানুষের ? সাধারণ জীবলোক থেকে স্বতন্ত্র এক আকুতি মানবমনে নিত্য ধ্বনিত হয় বলেই আমাদের গৌরব, আমরা কেবল খাদ্য-পানীয়ের দ্বারা জীবন-যাপন করতে পৃথিবীতে আসি না।

অবশ্য, এই উপলব্ধি জন্ম থেকেই মানুষ অর্জন করে না, ক্রমশ তাকে সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ওঠবার শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। জন্মত সে জৈব, কিন্তু কর্মত সে উচ্চ-মানবিক। প্রাণের অন্ধ তাড়নায় শিশু তার ক্ষুধার তৃপ্তি খুঁজে আকুল। কিন্তু সেই শিশু যখন বয়সী, তখন পরিবার পরিজন তার চেতনায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। সে কি তখন আর তার নিজের খাদ্যই কেবল খোঁজে ? তার উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে অপরের জন্যে। আত্ম থেকে পরিবার, পরিবার থেকে দেশ, দেশ থেকে বিশ্বের জন্যে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে তার উৎকণ্ঠা। এক মহাপ্রেমের বন্ধনে সে মানবসমাজকে নিজের সঙ্গে যুক্ত করে নেয়। আত্মবৃত্তের বন্ধন থেকে এইভাবে যখন সে নিষ্ক্রান্ত হয়, তখন চিত্তের স্বভাব-উল্লাসে সে উচ্চারণ করতে পারে : হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

বিশ্বাত্মীয়তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই জীবনই যথার্থ জীবন। কোনো একটি নাটকে রবীন্দ্রনাথ একটি ব্যাঙের উল্লেখ করেছেন, হাজার হাজার বছর গর্তের আড়ালে যে টিকে আছে। টিকে আছে কিন্তু বেঁচে নেই। একথার তাৎপর্য কী ? বেঁচেও কি নেই সে ব্যাঙ্‌ ? আছে, কিন্তু তাকে কি আর বাঁচা বলা যায় ! আলো বাতাসহীন নির্জনে কোনোক্রমে সে জীবন কাটাচ্ছে মাত্র। আমাদের মানবসমাজেও এই দুরকম শ্রেণী দেখি : কেউ বা টিকে থাকে ঐ ব্যাঙের মতো, কেউ বা বাঁচতে চায় মানুষের মতো মাথা উঁচু করে। শেষোক্ত পথ যে নির্বাচন করে নেবে, সে তো আর নিজেকে নিয়ে মগ্ন থাকতে পারে না। বাইরের জীবন-প্রবাহের সঙ্গে তার জীবনকে যুক্ত করে দিতে হবে, প্রাজ্ঞের মতো পরার্থে প্রাণ উৎসর্গ করতে হবে।

॥ ৩ ॥

মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্ত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর।

[—কবিতাসংখ্যা ৯ ॥ পৃ. ৩৩]

এক বিরাট মূলশক্তির প্রকাশ এই সমগ্র বিশ্ব। ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন একথা অর্ধসত্য। পূর্ণসত্য এই যে, ঈশ্বরই বিশ্ব। যদি একথা আমরা মনে রাখি তবে বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে কেবল তাঁর করুণারাশিকে নয় তাঁকেই প্রত্যক্ষ

করি। এজন্যে মহামনীষীরা বারংবার সতর্ক করে দিয়ে গেছেন, তাঁর মন্দিরস্বরূপ এই দেহকে উপেক্ষা করে, অপবিত্র করে যেন আমরা উদাসীন না থাকি, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর'—এই বেদনা তাই সন্ন্যাসীকবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

প্রতি বস্তুই যদি ঈশ্বরের স্বতঃপ্রকাশ হয়, আমার এই দেহটিও তো তবে তাঁরই অধিষ্ঠানভূমি। আমার দেহটির তবে তো আমি অন্তরতর ঈশ্বরকেই পূজা নিবেদন করি। 'আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো': এই অশ্রুসজল উচ্চারণ তখন আমার কাছে অত্যন্ত সহজ হয়ে আসে। নিজেকে উপযুক্ত করে রচনা করবার কাজে তখনই মানুষ ব্রতী হতে পারে। তার মধ্যে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন যে বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বরেরই বোধন, একথা সে তখন উপলব্ধি করে। তাই, শাস্ত্র আমাদের বলেছেন, নিজেকে জানো, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত,—তাহলেই ঈশ্বরকে জানা হবে। যখন 'আত্ম' আমাদের মধ্যে সম্যক দৃষ্টিপাতে জাগ্রত হয়ে ওঠে, তখনই মহেশ্বর আমাদের সামনে প্রকাশ পান।

॥ ৪৬ ॥ অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।
[—কবিতাসংখ্যা ১২৪ পৃ ৩৬]

ন্যায়নীতির বিধান যারা লঙ্ঘন করে, সমাজে তারা ঘৃণার পাত্র। এ খুব সহজ কথা। জীবনের আচরণে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট মান রক্ষা করে আমাদের চলতে হবে। সেই মান ও মূল্যকে যারা ক্ষুণ্ণ করবে তাদের অপরাধের সীমা নেই। এ তো আমরা অনায়াসেই বুঝি। তাই আমরা ধরে নিই, আমাদের একমাত্র কর্তব্য হলো কোনো অন্যায়ে লিপ্ত না হওয়া, ন্যায়ভঙ্গকারীর সান্নিধ্য থেকে দূরবর্তী থাকা।

কিন্তু বস্তুত, এখানেই আমাদের কর্তব্যের অবসান নয়। সমস্ত অপরাধ থেকে নিজেকে আমি আড়াল করে নিলাম, আর আমার পরিপার্শ্বে সেই অপরাধের অবাধ লীলা চলতে থাকল, এ কি একটা আদর্শপরিবেশ? মনুষ্যজন্ম পরিগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি অলিখিত দায়িত্ববিধি আমার ওপর অর্পিত হয়। সে-দায়িত্বের প্রধানতম কথাই তো এই যে, জীবনকে সুন্দর করে আমায় রচনা করতে হবে। যদি নিস্পৃহ উদাসীন দর্শকের মতো মানুষ কেবল আত্মরতার চর্চা করে তবে বৃহৎ মানবসমাজের কল্যাণস্থূপগুলি বহন করবে কে? তাই নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যে নয়, সক্রিয় উৎসাহে জীবনের পথে আমাদের যাত্রা করতে হবে।

যাত্রার পথে বহির্গত মানুষ দেখে, তার প্রগতির পথরোধ করতে কত দুষ্কৃতির আয়োজন। এই অন্যায়কে যদি সে উপেক্ষা করে তবে তার সুন্দরতরের পথে সে অগ্রসর হবে কেমন করে? তাই অন্যায় করাও যতটা হীনতা, বিনাবাক্যে অন্যায় সহ্য করাও ততটা কাপুরুষতা। এই দুই প্রবণতাই সমানভাবে ধিক্কারযোগ্য। যেখানে নম্রতার প্রয়োজন সেখানে যেন মানুষ কুসুমের চেয়ে কোমল আচরণে অভ্যস্ত হয়, কিন্তু

জীবনবিধাতা যেখানে ধিক্কারের জন্তে আহ্বান জানান তখনো কি আমরা বজ্রের মতো কঠোর হয়ে উঠব না? সত্যকার প্রেম এত সর্বপ্রেমী নয় যে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, পুণ্য-পাপকে সে সমানভাবে গ্রহণ করে নেবে। অন্যায়কে দলন করার জন্তেই পৌরুষ আমাদের নিত্য আহ্বান করে।

॥ ৫ ॥ বীর্য দেহো সুখের সহিতে
সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহো দুখে
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে।

[—কবিতাসংখ্যা ২৩ : পৃ. ৪৭]

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন :

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

তাকেই আমরা স্থিতধী মহাপুরুষ বলে গণ্য করি যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে স্পৃহাহীন, ভয়ক্রোধ থেকে যিনি মুক্ত। এই আদর্শের সিদ্ধি কঠিন, কিন্তু প্রকৃত মানুষ তো কঠিনতর সাধনার পথই অকাতরে নির্বাচন করে নেয়। অনায়াস-সুখের জন্তে লালসা, দুঃখে আত্মহারা হয়ে যাওয়া, মানবিক প্রাকৃত রিপুগুলির কাছে আত্মবিসর্জন করা—এইসব কেবল পাশব লক্ষণ। জন্মগত এই স্বভাবধর্মকে যিনি যত বেশি অতিক্রম করে অগ্রসর হতে পারেন, তিনি ততো বড়ো মানুষ।

তাই, আমাদের প্রার্থনা হবে শক্তির জন্তে। আত্মশক্তির ক্রমিক উদ্বোধন আমরা পাশবশক্তিকে লঙ্ঘন করে যাব, এর চেয়ে বড়ো আদর্শ আর নেই। রামপ্রসাদ দুঃখকে নিয়ে বড়াই করতে পেরেছিলেন, যদিও আর পাঁচজনে কেবল সুখ পেয়েই গর্ব করে। যে-সুখ সহজে আসে তা বিশ্বাসযোগ্য নির্ভরযোগ্য নয়, যে জীবন সুখের দ্বারা পরীক্ষিত হয়ে যায়নি সেও সত্য জীবন নয়। কেননা ভূয়োদর্শী আর্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি জানেন, মহাজীবনের পথ কঠিন দুর্গম—দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। এই দুর্গম পথের যাত্রা থেকে পথিকমানবকে ভ্রষ্ট করতে মায়া যেন তাঁর সুখের পরীগুলিকে পাঠিয়ে দেন, অসীম শক্তিকে তারা তন্দ্রাচ্ছন্ন করে রাখতে চায়। কিন্তু আমরাও কি প্রলোভনে, এই মায়ায় ভ্রষ্ট হব? আমরা এই বীর্যেরই প্রার্থনা করব যার দ্বারা উচ্চারণ করা সম্ভব : দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে, যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করে ধরিব হে।

॥ ৬ ॥ নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার—
সন্তান নহে গো মাতঃ সম্পত্তি তোমার।

[স্নেহগ্রাস : পৃ. ৬০]

সুকুমার স্নেহপাশে মা তাঁর সন্তানকে আবদ্ধ করে রাখেন, মানবসংসারে এ তো অতি স্বাভাবিক ঘটনা। স্নেহের লালনে সন্তান ক্রমে বড়ো হয়ে ওঠে, বহির্জগতের প্রবল তাড়না থেকে ঐখানে সে একটা আচ্ছাদন পায়। কিন্তু আচ্ছাদন

যদি চিরন্তন হয়ে আবৃত করে রাখে তাকে, তবে সে কি মানবিক যোগ্যতা লাভ করবে? চরিত্রগঠনের প্রাথমিক যুগে মাতৃস্নেহের প্রত্যক্ষ গণ্ডী যেমন প্রয়োজন, পরিণতির যুগে ততটাই তার মুক্তি চাই। প্রত্যাশিত এই মুক্তির অভাব আমাদের জীর্ণ শীর্ণ অমানুষ করে তোলে।

বাহিরবিশ্বে জটিলতার অন্ত নেই, জীবনের প্রতি-পদক্ষেপ প্রতিঘাতসঙ্কুল। এই প্রতিঘাত যাতে আমাকে জীবনপথ থেকে পরাজিতের মতো ফিরিয়ে না দেয়, তার জন্য প্রস্তুতি তো অর্জন করতে হবে! যদি শিশুবয়স থেকে কেবলই সন্তর্পণে আলো-হাওয়ার স্পর্শ বাঁচিয়ে দিনযাপন করি, তাহলে তো সেই প্রস্তুতির শক্তি পাব না। তবে কি অশক্তের নিষ্ফল ক্রন্দনে ঘরের মধ্যে বন্দী থেকেই আমার সুখ? স্নেহের অন্ধ আতিশয্যে মা হয়তো তাই মনে করেন। নিরাপদ দুর্গের মধ্যে তাকে বাঁচিয়ে রাখাই সবচেয়ে কাঙ্ক্ষনীয়, একথা তাঁর ভুল করে মনে হতে পারে। কিন্তু মানবজন্ম লাভ করে মানুষ তো তার জীবনের ঋণ অতো সহজে শোধ করতে পারে না। বৃহৎ বিশ্বসংসারের অনেক কর্তব্যের মহৎ দায়িত্ব তার মুখাপেক্ষী হয়ে আছে, যথার্থ মানুষ তাকে ভোলে কেমন করে? নিরাপদ গৃহজীবনযাপন তাই মনুষ্যত্বের মুক্তিস্বরূপ নয়। পথে বহির্গত না হয়ে তাই উপায় নেই। পথযাত্রার দুঃখদাহন সহ্য করার উপযুক্ত করে মা যদি তাঁর সন্তানকে অনেকখানি মুক্তি না দেন, তবে সে কেবল মায়েরই সন্তান থাকে, বিশ্বের সন্তান হয়ে ওঠে না। এই সত্যটি অনুভব করতে পারে বলেই পশ্চিমী দেশগুলিতে মানবতার এই জয়। আমাদের হতভাগ্য বাঙলাদেশে? স্নেহকোমলতার আতিশয্য যেন আমাদের বৃহত্তর-মুক্তির প্রতিবন্ধক।

দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।

[—কবিতাসংখ্যা ৩০। পৃ. ৮৮।

আদিম মানবকুল ছিল বন্যজীবেরই তুল্য। 'যে মারে সেই বাঁচে' এই নিদারুণ নীতি অবলম্বন করে সকলে সকলের দিকে ঘৃণাবিদ্বেষ নিয়ে লক্ষ্য স্থির রাখত। তারা সভ্য ছিল না, ছিল অসভ্য বন্য বর্বর। কিন্তু ক্রমে রচিত হলো সমাজ, বহিঃ-প্রকৃতি আর অন্তঃপ্রকৃতিকে শাসনসংযত করতে করতে অগ্রসর হলো এক সঙ্ঘবদ্ধ মানবজাতি, ইতিহাস বলল—সভ্যতার সূত্রপাত। সভ্যতার ক্রমবিকাশ কেমন করে হয়? কাঠ, পাথর, লোহা, আগুন—এসব প্রাকৃতিক বিষয়কে মানুষ তার আপন ব্যবহারের যোগ্য করে নিয়ে বহিঃপ্রকৃতির ওপর তার জয় ঘোষণা করল। আবার, কাম ক্রোধ ঈর্ষা ঘৃণা আত্মপরতা—এসব রিপুকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে অন্তঃপ্রকৃতির ওপর তার প্রভুত্ব প্রমাণ করল।

আজ বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে সেই সভ্যতার অধিকার চূড়ান্ত, মানুষের অভিমানও তাই সীমানাহীন। যদি বহির্বিশ্বে একবার দৃষ্টিপাত করি তবে মানবসভ্যতার

সর্বজয়িতায় সংশয় থাকে না কোনো। বিজ্ঞানের দশদিকবিস্তারী প্রভাবে জীবন এখন কত সহজ সুগম সমৃদ্ধ। তার স্রষ্টা বিধাতাকে এখন গ্রাহ্য করে না মানুষ। আপন ভাগ্যের ভার আজ সে আপন হাতেই তুলে নিয়েছে।

কিন্তু অল্প গভীরে যদি দৃষ্টিপাত করি, মনের অভিমান দূরে চলে যায়, অজস্র সংশয় মনে রেখাপাত করে। সত্যি কি জীবন এখন সহজ, সুগম? সে যে সমৃদ্ধ তাতে কোন ভ্রান্তি নেই, কিন্তু সম্পদের বহির্বিলাসই কি মানবের সকল আকাঙ্ক্ষার শেষ সীমা? বস্তুত, এত জটিল দুর্গম জীবন আর কোন্ সময়ে ছিল? আদিমতার মধ্যে একটা সহজ বর্বরতা আছে। আর, আধুনিক সভ্যতায় দেখা দিল জটিল বর্বরতা। বস্তুসম্পদে গরীয়ান্ মানবসমাজ তার অন্তরসম্পদ থেকে একেবারে বিচ্যুত আজ। বাহিরে কারুকাজকরা পর্দা দিয়ে একটা জীর্ণ মলিন বেয়াল সে ঢেকে রেখেছে। আগে যে-রিপুগুলি ছিল সমাজসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য, সে-প্রীতি সে-বিশ্বাস আজ কোথায়? ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে দ্বন্দ্বের সম্পর্ক আজ আরো বৃহৎ আকারে দেশে-দেশে বিরোধের মধ্যে তীব্রতর হয়ে ওঠে, ঘনীভূত হয়ে ওঠে। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব এই হলো আধুনিক সভ্যতার দিনানুদিন পরিচয়।

॥ ৮ ॥ জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মের ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।

[—কবিতাসংখ্যা ৩০। পৃ. ৮৮]

দেশপ্রেম বা জাতিপ্রেম মানুষের সং বৃত্তি। আপন দেশের উন্নতি বা আপন জাতির উন্নতি কে না আকাঙ্ক্ষা করে? কিন্তু বাঞ্ছনীয় এই সদনুভব কেমন করে বিপজ্জনক সর্বনাশ ডেকে আনে, আধুনিক রাষ্ট্রনীতি তার প্রমাণ। আমাদের কবি যখন বলেন, 'সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি' অথবা বলেন, 'সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি' তখন তা কোনো আশঙ্কার কারণ হয় না। কিন্তু কবিকণ্ঠে যখন ধ্বনিত হয়ে ওঠে:

কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া—

তখনই যেন বিপদের ঘণ্টা বেজে ওঠে। এই দেশাত্মবোধ কি খুব সুস্থ মানবিকতায় সম্পন্ন? দেশে ভালো, কিন্তু বিদেশেরও যা পূজনীয় তাকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারব না কেন? তখন তো কেবল দেশপ্রেমের জাতিপ্রেমের কথাই বলা হয় না, তখন গোপনে গোপনে উপ্ত হয় বিদেশবিদ্বেষ বিজাতিবিদ্বেষের বীজ। এই বীজ যে কখন মৃত্তিকা ভেদ করে দিগ্দিগন্ত লক্ষ্য করে তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে দেবে, তা কি কেউ জানে? আধুনিক পৃথিবীর সভ্যতায় এই বিশাল মহীরুহটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এক দেশ আজ অপর দেশকে গ্রাস করতে চায়। সে বলে, কই এতো

সাম্রাজ্যবাদ নয়, এ হলো আমার আপন দেশপ্রেম, জাতীয়তা। এক জাতি অপর জাতিকে ধ্বংস করতে চায়। কিন্তু তারো সে নাম বলে জাতীয়তা। বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছে, জাতীয়তার বীজ থেকে কোন্ সর্বনাশা ফ্যাসিজমের জন্মে হলো, দু'দুটো বিশ্বমহাযুদ্ধে যার ফলাফল ছড়িয়ে রয়েছে। মূলত যা অমানবিক, অন্যায়, অসত্য,—তাকে সভ্যসমাজের এক দার্শনিক মুখোস পরিয়ে এইভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মানবধর্মকে সে যে নিত্য লাঞ্ছনা করে, তার বিরুদ্ধে আমাদের সবল প্রতিরোধ কই?

॥ ৯ ॥ হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি—
ধরিতে দরিদ্রবেশ।

[—কবিতাসংখ্যা ৩৯। পৃ. ৯৭]

পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় ভারতকে আমরা চিরকালই অনেক বেশি অধ্যাত্ম-পরায়ণ বলে জানি। পশ্চিমে জড়বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি ভারতে জয়ী হয়েছে আত্মিক সাধনা। যুগে যুগে এদেশে কত সাধকের জন্ম দিয়েছে, সাধনার কত বাণী এদেশ থেকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়েছে এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্তও। ফলে, জীবনাচরণের প্রণালী-বিষয়ে ভারতের ভাবনা চিরদিনই স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত।

এই আত্মিক সাধনার বলে ঐশ্বর্যগৌরবকে ভারত তুচ্ছ করতে জেনেছে। সকল ঐশ্বর্যের সেরা রাজৈশ্বর্য। কিন্তু আমাদের রাজার আদর্শ কোথায়? রামচন্দ্র সেই আদর্শ। বাল্মীকি নারদকে প্রশ্ন করেছিলেন, কার কথা তিনি কাব্যে প্রকাশ করবেন। কে সেই মহানুভব ব্যক্তি যিনি সম্পদে ভীত, বিপদে নির্ভীক যিনি মহৈশ্বর্যে মহাদৈন্যে সমভাবে স্থির। সেইসমস্ত গুণের সমন্বয় আযোধ্যার রঘুপতি রামের চরিত্রে। আদি-কাব্যের এই মহাচরিত্রটি চিরকাল আমাদের শ্রেষ্ঠ-মানবত্বের আদর্শ, শ্রেষ্ঠ নৃপতির তো বটেই। এখনো প্রচলিত কথায় আমরা বলি 'রামরাজ্য'।

রামচন্দ্রের জীবনাচরণ যেন সমগ্র ভারতীয় জীবনধারার প্রতীক। যখন তিনি মুকুট শিরে স্থাপন করেন, সিংহাসন অধিকার করে থাকেন, তখনো তাঁকে স্মরণ রাখতে হয়, যে, তিনি সকল জনতার প্রতিনিধি-মাত্র, ব্যক্তিগত বিভবের কোনো অধিকার তাঁর নেই। তাই প্রজানুরঞ্জনের দুরূহ ব্রত পালন করতে গিয়ে ব্যক্তির সমস্ত স্বার্থ তিনি অকাতরে বিসর্জন দেন। আবার, যখন মানবতার অনুরোধে সেই রাজমুকুট ত্যাগ করবার প্রশ্ন ওঠে তখনো নির্দ্বিধায় তিনি বল্কলপরিধানে অরণ্যবাসে অগ্রসর হয়ে যান। উপনিষদের যে মহামন্ত্র 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—রামচন্দ্রের এই জীবনের মতো আর কোথায় তার এমন সুপ্রয়োগ?

এই ত্যাগশীলতায়, কর্মদীক্ষায়, দুঃখবরণে যাঁর স্বাভাবিক শক্তি আছে, তিনিই আমাদের দেশে নৃপতি নামের যোগ্য।

॥ ১০ ॥ দলে দলে চাই ছুটিবারে
পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র লুটিবারে
লুকাতে প্রাচীন দৈন্য।
বৃথা চেষ্টা ভাই,
সব সজ্জা লজ্জাভরা চিত্ত যেথা নাই।

[—কবিতাসংখ্যা ৪১। পৃ. ৯৯]

একদিন এদেশের যে-প্রাচীন মহিমা ছিল, আজ তা আমাদের আয়ত্তের অতীত। যুগবাহিত জড়তায় আমাদের সমগ্র জীবন যেন আচ্ছন্ন, উত্তম উদ্দীপনার অভাবে কী এক তামসিক অভ্যাস আমাদের গ্লানিময় করে তুলেছে। এই নির্জীব তমসা থেকে জাতীয় জীবন মুক্ত হবে কোন্ উপায়ে?

উনিশের শতকে ইংরেজ তার পশ্চিমী সংস্কৃতির পসরা নিয়ে এদেশে শিকড় বিস্তার করল। প্রথম-উন্মাদনায় আমরা এক রাজসিক উত্তেজনা বিস্তৃত হতে দেখলাম; অনেকে আমরা মনে করলাম—এই পথই মুক্তির পথ, পশ্চিমী সংস্কৃতিই উজ্জীবিত করবে ভারতকে। নতুন এই সংস্কৃতি যে মুক্তির আবাহনী নিয়ে এসেছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের চিত্তে কি তার যথার্থ প্রতিফলন হলো? অন্ধ-আনুগত্য এবং অন্ধ-অনুকরণে-প্রমত্ত জাতিকে সাবধান করে দেবার জন্তে বজ্রবাণী ঘোষিত হলো কত মনীষীর কণ্ঠে: বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ।

তাঁরা আমাদের মনে করিয়ে দিলেন, সিংহচর্মাবৃত গর্দভ কি সিংহ হয়? অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব কি আপনার হয়? বাহিরের সাজসজ্জা আচার-আচরণের অঙ্গীকার হলেই কি পাশ্চাত্যজাতির সমীপবর্তী হতে পারি আমরা? মৃত মানুষকে অথবা পাথরের মূর্তিকে তো আমরা স্বেচ্ছামতো সাজ বদল করিয়ে দিতে পারি, তার দ্বারা কি সে জীবন লাভ করে? বস্তুতপক্ষে, যতক্ষণ পর্যন্ত এক চিত্তের দ্বারা অপর চিত্ত প্রতিফলিত না হয়, ততক্ষণ গ্রহণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। পশ্চিমী জাতির কাছে অনেক শিক্ষণীয় আছে, সেই শিক্ষা-দ্বারা আমরা আমাদের জড় মৃত-অভ্যস্ত মনন থেকে মুক্তি পেতে পারি, নতুন জীবনের আলোকপাতে উদ্ভাসিত হতে পারি। কেবলমাত্র সেক্ষেত্রেই দুইজাতির সংস্পর্শ কোনো স্পষ্টগোচর পরিবর্তনের শুভ সূচনা করতে পারে। আর, যদি তা না হয়, যদি চিত্ত-স্পর্শহীন মননবিহীন অন্ধ-উন্মত্ত অনুকরণ-মাত্র আমাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, জাতীয় জীবনে তার চেয়ে লজ্জাজনক বিষয় আর কিছু হতে পারে না।

॥ ১১ ॥ আগে চল্ আগে চল্ ভাই।
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কি বা ফল ভাই।

[—যাত্রাসংগীত। পৃ. ১০৬]

[উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৩]

জীবনের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। আমাদের

অধিকাংশেরই জীবনে দিনের পর দিন আসে, তারা কোনো নতুন বাণী, নতুন তাৎপর্য বহন করে আনে না। একইভাবে প্রভাতে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়, আর, গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবনযাপনের পর আবার একইভাবে শয্যাগ্রহণের মুহূর্ত আসন্ন হয়। এই জীবন কি আমাদের শ্রেয়? এর দ্বারা কোন শুভ মানবত্বে কি উন্নীত হব আমরা? তা তো মনে হয় না। আদর্শবিহীন কর্তব্যহীন নিষ্ঠাবিহীন এই জীবনযাপন তো পাশব জীবনেরই তুল্য, এভাবে জীবনধারণ করে থাকা মৃত্যুরই কি নামান্তর নয়?

এই মৃত্যুকে লঙ্ঘন করবার জন্যে মহাজীবনের পথে আমাদের অগ্রসর হতে হবে, যুগে যুগে মহানায়কেরা সেই আবাহন ধ্বনিত করে যান। 'যে শয়ন করে থাকে, তার ভাগ্যও শায়িত—যে চলে তার ভাগ্যও চলে—অতএব, চলো, চলো' উপনিষদে একদিন এই মহামন্ত্র উদ্গীত হয়েছিল: চরৈবেতি, চরৈবেতি। সেই মন্ত্র অন্তরে ধারণ করে আমরাও কেবলই অগ্রসর হব, মহৎ ব্রত পালন করবার জন্যে জীবন পণ করব। 'যে-পথে সহস্র লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে, সে-পথপ্রান্তের একপাশে দাঁড়িয়ে আমরাও মহাযাত্রার অংশ নিতে চাই।

কেন সকলেই এপথে অগ্রসর হয় না? কেননা এপথ সুখের নয়, দুঃখের। অভ্যস্ত আরামের মধ্যে লালিত মানবসন্তান নিশ্চিত জীবনকে পরিত্যাগ করে অনিশ্চিতের পথে যেতে চায় না। কিন্তু জীবন্মৃত কাপুরুষ এই ব্যক্তিদের পিছনে রেখে আমরা অগ্রসর হয়ে যাব, আমাদের কণ্ঠে কবির গান ধ্বনিত হবে:

আমরা চলি সমুখ পানে, কে আমাদের বাঁধবে?
রইল যারা পিছুর টানে কাঁদবে তারা কাঁদবে।

॥ ১২ ॥ যদি হই দীন না হইব হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা।

[—নববর্ষের দীক্ষা। পৃ. ১১৪]

দীনতায় দুঃখ আছে, কিন্তু দীনতায় কোনো গ্লানি নেই। জীবনের প্রভূত উপকরণ-সম্ভার যদি আমাদের না থাকে, সে দৈন্যও আমরা সহ্য করতে পারি কেবল আত্মিক বলশালিতায়। আমাদের দেশেরই পণ্ডিত তো দানোৎসুক নৃপতিকে বলতে পেরেছিলেন, ঘরে চাল আছে, উঠোনে তেঁতুলগাছ আছে, আমার আবার অভাব কিসের। বাহিরের দীনতা যে অন্তরের সম্পদকে মলিন করতে পারে না, এ কাহিনী তো তারই একটি প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাজার কীর্তিবিভব এর কাছে অতি তুচ্ছ, আত্মসম্ভ্রমযুক্ত এই সন্তোষ মানুষকে সকল জীর্ণতা থেকে পরিত্রাণ করে।

কিন্তু যদি বহির্বৈভবের প্রমত্ত উল্লাসে চিত্ত দিশেহারা হয়ে যায়, দীনতা তখন মানুষকে টেনে নেয় হীনতায়, অন্তরের দৈন্যে। তখন আমরা পরপ্রত্যাশী কুকুরের মতো আচরণে লিপ্ত হতে দ্বিধা করি না, যেখানেই কিছুমাত্র প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে, মনে করি সেখানেই ছুটে চলি উন্মত্তের মতো। মনে রাখি না যে, অপরের কাছে এইভাবে আমরা নিজের দুর্বল চিত্তকে উদ্ঘাটিত করে দিই, যার কাছে কিছুমাত্র আত্ম-

অর্জন করি তার ঘৃণা ও উপেক্ষাও সেই সঙ্গে বহন করে আনি। যে দাতা ভিক্ষুককে বি সে সমীহ করে? যার কোনো আত্মসম্মানের বোধ নেই, কেবল সে-ই এ হীনভাবে স্বীকার করে নিতে পারে।

অপমানবত্তার এই পথে আমরা যাব না। দৈন্য যদি আসে, তবে তাকে বীরের মতো গ্রহণ করবার শক্তিও অর্জন করে নেব আমরা। বনবাসের জীবনকে রামচন্দ্র করে তুলেছিলেন রাজ্যভোগের চেয়ে অধিকতর রমণীয়। সে কিসের শক্তিতে? আত্মিক শক্তিতে। বিধাতার কাছে সেই আত্মিক সামর্থ্যের প্রার্থনাই আমাদে একমাত্র প্রার্থনা।

বস্তুসংক্ষেপকরণ

॥ ১ ॥ বিদায়। [পৃ. ২২] ॥ শব্দসংখ্যা প্রায় ১৩০ ॥

যাত্রার সময় আসন্ন। জলে জোয়ারের বেগ, উদ্দাম বাতাসে নৌকার পাল ফুলে উঠেছে, এখন তীর থেকে তরীর বাঁধন খুলে দিতে হবে। লগ্ন যখন উপস্থিত তখনো যদি কেউ অলস নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে তো থাকুক, পরে সে হাহাকার করবে। এখন বিরাট কর্তব্যের আহ্বান এসেছে, সুখের মোহ ত্যাগ করে নির্মম কঠোর পথে বহির্গত হব আমরা। বৃহত্তর মঙ্গলের জন্যে প্রয়োজন হলে আমরা মহৎ মৃত্যু বরণ করে নেব।

॥ ২ ॥ কবিতাসংখ্যা ১৩। [পৃ. ৩৭] ॥ শব্দসংখ্যা প্রায় ৭০ ॥

বাঙলাদেশের উন্মুক্ত প্রান্তর, আলোকিত আকাশ, নির্জন নদীতট, স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়া আর শান্তসুন্দর কল্যাণময় জীবন কবিহৃদয়কে অভিভূত করে রাখে। ঈশ্বর এই জীবনের আশীর্বাদ যেমন দিয়েছেন, তেমনি, প্রয়োজন হলে জীবন্মুক্তির আশীর্বাদও যেন তিনি দান করেন।

॥ ৩ ॥ শরৎ। [পৃ. ৫৪] ॥ শব্দসংখ্যা প্রায় ২৩০ ॥

শারদীয় সৌন্দর্যে বাঙলাদেশ ভরে উঠেছে। নদী জলধারায় পরিপূর্ণ, মাঠে ধানের শোভা, পাখির কূজনে বনভূমি মুখরিত। নবান্নের উৎসব যেন শরতের স্বচ্ছন্দগতি। বর্ষার ঘনমেঘ অপসৃত হয়ে আকাশ এখন নীল; শিশিরসিক্ত মাঠ। সতেজ বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। নবজীবনের চঞ্চলতা সকল দিকে পরিব্যাপ্ত। যেন জরাট সংসার থেকে সকলে তাদের মুখ সকল করে নিচ্ছে। এক্ষুনিকার তাই যেন এক উদার আহ্বানবাণী নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে, ক্ষুধা দুঃখ গ্লানির সময় এ নয়, অন্নপূর্ণা জননীর স্নেহহস্ত থেকে অন্নগ্রহণের এই সময়। জননীর এই মধুর মহিমময় আবির্ভাবে সমস্ত পৃথিবী প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। এই তো শরতের সৌন্দর্য।

॥ ৪ ॥ জগদীশচন্দ্র বসু। [পৃ. ৭৩] ॥ শব্দসংখ্যা প্রায় ১৫০ ॥

বয়সের তারুণ্য সত্ত্বেও আচার্য জগদীশচন্দ্র যেন ভারতের অতীত ঋষিদের মতো জ্ঞানপ্রবীণ। আধুনিক নাগরিকতার উন্মত্ত আলোড়নে তাঁর ধ্যান নষ্ট হয় নি, সকল জগতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত যে প্রাণ তার সন্ধানে তিনি মগ্ন। পরিপার্শ্বে সবাই যখন অতীত চর্চা অথবা পাশ্চাত্ত্য অনুকরণে ব্যাপৃত, জগদীশচন্দ্র তখনো অবিচলিত-চিত্তে প্রাণরহস্যের আবিষ্কারে স্থিরপ্রতিজ্ঞ। পাণ্ডিত্যের মূঢ় অভিমান নিয়ে যারা আছে, তারা দূরে থাক, কিন্তু জগদীশচন্দ্রের আহ্বানে আজ দেশে সত্যকারের জ্ঞাননিষ্ঠা ফিরে আসুক।

॥ ৫ ॥ যাত্রাসংগীত। [পৃ ১০৬] ॥ শং সংখ্যা প্রায় ২০০ ॥

জীবন্মৃত হয়ে থেকে কী লাভ? এগিয়ে চলার মন্ত্রধারণ করে সবাইকে এখন জড়িমামুক্ত হতে হবে। স্মৃতিস্বপ্ন আর সুখের আলস্য আর নয়। বরং দুঃখের প্রস্তুতিই এখন অনিবার্য। যথার্থ পৌরুষ দুঃখবিঘ্নকে গ্রাহ্য করে না। পারস্পরিক কলহ আর স্বার্থবুদ্ধির ক্ষুদ্রতায় আচ্ছন্ন থাকা আজ কাপুরুষতার পরিচয়। যারা অগ্রসর হতে ভয় পায় তাদেরও সঙ্গী করে নিতে হবে, স্নেহমায়ার বন্ধনে আবিষ্ট থাকলে চলবে না। তা যদি না হয়, যদি মহাজীবনের এই যাত্রাপথে আমরা বহির্গত না হতে পারি, তবে অধঃপতনের গভীরতলে নিমগ্ন হয়ে যাবে সমগ্র জাতি।

॥ ৬ ॥ নববর্ষের দীক্ষা। [পৃ ১৪৪] ॥ শং সংখ্যা প্রায় ১৫০ ॥

পরমুখাপেক্ষিতার অবসান অর্জন করে দেশীয় আচার-আচরণে অভ্যস্ত হব, এই প্রতিজ্ঞাই নববর্ষে আমাদের নতুন শক্তি দান করবে। স্বদেশ হয়তো দরিদ্র, কিন্তু তার সেই দারিদ্র্যের মধ্যেই আমরা সৌন্দর্য আবিষ্কার করে নেব; ভিক্ষার হীনতায় মাথা নত করব কেন? পরধর্ম ভয়াবহ, তা লজ্জাজনক। এই লজ্জার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ভারতের ধর্ম ভারতের কর্ম আজ আমরা আপন মর্মের গভীরে অনুভব করে নেব, স্বদেশদীক্ষায় আমরা গৌরবান্বিত হব।

সমার্থলেখন

॥ ১ ॥ আগুন লেগেছে কোথা। কার শঙ্খ ... মনে মনে।

[—এবার ফিরাও মোরে। পৃ. ১৬-১৭]

অন্যায়, অসত্য, অত্যাচার—এই হলো সংসারের নিত্য-অভিশাপ। এই অভিশপ্ত জীবনের মধ্যে এক চিরন্তন হাহাকার ধ্বনিত হয়, তা কি আমাদের শ্রুতি স্পর্শ করবে না? যুগযুগান্তরব্যাপী অত্যাচার-পেষণের দ্বারা জর্জরিত হয়েছে যারা তারা যেমন বলহীন, তেমনই বাণীহীন। অন্যায়ের প্রতিকার তারা জানে না, বিধাতার কাছে তাদের করুণ অভিযোগ পৌঁছে দিতেও তারা অক্ষম। এই

অবিচারের প্রতিরোধ করা এবং এদের চিত্তে আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের, এই আহ্বান আজ উপস্থিত। অত্যাচারিত যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় উদ্ধতশিরে দাঁড়াতে পারে, অন্যায় তবে মুহূর্তমধ্যে তিরোহিত হয়ে যায়, এই বোধ ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের।

॥ ২ ॥ বলো, মিথ্যা আপনার সুখ……পরমক্ষণে প্রিয়জন মুখে।

[—এবার ফিরাও মোরে। পৃ. ১৯-২১]

আত্মপরতা জীবনের ধর্ম নয়। আপন সুখদুঃখের ক্ষুদ্র চিন্তায় দিবানিশি আচ্ছন্ন থাকার মতো মূঢ়তা পরিত্যাগ করতে হবে। বিশ্বপ্রীতির মন্ত্র ধারণ করে মহাজীবনের পথে বহির্গত হতে হবে আমাদের। এ পথ ক্ষুদ্র সুখের নয়, বরং কঠোর দুঃখ, এমন কী মৃত্যু পর্যন্ত আঘাত করতে পারে এই পথে, তথাপি আমরা সত্যভ্রষ্ট হব না। যুগযুগ ধরে মহামানবেরা আত্মত্যাগ ও স্বার্থপরতার এই দুর্গম পথের সত্য লক্ষ্য অবলম্বন করে চলেছেন, সুখসম্পদের সমস্ত মোহ তাঁরা অনায়াসে ছিন্ন করেছেন. সহস্রবিধ লাঞ্ছনা ও অপবাদ সহ্য করেছেন। তাঁরা কোনোদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি, কেননা, সত্যের আদর্শপ্রতিমা তাঁদের মানসচক্ষে ভাস্বর ছিল। এই আদর্শের অনুসৃতি আমাদেরও ব্রত হোক।

॥ ৩ ॥ বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে……বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

[—বিদায়। পৃ. ২৩]

বিশ্বাত্মবোধের অনুভব যখন হৃদয়ে জাগ্রত হয়ে ওঠে, তখন ক্ষুদ্র সুখ বা মায়ামোহের বন্ধন নিমেষে ছিন্ন হয়ে যায়। জীবনের পরিণামে মৃত্যু তো অলঙ্ঘনীয়। তবে তাকে মহৎ কর্তব্যের জন্যেই বরণ করে নিই বা কেন? যদি পৃথিবীর মঙ্গলসাধনের জন্যে সেই মৃত্যু আলিঙ্গন করতে হয়, তাতে কোনো ভয় নেই বরং সেই তো প্রার্থনীয়। আজ তাই আর দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার মধ্যে স্থির হয়ে থাকবার সময় নেই, চিরন্তন জীবনের আহ্বানে আজ বহির্গত হতে হবে।

॥ ৪ ॥ সেবক আমার মতো……বহি বরমাল্যসম তোমার আহ্বান।

[—অশেষ। পৃ. ২৭-২৮]

জীবনবিধাতার আহ্বান তাঁর কর্মের জন্যে যাকে ডেকে নেয়, সে তো ধন্য। সংসারে জনতার অন্ত নেই, মনুষ্যত্ব বহনের দুরূহ দায়িত্ব তো তাদের সকলেরই ওপর নেই। কয়েকজন-মাত্র স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন, তাঁরা যেন বিধাতার কর্মী, তাঁদের কণ্ঠে বিধাতা তাঁর আপন বাণী প্রেরণ করেন। এইভাবে নির্বাচিত হবার সৌভাগ্য যে লাভ করেছে, তার তুচ্ছ সুখদিবসগুলির অবসান ঘটে গেছে। কিন্তু সেজন্যে কী তার কোন অনুতাপ আছে? না। সে বরং জানে যে তার প্রতি বিধাতার বিশেষ করুণা বলেই এই নিশ্চেতন সুখজড়তার অভ্যাস থেকে তাকে মুক্ত করে আনা হয়েছে।

॥ ৫ ॥ তোমার ন্যায়ের দণ্ড···তৃণসম দহে।

[—কবিতাসংখ্যা ১২। পৃ. ৩৬]

ঈশ্বরের পৃথিবীতে ন্যায়নীতি-প্রতিষ্ঠায় দায়িত্বভার ঈশ্বরেরই বটে। তবে সে দায়িত্ব তিনি পালন করেন পরোক্ষে। আমাদের প্রত্যেকেরই হৃদয়মধ্যে তিনি ন্যায়ের অনুভব সঞ্চারিত করে দেন, তাঁর প্রতিনিধি হয়ে আমরাই পৃথিবীর ধর্ম, রক্ষা করি। এর প্রতি-কূলাচারী অধর্ম যদি আমাদের কাছে প্রশ্রয় পায়, সেটা তবে মানবতার অপমান, ঈশ্বর তা ক্ষমা করে না।

॥ ৬ ॥ অচিন্ত্য এ ব্রহ্মাণ্ডের তাহাঃ গর্ব, নিজের নম্রতা।

[—কবিতাসংখ্যা ১৬। পৃ. ৪০]

বিশ্বস্রষ্টা অণোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। বিরাট থেকে তুচ্ছ—বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যেই তিনি স্বয়ম্প্রকাশ। মানবচৈতন্যের মূলে তিনি। মানুষ একথা যখন বিস্মৃত হয় তখনই এক অক্ষম্য আত্মম্ভরিতায় সে প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে। সত্যাশ্রয়ী মানুষ ঈশ্বরের মহিমাকে মুহূর্তকালও বিস্মৃত হন না বলেই আত্মজীবনাচারণে তিনি ধীর, নম্র।

॥ ৭ ॥ এ বিশ্বসমাজে তোমার পুত্রের হাত···ভরি আসে জল।

[—বঙ্গলক্ষ্মী। পৃ. ৫২-৫৩]

দেশমাতৃকার স্নিগ্ধ কল্যাণময় স্পর্শ দিকদিগন্তে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে, ঋতু-আবর্তনের মধ্যে, মধ্যাহ্ন-নিশীথের স্নেহচ্ছায়ার মধ্যে যেন মাতার মমতা নিয়ে দেশ প্রত্যক্ষভাস্বর হয়ে আছে। যদি স্থিরচিত্তে তাকে একবার অনুভব করি, আমাদের হৃদয় তবে বিনতিতে আপ্লুত হয়ে ওঠে।

॥ ৮ ॥ যে তোমার দূরে রাখি··· কী দিবে সম্মান।

[।—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। পৃ. ৫৯]

আমার দেশকে যে ঘৃণা আর অবজ্ঞা করে, সে যে মূলত আমাকেও ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে—একথা বিস্মৃত হওয়া অনুচিত। অপরের কাছে ভিক্ষার দ্বারা আমার সত্যকার সমৃদ্ধি আসে না, আত্মনির্ভরতাই সবচেয়ে বড়ো শক্তি। তাই, আমরা আপন উদ্যমে বিশ্বাস স্থাপন করে, আপন দেশের দৈন্যকেও মাথায় বরণ করে নেব। দেশকে নিত্য অপমান করে যে-বিদেশ, কখনোই আমরা তার দ্বারস্থ হব না।

॥ ৯ ॥ পুণ্যে পাপে দুঃখেসুখে···মানুষ করোনি।

[—বঙ্গমাতা। পৃ. ৬১]

মা তাঁর নিবিড় স্নেহবন্ধনে সন্তানকে আবদ্ধ-করে রাখতে চান, এ কোমল বৃত্তি তাঁর পক্ষে বড়ো স্বাভাবিক। কিন্তু বৃহৎ জীবনের মধ্যে বহির্গত না হলে

সন্তানের তো পরিপূর্ণ চিত্তবিকাশ ঘটে না, পৃথিবীর উপযুক্ত মনুষ্যত্বলাভে সে বঞ্চিত হয়। তাই, হৃদয়কে ব্যথিত করেও, সন্তানের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্যে, মা তাকে আপন বাহুডোর থেকে মুক্ত করে দেবেন, এই আমাদের প্রত্যাশা।

বাঙালিসন্তানে যে মনুষ্যধর্মের সহজ বিকাশ দেখি না, তারো মূল হেতু নিহিত আছে বঙ্গজননীর অতি-স্নেহকাতরতায়। তার থেকে মুক্তি আজ আমাদের প্রয়োজন।

॥ ১০ ॥ যে নদী হারায়ে স্রোত · চলিতে না পারে।

[উপমা। পৃ. ৬২]

যার প্রবল গতি আছে, কোনো তুচ্ছ সাময়িক আবর্জনা দ্বারা তাকে রুদ্ধ করা যায় না। গতির তীব্র স্রোতে সমস্ত কিছুই সে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। জাতির জীবনে যখন দেখি মিথ্যা লোকাচার, তুচ্ছ অনুশাসন বড়ো হয়ে উঠেছে, নানা শাস্ত্রের বাণীভার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে,—তখন বোঝা যায় যে সেই জীবন অচল হয়ে গেছে, ভবিষ্যতের দিকে সে আর অগ্রসর হইতে পারে না।

॥ ১১ ॥ ইহার চেয়ে হতেম যদি · গুপ্ত গৃহবাসে।

[—দুরন্ত আশা। পৃ. ৬৪-৬৬]

জীবনে কখনো কখনো উদ্দামতার আকাঙ্ক্ষা জাগে; স্থিতিময় শান্ত দিনযাপন পরিহার করে যাযাবর বেদুইনের মতো বিশাল জগতের মাঝখানে বহির্গত হতে ইচ্ছা করে। পথের কোনো স্থিরতা নেই, বিপদে কোনো ভীরুতা নেই, মুক্তজীবনের উল্লাসে এমনি করে যদি ছুটে চলা যায় তবেই সত্যকার তৃপ্তি। তার পরিবর্তে কি ক্ষুদ্র গৃহকোণে মধুর ললিত আস্বাদের জন্য বসে থাকব আমরা?

॥ ১২ ॥ এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে · আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।

[—কবিতাসংখ্যা ১৯। পৃ. ৭৭]

অবমাননার-পূর্ণ আমাদের দেশে এত গ্লানিভার কেন? এত জীবনযন্ত্রণার মূল হেতু কোথায়? আমাদের মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটেনি বলেই এই গ্লানি থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি না। জীবনবিধাতার কাছে তাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা হবে মনুষ্যধর্ম। সর্ববিধ দৈনন্দিন সংকীর্ণতা ও আচারভাতি পরিহার করে সেই সত্য ধর্মে যেন আমরা উজ্জীবিত হতে পারি, বিধাতা আমাদের সেই শক্তি দিন।

॥ ১৩ ॥ একদা ভারতের কোন্ বনতলে · নাহি অন্য পথ।

[—কবিতাসংখ্যা ২৬। পৃ. ৮৪]

অন্ধকারে-আচ্ছন্ন বর্তমান ভারতে মুক্তির কি কোন পথ আছে? প্রাচীন ভারতের বনভূমিতে ঋষিকণ্ঠে যে-জীবনবাণী উদ্গাত হয়েছিল তার মধ্যেই নিহিত আছে মুক্তিমন্ত্র। আত্মসাধনাবলে একদিন তপঃসিদ্ধ ভারত অনুভব করেছিল, সমস্ত সৃষ্টির মূলীভূত সত্তা এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। এই অনুভব, এই ব্রহ্মজ্ঞান, সকল তুচ্ছ মৃত্যুভয়কে

দূর করে দিয়ে অমৃতে অভিষিক্ত করে মানুষকে। বর্তমান ভারতকে তাই মুক্তিপ্রত্যাশায় এই সত্যজ্ঞানের সমীপে পৌঁছতে হবে।

॥ ১৪ ॥ স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে……গুপ্ত পর্বতের পানে।

[—কবিতাসংখ্যা ৭১। পৃ. ৮৯]

আধুনিক পৃথিবী ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থকেই চূড়ান্ত সত্য বলে গণ্য করে। প্রতিটি জাতি তার আপন স্বার্থের ইন্ধন সঞ্চয় করতে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, আপন লালসার তৃপ্তির জন্যে অপরের ক্ষুধার অন্ন গ্রাস করে নেয়। এইভাবে দেখা দিতে থাকে পারস্পরিক জিগীষা ও জিঘাংসার এক নির্লজ্জ লীলা। মনুষ্যত্বের উদার ভূমি থেকে বিচ্যুত হয়ে এই যে পাশববৃত্তের আচরণ: এর পরিণাম কখনো মঙ্গলময় হতে পারে না। প্রকাণ্ড এই লুব্ধতার জালে পৃথিবী একদিন হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠবে এবং অমোঘ সর্বনাশের দিকে আকর্ষণ করে আনবে সমগ্র মনুষ্যজাতিকে।

॥ ১৫ ॥ এই পশ্চিমের কোণে……ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রতীক্ষায়।

[কবিতাসংখ্যা ৭২। পৃ. ৯০]

পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ উজ্জ্বলতম বিভায় সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। তার বহির্জীবনের এই রূপচ্ছটাকে কখনো কখনো মনুষ্যত্বের, সভ্যতার, চূড়ান্ত বিকাশক্ষণ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বস্তুত এ অতি ভ্রান্ত ধারণা। পশ্চিমী জীবনসাধনায় সভ্যতা যেন তার অন্তিম লগ্নে উপস্থিত। বহিঃশক্তির প্রসাধনে তার মুক্তির আর প্রত্যাশা করা যায় না। তবে কি মনুষ্যত্ব সম্পর্কে চরম অবিশ্বাসই আমাদের বর্তমান নিয়তি? না। নবজীবনের উদয় সম্ভব হবে এই প্রাচ্য দিগঞ্চল থেকে, ভক্তিনম্র আত্মসাধনার থেকে। এই আত্মিক দীক্ষায় কোনো চোখধাঁধানো প্রখরতা নেই, আছে এক সুবিনীত তিতিক্ষা।

॥ ১৬ ॥ ক্ষান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে……বিস্তারিল বিশ্বের বিশ্বাস'

[ক্ষান্ত। পৃ. ১০১]

নিজেকে অতিক্রম করে যাবার চেষ্টার মধ্যে একটা অশান্ত দুর্দমনীয়তা আছে। যতক্ষণ আমি আমার শক্তির সীমা না জানি ততক্ষণ সেই অশান্তিই, সেই অবিরাম বিবর্ধনের প্রয়াসেই আমার বিক্ষুব্ধ পরিচয়। ততক্ষণ বহিঃসংসার আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে না। হিমালয়ের একদিন ছিল সেই প্রতপ্ত আলোড়িত জায়মান যুগ, চতুঃপার্শ্বকে সে তখন কেবল আঘাতই করেছে। কিন্তু আজ তার আপন সীমা জেনে তার শান্তি প্রতিষ্ঠিত। তাই, আজ প্রকৃতির শ্যামল সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তার প্রাচীন রুদ্র রূপ। মধুর জীবনরঙ্গ আজ তার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকতে আর দ্বিধা করে।

॥ ১৭ ॥ হে হিমাদ্রি, দেবাত্মা……শৈলগৃহে হিমগিরি।

[—হরগৌরী। পৃ. ১০৩]

কঠোরে-কোমলে-সমন্বিত হিমাচলের প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন শিবপার্বতীর যুগল-দৃশ্যের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়। একদিকে সুদুর্গম তুষারমৌলীর ধ্যানস্তব্ধতা, পরিপূর্ণ রিক্তকার উন্মুক্ত সৌন্দর্য যেন মহাদেবের ধ্যানাসনের তুল্য। আবার, অন্যদিকে শ্যামলস্নিগ্ধ নিসর্গলীলা ঘিরে থাকে তার সানুদেশ, যেন সমর্পিতা গৌরীর স্নিগ্ধমধুর আত্মনিবেদনের মতো।

॥ ১৮ ॥ ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাস……শিব অদ্বৈতের সঙ্গে।

[সঞ্চিতবাণী। পৃ. ১০৬]

সমুদ্রের জলরাশি বাষ্পাকারে আকাশে উত্থিত হয়, মেঘরূপে সঞ্চিত হয় পর্বতশৃঙ্গাধারে, আবার, বিগলিত প্রবাহে সে নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। এই চিরআবর্তন যেমন সত্য, তেমনই সত্য এই যে, অতীত তার সমস্ত সাধনালব্ধ শক্তি সঞ্চিত রেখেছে ঐতিহ্যের মধ্যে, নবজীবনের প্রত্যাশায় বর্তমান তার চিত্ত প্রসারিত করে দেয় সেই ঐতিহ্যের দিকে। হিমাচল কবিচিত্তের কাছে ভারতের সেই ঐতিহ্যের চিরপ্রতীক। শান্তশিব অদ্বৈতের যে-মহদ্বাণী ঘোষিত হয়েছিল প্রাচীন ভারতে, তার মন্ত্র যেন নিহিত আছে হিমালয়ের গূঢ় শৃঙ্গাভ্যন্তরে। আজ তা আমাদের ফিরে পেতে হবে

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রশ্নাবলী ও উত্তর

[উচ্চতর মাধ্যমিক]

॥ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬১ ॥

<প্রথম পত্র>

প্র. ৭। অর্থের অঙ্গহানি না করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলির যে-কোনো পাঁচটির নির্দেশ-অনুযায়ী রূপ পরিবর্তন কর :

(ক) ভিত্তি দৃঢ় না হইলে পাথরে-গড়া তাজমহলও এতকাল স্থায়ী হইত না (মিশ্রবাক্যে পরিণত কর)।

(খ) অন্ধকার ঢেকে নিল চার জনকেই (বাচ্যান্তরিত কর)।

(গ) হেদাৎউল্লা ঈশ্বরকে বল্‌লে—ধর বেটা সড়কি (উক্তি পরিবর্তন কর)।

(ঘ) নদীতট উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ প্লাবিত করিল (প্লাবিত স্থলে প্লাবন বসাও)।

(ঙ) ইহারা পরস্পরের সুহৃৎ (সুহৃৎ হইতে নিষ্পন্ন তদ্ধিত পদ প্রয়োগ কর)।

(চ) আমাকে থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাতেই হবে (নেতিবাচক কর)।

(ছ) জানোয়ারের মতো বসে থাকা হচ্ছে কেন ? (কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত কর)।

(জ) ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে (পাকের বদলে নামধাতুর ক্রিয়া চাই)।

(ঝ) কল্লোলিনীর সুললিত সংগীত এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রে তাহা নীরব হইল (চলিত সহজ ভাষায় পরিবর্তন কর)।

উ। (ক) ভিত্তি যদি দৃঢ় না হইত তবে পাথরে-গড়া তাজমহলও এতকাল স্থায়ী হইত না।

(খ) অন্ধকারে ঢাকা পড়ল চার জনই।

(গ) হেদাৎউল্লা ঈশ্বরকে তাচ্ছিল্যমিশ্রিত দম্ভের সঙ্গে সড়কি ধরতে বলল।

(ঘ) নদীতট উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশে প্লাবন আনিল।

(ঙ) ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহৃদ্য আছে।

(চ) আমার থিয়েটারে হারমোনিয়াম না বাজালে চলবে না।

(ছ) জানোয়ারের মতো বসে রয়েছ কেন ?

(জ) ব্রজবাবুর মাথার চুল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে।

(ঝ) কল্লোলিনীর মিষ্টি গান এতদিন কানে বাজছিল, হঠাৎ যেন কোন যাদুকরের মন্ত্রে তা থেমে গেল।

প্র. ৮। স্থূলাক্ষর পদগুলির পাঁচটির সম্বন্ধে ব্যাকরণমূলক টীকা লিখ :

(ক) ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া **আকণ্ঠ-নিমজ্জিত** তাহার **মাসতুতো** ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল।

(খ) কোতোয়ালের হুঁসিয়ারি দেখিয়া রাজা তাহাকে শিরোপা দিলেন।

(গ) স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্মিমালা **প্রস্তরীভূত** হইয়া রহিয়াছে।

(ঘ) ভাদ্র কঁড়ে ঘর তালপাতার ছাউনি।

(ঙ) অয়ি শ্যামাঙ্গিনি ধনি, অয়ি বর্ষা।

(চ) নাহি সোয়াস্তি, নাহি কোনো সুখ।

(ছ) সাত মহারথী শিশুরে বধিয়া ফুলায় বেহায়া ছাতি।

উ। (ক) আকণ্ঠ-নিমজ্জিত : কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ (অব্যয়ীভাব সমাস)। আকণ্ঠ-নিমজ্জিত (সুপ্ সুপা)। নি—মস্জ্ + ক্ত = নিমগ্ন হওয়া উচিত, কিন্তু বাঙ্লায় 'নিমজ্জিত' শব্দটি ভুল হইলেও বহুপ্রচলিত।

মাসতুতো : 'মাসীর অপত্য' অর্থে মাসী + তুত (উচ্চারণে 'তুতো')—অপত্যার্থ বাঙ্লা তদ্ধিতের উদাহরণ। মাসী + তুতো = মাসতুতো (বাঙ্লা সন্ধিতে স্বরলোপের উদাহরণ)।

(খ) হুঁশিয়ারি : হুঁশ + ইয়ার = হুঁশিয়ার; হুঁশিয়ার + ই = হুঁশিয়ারি পদটিতে দুই বিভিন্ন অর্থে দুইটি তদ্ধিত-প্রত্যয় রহিয়াছে। কথাটিতে কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি রহিয়াছে।

(গ) প্রস্তরীভূত : 'যাহা প্রস্তর ছিল না তাহা প্রস্তর হইয়াছে' এই অর্থে (অভূততদ্ভাব অর্থে) প্রস্তর + চি + ভূ + ক্ত = 'প্রস্তরীভূত'; গতি-সমাসের উদাহরণ।

(ঘ) ছাউনি : তদ্ভব শব্দ (<ছাদনী)। ছা + অনি = ছাঅনি > ছাউনি —স্বরসংগতি।

(ঙ) শ্যামাঙ্গিনি : 'শ্যামাঙ্গ' শব্দের শুদ্ধস্ত্রীলিঙ্গ-রূপ 'শ্যামাঙ্গী' (ঈ-যোগে)। কিন্তু বাঙ্লায় 'ইনী'-প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ গঠনের একটা ঝোঁক থাকায় এখানে 'শ্যামাঙ্গিনী' করা হইয়াছে। তাহারই সম্বোধন-রূপ, শ্যামাঙ্গিনি।

ধনি : মূল শব্দটি 'ধনী' (স্ত্রীলিঙ্গ—ধনবান্ অর্থে নয়, রূপসী নারী অর্থে); তাহার সম্বোধনে হ্রস্ব ই-কার হইয়াছে। সম্বোধনপদে স্বরের এইরূপ পরিবর্তন সাধারণত সংস্কৃতানুগ সাধুভাষায় দেখা যায়, খাঁটি বাঙ্লায় নয়।

(চ) সোয়াস্তি : স্বস্তি > সোয়াস্তি—অর্ধতৎসম শব্দ। ইহাকে সম্প্রসারণের বাঙ্লা উদাহরণও বলা যাইতে পারে।

(ছ) বধিয়া : 'বধ' শব্দটি বিশেষ্য; তাহাই এখানে বিনা-প্রত্যয়ে নামধাতুতে পরিণত হইয়া ক্রিয়াপদটি সৃষ্টি করিয়াছে।

বেহায়া : বে অর্থাৎ নাই হায়া বা লজ্জা যাহার = বেহায়া। এটি নঞ্ বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ।

প্র. ৯। নিম্নলিখিত শব্দগুলির পাঁচটিকে স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর :

অঙ্গীভূত, নজরবন্দী, বেগবত্তা, রবাহূত, উত্তরত, তাম্বর, বেমালুম, দিগ্বিদিক্, গলাবাজি, বিষয়াস্তর।

উ. ১। অঙ্গীভূত : দেহচর্চা শিক্ষার অঙ্গীভূত।

: ইংরেজশাসনে বহু বাঙালি-যুবককে পুলিশের নজরবন্দী হইয়া

বেগবত্তা : পার্বত্য নদীর বেগবত্তায় বৃহৎ শিলাখণ্ডও ভাসিয়া চলে।

রবাহূত : ভোজবাড়ীতে রবাহূতের দল আসিয়া ভিড় করিল।

উদ্বৃত্ত : ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় যাহাদের হস্তে, তাহাদের লাভ উদ্বৃত্ত।

ভাস্বর : অ্যাটম বোমা যখন ফাটে, তখন তাহা হইতে নাকি সূর্যের ন্যায় ভাস্বর দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়।

বেমালুম : তুমি তো বেশ লোক হে—টাকাটা বেমালুম হজম করে দিলে।

দিগ্ দিগন্ত : দিগ্ দিগন্তে আজ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজিতেছে।

গলাবাজি : সভায় খানিকটা গলাবাজিই হল—কাজের কাজ কিছুই হল না।

বিষয়ান্তর : একটি বিষয়ের মীমাংসা হওয়ায় সভা বিষয়ান্তরের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

প্র. ১০। (ক) নিম্নোক্ত অংশকে সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :

হুজুর, লেঠেলি আমার জাতব্যবসা নয়। বাপঠাকুরদাদার মতো আমি খেয়ানৌকা পারাপার করে দু-পয়সা কামাই। লাঠিখেলা জানতুম ছোকরা বয়েসে। তারপর আজ বিশপঁচিশ বৎসর লাঠি ধরিনি। এদের কাছে আমি ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি করেছি যে, আমি লাঠি-সড়কি আর ছোঁব না। সে কথা ভাঙি কি করে? হুজুরের হুকুম হলে আমি 'না' বলতে পারি না।

উ.। হুজুর, লাঠিয়ালি আমার জাতিগত বৃত্তি নয়, পিতৃপিতামহের ন্যায় আমি খেয়ানৌকা পারাপার করিয়া দুই পয়সা উপার্জন করি। লাঠিখেলা জানিতাম তরুণ বয়সে। তারপর আজ বিশপঁচিশ বৎসর লাঠি ধরি নাই। ইহাদের নিকট আমি বিগ্রহের সম্মুখে দিব্য করিয়াছি যে আমি লাঠি-সড়কি আর স্পর্শ করিব না। সে কথা ভাঙি কি করিয়া? হুজুরের আদেশ হইলে আমি 'না' বলিতে পারি না।

প্র.। (অথবা) (ক) নিম্নলিখিত পদ্য বাক্যগুলিকে যথাযথ গদ্য রূপ দাও :

(১) হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে।

(২) চালু সেরে বাঁধা দিনু মাটিয়া পাথরা।

(৩) বাঙালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।

(৪) পশিলা অমরাবতী জিনিয়া অবনী।

উ.। (ক) (১) এখানে সকলকে আনত শিরে মিলিত হইতে হইবে।

(২) এক সের চাউলে মাটিয়া পাত্রি বাঁধা দিলাম।

(৩) বাঙালীর হৃদয়ামৃত মন্থন করিয়া নিমাই কায়া ধারণ করিয়াছে।

(৪) অবনী জয় করিয়া অমরাবতীতে প্রবেশ করিলেন।

(খ) নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিতে যে-সব ভুলভ্রান্তি হইয়াছে, সেগুলি সংশোধন করিয়া লিখ :

যে বাঙালীত্ব নিয়ে আমরা অহরাত্রি আস্ফালন করিয়া থাকি তাহাও অতি ছোট ও শীর্ণ চেহারা ধারণ করে। এই চতুঃপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তী ধবলগিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দাঁড়িয়ে থাকে।

উ.। পাঠসংকলনে 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

প্র.। (অথবা) (খ) অনুক্ত শব্দগুলির স্থান পূরণ কর :

সেই ললিতগিরির পদমূলে বিরূপাতীরে গিরির শরীরমধ্যে—নামে এক গুহা ছিল। গুহা বলিয়া আবার—বলিতেছি কেন? পর্বতের—কি আবার লোপ পায়? কাল—হইলে সবই লোপ পায়। গুহাও আর নেই। ছাদ পড়িয়া গিয়াছে—ভাঙিয়া গিয়াছে, তলদেশে ঘাস—। —লোপ পাইয়াছে,—অন্ত দুঃখে কাজ কি?

উ.। University Bengali Selection-এ 'ললিতগিরি' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

< দ্বিতীয় পত্র >

প্র. ১। এমন একটি বাক্য রচনা কর যাহাতে সমস্ত কারক প্রয়োগ করা হইয়াছে। রচিত বাক্যে কোন্ বিভক্তি হইয়াছে, দেখাইয়া দাও। সম্বন্ধ ও সম্বোধন কারক কিনা, আলোচনা কর।

উ.। জমিদার বহির্বাটিতে দরিদ্র প্রজাদিগকে স্বহস্তে গোলা হইতে ধান দিতেছেন।

উপরের বাক্যটিতে—

(ক) জমিদার—কর্তৃকারক, বিভক্তি শূন্য ;

(খ) ধান—কর্মকারক, বিভক্তি শূন্য ;

(গ) স্বহস্তে—করণকারক, বিভক্তি 'এ' ;

(ঘ) প্রজাদিগকে—সম্প্রদানকারক, বিভক্তি 'কে' ;

(ঙ) গোলা হইতে—অপাদানকারক, বিভক্তি 'হইতে' ;

(চ) বহির্বাটীতে—অধিকরণকারক, বিভক্তি 'তে'।

সম্বন্ধপদ ও সম্বোধনপদ কারক নহে এই কারণে যে, ক্রিয়ার সহিত ইহাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না, এবং ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে কারক হয় না।

প্র.। (অথবা)

'গ্রামে লোকে এক মনে পূজিয়ে দেবতাগণে
খড়্গে ছাগে কাটে লোকহিতে।'—

উপরি-উদ্ধৃত কবিতাংশে 'এ'-বিভক্তির ব্যাপক প্রয়োগে গঠিত পদসমূহের পরিচয় দাও। অপাদান কারকে 'এ'-বিভক্তির প্রয়োগ দেখাইয়া একটি বাক্য রচনা কর।

উ.। (ক) গ্রামে—অধিকরণকারকে 'এ' ;

(খ) লোকে—কর্তৃকারকে 'এ' ;

[illegible] মনে—করণকারকে 'এ' ;

[illegible] দেবতাগণে—কর্মকারকে 'এ' ;

[illegible] খড়্গে—করণকারকে 'এ' ;

(চ) ছাগে—কর্মকারকে 'এ';

(ছ) লোকহিতে—কারক নাই, নিমিত্তার্থে 'এ';

অপাদানকারকে 'এ' : তিলে তেল হয়।

প্র. ২। উদাহরণ-সহকারে যে-কোনো পাঁচটি পরিভাষার ব্যাখ্যা কর :

নামধাতু; প্রাকৃতজ শব্দ; মিশ্র বাক্য; স্বাভাবিক ণত্ব; সর্বনামীয় বিশেষণ; নিপাতনে সন্ধি; ব্যতিহার বহুব্রীহি; অনন্বয়ী অব্যয়।

উ.। নামধাতু : উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৪ দ্রষ্টব্য।

প্রাকৃতজ শব্দ : যে-সকল সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতের মাধ্যমে বাঙলাভাষায় পরিবর্তিত আকারে আসিয়াছে, তাহাদের নাম প্রাকৃতজ শব্দ; যথা—

মৎস্য (সংস্কৃত)—মচ্ছ (প্রাকৃত)—মাছ (প্রাকৃতজ বা তদ্ভব)।

মিশ্র বাক্য : উচ্চতর মাধ্যমিক, কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬৩-তে 'জটিল বাক্য' দ্রষ্টব্য। জটিল বাক্যকেই কেহ কেহ 'মিশ্র বাক্য' বলেন।

স্বাভাবিক ণত্ব : কতকগুলি তৎসম শব্দে ণত্বের কারণ না থাকিলেও সর্বদা ণ ব্যবহৃত হয়। এইরূপ প্রয়োগকে স্বাভাবিক ণত্ব বলা হয়; যথা—

লবণ, বীণা, বাণী, মাণিক্য, বিপণি ইত্যাদি।

সর্বনামীয় বিশেষণ : উচ্চতর মাধ্যমিক, কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬৩ দ্রষ্টব্য।

নিপাতনে সন্ধি : সাধারণ নিয়মে সন্ধি না হইয়া যখন বিশেষ নিয়মে হয়, তখন সেইরূপ সন্ধিকে নিপাতনে সন্ধি বলা হয়; যথা—

কুল + অটা = সাধারণ নিয়মে হওয়া উচিত 'কুলাটা', কিন্তু বিশেষ নিয়মে হয় 'কুলটা'।

ব্যতিহার বহুব্রীহি : পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়া বুঝাইতে একই বিশেষ্যপদের দ্বিত্বের ফলে যে সমাস হয়, তাহার নাম ব্যতিহার বহুব্রীহি; যথা—চুলে চুলে আকর্ষণ করিয়া যে যুদ্ধ = চুলোচুলি।

অনন্বয়ী অব্যয় : যে-সকল অব্যয় বাক্যের অন্য কোনো পদ বা পদসমষ্টির সহিত ব্যাকরণগত কোন সম্পর্ক রাখে না, তাহাদের নাম অনন্বয়ী অব্যয়। সাধারণত ভাববাচক, প্রশ্নবোধক এবং বাক্যালংকার অব্যয়গুলি এই শ্রেণীর; যথা—

ছি! এমন কথা মুখে আনতে আছে!

প্র.। (অথবা) রূপক কর্মধারয়, উপমান কর্মধারয় এবং উপমিত কর্মধারয়ের পার্থক্য উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসের পার্থক্য উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

উ.। যাহার সহিত তুলনা করা হয় তাহা উপমান, যাহার তুলনা হয় তাহা উপমেয়, এবং উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে যে গুণসাদৃশ্য থাকায় তুলনা করা হয় তাহার নাম সাধারণ ধর্ম।

যে-কর্মধারয়ে পূর্বপদ উপমান এবং উত্তরপদ সাধারণ ধর্ম, তাহাকে উপমান কর্মধারয়; যথা—শঙ্খের ন্যায় ধবল = শঙ্খধবল।

সাধারণ ধর্মকে অনুল্লিখিত রাখিয়া উপমেয় পূর্বপদ এবং উপমান উত্তরপদের মধ্যে যে সমাস হয়, তাহার নাম উপমিত কর্মধারয়; যথা—পুরুষ সিংহের ন্যায়=পুরুষসিংহ।

অভেদ কল্পনা করা হইলে উপমেয় ও উপমানের যে সমাস হয়, তাহার নাম রূপক কর্মধারয়; যথা—মন-রূপ মাঝি=মনমাঝি।

উপমিত কর্মধারয় এবং রূপক কর্মধারয় চেহারায় এক বটে, কিন্তু স্বরূপে এক নয়। বাক্যে উপমেয়ের প্রাধান্য হইলে সমাস হয় উপমিত কর্মধারয়, আর উপমানের প্রাধান্য হইলে হয় রূপক কর্মধারয়।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি: যে কর্মধারয় অর্থাৎ উত্তরপদার্থ প্রধান সমাসে সমস্যমান পদগুলি হইতে মধ্যবর্তী এক বা একাধিক পদের লোপ হয়, তাহার নাম মধ্যপদলোপী কর্মধারয়; যথা—সিংহ-চিহ্নিত আসন=সিংহাসন ('চিহ্নিত' পদটি লুপ্ত)। বহুব্রীহি অর্থাৎ অন্যপদ প্রধান সমাসে যদি সমস্যমান পদগুলি হইতে মধ্যবর্তী এক বা একাধিক পদের লোপ হয়, তবে সেইরূপ বহুব্রীহিকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে; যথা—বিড়ালের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার=বিড়ালাক্ষী ('অক্ষির ন্যায়' পদ দুইটি লুপ্ত)।

প্র. ৩। যে-কোনো পাঁচটি শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় ও ব্যুৎপত্তি অর্থ লিখ:

শুশ্রূষা; ভার্যা; কৃত্য; রোরুদ্যমান; মাতৃকা; ভূমা; কাটারি; বড়াই।

উ.। শুশ্রূষা—শ্রু+সন্+অ+স্ত্রীলিঙ্গে আ (শুনিবার ইচ্ছা)।

ভার্যা—ভৃ+ণ্যৎ+স্ত্রীলিঙ্গে আ (যে-নারীকে ভরণ করা উচিত)।

কৃত্য—কৃ+ক্যপ্ (যাহা করা উচিত)।

রোরুদ্যমান—রুদ্+যঙ্+শানচ্ (যে অত্যন্ত রোদন করিতেছে)।

মাতৃকা—মাতৃ+ক (স্বার্থে)+স্ত্রীলিঙ্গে আ।

ভূমা—বহু+ইমনিচ্ (বহুর ভাব)।

কাটারি—কাট্+আরি (কাটা হয় যাহার দ্বারা)।

বড়াই—বড়+আই (বড়র ভাব)।

প্র.। (অথবা) নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলির যে-কোন পাঁচটি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, কারণ দেখাইয়া বিচার কর:

নিরপরাধিনী; সাম্রাজ্ঞী; রুচিবান্; উৎকর্ষতা; প্রাঙ্গন; বিদ্যুতালোক; সখা; প্রতিযোগীতা।

উ.। নিরপরাধিনী: 'নিঃ অর্থাৎ নাই অপরাধ যাহার' এই ব্যাসবাক্যে বহুব্রীহি সমাসে 'নিরপরাধ' হয়। বহুব্রীহি সমাসে অভীষ্ট অর্থ পাওয়া গেলে তাহার উত্তর আবার অত্যর্থক তদ্ধিত-প্রত্যয় হয় না। অতএব পুংলিঙ্গে নিরপরাধ+ইন (ঈ)='নিরপরাধী' যখন অশুদ্ধ, তখন ইহার স্ত্রীরূপ 'নিরপরাধিনী'ও অশুদ্ধ।

সাম্রাজ্ঞী: 'রাজন' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ-রূপ 'রাজ্ঞী'। 'সম্রাজন' বলিয়া কোন

শব্দ থাকিলে তাহার স্ত্রীলিঙ্গ-রূপ 'সম্রাজ্ঞী' হইতে পারিত। কিন্তু শব্দটি আসলে 'সম্রাজ্'। অতএব ইহার স্ত্রীরূপ 'সম্রাজ্ঞী' অশুদ্ধ, যদিও বাঙ্‌লায় বহুপ্রচলিত।

রুচিবান্: 'রুচি' শব্দটি অবর্ণান্ত বা মকারান্ত বা উপধায় ম্ বা অবর্ণবিশিষ্ট নয় বলিয়া রুচি + মতুপ্-এর ক্ষেত্রে মতুপ্-এর ম-স্থানে ব হইতে পারে না।

উৎকর্ষতা: 'উৎকর্ষ' কথাটি নিজেই ভাববাচক বিশেষ্য; সুতরাং ইহার উত্তর আবার ভাববাচক তদ্ধিত ('তা' বা 'তল্') যোগ করা যায় না।

প্রাঙ্গন: র্-এর পর স্বরবর্ণ এবং কবর্গ ব্যবধান থাকায় পরবর্তী ন ণত্ববিধান অনুসারে মূর্ধন্য ণ হইবে, দন্ত্য ন ভুল।

বিদ্যুতালোক: সন্ধির নিয়মে বর্গের প্রথম বর্ণ + স্বর = বর্গের তৃতীয় বর্ণ + স্বর। অতএব বিদ্যুৎ + আলোক = বিদ্যুদ্ + আলোক = 'বিদ্যুদালোক' না হইয়া 'বিদ্যুতালোক' হইতে পারে না।

সত্ত্বা: সৎ + তা = সত্তা। প্রকৃতি এবং প্রত্যয় কোনটিতেই ব-ফলা না থাকায় বানানে ব-ফলা আসিতে পারে না।

প্রতিযোগীতা: মূল শব্দটি 'প্রতিযোগিন্'। অন্য শব্দের সহিত সমাসে এবং প্রত্যয়-যোগে ন্-ভাগান্ত শব্দের ন্-অংশ লোপ পায়। অতএব প্রতিযোগিন্ + তা = প্রতিযোগি + তা = 'প্রতিযোগিতা'-স্থলে 'প্রতিযোগীতা' অশুদ্ধ।

প্র. ৪। উদাহরণ দিয়া উপমা ও রূপক, অথবা শ্লেষ ও যমক অলংকারের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

উ.। 'বিচিত্রা'-র অলংকার-ভাগ দ্রষ্টব্য।

প্র.। (অথবা) যে কোনো দুইটির অলংকার ব্যাখ্যা কর।

(ক) মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে।

(খ) কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥

(গ) খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তন্যপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি।

(ঘ) প্রীতিমন্ত্রবলে
শান্ত করো, বন্দী করো নিন্দা-সর্পদলে।

উ.। (ক) 'ন্দ' এই যুক্তাক্ষরটি তিনবার ধ্বনিত হইয়া মাধুর্যের সৃষ্টি করায় অনুপ্রাস অলংকার।

(খ) উপমান 'শারদশশী' অপেক্ষা উপমেয় 'মুখ'-এর উৎকর্ষ সূচিত হওয়ায় ব্যতিরেক অলংকার।

(গ) 'খণ্ড মেঘগণ' উপমেয়, 'মাতৃস্তন্যপানরত শিশু' উপমান, 'আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকা' সাধারণ ধর্ম এবং 'মতন' তুলনাবাচক শব্দ। উপমার চারিটি অঙ্গই বর্তমান থাকায় অলংকার এখানে পূর্ণোপমা।

(ৰ) উপমেয় 'প্রীতি' ও উপমান 'মন্ত্রে' এবং উপমেয় 'নিন্দা' ও উপমান 'মন্ত্রে' অভেদ কল্পিত হওয়ায় অর্থাৎ প্রীতি ও নিন্দা যথাক্রমে মন্ত্র ও সর্প হইয়া যাওয়ার রূপক অলংকার হইয়াছে।

উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬১।

< প্রথম পত্র >

প্র. ৭। অর্থের অঙ্গহানি না করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলির যে-কোনো পাঁচটিকে নির্দেশ-অনুসারে রূপান্তরিত কর :

(ক) সুরঞ্জমল হেসে বললেন—'বেশ, আজকের মতো ঘুমিয়ে নেওয়া যাক, কিন্তু কাল সকালে আমি তৈরী থাকব।' (উক্তি পরিবর্তন কর।)

(খ) কেহ-বা বল্লরীপল্লববিভূষিত নিকুঞ্জে মনস্তুষ্টিসাধনার্থ আশ্রয় লইবেন। (সমাসবদ্ধ পদ-দুইটিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া লিখ।)

(গ) কাল বিগুণ হইলে সবই লোপ পায়। ('বিগুণ' ও 'লোপের' পদ পরিবর্তন কর।)

(ঘ) শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবন ও মৃত্যুর মাঝেকার কোনো-এক অবস্থাকেই অব্যক্ত জীবন বলিতে চাহেন। (ক্রিয়াপদ বাদ দাও।)

(ঙ) মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত ও দেশী শিল্প, ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত হইত। (চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদ ব্যবহার কর অথবা বাচ্যান্তরিত কর।)

(চ) এই কুহেলিকাবরণ কোনদিন অপনীত হইবে কিনা আমরা তাহা জানি না। (আবরণ ও আমরা এই দুটিকে সম্বন্ধপদে পরিণত কর।)

(ছ) বান্ধবের মরণশোকে তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিত। (শোক-কে কর্তৃপদে ব্যবহার কর।)

(জ) কুকুরগুলো অশ্রুতপূর্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব পোষাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিকে তাড়া করিয়াছিল। (সমাস ভাঙিয়া মিশ্র বাক্যে রূপান্তরিত কর।)

(ঝ) গৃহিণী ইহাদের একজনও ক্ষুধিত থাকিতে নিজের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। (কুণ্ঠিতের স্থলে কুণ্ঠা, ক্ষুধিতের স্থলে ক্ষুধা প্রয়োগ কর।)

উ.। (ক) সুরঞ্জমল হেসে সে-প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে বললেন যে, সেদিনকার মতো তিনি ঘুমিয়ে নেবেন কিন্তু পরদিন সকালে তিনি তৈরি থাকবেন।

(খ) কেহ-বা বল্লরী ও পল্লবে ভূষিত নিকুঞ্জে মনের তুষ্টিসাধনের জন্য আশ্রয় লইবেন।

(গ) কালের বৈগুণ্যে সবই লুপ্ত হয়।

(ঘ) শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে জীবন ও মৃত্যুর মাঝেকার কোনো এক অবস্থাই অব্যক্ত জীবন।

(ঙ) (i) মেলায় দেশের স্তবগান গাওয়া, দেশানুরাগের কবিতা পড়া, আর দেশী শিল্প, ব্যায়াম প্রভৃতি দেখানো হত।

(ii) মেলায় লোকে দেশের স্তবগান গাহিত, দেশানুরাগের কবিতা পাঠ করিত ও দেশী শিল্প, ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শন করিত।

(চ) এই কুহেলিকাবরণের কোনদিন অপনয়ন হইবে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই।

(ছ) বান্ধবের মরণশোক তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইত।

(জ) কুকুরগুলা পূর্বে কখনো শ্রুত হয় নাই এমন গীত এবং পূর্বে কখনো দৃষ্ট হয় নাই এমন পোশাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিকে তাড়া করিয়াছিল।

(ঝ) সুগৃহিণী ইহাদের একজনেরও ক্ষুধা থাকিতে নিজের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন।

প্র. ৮। স্থূলাক্ষর পদগুলির পাঁচটির সম্বন্ধে ব্যাকরণমূলক টীকা লিখ:

(ক) চন্দ্রচূড়জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারতরস ঋষি দ্বৈপায়ন·· ···।

(খ) তারা মাস মাস মুঠা মুঠা তন্‌খা পাইয়া সিন্দুক বোঝাই করিল।

(গ) কোতোয়াল বলিল—এ কি বেয়াদবি!

(ঘ) মরিয়ার মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে 'মার, মার'।

(ঙ) আমরা এখন গাণপত্য।

উ.। (ক) চন্দ্রচূড়: চন্দ্র চূড়ায় যাঁহার = চন্দ্রচূড়—ব্যধিকরণ বহুব্রীহির উদাহরণ।

আছিলা: আছ + ইলা (ইল) = আছিলা। বর্তমানে গদ্যে 'আছিলা' (বা 'আছিল')-র স্থানে পাওয়া যায় 'ছিল' (আ-টি বাদ গিয়াছে)। বর্তমানে 'আছ্‌' ধাতুটির পূর্ণরূপ একমাত্র সামান্য বর্তমানে পাওয়া যায় বলিয়া এটি অসম্পূর্ণ বা পঙ্গু ধাতুর উদাহরণ।

জাহ্নবী: জহ্নু + অণ্‌ (অ) + স্ত্রীলিঙ্গে ঈ = জাহ্নবী (অর্থ—জহ্নুর কন্যা)—অপত্যার্থে সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়ের উদাহরণ।

দ্বৈপায়ন: দ্বীপে ভব অর্থাৎ জন্ম এই অর্থে দ্বীপ + ফক্‌ (আয়ন) = দ্বৈপায়ন—অপত্যার্থক তদ্ধিত-প্রত্যয়ের ভবার্থে প্রয়োগ।

(খ) মুঠা মুঠা: বাহুল্য বুঝাইতে বিশেষণপদের দ্বিত্ব হইয়াছে

(গ) বেয়াদবি: বেয়াদব + ই = বেয়াদবি—ভাব বা কার্য অর্থে তদ্ধিতান্ত বিদেশী শব্দ।

(ঘ) মরিয়া: মর্‌ + ইয়া = মরিয়া। 'ইয়া' প্রত্যয়টি সাধারণত অসমাপিকা ক্রিয়া গঠন করে, কিন্তু এখানে 'মরিতে প্রস্তুত' এই বিশেষ অর্থে 'মর' ধাতুর সঙ্গে 'ইয়া' যুক্ত হইয়াছে।

(ঙ) গাণপত্য : গণপতি+ষ্ণ্য=গাণপত্য (অর্থ—গণপতির সন্তান)—অপত্যার্থক সংস্কৃত তদ্ধিতের উদাহরণ।

প্র. ৯। নিম্নলিখিত শব্দগুলির পাঁচটিকে বাক্যে প্রয়োগ কর :

পুঁজিপাটা, হুঁশিয়ারি, ঐতিহ্য, উদাত্ত, সন্দিহান, পক্ষান্তরে, সমন্বয়, নিরপেক্ষ, কবলিত, চিরাভ্যস্ত।

উ.। পুঁজিপাটা : সামান্য পুঁজিপাটা হারাবার ভয়ে বাঙালি-যুবক ব্যবসায়ে নামে না।

হুঁশিয়ারি : সত্যকারের দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকের হুঁশিয়ারি সবদিকেই।

ঐতিহ্য : প্রত্যেকেই জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষায় যত্নবান হওয়া উচিত।

উদাত্ত : নেতাজীর উদাত্ত আহ্বান আর কি বাঙালি শুনিতে পাইবে?

সন্দিহান : তাঁহার সাধুতায় সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই।

পক্ষান্তরে : একদল লোক আছে যাহারা কিরূপে সময় কাটাইবে জানে না; পক্ষান্তরে, আর-একদল আছে যাহাদের নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই।

সমন্বয় : শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্মের সমন্বয় সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

নিরপেক্ষ : ভোটগণনাকালে দেখা গেল পাঁচজন নিরপেক্ষ রহিয়াছেন।

কবলিত : সেই সমৃদ্ধ গ্রাম একদিন মহামারীর কবলিত হইল।

চিরাভ্যস্ত : বাঙালির চিরাভ্যস্ত পরিচ্ছদের এখন অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

প্র. ১০। (ক) নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশের অশুদ্ধিগুলি সংশোধন করিয়া লিখ :

নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতিবৃহৎ ভাস্বর জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে, তাহা একান্ত দুর্নিরিক্ষ্য। সেই জ্যোতিপুঞ্জ হইতে নির্গলিত ধূম্ররাশি দিক্‌দিগান্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা? পৃথিবীরূপী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আভরণ করিয়া রহিয়াছে।

উ.। পাঠসংকলনে 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

প্র.। (অথবা) (ক) অনুক্ত শব্দের স্থানগুলি পূরণ কর :

তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর—করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতঃস্পর্শে জড়ত্বশাপ—করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে—করিয়া তুলিয়াছেন, ইঁহা কেবল—মত নহে, ইহা—সত্য।

উ.। Intermediate Bengali Selections-এ রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

(খ) নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিকে সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :

মিছু সর্দার বললে—'হুজুর, আগেই বলেছিলুম, ও নিশ্চই জাদু জানে, এখন তো দেখলেন আমারের কথাই ঠিক। মন্তরের সঙ্গে কে লড়তে পারবে?' ঈশ্বর হাতজোড় করে বললে—'হুজুর, আমি মন্তরতন্তর কিছুই জানি নে। লাঠি-সড়কি ধরামাত্র আমার শরীরে কী যেন ভর করে। আমার কেরামতি কিছুই নেই।'

উ.। মিছু সর্দার বলিল—'হুজুর, পূর্বেই বলিয়াছিলাম, ও নিশ্চয় জাদু জানে, এখন তো দেখিলেন, আমাদের কথাই সত্য। মন্ত্রের সহিত কে যুদ্ধ করিতে পারিবে?' ঈশ্বর হাতজোড় করিয়া বলিল—'হুজুর, আমি মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না। লাঠি-সড়কি ধরিবামাত্র আমার শরীরে কী যেন ভর করে। আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই।'

প্র.। (অথবা) (খ) নিম্নলিখিত পদ্যাংশগুলির যথাযথ গদ্যরূপ দাও:

(i) না আলোকে যদি শশী তিমিরা রজনী,
নক্ষত্রের নহে সাধ্য উজলে ধরণী।

(ii) ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে।

(iii) আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে।

উ.। (i) শশী যদি তিমিরা রজনীকে আলোকিত না করে, নক্ষত্রের সাধ্য নহে ধরণীকে উজ্জ্বল করে।

(ii) ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে পথিককে ধাঁধাইতে আঁধার (বা, অন্ধকার) বাড়ায় মাত্র।

(iii) হায়, আশার ছলনায় ভুলিয়া কী ফল লাভ করিলাম তাহাই মনে ভাবি।

< দ্বিতীয় পত্র >

প্র. ১। শব্দ, পদ ও বিভক্তি কাহাকে বলে, এবং ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী, উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

উ.। একটি বর্ণ বা একাধিক বর্ণের সমষ্টি যদি অর্থযুক্ত হয়, তবে তাহাকে শব্দ বলে। এ, কি, প্রতিভা—এগুলি শব্দ, কিন্তু অর্থ নাই বলিয়া মসিকা, হজনিয়া, শব্দ নয়।

শব্দ বা ধাতু বিভক্তিযুক্ত হইলে পদ হয়। শব্দ পদরূপেই বাক্যে ব্যবহারের যোগ্যতা লাভ করে; যথা—

পুকুর (শব্দ) + এ (বিভক্তি) = পুকুরে (পদ)। ডাক্ (ধাতু) + ই (বিভক্তি) = ডাকি (পদ)।

উপরের উদাহণ-দুইটি হইতে স্পষ্ট হইবে, যে বিভক্তি দুইপ্রকার: (ক) শব্দ-বিভক্তি; (খ) ধাতু-বিভক্তি।

শব্দের সহিত যে-বিভক্তি যুক্ত হইলে পদ গঠিত হয়, তাহার নাম শব্দ-বিভক্তি। ধাতুর সহিত যে-বিভক্তি যুক্ত হইলে পদ গঠিত হয়, তাহার নাম
উপরের উদাহরণে 'এ' শব্দ-বিভক্তি এবং 'ই' ধাতু-বিভক্তি

প্র.। (অথবা) √হ-ধাতু অথবা √শুন্ ধাতুর পুরাঘটিত বর্তমান, ঘটমান অতীত, বর্তমান অনুজ্ঞা এবং ঘটমান ভবিষ্যতে প্রথম পুরুষের সাধু ও চলিত রূপ লিখ। বাঙ্‌লা ভাষার ব্যবহৃত সনন্ত ও যঙন্ত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দের উদাহরণ দাও।

উ.। হ ধাতু : হইয়াছে, হয়েছে ; হইয়াছেন, হয়েছেন (পুরাঘটিত বর্তমান)।
হইতেছিল, হচ্ছিল ; হইতেছিলেন, হচ্ছিলেন (ঘটমান অতীত)।
হউক, হোক ; হউন, হন (বর্তমান অনুজ্ঞা)।
হইতে থাকিবে, হতে থাকবে ; হইতে থাকিবেন, হতে থাকবেন (ঘটমান ভবিষ্যৎ)।

শুন্ ধাতু : শুনিয়াছে, শুনেছে ; শুনিয়াছেন, শুনেছেন (পুরাঘটিত বর্তমান)।
শুনিতেছিল, শুনছিল ; শুনিতেছিলেন, শুনছিলেন (ঘটমান অতীত)।
শুনুক, শুনুন (বর্তমান অনুজ্ঞা)
শুনিতে থাকিবে, শুনতে থাকবে ; শুনিতে থাকিবেন, শুনতে থাকবেন (ঘটমান ভবিষ্যৎ)।

বাঙ্‌লায় ব্যবহৃত সনন্ত ও যঙন্ত ধাতুনিষ্পন্ন শব্দ :
জিজ্ঞাসা, পিপাসা, জিগীষা, জিঘাংসা ইত্যাদি (সনন্ত) ; রোরুদ্যমান, দেদীপ্যমান, দোদুল্যমান ইত্যাদি (যঙন্ত)।

প্র. ২। উদাহরণ-সহকারে নিম্নলিখিত যে-কোনো পাঁচটি পরিভাষার ব্যাখ্যা কর :

প্রযোজ্য কর্তা ; উপপদ তৎপুরুষ ; ভাববাচ্য ; উষ্মবর্ণ ; ধ্বন্যাত্মক শব্দ ; স্বরভক্তি ; দেশীশব্দ ; বিধেয় বিশেষণ।

উ.। প্রযোজ্য কর্তা : উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬২ দ্রষ্টব্য।
উপপদ তৎপুরুষ : উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬৩ দ্রষ্টব্য।
ভাববাচ্য : উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬২ দ্রষ্টব্য।

উষ্মবর্ণ : যে-সকল বর্ণের উচ্চারণ উষ্মা বা শ্বাসের সহিত প্রলম্বিত করিতে পারা যায়, অর্থাৎ যতক্ষণ শ্বাস থাকে ততক্ষণই উচ্চারণ হয়, তাহাদের নাম উষ্মবর্ণ। শ, ষ, স, হ এইপ্রকারের বর্ণ। উদাহরণস্বরূপ শ-কে শ্ শ শ্ শ্ শ-রূপে যতক্ষণ শ্বাস থাকে [illegible] উচ্চারণ করিতে পারা যায়।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ : উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬২ দ্রষ্টব্য।
স্বরভক্তি : উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬২ 'বিপ্রকর্ষ' দ্রষ্টব্য।
দেশীশব্দ : উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬২ দ্রষ্টব্য।
বিধেয় বিশেষণ : উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬২ দ্রষ্টব্য।
[illegible] এই দুইটি বিশেষণ পদের [illegible] সহিত [illegible] করিয়া বিশেষ্যপদ. এবং [illegible]

এই দুইটি বিশেষ্যপদের প্রত্যেকটির সহিত কৃৎ এবং তদ্ধিত উভয়-প্রকারের প্রত্যয় যোগ করিয়া একটি বিশেষণপদ গঠন কর।

উ.। লঘু : লাঘব, লঘিমা, লঘুত্ব (বিশেষ্য)।
দরিদ্র : দরিদ্রতা, দারিদ্র্য, দরিদ্রত্ব (বিশেষ্য)।
দর্শন : দৃষ্ট (কৃৎ-যোগে বিশেষণ) ;
দার্শনিক (তদ্ধিত-যোগে বিশেষণ)।
ব্যবহার : ব্যবহৃত (কৃৎ-যোগে বিশেষণ) ;
ব্যবহারিক (তদ্ধিত-যোগে বিশেষণ)।

প্র. ৩। ব্যাসবাক্যসহ যে কোন পাঁচটির সমাস বল :
গৃহাগত ; গাছপাকা ; বধূবর ; গৌরাঙ্গ ; ছাগদুগ্ধ ; সস্ত্রীক ; কোলাকুলি ; খেচর।

উ.। গৃহাগত—গৃহকে আগত (দ্বিতীয়াতৎপুরুষ), অথবা, গৃহ হইতে আগত (পঞ্চমীতৎপুরুষ)।
বধূবর—বধূ এবং বর (দ্বন্দ্ব)।
গৌরাঙ্গ—গৌর অঙ্গ যাহার (বহুব্রীহি)।
ছাগদুগ্ধ—ছাগীর দুগ্ধ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)।
সস্ত্রীক—স্ত্রীর সহিত বর্তমান (তুল্যযোগে বহুব্রীহি)।
কোলাকুলি—কোলে কোলে স্পর্শ করিয়া যে সম্ভাষণ (ব্যতিহার বহুব্রীহি)।
খেচর—খে অর্থাৎ আকাশে চরে যে, (অলুক্ উপপদ তৎপুরুষ)

প্র.। (অথবা) যে-কোনো পাঁচটির সন্ধিবিচ্ছেদ কর :
স্বাগত ; নীরক্ত ; উচ্ছ্বাস ; শীতার্ত ; নবোঢ়া ; অন্ত্যেষ্টি ; শুদ্ধোদন বৎসরোনাস্তি।

উ.। স্বাগত—সু+আগত। নীরক্ত—নিঃ+রক্ত।
উচ্ছ্বাস—উৎ+শ্বাস। শীতার্ত—শীত+ঋত।
নবোঢ়া—নব+ঊঢ়া। অন্ত্যেষ্টি—অন্ত্য+ইষ্টি।
শুদ্ধোদন—শুদ্ধ+ওদন। বৎসরোনাস্তি—বৎসরঃ+ন+অস্তি।

প্র. ৪। যে-কোনো দুইটি অলংকার উদাহরণ-সহকারে বুঝাইয়া দাও :
সমাসোক্তি ; শ্লেষ ; উৎপ্রেক্ষা ; ব্যতিরেক।

উ.। 'বিচিত্রা'র অলংকার-ভাগ দ্রষ্টব্য।

প্র.। (অথবা) যে-কোনো দুইটির অলংকার নির্ণয় কর :
(ক) সশব্দ নড়েণ শূন্য শরিলা সংবরে।
(খ) [illegible]
এ যে [illegible]।

(গ) যখন দাঁড়াবে তুমি, সম্মুখে তোমার তখনি সে
পথকুক্কুরের মতো সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে।

(ঘ) বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে।

প্র.। (ক) শ (স)-ধ্বনি এবং যুক্তব্যঞ্জনান্ত বার-বার ব্যবহৃত হইয়া ধ্বনিমাধুর্যের সৃষ্টি করায় অনুপ্রাস অলংকার।

(খ) উপমেয় 'রত্নললাটিকা'-কেই উপমান 'বজ্রানলশিখা' বলিয়া সংশয় বা বিতর্ক উপস্থিত হওয়ায় এবং সংশয়বাচক শব্দ 'এ যে' থাকায় বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকার।

(গ) উপমেয় 'সে' উপমান 'পথকুক্কুর', সাধারণ ধর্ম 'সত্রাসে মিশিয়া যাওয়া' এবং তুলনাবাচক শব্দ 'মতো'—উপমার চারিটি অঙ্গই বর্তমান থাকায় এখানে পূর্ণোপমা অলংকার।

(ঘ) উপমান 'বিমল হেম' অপেক্ষা উপমেয় 'তনু'-র উৎকর্ষ সূচিত হওয়ায় অলংকার এখানে ব্যতিরেক।

॥ উচ্চতর মাধ্যমিক : ১৯৬২

< প্রথম পত্র >

প্র. ৭। অর্থের অঙ্গহানি না করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলির যে-কোনো পাঁচটির, নির্দেশ অনুসারে, রূপান্তর সাধন কর।

(ক) বাঙালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া (প্রচলিত গদ্য রূপ দাও)।

(খ) ইন্দ্র আশ্বাস দিলেও আমি রাজী হইলাম না (মিশ্র বাক্যে পরিণত কর)।

(গ) প্রতিভা যে দেবদত্ত শক্তি এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় ('মিথ্যা'র বদলে 'সত্য' ব্যবহার কর)।

(ঘ) প্রতিভা শিক্ষা-নিরপেক্ষ (সমাস ভাঙিয়া লিখ)।

(ঙ) নিন্দুকগুলা খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে (যৌগিক বাক্যে পরিণত কর)।

(চ) চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র শৈলের মধ্যস্থলে ধবলগিরির ন্যায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে (চলিত ভাষার রূপ দাও)।

(ছ) উচ্চনীচনির্বিচারে একত্র মিলিয়া সুচির পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম (সমাস ভাঙিয়া এবং ক্রিয়াপদে 'না' যোগ করিয়া রূপান্তরিত কর)।

(জ) খাদ্যে ভেজাল দেওয়াই সবচেয়ে জাতীয়তাবিরোধী অপকর্ম (নেতি-বাচক ক্রিয়া যোগ দিয়া রূপান্তরিত কর)।

(ঝ) শৃঙ্খলাকে তাহারা শৃঙ্খল বলিয়া মনে করে না ('শৃঙ্খলা' শব্দটিকে কর্তৃপদে ব্যবহার কর—ক্রিয়াপদের পরিবর্তনে)।

(ঞ) গীতায় যাহাকে লোকসংগ্রহ বলা হইয়াছে (বাচ্যান্তরিত কর)।

উ.। (ক) বাঙালীর হৃদয়ামৃত মন্থন করিয়া নিমাই কায়া ধারণ করিয়াছেন।

(খ) যদিও ইন্দ্র আশ্বাস দিল তথাপি আমি রাজী হইলাম না।

(গ) প্রতিভা যে দেবদত্ত শক্তি এ কথা অনেকাংশে সত্য।

(ঘ) প্রতিভা কি শিক্ষার অপেক্ষা রাখে না?

(ঙ) নিন্দুকগুলা খাইতে পায় না, তাই, মন্দ কথা বলে।

(চ) চারপাশের ছোট ছোট পাহাড়ের মাঝখানে ধবলগিরির মতো বিদ্যাসাগরের মূর্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে।

(ছ) উচ্চনীচ বিচার না করিয়া একত্র মিলিয়া লুচির পাত্রটাকে ছাড়া আর কিছু বাকি রাখিতাম না।

(জ) খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার চেয়ে নিকৃষ্ট জাতীয়তাবিরোধী অপকর্ম আর নাই।

(ঝ) শৃঙ্খলা তাহাদের কাছে শৃঙ্খল বলিয়া মনে হয় না।

(ঞ) গীতায় (শ্রীকৃষ্ণ) যাহাকে লোকসংগ্রহ বলিয়াছেন।

প্র. ৮। স্থূলাক্ষর পদগুলির পাঁচটির সম্বন্ধে ব্যাকরণমূলক টীকা লিখ:

(ক) উত্তেজনা **অন্তঃশীলা** হইয়া বহিতে থাকে।

(খ) **মন্বন্তরে** মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি

(গ) তিমির-রাত্রি **সান্ত্রীরা সাবধান্**।

(ঘ) মাসমধ্যে মার্গশীর্ষ আপনি **ভগবান্**।

(ঙ) শত হাতে সহি **পরখের** ছল।

(চ) দস্যু রত্নাকর **ভাবরত্নাকর** বাল্মীকি।

(ছ) **লেঠেলদের** কথাই ঠিক।

(জ) আর **চিত্তোরমুখো** হয়ো না।

(ঝ) আমি শুধু এদের মার **ঠেকেয়েছি**।

(ঞ) স্বাধীনতা হইবে **শারদভ্রচ্ছায়া**।

উ.। (ক) অন্তঃশীলা: অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে সলিল যাহার (বহুব্রীহি)—'অন্তঃসলিলা'। 'শীল' এবং 'সলিল' একার্থক নয় বলিয়া অর্থে 'অন্তঃশীলা'-র প্রয়োগ অশুদ্ধ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বহুস্থলে এই অশুদ্ধ প্রয়োগই করিয়াছেন।

(খ) মন্বন্তরে: মনু+অন্তর=মন্বন্তর। মূলে কথাটি 'দুই মনুর শাসনকালের মধ্যবর্তী অরাজক সময়'-কে বুঝাইলেও বাঙ্লায় দুর্ভিক্ষ বুঝায়।

(গ) সান্ত্রীরা: ইংরেজী Sentry>সান্ত্রী। বিদেশী শব্দ।

সাবধান: অবধানের সহিত বর্তমান (বহুব্রীহি)—সাবধান (বিশেষণ) কিন্তু বাঙ্লায় শব্দটি প্রায়শ অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) ভগবান্ : ভগ + মতুপ্ = ভগবান্। 'ভগ' শব্দটি অবর্ণান্ত বলিয়া মতুপ্-এর ম-স্থলে ব হইয়াছে। বিধেয় বিশেষণের উদাহরণ।

(ঙ) পরখের : পরীক্ষা > পরখ। অর্ধতৎসম শব্দ।

(চ) ভাবরত্নাকর : ভাবরূপ রত্ন (রূপক কর্মধারয়); তাহার আকর (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)।

(ছ) লেঠেলদের : লাঠি + আল্ = লাঠিয়াল > লেঠেল। অভিশ্রুতির উদাহরণ।

(জ) চিতোরমুখো : চিতোর অর্থাৎ চিতোরের দিকে মুখ যাহার (ব্যধিকরণ বহুব্রীহি)। 'ও' সমাসান্ত প্রত্যয়।

(ঝ) ঠেকিয়েছি : ঠেক্ + আ + ইয়াছি = ঠেকাইয়াছি > ঠেকিয়েছি। প্রেরণার্থক ক্রিয়া।

(ঞ) শারদাভ্রচ্ছায়া : শরৎকালীন অভ্র (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহার ছায়া (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)।

প্র. ৯। নিম্নোক্ত শব্দগুলির পাঁচটিকে স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর :

প্রতীয়মান, কিংবদন্তী, আপোসে, অর্বাচীন, দুরারোহ, ইয়ত্তা, নিয়ন্ত্রিত, আষ্টেপৃষ্ঠে, পাশ্চাত্ত্য, হানাহানি।

উ.। প্রতীয়মান : পৃথিবী হইতে চন্দ্র রূপার থালার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

কিংবদন্তী : কিংবদন্তী আছে যে, এই প্রকাণ্ড দীঘি এক বিস্মৃত জমিদারের কীর্তি।

আপোসে : আমাদের ঝগড়া আমরাই আপোসে মিটিয়ে নেব।

অর্বাচীন : আজকালকার অর্বাচনীরা প্রবীণদের সঙ্গে মুখেমুখে তর্ক করে।

দুরারোহ : তেনজিং দুরারোহ এভারেস্টে উঠিয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

ইয়ত্তা : দাঙ্গায় কত লোক যে মরিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

নিয়ন্ত্রিত : বন্যার জল নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে উহার দ্বারা কৃষির অনেক সুবিধা হইতে পারে।

আষ্টেপৃষ্ঠে : ডাকাতেরা রাজাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া লইয়া গেল।

পাশ্চাত্ত্য : পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আদর্শ ভোগ, প্রাচ্যের আদর্শ ত্যাগ।

হানাহানি : ছোটখাট ব্যাপার লইয়া তাহাদের মধ্যে হানাহানি লাগিয়াই আছে।

১০। (ক) নিম্নোক্ত অংশকে সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :

পরদিনের লড়াইয়ে বিদ্রোহীদের পৃথ্বীরাজ হারিয়ে দিলেন। সুরজমল সারংদেবকে নিয়ে পালিয়ে চললেন। পৃথ্বীরাজও তাঁদের পিছনে তাড়িয়ে চললেন— একটার পর একটা পরগণা বিদ্রোহীদের হাত থেকে আবার জয় করতে করতে। শেষে সুরজমলের একটু দাঁড়াবারও ঠাঁই রইল না। তাঁর কলঙ্কের জীবন এমনি করেই কাটল।

উ.। তাহার পরদিরসের যুদ্ধে বিদ্রোহীদিগকে পৃথ্বীরাজ পরাস্ত করিলেন। সুরজমল সারংদেবকে লইয়া পলাইয়া চলিলেন। পৃথ্বীরাজও তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন—একটির পর একটি পরগণা বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে জয় করিতে করিতে। অবশেষে সুরজমলের একটু দাঁড়াইবারও স্থান রহিল না। তাঁহার অদৃষ্টের লিখন এইরূপেই ফলিল।

প্র.। (অথবা) নিম্নলিখিত প্রত্যক্ষ উক্তিগুলিকে পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তরিত কর :

ইন্দ্র বলিল—'তুই ক্ষেপেছিস শ্রীকান্ত? তোর দোষ কী? তুই কেন যাবি?'

আমি (শ্রীকান্ত) বলিলাম, 'তোমারই বা দোষ কী ইন্দ্র! তুমিই বা কেন যাবে?'

ইন্দ্র কহিল—'আমারও দোষ নেই, ভাই, আমি নতুন-দাকে আনতে চাইনি। একলা ফিরে যেতেও পারব না, আমাকে যেতেই হবে।'

উ.। ইন্দ্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, আমি ক্ষেপিয়াছি কিনা, আমার কোনো দোষ আছে কিনা এবং আমি কেন যাইব।

আমি (শ্রীকান্ত) তাহাকে পাল্টা প্রশ্ন করিয়া জানিতে চাহিলাম, তাহারই বা কী দোষ এবং সে-ই বা কেন যাইবে।

ইন্দ্র কহিল যে, তাহারও দোষ নাই, সে নতুন-দাকে আনিতে চাহে নাই। কিন্তু সে একলা ফিরিয়া যাইতেও পারিবে না, তাহাকে যাইতেই হইবে।

(খ) নিম্নলিখিত বাক্যগুলির উদ্ধৃতিতে যে অশুদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা সংশোধন কর :

(১) খাদ্য গলাধকরণ করাই প্রাণীদেহের পক্ষে পরম প্রাপ্তি নয়।

(২) গণতন্ত্রশাসনে রাজার এদানীন্তন অনুকল্প সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যই এই শাশ্বতী ভাগবতী উক্তি প্রযুজ্য।

(৩) আবাল্য হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্যতা।

(৪) সযত্নপূর্বক অধ্যয়ন না করিলে পর্যাপ্ত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

উ.। (১) খাদ্য গলাধঃকরণ করাই প্রাণিদেহের পক্ষে পরম প্রাপ্তি নয়।

(২) গণতন্ত্রশাসনে রাজার ইদানীন্তন অনুকল্প সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যেই এই শাশ্বতী ভাগবতী উক্তি প্রযোজ্য।

(৩) আবাল্য (বা, বাল্য হইতেই) নদীর সহিত আমার সখ্য।

(৪) যত্নপূর্বক (বা সযত্নে) অধ্যয়ন না করিলে পর্যাপ্ত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

প্র.। (অথবা) নিম্নোলিখিত উদ্ধৃতিতে [illegible] পদগুলি বসাও :

বঙ্গদর্শনে— এবং [illegible] —বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে [illegible] তাহা—। [illegible] হইতে যাহারা [illegible] শিখমাত্র [illegible] [illegible] জানেন [illegible]

শৈলসম্রাটের—তুষারকিরীট চতুর্দিকের—গিরিপরিপরিবৃন্দবর্গে—ঊর্ধ্বে—হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের—বঙ্গসাহিত্যে সেইরূপ—অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে।

উ.। University Bengali Selection-এ রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

< দ্বিতীয় পত্র >

প্র. ১। (ক) কর্তৃবাচ্যে একটি বাক্য রচনা করিয়া উহাকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত কর এবং এই বাক্যদ্বয়ের সাহায্যে কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। ভাববাচ্যের প্রয়োগটিও উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও।

উ.। শিশু চাঁদ দেখিতেছে (কর্তৃবাচ্য: কর্তা 'শিশু' প্রথমান্ত, কর্ম 'চাঁদ' দ্বিতীয়ান্ত এবং দেখ + ইতেছে = 'দেখিতেছে' ক্রিয়াটি (কর্তৃপদের অনুগামী)।

শিশুর দ্বারা চাঁদ দেখা হইতেছে [কর্মবাচ্য: কর্তা 'শিশুর দ্বারা' তৃতীয়ান্ত, কর্ম 'চাঁদ' প্রথমান্ত এবং ক্রিয়া (দেখ্ + আ) + (হ + ইতেছে) 'দেখা হইতেছে, কর্মপদের অনুগামী]।

যে-বাচ্যে কর্মপদ থাকে না এবং ক্রিয়ার অর্থটিই প্রধান, তাহাকে ভাববাচ্য বলে। ভাববাচ্যের কর্তা সাধারণত তৃতীয়ান্ত বা ষষ্ঠ্যন্ত হয় এবং ক্রিয়াপদটি 'হ' প্রভৃতি ধাতুযুক্ত হইয়া প্রথম পুরুষের হয়; যথা—

মহাশয় থাকেন কোথায়? (কর্তৃবাচ্য)—মহাশয়ের থাকা হয় কোথায়? (ভাববাচ্য)।

প্র.। (অথবা) সরল ও জটিল বাক্য-সংবলিত একটি যৌগিক বাক্য রচনা করিয়া তাহার অন্তর্গত সরল ও জটিল বাক্যের অংশগুলি দেখাইয়া দাও। এই ত্রিবিধ বাক্যের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

উ.। আমি তাহার আসা মোটেই পছন্দ করিতাম না, কিন্তু যখনই সুযোগ পাইত তখনই সে আসিয়া উপস্থিত হইত।

—উপরের বাক্যটি সরল ও জটিল বাক্য-সংবলিত যৌগিক। ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়:

(ক) আমি তাহার আসা মোটেই পছন্দ করিতাম না (সরলবাক্য)।

(খ) যখনই সুযোগ পাইত তখনই সে আসিয়া উপস্থিত হইত (জটিল বাক্য)।

একটি সরল বাক্য এবং একটি জটিল বাক্য সংযোজক অব্যয় 'কিন্তু'-র দ্বারা যুক্ত হইয়া একটি যৌগিক বাক্য গঠন করিয়াছে।

সরল বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য এবং একটিমাত্র বিধেয় থাকে; জটিল বাক্যে একটি প্রধান উপবাক্য এবং তাহার উপর নির্ভরশীল এক বা একাধিক অপ্রধান উপবাক্য থাকে।

যৌগিক বাক্যে একাধিক স্বাধীন সরল বা জটিল বাক্য সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা বা বিনা-অব্যয়েই সংযুক্ত থাকে।

(খ) যে কোনো **চারিটির** সন্ধিবিচ্ছেদ কর :

উদ্ধৃত ; নিরস্ত ; গোষ্পদ ; পুরোহিত , প্রাতরাশ ; স্বস্তি ; রাজর্ষি।

উ। উদ্ধৃত—উৎ + হৃত (বা, ধৃত)। নিরস্ত—নিচ্ + অস্ত।
গোষ্পদ—গো + পদ। পুরোহিত—পুরঃ + হিত।
প্রাতরাশ—প্রাতঃ + আশ। স্বস্তি—সু + অস্তি।
রাজর্ষি—রাজা + ঋষি।

প্র. ২। উদাহরণ-সহকারে যে কোনো **পাঁচটির** ব্যাখ্যা কর :

যৌগিক ক্রিয়া ; অর্ধতৎসম শব্দ ; বিপকর্ষ ; বিধেয় বিশেষণ ; ঘটমান অতীত ; প্রযোজ্য কর্তা ; ঘোষবর্ণ ; বিভক্তিশূন্য অধিকরণ কারকের পদ।

উ.। যৌগিক ক্রিয়া : যে-ক্রিয়ার পূর্বাঙ্গ ইয়া বা ইতে-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া এবং উত্তরাঙ্গ ফেল্, থাক্, নে, লাগ্, পড্ প্রভৃতি ধাতুজাত ক্রিয়া, তাহার নাম যৌগিক ক্রিয়া ; যথা—দুধটুকু **খাইয়া ফেল**।

অর্ধতৎসম শব্দ : সংস্কৃত হইতে সরাসরি বাঙ্লায় আসিয়া যে-শব্দ বাঙ্লার উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের ফলে কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, উহার নাম অর্ধতৎসম শব্দ ; যথা—কেষ্ট (<কৃষ্ণ), বেস্পতি (<বৃহস্পতি), বদ্যি (<বৈদ্য), ইত্যাদি।

বিপ্রকর্ষ : উচ্চারণ সহজ করিবার জন্য স্বরবর্ণের সাহায্যে সংযুক্তবর্ণের বর্ণগুলিকে পৃথক করিয়া দেওয়ার রীতিকে বলে বিপ্রকর্ষ ; যথা—

ভক্তি >ভকতি ; মুক্ত >মুকুতা ; বর্ষণ >বরিষণ, ইত্যাদি।

বিধেয় বিশেষণ : উদ্দেশ্যের বিশেষণ যদি উদ্দেশ্যাংশে না বসিয়া বিধেয়াংশে বসে, তবে তাহাকে বিধেয় বিশেষণ বলে ; যথা—ছেলেটি বড় **শান্ত**।

ঘটমান অতীত : যে-ক্রিয়া অতীতে আরম্ভ হইয়া চলিতেছিল, তাহার কালকে ঘটমান অতীত বলে ; যথা—বাহিরে তখন মুসলধারে বৃষ্টি **পড়িতেছিল**।

প্রযোজ্য কর্তা : অপরের প্রেরণা বা প্রবর্তনায় যে কাজ করে, তাহাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে ; যথা—প্রভু ভৃত্যকে দিয়া পা টিপাইতেছেন।—এখানে 'ভৃত্য' প্রযোজ্য কর্তা।

ঘোষবর্ণ : যে-বর্ণের উচ্চারণে ধ্বনির গাম্ভীর্য থাকে এবং গলমধ্যস্থ স্বরতন্ত্রীর কম্পনের ফলে শ্বাসবায়ু কম্পিত হয়, তাহার নাম ঘোষবর্ণ। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণগুলি অর্থাৎ গ ঘ ঙ, জ ঝ ঞ, ইত্যাদি এই প্রকারের বর্ণ।

বিভক্তিশূন্য অধিকরণ কারকের পদ : কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিকরণ কারকে বিভক্তিচিহ্ন লুপ্ত বা অদৃশ্য থাকে ; যথা—

তিনি রবিবার—(=রবিবারে) বাড়ী (=বাড়ীতে) থাকেন।

প্র.। (অথবা) নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলির যে-কোনো পাঁচটি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, তাহা কারণ দেখাইয়া বল :

সর্ব সত্ত্ব সংরক্ষিত, প্রাক্-রবীন্দ্র ; ১৯৫৪ সালের ষষ্ঠদশ আইনানুসারে ; গুণীগণ ; তড়িতাহত ; শিরোশোভা ; গায়কী ; বক্ষদেশ।

উ.। সর্ব সত্ত্ব সংরক্ষিত : সত্ত্ব (সৎ+ত্ব)—বিদ্যমানতা। কথাটির 'অধিকার' অর্থ হইতে পারে না। অধিকার বুঝাইতে শুদ্ধ শব্দ স্ব+ত্ব=স্বত্ব।

প্রাক্-রবীন্দ্র : বর্গের ১ম বর্ণ+য র ল ব হ=১ম বর্ণ স্থানে ৩য় বর্ণ। এখানে র পরে থাকায় সন্ধির নিয়মে ক্ স্থানে গ্ হইবে।

১৯৫৪ সালের ষষ্ঠদশ আইনানুসারে : ষোড়শন্+অ=পূরণবাচক 'ষোড়শ' ('ষষ্ঠদশ' নয়)। ইহা ছাড়া, 'আইন' এবং 'অনুসারে'—একটি তৎসম এবং একটি অতৎসম বলিয়া উহাদের মধ্যে সন্ধি হওয়া উচিত নয়।

গুণীগণ : অন্যশব্দের সহিত সমাসে এবং প্রত্যয়যোগে ন্-ভাগান্ত শব্দের ন্-অংশের লোপ হয়। গুণিন্+গণ=গুণিগণ (শুদ্ধ)।

তড়িতাহত : বর্গের ১ম বর্ণ+স্বর=১ম বর্ণ স্থানে ৩য় বর্ণ। তড়িৎ+আহত =তড়িদ্+আহত=তড়িদাহত (শুদ্ধরূপ)।

শিরোশোভা : অঃ+বর্গের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম বর্ণ বা য র ল ব হ=অঃ স্থানে ও। এখানে পরবর্তী বর্ণটি শ বলিয়া শিরঃ+শোভা='শিরোশোভা' হইতে পারে না।

গায়কী : অক-ভাগান্ত অধিকাংশ পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আ হয় এবং অক স্থানে ইক হয়। শুদ্ধরূপ—গায়িকা।

বক্ষদেশ : অঃ+বর্গের ৩য় বর্ণ=অঃ স্থানে ও। বক্ষঃ+দেশ=বক্ষোদেশ (শুদ্ধরূপ)।

প্র. ৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে কোনো পাঁচটি শব্দ নির্বাচন করিয়া বিশেষ্যক্ষেত্রে বিশেষণ এবং বিশেষণক্ষেত্রে বিশেষ্য পদ গঠন কর।

নিরস্ত ; ক্ষীণ ; উদ্বেগ ; ভাত ; মহৎ ; গুরু ; গাঁ ; বিচিত্র।

উ.। নিরস্ত (বিশেষণ)—নিরসন (বিশেষ্য)।
ক্ষীণ (")—ক্ষয় (")।
উদ্বেগ—(বিশেষ্য) উদ্বিগ্ন (বিশেষণ)।
ভাত (")—ভেতো (")।
মহৎ—(বিশেষণ)—মহত্ত্ব, মহিমা (বিশেষ্য)
গুরু (")—গুরুত্ব, গুরুতা (বিশেষ্য)।
গাঁ (বিশেষ্য)—গেঁয়ো (বিশেষণ)।
বিচিত্র (বিশেষণ)—বৈচিত্র্য (বিশেষ্য)।

(অথবা) 'শীত' এবং 'গুরু' এই দুইটি শব্দকে বিশেষ্য ও বিশেষণ-রূপে ব্যবহার করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বাক্য রচনা কর। 'শীত' শব্দের ব্যুৎপত্তি কী?

উ.। গীত : এটি একটি ভক্তিমূলক গীত (বিশেষ্য)।
সভায় রবীন্দ্রনাথের একখানি গান গীত হইল (বিশেষণ)।
গুরু : সাধক রামদাস ছিলেন শিবাজীর গুরু (বিশেষ্য)।
মধ্যযুগে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দেওয়া হইত (বিশেষণ)।

গীত : [গৈ (গান করা) + ক্ত (ভা)] বি, স্বর-তাল-লয়যুক্ত কণ্ঠধ্বনি অর্থাৎ গান, সংগীত।

প্র. ৪। মুখ ও চন্দ্র, এই দুইয়ের সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়া এমন দুইটি বাক্য প্রয়োগ কর যাহা ক্রমান্বয়ে উপমা ও রূপক অলংকারের উদাহরণ হইবে।

উ.। (ক) সন্তানের মুখচন্দ্র চুম্বিলেন মাতা (উপমা অলংকার : 'মুখ' উপমেয়, 'চন্দ্র' উপমান ; সাধারণ ধর্ম এবং তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত)।

(খ) দয়িতার মুখচন্দ্র দূর করে হৃদয়-তিমির (রূপক-অলংকার : 'মুখ' উপমেয়, 'চন্দ্র' উপমান ; উভয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে অর্থাৎ মুখই চন্দ্র হইয়া গিয়াছে)।

প্র.। (অথবা) যে-কোনো দুইটির অলংকার ব্যাখ্যা কর :
(ক) চরণারবিন্দ শোভে।
(খ) দুই চক্ষু জিনি নাট্য।
(গ) বাজে পুরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ।
(ঘ) তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্রসঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর-তীর্থ-দরশনে।
(ঙ) আঁধার সন্ধ্যা কাঁপিছে কাহার ভয়ে।

উ। (ক) উপমেয় 'চরণ' এবং উপমান 'অরবিন্দ' ; সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত। অতএব অলংকার এখানে লুপ্তোপমা।

(খ) উপমান 'নাট্য' অপেক্ষা উপমেয় 'চক্ষু'-র উৎকর্ষ দেখানো হইয়াছে বলিয়া ব্যতিরেক অলংকার।

(গ) 'পুরবী' এবং 'রবি' শব্দ একেবারই ব্যবহৃত হইয়া একাধিক অর্থ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া শ্লেষ অলংকার : পুরবী—(১) সংগীতের রাগিণীবিশেষ ; (২) রবীন্দ্রনাথের একখানি কাব্যগ্রন্থ। রবি—(১) সূর্য ; (২) রবীন্দ্রনাথ।

অথবা, 'রাগিণীর বীণ'—রাগিণীরূপ বীণ [বীণা]—রূপক অলংকার। এই দ্বিতীয় অলংকারটি গ্রহণ করাই ভালো।

(ঘ) 'দাস' উপমেয়, 'দীন' উপমান, সাধারণ ধর্ম মহত্তের আনুগামিত্ব, তুলনাবাচক শব্দ 'যথা'। উপমার চারিটি অঙ্গই বর্তমান থাকায় অলংকার এখানে পূর্ণোপমা।

(ঙ) অচেতন উপমেয় 'সন্ধ্যা'-র চেতন অথচ অনুল্লিখিত উপমানের ব্যবহার (ভয়ে কাঁপা) আরোপিত হওয়ায়

॥ উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেণ্টাল ঃ ১৯৬২ ॥

< প্রথম পত্র >

প্র. ৭। অর্থের অঙ্গহানি না করিয়া, নির্দেশ অনুসারে, নিম্নলিখিত যে-কোনো পাঁচটির বাক্যের রূপান্তর সাধন কর :

(ক) সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, হেলিয়া ভাঙিয়া দুলিয়া, গলিয়া উছলিয়া উঠিতেছে (ক্রিয়াপদগুলিকে চলিত ভাষার ক্রিয়াপদে পরিণত কর)।

(খ) কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে আর বলা হইল না (বাচ্যান্তরিত কর)।

(গ) সকল প্রকার উন্নতিই পরিশ্রমসাপেক্ষ (ক্রিয়াপদের দ্বারা শেষ পদটির অর্থ প্রকাশ কর)।

(ঘ) ইহাতেই বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অসাধারণত্ব অনুভব করি (কর্মবাচ্যের মিশ্র বাক্যে পরিণত কর)।

(ঙ) যেখানে গভীরভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাস্যের চপলতা পরিহার করা হইত (সরল বাক্যে পরিণত কর)।

(চ) ভেদবুদ্ধি বিদূরিত না হইলে জাতীয় সংহতির আশা নাই ('না' ও 'নাই' বাদ দিয়া মিশ্রবাক্যে পরিণত কর)।

(ছ) যাহাতে সমাজের হিত হয় এমন কাজে বিরোধীদলের সঙ্গে সহযোগিতা বাঞ্ছনীয় (সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করিয়া সরল বাক্যে পরিণত কর)।

(জ) দুর্গত জনগণের সেবায় মানের হানি হয় তাহা তিনি মনে করিতেন না (দুইটি সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার কর)।

(ঝ) পৃথ্বীরাজ খুড়োকে খাটিয়ায় শুইয়ে দিয়ে বললেন—'ভয় নেই, কেমন আছ তাই জানতে এলাম।' (পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তিত কর)।

উ। (ক) সুন্দরীর লাবণ্যের মতো হেসে হেসে, ভেসে ভেসে, হেলে ভেঙে দুলে, গ'লে উছ্‌লে উঠ্‌ছে।

(খ) কমলাকান্ত মনের কথা এ জন্মে আর বলিতে পারিল না।

(গ) সকলপ্রকার উন্নতিই পরিশ্রমের অপেক্ষা রাখে।

(ঘ) ইহাতেই বিদ্যাসাগরের চরিত্র যে অসাধারণ তাহা অনুভূত হয়।

(ঙ) গভীর ভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনার স্থানে হাস্যের চপলতা পরিহার করা হইত।

(চ) ভেদবুদ্ধি যতদিন বর্তমান থাকিবে ততদিন জাতীয় সংহতির আশা দুরাশামাত্র।

(ছ) সমাজহিতকর কাজে বিরোধীদলের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়।

(জ) দুর্গতজনসেবায় মানহানি হয় তাহা তিনি মনে করিতেন ন

(ঝ) পৃথ্বীরাজ খুড়োকে খাটিয়ায় শুইয়ে দিয়ে অভয় দিয়ে বললেন যে, তিনি (খুড়ো) কেমন আছেন তাই তিনি (পৃথ্বীরাজ) জানতে এলেন।

প্র. ৮। নিম্নলিখিত পদগুলির পাঁচটিকে স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর :

(ক) আছন্ত। (খ) উপর্যুপরি। (গ) পুরুষকার। (ঘ) উপলক্ষ মাত্র। (ঙ) খবরদারি। (চ) বেমালুম। (ছ) নজরবন্দী। (জ) রিক্তহস্তে। (ঝ) চরিতার্থ।

উ। (ক) আছন্ত : গ্রন্থখানি আমি আছন্ত পাঠ করিয়াছি।

(খ) উপর্যুপরি : উপর্যুপরি দুই সন অজন্মা হওয়ায় কৃষকের ঘরে খাবার ছিল না।

(গ) পুরুষকার : পুরুষকার বিনা দৈবও সর্বত্র ফলে না।

(ঘ) উপলক্ষমাত্র : খাওয়াটাই আসল কথা—মাইনে-বৃদ্ধি তো উপলক্ষমাত্র।

(ঙ) খবরদারি : কাজের বাড়ীতে এক শ্রেণীর লোক থাকে যারা সব সময় খবরদারিই করে।

(চ) বেমালুম : কাটা জিভ বেমালুম জোড়া লেগে গেল দেখে দর্শকেরা হাততালি দিয়ে উঠল।

(ছ) নজরবন্দী : বাঙ্‌লাদেশের অনেক যুবককেই এককালে পুলিশের নজরবন্দী হয়ে থাকতে হয়েছে।

(জ) রিক্তহস্তে : বড আশা করিয়া বাল্যবন্ধুর নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু ফিরিতে হইল রিক্তহস্তে।

(ঝ) চরিতার্থ : সকলের সব খেয়ালই কি চরিতার্থ হয় ?

প্র. ৯। স্থূলাক্ষর শব্দগুলির পাঁচটির সম্বন্ধে ব্যাকরণমূলক টীকা লিখ :

(ক) দুই ভাই ব্রজে প্রেমাবেশে মজি **বিভোর** আছেন সুখে।

(খ) সেই কাব্যে **বয়সোচিত** উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও…।

(গ) অভ্যাস দ্বারা তাহাতে **পারদর্শী** হওয়া যায়।

(ঘ) **জীবন-উদ্যানে** তোর যৌবনকুসুমভাতি কতদিন রবে ?

(ঙ) **কাণ্ডারী**! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি-পণ।

(চ) গিরিসকংট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু **গরজায়** বাজ।

(ছ) কানাকড়ি নিয়ে কত **টানাটানি**।

(জ) আমার **আজন্মপরিচিত** বাৎসল্যের বাসমন্দির সহসা শূন্যে পরিণত হইল

উ। (ক) বিভোর : বিশেষরূপে ভোর বা তন্ময় (বাঙ্‌লা প্রাদি-তৎপুরুষ সমাস)

(খ) বয়সোচিত : বয়ঃ + উচিত = (বিসর্গসন্ধির নিয়মে) বয় উচিত। [illegible] হইলেও 'বয়সোচিত' বাঙ্‌লায় বহুপ্রচলিত।

(গ) পারদর্শী : পার দর্শন করেন যিনি (উপপদ তৎপুরুষ সমাস

(ঘ) জীবন-উদ্যানে : জীবনরূপ উদ্যান (রূপক কর্মধারয়), তাহাতে : [illegible] অনুরোধে সমাস সত্ত্বেও সন্ধি করা হয় নাই।

(ঙ) কাণ্ডারী : কাণ্ডার + ঈ ('নিযুক্ত' অর্থে তদ্ধিত)। সম্বোধনপদ।

(চ) গরজায় : গরজ (< গর্জ) + আ = গরজা ; গরজা + এ = গরজায় ৷ বিপ্রকর্ষমূলক নামধাতুজাত ক্রিয়ার উদাহরণ।

(ছ) টানাটানি : পরস্পর টানা যেখানে (ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস)।

(জ) আজন্মপরিচিত : জন্ম হইতে = আজন্ম : আজন্ম পরিচিত (সুপ্ সুপা সমাস)।

প্র. ১০। (ক) অনুক্তপদের শূন্যস্থানগুলি বিশেষণপদের দ্বারা পূরণ কর :

—দিকে—পর্বতশ্রেণী - সেই পর্বতের পাদমূল হইতে—ভূভাগ পর্যন্ত—উন্নত বৃক্ষ—পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। —জলধারা—গতিতে— উপত্যকার—হইতেছে।

উ। পাঠসংকলনে জগদীশচন্দ্র বসুর 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

প্র। (অথবা) নিম্নলিখিত পদ্যাংশকে পরিচ্ছন্ন গদ্যভাষায় রূপান্তরিত কর :—

"সেই পরাজিত তিরস্কৃত সুরসেনা
আবার আসিয়া দম্ভে পশিল সংগ্রামে ;
না পারি জিনিতে তায় সুজিষ্ণু হইয়া
রে ভীরু দানবগণ ! নামে কলঙ্কিলা।
আপনি যাইব, অদ্য পশিব সমরে ;
ঘুচাইব অমরের সমরের সাধ।'—
বলিয়া গর্জিলা বীর বৃত্র দৈত্যপতি,
ধরিলা শিবের শূল সিংহের বিক্রমে।

উ। সেই পরাজিত তিরস্কৃত সুরসেনা আবার আসিয়া দম্ভে সংগ্রামে প্রবেশ করিল। 'রে ভীরু দানবগণ ! সুজিষ্ণু হইয়াও তাহাকে জয় করিতে না পারিয়া নামকেই কলঙ্কিত করিলি। অদ্য আপনি যাইব, সমরে প্রবেশ করিব ; অমরের সমরের সাধ ঘুচাইব।'—বলিয়া দৈত্যপতি বীর বৃত্র গর্জন করিল, সিংহের বিক্রমে শিবের শূল ধরিল (ধারণ করিল)।

(খ) সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :

ঈশ্বর বললে—ছেলেবেলায় এরা সব খেলা শিখত। আমিও খেলার লোভে এদের দলে জুটে গিয়েছিলুম। আমার বয়স তখন বছর কুড়িক, সব খেলাতেই আমিই হয়ে উঠলুম সকলের সেরা। এরা ভাবলে আমি কোনো মন্তর শিখেছি—তারই গুণে সকলকে হটিয়ে দিই। হজুর, আমি মন্তর-তন্তর কিছুই জানিনে। তবে আমার যা ছিল তা এদের কারো ছিল না। সে জিনিস হচ্ছে চোখ।

উ। ঈশ্বর বলিল—বাল্যকালে ইহারা সব খেলা শিখিত। আমিও খেলার লোভে ইহাদের দলে যোগ দিয়াছিলাম। আমার বয়স তখন প্রায় কুড়ি বৎসর, সকল খেলাতেই আমিই হইয়া উঠিলাম সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহারা ভাবিল আমি কোনো মন্ত্র শিখিয়াছি—তাহারই গুণে সকলকে পরাস্ত করি। মহাশয়, মন্ত্র-তন্ত্র আমি কিছুই জানি না। তবে আমার যাহা ছিল তাহা ইহাদের কাহারও ছিল না। সে বস্তু হইতেছে চক্ষু।

প্র। (অথবা) নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশের ভুলভ্রান্তিগুলি সংশোধন কর :

রঙ্গময়ী কল্পনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, জ্ঞানহীন দস্যু রত্নাকর ব্রহ্মের বরে ভাব-রত্নাকর বাল্মিকী। এই বিশ্বাসের বলে জনশ্রুতি প্রচার করেছেন যে, শকুন্তলা-প্রণয়িতা মহামুক্ষু ছিলেন, পরে স্বরস্বতীর প্রসাদে সর্ববিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত চুরামনি হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

উ। রঙ্গময়ী কল্পনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে জ্ঞানহীন দস্যুরত্নাকর ব্রহ্মার বরে ভাবরত্নাকর বাল্মীকি। এই বিশ্বাসের বলে জনশ্রুতি প্রচার করিয়াছেন যে, শকুন্তলা-প্রণেতা কালিদাস মহামূর্খ ছিলেন পরে সরস্বতীর প্রসাদে সর্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতচূড়ামণি হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

< দ্বিতীয় পত্র >

প্র. ১। (ক) প্রকৃতি, প্রত্যয় ও উপসর্গ কাহাকে বলে? উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও।

উ। যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টির দ্বারা জাতি, দ্রব্য, গুণ, ভাব বা কার্য বুঝা যায়, অথবা যাহার সহিত বিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদ বা প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠিত হইতে পারে, তাহাকে প্রকৃতি বলে; যথা—

'জল' একটি দ্রব্যবাচক প্রকৃতি (নাম-প্রকৃতি); আবার, 'কর্'-ও একটি প্রকৃতি (ধাতু-প্রকৃতি), কারণ, কর্ + ইতেছে (বিভক্তি) = করিতেছে (ক্রিয়াপদ)।

যে-বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি নামপ্রকৃতি বা ধাতুপ্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া শব্দের সৃষ্টি করে, তাহাকে প্রত্যয় বলে; যথা—

তাঁত (নামপ্রকৃতি) + ঈ = তাঁতী; হাস্ (ধাতুপ্রকৃতি) + ই = হাসি। এই দুইটি ক্ষেত্রে 'ঈ' এবং 'ই' প্রত্যয়।

প্র, পরা প্রভৃতি যে-সকল অব্যয় ধাতুর পূর্বে যুক্ত হইয়া ধাতুর অর্থকে পরিবর্তিত করে অথবা বিশিষ্টতা দান করে, তাহাদের নাম উপসর্গ; যথা—

সম্ (সংহার), প্র (প্রনষ্ট), অনু (অনুনয়), ইত্যাদি।

প্র। (অথবা) তদ্ধিত ও কৃৎ প্রত্যয়ের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও; খাঁটি বাংলা ও সংস্কৃত, উভয়বিধ কৃৎ ও তদ্ধিতের উদাহরণ দাও।

উ। উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেন্টাল, ১৯৬৭ দ্রষ্টব্য।

(খ) সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও।

উ। উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৩ দ্রষ্টব্য।

প্র। (অথবা) নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে-কোনো চারিটি হইতে চন্দ্রবিন্দু বাদ দিলে অর্থের কিরূপ ব্যতিক্রম হয় তাহা বল :

কাঁটা; বাঁধা; গাঁথা; পাঁজি; পাঁক; তাঁহার

উ।	কাঁটা—কণ্টক ;	কাটা—ছেদন করা।
	বাঁধা—বদ্ধ ;	বাধা—বিঘ্ন।
	গাঁথা—গ্রথিত করা ;	গাথা—কাহিনীমূলক কবিতা।
	পাঁজি—পঞ্জিকা ;	পাজি—বদমায়েস।
	পাঁক—কাদা ;	পাক—রান্না।

তাঁহার—সম্মানযোগ্য ব্যক্তির ; তাহার—সম্মানের অযোগ্য ব্যক্তির।

প্র। উদাহরণ-সহকারে যে-কোনো **পাঁচটি** পরিভাষার ব্যাখ্যা কর :

সমধাতুজ কর্ম ; দেশী শব্দ ; মহাপ্রাণ বর্ণ ; স্বরসংগতি ; ধ্বন্যাত্মক শব্দ ; শব্দদ্বৈত নিত্যবৃত্ত অতীত ; এবং পূরণবাচক বিশেষণ।

উ। **সমধাতুজ কর্ম :** ক্রিয়াপদ যে ধাতু হইতে উৎপন্ন তাহার কর্মটিও যদি সেই ধাতু হইতে সৃষ্ট বিশেষ্যপদ হয় তবে সেইরূপ কর্মকে সমধাতুজ কর্ম বলে ; যথা—

বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি। —এখানে কর্ম 'ঘুম' এবং ক্রিয়া 'ঘুমিয়েছি' একই 'ঘুমা' ধাতু হইতে উৎপন্ন।

দেশী শব্দ : উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেণ্টাল ১৯৬৩ দ্রষ্টব্য।

মহাপ্রাণ বর্ণ : যে-সকল বর্ণের উচ্চারণে প্রাণ বা শ্বাসের আধিক্য থাকে অর্থাৎ বেশী শ্বাসবায়ুর প্রয়োজন হয়, তাহাদের নাম মহাপ্রাণ বর্ণ। বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণগুলি অর্থাৎ খ ছ ঠ থ ফ এবং ঘ ঝ ঢ ধ ভ এই প্রকারের বর্ণ।

স্বরসংগতি : উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৪ দ্রষ্টব্য।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ : উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬৩ দ্রষ্টব্য।

শব্দদ্বৈত : উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬৪ দ্রষ্টব্য।

নিত্যবৃত্ত অতীত : অতীতকালে সর্বদা বা নিয়মিতভাবে ঘটিত—এইরূপ অর্থ বুঝাইতে যে ক্রিয়ার প্রয়োগ হয় তাহার কালকে নিত্যবৃত্ত অতীত বলে ; যথা—

গ্রামে থাকিতে প্রতিদিন নদীতীরে বেড়াইতাম।

পূরণবাচক বিশেষণ : উচ্চতর মাধ্যমিক, কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬৩ দ্রষ্টব্য।

প্র.। (অথবা) নিম্নলিখিত প্রয়োগুলির যে-কোনো **পাঁচটি** শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, কারণ বুঝাইয়া বল :

মহিমা-মণ্ডিত ; শ্রদ্ধাস্পদ ; নিরভিমানিনী ; তুম্রাবস্থা ; সশঙ্কিক ; মস্থিত ; সাবধানী ;

উ। **মহিমা-মণ্ডিত :** ন-ভাগান্ত শব্দ অন্য শব্দের সহিত সমাসবদ্ধ হইলে বা তাহার সহিত প্রত্যয় যুক্ত হইলে ন্-অংশের লোপ হয়। অতএব মহিমন্ + মণ্ডিত = মহিম + মণ্ডিত = মহিম-মণ্ডিত (শুদ্ধরূপ)।

শ্রদ্ধাস্পদ : আ + পদ = আস্পদ (সুট্ অর্থাৎ স্ আগম—নিপাতনে)। অতএব 'আস্পদ' অশুদ্ধ।

নিরভিমানিনী : বহুব্রীহি সমাসে অভীষ্ট অর্থ পাওয়া গেলে তাহার উত্তর আবার প্রত্যয়ক তদ্ধিত হয় না। নিঃ (= নাই) অভিমান যাহার = নিরভিমান (শুদ্ধ), তদ্ধিত-

যোগে 'নিরভিমানী' অশুদ্ধ। অতএব 'নিরভিমানী'-র স্ত্রীলিঙ্গ-রূপ নিরভিমানিনী-ও অশুদ্ধ।

দুরাবস্থা: র-জাত বিসর্গ + স্বর = র্ + স্বর। দুর্ + অবস্থা = দুরবস্থা, কারণ, র্ + অ = র, রা হইতে পারে না।

সশঙ্কিত: বিশেষণের সহিত 'সহ' শব্দের তুল্যযোগে বহুব্রীহি সমাস হয় না। 'শঙ্কিত' বিশেষণ বলিয়া ইহার সহিতও হইতে পারে না, করিলে তাহা অশুদ্ধ।

মন্থিত: ক্ত-প্রত্যয় যুক্ত হইলে মন্থ্, গ্রন্থ্, প্রভৃতি ধাতুর ন্ লোপ পায়। অতএব 'মন্থিত' অশুদ্ধ।

সাবধানী: বহুব্রীহি সমাসে অভীষ্ট অর্থ পাওয়া গেলে তাহার উত্তর আবার অস্ত্যর্থক তদ্ধিত হয় না। অবধানের সহিত বর্তমান = সাবধান (তুল্যযোগে বহুব্রীহি); ইহার উত্তর আবার 'ঈ' (ইন্) ভুল।

দৈন্যতা: একই অর্থবাচক একাধিক তদ্ধিত একসঙ্গে কোনো শব্দের সহিত যুক্ত হইতে পারে না। এখানে দীন + য্যঞ্ (ষ্য) + তল্ (তা)—দুইটি ভাববাচক তদ্ধিত একসঙ্গে যুক্ত হওয়ায় 'দৈন্যতা' অশুদ্ধ।

প্র. ৩। 'ভালো' এবং 'অজ্ঞান', এই দুইটি শব্দকে বিশেষ্য এবং বিশেষণরূপে ব্যবহার করিয়া পৃথক পৃথক বাক্য রচনা কর। 'অদৃষ্ট' শব্দের দুইটি অর্থ বল।

উ। ভালো: নিজের ভালো সকলেই চায়। (বিশেষ্য)
সুব্রত একটি ভালো ছেলে। (বিশেষণ)

অজ্ঞান: ভারতীয় কৃষকের দারিদ্র্যের একটি কারণ অজ্ঞান। (বিশেষ্য)
অজ্ঞান ছেলেটিকে হাসপাতালে নেওয়া হইল। (বিশেষণ)

অদৃষ্ট: (ক) ভাগ্য; (খ) যাহা দেখা হয় নাই।

প্র.। (অথবা) যে-কোনো পাঁচটির সমাস বল:

পাদপদ্ম; প্রত্যক্ষ; ঘনশ্যাম; সুপ্তোত্থিত; বিশ্বামিত্র; বেচাকেনা; অন্তেবাসী এবং অপুত্রক।

উ। পাদপদ্ম—পাদ পদ্মের ন্যায় (উপমিত কর্মধারয়)।
প্রত্যক্ষ—অক্ষির প্রতি (অব্যয়ীভাব)।
ঘনশ্যাম—ঘনের ন্যায় শ্যাম (উপমান কর্মধারয়)।
সুপ্তোত্থিত—পূর্বে সুপ্ত পরে উত্থিত (কর্মধারয়)।
বিশ্বামিত্র—বিশ্ব মিত্র যাহার (বহুব্রীহি)।
বেচাকেনা—বেচা ও কেনা (দ্বন্দ্ব)।
অন্তেবাসী—অন্তে (= গুরুগৃহে) বাস করে যে (অলুক উপপদ তৎপুরুষ)
অপুত্রক—অবিদ্যমান পুত্র যাহার (নঞ্ বহুব্রীহি)

প্র ৪। উদাহরণযোগে শ্লেষ ও যমক অলংকার বুঝাইয়া দাও।

উ। 'বিচিত্রা'-র অলংকারভাগ দ্রষ্টব্য।

প্র। (অথবা) যে-কোন দুইটির অলংকার ব্যাখ্যা কর :

(ক) শোকের ঝড় বহিল সভাতে।

(খ) কদম্ব-কেশর জিনি একটি পুলক রে।

(গ) পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগ-সম।

(ঘ) মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল—স্বামী
আমার যে-টুকু সাধ্য করিব তা আমি।

উ। (ক) উপমেয় 'শোক' এবং উপমান 'ঝড়'-এ অভেদকল্পনা হওয়ায় অর্থাৎ শোকই ঝড় হইয়া যাওয়ায় এখানে রূপক অলংকার।

(খ) উপমান 'কদম্ব-কেশর' অপেক্ষা উপমেয় 'পুলক'-এর উৎকর্ষ সূচিত হওয়ায় ব্যতিরেক অলংকার।

(গ) উহ্য 'আমি' (কবি) উপমেয়, 'কস্তুরীমৃগ' উপমান, সাধারণ ধর্ম 'পাগল হইয়া ফিরা', তুলনাবাচক শব্দ সম—চারিটি অঙ্গই বর্তমান থাকায় পূর্ণোপমা অলংকার।

(ঘ) অচেতন উপমেয় 'মাটির প্রদীপ'-এ চেতন অথচ অনুক্ত উপমানের (মানুষের) ব্যবহার ('কহিল') আরোপিত হওয়ায় সমাসোক্তি অলংকার।

॥ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৩ ॥

<প্রথম পত্র>

প্র. ৭। যে-কোন তিনটির উত্তর দাও :

(ক) যে-কোনো পাঁচটির প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ কর :

(i) প্রবাহ। (ii) ফণী। (iii) জিজ্ঞাসা। (iv) অভ্যস্ত। (v) অজেয়। (vi) প্রকাশিত। (vii) নিস্তব্ধ। (viii) পরিত্যাগ।

উ। (i) প্রবাহ—প্র—বহ্‌+ঘঞ্‌। (ii) ফণী—ফণ (বা ফণা)+ইন্‌। (iii) জিজ্ঞাসা—জ্ঞা+সন্‌+অ+স্ত্রীলিঙ্গ আ। (iv) অভ্যস্ত—অভি—অস+ক্ত। (v) অজেয়—নঞ্‌—জি+যৎ। (vi) প্রকাশিত—প্র—কাশ্‌+ক্ত। (vii) নিস্তব্ধ—নি—স্তন্‌ভ+ক্ত। (viii) পরিত্যাগ—পরি—ত্যজ+ঘঞ্‌।

যে-কোনো পাঁচটি শব্দের অবলম্বনে পাঁচটি সার্থক বাক্য রচনা কর :

মানবধর্ম। (ii) রাশীকৃত। (iii) শশব্যস্ত। (iv) রবাহূত। (v) বৈপরীত্য। (vi) পরিবেষ্টনী। (vii) কর্মনাশা। (vii) চড়কদার

উ। (i) মানবধর্ম : বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা মানবধর্মের অঙ্গীভূত।

(ii) রাশীকৃত : দুর্যোগের ফলে বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি না আসায় রাশীকৃত খাদ্য নষ্ট হইল।

(iii) শশব্যস্ত : ভূতের কথা মনে হইতেই শশব্যস্তে লোকালয়ে পৌঁছিবার চেষ্টা করিলাম।

(iv) রবাহূত : উৎসববাড়ীতে রবাহূতের ভিড়ও বড় কম ছিল না।

(v) বৈপরীত্য : তাঁহার আচরণ ও কথায় বৈপরীত্যের লেশমাত্র ছিল না।

(vi) পরিবেষ্টনী : পুলিশের পরিবেষ্টনী উৎসুক জনতার চাপে ভাঙিয়া পড়িল।

(vii) কর্মনাশা : নানা জনে নানা কাজে ব্যাপৃত হইল—কর্মনাশা লোকটিকে কেহ ডাকিল না।

(viii) চড়ন্দার : দূরে নগরের আলোকমালা নৌকার চড়ন্দারদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিল।

(গ) সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :

ঈশ্বর এসব চেঁচামেচিতে কর্ণপাত করলে না। তারপর, যখন সে উঠে দাঁড়াল তখন দেখি সে আলাদা মানুষ। তার চোখে আগুন জ্বলছে আর শরীরটে হয়েছে ইস্পাতের মতো।

উ। ঈশ্বর এই সকল চীৎকারাদিতে কর্ণপাত করিল না। তারপর, যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখি সে ভিন্ন মানুষ। তাহার চক্ষে আগুন জ্বলিতেছে এবং শরীরটা হইয়াছে ইস্পাতের ন্যায়।

(ঘ) উক্তিপরিবর্তন কর :

দুর্যোধন কৃষ্ণকে বললেন, 'তুমি বিবেচনা না করে কেবল পাণ্ডবদের প্রতি প্রীতির বশে আমাকে নিন্দা করছ। তুমি বিদুর পিতা পিতামহ ও আচার্য দ্রোণ—তোমরা কেবল আমাকেই দোষ দাও, পাণ্ডবদের দোষ দেখ না। বিশেষ চিন্তা করেও আমি নিজের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোনও অপরাধই দেখতে পাই না।'

উ। দুর্যোধন কৃষ্ণকে অনুযোগের সুরে বললেন যে তিনি (কৃষ্ণ) বিবেচনা না করে কেবল পাণ্ডবদের প্রতি প্রীতির বশে তাঁকে (দুর্যোধনকে) নিন্দা করছেন। তিনি, বিদুর (তাঁর) পিতা পিতামহ ও আচার্য দ্রোণ—তাঁরা কেবল তাঁকেই (দুর্যোধনকেই) দোষ দেন, পাণ্ডবদের দোষ দেখেন না। বিশেষ চিন্তা করেও তিনি (দুর্যোধন) নিজের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোনো অপরাধই দেখতে পান না।

(ঙ) পাঁচটি শব্দের গদ্যরূপ লেখ :

(i) লভিনু। (ii) নারিলি। (iii) উঠে ঝনঝনি। (iv)
(v). জিনিবারে। (vi) মথিয়া। (vii) উজলে। (viii) অর্পিনু।

উ। (i) লভিনু—লাভ করিলাম। (ii) নারিলি—পারিলি না
(iii) উঠে ঝনঝনি – ঝনঝন করিয়া উঠে। (iv) ত্যজিলে—ত্যাগ করিলে
(v) জিনিবারে—জয় করিতে (vi) মথিয়া—মথিত করিয়া।
(vii) উজলে—উজ্জ্বল করে। (viii) অর্পিনু—অর্পণ করিলাম।

পত্র >

প্র. ১। করণ, অপাদান ও অধিকরণ কারক কাহাকে বলে, উদাহরণসহকারে বুঝাইয়া দাও। কর্তৃকারক ও কর্মকারকে বাঙ্‌লায় অনেক সময় বিভক্তির একই রূপ দেখা যায়, তাহাদের দৃষ্টান্ত দাও। 'কে' বিভক্তির যোগে বাঙ্‌লায় কোন্ কোন্ কারক সম্পন্ন হয়?

উ। কর্তা যাহার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে অর্থাৎ ক্রিয়া সম্পাদনের ব্যাপারে যাহা প্রধান সহায়, তাহার নাম **করণ কারক**; যথা—আমরা চক্ষু দিয়া দেখি।

—এখানে দেখা ক্রিয়াটি কর্তার দ্বারা চক্ষুর সাহায্যে সম্পন্ন হইতেছে।

যাহা হইতে কিছু বিচ্যুত, ভীত, রক্ষিত, উৎপন্ন, গৃহীত ইত্যাদি হয় তাহাকে **অপাদান কারক** বলে; যথা—গাছ হইতে ফল পড়িল।

ক্রিয়ার আধারকে **অধিকরণ কারক** বলে। ক্রিয়ার আধার বলিতে বুঝিতে হইবে কর্তা যে-আধারে থাকিয়া ক্রিয়া সম্পাদন করে, অথবা প্রয়োজনমতো কর্মকে যে-আধারে রাখে, সেই আধারকে; যথা—তিলে তেল আছে।

কর্তৃকারক ও কর্মকারকে বিভক্তির একই রূপের উদাহরণ নিয়ে দেওয়া হইল:

মানুষ মরণশীল। (কর্তা)
বাঘে মানুষ খায়। (কর্ম) } —শূন্য বিভক্তি।

ছাগলে কী না খায়! (কর্তা)
সাগরে ভুলিতে নারি। (কর্ম) —'এ' বিভক্তি

তোমাকে আসতেই হবে। (কর্তা)
উপেনকে ডাকিয়া আন। (কর্ম) } —'কে' বিভক্তি।

বাঙ্‌লায় 'কে' বিভক্তির যোগে কর্তা, কর্ম, সম্প্রদান, অপাদান এবং অধিকরণ কারক নিষ্পন্ন হয়।

প্র। (অথবা) সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য ও পরস্পরের সম্পর্ক উদাহরণ যোগে বুঝাইয়া দাও। সন্ধি কয় প্রকারের? নিপাতনে সন্ধি ও নিত্যসমাস কাহাকে বলে, দৃষ্টান্তসহকারে বুঝাইয়া দাও।

উ। পরস্পর-সন্নিহিত দুই বর্ণের মিলনের নাম সন্ধি; যথা—অতি + আচার = অত্যাচার।

পরস্পর অর্থসম্বন্ধযুক্ত দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়ার নাম সমাস; যথা—রাজার পুত্র = রাজপুত্র

পাশাপাশি অবস্থানই সন্ধির প্রধান কথা, অর্থ-সম্পর্কই সমাসের প্রধান কথা। সমাসের উদ্দেশ্য বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া। সন্ধির এইরূপ কোনো উদ্দেশ্য নাই—ইহা ধ্বনিপরিবর্তনের একটি স্বাভাবিক নিয়ম মাত্র।

—সমাসের ক্ষেত্রে (এবং অন্যত্রও) সন্ধি করিতেই হইবে। সমাস হইলে

অবশ্য সন্ধি থাকিতেও পারে, না-ও থাকিতে পারে ; আবার, সন্ধি হইলেই যে সমাস থাকিবে এমন কোনো কথা নাই ; যথা—

মম+আলয়=মমালয় (সন্ধি আছে, সমাস নাই) ; সত্যনিষ্ঠা (সমাস আছে, সন্ধি নাই) ; শশ+অঙ্ক=শশাঙ্ক (সমাস এবং সন্ধি দুইই আছে ।)

সন্ধি যখন সাধারণ নিয়মে না হইয়া বিশেষ নিয়মে হয়, তখন সেইরূপ সন্ধিকে **নিপাতনে সন্ধি** বলে ; যথা—কুল+অটা=সাধারণ নিয়মে 'কুলাটা' না হইয়া বিশেষ নিয়মে 'কুলটা' হয় ।

ইতে একাধিক পদের সমবায়ে গঠিত বলিয়া মনে হইলেও যাহার ব্যাসবাক্য হয় না, অথবা ব্যাসবাক্য করিতে হইলে সমস্যমান পদগুলির মধ্যে নাই এমন বাহিরের পদের সাহায্য লইতে হয়, তাহাকে **নিত্যসমাস** বলে ; যথা—কৃষ্ণসর্প ব্যাসবাক্য হয় না) ; দেশান্তর (অন্য দেশ) ।

প্র. ২ । উদাহরণ-সহকারে যে-কোনো **পাঁচটির** পরিভাষার ব্যাখ্যা কর :

(ক) অল্পপ্রাণ বর্ণ । (খ) যৌগিক বাক্য । (গ) সমাসান্ত প্রত্যয় । (ঘ) নঞর্থক বহুব্রীহি । (ঙ) বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব । (চ) ভাববাচ্য । (ছ) ভগ্নতৎসম শব্দ । (জ) স্বাভাবিক ষত্ব ।

উ । (ক) **অল্পপ্রাণ বর্ণ :** যে-সকল বর্ণের উচ্চারণে প্রাণ বা নিঃশ্বাসের প্রাধান্য থাকে না, তাহাদের নাম অল্পপ্রাণ বর্ণ । বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণগুলি অর্থাৎ ক চ ট ত প এবং গ জ ড দ ব অল্পপ্রাণ ।

(খ) **যৌগিক বাক্য :** যে-বাক্যে একাধিক স্বাধীন সরল বা জটিল বাক্য সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা অথবা বিনা-অব্যয়েই সংযুক্ত থাকে, তাহার নাম যৌগিক বাক্য ; যথা—

আমি তাহার আসা মোটেই পছন্দ করিতাম না কিন্তু যখনই সুযোগ পাইত তখনই সে আসিয়া উপস্থিত হইত ।

একটি স্বাধীন সরল বাক্য 'আমি তাহার…করিতাম না' একটি স্বাধীন জটিল বাক্য 'যখনই সুযোগ…উপস্থিত হইত' সংযোজক অব্যয় 'কিন্তু' দ্বারা যুক্ত হইয়া যৌগিক বাক্য গঠন করিয়াছে ।

(গ) **সমাসান্ত প্রত্যয় :** সমাস করিবার পর সমস্তপদে সমাসেরই অঙ্গহিসাবে যে প্রত্যয় তদ্ধিতের ন্যায়, অথচ অর্থের কোনোরূপ পরিবর্তন না করিয়া যুক্ত হয়, তাহাকে সমাসান্ত প্রত্যয় বলে ; যথা—প্রিয় সখা=প্রিয়সখি+টচ্ (=অ)=প্রিয়সখ ; এখানে 'টচ্' সমাসান্ত প্রত্যয় ।

(ঘ) **নঞর্থক বহুব্রীহি :** যে-বহুব্রীহি অর্থাৎ অন্যপদার্থপ্রধান সমাসে পূর্বপদ নিষেধার্থক অব্যয়, তাহার নাম নঞর্থক বহুব্রীহি, যথা—নাই পুত্র যাহার=অপুত্রক ।

(ঙ) **বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব :** বীপ্সা অর্থাৎ সর্বত্র ব্যাপ্তির ইচ্ছা (কাহাকেও বা কোনটিকেও বাদ না দিয়া) অর্থে যে অব্যয়ীভাব সমাস হয় তাহাকে বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব বলে ; যথা—দিনে দিনে=প্রতিদিন ।

(চ) **ভাববাচ্য :** যে-বাক্যে কর্তৃপদ থাকে বা এবং ক্রিয়ার অর্থটাই

তাহাকে ভাববাচ্য বলে। ভাববাচ্যের কর্তা সাধারণত তৃতীয়ান্ত বা ষষ্ঠ্যন্ত হয় এবং ক্রিয়াপদটি 'হ' প্রভৃতি ধাতু-যুক্ত হইয়া সর্বদা প্রথম পুরুষের হয়। যথা—মহাশয়ের থাকা হয় কোথায়?

(ছ) ভগ্নতৎসম শব্দ : সংস্কৃত হইতে সরাসরি বাঙ্‌লায় আসিয়া যে শব্দ বাঙ্‌লায় উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের ফলে কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহার নাম ভগ্নতৎসম শব্দ; যথা—কেষ্ট (<কৃষ্ণ)।

(জ) স্বাভাবিক ষত্ব : ষত্বের কারণ না থাকিলেও কতকগুলি তৎসম শব্দে সর্বদাই ষ ব্যবহৃত হয়। মূর্ধন্য ষ-এর এইরূপ প্রয়োগকে স্বাভাবিক ষত্ব বলা হয়; যথা—আষাঢ়, পাষণ্ড ইত্যাদি।

প্র. ৩। যে-কোন **পাঁচটি** শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় দেখাইয়া ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখ :

(ক) বিবক্ষা। (খ) ছাত্র। (গ) সন্তান। (ঘ) সত্তা। (ঙ) স্বত্ব। (চ) সত্ত্ব (ছ) ভাগবত। (জ) আণবিক।

উ। (ক) বিবক্ষা : ব্রূ বা বচ্ + সন্ + অ + স্ত্রীলিঙ্গে আ (বলিবার ইচ্ছা)।

(খ) ছাত্র : ছত্র + ণ (ছত্র অর্থাৎ গুরুর দোষাবরণ যাহার শীল)।

(গ) সন্তান : সম্—তন্ + ঘঞ্ (যাহার দ্বারা বংশ সম্যক্ বিস্তৃত হয়)।

(ঘ) সত্তা : সৎ + তল্ বা তা (সৎ-এর ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা)।

(ঙ) স্বত্ব : স্ব + ত্ব (স্ব-র ভাব অর্থাৎ অধিকার)।

(চ) সত্ত্ব : সৎ + ত্ব (সৎ-এর ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা)।

(ছ) ভাগবত : ভগবৎ + অণ্ বা ষ্ণ (ভগবৎ-সম্বন্ধীয়)

(জ) আণবিক : অণু + ঠক্ বা ষ্ণিক (অণু হইতে উৎপন্ন)

প্র। (অথবা) নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলির যে-কোনো পাঁচটি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, তাহার বিচার কর।

(ক) কুরঙ্গিনী। (খ) শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। (গ) সুকৃতিশালিনী মাতৃবৃন্দ। (ঘ) জগদীন্দ্র। (ঙ) অজ্ঞানতা। (চ) এতদ্‌সত্ত্বেও। (ছ) ছন্দোকুশলী। (জ) দোষস্খালন।

উ। (ক) কুরঙ্গিনী : জাতিবাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সাধারণত ঈ প্রত্যয় হয়। কুরঙ্গ + ঈ = কুরঙ্গী (শুদ্ধ)। 'ইনী'-যোগ অশুদ্ধ।

(খ) শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা : ভগবানের (ভগবৎ-এর) দ্বারা গীতা = ভগবৎ + গীতা = ভগবদ্গীতা। কোনো তদ্ধিত যুক্ত না হওয়ায় 'ভগবৎ' শব্দটি 'ভাগবৎ' হইতে পারে না।

(গ) সুকৃতিশালিনী মাতৃবৃন্দ : 'মাতৃবৃন্দ' কথাটি স্ত্রীলিঙ্গ নয় বলিয়া তাহার [illegible] হইতে পারে না।

(ঘ) জগদীন্দ্র : জগৎ + ইন্দ্র = (সন্ধির নিয়মে) জগদ্ + ইন্দ্র [illegible] + ই = দি ; [illegible] পারে না বলিয়া শব্দটি অশুদ্ধ।

(ঙ) অজ্ঞানতা : নঞ্ জ্ঞান = অজ্ঞান। কথাটি ভাববাচক বিশেষ্য, সুতরাং উহার উত্তর আবার ভাববাচক তদ্ধিত যুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু নঞ্ বহুব্রীহি সমাসে (নাই জ্ঞান যাহার) 'অজ্ঞান' শব্দটিকে বিশেষণ ধরিলে 'অজ্ঞানতা' শুদ্ধই হয়।

(চ) এতদ্‌সত্ত্বেও : বর্গের ৩য় ও ৪র্থ বর্ণ+শ্, ষ্, স্ = ৩য় বা ৪র্থ বর্ণ-স্থানে ১ম বর্ণ। অতএব ১ম বর্ণ না করিয়া ৩য় বর্ণ (দ্) রাখায় শব্দটি অশুদ্ধ।

(ছ) ছন্দোকুশলী : অঃ-এর পর বর্গের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম বর্ণ বা য, র, ল, ব, হ্‌ না থাকিলে অঃ 'ও' হইতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে শব্দটি 'ছন্দঃ'।

(জ) দোষস্খালন : 'স্খালি' (= খসানো) এবং 'ক্ষালি' (ধৌত করা) : ধাতু দুইটি একার্থক নয় বলিয়া একটির অর্থে অন্যটির ব্যবহার ('ক্ষালন' স্থলে 'স্খালন্') ভুল

প্র ৪। শ্লেষ ও সমাসোক্তি অলংকার উদাহরণ-যোগে ব্যাখ্যা কর।

উ। 'বিচিত্রা'র অলংকার-ভাগ দ্রষ্টব্য।

প্র। (অথবা) যে-কোন দুইটির অলংকার বুঝাইয়া দাও :

(ক) বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে।

(খ) বন্দি চরণারবিন্দ আমি, অতি মন্দমতি।

(গ) গ্রাসগুলি তোলে যেন তে-আঁঠিয়া তাল।

(ঘ) গুরু-কাছে লব গুরু দুঃখ।

উ। (ক) উপমান 'বিমল হেম' অপেক্ষা উপমেয় 'তনু'র উৎকর্ষ সূচিত হওয়ায় ব্যতিরেক অলংকার।

(খ) উপমান অরবিন্দের সহিত উপমেয় চরণের সাদৃশ্য দ্যোতিত হওয়ায় উপমা অলংকার (লুপ্তোপমা)। ইহা ছাড়া, 'ন্দ' যুক্তবর্ণটি একাধিকবার ধ্বনিত হওয়ায় অনুপ্রাস অলংকারও হইয়াছে।

(গ) উপমেয় 'গ্রাসগুলি'-কেই উপমান 'তে-আঁঠিয়া তাল' বলিয়া প্রবল সংশয় হওয়ায় এবং সংশয়বাচক 'যেন'-র উল্লেখ থাকায় বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকার।

(ঘ) 'গুরু' কথাটি একই বাক্যে দুইবার দুই ভিন্ন অর্থে (১. দীক্ষাদাতা, ২. কঠিন) ব্যবহৃত হওয়ায় যমক অলংকার।

॥ উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেন্টাল ১৯৬৩ ॥

< প্রথম পত্র >

প্র ৭। যে-কোন তিনটির উত্তর দাও :

(ক) যে-কোনো পাঁচটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ :

(১) প্রবাস। (২) অগ্রসর। (৩) আরোহণ। (৪) [illegible] ([illegible]স্রোতস্বতী। [illegible] দুর্গম। (৭) সংগ্রহ। (৮) আবিষ্কার।

উ। (১) প্রবাস—প্র — বস্ + ঘঞ্।

(২) অগ্রসর—অগ্র — [illegible]

(৩) আরোহণ—আ – রুহ্ + ল্যুট্ বা অনট্।

(৪) বিস্মৃত—বি – স্মৃ + ক্ত।

(৫) স্রোতস্বতী—স্রোতঃ (স্রোতস্)+ মতুপ্ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈ।

(৬) দুর্গম—দুর্ – গম্ + খল্।

(৭) সংগ্রহ—সম – গ্রহ্ + অপ্।

(৮) আবিষ্কার—আবিঃ—কৃ + ঘঞ্।

(খ) যে-কোনো পাঁচটি শব্দ অবলম্বনে পাঁচটি বাক্য রচনা কর :

(১) মাহেন্দ্রযোগ। (২) ইয়ত্তা। (৩) অনাড়ম্বর। (৪) অনুকল্প। (৫) কবন্ধ। (৬) অপ্রতিহত। (৭) অনুগামিনী। (৮) রবিরশ্মিমালাপ্রদীপ্ত।

উ। (১) মাহেন্দ্রযোগ : জীবনে মাহেন্দ্রযোগ একাধিকবার আসে না।

(২) ইয়ত্তা : পণপ্রথা যে কত বাঙালি-পিতার সর্বনাশ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

(৩) অনাড়ম্বর : সে-যুগের ধনীদের জীবনযাত্রাও ছিল অনাড়ম্বর।

(৪) অনুকল্প : মাতৃহীন শিশুটির কাছে দিদিই মাতার অনুকল্প।

(৫) কবন্ধ : পশ্চিমী সভ্যতা কবন্ধ—উহাতে দেহ এবং উদরই আছে, মস্তিষ্ক অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা নাই।

(৬) অপ্রতিহত : বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছে।

(৭) অনুগামিনী : বনগমনকালে সীতা স্বেচ্ছায় রামচন্দ্রের অনুগামিনী হইলেন।

(৮) রবিরশ্মিমালাপ্রদীপ্ত : নদীর রবিরশ্মিমালাপ্রদীপ্ত জলরাশি গলিত স্বর্ণের ন্যায় দেখাইতেছিল।

(গ) সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :

তারাবাই সামান্য মেয়ে তো ছিলেন না, এক ঝাপটায় জয়মলকে দশ হাত দূরে ফেলে দিয়ে একেবারে বাঘিনীর মতো তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি ছুরির ঘায়ে তাঁর সব আস্পর্ধা শেষ করে দিলেন।

উ। তারাবাই সাধারণ মহিলা তো ছিলেন না; এক ঝাপটায় জয়মলকে দশ হাত দূরে নিক্ষেপ করিয়া একেবারে ব্যাঘ্রীর ন্যায় তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া একটি ছুরিকার আঘাতে তাঁহার সকল স্পর্ধা শেষ করিয়া দিলেন।

(ঘ) প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তরিত কর :

কাঙালী জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই খেলি নে মা?'

'বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।'

ছেলে বিশ্বাস করিল না, 'না, ক্ষিদে নেই বই কি! কই দেখি তোর হাঁড়ি!'

[illegible] কাঙালী মাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কেন খাইল না। মা উত্তরে সস্নেহে [illegible] গড়াইয়া গিয়াছে, তখন আর ক্ষুধা নাই। ছেলে বিশ্বাস করিল না। [illegible] যে, ক্ষুধা না থাকাটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। নিশ্চিত হইবার জন্য সে মায়ের

(ঙ) যে-কোনো পাঁচটি শব্দের গদ্যরূপ লেখ :

(১) আছিলা। (২) খননি। (৩) নারিবে। (৪) তেমতি। (৫) ঝলমলে। (৬) ব্যয়িলি। (৭) পশিয়াছে। (৮) তিতিল।

উ। (১) আছিলা—ছিল বা ছিলেন। (২) খননি—খনন করিয়া। (৩) নারিবে—পারিবে না। (৪) তেমতি—সেইরূপ। (৫) ঝলমলে—ঝলমল করে। (৬) ব্যয়িলি—ব্যয় করিলি। (৭) পশিয়াছে—প্রবেশ করিয়াছে। (৮) তিতিল—সিক্ত হইল, ভিজিল।

< দ্বিতীয় পত্র >

প্র ১। শব্দ ও ধাতু কী করিয়া পদে পরিণত হয়, উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া দেখাও। পদ কয় প্রকারের, দৃষ্টান্তসহকারে শ্রেণীবিভাগ করিয়া দেখাও। পদ ও বাক্যের সম্পর্ক কী ?

উ। শব্দের সহিত শব্দবিভক্তি এবং ধাতুর সহিত ধাতুবিভক্তি যোগ করিলে পদ গঠিত হয় ; যথা—

রাম (শব্দ) + কে (শব্দবিভক্তি) = রামকে (পদ)

হাস্ (ধাতু) + ইতেছে (ধাতুবিভক্তি) = হাসিতেছে (পদ)।

পদ পাঁচ প্রকারের—বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, অব্যয় ও ক্রিয়া ; যথা—জল, আকাশ, মাছ ইত্যাদি বিশেষ্য ; আমি, তুমি, সে, তাহা, ইহা প্রভৃতি সর্বনাম ; ছোট, বড়, ভালো, উচ্চ, সুন্দর, কুৎসিত ইত্যাদি বিশেষণ ; যদি, কিন্তু, এবং, ও, তো, প্রভৃতি অব্যয় ; করে, বলি, শিখিল, পড়িবে ইত্যাদি ক্রিয়া।

কয়েকটি পদ মিলিয়া যখন একটি পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে তখন বাক্য হয়। পদ বাক্যের অংশ মাত্র।

প্র। (অথবা) কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের পার্থক্য উদাহরণ-সহকারে বুঝাইয়া দাও। তৎসম ও বাঙ্লা উভয়বিধ কৃৎ ও তদ্ধিতের দৃষ্টান্ত দাও।

বিশেষ্যপদকে বিশেষণে রূপান্তরিত করিবার জন্য যে-যে কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে অন্তত দুইটি করিয়া প্রত্যয়ের উদাহরণ দাও।

উ। ধাতুর উত্তর যে প্রত্যয় (বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি) যুক্ত হইয়া শব্দ গঠন করে, তাহার নাম কৃৎ-প্রত্যয় ; যথা—কাট্ + আরি = কাটারি ; এখানে 'আরি' কৃৎ-প্রত্যয়।

শব্দের উত্তর যে প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নূতন শব্দ গঠন করে, তাহার নাম তদ্ধিত-প্রত্যয় ; যথা—তাঁত + ঈ = তাঁতী ; এখানে 'ঈ' তদ্ধিত-প্রত্যয়।

আস + শানচ্ = আসীন	(তৎসম কৃৎ) ;
তর্ক + ঠক্ (ইক) = তার্কিক	(,, ,, তদ্ধিত) ;
খা + ইয়ে = খাইয়ে	(বাঙ্লা কৃৎ) ;
বড় + আই = বড়াই	,,

[মন্তব্য : ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় হইলে বিশেষ্য এবং বিশেষণ দুই-ই গঠিত হয়। বিশেষ্যকে কৃৎপ্রত্যয়ের সাহায্যে বিশেষণে পরিণত করা যায় না, কারণ বিশেষ্যের সহিত কৃৎপ্রত্যয় যুক্তই হয় না।]

নিদ্রা (নি-দ্রা) + আলুচ্ = নিদ্রালু (কৃৎ-যোগে বিশেষণ) ;
আকাঙ্ক্ষা (আ-কাঙ্ক্ষ্ + অ + স্ত্রীলিঙ্গে আ) + ক্ত = আকাঙ্ক্ষিত (ঐ) ;
তেজঃ + বিন্ = তেজস্বী (তদ্ধিত-যোগে বিশেষণ) ;
হিসাব + ঈ = হিসাবী (ঐ)।

প্র ২। উদাহরণ-সহকারে যে-কোনো পাঁচটি পরিভাষার ব্যাখ্যা কর :

(ক) জটিলবাক্য ; (খ) প্রযোজক কর্তা ; (গ) অন্তঃস্থ বর্ণ ; (ঘ) দেশী শব্দ ; (ঙ) ধ্বন্যাত্মক শব্দ ; (চ) পূরণবাচক বিশেষণ ; (ছ) সর্বনামীয় বিশেষণ ; (জ) উপপদ তৎপুরুষ সমাস।

উ। (ক) জটিল বাক্য : যে-বাক্যে একটিমাত্র প্রধান উপবাক্য এবং তাহার উপর নির্ভরশীল এক বা একাধিক অপ্রধান উপবাক্য থাকে, তাহার নাম জটিল বাক্য ; যথা—

দেশকে যে ভালবাসে না, দেশের অন্নজল গ্রহণ করিবার অধিকার তাহার নাই। —এখানে 'দেশের অন্নজল···তাহার নাই' প্রধান উপবাক্য, এবং ইহার-উপর নির্ভরশীল উপবাক্য 'দেশকে যে ভালবাসে না।'

(খ) প্রযোজক কর্তা : যে-কর্তা স্বয়ং কাজ না করিয়া অন্যকে কর্মে প্রবৃত্ত করে, তাহাকে প্রযোজক কর্তা বলে ; যথা—

শাশুড়ী বধূকে দিয়ে চিঠি লেখাইতেছেন।—এখানে 'শাশুড়ী' প্রযোজক কর্তা, কারণ, তিনি লেখার কাজটি নিজে না করিয়া বধূকে দিয়া করাইতেছেন।

(গ) অন্তঃস্থ বর্ণ : স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যে যে-চারিটি বর্ণ অর্থাৎ য র ল ব থাকে তাহাদের নাম অন্তঃস্থ বর্ণ (অন্তঃ = মধ্যে ; স্থ = অবস্থানকারী)

(ঘ) দেশী শব্দ : আর্যগণ ভারতে আসিবার পূর্ব হইতেই অনার্য জাতিরা যেসকল শব্দ ব্যবহার করিত তাহাদের কিছু কিছু বাঙ্‌লা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, এইগুলির নাম দেশী শব্দ ; যথা—কাঁচা, ঢেঁকি, পেট, ডাব, ঝাঁটা ইত্যাদি।

(ঙ) ধ্বন্যাত্মক শব্দ : বাস্তবে আমরা বিভিন্ন অব্যক্ত ধ্বনি শুনিতে পাই। এই ধ্বনিগুলিকে ভাষায় বুঝাইবার জন্য যে-শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহাকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে : যথা—ঝমঝম (বৃষ্টির শব্দ), কা-কা (কাকের ডাক), ইত্যাদি।

(চ) পূরণবাচক বিশেষণ : যে-সংখ্যাবাচক শব্দ তৎসংখ্যিত বস্তু বা ব্যক্তির বিশেষণ হয়, তাহাকে পূরণবাচক বিশেষণ বলে ; যথা—প্রথম, দ্বিতীয়, সতের ইত্যাদি।

(ছ) সর্বনামীয় বিশেষণ : সর্বনামপদই যদি বিশেষণরূপে বিশেষ্যকে বিশেষিত করে তবে তাহাকে সর্বনামীয় বিশেষণ বলা হয় ; যথা—

যে-পাখির পরাণে সে-পথে আড়িতে মোরে ডাকো না আজান

(জ) উপপদ তৎপুরুষ সমাস : যে-সকল পদের পর ধাতুর উত্তর কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হয় তাহাদের নাম উপপদ। উপপদের সহিত কৃদন্ত পদের যে সমাস হয় তাহার নাম উপপদ তৎপুরুষ ; যথা—জল দেয় যাহা = জলদ ; এখানে 'জল' উপপদ, কারণ, ইহার পর 'দা' ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় (জল-দা + ক) হইয়াছে।

প্র। (অথবা) ণত্ববিধান ও ষত্ববিধানের প্রধান সূত্রটি উদাহরণ-সহকারে ব্যাখ্যা কর। তদ্ভব ও বিদেশী শব্দের বানানে কি ণত্ববিধান ও ষত্ববিধান মানা হয় ?

উ। ণত্ববিধান :

ঋ, র্, ষ্-এর পরবর্তী একপদস্থিত ন = ণ ; যথা—ঋণ, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, কর্ণ, বর্ণ ইত্যাদি।

ষত্ববিধান :

অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং র ও র্-এর পরবর্তী প্রত্যয় ও আদেশের দন্ত্য স্ মূর্ধন্য ষ্ হয় ; যথা—শ্রীচরণেষু, মুমূর্ষু ইত্যাদি।

তদ্ভব ও বিদেশী শব্দের বানানে ণত্ববিধান ও ষত্ববিধান মানা উচিত না হইলেও ইহা মানা না-মানার ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নাই—কেহ মানেন, কেহ-বা মানেন না।

প্র ৩। যে-কোন পাঁচটি শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখ :

(ক) চঞ্চল। (খ) পুত্র। (গ) ভৃত্য। সার্বভৌম। (ঙ) সাহিত্য। (চ) বন্দী। (ছ) সৌগত। (জ) আর্জব।

উ। (ক) চঞ্চল—চল্ + যঙ্ + অ (যে পুনঃ পুনঃ চলিতেছে)।

(খ) পুত্র—পুৎ-ত্রৈ + ক (পুৎ নামক নরক হইতে যে ত্রাণ করে)।

(গ) ভৃত্য—ভৃ + ক্যপ্ (যাহাকে ভরণ করা উচিত)।

(ঘ) সার্বভৌম—সর্বভূমি + অণ (সর্বভূমির অধীশ্বর বা সর্বভূমিতে বিদিত)।

(ঙ) সাহিত্য—সহিত + ষ্যঞ্ (সাহিত্যের ভাব)।

(চ) বন্দী—বন্দ + ণিনি (যে বন্দনা করে)।

(ছ) সৌগত—সুগত + অণ (সুগত অর্থাৎ বুদ্ধ ইহার দেবতা)।

(জ) আর্জব—ঋজু + অণ (ঋজুর ভাব)।

প্র। (অথবা) যে-কেনো পাঁচটি যুগ্মকের অন্তর্গত শব্দদ্বয়ের অর্থের পার্থক্য দেখাও :

(ক) নিরসন ও নিরশন। (খ) কুঁজন ও কূজন। (গ) পরস্ব ও পরশ্ব। (ঘ) স্বার্থ ও সার্থ। (ঙ) দ্বিপ ও দ্বীপ। (চ) দিনেশ ও দীনেশ। (ছ) মহাপরাক্রম ও মহৎপরাক্রম।

উ। (ক) নিরসন—নিরাকরণ
নিরশন—অভুক্ত

(খ) কুঁজন—খারাপ লোক
কূজন—পাখির ডাক

(গ) পরস্ব—পরের ধন
পরশ্ব—আগামী কালের পরের দিন

(ঘ) সার্থ—বণিকদল
স্বার্থ—নিজের প্রয়োজন

(ঙ) দ্বিপ—হাতী
দ্বীপ—জলবেষ্টিত ভূভাগ

(চ) দিনেশ—সূর্য
দীনেশ—দরিদ্রের ভগবান

(ছ) মহাপরাক্রম—প্রভূত পরাক্রম
মহৎপরাক্রম—মহৎ লোকের পরাক্রম .

প্র ৪। উৎপ্রেক্ষা ও ব্যতিরেকি অলংকার উদাহরণযোগে ব্যাখ্যা কর।

উ। 'বিচিত্রা'-র অলংকার ভাগ দ্রষ্টব্য।

প্র.। (অথবা) যে-কোনো দুইটির অলংকার ব্যাখ্যা কর :

(ক) ভারত ভারত-খ্যাত আপনার গুণে।
(খ) অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
(গ) মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।
(ঘ) শোকের ঝড় বহিল সভাতে।

উ। (ক) 'ভারত' কথাটি দুইবার দুইটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় যমক অলংকার। প্রথম 'ভারত' = কবি ভারতচন্দ্র; দ্বিতীয় ভারত—ভারতবর্ষ।

(খ) অচেতন উপমেয় 'অরণ্যে' অন্তর্লিখিত চেতন উপমান (মানুষ)-এর ব্যবহার (উদ্যত বাহু হইয়া হাহাকার করা) আরোপিত হওয়ায় সমাসোক্তি অলংকার।

(গ) 'মধু' কথাটি একবার ব্যবহৃত হইয়া দুইটি অর্থ (১ মকরন্দ, ২ কবি মধুসূদন) প্রকাশ করায় শ্লেষ অলংকার। ইহা ছাড়া, উপমেয় 'মনঃ' এবং উপমান 'কোকনদ'-এ অভেদ কল্পিত হওয়ায় রূপক অলংকারও হইয়াছে।

(ঘ) উপমেয় 'শোক' এবং উপমান 'ঝড়'-এর মধ্যে অভেদ কল্পিত হওয়ায় অর্থাৎ শোকই ঝড় হইয়া যাওয়ায় রূপক অলংকার।

॥ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৪ ॥

< প্রথম পত্র >

প্র. ৭। (ক) হইতে (ঙ) পর্যন্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে যে-কোনো তিনটির উত্তর দাও :

(ক) প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ কর :

(i) ব্যাপ্ত। (ii) যশস্বী। (iii) গৌরব। (iv) উপহার। (v) বিদীর্ণ।

উ.। (i) ব্যাপ্ত—বি—আপ + ক্ত। (ii) যশস্বী—যশস্ + বিন্। (iii) গৌরব—গুরু + অণ্ (ক) (iv) উপহার—উপ—হৃ + ঘঞ্। (v) বিদীর্ণ—বি—দৄ + ক্ত।

(খ) নিম্নলিখিত পাঁচটি শব্দসংযোগে পাঁচটি সার্থক বাক্য রচনা কর :

(i) কালক্রমে। (ii) উদ্‌ঘাটিত। (iii) সর্বতোভাবে। (iv) উত্তরপুরুষ। মহীরুহ।

উ.। (i) কালক্রমে : একটি ক্ষুদ্র বীজই কালক্রমে বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়।

(ii) উদ্‌ঘাটিত : প্রেক্ষাগৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত সকলকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইল।

(iii) সর্বতোভাবে : ছেলেটির 'চঞ্চল' নাম সর্বতোভাবে সার্থক।

(iv) উত্তরপুরুষ :. আমরা এমন কোনো কার্য করিব না যাহাতে আমাদের উত্তরপুরুষ আমাদিগকে ধিক্কার দিতে পারে .

(v) মহীয়সী : রাণী ভবানী বঙ্গের মহীয়সী নারীকুলের অন্যতমা।

(গ) সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :

আমরা দর্জিপাড়ার ছেলে—যমকে ভয় করিনে তা জানিস? কিন্তু তা বলে ছোটলোকদের dirty পাড়ার মধ্যে ও আমরা যাইনে। ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যামো হয়।

উ.। আমরা দর্জিপাড়ার ছেলে—যমকে ভয় করি না তাহা জানিস? কিন্তু তাই বলিয়া ছোটলোকদের dirty পাড়ার মধ্যেও আমরা যাই না। ব্যাটাদের দেহের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যাধি হয়।

(ঘ) উক্তি পরিবর্তন কর :

তারপর কৃষ্ণ বলিলেন, 'মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, আপনি ক্ষত্রিয়গণকে মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত করুন, ক্রোধের বশীভূত হবেন না।'

উ.। তারপর কৃষ্ণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন ক্ষত্রিয়গণকে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করিতে এবং ক্রোধের বশীভূত না হইতে।

(ঙ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির গদ্যরূপ লেখ :

(i) উথলিছে। (ii) পশিয়াছে। (iii) নিশ্বাসে। (iv) ধাইছে। (v) তিতিল।

উ.। উথলিছে—উচ্ছ্বসিত হইতেছে। (ii) পশিয়াছে—প্রবেশ করিয়াছে। (iii) নিশ্বাসে—নিশ্বাস ফেলে। (iv) ধাইছে—ধাবিত হইতেছে। (v) তিতিল—ভিজিল, সিক্ত হইল।

< দ্বিতীয় পত্র >

প্র. ১। (ক) বহুব্রীহি সমাস ও কর্মধারয় সমাস অথবা রূপক সমাস ও উপমিত সমাসের পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও।

উ.। বহুব্রীহি ও কর্মধারয় : যে সমাসে পূর্ব বা উত্তর কোনো পদেরই প্রাধান্য না থাকিয়া তাহাদের দ্বারা লক্ষিত অন্য পদের প্রাধান্য থাকে, তাহাকে বহুব্রীহি সমাস বলে; যথা—পীত অম্বর যাহার = পীতাম্বর (কৃষ্ণ)।

পূর্বপদ বিশেষণ ও উত্তরপদ বিশেষ্য এবং উভয়ই প্রধান থাকিলে যে সমাস হয় তাহার নাম কর্মধারয়। এই সমাসে উত্তর পদের প্রাধান্য থাকে, যথা—রক্ত পদ্ম = রক্তপদ্ম।

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি এবং কর্মধারয়ের মধ্যে এই দিক দিয়া সাদৃশ্য আছে যে উভয় সমাসেই পূর্বপদ প্রথমান্ত বিশেষণ এবং উত্তরপদ প্রথমান্ত বিশেষ্য।

রূপক ও উপমিত সমাস : যে সমাসে পূর্বপদ উপমেয় এবং উত্তরপদ উপমান এবং উভয়ের মধ্যে অভেদকল্পনা থাকে, তাহার নাম রূপক (কর্মধারয়) সমাস ; যথা—মন-রূপ মাঝি = মনমাঝি।

উপমিত (কর্মধারয়) সমাসেও পূর্বপদ উপমেয় এবং উত্তরপদ উপমান, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অভেদকল্পনা না থাকিয়া সাদৃশ্যের ভাব থাকে ; যথা—পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ।

রূপক সমাসে উপমানের প্রাধান্য থাকে এবং ক্রিয়াপদ উপমানকেই অনুকরণ করে, কিন্তু উপমিত সমাসে থাকে উপমেয়ের প্রাধান্য। আকৃতিগত পার্থক্য না থাকিলেও বাক্যে ইহাদের অর্থগত পার্থক্য স্পষ্ট হয়। ইহা ছাড়া, রূপক সমাসের ব্যাসবাক্যে 'রূপ' শব্দটি আনিতে হয়, কিন্তু উপমিত সমাসে আসে 'ন্যায়' বা 'মত' শব্দ।

প্র.। (অথবা) বাঙ্‌লায় স্ত্রীলিঙ্গ-শব্দ-গঠনের প্রধান প্রধান নিয়মগুলি দৃষ্টান্তসহ উল্লেখ কর।

উ.। বাঙ্‌লায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সাধারণত তিনটি উপায়ে গঠিত হইয়া থাকে :

(ক) আ, ঈ, নী, আনী, ইনী প্রভৃতি স্ত্রীপ্রত্যয় পুংলিঙ্গ শব্দের সহিত যুক্ত করিয়া ; যথা—কোকিল—কোকিলা (আ) ; গৌর—গৌরী, কাকা—কাকী ; নর্তক—নর্তকী (ঈ) ; কামার—কামারনী, ছুতোর—ছুতোরনী (নী) ; ঠাকুর—ঠাকুরাণী, মেথর—মেথরানী (আনী) ; বাঘ—বাঘিনী, রজক—রজকিনী (ইনী) ইত্যাদি।

(খ) সম্পূর্ণ ভিন্নশব্দের প্রয়োগে (পত্নী এবং তজ্জাতীয় স্ত্রী বুঝাইতে) ; যথা—বাবা—মা ; ভাই—বোন, ভাজ ; পো—ঝি ইত্যাদি।

(গ) উভয়লিঙ্গক শব্দের বামে স্ত্রীবাচক শব্দ বসাইয়া ; যথা—গোরু—গাইগোরু কর্মী—মহিলাকর্মী ইত্যাদি।

(খ) উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থের কিরূপ পরিবর্তন হয়, চারিটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখাইয়া দাও।

উ.। 'হৃ' ধাতুর অর্থ—হরণ করা ; কিন্তু প্র—হৃ = মারা, আঘাত করা ; আ—হৃ = খাওয়া ; পরি—হৃ = ত্যাগ করা ; সম্—হৃ = বধ করা।

প্র.। (অথবা) সন্ধি কর : শরৎ + চন্দ্র, প্রতিষ্ঠা + উৎসব। এইরকম স্থলে চলিত বাঙ্‌লায় কিরূপ ব্যবহার দেখা যায় ?

উ.। শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র। প্রতিষ্ঠা + উৎসব = প্রতিষ্ঠোৎসব। এইরকম স্থলে চলিত বাঙ্‌লায় শ্রুতিকটুতার জন্য সমাস সত্ত্বেও সন্ধি করা হয় না, প্রয়োজনমতো একপদে লিখিয়া বা হাইফেন-চিহ্ন দিয়া সমাসটি বুঝাইয়া দেওয়া হয় : শরৎচন্দ্র (বিশেষত ব্যক্তির নাম হইলে), প্রতিষ্ঠা-উৎসব।

প্র. ২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে-কোনো পাঁচটির উদাহরণ-সহকারে

স্পর্শবর্ণ, অলুক্ সমাস, যোগরূঢ় শব্দ, প্রযোজ্য কর্তা, নামধাতু, স্বার্থিক প্রত্যয়, বাচ্য, স্বরসংগতি।

উ.। স্পর্শবর্ণ : ক হইতে ম পর্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের নাম স্পর্শবর্ণ, যেহেতু ইহাদের উচ্চারণে জিহ্বার সহিত মুখবিবরের মধ্যস্থ তালু, দন্ত প্রভৃতি উচ্চারণ-স্থানের অথবা ওষ্ঠের সহিত অধরের স্পর্শ হয়।

অলুক্ সমাস : সমাসে পূর্ব এবং উত্তর উভয় পদেরই বিভক্তির লোপ হয় ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে পূর্ব বা উত্তরপদের বিভক্তি সমস্তপদে লুপ্ত হয় না—এইরূপ সমাসকে অলুক্ সমাস বলা হয় (অলুক্ = লোপের অভাব) ; যথা—ভ্রাতুঃ (৬ষ্ঠী একবচন) পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র ; তেলে ভাজা = তেলেভাজা ইত্যাদি।

যোগরূঢ় শব্দ : প্রকৃতি-প্রত্যয় বা ভিতরের অংশগুলি অনুসারে যত প্রকার অর্থ হইতে পারে তাহাদের সবগুলিকে না বুঝাইয়া কোনো শব্দ যদি বিশেষ একটিকে বুঝায়, তবে সেই শব্দকে যোগরূঢ় শব্দ বলা হয় ; যথা—পঙ্কজ। ইহার প্রকৃতিপ্রত্যয়গত অর্থ—যাহা পঙ্কে জন্মে। কিন্তু একমাত্র পদ্মেই ইহার অর্থ সীমাবদ্ধ।

প্রযোজ্য কর্তা : কর্তা স্বয়ং কাজ না করিয়া যাহাকে ক্রিয়ায় প্রবর্তিত করে, তাহার নাম প্রযোজ্য কর্তা ; যথা—ভৃত্যকে দিয়া বইখানি আনাও।—এখানে 'ভৃত্য' প্রযোজ্য কর্তা।

নামধাতু : নাম অর্থাৎ বিশেষ্য বা বিশেষণ এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দ যদি প্রত্যয়যোগে বা বিনা-প্রত্যয়ে ধাতুতে পরিণত হইয়া ক্রিয়াপদের স্রষ্টা হয়, তবে তাহাকে নামধাতু বলে ; যথা—আকাশে মেঘ ঘনাইতেছে। ঘন (বিশেষণ) + আ = ঘনা (নামধাতু) ; ইহার সহিত 'ইতেছে' বিভক্তিযোগে 'ঘনাইতেছে' ক্রিয়াপদটি গঠিত হইয়াছে।

স্বার্থিক প্রত্যয় : যে তদ্ধিত-প্রত্যয় প্রকৃতির অর্থগত কোনো পরিবর্তন সাধন করে না তাহাকে স্বার্থিক প্রত্যয় বলা হয় ; যথা—দেব + তল্ (তা) = দেবতা। এখানে 'তল্' স্বার্থিক প্রত্যয়।

বাচ্য : ক্রিয়ার যে রূপভেদের দ্বারা বাক্যে কর্তা বা কর্ম বা ভাব অর্থাৎ ক্রিয়ার অর্থের প্রাধান্য সূচিত হয়, তাহার নাম বাচ্য ; যথা—শিশু গল্প শুনিতে ভালবাসে। —এখানে 'ভালবাসে' ক্রিয়াটির দ্বারা কর্তা 'শিশু'-র প্রাধান্য সূচিত হইতেছে বলিয়া কর্তৃবাচ্য। এইরূপ কর্মবাচ্যও হইতে পারে।

স্বরসংগতি : শব্দমধ্যস্থ প্রধান স্বরধ্বনির প্রভাবে অন্য স্বর যদি প্রধান স্বরের সহিত অভিন্ন বা তাহার সগোত্র (উচ্চ বা নিম্নস্বর) হইয়া যায়, তবে স্বরসংগতি হয় ; যথা—

বিলাতি>বিলিতি। এখানে প্রধান স্বর ই-র প্রভাবে 'আ' হইয়াছে 'ই' (অভিন্ন)।

প্র.। (অথবা) কারণ নির্দেশ করিয়া, নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলির মধ্যে যে-কোনো [illegible]টির অশুদ্ধি সংশোধন কর

লক্ষ্যণীয়, সত্ত্বা, ভৌগলিক, নিভাননী, ঐক্যমত, শ্রদ্ধাস্পদাসু, মন্মোহন, নিশ্চয়তা, বৈশিষ্ট।

উ.। লক্ষ্যণীয়: 'য‍ৎ' এবং 'অনীয়' প্রত্যয় দুইটির একই অর্থ বলিয়া একসঙ্গে দুইটির প্রয়োগ অশুদ্ধ। অতএব শুদ্ধরূপ—লক্ষ্য, লক্ষণীয়।

সত্ত্বা: মূল শব্দটি 'সৎ' এবং প্রত্যয় 'ত'। ইহাদের কোনোটিতেই ব-ফলা না থাকায় সাধিত শব্দটিতেও ব-ফলা আসিতে পারে না। অতএব শুদ্ধরূপ—সত্তা।

ভৌগলিক: মূল শব্দটি 'ভূগোল'। উহার সহিত ঠক্ বা ষ্ণিক প্রত্যয়যোগে আদিস্বর এবং অন্ত্যবর্ণের পরিবর্তন হইতে পারে, মধ্যস্বরের নয়। অতএব শুদ্ধরূপ—ভৌগোলিক।

নিভাননী: অঙ্গবাচক শব্দ দুইয়ের অধিক স্বরবিশিষ্ট হইলে স্ত্রীলিঙ্গে ঈ না হইয়া আ হয়। অতএব শুদ্ধরূপ—নিভাননা (অঙ্গবাচক 'আনন্' শব্দটি ত্রিস্বর)।

ঐকমত: মূল শব্দটি 'একমত' ইহার সহিত তদ্ধিতযোগে মধ্যবর্ণ ক-এর পরিবর্তন হইতে পারে না, পারে আদি এবং অন্ত্যবর্ণের। অতএব একমত+ষ্ণ্যঞ্—(ষ্ণ্য) = ঐকমত্য (শুদ্ধরূপ)।

শ্রদ্ধাস্পদাসু: 'আস্পদ' শব্দটি অজহল্লিঙ্গ (ক্লীবলিঙ্গ) বলিয়া ইহার লিঙ্গান্তর হয় না। অতএব শুদ্ধরূপ শ্রদ্ধাস্পদেষু।

মন্মোহন: মনঃ+মোহন = মনোমোহন (শুদ্ধরূপ)। অঃ + বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ বা য র ল ব হ = অঃ-স্থানে ও।

নিশ্চয়তা: 'নিশ্চয়' শব্দটি নিজেই ভাববাচক বিশেষ্য বলিয়া ইহার উত্তর আবার ভাববাচক কোনো তদ্ধিত (এখানে 'তা') যুক্ত হইতে পারে না। অতএব শুদ্ধরূপ—নিশ্চয়।

বৈশিষ্ট: 'বিশিষ্ট' শব্দের সহিত 'ষ্যঞ্' (ষ্য) প্রত্যয়-যোগে শব্দটি নিষ্পন্ন। প্রত্যয়ে য-ফলা থাকায় প্রত্যয়ান্ত শব্দটিতেও য-ফলা থাকিবেই। অতএব শুদ্ধরূপ—বৈশিষ্ট্য।

প্র. ৩। (অথবা) নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির মধ্যে যে-কোনো পাঁচটির প্রয়োগ দেখাও ও অর্থ নির্দেশ কর:

ইমন্, ত্ব, মৎ, গিরি, ওয়ালা, আমি, উয়া, অন্ত, আ

উ.। ইমন্: গুরু + ইমন্ = গরিমা (ভাব অর্থে)।
ত্ব: কবি+ত্ব = কবিত্ব (ভাব বা কার্য অর্থে)।
মৎ: বুদ্ধি+মৎ = বুদ্ধিমান্ (অস্ত্যর্থে বা প্রশংসার্থে)।
গিরি: বাবু+গিরি = বাবুগিরি (কার্য অর্থে)।
ওয়ালা: বাড়ী+ওয়ালা = বাড়ীওয়ালা (অধিকারী অর্থে)।
আমি: ইতর+আমি = ইতরামি (ভাব বা কার্য অর্থে)।
উয়া: টাক+উয়া = টাকুয়া>টেকো (অস্ত্যর্থে)।

অন্ত : জ্বল + অন্ত = জ্বলন্ত (কোনো ক্রিয়া চলিতেছে অর্থে)।

আ : জল + আ = জলা (অস্ত্যর্থে)।

প্র.। যে-কোনো দুইটির অলংকার ব্যাখ্যা কর :

(ক) শুভ্রললাটে ইন্দুসমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।

(খ) সারদা সরলা বালা সবে না সন্দেহ-জ্বালা।

(গ) সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া।

(ঘ) কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর, সাতটি যেন পোষা পাখি।

উ.। (ক) উপমেয় 'শান্তি', উপমান 'ইন্দু', সাধারণ ধর্ম 'ভাতিছে', তুলনা-বাচক শব্দ 'সমান'—উপমার চারিটি অঙ্গই বর্তমান থাকায় অলংকার এখানে পূর্ণোপমা।

(খ) স, ল, ও র-ধ্বনি বার বার আবৃত্ত হইয়া মাধুর্যের সৃষ্টি করায় অনুপ্রাস অলংকার।

(গ) উপমান 'সোনা' অপেক্ষা উপমেয় 'মাটি'-র উৎকর্ষ সূচিত হওয়ায় ব্যতিরেক অলঙ্কার।

(ঘ) সাদৃশ্যের প্রাবল্যহেতু উপমেয় 'সাতটি সুর'কেই উপমান 'সাতটি পোষা পাখি' বলিয়া সংশয় বা বিতর্ক উপস্থিত হওয়ায়, এবং সংশয়বাচক শব্দ 'যেন'-র উল্লেখ থাকায়, অলংকার এখানে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

প্র.। (অথবা) অনুপ্রাস ও যমক অলংকারের পার্থক্য উদাহরণ-সহযোগে নিরূপণ কর।

উ.। 'বিচিত্রা'-র অলংকারভাগ দ্রষ্টব্য।

॥ উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬৪ ॥

< প্রথম পত্র >

প্র. ৭। যে-কোনো তিনটির উত্তর দাও :

(ক) প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ কর :

(i) কেশরী। (ii) বিজয়। (iii) জ্ঞান। (iv) পৈতৃক। (v) প্রভাব।

উ.। (i) কেশরী—কেশর + ইন্। (ii) বিজয়—বি-জি + অল্। (iii) জ্ঞান—জ্ঞা + অনট্। (iv) পৈতৃক—পিতৃ + ঠঞ্। (v) প্রভাব—ভূ + ঞ = ভাব ; প্রকৃষ্ট ভাব = প্রভাব (প্রাদি-তৎপুরুষ)।

(খ) নিম্নলিখিত পাঁচটি শব্দযোগে পাঁচটি সার্থক বাক্য রচনা কর :

(i) ইন্দ্রপ্রস্থ। (ii) দ্যূতক্রীড়া। (iii) বীরশয্যা। (iv) অপ্রতিভ। (v) হিতৈষণা।

উ.। (i) ইন্দ্রপ্রস্থ : ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটে খাণ্ডব নামে এক বন ছিল।

(ii) দ্যূতক্রীড়া : দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের আসক্তিই পাণ্ডবদের বনবাসের কারণ হইয়াছিল।

(iii) বীরশয্যা : যুদ্ধে বীরশয্যা লাভ করাই ক্ষত্রিয়ের কাম্য।

(iv) অপ্রতিভ : চালাকি ধরা পড়িয়া গেলেও লোকটি কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইল না।

(v) হিতৈষণা : অন্তরে সত্যকারের হিতৈষণা না থাকিলে কেহ নিজের অনিষ্ট করিয়া অন্যের কল্যাণ করিতে পারে না।

(গ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে কোন্‌টিতে কি সমাস হইয়াছে, ব্যাসবাক্যসহ নির্দেশ কর :

(i) নষ্টকীর্তি। (ii) ভরতনন্দন। (iii) পানভোজন। (iv) সিংহাসন। (v) রাতারাতি।

উ.। (i) নষ্টকীর্তি—নষ্ট হইয়াছে কীর্তি যাহার (বহুব্রীহি)।

(ii) ভরতনন্দন—ভরতের নন্দন (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)।

(iii) পানভোজন—পান এবং ভোজন (দ্বন্দ্ব)।

(iv) সিংহাসন—সিংহ-চিহ্নিত আসন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)।

(v) রাতারাতি—শব্দটিতে কোনো সমাস নাই, ইহা শব্দদ্বৈত মাত্র।

(ঘ) উক্তি পরিবর্তন কর ;

সুরজমল বললেন, 'যা দৌড়ে, আর এক থাল নিয়ে আয়।'

উ.। সুরজমল দৌড়ে গিয়ে আর এক থাল নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন।

(ঙ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির গদ্যরূপ লেখ :

(i) পরশে। (ii) শুকায়েছে। (ii) গ্রাসিতে। (iv) ধেয়ানের। (v) রয়েছে ধ্বনিতে।

উ.। (i) পরশে—স্পর্শে। (ii) শুকায়েছে—শুকাইয়াছে। (iii) গ্রাসিতে—গ্রাস করিতে। (iv) ধেয়ানের—ধ্যানের। (v) রয়েছে ধ্বনিত—ধ্বনিত হইতে রহিয়াছে।

পত্র >

প্র. ১। ণত্ব ও ষত্ববিধানের প্রধান প্রধান নিয়মগুলি উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। বাঙ্‌লায় এই নিয়মগুলি প্রযুক্ত হয় ?

উ.। ণত্ববিধান : ঋ, র ও ষ-এর পরবর্তী একপদস্থিত ন মূর্ধন্য ণ হয় ; যথা—ঋণ, বর্ণ, কৃষ্ণ ইত্যাদি।

ঋ র ষ এবং ন—ইহাদের মধ্যে স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য ব হ এবং অনুস্বার থাকিলেও ন মূর্ধন্য হয় ; যথা—ব্রাহ্মণ, অর্পণ, বৃংহণ, ইত্যাদি।

ষত্ববিধান : অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক্ ও র্-এর পরবর্তী প্রত্যয় ও আদেশের দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয় ; যথা—শ্রীচরণেষু, মুমূর্ষু, বুভুক্ষু ইত্যাদি।

বাঙ্‌লায় ণত্ববিধান ও ষত্ববিধান কেবল তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে মানিয়া চলা হয় ; দেশী, বিদেশী প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে মানিবার কোনো বাধ্যবাধকতা নাই—কেহ মানেন কেহ-বা মানেন না।

প্র. ২। উদাহরণ-সহযোগে যে-কোনো পাঁচটির ব্যাখ্যা কর :

(ক) সর্বনাম। (খ) অনুনাসিক বর্ণ। (গ) অব্যয়ীভাব সমাস। (ঘ) শব্দদ্বৈত। (ঙ) অনুসর্গ। (চ) তদ্ভব শব্দ। (ছ) চলিত ভাষা।

উ.। (ক) সর্বনাম : বিশেষ্যের ক্লান্তিকর এবং শ্রুতিটুকু পুনরাবৃত্তি দূর করিবার জন্য বিশেষ্যের পরিবর্তে যে-পদের প্রয়োগ হয় তাহাকে সর্বনাম বলে ; যথা—

রাম ভালো ছেলে। সে তাহার পিতামাতাকে ভক্তি করে।

(খ) অনুনাসিক বর্ণ : যে-সকল বর্ণের উচ্চারণে অন্যান্য উচ্চারণস্থানের সাহায্য প্রয়োজন হইলেও প্রধান স্থান অধিকার করে নাসিকা, তাহাদের নাম অনুনাসিক বর্ণ। বর্গের পঞ্চম বর্ণগুলি অর্থাৎ ঙ ঞ ণ ন ম এই প্রকারের বর্ণ।

(গ) অব্যয়ীভাব সমাস : অব্যয় পূর্বপদ এবং বিশেষ্য উত্তরপদের সমাস হইলে সমস্তপদটি যদি অব্যয় হইয়া যায়, তবে সেই সমাসকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে ; যথা—দিনে দিনে = প্রতিদিন ; শৈশব হইতে—আশৈশব, ইত্যাদি।

(ঘ) শব্দদ্বৈত : অর্থবৈশিষ্ট্য বুঝাইবার জন্য একই শব্দ যখন অবিকৃত বা বিকৃতভাবে দুইবার ব্যবহৃত হয়, তখন তাহাকে শব্দদ্বৈত বলে ; যথা—চেনা-চেনা ; অলিগলি ; মুড়ি-টুড়ি ইত্যাদি।

(ঙ) অনুসর্গ : কতকগুলি অব্যয়-জাতীয় শব্দ আছে যাহারা ভিন্ন অর্থে স্বাধীন-ভাবে বাক্যে প্রযুক্ত হইলেও বিশেষ্যের পরে বসিয়া তাহার বিভক্তি সূচিত করে। এইরূপ শব্দকে অনুসর্গ বলা হয় ; যথা—শাক দিয়া মাছ ঢাকা।

(চ) তদ্ভব শব্দ : যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতের মাধ্যমে বাঙলায় আসিয়াছে তাহাদের নাম তদ্ভব ; যথা—কার্য>কজ্জ>কাজ ; মৎস্য>মচ্ছ>মাছ ইত্যাদি।

(ছ) চলিত ভাষা : আমরা যে-ভাষায় কথাবার্তা বলি তাহাকে অর্থাৎ আমাদের মৌখিক ভাষাকে চলিত ভাষা বলা হয়। এই ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপের পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা হয় এবং সাধারণত অর্ধতৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশী হয় ; যথা—তাকে বিকেলে একবার আসতে বলে দাও।

প্র.। (অথবা) নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলির মধ্যে যে-কোনো পাঁচটির শুদ্ধতা অশুদ্ধতা বিচার কর :

(ক) দাতা ও গৃহীতা। (খ) লজ্জাস্কর। (গ) ঐক্যতান। (ঘ) লিখিত (ঙ) আকাংখা। (চ) সক্ষম। (ছ) প্রসারতা। (জ) নির্দোষী।

উ। (ক) দাতা ও গৃহীতা : 'গ্রহণকারী' অর্থে গ্রহ্ + তৃন্ = গ্রহীতা ; গৃহীত (গ্রহ্ + ক্ত + স্ত্রীলিঙ্গে আ) এই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

(খ) লজ্জাস্কর : 'লজ্জা' শব্দটিতে বিসর্গ না থাকায় কৃ ধাতু-নিষ্পন্ন শব্দের পূর্বে সন্ধির ফলে স্ আসিতে পারে না।

(গ) ঐক্যতান : মূল শব্দটি 'একতান' ; ইহার সহিত [illegible]

এবং অন্ত্যবর্ণের পরিবর্তন হইতে পারে, মধ্যের কোনো বর্ণের নয়। অতএব ক-তে ব-ফলা আসিতে পারে না।

(ঘ) সিঞ্চিত : সিচ্ + ক্ত = সিক্ত ; 'সিঞ্চিত' হইতে পারে না।

(ঙ) আকাংখা : মূল ধাতুটি 'কাঙ্ক্ষ্' ; অতএব শব্দটির ক্ষ থাকিবেই।

(চ) সক্ষম : 'ক্ষমার সহিত বর্ত্তমান' অর্থে বহুব্রীহি সমাসে 'সক্ষম' শুদ্ধ, কিন্তু 'সমর্থ' অর্থে অশুদ্ধ, কারণ, 'ক্ষম' মানেই সমর্থ।

(ছ) প্রসারতা : 'প্রসার' নিজেই ভাববাচক বিশেষ্য, ইহার সহিত আবার ভাববাচক তদ্ধিত যুক্ত হইতে পারে না বলিয়া শব্দটি অশুদ্ধ।

(জ) নির্দোষী : নিঃ (= নাই) দোষ যাহার = নির্দোষ (নঞ-বহুব্রীহি)। বহুব্রীহি সমাসে অভীষ্ট অর্থ পাওয়া গেলে তাহার উত্তর আবার অস্ত্যর্থক তদ্ধিত যোগ করা যায় না। অতএব নির্দোষ + ইন্ = 'নির্দোষী' অশুদ্ধ।

প্র. ৩। বস্, বপ্, বহ্, স্পৃশ্, ত্যজ্, পচ্—এই ধাতুগুলির মধ্যে যে-কোনো **পাঁচটি** ধাতু হইতে উৎপন্ন পাঁচটি শব্দের উল্লেখ করিয়া সেগুলির প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্দেশ কর।

উ.। বাস—বস্ + ঘঞ্। উপ্ত—বপ্ + ক্ত।
বহন—বহ্ + অনট্। স্পৃষ্ট—স্পৃশ্ + ক্ত।
ত্যাজ্য—ত্যজ্ + ণ্যৎ। পাচক—পচ্ + অক।

প্র.। (অথবা) নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোন **পাঁচটির** লিঙ্গ পরিবর্তন কর :

(ক) নিরপরাধ। (খ) অধীন। (গ) প্রেয়সী। (ঘ) মেথর। (ঙ) ধোপা। (চ) বিদ্বান্। (ছ) কর্তা। (জ) ভাগ্যবান। (ঝ) শিক্ষক। (ঞ) চতুর্থ।

উ। (ক) নিরপরাধ—নিরপরাধা। (চ) বিদ্বান্—বিদুষী।
(খ) অধীন—অধীনা। (ছ) কর্তা—কর্ত্রী, গিন্নী।
(গ) প্রেয়সী—প্রেয়ান্। (জ) ভাগ্যবান—ভাগ্যবতী।
(ঘ) মেথর—মেথরাণী। (ঝ) শিক্ষক—শিক্ষিকা।
(ঙ) ধোপা—ধোপানী। (ঞ) চতুর্থ—চতুর্থী।

প্র. ৪। অনুপ্রাস ও যমকের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া অলংকার দুইটির পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। উ.। 'বিচিত্রা'-র অলংকার ভাগ দ্রষ্টব্য।

প্র.। (অথবা) নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশগুলির মধ্যে যে কোনোও **দুইটির** অলংকার বুঝাইয়া দাও :

(ক) দেখিবারে আঁখিপাখি ধায়।

(খ) কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে।

(গ) নিত্য অভাবের কুণ্ড জাগাইয়া বুকে।
সাধিতেছ মৃত্যুযজ্ঞ পৈশাচিক সুখে॥

(ঘ) নবীন-নবনীনিন্দিত করে দোহন করিছ দুগ্ধ।

উ। (ক) উপমেয় আঁখি এবং উপমান পাখির মধ্যে অভেদ কল্পিত হওয়ায় রূপক অলংকার।

(খ) গন্ধ এই যুক্তব্যঞ্জনের অনুপ্রাস। ইহা ছাড়া, অচেতন উপমেয় গন্ধে চেতন উপমানের ব্যবহার (কাঁদিছে) আরোপিত হওয়ায় সমাসোক্তি অলংকারও হইয়াছে।

(গ) উপমেয় অভাব ও উপমান কুণ্ডে, এবং উপমেয় মৃত্যু ও উপমান যজ্ঞে অভেদ কল্পিত হওয়ায় রূপক অলংকার।

(ঘ) উপমান নবনী অপেক্ষা উপমেয় কর-এর উৎকর্ষ সূচিত হওয়ায় ব্যতিরেক অলংকার।

॥ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৫ ॥

< প্রথম পত্র >

প্রশ্ন ৭। (ক) হইতে (ঙ) পর্যন্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে যে-কোনো তিনটির উত্তর দাও ঃ—

(ক) প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্দেশ কর ঃ

উ.। (১) সন্নিহিত = সম্‌-নি + ধা + ক্ত (ত)। (২) পরাজয় = পরা-জি + অ। (৩) আত্মজ = আত্ম + জন্‌ + ড। (৪) প্রদীপ্ত = প্র—দীপ্‌ + ক্ত। (৫) অনিবার্য = অ—নি + বৃ + ণিচ্‌ + যৎ।

(খ) নিম্নলিখিত পাঁচটি শব্দ সহযোগে পাঁচটি সার্থক বাক্য রচনা কর ঃ—অসদ্ভাব, আস্ফালন, পুরুষকার, কপটাচার, নিষ্প্রভ।

উ.। অসদ্ভাব = দুই ভ্রাতার মধ্যে অসদ্ভাব লাগিয়াই আছে।
আস্ফালন = নন্দলাল তাহার মেকি দেশপ্রেমিকতা লইয়া আস্ফালন করিত।
পুরুষকার = উগ্র পুরুষকারই কর্ণ-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।
কপটাচার = দুর্যোধনের ন্যায় কপটাচার অতি বিরল।
নিষ্প্রভ = বিদ্যাসাগরের কাছে অনেকের চরিত্র নিষ্প্রভ ও মলিন হইয়াছে।

(গ) সাধু ভাষায় রূপান্তরিত ঃ

উ.। একদিন কমলমীরে পৃথ্বীরাজের দূত আসিয়া সংবাদ দিল—সঙ্গ জীবিত আছেন, শ্রীনগরের রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের আয়োজন হইতেছে। প্রত্যূষে পৃথ্বীরাজ সজ্জিত হইয়া সঙ্গকে ধরিবার অনুসন্ধানে বাহির হইবেন, এমন সময়ে শিরোহি হইতে পৃথ্বীরাজের কনিষ্ঠা ভগ্নী একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন।

(ঘ) উক্তি পরিবর্তন :

উ.। গান্ধারী (ধৃতরাষ্ট্রকে) মহারাজ সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে তিনিই দোষী, পুত্রের দুষ্ট প্রকৃতি জানিয়াও স্নেহবশে তাহার মতে চলিয়াছেন আর মূঢ় দুরাত্মা পুত্রকে রাজ্য দিয়া এখন তাহার ফল্ ভোগ করিতেছেন।

(ঙ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির গদ্যরূপ লেখ :—

উ.। বেষ্টিয়াছে = বেষ্টন করিয়াছে। সম্ভাষি = সম্ভাষণ করিয়া। পশিল = প্রবেশ করিল। শিরসে = শিরে (মস্তকে)। নিরখি = দেখিয়া।

< দ্বিতীয় পত্র >

প্র. ১। সমাস প্রধানতঃ কয়প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক সমাসের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও :—

উ.। **সমাস প্রধানত ছয় প্রকার**, যথা—

(১) তৎপুরুষ (২) দ্বন্দ্ব (৩) দ্বিগু (৪) কর্মধারয় (৫) বহুব্রীহি (৬) অব্যয়ীভাব।

প্রত্যেক প্রকার সমাসের দুইটি করিয়া উদাহরণ :—

(১) তৎপুরুষ :—(ক) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ = চরণাশ্রিত = চরণকে আশ্রিত; চিরশত্রু = চিরকাল ব্যাপিয়া শত্রু।

(খ) তৃতীয়া তৎপুরুষ :—কলছাঁটা = কল দিয়া ছাঁটা; মেঘাচ্ছন্ন = মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন।

(গ) চতুর্থী তৎপুরুষ :—বিয়ে পাগলা = বিয়ের জন্য পাগলা; যূপকাষ্ঠ = যূপের নিমিত্ত কাষ্ঠ।

(ঘ) পঞ্চমী তৎপুরুষ :—বিলাতফেরত = বিলাত হইতে ফেরত; দুগ্ধজাত = দুগ্ধ হইতে জাত।

(ঙ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ :—দেশসেবক = দেশের সেবক; ফুলবাগান = ফুলের বাগান।

(চ) সপ্তমী তৎপুরুষ :—সর্বনাশা = সর্বনাশ করে যে; শত্রুঘ্ন = শত্রুকে হনন করে যে।

নঞতৎপুরুষ :—অনাচার = নয় আচার; নগণ্য = নয় গণ্য।

অলুক তৎপুরুষ :—মামার বাড়ি = মামার যে বাড়ি; হাতে গরম = হাতে যাহা গরম।

(২) দ্বন্দ্ব সমাস :—হিতাহিত = হিত ও অহিত; ছেলেমেয়ে = ছেলে ও মেয়ে।

অলুক দ্বন্দ্ব :—পথে-ঘাটে, হাতে-পায়ে; দুধে-ভাতে ইত্যাদি।

(৩) দ্বিগু সমাস :—শতাব্দী = শত অব্দের সমাহার; পঞ্চবটী = পঞ্চ বটের সমাহার।

(৪) কর্মধারয় সমাস :—বড়দিদি = বড় যে দিদি ; শ্বেতচন্দন = শ্বেত যে চন্দন।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় :—পলান্ন = পলমিশ্রিত অন্ন ; ছায়াতরু = ছায়াদানকারী তরু।

রূপক কর্মধারয় :—মনমাঝি = মনরূপ মাঝি ; কালসিন্ধু = কালরূপ সিন্ধু।

উপমান কর্মধারয় :—শশব্যস্ত = শশকের ন্যায় ব্যস্ত ; তুষারধবল = তুষারের ন্যায় ধবল।

উপমিত কর্মধারয় :—চাঁদবদন = বদন চাঁদের মতন ; অধরকমল = কমলের ন্যায় অধর।

(৫) বহুব্রীহি সমাস :—দশানন = দশ আনন যাহার সে ; শূলপাণি = শূল পাণিতে যাঁহার তিনি।

ব্যতিহার বহুব্রীহি :—লাঠালাঠি = লাঠিতে লাঠিতে যে লড়াই ; কানাকানি = কানে কানে যে কথা।

ব্যধিকরণ বহুব্রীহি :—বীণাপাণি = বীণা পাণিতে যাহার ; চন্দ্রচূড় = চন্দ্র চূড়ায় যাহার।

অলুক বহুব্রীহি :—হাতেখড়ি = হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে। গায়েহলুদ ইত্যাদি।

অব্যয়ীভাব :—আকণ্ঠ = কণ্ঠ পর্যন্ত ; প্রতিদিন = দিন দিন।

অথবা, কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে কিভাবে বিশেষ্য শব্দ বিশেষণে ও বিশেষণ শব্দ বিশেষ্যে পরিবর্তিত হয় তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝাও :

উ। [মন্তব্য : প্রশ্নকর্তা হয়ত প্রশ্ন করিবার সময়ে ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে প্রকৃতপক্ষে বিশেষ্যকে কৃৎপ্রত্যয়ের সাহায্যে বিশেষণে পরিণত করা যায় না। কৃৎপ্রত্যয় ধাতুর উত্তর হয়, শব্দের উত্তর হয় না। এইরূপ আর একটি ভুল ১৯৬৩ সালের কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও পাওয়া গিয়াছে।]

নিদ্রা = নি + দ্রা + আলুচ = নিদ্রালু (কৃৎযোগে বিশেষণ)।

আকাঙ্ক্ষা (আ + কাঙ্ক্ষ + অ + স্ত্রীলিঙ্গে আ) + ক্ত = আকাঙ্ক্ষিত (কৃৎযোগে বিশেষণ)।

মেধা + বিণ = মেধাবী (তদ্ধিতযোগে বিশেষণ)।

মৃৎ + ময় = মৃন্ময় (ঐ)।

হিসাব + ই = হিসাবী (ঐ)।

প্র. ২। তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দের পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে বুঝাইয়া দাও।

উ.। তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দের মধ্যে পার্থক্য :—

যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়া বাংলা ভাষায় আসিয়াছে তাহাদিগকে তদ্ভব শব্দ বলে। তদ্ভব কথাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় : তৎ = তাহা হইতে অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে ভব = জাত বা সৃষ্ট,

অতএব সংস্কৃত হইতে জাত যে শব্দ তাহাই তদ্ভব শব্দ। যথা :— হস্ত (সং)>হত্থ (প্রা)>হাত (বাং)। সর্প (সং)>সপ্প (প্রা)>সাপ (বাং)।

যে সকল সংস্কৃত শব্দ সরাসরি বাংলায় আসিয়া উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের ফলে কিঞ্চিৎ বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাদিগকে অর্ধতৎসম শব্দ বলে। যথা :—মন্ত্র>মন্তর ; কৃষ্ণ>কেষ্ট ; শ্রী>ছিরি ইত্যাদি।

অথবা, নিম্নলিখিত প্রায়সদৃশ তিনটি শব্দযুগলের মধ্যে যে-কোনও টির অর্থের পার্থক্য নিরূপণ :—

উ.। স্বত্ব—স্বীয় ভাব, প্রভুত্ব। সত্ত্ব—সত্তা ; অস্তিত্ব।

অধ্যয়ন—পাঠ, শাস্ত্রের আলোচনা। অধ্যাপন—শিক্ষাদান।

বিংশ—বিংশতির পূরণবাচক শব্দ। বিংশতি—কুড়ি, বিশ সংখ্যা।

প্র ৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোন পাঁচটির অশুদ্ধি সংশোধন কর :—

(ক) দুরাবস্থা—দুরবস্থা। (খ) ব্যাবহার—ব্যবহার।

(গ) জ্যোতীন্দ্র—জ্যোতিরিন্দ্র। (ঘ) রোগগ্রস্থ—রোগগ্রস্ত।

(ঙ) সবিনয় পূর্বক—বিনয় পূর্বক। (চ) লক্ষ্যণীয়=লক্ষণীয়।

(ছ) সম্ভ্রান্তশালী—সম্রান্তশালী। (জ) প্রসারতা—প্রসার।

অথবা, নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোনও পাঁচটিকে এক একটি শব্দে প্রকাশ কর—

উ.। (ক) সাধুর ভাব=সাধুত্ব। (খ) যে ব্যাকরণ জানে—বৈয়াকরণ।

(গ) যাহার যশ আছে—যশস্বী। (ঘ) যিনি অভিনয় করেন—অভিনেতা।

(ঙ) যে পড়ে=পড়ুয়া। (চ) মাটি দিয়া তৈয়ারী=মেটে ; মৃন্ময়।

প্র. ৪। স্থূলাক্ষর শব্দের কারক ও বিভক্তি নির্ণয় :—

উ.। (ক) বল—করণকারকে শূন্য বিভক্তি।

(খ) কলমে=করণকারকে সপ্তমী বিভক্তি।

(গ) জনে—সম্প্রদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি।

(ঘ) মেঘে—অপাদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি।

(ঙ) ধুয়ে—অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি।

(চ) ছাদ=অপাদান কারকে শূন্য বিভক্তি।

(ছ) হাতে—করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি।

অথবা, নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোনও পাঁচটির প্রকৃতি-প্রত্যয় নিরূপণ কর।

উ.। (ক) অভিষেক—অভি—সিচ্‌+ঘঞ্‌।

(খ) মহিমা—মহৎ+ই। (গ) আহূত—আ—হ্বে+ক্ত।

(ঘ) বাবুগিরি—বাবু+গিরি। (ঙ) বাড়ন্ত—বাড়্‌+অন্ত।

(চ) দোকানদার—দোকান+দার। (ছ) ভয়ঙ্কর—ভয়+কৃ+খট্‌ (অ)।

প্র. ৫। রূপক ও ব্যতিরেক অলঙ্কার কাহাকে বলে উদাহরণ সহযোগে বুঝাইয়া দাও ঃ

উ.। উপমেয় ও উপমানের মধ্যে যেখানে কোন ভেদ কল্পনা করা হয় না সেখানে রূপক অলংকার হয়। এই অলংকারে উপমানের প্রাধান্য থাকে বলিয়া ক্রিয়াপদটি উপমানেরই অনুগামী হয়। যথা :—

'শাখা-বাহু দ্বারা আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন করো'।

যে অলংকারে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণিত হয় সেই অলংকারকে ব্যতিরেক অলংকার বলা হয়। যথা :—

'বাসন্তী শারদী জিনি' তুমিই গো ঋতুকুলরাণী'।

অথবা, নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলির অলংকার নির্ণয় কর :—

উ.। (ক) লুপ্তোপমা অলংকার। এখানে সমান ধর্ম বা গুণবিশিষ্ট ভিন্নজাতীয় বস্তু—'চাঁদ ও বদন' এর মধ্যে সাদৃশ্য প্রদর্শন অর্থাৎ তুলনা করা হইয়াছে ; এবং 'চাঁদের মতো সুন্দর' বদন, এই অর্থে তুলনাবাচক শব্দ ও সাধারণধর্ম লুপ্ত। 'মরমে মরিয়া'— এখানে 'ম' ধ্বনিটির দ্বিরাবৃত্তিতে অনুপ্রাস অলংকার।

(খ) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকার। এখানে প্রবল সাদৃশ্যহেতু উপমেয় 'সীতাহারা আমি'কে উপমান 'মণিহারা ফণী' বলিয়া উৎকট সম্ভাবনা বা সংশয় জন্মিয়াছে এবং সংশয় বা সম্ভাবনাবাচক 'যেন' শব্দটি রহিয়াছে।

(গ) যমক অলংকার। বহুস্বরব্যঞ্জনের একই শব্দ, এখানে সমোচ্চার্য শব্দ 'ভারত' বাক্যটির মধ্যে দুইবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; (১) ভারত= মহাভারত (২) ভারত=ভারতবর্ষ। অথবা—(১) ভারত=কবি ভারতচন্দ্র (২) ভারত=ভারতবর্ষ।

(ঘ) সমাসোক্তি অলংকার। এখানে একই প্রকারের কার্য দ্বারা উপমেয় 'পরিপাণ্ডু পদ্মদল' ও অনুল্লিখিত উপমানের ব্যবহার 'মুদে আঁখি' আরোপিত হইয়াছে।

উচ্চতর মাধ্যমিক, কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬৫

< প্রথম পত্র >

প্র. ৭। (ক) হইতে (ঙ) পর্যন্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে যে-কোনও তিনটির উত্তর দাও।

(ক) প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ কর :—

উ.। (i) সৃষ্টি=সৃজ্+ক্তি। (ii) বিধান=বি-ধা+অনট্। (iii) স্পর্শ= স্পৃশ্+অল্। (iv) রথী=রথ+ইন্। অবনত=অব+ক্ত।

(খ) নিম্নলিখিত পাঁচটি শব্দযোগে পাঁচটি সার্থক বাক্য রচনা কর :—

(i) অপ্রতিভ—বালকটি মাতার ভর্ৎসনা শুনিয়া অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

(ii) আড়ষ্ট—পিতা ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র পুত্র আড়ষ্ট হইয়া ঘরের এক কোণে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

(iii) বীরশয্যা—শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনকে বলিলেন যে তিনি বীরশয্যাই লাভ করিবেন।

(iv) অর্বাচীন—আমার মতন অর্বাচীন লোকও এই স্বাদেশিকদের সভার সভ্য ছিল।

(v) নিগ্রহ—দ্রৌপদীর নিগ্রহ দেখিয়াও যুধিষ্ঠিরের ধৈর্যচ্যুতি হয় নাই।

(গ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে কোন্‌টিতে কি সমাস হইয়াছে ব্যাসবাক্য সহ তাহা নির্দেশ কর :—

উ.। (i) বীরধর্ম—বীরের ধর্ম (ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস)।

(ii) রবাহূত—রবের দ্বারা আহূত (তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস)।

(iii) জ্ঞানবৃক্ষ—জ্ঞানরূপ বৃক্ষ (রূপককর্মধারয় সমাস)।

(iv) অজ্ঞাত—ন জ্ঞাত (নঞ্‌ তৎপুরুষ সমাস)।

(v) পর্বতনিঃসৃত—পর্বত হইতে নিঃসৃত (পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস)।

(ঘ) উক্তি-পরিবর্তন :

উ.। কুলুকুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম যে তাহারা (ভাগীরথীর জলধারা) যথা হইতে আসিয়াছে আবার তথায় ফিরিয়া যাইতেছে। দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছে।

(ঙ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির গদ্যরূপ লেখ :—

(i) লভিনু—লাভ করিলাম। (ii) পরশে—স্পর্শে।

(iii) বিরাজিতে—বিরাজ করিতে। (iv) তেমতি—সেইরূপ (তেমনি)।

(v) প্রবেশি—প্রবেশ করিয়া।

< দ্বিতীয় পত্র >

প্র. ১। বাক্য কয়প্রকার ও কি কি ? প্রত্যেক প্রকার বাক্যের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

উ.। বাক্য সাধারণতঃ তিন প্রকার। যথা—(১) সরলবাক্য, (২) জটিল বা মিশ্রবাক্য (৩) যৌগিক বাক্য।

যে বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য এবং একটিমাত্র বিধেয় থাকে অর্থাৎ একটি কর্তা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাহাকে সরলবাক্য বলা হয়। যথা,—বিশু বিদ্যালয়ে যাইতেছে।

যে বাক্যে একটিমাত্র বাক্য এবং এক বা একাধিক অপ্রধান বাক্য

থাকে তাহাকে জটিল বা মিশ্রবাক্য বলে। যথা,—তুমি যদি পরিশ্রমী হও, তবে সকল কার্যে কৃতকার্য হইবে।

দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র সরলবাক্য কোন অব্যয়ের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া একটি পূর্ণ বাক্যে পরিণত হইলে তাহাকে যৌগিক বাক্য বলে। যথা,—শিক্ষক মহাশয় উপস্থিত হইলেন, আর ছাত্রটিও পড়িতে আরম্ভ করিল।

অথবা, কর্মধারয় সমাস কাহাকে বলে? দ্বিগু সমাসের সহিত উহার পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে বুঝাইয়া দাও।

উ.। বিশেষ্যপদের সহিত বিশেষণ পদের যে সমাস হয় তাহাকে কর্মধারয় সমাস বলে। এই সমাসে পূর্বপদটি পরপদের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য লাভ করে। যথা—রাজর্ষি = রাজা এমন ঋষি। নীলপদ্ম = নীল যে পদ্ম।

কোন কোন সময়ে পূর্বপদ বিশেষ্য ও পরপদ বিশেষণ হয় এবং পূর্বপদের অর্থই প্রাধান্য লাভ করে। যথা—হলুদবাটা = বাটা যে হলুদ।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় পদই বিশেষণ হয়। যথা—পণ্ডিতমূর্খ = পণ্ডিত যিনি, মূর্খও তিনি।

আবার কোন কোন স্থলে উভয় পদই বিশেষ্য হয়। যথা—আম্রবৃক্ষ = আম্র যে বৃক্ষ।

যে সমাসে সংখ্যাবচক শব্দ থাকে পূর্বপদে এবং উহা পরপদের সহিত অন্বিত হইয়া সমাহার বা সমন্বয় বুঝায় তাহাকে দ্বিগু সমাস বলে। যথা—সপ্তসুর = সপ্তসুরের সমষ্টি। শতাব্দী—শত অব্দের সমাহার।

প্র. ২। সন্ধি কর ঃ—

উ.। (ক) চক্ষু + রোগ = চক্ষুরোগ। (খ) বিপদ + সঙ্কুল = বিপৎসঙ্কুল।
(গ) তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া। (ঘ) বাক্ + রোধ = বাগ্‌রোধ।

অথবা, বিভিন্ন কারক বুঝাইতে 'এ' বিভক্তির ব্যবহার উদাহরণ দিয়া দেখাও।

উ.। কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি—ছাগলে ঘাস খায়।
কর্মকারকে " " —বৃথা গঞ্জ দশাননে।
করণকারকে 'এ' বিভক্তি—নূতন ধান্যে হবে নবান্ন তোমার ভবনে ভবনে।
সম্প্রদান কারকে 'এ' "—সৎপাত্রে কন্যা দান করিবে।
অপাদান কারকে " "—বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা।
অধিকরণ কারকে " "—সুন্দরবনে বাঘ বাস করে।

প্র. ৩। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনও পাঁচটি উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর ঃ—

উ.। (ক) ণিজন্ত—যে ধাতুর কার্য কর্তা ভিন্ন অন্যের দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহাকে ণিজন্ত ধাতু বলে। যথা,—মাতা শিশুকে চন্দ্র দেখাইতেছেন।

(খ) উপপদ তৎপুরুষ—ধাতুর পূর্বে যে বিশেষ্যপদ বসে তাহাকে উপপদ বলা

হয়। উপপদের সহিত কৃদন্ত পদের মিলনে যে সমাস হয় তাহাকে উপপদ তৎপুরুষ বলে। যথা—বর্ণচোরা = বর্ণ চুরি করে যে; বাজিকর = বাজি করে যে।

(গ) যৌগিক ক্রিয়া—যে সকল ধাতুর পূর্বাঙ্গ অসমাপিকা ক্রিয়া (ইয়া, ইতে প্রভৃতি) এবং উত্তরাঙ্গ নে, দে, ফেল্ প্রভৃতি ধাতু, তাহাদিগকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যথা,—মাছটা আংটিটি গিলিয়া ফেলিল। ফিরে চল্। খুলে দে মা চোখের ঠুলি।

(ঘ) মূর্ধন্য বর্ণ—'ট' বর্গের বর্ণগুলির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগকে উল্টাইয়া তাহার দ্বারা অর্থাৎ তালুর সর্বোচ্চ কঠিন অংশকে স্পর্শ করিতে হয় বলিয়া ইহাদিগকে মূর্ধন্য বলা হয়।

(ঙ) নিপাতন—সন্ধির কোন সূত্র বা নিয়ম না মানিয়া পদ সাধন হইলে তাহাদিগকে নিপাতন বলা হয়। যথা,—গো + অস্থি = গবাস্থি। সীম + অন্ত = সীমন্ত।

(চ) বৃদ্ধি—অ স্থলে 'আ', ই ঈ স্থলে 'ঐ', উ ঊ ও স্থলে 'ঔ', ঋ ৠ স্থলে 'আর' হওয়ার নাম বৃদ্ধি।

(ছ) সম্প্রসারণ—য, ব এবং র-এর যথাক্রমে ই, উ এবং ঋ-তে পরিণতির নাম সম্প্রসারণ। যথা—যজ্—ইষ্টি; বপ—উপ্ত; গ্রহ – গৃহীত, গৃহ; বাংলায় দ্বার হইতে দুয়ারকে সম্প্রসারণের উদাহরণ বলা যায়।

অথবা, কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় কাহাকে বলে? চলিত ও সাধু ভাষায় প্রত্যয় সহযোগে প্রত্যেকের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

উ.। ধাতুর উত্তর যে সকল প্রত্যয় যুক্ত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে কৃৎ প্রত্যয় বলা হয়। যথা—দৃশ্ + তব্য = দ্রষ্টব্য; যোগ + আন = যোগান।

শব্দের উত্তর যে সকল প্রত্যয়যুক্ত হয় তাহাদিগকে বলা হয় তদ্ধিত প্রত্যয়। যথা—রঘু + ষ্ণ = রাঘব; দুরন্ত + পনা = দুরন্তপনা।

চলিত ও সাধু ভাষায় প্রত্যয় যোগে কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ :—

কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ :

নাচ + ইয়ে = নাচিয়ে। কাঁদ + উনে = কাঁদুনে।

জ্বাল + আনি = জ্বালানি। মিশ + উক = মিশুক।

তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ :

তামা + টে = তামাটে। হাট + উরে = হাটুরে।

কেরানী + গিরি = কেরানীগিরি। নেশা + খোর = নেশাখোর।

প্র. ৪।। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে কোনও পাঁচটির অশুদ্ধি সংশোধন কর :—

উ.। (ক) অপস্রিয়মান—অপসারণ। (খ) আবর্ত্তিত = আবর্ত, আবৃত।

(গ) উজ্জ্বল = উজ্জ্বল। (ঘ) ষষ্টদশ = ষষ্ঠদশ, ষোড়শ।

(ঙ) নভচারী = নভশ্চর। (চ) নীলিমাদেবী—নীলিমা দেবী।
(ছ) রঞ্জিৎকুমার = রণজিৎকুমার।

অথবা, নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে কোনও দুইটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্দেশ কর :—

উ.। প্রামাণ্য = প্রমাণ + ষ্ণ্য (যোগ্য অর্থে)।
শুশ্রূষা = শ্রু + সন + স্ত্রীং আপ্ (ইচ্ছার্থে)।
মুমূর্ষু = মৃ + সন্—উ (ইচ্ছার্থে)।
আন্তর্জাতিক = আন্তর্জাতি + ইক (সম্বন্ধার্থে)।
প্রাগৈতিহাসিক = প্রাক্ + ঐতিহাসিক (সম্বন্ধার্থে)।
অভুক্ত = অ—ভুজ্ + ক্ত (স্বভাবার্থে)।

প্র. ৫। উপমা ও উৎপ্রেক্ষা অলংকারের স্বরূপ উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও :—

উ। সমান গুণবিশিষ্ট ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য প্রদর্শন দ্বারা তুলনা করা হইলে উপমা অলঙ্কার হয়। সাধারণতঃ উপমার চারটি অঙ্গ (১) উপমেয় (যাহাকে তুলনা করা হয়); (২) উপমান (যাহার সহিত তুলনা করা হয়); (৩) সাধারণ ধর্ম (উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাধারণ গুণ) (৪) তুলনাবাচক শব্দ (যেমন—ন্যায়, সম, প্রায়, মতন)। যথা—যে মুক্তবেণী সম শোভা পায় সুনীল অটবী।

উপমেয়ের সহিত উপমানের অভেদ রূপে সংশয় জন্মিলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। ইহাতে সাধারণতঃ যেন, বুঝি, মনে হয় প্রভৃতি থাকে। যথা—নিখিল সাগর অঙ্কে তুমি যেন কমলে কামিনী।

অথবা, নিম্নোদ্ধৃত যে কোন দুইটির অলংকার ব্যাখ্যা কর :—

উ.। (ক) সমাসোক্তি অলংকার। এখানে একই প্রকারের কার্য দ্বারা উপমেয় 'বসুন্ধরা'র উপর অনুল্লিখিত উপমান [পল্লীবধূ] এর ব্যবহার 'বেড়াটি ধরিয়া 'দিগন্তের পানে' চাহিয়া থাকা আরোপিত হইয়াছে।

(খ) রূপক অলঙ্কার। এখানে ধর্ম বা গুণবিশিষ্ট ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে [ক্ষত চিহ্ন ও অলংকার] সাদৃশ্যপ্রদর্শন অর্থাৎ তুলনা করা হইয়াছে এবং সেই তুলনায় উপমেয় 'ক্ষতচিহ্ন' এবং উপমান 'অলংকার' এর মধ্যে অভেদ আরোপিত হইয়াছে এবং দুইই অভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

(গ) 'ব্যতিরেক' অলংকার। এখানে উপমান 'স্থলপদ্ম' অপেক্ষা উপমেয় 'চরণতল' এর উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে।

(ঘ) অনুপ্রাস অলংকার। এখানে একই বর্ণগুচ্ছ গুরু, গুমরি, গগনে বারম্বার আবৃত্ত হইয়া ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাতে বাক্যের সৌন্দর্য সম্পাদিত হইয়াছে।

উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৬

< প্রথম পত্র >

প্র. ৭। ক হইতে ঙ পর্যন্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কোন তিনটির উত্তর দাও :—

উ. । (ক) প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্দেশ কর :—

(i) চূর্ণীকৃত (ii) ঈদৃশী (iii) তাৎকালিক (iv) অনুরাগ (v) আসক্তি।

(i) চূর্ণীকৃত—চূর্ণ + (অভূততদ্ভাবে) চ্বি + ভৃ + ক্ত।

(ii) ঈদৃশী—ইদম্-দৃশ্ + কঙ্ (অ) + (স্ত্রীলিঙ্গে) ঈ।

(iii) তাৎকালিক—তৎকাল + ঠক (ইক)।

(iv) অনুরাগ—অনু রন্জ্ + ঘঞ্।

(v) আসক্তি—আ-সন্জ্ + ক্তি।

(খ) নিম্নলিখিত পাঁচটি শব্দ সহযোগে পাঁচটি সার্থক বাক্য রচনা কর :—

(i) সমভিব্যাহারে (ii) দন্তস্ফুট (iii) অনাহূত (iv) কাঠিন্য (v) জঙ্গমত্ব।

(i) সমভিব্যাহারে—বাল্মীকির সমভিব্যাহারে লব-কুশ অযোধ্যার রাজসভায় প্রবেশ করিল।

(ii) দন্তস্ফুট—বিকট সমাসবদ্ধ শব্দে কণ্টকিত এই রচনাটিতে দন্তস্ফুট করিবার সাধ্য সাধারণ পাঠকের নাই।

(iii) অনাহূত—পূর্বকালে গৃহস্থগণ অনাহূত অতিথিকেও দেবজ্ঞানে পূজা করিতেন।

(iv) কাঠিন্য—কোমলতার সহিত কাঠিন্যের সংমিশ্রণেই মহৎচরিত্র গঠিত হয়।

(v) জঙ্গমত্ব—জীব-দেহে অণুসমূহের জঙ্গমত্বই জীবনের উৎস।

(গ) সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :—

কাঙাল নিরস্ত্র হয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে। তখন ঈশ্বর বললে, "যে লকড়ি হাতে ধরে রাখতে পারে না, সে আবার খেলবে কি!"

উ. । কাঙ্গাল নিরস্ত্র হইয়া বোকার মত দাঁড়াইয়া আছে। তখন ঈশ্বর বলিল, "যে লকড়ি হাতে ধরিয়া রাখিতে পারে না, সে আবার খেলিবে কি!"

(ঘ) উক্তি পরিবর্তন কর :—

"বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।" ছেলে বিশ্বাস করিল না, বলিল, "না ক্ষিদে নেই বইকি! কই দেখি তোর হাঁড়ি?"

উ. । (মা) ছেলেকে সাদরে বাবা বলিয়া ডাকিয়া বলিল তাহার (মায়ের) ক্ষুধা নাই। ছেলে বিশ্বাস করিল না; সে বলিল, ক্ষুধা নাই এইরূপ হইতে পারে না। সে তখন মায়ের হাঁড়ি দেখিতে চাহিল।

(ঙ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির গদ্যরূপ লিখ :—

(i) নারিবে। (ii) জিনিয়া। (iii) হেনেছি। (iv) রাঙিয়া। (v) হিয়া।

উ.। (i) নারিবে—পারিবে না। (ii) জিনিয়া—জয় করিয়া। (iii) হেনেছি—আঘাত করিয়াছি। (iv) রাঙিয়া—রাঙা হইয়া, বা, রাঙা করিয়া। (v) হিয়া—হৃদয়।

< দ্বিতীয় পত্র >

প্র. ১। উপমিত সমাস ও রূপক সমাসের পার্থক্য উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও :—

উ.। ১৯৬৪ সনের দ্বিতীয় পত্রের প্রথম প্রশ্নের "অথবা" দ্রষ্টব্য।

অথবা, ষত্ব-ণত্ব বিধানের প্রধান দুইটি নিয়ম নির্দেশ করিয়া উদাহরণ দাও :—

উ.। ১৯৬৪ সনের 'কম্পার্টমেণ্টাল' দ্বিতীয় পত্রের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্র. ২। নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির মধ্যে যে কোনও পাঁচটির প্রয়োগ দেখাও :—

(ক) ক্তি। (খ) তৃচ্। (গ) ইত। (ঘ) ইন্। (ঙ) উয়া। (চ) অন্ত। (ছ) আলি। (জ) পনা।

উ.। ক্তি—গম্ + ক্তি—গতি, ভজ্ + ক্তি—ভক্তি } ভাবার্থে ও ভাববাচ্যে।

তৃচ্—কৃ + তৃচ্—কর্তৃ ; প্রথমা বিভক্তির একবচনে কর্তা।

দা + তৃচ্ দাতৃ ; দাতা (কর্তৃবাচ্যে) করে যে এই অর্থে।

(গ) ইত—ফল + ইত—ফলিত, তারকা + ইত—তারকিত } অস্ত্যর্থে।

ইন্—গুণ + ইন্—গুণিন্ ; প্রথমা বিভক্তির একবচনে গুণী।

ধন + ইন্—ধনিন্ ; " " " ধনী।

উয়া—কাঠ + উয়া—কাঠুয়া > কেঠো—কাঠের মত শুষ্ক (সদৃশার্থে)।

বন + উয়া—বনুয়া > বুনো—বনজাত বা বন হইতে আগত অর্থে।

অন্ত—পড্ + অন্ত = পড়ন্ত, যাহা পড়িতেছে।

জল + অন্ত—জলন্ত (যাহা জ্বলিতেছে)

আলি— { ঠাকুর + আলি = ঠাকুরালি, চতুর + আলি = চতুরালি } ভাবার্থে।

পনা— { দুরন্ত + পনা = দুরন্তপনা, বীর + পনা = বীরপনা } ভাবার্থে।

প্র.। (অথবা) নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে কোনও পাঁচটি শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় নিরূপণ কর :—

(ক) বক্ষ্যমান (খ) রোরুদ্যমান। (গ) কৌন্তেয়। (ঘ) মায়াবী। (ঙ) শাঁসাল। (চ) বলিয়ে। (ছ) আদুরে। (জ) ঢাকনি।

উ.। (ক) বক্ষ্যমান—বচ্‌+স্যমান—(বলা হইবে এই অর্থে)।

(খ) রোরুদ্যমান—রুদ্‌+যঙ্‌+শানচ্‌ (আন) (পুনঃ পুনঃ রোদন করিতেছে, এমন)

(গ) কৌন্তেয়—কুন্তী+ঢক্‌ (এয়) অপত্যার্থে।

(ঘ) মায়াবী—মায়া+বিন্‌—মায়াবিন্‌, প্রথমা বিভক্তির একবচনে মায়াবী ; (অস্ত্যর্থে)।

(ঙ) শাঁসাল—শাঁস+আল—অস্ত্যর্থে।

(চ) বলিয়ে—বল্‌+ইয়ে—নিপুণার্থে।

(ছ) আদুরে—আদর+ইয়া>আদুরে (অস্ত্যর্থে)।

(জ) ঢাকনি—ঢাক্‌+অনি—যাহা দিয়া ঢাকা যায়।

প্র. ৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে কোনও পাঁচটি শব্দ বাছিয়া লইয়া তাহাদের মধ্যে বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণ-গুলিকে বিশেষ্যে পরিবর্তিত কর :—

(ক) সম্পন্ন। (খ) বিশ্রাম। (গ) বসন্ত। (ঘ) আসন। (ঙ) গেঁয়ো। (চ) বুড়ো। (ছ) প্রীতি। (জ) প্রশ্ন।

উ.। (ক) সম্পন্ন—বিশেষণ সম্পদ্‌—বিশেষ্য।
(খ) বিশ্রাম—বিশেষ্য বিশ্রান্ত—বিশেষণ।
(গ) বসন্ত—বিশেষ্য বাসন্ত, বাসন্তিক—বিশেষণ।
(ঘ) আসন—বিশেষ্য আসীন—বিশেষণ।
(ঙ) গেঁয়ো—বিশেষণ গাঁ—বিশেষ্য।
(চ) বুড়ো—বিশেষণ বুড়োমি—বিশেষ্য।
(ছ) প্রীতি—বিশেষ্য প্রীত—বিশেষণ।
(জ) প্রশ্ন—বিশেষ্য পৃষ্ট, প্রষ্টব্য—বিশেষণ।

প্র.। (অথবা), নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে কোনও পাঁচটির সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

(ক) বিচ্ছেদ (খ) নিশ্চিহ্ন (গ) বিপন্মুক্ত (ঘ) গ্রামাঞ্চল (ঙ) জগদ্বন্ধ (চ) প্রাতরাশ (ছ) উল্লেখ।

উ.। (ক) বিচ্ছেদ=বি+ছেদ (স্বরবর্ণ+ছ=চ্ছ)

(খ) নিশ্চিহ্ন=নিঃ+চিহ্ন (ঃ+চ, ছ=শ্চ, শ্ছ)

(গ) বিপন্মুক্ত=বিপদ+মুক্ত (ৎ, দ+ম=ন্ম)

(ঘ) গ্রামাঞ্চল=গ্রাম+অঞ্চল (অ, আ+অ, আ=আ)

(ঙ) জগদম্বা = জগৎ + অম্বা (বর্গের হসন্ত প্রথম বর্ণ + স্বরবর্ণ = বর্গের তৃতীয়

(চ) প্রাতরাশ = প্রাতঃ + আশ (র্-জাত বিসর্গ + স্বরবর্ণ = র্ + স্বরবর্ণ)

(ছ) উল্লেখ + উদ্ = লেখ (ৎ, দ্ + ল = ল্ল)

প্র. ৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে কোনও পাঁচটির অশুদ্ধি সংশোধন কর :—

(ক) তেজচন্দ্র। (খ) ব্যাথা (গ) মুখস্ত। (ঘ) লক্ষ্যণীয়। (ঙ) বিপদ্পাৎ। (চ) মহদাশয় (ব্যক্তি)। (ছ) আশীষ।

উ.। (ক) তেজচন্দ্র—তেজঃ + চন্দ্র = তেজশ্চন্দ্র (শুদ্ধ)।

(খ) ব্যাথা—বি – অথ্ + অঙ্ (অ) + স্ত্রীলিঙ্গে আ = ব্যথা (শুদ্ধ)

(গ) মুখস্ত—মুখ – স্থা + ক (অ) = মুখস্থ (শুদ্ধ)।

(ঘ) লক্ষ্যণীয়—(i) লক্ষ্ + য = লক্ষ্য (শুদ্ধ) (ii) লক্ষ্ + অনীয় = লক্ষণীয় (শুদ্ধ)।

(ঙ) বিপদ্পাত—বিপদ্ + পাত = বিপৎপাত (শুদ্ধ)

(চ) মহদাশয় (ব্যক্তি) = মহতের আশয় মহদাশয়। কিন্তু ব্যক্তির বিশেষণ-রূপে 'মহাশয়'—পদটি ব্যবহৃত হইতে পারে। মহান্ আশয় যাহার—মহাশয় (শুদ্ধ)।

(ছ) আশীষ—আ-শাস্ + ক্বিপ্ = আশিস্ (শুদ্ধ)।

প্র.। (অথবা), উপসর্গের পর ধাতুর অর্থ কি ভাবে পরিবর্তিত হয়, দেখাও।

উ.। হৃ—এই ধাতুর অর্থ হরণ করা।

কিন্তু বি—হৃ = বিচরণ করা। আ—হৃ = আহার করা। পরি—হৃ = পরিত্যাগ করা। অব—হৃ = বিরতি সাধন করা। সম—হৃ = বধ করা। প্র—হৃ = আঘাত করা। সম্—অ-হৃ = সম্মিলিত করা। বি—অব-হৃ = আচরণ করা। উপ—হৃ = উপঢৌকন দেওয়া।

প্র. ৫। বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত পাঁচটি বিদেশী শব্দের ও তাহাদের আকারের উল্লেখ কর।

উ.। ডাক্তার, চেয়ার, আইন, কাফে, রিক্স, এই পাঁচটি শব্দের উৎস বিভিন্ন বিদেশী ভাষা—

ডাক্তার—ইংরেজী "Doctor" শব্দ হইতে আসিয়াছে।

চেয়ার—ইংরেজী "Chair" শব্দের অবিকৃত রূপ।

আইন—ফার্সী (Persian) ভাষা হইতে আসিয়াছে।

কাফে—ফরাসী (French) 'cafe' শব্দ হইতে আসিয়াছে।

রিক্স—জাপানী ভাষা হইতে আসিয়াছে।

প্র.। (অথবা), নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে কোনও পাঁচটির বিপরীতার্থক শব্দ নির্দেশ কর :—

(ক) তিরস্কার। (খ) হর্ষ। (গ) সন্ধি। (ঘ) গৌণ। (ঙ) অগ্রজ। (চ) উৎকৃষ্ট। (ছ) আবাহন।

উ.। (ক) তিরস্কার—পুরস্কার। (খ) হর্ষ—বিষাদ। (গ) সন্ধি—বিগ্রহ। (ঘ) গৌণ—মুখ্য। (ঙ) অগ্রজ—অনুজ। (চ) উৎকৃষ্ট—অপকৃষ্ট। (ছ) আবাহন—বিসর্জন।

প্র. ৬। উপমা ও রূপকের পার্থক্য উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

উ.। 'বিচিত্রার' অলংকার ভাগ দ্রষ্টব্য।

প্র.। (অথবা) যে কোনও দুইটি অলংকার ব্যাখ্যা কর :—

(ক) বাছা করে সর সর পাপিনী বলে সর সর
অবসর হয় না সর দিতে।

(খ) বসিলা যুবতী পদতলে, আহামরি, স্বর্ণ দেউটি তুলসীর মূলে যেন, জ্বলিল।

(গ) কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা, পদনখে পড়ে আছে তার কতগুলা।

উ.। (ক) (i) প্রথম পংক্তির প্রথম 'সর সর'—দুধের সর। দ্বিতীয় 'সর সর'—সরে যা, সরে যা।

দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম 'সর'—অবসর শব্দের শেষাংশ; দ্বিতীয় সর=দুধের সর। 'সর' শব্দটি কবিতাংশে একাধিক বার প্রযুক্ত হইয়া ভিন্নার্থ সূচনা করায়, যমক অংকারের উদ্ভব ঘটিয়াছে।

(ii) স ও র এর অনুপ্রাস ঘটিয়াছে।

(খ) পদতলে উপবিষ্টা যুবতী উপমেয়, তুলসীর মূলস্থিত দেউটি উপমান; উভয়ের মধ্যে প্রবল সাদৃশ্য বশতঃ উপমেয়কে উপমান বলিয়া উৎকট সন্দেহ দ্যোতিত হইতেছে, আবার 'যেন' এই সন্দেহদ্যোতক অব্যয়টিও প্রযুক্ত হইয়াছে; ফলে বাচ্যোৎপেক্ষা উদ্ভব ঘটিয়াছে।

(গ) (i) শারদ শশী উপমান; মুখ উপমেয়; উদ্ধৃতাংশে উপমান অপেক্ষ উপমেয়ের উৎকর্ষ সূচিত হওয়ায় ব্যতিরেক অলংকারের সৃষ্টি হইয়াছে।

(ii) 'শ'-এর অনুপ্রাস ঘটিয়াছে।

॥ উচ্চতর মাধ্যমিক, ১৯৬৭ ॥

< প্রথম পত্র >

৭। (ক) হইতে (ঘ) পর্যন্ত প্রশ্নগুলির যে কোনও তিনটির উত্তর দাও :—

প্রঃ—(ক) প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর :—

(i) গোময় (ii) সঞ্চিত (iii) লেঠেল (iv) আত্মজ (v) দারিদ্র্য।

উত্তর :—(i) গোময়—গো + ময় (ট্) (ii) সঞ্চিত—সম—চি + ক্ত (iiii) লেঠেল—লাঠি + আল = লাঠিয়াল > লাইঠ্যাল > লেঠেল (iv) আত্মজ—আত্মন্—জন্ + অ (ড) (v) দারিদ্র্য—দরিদ্র + য।

(খ) নিম্নোদ্ধৃত পাঁচটি শব্দ সহযোগে পাঁচটি সার্থক বাক্য রচনা কর :—

(i) লিপিকর (ii) অবিমিশ্র (iii) অন্তঃশীলা (iv) অপরিমেয় (v) অশনবসন।

উত্তর :—(i) লিপিকর :—ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে নিপুণ লিপিকরগণ বিশেষ মর্যাদার সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন।

(ii) অবিমিশ্র :—জীবনে অবিমিশ্র সুখের স্বপ্ন বিরচন করিয়া অকারণে দুঃখ পাইতে হয়।

(iii) অন্তঃশীলা :—ঈশ্বরচন্দ্রের অন্তঃশীলা স্নেহফল্গুধারা দুঃখীর দুঃখ বিমোচনে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

(iv) অপরিমেয় :—রবীন্দ্রনাথের অপরিমেয় মনীষার অতুল সম্পদে ভারতবর্ষ ঋদ্ধ হইয়াছে।

(v) অশনবসন :—কোটি কোটি ভারতবাসী অশনবসনের অভাবে আজ জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

প্রঃ—(গ) সাধুভাষায় পরিবর্তন কর :—

তুমি আজন্ম পাণ্ডবদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ক'রে আসছ, কিন্তু তাঁরা তা সয়েছেন। পাণ্ডবরা যে রাজ্য জয় করেছিলেন, তা এখন তুমি ভোগ করছ।

উঃ—তুমি আজন্ম পাণ্ডবদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিয়া আসিতেছ, কিন্তু তাঁহারা তাহা সহিয়াছেন। পাণ্ডবেরা যে রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, তাহা এখন তুমি ভোগ করিতেছ।

প্রঃ—(ঘ) উক্তি পরিবর্তন কর :—

সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাকে ডেকে আনতে পারিস্ বাবা ?

কাকে মা ?

ওই যে রে—ও গাঁয়ে উঠে গেছে।

উঃ—সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে সাদরে বাবা বলিয়া ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল সে তাহাকে ডাকিয়া আনিতে পারে কি না। ছেলে মাকে সম্বোধন করিয়া কাহাকে ডাকিয়া আনিতে হইবে তাহা জানিতে চাহিল। মা ইঙ্গিতে অপর গ্রামে যে উঠিয়া গিয়াছে তাহাকে ডাকিতে বলিলেন।

< দ্বিতীয় পত্র >

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কোনও পাঁচটির উত্তর দাও :—

প্রঃ—(ক) উদাহরণ সহযোগে কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও :—

উঃ—কৃৎপ্রত্যয় :—ধাতুর উত্তর যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হইয়া নূতন শব্দ সৃষ্টি করে তাহাকে কৃৎপ্রত্যয় বলে।

কৃ + ক্বিপ্ = কৃৎ   কৃ + অন = করণ

বৃ + অণীয় = বরণীয়   ধৃ + য = ধার্য।

ক্বিপ্, অন, অণীয়, য কৃৎপ্রত্যয়।

তদ্ধিত প্রত্যয় :—শব্দের উত্তর যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হইয়া নূতন শব্দ সৃষ্টি করে তাহাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যথা—দেব + অ = দৈব ; সুমিত্রা + ই = সৌমিত্রি ; দক্ষ + আয়ণ = দাক্ষায়ণ ; গো + য = গব্য।

অ, ই, আয়ণ, য—তদ্ধিত প্রত্যয়।

প্রঃ—(খ) বাংলায় পূরণবাচক শব্দ কিভাবে গঠিত হয় দেখাও :—

উঃ—বাংলায় পূরণবাচক শব্দ মুখ্যতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে গঠিত হয় :—

(১) তৎসম সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ তদ্ধিতপ্রত্যয় যোগ করিয়া :—

দ্বি + তীয় = দ্বিতীয়   একাদশ + তম = একাদশতম

বিংশতি + অ = বিংশ   ত্রিংশৎ + অ = ত্রিংশ

(২) অতৎসম 'এর' প্রত্যয় যোগে :—

দশ + এর = দশের [দশের কোঠা]

একুশ + এর = একুশের [একুশের ঘর]

(৩) অতৎসম 'অই', 'ইয়া' প্রত্যয় যোগে—

পাঁচ + অই = পাঁচই > পাঁচুই   একুশ + ইয়া = একুশিয়া > একুশে

প্রঃ—(গ) যে কোনও পাঁচটির স্থলে সন্ধি কর :—

নিঃ + রোগ ; চলৎ + চিত্র ; রাজ + ছত্র ; বাক্ + জাল ; মনঃ + মোহন ; প্রিয়ম্ + বদা ; সু + আগত।

উঃ—নিঃ + রোগ = নীরোগ ; চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র ; রাজ + ছত্র = রাজচ্ছত্র ; বাক্ + জাল = বাগ্‌জাল ; মনঃ + মোহন = মনোমোহন ; প্রিয়ম্ + বদা = প্রিয়ংবদা ; সু + আগত = স্বাগত।

প্রঃ—(ঘ) নিম্ননির্দিষ্ট শব্দগুলির মধ্যে যে কোনও পাঁচটির স্থলে ব্যাসবাক্য উল্লেখ করিয়া সমাসের নাম লিখ :—

রান্নাঘর ; মুখপোড়া ; প্রোষিতভর্তৃকা ; বিপত্নীক ; বীণাপাণি ; যথাশক্তি ; তেলেভাজা।

উঃ—রান্নাঘর—রান্নার নিমিত্ত ঘর—৪র্থী তৎপুরুষ।

মুখপোড়া—মুখ পোড়া যাহার—বহুব্রীহি।

প্রোষিতভর্তৃকা—প্রোষিত ভর্তা যাহার—বহুব্রীহি + সমাসান্তক + স্ত্রীলিঙ্গ, আ।

বিপত্নীক—বিগতা পত্নী যাহার—বহুব্রীহি + সমাসান্ত ক প্রত্যয়।

বীণাপাণি—বীণা পাণিতে যাহার—বহুব্রীহি।

যথাশক্তি—শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া—অব্যয়ীভাব।

তেলেভাজা—তেলে (তেল দিয়া) ভাজা—অলুক তৃতীয়া।

প্রঃ—(ঙ) নিম্ননির্দিষ্ট প্রায় সদৃশ শব্দগুলির মধ্যে যে কোনও দুইটির ক্ষেত্রে শব্দ দুইটির অর্থের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও :—

(ক) পূর্বাহ—পূর্বদিন। পূর্বাহ্ণ—দিনের পূর্বভাগ।

(খ) স্বত্ব—অধিকার। সত্ত্ব—প্রাণী, বল, গুণবিশেষের নাম।

(গ) কৃত—সম্পন্ন, বিহিত। ক্রীত—যাহা ক্রয় করা হইয়াছে।

(ঘ) শয্যা—শী + ক্যপ্ + (স্ত্রীং) আ। সজ্জা—সস্জ + অঙ্ + (স্ত্রীং) আ।

প্রঃ—(ছ) নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির মধ্যে যে কোনও পাঁচটির প্রয়োগ দেখাও :—

ইল, ঈয়স্, তন, ইমন্, গিরি, দার, বিন্, তা।

উঃ—ইল—ফেন + ইল = ফেনিল

ঈয়স্—গুরু + ঈয়স্ = গরীয়স্ (১মা বিভক্তি ১ বচনে—গরীয়ান্)

তন—অধুনা + তন = অধুনাতন

ইমন্—লঘু + ইমন্ = লঘিমন্ [১মা ১ বচনে লঘিমা]

গিরি—কেরানী + গিরি = কেরানীগিরি

দার—জমি + দার + জমিদার

বিন্—যশস্ + বিন্ = যশস্বিন্ [১মা ১ বচনে যশস্বী]

তা—সাধু + তা = সাধুতা।

প্রঃ—(জ) নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির মধ্যে যে কোনও পাঁচটিকে এক একটি শব্দের দ্বারা প্রকাশ কর :—

জয় করিবার ইচ্ছা—জিগীষা।

যাহার শ্রী আছে—শ্রীমান্, শ্রীমতী, শ্রীল।

যাহার মান আছে = মানী।

যে গান গাইতে পারে = গাইয়ে।

যাহা পূর্বে দেখা যায় নাই = অদৃষ্টপূর্ব।

যে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে—পণ্ডিতম্মন্য।

যাহার শত্রু জন্মে নাই—অজাতশত্রু।

প্রঃ ২। শ্লেষ ও সমাসোক্তি অলংকার কাহাকে বলে ?

উঃ—['বিচিত্রার' অলঙ্কার আলোচনাংশে প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য]

প্রঃ—অথবা—নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যে যে কোনও দুইটির অলংকার ব্যাখ্যা কর :—

(ক) নিভিল অকালে আশার প্রদীপ।

(খ) নবীন নবনীনিন্দিত করে দোহন করিছে দুগ্ধ।

(গ) শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই/'আয়, আয়' কাঁদিতেছে' তেমনি সানাই।

উঃ—(ক) আশার প্রদীপ নিভিল—প্রদীপই নেভে।

প্রদীপ উপমান, আশা উপমেয়—দুইএর অভেদ কল্পিত হইয়াছে; উপমানের প্রাধান্যাভাস রহিয়াছে সুতরাং রূপক অলংকারের উদ্ভব হইয়াছে।

'আ' কারের অনুপ্রাস হইয়াছে।

(খ) নবীন নবনীনিন্দিত করে দোহন করিছে দুগ্ধ—

নবনী উপমান, কর উপমেয়; কর কোমলতা-ধর্মে নবনীকেও লাঞ্ছিত করে—অর্থাৎ উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের গৌরবাধিক্য সূচিত হইয়াছে। অতএব ব্যতিরেক অলংকারের প্রকাশ ঘটিয়াছে। 'ন' এর অনুপ্রাস লক্ষণীয়।

(গ) শুনিতেছি আজি আমি প্রাতে উঠিয়াই

'আয়, আয়' কাঁদিতেছে, তেমনি সানাই।

'সানাই' অপ্রাণি-বাচক; সন্তানহারা জননীর ব্যাকুল চেতনা এই 'সানাই' কবি মহাত্ম্য অর্জন করিয়াছে। সুতরাং সমাসোক্তির উজ্জ্বল রস উদ্ধৃতাংশটিকে পরিপ্লাবিত করিয়াছে।

'ত' ও 'আ' এর অনুপ্রাস উল্লেখযোগ্য।

॥ উচ্চতর মাধ্যমিক কম্পার্টমেণ্টাল, ১৯৬৭ ॥

< প্রথম পত্র >

৭। (ক) হইতে (ঙ) পর্যন্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কোন তিনটির উত্তর দাও :—

প্রঃ—(ক) প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্ণয় কর :—

(i) খেপামি (ii) প্রতিবিধান (iii) বিচারক (iv) শয়ন (v) কণ্ঠস্থ।

উঃ—(i) খেপামি—খেপা + আমি। (ii) প্রতিবিধান—প্রতি—বি—ধা + অন।
(iii) বিচারক—বি—চর্ + অক। (iv) শয়ন—শী + অন। (v) কণ্ঠস্থ—কণ্ঠ + স্থা + অ।

প্রঃ—(খ) নিম্নলিখিত পাঁচটি শব্দ দ্বারা পাঁচটি সার্থক বাক্য রচনা কর :—

(i) নিরবধি (ii) চরিতার্থ (iii) উন্মাদনা (iv) প্রচ্ছন্ন (v) লক্ষ্মীশ্রী :—

(i) নিরবধি—নিরবধি কালস্রোত মানুষের সমস্ত কীর্তি নিঃশেষে মুছিয়া ফেলে।

(ii) চরিতার্থ :—মানুষের আশা কদাচিৎ চরিতার্থ হয়।

(iii) উন্মাদনা :—বিবেকানন্দের মহাবাণী ভারতীয় তরুণগণের মনোলোকে অভূতপূর্ব উন্মাদনা সঞ্চারিত করিয়াছিল।

(iv) প্রচ্ছন্ন :—বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্তরের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কোন কাজ করিতে পারিতেন না।

(v) লক্ষ্মীশ্রী :—জাতীয় জীবনের লক্ষ্মীশ্রী আজ শঠতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া

প্রঃ—(গ) নিম্নোদ্ধৃত শব্দগুলির মধ্যে কোন্‌টিতে কি সমাস হইয়াছে তাহা ব্যাসবাক্য সহ উল্লেখ কর :—

(i) জীবন-উদ্যান (ii) মহারুদ্রতেজে (iii) কালসিন্ধুজলতলে (iv) পাশ্চাত্ত্যজাতিসুলভ (v) সুরনদী।

উঃ—(i) জীবন-উদ্যান—জীবন রূপ উদ্যান (রূপক সমাস)।

(ii) মহারুদ্রতেজে:—মহান্ রুদ্র (কর্মধারয়) তাঁহার তেজ (ষষ্ঠী তৎ) তাহাতে।

(iii) কালসিন্ধুজলতলে : -কাল রূপ সিন্ধু (রূপক কর্মধারয়) তাহার জল (ষষ্ঠী তৎ) তাহার তল (ষষ্ঠী তৎ) তাহাতে।

(iv) পাশ্চাত্ত্যজাতিসুলভ :—পাশ্চাত্ত্য যে জাতি (কর্মধারয়) তদ্দ্বারা সুলভ (তৃতীয়া তৎপুরুষ)।

(v) সুরনদী :—সুরবন্দিতা নদী (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)

প্রঃ -(ঘ) উক্তি পরিবর্তন কর :—

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, "ভাগিনা, একি কথা শুনি!" ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।"

উ,—রাজা ভাগিনাকে ডাকিয়া ভাগিনা সম্বোধন করিয়া ঐরূপ কথা শোনার হেতু জানিতে চাহিলেন। ভাগিনা প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়া মহারাজকে সশ্রদ্ধভাবে সম্বোধন করিয়া জানাইলেন পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।

প্রঃ—(ঙ) গদ্যরূপ লিখ :—

(i) লভিনু (ii) হিযা (iii) বারতা (iv) নিরখি (v) উজলে।

উঃ—(i) লভিনু –লাভ করিলাম (ii) হিয়া—হৃদয় (iii) বারতা—বার্তা (iv) নিরখি—নিরীক্ষণ করিয়া (v) উজলে—উজ্জ্বল করে।

< দ্বিতীয় পত্র >

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কোনও পাঁচটির উত্তর দাও :—

প্রঃ—ক) সংস্কৃত ভাষার সন্ধির সহিত বাংলা ভাষার সন্ধির পার্থক্য উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও :—

উঃ—(i). সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে খাঁটি বাংলা সন্ধিও সংস্কৃত সন্ধিরীতি সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে না। সংস্কৃতের নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির মত বাংলা সন্ধির দৃষ্টান্ত বিরল নয়। একথা সত্য যে সংস্কৃত সন্ধির সাধারণ নিয়ম বাংলায় সর্বক্ষেত্রে অনুসৃত হয় না।

(ii). কিন্তু বহুক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার দুহিতা বাংলা ভাষা সংস্কৃতের সন্ধিরীতিও অনুসরণ করে।

সংস্কৃত নিপাতন সিদ্ধ সন্ধি	বাংলা সন্ধি
কুল + অটা = কুলটা	বার + এক = বারেক।
['কুল' শব্দের "ল্" এর পরবর্তী 'অ' সন্ধিক্ষেত্রে লুপ্ত]	['র্' এর পরবর্তী 'অ' লুপ্ত হইয়াছে

পৃষৎ + উদর = পৃষোদর
['ৎ' এর লোপ হইয়াছে ।

জগৎ + বন্ধু = জগবন্ধু
['ৎ' এর লোপ হইয়াছে]

[বাংলায় অনুসৃত সংস্কৃত সন্ধিরীতি]

জগৎ + জন = জগজ্জন
নাত + জামাই = নাজ্জামাই
ষট্ + যন্ত্র = ষড়্যন্ত্র
ছোট্ + দাদা = ছোড়্দাদা ।

[একান্তরূপে বিশিষ্ট বাংলা সন্ধি
[সমীকরণ]

বড + ঠাকুর = বট্ঠাকুর
পাঁচ + জন = পাজ্জন
পাঁচ + সের = পাঁস্সের

(iii) সন্ধি সাধন ব্যাপারে (অর্থাৎ আসন্ন বর্ণসমূহের মিলন ঘটন রীতিতে) সংস্কৃতের সহিত বাংলার পার্থক্য আছে ।

সংস্কৃতে সমাসবিহিত পদে সন্ধি অবশ্যকরণীয়—শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র, কিন্তু বাংলায় শরৎচন্দ্র (চট্টোপাধ্যায়) লিখিলে কেহ আপত্তি করিবে না ।

পিতৃ + আদর = পিত্রাদর (সংস্কৃতে) । পিতৃ-আদরে তিনি আমাকে পালন করিয়াছেন (বাংলা) ।

মহা-ওঙ্কার ধ্বনি = বাংলায় গ্রহণীয় ; কিন্তু সংস্কৃতে মহোঙ্কার ধ্বনি ।

সংস্কৃতে কবিতা পংক্তিতে দুইটি আসন্ন বর্ণের মধ্যে সন্ধি সম্ভাবনা থাকিলে অবশ্য সন্ধি বিধেয় । কিন্তু বাংলায় ঐরূপ নিয়ম অচল ।

তিনি আছেন সবার মাঝে এই ক্ষেত্রে 'তিন্যাছেন' অকল্পনীয় ।

প্রঃ—(খ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে কোনও পাঁচটি গুচ্ছকে সমাসবদ্ধ কর :—

মহান্ রাজা ; মুখ চন্দ্রের ন্যায় ; পঞ্চবর্ষের সমাহার ; কর্ম করে যে ; বোঝাই নৌকা যাহা দ্বারা ; নাই ক্রিয়া যাহার ; কমলের মত অক্ষি যাহার ।

উঃ—মহান্ রাজা = মহারাজ (কর্মধারয়) ।
মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র [উপমিত কর্মধারয়] ।
পঞ্চবর্ষের সমাহার = পঞ্চবর্ষ [দ্বিগু] ।
কর্ম করে যে = কর্মকার (উপপদতৎপুরুষ] ।
বোঝাই নৌকা যাহা দ্বারা = নৌকা-বোঝাই [বহুব্রীহি] ।
নাই ক্রিয়া যাহার = নিষ্ক্রিয় [বহুব্রীহি] ।
কমলের মত অক্ষি যাহার = কমলাক্ষ [বহুব্রীহি সমাসান্ত 'অ' প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে] ।

প্রঃ—(ঘ) নিম্নের বাক্যগুলির মধ্যে কোনও পাঁচটি মোটা হরফের পদের কারক ও বিভক্তি নিরূপণ কর :—

পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায় । আমি কি ডরাই সখি ভিখারী

রাঘবে? অন্ধজনে দয়া কর। ঘরকে চল। কে তোরে মজাল দিয়ে পত্রপুষ্প ফল? এমন ছেলে ত দেখি নাই। তাহারা তাস খেলিতেছে।

পাগলে—কর্তৃকারকে "এ" বিভক্তি।

রাঘবে—কর্মকারকে "এ" বিভক্তি।

অন্ধজনে—কর্মকারকে "এ" বিভক্তি।

ঘরকে—(1) 'চল্' ধাতু গত্যর্থক বলিয়া "ঘরকে" সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণে কর্মে কে' বিভক্তি বলা চলে।

(2) বাংলা ভাষার প্রকৃতি অনুসরণে অধিকরণে "রে" বিভক্তি।

তোরে—(1) 'মজাল' ক্রিয়ার কর্মে "রে"

(2) 'দিয়ে' ক্রিয়ার সম্প্রদানকারকে "রে" বিভক্তি।

"ছেলে"—কর্মে ["দেখি" ক্রিয়ার] শূন্য বিভক্তি।

তাস—করণে শূন্য বিভক্তি।

(ঙ) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনও দুইটির তাৎপর্য বিশেষভাবে বুঝাইয়া দাও :—

যৌগিকবাক্য, অপত্যার্থক প্রত্যয়, নামধাতু, নিত্যবৃত্ত অতীত।

যৌগিকবাক্য :—একাধিক স্বাধীন বাক্যের সমবায়ে যে বাক্য গঠিত হয় তাহাকে যৌগিক বাক্য বলে। যথা :—

মহেশবাবু ধনী ছিলেন কিন্তু কাহাকেও কাণা কড়িও দিতেন না।

অপত্যার্থক প্রত্যয় :—শব্দের উত্তর যে তদ্ধিতপ্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়া সে শব্দ দ্বারা সূচিত ব্যক্তি বা প্রাণীর অপত্যার্থ সূচিত করে তাহাকে অপত্যার্থক প্রত্যয় বলে। যথা :—

দশরথ + ষ্ণি = দাশরথি, জমদগ্নি + ষ্ণ্য = জামদগ্ন্য।

নামধাতু—প্রাতিপদিক, নাম বা শব্দের উত্তর প্রত্যয়যুক্ত করিয়া যে ধাতু সৃষ্টি করা হয় তাহাকে নামধাতু বলে। যথা :—

বিষ + আ = বিষা। শব্দ + ক্যঙ্ = শব্দায়।

নিত্যবৃত্ত অতীত—অতীতে কোনও ক্রিয়ার অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি বুঝাইতে ঐ ক্রিয়ার ধাতুর উত্তর 'ইত্' প্রত্যয় ও 'আম', 'এ', বিভক্তি যোগে যে কাল সূচিত হয় তাহাকে নিত্যবৃত্ত অতীতকাল বলে।

যথা—আমার পিতৃদেব প্রত্যহ গীতা পাঠ করিতেন।

অবিনাশ মন দিয়া বই পড়িত।

প্রঃ—(চ) কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাসের পার্থক্য উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও :—

উঃ—কর্মধারয় সমাস ও দ্বিগুসমাস উভয়েই তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত। উভয় প্রকার সমাসেই উত্তর পদের অর্থ প্রধান হয়। কিন্তু কর্মধারয় সমাসের পূর্বপদ সংখ্যা-বাচক হয় না ও উত্তরপদের সহিত সমাহারার্থ সূচিত করে না। দ্বিগু সমাসে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ ও উত্তর পদের সহিত সমাহারার্থ সূচিত করে।

যথা—মহান্ যে ঋষি = মহর্ষি (কর্মধারয় সমাস)।

ত্রি (তিন ভুবনের সমাহার = ত্রিভুবন (দ্বিগু সমাস)।

প্রঃ—(ছ) নিম্নলিখিত বর্ণগুলির পাঁচটির উচ্চারণ-স্থান নিরূপণ কর :—

ম, উ, প, দ, ছ, ঘ, ড।

ম—ওষ্ঠ ও নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত বলিয়া ঔষ্ঠ্য ও নাসিক্য।

উ—ওষ্ঠ হইতে জাত বলিয়া ঔষ্ঠ্য বর্ণ।

প—ওষ্ঠ হইতে জাত বলিয়া ওষ্ঠ্য। দ—দন্ত জাত বলিয়া দন্ত্য।

ছ—তালুজাত বলিয়া তালব্য। ঘ—কণ্ঠজাত বলিয়া কণ্ঠ্য।

ড—মূর্ধার সহিত জিহ্বার সংঘর্ষে জাত বলিয়া মূর্ধন্য।

প্রঃ—(জ) দৃশ্, কৃ, পঠ্, ও ভুজ্ ধাতুর মধ্যে যে কোনও দুইটি ধাতুর সহিত বিভিন্ন প্রত্যয় যোগ করিলে কিরূপ বিভিন্ন অর্থ প্রকাশিত হয় দেখাও।

উঃ—দৃশ্—দৃশ + ণক = দর্শক (দেখে যে)

দৃশ্ + য = দৃশ্য (দেখার যোগ্য) দৃশ্ + অন = দর্শন (দেখা)

কৃ—কৃ + ত = কৃত (যাহা করা হইয়াছে)

কৃ + অনীয় = করণীয় (করার যোগ্য) কৃ + তৃচ্ = কর্তা (করেন যিনি)

পঠ্—পঠ্ + ঘঞ্ = পাঠ (পড়া)

পঠ্ + তব্য = পঠিতব্য (পাঠের যোগ্য) পঠ্ + ণিচ্ + অন = পাঠন (পড়ান)

ভুজ্—ভুজ্ + ক্তি = ভুক্তি (ভোগ করা)

ভুজ্ + য = ভোজ্য (ভোজনের যোগ্য)

ভুজ্ + ক্ত = ভুক্ত (যাহা ভোজন করা হইয়াছে)।

প্রঃ—২। উপমা ও উৎপ্রেক্ষা অলংকার কাহাকে বলে উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও :—

উঃ—(বিচিত্রা'র অলংকার অংশ দ্রষ্টব্য)

অথবা

প্রঃ—নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যে যে কোনও দুইটির অলংকার ব্যাখ্যা কর :—

(ক) চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে

উঃ—জীবন নদে = জীবনরূপ নদে, জীবন উপমেয়, নদ—উপমান ; উভয়ের অভেদ কল্পনায় রূপক অলংকার হইয়াছে।

(খ) নড়িছে বিষাদে মর্মরিয়া পাতাকুল—

উঃ—পাতাকুল অচেতন, তাহাতে চেতন ধর্মের আরোপণে সমাসোক্তির সঞ্চার ঘটেছে।

(গ) গতিজিনি গজরাজ কেশরী জিনিয়া মাঝ

মুক্তা পাতি জিনিয়া দশন

উপমানের গজরাজ ও কেশরী ও মুক্তা পাতি অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ দ্যোতিত হওয়ায় ব্যতিরেক অলংকারের উদ্ভব হয়েছে।

* গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশকের *